ল রায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিকপত্র

অষ্টাবিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

অষ্টাবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ—১৩৪৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। পৌষ পার্ব্বণ ২। পাহাড়ী পথ ৩। জহর ব্রত

বিশেষ চিত্র

১। দিল্লীতে সম্পাদক সম্মিলনে ট্রিবিউনের মিঃ সন্ধী, লীডারের মিঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ডেপুটী স্পীকার শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত

২। কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সাধারণের জন্য বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধ কেন্দ্র। বালীর থলিয়া দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে

৩। বাকিংহাম প্রাসাদের উদ্যানে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ, সাম্রাজ্ঞী ও মিঃ উইনস্টন চার্চ্চিল—ইঁহারাই এখন বৃটীশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন

৪। বিলাতের ... সভার উপর বোমা পড়ার পর তাহার ব্যবস্থা। অনেক স্থানে বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে

৫। বিলাতে ...য়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় ছাত্রাবাসে বোমা পড়িয়া উহার একাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

৬। লাহোরে গুরু নানকের জন্মদিনে বহু লোক তথায় গমন করে

৭। বিলাতে বাকিংহাম প্রাসাদে বোমা পড়ার অবস্থা—এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

৮। কলিকাতার গঙ্গায় (বাগবাজারে) খড়ের নৌকাসমূহে অগ্নি-কাণ্ডের দৃশ্য। হাতে কয়েক লক্ষ টাকার খড় নষ্ট হইয়াছে

৯। রাঁচী... লেক—(রাঁচীর একটি দৃশ্য)

১০। স...-পারের ছেলের দল

মাঘ—১৩৪৭

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৪৭

ত্রিবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

চৈত্র—১৩৪৭

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৪৮

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ-চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

পৌষ [illegible]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক

সরগুজার আদিবাসীর দুর্গা উৎসব নৃত্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পৌষ—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সৃষ্টির স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি

ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব ডি-এস-সি

১

বর্ত্তমান বিজ্ঞান "কার্য্যকারণতত্ত্ব"কে অস্বীকার করতে চলেছে। যাকে আমরা কার্য্য বলি আর সেই কার্য্য যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করি—এই উভয়ের মধ্যে সে আজকাল কোনও স্পষ্ট কারণিক সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তাকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে যে, যা ভূতকালে সংঘটিত হয়েছে কেবলমাত্র তারই ওপরে সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না—ভবিষ্যতের মধ্যে ভূতকালের সঙ্গে এমন একটা কিছু জড়িত রয়েছে যার অস্তিত্ব সমস্ত ভূতকালের মধ্যে পাওয়া যায় না। সূফী কবি ওমরের সেই প্রসিদ্ধ লাইন "সৃষ্টির প্রথম উষার মধ্যেই তার শেষ সন্ধ্যাও লুকিয়ে আছে" আজকালকার বিজ্ঞান অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না।

এই কার্য্যকারণতত্ত্ব শুধু যে বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ছিল তাই নয়, তার প্রকাণ্ড ইমারতের প্রত্যেকটি ইট এই কার্য্য-কারণের সীমেণ্ট দিয়ে গাঁথা ছিল। তাই যদি বলা যায় যে, এই কার্য্যকারণতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ ছিল তা হ'লে বোধ হয় খুব বেশী বলা হবে না। জীবন্ত শরীরে প্রাণশক্তি থাকে তার প্রত্যেক কণার মধ্যে। তেমনিই কার্য্যকারণ ছিল গত শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম বিভাগের মধ্যে। তাই যে তত্ত্বের ওপর সে তার সমস্ত ইমারতকে দাঁড় করিয়েছিল, গ্রথিত করেছিল, বোধ হয় অকিঞ্চিৎকর সামান্য একটা ইলেক্ট্রনের স্বেচ্ছাচারিতায় তা যখন স্বপ্নবৎ অলীক ব'লে প্রতীয়মান হ'ল,তখন তার অবস্থা কল্পনা করা দুরূহ। তার মধ্যে স্থানে স্থানে গোলমাল দেখা দিতে লাগল, আর হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে সে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। আর তাকে দেখে কেউ কেউ হয়ত বলেছিল, এইবার তার শেষ। কিন্তু সত্যের আকর্ষণ দিয়ে যার শরীর তৈরি, অজ্ঞানের বা মিথ্যার অন্তর্ধানে তাকে কতদূর কি করতে পারে! সে যে ক্ষণিকের জন্যেও অভিভূত হয়েছিল এই তার পক্ষে ছিল অশোভন।

মিথ্যার আবরণ তার চোখের ওপর থেকে সরে গেলে সে নিজের অন্তরে এই তত্ত্বটি অনুভব করল, জগৎ-ব্যাপারের সব কিছুই নিজের স্বভাবের গুণেই 'হয়' (happens)। সমস্তকে এক সঙ্গে ক'রে বৃহৎভাবে যখন দেখি তখন এই স্বভাব প্রতীয়মান হয় 'আকস্মিকতা'র (chance) রূপে। আর যখন কোনও একটিকে বা ক্ষুদ্রকে অবলম্বন ক'রে তা দেখতে যাই তখন তাকেই পাই যেরূপে তার নাম দেওয়া চলতে পারে "FREE WILL". আর তার সেই পুরাতন কার্য্যকারণতত্ত্ব—সেও এখন তার ধার করা দীপ্তি ফেলে দিয়ে নিজের সত্যিকারের স্থানটিতে দেখা দেয়—তাকে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত অগভীরভাবে সকলের সঙ্গে শুধু ওপর ওপর ভাবে মিশে থাকতে। একটু সামান্য নাড়াচাড়াতেই এখন তার শূন্য গর্ভ প্রকট হ'য়ে পড়ে।

স্বল্প কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কার্য্যকারণের জায়গায় বিজ্ঞান এখন পেয়েছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে "FREE WILL"-কে—আর সমষ্টিগত ক্ষেত্রে পেয়েছে CHANCE বা আকিস্মকতাকে। আর এই আকস্মিকতার উত্তরফলস্বরূপ কার্য্যকারণকে সে আবার ফিরে এনেছে। সে বলে আমরা যে সর্ব্বত্র কার্য্যকারণতত্ত্বকে অনুভব করি—তা CHANCE-এরই একবিশেষ প্রকাশ, FREE WILL এরই বাহিরের পরিসমাপ্তি।

CHANCE-কে নিয়ে যতটা না হোক, এই "FREE WILL"-কে নিয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে। এই WILL-ব্যাপারটা একে ত আগাগোড়া অবিজ্ঞান-ঘেঁষা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে FREEDOM অর্থাৎ স্বাধীনতা। অর্থাৎ বিজ্ঞান তার প্রত্যেক কণাকে শুধু ইচ্ছা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। বিজ্ঞানের এ করবার ক্ষমতা আছে কি-না এই হ'ল সমস্যা। 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের আমরা বর্ত্তমানে এই সমস্যাটি উপহার দিতে চাই।

২

FREE WILL কথাটি মানুষ অনেক কাল থেকেই বলতে শিখে এসেছে। কিন্তু সে এতদিন যে ক্ষেত্রে একে ব্যবহার ক'রে এসেছে তা একেবারে বিজ্ঞানের বিপরীত। এর স্থান ছিল প্রধানত স্বাধীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যুক্তিবাদকে অপ্রধান করা হয়—আর ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রধান করা হয়ে থাকে। অথচ সেই শাস্ত্রের অন্তর্গত এই FREE WILL কথাটি বিজ্ঞান আত্মসাৎ ক'রে নিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে FREE WILL-এর একটা সত্যিকারের তাৎপর্য্য আছে, একটা সংস্কার বা TRADITION আছে। এই ভাবধারাকে বাদ দিয়ে শুধু শব্দটিকে গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না। তাই বিজ্ঞানকে শব্দ দুইটির সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে TRADITION-কেও গ্রহণ করতে হয়েছে। কাজেকাজেই ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা একে যেভাবে দেখে এসেছেন, আমাদেরও সেইখান থেকেই এর আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।

ইচ্ছা বা ইচ্ছা করা প্রধানত মানুষের বা মনের ব্যাপার। আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা বলে একটা জিনিষ আছে, আমরা প্রত্যেকেই যে ইচ্ছা ক'রে থাকি এ একটা অত্যন্ত সাধারণ কথা। আমার নিজের অস্তিত্বের সম্বন্ধে যেমন আমরা নিঃসন্দেহ, আমাদের মধ্যে ইচ্ছা বলে কিছু যে একটা আছে সে সম্বন্ধেও তেমনই অসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই ইচ্ছা কি স্বাধীন, না এর অন্তরালে কোনও কারণ আছে? একটা ডালা ভর্ত্তি ক'রে নানা রঙের অনেকগুলি গোলাপ আমার সামনে রাখা আছে। তার মধ্যে থেকে একটা নিতে ইচ্ছে হ'ল। তুলে নিলাম হলুদ রঙের মার্শাল নীলটা। অনেকগুলোর মধ্যে এই মার্শাল নীলটাকেই বেছে নেবার মধ্যে বলা হয় যে, এর মূলে রয়েছে আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা। যেখানে অনেকগুলো জিনিষ সমান অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে একটাকে বেছে নেবার মধ্যে আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা বর্ত্তমান; কিন্তু ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental psychology) বলে যে, এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যেও আমার স্বাধীনতা নেই। এখানে আমরা আমাদের পূর্ব্ব-সংস্কারের অধীন। আমাদের ভাল লাগা বা মন্দ লাগা, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অন্তরালে রয়েছে নানা সময়ের নানা ঘটনার ভাব-সমষ্টি। এরা আমাদের মনের মধ্যে অলক্ষিতে জমা হ'য়ে ব'সে আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখানেও আমাদের কোনও সত্যিকারের স্বাধীনতা নেই। তাই এখানেও FREE WILL-সমস্যা এসে উপস্থিত হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলে থাকেন যে, আমাদের পাপের মূলে ইচ্ছার এই স্বাধীনতা রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আমার কর্ম্মের দায়িত্ব আমার না থাকলে পাপের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার কর্ম্মের জন্যে আমি দায়ী

বললেই কথা সম্পূর্ণ হয় না—বলতে হয় কার কাছে দায়ী? শাস্ত্রকারদের (Theologians) কাছে এর উত্তর অবশ্য আছে। তাঁরা বলেন, আমার কর্ম্মের জন্যে আমি দায়ী—(১) ভগবানের কাছে, (২) সমাজের কাছেও (৩) আমার নিজের কাছে। এর মধ্যে পাপের জন্যে আমরা দায়ী প্রধানত ভগবানের কাছে। প্রশ্ন হয়, "ভগবানের কাছেই-বা দায়ী হ'তে যাব কেন?" উত্তরে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই রকম যুক্তি দেখান—(১) ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, (২) তাই আমাদের কর্ম্মের হিসাব তাঁর প্রাপ্য, কারণ (৩) আমার পাপের জন্যে তাঁর হাতে শাস্তি পেতে হবে। তাঁদের কাছে ভগবৎ ইচ্ছার বিপরীত কোনও ইচ্ছার উত্তরফলই হ'ল অন্যায়-কর্ম্ম, পাপ। এইভাবে তাঁরা অন্যায় আর পাপের সঙ্গে স্বাধীনতার সংযোগ স্থাপন করেন।

স্বাধীনতার মূল এইভাবে একটা পাওয়া গেলেও তা মোটেই যুক্তিসহ হয় না। ভগবান যদি আমাকে সৃষ্টি ক'রেই থাকেন তবে আমার ভিতরকার তাঁর ইচ্ছার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ করার চেষ্টাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব এখানেও এর জন্যে আমি প্রধানত দায়ী নই। তা ছাড়া, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ভগবানকে বলেন তিনি পরিপূর্ণ ভাল। যে পরিপূর্ণ ভাল, তার সৃষ্টির মধ্য থেকে মন্দ বের হবে কেমন ক'রে? ভগবানকে পরিপূর্ণ ভাল ও হ'তে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পাপ করার ইচ্ছাও থাকবে—এ দুটো এক সঙ্গে হ'তে পারে না। একাসনে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা আর বিচারক হ'লে তাঁর মধ্যে বিরোধ এসে পড়ে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের এ কথা এ ভাবে স্বীকার করা চলে না।

বাস্তবিক কথা এই যে, খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা স্বাধীনতা বা freedom-কে আবিষ্কার করলেও তাঁরা এর যথার্থ স্থানটি খুঁজে পাননি। তাঁরা ভগবানকে পরিপূর্ণ ভাল বলেই যত বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন। এই স্বাধীনতাই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দিয়েছেন। তাই সে ভগবৎমুখী বা ভগবৎ-বিরোধী দু-ই হ'তে পারে। এইখানেই আছে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা। ভগবানের আছে শুধুমাত্র স্বাধীনতা—সৃষ্টির মধ্যে এসে তাই হয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা—FREE WILL.

সৃষ্টি মূলত শুধুমাত্র জড় নয়—জড় প্রাণ ও মন এই তিনটি তত্ত্বকে অঙ্গাঙ্গীভাবে এক ক'রে নিয়ে সচেতনভাবে অবস্থিত। মনের স্তরে এই স্বাধীনতা দেখা দেয় ইচ্ছার স্বাধীনতারূপে, প্রাণের স্তরে দেখা দেয় জীবনের উৎশৃঙ্খল স্পন্দনের ভিতর, আর জড়ের স্তরে সে দেখা দেয় সেই গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে যাকে আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা জড়জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখছেন।

সৃষ্টির মধ্যে এই তত্ত্বগুলি অবশ্য এইভাবে বিভাজিত হ'য়ে নেই—সেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে এক হ'য়ে মিলে মিশে বর্ত্তমান। বিজ্ঞান এর ভিতরকার চৈতন্য-সত্তাকে স্বীকার করতে চায় না। এর সচেতনত্বকে বাদ দিয়ে যা বর্ত্তমান থাকে তার নাম সে দেয়—প্রকৃতি। তাই প্রকৃতিকে সে অচেতন জড়রূপা বলেই পায়। প্রকৃতিকে অনুধাবন করবার এই পথ সে বেছে নিয়েছে বলেই প্রকৃতির যান্ত্রিক ভাবই তার কাছে শুধু প্রকাশ পায়। যান্ত্রিকতার প্রথম করোলারি (corollary) হ'ল কার্য্যকারণতত্ত্ব। তাই তার সামনে কার্য্যকারণতত্ত্ব এত সত্যরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও কাল বেরিয়ে আসে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থায় এক অপরের অসম্পর্কিতভাবে। তার জগৎ তখন জড়রূপ নেয় খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে। অথচ তার সমস্ত নিয়ম সে গড়ে—এক অবিচ্ছিন্নতা অখণ্ডতাকে কল্পনা ক'রে।

৩

বিজ্ঞান যে প্রকৃতিকে এইরকম জড়রূপা যন্ত্রভাবাপন্ন-ভাবে দেখতে পায় তার মূলে একটা বিশেষ কারণ আছে। মানুষ আর প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে যা সম্বন্ধ তা মানুষের কাছে প্রকাশ পায়—জ্ঞানের আকারে। তাই সমস্ত জ্ঞানের মূলে রয়েছে বিষয়ী আর বিষয়ের সম্পর্ক। মানুষ এখানে হ'ল বিষয়ী অর্থাৎ subject, আর প্রকৃতি হ'ল বিষয় অর্থাৎ object. বিষয়ী বা subject, অর্থাৎ মানুষ, বিষয় বা object অর্থাৎ জগৎকে তার বাইরের জিনিষ বলে মেনে নিয়ে তার মধ্যে তারই অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি অনুসন্ধান করে—সম্পূর্ণ নিজের প্রয়োজনানুসারে বা ইচ্ছার অনুরোধে। যে সম্পর্ক সে খুঁজে বার করে, তা তার কাছে বাইরের জিনিষেরই ভিতরকার সম্পর্ক

বলেই প্রকাশ পায়। এই সম্পর্কের মূলে যে তার নিজেরই ইচ্ছা ছিল বা তারই প্রয়োজনের খাতিরে এই সম্পর্ক বা নিয়ম সে খুঁজে পেয়েছে তা তার কাছে একেবারেই অপ্রকাশ থেকে যায়। কাজে কাজেই, তার কাছে বিষয় আর বিষয়ী একেবারে পৃথক্ থেকে যায়। প্রকৃতি আর মানুষ হ'য়ে ওঠে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা।

এই সত্তা দুটির মধ্যে একটির অর্থাৎ মানুষের অধিকার ইচ্ছা করা, কাজ করা, আর অনুভব করা। আর অপরটির অধিকার object বা মানুষের ইচ্ছার ভূমি হওয়া বা তার কাজের উপকরণ-স্বরূপ হ'য়ে ওঠা। প্রকৃতিকে তাই মানুষ যে ভাবে দেখতে চায় সে তাকে ঠিক সেই ভাবেই ফিরে পায়। যখন সে যন্ত্র দিয়ে তাকে অনুসন্ধান করে তখন প্রকৃতির মূল রহস্যও যান্ত্রিকভাবেই ধরা পড়ে। যন্ত্র জিনিষটা মানুষের হাতের তৈরি জিনিষ, আর একে সে তৈরি করেছে 'নিশ্চিতত্বের' তত্ত্ব দিয়ে। তাই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যে প্রকৃতিকে সে খুঁজে বার করে, তাকেও মনে হয় যেন অতি সু-নিশ্চিত। কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে তা যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। এই নিয়মগুলি জানা থাকলে আর জগতের যে-কোনও জায়গার যে-কোনও সময়ের অবস্থার খবর পেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অঙ্ক কষে বার ক'রে ফেলতে পারা যাবে। জগতের মধ্যে অনিশ্চিত অজানিত বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে পারে না এই তার দৃঢ় ধারণা।

কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরে ভাল ক'রেই জানি যে, জগৎ অত সু-নিশ্চিত ব্যাপার নয়। আমরা জানি যে জগতকে আমরা কখনও সম্পূর্ণভাবে সব দিক দিয়ে জানতে পারি না। জগতের একটা ব্যাপারের খবর জানলে তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারটি তেমনিই গোপন হ'য়ে পড়ে। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সে যন্ত্রের মত স্থির নিশ্চল নয়। প্রমাণ না দিতে পারলেও আমরা জানি যে, জগৎ শুধু পরিবর্ত্তনশীল তাই নয়, এ পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রগতি বা পরিণতিও বর্ত্তমান। এখানে সৌর জগৎ সৃষ্ট হ'য়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। ছড়ান নীহারিকা পুঞ্জীভূত হ'য়ে শীতলতায় পর্য্যবসিত হয়। এখানে জীবন অবির্ভূত হ'য়ে বোধ ও সাড়াকে উদ্বুদ্ধ করে। মন জন্ম নেয়—নিরাশার গভীর অন্ধকারে আশার ক্ষণদীপ্তি দেখা দেয়। সৃষ্টির নাটক তার পট-পরিবর্ত্তন ক'রে চলে—"অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি"।

"তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে।"

বিগত যুগের বিজ্ঞান পরিপূর্ণ যান্ত্রিকতাকে চোখের সামনে জোর ক'রে ধরে রেখেছিল বলে সৃষ্টির এই সব অশাস্ত্রীয় উৎশৃঙ্খলতাকে দেখতে পেলেও জোর ক'রে অস্বীকার করত। তার কাছে এ সব ছিল বিষয়ী অর্থাৎ subject-এর গণ্ডীর ব্যাপার, আর কাজে কাজেই অলীক। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের পূর্ব্বজগণের গড়া যান্ত্রিকতার কঠিন নিগড় থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টায় প্রাণপণে ব্যাপৃত আছেন। কাজে কাজেই, তাঁরা এমন সব কথা আজকাল বলতে সুরু করেছেন প্রাচীনপন্থী বৈজ্ঞানিকেরা যা শুনলে বোধ হয় কানে আঙুল দিতেন।

৪

জগতকে বোঝবার চেষ্টায় তাকে বিষয়ী আর বিষয় অর্থাৎ subject-object-হিসাবে ভাগ ক'রে নেওয়া যে বাস্তবিক একটা কৃত্রিম কাজ, তা সহজেই বোঝা যায়। বিষয়ী বা subject বলতে মানুষ অর্থাৎ তার মনকে বোঝায়। জগতকে মানুষের মনের বা চিন্তার সৃষ্টি, এইভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে দর্শনের উদ্ভব তাকে idealist বা আদর্শবাদী দর্শন বলা হয়। অপর পক্ষে, জগৎ সম্পূর্ণভাবে subject বা মানুষের বাইরের বস্তু, বিষয়ী থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, এইরূপ ভাব মূলে রেখে যে দর্শনের উদ্ভব তাকে realist দর্শন বলে। এর মধ্যে যারা আরও বলে—বিষয়ী যে, সে নিজেও বিষয়েরই অন্তর্গত একটা ব্যাপার—তাকে materialist দর্শন বলে। কাজে কাজেই আদর্শবাদী দর্শন ও বাস্তব বা জড়বাদী দর্শন মূলগতভাবে পরস্পরের বিরোধী। অর্থাৎ আদর্শের মধ্যে বস্তুর কণামাত্রও নেই, অপরপক্ষে বস্তু জিনিষটার মধ্যে idea বা আদর্শ বা চেতনার চিহ্নও থাকতে পারে না।

পরিপূর্ণ বাস্তবতা বা জড়কে নিয়ে যে শাস্ত্র একেবারে মগ্ন, তাকে আমরা বলি জড়বিজ্ঞান। এ শাস্ত্র মনকে বা তার কাজকে যে একেবারে অস্বীকার করে তা অতি প্রসিদ্ধ। এ বলে যে দ্রষ্টা বা subject জগতের সত্যকারের জ্ঞানকে

পাওয়ার পথে এত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আসে যে তাকে একেবারেই বাদ দিতে হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান তাই আদর্শ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ জ্ঞান। কাজেকাজেই, বিষয়ী বা দ্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থায় জগতের যে রূপ ও গুণ গড়ে ওঠে তারা পুরোপুরি অলীক ব'লে বিজ্ঞান তার রাজ্য থেকে তাদের নির্বাসন দেবার পক্ষপাতী। মানুষের কাছে জগতের রংটাই প্রধান, তাই বিজ্ঞান রং-জিনিষটাকে স্বীকার না ক'রে তার জায়গায় কম্পন-সংখ্যা নিয়ে এসেছে। শীতলতা বা উত্তাপবোধের স্থান নিয়েছে টেম্পারেচারের ডিগ্রী। শব্দানুভূতিকে অস্বীকার ক'রে তার স্থানে বাতাসের কম্পন-সংখ্যা এসে জুড়ে বসেছে। এইভাবে জগতের qualitative element-গুলিকে সরিয়ে রেখে তাকে সর্ব্বাংশে quantitative করবার চেষ্টা হ'য়েছে সংখ্যার সাহায্যে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বিজ্ঞানের আলোচনায় সংখ্যা ছাড়া বাস্তবতামূলক অপর কোনও গুণ বা ধর্ম্মের স্থান নেই। কিন্তু সংখ্যা ত সত্যকারের বাস্তব জিনিষ কিছু নয়, বরং একে আদর্শ (idea)-জাতীয় কিছু বলাই বেশী চলে। কাজেকাজেই, পরিপূর্ণ বাস্তবতা করতে গিয়ে বিজ্ঞান বাস্তবতাকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলতে হয়, বিজ্ঞান যে-জগতকে নিয়ে আলোচনা করে তা যে-জগতকে আমরা ধরি, ছুঁই, সব রকমে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে আসি—তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের জড় বা matter তাই unknowable, আর সঙ্গে সঙ্গে non-existant.

অপরপক্ষে আদর্শবাদীদের গোড়া অনুসন্ধান ক'রে দেখলে সেখানেও ঠিক এই রকমেরই যুক্তিহীনতা প্রকাশ পায়। বাস্তববাদী যেমন আদর্শবাদীতে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি আদর্শবাদী হ'য়ে ওঠে বাস্তববাদী। আদর্শবাদীর মতে বিষয়ী বা subject বা তার idea-র বাইরে কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই idea বা আদর্শের স্থান কোথায়? নিশ্চয়ই মানুষের বস্তুময় মস্তিষ্কের ভিতর নয়ই; যদি তাই হয় তবে idea-কেও বস্তুর সঙ্গে একাসনে বসতে হবে, আর তা স্বীকার করলেই আদর্শবাদ সম্পর্কে গোড়াতে যা মেনে নিয়েছি, তার বিপরীত কথা স্বীকার করতে হবে। কাজে কাজেই স্বীকার করতে হয় যে আদর্শবাদীদের idea তাদের বাইরে কোথাও আছে। আদর্শবাদী গিয়ে নিজের জায়গা ক'রে নিচ্ছে বাস্তববাদীদের পাশে।

বাস্তবিক কথা এই যে, জগতকে শুধু বস্তুময় বা শুধু মাত্র idea দিয়ে তৈরি এমন কোনও watertight বিভাগ করতে গেলে তা ভুল হবে। জগৎ সর্ব্বথা বস্তুময় বা পরিপূর্ণ idea দিয়ে তৈরি নয়। জগতের মধ্যে বস্তু বা জড়ত্ব ও idea আদর্শ বা চেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে, তাই বিষয়ী আর তার বিষয়কে জোর ক'রে পৃথক্ ক'রে এদের জট ছাড়ানর চেষ্টা করলে আমাদের জ্ঞানের জায়গায় অজ্ঞানের গভীরতর জটিলতা এসে দেখা দেবে। জগতে বস্তু ও চেতনা দু-ই রয়েছে একেবারে একসঙ্গে মেশে অদ্বৈত অবস্থায়। সৃষ্টির এই দ্বৈতাদ্বৈত রূপকে স্বীকার না ক'রে যে জ্ঞানই লাভ করা যাক না কেন, তা হবে প্রধানত অজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান নিজের দৃষ্টি জগতের এই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের ওপর নিবদ্ধ ক'রে নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার অসাধ্য সাধনে ব্যাপৃত। শুধু পদার্থ বিজ্ঞানই নয়—বিজ্ঞানের অন্য সব ক্ষেত্রেও অর্থাৎ জীব-বিজ্ঞানে আর মনোবিজ্ঞানেও এই রকম দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের আলোচনা পদার্থবিজ্ঞান আর তার অন্তরনিহিত দর্শনতত্ত্ব নিয়ে সমাকৃত বলে আমরা প্রধানত আমাদের সেই সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব।

৫

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীকে এইভাবে সম্পূর্ণ অভিনব দিকে নিয়ে গিয়ে জগতকে দেখতে যাবার প্রধান ফল হ'ল এই, সমস্ত দর্শনই যে পরিপূর্ণ নিশ্চিততাকে এই জগতের সর্ব্বত্র মূলগতভাবে বর্ত্তমান বলে নিয়েছিল তা একেবারে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রাক্কায় কার্য্যকারণের যে রূপ ছিল তাও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। কার্য্যকারণ এখন আর নিশ্চিততাকে অবলম্বন করল না, বরং অবলম্বন করল অনিশ্চয়তা বা আকস্মিকতাকে। এই যে অনিশ্চয়তা-তত্ত্বের কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম তা বৈজ্ঞানিক-দের একটা মনগড়া কথা নয়। এই অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব তাঁরা জগতের সর্বত্রই লক্ষ্য করেছেন—জগতের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যরূপে। জগতের এই অনিশ্চয়তার প্রকাশ পাবার মূলে রয়েছে কর্ম্মজগতের স্বাভাবিক আণবিক বা পরমাণুভাব। জড়কে ত অনেকদিন থেকেই আণবিক ব'লে আবিষ্কার করা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা এখন এই জড়ের আণবিকতা

সম্বন্ধে তেমন স্পষ্টাক্ষরে কোনও কথা বলতে চান না—বরং বলেন যে, তাঁদের পরীক্ষণের সামনে শক্তি বা কার্য্য আণবিক রূপ নেয়। বৈজ্ঞানিকের সমস্ত পরীক্ষা বা প্রয়োগের প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, জগতের সমস্ত কাজ চলে খণ্ড খণ্ড ভাবে—by jumps.

কর্ম্মজগতের এই সর্ব্ব রকমের আণবিকতা জগতকে অনিশ্চিত ক'রে তুলেছে। জগতকে যতক্ষণ আমরা জানবার চেষ্টা করছি না বা অনিশ্চিততার মধ্যে তাকে পাবার প্রয়াসী হচ্ছি না, ততক্ষণ এর নিশ্চিততা বা অনিশ্চিততার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। যে মুহূর্ত্তে একে জানবার জন্যে এর আণবিক অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে বৈলক্ষণ্য এনে ফেলছি। আর এই বৈলক্ষণ্যই জগতের আণবিক রূপের ওপর প্রতিফলিত হ'য়ে এসে আমাদের কাছে জ্ঞান হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কাজে কাজেই, এই জ্ঞান হ'য়ে উঠছে অনিশ্চিত বা অর্দ্ধ-নিশ্চিত জ্ঞান। হাইসেনবার্গ দেখিয়েছেন যে, জগতের গঠনই এমন যে, জ্ঞানের এই অনিশ্চিত রূপ ছাড়া অন্য কোনও রূপ পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। জগতের নিজের মধ্যেই এই অনিশ্চয়তা বা স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকার দরুণ জগতান্তর্গত যাবতীয় ঘটনা বা কাজের মূলেও এই অনিশ্চয়তা বা স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়।

জগতের কার্য্যের আণবিকতা কি ভাবে নিজের মধ্যের অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে দেয়, তা আগের একটা লেখায় দেখাবার চেষ্টা করেছি। এখানে তার মোটা মোটা দু-একটা তথ্য দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। ধরা যাক, একটা কাচের টুকরার ওপর কতকটা আলো এসে পড়েছে। এই আলোটার কতক অংশ কাচটার মধ্যে প্রবেশ করবে, আর কতক অংশ তার গায়ে লেগে প্রতিফলিত হ'য়ে যাবে। মনে করা যাক, আলোটার তিন-চতুর্থাংশ প্রতিফলিত হচ্ছে, আর এক-চতুর্থাংশ ভেতরে ঢুকছে। আলোর কাচের মধ্যে প্রবেশ করবার আর প্রতিফলিত হবার এই যে সম্বন্ধ (ratio), তা আলোর জোর বা intensity-র ওপর নির্ভর করে না। মনে করা যাক, আলোর জোর কমতে কমতে একটা আলোর কণার গিয়ে দাঁড়াল। তখন প্রশ্ন এই যে, সে কি করবে, প্রতিফলিত হবে, না কাচের ভিতর ঢুকে প্রতিসরিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আলো যদি কণা-রূপ না হ'ত তবে বলতাম যে, যত ইচ্ছা সে বিভাজিত হ'তে থাকবে তত তার প্রতিফলন আর প্রতিসরণের সম্বন্ধ বজায় থাকবে। কিন্তু কণাকে ত বিভাগ করা চলে না। কাজেকাজেই, কণাটার আচরণ থেকে যায় একেবারে অনিশ্চিত—তার আচরণ তখন বলতে হয় দেবা ন জানাতি কুতো বৈজ্ঞানিক।

ইলেক্‌ট্রিকের কণা বা ইলেক্‌ট্রনকে নিয়েও ঠিক এই রকম অনিশ্চিতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। ইলেক্‌ট্রনটা কোথায় আছে জানবার প্রয়োজন হ'লে তাকে দেখতে হবে তার ওপর আলো ফেলে। আলোটা যদি স্থূল হয় তবে দেখাটাও স্থূল হবে। কাজেকাজেই, আলোটাকেও সূক্ষ্ম ক'রে নিতে হয়। আলো যতই সূক্ষ্ম হয় ততই ইলেক্‌ট্রনটাকে অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় ভাল ক'রে। কিন্তু সূক্ষ্ম আলোর শক্তি বেশী বলে সে তত বেশী ইলেক্‌ট্রনটাকে সরিয়ে দেয় নিজের অবস্থান থেকে। অর্থাৎ তার অবস্থানের মধ্যে ততখানি অনিশ্চয়তা এসে জোটে! ফলে এই দাঁড়ায় যে, ইলেক্‌ট্রনটার অবস্থান যত ভাল ক'রে দেখতে যাই, তার গতির মধ্যে তত বেশী ভ্রান্তি এনে ফেলি; আবার অপর পক্ষে তার গতি যত ভাল ক'রে জানি তার অবস্থান তত অনিশ্চিত থেকে যায়। তথ্য দুইটাই যুগপৎ সমানভাবে কিছুতেই জানতে পারি না।

জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের সর্ব্বত্রই এই অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তাকে লক্ষ্য ক'রে স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স বলেছেন, জগৎ যেন একটা মরুভূমি। এর আকাশে উড়তে উড়তে দূর উপর থেকে একে একভাবে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু সে দেখায় আমাদের জ্ঞানের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। তাই কাছে এসে ভাল ক'রে দেখতে যাই, কিন্তু নিজেরই পাখার বাতাসে এত ধূলোর সৃষ্টি করি যে তাতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে নেবার সুবিধে পেয়ে যায়। তার যত কাছে আসি সে তত নিজেকে গোপন ক'রে দেয় আমারই নৈকট্যের অন্তরালে।

জগতের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। যাকে আমরা জড় বলে সাধারণত নির্দ্দেশ ক'রে থাকি সেখানে এই অনিশ্চয়তা প্রকাশ পায় আকস্মিকতার আকারে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, এই আকস্মিকতার উত্তরফলস্বরূপ কার্য্যকারণতত্ত্ব জগতে আবার জন্ম লাভ

করে। পূর্ব্বেই বলেছি জগতের সব কর্ম্মই একটা discontinuous process অর্থাৎ কাটা কাটা ভাবে হ'য়ে চলে—অখণ্ডভাবে হয় না। কর্ম্মের অস্তিত্ব তাই ক্ষণিকের—খণ্ড খণ্ড ভাবে। এই ক্ষণস্থায়ী জগতকে চিরস্থায়ী অবস্থায় কিভাবে পাই তা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটি অতি মনোজ্ঞ আবিষ্কার। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও ভাল ক'রে বলবার ইচ্ছা থাকাতে এ নিয়ে এখন আর আলোচনা করলাম না। একে এইখানে উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে, জগতের মূল অনিশ্চয়তার সঙ্গে জগতের এই মূল ক্ষণিকতার নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। অনিশ্চয়তা এর ক্ষণিকতাকে জন্ম দিয়েছে, বা ক্ষণিকতা আছে বলে সব অনিশ্চিত তা বলা কঠিন, তবে এটুকু বলা যায় যে এই দুয়েরই মূলে রয়েছে জগতের মূল স্বাধীনতা বা freedom।

৬

আমরা দেখলাম যে, বিজ্ঞান তার পরীক্ষণ ও প্রয়োগের ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করল যে সমস্ত কাজের মূলে আকস্মিকতা বর্ত্তমান। জগতের সমস্ত কিছুই যদি আকস্মিক হয় তবে তা হ'য়ে ওঠে অনিশ্চিত। অনিশ্চিত হ'লেই তাকে স্বাধীন কেমন ক'রে বলি? আমার এই কলমটার গতিবিধি অন্তত এই কলমটার নিজের কাছে অনিশ্চিত। কিন্তু গতিবিধি যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, তার মধ্যে কলমটার স্বাধীনতা একটুও নেই। অতএব জগতের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকলেও তার মধ্যে স্বাধীনতা না থাকতেও পারে। জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে স্বাধীনতার অস্তিত্বের দাবী করতে গিয়ে অনিশ্চয়তা আর স্বাধীনতাকে সমার্থ বোধ করা হয় কোন্ যুক্তি অনুসারে বা কিরূপ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে? আমরা এখন এই সমস্যাটির ওপর দু-একটি কথা বলেই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার উপসংহার করতে চাই। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ এখনও রয়েছে। অনেকেই আকস্মিকতাকে স্বীকার করলেও স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে চান না। আকস্মিকতার মধ্যে সচেতনত্ব থাকলেই তাকে স্বাধীনতা বলা হয়। তাই স্বাধীনতাকে একটু নাড়াচাড়া দিলেই তার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা বার হ'য়ে আসে। বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণভাবে বহির্জগতের ভিতর, তাই এখনও সচেতনত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করতে স্পষ্টভাবে রাজী নন। যদিও খুব নাম করা কেউ কেউ তা করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আকস্মিতার সঙ্গে চেতনা সংযুক্ত থাকলে তাকে স্বাধীনতা বলা হয়। আমার বিশ্লেষণের মধ্যে গোড়াতেই জড় ও চৈতন্যের বা object ও subject-এর মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গী ও অটুট সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছিল। Subject বা চৈতন্যের একটা অংশ (কতটা তা একেবারে অনিশ্চিত) জড়ের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা যুক্ত হ'য়ে থাকায় জড়ের মধ্যেও সচেতনত্বের ভাব বর্ত্তমান তা স্বীকার করতে হয়। কাজে কাজেই, বহিঃসত্তার মধ্যে আকস্মিকতা আর সচেতনত্ব দু-ই বর্ত্তমান, আর এই দুটি একীভূত অবস্থায় থেকে তাকে ক'রে তোলে স্বাধীন। ফলে দাঁড়ায় এই যে, নিউটন আর দেকার্ত্ত বহিঃসত্তার মধ্যে যে পরিপূর্ণ জড়ত্ব বা চিরন্তনের ও অপরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম আরোপ করেছিলেন তা বদলে গিয়ে তাকে শুধু যে পরিবর্ত্তনশীল করে গেছে তাই নয়, তার মধ্যে পরিণামশীলতাও এনে হাজির করে। সে উজ্জীবিত হ'য়ে দেখা দেয়।

যে পরিণামশীলতা স্বাধীনতা বা চেতনাকে আশ্রয় ক'রে আত্মপ্রকাশ করে, তার মধ্যে একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য থাকে। এ বৈশিষ্ট্য তার প্রতিমুহূর্ত্তের অভিনবত্ব। অনাগত সৃষ্টি তার ভূতকালের সংগুপ্ত অবস্থাকেই শুধু যে ফুটিয়ে তোলে তাই নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নবীনতা দান করে। সৃষ্টির বিগত ইতিহাস তার অনাগতকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে না। সৃষ্টি তাই "তিলে তিলে নূতন হয়", এখানে তাই first morning of creation can never write what the last dawn of reckoning shall read.

সৃষ্টির পরিণামশীলতা আর তার প্রতিমুহূর্ত্তের অভিনবত্ব তাই সোজাসুজিভাবে তার মধ্যে ইচ্ছার অস্তিত্বকে জাহির ক'রে দেখাচ্ছে। সৃষ্টি প্রতি মুহূর্ত্তে এমন একটি রূপ পায় যার অস্তিত্ব তার বিগত অবস্থার মধ্যে একেবারেই নাই। আবার এ অভিনবত্ব পুরোপুরি তার চেতনায় মধ্যেও নাই, কারণ এই চেতনাই তার এই অভিনবত্বকে অভিনব বলে স্বীকার করছে। এর মূলে রয়েছে ইচ্ছা।

সচেতনের ইচ্ছা, কাজে কাজেই তা স্বাধীন, শুদ্ধ জড়ের ক্ষেত্রে সে হয়ে ওঠে আকস্মিক। এই আকস্মিকতা আবার ঘনীভূত অবস্থায় কার্য্যকারণকে জন্ম দান করে, আর তখন আমার হাতের কলম তার সব স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিরেট জড় হ'য়ে সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার অধীনে চালিত হয়।

৭

যে ইচ্ছার অস্তিত্বকে জগতের মধ্যে আমরা এইমাত্র আবিষ্কার করলাম তাকে শুধু মাত্র ইচ্ছা বললে ভুল হবে। তার সত্য পরিচয় তখনই দেওয়া হবে যদি তাকে বলা হয়—"ইচ্ছা শক্তি"। স্বাধীন ইচ্ছাকে এইভাবে শক্তিমত্তার সঙ্গে বিজড়িত করলে "স্বাধীন ইচ্ছা"র বাস্তবিক কোনও অর্থ হয় না। এই জন্যেই আমাদের মনে অনবরত যে ইচ্ছার উদয় হয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে, বা নির্ব্বাচন করবার সময় Pabloo complex-এর অধীন হ'য়ে যে ইচ্ছা কাজ করছে তা থেকে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের ইচ্ছা তার স্বাভাবিক কার্য্যকারিতা হারিয়েছে, ইচ্ছা করলেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না, মনোজগতের তরঙ্গ হ'য়ে মনোজগতেই মিলিয়ে যায়। যে জগতে বা যে ক্ষেত্রে এই ইচ্ছাগুলি উৎপন্ন হয় প্রথমত তাদের তাতে স্বাধীনতা থাকে না, আর দ্বিতীয়ত যে-জড়জগতে এই ইচ্ছাগুলি নিজেকে সফল করবে সে-জগতের সঙ্গে তাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। কাজেকাজেই আমার নিজের অংশ বলে আমার হাতকেই আমি চালনা করতে পারি, কিন্তু আমার শরীরের বাইরের কিছুর প্রতি আমার কর্ত্তৃত্ব একেবারে থাকে না।

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে ইচ্ছা তার পরিণামশীলতা আর চিরনবীনতার মূল ভাবে বর্ত্তমান রয়েছে, তার মধ্যে এই দোষ ত্রুটি নাই। একে ত সে পরিপূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তারপর তার স্বাধীনতা জড়ত্ব পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে বলে তার ইচ্ছা সর্ব্বত্র তার কার্য্যকারিতাকে অনুভব করতে পারে, কোথাও সে প্রতিহত হয় না। ইচ্ছাশক্তি আর কর্ম্মশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক হ'য়ে দাঁড়ায়। সৃষ্টির মধ্যে এইখানে তাই একটা নিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এই নিশ্চয়তা তার স্বাধীনতারই রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টি স্বাধীন বলেই তার নিজের কাছে সে নিশ্চিত। কিন্তু এ নিশ্চিততা কর্ম্মজগতের—বর্ত্তমানের। জ্ঞান জগতের নয়। তাই একে আগে থেকে জানা যায় না, হিসাবের মধ্যে ধরা পড়ে না।

আমরা এবার আর একটি গভীরতর তত্ত্বের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কর্ম্মজগৎ নিশ্চিতরূপ পেয়েছে শক্তির সাহায্যে —যে শক্তি ইচ্ছাশক্তিরূপে সমস্ত জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে ক্রিয়া ক'রে চলেছে। জ্ঞানজগতকেও সেই ভাবে নিশ্চিতরূপ পেতে হ'লে তাকেও আশ্রয় করতে হবে ওই ভাবে একটি শক্তিকে। বিজ্ঞান এই শক্তিকে আবিষ্কার করতে না পারলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার দরজা চিরকালই অর্গলবদ্ধই থাকবে। আর যখন সে এই শক্তিকে জড়ের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করবে, কালের অতীত কর্ম্মের যে চিরন্তন রূপ সে উপলব্ধি করেছে, জ্ঞানেরও তেমনি কালাতীত চিরন্তন রূপ তার কাছে আবরণ উন্মোচন ক'রে আত্মপ্রকাশ করবে। জ্ঞান-জগতও তার কাছে আবার নিশ্চিত হয়ে ওঠবে।

রূপ

শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

কুসুম সেচিয়া রূপ
যে বিধি দিয়েছে তোমা,
ভুলেছে কি গন্ধটুকু দিতে ?

গন্ধহীন রূপ সে তো
আঁখির বিলাস শুধু,
স্বপ্নসম মিলাবে মাটিতে।

স্মৃতিরত্নের বিধান

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

এক

হিন্দুর ঘরে বালবিধবার ভাগ্যে সাধারণতঃ যাহা ঘটে, তাহার ভাগ্যেও ঘটিয়াছে তাই। সকাল হইতে রাত বারটা পর্য্যন্ত কাজ আর ফুরায় না। কাপড়-কাচা বাসন-মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া রাঁধা-বাড়া-এঁটোপাড়া-ঝাড়ামোছা সবই তাহার ঘাড়ে।

মা নাম দিয়াছেন 'হতভাগী', পিতা ডাকেন 'উষা মা'। মায়ের দেওয়া নামটায় তাহার দুঃখ হয় না। ভাবে, যাহার স্বামী অল্প লইয়া অনেক কিছু দান করিয়া চলিয়া যায় তাহারাই বস্তুতঃ হতভাগী। কিন্তু সে যেমন কিছুই দেয় নাই, পায় নাইও কিছু। তাহার হাসি পায়—আহা, সেই লোকটার আসা-যাওয়ার হর্ষ-বিষাদও প্রাণে জাগাইবার সুযোগ হয় নাই।

তথাপি সে বিধবা। শাস্ত্রজ্ঞরা তাহার পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেন। প্রবীণারা ধার্মিকা হইতে উপদেশ দেন। সে শুধু অভিজ্ঞতাহীন দৃষ্টিতে তাঁহাদের পানে চাহিয়া থাকে। বিলাস তাহার প্রতি বিমুখ হইলেও বিলাসের প্রতি সে কিন্তু বিমুখ নয়। কাজ সারিয়া পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়া যখন পুকুর ঘাটে গা ধুইতে যায়, পাড়ার মেয়েরা মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরস্পর ইঙ্গিত করে। সে সবে তাহার একটুও লক্ষ্য নাই। রঙ্গীন সেমিজের উপর একখানা চওড়া কালাপাড় শাড়ি পরিয়া তাম্বুল রাগরঞ্জিত অধরে যখন আর্শির সুমুখে দাঁড়ায়, তখন সে নিজের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শাদা কপালখানার পানে চাহিয়া ভাবে—এমনি কপালেই সিঁদুর মানায়।

যৌবনের তটভাঙ্গা বাসনা রোধ করা কঠিন। আঙুলের ডগায় একটু সিঁদুর লইয়া সংগোপনে ভ্রূযুগের মাঝখানে একটি টিপ দিয়া যখন দর্পণে মুখের শোভা দেখে, তখন লজ্জা ও হর্ষের সংমিশ্রণে মুখখানা লাল হইয়া উঠে। হঠাৎ মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলেন, ওরে হতভাগী, উনুন যে জ্বোলে গেল। তাহার পরই একটা চাপা চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কি সর্বনাশ করেছিস, ও হতভাগী পোড়ারমুখী! মুছে ফ্যাল্, মুছে ফ্যাল্।

তাহার যৌবনোদ্দীপ্ত লাল মুখখানা অমনি শাদা হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি আঁচল তুলিয়া টিপ মুছিতে মুছিতে উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপাইয়া কাঁদে। মায়ের পানে চাহিয়া দেখে—তাঁরও চোখে জল, তিনি দ্রুত পলাইতেছেন।

দুই

দিন এমনিভাবেই কাটে, কিন্তু ব্যতিক্রম হইল সেইদিন—যেদিন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র বিভূতি ফিরিয়া আসিল বিদেশ হইতে। ছেলেবেলায় উষার সহিত তাহার বিবাহের কথা হয়, কিন্তু কোনো কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

অতীতের মধুর স্মৃতি মনে উদয় হইয়া উভয়কে আজ যেন আরও কাছাকাছি করিয়া দিল।

সবে সন্ধ্যার আগমনী সুরু হইয়াছে। বাড়ির পিছনে একটুখানি বাগান। দু-একটা জবা, দোপাটি, কৃষ্ণকলির গাছে ফুল ফোটে। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর ফুল আবশ্যক হয় নিত্য পূজার জন্য, তাই ফুল গাছগুলি যত্নে বর্দ্ধিত। উষা মাঝে মাঝে বৈকালে এখানে আসে, কারণ স্থানটি তার বড় ভাল লাগে।

ঐ পুষ্করিণীর ওপারে, যেখানে আম জাম নারিকেল গাছের মাথার উপর দিয়া আকাশ দিক্ চক্রবালে হারাইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যা-ধূসর আকাশের কোলে গাঢ় সবুজ গাছের মাথাগুলা স্থির ছবির মত নিস্পন্দ—দৃষ্টি যেখানে স্বতঃই যেন হারাইয়া যায়—উষা আপনমনে সেইদিকে তাকাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরে—'তারই কথা আসে স্মৃতি-সজল শ্বাসে।'

সেদিনও সে একটা গন্ধরাজ ফুল নাকের কাছে ধরিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছে—'দেখা দিলে না হে অকরুণ'।

এমন সময় সেইখানে বাগানের আগড় ঠেলিয়া কে প্রবেশ করিল।

ফিরিয়া চাহিয়াই উষা আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বিভূ-দা তুমি ?

—হ্যাঁ, অনেকদিন পরে ফিরেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। কেমন আছ, উষা ?

উষা হাসিয়া উত্তর দিল, ভালই। তুমি কেমন ছিলে সব বিদেশী বন্ধু-টন্ধু নিয়ে ?

কথার সহিত একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া উষা হাসিল। বিভূতি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিল, তুমি নাকি……

কথা বাধিয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উষা পাদপূরণ করিল—বিধবা ? তাহার পর একটা হাসির উৎস খুলিয়া কহিল, তোমার দুঃখ হচ্ছে, বিভূ-দা ? কিন্তু আমার ভারী আমোদ লাগে সেই লোকটির কথা ভেবে। আহা, বেচারার কষ্ট কোরে আসা যাওয়াই সার। না পারলে সংসারের বুকে একটা রেখা টানতে, না পারলে একটাও মানব-আত্মার ওপর একটু প্রভাব বিস্তার করতে।

বিভূতি ভীত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে কথা নাই। উষার যেন চৈতন্য হইল। সে বিভূতির হাতে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া কহিল, হাবা হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বিভূ-দা ? বোস।

সে তাহাকে নিজের অতি সন্নিকটে বসাইয়া দিল। উষার উষ্ণ শ্বাস মাঝে মাঝে বিভূতির অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। তাহাতে বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া তাহার দেহ স্পন্দিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

তিন

পাড়ায় একটা বিশ্রী আন্দোলন সুরু হইতে বেশী বিলম্ব ঘটিল না। তবু স্বয়ং স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র যাহাতে সংশ্লিষ্ট সে আলোচনা চাপিয়া করাই দরকার। শিবরাম চক্রবর্তী আপনভোলা সরল প্রকৃতির। স্ত্রী বসুমতীর ইঙ্গিত ধরিয়াও ধরিতে পারেন না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিলেন, উষা মা, কৈ রে ?

বসুমতী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, আহা, চিরদিন সমান রইলেন, ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানেন না। আদিখ্যেতা দেখ্‌লে গা জ্বালা করে। বলি উষা তোমার এমন সময় বাড়ি থাকে ? সে তো সেজেগুজে বিকেল থেকেই বাগানে গিয়ে বসে।

শিবরাম যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

—কেন বাগানে কি জন্যে ?

বসুমতী হাত নাড়িয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, কেন আর, তোমার আর আমার শ্রাদ্ধ করতে! তবে রোজ তোমায় কি বলি ? স্মৃতিরত্ন মশাইয়ের ছেলের সঙ্গে গল্প করতে যায়।

—আঁ্যা, বল কি ? এই সন্ধ্যেবেলা বাগানে গল্প ? সাপ-খোপের ভয় আছে। বাড়িতে গল্প করলেই তো পারে। তুমি বারণ করতে পার না ?

বসুমতী অসহায়ার ভঙ্গীতে কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হায় রে অদৃষ্ট! বলি, একি তোমার-আমার গল্প করা ? নিন্দেয় গ্রাম যে ভোরে গেল! আর কাণ পাতা যায় না। তুমি ঘুমিয়ে আছ ? আমার বারণ কি তোমার মেয়ে শোনে ? না, আজ পর্যন্ত শুনেছে কোনো দিন ?

শিবরাম বসুমতীর কথায় আর কাণ না দিয়া কহিলেন, যাই, ডেকে আনি। এই উঠোনে তক্তাপোশে বোসে গল্প করুক যত খুশি।

তিনি খিড়কির দরজার পানে অগ্রসর হইলেন। বসুমতী কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া হারিকেন হাতে ত্বরিতপদে স্বামীর অনুবর্তিনী হইলেন।

বাগানে প্রবেশ করিয়া স্বামি-স্ত্রী উভয়েই স্তম্ভিত! গন্ধরাজ গাছের তলায় বিভূতির কোলে মাথা রাখিয়া উষা গল্পে মশগুল! বসুমতীর দেহ বেতস পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। শিবরাম নিতান্ত অপ্রতিভ। বিভূতি ও উষার চোখে আলো পড়িতেই তাহারা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। সেইক্ষণেই সকলের কাণে একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর আঘাত করিল—'বিভূতি'।

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত উষা ও বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিল। শিবরাম ও বসুমতী আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন—স্বয়ং স্মৃতিরত্ন মহাশয় জবা গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। গম্ভীরভাবে বিভূতির পানে চাহিয়া তিনি হস্ত দ্বারা পথ নির্দেশ করিয়া কহিলেন, চল।

বিভূতি নতশিরে ত্রস্তভাবে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বসুমতী তাহার পানে তাকাইয়া দেখিলেন—তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, যেন বুঝিয়াছে মৃত্যু সন্নিকট।

চার

যে গুঞ্জনটা এতদিন অস্পষ্ট ছিল, ক্রমে তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপে প্রবীণের দল, দুপুরে সেলাইয়ের কাজ হাতে তরুণীর দল, আখড়ার আড্ডায় তরুণের দল এবং পুকুর ঘাটে প্রবীণার দল চক্রবর্তীকে লইয়া জল্পনা-কল্পনায় এমন মাতিয়া উঠিলেন যে এই বিষয়টিই যেন সকলের একমাত্র অনুধ্যান। ইহার আলোচনা গ্রামবাসীদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারার মাঝখানে বাধা স্বরূপ দাঁড়াইয়া যেন একটা বিষম আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। উষা-বিভূতির ব্যাভিচার সম্বন্ধে যতটুকু সত্য, তাহার শত গুণ মিথ্যা চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অনেকেই ব্যগ্র। এমন জিনিস চোখে না-দেখার হীনতা স্বীকার করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। এমন কি অঘোর ঘোষ জাহির করিলেন যে তিনি দেখিয়াছেন—উষাকে লইয়া বিভূতি পলায়ন করিতেছে, শুধু তাঁহার চোখের সামনে পড়ায় তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহা না হইলে ·····

কথাটা তিনি চোখের ইঙ্গিতেই শেষ করেন।

যাহা হউক আলোচনা এবং বিতর্কের পর গ্রামবাসীরা একমত হইলেন যে চক্রবর্তীকে একঘরে করা একান্ত আবশ্যক। কেহ তাঁহার সহিত কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতায় আর না আসে।

এরূপ সিদ্ধান্তের পর কার্যারম্ভ করিতে উদ্যমশীল গ্রামবাসীদের বিলম্ব ঘটে নাই। ধোপা-নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু-পুরোহিত পর্যন্ত সকলকেই চক্রবর্তীর সহিত অসহযোগিতার বিজ্ঞাপন জারি করা হইল। ধর্মের দোহাই দিয়া পরনির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া লইতে লোলুপ হইয়া উঠিল সমস্ত গ্রামখানি।

রমণীরা বসুমতী ও উষার পানে চাহিয়া জয়োল্লাসে হুঙ্কার ছাড়িল। শিবরাম দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া মাথা ফাটাইলেন, কিন্তু পাষাণে পীযূষের আশা করা বৃথা। শিবরামের একটা বদ অভ্যাস ছিল, তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন খানিকটা গল্প গুজবের খাতিরে। কিন্তু তাঁহার সহিত সকলে বাক্যালাপও বন্ধ করিয়াছে।

অগত্যা প্রখর রৌদ্রে তাঁহাকে গ্রামান্তর হইতে বাজার করিয়া আনিতে হয়। গ্রামের ঘাটসরা বন্ধ হওয়ায় দূর নদী হইতে জল তুলিয়া আনেন। তাহাতেও তত কষ্ট নাই—যত কাহারও সহিত গল্পগুজব করিতে না পাওয়ায়।

বৈকাল হইলেই অভ্যাসবশতঃ কাঁধে চাদরখানা ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়েন দাবার আড্ডার উদ্দেশে। কিন্তু যেই মনে পড়ে কেহ আর তাঁহাকে লইয়া খেলে না, এমন কি ডাকিলেও সাড়া দেয়না, অমনি বিপরীত পথ ধরিয়া ঘুরিতে নদীর ধারে আসিয়া পড়েন। অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় চকচক্ করে নদীর বুকের নর্তনশীল ঢেউগুলি। নদীর ওপারে তাল-খর্জুর-বনের পিছনে, যেখানে আকাশ পৃথিবীর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে যেন একটা অগ্নি গোলক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আপন মহিমা বিকাশ করিতেছে। গাছের মাথায়, নদীর জলে, আকাশের টুকরা টুকরা মেঘে রাঙা রশ্মি ছড়ানো। শিবরাম ব্যথিত নয়নে সেইদিকে তাকাইয়া ভাবেন, এই জগৎ একখানা নিয়মের চাকা। অনন্তকাল ধরিয়া এই চাকা ঘুরিতেছে। সেই চক্রমধ্যবর্ত্তী সৃষ্ট জীব মানবও যথানিয়মে সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতেছে। যাহারা চিরন্তন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চক্রের বাহিরে আসিতে চায়, তাহারাই বুঝি কালের চাকায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া অস্তিত্ব হারায়। তাঁহার মনে হয়, তিনিও যেন কি একটা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাই কালের চাকায় আজ তাঁর অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইতে বসিয়াছে।

পাঁচ

কিন্তু তিনি কি একলাই দোষী? স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও কি ইহার সহিত জড়িত নহেন? কেন, তিনি ছেলের পিতা বলিয়া?

তাঁর মন আপত্তি করিয়া উঠিল—না, তা হবে না। আমার সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মশাইকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এত দুঃখ আমি একলা সইব না, তাঁকেও ভাগ নিতে হবে। আমি এখনি যাই তাঁর কাছে।

তিনি চলিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, স্মৃতিরত্ন মশাই বাড়ি আছেন?

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, আছি।

শিবরাম প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সুতা-বাঁধা-চশমা-চোখে স্মৃতিরত্ন মহাশয় পাণিনির পাতা উল্টাইতেছেন। শিবরামকে দেখিয়া বই রাখিয়া চশমা খুলিতে খুলিতে তাঁহার পানে গভীর দুঃখব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অদূরে একখানা আসন দেখাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, বোস, শিবরাম।

শিবরাম বসিয়া দ্বিধাভরে ঘামিতে লাগিলেন, যেন সব বাক্য তাঁহার কে হরণ করিয়া লইয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর অবশেষে স্মৃতিরত্ন মহাশয় নিজেই কথা আরম্ভ করিলেন, আমি মনে করছিলুম তোমার বাড়িতে আজ সন্ধ্যার পর যাব। তোমার অবস্থা আমি সব শুনেছি।

শিবরাম উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়া কহিলেন, কি রকম অন্যায় একবার ভাবুন দেখি! ছেলেমানুষ যদি একটা অন্যায় কোরে ফেলে থাকে, তার কি এমনিভাবেই প্রাণবধ করতে হবে?

স্মৃতিরত্ন মহাশয় হাসিলেন। হাত তুলিয়া শিবরামকে বাধা দিয়া কহিলেন, থামো। অন্যায় বল্‌ছ কাকে? এটা কখনো অন্যায় হোতে পারে না। তুমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, অতএব তোমার শাস্তি অনিবার্য।

—আমি কি-নিয়ম লঙ্ঘন করলুম?

—তোমার যুবতী বিধবা কন্যাকে তুমি রক্ষা করতে পারনি। সে বিপথে গিয়ে পড়েছে, অতএব তুমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছ।

—আপনিও তো আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারেন নি।

—ঠিক, সেজন্যে আমি নিজের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেই করব। তোমার শাস্তি গ্রামের লোক দিয়েছে, কাজেই আমার দেবার দরকার নেই। তবে তোমার মেয়েকে দেব।

তিনি অন্যমনস্কের মত চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, আমার শাস্তি আমার ঐ একমাত্র ছেলে বিভূতির চির-নির্বাসন। পৈতৃক বিষয় থেকে সে বঞ্চিত হোল।

শিবরাম চমকাইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মুখখানা ভাব-সংস্পর্শ-বর্জিত। তিনি কহিতে লাগিলেন, এমন কি, আমার মৃত্যুকালেও সে এখানে এসে আমায় দেখে যেতে পারবে না। ওকে আমরণ কৌমার্য নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং ওর গুরু হবেন যে সন্ন্যাসী তিনিই ওকে সংযম শিক্ষা দেবেন। আর তোমার মেয়েকে কালই প্রায়শ্চিত্ত কোরে কঠোর ব্রহ্মচর্য নিতে হবে। তার শিক্ষাদাতা হব আমি।

শিবরাম আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

—এ যে বড় কঠিন ব্যবস্থা করলেন দুজনেরই!

স্মৃতিরত্ন মহাশয় হাসিলেন।

—শিবরাম, আমরা হিঁদু। সব নিয়ম কঠোরভাবেই পালন কোরে আসছি সেই সনাতন যুগ থেকে। তাই সব ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্ম এত কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হিন্দুশাস্ত্র হিঁদুর কাছে মৃত্যুর মতই সত্য।

ছয়

পরদিন প্রাতে একখানা আসনে গম্ভীরমুখে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বসিয়া এবং তাঁহার সম্মুখে একখানা কম্বলের আসনে উষা উপবিষ্টা। বসুমতী ও শিবরাম ব্যতীত আরও একজন এক কোণে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে, সে বিভূতি। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহাকে জোর করিয়া আনাইয়াছেন, কি করিতে তাহা তিনিই জানেন।

উষাকে আর চেনা যায় না। তাহার মস্তক ক্ষৌরমুণ্ডিত, হস্ত আভরণশূন্য, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষ। হোমাগ্নির উজ্জ্বল বিভায় তাহাকে দেখাইতেছিল যেন লাবণ্যময়ী ঋষি-কন্যা! যেন তপশ্চর্যার প্রভাবে অঙ্গ হইতে একটা দৈবী প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে।

প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিভূতিকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, বোস। অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর দুজনেই—আজ থেকে সমস্ত বিলাস বর্জন করলে। বল, সংস্পর্শজ সুখের সকল লিপ্সা দগ্ধ হোক্, হে অগ্নি, তোমার ঐ লেলিহান শিখায়!

বিভূতি একবার চাহিল পিতার পানে। কিন্তু ও কি? যমের মত নিষ্ঠুর, ধর্মের মত যে পিতা, আজ তাঁর চোখে জল! বশিষ্ঠ-গৌতমের মত যাঁর কর্তব্যবুদ্ধি নিয়ত সজাগ, ব্রহ্মচর্য পালনে যাঁর আশ্চর্য অবিচলিত নিষ্ঠা, আজ তাঁর দুই চোখে দুইটি জলধারা নামিয়া গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়াছে!

বিভূতি বিহ্বলভাবে পিতার পানে চাহিয়া রহিল।

ভক্তিযোগ

স্বামী জগন্নাথানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—জ্ঞান ও ভক্তি দুইই এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকা সাধারণ জীবের পক্ষে খুবই ভাগ্যের কথা। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বর-কোটীরই পক্ষে ঐ সমুদয় সম্ভব।

সাধারণ জীব বা জীবকোটীর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।......

"কখন কখন দেখা যায় সূর্য্যঠাকুরের অস্ত যাবার পূর্ব্বেই চাঁদামামা আকাশে উঠে হাজির হন। ভক্তি হল চন্দ্র, জ্ঞান হল সূর্য্য। ভগবানের অবতারের হৃদয়-আকাশেই ভক্তিচন্দ্র ও জ্ঞান সূর্য্য একত্র উদিত হন।" জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ যে কি সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আমরা এখানে করিতে চাহিনা—তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু নহে, এখানে শুধু ভক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। জ্ঞানে অগ্রসর হওয়া বা ভক্তিতে অগ্রসর হওয়া কোনটাই সহজ-সাধ্য নহে। মনে হয়, বুঝি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিই সহজ, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে ঠিক ভক্তি কি এবং তাহার কতটুকু আমাদের অর্থাৎ সাধারণের আছে বা হওয়া সম্ভব।

ভক্তিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রাণ। তাই আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রকেই মূল রাখিয়া ইহার আলোচনা করিয়া যাইব। বৈষ্ণবশাস্ত্র বিষ্ণুকে লইয়া—বিষ্ণুর-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—তাঁহাকে লইয়াই বা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলেই এ সম্বন্ধে বহু আভাষ মিলিবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রধানভাবে কিরূপে ভগবানকে ভালবাসা যায়, তাহাই বৃন্দাবনে গোপগোপীদিগকে শিখাইয়াছিলেন। একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"গোপীদের প্রেম অতুলনীয়, তাহারা আমারই কিছু জানিত না, তাহারা শাস্ত্র জানিত না; কিছু ব্রত উপাসনা করিত না; সর্ব্ব-শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে বুঝিতে চাহিত না, কেবল আমাকেই ভালবাসিয়াছিল। যে সময় অক্রুর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া আসে, তখন আমাতে অত্যন্ত প্রেম ও অনুরাগ বশতঃ আমার বিয়োগ-জনিত দুঃখে সংসারের অন্য কোন বস্তু তাহাদের কাছে সুখপ্রদ হয় নাই। আমাতেই তাহারা ধন, মন, প্রাণ, যৌবন সমস্ত অর্পণ করিয়াছিল। বৃন্দাবনে গোচারণের সময় ও রাস-ক্রীড়া রাত্রিতে আমার সঙ্গলাভে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া মনে করিত, দিন, মাস, বৎসর আমা বিহনে কল্পের সমান হইয়া গিয়াছে।

যেমন সমাধিমগ্ন মুনিগণ ও সমুদ্রে নদ-নদী মিলিত হইলে পর নামরূপ পরিত্যাগ করে সেইরূপ তাহাদের আমাতে অতিশয় আসক্তি ও প্রেমানুরাগের জন্য নিজের শরীর যে এত প্রিয় তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল এবং শরীর-বুদ্ধিরহিত হইয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়—শুদ্ধজ্ঞান যেখানে পৌঁছায় শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে লইয়া যায়। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে পাঠাইয়াছিলেন—গোপীদের সংবাদ আনিবার জন্য। উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন 'আমি অত্যন্ত কার্য্যে-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে তাহাদের খবর লইতে পারি নাই। আমার যখন কোন ঐশ্বর্য্য ছিলনা তখন তাহারা আমাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এখন আমি বড়লোক (king-maker), সকল মানবে প্রণাম করবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?" এইরূপ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"হে উদ্ধব, তাদের ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারিব না। তিনি জরাসন্ধাদি বধ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অত্যাচারী রাজন্যবর্গকে নিধন ও সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে গীতা-সহায়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন 'গীতাই শ্রুতির একমাত্র প্রামাণিক ভাষ্য। এমন কোন উপদেশ নাই গীতাতে যাহা আলোচনা হয় নাই। 'কি কর্ম্মযোগ, কি রাজযোগ, কি জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, পুরুষ-প্রকৃতিযোগ, সমন্বয়যোগাদি সমস্তই আলোচিত হইয়াছে। স্বামীজি বলিতেন—শ্রুতি বা উপনিষদের মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহা সত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে থাকে কোথাও কোথাও অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ তাহার শিকড় কাঁটাপাতা সব সমেত। আর গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজান যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এই কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত সকাম পুরুষদের জন্য, হে অর্জ্জুন তুমি নিষ্কাম হও। এই গীতাতেও পুনঃ পুনঃ ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভক্তিই সহজ সরল উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাম-গন্ধহীন নিস্বার্থ গোপী-প্রেম আজও ভারতীয় জনসমাজে আদর্শ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের প্রেমোন্মত্ততা পরিস্ফুট করিবার জন্য এলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ৺পুরীধামে যান এবং তিন বৎসর দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণ ও তিন বৎসর বৃন্দাবনাদি পরিভ্রমণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করেন। তাঁহার শেষ অবস্থায় গম্ভীরাতে স্বরূপ দামোদরের সহিত মধুর ভাবালাপনে দিন কাটাইতেন। তাঁহার হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত। অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ছটফট করিতেন। কখন বা স্বরূপ দামোদর হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিয়া বলিতেন—এখনও প্রাণনাথ এলেন না।

ঐশী প্রেমে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। তাঁহার উচ্চ নীচ বোধ থাকিত না, জগৎও তাঁহার কাছে ভুল হইয়া যাইত। সমুদ্র দেখিয়া যমুনা, চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন মনে করিতেন। একদিন চটক পর্ব্বত হইতে সাগর-জলে ঝম্প-প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মধুর ভাব অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ বলিয়া সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন না। দেহ বুদ্ধি রহিত ও বিষয়াদিতে আসক্তিশূন্য না হইলে মধুরভাব বুঝা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই মহাপ্রভু বহিরঙ্গ সঙ্গে সংকীর্তন ও অন্তরঙ্গ সঙ্গে মধুর আলাপন করিতেন। তিনিও এই ভক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন ও নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া ৺জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করিতেন।

"ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, কবিতা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করি না, হে ঈশ্বর তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

সার্দ্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত বিশাল হৃদয়বত্তা লইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস ভারতান্তর্গত ভারতবর্হিভূত বিরোধী সম্প্রদায় মতে সাধন করিয়া সকলকে বুঝাইলেন—একই ঈশ্বরের কাছে যাইবার নানা পথ অধিকারী ও রুচিভেদে। তিনি বলিতেন—হও খৃষ্টান, হও মুসলমান, হও বৈষ্ণব, হও শাক্ত, হও সাকার বা নিরাকারবাদী তাহাতে ক্ষতি নাই। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বা ব্যাকুলতা চাই, যেমন সতীর পতির প্রতি টান, কৃপণের ধনের প্রতি, মাতার পুত্রের প্রতি টান, এই তিন টান একত্রিত করিলে যতখানি ততখানি ঈশ্বরে ভালবাসা আসিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি ও মায়ের কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলেন।

সত্যবাদী রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রও শবরীকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। শবরী যখন রামচন্দ্রের চরণে প্রণত হইয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিয়াছিল—প্রভু আমি অধম, আমি নীচবংশজাত, আমার কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন, জাতি, পাঁতি, কুল, ধর্ম্ম বড়াই। ধন, বল, পরিজন, গুণ চতুরাই।

ভকতি হীন নর সো হই কৈসা।
বিনু জল বারিদ দেখিও দেখিও জৈসা।

উচ্চবংশে জন্ম, উচ্চ জাতি, ধনী, বলিষ্ঠ, গুণী, মানী হইয়া যদি তাহাতে ভক্তি না থাকে তা হইলে উক্ত গুণ সবই বৃথা, যেমন জলধরপটল মেঘ বারি বর্ষণ না করিয়া আকাশে শোভা পাইয়া থাকে। এই ভক্তি আচার্য্যগণ বহুপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। সম্বন্ধাত্মিকা, অনুরাগাত্মিকা, জ্ঞানমিশ্রা, সাধারণী প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ থাকিলেও নবধা ভক্তির কথা আলোচনা করব।

সংকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদীক্ষণম্
লোকস্য সদ্যো বিধোনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।

যাহার কীর্ত্তন, যাহার স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ, পূজায় পুরুষের পাপ সদাই নষ্ট হইয়া থাকে সেই মঙ্গলরূপী ভগবানকে নমস্কার করি।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, মন, বাক্য দ্বারা লীলা স্মরণ, হরির পাদপদ্ম সেবা, বিগ্রহাদি মূর্ত্তিতে স্তবস্তুতি দ্বারা বিষ্ণুর বন্দনা, দাস্যরূপে সখ্যভাবে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, পুত্রকলত্রাদি বিষ্ণুর চরণে অর্পণরূপ আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি নবধা ভক্তির লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন দাস্যে হনুমান, সখ্যে শ্রীদামাদি, সেবায় আত্মনিবেদন বলি প্রভৃতি ভক্তগণ এক এক ভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

যে কোনরূপে তাঁহাতে ভক্তি হলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, দ্বেষ করেই হউক কিংবা ভয়ে অথবা স্নেহে অথবা কামে যে প্রকারে হোক—যদি ঈশ্বরে সমগ্র মন দিতে পারে তাহলে পরম গতি লাভ হয়।

কামাদ্ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মন
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।

কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল, স্নেহে বৃষ্ণিনৃপালগণ মুক্তি পাইয়াছিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পূর্ব্বে অবধূত উপাখ্যান, সংসার মিথ্যাত্ব, সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য, কর্ম্মত্যাগ প্রভৃতি উপদেশ দিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগের কথা বলিয়াছেন।

হে উদ্ধব, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমার ভক্তি সমুদয় পাপরাশীকে নষ্ট করিয়া থাকে। হে উদ্ধব আমাকে লাভ করিবার সুগম উপায়—দৃঢ়ভক্তিতুল্য যোগ, সাংখ্য, স্বাধ্যায়, তপস্যা অথবা দান কোনটাই সমর্থ নহে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন তিনি স্বধামে যাইবেন তাই তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ উদ্ধবকে ডাকিয়া বলিলেন—'হে উদ্ধব, ব্রহ্মশাপে সপ্তদিনের মধ্যে দ্বারকা সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইবে এবং যদুবংশ ধ্বংস হইবে। তুমি আমার আদেশে লোকশিক্ষার জন্য কিছুদিন ধরাধামে থাক এবং বদ্রিকাশ্রমে যাইয়া সাধুসঙ্গ ও ভগবানের ধ্যান ভজন কর।'

পুণ্ডরীক

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় এম-এ

পুণ্ডরীকের বাড়ি ছিল আমাদের পাশের গ্রামে। গ্রাম্য পাঠশালায় যখন পড়িতাম, দুইজনে তখন কত ভাবই না ছিল। প্রকৃতির তাণ্ডবকে উপেক্ষা করিয়া কি গ্রীষ্মে কি বর্ষায় মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, বিপক্ষের সহিত মারামারি করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরে সাঁতার কাটিয়া চক্ষু জবাফুল করিয়াছি। কিন্তু এই বন্ধুত্ব বেশি দিন উপভোগ করিতে পারি নাই। বাবা কলিকাতায় চাকুরী করিতেন। শনিবার শনিবার বাড়ি আসিতেন, আবার সোমবার ভোরে চলিয়া যাইতেন। গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিবার পরই আমাকে বাবা কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার জন্য লইয়া গেলেন। পুণ্ডরীকের সহিত ছাড়াছাড়ি হইল।

কলিকাতায় থাকিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিলাম। আই-এ ক্লাশেও ভর্ত্তি হইলাম। এমন সময় একদিন বাবার মুখে শুনিলাম যে পুণ্ডরীক আসিতেছে, আমরা দুইজনে একত্রে থাকিয়া পড়াশুনা করিব। পুণ্ডরীকও যে গ্রামের হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, আমি আগেই তাহা গেজেটে দেখিয়াছিলাম। পুণ্ডরীকের আগমনের সংবাদে মনে মনে কত আনন্দই যে হইতে লাগিল!

আসিল পুণ্ডরীক। একসঙ্গে পড়াশুনা করা, কলেজে যাওয়া—পুরাতন বন্ধুত্ব পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এবার যেন পুণ্ডরীকের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে লাগিলাম। শৈশবের সে চাপল্য আর নাই, একটু যেন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া গেছে সে, একটা বিবেকানন্দীয় তেজস্বিতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মুখে-চোখে। আমার ছিল গান-বাজনা খেলাধুলার দিকে ঝোঁক; কিন্তু পুণ্ডরীককে দেখিতাম খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে কি রকম চিন্তামগ্ন হইয়া যাইত; কোথায় কিসের সভা, কে কোথায় দুঃখে পড়িল, কেবল এই সবের অনুসন্ধান করিত ও। সন্ধ্যার সময় একত্র হইলে মাঝে মাঝে আমায় বলিত, "প্রতুল, তুই তো গেলি নে? বেলুড় মঠে সন্ধ্যের সময় কী যে চমৎকার লাগে ভাই, মনটা যে কোথায় উড়ে যায়!" এ কথা শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়াই ওর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত—তাহা হইলে কি পুণ্ডরীকের মনে প্রেমের বিষ ঢুকিয়াছে? কখনো কখনো পরিহাস করিয়া এ সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু সে সময় ওর মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব দেখিতে পাইতাম, যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম যে ওর এই পরিবর্ত্তনের মূলে কোন প্রেমের কুহকিনীর স্থান নাই, জীবনের পথে নারীর আকর্ষণকে পদদলিত করিয়া চলিবার শক্তি ওর আছে।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুইজনেই আই-এ পরীক্ষা দিয়া গ্রামে গেলাম। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, দুইজনেই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া আবার দুইজনে বি-এ পড়িব, সমস্ত ঠিকঠাক; হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, পুণ্ডরীক নিরুদ্দেশ।

ছুটিলাম পুণ্ডরীকদের বাড়িতে। পুণ্ডরীকের মা-বাবা আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কিছু জানি কি-না। কিছুই জানিতাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু একটা কথা মনে পড়িল। পুণ্ডরীক আমায় মাঝে মাঝে বলিত বটে, "ত্যাখ্ প্রতুল, ঘরের কোণে আর আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয়, চোখ-কাণ বুজে বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ি।" কথাটা বলিলাম। শুনিয়া পুণ্ডরীকের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "একথা আমায় আগে বলিস নি কেন বাবা? কে ওকে আমার এমন করলে? এবার এলে ওকে আগে আমি বিয়ে দোব, তবে ছাড়ব।" বয়স্ক ছেলে, যাইবে কোথায়, শীঘ্রই ফিরিবে—ইত্যাদি কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া আমি ফিরিলাম।

কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল, পুণ্ডরীক তো ফিরিল না। একমাত্র পুত্রের আশার পথ চাহিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার দিন কাটিতে লাগিল নোঙর-ছেঁড়া নৌকার ন্যায়।

ইতিমধ্যে আমার জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অসুখের জন্য কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাবা গ্রামে গিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন তার পাইলাম, তাঁর অবস্থা খারাপ, আমি যত শীঘ্র পারি যেন বাড়ি যাই। আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হইয়া পড়িলাম। গ্রামে আসিয়া দেখি, সত্যই বাবার অবস্থা খারাপ। এক মনে ভগবানকে ডাকিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম বাবাকে বাঁচাইতে। ভগবান বোধ হয় সে যাত্রা আমাদের প্রাণের ডাক শুনিতে পাইলেন। বাবা সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, সেরে উঠেছি বটে, কিন্তু শরীরের তো জোর পাচ্ছি না। তাই বলি, এবার একটা বিয়ে-থা কর্। প'ড়ে লিখে আর কি হ'বে? গ্রামে ব'সে জায়গা-জমি ছ্যাখ্।" বাবার শেষ বয়সের আদেশ অমান্য করিতে পারিলাম না। বহু সাধের লেখাপড়া ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া গ্রামে স্থায়ী হইয়া বসিলাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন সকালে শুনিতে পাইলাম, পুণ্ডরীক ফিরিয়াছে। গেলাম পুণ্ডরীককে দেখিতে। গিয়া দেখি, গ্রাম যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে সেখানে পুণ্ডরীককে দেখিবার জন্য। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে একটা ঘরে প্রবেশ করিতেই পুণ্ডরীক আমায় হাসি মুখে ডাকিল, "আয়!" পুণ্ডরীকের মা-বাবা তখন কাঁদিতেছিলেন, আর পুণ্ডরীক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পুণ্ডরীকের পরণে আগের মত সেই খদ্দরই আছে, গাম্ভীর্য্যও সেইরূপ। তবে চেহারা বোধ হয় আরও লম্বা-চওড়া হইয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে পুণ্ডরীককে লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া কিছুদূরে মাঠের মাঝখানে আমাদের শৈশবের প্রিয় একটি বটগাছ-তলায় গিয়া বসিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় ছিলি এদ্দিন?"

হাসিয়া উত্তর দিল ও, "ক—তো জায়গায়, তার কি ঠিক আছে?"

বলিলাম, "বিনা পয়সায় তো আর দেশ-ভ্রমণ হয় না, বেরিয়েছিলি তো একবস্ত্রে।"

"আরে ভাই," হাসিতে লাগিল পুণ্ডরীক; "যেখানেই যাই, আমার মধ্যে সকলে যেন কি দেখতে পায়। বড় বড় শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে আমায় পুজো করতে চায় যেন। কোন জায়গায় পনের দিন এক মাসের কমে ছাড়া পাই নি। তারপর নিজেরাই সঙ্গে এসে টিকিট কিনে গাড়িতে তুলে দেয়। এই হচ্ছে আমার দেশ-ভ্রমণের ইতিহাস।"

ওর হাসি দেখিয়া আমার গা-টা যেন জ্বলিতে লাগিল; বলিলাম, "খুব করেছ! বুড় বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ে এক যুগ বাদে ফেরা!"

তারপরে থামিয়া নরম গলায় বলিলাম, "এইবার একটা বিয়ে ক'রে গ্রামে বস্। আর কোথাও যাস নি। বাপ-মার শেষ বয়সে সুখী কর্ তাঁদের।"

বিবাহের কথায় পুণ্ডরীক হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া গেল। বুঝিলাম, মনের ওর পরিবর্ত্তন হয় নাই একটুও। উদাসীন প্রকৃতিটা এখনও বাঁচিয়া আছে ওর মধ্যে। তখনকার মত কথাটা চাপা দিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

সুখের বিষয়, পুণ্ডরীক গ্রামেই রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে ছায়ার (আমার স্ত্রী) মুখে শুনিলাম, পুণ্ডরীকের নাকি আমাদেরই গ্রামের সুষমার সহিত বিবাহ হইতেছে। মাতৃপিতৃহীনা সুষমা মামার স্কন্ধের ভার লাঘব করিবে শুনিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতে লাগিল! সুষমারা খুব গরীব ছিল। সুষমার পিতা বৎসর দুই পূর্ব্বে মারা যান। কন্যার বিবাহের জন্য তিনি এক পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই সুন্দরী হইলেও সুষমার বয়স গ্রাম দেশের পক্ষে বড় কম হয় নাই। ষোল পার হইয়া গিয়াছিল সে। সুষমার মামা যখন শুনিলেন যে পুণ্ডরীক গ্রামে আসিয়াছে, তখন তিনি গিয়া পুণ্ডরীকের হাতে-পায়ে কাঁদিয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীকের পিতামাতাও তখন তাহাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে চাহিতেছিলেন। সকলের অনুরোধে উত্যক্ত হইয়া অবশেষে পুণ্ডরীক রাজি হইল। কিন্তু সকলকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে বিবাহ-কার্য্য যত সামান্য-ভাবে হয় সম্পন্ন করিতে হইবে এবং বিবাহের পরদিন হইতেই সুষমাদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আপাতত সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইল।

শুভদিন দেখিয়া বিবাহ হইয়া গেল। বাহিরের লোক বলিতে একমাত্র আমি বিবাহ-বাটিতে উপস্থিত ছিলাম। না হইল কোন আনন্দ-কোলাহল, না হইল কোন সঙ্গীত-বাদ্যের আয়োজন। রাত্রি বারটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

পিছনে বাসর-গৃহে পড়িয়া রহিল এক সংসার-বিরাগী পুরুষ-সিংহ আর এক সরলা ভীতা হরিণী।

সকলেই ভাবিয়াছিল, পুণ্ডরীক যাহাই কেন না প্রতিজ্ঞা করুক, বিবাহের পর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইবেই। কিন্তু ছায়ার নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে পুণ্ডরীক নাকি শ্বশুরবাড়ীর ধাবে-কাছেও আসে না। সুষমা বেচারি বাড়ির বাহির হয় না, মনের দুঃখে নাকি আধ-মরা হইয়া গিয়াছে সে।

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। একদিন গিয়া পুণ্ডরীককে ধরিলাম। বিবাহ করিয়া একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করা পৌরুষের কাজ নহে—ইত্যাদি বলিয়া ভৎ'সনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পুণ্ডরীক অচল অটল। মুখে তার একমাত্র কথা, সে তো বিবাহের পূর্ব্বে সকলকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাই করাইয়া লইয়াছিল। আমি হার মানিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কিছুদিন পরে কিন্তু আমার ভুল ভাঙিল। পুণ্ডরীকের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম। সেদিন অপরাহ্নে হাট হইতে ফিরিতেছিলাম। আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতেই দেখি, দূর হইতে পুণ্ডরীক আসিতেছে। বোধ হইল, সুষমাদের বাড়ির দিক হইতেই আসিতেছে ও। কাছাকাছি হইতেই হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে ভীষ্মদেব, এদিক থেকে যে বড় ?'

ও একটু রাঙা হইয়া গেল। সলজ্জভাবে কহিল, "ঘণ্টাখানেক আগে একটি ছেলে গিয়ে আমায় চিঠি দিলে। তাতে লিখেছে, ক'দিন ধ'রে বড় অসুখ। বাঁচি কিনা, ঠিক নেই। যদি দেখতে চাও তো একবারটি এস। ওমা, গিয়ে দেখি, কিচ্ছু নয়, সব চালাকি।"

সুষমা মরিবে শুনিয়াই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ছোটবেলা হইতেই উহাকে আমি ভগিনীর ন্যায় দেখি। পুণ্ডরীকের শেষ কথাগুলিতে আশ্বস্ত হইলাম।

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "তা, থেকে এলেই পারতিস আজ ?"

"দূর, তা কি হয় ?" মাথা নীচু করিয়া বলিল পুণ্ডরীক, "তা ছাড়া, ডেকে নিয়ে গেল এত ক'রে, কিন্তু একঘণ্টা ধ'রে একটি কথাও বলাতে পারলুম না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ঘরের এককোণে।"

মনে মনে হাসিলাম, এতদিন পরে তাহা হইলে উহাদের মনে সত্যসত্যই রঙ ধরিয়াছে।

কিছুদিন বাদে একটা জরুরী কাজে পুণ্ডরীকদের গ্রামে একজনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় পুণ্ডরীকদের বাড়ির সম্মুখের মাঠ দিয়া আসিতেছিলাম। সহসা উহাদের বাড়ির দিকে নজর পড়ায় সেখানে খুব ভিড় দেখিলাম। মনে বড় কৌতূহল হইল। ছুটিলাম। গিয়া দেখি, ভিড়টা জমিয়াছে দেশি-বিলাতি কয়েকজন পুলিশকে ঘিরিয়া। মধ্যস্থলে পুণ্ডরীক, মুখে একটা অবর্ণনীয় কঠিন ভাব। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কি একটা রাজ-দ্রোহী দলের সহিত পুণ্ডরীক জড়িত আছে সন্দেহ করিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। বাড়ি খানাতল্লাসী করিয়াও নাকি কয়েকটা নিষিদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বক্ষ ভেদিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল, ভাবিলাম, "যাও পুণ্ডরীক, সংসারের পঙ্কিল আবর্ত্তে সত্যই তুমি নিজেকে মিশাইতে পারিবে না।" পুলিশেরা যখন পুণ্ডরীককে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সুষমার সে কী কান্না। সংবাদটা পাইয়াই নাকি সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছিল। সুষমাকে কাঁদিতে দেখিয়া চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল পুণ্ডরীক, কঠিন স্বরে বলিল, "কাঁদতে বারণ কর প্রভুল, নইলে এক একটাকে খুন ক'রে ফেলব আমি।"

পুণ্ডরীকের তখনকার মূর্ত্তি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

তারপর আর কি—পুণ্ডরীক ফিরিয়া আসায় তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা যেমন একদিন দুঃখ-শোক ভুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাঁহারা আবার তেমনি করিয়াই ভাঙিয়া পড়িলেন। মাসখানেকের মধ্যেই মাত্র তিনদিনের আগে-পাছে তাঁহারা অজানার পথে পাড়ি দিলেন।

এদিকে আর এক সংবাদ শুনিলাম, সুষমা নাকি অন্তঃসত্ত্বা। সে খায় না, স্নান করেনা, অনাহারে অনিদ্রায় নাকি জীর্ণ কুটিরের এককোণে পড়িয়া পড়িয়া শুকাইয়া

মরিতেছে। ছায়া আসিয়া বলিল, "ছাখো না জেলের লোকেদের কাছে চিঠি লিখে, যাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অন্তত চিঠি-পত্রটাও লিখতে পায়। বেচারির যা অবস্থা, দেখলে চোখে জল রাখা যায় না। ভয় হয়, কোন্ দিন না একটা কিছু ক'রে বসে। বললে তো যে, পেটেরটা না থাকলে নাকি ও এক্ষুণি সংসারের জ্বালা মিটিয়ে ফেলত।" শুনিয়া আমি আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, আচ্ছা, দেখিতেছি জেলের কর্তৃপক্ষদের কাছে চিঠি লিখিয়া। কিন্তু কোনই সুবিধা করিতে পারিলাম না। কোনমতেও জানিতে পারিলাম না, পুণ্ডরীক কোথায় কোন্ জেলে আছে।

এদিকে সকলের স্নেহ-তিরস্কারে সুষমা তাহার শরীরের প্রতি যত্ন লইতে লাগিল। স্বামী তাহার যেখানেই থাকুক সময়ে ফিরিয়া আসিবে, পুত্র-কন্যা লইয়া সে তাহার সুখের সংসার পাতিবে—এই সমস্ত কল্পনা করিয়াই বুঝি সুষমা তাহার স্বামীর ভিটায় আসিয়া দিন-যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুর। বৎসর খানেক পরে একটি সুন্দর শিশু-পুত্র প্রসব করিয়া অভাগিনী তাহার সকল জ্বালার অবসান করিল। যাইবার সময় ছায়ার হাতে তাহার সাধের ধনকে তুলিয়া দিয়া বলিয়া গেল, "এ ঝঞ্ঝাট তোমার হাতে দিতুম না বৌদি। কিন্তু এ সময় আমার আপনার বলতে কেউ তো বেঁচে নেই। তাই, ওটাকে তুমি ফেলো না, দেখো।"

দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। পুণ্ডরীকের আশা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। এমন সময় এক উজ্জ্বল বসন্ত-প্রভাতে সে আসিয়া উপস্থিত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে গৈরিক বসন, শ্মশ্রু-গুম্ফ-জটা-সমন্বিত সন্ন্যাসোচিত পরিবেশ। সংবাদটা পাইয়াই দলে দলে লোক আসিতে লাগিল উহাকে দেখিতে। বহুক্ষণ পরে ভিড় কমিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জেল থেকে বেরোলি কবে?"

"বহুদিন।" উত্তর দিল ও।

বলিলাম, "ছিঃ, সংসার ফেলে গেছিস, এদিকে আসতে নেই? কোথায় ছিলি এদ্দিন?"

"মঠে মঠে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

কথাটা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর দেবব্রতকে ওর সম্মুখে আনিয়া বলিলাম, "চিনতে পারিস?"

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ও উত্তর দিল, "না।"

"তা চিনবি কি ক'রে? তুই তো আর জানতিস না, হঠাৎ জেলে চ'লে গেলি।" বলিয়া ওকে আমি এই কয় বৎসরের কাহিনী একে একে সব খুলিয়া বলিলাম।

ও পাষাণ-পুত্তলীর মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া সব শুনিতে লাগিল। শেষে আমি ওকে সংসারে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে কহিলাম, "এইবার তোর প্রতিনিধি তুই নিয়ে যা ভাই।"

ছায়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওগো, আমার দেবুকে ওর হাতে দিও না। তা হ'লে দেবুকে ও সন্ন্যেসী ক'রে ছাড়বে।"

কিন্তু আশ্চর্য্য হইলাম পুণ্ডরীকের দৃঢ়তা দেখিয়া। তাহার যেন নেশা চাপিয়া গিয়াছে, পুত্রকে সে লইয়া যাইবেই। নিঃসন্তানা ছায়ার কোল হইতে অজ্ঞান অবোধ শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া সেইদিনই অপরাহ্ণে নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

* * * *

গল্পের যবনিকা এইখানেই টানিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু বহুদিন পরে পুণ্ডরীকের সহিত হঠাৎ একবার দেখা হইয়া গিয়াছিল। সে কাহিনীটা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

দশ-বার বৎসর পরের কথা। কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। চৌরঙ্গী-পল্লীর একটি প্রশস্ত রাস্তা দিয়া ব্যস্তভাবে চলিয়াছিলাম। সহসা পিছন হইতে কে জামা ধরিয়া টানিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখি—পুণ্ডরীক। তাহার রূপ-সজ্জা দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিতই হইয়া গেলাম। সে সন্ন্যাসীর বেশ আর নাই। পরণে মিলের ধুতি-পাঞ্জাবি। চেহারার মধ্যে বিলাসিতা না থাকিলেও সৌখীনতার আভাস পরিস্ফুট।

আমাকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া ও বলিল, "কি দেখছিস? চল্।"

বলিলাম, "কোথায়? তুই যে এদিকে বড়, এই বেশে?"

"দোকানে ঢুকছিলাম," হাসিতে লাগিল ও, "তা, তোর দিকে নজর পড়তেই কেমন সন্দেহ হ'ল। পেছনে পেছনে

খানিকটা গিয়ে তবে বুঝলুম, ভুল করি নি, তুই প্রতুলই। তার পরেই তোর জামা ধ'রে টান দিলুম।"

"তা এদিকে কিসের দোকানে যাচ্ছিলি ?"

"আমার দোকান রে, ব্যবসা। চল্ দেখবি।"

আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল ও। দেখিলাম ওর ব্যবসা। ফার্নিচারের (আসবাব-পত্র)' দোকান, নেহাৎ ছোট-খাট নহে। চার-পাঁচজন কর্ম্মচারি খাটিতেছে, ক্রেতার সংখ্যাও বেশ।

দোকান দেখা হইলেও আমাকে ওর বাড়িতে লইয়া চলিল, বলিল, "চল্, আজ আমার ওখানে থাকবি। রাত্তিরে বায়স্কোপ-টায়স্কোপ দেখা যাবে। কাল যাবি।"

পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোকে এ বেশে দেখতে পাব, আশাই করতে পারি নি। কি ক'রে এলি এ লাইনে ?"

পুণ্ডরীক বলিয়া চলিল, "গ্রাম ছেড়ে চ'লে আসবার সময় তোর মুখে আমার সংসারের সব ঘটনা শুনে মনে একটা ধিক্কার হ'ল। সন্ন্যাসীর বেশ যেন কামড়াতে লাগল। খুলে ফেললুম সে বেশ। কলকাতায় এসে এক দূরসম্পর্কীয় পিসীর বাড়িতে উঠলুম। তারপর মোটে পাঁচ টাকার মাল নিয়ে ফিরি সুরু ক'রে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল ও।

বাড়িতে আসিলাম। পুণ্ডরীকের স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। গুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে দেখিলাম। কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যেও দেবুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ রে, দেবু কোথায় রে ?"

এ কথায় পুণ্ডরীকের মুখখানা যেন একটু ম্লান হইয়া গেল ; কহিল, "ও বোধ হয় আমার মতই হতচ্ছাড়া হ'বে রে। এই তো মোটে ষোল-সতর বছর বয়েস ওর—এর মধ্যেই কোথায় মিটিং, কোথায় কে দুঃখে পড়ল, খালি সেই সব খোঁজ। পড়াশুনোর দিকে একটুও মন নেই। ভোর বেলায় পাড়ারই কার মড়া পোড়াতে গেছে, এখনো ফেরে নি।"

কথাটা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপরে আরও কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পুণ্ডরীক ও তাহার স্ত্রী অনেক করিয়া সেদিনটা থাকিয়া যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যের অনুরোধে তাহাদের সে অনুরোধ রাখিতে পারি নাই। যাহা হউক, পথে বাহির হইয়া আমার মনে কেন যেন শুধু এই কথাটাই উঁকি মারিতে লাগিল যে, পুরাতন পুণ্ডরীকের মৃত্যু হইয়া এই যে নূতন পুণ্ডরীকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ওর উত্থান হইয়াছে, না পতন ?

ক্ষুদ্র আনন্দ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এ চিত্ত চলেছে ছুটে' মুগ্ধ হয়ে যুগযুগ ধরি,'
শত সুন্দরের পিছে চিরন্তন বাঞ্ছিতে মাগিয়া,
সুন্দর ফুরায়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, যৌবনের কূলে—
আবার বাঞ্ছিত লাগি দাঁড়ায় এ চিত্ত থমকিয়া।

কামিনীকাঞ্চন ভোগ মণিরত্ন এ মধুসংসার,
সঙ্গীত কবিতা ছন্দ প্রেয়সীর সুন্দর বদন,
লুব্ধ মনে প্রতিদিন ভৃঙ্গসম সেবি' মধু তার,
সহস্র সুন্দর মাঝে ভরিল না তবু এই মন।

সিন্ধুপানে শূন্যে চাহি' চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহে তারকায়
রচে সে আনন্দ গীত ভরে যায় রূপমুগ্ধ প্রাণ ;
কিন্তু ওরে কোন্ ক্ষণে গুপ্ত কোন্ ছিদ্র পথ দিয়া
লুকাইয়া ঝরে যায় সাধের এ আনন্দসন্ধান।

লুব্ধ মন ছোটে তবু ছোট ছোট সুন্দরের পিছে,
ঝরে যাবে ? যাক্ ঝরে', ক্ষণিকের সত্য নহে মিছে।

কালিম্পঙ্

শ্রীকাননগোপাল বাগচী এম-এসসি

প্রেসিডেন্সি কলেজ হ'তে আমরা কয়েকজন ভূতত্ত্বের ছাত্র একবার কালিম্পঙ্ সফরে গেছিলাম শিক্ষাভ্রমণে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলের ভূতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করা। কিন্তু সেই উপলক্ষে এখানের ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসীদেরও

হোটেল হিল ভিউ হতে পাহাড়ের দৃশ্য ছবি—দিব্যজ্যোতি

সংস্পর্শে অল্প বিস্তর আসতে হয়েছিল। কালিম্পঙ্ মহকুমা দার্জিলিঙ্ জেলারই পূর্বাংশ। দার্জিলিঙের গুরুত্ব যেমন বাঙ্গালা সরকারের গ্রীষ্মাবাস হিসাবে, কালিম্পঙের গুরুত্ব তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ব'লে। ভারতের সঙ্গে তিব্বত সিকিম ইত্যাদির যে সব বিনিময় হয়, তা সবই যাতায়াত করে কালিম্পঙ্ শহরের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া দার্জিলিঙের মত কালিম্পঙও অধুনা ব্যবহৃত হচ্চে শৈল-বিহার হিসাবে। কালিম্পঙে যে কয়দিন আমরা ছিলাম তার অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে নদীনালা অনুসরণ করে এর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে। আমরা কখনও উপভোগ করেছি গহন বনের স্তব্ধ নীরবতা, আবার কখনও ভ্রমণ করেছি এদের জনবিরল, স্তব্ধ পল্লীগুলোতে। কালিম্পঙের নিসর্গে এমন এক মাধুর্য আছে, এত বেশী সজীবতা রয়েছে এর প্রকৃতিতে, যে অত্যধিক পর্যটন সত্ত্বেও একঘেয়ে লাগেনি, পরিশ্রান্ত বোধ করিনি কখনও। এর অনাবিল আকাশে রয়েছে পুলকের শিহরণ, এর বাতাসে রয়েছে মৃদু-উত্তেজনা, এর প্রকৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র্যের পরিবেশ।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দ। এর পূর্ব পর্য্যন্তও কালিম্পঙ্ ছিল স্বাধীন। কিন্তু এই বৎসর ভুটান যুদ্ধের পর, সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী, পরাজয়ের কালিমা বুকে নিয়ে সে এসে যোগ দেয় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের এলাকায়। এখন দার্জিলিঙ্ জেলারই পূর্বাংশরূপে কালিম্পঙ্ আমাদের কাছে পরিচিত। কালিম্পঙ্ মহকুমার পূর্ব সীমানা সঙ্কেত করে জালদোকা নদী, আর পশ্চিমে দার্জিলিঙের সঙ্গে এর বিচ্ছেদ খরস্রোতা তিস্তার সাহায্যে। কালিম্পঙের উত্তরে হ'ল সিকিম রাজ্য ও দক্ষিণে সমতলভূমিতে জলপাইগুড়ি জেলা।

উত্তরে ইঃ বিঃ আরের শেষ বিশ্রাম, শিলিগুড়ি পর্যন্ত ট্রেণে এসে কালিম্পঙ্ দুভাবে পৌছুন যায়। ডিঃ এচ্ঃ আরের লঘুভার ট্রেণে গিয়েলখোলা অবধি অগ্রসর হয়ে বাকী ১২ মাইল পথ বাসে, আর নয়ত বরাবর ৪২ মাইল সমস্ত পথটাই মোটরে। দার্জিলিঙ্ হ'তেও ঘুম হ'য়ে কালিম্পঙ্ আসার ব্যবস্থা রয়েছে তিস্তা পুলের উপর দিয়ে। ব্যবসা ইত্যাদির জন্য তিব্বতের রাজধানী লাসার সঙ্গে কালিম্পঙের যোগ রয়েছে মিউল ট্র্যাকের সাহায্যে। এ ছাড়া ভ্রমণামোদিরা কালিম্পঙ্ হ'তে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটং যেতে পারেন সুদৃশ্য মোটর পথে।

কালিম্পঙ্ হিমালয় পর্বতের যে প্রদেশে অবস্থিত, তাকে ভূগোলের বিভাগ অনুযায়ী বহির্হিমালয় বলা যেতে পারে।

এ সব অঞ্চলে পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত ক'রে চাষের জন্য ক্ষেত তৈরী হয়

কালিম্পঙের ভূ-প্রকৃতি বিচিত্র। এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূলে রয়েছে এ অঞ্চলের প্রস্তরসমূহের বিভিন্নতা। নাইস,

কোয়ার্টজাইট ইত্যাদি যে সব পাথর কঠিন তারা সূর্যের তাপ বৃষ্টি ও তুষারের প্রভাব সহ্য করেও এখনও উঁচু আছে, দেওলো, দূরবীণডাণ্ডা ইত্যাদি চূড়ার আকারে। অন্যদিকে বালুপাথর শেল ইত্যাদি কোমল প্রকৃতির পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে নীচু ভূমিতে পরিণত হ'য়েছে। এখানের প্রস্তরাদির বয়স হিসেব করতে গেলে জানা যায় যে অনুমান পঞ্চাশ কোটী হ'তে আরম্ভ করে ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ বছরের পুরাণ পাথর এখানে রয়েছে। পাথর গঠিত হওয়ার সময় যে সমস্ত প্রাণী তাদের গর্ভে সমাধিস্থ হ'য়েছিল সেই সব আস্তর জীবাশ্ম হ'তেই এই বয়স নিরূপণে অনেক সাহায্য হয়। কালিম্পঙের অতীত ইতিহাসে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বেও নাকি এ অঞ্চল, শুধু তাই কেন, সমস্ত হিমালয় জুড়েই বিরাজ করত টেথিস্ নামে একটা বিরাট সমুদ্র। তারই গর্ভে যুগ যুগ ধরে হিমালয়ের পাথরের স্তরগুলি সঞ্চিত হয়। পরে ভূত্বকের ভীষণ এক আলোড়নের ফলে এই সব সঞ্চিত পাথর উত্থিত হ'য়ে আবেলুচিস্থান—আসাম পর্যন্ত বিশাল এক পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। এই সব আলোড়নের নিদর্শনস্বরূপ আজও আমরা কালিম্পঙের পাথর কুঞ্চিত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখি। কালিম্পঙে যে কয়লার স্তর পাওয়া যায় তাও এই

পাহাড়ীদের একটি কুটীর ছবি—ভবানী

আলোড়নের ফলে এতই বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে যে উৎকৃষ্ট কয়লা থাকা সত্ত্বেও সেগুলো উদ্ধার করা সমস্যায় দাঁড়িয়েছে।

সমতলভূমি হ'তে সদ্য-আগত বলে আমাদের যা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হচ্চে এখানের অতি বন্ধুর ভূপ্রকৃতি। কালিম্পঙের কঠিন শিলারাজি, প্রকৃতির তাড়নে কিভাবে বছরের পর বছর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্চে ও সেই সঙ্গে নৈসর্গিক দৃশ্যও চলেছে রূপ বদলিয়ে, তা কিছুদিন

কালিম্পঙের বাজারে তিব্বতীরা কার্পেট বিক্রয় করছে

অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যায়। দিনে সূর্যের প্রখর রশ্মিতে এ অঞ্চলের পাথর আগুন হ'য়ে তেতে যায়, তখন সেগুলো আয়তনেও বৃদ্ধি পায়। তার পরই আসে রাত্রির শীতলতা, যার ফলে ঘটে পাথরগুলোর অপরিহার্য সঙ্কুচন। অনবরত সঙ্কুচন ও প্রসারণের ফলে পাথরের গায়ে ধরে অসংখ্য ফাটল। বৃষ্টির জল ঢুকে ঢুকে দেয় সেই সব ফাটলের পরিমাণ বাড়িয়ে। এর উপর রয়েছে তুষারের দৌরাত্ম্য। সমতলভূমির থেকে জলীয় বাষ্প বিমিশ্র বাতাস উপরের দিকে উঠলেই আয়তনে বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যেকার জলকণা-গুলো তখন আর মিশে থাকতে পারেনা; বাতাসের ভিতর। সেগুলো গিয়ে তখন আশ্রয় নেয় পাথরের অসংখ্য ছিদ্রের মধ্যে, ফাটলগুলোতেও। রাত্রে ঠাণ্ডার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেই এই সব জলকণা পরিণত হয় বরফে, আয়তনে যায় তারা বেড়ে। এর শক্তি তখন এত বেশী হয় যে পাথরের বিভিন্ন অংশ ফেটে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, বড় বড় চাক্‌লা খুলে আসে পাথরের গা থেকে। নানান্ উপদ্রবের তাড়নে যখন পাথরগুলো এইভাবে বিপর্যস্ত হ'য়ে থাকে, তখন আসে বৃষ্টি তার উদ্দাম বেগ নিয়ে, ধুয়ে চলে যায় সমস্ত স্খলিত পাথরের টুক্‌রো। কত পাথরই যে বছরের পর বছর, মাসের পর মাস এইভাবে অপসৃত হচ্চে তার ইয়ত্তা নাই। তিস্তার জল অন্য সময় দেখায় সবুজ, কিন্তু বর্ষার সময় পাথরের গুঁড়োয়

তার বর্ণ হ'য়ে উঠে ধূসর। চাই চাই পাথর ধ্বসে গিয়ে সৃষ্টি করে ভূমি-চ্যুতির বা ল্যাণ্ড-স্লাইডের। এইজন্ত যে

পাহাড়ী মেয়েরা ঝুড়িতে করে হাটে পশমের কাপড় বিক্রয় করতে এনেছে

কয়মাস বারিপাত হয়, অনবরত লোক নিযুক্ত থাকে ধ্বসে-যাওয়া পাথরের আবর্জনা সরিয়ে পথ পরিষ্কার রাখতে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পাথরের এই অপরিমেয় ক্ষতি সত্ত্বেও পাহাড়ের চূড়াগুলো এখনও রয়েছে মাথা জাগিয়ে বরের টোপরের মত। অদম্য শক্তি নিয়ে তারা প্রতিহত করছে ক্ষয় সাধনে নিযুক্ত অরিকুলকে। এর মূলে রয়েছে অবশ্য, পর্বতের স্বল্প বয়স ও অবিরত উদ্দীপনী শক্তি। যখনই অত্যধিক পাথর অপসারণের জন্য পাহাড়ের ভার যায় লঘু হ'য়ে, নীচু হ'য়ে আসতে থাকে তাদের মাথা, ভূত্বকের আন্তর শক্তির প্রভাবে তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। কিছুদিন আগে কোয়েটা বা বিহারে যে প্রবল ভূকম্প হ'য়েছিল তার কারণই হ'ল হিমালয়ের উদ্দীপনী শক্তির প্রেরণা। এইজন্যই আজ বয়সে নবীন হ'লেও হিমালয় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তার বিশাল উচ্চতায়। দক্ষিণ ভারতের পর্বতগুলো বা আরাবল্লী পর্বতও একদিন উচ্চতার গৌরব রাখত, কিন্তু বয়সের প্রকোপে আজ তারা সে শক্তি হারিয়েছে। এ কথাও সত্যি, যে হিমালয়ও একদিন প্রাপ্ত হ'বে এদের অবস্থা, তবে সে বহু পরে।

পার্বত্য অঞ্চল কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমাদের সমাজ, সংসার বা দৈনন্দিন জীবনে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় কালিম্পঙে। ঘন জঙ্গল, অত্যধিক ঢাল (slope) ও বন্ধুরতার জন্য গমনাগমন তো দুঃসাধ্য। ফলে বিভিন্ন স্থানের ভিতর ভাবের আদান প্রদান চলে অতি অল্পই। এমন কি একই গ্রামের সকল অধিবাসীও পরস্পরের সহায়তা করবার সুযোগ পায় না। কাযেই পাহাড়ীদের জীবন হ'য়ে উঠে ব্যক্তিসর্বস্ব, আত্মনির্ভরশীল। তাদের চরিত্রে গড়ে উঠে রক্ষণশীলতা, মন থেকে যায় অনগ্রসারী। কুসংস্কার তো এদের মজ্জাগত। প্রতি ঘরে, মাঠে ঘাটে সর্বত্রই দেখা যায় ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা। লম্বা লম্বা বাঁশের ডগায় তারা ঝুলিয়ে দেয় পাত্‌লা নিশান, আর তাতে লেখা থাকে কত কি মন্ত্র। পথে ঘাটে যত তিব্বতী বুড়োবুড়ি দেখেছি তাদের অধিকাংশই মালা জপছিল, লাটাইয়ের মত একটা যন্ত্র—প্রেয়ার হুইল্—ঘুরিয়ে। তাদের একটা মন্ত্র হ'ল "ওম্ ম'ণি পদ্মে হুম্", উহা জপ করলে অমর ভবনে স্থান পাওয়া যায়। দৈনন্দিন অভিযানে বেরিয়ে একদিন এক কুটীরের সামনে দেখি, তিব্বতী ওঝা ভূত তাড়াচ্ছে গৃহকর্ত্রীর ঘাড় হ'তে। লামা বসে রয়েছেন একটি কেদারার উপর, তাঁর একহাতে চামর ও অন্যহাতে একথাল চাল। বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ছেন ও চাল ছুঁড়ে দিচ্ছেন সেই ভূতে-পাওয়া নারীর গায়ে। ভূতটা শান্তপ্রকৃতিরই ছিল বলতে হ'বে, কেননা অল্প আয়াসেই নেমে গেল।

এখানে প্রধানতঃ নেপালী, লেপচা ও ভুটিয়া এই কয়

আমাদের নেপালী অনুচর

জাতি দেখা যায়। এদের মধ্যে লেপচারাই সবচেয়ে আদিম ও অসংস্কৃত। এরা দেখতে সাধারণতঃ কাল, বেঁটে ও

১ Bengal District Gazeteers—Darjeeling dist.

কৃশ। গড়ে পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা দেখিনি। এদের অধিকাংশেরই হলদে দাঁত ও অপরিচ্ছন্ন পোষাক। লেপচারা পূর্ব্বে যাযাবর বৃত্তিরই অনুসরণ করত, লাঙ্গলের ব্যবহার এদের জানা ছিল না। জঙ্গল পুড়িয়ে যে ক্ষার হত, তারই উপর বীজ ছড়িয়ে শস্য উৎপাদন করত। এখন কিন্তু এরাও পাহাড়ের গায়ে চাষ দিয়ে শস্য উৎপন্ন করে। লেপচারা অত্যন্ত প্রকৃতি-প্রিয়, বনে জঙ্গলে ঘুরে অনেক সময় কাটিয়ে দেয়। বিভিন্ন ফুল, গাছ বা প্রজাপতির জন্য পৃথক্ পৃথক নাম যারা দেয় তারা প্রকৃতির অনুরাগী ছাড়া আর কি বলব? এরা খুব সরল ও ধীর প্রকৃতির।

নেপালীরা লেপচাদের মত প্রাচীন না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত উন্নত। এরাই লেপচাদের ঝুম প্রথার পরিবর্ত্তে পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত ক্ষেত তৈয়ারী করে চাষ করার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। আকার, দেহের গঠন গায়ের রং সমস্ত বিষয়েই নেপালীরা লেপচাদের অগ্রবর্ত্তী। নেপালী-চরিত্রের বিশেষত্ব হ'ল, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও শৃঙ্খলানুরক্ততা। এরা বলে "মৃত্যুকে ঠেকানোর যেমন নেই কোন ওষুধ, আদেশের ওপরও তেমনি চলে না কোন ওজর।"[১] নেপালীরা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত—গুর্খা, অনেকেই সৈন্যের কায করে

নেপালী মেয়ে, পিঠে ভার বইবার ঝোলা

নেওয়ার—রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরের কাযে দক্ষ ও লিম্বু—সাধারণতঃ চাষবাস করেই খায়।

এখানে যে সব ভুটিয়া আছে তারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। একশ্রেণী স্থায়ীভাবে বসবাস করে, অপরশ্রেণী তিব্বত হ'তে কয়েক মাস কার্য্যোপলক্ষে এখানে কাটিয়ে যায়। শেষোক্ত শ্রেণী "তিব্বতী-ভুটিয়া" বলেই চলিত। ভুটিয়ারা অন্যান্য

দার্জ্জিলিঙ্‌বাসী তিব্বতী রমণী

দুই জাতির চেয়ে সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি। দেহ সুগঠিত ও সহনশীল। এই ঠাণ্ডার ভিতর তিব্বত হ'তে কালিম্পঙ্ হাঁটা পথে যারা ব্যবসা করতে আসে তারা কি কর্ম্মঠ না হ'য়ে পারে! লেপচা ও ভুটিয়ারা অধিকাংশই বুদ্ধের উপাসক, নেপালীরা হিন্দু। উভয়েই অপর ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত। শিব ও বুদ্ধের উপাসনা পাশাপাশিই চলতে থাকে। তবে ধর্ম্ম তাদের যাই হোক্ না কেন, এরা সবাই অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মাংসাশী। খ্রীষ্ট ধর্ম্মও আজকাল ধীরে ধীরে এসব অঞ্চলে প্রসার লাভ করছে এবং এরই ভিতর বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। এরা সবাই অত্যন্ত দরিদ্র, রোগ শোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন রকমে টিকে থাকে। অশিক্ষার কথা নাই বা বললাম।

এই সব পাহাড়ীদের বসবাসের রীতিতেও পার্ব্বত্য অঞ্চলের ছাপ সুপরিস্ফুট। যাতায়াতের অসুবিধা ও সমতল ভূমির অপ্রাচুর্য সঙ্ঘবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে দেয় না। জীবিকা-গত শ্রেণী বিভাগ, যা সমতল প্রদেশের সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, এ অঞ্চলে তা সম্ভব নয়। প্রত্যেক কুটিরকেই ধোপা-নাপিত চাষী সমস্তেরই কায করে নিতে হয়, লোকাভাব ঘটলে একই ব্যক্তিকে করতে

১ Bengal District Gazeteeres—Darjeeling dist.

হয একাধিক কায। এক একটা গ্রাম গড়ে উঠে চার পাঁচ ঘর অধিবাসীকে অবলম্বন করে। কুটিরগুলি আবার অনেক ক্ষেত্রেই থাকে দূরে দূরে, নিজ নিজ চাষের জমির মধ্যে অবস্থিত। মানুষ যখন সবে গ্রাম ও সমাজ গড়ে তুলছে সেই প্রাচীনকালের জীবনযাপনের কতকটা ধারণা পাই আমরা এদের অনগ্রসারী আত্মস্থ জীবনের ধারা হ'তে।

জীবিকানির্বাহের উপায়স্বরূপ এরা করে কৃষিকার্য, শাকসব্জি উৎপাদন ও ফলের চাষ। ৪০০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত নাকি ধানের চাষ করা চলে। চা ও লেবুর চাষও এ অঞ্চলে একটি লাভজনক ব্যবসা। এছাড়া কাঠের ব্যবসা, পশমের পোষাক ও কার্পেট প্রস্তুত এবং স্থানীয় পাথর হ'তে তামা গালানতেও কিছু লোক নিযুক্ত থাকে। এখানে কয়লার প্রয়োজন হ'লে তা আমদানী করতে হয় ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ হ'তে—কেননা এখানের কয়লার স্তরগুলি গেছে বিধ্বস্ত হ'য়ে।

এ অঞ্চলের দুর্গমতা নিবারণকল্পে যে সব পথ নির্মিত হ'য়েছে সেগুলির উল্লেখ প্রথমেই করেছি। মানুষের সাধ্য

দার্জ্জিলিংবাসী নেপালী রমণী

নাই যে বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে ইচ্ছামত পথ প্রস্তুত করবে। তাই, এসব অঞ্চলে পথ প্রস্তুত হয় নদীনালার পাড় অবলম্বনে। কালিম্পঙ্ হ'তে শিলিগুড়ি যে রাস্তাটা রয়েছে তার সমস্তটাই তিস্তার 'গর্জ' অবলম্বনে গড়া। এছাড়

তিব্বতী লেপচা পরিবার

জিনিসপত্রের দ্রুত বহনের জন্য রজ্জু পথের শরণ নিতে হয়। এর প্রধান সুবিধে এই যে নদীনালার উপর দিয়েও অবাধে লাইন নিয়ে যাওয়া যায় ইচ্ছামত, যদি ঠিকমত ঢাল (slope) পাওয়া যায়। কালিম্পঙ্ হ'তে পেশোখোলা পর্যন্ত এইরূপ একটা রজ্জু পথ রয়েছে। রজ্জুর উপর স্থানে স্থানে ভারসমেত বালতী বসিয়ে দেওয়া হয় ও রজ্জুর আবর্তনের সঙ্গে সেগুলো গন্তব্য স্থানে নীত হয়। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, পায়ে চলার পথে ভার বহিত হ'লে একমাত্র অবলম্বন হ'ল টাট্টু ও খচ্চর।

কালিম্পঙের সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নাতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া। গ্রীষ্মের সজীবতাঘাতী অসহ্য গরমের তাড়না এড়াতে বহু বাঙ্গালী এর বুকে আশ্রয় নেয়। আবার শীতের সময়ও উত্তর থেকে পাহাড়ীরা এসে শরণাপন্ন হয় কালিম্পঙের স্নেহশীল ক্রোড়ে, অত্যধিক শীতের হাত এড়াতে। কালিম্পঙের সবচেয়ে অসুবিধাজনক সময় হ'ল বর্ষা, তবে দার্জ্জিলিঙের বর্ষার মত অত পীড়াদায়ক নয়।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের লোকের ধারণা ছিল অদ্ভুত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্প যে-কোন দেশের উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পের সমপর্য্যায়ে স্থান লাভ করিতে পারে, এরূপ কেহ ভাবিতে পারিত না। অবশ্য তাহার অনেক কারণও ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশে উৎকৃষ্ট চিত্রাঙ্কনের প্রচলনও ছিল না। দেশে তখন নিকৃষ্টধরণের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত কিছু ছবির আমদানি ছিল। বাঙ্গালাদেশে মহাত্মা চৈতন্যের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার ধর্ম্মের দ্বারা একদল পটুয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিল; তাহাদের অঙ্কিত গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতির যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। উহাদের রেখা এবং বর্ণবিন্যাসেও যথেষ্ট শিক্ষা এবং সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী যে পটচিত্রের নিদর্শন আমরা কালীঘাটের পটুয়াদের চিত্রে পাই, তাহা তত উন্নত নহে; উহাদের মধ্যে তামসিক চিত্রও অনেক দেখা যায়; কিন্তু অঙ্কন দক্ষতা ও তৎপরতা উহাদেরও মধ্যেও ছিল। কিন্তু ইহাও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

বাঙ্গালাদেশের মত উড়িষ্যায়ও একদল পটুয়া পট অঙ্কিত করিত। উড়িষ্যায় অধিবাসীদের বিদেশী শিক্ষার অভাবের জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত এই পটুয়ারা প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়া অঙ্কন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহারাও অন্নাভাবে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোঘলযুগে যে সমস্ত শিল্পী রাজা কিংবা নবাববাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া চিত্রাঙ্কন করিত, মোঘলরাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বংশধরেরা রাজপুতানার পার্ব্বত্য প্রদেশে কাংড়া, গাড়োয়াল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতক ইউরোপীয় নিকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চিত্রাঙ্কন সুরু করিয়াছিল। আর-কতকাংশ পিতৃপিতামহের অনুসৃত প্রাচীন রীতিনীতি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিতে লাগিল; কিন্তু দেশীয় লোকের এবং নূতন মনিব, রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশ তাহারাও এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্নসংস্থানের নিমিত্ত অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। যখন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ নূতন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন দেশীয় চিত্রশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দেশের লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত বিদেশী ভাষা এবং ভাবধারার আশ্রয়ে। তাহার ফলেই আমাদের দেশের মানসলক্ষ্মী বিদেশী মানস-প্রতিমার হুবহু প্রতিরূপে অঙ্কিত না হইলে তাঁহারা ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিতেন না। বিদেশী ভাষায় বিদেশী শিল্পের গৌরবের কথা শুনিতে শুনিতে মনও দেশী শিল্পের প্রতি বিরূপ হইতেছিল। তাই যখন নূতন ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের সূত্রপাত হইল, তখন একশ্রেণীর লোকের কাছে ইহা বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে যদি অজন্তা, বাঘ প্রভৃতির প্রাচীন চিত্র, বরভূধরের মূর্ত্তি প্রভৃতি দেশীয় শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের কোনরূপ ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বিদেশী চোখ লইয়া দেশীয় শিল্পের বিচার করিতে কেহ অগ্রসর হইত না।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে রবি বর্ম্মা, বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রভৃতি একশ্রেণীর চিত্রকর দেশীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং উহাদের অঙ্কিত ছবি সেই সময় দেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল। ভাবগভীরতার অভাব উহাদের মধ্যে বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। অঙ্কনপদ্ধতি এবং বর্ণ-বিন্যাসের অভিনবত্বের নূতন মহিমা কিছু পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছিল ইউরোপীয় অনুকরণ মাত্র। এই জন্য সেই পদ্ধতি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন সুরু হইয়াছিল ইউরোপীয় রীতি-নীতি অবলম্বনে। বিলাতী অঙ্কনরীতিতে তিনি সবিশেষ দক্ষতাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে যে সমস্ত দৃশ্য ভাসিয়া বেড়াইত, ইউরোপীয় পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। বিলাতী পদ্ধতির ধরাবাঁধা গণ্ডীও শরীরগঠনতত্ত্বের মাপকাঠি তাঁহার মনের ভাবপ্রকাশের পথকে সীমাবদ্ধ করিয়া তুলিত। ফলে তিনি ঐ পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলেন এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতির আশ্রয়ে তাঁহার প্রকাশভঙ্গীর পথ খুঁজিয়া লইলেন। ইহা তাঁহার ভাবপ্রকাশের সহায়ক হইল এবং এই প্রাচীন নীতির আশ্রয়ে এক নূতন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন। সেই সময় ই, বি, হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা সরকারী কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। তখন নূতন উদ্যমের সহিত নূতন পদ্ধতিতে শিল্পচর্চ্চা চলিতে থাকে।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের এই নব প্রচেষ্টা দেশে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি করিল। দেশের একশ্রেণীর লোকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয় পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের প্রচলন হইলে দেশীয় চিত্রকলার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী; তাঁহারা দেশে মহা হৈ চৈ সুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন পাশ্চাত্য দেশেরই বড় বড় চিত্রসমালোচকগণ অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত আধুনিক

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হ্যাভেল সাহেব, ওকাকুরা, ভগ্নী নিবেদিতা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট লোক তখন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া দেশীয় শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। স্যার জন উড্‌রফ্‌, লর্ড কিচ্‌নার প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট নূতন পদ্ধতি যথেষ্ট সমাদর অর্জ্জন করিতেছিল।

আমাদের দেশীয় মাসিক সংবাদপত্রের মধ্যে কয়েকখানি ছিল অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষক। অবনীন্দ্রনাথের নূতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি প্রকাশিত করিবার জন্য এই সমস্ত সংবাদপত্রের তখন অনেক বিরুদ্ধ এবং সময় সময় অত্যন্ত কুশ্রী সমালোচনাও সহ্য করিতে হইয়াছে; নানারকম হাস্যজনক লেখা এবং ব্যঙ্গচিত্র তখন অবনীন্দ্রনাথের নব প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকে হাস্যাস্পদ এবং হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিপুল উদ্যোগের সহিত কাগজে কাগজে বাহির হইত।

কিন্তু এই আলোচনার ফলে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। মধ্যযুগের বিভিন্ন শিল্প, মোঘলযুগের শিল্প, অজন্তা, ইলোরা, বাঘ প্রভৃতি প্রাচীন গুহা এবং মন্দিরাদিতে প্রাপ্ত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য নূতন আগ্রহের সহিত আলোচিত হইতে লাগিল এবং শিল্পে স্বজাতীয়তার ভাবও লোকের মনে উদিত হইল। বহু বিদেশীয় এবং কতিপয় দেশীয় বিশিষ্ট লোকের সহায়তায় নবপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই সময় ১৯০৭ সালে কলিকাতায় 'প্রাচ্যকলা সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমিতি গঠিত হইবার পর অবনীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বহু ছাত্রছাত্রী তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল এবং নূতন নূতন রূপে ও রসে ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করিয়া অপরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

এই সময় অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিকতম ইউরোপীয় পদ্ধতির সহিত দেশীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের কলাকুশলতার কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। জাপান হইতে ওকাকুরা, টেইকান, হিসিডা, কাত্‌সুতা, আরাই প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য এদেশে আসিলেন এবং এদেশীয় ছাত্রদের জাপানী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিতে অঙ্কন শিক্ষায় সহায়তা করিলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নূতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী হইতে লাগিল। জাভা, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই সকল ছবি প্রেরিত হইল এবং যথেষ্ট সমাদর অর্জ্জন করিল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতে অঙ্কন শিক্ষা দিবার প্রচলন হইল। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন দেশে স্থায়ীভাবেই প্রচলিত হইল।

এক্ষণে এই অঙ্কনপদ্ধতি এবং ইহার ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। ইহার অঙ্কন পদ্ধতিতে বিশেষ কোন গণ্ডীবদ্ধ নিয়ম নাই। এই শিল্পের সঙ্গে চীনা ও জাপানের শিল্পের বহুস্থানে একতা লক্ষিত হয়। দেশের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া শিল্পী তাঁহার মনের ভাবধারা প্রকাশ করেন। সুতরাং এদেশীয় চিত্রের রস উপলব্ধি করিতে গিয়া বাহিরের দিকটা দেখিলে চলিবে না। শিল্পীর অন্তরের প্রকাশই তার ছবি। সুতরাং ছবিকে বুঝিতে হইলে কোথা হইতে ইহা উৎসারিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। ইউরোপীয় শিল্পীরা তাঁহাদের "মডেল" সম্মুখে রাখিয়া হুবহু তাহার নকল করিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্তু এদেশীয় শিল্পীরা প্রকৃতির অন্তর হইতে প্রকাশের উপযোগী রস এবং সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া চিত্রে প্রকাশ করেন। তাই ভারতীয় চিত্রের রস গ্রহণ করিতে গিয়া শিল্পীর অন্তরের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইঁহাদের অঙ্কনকার্য্য ও বর্ণবিন্যাসে রেখা এবং জল-রঙের "wash"-এর বেশী প্রচলন দেখা যায়। শিল্পীর মানসচক্ষের সম্মুখে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই তাঁহারা রঙ্‌ এবং রেখায় ছবিতে ফুটাইয়া তোলেন। শুধু ছবিটিকে রূপ দিতে রঙ্‌ এবং বর্ণবিন্যাসের দক্ষতা (technique) প্রকাশ করা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তাঁহারা ব্যবহার করেন। অঙ্কনপদ্ধতির বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নন—ভাবপ্রকাশই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বলিয়া ইঁহারা যে প্রাচীন কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এরূপ ভাবিলে ভুল করা হইবে। এদেশের বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া ইঁহারা নূতন নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতাকেও ইহারা বর্জ্জন করেন নাই। আবার ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যেমন শারীর-তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম, পারিপ্রেক্ষিক প্রভৃতি নানারকম বাঁধন আছে, ইঁহারা সেই সমস্ত বাঁধন হইতে নিজেদিগকে মুক্ত রাখিয়াছেন। ফলে ইঁহাদের প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্র অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে।

এই পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা চিত্রাঙ্কন করিতেছেন এবং নূতন নূতন ভাবধারা, অঙ্কন ও বর্ণবিন্যাসের অভিনবত্বের দ্বারা ইহাকে আরও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রতিভা নব নব সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইঁহাদের সৃষ্টি ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে।

আচার্যিদের বউ

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভূমিকা ফেঁদে আচার্য মহাশয়ের পরিবারের পরিচয় দেবার কিছু দরকার নেই। কিন্তু একথা যদি বলি, এই নাস্তিক্য-বাদ, অশ্রদ্ধা আর সংশয়ের যুগে এমন একটি পরিবার অভিনব, তাহ'লে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন। মানুষ আজ আত্মরচিত বিজ্ঞান-সভ্যতায় উৎপীড়িত হচ্ছে, নিজের সৃষ্টি-করা মারণাস্ত্রের ভয়ে মাটির তলায় গিয়ে প্রবেশ করছে। অশান্ত জীবনের একমাত্র স্বস্তি ছিল শূন্যময় ঈশ্বর, কিন্তু সেখানেও অসংখ্য যন্ত্র-শকুনের পাল ঈশ্বরকে ডানা দিয়ে ঢেকে মানুষকে মারছে তাণ্ডব-দাহনে। মেঘলোক থেকে বিদ্যুৎকে ছিনিয়ে যে-সভ্যতার আলো সে জ্বালিয়েছিল ঘরে ঘরে, দেশ-দেশান্তরে—সেই আলো প্রাণভয়ে নিবিয়ে সে ঢুকলো সুড়ঙ্গপথে। বিশ্ববিধানের ভার যাদের হাতে, আত্মদলনে আর আত্মাবমাননায় তারা মুমূর্ষু। এই অশান্ত জীবনে যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখি, চমকে উঠি।

জানি, আচার্য পরিবারের আলোচনায় একথার দাম নেই, তবু এই বিংশ শতাব্দীর বিষে জর্জরিত কল্‌কাতা নগরের ঠিক মাঝখানে এমন একটি নিরুদ্বিগ্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার বিস্ময়ের বিষয় বৈ কি। বাংলার একটি অতি প্রাচীন গুরুবংশের ধারা তাঁরা বজায় রেখে চলেছেন—যেমন ভগীরথ শাঁখ বাজিয়ে যান্ গঙ্গার আগে আগে উষর জনপদ আর প্রান্তর পেরিয়ে। পৃথিবী প্রগতিশীল এ-সংবাদ তাঁদের জানা নেই; সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ঐশ্বর্যশালিনী ভাষা আছে এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আশ্চর্য বৈ কি। সকাল সন্ধ্যা পূজাপাঠ, গঙ্গাস্নান, বেদমন্ত্র-ধ্বনি, আরতি, নারায়ণসেবা, পৌরাণিক আলোচনা—এ পরিবারের এইটিই নিত্যকর্ম বংশানুক্রমায়। এর মধ্যে কোনো ভাঙন নেই, ব্যতিক্রম নেই, সংশয় অথবা আলস্য ঢুকে কোনোদিন এখানে প্রশ্রয় পায়নি। কঠিন, নিরেট, নিরুদ্ধ দেওয়াল এই পরিবারকে পৃথিবীর কলরোল থেকে চিরকালের জন্য আড়াল ক'রে রেখেছে। এখানকার সর্বশেষ শিশুটি অবধি এই শিক্ষায় আর এই দীক্ষায় বনবল্লীর মতো নিভৃতে বেড়ে উঠেছে। অথচ সমস্তটাই সহজ, সাবলীল, প্রসন্ন—কোথাও শাসন নেই, সতর্কতা নেই। যেন কল্‌কাতার তৃষাদগ্ধ মরুভূমির মাঝখানে অরণ্য ছায়াময় একটি প্রাচীন সরোবর।

এমন একটি পরিবারে সেদিন যে বিবাহটা ঘট্‌লো সেটা কিছু অভিনব। বিবাহের ইতিহাসটুকু সামান্যই। আচার্য মহাশয়ের ছাত্র দেবগ্রামের কেশবচন্দ্রের কন্যা মল্লিকার সঙ্গে আচার্য তাঁর নাতির বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কি কারণে এই প্রতিশ্রুতি সেকথা এখানে ওঠেনা। প্রতিশ্রুতি—এই যথেষ্ট। কিন্তু এই সত্য আচার্যকে রক্ষা করতে হোলো বহুমূল্যে—কারণ তাঁর পরিবারে বাল্যবিবাহ যেমন চিরকালীন প্রথা, তেমনি পাত্রীর পক্ষে লেখাপড়া শেখাও তাঁদের বংশের সংস্কার-বিরুদ্ধ। সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ কিন্তু দ্বিরুক্তি না ক'রে শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে নাতি হরিমোহনের বিয়ে দিলেন। মল্লিকার বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে গেছে। হরিমোহনের পঁচিশ। সমগ্র পরিবার উৎকট অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

বলা বাহুল্য, যৌথ পরিবার হ'লেও আচার্যদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল। দাসদাসী সমেত দুবেলায় প্রায় দেড়শো পাত পড়ে। আগেকার আমলের গৃহসজ্জায় সমস্ত বাড়ীটা পরিপূর্ণ। পুরণো কালের পিতল-কাঁসার বাসনপত্রগুলো দেখলে বাঙ্গালীর আদি ইতিহাস মনে পড়ে। বাড়ীতে সবসুদ্ধ কতজন স্ত্রী-পুরুষ এবং কা'র সঙ্গে কি সম্পর্ক—মল্লিকা আজ অবধি থৈ পায়নি। কয়েকদিন সে ঘুরে ঘুরে ঘরে ঘরে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। তাকে দেখে বৌ-ঝিরা অনেকেই মাথার কাপড় টেনে দিল, ছেলেরা আড়ালে চ'লে গেল এবং কুমারী মেয়েরা চেয়ে রইলো অবাক হয়ে। প্রথমটা মল্লিকা কৌতুক বোধ করলো, কারণ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসে না! পরে, অনেকক্ষণ বাদে, সে নিজের মহলে এসে আবিষ্কার করলো, পায়ে তার চটিজুতো ছিল—ওরা তাই শিউরে উঠে গা-ঢাকা দিয়েছে। মল্লিকা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো।

নতুন স্বামী-স্ত্রীর আলাপ কি ভাবে আরম্ভ হয়, সে তারা নিজেরাই শেখে। সে অবস্থাটা দুজনেই পেরিয়ে এসেছে। স্বল্পভাষী বিনয়ী হরিমোহন সেদিন ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা বললে, স্নান ক'রে আসা হোলো, মাথা আঁচ্ড়ানো হোলো না?

হরিমোহনের মুখখানি নধর, সুন্দর। এই পরিবারে প্রিয়দর্শন ব'লে তার খ্যাতি। হাসিমুখ তুলে তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে মাথার চুল বার বার নিচের দিকে নামিয়ে দোরস্ত করতে লাগলো।

মল্লিকা বললে, ওকি, হাত দিয়ে কি মাথা আঁচড়ানো যায়?—এই ব'লে নিজের আলমারির ড্রয়ার থেকে চিরুণী আর ব্রাশ বা'র ক'রে দিল।

হরিমোহন হেসেই অস্থির। বললে, না না, এখন আহ্নিকের সময়, চিরুণী ছুঁতে পারবো না। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা কেউ চিরুণী ছোঁয়না। তুমি জানোনা বোধহয়—না?

মল্লিকা বললে, সেইজন্যেই বুঝি সকলের কদমফুলের মতন চুল-ছাঁটা?

হ্যাঁ, তাই বটে।—ব'লে হরিমোহন গরদের ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে মাথার টিকিটায় একটা ফাঁস বেঁধে নিল। মল্লিকা হাসবে কিম্বা হাত-পা ছড়িয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে বসবে, ঠিক ঠাহর করতে পারলোনা।

ঘরে স্ত্রীর কাছে বেশিক্ষণ থাকতে হরিমোহনের সাহস নেই, গভীর রাত্রি ভিন্ন স্বামীস্ত্রীতে দেখাশোনা এবাড়ীর বিধিবহির্ভূত। কোনো রকমে কাজ সেরে হরিমোহন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিল, মল্লিকা তাকে ডাকলো। বললে, সকালবেলা কি যে বল্‌বে বলেছিলে?

হরিমোহন ফিরে দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, বলছিলুম কি—মানে, কিছু মনে ক'রো না ওরাই বলাবলি করছিল, তোমাকে নাকি বই পড়তে দেখেছে ওরা।

বই পড়া কি বারণ?

হরিমোহন হেসেই অস্থির, হাসতে হাসতেই সে বেরিয়ে চ'লে গেল এবং মল্লিকা জানে, সমস্তদিনে তার সঙ্গে দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমীরবান্নার বিন্দুমাত্র সংস্রব এ বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যায় না; তরকারীগুলো মধুর রসে একপ্রকার অখাদ্য। শাড়ির সঙ্গে আটপৌরে জামা পরা এখানে মেয়েদের পক্ষে নিন্দার কথা। শেষরাত্রে উঠে স্নান না করলে সামাজিক অপরাধ। মল্লিকা দিনে দিনে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এমন আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়নি, সে দোষ তার নয়। প্রতিদিনই সে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে লাগলো, তার ওপর একটা প্রকাণ্ড অন্যায় করা হয়েছে। আলো আর বাতাস থেকে তাকে ছিনিয়ে ফেলা হয়েছে এক অন্ধকূপে। এইরূপ অদ্ভুত সংসারে চিরদিন তাকে বাস করতে হবে এই কল্পনা করতে গিয়ে মল্লিকার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

হরিমোহন একদিন পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে দুহাতে স্ত্রীর দুই চোখ টিপে ধরলো। হরিমোহনের বলিষ্ঠ সুন্দর দুই হাতে ফুল-বেলপাতা আর চন্দনের মৃদু মধুর গন্ধ। মল্লিকা গম্ভীরভাবে তার হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে বললে, জানি, ছাড়ো।

হরিমোহনের হাসি আর ধরে না। কিন্তু পলকের মধ্যে আয়নার ভিতরে চোখ পড়তেই দেখা গেল, স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি। একজনের সঙ্গে আরেক জনের কী বিচিত্র পার্থক্য। মল্লিকার মুখে রোজ-পাউডারের আভা, দুই আয়ত চোখে সুর্মা টানা, কপালে চুলের আঙট্‌ ঝুমকো-লতার মতো নামানো। আর তার পাশে আচায্যিদের নাতি, মাথায় টিকি, ছোট ছোট ছাঁটা চুল, গলায় সাম বেদী পৈতার গোছা—চোখে মুখে বিদ্যা-বুদ্ধি অপেক্ষা সারল্য আর আত্মিক ভাব। রসবোধ অপেক্ষা কৌতুকবোধের দিকে ঝোঁক বেশি। সুশ্রী যুবক সন্দেহ নেই, একে ভালোবাসাও সহজ—কিন্তু শিক্ষার পালিশ আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকলে মল্লিকার কেমন ক'রে চলবে? এর সঙ্গে পারিবারিক জীবন অচল, কারণ যৌথ-পরিবারের আওতায় থেকে এর কোনো স্বকীয়তা জন্মায়নি। এর সঙ্গে সামাজিক জীবনও অসম্ভব, কারণ বাইরের জীবনযাত্রার গতিরহস্য এর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

হরিমোহন আস্তে আস্তে বললে, বৌ, রাগ করলে?

মল্লিকা বললে, বৌ ব'লে ডাকো কেন? আমার নাম রাণী।

নাম ধরতে নেই যে।

সে কি, তাহ'লে বলো আমিও তোমার নাম ধ'রে ডাকতে পারবো না ?

হরিমোহন অবাক হয়ে গেল। স্ত্রী স্বামীকে নাম ধ'রে ডাকতে চায় এ তার কল্পনাতীত। পরিহাস মনে ক'রে সে হাসিমুখে বললে, ওকথা কি বলতে আছে ?

বলতে আছে কিনা সে আমি জানি। বলো যে এখানে সে-রীতি চলবে না। যাক গে। তুমি হাত-কাটা ফতুয়া আর উড়ুনি গায়ে দিয়ে পথে বেরোও কেন, বলো দেখি ?

তার গলার আওয়াজে এমন একটা কঠিন নির্দেশের চিহ্ন যে হরিমোহন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে, ওটাই যে আমাদের অভ্যেস। শীতকালে কেবল বালাপোষ গায়ে দিই।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মল্লিকা বললে, বগলে পুরণো ছাতি, কাঁধে উড়ুনি, গায়ে ফতুয়া—তোমার সঙ্গে নাপ্‌তের তফাৎ কি ?

রসিকতা ক'রে হরিমোহন বললে, তফাৎ কেবল আমার মাথায় টিকি ?

না, ও-অভ্যেসটা তোমাকে ছাড়তে হবে। উড়ুনি নাও ক্ষতি নেই, কিন্তু পরণে ধুতি আর পাঞ্জাবী—আর পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি ছেড়ে য়্যালবার্ট্।

কিন্তু দাদু যে রাগ করবেন ?

মল্লিকা বললে, এতেই যদি তিনি রাগ করেন তবে ঘুমের ঘোরে কাঁচি দিয়ে একদিন তোমার টিকিও কেটে দেবো। ছি ছি, আমার বন্ধুরা কোনোদিন তোমাকে দেখলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

হরিমোহনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ভয়ার্ত মুখে সে চুপ ক'রে রইলো। বৃদ্ধ আচার্য মহাশয়ের প্রতি যে অশোভন কটাক্ষ উচ্চারিত হোলো, সে-আঘাত হরিমোহনের মর্মে গিয়েই বিঁধলো।

কিন্তু মল্লিকা সেখানেই থামলো না। স্বামীর নতমুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি না কল্‌কাতার ছেলে ? আজকাল কত রকমের চালচলন, কিছুই কি চোখে পড়েনা তোমাদের ? ইংরিজি লেখাপড়া শেখেনি, এমন একজন ছেলেও তুমি দেখাতে পারো ? না শিখেছ ম্যানার্স, না এটিকেট্। হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধেছ কেন ? ওতে তোমার কি লাভ বলতে পারো ?

অপরাধীর মতো মুখ ক'রে হরিমোহন বললে, আমরা শৈব কিনা, তাই।

ছাই আর পাঁশ! ধর্মে মতি খুব ভালো, ভণ্ডামি কেন ? তুমি আশা করছ আমি তোমার মতন হবো, আমিও ত আশা করতে পারি, তুমি হবে আমার মতন ? ঘণ্টা নাড়া আর পুজো আর চাল-কলা বাঁধা—লোকের কাছে আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা করে !

হরিমোহন সবিনয়ে বললে, আমি কি তোমার যোগ্য নই, বৌ ?

সে-কথা হচ্ছে না—মল্লিকা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো; তোমাদের রুচি আর শিক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছে। মানুষ আর বনমানুষের প্রভেদ নিয়ে কথা হচ্ছে।

হরিমোহন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালো। তারপর মৃদুকণ্ঠে—ঘরের বাইরে কেউ না-শুনতে পায়—এম্‌নি ভাবে বললে, আমাকে তুমি কি করতে বলো ?

বলবো কা'কে, আমার কথা যে বুঝতেই পারবে না ? তুমি কি কোনোদিন আমাকে চেনবার চেষ্টা করেছ ?

না।

চেষ্টা করলে বুঝতে, এখানকার ছাঁচ আজকের দিনে কেউ সহ্য করতে পারবে না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সদর দরজা বন্ধ—বাইরের হাওয়া আসে না, খবর আসে না, কথা আসে না। কেউ বাঁচতে পারে এখানে ?

হরিমোহন বললে, তুমি কি চাও ?

মল্লিকা বললে, তোমাকে বুঝে নিতে হবে। আমি ছিলুম ডিবেটিং ক্লাবের প্রধান বক্তা—

তা বুঝতে পারছি।—হরিমোহন একটু হাসলো।

যতই হাসো, সত্যিটা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস্ কন্‌ফারেন্সের আমি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, পর্দানিবারণী সমিতির আমি মেম্বর—তুমি বলতে চাও সমস্তই ত্যাগ ক'রে ভট্‌চায্যিদের পুজো নিয়ে থাকবো ? তুমি জানো, ভবানীপুর 'মহিলা-সমাজ' আমারই হাতের তৈরি ? তুমি এও বোধ হয় শোনোনি, আমার একটা পলিটিক্যাল ক্যারিয়রও আছে!—এক নিশ্বাসে কথাগুলো ব'লে মল্লিকা হাঁপাতে লাগলো।

ওদিকে নারায়ণের ঘরে সন্ধ্যারতির লগ্ন প্রায় আসন্ন। আসছি।—ব'লে হরিমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে

যেতে ভাবতে লাগলো, সর্বনাশ, এ কা'র সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে? একে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ?

জানলার ধারে মল্লিকা কঠিন হয়ে ব'সে রইলো। চারিদিকের এই অবরোধী আবহাওয়ার মধ্যে ব'সে তার মনে হোলো বাইরেটাও যেন রুক্ষ, যেন তৃষ্ণার জিহ্বা মেলে ধরা। সহসা, যতদূর দেখা গেল, তার জীবনটা ভয়ানক বিপন্ন। এ বিয়েতে বিন্দুমাত্রও তার তৃপ্তি হয়নি। সন্দেহ নেই, হরিমোহনের চেহারা আর প্রকৃতি ভালোবাসবারই মতো, কিন্তু সে অন্ধগুহাবাসী। মল্লিকার বয়স কম হয়নি, সে জানে অগ্নিস্রাবী যৌবনের মাদকবর্ণ সহজেই একদিন ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু তারপরে সর্বপ্রকারে তার জীবন হবে বিড়ম্বিত। এই পারিপার্শ্বিক সহ্য করা হবে তার পক্ষে কঠিনতম সমস্যা। একটু আগে নিজের আত্মাভিমান হরিমোহনের কাছে সে প্রকাশ ক'রে ফেললো। জানে, এ প্রবৃত্তি অশোভন; নিতান্তই বাধ্য হয়ে তাকে এই আত্মহত্যা করতে হোলো। কিন্তু তার নিজের পরিচয় যাই হোক, তার প্রাথমিক দাবিগুলি যদি পূর্ণ না হয় তবে কি তার জীবন ব্যর্থ নয়? তার রুচি আর শিক্ষামতো কিছুই যদি সে না পায়, তবে নিজেকে দৃঢ় ক'রে দাঁড় করানো কি তার এত বড় সামাজিক অপরাধ? অনুকূল অবস্থা না পেলে স্নেহ ভালোবাসা আসবে কোন্ পথ দিয়ে?

মাসতিনেক এমনি ক'রেই কাটলো।

কয়েকদিন আগে থেকেই মল্লিকার মন ভালো ছিলনা। বেশ বোঝা যায়, পারিবারিক এক চক্রান্ত চলেছে তার বিপক্ষে, এ বাড়ীতে সে প্রিয় নয়। ফলে, সকলের মাঝখানে থেকেও সে একা। তার স্নানাহার, তার সাজসজ্জা, তার চলনধরণ সমস্তগুলোই এ পরিবারের ঐক্য প্রণালী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা চড়া সুর, এখানকার হাওয়ায় সে যেন বিরূপতা অনুভব করে।

এই একঘেয়ে অস্বস্তির ওপর একদিন একটুখানি বৈচিত্র্যের ধাক্কা পড়লো।

দুপুরে এই সময়টায় রোজই হরিমোহন পুরাণপাঠ, শিষ্যসেবকের বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ীতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেদিন সে বাড়ী ছিল না। তাদের টোলের পরীক্ষায় আচার্যের সঙ্গে তাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল, তাছাড়া উপাধি বিতরণ সভার কাজকর্মও কিছু ছিল। এমন সময় একদল অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ বাগান পেরিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকলো। খবর পাওয়া গেল, তারা মল্লিকার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এ বাড়ীর নিয়ম হোলো, মেয়েরা নিচের তলাকার বৈঠকখানার দিকে কখনোই অগ্রসর হবে না। কিন্তু আজ অম্লানবদনে মল্লিকা সেই বিধি লঙ্ঘন ক'রে নিচের তলায় নেমে সোজা বৈঠকখানায় এসে হাজির হোলো।

তিনটি যুবকের সঙ্গে চার পাঁচটি তরুণী তাকে দেখে একসঙ্গে সোল্লাসে কলরব ক'রে সারা বাড়ী মুখর ক'রে তুললো। তাদের সেই সমগ্র মিলিত কণ্ঠস্বর এই প্রাচীন বনেদী এবং রক্ষণশীল বাড়ীর সমস্ত ভিতগুলোর সন্ধিস্থানে হাতুড়ি মেরে মেরে যেন ধরাশায়ী ক'রে দিতে লাগলো। কাছাকাছি কারুকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মল্লিকার মনে হোলো—আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে সারা বাড়ীর মানুষরা একটি মুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

একটি পলক মাত্র, তারপরই হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে মিসেস রেবা রায় আর অলকা মিত্রের হাত ধ'রে অভ্যর্থনা জানিয়ে মল্লিকা বললে, এসো—আসুন অরিন্দমবাবু, আসুন বিজনবাবু। তারপর? হঠাৎ যে? কি মনে ক'রে?—চলো ওপরে, আমার শোবার ঘরে। রতীনবাবু, আপনি সেই যে শীলং গেলেন, তারপর আর কোনো খোঁজ পেলুম না কেন বলুন ত?

অরিন্দম হাসি টিপে বললে, ও কি আর আমাদের মতন গরীবদের খবর রাখে? He was engaged elsewhere!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রেবা-অলকা-বিজনরা উচ্চ হাস্যে ঘরবাড়ী ভরিয়ে দিল।

আপ্যায়ন আর অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়া ত দূরের কথা, আজ বরং তারই একটা চেষ্টাকৃত অতিশয়তা দেখা গেল। কোথাও স্খলন নেই, কোনো বিচ্যুতি নেই—আদ্যোপান্ত হিসাব নিকাশে একেবারে সুসমন্বিত। মল্লিকা চঞ্চল হয়ে, উত্তেজিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে গা ঢেলে দিল এই কোলাহল-মুখর আসরে। ওরা কেউ বোধ হয় বুঝতে পারলো না, মল্লিকা নানা কথার কৌশলে শ্বশুরবাড়ীর আসল চেহারাটা ওদের কাছে ঢেকে রাখতে চায়, নানাবিধ ছলনায় হরিমোহনের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে পালিয়ে চলে। ওরা যখন বললে, মল্লিকা, একটা গান গাও, তোমার চমৎকার গলা

অনেকদিন শুনিনি। মল্লিকা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। বাবার দেওয়া যৌতুকের হারমোনিয়মটা দ্রুত হস্তে বা'র ক'রে সে ধরলো 'গীতবিতানের' একখানা গান। তার সেই দীর্ঘ মধুর মসৃণ কণ্ঠস্বরে শরৎ-শেষের মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল নীলাকাশ ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলো। হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে আগেকার সেই মল্লিকাকে নতুন ক'রে দেখে বিজন, অরিন্দম আর রতীন সমাধিস্থ হয়ে রইলো।

রেবা-অলকারা ধ'রে বসলো, আজ বেলা তিনটার শো'তে মেট্রোয় যেতে হবে। অনেক কাল পরে আজ এই সুযোগ।

এইমাত্র! প্রস্তাব শোনামাত্রই মল্লিকা নেচে উঠলো, বর্ষার মেঘের কটাক্ষে যেমন ময়ূরী নৃত্য ক'রে ওঠে। সত্যি বলতে কি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তার কুমারীকালের মতো সুরুচিসম্পন্ন সজ্জায় এসে দাঁড়ালো। যেন দীর্ঘকাল থেকে সে উপবাসী, তৃষ্ণার্ত—সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন অদ্ভুত অধীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চলিত। তার দিকে তাকিয়ে তিনটি যুবকের ইহকাল ঝরঝরে হয়ে গেল।

মল্লিকা বললে, যাচ্ছি, কিন্তু একটি সর্তে। তোমরা আজ আমার অতিথি, আজকের সব খরচ আমার।

সবাই বললে, বেশ বেশ, খুব ভালো।—এই ব'লে তারা আবার সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীময় সাড়াশব্দ জাগিয়ে নেমে চললো।

মল্লিকাও নামবে, এমন সময় ধীরপদে দিদিশাশুড়ী এসে দাঁড়ালেন। বললেন, নাৎ-বৌ, ওঁরা কে?

ওঁরা?—মল্লিকা থমকে দাঁড়ালো। বললে, ওঁরা সবাই আমার কলেজের বন্ধু।

তুমি যাচ্ছ কোথায়?

একটু বেড়াতে—সিনেমায়—

ওঁদের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কর্তার মত নিয়েছ কি?

তিনি ত বাড়ী নেই, আপনাকেই জানিয়ে যাচ্ছি। ওঁদের বলবেন, সন্ধ্যে নাগাৎ ফিরবো।

গট্ গট্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মল্লিকা দ্রুতপদে বন্ধুদের সঙ্গে চ'লে গেল। তার প্রতি পদক্ষেপে এই বংশের শিক্ষা-দীক্ষার ধারা দলিত মথিত হ'তে লাগলো। বিমূঢ় নিস্পন্দ দিদিশাশুড়ী নির্বাক চেয়ে রইলেন। মেয়েটার অদ্ভুত স্পর্ধা বটে!

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মল্লিকারা গিয়েছিল ইম্পিরীয়লে, সেখান থেকে হগ মার্কেট্ ঘুরে ময়দানের হাওয়া খেয়ে যখন তারা যে-যার বাড়ীর দিকে চললো, মল্লিকা বিজনকে এস্কর্ট্ নিয়ে ট্রামে উঠে বসলো। অতঃপর শ্বশুরবাড়ীর ফটকের কাছে এসে সে যখন হাত তুলে বিজনকে 'চিয়ারো' ব'লে বিদায় দিয়ে ভিতরে ঢুকলো, আচার্য মহাশয় গীতার পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মল্লিকা অগ্রসর হচ্ছিল, আচার্য গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে তাকে ডাক দিলেন—নাৎ-বৌ দিদি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন বৈঠকখানায়!

বৈঠকখানায়! বিস্ময়জনক নির্দেশ বটে। মল্লিকা থমকে সেইখানেই দাঁড়ালো। আচার্য ভিতর থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন—এবং অপ্রত্যাশিত, হরিমোহন এলো তাঁর পিছনে পিছনে।

দৃঢ় স্মিতকণ্ঠে আচার্য বললেন, ভেতরে কিম্বা ওপরে আপনার আর যাবার দরকার নেই। আমি ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। আপনার আসবাবপত্র সবই ধর্মতলার বাসায় চ'লে গেছে। স্বামীস্ত্রীতে সাবধানে ভদ্রভাবে থাকবেন। হ্যাঁ, খরচপত্র সমস্তই নিয়মিত যাবে—মানে, মাসে দুশো টাকা। আমার কর্তব্য থেকে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হবোনা। অন্যান্য সকল কথাই হরিমোহনকে আমি ব'লে দিয়েছি, অসুবিধে কিছু হবেনা। আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?

দুই পা থর থর ক'রে মল্লিকার কাঁপছিল। ভূমিকম্পের একটা প্রচণ্ড নাড়ায় সে যেন কেমন বিকল হয়ে গেছে। নিজেকেই সে একটা চাবুক মেরে সজাগ ক'রে তুললো। বললে, না।

ফটকের কাছে একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আচার্য বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু তোমার বক্তব্য আছে, হরিমোহন?

অপ্রকম্পিত কণ্ঠে হরিমোহন জবাব দিল, আজ্ঞে না।

স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য বিবেচনা, স্নেহ—এগুলোর

অভাব যেন কোনোদিন না হয়। তোমাদের প্রতি আমার নিত্য আশীর্বাদ রইলো। আচ্ছা, এবার তা হ'লে দুর্গা ব'লে যাত্রা করো। সেখানে গিয়ে আবার রান্নাবান্না করতে হবে।

মল্লিকা হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই আচার্য বললেন, থাক্ ছোঁবেননা আমাকে নাৎ-বৌ দিদি, আমি আশীর্বাদ করছি।

দুজনে অগ্রসর হোলো। হরিমোহন বোধ করি দ্রুত আত্মগোপন করার জন্য গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসলো। মল্লিকা এতক্ষণ পরে সহসা তার গ্রীবা হেলিয়ে নিঃসঙ্কোচ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, দাদামশায়, পায়ের ধূলোও নিতে দিলেন না? দেখছি এটা তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু আমি এ বাড়ীর বৌ—

ঘাড় নেড়ে বাধা দিয়ে আচার্য বললেন, এ বাড়ীর বৌ আপনি নন্ নাৎ-বৌ দিদি, আপনি হরিমোহনের স্ত্রী, এই মাত্র। হ্যাঁ, কি বলছেন বলুন?

অপমানিত মুখ তুলে ফস ক'রে মল্লিকা ব'লে বসলো, ওঁর স্ত্রী না হ'লেও আমি দুঃখিত হতুমনা। এ বাড়ীর বৌ আমি নয়—একথা শুনেও আমি আনন্দ পেলুম।—থাকগে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি যা খরচের বরাদ্দ করেছেন, কল্‌কাতা শহরে তা নিয়ে চলবেনা।

চলবে।—আচার্য বললেন, ধর্মতলার বাড়ীটা আমার, সেখানে ভাড়া লাগবেনা। আপনারা মাত্র দুজন, ওতেই চলবে। তবু, আপনার শেষ দাবি যুক্তিহীন হ'লেও আমি পূর্ণ করব। আড়াইশো টাকা ক'রে আপনাদের মাসিক খরচ বরাদ্দ রইলো।

মল্লিকা নীরবে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। আচার্য উপর দিকে একবার চেয়ে নিজের মনে বললেন, তোমারই নির্দেশ, প্রভু।

মিনিট তিন চার ধ'রে দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটে চললো। আঘাতটা সামলে নিতে মল্লিকার দেরি হয়নি। শ্বশুরবাড়ীর প্রতি মমত্ববোধ কিছু থাকলে একটু কষ্ট হোতো বৈকি। তবু কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেও পরিত্যক্ত কয়েদখানার জন্য ছোট একটি নিশ্বাস পড়ে। মাত্র সেইটুকু, তার বেশি নয়। তার পাশে হরিমোহন বিষণ্ণ বালকের মতো বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রয়েছে। পুরুষ সে নয়—কিশোরী বালিকা যেমন গ্রামের স্নেহশৃঙ্খলিত জীবন ত্যাগ ক'রে অজানা শ্বশুরবাড়ীর পথে প্রথম যাত্রা করে, তেমনি নিঃশব্দ ব্যাকুল করুণ তার চাহনি। পথ, ঘাট, জনতা, নগরের অশ্রান্ত মুখরতা—ওদের কোনো অর্থ নেই। শত সহস্র লক্ষ্যবস্তুর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও চোখ দুটি তার ছিল আচার্যের দিকে। প্রিয়তম পৌত্র সে, পিতামাতার একমাত্র পুত্র সে, পারিবারিক সংস্কৃতির সে-ই যোগ্যতম প্রতিনিধি, তাকে নিয়ে কত আশা, কত আশ্বাস।

তার হাতের উপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সহসা মল্লিকা বললে, সোজা হয়ে ব'সো। কেমন ক'রে গাড়ীতে চড়তে হয় তাও জানোনা?

হরিমোহন সোজা হয়ে বসলো। রাঙা দুটো চোখ ফিরিয়ে পরে সে বললে, আগে আমি কখনো মোটরে চড়িনি।

সহসা ঝড়ের মতো মল্লিকা হেসে উঠলো—কি যে করবো তোমাকে নিয়ে! চলো, খুব তোমাকে মোটরে চড়াবো এখন থেকে। আমার কথার বাধ্য থাকবে ত?

অবাধ্যতা কা'কে বলে, হরিমোহন জীবনেও জানেনা। সে কেবল ঘাড় নেড়ে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে তার সম্মতি জানালো। মল্লিকা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। হরিমোহনের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে তার মাথায় হাত বুলিয়ে পুরুষের পাওনা বক্‌শিস চুকিয়ে দিল।

বাঁচলুম—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—মল্লিকা ফুক্‌রে উঠলো, আর কিছু না হোক আমীষ রান্না খেয়ে বাঁচবো, অখাদ্য আর পেটে যাবেনা। আড়াইশো টাকায় আমাদের যা হোক চলে যাবে। বাড়ী ভাড়া লাগবেনা।

হরিমোহন গলাটা ছাড়িয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে বললে, তুমি কি মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, ডিমের কথা বলছ? ওসব ত আমাদের খেতে নেই, বৌ?

দুরন্ত বালকের প্রতি বর্ষীয়সী নারী যেমন সস্নেহে চেয়ে থাকে, তেমনিভাবে কিয়ৎক্ষণ হরিমোহনের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে সহসা মল্লিকা পুনরায় চলন্ত গাড়ীর মধ্যে উচ্চ দীর্ঘ উল্লোলে হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী বংশেরই মানুষ তোমরা, সব এক একটি পরমহংস! জীবে দয়া, অহিংসা

—এতই যদি ছিল, বনে যেতে পারোনি? বিয়ে করেছিলে কেন? একথা শেখোনি, ষড়রিপুর প্রথমটা থেকেই আর সবগুলোর উৎপত্তি?

কিন্তু তার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় হরিমোহনের ঔৎসুক্য না দেখে মল্লিকা পুনরায় বললে, আচ্ছা, থাক্, এসব কথা পরে হবে। আগে নিজের ইচ্ছে মতন ঘরকন্না পাতিগে।

ধর্মতলার বাড়ীতে ঢুকে মল্লিকা দেখলো—আশ্চর্য, উপর তলাকার দুটো ঘরে তাদের সমস্ত আসবাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ গোছানো। পাচক, দাসী এবং একটি ছোকরা চাকর তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আচার্য মহাশয় চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছেন। মল্লিকা শোবার দুটো ঘর এবং বৈঠকখানায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে তদারক করতে লাগলো। রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম—সমস্তই হাল ফ্যাশনের। লোকটার রুচি আছে বটে।

পাচক এসে দাঁড়ালো। বললে, কি রান্না হবে মা?

মল্লিকা অলক্ষ্যে একবার হরিমোহনের দিকে তাকালো। তার পর বললে, তুমি যাও ঠাকুর, আমি পরে রান্নাঘরে গিয়ে দেখছি।

সেদিনকার আহারাদির ব্যবস্থা কতদূর কি হোলো বলা কঠিন, কিন্তু মল্লিকা সারাদিনের উত্তেজনার পর ঘুমিয়ে পড়তেই হরিমোহন সারারাত পথে-হারানো শিশুর মতো কেঁদেই ভাসাতে লাগলো।

পরদিন সকালে মল্লিকা বাইরে বেরোতেই চাকর খবর দিল, ব্রাহ্মণ পাচক তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভোর রাত্রেই চ'লে গেছে।

কোনো ক্ষতি নেই—ব'লে মল্লিকা কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সে স্নান সেরে এলো। হরিমোহন ইতিমধ্যে তার পূজা অর্চনা সেরে বইপত্র নিয়ে ব'সে গেছে।

প্রথম অবস্থায় একেবারে বিপ্লব বাধালে চলবেনা। মল্লিকা স্থির করলো, তার দরকার মতো কিছু কিছু আহার্য ধর্মতলার হোটেল থেকে আনিয়ে নিলেই চলবে। চাকরটার মাইনে সে বাড়িয়ে দেবে। তারপর ধীরে সুস্থে দেখা যাক্, হরিমোহনের টিকির সঙ্গে তার আহারের সঙ্গতি থাকে কিনা। সেও কেশব মুখুজ্যের মেয়ে, ছাড়বার পাত্রী সে নয়।

হাতীবাগানে কোন এক টোলে হরিমোহন ছাত্রদের পড়াতে যায়। সপ্তাহে একদিন করে যায় ভাটপাড়ায়—সুতরাং মল্লিকার অবসর অখণ্ড, স্বাধীনতা অবাধ। এর উপর স্বামী যদি বাধ্য হয়, নিয়মানুবর্তী হয়, তবে সুখ এবং স্বস্তি দু-ই। মল্লিকা যে-হাওয়ায় মানুষ, যে-শিক্ষায় তার বিদ্যা, তাতে পুরুষকে সন্দেহ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নীতিবিদ্ হরিমোহন সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই, জ্বালা নেই। আর তার যে স্বামী—টিকি, নামাবলী, চাদর, চটি এসব বাদ দিলে অবশ্যই ভদ্রসমাজের যোগ্য। কিছু ইংরেজি শিক্ষা থাকলে অবশ্য ভালো হোতো, কিন্তু সংস্কৃতই বা কম কিসে? মেঘদূত আর শকুন্তলা আর কুমারসম্ভব আবৃত্তি সে যদি করতে বসে, তার উদাত্ত কণ্ঠে অন্তত স্নেবা-অলকার দলকে নিশ্চয়ই চমকে দেওয়া যেতে পারবে। আর ইংরেজি? মল্লিকা তার হাতখরচের জন্য দু-চারবার টুইশনি করেছে, স্বামীকে কাজ-চালানো ইংরেজি শেখাতে তার অসুবিধে হবেনা। সেদিন সে কয়েকখানা ইংরেজি রীডার নিজেই কিনে নিয়ে এলো। হায় অজ্ঞানাচার্য, তুমি নাতিকে পণ্ডিত করেছ, মানুষ করোনি!

অবসর যখন তার অখণ্ড, তখন তার বিগত কুমারী-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে বাধা কি? স্বামী যখন তার করতলগত, স্বামী যখন নিরাপদ, তখন তার মনের গতিকে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত করা অসুবিধাজনক নয়। মল্লিকা অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস কন্ফারেন্সের আগামী অধিবেশনের জন্য প্রস্তাব রচনা করতে বসলো, 'পর্দা-নিবারণী'তে খবর পাঠালো এবং ভবানীপুরের যে 'মহিলা সমাজের' আপিসে এখন আর বাতি দেবার কেউ নেই, সেই ঘরটায় নতুন আপিস বসাবার জন্য সে একদিন গিয়ে ঝাড়া-মোছার বন্দোবস্ত ক'রে এলো। বিয়ের পর যে-মেয়েরা আল্মারীতে বইপত্র তুলে রেখে কেবল মাত্র 'প্রসূতি-কল্যাণ' মুখস্থ করতে বসে, মল্লিকা সে-দলের মেয়ে নয়। স্বামী তার জীবনের সোপান, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। কে বলেছে, পুরুষকে খুশি করতেই মেয়েদের জন্ম? কে বলেছে, পায়ে পড়ে কান্না ছাড়া মেয়েরা আর কিছু জানে না? কে বলেছে, স্বামীর আদর্শ আর মতবাদ অনুকরণ ক'রে চলাই স্ত্রীর ধর্ম? সত্যকারের প্রতিভাকে চিনতে দেরি লাগে, সেইজন্য শক্তিশালী স্রষ্টা যখন জন্মায়, সমসাময়িক কাল তাকে বিদ্রূপ করে, গালাগালি দেয়। প্রতিভার পথ চিরকালই কণ্টকাকীর্ণ।

মল্লিকার অনেক কাজ। বিয়ের পরে তাকে অহেতুক অবরোধ করা হয়েছিল। অপরাধ ছিলনা, শাস্তি ছিল। তার আধুনিক শিক্ষা, প্রগতিবাদী মন, তার কষ্টার্জিত বিদ্যা—সবগুলিকে অবমাননায় উপেক্ষা করাই ছিল তার শ্বশুরবাড়ীর কাজ। স্ত্রীলোককে ওরা মানুষ বলেনি, বলেছে দেবী—কারণ পদদলিত হয়েও তারা মার্জনা করবে এই সুবিধা। দেবীর সিংহাসনে বসিয়ে তাকে চলৎশক্তিহীন ক'রে রাখলে সম্ভোগ-চক্রান্তের তৃপ্তি! পুরুষ লেলিয়ে দিয়ে তাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে তার ধাত্রীবিদ্যাকে কাজে লাগানো যায়! ধন্য, হে রক্ষক!

একদিন সন্ধ্যার পর কোথা থেকে ঘুরে এসে মল্লিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই যে, কখন্ এলে তুমি? সন্ধ্যাহ্নিক সেরেছ?

হরিমোহন বললে, হ্যাঁ। বেড়িয়ে এলে বুঝি?

না গো, বেড়াবার সময় নেই, অনেক কাজ। তোমাকে একটা খবর দিই। আসছে সতেরোই তারিখে আমার এখানে মহিলা-সমাজের একটা জরুরী সভা—অবশ্য রাত্রের দিকে। সেদিন ডিনারের ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার যে ভয় করে!

শান্তকণ্ঠে হরিমোহন বললে, ভয় কেন?

তুমি যা জবু-থবু, লোকে না নিন্দে করে।

কি করতে হবে বলো?

করতে কিছুই হবেনা, কেবল আমি যা বলবো তাই শুনবে। শুনবে ত?

আমি ত কখনো তোমার অবাধ্য হইনি, বৌ।

আবার বৌ! একটুও স্মরণশক্তি যদি তোমার থাকে! বলো, বৌরাণী!—সহাস্য তিরস্কারে আর বিলোল চাহনিতে মল্লিকা পুরুষের আসক্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলো।

হরিমোহন বললে, বলো তোমার কি হুকুম, বৌরাণী!

মল্লিকা তার পাশে এসে বসলো। আজ হরিমোহনের মুখের উপরে বিষাদের কোনো রেখা নেই, কেমন যেন নির্মল প্রসন্নতা। প্রসাধন সে কখনো করেনি, আয়নায় সে কখনো মুখ দেখেনি, সে স্বল্পাহারী ও ধার্মিক—কিন্তু আজ মল্লিকা ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো—ঘন পেশীসন্নিবিষ্ট দৃঢ় চোয়াল, মুখের উপরে স্বাস্থ্যের রক্তাভা, উন্নত কপাল, আয়ত শান্ত দুটি চোখ। হরিমোহন সত্যকার রূপবান।

কাণের মুক্তোর দুল দুলিয়ে মল্লিকা স্বামীর গলা জড়িয়ে বললে, তুমি নিজের ধর্ম রক্ষাতেই ব্যস্ত রইলে; কিন্তু তুমি দেখলেনা, যে তোমার আশ্রিত, তারো আছে কিছু সাধ, কিছু বা কামনা।

কথাটা খুবই সত্য। আচার্য ব'লে দিয়েছিলেন, স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবে না, কর্তব্য ভুলবেনা। স্ত্রী সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী। মল্লিকা এবাড়ীতে আসার পর থেকে হরিমোহন মনে মনে তার প্রতি বিরক্তিবোধ করেছে। সে তার আজীবনের আত্মীয়বন্ধন ছিন্ন ক'রে এক নারীর হঠকারিতায় ঘর ছেড়ে এলো, এই অদ্ভুত অন্ধতার জন্য কয়েকদিন অবধি, সত্য বলতে কি, মল্লিকাকে সে ঘৃণা করেছে। কিন্তু এর ত কোনো কারণ নেই, স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার জন্যই ত মল্লিকা ছেড়ে এলো সব। হরিমোহন আজ স্ত্রীর আলিঙ্গনে নূতন আস্বাদ পেলো। চোখ ভ'রে তার নেশা লাগলো।

মৃদুকণ্ঠে সে বললে, অনেক রকমের ভুল আমার ঘ'টে গেছে, আমি তার জন্যে লজ্জিত! এবার তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

কথা দিচ্ছ?

হ্যাঁ।

আমি যদি তোমার চাল-চলন আর খাওয়া দাওয়ার চেহারা বদ্‌লাতে চাই?

স্পন্দিত নিশ্বাসে হরিমোহন বললে, আমিষ?

স্বামীর গলায় জড়ানো হাতখানায় আর একটু জোর দিয়ে মল্লিকা বললে, যদি ধরো তাই হয়?

তুমি তাতে সুখী হবে?

আমি সুখী হবার চেয়ে তুমি এ-কালের যোগ্য হবে, সে-ই আমার আনন্দ। আমি ভাসতে চাই তোমাকে নিয়ে। এযুগের নেশায় আচ্ছন্ন হ'তে চাই। তোমাকে আমি অনেক শেখাবো।

হরিমোহন চুপ ক'রে রইলো। মল্লিকা তার গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে যাবার পর তার চমক ভাঙলো, কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। এই নারীর সান্নিধ্য যেন ভাঙনের সুরে ভরা—কাছে এলে সন্ত্রস্ত, সতর্ক থাকতে হয়। কি যে সে বলতে চায়, জানা কঠিন। কিসে খুশি হয় তাও অজ্ঞাত। কিন্তু তার দুরন্ত গতির সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে

না চলতে পারলে তাকে যেন হারাতে হবে। ভালোবাসা বড় নয়, সংসারধর্ম প্রয়োজন নয়—কেবল একটা দুর্বার গতি, একটা অন্ধ ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা, অকূলের দিকে অজানায় ভেসে চলা। এ মেয়ে কাছে এলে সব ভুলিয়ে দেয়। তার আক্রমণ থেকে নিজের দুর্গ রক্ষা ক'রে থাকা বড় কঠিন।

ধর্মতলার ধারে বাসা বাঁধলে কল্‌কাতা নগরকে হুকুমের মধ্যে পাওয়া যায়। মল্লিকার বাড়ীর নিচের তলায় নানাবিধ বিপনি বেসাতি। হরিমোহনকে সেদিন সঙ্গে নিয়ে সে এক 'সেলুনে' গিয়ে উঠলো। অভিজাত নাপিত কাঁচি হাতে নিয়ে তাদের বসতে জায়গা দিল। মল্লিকা বললে, এঁর চুলটা কেটে দাও ভালো ক'রে। ক্লিপ্ লাগিয়ো সাবধানে,—নিউ আমেরিকান্ কাট্ হবে।

বড় একখানা আয়নার সামনে চেয়ারে হরিমোহন বসলো। দোকানের অদ্ভুত সাজ আসবাব। নাপিতের কাছে সে মাথা পেতে দিল। নাপিত হরিমোহনের টিকির দিকে মল্লিকার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে, এটা?

ওটা কেটে দাও।

নাপিত তার কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। মল্লিকা সকাল বেলাকার সংবাদপত্র নিয়ে ব'সে রইলো দোকানের এক পাশে।

সমস্ত সকালটা সেদিন মল্লিকার বিশ্রাম রইলো না। এগারোটার পর স্বামী-স্ত্রীতে যখন ফিরলো, তাদের সঙ্গে মুটের মাথায় একরাশি জিনিসপত্র। তিনজোড়া জুতো, তার সঙ্গে মোজা। থান পাঁচেক শান্তিপুরের ধুতি। অছেল মোল্লার দোকান থেকে কেনা হরিমোহনের জন্য ট্রাউজার, গেঞ্জি, শার্ট, কোট, নেকটাই—কি নয়? জুয়েলারের দোকান থেকে সোনার বোতাম। হগমার্কেট থেকে আইভরি সিগারেট কেস। মণিহারি থেকে সুগন্ধী সম্ভার।

সতেরোই তারিখের বিলম্ব বেশি নেই। স্বামীকে ভদ্র-সমাজের উপযোগী ক'রে তোলার জন্য মল্লিকা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে লাগলো। মল্লিকাকে যারা জানে তারা স্বীকার করবে, বহু বিষয়ে সে অভিজ্ঞ। কেবল মাত্র বই মুখস্থ করা কলেজী তরুণী সে নয়, ফ্যাশনেবল্ পল্লীর সব খবর সে রাখে। নাচ গান শিখিয়েছে সে বহু মেয়েকে, সে জানে ছবি আঁকতে, সূচীশিল্পে সে পারদর্শিনী। অলঙ্কার নির্বাচনে তার জুড়ি কম—মণিপুরী কাণের ঝুমকো থেকে গুজরাটি চুড়ির ডিজাইন্ তার করতলগত। জাপানী মেয়েদের পারিবারিক কুসংস্কার আর আমেরিকান্ তরুণীদের প্রণয়ালাপের বিশেষ ঢং অবধি তার কণ্ঠস্থ। প্রণয়-প্রশ্রয়িণী 'সোসায়েটি-গার্লসরা' কেমন সরল যুবকদের 'ব্ল্যাকমেল্' করে সেও তার অজানা নয়। সে জানে, এটিকেট্ শিখতে হ'লে ইংল্যাণ্ড, উপন্যাস পড়তে হ'লে ফ্রেঞ্চ, আর রাষ্ট্রব্যবস্থা জানতে হ'লে রাশ্যা। সুতরাং হরিমোহনের মতো ছাত্র তার কাছে অতি সামান্য।

সতেরোই তারিখ নিকটবর্তী। তাদের 'মহিলা সমাজের' জরুরী অধিবেশনের সংবাদ কল্‌কাতার কাগজ-গুলোতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। রবিঠাকুরের দু'লাইন ফিকে আশীর্বাদ তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ ডাকে মল্লিকার হাতে এসে পৌচেছে। আমন্ত্রণলিপি চ'লে গেছে সভ্যদের কাছে। বাঙ্গালায় মহিলা-নেতা নেই, সুতরাং মল্লিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অল্-ইণ্ডিয়া থেকে বহু নেত্রীর শুভকামনা এসেছে পত্রযোগে।

'ইংলিশ এটিকেট্' নামক বইখানা আদ্যোপান্ত মুখে মুখে অনুবাদ ক'রে মল্লিকা হরিমোহনকে শোনালো। উৎসাহ ও উদ্যম কেবল নয়—প্রাণের অজস্রতা মল্লিকার অসামান্য। দীর্ঘ সাতদিন ধ'রে সে ইংরেজি রীডারখানা হরি-মোহনকে দিয়ে মুখস্থ করালো। শেষ দিন শেষ রাত্রের দিকে ঘুমে হরিমোহনের চোখ জড়িয়ে এলেও মল্লিকা তাকে ছাড়লো না। তার স্মরণশক্তির পরীক্ষা করতে লাগলো।

—আচ্ছা বলো, আঃ ঘুমিয়োনা বলছি?—বলো, ফুল্ মানে কি?

হরিমোহন বললে, বোকা।

ডগ্ মানে কি?

কুকুর।

হাসব্যাণ্ড্ মানে কি?

চাষা!

হোলোনা, হোলোনা—ঠিক ক'রে বলো। হাস্‌ব্যাণ্ড্ মানে?

গাধা!—

আঃ কিচ্ছু মনে রাখতে পারো না তুমি। হাসব্যাণ্ড্ মানে, স্বামী। মনে থাকবে ত ? আচ্ছা, উইচ্ মানে কি ?

স্ত্রী।

মল্লিকা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, ভাগ্যিস, এখানে কেউ নেই ? সব ভুলে মেরে দিয়েছ ? উইচ্ মানে ডাইনী, ওয়াইফ্ মানে স্ত্রী। মনে থাকবে ? আচ্ছা, এবার ঘুমোতে পারো। রাত চারটে বাজে।

এর পরে সাজসজ্জা শেখানোর পালা। ভূতপূর্ব 'মহিলা-সমাজের' কল্যাণে বহু সমাজে আর পার্টিতে মল্লিকার যাতায়াত ছিল। তার মামার বিলাত যাওয়া উপলক্ষে সে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করেছিল। দেখেছে, পাশ্চাত্য সজ্জার সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল্ রং মেশালে আদর পাওয়া যায়। ফ্যাশন বস্তুটার বনেদী ভিত্তি কম, প্রগতিশীল কল্পনার সঙ্গে ওটা আসে, নতুন ধাক্কায় আবার সে মার খেয়ে পালায়। মোট কথা, দৃশ্যত আকর্ষণীয় হওয়া চাই, চলতি যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারলেই হোলো। মল্লিকা হরিমোহনকে সাহেবী পোষাকে দুরস্ত ক'রে তুললো। বাঁ হাতে কাঁটা ধরতে শেখালো, ডান হাতে চামচ। খাবার সময় প্রথম দফায় খেতে হবে সুপ—তারপরে যা কিছু। ফল-পাকড় যদি খেতে হয় তবে শেষকালে। চুমুক দিয়ে যেন সুপ খেয়ো না—মল্লিকা সতর্ক ক'রে দিল—টেবল্ স্পুন্ থাকবে, ডান হাতে খেয়ো। আচ্ছা, স্পুন্ মানে কি ?

চামচে।

মল্লিকা সোল্লাসে হেসে উঠলো—বাঃ এবার ত ঠিক হয়েছে ! এবার ঠিক পারবে তুমি। আর ভয় নেই, আমার ঠিক মুখ রক্ষে হবে। খুব সাবধান, আমার পুরুষ বন্ধুরা আসবে, তারা যেন হাসাহাসি না করে। তারা সব—

হরিমোহন বিস্মিত হয়ে বললে, পুরুষ-বন্ধু ?

হ্যাঁ, তারা সহপাঠী ছিল। তা ছাড়া দু চারজনের সঙ্গে এমনি ভাব আছে। মিটিং ভাঙলে রাত্রে ত' আর মেয়েরা একলা যেতো না—অনেকের এস্কর্ট থাকতো, অনেকের বন্ধুও থাকতো।

লোকে নিন্দে করতো না ?

লোকনিন্দে ?—হাসিমুখে মল্লিকা বললে, গ্রাহ্য করতো কে ?

পাপ মনে হোতো না ?

আ, কি যে বলো তুমি। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকলেই কি মন্দটা ভাবতে হবে ? মন্দ আছে মানুষের মনে, বাইরে সবটাই সুন্দর। এই ত বিজনের সঙ্গে আমি কতদিন কত জায়গায় বেড়িয়েছি, বলো আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে ? নীতি আর দুর্নীতির সীমারেখা কেউ টানতে পারে ? তা ছাড়া ভালোবাসা যদি হয়ই, মেয়েদের সতীত্ব কি এতই ঠুন্‌কো ? —উজ্জ্বলন্ত কটাক্ষে হরিমোহনের প্রাণের দিগন্তব্যাপী বিদ্যুদ্দাম ছুটিয়ে মল্লিকা চ'লে গেল।

বিমূঢ় হরিমোহন আতঙ্কে, অস্বস্তিতে, লজ্জায় আর অপমানে ব'সে ব'সে কাঁপতে লাগলো।

সতেরোই তারিখ সকালেও মল্লিকার ছুটি ছিল না। ছুটি না থাকলেও তার আনন্দ ছিল। হরিমোহন তার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন আর বিশেষ ভয় নেই, সভাসমাজে তাকে নিয়ে অন্তত মানহানি আর ঘটবে না। আচার্যকে ধ'রে এনে আজকে যদি সে হরিমোহনের উন্নতিটা দেখাতে পারতো !

সকালবেলা উঠে চা খেয়েই মল্লিকাকে ছুটতে হোলো। ভবানীপুরের এক মাঠে প্যাণ্ডাল্ তৈরি ক'রে সেখানেই আয়োজন করা হয়েছে। মফঃস্বল থেকে বহু মহিলা-ডেলিগেট্ এসে উপস্থিত হয়েছেন। হাজার দুই টাকা চাঁদা তুলতে মল্লিকার দলকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন ক'রে মল্লিকা যখন ফিরলো, বেলা তখন বারোটা বাজে। সন্ধ্যা সাতটায় সভার উদ্বোধন। সভাপতিনী হবেন—মহীশূরের বিখ্যাত মহিলানেত্রী।

আজ তার একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের সূচনা। সভাপতিনীকে দিয়ে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে, বাঙ্গালাদেশের নেত্রীত্বের মুকুট মল্লিকা মুখুজ্যের মাথায় পরাণো হোক। বাপের বাড়ীর মুখুজ্যে পদবীটাই তা'র বহাল থাক্, বদ্‌লে দিলে নতুন নামে পরিচিত হ'তে সময় লাগবে। সমাজসেবায় আর জাতীয়তা প্রচারে বর্তমানে মল্লিকার দ্বিতীয় নেই। আজ সবসমক্ষে হরিমোহনকে স্বীকার ক'রে আসতে হবে, স্ত্রীর গৌরবে সে গৌরবান্বিত।

পাঁচটার পরে মল্লিকা নিজের হাতেই হরিমোহনকে সাজাতে বসলো। কনকচাঁপা রঙের বিলেতী ট্রাউজার

পরালো, ভিতরে শাদা রেশমের হাফ্ শার্ট, গলায় বো-নেকটাই, চোখে পাওয়ারলেস্ পাস-নে, পায়ে চকোলেট্ রঙের ফিতে বাঁধা সু। বুক-পকেটে রেশমী রুমাল দিল দু ইঞ্চি তুলে। মাথায় ব্যারিষ্টরী হ্যাট। তারপর বললে, নাম জিজ্ঞেস করলে কি বলবে মনে আছে? ব'লো, মিস্টার হ্যারি বোনারজি। চমৎকার মানিয়েছে আজ তোমাকে। চলো না, অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। ঈর্ষায় তারা জ্বলতে থাকবে, আর সেই ঈর্ষার বুকের ওপর দিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে আসবো সগৌরবে। কেমন, ভালো লাগবে না? দেখো, আমার মাথা খেয়ো না যেন।—এই ব'লে নিজে সাজগোজ করতে যাবার আগে মল্লিকা বা'র বা'র আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে হরিমোহনকে হোটেলের রান্না পেঁয়াজ-রসুন ভরা চপ, কাটলেট্, মাংস ইত্যাদি খেতে রাজি করালো। আর কিছু নয়, তার কুসংস্কার ভেঙে দিতে হবে।

যেন একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষা আসন্ন। ভয়ে ভয়ে হরিমোহন চুপ ক'রে রইলো। তার অস্থির বুকের ভিতরটা আজ সকাল থেকেই ধকধক করছিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তাকে পালন করতেই হোলো, সে সত্যবাদী।

মল্লিকা আজ পরলো গৈরিকবর্ণের খদ্দরের শাড়ী, ভিতরে রেশমী জামা—রক্তলেখাঙ্কিত। চোখে সুর্মাটানা, মুখমণ্ডল গোলাপী পরাগে মোহমদির, দুই কাণে হীরার কুণ্ডল, হাতে আলপনা ডিজাইনের কঙ্কন, ঝলকে ঝলকে মাথার রুক্ষ চুল হাওয়ায় ওড়ানো, পায়ে হীল্-তোলা লেডিস সু। বয়সের ভারে সর্বাঙ্গ কিছু আনত, ভঙ্গিটি কিছু ক্লান্তির। বাঙ্গালার নেত্রী মল্লিকা।

ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, একটি যুবক তাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানালো। বললে, আধঘণ্টা থেকে ব'সে আছি তোমার জন্যে, মল্লিকা।

মল্লিকা হাসিমুখে বললে, কেন, মিস্টার ব্যানার্জিকে দেখোনি?

দেখেছি, তিনি আমাকে বসিয়ে ওঘরে গেলেন। আঃ, অদ্ভুত মানিয়েছে আজ তোমাকে। স্প্লেণ্ডিড্!

এমন সময় প্রশান্ত গম্ভীর মুখে হরিমোহন এসে দাঁড়ালো। তখন তার গা বমি-বমি করছে। হাত বাড়িয়ে একটি ছোট চিঠি মল্লিকার হাতে দিয়ে বললে, এটা প'ড়ো এক সময়ে।

কিসের চিঠি?

কিছু না, এমনি।

আচ্ছা, পড়বো পরে। ওগো শোনো, এই আমার একটি বন্ধু, বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ—এর নাম সুব্রত সেন। আচ্ছা, বলো ত সুব্রত, ওঁকে এই পোষাকে কেমন মানায়?—মল্লিকা অধীর হয়ে উঠলো।

উচ্ছ্বসিত সুব্রত বললে, Oh, he's looking fine. কিন্তু তুমি—তুমি যে আজ এঞ্জেল, মল্লিকা? কেবল কি মিস্টার ব্যানার্জি? আজ অনেকের মাথা ঘুরে যাবে।

বমির বেগ সামলে হরিমোহন মনে মনে আওড়ালো, এঞ্জেল, এঞ্জেল মানে স্বর্গবাসিনী পরী, দেবদূত। এমন সময় নিচে ধর্মতলার রাস্তায় মোটরের শব্দ হতেই হরিমোহন ছড়িটা হাতে নিয়ে নিচে নেমে গেল। মল্লিকা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালো। আজ যেন হরিমোহনকে কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু যতই হোক, সুব্রতকে আর একটু তার সমাদর করা উচিৎ ছিল বৈ কি। সামাজিক সৌজন্যটা তাকে শেখানো হয়নি বটে।

সুব্রত বললে, উনি যাবেন না সভায়, মল্লিকা?

যাবেন বৈ কি, নতুন পোষাক পরার আনন্দে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছেন একটু। মানুষটি একটু সেকেলে, সুব্রত।

এমন সময় নিচে থেকে চাকর উঠে এলো। মল্লিকা তার বিরক্তি চেপে প্রশ্ন করলো, বাবু কোথায় গেলেন রে?

চাকর বললে, তিনি মোটরে উঠে চ'লে গেলেন।

কোথায়?

তা জানিনে, মা।

সহসা চিঠির টুকরোর কথা মনে পড়তেই মল্লিকা হাতের মুঠো থেকে চিঠি খুলে পড়তে লাগলো। সুব্রত রইলো সামনে ব'সে, সে কিছু বুঝতেই পারলো না।

"কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাকে ক্ষমা করিয়ো। আমার খোঁজ-খবর লইয়ো না। আমার সামাজিক ক্ষতি হইলেও তোমার হইবে না, এই আশা লইয়াই দূরে থাকিব।

ইতি—

হরিমোহন

আসছি সুব্রত, তুমি একটু বসো।—এই ব'লে মল্লিকা তার সকল প্রকার উত্তেজনা দমন ক'রে, নিচে নেমে গেল। কিন্তু পথে নেমে দুরন্ত অধীর উত্তেজনায় সে একখানা ট্যাক্সির সন্ধান ক'রে তার ভিতরে উঠে বসলো। বললে, চোরবাগান।

প্রতিটি মুহূর্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে নিবিড় জীবন্ত। উল্কাপিণ্ডের মতো মল্লিকা ক্ষিপ্তোন্মত্ত ক্রোধে ছুটে চললো। ওদিকে সভা উদ্বোধনের সময় আসন্ন, এদিকে তার সমগ্র জীবনকে ধ'রে ভাগ্যদেবতা একটি কঠিন মোচড় দিলেন। দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মল্লিকার মোটর চোরবাগানের আচার্যদের বাড়ীর ফটকে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ীর ভিতর থেকে ছিট্‌কে পড়লো মল্লিকা, তার পর সোজা বাগান পার হয়ে আচার্য মহাশয়ের বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়ালো। স্তম্ভিত মূঢ়ের ন্যায় দেখলো, সাহেবী পোষাক পরা হরিমোহন আচার্য মহাশয়ের কোলে মাথা রেখে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে—বিছানার চাদরের উপর একরাশি বমি। দুর্গন্ধে ঘর ভ'রে গেছে।

কঠোর কণ্ঠে মল্লিকা বললে, জানোয়ার মানুষ হয় না, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ। আমাকে তুমি ত্যাগ করবে এত বড় স্পর্ধা? ত্যাগ আমি তোমাকেই ক'রে যাবো।

হরিমোহন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, দাদু, ওকে চ'লে যেতে বলুন।

আচার্য বললেন, না হরিমোহন, তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর সকল ব্যবস্থা তোমারই হাতে।

বিদীর্ণ কণ্ঠে মল্লিকা বললে, আপনাদের হাত তুলে দেওয়া কোনো ব্যবস্থা আমি স্বীকার করবো না। কিন্তু আচার্য পরিবারকে আমি দেশের মাঝখানে অপমানে টেনে নামাবো, তবেই আমার নাম।

আশপাশে দেখতে দেখতে মল্লিকার চীৎকারে লোক জ'মে গেল। আচার্য মহাশয় হাত জোড় ক'রে মল্লিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষমা করুন নাৎ-বৌ দিদি…

ক্ষমা!—মল্লিকা চেঁচিয়ে উঠলো, আপনিই সব চেয়ে অপরাধী। নিরপরাধ একজন মেয়ের জীবনকে নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলেছেন, মনে নেই?

বিপন্ন অপমানিত আচার্য ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি চুপ করুন, ঝগড়া আমি মিটিয়ে দেবো। হরিমোহন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে।

না।—মল্লিকা তিরস্কার ক'রে বললে, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক মুছে দেবার জন্যই আমি ছুটে এসেছিলুম। ক্ষমা আমি আপনাদের করব না। আদালতে আপনাদের যেতে হবে, সেখানে গিয়ে আমার উপযুক্ত পাওনা আপনারা দিতে বাধ্য হবেন। এই চিঠি আমার কাছে রইলো।

আগুনের শিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে মল্লিকা যেমন এসেছিল, তেমনি আবার ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠে চ'লে গেল।

কলিকাতাষ্টক

শ্রীইন্দু রায়

নমো নমো নমঃ অপরূপ মম বিমাতা কলিকাতা,
গঙ্গার জল, স্নিগ্ধ শীতল, ঠাণ্ডা করিলে মাথা।

ট্রাম্-বাস্-ঘন পথে অগণন ট্যাক্সি উড়ায় ধূলি,
ধেয়ে এসে পড়ে ঘাড়ের উপরে বড় বড় লরীগুলি;

দীঘি-লেক-ধার, রেস্তোরাঁ বার, ছায়া-বাণী-নাটগেহ;
নিতুই নূতন পড়শী সুজন, কাঁর তরে কার স্নেহ?

য়্যারিষ্টোক্রাটিক বাবু সস্ত্রীক সিনেমা দেখিয়া ফিরে;—
মা'র কোল তরে ঘরে কেঁদে মরে, ঝি ভুলায় শিশুটিরে।

যন্ত্রবর্জ্জিত শিল্পবাণিজ্য কি সম্ভব?

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এসসি

পৃথিবীব্যাপী এই মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে যে যন্ত্রসভ্যতা যখন বর্ত্তমান কালের সকল অশান্তির হেতু, তখন যন্ত্রবর্জ্জন করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত কুটীরশিল্প অনুসরণ কি যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব নহে?

এই প্রশ্ন বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক মানুষের জীবনের সহিত জড়িত। সভ্যতার সংজ্ঞার্থ লইয়াই এখন সংশয় উঠিয়াছে। একদা যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতিকেই সভ্যতার বিকাশরূপে গ্রহণ করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে উহাতে মানুষের মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের বলে তুচ্ছ তৃণখণ্ড হইতে অমিত তেজ সংগ্রহ করিয়া তাহা ভ্রাতৃহননে নিয়োজিত করিয়াছে, মানব মনের সকল ছন্দের নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করিয়া স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছে। কিন্তু সুখ পায় নাই, শান্তি দূরে চলিয়া গিয়াছে, কেবল সভ্যতার স্বরচিত আবর্ত্তের মধ্যে কেন্দ্রচ্যুত নক্ষত্রের মত মানুষ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

কিন্তু ইহা হইতে নিষ্কৃতি কোথায়! যে অবতার পৃথিবীর সমস্ত জীবিত বস্তু মুছিয়া ফেলিয়া নূতন জীবিত বস্তু সৃজন করিবেন তাঁহার জন্য কি অপেক্ষা করিয়া রহিব? যদি সে কল্পনা নিরর্থক হয়, অথবা অপেক্ষা না সহে, তবে বর্ত্তমান পৃথিবী লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে কি উপায়ে যন্ত্রশিল্প বর্জ্জন করিয়া কুটীর শিল্পকে গ্রহণ করিতে পারি? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে ইহাই স্থির করিয়া লওয়া সঙ্গত যে কুটীরশিল্প কাহাকে বলে?

গান্ধিজী প্রভাবান্বিত গ্রাম-উদ্যোগ-সংঘ কাগজ তৈরী, তৈল নিষ্কাষণ, চামড়া, সাবান, মধু, গুড় ইত্যাদি কে কুটীর শিল্প বলিয়া অনুসরণ করেন। দেশীয় মাটির খেলনা, ঢাকার ঝিনুকের বোতাম, টাঙ্গাইলের তাঁতের সাড়ী, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বর্দ্ধমানের সোলা ও রাঙের সাজ, বাগমারীর ঢাকাই সাবান, উল্টাডাঙ্গার কেরোসিনের কুপী ও নারিকেলডাঙ্গার কাঁটা-পাল্লা তৈরীকে অনেকে কুটীর শিল্প আখ্যা দেন। কেহ কেহ বিদেশী সুতার লাছি হইতে গুলিসুতা ও সালফিউরিক এসিডের সাহায্যে হাঁড়িতে করিয়া নাইট্রিক এসিড তৈরীকেও কুটীর শিল্প বলিতে প্রস্তুত। এখন এই সকল বস্তুর উপাদান বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

কাগজ তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষারবস্তু ও ব্লিচিং পাউডার, তৈল নিষ্কাষণ যন্ত্রের জন্য কয়েকটি ধাতব অংশ, চামড়া পাকা করার জন্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য, সাবানের জন্য ক্ষারবস্তু (সাজিমাটি হইতে এই ক্ষার তৈরীর যন্ত্র চলিতেছে), গৃহপালিত মৌমাছির কৃত্রিম চাকের জন্য খনিজ মোম, গুড়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু বৃহৎ যন্ত্রশিল্প হইতেই উদ্ভূত। দেশীয় খেলনার রং, ঢাকার ঝিনুকের বোতাম তৈরীর যন্ত্র, উহা প্যাক করার সুতা, রাংতা ও বাক্স এবং বাক্সের লেবেল, টাঙ্গাইলের তাঁতের সাড়ীর সুতা ও প্যাটার্ণ কার্ড, কৃষ্ণনগরের পুতুলের রং, বর্দ্ধমানের সাজের রাং, ঢাকাই সাবানের ক্ষারবস্তু, কেরোসিনের কুপীর সমস্ত উপকরণ, কাঁটা-পাল্লার ধাতু সবই বৃহৎ যন্ত্রশিল্প হইতে পাওয়া যায়। লাছি সুতা ও সালফিউরিক এসিড তৈরীর যন্ত্রের মূল্য অন্তত লক্ষ টাকা।

সুতরাং যন্ত্রশিল্পবর্জ্জিত কুটীর শিল্প কোথায়? কি উপায়ে, অলক্ষে, কোন্ প্রলোভনে বা প্রয়োজনে এমনি করিয়া কুটীর শিল্পের জাতি নষ্ট হইল? নষ্ট যখন হইয়াছেই তখন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে ইহা কালধর্ম্ম। নূতনতম অভাব সৃষ্টি, তাহা পূরণের বাঞ্ছা ও তজ্জন্য চেষ্টা, বাস্তব-জীবন অনুসরণকারী মানুষের পক্ষে ইহাই তাহার জীবন। সেই স্বাভাবিক পরিণতির সূত্র ধরিয়াই কুটীর শিল্প ও যন্ত্রশিল্প অজাঙ্গি-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বাস্তব জীবনে ও শিল্পক্ষেত্রে বস্তুতই কুটীর শিল্পের যন্ত্রশিল্প বর্জ্জিত কোন পৃথক সত্ত্বা নাই।

তবে কোন উপায়ে এই দ্বিবিধ শিল্পের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা যাইবে? আমাদের মনে হয় যে, যে কারণে আধুনিক মানুষ যন্ত্রশিল্পকে বর্জ্জন করিয়া কুটীর শিল্পের পক্ষপাতী হইতে চাহিতেছে তাহাতে কুটীর শিল্পের নূতনতম সংজ্ঞার্থ হওয়া আবশ্যক। এই সংজ্ঞার্থ এইরূপ যে, যে শিল্পে বহু শ্রমিক ও বহু অর্থ নিয়োজিত নহে এবং বহু দ্রব্য যন্ত্রবলে প্রস্তুত হইতেছে না তাহাই কুটীর শিল্প। এইরূপ দ্রব্য যে শিল্পীর স্বকীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের উপরই অনেকখানি নির্ভর করিবে তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই সব বস্তু ক্রেতাসাধারণের পণ্য হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন নাও করিতে পারে। উহা পটুয়া বা শিল্পীর রচনা হইলে (as an work of art) অপেক্ষাকৃত কম ক্রেতার পণ্য হইবে মাত্র। উহা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে উহার প্রচলন প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে অতীব কঠিন। দুই চারিজনের পরিবারের রান্নাবান্না যেমন তেমন করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ যজ্ঞে লাগে বৃহৎ ব্যবস্থা (organisation)। ঠিক তেমনি অল্প পরিসর বিচ্ছিন্ন স্থানে (যেমন সভ্যতার আদিযুগে ছিল) কুটীর শিল্পই প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সংযুক্ত হইয়া ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশে পরিণত হইলে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যবসায়িক ব্যবস্থাই (organisation) যে প্রয়োজন তাহাতে আর সংশয় কি

আসন্ন প্রশ্নের আলোচনা লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি তাহার একাংশের সমস্যা এই যে, যন্ত্রকে যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করিতে না পারা যায় তবে কি যন্ত্রপূর্ব্বযুগে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব? সাধারণ জীবন যাপনের (plain living and high thinking) গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া একটা আলোচনা, লেখা ও অনুশীলন একদা এই জগতে প্রচলিত ছিল। সে আলোচনা এখন কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু যেমন খেলার নূতন পুতুল ভাঙিয়া তখনি আবার নূতনতর পুতুল খোঁজে, তেমনি করিয়া প্রকৃতির বড় শিশু এই মানুষ নূতনতর খেলার সামগ্রীতে এখন মন সমর্পণ করিয়াছে। এই খেলা অনুসরণ করিয়াই মানুষ যন্ত্রপূর্ব্বযুগ হইতে যন্ত্রযুগে আসিয়াছে। আবার এই খেলা অনুসরণ করিয়াই মানুষ আধুনিক যন্ত্রযুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে।

উল্লিখিত কল্পনাবিলাসী বাক্য ছাড়িয়া দিয়া উহাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক্। যন্ত্রসভ্যতার মাপকাঠিতে ভারত পশ্চাতে এবং যুদ্ধরত দেশগুলি উহাতে অগ্রবর্ত্তী। যুদ্ধশেষে ইহারা যন্ত্র লইয়া কি করিবেন, পরিত্যাগ করিবেন—কিম্বা অধিকতর যত্ন করিবেন ভবিষ্যত তাহা নির্ণয় করিবে। তাহাদের মত আমরা যন্ত্রের শিক্ষা বা শাসন ততখানি মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিব না। তবু আমরা কি যুদ্ধরত দেশগুলির অনুসরণ করিব? ইচ্ছা করিলেও সর্বতোভাবে তাহাদের অনুসরণ আমরা করিতে পারিব না। সুতরাং এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিলে ক্ষতি নাই।

কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র যুবক সম্প্রদায়ের বৃত্তিহীনতা দারুণ ক্ষতি ও অসহনীয় অপচয়। পৃথিবীর অন্যান্য যন্ত্রশিল্পী ও জাতির সহিত সম্পর্কযুক্ত এই ভারতে যন্ত্রশিল্প ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য কি এত অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারে? গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব, তৎফলে সমাজ বন্ধনের শিথিলতা এবং অফুরন্ত অবসরের জুগুপ্সিতা সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করিতেছে। কর্ম্মীর দেহ, মন ও অনুভূতি অন্তর্হিত হইয়া অতি ধীরে, গোপনে ভারতবাসীর কর্ম্মশক্তি ও চরিত্র তমসায় আচ্ছন্ন হইতেছে। নানা প্রশ্ন ও বিচিত্র সমস্যায় আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, মন উদ্‌ভ্রান্ত এবং দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়। আমরা আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচাইব। এজন্য বিদেশের স্বার্থে স্বার্থান্বিত রাজশক্তির প্রভাব বর্জ্জিত স্বাধীনতাই যে আমাদের অত্যাবশ্যক তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বস্তুত যন্ত্রসৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের প্রতি আমাদের বিরূপতা নহে। আমাদের বিরূপতা যন্ত্রশিল্পীদের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থলোভের বিরুদ্ধে। এই লোভ শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ে যন্ত্রশিল্পহীন দেশগুলির ধন, কর্ম্মশক্তি ও চারিত্রিক বল হরণ করিয়া লয় এবং দৃষ্টি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সুতরাং যে সকল দেশে যন্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করে নাই এবং বিদেশীয় লোলুপতা রোধ করিতে অসমর্থ সে সকল দেশ পরোক্ষে মানব সভ্যতার অনিষ্টই করিতেছে।

"অত্যাচার যে করে আর অত্যাচার যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এই যুক্তি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে এদেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার অচিরে আবশ্যক এবং তজ্জন্য অতিপ্রয়োজনীয় রাজশক্তির রশ্মি আমাদিগকে অতি সত্বর স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

সকল দিক হইতে বিচার করিয়া ক্ষমতাশীল প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট উপরোক্ত যুক্তি প্রতিভাত হইলে এবং আত্মস্বার্থ, দলের স্বার্থ ও মতবাদের স্বার্থ সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া সকলে সম্মিলিত হইলে জনচেতনার দৃঢ়তায় শৃঙ্খল মোচিত হইবে। অন্যথা দেশের নিয়ন্তৃগণ তমসাবৃত দৃষ্টিতে দেখিয়া এমন সকল আইন ও ব্যবস্থা রচনায়ই সময়, বুদ্ধি, অর্থ ও উৎসাহ ব্যয় করিবেন যদ্দ্বারা বিদেশী যন্ত্রশিল্পীর লোলুপ স্বার্থ কিছুমাত্র স্পর্শিত না হয়।

বস্তুত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এদেশের বিদেশী শাসকগণ এমন সকল রকম আইন গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত যাহা তাঁহাদের স্বার্থকে স্পর্শ করে না। এই ভাবে আমাদের দেশের লোকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্ট হওয়াতে যে আত্মবিরোধ উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের তথা মানব সভ্যতার অন্তরায়। বাহ্যিক মনোহর-দর্শন এই মুখোস খুলিয়া আমরা সকলে সভ্যতার এই নগ্ন-বীভৎসতা যেন চিনিতে পারি।

অগোচর

(গান)

শ্রীপ্রভাতসমীর রায়

চোখে তোমার পাই না দেখা,
ঘুমিয়ে থাকো বুকের তলে।
দিই না সাড়া তোমার ডাকে
শুনি তবু পলে পলে।

ভোরের আলোয় তোমার ছবি
নিত্য আঁকে অরুণ রবি,
বেলা-শেষে জাগে বনে
সবুজ শোভা ফুলে ফলে
দিই না সাড়া তোমার ডাকে
শুনি তবু পলে পলে।

দিন ফুরালে ধূসর সাঁঝে
তোমার প্রেমের বাঁশি বাজে
হাসির মাঝে পাই না তোমায়
পাব বুঝি চোখের জলে!

অন্তঃশীলা

(গান)

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

অশ্রু আমার গোপন গতির
নদীর নীরব লীলায় চলে।
নয়ন শাখের ফুল ঝরে মোর
একলা মায়ের পায়ের তলে।

ব্যথার সিন্ধু তলে মগন
রতন হ'ল আঁখি যখন
বিন্দু বিন্দু সলিলে তার
তখন অমল মুক্তা ফলে
সেই মুকুতার মালায় মায়ের
অর্ঘ সাজাই পলে পলে

কাঁদন আমার মায়ের কোলের
বাঁধনহারা পরশ পেয়ে
সুদূর নীলে মিলিয়ে যাওয়া
পাখির মতন উঠল গেয়ে।

কাল-ভোলা মোর কান্নাধারায়
দিন-রজনী কখন হারায়
সূর্য তারা কখন ওঠে
কখন যে যায় অস্তাচলে!

সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীদিলীপকুমার রায়

একতালা

০ ১ + ৩ ০ ১

II রা মরা মা | পা র্সণা র্সা | ণদা ণদা পা | দা পদা ক্ষপা | মগা পমা দপা | ণদা ণপা দমা

চো খে - তো মা র পা ই না দে খা - ঘু মি য়ে থা - কো

অ - শ্রু আ মা র গো প ন গ তি র ন দী র নী র ব

\+ ৩ II

ক্ষা মগা মা | গঋা গঋা সা | সা ন্‌া ঋসা | ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা রা গা | মা পদা ক্ষপা

বু কে র ত - লে দিই - না সা - ড়া তো মা র ডা কে -

লী লা য় চ - লে ন য় ন শা - খের ফু ল ঝ রে যা য়

পা র্সণা র্সদা | পা মজ্ঞা মসা | র্ণা ণধা ণা | দা পা সা II

শু নি - ত বু - প লে - প লে -

এ ক লা মা য়ে র পা য়ে র ত লে -

মমা -া -া | -া মগা মা | পপা -া -া | -া পক্ষা পা | ণা -া ণা | -া দপা দা |

ভোরে - - র আ লোয় তোমা - - র ছ বি নি - ত্য - আঁ কে

ব্যথা - - র সিন্ ধু তলে - - - ম গন র ত - ন হো লো

পমা পা ক্ষপা | ক্ষপা মগা মা | মা ধা -া | মধা ণর্রা র্সা | ণধা র্সণা র্সণা | দপা ণদা ণদা |

অ রু ণ্ - র বি বে লা - শে - যে জা - গে ব নে -

আঁ খি - - য খন বি ন্ দু বিন্ - দু স লি - লে তা র

পমা পা ক্ষপা | গমা পণা দা | র্সণা দপা মপা | ণদা পমা গমা | গমা পদা পা | পদা ণর্সা ণা |

স বু জ শো - ভা ফু - লে ফ - লে দিই - না সা - ড়া

ত খ ন অ - মল মুক্ - তা ফ - লে সেই - মু কু - তার

র্রা র্সণা ধণা | র্সা ণদা পমা | গা পমা পমা | মা ণদা ণদা | পা মগা মগা | মা গঋা গসা |

তো মা ০র ডা কে - শু নি - ত বু - প লে - প লে -

মা লা ০য় মা য়ে ০র অ র্ ঘ সা জা ই প লে - প লে -

পা দা ণা | পা ণা ণা | পা র্সা -া | ঋর্া র্সা -া | জ্ঞর্া র্রা -া | র্সণা ধা ণা |

দি ন ফু রা - লে ধূ স র সাঁ ঝে - তো মা র প্রে - মের

কা ল ভো লা মো র কা ন্ না ধা রা য় দি ন র জ - নী

র্রা র্সা -া | ণদা পা দা | মা ধা -া | ণা -া র্সা | র্রা -া ণা | দা -া পা |

বাঁ শি - বা - জে হা সি র মা - ঝে পা ই না তো - মায়

ক থ ন হা - রায় সু র য তা - রা ক থ ন ও - ঠে

ণা -া দা | পা -া মা | পা গা মা | গঋা গপা মা | গমা পদা পা | পর্দা ণর্সা ণা |
পা - ব বু - ঝি চো খে র জ - লে দিই - না সা - ড়া
ক থ ন যে - যায় অ স্ তা চ - লে আ - মার জী - বন

র্রা র্সণা ধণা | র্সা ণদা পমা | গা পমা পমা | মা ণদা ণদা | পা মগা মগা | মা গঋা ঋসা I
তো মা ০র ডা কে - শু নি - ত বু - ঝ - লে - প - লে
ম র ০ণ ডু বা ই আ মা র চো খে র গ ভী র জ - লে

দা পা -া | মগা -া মা | সা গরা গা | -া পা মা | মা ধা দধা | দধণা ণা ণা |
কাঁ দ ন আ - মার মা য়ে - র কো লের বাঁ ধ - ০০ন হা রা

ধা দধা দধা | ণধপা মগা মা | মা ধা -া | ণা র্রা র্সা | ণা ধা র্সণা | দা পা দমা |
প র - - ০০শ পে য়ে সু দূ র নী - লে মি লি য়ে যা ও য়া

পা মগা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা | সা ণা ণা | ণদা ণদা পা |
পা খি র ম - তন উ ঠ ল গে - য়ে

শ্রীমান প্রভাত সমীরের গানটিতে ভৈরবী জৌনপুরি ও বাগেশ্রীর তানাদি লাগানো চলবে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে। কবি নিশিকান্ত এ গানটির সুর শুনে একটি গান বাঁধেন সেটিও দেওয়া হ'ল—ঐ সুরেই গাওয়া চলবে, কেবল মাঝে চারটি নতুন চরণ জুড়ে দিয়েছেন তিনি তার, স্বরলিপি শেষে দেওয়া হ'ল আলাদা ক'রে। ইতি শ্রীদিলীপকুমার রায়।

ভুলের জীবন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কাজ নেই আজ হাতে
অবসর পেয়ে স্মৃতিগুলি জাগে মানসের আঁখিপাতে।
আজি সন্ধ্যায় ব'সে ব'সে ভাবি গত জীবনের কথা,
যতদূর আঁখি যায় তত দেখি ব্যর্থতা, ব্যর্থতা!
ভুলে ভুলে সারা জীবন শাহারা ক'রে ওঠে হাহাকার,
ফুলে ফুলে ওঠে উষ্ণ বাতাসে বুকখানি বারবার।
শৈশবে ভুল করিয়া ভুগেছি যৌবনে অভিশাপ,
অলকার ভুলে রামগিরিশিরে করিয়াছি অনুতাপ।
যৌবনে পুন ঘুরিয়া মরেছি নূতন নূতন ভুলে,
ভ'রে গেল শির ভুল ঘোরে মোর ভোলার ধুতুরা ফুলে।
এমনি করিয়া কাটিয়া যাইল আয়ুর অর্দ্ধশত,
আজি ভোলানাথে শুধাই কেবল এ ভুল করিব কত?
ভুলে ভুলে ঠেকে ঠেকে,
শুনি লোকে কয়, সাবধান হয় কতই না তারা শেখে।

কোন্ অভিশাপ শিরে ধরি পাপ জনম লভেছি আমি,
ভ্রমের ভূধর হইতে চেতনা-ধারাটি এলো না নামি'।
একভুল হ'তে জনমে হাজার রক্তবীজের মত,
যত বাড়ে কাজ, তত পাই লাজ, ভুল বেড়ে যায় তত।
আজি সন্ধ্যায় বসি,
ভাবি এ জীবনে ভুলের কারণে, আর কেহ নয় দোষী।
ভুল ধারণায় অভ্যাস বশে মিছে দূষি বিধাতায়।
আপনারে আজি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিতে সাধ যায়।
আজি ভাবি হায় ভুল ক'রে মিছে পরেরে দিয়াছি দোষ,
কারো'পরে আজ নাই অভিযোগ; কারো প্রতি নাই রোষ।
সবার নিকটে আজি এ জীবন বার বার ক্ষমা চায়,
ধিক্কৃত প্রাণ ধূলায় লুটায় আজি এই সন্ধ্যায়।
শত ব্যথা তাপ সকল দণ্ড এ শিরে আসুক নামি!
সকলি সহিব, নহি বিধাতার ক্ষমার পাত্র আমি।

আজি সন্ধ্যায় ভাবি
স্বখাত সলিলে ডুবিলে নেইক রেহাই পাওয়ার দাবি।

স্বাধীন বৈষ্ণবরাজ্য মণিপুর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেতরের যাযাবর চঞ্চল হোয়ে উঠল। কর্ম্মমুখর সহরে আবহাওয়ায় তার শ্বাসরোধের উপক্রম হোয়েছিল, তাই সভ্যতার বাঁধন ছিঁড়ে প্রকৃতির শ্যামল কোলে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য সে অস্থির হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু সভ্য কর্ম্মী তার লাভ-লোকসানের খাতা সামনে ফেলে পথরোধ কোরে দাঁড়াল। শেষে রফা হোল লম্বা নয়—ছোট্ট ছুটী।

বন্ধু একদিন ঠাট্টা কোরে বোলেছিল "Himalayas in and across ত লিখেছ, কিন্তু মণিপুর গেছ?"

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কোরেছিলুম "না"

"কেন আসামের পর্ব্বতমালা কি হিমালয়ের সামিল নয়? মণিপুরের এত নাম শোনা যায়, এ নাকি দ্বিতীয় কাশ্মীর; এখানে যাও নি, আর হিমালয় ভ্রমণের দম্ভ"। খোঁচাটা মনে বিঁধেছিল। তাছাড়া সম্প্রতি নানাভাবে মণিপুরের নিপুণ নৃত্যকলা ও সংস্কৃতির যে সব আলোচনা চোলেছে, তাতে প্রথমেই মন মণিপুরের দিকে আকৃষ্ট হ'ল।

মণিপুর রোড রেল স্টেশন থেকে ১৩৩½ মাইল পাহাড় ভেঙ্গে বাসে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল পৌছুতে হয়। কোলকাতা থেকে ই. বি. আর-এর পাণ্ডু স্টেশন হোয়ে মণিপুর রোড পৌছন যায়, আবার এ. বি. আর-এর আখাউরা স্টেশন থেকে লামডিং পর্য্যন্ত যে পার্ব্বত্য রেলপথ গিয়েছে সেখান দিয়েও যাওয়া যায়। এই পার্ব্বত্য পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সুন্দর বোলে এই পথটাই বেছে নিলাম। আমি ও বন্ধু বেণু জুলাই (১৯৪০) মাসে যাত্রা কোরলাম।

যাঁরা পথ না হেঁটে আরামে পার্ব্বত্য দৃশ্য উপভোগ কোরতে চান তাঁদিগকে এই শৈলপথটুকু বেড়াতে অনুরোধ করি। চন্দ্রনাথপুর থেকে লাংটিং পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৭৮ মাইল রেলপথ পাহাড়ের বেড়াজালের মধ্যে এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে চোলেছে—কখনও পাহাড় ভেদ কোরে, কখনও পাহাড়ের কোলে কোলে, কোথায় খরস্রোতস্বিনীর বুকের ওপর দিয়ে। দুধারে নিবিড় জঙ্গল, বর্ষায় তার ভেতরে সত্যিই রৌদ্র মাথা গলাতে পারে না, সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোথাও দুধারে খাড়া পাহাড় উঁচু হোয়ে দাঁড়িয়ে, মনে হয়, হয়ত এখুনি হুড়মুড় কোরে গাড়ীখানা পিষে ফেলবে। এই দীর্ঘ পথের দুধারের ঘন জঙ্গল শ্বাপদসঙ্কুল। বাঘের সংখ্যা এখানে বেশ, তবে আসামের জঙ্গলের বাঘ মানুষ-খেকো নয়, কিন্তু সুবিধামত পেলে বৈরাগ্য নেই। এই জঙ্গলে সব চেয়ে ভয়ের জিনিষ হাতী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দলবদ্ধ হাতী লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ট্রেণের গতিরোধ কোরেছে, মাঝে মাঝে স্টেশনের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে, ট্রেণের পেছনের লাল আলো শুঁড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। হাতীর উৎপাতের জন্যই এদিকে লাইনের পাশের দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্নগুলির গায়ে লোহার কাঁটা দেওয়া, যাতে শুঁড় দিয়ে সহজে না তুলে ফেলতে পারে। এই সব জঙ্গলের মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে নাগা'দের বস্তী। এরা স্টেশন বা নীচের বাজার থেকে দলবদ্ধভাবে নিজেদের গ্রামে যাওয়া আসা করে, আত্মরক্ষার জন্য ধারাল অস্ত্র কাছে রাখে—আর পর্য্যায়ক্রমে "হুম হুম" কোরে একরকম শব্দ কোরতে কোরতে চলে, যাতে বাঘও ওদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না; ওরাও বাঘকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু পাহাড়ী সরু রাস্তার সামনে হাতী দাঁড়ালেই এরা প্রমাদ গণে। নিজেদের দল বা হাতীয়ার সবই হাতীর কাছে অকেজো, এরা তখন হাঁটু গেড়ে করজোড়ে হাতীরূপী গণেশ দেবতাকে স্তবস্তুতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতে হাতী নাকি পথ ছেড়ে দেয়, কারণ হাতী স্তুতি বা গালাগাল অতি সহজে বুঝতে পারে। গুণ্ডা হাতীগুলো অবশ্য গুণ্ডামীই ভাল বোঝে। মাঝখানে সর্ব্বাঙ্গ কালো এক রকমের হনুমান দেখলাম। কয়েকটা জায়গায় লাইন এমন এঁকে বেঁকে গেছে যে, যে স্টেশন পাহাড়ের ওপরে বা নীচে পেছনে ফেলে এল, আবার ঘুরে সেখানেই এসে গাড়ী দাঁড়াল। এত সর্পিলগতিতে রেলপথ এই দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম কোরেছে যে অধিকাংশ জায়গাতেই গাড়ীর পেছনে বোসলে বাঁকের পারে সামনের ইঞ্জিন

দেখা যায় না। ভারতের পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়ের সঙ্গে পূর্ব্ব প্রান্তের এই পাহাড়গুলির বিচিত্র বৈষম্য। পশ্চিমের পাহাড়গুলি তাদের কোলের অধিবাসীদের মতই নিষ্করুণ, রুক্ষ, রসলেশহীন, উন্নতবপু, আর পূর্ব্বের পাহাড়গুলি লোকগুলির মতই সরস, অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, এদের তরুলতার আচ্ছাদনে যেন সংসারের মায়া জড়ান, জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল, অতিথিবৎসল।

সারাদিন রাত্রি ট্রেণে বনজঙ্গল পাহাড়পর্ব্বতের মাঝ দিয়ে ৩৭টা সুড়ঙ্গ ফুঁড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পরদিন বেলা প্রায় ১১॥০টায় গাড়ী লামডিং জংসনে পৌছল। এই সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা সুড়ঙ্গটীর (২২ নম্বর) দৈর্ঘ্য ১৯০০ ফিট। লামডিং থেকে গাড়ী বদল কোরে বেলা প্রায় তিনটের সময় মণিপুর রোড পৌছলাম। স্টেশনটার নাম মণিপুর রোড, কিন্তু আসলে জায়গাটার নাম ডিমাপুর। এটা একটা ছোট ব্যবসাকেন্দ্র। যখন মণিপুর থেকে চাল, লঙ্কা প্রভৃতি রপ্তানী হয় তখন জায়গাটা একটু কর্ম্মচঞ্চল হোয়ে ওঠে, এখন যেন নির্জীব। কয়েকটা দোকান আছে, অধিকাংশই মাড়োয়ারীর; মাত্র দুএকটী ছোট্ট বাঙ্গালীর দোকান আছে। মাড়োয়ারী ও মণিপুরী হোটেল আছে, তবে তা খুব উঁচু ধরণের নয়। এখানে ডাক্তারখানা, থানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ডাকবাংলা আছে; স্টেশনে কেলনারের একটা অচল ষ্টল আছে। আমরা ডাকবাংলায় উঠলাম। দক্ষিণা বেশ—মাথা পিছু চব্বিশ ঘণ্টায় দেড় টাকা, (বিবাহিত যুগলের জন্য একজনেরই ভাড়া দিতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বেরসিক নন!); ছাপা ফর্দ্দমত এক পেয়ালা চায়ের দাম চার আনা। একজনের একদিনের থাকা খাওয়া অন্ততঃ পাচ টাকা। তবে থাকা ও খাওয়া দুয়েরই বন্দোবস্ত চমৎকার। বিছানা মশারী ডাকবংলা থেকে দেবার ব্যবস্থা আছে। ডিমাপুরের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়, খুব ম্যালেরিয়া—মশাগুলি সংখ্যাতে যেমন, অভদ্রও তেমনি। এদের উৎপাতে সন্ধ্যার পর বাইরে বোসে থাকা দুষ্কর। এখানেই থানায় গিয়ে পূর্ব্বে পলিটিক্যাল এজেন্টের ছাড় নেওয়া থাকলে সেটা পাল্টে একটা ছাড়পত্র নিতে হয়, আর যারা পূর্ব্ব থেকে ছাড়পত্র জোগাড় করেন নাই, তাঁদিগকে এখানে আবেদন কোরতে হয়। উত্তরের খরচ দিয়ে তার কোরলে চব্বিশ ঘন্টায় ছাড়পত্র আসে। পূর্ব্বে মণিপুর থেকে এখানে দৈনিক ৭০ থেকে ১০০ খানা মাল-বোঝাই লরি মাল নিয়ে রোজ যাওয়া আসা কোরত। এখন ৭।৮ খানি মাত্র আসে, তাও সব সময় মাল পায় না।

ডিমাপুরের থানায় মাথা পিছু আট আনা হিসেবে দিয়ে পাশপোর্ট নিলাম। এই আট আনা বৃটিশ সরকারের প্রাপ্য। মণিপুর যাবার বাসভাড়া বাঁধাধরা কিছু নেই, একটাকা থেকে আড়াই টাকা (কখনও ৫।৬ টাকাও) —যার কাছে যেমন পারে নেয়। ফেরার ভাড়া প্রায় অর্দ্ধেক, কারণ মাল নেবার জন্যে বাসকে ডিমাপুর আসতেই হয়, কাজেই যা যাত্রী পাওয়া যায় তাই লাভ। ১৩৩½ মাইল পাহাড়ী পথের পক্ষে এই ভাড়া বেশ কম।

সকাল ৭॥০টায় বাস ছাড়ল। দুধারে বেশ ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ও উপরে বাঘ দেখা যায়,

ইম্ফালের প্রধান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়

ড্রাইভার গল্প কোরলে। জঙ্গলের ভেতরে বাঘ, হাতী, বন্যবরাহ, বন্যকুকুর প্রভৃতি যথেষ্ট আছে। কয়েক বৎসর আগে এরই কাছাকাছি হাতীর খেদা করা হোয়েছিল। ৯ মাইল সোজা সমতল পথ এসে নীচু গারোদ নামে একজায়গায় বাস দাঁড়ায়। এখানে পাশপোর্ট ও মালপত্র পরীক্ষা করে। মালপত্র তল্লাসী মাথা পিছু কর আদায়ের জন্য, অন্য উদ্দেশ্যে নয়। এর পর থেকেই পাহাড়ী রাস্তা সুরু। রাস্তা ক্রমাগত এঁকে বেঁকে পাহাড়ের বেড়াজালে মাথা গলিয়েছে। এদিকের পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ, কাজেই পাহাড়, জঙ্গল, নদী ঝর্ণা, প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যই প্রায় একত্র সন্নিবেশিত। কাশ্মীরের পথেও এমনি লম্বা পাল্লা মোটরে পাড়ি দিতে হয়, কিন্তু কাশ্মীরের পথের চেয়েও এ রাস্তা আরও সর্পিল ও শ্যামল, তাই সুন্দর। এক ফার্ম রাস্তাও

কোথাও সোজা চোখে পড়ে না। পাহাড়ের ধারে চায়ের ক্ষেত বা গ্রাম কদাচিৎ চোখে পড়ে। পথে দুএকটী বড় গ্রাম পেরিয়ে ৪৬ মাইল এসে নাগা পর্ব্বত অঞ্চলের হেডকোয়াটার্স 'কোহিমা'য় পৌছলাম, সকাল থেকেই টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়ছিল। 'কোহিমা'তে আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে পায়ের তলা দিয়ে মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগল। এর চারপাশে গ্রাম জঙ্গল মেঘের আবরণে ঢাকা ছিল, এমন কি সূর্য্যদেবও পর্দ্দানশীন হোয়ে উঠেছিলেন। কোহিমার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফিট। এখানে থাকতে গেলে পৃথক পাশ নিতে হয়, অথবা এখানে ডি. সি'র কাছে গিয়ে অনুমতি আনতে হয়; তাও শুনলাম তিন দিনের বেশী পাওয়া যায় না। এটী একটী সামরিক ঘাঁটী, তাই এই কড়া-কড়ি। এখানকার ডাকবাংলা বেশ সুন্দর। প্রত্যেক পাহাড়ী জাতির মত (কাশ্মীরী ছাড়া) নাগাদের গড়ন বেঁটে, চোখ

মহারাজার প্রেস গৃহ

কুলো কুলো, নাক থ্যাবড়া, রং অপেক্ষাকৃত ফর্সা, বলিষ্ঠ দেহ, পোষাক পরিচ্ছদ দারিদ্র্যহেতু স্বল্প ও নোংরা। বাস এখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার চোল্লো। পথ যে ক্রমাগত উঁচু হোয়েই চোলেছে তা গাড়ীর এঞ্জিনের গোঙানীতেই বোঝা যাচ্ছিল।

পথের এক ধারে উঁচু পাহাড়, অন্য ধারে গভীর খাদ; কিন্তু চলমান ঘন মেঘের জন্য খাদের দিকটা অনন্ত শূন্য বোলে মনে হোচ্ছিল। কয়েকটী বড় গ্রাম পেরিয়ে আরও ১০ মাইল এসে 'মাও' পৌছলাম। এখান থেকেই মণিপুর রাজ্যের সীমানা। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা রাস্তায় দুদিক থেকে গাড়ী যাওয়া আসা করা বিপজ্জনক, এজন্য দুদিকের গাড়ী মধ্যস্থল মাও'তে এসে দাঁড়ায়। যে গাড়ী যত আগেই এসে থাকুক, এখানকার ফটকের সামনে এসে সবার গতিরোধ হয়। ১২৷৷০টায় ফটক খোলা হয়, তখন যে যার গন্তব্য পথে যায়, কিন্তু ১২৷৷০টার পর নীচু গারোদ থেকে কোন গাড়ীকে আর মণিপুর মুখে আসতে দেবে না, কিম্বা মণিপুর থেকেও কোন গাড়ীকে 'মাও' আসতে দেবে না। 'মাও' একটী বড় পাহাড়ী গ্রাম, ডাকবাংলা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। একটী মণিপুরী ও নেপালী হোটেল আছে, খাওয়া দাওয়া বিশেষ ভাল নয়। এখান থেকেই মণিপুরী মেয়ে পুরুষ চোখে পোড়তে লাগল। 'মাও'এর উচ্চতা ৫৭১২.৬ ফিট, এ পথের সর্ব্বোচ্চ জায়গা। ডিমাপুর থেকে এর দূরত্ব ৬৬ মাইল, আর এখান থেকে ইম্ফাল ৬৭½ মাইল, কাজেই এটা ঠিক মধ্যস্থল। আমাদের পাশপোর্ট এখানে একবার পরীক্ষিত হোল। এখানে একজন মণিপুরী একটা টেবিলের ওপর কয়েকটা কাঁচের ও পেতলের গেলাস সাজিয়ে চায়ের দোকান কোরেছিল, আমরা তার টেবিলের ধারে গিয়ে চা চাইতেই, সে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী কোরে "ফাঁদরে ফাঁদরে" কোরে উঠল। তার খিঁচুনী দেখে আমরা সভয়ে সরে এলাম। পরে দেখলাম তার টেবিলের তিনধারে মাটীর ওপর তিনটে বাঁশের কঞ্চি পোড়ে আছে, তার মধ্যে কারু যাওয়া নিষেধ। 'মায়াং' (বিদেশীদের) স্পর্শে জাত যাওয়ার আশঙ্কা আছে। চা খাওয়ার পর গেলাস মাটীতে নামিয়ে দিলাম, একটী ছেলে সেটী মেজে ধুয়ে নিল, ১২৷৷০টার পর বাস ছাড়ল। এর পর ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে গাড়ী নামতে লাগলো প্রায় বিনা তেলখরচেই। প্রায় ৪০ মাইল এসে 'কানকপি'তে ফটকের সামনে এসে আবার গাড়ী দাঁড়াল। এখানে গাড়ীর মালপত্র পরীক্ষিত হবার পর আবার গাড়ী ছাড়ল। এই রাস্তায় মাল চলাচলের কর বাবদ মণিপুরের মহারাজা বাৎসরিক প্রায় ৮২ হাজার টাকা পান। একজন মাড়োয়ারী মহারাজকে ঐ সেলামী দিয়ে রাস্তা বন্দোবস্ত নিয়েছে। সে আবার যাওয়া আসা মণ পিছু ।০ আনা কর আদায় করে; লাভলোকসান তার। এই রাস্তায় যত বাস চলে, তাদের কাছ থেকে ইংরেজ সরকারের P. W. D. বিভাগ বাসপিছু ২০০৲ টাকা নেন, রাস্তা মেরামতের খরচ বাবদ। মণিপুর থেকে ডিমাপুর পর্য্যন্ত যে বাসে ডাক আসে, তাও এক মাড়োয়ারী মাসিক ১২০০৲ টাকার ঠিকে নিয়েছে। এই দুর্গম পাহাড়ী রাস্তার যেখানেই

কোন বড় গ্রাম আছে সেখানেই মাড়োয়ারীর কোন না কোন ব্যবসা আছে ; বহু মাড়োয়ারী ঘরবাড়ী তৈরী কোরে এ অঞ্চলের বাসিন্দা ব'নে গিয়েছে।

'কানকপির' কিছু পরেই রাস্তা পাহাড়ের বেড়াজাল ছেড়ে সমতলে এসে পোড়ল। আশেপাশে ছোটখাট পাহাড় কিছুদূর পর্য্যন্ত চোলেছে, তার পর একবারে সমতল। দুধারে অনেকখানি সমতল অনাবাদে অকেজো হোয়ে পড়ে আছে, বসতিও নেই। এরও অনেক পরে দুধারে ধানের ক্ষেতে কচি সবুজ ধানগাছ মাথা দুলিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। ইম্ফালের প্রায় ৭ মাইল দূর থেকে জলপ্রপাতের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হোচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে বিদ্যুতের তার ও টেলিগ্রাফের তার পাশাপাশি গিয়েছে। ইম্ফাল ঢুকবার কয়েকমাইল আগে থেকে রাস্তার দুধারে কাশ্মীরের প্রধান রাস্তায় 'সফেদা' গাছের মত একরকম ঝাউ সমান্তরভাবে সোজা উঠে গেছে। বিকেল প্রায় ৫টায় বাস এসে ইম্ফাল পৌছল।

ইম্ফালে ডাকবাংলা আছে, দৈনিক থাকা খাওয়া প্রায় ৫৲ পড়ে। দুভাগ্যক্রমে ডাকবাংলা তখন ভর্ত্তি ছিল, দ্বিতীয় আশ্রয় করের হোটেল (বাঙ্গালী) এবং তৃতীয় ও শেষ আশ্রয় মাড়োয়ারীদের একটা ধর্ম্মশালা। আমরা করের হোটেলেই উঠলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন যাত্রী মণিপুরের দৈনিক খাদ্য খরচ মাত্র ছ'পয়সা বোলে লিখেছিলেন, কিন্তু গিয়ে দেখি হোটলের খরচ ১৷৷৹-এর কম নয়। অবশ্য জিনিষপত্র অনেক সস্তা, কাজেই নিজেরা রান্নার ব্যবস্থা কোরতে পারলে বোধহয় অনেক কম খরচ পড়ে। এখানকার উচ্চতা দু'হাজার ফিটের কিছু বেশী।

মণিপুর বৈষ্ণব রাজ্য। ১৫৭৭ সালে কামাখ্যা পীঠের পুনরুদ্ধারক পূর্ণানন্দ মণিপুরে তন্ত্র উপাসনা প্রচলিত করেন ; সেই সময় অদ্বৈত শাখার নরোত্তম অধিকারী সদলে মণিপুরে এসে মহারাজা চিংতোমাখোম্বাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাহার পর থেকেই বৈষ্ণবধর্ম্মই এখানকার হিন্দুদের একমাত্র ধর্ম্ম হয়ে ওঠে। নবদ্বীপ মণিপুরীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গই মণিপুরীদের আরাধ্য দেবতা ; এদের বার মাসে তের পার্ব্বণ। আরও এদের পোষাক পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার, পূজাপদ্ধতি, কীর্ত্তন সবই সাক্ষ্য দেয় বিজয়ী বাঙ্গালার। একদিন বাঙ্গালার প্রতিভা ভৌগলিক গণ্ডী ছাড়িয়ে ট্রেণ বাসের সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যে এই দুর্গম পর্ব্বতঘেরা অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হোয়েছিল, একথা মনে হোলে আজও প্রত্যেক বাঙ্গালীর আনন্দ হয়। অতীতের গৌরবময় ইতিহাস বর্ত্তমানকে প্রেরণা দেয়, ভবিষ্যতকে প্রস্তুত করে, তাই এর আলোচনা প্রয়োজন। ইম্ফাল মণিপুরের রাজধানী এবং একমাত্র সহর। এর মাঝে যে অঞ্চলটুকু ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র সেটুকু ইংরেজ সরকারের সংরক্ষিত (for Reserved area)। এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার জন্য এখানকার পলিটিক্যাল এজেন্ট সর্ব্বতোভাবে দায়ী, মহারাজার কোন দায়িত্ব নাই। এরই সংলগ্ন ইম্ফাল নদীর অপর তীরে মহারাজার এলাকায় সবই ছোট বড় গ্রাম। ইংরেজের

টেলিগ্রাফ অফিস

সংরক্ষিত এলাকার ব্যবসাদারদের আয়কর, ব্যবসার অনুমতি-পত্রের আয় মহারাজা পান, কিন্তু জমির খাজনা ইংরেজ সরকার পান। বিচার ও শাসন ব্যাপারেও কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকম জটীল দ্বৈত ব্যবস্থা আছে। ইংরেজ এলাকার বাসিন্দারা বাড়ীঘর থাকা সত্ত্বেও, নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করা—এমন কি নিজেদের একটা গাছ পর্য্যন্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের বিনা হুকুমে কাটতে পারে না। ইনি যে কোন লোককে (ইংরেজ প্রজা) প্রয়োজন হোলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মণিপুর এলাকা থেকে বহিষ্কৃত কোরতে পারেন বা আটক রাখতে পারেন অর্থাৎ পলিটিক্যাল এজেন্টই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। এখানকার শাসন

(কোন সাধারণ স্থানে) কোরতে হোলেও এঁর অনুমতি প্রয়োজন। ইম্ফালের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র 'সদর বাজার।' 'সদর বাজার' রাস্তাটী বেশ প্রশস্ত, এর দুধারে দোকানপাট; ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই মাড়োয়ারীদের করতলগত।

মহারাজার আদালত

বিস্তৃতিতে ও অনিষ্টকারিতায় এরা কচুরিপানাকেও হার মানিয়েছে। ব্যবসাকেন্দ্রের স্বচ্ছ জলে একজন মাড়োয়ারী কোনমতে মাথা গলাতে পারলে অবিলম্বে ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্তার লাভ কোরে সমস্ত কেন্দ্রটিকে ছেয়ে ফে'লে এরা স্থানীয় ব্যবসাদারদের শ্বাসরোধে কোরে ফেলে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি এবং এরই ফলে মণিপুর রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন আজ এত ব্যাপক ও শক্তিমান হোয়ে উঠেছে। সহরের একদিকে সৈন্যদের ছাউনী, তারই কাছাকাছি ডাকবাংলা, থানা, ডাকঘর, পলিটিক্যাল এজেণ্টের অফিস বাড়ী ইত্যাদি। যে রাস্তার ওপর এইগুলি সেই রাস্তাটী ঘুরে নদী পেরিয়ে মহারাজের প্রাসাদের দিকে চোলে গেছে। সমস্ত ইম্ফাল সহরটার আয়তন আন্দাজ ৪ বর্গমাইল। এখানে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর বা কোন যানবাহন পাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে ২।১টা মালবাহী গরুর গাড়ী চোখে পড়ে। সাইকেলের প্রচলন বেশ আছে, ব্যক্তিগত মোটরের সংখ্যা খুব কম। সংরক্ষিত অঞ্চলের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন ও পিচ দেওয়া এবং এই অংশের অধিকাংশ বাড়ীঘর পাকা ও শ্রীসম্পন্ন এবং বেশীর ভাগ বিদেশীদের। দেশীয় রাজ্যের বাড়ীঘর অধিকাংশই খড়ের বা টীনের, তবে এদেশীয় লোকেদের বাড়ীঘর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পাঠশালায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আসিয়াছে বুঁচুবাবু পাঠশালে পড়িতে
মুখে বলে ক খ আর লিখে তাহা খড়িতে।
কি করুণা কাতরতা মাথা তার ঘরে রে,
বিশ্বের ব্যথা যেন এক সাথে ঝরে রে।
হাসিছেন পণ্ডিত খুসী তারে রাখিতে
গোমুখীর ধারা তবু উঁকি মারে আঁখিতে।
কণ্ঠের স্বরে ওঠে কি কাকুতি ছাপিয়া,
সারা মাঠ ডেকে যেন ক্লান্ত রে পাপিয়া।
এ যে দেখি রাঙা হয়ে উঠিয়াছে গণ্ড,
বিষ পান করিছেন যেন নীলকণ্ঠ।
গাত্র রোমাঞ্চিত একেবারে মুখ চূণ
সময় বিমুখ যেন গাণ্ডীবী অর্জ্জুন।

হয়নি ত এত ক্লেশ এত বড় কাণ্ড
গরুড়েও আনিত যে অমৃতের ভাণ্ড।
দেখ এসে করিও না এ সুবিধা নষ্ট
স্পষ্ট গোবর্দ্ধন-ধারণের কষ্ট।
বাণীপদ কোকনদে বল দেখি তোমরা
এত কি কোমল সুরে গুঞ্জরে ভোমরা?
এ যেন রে বনে ধ্রুব নারায়ণে ডাকছে
সঙ্কটে প্রহ্লাদ হরিকৃপা মাগছে।
ক'রে ছিল এমনি কি?. বসে দেখি রঙ্গ
ত্রাস্ত অগস্ত্য কে সাগর তরঙ্গ।
কাঁদিছে এবং যাহা কাঁদাইছে সবারে
বালক বাসব হেরি উচ্চৈঃশ্রবারে।

বুঁচুকে এমন দেখি হাসিবে না বল কে
লকধাঁধা লাগায়েছে গোলকে।

বনফুল

১০

রাজমহলে মুকুজ্যে মশাই তাঁহার স্বাভাবিক রীতি-অনুযায়ী একদল ছেলে জুটাইয়া খেলায় মত্ত ছিলেন। এ খেলাটা অবশ্য বাঘ্-বক্‌রি নয়, কলসি-ভাঙা খেলা। বাঘ-বকরি অপেক্ষা অধিক উত্তেজনাজনক। মাঠের মাঝে একটা খালি কলসি উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এক একটি বালকের চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে বেশ দুই-চারি পাক ঘুরাইয়া তাহার হাতে একটি লাঠি দেওয়া হইতেছে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় যদি সে কলসিটিকে গিয়া লাঠির ঘায়ে ভাঙিতে পারে তাহাকে নগদ একটাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, মুকুজ্যে মশাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেশ একদল বালক জুটিয়া জটলা করিতেছে। মুকুজ্যে মশাই এক এক-জনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িতেছেন এবং বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ ঠিক বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছে, কেহ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কেবল ইতস্তত করিতেছে, কেহ কলসীর পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বারম্বার দিক পরিবর্ত্তন করিতেছে, কেহ অভিযোগ করিতেছে যে চোখ বড় বেশী জোরে বাঁধা হইয়াছে, নানা বালক নানা রকম করিতেছে, কিন্তু কেহই কলসী ভাঙিতে পারিতেছে না। মুকুজ্যে মশাই হাসিতেছেন।

একে একে অনেকগুলি বালকই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। পারিলে মুকুজ্যে মশায়ের পক্ষে ভাল হইত, একটাকার বেশী খরচ হইত না। কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন মুকুজ্যে মশাই অনুভব করিলেন এবং নিকটেই একটি ময়রার দোকান থাকায় তাহা অসম্ভবও হইল না।

মোট কথা, মহানন্দে খেলা-পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

মুকুজ্যে মশাই যে বাড়িটাতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই বাড়িরই সম্মুখে অবস্থিত খোলা মাঠটাতে এই সব হইতেছিল। মুকুজ্যে মশাই বাসায় ঢুকিতে যাইবেন এমন সময় দুই-তিনটি বালক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল যে, আজ কিছুতেই তাঁহার যাওয়া হইবেনা। গতকল্য ক্লিওপেট্রার যে গল্পটা রাত্রে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন সেটা শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

মুকুজ্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন, "আজ আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই—"

"তবে আপনি গল্প আরম্ভ করলেন কেন!"

অত্যন্ত অভিমান-ভরে আট-নয় বছরের একটি বালক ঠোঁট ফুলাইল। মুকুজ্যে মশাই ভারী বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি গিয়েই একটা ভালো বই পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তাতে ক্লিওপেট্রার গল্প আছে, আরও অনেক ভাল গল্প আছে—"

"পরশু দিন সেই যে জাহাজডুবির গল্পটা বললেন, সেটাও আছে?"

"ওটা তো গল্প নয়, সত্যি কথা—"

"না, আপনি আজকের দিনটি থালি থেকে যান—"

"কলকাতায় আমার বড্ড দরকার আছে যে কাল। না গিয়ে উপায় নেই। তা না হ'লে তোমাদের ছেড়ে কি আমার যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতার সেই ভিড়ে!"

"আবার কবে আসবেন আপনি?"

"আবার শিগ্‌গিরই আসব।"

কথাটা বলিয়াই মুকুজ্যে মশায়ের মনে পড়িল সেবার অর্থাৎ প্রায় বৎসরখানেক পূর্ব্বে তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়া-ছিলেন, তখনও একদল বালক সঙ্গী তাঁহার জুটিয়াছিল এবং আসিবার সময় তাহাদেরও তিনি আশ্বাস দিয়া আসিয়া-ছিলেন যে শীঘ্রই ফিরিবেন। কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদেরও তিনি বিস্মৃতই হইয়াছেন, যাওয়া দূরের কথা।

তথাপি তিনি হাসিয়া আবার বলিলেন, "শিগ্‌গিরই আসব আবার—"

ছেলের দল ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া গেল।

মুকুজ্যে মশাই বাসায় ঢুকিতেই মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল এবং শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তুমি আজই তো আপনি যাবেন?"

মুকুজ্যে মশাই স্মিতমুখে তাহার পানে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। মনোরমা মুকুজ্যে মশায়ের এ হাসি চেনে, বুঝিল আজই তিনি যাইবেন।

মনোরমার বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ছিপছিপে গড়নের চেহারা। এই বয়সে মেয়েরা সাধারণত একটু মোটা হয়, কিন্তু মনোরমা তাহাও হয় নাই, এখনও সে তম্বী আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা মনোরমা-নির্ম্মাণে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনোরমার অঙ্গে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নাই। ঠোঁট দুটি এত পাতলা, দাঁতগুলি এত ছোট ছোট, নাকটি এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মাগ্র, চোখ দুটি বড় বড় না হইয়াও এমন শ্রীসম্পন্ন, চিবুকটি ছোট হইয়াও এমন মানানসই, সমস্ত দেহটা লঘু হইয়াও এত লালিত্যময় যে বিধাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু এই তম্বী নারীটির সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া অদৃশ্য কি যেন একটা আছে, তাহার মুখের দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না, দৃষ্টি আপনিই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত মুখচ্ছবিতে যেন একটা নীরব নিষেধ লেখা রহিয়াছে, যেন বলিতেছে এদিকে চাহিও না। তাহার পরিমিত আলাপে, শান্ত কণ্ঠস্বরে, ধীরে গমন-ভঙ্গিমায় তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হয় সে ধারণার প্রতিবাদ তাহার কঠিন মুখভাবে, সূক্ষ্ম নাসার সূক্ষ্মতর কম্পনে, দৃঢ়নিবদ্ধ পাতলা ঠোঁট দুটিতে এবং সর্ব্বোপরি তাহার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। শান্তকণ্ঠে তাহার মৃদু কথাগুলি শুনিলে মনে হয় তাহার মনে কোন ক্ষোভ বা অশান্তি নাই, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে দেরী হয় না যে, প্রাণপণ শক্তিতে সে একটা বিরাট আর্ত্তনাদের কণ্ঠ-রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরের এই নিদারুণ দ্বন্দ্বকে গোপন করিতে গিয়াই তাহার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; জোরে কথা কহিবার অথবা চলিবার ক্ষমতাও যেন অ র অবশিষ্ট নাই। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অনিবার্য্য প্রয়োজনে যদি বলিতে অথবা চলিতে না হইত সে নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হয়, সমাজ তো নির্জ্জন নয়।

বালবিধবা মনোরমাকে তাই চলিতে হয়, বলিতে হয়, কাজকর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু সে এত সংক্ষিপ্ততার সহিত এগুলি করে যে দেখিলে বিস্ময় জন্মে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সঙ্গোপনে কি একটা গোপন বেদনাকে সে সর্ব্বদা পালন করিতেছে এবং পাছে কেহ তাহা বুঝিতে পারে এই আশঙ্কায় নিরুদ্বেগের একটা মুখোস পরিয়া আছে। তাই কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাহার চোকে মুখে এমন একটা জ্বালা প্রকটিত হইয়া ওঠে, দর্শককে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হয়।

মনোরমার জীবন দুঃখময়। সেই কবে, কতদিন আগে বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় সে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, ফুলশয্যার রাত্রেও লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল, তাহার পর আর স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগই হয় নাই। তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন। স্বামীর মুখ মনোরমার মনে নাই। যখন বিবাহ হইয়াছিল, কতই-বা তখন তাহার বয়স। দশ বৎসরও নয়। হিন্দু-বিধবা-জীবনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার চাপেও কিন্তু মনোরমার যৌবন নিষ্পিষ্ট হইয়া যায় নাই এবং যায় নাই বলিয়াই সমাজের চক্ষে সে পতিতা। কিন্তু কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়। গুণ্ডায় তাহাকে হরণ করে নাই। সে স্বেচ্ছায় তারাপদর সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা তারাপদকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল এবং আত্মীয়স্বজনেরা যদি পুলিশের হাঙ্গামা না তুলিতেন হয়তো তারাপদর সঙ্গেই তাহার জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত (যাইত কি? মাঝে মাঝে এখন তাহার নিজেরই সন্দেহ হয়!); পুলিশের ভয়ে তারাপদ অন্তর্দ্ধান করিল। আত্মীয়-স্বজনেরা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। পদস্খলিতাকে ক্ষমা করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বাপ মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন মনোরমা সংসারের মধ্যে কোনরকমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বাপ মার মৃত্যুর পর তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভাইদের সংসারে ভ্রাতৃজায়াদের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও হয়তো মনোরমা ভিটা আঁকড়াইয়া কোনক্রমে পড়িয়া থাকিতে পারিত কিন্তু যখন সে শুনিল যে সে থাকাতে তাহার ভাইঝিদের বিবাহ হইতেছে না, তাহার অতীত কলঙ্কটা তাহাকে ঘিরিয়া এখনও সজীব হইয়া আছে এবং তাহাদের বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে তখন সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, দু চক্ষু যেখানে লইয়া যায় সেই-

খানেই সে চলিয়া যাইবে, দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিবে, ভাইদের সংসারে আর থাকিবে না। যৌবন তখনও অটুট ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত রূপও ছিল, কাশীধামে উপনীত হইয়া মনোরমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য একাধিক ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক একটি বিপত্নীক কাশীবাসী প্রৌঢ় এবং গুটিচারেক ছোকরার বল-বিক্রম-দরদ-অনুরোধ-ইঙ্গিতের আবর্ত্তে পড়িয়া সে যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল তখন সহসা মুকুজ্যে মশাই আসিয়া দেখা দিলেন। মুকুজ্যে মশাই লোকটি কে, কেন তাহার উদ্ধার সাধন করিতে চাহিতেছেন, কি করিয়া তাহার খবর পাইলেন, মনোরমা কিছুই জানিত না। তিনি আসিয়া বলিলেন, "শুনলাম তুমি বিপদে পড়েছ, যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও আসতে পারো—"

মুকুজ্যে মশায়ের চোখে মুখে কথায় বার্ত্তায় মনোরমা কি দেখিল তাহা মনোরমাই জানে, সে নির্ভয়ে রাজি হইয়া গেল।

কেবল বলিল, "আমাকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?"

"তা এখনও ঠিক করিনি। আমি কোথাও বেশী দিন থাকি না, তবে তোমাকে ভালভাবে রাখবার বন্দোবস্ত করব কোথাও না কোথাও—"

সেই হইতে মনোরমা মুকুজ্যে মশায়ের আশ্রয়ে আছে এবং এ যাবৎ যত পুরুষের সংশ্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই মুকুজ্যে মশাইই একমাত্র লোক যিনি তাহার রূপ-যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তাহার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, ভদ্রপরিবারে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট—কিন্তু কখনও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনোরমার মনে পড়ে না। প্রায় বারো-তেরো বৎসর মুকুজ্যে মশায়ের আশ্রয়ে কাটিল—কিন্তু মুকুজ্যে মশাই সেই একরকম। সৌম্যমূর্ত্তি, সদাহাস্যমুখ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সদাচঞ্চল ব্যক্তি।

ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল মুকুজ্যে মশাই নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছেন।

শান্ত স্বরে প্রশ্ন করিল, "খাবার এনে দি তা হ'লে।"

"এ-বেলা আর খাব না, খিদে নেই, ওবেলাই যা খাওয়া হয়েছে তা হজম হয়নি এখনও—"

মুকুজ্যে মশায়ের মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "মকোর্দ্দমার কি বুঝলেন? ভবেশবাবুর স্ত্রী জিগ্যেস করতে বললেন।"

"ভবেশ ছাড়া পাবে।"

মুকুজ্যে মশাই পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিলেন, মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে ইতস্তত করিয়া মনোরমা পুনরায় আর একটি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ওবেলা কাল যে জাহাজডুবির গল্পটা বলছিলেন সেটা কি সত্যি?"

মুকুজ্যে মশাই চকিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি ক'রে শুনলে?"

"আমি বারান্দায় ছিলাম। ওটা গল্প, না সত্যি?"

মুকুজ্যে মশাই ক্ষণকাল নীরবে মনোরমার দি'কে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সে কথা জেনে তোমার লাভ?"

মনোরমা কিছু না বলিয়া আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুজ্যে মশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন জানতে চাইছ, বল না!"

"এমনি।"

উত্তর না দিয়া মুকুজ্যে মশাই আর একটু হাসিলেন। বলিলেন, "এবারে যেতে হবে, ট্রেনের আর বেশী সময় নেই, ভবেশের স্ত্রীকে ডাক।"

মনোরমার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর সামান্য যেন একটু কম্পিত হইল, সে কিন্তু কিছু বলিল না। মুকুজ্যে মশাইকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অবগুণ্ঠনবতী একটি বধূ আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুকুজ্যে মশাইকে প্রণাম করিল।

"কোন ভয় নেই মা—ভবেশ ঠিক ছাড়া পাবে।"

মুকুজ্যে মশাই বাহির হইয়া গেলেন।

১১

গতকল্য শঙ্করের নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আসিয়াছিল তাহাই সে একা বসিয়া পড়িতেছিল। নিজের লেখাটাই বারবার করিয়া পড়িতেছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের

প্রথম রচনা! অনেক দিন আগের লেখা একটা কবিতা। সোনাদিদির কথা মনে পড়িল, সোনাদিদিই লেখাটা কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি রিণির উদ্দেশে লেখা, কিন্তু লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সোনাদিদির মুখখানা যেন উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেদিনের কথাটা শঙ্করের মনে পড়িল—যেদিন সে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মিষ্টিদিদি এবং সোনাদিদির শরণাপন্ন হইয়াছিল। সলজ্জ স্নিগ্ধ সংযতশ্রী রিণির মুখখানি এখনও মনে আঁকা রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। মনের যে সুনিভৃত মণিকোটায় বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি টাঙানো থাকে, রিণির ছবিও সেইখানে টাঙানো রহিয়াছে। রিণির নিকট হইতে কতটুকুই বা সে পাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেইটুকুই সুন্দর করিয়া কখন যে তাহার মন সাজাইয়া রাখিয়াছে তাহা সে এতদিন জানিতেই পারে নাই। স্মৃতিপটে অঙ্কিত রিণির আলেখ্যের পানে চাহিয়া শঙ্কর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। রিণির জন্য মন আর উন্মুখ নহে, উন্মুখ হইবার অধিকার তাহার নাই এবং সেজন্য দুঃখও আর নাই। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় ভালই হইয়াছে। নিজের যে পরিচয় সে ক্রমশ পাইতেছে তাহাতে মনে হয় রিণিকে সে সুখী করিতে পারিত না। তাহার মনের কলুষ একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গ্লানিময় করিয়া তুলিতই। কলুষ তাহারই মনের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। মিষ্টিদিদি উপলক্ষ মাত্র। তিনি না থাকিলেও অন্য উপায়ে ইহা ঘটিত। রিণি নষ্ট হইয়া যাইত, রিণির সম্বন্ধে তাহার স্বপ্নটাও ভাঙিয়া যাইত, বাস্তবের রূঢ় আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না।

বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াও আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া থাকিতে পারে মুক্তো। শঙ্করের মাংস-লোলুপ অথচ স্বপ্নবিলাসী মনকে আশ্রয় দিতে পারে সেই। অপর কাহারও পক্ষে, বিশেষত ভদ্রঘরের সুনীতি-শৃঙ্খলিত সভ্য রমণীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন ভদ্রমনা নারীই পশুটাকে সহ্য করিতে পারে না, অন্তত না পারার ভাণ করে। মুক্তোর পশু লইয়াই কারবার, সুতরাং সে বিষয়ে কোনরূপ ভণ্ডামি বা ছদ্মবেশ তাহার নাই। পশুদের হাটে নিজেকে সে নিলামে চড়াইয়া দিয়াছে, যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিবে সে বিনা দ্বিধায় তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিছক কেনা-বেচার অন্তরালেও কিন্তু আর একজন আছে যাহাকে টাকা দিয়া কেনা যায় না, কথা দিয়া মুগ্ধ করা যায় না, যাহাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, তাহাকে ঘিরিয়াই শঙ্করের স্বপ্ন রঙীণ হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল কি করিয়া বেশ কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। এক-আধ শ টাকা নয়, বেশ কিছু মোটা টাকা যাহার বিনিময়ে সে মুক্তোকে পাইতে পারিবে। নিজের দৈন্যে নিজের উপরই তাহার ঘৃণা হইতে লাগিল। সামান্য টাকার জন্য এই অপমান, এই বঞ্চনা, এই আত্ম-অসম্মান। যেমন করিয়া হোক উপার্জ্জন করিতে হইবে, বড়লোক হইতে হইবে। অকারণে ফিজিক্স্ মুখস্থ করিয়া এম, এস-সি পাশ করার কোন সার্থকতা নাই। ওরিজিন্যাল মূর্খ কিন্তু ধনী সেই জন্যই মুক্তোর উপর তাহার ন্যায্য অধিকার বেশী।

... সহসা শঙ্করের মনে হইল মুক্তো কি পড়িতে পারে? এই মাসিক পত্রিকাটা তাহাকে দিয়া আসিলে কেমন হয়। এ কবিতা কি মুক্তো বুঝিতে পারিবে?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দুইখানিই খামের চিঠি। একটি বেশ মোটা, হাতের লেখা দেখিয়াই শঙ্কর বুঝিল সুরমার চিঠি। ইদানীং অনেক দিন সে সুরমার কোন পত্র পায় নাই। দ্বিতীয় চিঠিখানি বাবার। বাবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, প্রয়োজনীয় কথার বেশী আর কিছু নাই। লিখিয়াছেন—মা ভাল আছেন আজকাল, শঙ্কর আগামী মাসে যেন একবার বাড়ি আসে, তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত কথা-বার্ত্তা তিনি শেষ করিয়া ফেলিতে চান। লিখিয়াছেন, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়াছিলে। আশা করি এতদিন চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ এবং তাহা অসাধারণ কিছু নহে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শিরিষবাবুর কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেনা-পাওনার কথা এখনও অবশ্য কিছুই ঠিক হয় নাই। সেদিক দিয়া তাঁহাদের তরফে যদি কোন বাধা না ওঠে তাহা হইলে অন্য কোন আপত্তির কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যতদূর শুনিয়াছি এবং ফোটোতে যতদূর দেখিয়াছি মেয়েটি সুশ্রী। তুমি যদি ইচ্ছা কর পাত্রীটিকে দেখিয়া আসিতে পার। কলিকাতাতেই

তাহারা থাকে। তোমার পত্র পাইলে শিরিষবাবুকে লিখিব তোমার সহিত দেখা করিয়া মেয়ে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে। তুমি আগামী মাসে নিশ্চয়ই একবার আসিবে।

শঙ্কর ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিল যে সে ঠিক করিয়াছে বিবাহ করিবে না। ইহা লইয়া তাহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয়। বিবাহ করা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। চিঠিখানা লিখিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিতে বলিল। এক কাপ্ চা-ও ফরমাস করিল।

সুরমার চিঠিটা খুলিতেই কতকগুলি ফোটো বাহির হইয়া পড়িল। নানারকম ফোটো। একটা কুকুরের, একটা ফুলের, একটা ক্রন্দনাকুল একটি শিশুর, একটা মেঘের, একটা সমুদ্রের, আরও কয়েকটা নানারকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুরমা লিখিতেছে—

শঙ্করবাবু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। অর্থাৎ আপনার চিঠিখানা পাওয়ার পর এতদিন কেটে গেছে যে, চিঠিখানাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজে পাচ্ছি না বলে যেন মনে করবেন না যেখানে সেখানে অবহেলাভরে ফেলে রেখেছিলাম এবং অবশেষে তা ওয়েস্ট-পেপারবাস্কেটে বাহির হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। মোটেই তা নয়। বরং পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে অত্যধিক যত্ন ক'রে সেটা রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ য়্যাটাচি কেসের কোন্ পকেটে, কোন্ টেবিলের কোন ড্রয়ারে অথবা কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে যে সেই সযত্নরক্ষিত চিঠিটি আত্মগোপন করে রইলো উত্তর দেবার সময় কিছুতেই আবিষ্কার করা গেল না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। চিঠির উত্তরে আমরা যখন চিঠি লিখি তখন সব সময়ে আমরা যে চিঠির 'উত্তর'ই লিখি তা নয়, উত্তর দেবার উপলক্ষ ক'রে নিজের লিপিকুশলতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। সব সময়ে তাতে প্রশ্নের উত্তর থাকে না, আবার অনেক সময় অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও অযাচিত উত্তর থাকে। কারো চিঠি পেলে মনে যে সাড়া জাগে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা যা করি তাই তার উত্তর। অনেক সময় নীরবতাই হয় শ্রেষ্ঠ উত্তর, অনেক সময় আবার আসল উত্তরটাকে আড়াল করবার জন্যেই অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করতে হয়; অনেক সময় পাতার পর পাতা লিখলেও উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আবার অনেক সময়—কিন্তু এ আমি করছি কি! আপনি কবি মানুষ। আপনাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া যে নিউ-কাস্‌ল্ শহরে কয়লা বহন করার চেয়েও হাস্যকর। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছেন। ভাবছেন বোধ হয় এতদিন পরে চিঠির উত্তর এলো—তাও আবোল তাবোল!

সুতরাং আর নয়, ও প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা দিলাম। এতদিন আপনার চিঠির যে উত্তর দিই নি তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। ফোটোগ্রাফিতে আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনরাত ওই নিয়েই আছি। দিনে ফোটো তুলি, রাত্রে ডেভেলাপ করি। কয়েকটা নমুনা পাঠালাম, কেমন লাগল সত্যি ক'রে জানাবেন তো! খুব কঠোর হয়ে বিচার করবেন না তা বলে! এই আমার প্রথম হাতেখড়ি, সেটা মনে রাখবেন। ছোট ছেলেটির কান্নার ছবিটা খুব মিষ্টি, নয়? একটি পার্শি ভদ্রমহিলার ছেলেটি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে, বেশ মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রায় কণ্ঠস্থ। আপনার সেই কবিতাটাও ওঁকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছি, খুব ভাল লেগেছে ওঁর। ভাল কথা, আপনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন না কি! কই, কোন লক্ষণই তো দেখতে পাই না। লিখলে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও দেখতে পেতাম।

আপনার বন্ধুর কোন খবর কি পেয়েছেন ইদানীং? আমি অনেকদিন কোন খবর পাইনি। পত্রলেখক-হিসেবে বোধ হয় কোনকালেই ওঁর প্রসিদ্ধি ছিল না। আপনিই ভাল বলতে পারবেন. কারণ আপনারা বাল্যবন্ধু। আমার সঙ্গে পরিচয় যদিও অল্পদিনের (আমি তো আগন্তুক বললেই হয়), কিন্তু এই স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও এ কথাটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পত্রলেখক-হিসেবে ওঁকে প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিতেও ইতস্তত করা উচিত। অত্যন্ত কাজের মানুষ অর্থাৎ প্র্যাকটিকাল লোক যাঁরা শুনেছি অপব্যয় করবার মতো সময় নেই তাঁদের এবং যে চিঠি দু কথায় লেখা যায় তার জন্যে দু'শো কথা লেখাটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেন তাঁরা। দু'শো কথা একসঙ্গে লেখবার ক্ষমতা আছে কি-না সে প্রশ্ন না

ভুলেও এটা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে দু'শো কথা লেখবার ধৈর্য্য ওঁদের নেই। আপনার বন্ধুটির প্রথম প্রথম যা-ও বা একটু ধৈর্য্য ছিল, আজকাল তার থেকেও চ্যুত হয়েছেন তিনি। হয় তো পড়ার চাপ, নয়তো বা আর কিছু। অনেক সময় প্রহেলিকা বলে মনে হয়।

কবিরা এখনও নারীদেরই প্রহেলিকা বলে থাকেন, আমার মনে হয় খুব সম্ভবত সেটা প্রথার খাতিরে। এককালে হয় তো নারীরা সত্যিই প্রহেলিকা ছিল এবং বিস্মিত পুরুষের মন একদা তার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল বলেই কাব্যে তার এত উল্লেখ দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে' পুরুষদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে নারী কিন্তু আর প্রহেলিকা নেই, নারী-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যারই তাঁরা সমাধান করেছেন। নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র আজকাল পুরুষ জাতির নখদর্পণে। তবু কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টির সম্মুখে এখনও নারীরা নিজেদের রহস্যময়ীরূপে প্রকট রাখবার চেষ্টা করেন এবং আমার বিশ্বাস, পুরুষরা সব জেনে শুনেও মুগ্ধ হবার ভাণ করেন। অর্থাৎ আজকাল বিজ্ঞান-মহিমার প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন। আপনারা তা দেখে যে হেসে লুটিয়ে পড়েন না সেটা আপনাদেরই ঔদার্য্য, ভণ্ডামি বা শিভাল্‌রি যাই বলুন। আমার বরং পুরুষদেরই প্রহেলিকা বলে মনে হয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রকোপ আপনারাও এড়াতে পারেন নি এবং যদিও আমাদের ধারণা আপনাদের চরিত্রের অনেকখানিই আমরা বুঝে ফেলেছি। আপনাদের আমরা সমস্ত বুঝে ফেলেছি এই ধারণাই আরও বিভ্রান্ত করেছে আমাদের। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু আমরা পাই আপনাদের ততটুকুই হয়তো কিছু কিছু বুঝি আমরা—কিন্তু আমাদের আয়ত্তের বাইরে আপনাদের যে সত্তা তার সঙ্গে আমাদের কিছুই পরিচয় নেই এবং সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে সবজান্তার মতো চলতে যাই বলে পদে পদে হোঁচট্ খেতে হয় এবং সেই হোঁচটের নানামূর্ত্তি নানারূপে দেখা দেয়। কখনো মূর্চ্ছা যাই, কখনো আত্মহত্যা করি, কখনো কবিতা লিখি, কখনো বা কোনো আন্দোলনে যোগদান করি। আমি ফোটোগ্রাফ নিয়ে মেতেছি। কিন্তু ওই অপরিচয়ের অন্ধকারটাই যে লোভনীয়!

যাক্। নিজের কথা নিয়েই অনেকক্ষণ বাগবিস্তার করলাম, আপনার কথা কিছুই জিগ্যেস্ করা হয় নি। মিষ্টিদিদির খবর অনেকদিন পাইনি। শৈল ঠাকুরঝিও কোন চিঠিপত্র দেন না। কেমন আছেন তাঁরা? রিণি দেবী কেমন আছেন? এখনও কি আপনি তাঁর পাঠাভ্যাসে সহায়তা করছেন না কি? পুরুষদের মধ্যে যে অংশটুকু প্রহেলিকা নয়, কাচের মত স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর যেটুকু—সেটুকুর সম্বন্ধে সচেতন করা বৃথা বলেই কিছু বললাম না। আশা করি আপনি এবং রিণি উভয়েই নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অনেকক্ষণ ধরে বকছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বোধ হয় এতক্ষণ। আমারও নতুন প্রিণ্টগুলো শুকিয়েছে, তুলতে হবে এইবার। ফোটোগুলো কেমন লাগল জানাবেন। প্রীতি সম্ভাষণ নিন্। ইতি

—সুরমা

ভৃত্য চা দিয়া গেল এবং বলিল যে, নীচে কমন রুমে এক ভদ্রলোক শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শঙ্কর বলিল, "এইখানেই নিয়ে আয় ডেকে—"

একটু পরেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। বিনীত নমস্কার করিয়া অপ্রস্তুত মুখে রুমালটা পকেটে পুরিতে পুরিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আশা করি আপনার কাজের কোন ব্যাঘাত করে বিরক্ত, মানে—"

"কিছু না, বসুন। চা খাবেন?"

"না। অনেক ধন্যবাদ, এইমাত্র চা খেয়ে আসছি আমি—"

"কোন দরকার আছে না কি আমার সঙ্গে?"

অপূর্ব্ববাবু পুনরায় রুমাল বাহির করিলেন এবং গলা, ঘাড়, কানের পিছন প্রভৃতি মুছিয়া যেন কিছু শক্তিসংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মরিয়া হইয়া শঙ্করের চোখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মিস্ মল্লিকের সঙ্গে কি দেখা হয় আজকাল আপনার?"

"দেখা না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?"—বিস্মিত শঙ্কর প্রশ্ন করিল। অপূর্ব্ববাবু কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন। সত্যই তো, শঙ্করবাবুর সহিত বেলা মল্লিকের দেখা না হওয়ার কোন সঙ্গত বাধা থাকিবার কথা নয়। এ প্রশ্ন করার কোন অর্থ হয় না। অকারণে অনর্থক একটা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে এই ভাবিয়া অপূর্ব্ববাবু মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার

মুখভাবেও সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আবার রুমাল বাহির করিতে হইল। শঙ্করই পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বেলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কতদিন আগে?"

"আমার? আমার তো দেখা করার তেমন সুযোগ হয় না, রবিবার ছাড়া আমার ছুটি তো তেমন, মানে—তাছাড়া আপিস আজকাল বড় স্টি্রক্ট, রবার্টসন সায়েব—"

"রবিবার তো মাসে চারটে করে আছে—" বলিয়া শঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"মিস্ মল্লিক রবিবারে বাড়ি থাকেন না, আমি গিয়েছিলাম দু'দিন। অথচ পিয়ানোর ভাল ভাল গৎ জোগাড় করেছি কয়েকটা, মানে শুনলাম উনি আজকাল পিয়ানোও—"

শঙ্কর বলিল, "পিয়ানো! পিয়ানো পেলে কোথা? শুনিনি তো।"

"মিস্টার বোসের একটা পিয়ানো আছে, উনি মিসেস বোসকে এস্রাজ শেখাতে যান, সেই সময় পিয়ানোটাও বাজান শুনেছি। মানে, ওদের বেয়ারাটা বলছিল—"

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বেশ তো, আপনি কি করতে চান?"

অপূর্ব্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "কয়েকটা ভাল গৎ পেয়েছিলাম, খুব ভাল বিলিতি গৎ, সেইগুলো ওঁকে,আর কি, মানে as a friend—"

"উপহার দিতে চান?"

অপূর্ব্ববাবু একটু হাসিলেন, চক্ষু দুইটি একটু নত করিলেন এবং সমস্ত মুখভাবে নারী-সুলভ কমনীয়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "না, না, উপহার ঠিক নয়, আমি অর্থা—"

নির্ব্বিকারভাবে শঙ্কর বলিল, "বেশ তো ডাকে পাঠিয়ে দিন না।. দেখা যখন হচ্ছে না—"

"ডাকে? তা বেশ বলেছেন, শিওর পাবেন তা হ'লে, কি বলুন। আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো বলতে পারবেন কখন উনি বাড়িতে থাকেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমিও একদিন, মানে—"

"উনি কখন বাড়িতে থাকেন তা আমিও ঠিক জানি না। প্রায়ই অবশ্য থাকেন না, অনেকগুলো টিউশনি নিয়েছেন কিনা—"

"তা শুনেছি আমি। তা হ'লে—"

অপূর্ব্ববাবু আর কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ডাকেই তা হ'লে পাঠিয়ে দেব। ওঁর নাম্বারটা কি বলুন তো, টুকে নি, ঠিক মনে নেই—"

পাঞ্জাবির পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিতে গিয়া কতকগুলি মেয়েদের মাথার কাঁটা বাহির হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেল। কুণ্ঠিত অপূর্ব্ববাবু চাদর সামলাইতে সামলাইতে সেগুলি কুড়াইতে লাগিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "ওগুলো আবার কি?"

"ওগুলো, মানে, আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে কিনতে দিয়েছিল আমাকে—"

কাঁটাগুলি কুড়াইয়া মিস বেলা মল্লিকের ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত চলিয়া গেলেন। শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ

অন্ধের প্রতি

শ্রীমতী ইন্দুরাণী দেবী

ধরণীর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে আজ,
　হে মানব রিক্ত তুমি,
রিক্ত তুমি, অতি ক্ষুদ্র দীন,
পৃথিবীর এই আলো ছায়া
　তব চক্ষে আজ শুধু
ছায়ারূপ, শুধু ভাষাহীন।
নয়নের মাঝে দুটি কালো তারা
　নাচে না চন্ চল্—
ছন্দ মাঝে,' যেন উদাসীন,'

ধরণীর বুকে হাসি খেলা
　ব্যথা-হত পরাণের
শুধু ছলভরা, শুধু রূপহীন।
চাহনিতে তব কালোছায়া,
　ব্যর্থতায় ভরা শুধু,
যেন জীবনের শেষ গণা দিন,
জাগে নাকো বাণী, দুটী আঁখি কোলে
　অন্তরের মৌন ভাষা
স্তব্ধ চির তরে, শুধু অর্থ হীন ॥

পদকর্ত্তা নয়নানন্দ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

পদাবলী সাহিত্যে আমরা আজ পর্য্যন্ত তিনজন নয়নানন্দের সন্ধান পাইয়াছি। তিনজনই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, অথচ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণের জীবনী-লেখক মহাশয়েরা অপর দুইজন নয়নানন্দের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণের এই অনবধানতা ভবিষ্যতে অকৃতজ্ঞতারূপে অভিহিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা সংক্ষেপে তিনজন নয়নানন্দের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি।

(১)

পদাবলী সাহিত্যে সুপরিচিত নয়নানন্দ মিশ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর প্রিয়সহচর গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য। পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাবের পর রাঢ়দেশে ভরতপুর গ্রামে বাস করেন। স্বর্গগত যশোদানন্দন তালুকদার প্রকাশিত প্রেমবিলাসের দ্বাবিংশ এবং চতুর্ব্বিংশ বিলাসে ইঁহার নিম্নরূপ পরিচয় আছে। "চট্টগ্রামে চিত্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি বিলাস আচার্য্যকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন এবং (চট্টগ্রাম) বেলেটী গ্রামে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিলাস মিশ্রের পুত্রের নাম মাধব। চট্টগ্রাম চক্রশালার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সঙ্গে মাধবের বন্ধুত্ব হয়। চট্টগ্রামে মাধবের এক পুত্র জন্মে তাহার নাম বাণীনাথ, বাণীনাথের অপর এক নাম জগন্নাথ। অতঃপর মাধব মিশ্র নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। নবদ্বীপে মাধবের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়, এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ গদাধর পণ্ডিত। মাধব মিশ্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধব মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ বিবাহ করেন, এই বাণীনাথ বা জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রই পদকর্ত্তা নয়নানন্দ। আমাদের মনে হয় গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায়—"বাণীনাথ দ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়" বলিয়া এই বাণীনাথের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। খেতরীতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বাণীনাথকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তালুকদারের প্রেমবিলাসে উল্লিখিত আছে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া নয়নানন্দকে স্বপূজিত গোপীনাথ বিগ্রহের সেবার ভার দিয়াছিলেন।

> পণ্ডিত গোসাঞীর বড় ভাই বাণীনাথ হয়।
> জগন্নাথ বলি তারে কেহো কেহো কয়॥
> বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গোসাঞি।
> তাঁহার যতেক গুণ তার অন্ত নাই॥
> তারে শিষ্য করি গোসাঞী শক্তি সঞ্চারিলা।
> পণ্ডিত গোসাঞীর সেবা নয়ন পাইলা॥
> পণ্ডিত গোসাঞী প্রভুর অপ্রকট সময়।
> নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
> মোর গলদেশে ছিল এই কৃষ্ণ মূর্ত্তি।
> সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥
> তোমারে অর্পিল এই গোপীনাথের সেবা।
> ভক্তিভাবে পূজিবে, না পূজিবে অন্য দেবীদেবা॥
> স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
> মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥
> ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
> এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হইলা অন্তর্দ্ধান॥
> দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা।
> প্রভুর ইচ্ছামতে তবে সুস্থির হইলা॥
> নয়ন পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
> রাঢ়দেশ ভরতপুরে করিলেন বাড়ি॥ (২২শ বিলাস)

প্রেমবিলাসের এই কাহিনী কতখানি বিশ্বাসযোগ্য জানি না। ভরতপুর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত।

নয়নানন্দ গৌর-গদাধরের উপাসক। এই সম্পর্কে শ্রীখণ্ডের সরকার-ঠাকুর বংশের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা জন্মে। কারণ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ই

গৌর-গদাধর উপাসনার প্রবর্ত্তক। নয়নানন্দের কোন কোন পদের ভণিতা এইরূপ—

'কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে।
আর কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে॥'
"নাচে শচীর নন্দন ঢুলালিয়া।
সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া' ॥

পদকল্পতরুতে নয়নানন্দ ভণিতার ২৬-টি পদ আছে। সমস্ত পদই এই মিশ্র নয়নানন্দের রচিত কি-না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ ইহার প্রায় সম-সময়েই শ্রীখণ্ডে নয়নানন্দ কবিরাজ নামে অপর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য, সুতরাং গৌর-গদাধরের উপাসক। ইহার কথা পরে বলিতেছি। মিশ্র নয়নানন্দের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

রূপানুরাগের গৌরচন্দ্র। ধানশী॥
গৌরাঙ্গ লাবণ্যরূপে কি কহিব একমুখে
আর তাহে ফুলের কাচনি।
ও চান্দ মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি॥
বিহি গড়ল কত ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ পুতলি মোর কান্দে।
বিধিরে বলিব কি করিলে কুলের ঝি
আর তাহে নহি সতন্তরি॥
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়্যা মরি।
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
ঠেকিলে গৌরাঙ্গ প্রেম ফান্দে॥

(২)

পদকর্ত্তা নয়নানন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দনের সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীখণ্ডনিবাসী "রসকল্পবল্লী"-প্রণেতা ও পদকর্ত্তা গোপালদাস শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দনের শাখা-নির্ণয়ে অনেক কবি ও ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন শাখায় প্রথমেই তিনি নয়নানন্দ কবিরাজের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন—

"রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ।
যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ॥
বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন।
ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরণ।
শ্রীনিকেতন আদি কবিরাজের শাখা।
সংক্ষেপে কহিল নাম নাহি লেখা জোখা॥"

এই কবিতাংশ হইতে জানা যায়—"নয়নানন্দ কবিরাজ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীনিকেতন-আদি বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত বয়ঃসন্ধি রসের পদ ছিল। এই পদগুলি ভাগ্যবান ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ নিত্য স্মরণ করিতেন।" ইহার অধিক কবিরাজের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নয়নানন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

আমি যখন "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি"র সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় সমিতির গ্রন্থশালায় হাতের লেখা বহু পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে পদসংগ্রহের পুঁথিও ছিল। সেই সমস্ত পুঁথি হইতে এখানে সেখানে দুই-চারিটী পদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এইরূপে নয়নানন্দ ভণিতার দুইটি পদ সংগৃহীত ছিল। তখন নয়ন মিশ্র ও মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দ ঠাকুর ভিন্ন কবিরাজ নয়নানন্দের নাম জানিতাম না। সুতরাং পদ দুইটি আমি মঙ্গলডিহির নয়নানন্দ কবির পদ বলিয়াই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীখণ্ডের নয়নানন্দ কবিরাজের পরিচয় আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এই পদ দুইটি তাঁহারই রচিত। পদ দুইটি পাঠ করিয়া তাহার সঙ্গে গোপালদাসের পূর্ব্বোক্ত কবিতাংশ মিলাইলেই নিরপেক্ষ পাঠকগণও আমাদের উক্তি সমর্থন করিবেন। ভাগ্যক্রমে দুইটি পদই বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে, একটি গৌরচন্দ্র, অপরটি শ্রীমতীর রূপ। পদ দুইটি তুলিয়া দিলাম। পদ দুইটি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। পদাবলী সাহিত্যে গৌরচন্দ্রের

বয়ঃসন্ধি-বিষয়ক পদের সংখ্যা খুবই কম। সেদিক দিয়াও পদ দুইটির মূল্য স্বীকার করিতে হয়।

সুহই ॥ বিমল সুরধুনী তীর।
কালিন্দি ভরমে অধীর ॥
বিহরই গৌর কিশোর।
পূরব পিরিতি রসে ভোর ॥
রাজপথে নরহরি সঙ্গে।
ক্ষণে হেরি গঙ্গ তরঙ্গে ॥
গদাধর লাজে তেজে পাশ।
মুরারি এ কর পরিহাস ॥
কৈশোর যৌবনে সন্ধি।
নয়নানন্দ চির বন্দি ॥

অল্পের মধ্যে শ্রীমহাপ্রভুর বয়ঃসন্ধির একটি অতি সুন্দর আলেখ্য। এই নবদ্বীপের রাজপথে প্রিয়বন্ধু নরহরির কণ্ঠ বাহুবেষ্টনে বান্ধিয়া চলিয়াছেন, পরক্ষণেই দেখি তিনি অপর বয়স্যগণ সঙ্গে গঙ্গাতরঙ্গে সন্তরণ করিতেছেন। এই এখনই মুরারীগুপ্তকে দেখিয়া পরিহাস সহকারে বলিতেছেন

—"ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি"।

আবার হয়তো গদাধরকে দেখিয়া—

"বাহু পসারিয়া প্রভু রাখিল ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিযা ॥"

মুরারীকে দেখিয়া পরিহাস করেন—তুমি বাড়ী গিয়া গাছগাছড়া লইয়া রোগীর ব্যবস্থা কর, ব্যাকরণ পড়িয়া কি হইবে?" গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন, কূটতর্ক উত্থাপন করেন। মুরারী প্রভুকে দেখিয়া দূরে পরিহার করিয়া চলেন, গদাধর যেন প্রভুর হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচেন। সুতরাং পদকর্ত্তা সত্য কথাই বলিয়াছেন—

"গদাধর লাজে তেজে পাশ।.
মুরারীকে করু পরিহাস।"

ভণিতাটিও চমৎকার। মহাপ্রভু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছেন। (ত্রিলোকের লোকের) নয়নের আনন্দ সেইরূপে চির বন্দিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে পদকর্ত্তা নয়নানন্দ সেইরূপে চিরবন্দী হইয়া রহিলেন। অপর পদটি এইরূপ—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি) ধানশী ॥

মাধব পেখলুঁ সো নব বালা।
বরজ রাজপথ চাঁদ উজালা ॥
অধরক হাম নয়নযুগে মেলি।
হেম কমল পর চঞ্চরী খেলি ॥
হেরি তরুণী কোই করু পরিহাস।
অন্তরে সমুঝয়ে বাহিরে উদাস।
শুনিয়া না শুনে জনু রসপরসঙ্গ।
চরণ চলন গতি মরাল সুরঙ্গ ॥
বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল ক্ষীণ।
নয়নানন্দ দরশ শুভ দিন ॥

মাধব, ব্রজের রাজপথের উজ্জ্বল চাঁদ সেই নবীনা বালাকে দেখিলাম। (তাহার) অধরের হাসি নয়নযুগলে মিলিত হইয়াছে। যেন সোনার কমলে (বদনমণ্ডলে দুইটি চক্ষুরূপ) ভ্রমর খেলিতেছে। (তাহাকে) দেখিয়া কোন তরুণী যদি পরিহাস করে, অন্তরে বুঝিতে পারে, (কিন্তু না বুঝার ভাণে) বাহিরে ঔদাস্য দেখায়। রসপ্রসঙ্গ যেন শুনিয়াও শুনে না, মরালগতিতে চলিয়া যায়। জঘন ও বক্ষস্থল এবং কটি ক্ষীণ হইল। (আমার পক্ষে আজ) শুভদিন, সেই নয়নানন্দদায়িনীকে দেখিলাম। অপর পক্ষে পদকর্ত্তা নয়নানন্দ সেইরূপে শুভদিনের দর্শন পাইলেন। অর্থাৎ শ্রীমতীর এই রূপ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবে, এইবার ভক্তগণের যুগলমিলন দর্শনের শুভদিনের উদয় হইবে।

গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রকে প্রায় মহাপ্রভুর সম-সাময়িক বলিতে পারা যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর নয়নমিশ্র বহুদিন জীবিত ছিলেন, কারণ খেতরীর মহোৎসবে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর রঘুনন্দন এবং নয়নমিশ্র প্রায় সমবয়স্ক। সুতরাং নয়নানন্দ কবিরাজ নয়নানন্দ মিশ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্যক্তি। আমরা উভয় কবিকে সম-সাময়িক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। উভয় কবিই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতি ভণিতার "বয়ঃসন্ধির পদগুলি ভাষার

দিক দিয়া সন্দেহজনক। আমার মনে হয়, নয়নানন্দ কবিরাজের বয়ঃসন্ধির পদগুলি বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। এদিকে ভাষাতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৩)

ঠাকুর নয়নানন্দ পূর্ব্বোক্ত দুই নয়নানন্দ অপেক্ষা প্রায় শতাধিক বৎসরের পরবর্ত্তী ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালা ১১৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ (খৃঃ অঃ ১৭৩৩) মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্বগ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৬৫৩ শকাব্দায় প্রেয়োভক্তিরসার্ণব রচনা সমাপ্ত হয়। আমরা কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই সন তারিখ উদ্ধৃত করিতেছি। বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানায় মঙ্গলডিহি অতি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের চারিশত বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। মহাপ্রভুর পার্ষদ ঠাকুর সুন্দরানন্দ মঙ্গলডিহির গোপাল ঠাকুরকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। গোপাল পান বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া পর্ণগোপাল বা পানুয়া ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন। সেকালে হিন্দু-মুসলমানে মিলন স্থাপনের জন্য যাঁহারা অন্তরের সঙ্গে চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পর্ণগোপাল অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। পর্ণগোপাল এক সন্ন্যাসীর নিকট গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে শ্যামচাঁদ ও বলরাম বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। পর্ণগোপাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নয়নানন্দের পিতার নাম গোপালচরণ, জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম গোকুলচন্দ্র। দুই ভ্রাতাই পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ইহাঁদের চতুষ্পাঠীতে নানাস্থান হইতে ছাত্রের দল আসিয়া উপস্থিত হইত। কবি নয়নানন্দ এবং বীরভূম জোঁফলাই গ্রামের কবি জগদানন্দ উভয়েই সম-সাময়িক। নয়নানন্দের কৃষ্ণ-ভক্তিরসকদম্ব গ্রন্থের অনুক্রমণিকা এইরূপ—

এবে কহি গ্রন্থের অনুক্রম সূত্র।
যেবা যেই প্রকরণে হয়াছেন উক্ত॥
প্রথম প্রকরণে হৈলাম মঙ্গলাচরণ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বন্দনারূপ হন॥
সর্ব্ব আরাধনা পর কৃষ্ণের অর্চ্চন।
মনে সম্বোধিয়ে প্রশ্ন প্রথম প্রকরণ॥১
শ্রীকৃষ্ণসেবায় হয় জগতের প্রীতি।
ভক্তবশ ভগবান অভক্ত নিন্দাতথি॥
কৃষ্ণাশ্রয় বিনে ভবসিন্ধু নহে পার।
দ্বিতীয় প্রকরণে হৈল তাহার বিচার॥২
বাল্যারভ্য কৃষ্ণসেবা বিষয়াবিষ্ট ত্যাগ।
অনাশ্রিত পশুতুল্য ইত্যাদি বিভাগ॥
ইন্দ্রিয় থাকিতে যে ইন্দ্রিয়হীন জন।
ভক্তিশ্রেষ্ঠ তৃতীয়ে হৈল নিরূপণ॥
অকামা সকামা ভক্তি কৃষ্ণভক্তি ফল।
অবিনাশী কৃষ্ণদাস তৃতীয়ে সকল॥৩
চতুর্থে সাধন ভক্তি বৈধীর কথন।
উত্তম মধ্যম ভক্ত তটস্থ লক্ষণ॥৪
পঞ্চমে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গ লক্ষণা।
ষষ্ঠে সেবা নাম আদি অপরাধ বর্ণনা॥৫।৬
সপ্তমে রাগভক্তি প্রকটাপ্রকট লীলা।
অষ্টমে ভাব ভক্তি বর্ণন হইলা॥৭।৮
নবম বিভাগ সূত্র পূর্ণতরতম।
ধীরোদ্দাত্তাদি তথা নায়ক কথন॥৯
নিত্যসিদ্ধাদি ভক্তি লক্ষণা নবমে।
দশমে অনুভাব তথা সাত্ত্বিক কথনে॥১০
ব্যভিচারী কহিলাম প্রকরণ একাদশে।
স্থায়ীভাব কথন হইয়াছেন দ্বাদশে॥১১।১২
ত্রয়োদশে মুখ্য ভক্তি রস নিরূপণ।
শান্ত দাস্য পর্য্যন্ত তাহাতে লিখন॥১৩
চতুর্দ্দশে সখ্য ভক্তি রসের বিচার।
পঞ্চদশ প্রকরণে বাৎসল্যের সার॥১৪।১৫
ষোড়শ সপ্তদশে উজ্জ্বল বর্ণন।
এই তো কহিল ইতি শাস্ত্র অনুক্রম।১৬।১৭

গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর মর্ম্মানুসরণে লিখিত। অনুবাদ প্রাঞ্জল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং কবিত্বময়। গ্রন্থ সমাপ্তি প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

যুগ্মবাণ ঋতুচন্দ্র শকে পরিগণি।
বৃষরাশি গত ভানু মাসী তাহে জানি॥

ভূমিপুত্র করে তথা কুহুতিথি শেষে।
হইলেন গ্রন্থ সাঙ্গ পঞ্চম দিবসে॥
সেনভূম মধ্যে মঙ্গলডিহি গ্রাম।
শ্রীপর্ণিগোপালের যাহাতে বিশ্রাম॥
ঠাকুর পান্নয়ার সেবা শ্রীশ্যামসুন্দর।
বলরামচন্দ্র প্রভু রসিক নাগর॥
সে মূর্ত্তি দেখিতে ভক্তের বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
সেই স্থানে রহি এই গ্রন্থ হইল সাঙ্গ॥
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব শ্রবণে উল্লাস।
কাতরে বর্ণিলা এ নয়নানন্দ দাস॥

কবি প্রেয়োভক্তি রসার্ণব সমাপ্তি-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর।
শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
তাহার আশয় সূত্র কথক দেখিয়া।
এই গ্রন্থ লিখিলাম প্রচার করিয়া॥

নয়নানন্দের একটি পদ তুলিয়া দিলাম।

উঠ গোপাল প্রাতঃকাল মুখ নেহারি তের।
রজনী অবসান ভই কাম ভই মের॥
উঠতো ভানু দেখতো কানু রজনি গেই দূর।
বালক সঙ্গে মেলত রঙ্গে রোহিণের বলবীর॥
এই শ্রীদাম দাম সুদাম সঙ্গীগণ তের।
পুরতো বেণু ধাওত ধেনু আঙিনা ভরল মের॥
নন্দরাণী পসারি পানি বালক সেই মোর।
মুখ নেহারি দুখ বিসরি কিয়ে সুখ জানি ওর॥
শ্যামচন্দ্র চন্দ্র উদিত নামাল হৃদি ঘোর।
হেরিয়া বয়ান কহিছে নয়ান উঠ কানাই মোর॥

ভাই-ফোঁটা

কাদের নওয়াজ

আমায় দিল ভাই-ফোঁটা কে
জান্‌তে তুমি চাও আলেয়া?
তবে শুন কালিন্দী নয়,
দিয়েছে মোর বোন্ সে কেয়া।

ভাব্‌ছ সিঁথির সিঁদুর তোমার,
রইবে চিরকাল যে এবার,
মিথ্যা কথা, ভাই-ফোঁটা মোর
নয়্‌রে প্রিয়ে তাহার তরে।

তবে এবার খুলেই বলি,
শুন্‌বে যদি ধৈর্য্য ধ'রে,
বৈতরণীর বদ্বীপেরি—
মতই পূত মায়ের ক্রোড়ে—

ছিলেম্ মোরা পারুল—চাঁপায়,
বৃন্তে যেন তরুর শাখায়—
ছাড়াছাড়ি হ'তেই ক্রমে
ভুলে গেলাম পরস্পরে।

এম্‌নি ক'রেই দিন যে গোঁয়ায়,
হঠাৎ এলে তুমিই প্রিয়া!
নিলে আমার হৃদ্-কাননের
কুসুমগুলি সব তুলিয়া।

ভুলে গেলাম বোনের স্মৃতি,
ভুলিল সে ভায়ের প্রীতি,
হারিয়ে গেল অঙ্গুরী কার—
যেন বা পুষ্করার সরে।

পারুলেরে ভুল্‌ল চাঁপা
ভুলিল যে পারুল চাঁপায়,
ফিরে এল সব স্মৃতি আজ
যেন রে এই ভাইদ্বিতীয়ায়।

বোনেরি, ভাই-ফোঁটার সনে—
জননীরেও পড়্‌ল মনে,
নেমে এল ক্ষণিক স্বরগ
যেন বা এই ধরার 'পরে।

আমায় দিল ভাই-ফোঁটা কে
এখনও কি শুধাও প্রিয়ে?
কালিদহের কমল-কানন
দেখেছে যে নয়ন দিয়ে,

সরে না তার মুখেই বাণী,
প্রশ্ন করা বৃথাই রাণি!
'আজি যে এক-বৃন্তে-ফোঁটা
কুসুমেরি পরাগ ঝরে!'

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন জলযোগ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইংরেজ আমলে পড়িয়া আমাদের পাঠশালা ও বিদ্যালয়গুলি বেলা সাড়ে দশটা হইতে বিকাল চারটা পর্য্যন্ত চালাইতে হয়। সরকারী নিয়মে ইহার কোনও ব্যতিক্রম করিবার উপায় নাই। এমন কি কিশোরদিগের জন্য যে নিম্ন বা উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালাগুলি পরিচালিত হয়, তাহাতেও ১০-৩০ হইতে ৪টা (নিতান্ত বালক পক্ষে ১০-৩০ হইতে ২টা) স্কুল বসে।

এই কারণে সাধারণতঃ সকাল ৯॥ হইতে ১০টার মধ্যে বিদ্যার্থিদিগকে আহার সমাপন করিতে হয়। পল্লীর দিকে এই সকল স্কুলগুলি প্রায়ই অতি দূরে দূরে অবস্থিত; সে কারণে অনেক ছাত্রকে কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া পড়িতে আসিতে হয়। তাহাদের আহার শেষ করিতে হয় আরও আগে। ছুটী হয় চারটার পরে; সে কারণে অধিকাংশ পড়ুয়াকে সাড়ে চারটার পর হইতে বাড়ী পৌঁছিতে হয়; যাহাদের বাড়ী যত দূরে তাহাদের তত বেশী সময় লাগিয়া যায়! ইহার উপর যাহাদের বিদ্যালয়ে ছুটির পর ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের আরও অন্ততঃ আধঘণ্টা আটক থাকিতে হয়।

যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন পাঠগৃহে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দ্বিপ্রহরে বিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই সময় কিছু খাইতে না পাইয়া শরীরের বিশেষ ক্ষতি এবং বিকালের দিকে পাঠগৃহে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করা ছাত্রদিগের পক্ষে অত্যাচারের নামান্তর মাত্র হয়। হয়ত কয়েকটী বালক বাটী হইতে সামান্য দুই একটা পয়সা আনিয়া স্থানীয় দোকান হইতে কিছু কিনিয়া খায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই খাদ্য স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। তাহা ছাড়া, অনেক বালকই কিছু না খাইয়া টিফিনের সময় ছুটাছুটী, পরের দুই ঘণ্টা পাঠ এবং ব্যবস্থা থাকিলে ছুটীর পর ব্যায়াম করিয়া ঘরে ফেরে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় বাধ্যতামূলক ব্যায়াম ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক হইয়া থাকে। তখনকার ক্লান্তি অপেক্ষা সন্ধ্যার ক্লান্তি আরও গুরুতর হয় এবং রাত্রে পাঠকালে দারুণ অবসাদ আসে।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি বিদ্যালয়েই নিজশক্তিমত মধ্যাহ্নে বালকদিগকে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাতে যে কেবলমাত্র তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে তাহা নহে, মধ্যাহ্নের পর হইতে তাহাদের পাঠের রুচি ও বৃদ্ধি পাইবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মধ্যাহ্ন জলযোগের ব্যবস্থা করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেক স্থলে যে বিশেষ অসুবিধা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সামান্য যত্ন ও চেষ্টা করিলে যে ইহা সম্ভব হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে কয়েকটা বিদ্যালয়ে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দূর পল্লীতে দুটী একটী আছে। সুতরাং পল্লীর দিকে একেবারে চলে না, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রথমেই খরচের কথা আসিয়া পড়ে। আমি এই বিষয় প্রবন্ধের শেষ ভাগে আলোচনা করিতেছি। ইতিমধ্যে কত খরচ পড়িতে পারে তাহার একটা আলোচনা করা যাক্।

প্রথমতঃ সমস্ত বৎসরেই শনিবার ও রবিবার টিফিন দিবার প্রয়োজন নাই; ছাত্রেরা বাড়ী গিয়া জলযোগ করিতে পারিবে। তাহার পর গ্রীষ্মাবকাশ, পূজা ও বড়দিন লইয়া দীর্ঘ বন্ধ থাকে। ঈদ উপলক্ষে ছুটী দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। প্রাতঃকালীন (গ্রীষ্ম) বিদ্যালয়ে এবং ছাত্রদের পরীক্ষার সময় টিফিন দেওয়ায় নানা অসুবিধা আছে। তাহার উপর খরচের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে হইলেও টিফিন বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

সমস্ত বন্ধগুলি বিবেচনা করিলে বর্ত্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে ১০০ দিন হিসাব করিয়া টিফিনের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হয়।

পল্লীর দিকে জলযোগে কি খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে তাহা লইয়া এক সমস্যার কথা। সামান্য কিছু স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য দেওয়াই উদ্দেশ্য; সুতরাং সকল ছাত্রকে দেওয়া যায় এমন কোনও জলযোগের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কাজ চলে।

অন্য কিছু পাওয়া না গেলেও আটা এবং ছোলার ডাল পাইলেই চলিবে। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারা যায়, প্রকৃতপক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য এবং সকল বিদ্যালয়েই ইহার ব্যবস্থা অতি সহজেই করা যায়। রুটী এবং ডাল, তাহাতে সামান্য নারিকেল কুচি বা আলু পড়িলে খুব ভালই হয়।

যদি একটী বিদ্যালয়ে ২৫০ পড়ুয়া থাকে, তাহাদের লইয়া একটী হিসাব করিয়া দেখা যাইতে পারে! যেস্থলে ২৫০ ছাত্র থাকে গড়ে তাহাদের উপস্থিতি সংখ্যা দিনে ২১০।২১৫ জনের অধিক নহে। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১০।১৫ জন ছাত্র কোনও না কোনও কারণে দিনের সাধারণ টিফিন গ্রহণ করিবে না। বাকী থাকে দুই শত। প্রতি ছাত্রকে দুইখানি রুটী ও মাঝারি এক চামচ বা হাতা ডাল দিতে হয়।

প্রতি পোয়া আটায় দশখানি রুটী (প্রতি ছাত্রের ২খানি এবং ২০০ ছেলের) হইলে ৪০০ রুটীতে ৪০ পোয়া বা ১০ সের আটা লাগে—আনুমানিক মূল্য ১।০।

প্রতি ১০০ শত ছাত্রের জন্য ছোলার ডাল আড়াই সের হইতে তিন সের লাগে, অর্থাৎ বেশী পক্ষে ছয় সের—মূল্য ।৵০—।৶০।

মশলা প্রভৃতি তিন আনা ও কয়লা তিন আনা। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে ঘৃত দেওয়া হয় না। ইচ্ছা হইলে সামান্য দেওয়া যাইতে পারে;

সর্ব্বপ্রকারে কোনওরূপে মোট আড়াই টাকার অধিক হয় না। ইহা ছাড়া তৈয়ারী করিবার মজুরি আছে।

রুটী ডাল ব্যতীত (১) মুড়ি, নারিকেল, ঘৃত, চিনি (২) মুড়ি, মুড়কী, নারিকেল (৩) চিঁড়ে, দই, কলা, চিনি (৪) ডাল ভিজানো, চিনি, শশা প্রভৃতি (৫) আম, আনারস, কলা, ফুটী প্রভৃতি ফল (৬) ছোলা গুড় বা চিনি (৭) মটর ভিজাইয়া ঘুগনী (৮) হালুয়া, (৯) মোয়া বা খইচুর প্রভৃতি নানা প্রকার অদল বদল করা যাইতে পারে। একই প্রকার টিফিন ভাল নহে ; সুতরাং যত পরিবর্ত্তন করা যায় ততই মঙ্গল।

মুড়ি, নারিকেল (কুরা), চিনি দিয়া যে জলপান হয়, তাহা অতি উপাদেয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ। পল্লীর দিকে টাকায় ২৪ হইতে ৩২ খুঁচি মুড়ি সচরাচর পাওয়া যায়। প্রথম হিসাবেও দেখা যায়, এক খুঁচিতে আট জন ছাত্র খাইলে, এক টাকা বা এক টাকা দুই আনার মুড়ি হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার সহিত চার আনার নারিকেল (কুরা), বারো আনার (মাখন জ্বালানো) ঘৃত এবং আট আনার চিনি পর্য্যাপ্ত হইবে। ইহাতেও মোট দৈনিক খরচ আড়াই টাকার বেশী হয় না।

এইভাবে অন্যগুলিরও হিসাব করা যাইতে পারে। যদি টাকা বেশী থাকে, তাহা হইলে পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ; সুতরাং এ বিষয়ে বিরুদ্ধ আলোচনার কোনও সুযোগ নাই।

কাহারা এই সকল খাদ্য সরবরাহ করিবে বা কাহাদের তত্ত্বাবধানে হইবে, ইহাই পল্লীর দিকে মহা সমস্যার কথা। যদি অর্থানুকূল্য থাকে, তবে বিদ্যালয়ের নিজের তত্ত্বাবধানে এই সকল মাল প্রস্তুত করাইয়া বিতরণ করাই মঙ্গল। গ্রামে বহু বেকার সমর্থ লোক বাস করে। উহাদের মধ্যে যাহারা এই সকল কাজ জানে, তাহাদের কাহাকেও দৈনিক মজুরিতে নির্ব্বাচিত করিলেই চলে। ইহাতে কোনও বিশেষ অসুবিধা নাই। ইহাতে মোট খরচ দৈনিক বারো আনা হইতে এক টাকার বেশী হয় না ; অন্ততঃ হইতে দেওয়া উচিত নয়।

ইহাতে অসুবিধা থাকিলে স্থানীয় ভাল ময়রার দোকানের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য। পল্লীর দিকে জীবন্মৃত একটী দোকানও নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা পাইয়া বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ১০।১৫ বা ততোধিক ছাত্র সাধারণ টিফিন গ্রহণ করে না। তাহাদের লইয়া একটু সমস্যা। মিছরি, বাতাসা, কলা, ডাব প্রভৃতি ফল, বিস্কুট, মোয়া, খইচুর প্রভৃতি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার। ইহাতে দৈনিক চার আনার অধিক খরচ করিতে দেওয়া যায় না।

বাহিরের দোকান হইতে লইলে সর্ব্বপ্রকারে মোট খরচ তিন টাকা ; আর তাহা নিজেদের লোক দ্বারা তৈয়ারী করাইতে হইলে চার টাকা দৈনিক পড়ে। এই হিসাবে বৎসরে ১১০ দিনে ৩৩০৲ হইতে ৪৪০৲ অর্থাৎ ৩৫০৲ অথবা ৪৫০৲ টাকা পড়িবে।

আসল কথা টাকা আসিবে কোথা হইতে? বাঙ্গালা দেশে খুব কম বিদ্যালয়ই আছে যাহারা নিজেদের আয় হইতে বৎসরে এতগুলি টাকা ব্যয় করিতে পারে। সুতরাং ছাত্রদের নিকট হইতে লওয়া দরকার।

প্রতি ছাত্রের নিকট মাসিক চার আনা করিয়া লইলে বৎসরে তিন টাকা হিসাবে ২৫০ জন ছাত্রে ৭৫০৲ টাকা পাওয়া যায়। পল্লীর বিদ্যালয়ের পক্ষে এই হার খুব বেশী এবং উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রয়োজন নাই।

প্রতি ছাত্রের নিকট মাসিক তিন আনা হিসাবে লইলে বৎসরে প্রতি ছাত্র দুই টাকা চার আনা করিয়া ৫৬২॥০ হয়। যদি এই টাকা আদায় করা যায়, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দেই জলযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং হাতে কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। মাঝে মাঝে এক দিন মাংস প্রভৃতি দেওয়া যায়।

প্রতি ছাত্রের নিকট মাসিক দুই আনা হিসাবে লইলে বৎসরে দেড় টাকা হিসাবে ২৫০ জন ছাত্রে ৩৭৫৲ টাকা পাওয়া যায়। এই টাকা পাইলে নিজেদের কারিগর না রাখিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে ২৫০ ছেলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে পারি। প্রতি ছাত্রের নিকট দুই আনা লইলে খুব বেশী লওয়া হইল না এবং অভিভাবকেরা ইহা বিনা কষ্টে দিতে পারেন। কিন্তু ইহার বিপদ আছে ; যদি কোনও মাসে কম আদায় হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের উপর দেনার দায় আসিয়া পড়িতে পারে।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া প্রতি ছাত্রের নিকট তিন আনা লইলে সহজেই কাজ চলিয়া যায়।

এইখানে আরও একটী কথা আছে, তাহা সাধারণের জানা নাই। বাঙ্গালা সরকার হইতে এই জলযোগের জন্য আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে। কোনও বিদ্যালয়ে Director of Physical Education অনুমোদিত একজন শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলে এই টাকা দেওয়া হয়। প্রতি ছাত্রের নিকট হইতে মাসিক ছয় পয়সা লইলে সরকার হইতে প্রতি ছাত্রের জন্য মাসিক তিন আনা পাওয়া যায়। উক্ত শিক্ষক যে কেবলমাত্র ব্যায়াম স্বাস্থ্যচর্চ্চার কাজই পরিদর্শন করেন তাহা নহে, তাঁহার দ্বারা ছাত্রদের অন্য শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা চলে। সুতরাং এই হিসাবে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কোনও ক্ষতি নাই। উপরন্তু সরকারী টাকায় জলযোগের খরচ চালাইয়া, ছাত্রদের নিকট আদায়ী মাসিক ছয় পয়সা হইতে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির অপর চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ছাত্রদের মধ্যে জলপান বাঁটিয়া দিবার জন্য কতকগুলি তৈজসপত্রের দরকার। তাহার উপর যদি বিদ্যালয়ের মধ্যেই খাদ্যদ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে বড় চাটু বা তাওয়া একখানি, বড় কড়াই, হাতা, খন্তি, চিমটা, রুটী দিবার জন্য ডেকচি, ডাল দিবার জন্য গামলা, ময়দা মাখিবার কেটুকো, বারকোষ, চাকী ও বেলন, বাটনার জন্য হামানদিস্তা, মালপত্র ওজনের জন্য বাটখারা দাঁড়িপাল্লা প্রভৃতি লাগিবে। ছাত্রেরা যাহাতে হাত ধুইতে পারে, তাহার জন্য জলের

ব্যবস্থা থাকা চাই ; ইহার আনুমানিক ব্যয় (বর্ত্তমান সময়ে) এককালীন ১০০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা।

টিফিনের পূর্ব্বে প্রতি ক্লাসের নিকট প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসিলে, টিফিন হইবামাত্র ছাত্রেরা হাত ধুইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলে ক্লাশের নির্ব্বাচিত দুইটী ছাত্র (monitors) খাদ্য বিতরণ করিবে। পাত্রাদি যাহাতে প্রতিদিন ভালরূপে পরিস্কৃত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যাহারা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিবে এবং যাহাদের জন্য দৈনিক এক টাকা মজুরি ধরা হইয়াছে, তাহাদের লোক দ্বারা ইহা পরিস্কৃত করা হইয়া থাকে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার ; নানা অসুবিধার অহেতুক চিন্তাই ইহার পরিপন্থী ; তাহা ছাড়া অন্য বালাই নাই। ভরসা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যায়, অনেক বিষয় সহজ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ স্থানীয় দোকানদার প্রভৃতি মাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করিয়া নানা প্রকারে সহায়তা করে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অনেক অসুবিধা সহজেই দূর হইয়া যায়। বাঙ্গালার ছাত্রদের এইরূপ জলযোগ বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সকল বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকমণ্ডলী অবহিত হন, ইহাই আমার অনুরোধ।

আহ্বান

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্মুখে নিরন্ধ্র মেঘ, কৃষ্ণপক্ষ স্তিমিত রজনী,
সুচিভেদ্য অন্ধকারে শঙ্কাতুরা নিস্তব্ধ ধরণী,
অশনি চমকে শূন্যে ;—ক্ষণপ্রভা অগ্নির গোলকে
বিদীর্ণ বিক্ষত বক্ষ চরাচর কাঁদে সে আলোকে।
দিগন্তে এসেছে নামি' কালরাত্রি কুটিল করাল
উলঙ্গ উদ্দাম ঝঞ্চা মুক্ত করি' দীর্ঘ জটাজাল
ডাকে কোন্ উন্মত্ত ভৈরবে !—মত্ত বায়ুবেগে কম্পমান
ভয়ভীত স্থাবর-জঙ্গম, এরই মাঝে এসেছে আহ্বান !—

বজ্রের নির্ঘোষ নহে, স্বপ্ন নহে, নহে মরীচিকা
নহে ভ্রম, নহে মিথ্যা—এই তোর ললাটের লিখা।
আজিকে তামসী রাতে তমিস্রার পরপার হ'তে
আঁধার মন্থন করি ঐ মেঘ-সংঘাতের পথে
দুরন্ত চঞ্চল বায়ে সুদুস্তর অমানিশা ভেদি'
এসেছে নূতন বাণী, স্থির লক্ষ্য বক্ষচ্ছেদী
সুতীক্ষ্ণ শায়ক সম ;—অকস্মাৎ তাহার প্রকাশ
তড়িৎ শলাকা সম ছিন্ন করে মর্ম্মের আকাশ।

যাত্রী তুই, যাত্রা তোর শঙ্কাঘন দুর্য্যোগ লগনে
পথহীন পথমাঝে সঙ্গীহীন একান্ত বিজনে ;
—আজিকে নাহি রে আলো, নাহি আশা নাই রে আশ্বাস
অন্তরের কোণে আর একতিল নাহি ক বিশ্বাস।

বিপদ সঙ্কুল পথ, জনহীন শ্মশানের প্রায়
বিক্ষুব্ধ হৃদয় মাঝে কাঁদে প্রাণ রিক্ত অসহায়
মৃতের কঙ্কাল সম শুষ্ক অস্থি রস মজ্জাহীন
শঙ্কিত নিখিল বিশ্ব মহাত্রাসে নিঝুম বিলীন।

এই ত লগন তোর, সুনিশ্চয় স্থির যাত্রাকাল
অন্তর আলোকে জ্বালি' অনির্ব্বাণ বীর্য্যের মশাল,
অক্ষম শঙ্কা রে জিনি' অফুরাণ শক্তির সংগ্রামে
একাগ্র তপস্যা ঘিরি' উর্দ্ধে অধেঃ দক্ষিণে ও বামে,
সকল মূঢ়তা আর ক্লীবাত্মক ভীরু প্রতীক্ষায়
উপেক্ষিয়া উল্লঙ্ঘিয়া অবিচল ধৈর্য্য তিতিক্ষায়
বাহিরিয়া আয় তুই আগে—সকলে রহুক পড়ি'
জীর্ণালস্যে কম্প্রবুকে দুরু দুরু হৃৎপিণ্ড ধরি'।

নিরুদ্ধ চরণ পাতে অমারাতে তুই চল আগে
উজলি' আঁধার রাশি তোরই আলো জ্বাল্ পুরোভাগে
অতি কণ্টকিত পথ, অতি দীর্ঘ অতীব দুস্তর—
লক্ষ কোটি ম্লান মুখ তোরই পরে একান্ত নির্ভর ;
—ভয় তোর কণ্ঠমালা, বিভীষিকা খেলার পুতুল
পথপ্রান্তে ফুটে আছে মরণের মরীচিকা ফুল
ঝঞ্চা রাগে বজ্রশঙ্খ বোধনের বাজায় বিষাণ
চল্ পান্থ শ্রান্তিহীন প্রভঞ্জনে উড়ায়ে নিশান !

পথ বেঁধে দিল

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

ফেড্ ইন্।

ঝাঝায় একটি বাড়ীর সম্মুখস্থ ঢাকা বারান্দা। একটি ডেক্ চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া একটি টুলের উপর পা তুলিয়া দিয়া ইন্দু নভেল পড়িতেছে। তাহার বেশবাশ ও কেশপাশ অবিন্যস্ত।

নভেল পড়িতে পড়িতে পাশের একটি বেতের টেবিলের উপর হইতে চকোলেট লইয়া মুখে পুরিয়া ইন্দু চিবাইতে লাগিল। ইন্দুর মাতা আসিয়া ইতিমধ্যে একটি বেতের চেয়ারের মাথা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে ভৎর্সনা ও বিরক্তি মিশাইয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা স্থূলাঙ্গী গৃহকর্ত্রী।

কর্ত্রী: কেদারায় গা এলিয়ে নভেল পড়লেই চল্‌বে? এই জন্যেই বুঝি এখানে আসা হয়েছে?

ইন্দু মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল; তাহার মুখেও বিরক্তি ও বিদ্রোহ সুপরিস্ফুট।

ইন্দু: তা—আর কী করব বলে দাও—

হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকর্ত্রী বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্ত্রী: তোকে নিয়ে আমি যে কি করি ইন্দু, ভেবে পাইনা। একটু গা নাড়বি না—কেবল আলিস্যি আর নভেল পড়া। বলি, দায় কি শুধু আমারই? বিয়ে করবে কে? তুই—না আমি?

ইন্দু রুক্ষস্বরে উত্তর দিল।

ইন্দু: তা কি জানি—তুমিই বল্‌তে পার।

কর্ত্রী: ইন্দু—!

ইন্দু মাতার বিমূঢ় বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া আর থাকিতে পারিল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া মুখে বই চাপা দিল। রাগের মাথায় সে যাহা বলিয়াছিল তাহার যে একটা হাস্যকর দিক আছে তাহা সে পূর্ব্বে খেয়াল করে নাই।

কর্ত্রী: আবার হাসি!—আজকালকার মেয়েরা সত্যি বেহায়া বাপু। ও কথা বল্‌তে তোর মুখে বাধ্‌ল না?

ইন্দু আবার উদ্ধত স্বরে জবাব দিল।

ইন্দু: বাধবে কোন্ দুঃখে! তোমরাই তো আমাদের বেহায়া করে তুলেছ; নইলে একটা পুরুষ মানুষের পেছনে ছুটে বেড়াতে আমার কি লজ্জা হয়না?

কর্ত্রী: বোকার মত কথা বলিস নি ইন্দু। ছুটে বেড়াতে বলি কি সাধে। ওর বাপের যে লক্ষ লক্ষ টাকা; বিয়ে হলে সব যে তোর হবে। এতটুকু নিজের ইষ্ট বুঝতে পারিস নে?

ইন্দু সশব্দে বই বন্ধ করিল।

ইন্দু: খুব পারি। কিন্তু যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তার পেছনে ছুটে বেড়াতে নিজের ওপর ঘেন্না হয়—

কর্ত্রী: (ধমক দিয়া) ঘেন্না আবার কিসের! সবাই করছে। এই যে মীরার মা, মলিনার মা, সলিলার মা, সবাই এসে জুটেছে—সে কি হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যে? সকলের মৎলব রঞ্জনকে হাত করা—

ইন্দু বই খুলিয়া বসিল।

ইন্দু: যা ইচ্ছা করুক তারা; আমি পারব না।

কর্ত্রী: আবার বই খুললি?—পারিনে বাপু! (মিনতির সুরে) নে ওঠ—লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি সাজ গোজ করে বের হ'। কী হয়ে রয়েছিস বল্ দেখি? চুলগুলো একমাথা—মা গো মা!

ইন্দু: কোথায় যেতে হবে শুনি?

কর্ত্রী: তা—বেড়াতে বেড়াতে না হয় রঞ্জনের বাড়ীর দিকেই যা না—হয় তো সে—

ইন্দু: বলেছি তো বাড়ীতে থাকেনা—দুবার গিয়ে ফিরে এসেছি।

গৃহকর্ত্রী ইন্দুর হাত ধরিয়া একটু নাড়া দিলেন।

কর্ত্রী: তা হোক; তুই এখন ওঠ তো।—কে বল্‌তে পারে হয় তো রাস্তাতেই দেখা হয়ে যাবে—

ইন্দু: (মুখ বিকৃত করিয়া) হ্যাঁ—হয়তো দেখবো মীরা কি মলিনা আগে থাকতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্ত্রী : তাহলে তুইও সেই সঙ্গে জুটে যাবি।—আর কিছু না হোক, ওরা তো কিছু করতে পারবে না; সেটাই কি কম লাভ?—নে, আর দেরী করিস নি।

ইন্দু বইখানা বিরক্তিভরে দূরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু : বেশ, যা বল করছি।—মান ইজ্জৎ আর রইল না—

সে রাগে গাল ফুলাইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল! গৃহকর্ত্রী তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজমনেই বলিলেন—

কর্ত্রী : মান ইজ্জৎ! কথা শোনো না, টাকার কাছে মান ইজ্জৎ—!

কাট্।

ঝাঝার বাজারের পাশে একটা আম বাগান। মিহির এই বাগানের একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়া একান্তমনে কাঠ্-বিড়ালীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; বোধ হয় ফটো তুলিবার ইচ্ছা।

একটি যুবতী মিহিরের পিছন দিকে প্রবেশ করিলেন। ইনি মলিনা। পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তিনি পিছন হইতে মিহিরের চোখ টিপিয়া ধরিলেন। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—

মলিনা : বলুন তো আমি কে?

মিহির ত্বরিতে নিজের চোখের উপর হইতে মলিনার হাত সরাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইল; তারপর তাহার সন্ত্রস্ত মুখে হাসি দেখা দিল। সে মলিনার দিকে ঘুরিয়া বসিল।

মলিনার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল; সে থতমত খাইয়া বলিল—

মলিনা : ওঃ মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি রঞ্জনবাবু—!

মিহিরের আনন্দ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। মলিনা পিছু হটিতে লাগিল।

মিহির : না—আমার নাম মিহির নাথ মণ্ডল—রঞ্জন-বাবু এখানে নাই।

মলিনা : মাফ্ করবেন—

চলিয়া যাইতে যাইতে মলিনা দ্বিধাভরে দাঁড়াইল।

মলিনা : আপনি—রঞ্জনবাবুকে চেনেন?

মিহির উঠিয়া মলিনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিহির : চিনি বৈকি। আপনি কি তাঁর—কেউ?

মলিনা : বান্ধবী। তাঁকে কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?

মিহির : এই তো খানিকক্ষণ হল তিনি ফট্‌ফট্ করে এদিক দিয়ে নদীর দিকে বেড়াতে গেলেন।

মলিনা : ও! তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল বুঝি?

মিহির : কেউ না—একলা।—কী ব্যাপার বলুন দেখি? কালকেও একটি অপরিচিতা তরুণী আমাকে এই কথাই জিগ্যেস করছিলেন—

মলিনা সচকিতে মিহিরের পানে তাকাইল।

মলিনা : তাই না কি?

মিহির : হ্যাঁ। তাঁকেও বললুম। রঞ্জনবাবু তো প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াতে যান—

মলিনা একটু চিন্তা করিল।

মলিনা : হুঁ নদীর ধারটা কোন দিকে?

মিহির সোৎসাহে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

মিহির : ঐ দিকে। এই যে রাস্তাটা ঐ দিকেই গিয়েছে। ভারি সুন্দর যায়গা; পাহাড়, বন, নদী—। যাবেন সেখানে? বেশ তো চলুন না—

মলিনা : ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব।

মিহিরের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মলিনা চলিয়া গেল। মিহির একটু নিরাশ ভাবে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্।

ঝাঝার উপকণ্ঠস্থ পার্ব্বত্য ভূমি। মঞ্জুর মোটর পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়া। গাড়ী শূন্য; কাছে পিঠে কেহ নাই।

ফট্‌ফট্ শব্দ হইল; রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর মোটরের পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন অবতরণ করিয়া উৎসুক ভাবে চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু ঈপ্সিত মূর্ত্তিটিকে দেখিতে পাইল না। রঞ্জন মনে মনে একটু হাসিল; তারপর মুখে আঙুল দিয়া দীর্ঘ শিস্ দিল। শিস্ দিয়া উৎকণ্ঠ হইয়া রহিল—কোন্ দিক হইতে উত্তর আসে!

[দুইটি মানুষ যখন পরস্পর ভালবাসিয়া ফেলে তখন তাহাদের মধ্যে আদৌ খেলার অভিনয় চলিতে থাকে। এই

জন্যই বোধ হয় 'রস' 'ক্রীড়া' 'কেলি' প্রভৃতি শব্দগুলি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।]

মঞ্জু কিছু দূরে একটা বড় পাথরের চ্যাঙড়ের আড়ালে লুকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এখন একবার সতর্কভাবে ওধারে উঁকি মারিবার চেষ্টা করিল। তারপর দুই করতল শঙ্খের আকারে মুখের কাছে লইয়া গিয়া দীর্ঘ টু দিল।

মঞ্জু: টুউউউ—!

টু দিয়াই সে দেহ ঝুঁকাইয়া ক্ষিপ্রচরণে পাথরের আশ্রয় ছাড়িয়া সম্মুখ দিকে পলায়ন করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রঞ্জন আসিয়া প্রবেশ করিল; কিন্তু কেহ কোথাও নাই। রঞ্জন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে এমন সময় দূর হইতে আবার মঞ্জুর টু আসিল। রঞ্জনের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে একটু চিন্তা করিল; তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

মঞ্জু আর একটা পাথরের তলায় গিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত উলু বন; পাথরটাও বেশী উঁচু নয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথা দেখা যাইবে। মঞ্জু রঞ্জনের পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কিছু শুনিতে না পাইয়া সে উল্টা দিকে ফিরিয়া অবনতভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। পাথরের আড়ালে আড়ালে কিছুদূর গিয়া যেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেখিল ঠিক সম্মুখেই পাথরে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরাইতেছে।

মঞ্জু চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

রঞ্জন সিগারেট ধরাইয়া ধীরে-সুস্থে তাহার অনুসরণ করিল।

নদীর বালুর উপর দিয়া মঞ্জু ক্রীড়া-চপলা বালিকার মত হাসিতে হাসিতে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিতেছে। অবশেষে জলের নিকটবর্ত্তী ভিজা বালুর উপর পৌঁছিয়া সে বসিয়া পড়িল; তারপর দুহাত দিয়া ভিজা বালু খুঁড়িয়া বালির ঘর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এইখানে নদীটি প্রায় বিশ হাত চওড়া, জলের উপর সম-ব্যবধানে কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই বসাইয়া পারাপারের ব্যবস্থা হইয়াছে। জল অবশ্য গভীর নয়; কিন্তু জলে না নামিয়া তাহা অনুমান করা যায় না।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জু'র পিছনে দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

রঞ্জন: ওটা কি হচ্চে?

মঞ্জু একবার উপর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া আবার বালু-খনন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু: ঘর তৈরি হচ্চে। আপনিও আসুন না, দেখি কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন।

রঞ্জন ঘুরিয়া গিয়া মঞ্জুর সম্মুখে বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিল; বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন: মেয়েদের ঐ এক কাজ—ঘর তৈরি করা, আর ঘর তৈরি করা।

মঞ্জুর ঘর তখন প্রায় শেষ হইয়াছে; সে ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিল—

মঞ্জু: আর পুরুষদের কাজ বুঝি ঘর ভাঙা, আর ঘর ভাঙা?

রঞ্জন উত্তর দিল না; সিগারেট টানিয়া আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। তাহার চোখে ও অধর-কোণে দুষ্টামি ঝিলিক মারিয়া উঠিল। সে সরলভাবে মঞ্জু'র দিকে দৃষ্টি নামাইয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন: তোমার বাড়ীতে ক'টি ঘর?

মঞ্জু: একটি।—কেন?

রঞ্জন দুষ্টামি-ভরা চক্ষু আবার আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন: না কিছু না—এম্নি জিগ্যেস করছিলুম।

মঞ্জু কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিল।

মঞ্জু: কী কথাটা, শুনিই না।

রঞ্জন: নাঃ—কিচ্ছু না—

বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু দ্রুত একমুঠি ভিজা বালি তুলিয়া লইয়া রঞ্জনকে ছুঁড়িয়া মারিল। রঞ্জন টপ্ করিয়া মাথা সরাইয়া আত্মরক্ষা করিল; তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—

মঞ্জু: হাসি হচ্চে কেন? নিজে বাড়ী তৈরি করতে পারেন না তাই আমার বাড়ী দেখে ঠাট্টা হচ্চে?

হাস্য সম্বরণ করিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িল।

রঞ্জন: উঁহু—

মঞ্জু : তবে ?—দেখি না কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন। আমার চেয়ে ভাল ঘর তৈরি করুন তবে বুঝব।

রঞ্জন : আমি আলাদা ঘর তৈরি করছি না—

মঞ্জু : তবে ?

রঞ্জন : তোমার ঘর তৈরি হলে তাইতে ঢুকে পড়ব।

খেলাঘরের ঝগড়ার ভিতর দিয়া রঞ্জনের কথার ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা মঞ্জু বুঝিতে পারে নাই। কপট যুযুৎসায় সেও আর এক মুঠি বালি তুলিয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জু : ইঃ—! আসুন না দেখি ! আমি ঢুকতে দিলে তো ! আমার দুর্গ আমি প্রাণপণে রক্ষা করব—

রঞ্জন কিন্তু দুর্গ আক্রমণের কোনও চেষ্টা করিল না; হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মঞ্জু'র দিকে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : মঞ্জু, মনে কর আমার বাড়ী নেই; আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে তোমার কি আপত্তি হবে ?

মঞ্জু বালুমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য ঊর্দ্ধে তুলিয়াছিল, সেগুলি ঝরিয়া তাহার কাপড়ের উপর পড়িল। তাহার গাল দুটি তপ্ত হইয়া উঠিল ; সে মাথা হেঁট করিয়া কাপড় হইতে বালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন : মঞ্জু—

মঞ্জুও উঠিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

রঞ্জন : কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবার চেষ্টা করছি—

মঞ্জু তাহার সলজ্জ চোখ দুটি রঞ্জনের বুক পর্য্যন্ত তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল ; চুপি চুপি বলিল—

মঞ্জু : খুব গোপনীয় কথা বুঝি ?

রঞ্জন : হ্যাঁ। বলব ?

মঞ্জু ভালমানুষের মত বলিল—

মঞ্জু : বলুন না—এখানে তো কেউ নেই—

বলিয়া স্থানটির জনশূন্যতার প্রতি রঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই যেন পাশের দিকে চোখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদাহতের মত হাত ছাড়াইয়া সে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জনও ঘাড় ফিরাইল।

যেখানে নদীর বালু শেষ হইয়াছে তাহারই কিনারায় একটি গাছে আলস্যভরে ঠেস্ দিয়া একটি তরুণী দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। এখন তিনি একটি ক্ষুদ্র গাছের শাখা বাঁ হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মঞ্জু ও রঞ্জনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। রঞ্জনের মুখে অস্বস্তি ও বিরক্তি সুপরিস্ফুট ; তরুণীটি যে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্জু চকিতের ন্যায় তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; রঞ্জনের প্রতি একটি কুটীল ভ্রূবিন্যাস করিয়া বলিলেন—

মীরা : কী রঞ্জনবাবু ? আমাকে চিনতে পারছেন না নাকি ?

রঞ্জন : (চমকিয়া) না না, চিন্‌তে পারছি বৈকি মীরা দেবী। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম আপনাকে দেখে।—ইয়ে —(পরিচয় করাইয়া দিল) ইনি মঞ্জু দেবী—মীরা দেবী—

যুবতীদ্বয় কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া শুধু একবার ঘাড় ঝুঁকাইলেন। মীরা একটু বাঁকা সুরে রঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—

মীরা : আমিও কম আশ্চর্য্য হইনি আপনাকে দেখে—

রঞ্জন লাল হইয়া উঠিয়া কাশিল।

মীরা : —কে ভেবেছিল যে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন—

রঞ্জন : না না, লুকিয়ে আর কি—

মঞ্জু'র মুখ গাম্ভীর্য্যে রাহুগ্রস্ত। সে রঞ্জনকে বলিল—

মঞ্জু : দেরী হয়ে যাচ্ছে ; এবার বাড়ী ফেরা উচিত।

রঞ্জন যেন কূল পাইল ; সোৎসাহে বলিল—

রঞ্জন : হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়ী ফেরা দরকার। কেদার-বাবু হয় তো কত ভাবছেন।—(মীরাকে) আচ্ছা তাহলে—

মীরা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিল।

মীরা : কৈ, এখনও তো দিব্যি আলো রয়েছে ; ছটাও বাজে নি বোধ হয়। এত শিগ্‌গির বাড়ী ফেরা তো আপনার অভ্যেস নয় রঞ্জনবাবু—

মীরা মুচকি হাসিল, তারপর মঞ্জুর পানে নিরুৎসুক ভাবে তাকাইয়া বলিল—

মীরা : কিন্তু আপনার যদি দেরী হয়ে গিয়ে থাকে

তাহলে আপনাকে আট্‌কাবো না।—আসুন রঞ্জনবাবু, ঐ দিকটা খানিক বেড়ানো যাক। কী সুন্দর যায়গা!—

মঞ্জু'র মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব জোর করিয়া চাপিয়া শুষ্কস্বরে বলিল—

মঞ্জু: আচ্ছা চললুম—

মঞ্জু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বুঝি তাহার অনুসরণ করিবে; কিন্তু মীরার মধুটানা কণ্ঠস্বর তাহাকে পা বাড়াইতে দিল না। সে কেবল দুই চক্ষে আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া যেদিকে মঞ্জু গিয়াছে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

মীরা: কলকাতার কত যায়গায় আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন রোমান্টিক যায়গা কোথাও পাই নি—

মীরা রঞ্জনের বাম বাহুর সহিত নিজ দক্ষিণ বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে একটা নাড়া দিল।

মীরা:—না রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন চমকিয়া মীরার দিকে মুখ ফিরাইল।

রঞ্জন: হ্যাঁ—না—মানে—

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

মঞ্জু মোটর চালাইয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। গাড়ী প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছে। মঞ্জুর চোখের দৃষ্টি স্থির, ঠোঁট দুটি চাপা; সে প্রয়োজন মত গাড়ীর কলকব্জা নাড়িতেছে, কখনও হর্ণ বাজাইতেছে; কিন্তু তাহার মন যে আজিকার ঘটনায় একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যায়।

ফেড্‌ আউট্‌।

ফেড্‌ ইন্‌।

কেদারবাবুর ড্রয়িং রুম। মঞ্জু পিয়ানোয় বসিয়া উদাস কণ্ঠে গান গাহিতেছে; তাহার দৃষ্টি জানালার দিকে যাইতে যাইতে পথে রঞ্জনের ছবিটার কাছে আট্‌কাইয়া যাইতেছে, কিন্তু মুখের বিষণ্ণতা দূর হইতেছে না।

মঞ্জু: "ঘন বাদল আসে কেন গগন ঘিরে?
কেন নয়ন ভাসে সখি নয়ন নীরে!
ছিল উজল-শশী মেঘে পড়িল ঢাকা—
কালো কাজল মসী এল মেলিয়া পাখা—
মোর তরণীখানি বুঝি ডুবিল তীরে।"

এতক্ষণ আমরা মঞ্জুকেই দেখিতেছিলাম; কেদারবাবু যে ঘরে আছেন তাহা লক্ষ্য করি নাই। কেদারবাবু চোখে চশমা লাগাইয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া চশমার উপর দিয়া মঞ্জুর প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মঞ্জুর মনে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

গান শেষ হইলে মঞ্জু পিয়ানোর দিকে পাশ ফিরিয়া গালে হাত দিয়া বসিল। কেদারবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন, সহসা প্রশ্ন করিলেন—

কেদার: আজ বেড়াতে যাবি না?

মঞ্জু হাত হইতে মুখ তুলিল।

মঞ্জু: (নিরুৎসুক) বেড়াতে? কি জানি—

কেদার হাতের বই বন্ধ করিয়া চশমার উপর দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—

কেদার: কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

মঞ্জু উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু: না—কিছু নয়—

কেদার গলার মধ্যে হুঙ্কার করিলেন।

কেদার: হুঁঃ। তবে বেড়িয়ে এসো—

বই খুলিয়া পড়িতে গিয়া তিনি আবার মুখ তুলিলেন।

কেদার: সে ছোকরা—কি নাম? রঞ্জন!—কৈ আজকাল তো আর আসে না। চলে গেছে নাকি?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মাথা নাড়িল।

মঞ্জু: না—

কেদার: তবে আসে না কেন?

মঞ্জু: (পূর্ব্ববৎ) জানি না—

কেদার এবার তাঁহার চশমা কপালের উপর তুলিয়া দিলেন; ভাল করিয়া মঞ্জুকে নিরীক্ষণ করিয়া আবার চশমা নাকের উপর নামাইয়া দিয়া একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার দিলেন।

কেদার: হুঁঃ। তুমি এখন একটু বেড়িয়ে এসো। আর, যদি 'দৈবাৎ' সে ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে আসতে বোলো? তাকে আমার বেশ লাগে—হুঁঃ।

কেদার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। মঞ্জু একটু ইতস্তত করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য গমনোদ্যত হইল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্ব্বত্য ভূমির যে-স্থানে মঞ্জু ও রঞ্জনের গাড়ী আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত, সেখানে কেবল রঞ্জনের মোটর বাইক নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

রঞ্জন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সপ্রশ্ন নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শেষে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়া সাঙ্কেতিক শিষ্ দিল। কিন্তু কোনও দিক হইতেই উত্তর আসিল না।

রঞ্জন প্রথম দিন যে পাথরের স্তম্ভের মাথায় উঠিয়াছিল সেইদিকে দৃষ্টি তুলিল কিন্তু সেখানে কেহ নাই। রঞ্জন নদীর দিকে চলিল।

নদীতীর জনশূন্য; সেখানে মঞ্জু নাই।

রঞ্জন চিন্তিত মুখে সেখান হইতে ফিরিল। যে পাথরের ঢিবির পশ্চাতে মঞ্জু লুকাইয়া লুকোচুরি খেলার অভিনয় করিয়াছিল তাহাতে কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া রঞ্জন ভাবিতে লাগিল।

কিছু দূরে একটা ঝোপের মত ছিল; ঘন আগাছা ও কাঁটা গাছ মিলিয়া খানিকটা স্থান বেড়ার মত আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেই বেড়া ফাঁক করিয়া একটি যুবতী উঁকি মারিল। যুবতীটি মলিনা। ক্ষণেক নিঃশব্দে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া মলিনা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রঞ্জনের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। কী হইল? মঞ্জু আজ আসিল না কেন? সহসা তাহার দুশ্চিন্তা জাল ছিন্ন করিয়া ঝোপের অন্তরাল হইতে রমণী কণ্ঠের উহু কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া রঞ্জন মুখ তুলিল। তারপর দ্রুত ঝোপের কাছে গিয়া কাঁটা গাছ দু'হাতে সরাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কাট্।

যেখানে রঞ্জনের মোটর-বাইক দাঁড়াইয়াছিল, মঞ্জুর গাড়ী সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। একটু দূরে গাড়ী দাঁড় করাইয়া মঞ্জু গাড়ী হইতে নামিল, নিরুৎসুকভাবে এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর মন্থরপদে নদীর দিকে চলিল।

কাট্।

ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রঞ্জন দেখিল অদূরে একটি গাছের তলায় একটি যুবতী পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটস্থ হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রঞ্জন: এ কি! মলিনা দেবী—!

মলিনা কাতরভাবে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল—

মলিনা: রঞ্জনবাবু! আপনি! উ—ঃ!

রঞ্জন একটু ইতস্তত করিয়া মলিনার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

রঞ্জন: কি হয়েছে?

মলিনা: বেড়াতে এসেছিলুম—হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা মচ্‌কে গেছে—

যেন যন্ত্রণা চাপিবার জন্য মলিনা অধর দংশন করিল।

রঞ্জন: তাই তো—কোনখানটা—দেখি?

পায়ের গোছের উপর হইতে শাড়ীর প্রান্ত সরাইয়া রঞ্জন চরণ দুটি পর্য্যবেক্ষণ করিল, কিন্তু কোথাও স্ফীতির লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

রঞ্জন: কোন্ পায়ে?

মলিনা: (মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিয়া তাড়াতাড়ি) বাঁ পায়ে।

রঞ্জন: এইখানে?—লাগছে?

তর্জ্জনী দিয়া রঞ্জন পায়ের আহত স্থানটা টিপিয়া দিতেই মলিনা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রঞ্জন দ্রুত আঙুল টানিয়া লইল।

কাট্।

মঞ্জু ইতিমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ঝোপের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; ঝোপের অভ্যন্তরে চীৎকার শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; বিস্মিতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া মঞ্জু দ্বিধা-শঙ্কিত ভাবে ঝোপের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কাট্।

ওদিকে রঞ্জন রুমাল বাহির করিয়া মলিনার পায়ের গোছ বাঁধিয়া দিতেছে; মলিনা সময়োচিত ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করিয়া যেন যন্ত্রণা অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঁধা শেষ করিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন: এবার দেখুন তো উঠ্‌তে পারেন কিনা—

মলিনা উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মলিনা: আপনি সাহায্য করুন, নইলে উঠ্‌তে পারব না—

রঞ্জন উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন: আমি—সাহায্য—! আচ্ছা—

রঞ্জন মলিনার একটা বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল।

মলিনা: না, না, ও রকম করে নয়।—আপনি হাঁটু গেড়ে বসুন—এইখানে—

মলিনা নিজের পাশে হাঁটু গাড়িবার স্থান নির্দ্দেশ করিল। ঘাতকের খড়্গের সম্মুখে আসামীকে হাঁটু গাড়িতে বলিলে তাহার মুখের ভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ মুখ লইয়া রঞ্জন মলিনার পাশে নতজানু হইল।

মলিনা তাহার বাম বাহুটি রঞ্জনের কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া বলিল—

মলিনা: এইবার আপনি উঠুন—

রঞ্জন উঠিল; সেইসঙ্গে মলিনাও দাঁড়াইল।

একজন ঝোপ ফাঁক করিয়া যে এই পরম ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটি লক্ষ্য করিতেছে তাহা ইহারা দেখিতে পাইল না। মঞ্জুর মুখ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি কঠিন। সে আর দাঁড়াইল না; হাত সরাইয়া লইতেই ঝোপের ডালপালা তাহাকে আড়াল করিয়া দিল।

এদিকে রঞ্জন গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; টানাটানি করিয়া নয়, বিনীত শিষ্টতার সহিত।

রঞ্জন: এবার বোধ হয় আপনি দাঁড়াতে পারবেন—

মলিনা: দাঁড়াতে হয় তো পারি, কিন্তু একলা হাঁটতে পারব না। বাড়ী যেতে হবে তো। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, নৈলে কি করে যে বাড়ী যেতুম—

এইভাবে বাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া রঞ্জন ঘামিয়া উঠিল; ক্ষীণস্বরে বলিল—

রঞ্জন: অ্যাঁ—বাড়ী—! কিন্তু—

কিন্তু মলিনার বাহুবন্ধন শিথিল হইল না। হতাশভাবে রঞ্জন তদবস্থায় সম্মুখ দিকে পা বাড়াইল।

কাট্।

পূর্ব্বোক্ত স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের বাইক দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে, প্রবেশ করিল; গাড়ীর চালকের আসনে বসিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জন ও তাহার কণ্ঠলগ্ন মলিনাকে আসিতে দেখা গেল। দূর হইতে মোটর-বাইক দেখিতে পাইয়া মলিনা বলিল—

মলিনা: ওটা বুঝি আপনার মোটর বাইক?

রঞ্জন: হ্যাঁ—

মলিনা: ভালই হল। আপনি গাড়ী চালাবেন, আর আমি আপনার কোমর ধরে পেছনে বস্‌ব—

চিত্রটি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়া রঞ্জনের হাত-পা শিথিল হইয়া গেল। মলিনা আর একটু হইলেই পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত রঞ্জনের গলা চাপিয়া ধরিয়া পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডিজল্‌ভ্।

ঝাঝার একটি পথ। মিহির পথের মাঝখান দিয়া চলিযাছে। তাহার অবিচ্ছেদ্য ক্যামেরাটি অবশ্য সঙ্গে আছে।

পিছনে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া মিহির পিছু ফিরিয়া তাকাইল; তারপর তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বাহির করিতে করিতে রাস্তার একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ী চালাইতেছে; মলিনা তাহার কোমর জড়াইয়া পিছনে বসিয়া আছে। মলিনার মুখ মিহিরের দিকে। মোটর বাইক সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেই মিহির টক্ করিয়া ফটো তুলিয়া লইল।

মোটর বাইক চলিয়া গেল। মিহির ক্যামেরা হইতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে সার্থকতার হাসি ক্রীড়া করিতেছে।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

ক্রমশঃ

আর্য্য পূজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান

(২)

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

বিধিমত আচমনের পরে বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য। বিষ্ণু স্মরণান্তে (কাম্য নৈমিত্তিক কর্ম্মস্থলে স্বস্তিবাচন, পূজার সংকল্প, সংকল্পসূক্ত পাঠ ও ঘট-স্থাপনাদি) গন্ধাদির অর্চ্চনা, নারায়ণাদির অর্চ্চনা, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, দ্বারদেবতা পূজা, গুরুপংক্তি প্রণাম, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দিগ্বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, সর্ব্বদেব-দেবীর সংক্ষেপ পূজা, ধ্যান, মানসপূজা বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠদেবতাপূজা (চক্ষুর্দ্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা) পুনর্ধ্যান, আবাহন ও পূজা করিতে হয়। এই সকল বিধি ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

বিষ্ণুস্মরণ

যথা বিধি আচমনের দ্বারা হৃদয়াদিশুদ্ধি ঘটিলে পূজককে বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ করিতে হইবে। বিষ্ণুস্মরণের মন্ত্র যথা :—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পরমাত্মরূপী বিষ্ণু বা ব্যাপনশীল ব্রহ্মের পরম পদ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন। বিষ্ ধাতুর উত্তর নুক্ প্রত্যয় করিয়া বিষ্ণু শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। বিষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। অতএব বিষ্ণুশব্দের অর্থ ব্যাপনশীল। তৎশব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়। গীতায় আছে "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশোব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। "অতএব "তদ্বিষ্ণু" শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল পরমাত্মা। এই ব্যাপনশীল পরমাত্মার শ্রেষ্ঠপদ জগচ্চক্ষুঃ। সূর্য্যের অবস্থান আকাশে। শাস্ত্রে আছে "হৃদ্ব্যোম্নিতপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যঃ স চান্তরে। অর্থাৎ এই ভর্গ হৃদয় ও আকাশে উভয়ত্রই বিদ্যমান। আকাশে সূর্য্যরূপে এবং অন্তরে পরমাত্মরূপে। পণ্ডিতগণ এই ভর্গ অর্থাৎ তেজকে সর্ব্বদা হৃদয় ও বাহিরে দেখিয়া থাকেন। বহির্জগতে ইনি জগচ্চক্ষুঃ সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হন। শ্রুতিতে পাওয়া যায় "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবি।" অখিল ভূতসকল বিষ্ণুর একচরণে অবস্থিত এবং তাঁহার পরমানন্দমূর্ত্তি যাহা স্বর্গ বা আকাশে অবস্থিত তাহা সেই বিষ্ণুর ত্রিপাদে।

পুরাণকার এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন, যথা—স্বর্গে ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তশয্যায় চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু শায়িত। তাঁহার চতুর্হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাঁহার বাহন গরুড় এবং লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃ-স্থিতা। তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়। এই আনন্দময় বিষ্ণু হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতেই জগতের স্থিতি এবং ইঁহাতেই লয়। পুরাণ কারের মতে বিষ্ণু স্মরণের মন্ত্রদ্বারা এইরূপ দেব বিশেষই স্মৃতিপথে উদিত হন। যাহা হউক এই পুরাণ বচনের বৈজ্ঞানিক অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। মনুস্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ড মভবদ্ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সূর্য্যের মত উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ অণ্ডে পরিণত হইল। এই অণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ড। স্মৃতিকথিত এই জলকে সর্ব্বব্যাপী ব্যোম বলিয়াই মনে হয়। ইহার ইংরাজী নাম "ঈথার"—এই ব্যোম বা আকাশ জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহারই নাম কারণ সলিল। এই সলিল হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। শ্রুতিও এই মনুবাক্যের সমর্থন করিয়াছেন যথা :—"তস্মাদ্বা এত স্মাদত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদি।" আকাশই পুরাণ-বর্ণিত ক্ষীরোদ সমুদ্র ও মনুবর্ণিত কারণসলিল। সূর্য্যমণ্ডল সেই সমুদ্র-স্থিত অনন্তশয্যা। অনেকেই জানেন সূর্য্যের এক নাম অনন্ত। সূর্য্যের সহস্র কিরণ অনন্ত নাগের সহস্র মস্তক। কিরণ যেরূপ আলোকদ্বারা বিশ্বের প্রকাশক, মস্তকও সেইরূপ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আধারভূত হওয়ায় বিশ্বজ্ঞানের প্রযোজক। তাই সূর্য্যের কিরণকে অনন্তের মস্তক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই জন্যই ত শাস্ত্রে কথিত আছে—"সহস্র-শীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি। আবার গরুড় সেই পুরাণবর্ণিত বিষ্ণুর বাহন। ইহারও এক বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। গরুড়ের এক নাম খগ। খ শব্দের অর্থ আকাশ। খকে অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া যে গমন করে তাহাকে খগ বলে। অতএব খগ শব্দের অর্থ আকাশস্থ-বিচরণ পথ বা গ্রহ কক্ষ। সূর্য্য এই আকাশপথ অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। কেহ কেহ বলেন সূর্য্য স্থির এবং গ্রহগণই সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করে। তাহা হইলেও পৃথিবীবাসী জীবগণের নিকটে সূর্য্য আকাশপথে বিচরণ করেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই সূর্য্যের কক্ষকে অনন্তশায়ী-বিষ্ণুর বাহন গরুড় বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদস্থ অনন্তশায়ী বিষ্ণু সেই সূর্য্য মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গ বা নারায়ণ। তিনিই নরের আশ্রয়। তাইত, বিষ্ণুর ধ্যানে জানি—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ। এই আকাশস্থ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণই অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বিরাট্ আকাশ তাঁর অপার ক্ষীরোদধি, সূর্য্যমণ্ডল তাঁর অনন্ত নাগশয্যা, এবং সূর্য্যের সহস্র কিরণ সেই নাগের সহস্র মস্তক আকাশস্থ বিচরণপথ সেই বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বাহন খগ অর্থাৎ গরুড়। করস্থ শঙ্খের ধ্বনিতে তিনি নামরূপাত্মক জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার হস্তস্থিত চক্র অর্থাৎ গ্রহগণের অবিরত চক্রভ্রমণ সৃষ্টির চিরন্তন আবর্ত্তন সূচনা করিতেছে, তাঁহার পাণিস্থ গদা সংসার নিয়ম ভঙ্গে পাপীর ত্রাসের-সূচক (গদ্ ধাতুর অর্থ ত্রাস), তাঁর করস্থ পদ্ম প্রেমপুষ্পের নিদর্শন, তাঁর বক্ষঃ স্থিতা লক্ষ্মী তাঁর হলাদিনীশক্তি। এইরূপ বিষ্ণুরই পরমপদ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা আকাশে

বিস্তৃত জগচ্চক্ষুর মত দেখিয়া থাকেন। এই বিষ্ণুর পরম-পদ-দর্শনে পূজক অন্তর্বহিঃশুদ্ধ হইয়া থাকেন। স্ত্রী ও শূদ্রের বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রও এইরূপ অর্থেরই সূচনা করে। যথা:—নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ। এইরূপ বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা অন্তর্বহিঃশুদ্ধ হইয়া পূজককে কাম্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মস্থলে স্বস্তিবাচন, সংকল্প ও ঘটস্থাপনাদি করিতে হইবে। নিত্যপূজায় স্বস্তিবাচনাদির প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, অতঃপর স্বস্তিবাচন বিবৃত হইতেছে।

স্বস্তিবাচন

স্বস্তিবাচনের বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ পুরোহিত দর্পণাদি পুস্তকে পাইবেন। এস্থলে আমরা কেবল সেই সকল মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক অর্থ-প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। স্বস্তিবাচন বিধিতে প্রথমে পুণ্যাহবাচন তৎপরে ঋদ্ধিবাচন এবং পরিশেষে স্বস্তিবাচন মন্ত্রসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কাম্য কর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমত পুণ্যদিন দেখিয়া করিতে হয়। কারণ কাল, দেশ ও পাত্রের প্রভাব জীবে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পুণ্যকালে, পুণ্যদেশে এবং পুণ্য চিত্তে কর্ম্ম করিলে তাহা সুসিদ্ধ হয়। শুভতিথিনক্ষত্রাদির প্রভাবে এবং তাহাদের সদ্ভাবজ্ঞানে জীবের হৃদয়ে একটা বিমল আনন্দের আবেশ হয়। এই আনন্দ তাহাকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে সুদৃঢ়রূপে চালিত করে। সেই জন্যই প্রতি কর্ম্মের প্রারম্ভে পুণ্যাহ বাচন আবশ্যক। তারপরে ঋদ্ধিবাচন। ঋদ্ধিবাচনের দ্বারা পূজাস্থান সমৃদ্ধ হয় এবং সর্ব্বশেষে স্বস্তিবাচন। স্বস্তিবাচনের দ্বারা পাত্র অর্থাৎ পূজকের চিত্ত পবিত্র হয়। অতএব দেখা গেল—পুণ্যাহবাচন, ঋদ্ধিবাচন এবং স্বস্তিবাচন যথাক্রমে কালশুদ্ধি, দেশশুদ্ধি ও পাত্রশুদ্ধির নিয়ামক! এই পুণ্যাহাদিবাচন ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই কর্ত্তব্য। স্বস্তিবাচনের সর্ব্ব সাধারণ মন্ত্র আমরা এইরূপ দেখিতে পাই যথা:—

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥"

অর্থাৎ বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র বিশ্ববেদা সূর্য্য অরিষ্টনেমি গরুড় এবং বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। 'ইন্দ্‌' ধাতুর উত্তর 'র' প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। 'ইন্দ্‌' ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য। অতএব যিনি আধিপত্য করেন বা ঐশ্বর্য্যশালী হন, তিনি ইন্দ্র। জীবের অহংকারতত্ত্বই ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিপতি। কারণ অহংকার হইতেই জীবের ভোগ। নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত স্বভাব আত্মার প্রকৃত কোন ভোগ নাই। অহংকার হইতে একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় তাহারাই ভোগের উপাদান সৃষ্টি করিয়া জীবের সম্মুখে ধরে। জীব অভিমানবশত আপনাকে এই সকল উপাদানের অধিপতি মনে করে। অতএব ইন্দ্র শব্দে জীবের ঐশ্বর্য্যশালী অহংকার তত্ত্বকে বুঝায়। আবার 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতে গেলে বলিতে হয়—বৃদ্ধ শ্রবঃ যার অর্থাৎ বহুদিন হইতে যার শ্রুতি বা খ্যাতি আছে তিনিই বৃদ্ধশ্রবাঃ। অতএব দেখা যাইতেছে—'বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ'—অর্থে—বহুজন্ম ধরিয়া জগতে গমনাগমনপূর্ব্বক সংসার ভোগী অহংকারতত্ত্ব। এই অহংকার আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন অর্থাৎ জড়ভোগের দ্বারা আমাদিগকে বদ্ধ না করিয়া আত্মতত্ত্ব নিয়োগে আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করুন—ইহাই 'স্বস্তিন ইন্দ্রো-বৃদ্ধশ্রবা' বাক্যের তাৎপর্য্য। তৎপরে 'স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা' বাক্যের বিচার। পূষা শব্দের অর্থ সূর্য্য এবং বিশ্ববেদা (বিশ্বান্ সকলান্ বেত্তি) অর্থে সর্ব্বজ্ঞ। সূর্য্যই বিশ্বপ্রকাশক বলিয়া সূর্য্যকে সর্ব্বজ্ঞ বা বিশ্ববেদা বলা যাইতে পারে। আবার অন্তর্জগতে এই সূর্য্য জীবাত্মা বা বুদ্ধিস্থ চৈতন্য। অতএব 'স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা'—বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝিব—বিশ্বজ্ঞ সূর্য্য অর্থাৎ ব্যাবহারিক জীব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্য বিচার দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক তল্লাভের দ্বারা আমাদের শ্রেয়ঃসাধন করুন। তারপর বাক্য আছে—"স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমিঃ।" অরিষ্টনেমি ও তার্ক্ষ্য উভয়শব্দের অর্থই বিষ্ণুর বাহন গরুড়। অরিষ্টশব্দে শুভাশুভ অদৃষ্ট বুঝায় এবং নেমির অর্থ চক্রধারা। অতএব অরিষ্টনেমি পদে শুভাশুভাদৃষ্টবাহিকা চক্রধারা বা চক্রবৎপরিবর্ত্তন-শীল শুভাশুভ অদৃষ্ট বুঝায়। আবার তার্ক্ষ্য শব্দের অর্থ গরুড় এই গরুড় আকাশচারী এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রগামী। ইহা বিষ্ণু বা নারায়ণের বাহন। এই বাহনে আরোহণ করিয়া নারায়ণ পলমধ্যে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মাকে নারায়ণ ভাবিলে গরুড় হইবে জীবের মনঃ। কারণ, মনের গতি গরুড়ের মতই ক্ষিপ্র এবং মনঃ সঙ্কল্পবিবেকবৃত্তির দ্বারা শুভাশুভ অদৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া অরিষ্টনেমি হইয়া থাকে। এই মনোরূপ গরুড়ের নায়কত্বে জীবরূপে বদ্ধ পরমাত্মার সংসারে গমনাগমন হয়। "স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমিঃ।" এই বাক্যে আমাদের বুঝিতে হইবে—শুভাশুভাদৃষ্ট বাহক মনঃ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন অর্থাৎ মনঃ সদ্বোৎ কর্ষলাভ দ্বারা শুভাশুভ অদৃষ্ট না জন্মাইয়া আত্মস্থিতিপূর্ব্বক পরমাত্মধ্যানোপযোগী হইয়া আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করুন। সর্ব্বশেষে আমরা বাক্য দেখিতে পাই—"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।" অর্থাৎ বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। এই বৃহস্পতি পরমাত্মা। বৃহৎ ও পতি শব্দের সন্ধি হইয়া নিপাতনে বৃহস্পতি শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ পতি বা পালন কর্ত্তা তিনি পরমাত্মা ভিন্ন কি হইবেন? অতএব বৃহস্পতি শব্দে পরমাত্মাই লক্ষিত হয়। এই পরমাত্মার অধ্যাসেই জীবদেহ রক্ষিত হয়। অথবা বৃহস্পতি শব্দের অর্থ বৃহতের পতি বা বাক্যের পতি। জীব কোন কার্য্য করিবার সময়ে আদেশ বাক্য পরমাত্মার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে অবিদ্যার প্রভাবে জীবের বুদ্ধি সত্ত্ব এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে যে, সে পরমাত্মার বাণী শুনিতে পায়না। এরূপ স্থলে নিত্যমুক্ত জীব ইচ্ছা করিয়াই বন্ধনকে বরণ করিয়া লয়। ইহার নাম জীবের এক প্রকার আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত জীবকে অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্যকে পরমাত্মার বাণী শুনিতে হইবে। এই সমস্ত বিচার করিলে জানা যায়—স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। এই বাক্যের অর্থ বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন অর্থাৎ পরমাত্মা আমাদের প্রতি কার্য্যে এরূপ আদেশ বাণী দিন যাহা আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। তাহা হইলে আমরা অশ্রেয়ঃ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ পথে অগ্রসর হইতে পারিব। এই গেল স্বস্তিবাচন।

বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলন

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম-এ

বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির অন্তরায় এবং বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃত কারণ

১৯০৪ সালের সমবায় আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতেই বাঙ্গালায় সমবায় ঋণ দান সমিতি স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯১২ সালে যে দ্বিতীয় সমবায় আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার ফলে ঋণদান ব্যতীত অন্য ভাবে স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় নীতির ভিত্তিতে বাঙ্গালায় নানা শ্রেণীর সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলনের যে প্রসার ও ব্যাপ্তি হইয়াছে তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সারা বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেণীর সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৪,২৫৬। আলোচ্য বর্ষে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮,৬৮,৫৪০; ইহাদের মোট কার্য্যকরী মূলধন ছিল ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু সমবায় আন্দোলনের প্রসার বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ও প্রয়োজনের তুলনায় যে খুব উল্লেখযোগ্য হয় নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশের সমবায় আন্দোলনে হাজার করা ১৫৭ জনের বেশী লোক যোগদান করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির হিসাব মত বাঙ্গালার কৃষকের কৃষিকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য (short and intermediate loans) যে টাকার প্রয়োজন তাহা প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি মাত্র চারি কোটি টাকার মত ঋণ দান করিয়া কৃষককে সাহায্য করিতেছে।*

বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলনের এই প্রকার সামান্য অগ্রগতির বাহ্য কারণসমূহ (external handicaps) প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমবায় আন্দোলন বিশেষভাবে দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াসে ব্যাপৃত। কিন্তু নিরক্ষর জনসাধারণ সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার মূলনীতিসমূহ সম্যক উপলব্ধি করিতে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম হওয়ায় তাহাদের মধ্যে আন্দোলনের বিস্তার বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার প্রত্যেক গ্রামেই কতকসংখ্যক লোক রহিয়াছে—যাহাদের মধ্যে সাধারণ ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ যদি বিশেষভাবে মিতব্যয়ী এবং স্ব স্ব আয়-ব্যয়ের তুলনায় দূরদর্শী না হয় তবে সমবায় আন্দোলন কোন ক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করিতে এবং দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এক সময় মহাজন সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতাও অনেক ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিত দেখা গিয়াছিল। মহাজনদিগের নিকট হইতে ধান্যোৎপাদন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের জন্যও সহজে ও অল্প সময়ে ধার পাওয়া সম্ভব ছিল বলিয়া অনেকে তাহাদের নিকট হইতেই টাকা ধার করা সুবিধাজনক মনে করিত। এই জন্যও কৃষকদিগকে ব্যাপকভাবে সমবায় আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখা যায় নাই।

আর সব চাইতে বড় কথা হইতেছে এই যে, সমবায় আন্দোলন যে সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহা এত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলতাময় যে, এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করা সময়সাপেক্ষ। কৃষককে কৃষিকার্য্য চালাইবার জন্য অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা

---

* অবশ্য কৃষকদের আর্থিক অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাদিগকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানের ও পুরাতন ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তও করিতে হইবে। এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, যথেষ্টসংখ্যক শক্তিশালী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কৃষকদের এই অভাব দূরীভূত হইবে না এবং সাধারণ সমবায় সমিতিসমূহের পক্ষে এই শ্রেণীর ঋণদান করা সম্ভব নহে। 'ভারতবর্ষ'এর পূর্ব্বের এক সংখ্যায় দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

করায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরাতন ঋণ শোধের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কৃষকের যথার্থ উন্নতি অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমি একত্রিত করিতে হইবে; জল সেচ ও জল নিকাশের এবং উন্নততর প্রণালীতে কৃষি-ব্যবস্থা চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করাও একান্ত আবশ্যক। গোটা সমস্যাটাকে শত-দিক হইতে সমাধান করিবার জন্য চেষ্টিত না হইলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি অসম্ভব এবং এই দৃষ্টি-কোণ হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমস্যাটার জটিলতার জন্য সমবায় আন্দোলনের প্রসার মন্দগতিতে অগ্রসর হইতে বাধ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালার সমবায় সমিতিসমূহের পরিচালনা, কার্য্যপ্রণালী ও গঠননীতি প্রভৃতি সম্পর্কে কোনই দোষত্রুটি ও গলদ নাই এই কথা কেহই বলিবেন না। পক্ষান্তরে নানা প্রকার আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও দোষত্রুটির জন্যও বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এই সকল কারণে বর্ত্তমানে সমবায় সমিতি-গুলির এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় তথা ভারতে সমবায় সমিতি গঠন ব্যাপারে প্রথম হইতেই জনসাধারণের দিক হইতে আশানুরূপ স্বতপ্রণোদিত ইচ্ছা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাপারে সরকারী চেষ্টা ও উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে যে সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে সজীব-ভাবে জাগিয়া উঠিতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন ও ইহাদের পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়ার ব্যাপারে যে নিরুৎসাহতার ও নিরুদ্যমতার ভাব দেখা গিয়াছে তাহার ফলে আন্দোলনের প্রাণপূর্ণতা ও সজীবতা অনেকাংশে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা ইহা বলি না যে বর্ত্তমান অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ আরও কম হওয়া দরকার। বরং নানা ব্যাপারে—বিশেষভাবে সমিতির হিসাব-নিকাশ ও কার্য্যপরিচালনা সম্পর্কে সরকারী তত্ত্বাবধান আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইবে। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, জনসাধারণ যদি আন্দোলনের প্রতি উৎসাহী ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়, তাহারা এই ব্যাপারে যদি আত্মনির্ভরশীল হইয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে শুধু সরকারী উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় আন্দোলনকে সজীব রাখা যাইবে না। ইহাকে বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের একটা প্রধান আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা বলা যাইতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী ও সমস্যা সম্বন্ধে যে শুধু জনসাধারণই অজ্ঞ এই কথা বলিলে তাহাদের প্রতি কিছু অবিচার করা হয়। কারণ দেখা গিয়াছে যে, সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দও অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের সাধারণ নীতি ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সমবায় সমিতির সভ্যদের সম্পর্কে এই উক্তি আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সমবায় আন্দোলনের সহিত যাঁহারা জড়িত আছেন তাঁহাদের মধ্যে সমবায় নীতি ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না হইলে আন্দোলন কিছুতেই অগ্রসর লাভ করিতে পারে না। বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী সত্যই বলিয়াছেন যে, এই প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ গলদসমূহের উৎস-সন্ধান এই স্থানেই পাওয়া যাইবে।

সমবায় সমিতির দাদনী টাকার সুদ ও আসল টাকা যদি সভ্যগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করে তাহা হইলে আন্দোলনের আর্থিক অবস্থা কিছুতেই সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। অনিয়মিতভাবে সভ্যগণ কর্ত্তৃক ঋণ পরিশোধের জন্যই বিশেষভাবে সমবায় সমিতিগুলি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, যথাসময়ে এবং পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধিত না হইলে লোকশিক্ষার ও আর্থিক উন্নতির দিক হইতে সমবায় আন্দোলনের কোনই সার্থকতা নাই। দক্ষ তদ্বির-তদারকের অভাব, প্রাথমিক সমিতির পরিচালকদের ঔদাসীন্য, পুরাতন ঋণভার, সদস্যদের ঋণশোধ-ব্যাপারে স্বাভাবিক আলস্য, শস্যহানি ও স্বল্প পণ্যমূল্য ইত্যাদি ঘটনা এই গলদের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিচালক-সদস্যগণ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করিলেও তাহাদিগকে আইনত ঋণ শোধ করিতে অন্য কেহ বাধ্য করিতে পারে না। ফলে, পরিচালক-সদস্যদের মধ্যে এই ব্যাধি বিশেষভাবে দৃষ্ট

হয় এবং তাহা ক্রমে অন্য সভ্যদের স্বভাব প্রভাবান্বিত করিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ সমবায় সমিতিসমূহ কেবল টাকা দাদন কার্য্যেই তাহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির স্বল্প সুদে ঋণদান করাই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন। অথচ সভ্যদের মধ্যে 'সঙ্ঘশক্তির ভাব' সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মিলিত চেষ্টায় ও সাহায্যে নিজেদের বর্ত্তমান দুরবস্থার উন্নতি করাই যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য তাহা নিজেরাও বুঝিতে পারে নাই এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী ও নেতৃবৃন্দও তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন নাই। বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের ইহাও একটা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেকের মতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনের দিক হইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক সমিতি শুধু এক একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যথা, কোন সমিতি কেবলমাত্র ঋণদানের জন্য, কোন সমিতি শুধু পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সকল শ্রেণীর সমিতির সভ্য না হইলে কোন গ্রামবাসীর পক্ষে সমবায় আন্দোলনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করা সম্ভব নহে। তাই অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমিতি যদি সভ্যগণকে টাকা ধার দিবার, তাহাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদি, উৎকৃষ্ট ফসলের বীজ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল সরবরাহ করিবার, তাহাদের জমিতে সেচ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে সমিতির কাজ ও সভ্যদের সহিত সমিতির সম্পর্ক শুধু যে ব্যাপক হইবে তাহা নহে, গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ আর্থিক জীবন সমিতির কাজ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে; সমিতির সহিত সভ্যদের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও সর্ব্বক্ষণস্থায়ী হইবে, জনসাধারণ এই ধরণের সমিতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে এবং ফলে সমগ্র আন্দোলন সজীব, বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিবে। অবশ্য বহু উদ্দেশ্যমূলক নীতির ভিত্তিতে প্রাথমিক সমিতি গঠিত হইলে সভ্যদের দায়িত্ব সসীম হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু যে গলদের ফলে এই প্রদেশের সমবায় সমিতিসমূহ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং যে সমবায় সমিতিসমূহের পূর্ব্বকৃত দাদনী টাকার বেশীর ভাগ একেবারে বা আংশিকভাবে অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে, বিগত কয়েক বৎসরের কৃষি-সঙ্কটের ফলে কৃষিজাত পণ্যের যে মূল্য হ্রাস হয় সেইজন্য এবং সমবায় সমিতির ঋণদান ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ কার্য্যনীতির দরুণ এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

সমিতি হইতে টাকা ধার লইবার সময় যদিও ঋণ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিতে হয়, তবু কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতি, সভ্য অন্য উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করিতেছে কি না, তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে নাই। অনেক ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি আবার দীর্ঘ ও অল্পকাল মেয়াদী দাদনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ঋণ-পরিশোধের কাল বাড়াইয়া দিয়া ও কোন সভ্যের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া কাগজপত্রে উল্লেখ করিয়া সেই সভ্যকেই আবার নূতন ঋণ দেওয়া হইয়াছে; এইভাবে হিসাব দেখাইয়া অল্প মেয়াদী ঋণ কার্য্যত সমিতির পরিচালনার ত্রুটিতে দীর্ঘ মেয়াদী দাদনে পরিণত হইয়াছে। এই সব নানা কারণে এবং অনেক স্থলে সভ্যের পরিশোধ করিবার শক্তির অতিরিক্ত ঋণদান করার ফলে প্রাথমিক সমিতির দাদনী টাকার একটা অংশ একেবারে অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্য অংশও দীর্ঘ ও অল্পকাল-ব্যাপী ছোট ছোট কিস্তির সাহায্য ব্যতীত আদায় করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় প্রাথমিক সমিতিগুলি আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ইহার দরুণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি আবার আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে সমিতিসমূহ নূতন ঋণ দেওয়া বহুলাংশে স্থগিত করিয়া ফেলিয়াছে, অনেক সমিতির পক্ষে তাহাদের সঞ্চিত তহবিল ও আদায়ী টাকা হইতে আমানতকারীদের প্রাপ্য সুদ ও সমিতির আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব নানা কারণে

সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের আস্থাও হারাইতে বসিয়াছে। এইভাবে বিকৃত ঋণদান-নীতির, পরিচালনা সম্পর্কে নানা প্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থার এবং বিগত কৃষি-সঙ্কটের ফলে সমবায় আন্দোলন এক বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছে এবং এই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে পাপচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দরুণ বাঙ্গালার সমগ্র সমবায় আন্দোলন একটি অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় সহিষ্ণু ও ধীরবুদ্ধি সহযোগে সমবায় সমিতিসমূহের পুনরুজ্জীবিত করিবার আশু ব্যবস্থা না করিলে এই প্রদেশের আন্দোলনের ভবিষ্যত চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে। এই দৃষ্টি-কোণ হইতে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহকে বিচ্ছিন্ন অবস্থার প্রতিকারার্থে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অতীতের ভুল ত্রুটির পুনরভিনয় না হয় সেই উদ্দেশ্যে যে সমবায় আইন প্রস্তুত হইতেছে তাহার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকার এবং প্রস্তাবিত সমবায় আইন

বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দুই ভাবে সমবায় সম্পর্কে জড়িত সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। অতীতের অব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমানে সমবায় সমিতিসমূহ যে সঙ্কটে পতিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। পুরাতন ও নব-প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলি যাহাতে আবার বিপন্ন হইয়া না পড়ে এবং যাহাতে তাহাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত ও সুগম হয় তাহার জন্য আইন দ্বারা ও অন্য উপায়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমবায়সমিতিসমূহের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীকরণার্থ প্রাথমিক সমিতি তথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দাদনী টাকার যে অংশ প্রকৃতই অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে সেই পরিমাণ টাকা প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় সমিতির আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা হইতে একেবারে বাদ দিতে হইবে। আন্দোলনের ভবিষ্যত উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া আমানতকারীদের এই খাতে কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু আশার কথা এই যে, দাদনী টাকার বেশীর ভাগ একেবারে অনাদায়ী নহে। যদি ঋণকারকদের জমি-জমা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাদের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী প্রয়োজনমত ঋণের সুদ ও সম্ভাবিশেষে আসলের পরিমাণ হ্রাস করিয়া যথাযোগ্য কিস্তি নির্দ্ধারণ করা যায় তাহা হইলে অধিকাংশ সভ্যই পনের-বিশ বৎসরের মধ্যে সব টাকা পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবে। এই শ্রেণীর দাদনী টাকার হিসাব প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির হিসাব হইতে একেবারে ভিন্ন করিয়া জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া দিলে এই প্রকার ঋণ কিস্তি-ক্রমে আদায় করা সহজ হইয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণকারকদের সম্পত্তির মূলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মারফতে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির আমানতকারীদিগকে দেয় টাকার পরিমাণ ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া অল্প সুদে টাকা ধার লইয়া গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিদিগকে তাহাদের আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া ফেলিতে সাহায্য করিবেন এবং জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে ঋণকারকদের নিকট হইতে কিস্তিক্রমে তাহা আদায় করিয়া লইবেন। এইভাবে যদি আমানতকারীগণ তাহাদের প্রাপ্য টাকার অধিকাংশ একসঙ্গে ফিরাইয়া পান তাহা হইলে সমিতি-সমূহের দাদনী টাকার যে কতকাংশ একেবারে অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে সেই পরিমাণ টাকার দাবী ত্যাগ করিয়া এবং ঋণের সুদ ও আসল কমান সম্বন্ধে সমিতিসমূহের সহিত একটা আপোষ করিতে রাজী হইয়া কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিতে তাহারা হয়ত সহজেই স্বীকৃত হইবেন।

এইরূপ প্রণালীতে কার্য্যে অগ্রসর হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-সমূহের বর্ত্তমান সঙ্কটের অবসান হইবে এবং তাহারা ও প্রাথমিক সমিতিসমূহ সভ্যদিগকে আবার অল্পকালের মেয়াদে টাকা ধার দিয়া তাহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দেওয়াতে সমবায় সমিতিগুলি আবার জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিয়া আমানত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহকে পুনঃ টাকা ধার দিয়া তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিবে। অবশ্য কিছুকালের জন্য আমানতকারীদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে টাকা ধার পাওয়া হয়ত সম্ভব নাও হইতে পারে।

এই অবস্থায় গভর্ণমেণ্টকে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মারফতে কতক সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কদিগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদের কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করা দরকার হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট যদি এইভাবে ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া আমানতকারীদের টাকা পরিশোধ করিবার ও অল্পসময়ের জন্য কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অতীতের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা দূর হইবে, সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অচল ও সঙ্কটময় অবস্থার অবসান হইবে এবং সমগ্র আন্দোলনের সজীব ও প্রাণপূর্ণভাব আবার ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থামিলেই চলিবে না। নূতন সমবায় আইন প্রণয়ন করিয়া অতীতের গলদ ও ভুলভ্রান্তি পুনরায় যাহাতে আন্দোলনের প্রগতি বন্ধ করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত এবং আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রধানত প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট একটী নূতন সমবায় আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন। নূতন আইনে সমবায় সমিতিসমূহের উপর সরকারী প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া কেহ কেহ প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছেন। ইহা অতি সাধারণ কথা যে সমবায়ের মূল নীতি হইল সমিতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলা। কাজেই নীতির দিক হইতে তাহাদের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ যতই হ্রাস পায় ততই মঙ্গলজনক। আন্দোলন যে পরিমাণে সরকারী কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত কৃতিত্বের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে সেই পরিমাণে আন্দোলনের সাফল্য ও সুস্থতা সূচিত হইবে। কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী তদ্বির ও তদারক একেবারে শিথিল করিয়া ফেলিলে আন্দোলনের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। বিশেষত সমিতির হিসাব-নিকাশ ও কার্য্য পরিচালনা এবং নানা শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠা, তাহাদের মূলধন সরবরাহ, আন্দোলনের কর্ম্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারী তত্ত্বাবধান আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। সমবায় আন্দোলন যে বর্ম্মা প্রদেশে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল সেই জন্য অসময়ে সরকারী তদ্বির-তদারক শিথিল করা কতকাংশে দায়ী বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সব কথা বিবেচনা করিলে এবং সমিতির কার্য্যপ্রণালী ও পরিচালনা সম্পর্কে যে সকল গলদ ও দুর্নীতি প্রকাশ লাভ করিয়াছে ও যাহা অন্তত কতকাংশে বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী তাহা মনে রাখিলে প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে এই শ্রেণীর আপত্তি খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বরং বর্ত্তমান অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুণ সরকারী অভিভাবকত্বে জনসাধারণকে সমবায় নীতি সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমিতিসমূহ পুনরুজ্জীবিত হইলে নূতন আইন দ্বারা তাহাদের কার্য্যপ্রণালী ও পরিচালনার উন্নতি এবং ধনবৃদ্ধিকর নানা শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র আন্দোলনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত ও সুদৃঢ় হইবে। তখন ক্রমে ক্রমে সরকারী কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে এবং সরকারী অভিভাবকত্ব শিথিল করা সম্ভবপর ও মঙ্গলজনক হইবে।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রস্তাবিত আইনের মূলধারাসমূহ সাধারণভাবে সমর্থন করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সমবায় আইনের কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় বিধানের উল্লেখ করিলে উক্ত আইন সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যের তাৎপর্য্য পরিষ্কার হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, দুই-একজন প্রভাবশালী কর্ম্মকর্ত্তার অন্যায় ব্যবহারের দরুণ সমিতির অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯১২ সালের আইনে এই শ্রেণীর সদস্যের প্রতি কোন প্রকার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা নাই। ফলে রেজিষ্ট্রারের পক্ষে সমিতি লিকুইডেশন-এ দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন পন্থা থাকে না। এই ভাবে দুই-এক জন সদস্যের অন্যায় ব্যবহারের জন্য সমস্ত সভ্য ও সমিতিসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নূতন আইনে রীতিমত ও আইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হিসাব-নিকাশ না রাখা, ইচ্ছাপূর্ব্বক সময়মত ঋণ পরিশোধ না করা, সদস্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও টাকা ধার দেওয়া, ঋণগ্রহণেচ্ছু সদস্যের পক্ষে তাহার সম্পত্তি ও দেনার যথার্থ পরিচয় প্রদান না করা, এক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা, হিসাব-পরীক্ষকের নির্দ্দেশ মানিয়া না চলা অথবা তাহার প্রদর্শিত দোষত্রুটির যথাসম্ভব সত্বর সংশোধন না করা—

ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গলদ, ক্রটিপূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবহারের প্রতিকারের এবং প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নূতন আইনে যথোপযুক্ত বিধান ও শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই ভাবে বাঙ্গালার সমবায় আন্দোলনের যে সকল আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দূর করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে নূতন আইন প্রয়োজনীয় হইবে।

অবশ্য আইনে কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার যদি তাঁহারা অপব্যবহার করেন তবে তাঁহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করাও আবশ্যক-মত অন্যায় আদেশের পরিবর্ত্তন করারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঋণকারকদিগের নিকট হইতে সমিতিগুলি যাহাতে যথারীতি ঋণ আদায় করিতে পারে, প্রস্তাবিত আইনে সেই সম্বন্ধেও নানাপ্রকার বিধান রহিযাছে। তদ্বির-তদারক ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থার নূতন আইনে যথেষ্ট উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই বিধানগুলি সমিতির কার্য্য-প্রণালীর ব্যাপারে যাহাতে নানাপ্রকার গলদ আত্মপ্রকাশ না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে। অক্ষম ও অসাধু পরিচালনা সমিতি সরাইয়া দিয়া সমিতি যাহাতে লিকুইডেশন-এ না যায় তাহার জন্য সাময়িকভাবে দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এই শ্রেণীর সমিতিকে ও ইহার সভ্যদিগকে অবস্থার উন্নতি করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির আভ্যন্তরীণ দোষক্রটি দূরীকরণার্থে যে এই শ্রেণীর বিধান ও ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে তাহা হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন। নূতন আইনে আন্দোলনের উপর রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সরকারী কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া সমবায় নীতির দিক হইতে ক্ষোভ করিয়া লাভ নাই। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় আভ্যন্তরীণ দোষ ক্রটি ও অব্যবস্থা দূর করিতে হইলে এবং আন্দোলনের দুর্গতি ও সঙ্কটের অবসান করিতে হইলে সরকারী সাহায্য, সরকারী অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব, সরকারী নির্দ্দেশ ও সরকারী তদ্বির-তদারক এক প্রকার অপরিহার্য্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে উপযুক্ত ও দক্ষ রেজিষ্ট্রার যাহাতে নিযুক্ত হয় সেই দিকে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, রেজিষ্ট্রারকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন যোগ্য ও উপযুক্ত বেসরকারী ও সরকারী ব্যক্তিদ্বারা একটী পরামর্শদাতৃসংঘ গঠিত হইলে আন্দোলনের কাজ সুচারুরূপে চালিত হইবে ও বিভাগের কার্য্যপরিচালনায় ক্রটি-বিচ্যুতির আবির্ভাবের আশঙ্কা হ্রাস পাইবে। বর্ত্তমান আইনে এই প্রকার পরামর্শদাতৃসংঘ গঠনের পক্ষে কোন বাধা নাই।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অন্যভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও পণ্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না করিলে শুধু সমবায় আইনের সাহায্যে বাঙ্গালার কৃষক ও স্বল্প আয়-বিশিষ্ট লোকের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। অর্থাৎ একমাত্র ঋণদান সমিতি স্থাপন করিলেই চলিবে না। আযবৃদ্ধিকর নানা শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যসূচী ও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কয়েকটি multiple-purpose-society স্থাপন করিয়া ইহাদের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই ধরণের সমিতির প্রতি অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু তাই বলিয়া উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার প্রয়াসকে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মোট কথা, সমবায় নীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার উপর বাঙ্গালার আর্থিক জীবনের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। তাই নানা শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠা ও সমবায় নীতির ভিত্তিতে কৃষকের আর্থিক জীবনের পুনর্গঠন ব্যাপারে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের সমবেত মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক—এই কথাটা দেশের গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।*

---

* এই প্রবন্ধের শেষ অংশটি প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার মহাশয়ের A Note on the Problem of Rural Credit নামক মূল্যবান তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা এবং ডক্টর হীরেন্দ্রলাল দে মহাশয়ের 'আর্থিক জগত'-এ প্রকাশিত একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

বেতিয়ার পুরাকীর্ত্তি

রায় বাহাদুর শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

এই বিশাল বিস্তৃত ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে অতীত যুগের কত ঐতিহাসিক নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে লর্ড কর্জ্জন ভারতের বড়লাট থাকাকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের সুধীবৃন্দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভারত সরকার এই প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান ও খননকার্য্যাদির জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া প্রতি বৎসর অজস্র অর্থব্যয় করিয়া এ যাবৎ বহু লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধারসাধন করিলেও এখনও পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে ঐ সকল স্তূপ, ভগ্ন দুর্গ, পরিখা, প্রাচীর স্তম্ভাদির অবশেষ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কয়েকজন বিদ্বান বড়লোক অর্থ সাহায্য করিয়া প্রাচীন স্তূপাদির খনন-কার্য্য করাইয়াছেন, তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। এই সকল স্তূপ ইত্যাদির উদ্ধারসাধন হইলে এই সুপ্রাচীন দেশের পুরাকালের ইতিহাসের চেহারা বদলাইয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত যে সকল খননকার্য্য সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে সকল অমূল্য বস্তু ও বিবিধ স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সাহায্যে ভারত-ইতিহাসের যথেষ্ট সমৃদ্ধি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ব্যয় হ্রাস করায় খননাদি কার্য্যের অনেক বিলম্ব ও বিঘ্ন সূচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। তত্রাপি আমরা প্রতি বৎসর ঐ বিভাগের সহায়তায় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল নিদর্শনাদি পাইতেছি তাহার মূল্য যথেষ্ট।

আমি সম্প্রতি উত্তর বিহারের বেতিয়া মহকুমায় আমার বৈবাহিক বেতিয়া-রাজের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট দিন কতক আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। পবিত্রবাবু আমাকে সংবাদ দিলেন যে, বেতিয়া হইতে পনর-ষোল মাইল দূরে আমার খোরাক কিছু মিলিবে এবং বেতিয়া হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরেও তাদৃশ পদার্থ আছে। আমি এ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইয়া ঐ দুইটি স্থান পরিদর্শন জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে পবিত্রবাবুর মোটরযোগে লৌরিয়া নন্দনগড় দর্শন করার ব্যবস্থা হইল। আমার গাইড বা পথপ্রদর্শক ছিলেন পবিত্রবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রকৃতিকুমার। আমরা প্রাতে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বদিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা বেশ পরিষ্কার এবং ধূলি-শূন্য ছিল। প্রথম আমরা বেতিয়া হইতে উত্তর দিকে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী লৌরিয়া পৌঁছিলাম। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতেই একটা ছোট মাঠের মধ্যে অশোকস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। মোটর গাড়ী ঐ স্তম্ভের পাদমূলে পৌঁছিলে আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঐ স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ সুরু করিলাম। অশোকস্তম্ভটি মামুলি মতই প্রস্তরনির্ম্মিত এবং ইহাতে মহারাজ অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভটি দেখিলে মনে হয়, মাত্র দুই-চারি বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কি চমৎকার উহার স্থাপত্যশিল্প. এবং সেই পুরাকালের প্রস্তরশিল্পীর সুনিপুণ অস্ত্রের কৌশলপূর্ণ খোদকারি। স্তম্ভশীর্ষে অবস্থিত সিংহমূর্ত্তি মুখখানির কিয়দংশ ভগ্ন আছে। প্রবাদ যে, মুসলমান রাজের কামানের গোলার আঘাতে উহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভটির গাত্রে অন্য কোথাও কোন ক্ষত চিহ্ন দেখিলাম না। জনৈক চীন পরিব্রাজকের স্বাক্ষর স্তম্ভগাত্রে খোদিত আছে। আমি চীনে ভাষায় অনভিজ্ঞের জন্য বুঝিলাম না উহা কোন্ মহাত্মা পর্য্যটকের স্মৃতিচিহ্ন। একজন ইংরেজ পরিব্রাজক আর ব্যারো (R Barrow) ১৭০২খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবত ইনিই প্রথম ইংরেজ পরিদর্শক। এই স্তম্ভের অনতিদূরে চতুর্দ্দিকে সাত-আটটি স্তূপ রহিয়াছে। একটি স্তূপের কিয়দংশ খনিত হইয়াছে। ইষ্টকনির্ম্মিত গাঁথনি দেখা যায়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ খনিত না হওয়ায় .ব্যাপার কি ছিল তাহা বুঝা যায় না। অশোকস্তম্ভটি এবং ঐ সকল স্তূপ সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক আইন-মত রক্ষিত হইতেছে। অশোকস্তম্ভটি লৌহ বেড় দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্তম্ভ এবং উহার সন্নিকটস্থ স্তূপের নিকট প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিয়া থাকে। উৎসবাদির অনুষ্ঠান ঐ মেলায় হইয়া থাকে শুনিলাম। এই অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশে সিংহমূর্ত্তির পাদপীঠের চতুর্দ্দিকে হংস মূর্ত্তি খোদিত আছে। যে সকল স্তূপ এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হয় তাহার মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ ফুটের অধিক উচ্চ কোনটি নহে।

লৌরিয়া হইতে আমরা মোটরযোগে নন্দনগড় দর্শনার্থে রওনা হইলাম। এই গ্রাম্য পথটি কাঁচা এবং কর্দ্দমাক্ত। একটি সাঁকোর নিকটবর্ত্তী হইলে আমাদের 'রথচক্র গ্রাসিলা মেদিনী'! মাট-গার্ড পর্য্যন্ত কর্দ্দমপূরিত পথে ভূগর্ভস্থ হইল। এইবার বুঝি 'গাড়িকা উপর লাউ' হয়! স্থানটি ছিল একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে। আমাদের দুর্দ্দশা দর্শনে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া কয়েকজন যুবকের সাহায্যে অতি কষ্টে রথচক্র উদ্ধার করিয়া দেওয়ায় আমরা গন্তব্য পথে মন্থর গতিতে চলিলাম। বৈবাহিকের সারথির ঐ পথ-ঘাট জানা ছিল—সে খুব হুসিয়ার হইয়া গাড়ী চালাইতেছিল। দূর হইতে নন্দনগড় স্তূপের উচ্চ শীর্ষ দর্শনপথে পড়িল। স্তূপ হইতে তিন রশি দূরে আমরা মোটর ছাড়িয়া পদব্রজে স্তূপ সমীপে আসিলাম। এই স্তূপটি বিশালায়তন, অনেকটা রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের স্তূপের মতই। ইহার খননকার্য্য গত বৎসর হইতে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্তূপটির মাত্র পাদপীঠ খনিত হইয়াছে। এ কার্য্য সমাধা করিতে সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। স্তূপের উচ্চতা ১৭৫ ফিট হইবে। উপরটা বৃক্ষলতা-পূর্ণ ভীষণ জঙ্গলে আচ্ছাদিত। স্তূপের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে নিম্ন

ভূমি। দেখিলে মনে হয় উহা জলাশয় ছিল। খননকার্য্যে স্তূপের চতুর্দ্দিকের দাওয়া বাহির হইয়াছে। কি চমৎকার গাঁথনি। বৃষ্টিজলে ধৌত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন অতি সামান্য দিন পূর্ব্বে এই সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ধ্বংসাবশেষ একটি অতি প্রাচীন সুবৃহৎ হিন্দু মন্দিরের বলিয়া অনুমান করা যায়। মন্দিরের পাদপীঠের গাথনি ইষ্টক এবং মন্দিরের আকার দেখিলে পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত মন্দিরের অনেকটা অনুরূপ মনে হয়। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বিশাল সোপানশ্রেণী বিদ্যমান এবং উত্তর পার্শ্বে বারান্দার নিম্নে তিনটি পাকা ইন্দারা এবং স্নানের ঘর, জলের চৌবাচ্চা, জল নির্গমনের নালি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ঐ স্থানের নির্ম্মাণ জন্য ১৫´´×১২´´ মাপের ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। মন্দিরের দাওয়া নির্ম্মাণে আধগোলা এবং কার্নিশের টেড়চা কাটা ইষ্টকগুলি কি সুন্দর এবং পরিষ্কার তাহা বর্ণনাতীত। এই মন্দিরটি ঠিক যেন তান্ত্রিক যন্ত্রের আকারে নির্ম্মিত। পাহাড়পুর মন্দিরের পাদপীঠ যে প্রকার স্থাপত্যকৌশলে এবং নক্সায় প্রস্তুত এই মন্দিরও অনেকটা তদ্রূপ—কিন্তু ইহার নক্সা এবং নির্ম্মাণকৌশল কিছু অন্য রকমের। এখন খননকার্য্য শেষ হয় নাই এইজন্য এই ধ্বংসাবশেষের কোন আলোক-চিত্র বা নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। কাজেই আমি সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া তদ্রূপ কোন প্রচেষ্টা করি নাই। মন্দিরটির অভ্যন্তরে যে কি পদার্থ বিদ্যমান আছে, খননকার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা জানা অসম্ভব। যতদূর খনিত হইয়াছে তন্মধ্যে কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাদি বা প্রস্তর ফলক এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিম্বা কোন মূর্ত্তিও মন্দিরের নিম্ন দেশে দাওয়ার নীচে পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুরের নিম্ন দেশে দাওয়ার নীচে বহু দেবদেবীর মায় রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। খননকার্য্য বর্ত্তমান বর্ষের শীত ঋতুতে পুনরায় আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। খননকার্য্য আরও অগ্রসর হইলে ইহার মধ্যে কি আছে তাহার নিদর্শন পাওয়ার আশা করা যায়। মন্দিরটির স্থাপত্যশিল্প এবং নক্সাদি যতদূর বাহির হইয়াছে তাহাতে হিন্দু কীর্ত্তি বলিয়াই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বেতিয়া সহর হইতে এই নন্দনগড় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই মন্দিরের আয়তন পাহাড়পুর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এত বড় প্রকাণ্ড মন্দির বোধ হয় খুব অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানের সন্নিকটে আর কোন স্তূপ দৃষ্টিগোচর হইল না। তবে ইহার এক পার্শ্বের ভূমিখণ্ড (দক্ষিণ দিকের) কিছু উচ্চ বলিয়া অনুমান হয়।

বেতিয়ার অপর দিকে যে পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে তাহা বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় পথ দুর্গম জন্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। নন্দনগড়ের ধ্বংসস্তূপ খননকার্য্য শেষ হইলে ইহা হইতে ভারতের ইতিহাসে আরও অনেক কিছু নূতন অংশ সংযোগ হইবে আশা করা যায়।

বেতিয়ার রাজভবনে পুরাতত্ত্বের নিদর্শন বহু দ্রব্যাদি আছে। তন্মধ্যে যুদ্ধোপকরণই অধিক। রাজকোষে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাও যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তাহা দেখার উপায় আমাদের নাই। মালখানার এবং সিন্দুকের চাবি ম্যানেজার ও কমিশনারের নিকট থাকে। উভয়ে একত্রিত না হইলে ঐ কোষাগার খুলিবার উপায় নাই। রাজ এষ্টেট বহুদিন যাবৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে। রাজা কেহ নাই। বৃদ্ধা মহারাণী প্রয়াগে বাস করেন। এক সময়ে বেতিয়ার রাজাগণ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন এবং মোগল সম্রাটের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ইংরেজ যে সময় সুবা বাংলা বিহারের ইজারা গ্রহণ করেন সেই সময় ইঁহারা ইংরাজের সহিত বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, করদানে অস্বীকার করিয়া পরে বেতিয়া রাজ্য জমিদারী স্বত্বে করিয়া লয়েন। বেতিয়া রাজার জমিদারী চম্পারণ জিলা ও মজঃফরপুর জিলায় বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবস্থিত। এই রাজবাড়ীতে বহু প্রকার কামান, বন্দুক (নালিক অস্ত্র), তলয়ার, বল্লম, বর্ষা, বর্ম্ম, চর্ম্ম, ধনুক, তীর পুঞ্জীকৃত হইয়া হতযত্নে ছিল। এষ্টেটের অনেক শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের আদেশে ঐ সকল ভাঙ্গা মরিচা-ধরা এবং অকর্ম্মণ্য আয়ুধ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। এক্ষণে লৌহ ও পিত্তলের কতকগুলি সেকালের কামান আছে। সেগুলি এমন হতযত্নে রক্ষিত যে তাহাতে কোন খোদিত লিপি আছে কি-না তাহা আবিষ্কার করা দুষ্কর। আমি বৈবাহিক ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়কে যে সকল পিত্তল নির্ম্মিত কামান আছে ঐগুলি একটু তদন্ত করিয়া খোদিতলিপি পাওয়া যায় কি-না তাহা দেখিতে অনুরোধ করিয়াছি।

এই বিশাল ভারতভূমির কোন-প্রান্তে কোথায় কি বস্তু নিহিত আছে এবং তাহা অতীতের কোন্ ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণের সাক্ষ্য দিতে পারে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে।

দেবতার মুক্তি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মন্দির মাঝে বন্দী দেবতা
কাঁদিছে আকুল স্বরে,
কে আছ কোথায়, মুক্তি দাও গো,
মুক্তি দাও গো মোরে;

সাধক কহিল—"মুক্তি লভিয়া
কোথায় পালাবে হায়,
ভক্তির ডোরে বাঁধিয়া রাখিব
মনের গোপন ঠাঁয়।"

গণ-দেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

কারণ সামান্য। সামান্য কারণেই একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। গ্রামের কামার অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার এবং ছুতার গিরীশ সূত্রধর নদীর ও-পারে বাজারে সহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায়, আসে রাত্রি দশটায়। ফলে গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় যে কি নাকাল তাহাদের গিয়াছে সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাজানো, গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য চাষীদের অসুবিধার আর শেষ ছিল না। গিরীশ ছুতারের বাড়ীতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে গত বৎসরের ফাল্গুন চৈত্র হইতে—কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না। এই ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় এই লইয়া একটা জটলা করিবার কাহারও সময় হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধের বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকিয়া—তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরী দরকার থাকিলে ফাল লইয়া—গাড়ীর চাকা ও হাল গড়াইয়া গড়াইয়া—সেই সহরের বাজার পর্য্যন্তও লোকে ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় দুই মাইল—কিন্তু মধ্যে ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ ক্রোশ অর্থাৎ চল্লিশ মাইলের সমান। বর্ষার সময় ভরা নদীর খেয়া-ঘাটেই যাইতে-আসিতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুকনার সময়েও আধ মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। নদীর উপর ব্রীজ অবশ্য আছে, কিন্তু সে রেলওয়ে ব্রীজ - পাশের মানুষ যাইবার রাস্তাটাও এমন পরিসর নয় যে, গাড়ীর চাকা গড়াইয়া যাওয়া যায়। চাষ শেষ হইয়া ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরাণো কাস্তেতে সান লাগাইয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়; কিন্তু অনিরুদ্ধ সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে সে গিরীশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের লোকে এক হইয়া পঞ্চায়েৎ মজলিস ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা গ্রাম নয়, পাশাপাশি দুইখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরীশ এবং অনিরুদ্ধকে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন জানাইয়া ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। অনাদি লিঙ্গ ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই জমিদার-প্রতিষ্ঠিত ভাঙ্গা-কালীর বেদী; কালীমায়ের ঘর নাকি যতবার তৈয়ারী হইয়াছে ততবার ভাঙ্গিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙ্গা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের—হাতীশুঁড়-ষড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের অজস্র কাঠ দিয়া চাল কাঠামোটি যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নীচের মেঝেও পুরাণো আমলের পদ্ধতিতে খোয়া দিয়া বাঁধানো। এই চণ্ডীমণ্ডপে শতরঞ্জি, চ্যাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরীশ এবং অনিরুদ্ধ না আসিয়া পারিল না; তাহারা দু'জনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্ত্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারিক্কী লোক—গ্রামের প্রাচীন মাতব্বর চাষী সদ্গোপ বাগ্দীদের মাতব্বর রাজকিশোর লোহার—সেও প্রাচীন লোক, অবস্থাপন্ন চাষী—জমিদারের নগদী; পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও প্রাচীন ব্যক্তি, ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য; দোকানী বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক; ইহা ছাড়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন চাষী 'ছিরে' ওরফে শ্রীহরি ঘোষ, গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত রামনারায়ণ ঘোষ, দেবদাস ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিল। এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও

গ্রামের নিশি মুখুজ্জে, পিয়ারী বাঁড়ুজ্জে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল। আসে নাই কেবল ও গ্রামের কৃপণ মহাজন মৃত রাখহরি চক্রবর্ত্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকীদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশেপাশে ছেলেদের দল, তাহারও অদূরে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়াছিল। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী—অসুবিধার প্রায় বারো আনা ভোগ করে ইহারাই।

অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশ-ভূষা বেশ পরিচ্ছন্ন ফিটফাট—তাহার মধ্যে সহুরে ফ্যাশনের ছাপ সুস্পষ্ট; দু'জনেই তাহারা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধই কথা আরম্ভ করিল—বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কি বলছেন বলুন। আমরা খাটি-খুটি খাই; আমাদের আজ এ বেলাটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় সুরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল—ছিরে ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর—তবে আসবারই বা কি দরকার ছিল?

দেবদাস স্পষ্টবক্তা লোক—সে বলিল—সে মনে হ'লে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কেউ বেঁধে ধরে নিয়েও আসে নাই, তোমাদিগে বেঁধে রাখেও নাই কেউ।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখন যখন ডাকা হয়েছে তখন আসতেই হবে; তা তোমরা এসেছ। বেশ কথা—ভাল কথা—উত্তম কথা। তারপর এখন—কথাবার্ত্তা হবে, আমাদের যা বলবার তা বলব—তোমাদের জবাব তোমরা দেবে, তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন?

গিরীশ বলিল—তা, কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই!

অনিরুদ্ধ বলিল—তা, আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, কি কথা আপনাদের বলুন। আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের—তখন বিচার আপনারা কি ক'রে করবেন—এ তো আমরা বুঝতে পারছি না।

ও-গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষেরা এককালে জমিদার ছিলেন; চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। গৌরবর্ণ রং, পাকা-ধবধবে-গোঁফ, আসরের মধ্যে মানুষটি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। চৌধুরী এবার মুখ খুলিল—দেখ কর্ম্মকার, কিছু মনে কর না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্ত্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছ। এটা তো ভাল নয় বাবা। ব'স—স্থির হ'য়ে ব'স।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ—বলুন—কি বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু—খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়। সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দুজনে সহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে মানুষ দুটো পয়সা পাবে সেইখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাট যে একবারে তুলে দেবে—আর আমরা যে এই এক কোশ রাস্তা জিনিষপত্র ঘাড়ে ক'রে ছুটব—এই নদী পার হয়ে—তা তো হবে না বাপু। এবার যে তোমরা কি নাকাল করেছ আমাদের—ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে তা—অসুবিধে একটুকু আপনাদের হয়েছে।

'ছিরে' বা শ্রীহরি গর্জ্জিয়া উঠিল—একটুকু? একটুকু কি হে? জান, জমিতে জল থাকতে ফাল পাজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও তো জমি আছে, জমির মাথায় মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি, 'পটপটি' ঘাসের ধুমটা। ফালের অভাবে—চাষের সময় একটা পটপটির শেকড় ওঠে নাই। বছর-সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে ক'রে এসে দাঁড়াবে। আর কাজের সময় তখন সহরে গিয়ে ব'সে থাকবে—তা বললে হবে কেন?

দেবদাস এবার সায় দিয়া উঠিল—এই কথা।

মজলিস সুদ্ধ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিল—এই।

প্রবীণেরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অনিরুদ্ধ এবার খুব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নড়িয়া চড়িয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—এই তো আপনাদের কথা। এইবার আমাদের জবাব শুনুন। আপনাদের ফাল পাজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গ'ড়ে দিই - পাজিয়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হাল-পিছু কাঁচি পাঁচ শলি ধান। আমাদের গিরীশ সুত্রধর—

বাধা দিয়া ছিরে ঘোষ বলিল—গিরীশের কথায় তোমার কাজ কি হে বাপু ?

কিন্তু ছিরেও কথা শেষ করিতে পারিল না; দ্বারকা চৌধুরী বলিল—বাবা শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ তো অন্যায় কিছু বলে নাই। ওদের দুজনের একই কথা। একজনা বললেও তো ক্ষতি নাই কিছু।

শ্রীহরি চুপ করিয়া গেল। অনিরুদ্ধ বলিল—চৌধুরী মশায় না থাকলে কি মজলিসের শোভা হয়—উচিত-কথা বলে কে ?

—বল অনিরুদ্ধ, কি বলছিলে বল !

—আজ্ঞে—হ্যাঁ। আমি, মানে কর্ম্মকারের হাল পিছু পাঁচ শলি, আর সুত্রধরের হাল-পিছু চার শলি ক'রে ধান বরাদ্দ আছে। আমরা কাজও ক'রে এসেছি, কিন্তু চৌধুরী মশায়—ধান আমরা হিসেব মত প্রায়ই পাই না।

—পাও না ?

- আজ্ঞে না।

গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—আজ্ঞে না। প্রায়-ঘরেই দু আড়ি চার আড়ি ক'রে বাকী রাখে—বলে দু দিন পরে দোব—কি আসছে বছর দোব—তার পর আর সে ধান আমরা পাই না।

শ্রীহরিই সাপের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—পাও না ? কে দেয় না শুনি ? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা ?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব ? নাম করতে হবে ? তোমার কাছেই পাব।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু বছর ?

—আর আমি যে তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাব! তাতেই উশুলের কথা বলি নাই ? মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ ?

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব নিকেস আছে হে ! ধানের দামটা তো তোমার হ্যাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে হবে ! না কি ? বলুন চৌধুরী মশায়, মণ্ডল মশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন।

চৌধুরী বলিল—শোন, চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা—হ্যাণ্ডনোটের পিঠে টাকাটা উশুল ক'রে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমরা একটা বাকীর ফর্দ্দ তুলে—হরিশ মণ্ডল মশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায়-পত্র ক'রে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা ক'রে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম্ম করছিলে কর।

মজলিস সুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে ভঙ্গিতেও সম্মতি অসম্মতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

দেবদাস ঘোষ প্রশ্ন করিল—কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে ? হ্যাঁ—না একটা কিছু বল। মাথার ফুলটাই পড়ুক।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ !

—আজ্ঞে ?

—কি বলছ বল ?

এবার হাত যোড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে আমাদিগে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর পারছি না।

মজলিসে এবার কলরব উঠিয়া গেল।

—কেন ?

—না পারবার কারণ ?

—পারব না বললে হবে কেন ?

—চালাকী না কি ?

—গাঁয়ে বাস কর না তুমি ?

চৌধুরী দীর্ঘ হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিতে প্রকাশ করিল—চুপ কর, থাম।

হরিশ বিরক্তিভরে বলিল—থাম রে বাপু ছোঁড়ারা; আমরা এখনও মরি নাই।

এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল অল্প-বয়সী ছোকরা, ম্যাট্রিক পাশ—সে প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যা-ও। সাইলেন্স—সাইলেন্স !

অবশেষে দ্বারকা চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার ফল

হইল। চৌধুরী বলিল—চীৎকার ক'রে গোলমাল বাধিয়ে তো ফল হবে না। বেশ তো, কর্ম্মকার কেন পারবে না—বলুক। বলতে দেন ওকে।'

সকলে এবার নীরব হইল। চৌধুরী আবার বসিয়া বলিল—কর্ম্মকার, পারবে না বললে তো হবে না বাবা। কেন পারবে না, বল। তোমরা পুরুষানুক্রমে ক'রে আসছ। আজ পারব না বললে, গ্রামের ব্যবস্থা কি হবে?

হরিশ বলিল—তোমার পূর্ব্বপুরুষের বাস হ'ল গিয়ে মহাগ্রামে; গ্রামে কামার ছিলনা বলেই তোমার পিতামহকে গাঁয়ে এনে বাস করানো হয়েছিল। সে তো তুমিও শুনেছ হে বাপু। এখন না বললে চলবে কেন?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, মোড়ল জ্যাঠা, তা হ'লে শুনুন। চৌধুরী মশায়, আপনি বিচার করুন। এ গাঁয়ে আগে কত হাল ছিল ভেবে দেখুন। কত ঘরের হাল উঠে গিয়েছে তা দেখুন। এই ধরুন গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র আমি হিসেব ক'রে দেখেছি—আমার চোখের ওপর এগার ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কনায়—ভদ্রলোকের ঘরে। কঙ্কনার কামার আলাদা; আমাদের এগারখানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তার পরে ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙলের-গাড়ীর—অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর দোর হ'ত—আমরা পেরেক-গজাল গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল-কুড়ুল গড়তাম। গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোক সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত—ঘরের চাল কাঠামো করতে গিরীশকেই ডাকত। এখন অন্য জায়গার সস্তা মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে। তার পরে ধরুন—ধানের দর এখন পাঁচ সিকে—দেড় টাকা—আর অন্য জিনিষপত্র আক্রা। এতে আমাদের এই নিয়ে প'ড়ে থাকলে কি ক'রে চলে বলুন? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসার—তাদের মুখে তো দুটো দিতে হবে। তার ওপর ধরুন আজকালকার হালচাল সে রকম নাই—

ছিরে এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুলিতেছিল—সে সুযোগ পাইয়া বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—তা বটে—আজকাল বার্ণিশ করা জুতো চাই, লম্বা লম্বা জামা চাই, সিগারেট চাই—পরিবারদের শেমিজ চাই, বডিজ চাই—

—এই দেখ ছিরু মোড়ল, তুমি একটু হিসেব ক'রে কথা বলবে। অনিরুদ্ধ এবার কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

শ্রীহরি বারকতক হেলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিল—হিসেব আমার করাই আছে রে। পঁচিশ টাকা ন আনা তিন পয়সা। আসল দশ টাকা, সুদ পনের টাকা ন আনা তিন পয়সা। তুই বরং কষে দেখতে পারিস। শুভঙ্করী জানিস তো?

হিসাবটা অনিরুদ্ধের নিকট পাওনা হ্যাণ্ডনোটের হিসাব। অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত মজলিসের দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত মজলিসটাও এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনিরুদ্ধ মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

শ্রীহরিই ধমক দিয়া উঠিল—যাবে কোথা হে তুমি? ব'স ওইখানে।

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিলনা, সে চলিয়া গেল।

চৌধুরী এতক্ষণে বলিল—শ্রীহরি!

ছিরু বলিল—আমাকে চোখ রাঙাবেন না চৌধুরী মশায়। দু তিনবার আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন আমি সহ্য করেছি। আর কিন্তু আমি সহ্য করব না!

চৌধুরী এবার চাদরখানি ঘাড়ে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিটি লইয়া উঠিল; বলিল—চললাম গো তা হ'লে। ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম—আপনাদিগে নমস্কার।

এই সময়েই গ্রামের পাতুলাল মুচি যোড়হাত করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—চৌধুরী মশায়, আমার একটুকুন বিচার ক'রে দিতে হবে।

চৌধুরী সন্তর্পণে মজলিস হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল—বল বাবা—এঁরা সব রয়েছেন, বল!

—চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী এবার চাহিয়া দেখিল—অনিরুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—একবার বসতে হবে চৌধুরী মশায়! ছিরু পালের টাকাটা আমি এনেছি—আপনারা থেকে আমার হ্যাণ্ডনোটটা—ফেরতের ব্যবস্থা ক'রে দিন।

মজলিস সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হইয়া—চৌধুরীকে ধরিয়া বসিল—কিন্তু চৌধুরী কিছুতেই নিরস্ত হইল না; ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অনিরুদ্ধ পঁচিশ টাকা দশ আনা মজলিসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—হ্যাণ্ডনোট নিয়ে এস ছিরু পাল।

হ্যাণ্ডনোটখানি লইয়া বলিল—একটা পয়সা আমাকে আর ফেরৎ দিতে হবে না। পান খেয়ো। এস হে গিরীশ, এস।

হরিশ বলিল—ওহে কম্মকার, চললে যে। যার জন্যে মজলিস বসল—

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ওকাজ করব না মশায়। জবাব দিলাম। আর যে মজলিস ছিরে মোড়লকে শাসন করতে পারে না—তাকে আমরাও মানি না।

তাহারা হন হন করিয়া চলিয়া গেল। মজলিস ভাঙিয়া গেল। পরদিন প্রাতেই শোনা গেল অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

দুই

অনিরুদ্ধ ফসলশূন্য ক্ষেতখানার আইলের উপর স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার লোহা-পেটা হাত দু'খানায় মুঠা বাঁধিয়া ভাইস-যন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল। অত্যন্ত দ্রুতপদে সে বাড়ী ফিরিয়া হাতকাটা জামাটা টানিয়া সেটার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম পদ্মমণি—দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণ-যৌবনা কালো মেয়েটি, টিকালো নাক, টানা টানা বেশ ডাগর দুটি চোখ; পদ্মের রূপ না থাক, শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি। অনিরুদ্ধকে এইভাবে বাহির হইতে দেখিয়া সে স্বামী অপেক্ষাও দ্রুতপদে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—চললে কোথায়?

রুঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ফিঙের মত পেছনে লাগলি কেন? যেখানে যাইনা—তোর সে খোঁজে কাজ কি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—পেছনে লাগি নাই। তার জন্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর খোঁজে আমার দরকার আছে বই কি। মারামারি করতে যেতে পাবে না তুমি।

অনিরুদ্ধ বলিল—মারামারি করতে যাই নাই, [illegible] যাচ্ছি, পথ ছাড়্।

—থানা? পদ্মর কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনিচ্ছা পরি[illegible] হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, থানা। শালা ছিরে চাষার নামে আমি ডা[illegible] ক'রে আসব। রাগে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর—রণ-রণ করিতেছি[illegible]

পদ্ম স্থিরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। [illegible] মোড়ল তোমার ধান চুরি করেছে—এ চাকলায় কে এ [illegible] বিশ্বাস করবে?

অনিরুদ্ধের কিন্তু তখন এমন পরামর্শ শুনিবার অবস্থা নয়, সে ঠেলিয়া পদ্মকে সরাইয়া দিয়া বা[illegible] হইবার উদ্যোগ করিল।

কথাটা মিথ্যা হইলেও নিষ্ঠুরভাবে সত্য।

এ চাকলায় কাছাকাছি তিনখানা গ্রাম—কালী[illegible] শিবপুর ও কঙ্কনা—এ তিনখানা গ্রামে ছিরু মোড়ল[illegible] শ্রীহরি ঘোষের ধনের খ্যাতি যথেষ্ট। কালীপুর ও শিব[illegible] সরকারী সেরেস্তায় দু'খানা ভিন্ন গ্রাম—বিভিন্ন জমিদা[illegible] অধীন স্বতন্ত্র মৌজা হইলেও কার্য্যত একখানা গ্রা[illegible] একটা দীঘির এপার ওপার মাত্র। শ্রীহরির বাস কালীপুরে। এ দুইখানা গ্রামের মধ্যে শ্রীহরির সম[illegible] ব্যক্তি কেহ নাই। শিবপুরের হেলা চাটুজ্জেরও ট[illegible] এবং ধান যথেষ্ট—তবে শ্রীহরির ঘরে সোনার ইঁট. আ[illegible] টাকা ধানও প্রচুর। ক্রোশখানেক দূরবর্ত্তী কঙ্কনা অ[illegible] সমৃদ্ধ গ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস—সেখ[illegible] কার মুখুজ্জেবাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী—এ অঞ্চ[illegible] প্রায় গ্রামই এখন তাহাদের কুক্ষীগত—মহাজন হ[illegible] তাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়া উঠিতে[illegible] শিবপুর কালীপুর গ্রাম দু'খানাও ধীরে ধীরে তাহা[illegible] গ্রাসের আকর্ষণে সর্পিল জিহ্বার দিকে আগাইয়া চলিয়া[illegible] কিন্তু কঙ্কনাতেও শ্রীহরি ঘোষের নামডাক আ[illegible] ময়ূরাক্ষীর ওপারে আধা সহর—রেলওয়ে জংশন; সেখ[illegible] বহু ধনী মাড়োয়ারীর গদী আছে—দশ-বারোটা রাইস [illegible] গোটা দুয়েক অয়েল মিল, একটা ফ্লাওয়ার মিল আ[illegible] —সেখানে শ্রীহরি ঘোষকে ঘোষ মশায় বলিয়াই সম্ব[illegible] করা হয়। ওই জংশন সহরেই এ অঞ্চলের থানা অবস্থিত

পদ্মের অনুমান মিথ্যা নয়—কঙ্কনায় অথবা জংশন সহরে কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু শিব-কালীপুরের কেহ এ কথা অবিশ্বাস করে না। ছিরু ভয়ঙ্কর ব্যক্তি—এ সংসারে তাহার অসাধ্য কিছু নাই। এ ধান কাটিয়া লওয়া তাহার অনিরুদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নয়—চুরীও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য—এ কথা শিব-কালীপুরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও নাই।

শ্রীহরির খুড়া ভবেশ পাল ইহার জন্য লজ্জা পায়, কিন্তু ভয়ে সে লজ্জার কথা প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীও লজ্জিত। তাহাদের বংশ এ অঞ্চলে স্বজাতির মধ্যে বহু-প্রশংসিত সদ্বংশ। সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত—শ্রীহরির একজন জ্ঞাতিভাই এম-এ, বি-এল পাস করিয়া উকীল হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই সদ্গোপ বংশটি রূপের জন্যও বিখ্যাত। রূপ যেন বাসা বাঁধিয়াছে ইহাদের ঘরে। কিন্তু শ্রীহরি সব দিক দিয়াই বংশের ব্যতিক্রম। সে দেখিতে হইয়াছে মাতামহের মত। এই সোনার ইঁট—নগদ টাকা—এসবও শ্রীহরির মাতামহের সঞ্চয়। লোকে বলে শ্রীহরির মাতামহের ব্যবসা ছিল—চুরী-ডাকাতির মাল সামাল-দেওয়া। সোনা রূপার গহনা গলাইয়া—সে সোনার বাট, রূপার বাট, পরিশেষে সখ করিয়া সোনার ইঁট তৈয়ারী করিয়াছিল। সেই সোনার ইঁট পাইয়াছে শ্রীহরি। শ্রীহরি নয়, শ্রীহরির মা। প্রাপ্য অবশ্য শ্রীহরিদের নয়, শ্রীহরির মাতামহ দান করিয়াও যায় নাই, কিন্তু শ্রীহরির মা এবং শ্রীহরির মাতামহের মেয়ে। শ্রীহরির মামা এমন বাপের সন্তান হইয়াও সৎপ্রকৃতির লোক। মায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রী লইয়া ঘরে বাস করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীহরির মাতামহের দৃষ্টির লোলুপতা কেবল মাত্র ধন সম্পদের উপরেই আবদ্ধ ছিল না; এ পৃথিবীর ভোগ্য যাহা কিছু সমস্ত কিছুর উপর প্রসারিত ছিল এবং আপন পুত্রের মুখের গ্রাসের মধ্যে উপাদেয় কিছু থাকিলে তাহাও আত্মসাৎ করিতে বৃদ্ধের দ্বিধা ছিল না। শ্রীহরির মামা লজ্জায় ভয়ে দূরান্তরে গিয়া বাস করিতেছিল। বৃদ্ধের মৃত্যু-রোগের সময় যথাসময়ে পুত্র আসিয়া পৌছিতে পারে নাই—শয্যা পার্শ্বে ছিল কন্যা, শ্রীহরির মা। প্রলাপের ঘোরে বৃদ্ধ কেবল গুপ্তধনের কথাই বলিতেছিল—সোনার ইঁট, আমার সোণার ইঁট—ঘরের নর্দ্দামায় ইটের নীচে ছিল যে, কে নিলে? কে নিলে? রূপোর বাট—রূপোর বাট—

শ্রীহরির মা স্থির হইয়া শুনিতেছিল—চোখে তাহার বিচিত্র দৃষ্টি।

—কে? তুই কে? আমার রূপোর বাট ছিল যে ওই কোণে?

রাত্রি তখন গভীর; গ্রামের কাহারও একবিন্দু করুণা ছিল না বৃদ্ধের উপর, কেহ আসে নাই। প্রলাপগ্রস্ত রোগীর শয্যাপার্শ্বে কেবল শ্রীহরির মা, আর একখানা ঘরে চৌদ্দ পনের বছরের শ্রীহরি ঘুমাইতেছিল। শ্রীহরির মা একরাশি বিছানা আনিয়া বৃদ্ধের মুখের উপর চাপাইয়া দিল।

তারপর নর্দ্দামার ইঁট তুলিয়া খুঁড়িয়া সোণার ইঁট রূপার বাট তুলিয়া শ্রীহরিকে সেই রাত্রে ডাকিয়া তুলিয়া নিজে তাহাকে বহুদূর আগাইয়া বলিল—মাঠে মাঠে চ'লে যাবি। খবরদার পথ ধরবি না। যা দিলাম কাউকে দেখাবি না, বলবি না—বুঝলি?

শ্রীহরি বুঝিয়াছিল এবং মায়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। বুঝিবার এবং এ কাজ পারিবার শক্তি মা তাহার রক্তে রক্তে সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে—ফিরিয়া বিছানাগুলি সরাইয়া—খোঁড়া জায়গাগুলি সমতল করিয়া দিয়া বুকফাটা কান্না তাহার মা কাঁদিয়াছিল।

শ্রীহরির রক্ত-রূপ—সব মাতৃদত্ত। বিশাল দেহ—কিন্তু স্থূল নয়-একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই—বাঁশের মত মোটা হাত, পায়ের হাড়—তাহার উপর কঠিন পেশী—প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা পাঞ্জা—প্রকাণ্ড বড় মাথা—বড় বড় চোখ—আকর্ণ-বিস্তার মুখগহ্বর, কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; এত বড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাত্রে রাত্রে আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে, শব্দ নিবারণের জন্য সে করাত দিয়া বাঁশ কাটে। খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আনিয়া নিজের পুকুর বোঝাই করে। 'অন্যের দুগ্ধবতী গাভী বা ভাল হেলে থাকিলে—রাত্রে সে জাবের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়া আসে। প্রতিবৎসর তাহার বাড়ীর পাঁচিল

সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নূতন পাঁচিল দিবার সময় অপরের সীমানা—অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। কেহ প্রতিবাদ বড় করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সীমানা আত্মসাৎ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া উপায় থাকে না; শ্রীহরি কোদালি হাতেই উঠিয়া দাঁড়ায়; দন্তহীন মুখে কি বলে বুঝা যায় না, মনে হয় একটা পশু গর্জ্জন করিতেছে। এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন; যৌনব্যাধির আক্রমণে তাহার দাঁতগুলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছে। হরিজন পল্লীতে সন্ধ্যায় যখন পুরুষেরা মদে ভোর হইয়া থাকে—তখন শ্রীহরি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পল্লীতে গিয়া প্রবেশ করে। তবুও কতবার তাহারা তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু শ্রীহরি ছুটিয়া চলে অন্ধকার-চারী হিংস্র শ্বাপদের মত।

এই শ্রীহরি ঘোষ—ছিরু পাল।

শ্রীহরিকে ভাল করিয়া চিনিয়াও অনিরুদ্ধ স্ত্রীর কথা বিবেচনা করা দূরে থাক—তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। পদ্ম বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে অভিমান করিল না—সে আবার ডাকিল—শোন—শোন—ফেরো।

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিল না।

অতি ক্ষীণ হাসিয়া পদ্ম এবার বলিল—পেছন ডাকছি!

অনিরুদ্ধ লাঙ্গুলস্পৃষ্ট কেউটের মত এবার ফিরিল।

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একটু জল খেয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া পদ্মের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ডাকবি আর পেছনে?

পদ্মের মাথাটা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল—অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়—সে বড় ভয়ঙ্কর আঘাত। পদ্ম 'বাবা রে' বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল। যেখানে সেখানে চড় মারিলে মানুষ মরিয়া যায়; সে ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—পদ্ম! পদ্ম! বউ!

পদ্মের শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই নে বাপু, এই নে—জামা খুললাম। থানায় যাব না। ওঠ! কাঁদিস না। ও পদ্ম! সে পদ্মের মুখ-ঢাকা হাতখানি ধরিয়া টানিল—ও পদ্ম! পদ্ম মুখ হইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া—খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মুখ ঢাকা দিয়া পদ্ম কাঁদে নাই, নিঃশব্দে হাসিতেছিল। অদ্ভুত শক্তি পদ্মের—আর অনিরুদ্ধের অনেক কিল চড় খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে—এক চড়ে কি হইবে!

কিন্তু অনিরুদ্ধের পৌরুষে বোধ হয় ঘা লাগিল—সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পদ্ম খানিকটা গুড় আর প্রকাণ্ড একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি ও টুকনি ঘটির এক ঘটি জল আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি যে ছিরু মোড়লকে শুবে ক'রে এজাহার করবে—গাঁয়ের নোক কে তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে বল তো? কাল তো গাঁয়ের নোক সবাই তোমার ওপর বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাল সন্ধ্যার পর আবার মজলিস বসিয়াছিল; অনিরুদ্ধের ওই 'মজলিসকে মানি না' কথাটা সকলকে বড় আঘাত দিয়াছে। অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানানো স্থির হইয়া গিয়াছে।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে পড়িল; কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না।

(ক্রমশঃ)

দীন-বন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হে প্রিয় ঈশার শুভ মণীষার ভগীরথ সত্তম
শঙ্খ বাজায়ে আনিলে জ্বালায়ে প্রসন্ন দীপশিখা
পশ্চিম হ'তে সিন্ধুর পথে ত্রিবেণী প্রবাহ সম
তোমারে নিখিল ভারত লিখিল সুস্বাগত লিখা।

হে দীনবন্ধু, এ দীনভূমির মাটীতে শয়ন মেলে
'সুরুচি'-মাতারে ফেলিয়া চাহিলে দুখিনী সুমতি-মায়ে
হে ধ্রুব সাধক উত্তানপাদ রাজসম্পদ ফেলে
মুক্তি লভিলে বন্ধন-মাঝে শান্তিকেতন-ছায়ে।

বিশ্ব যখন ভীষ্ম রবির রশ্মিতে হ'ল আলো
সে রবি কিরণে স্নিগ্ধ করিলে তাহারে বাসিয়া ভালো।

দুঃখের নিবৃত্তি ও স্বধর্ম্মপালন

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস এম-এ, বি-এল

দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই কাম্য। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? এই ..র আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে স্থির করা প্রয়োজন, দুঃখ কি? ..য়ায়িকগণ বলেন, "প্রতিকূল-বেদনীয়ং দুঃখং।" সকল প্রকার প্রতিকূল ..দনাই দুঃখের। এই প্রতিকূল বেদনা দুই প্রকারের হইতে পারে, ..থা, শারীরিক ও মানসিক। (১) কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,"এরূপ বিভাগ ..ক নহে। সকল দুঃখই শারীরিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ ..ই এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থের সহিত ..রীরের সংযোগই তাহার মূল। আমার রূঢ় বাক্যে তুমি দুঃখ বোধ ..রিলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ..হণ করিলে তাহাতেই তোমার দুঃখ।" এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ..সঙ্গত নহে। তবে মানসিক দুঃখ বলিতে কি বুঝিব? শারীরিক দুঃখ ..লিতেই বা কি বুঝিব? শরীরের স্বাভাবিক নিরোগ অবস্থার ব্যতিক্রম-..নিত যে দুঃখ তাহাই শারীরিক দুঃখ। অপর সকল দুঃখই মানসিক ..ঃখ। তোমার বাক্যে আমি দুঃখ বোধ করিলাম তাহা মানসিক দুঃখ; ..ারণ উহা শরীরের স্বাভাবিক নিরোগ অবস্থার ব্যতিক্রমজনিত নহে। ..ই দুই প্রকারের দুঃখ নিরোধ করিবার পন্থাসকলও এক নহে এবং এই ..ন্যই এইরূপ বিভাগের প্রয়োজন হয়।

শারীরিক দুঃখ দূর করিবার বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমেই মনে হয়, ..াস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল যথাযথরূপে পালন করিয়া শরীরকে সুস্থ ও নিরোগ ..রিয়া রাখিতে পারিলেই শারীরিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ..কল প্রকার শারীরিক দুঃখ কেবলমাত্র স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল পালন ..রিয়া দূর করা যায় না। কারণ, এই সকল নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও ..রীর পীড়িত হইতে পারে কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হইতে ..ারে। এরূপ স্থলে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বোধ না করাই দুঃখ দূর করার ..পায়। ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ অর্থাৎ দুঃখের বিষয় ..িন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ। এ ভিন্ন এরূপ দুঃখ দূর ..রিবার অন্য উপায় নাই।

(১) হিন্দুদিগের প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থাদিতে দুঃখ তিন প্রকারের ..লিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ সকল প্রকার দুঃখকে শারীরিক ও ..ানসিক এই দুইভাগে ভাগ করেন। দেশপূজ্য তিলক তাঁহার "শ্রীমদ্ভাগ-..গীতারহস্যে" ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দুঃখকে এইরূপ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু ..াহারা কেহই দুই প্রকার দুঃখের সংজ্ঞা দেন নাই, কিম্বা এই দুই প্রকার ..ুঃখের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই।

এখন দেখা যাউক, মানসিক দুঃখ কিরূপে দূর করা যাইতে পারে। সকল প্রকার মানসিক দুঃখের মূল হইতেছে, বাসনা, কামনা বা তৃষ্ণা। তোমার নিকট হইতে প্রিয় বাক্যই কামনা করি, রূঢ় বাক্য কামনা করি না। আমার কামনা পূর্ণ হইল না, তাহাতেই আমি দুঃখ বোধ করিলাম। অতএব বাসনা বা কামনার নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইল। বাসনা বা কামনার নিবৃত্তি দুই প্রকারে হইতে পারে, (ক) বাসনা পূর্ণ হইলে কিংবা (খ) বাসনা ত্যাগ করিলে। বাসনা পূর্ণ করা সম্বন্ধে এই আপত্তি করা যাইতে পারে যে, বাসনা পূর্ণ করিয়া কখনও বাসনার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। অধিকন্তু কাহারও কাহারও মতে অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ করিলে যেরূপ অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বাসনা পূর্ণ করিলে আরও বাসনা বৃদ্ধি পায়। একথা সত্য যে একটী বাসনা পূর্ণ করিলে অন্য বাসনার কিংবা যে বাসনা পূর্ণ করা হইয়াছে কিছুকাল পরে তাহারই উদ্রেক হয়। মহাভারতে যযাতি রাজার উপাখ্যানে এই কথাটাই বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের মনীষীগণ বাসনা ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে বাসনা ত্যাগ করিব? প্রতিদিন সহস্র সহস্র বাসনা মনে উদয় হয়, কিরূপে তাহাদের ত্যাগ করিব? সন্ন্যাস মার্গের লোকেরা বলেন, মানুষের সাংসারিক সমস্ত প্রবৃত্তিই বাসনাত্মক বা তৃষ্ণাত্মক। যে পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারিক কর্ম্মত্যাগ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত বাসনা বা তৃষ্ণা নির্ম্মূল হয় না। অতএব দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। সাংখ্য দর্শনে ও হিন্দুদিগের অন্যান্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থে এই মত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন গৃহীর পক্ষে নির্ব্বাণ লাভ করা অসম্ভব। একথা কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদিও ইহারা সংসার ত্যাগ করিয়া কর্ম্মত্যাগ দ্বারা সন্ন্যাসী হইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তথাপি কেহই বলেন নাই যে কেবলমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেও সাধনার প্রয়োজন হইতে পারে।

আর একদল ধর্ম্মবেত্তারা বাসনা বা কামনা ত্যাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন; কিন্তু বাসনা বা কামনা ত্যাগ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা সম্ভব ও তাহাই উচ্চতর আদর্শ। গীতায় এই কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে এবং গীতাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে—কিরূপ কর্ম্ম আমাদের করা উচিৎ? গীতায় বলা হইয়াছে তোমার স্বধর্ম্ম তুমি পালন কর। এই স্বধর্ম্ম কথাটী গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে, তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে
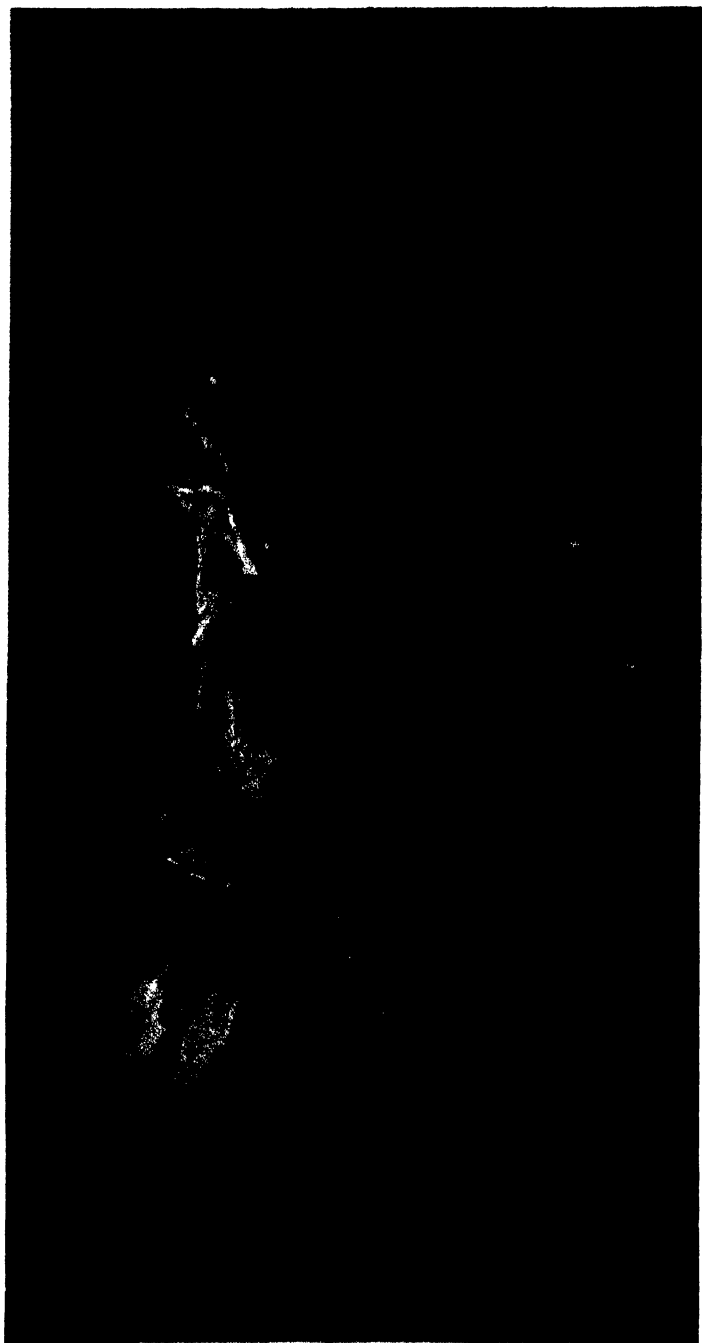
ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) কিন্তু এই তিন জায়গার কোথাও স্বধর্ম্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা সাধারণের বোধগম্য করিয়া স্পষ্টভাবায় বলা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, স্বধর্ম্ম অর্থে Duty অথবা কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে। (৩) কিন্তু স্বধর্ম্ম শব্দের দুটী প্রতিশব্দ জানিলেই ত সকল সমস্যার সমাধান হয় না। Duty অথবা কর্ত্তব্য বলিতে কি বুঝিব? কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ইহা একটী বড় প্রশ্ন। প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয় উদয় হয় এবং এই সংশয় দূর করিতে না পারিলে সুচারুরূপে কর্ম্মযোগ সাধন সম্ভব নহে। (৪) এই সংশয় দূর করিবার জন্যই কর্ত্তব্য কি জানা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাউক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিরূপ সংশয় বর্ত্তমান যুগে সাধারণতঃ উদয় হয় এবং কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদিগের মতে কিরূপে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। মহাভারতের যুগে জাতিভেদ প্রথা যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল এখন সেরূপভাবে উহা প্রচলিত না থাকিলেও উহা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এইজন্য প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি বংশানুক্রমিক হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ যে কার্য্য করিতেন সেই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বপুরুষেরা যে কার্য্য করিতেন সেই কার্য্য করাই আমাদের স্বধর্ম্ম। মুচির ছেলের মুচি ও ডাক্তারের ছেলের ডাক্তার হওয়াই উচিৎ। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মণীষীগণ কিন্তু বলেন যে স্বধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম হওয়া চাই মানুষের স্বরূপতঃ নিজস্ব, ভিতর হইতে বিবর্ত্তিত সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস্য স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ মুচির ছেলের পক্ষে ডাক্তারী করাটা স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে না, যদি উহা তাহার স্বরূপতঃ নিজস্ব হয়। (৫) সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রমুখ আর একদল মণীষী বলেন, অর্থোপার্জ্জনের জন্য পিতৃপুরুষগণ যে কার্য্য করিতেন সেই কার্য্যই করিতে হইবে; কিন্তু পরোপকার করিবার জন্য অন্য কার্য্যও করা যাইতে পারে, অর্থাৎ মুচির ছেলে পরোপকার করিবার জন্য ডাক্তারী করিতে পারে—কিন্তু ডাক্তারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা তাহার উচিৎ হইবে না, মুচিগিরি করিয়াই তাহাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীও নাকি স্বধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (৬) অতএব দেখা গেল, কর্ম্ম বংশানুক্রমিক হইবে কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। স্বধর্ম্ম কি তাহা নির্ণয় করিতে আর এক প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। দেশপূজ্য তিলক তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবদগীতা-রহস্যে ও বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় এইরূপ সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) সমস্যাটী কি তাহা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা হইতেছে। শর্ব্বীলক নামে এক ব্রাহ্মণ, দিবাভাগে পূজা, অর্চ্চনা, অধ্যাপনা, দান প্রভৃতি সৎকার্য্য করিত এবং রাত্রিকালে দস্যুবৃত্তি করিত। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণও নাকি এইরূপ করিত। এইরূপ দস্যুবৃত্তি সে কোন কুকার্য্য বলিয়া মনে করিত না; বরঞ্চ সে মনে করিত যে সে তাহার কুলধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম পালন করিতেছে। (৮) বাস্তবিকই কি ব্রাহ্মণ তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিতেছিল? ঠগীদস্যুগণ মনে করিত নরহত্যা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই তাহাদের স্বধর্ম্ম এবং এইরূপ নরহত্যায় তাহাদের কোন পাপ হইত না। বাস্তবিকই কি তাহাদের কোন পাপ স্পর্শ করে নাই? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এরূপ মনগড়া সমস্যার আলোচনা করিয়া লাভ কি? বর্ত্তমান যুগে এরূপ সমস্যার উদয় হয় না অতএব এরূপ সমস্যার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে ঠিক এইরূপ সমস্যার উদয় না হইলেও এই প্রকারের অন্যান্য সমস্যার উদয় হয়; যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি দেখিল যে সময় বিশেষে মিথ্যা কথা না বলিলে কিংবা উৎকোচ প্রদান না করিলে নিজ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাহার সমব্যবসায়ী সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে যদি সে মনে করে যে মিথ্যা কথা বলা ও উৎকোচ প্রদান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তবে কি বলিব যে তাহার এ ধারণা ভ্রান্ত। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশের মনীষীগণ এই সকল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দিয়াছেন। গিরীন্দ্রশেখর বাবু বলেন—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্বধর্ম্ম কথাটির অর্থ সামাজিক কর্ত্তব্য বা সমাজ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম এবং ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বধর্ম্ম কথাটীর অর্থ স্বভাবনিয়ত ধর্ম্ম। এই দুইটী অর্থের সমন্বয় করিয়া তিনি স্বধর্ম্মের অর্থ করিয়াছেন, যে কর্ম্ম নিজ প্রবৃত্তি বিরোধী নহে ও যাহা সমাজ দ্বারা অনুমোদিত। তাঁহার মতে

---

(২) স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥২।৩১॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩।৩৫॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥১৮।৪৭॥

(৩) শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। পাতা ৭৮

(৪) Swami Vivekanantla says, "It is necessary in the study of Karma Yoga to know what work is and with that comes naturally the question what duty is. If I have to do something, I must first know my duty in regard to it and then it is that I will be able to do it well."

—Karma Yoga. Edited by Saradananda. page 65.

(৫) ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪৬।

(৬) ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৩৫।

(৭) (ক) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতারহস্য বা কর্ম্মযোগশাস্ত্র—বালগঙ্গাধর তিলক।

(খ) গীতা—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

(৮) উদাহরণটী গিরীন্দ্রশেখর বাবুর গীতার ব্যাখ্যা হইতে গৃহীত।

দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা পাপ, কারণ দস্যুবৃত্তি সমাজ-সম্মত কার্য্য নহে। দস্যুবৃত্তি যে সমাজসম্মত কার্য্য নহে তাহা না হয় বুঝিলাম; কিন্তু যখন সমাজের অধিকাংশ লোকই কার্য্যসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলে ও উৎকোচ প্রদান করে, তখন মিথ্যা কথা বলা ও উৎকোচ প্রদান করা কি সমাজ-সম্মত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে? সমাজের অধিকাংশ লোক যাহা করে তাহাই কি সমাজসম্মত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে? দুঃখের বিষয় গিরীন্দ্রশেখরবাবু এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করেন নাই।

অনুশীলন ধর্ম্মের প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না, কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি—আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি—আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন-ভোজনাদি। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলেই নয়, সুতরাং করিতে হইবে। সৎকর্ম্মসকল মনুষ্যত্বের উপাদান, অতএব উহা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অসৎ কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না, উহা আমাদের জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম নহে। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ বাঁচে না এমন নহে।(৯) সুতরাং অসৎকর্ম্ম আমাদের করা উচিৎ নহে। চুরি ও পরদারগমন যে অসৎকর্ম্ম তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু মিথ্যাকথন ও উৎকোচপ্রদান করাও কি অসৎকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে? বর্ত্তমান যুগে এমন ব্যবসা বা কার্য্য খুব কমই আছে যাহাতে মিথ্যার আশ্রয় লইতে না হয়। মিথ্যার আশ্রয় লওয়া যদি অসৎকর্ম্ম হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবননির্ব্বাহের নিয়ম নহে এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সত্য নহে।(১০)

দেশপূজ্য তিলক কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য অন্য প্রকার মানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে কোন কর্ম্ম করিবার সময় সেই কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে আবশ্যক হয় বলিয়া কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্ব্বাংশে বুদ্ধির শুদ্ধাশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি খারাপ হইলে কর্ম্ম খারাপ হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কর্ম্ম খারাপ হইলে তাহা হইতেই বুদ্ধিও খারাপ হইবেই হইবে এরূপ অনুমান করা যায় না। গীতা নিছক কর্ম্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়া কর্ম্মের প্রেরকবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত মানুষের মধ্যেই এক আত্মা আছে এই তত্ত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধি এইরূপে শুদ্ধ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে, ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি মনোধর্ম্ম স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। অতএব যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে। যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই তাহার পক্ষে বিশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ।(১১)

এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান যুগের আর একজন বিখ্যাত মণীষী এ বিষয়ে কি বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতায় এই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—

"Ordinarily if a man goes out into the street and shoots down another man, he is apt to feel sorry for it—thinking that he had done wrong or that he had not done his duty. But if the very same man standing as a fighting soldier in the ranks of his regiment, kills not one man, but twenty men by shooting them down, he is certain to feel glad and think that he did his duty remarkably well. Therefore it is easy to see that it is not the thing done that defines a duty. To give an objective definition of duty, therefore is thus entirely impossible. Indeed there is no such thing as an objectively defined duty. Yet there is duty from the subjective standpoint. And any action that makes us go Godward is a good action and to do that is our duty and similarly any action that makes us go downward or away from God is an evil action and to do that is not our duty. From the subjective standpoint alone, we see that certain acts have a tendency to exalt and ennoble us—while certain others have a tendency to degrade or brutalise us. But it is not possible to make out with certainty which act will have which kind of tendency in relation to persons placed in different or even in similar conditions."

উদ্ধৃত অংশের শেষ লাইনটীর প্রতি আমি বিশেষভাবে পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বামিজী স্পষ্টই বলিতেছেন, একই অবস্থায় মধ্যে অবস্থিত কর্ম্মীগণ একই কর্ম্ম করিয়া বিভিন্ন প্রকারে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। অতএব কেবলমাত্র অবস্থা ও কর্ম্ম বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায় না। তবে কিরূপ কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? স্বামীজী তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "Therefore to perform to the best of our ability the actions that appear to be our duty at any particular time is the only thing that we can do in this world." (১২) যাহা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে তাহাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই আমাদের উচিত।

চারিজন বিখ্যাত মনীষীর মত উদ্ধৃত করিলাম। ইহাদের প্রত্যেকেরই মত বিভিন্ন। বঙ্কিমবাবু ও গিরীন্দ্রশেখরবাবু উভয়েই বাহ্য কর্ম্মের বিচার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী। তিলক ও স্বামীজী

---

(৯) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত। পাতা, ৯৩।

(১০) অবস্থা বিশেষে জীবনধারণের জন্য চুরি করার প্রয়োজন হয়। দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র মুনি চুরি করিয়া কুক্কুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

(১১) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতারহস্য বা কর্ম্মযোগশাস্ত্র—বালগঙ্গাধর তিলক। অনুবাদক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ প্রকরণ।

(১২) কর্ম্মযোগ নামক বাঙ্গলা পুস্তকে মূল বক্তৃতার বহু অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে ও স্থানে স্থানে অনুবাদও ভাল হয় নাই। এই জন্য আমি মূল ইংরাজী বক্তৃতাই উদ্ধৃত করিলাম।

বলেন, কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধি কিংবা কর্ম্মীর মন কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহার দ্বারাই কর্ম্মীর বিচার করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু ও গিরীন্দ্রশেখরবাবুর মতে শর্ব্বীলক ও ঠগীদস্যুগণ পাপ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, কারণ দস্যুতা ও নরহত্যা সমাজসম্মত কার্য্য নহে—বরং অসৎ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। উহা আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের নিয়মও নহে। ব্যবসাদারের কাজ সম্বন্ধে ইহাদের মত কি তাহা আমাদের জানা নাই। দেশপূজ্য তিলকের মতে শর্ব্বীলক, ঠগীদস্যুগণ কিংবা উল্লিখিত ব্যবসাদারের কার্য্যের বিচার করিতে হইলে প্রথমে বিচার করিতে হইবে তাহাদের বুদ্ধি-শুদ্ধ ছিল কিনা। বুদ্ধি-শুদ্ধ হইলে তাহাদের কোন পাপ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দের মতে উহারা যদি সত্য সত্যই মনে করিয়া থাকিত যে ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা উহারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা হইলে উহাদের কোন পাপ হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কাহার মত অধিকতর যুক্তিযুক্ত তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত। স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কিরূপ মতভেদ আছে তাহাই আমি নির্দ্দেশ করিলাম।

এখন দেখা যাউক এই আলোচনার ফলে আমরা কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম :—

(১) প্রতিকুল বেদনার নামই দুঃখ। দুঃখ দুই প্রকারের, শারীরিক ও মানসিক।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল যথাযথরূপে পালন করিলে শারীরিক দুঃখ বহুল পরিমাণে দূর হয়; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি শারীরিক দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা হইলে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বোধ না করাই দুঃখ দূর করার উপায়।

(৩) সকল প্রকার মানসিক দুঃখের মূল হইতেছে, বাসনা, কামনা বা তৃষ্ণা। অতএব বাসনার নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইল। বাসনার নিবৃত্তি দুই প্রকারে হইতে পারে, (ক) বাসনা পূর্ণ করিয়া কিংবা (খ) বাসনা ত্যাগ করিয়া।

(৪) বাসনা পূর্ণ করিয়া কখনও বাসনার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ বাসনা পূর্ণ করিলে অন্য বাসনার কিংবা কিছুকাল পরে সেই বাসনারই পুনরুদ্রেক হয়।

(৫) সন্ন্যাস মার্গের লোকেরা বলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী না হইলে বাসনা বা তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয় না। বাসনার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

(৬) আর একদল ধর্ম্মাবতাররা বলেন, বাসনা ত্যাগ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা যায় ও তাহাই উচ্চতর আদর্শ।

(৭) নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু কিরূপ কর্ম্ম আমাদের করা উচিৎ। গীতায় বলা হইয়াছে, স্বধর্ম্ম পালন কর। স্বধর্ম্ম অর্থে duty অথবা কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে।

(৮) কর্ত্তব্য কি? কেহ কেহ কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করিতে কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধির বিচার করেন, কিংবা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী কিরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহাই বিচার করেন; কেহ কেহ বাহ্য কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করেন। আবার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বংশানুক্রমিক হইবে কিনা, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে।

পদ্মা

শ্রীশান্তি পাল

পদ্মা, পদ্মা,—
বক্ষে ল'য়ে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
ঘন ঘন শ্বাস,
উন্মত্ত আবেগ ভরে
কল কল স্বরে
কোথা যাও উন্মাদিনী বৈরাগিনী বেশে
দিগন্তের শেষে,
যেথা, দুই কূল এক হ'য়ে যায়
অবসন্ন জীবনের শেষ মোহানায়!
পদ্মা, পদ্মা,—
ও কি ব্যথা বাজে তব প্রাণে
কল্লোলের গানে?
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, নাহি অবসাদ
ভাঙি দীর্ঘ দৃঢ় বাঁধ
চলিয়াছ আপনার সব কিছু দিয়া
মর্ম্মমাঝে শুধু ঘোর ব্যাকুলতা নিয়া!

পদ্মা, পদ্মা,—
এ সজ্জা কি সাজে তব,
অভিনব!
আজি এই উচ্ছলিত বরষার দিনে
চেয়ে দেখো দুই কূলে নবশ্যাম বিপিনে বিপিনে,
পল্বলে পল্বলে
সরোবর-জলে,
সরসিয়া উঠিতেছে কত শত কুমুদকহ্লার,
শুধু একবার
অঙ্গে মাখ মদ-গন্ধ তার;
ক্ষণেকের তরে
ভুলে যাও অবিশ্রান্ত চলার ছন্দ রে।
গতি তব হোয়ে যাক্ লয়—
সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ স্তব্ধ হোক অনন্ত প্রলয়!
উচ্ছলিত গতির প্রপাতে
নিবিড় করিয়া বাঁধ মিলনের রাঙারাখী হাতে।

বানপ্রস্থ

বনফুল

(নাটিকা)

একটি পোড়ো নীলকুঠির একটি কক্ষ। ঘরটিতে দুইটি বড় দরজা এবং কয়েকটি জানালা রহিয়াছে। আসবাব-পত্র কিছুই নাই। দরজা ঠেলিয়া বরদা ও জগমোহন প্রবেশ করিলেন। জগমোহনের হাতে দুইটি মুগুর, বরদার হাতে কিছু নাই। উভয়েই স্বাস্থ্যবান, যদিও উভয়েরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জগমোহনের গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে মুখে এমন একটি ভাব আছে যে দেখিলেই মনে হয় লোকটি রসিক। বরদার বেশ জমকালো কাঁচাপাকা এক জোড়া গোঁফ আছে, গোঁফের প্রান্তদ্বয় ঊর্দ্ধমুখী। বরদার চোখে-মুখেও এমন একটা ভাব আছে যে, দেখিলে মনে হয় লোকটি রাশভারী এবং চটা মেজাজের। বরদার রঙ, কালো এবং বড় বড় চোখ দুটি লাল। তাঁহারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভৃত্য-জাতীয় ব্যক্তি একটি শতরঞ্চি বগলে করিয়া প্রবেশ করিল।

জগমোহন। শতরঞ্চিটা পেতে ফেল। বরদা, একটু সর তো ভাই, শতরঞ্চিটা বেশ চৌরস ক'রে পাতুক।

বরদা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। চাকরটি শতরঞ্চি বিছাইতে লাগিল। জগমোহন ঘরের কোণে গিয়া মুগুর দুইটি রাখিয়া দিলেন।

ভৃত্য। (শতরঞ্চি পাতা শেষ করিয়া) আমি এবার যাই হুজুর ?

জগমোহন। বেশ, যা—ভাড়া পেয়ে গেছিস তো ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর !

নমস্কার করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল

জগমোহন। ওরে শোন্ !

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিল

আমাদের সেই মালের নৌকোটার সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লে দিস তাড়াতাড়ি আসে যেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে হুজুর।

চলিয়া গেল

জগমোহন। যাক্—এসে তো পড়া গেল। ওপারের জমিদারবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলাম, তাঁরাও ঘরটা সাফ-সুতরো করিয়ে রেখেছেন দেখছি। বাপরে বাপ—রাস্তা কি সহজ, স্টেশন চার ক্রোশ থেকে বারো ক্রোশ—গরুর গাড়ি, তারপর নৌকো—ওকি ভুরু কুঁচকে আছ কেন ? এর মধ্যেই ঘাবড়াচ্ছ ! তখুনি বলেছিলাম তোমার দ্বারা এসব হবে না।

বরদা। ঘাবড়াই নি। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার বুদ্ধি দেখে।

জগমোহন। কি রকম ?

বরদা। এত জিনিস থাকতে তুমি কেবল মুগুর দুটো নিয়ে এলে। ফলের বাস্কেট্ পড়ে রইলো ওই নৌকোটাতে, মুগুর নিয়ে কি করব এখন !

জগমোহন। ব্যস্ত হও কেন ! ও নৌকোটাও এসে পড়ল বলে। পান্সির মাঝিটাকে তো বলেও দিলুম শুনলে, যদি দেখা পায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আসবেও তারা তাড়াতাড়ি। আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। খিদে পেয়েছে না কি ?

বরদা। খুব বেশী নয়, একটু একটু।

জগমোহন হাসিলেন

জগমোহন। তোমার পাল্লায় পড়ে এলাম তো। আসল ব্যাপারটা এইবার খুলে বল দিকি। এমন ভাবে পালিয়ে আসার অর্থটি কি—

বরদা। অর্থ আবার কি, অর্থ তো আগে বলেইছি।

জগমোহন। আমি কিন্তু শুনতে চাইছি নির্গলিতার্থ। মানে—

বরদা। মানে টানে কিছু নেই—মানুষের ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে আমার। এই রকম স্থানই আমার পক্ষে ঠিক স্থান। এ বয়সে শান্তিতে থাকতে হ'লে বানপ্রস্থ নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

জগমোহন। এ সব তো প্রাচীন কথা। হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন ?

বরদা। (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) খেয়াল ! কিছুমাত্র আত্ম-

সম্মান জ্ঞান থাকলে বুড়ো বয়সে সংসারে থাকা উচিত নয়। একটা বুড়ো সংসারের অলঙ্কার নয়, ভার। তার মানে মানে সরে যাওয়াই উচিত।

জগমোহন। (হাসিয়া) অর্থাৎ পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

বরদা। পরিবারের সঙ্গে আবার সদ্ভাব থাকে কার কোন্ দিন! তুমি ব্যাচিলার মানুষ, পরিবারের স্বাদ পাওনি কখনও, তাই ইডিয়টের মতো এ কথাটা বললে। কোন ভদ্রলোকের কখন কোন দিন কস্মিন্‌কালে পরিবারের সঙ্গে সদ্ভাব থাকে নি—থাকতে পারে না।

জগমোহন কিছু না বলিয়া হাসিলেন

শুধু পরিবারের সঙ্গে নয়, কারো সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। এ যুগের কারো সঙ্গে আমার মেলে না।

জগমোহন। কারো সঙ্গে মেলে না! বল কি!

বরদা। মিলবে কি ক'রে! আমাদের পছন্দ বালা-পোষ, ওদের পছন্দ চেস্টারফিল্ড; আমাদের জামা গলা-বন্ধ, ওদের জামা গলা খোলা; আমরা মুগুর ভাঁজি, ওরা তাস ভাঁজে; আমরা কুস্তি করি পালোয়ানের সঙ্গে—ওরা ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলে মেয়েদের সঙ্গে। আমরা দামী গড়গড়ায় তাওয়া দিয়ে অম্বুরি তামাক খাই, ওরা ফোঁকে সিগারেট। ওদের সঙ্গে আমাদের মিলতে পারে না—পারে না—পারে না।

প্রত্যেক 'পারে না'র সহিত তিনি প্রসারিত বাম করতলে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ করতল দিয়া আঘাত করিলেন

জগমোহন। তোমার গিন্নিটি তো সেকেলে, তাঁর সঙ্গে অন্তত তোমার ভাব থাকা উচিত ছিল।

বরদা। তুমি হ'লে আইবুড়ো কার্ত্তিক, তুমি গিন্নি-ফিন্নির কিছু বোঝ কি! ওরা হ'ল ঝড়ের আগে এঁটো পাতের জাত। যেদিকে হাওয়া বয়, সেইদিকেই চলে।

জগমোহন। তার মানে ?

বরদা। তার মানে—নির্ব্বিচারে প্রবলের পক্ষ নেয়। আমার এখন বয়স গেছে, উপার্জ্জন করি না; সুতরাং গিন্নি এখন ছেলেদের দলে যোগ দিয়েছে। ভাবছে—ও বুড়োটার আর কি পদার্থ আছে—ওটাকে তো আমসি-চোষা ক'রে শেষ ক'রে এনেছি। (সহসা উদীপ্ত কণ্ঠে) তা না ভাবলে—

সহসা আবার থামিয়া গেলেন

জগমোহন। তা না ভাবলে ?

বরদা। তা না ভাবলে কখনও আমার কথার ওপর কথা কইতে আসে। অমন সুন্দরী সদ্বংশের মেয়ে পছন্দ করলাম, তা কারুর মনে ধরল না। নানান্ বায়নাক্কা। দুর্গার নাম ছেলের পছন্দ নয়, মেয়ে গান গাইতে জানে না। আরে মোলো, গান শুনতে চাস তো ভাল, একটা বাঈজী ডেকে গান শোন্ না। শুনে তৃপ্তি পাবি। তারা রুটির জন্যে গান শিখেছে—হার্মোনিয়াম প্যাঁ-পোঁ ক'রে ন্যাকামি করবার জন্যে নয়। তা ছাড়া, বউ গান গাইবে কখন বল তো হ্যাঁ—এসেই তো ঢুকবে রান্নাঘরে, তারপর আঁতুড়ে। সারাটা জীবন রান্নাঘর-আঁতুড়ঘর করতে হবে যাকে, সে গান গাইবে কখন!

জগমোহন। তোমার বড় ছেলের বিয়ের কথা বলছ ? কোথায় ঠিক হ'ল ?

বরদা। কে জানে! কোন এক ধূসরা বলে মেয়ের সঙ্গে।

জগমোহন। ধূসরা!

বরদা। হ্যাঁ ধূসরা। ধূসরা ফোয়ারা জর্জেট মর্জিনা—যার সঙ্গে খুশি ছেলের বিয়ে দিক—আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি জীবনের বাকী দিন ক'টা শান্তিতে কাটিয়ে দিতে চাই, বাস্ এবং এই রকম নির্জ্জন স্থানই আমার পছন্দ।

পদচারণ করিয়া জানলার নিকট গিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জগমোহন স্মিতমুখে বরদার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বরদা সহসা ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলেন

দুধ পাওয়া যাবে এখানে ?

জগমোহন। এখানে কিছু পাওয়া যায় না; তবে এখানে যদি থাকো, ওপারের গোয়ালাদের কাছ থেকে দুধের ব্যবস্থা হতে পারে।

বরদা। খেয়া নৌকো নেই বলছ, তারা পার হবে কি করে ?

জগমোহন। তারা মোষের পিঠে চড়ে পার হয় সাধারণত।

বরদা। ও।

পুনরায় জানলার দিকে ফিরিলেন

জগমোহন। বাড়িতে কি ব'লে এসেছ ?

বরদা। জমিদারী দেখতে বেরুচ্ছি। এক তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না আমি কোথায় এসেছি।

জগমোহন। থাকতে পারবে তো, দেখ—

বরদা। না থাকতে পারার কি হেতু আছে? তুমি যদি পারো, আমি পারবো না কেন?

জগমোহন। আমার কথা ছেড়ে দাও, অনেক ঘাটের জল খাওয়া অভ্যেস আছে আমার। চিরটা কাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারশিয়ারি ক'রে কাটিয়েছি, তাছাড়া আমার তিন কুলে কেউ নেইও যে বুক চাপড়ে কাঁদবে। তোমারি নানান্ বখেড়া—

বরদা। বখেড়া কি রকম?

জগমোহন। (হাসিয়া) বখেড়া বই কি! তোমার ঢালা ফরাস চাই, তাকিয়া চাই, বই চাই, ঘন ঘন খাবার চাই, তামাক চাই, মুগুর চাই—মুগুর না ভাঁজলে খিদেই হয় না। তোমার মতো লোকের এসব জায়গায় থাকা শক্ত বই কি।

বরদা। কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া ফরাস, তাকিয়া, বই, খাবার সবই তো আসচে। নৌকোটা কতক্ষণে এসে পৌঁছবে বল তো! তুমি নিয়ে এলে মুগুর দুটো—ফলের বাস্কেটটা ফেলে। আশ্চর্য্য বুদ্ধি তোমার!

জগমোহন। মুগুর দুটো হাতে ছিল, নিয়ে এলাম। আমাদের ঐ ছোট পানসিতে কি তোমার ওই বিরাট বড় বড় দুটো ফলের বাস্কেট আঁটতো? ও দুটোকে বাস্কেট বল কি হিসেবে, দুটো তো প্রকাণ্ড বড় বড় প্যাকিং কেস। কি ফল এনেছ এত?

বরদা। সমস্ত ড্রাই ফ্রুট্স্। দু'জনের স্বচ্ছন্দে মাসখানেক চলে যাবে। তার পর ঠিক করেছি, কলকাতা থেকে রেগুলার বাস্কেট আনাব। নিজেদের একটা নৌকাও রাখতে হবে, বুঝলে? চমৎকার নির্জ্জন জায়গাটি—

সহসা শূন্যে করতালি দিয়া

বেশ মশা আছে দেখছি এখানে।

জগমোহন। মশা তো হবেই, বুনো জায়গা।

বরদা। তুমি নিধেটাকেও ওই নৌকোটাতে রেখে এলে। সে থাকলে তবু—

জগমোহন। বাঃ—অত খাবারটাবার, কাপড়চোপড়, হোল্‌ড অল্, স্যুট কেস, ট্রাঙ্ক, য়্যাটাচি—সব ওই অচেনা মাঝি ব্যাটাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসব! নিধে পুরোনো চাকর, সব সামলে-সুমলে আনতে পারবে।

বরদা। [সক্ষোভে] তুমি যদি মুগুর দুটো না এনে তামাকের সরঞ্জামটা আর মহাভারতটা আনতে, তা হলে আরাম ক'রে ব'সে একটু পড়া যেত।

জগমোহন। সব এসে পড়বে এক্ষুণি, ঘাবড়াচ্ছো কেন? তুমি বস না।

বরদা। শতরঞ্জির উপর দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকব! তার চেয়ে চল বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।

জগমোহন। বাইরে স্রেফ শেয়াল কাঁটা আর কন্টিকারির বন ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। এইখানেই বস—

বরদা। এই জঙ্গলে সায়েবগুলো কেমন বাংলোটা বানিয়েছে দেখেছ!

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন

জগমোহন। আগে যে এখানে নীল চাষ হ'ত।

বরদা। [আর একটি দরজায় উঁকি দিয়া] এদিকেও আর একটা ছোট রুম রয়েছে হে।

জগমোহন। এ বাড়িটাতে অনেকগুলো রুম। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে।

বরদা। [সহসা জানালার দিকে চাহিয়া] ওহে, দেখ দেখ, আর একখানা কাদের নৌকো যেন ভিড়েছে এসে। কে একজন যেন নেবে আসছেও—বেশ হনহন ক'রে আসছে। ভটচায্যি-ভটচায্যি চেহারা।

জগমোহন। এই পোড়ো বাংলোটার লোভে অনেকে পিক্‌নিক করতে আসে এখানে। শিকারও মেলে শীতকালে—

বরদা। তুমি ওপারের জমিদারবাবুদের ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তো?

জগমোহন। সমস্ত—মায় ভাড়া পর্য্যন্ত।

বরদা। ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়েছেন, এইদিকেই ঘুরলেন।

জগমোহন। বেশ তো, আসুন না, গল্প ক'রে সময় কাটবে।

বরদা। উঃ, কি ভয়ানক মশা হে—

চটাৎ করিয়া মারিলেন

(নেপথ্যে) আসতে পারি ?

বরদা। [আগাইয়া গেলেন] আসুন, আসুন—নমস্কার !

শিরোমণি মহাশয় প্রবেশ করিলেন

আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন ?

শিরোমণি। ওনারা হয়তো বেড়াতে এসেছেন, আমি এসেছি অদৃষ্টের ফেরে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন পাপের ফলেই সম্ভবত দূষিত সংসর্গ করতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি অম্বিকা শিরোমণি স্বেচ্ছায় এদের সঙ্গে বেড়াতে আসি না।

জগমোহন। আসুন আসুন, বসুন !

বরদা। ভালই হয়েছে, কথা কয়ে বাঁচা যাবে, বসুন।

জগমোহন। [হাসিয়া] তুমি এইমাত্র মহাভারতের খোঁজ করছিলে স্বয়ং শিরোমণি মশায় এসে হাজির হয়ে গেছেন। কত শাস্ত্রচর্চ্চা করবে কর এখন বসে বসে।

বরদা। যা বয়স হ'ল এখন শাস্ত্রচর্চ্চাই করতে হবে ভাই। তা ছাড়া, শাস্ত্রচর্চ্চা আমার ভালও লাগে খুব। শিরোমণি মশায় চটে আছেন বলে মনে হচ্ছে—বসুন।

সকলে উপবেশন করিলেন

শিরোমণি। চটব কার ওপরে বলুন, নিজের অদৃষ্টের ওপরে ? তবে ক্ষুব্ধ হতে তো বাধা নেই। ক্ষুব্ধ হয়েছিও।

বরদা। ঠিকই বলেছেন, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

শিরোমণি। যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষকার বলেও একটা জিনিস আছে। কঠোপনিষদ বলেছেন—

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
> তয়োঃ শ্রেয় আদাদানস্য সাধু
> ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ৩০॥১॥

জগমোহন। আপনারা ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করুন, আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি একটু। দেখি আমাদের নৌকাটা আসছে কি-না।

শিরোমণি। কিসের নৌকো ?

বরদা। আমাদের জিনিসপত্র যে নৌকাটায় আছে সেটা এখনও এসে পৌছয়নি। হ্যাঁ, তুমি একটু খোঁজ নাও গিয়ে—

জগমোহন বাহির হইয়া গেলেন

আপনি যে শ্লোকটি বললেন তার অর্থ কি ?

শিরোমণি। তার অর্থ হচ্ছে গিয়ে—শ্রেয় আর প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন জিনিস এবং দু-ই জীবকে বিভিন্নরূপে আবদ্ধ করে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর মঙ্গল হয়, আর যিনি শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়তে অর্থাৎ সুখকরকে বরণ করলেন তিনিই মলেন, পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হলেন।

ট্যাঁক হইতে নস্যদানি বাহির করিয়া নস্য লইলেন

আমি এখন প্রেয়-বিলাসী পরমার্থ-বিচ্যুত এক ছোকরার কবলে কবলিত। দুরদৃষ্ট আর কি।

বরদা। তাই না কি ! মান ?

শিরোমণি। মানে, বিপথগামী এক শিষ্যের পাল্লায় পড়েছি এবং সে বিপথগামী বলেই তাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। কারণ স্বয়ং ভগবান গীতায় বলছেন—

> যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
> পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ৪॥৮॥

ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনের জন্যই ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিকের সঙ্গ করতে হয়, উপায় নেই। তা ছাড়া বেতনও দেয়, সুতরাং অধিকতর নিরুপায় !

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি আনন্দিত হলাম। চমৎকার ! সময়টা ভাল ভাবেই কাটবে মনে হচ্ছে। আপনার সেই বিপথগামী শিষ্যটি কোথায় ?

শিরোমণি। ওই যে নৌকাবিহার করছেন তিনি। আমার আর বরদাস্ত হ'ল না, নৌকো থেকে নেমে পড়লাম আমি। ছোকরার এদিকে সংস্কৃতের দিকে ঝোঁক আছে, সংস্কৃত চর্চ্চার জন্যে আমাকে বেতন দিয়ে রেখেছে—কিন্তু হ'লে কি হবে—অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ। ওই অবিদ্যাতেই সব মাটি করেছে।

বরদা। যা বলেছেন। এ যুগটাই অবিদ্যার যুগ। যে ভারতে একদিন—

জগমোহন ফিরিয়া আসিলেন

কি হ'ল হে, নৌকোর কোন পাত্তা পেলে ?

জগমোহন। কই, কিছু তো দেখতে পেলাম না। একটু পরেই এসে পড়বে। শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করা যাক—

শিরোমণি। আমি শাস্ত্রের কতটুকুই বা জানি! তা ছাড়া, শাস্ত্র—যার অর্থ হ'চ্ছে প্রাচীন অনুশাসন—যা দেবগণ ঋষিগণ বেদ-তন্ত্র-স্মৃতি-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন সে শাস্ত্র আজকাল কে জানছে বলুন। শাস্ত্রচর্চা আজকাল একটা অবান্তর ব্যাপার। এই ধরুন না, যে জমিদারপুত্রটির সঙ্গে আমি এসেছি সে কি মনুসংহিতোক্ত রাজার ধর্ম্ম পালন করে?

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ
বৃকবচ্চানুলম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ।

ও বকও নয়, সিংহও নয়, বৃকও নয়, শশও নয়—ও একটা ছাগল।

বরদা। (সমঝদারের মত ভঙ্গী করিয়া) ঠিক বলেছেন, আজকাল ব্যাপারই ওই রকম।

জগমোহন। (হাসিয়া) না, সেকথা বললে শুনব কেন! ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব এখনও কিছু কিছু আছে বই কি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আপনার সামনেই বর্ত্তমান; ইনি সংসারে বীতরাগ হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে এখানে এসেছেন।

বরদা। তুমি থামো দিকি।

জগমোহন। থামবো কি রকম, যা সত্যি—

শিরোমণি। বানপ্রস্থ! তাই নাকি, এ যুগের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। বানপ্রস্থ ক'রকম তা জানেন?

বরদা। কিছুই জানি না। (হাসিলেন)

জগমোহন। শিরোমণি মশায় নিশ্চয় সব জানেন। বানপ্রস্থের বিষয় আপনি বলুন তো একটু শিরোমণি মশায়। কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা যাক।

বরদা। (সাগ্রহে) আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন তো।

শিরোমণি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য—শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম। মহানির্ব্বাণতন্ত্র কিন্তু বলছেন কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন আশ্রমই নেই। ও বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে, ব্যাসদেব বলেন—য্যাক্ সে সব—এখন বানপ্রস্থের কথা শুনুন।

নস্য লইলেন

বানপ্রস্থ হচ্ছে তৃতীয় আশ্রম। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী দার-পরিগ্রহ অপত্যোৎপাদনাদি সমাধানান্তে বনবাসগমন পূর্ব্বক অকৃষ্ট পচ্য ফলাদি ভক্ষণ ক'রে যে ঈশ্বরারাধনা তাকেই বলে বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—

বরদা। (মুগ্ধ) আপনার জ্ঞানের গভীরতা দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। আপনারাই হলেন ভারতের গৌরব।

জগমোহন। (সোৎসাহে) সে কথা আর বলতে!

বরদা। বলুন বলুন শুনি।

শিরোমণি। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তদূখলিক।

বরদা। সে আবার কি! দন্তদূখলিক!

শিরোমণি। যারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে তাদেরই দন্তদূখলিক বলে।

বরদা। বানপ্রস্থে খেতেও মানা না কি?

জগমোহন। (অপাঙ্গে বরদার পানে চাহিয়া) তবেই সেরেছে!

শিরোমণি। না, না, খেতে মানা নেই, তবে আহার বিষয়ে সংযত হবার নানা বিধান আছে। ফালকৃষ্ট আহার্য্যই নিষিদ্ধ। অন্যান্য বিধানও আছে, তার মধ্যে তিনবার স্নান করা, জটাবল্কল ধারণ করা, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত হওয়া, স্বাধ্যায়বান হওয়া, দান্ত আত্মবান হওয়া—এইগুলোই প্রধান।

বরদা। এ সব করবার মানে?

জগমোহন। ভীষণ আইন-কানুন দেখছি!

শিরোমণি। ভোগলিপ্সাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে অবলুপ্ত করতে পারাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীর-মনকে প্রস্তুত ক'রে নিতে হয়, তেমনি ভৈক্ষ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার জন্যে বানপ্রস্থে সমস্ত বাসনাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়। সেইজন্যে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাকালে ভূতলশায়ী হয়ে এবং হেমন্তকালে আর্দ্রবস্ত্রধারী হয়ে থাকার নিয়ম আছে। আসল কথা কি জানেন?

বরদা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষোক্ত বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন

বরদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলুন সহজ ক'রে।

শিরোমণি। আসল কথা উপনিষদে পাবেন। ছান্দোগ্যে আছে—শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ—

নস্য লইলেন

বরদা। একটা ভারি অভাব বোধ করছি, জগমোহন!

জগমোহন। কিসের?

বরদা। তামাকের। তুমি খালি মুগুর দুটো নিয়ে এলে—

জগমোহন। নৌকো এই এসে পড়ল বলে', একটু ধৈর্য্য ধর না।

বরদা। তুমি আর একবার বেরিয়ে দেখ না হয়।

জগমোহন। হ্যাঁ যাই। পণ্ডিত মশায়ের কথাটা শেষ হয়ে যাক। এমন উপদেশাত্মক ভাল কথা তো চট্ ক'রে শোনা যায় না।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন—ছান্দোগ্যে—

শিরোমণি। ছান্দোগ্য বলছেন, শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুখ কি?

জগমোহন। ঠিক কথা, ওই সুখের খোঁজেই তো এখানে আসা।

বরদা। ওইটেই তো আসল প্রশ্ন।

শিরোমণি। তার আসল উত্তরও ওই ছান্দোগ্যেই পাবেন। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ভূমাই চরম সুখ। এখন ভূমা হচ্ছে—

বরদা। (সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে) মাঝি ব্যাটারা আবার এ নীলকুঠি চিনতে পারবে তো হে?

জগমোহন। তা পারবে।

বরদা। তুমি আর একবার দেখ। খিদে পাচ্ছে আমার।

জগমোহন। দেখছি, দেখছি। থাম না, শিরোমণি মশায়ের কথাটা শেষ হতে দাও না। বলুন শিরোমণি মশায়, ভূমা হচ্ছে—

বরদা। হ্যাঁ বলুন, বলুন।

শিরোমণি। ভূমা হচ্ছে সেই জিনিস, যা লাভ করলে অন্য কোন বস্তু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি—স ভূমা। যা অল্প, যা সীমাবদ্ধ তাই মরণশীল, তাই দুঃখজনক। অর্থাৎ সমস্ত বাসনা-কামনা-বর্জ্জিত না হ'লে ভূমা লাভ হয় না। বৃহদারণ্যকে যাকে বলেছে এষণা—সেই এষণামুক্ত হতে হবে।

বরদা চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন

বরদা। ঠিক বলেছেন, মায়াই হল আসল বখেড়া। ওইতেই তো ডুবেছি আমরা।

(নেপথ্যে) শিরোমণি মশায় আছেন না কি?

শিরোমণি। আমার শিষ্যপ্রবর এসে হাজির হয়েছেন। এসো হে রঙ্গলাল—ভিতরে এসো।

রঙ্গলাল আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চোখে প্যাঁশনে, পরিধানে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখে মৃদু হাসি, চক্ষু বুদ্ধিদীপ্ত। সপ্রতিভ সুদর্শন ব্যক্তি। বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে

বরদা। আসুন, আসুন, নমস্কার।

জগমোহন। (হাসিয়া) আপনার শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলাম। আসুন, বসুন।

রঙ্গলাল প্রতিনমস্কার করিয়া হাস্যদীপ্তচক্ষে সকলের মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর সিগারেটটায় শেষ টান দিয়া সেটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন

রঙ্গলাল। এই রবিন্সন ক্রুশো-মার্কা দ্বীপে যে শিরোমণি মশায় শাস্ত্রালাপ করবার মতো লোক আবিষ্কার করতে পারবেন তা আমি ধারণাই করতে পারি নি! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঠিক পেয়ে গেছেন তো!

জগমোহন। আপনাদের পেয়ে বেঁচে গেছি আমরা। বসুন।

রঙ্গলাল। (উপবেশনান্তে) শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন কেন—কি আলাপ করছিলেন করুন, আমিও একটু শুনি।

বরদা। ভূমা সম্বন্ধে বলছিলেন উনি।

রঙ্গলাল। আহা, ভূমা কথাটা বড় ভাল, চুমার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিল হয়!

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

শিরোমণি। এসেই ফাজলামি সুরু করলে তো বাবা!

রঙ্গলাল। আমি আর একটি কথাও বলব না, আপনি যা বলছিলেন বলুন।

বরদা। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছেন যে রঙ্গলালবাবু?

রঙ্গলাল। আপনার শরীর দেখছি। বাঃ, এই বয়সেও তো চমৎকার শরীর রেখেছেন। ফাইন্!

বরদা। কুস্তি-লড়া শরীর, এখনও মুগুর ভাঁজি।

রঙ্গলাল। ও তাই।

জগমোহন। শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন যে?

রঙ্গলাল। কি বলছিলেন বলুন না শুনি।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন।

শিরোমণি নস্য লইলেন

শিরোমণি। বলছিলাম, বৃহদারণ্যকের উপদেশ হচ্ছে—এষণামুক্ত হতে হবে। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—সর্ব্বপ্রকার এষণামুক্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করলেই পরমানন্দে লীন হবার আশা করা যায়। তৎপূর্ব্বে নয়।

রঙ্গলাল। মাপ করুন শিরোমণি মশায়, আমি কিন্তু পরমানন্দ লাভ করতে চাই অন্য উপায়ে।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

শিরোমণি। বন্ধন নিয়ে মুক্তির স্বাদ মেলে না বাবা, কবিতাতেই ও সব শুনতে ভাল। মুক্তি পেতে হলে রীতিমত সাধনা করতে হয়, নিরাসক্ত হয়ে পূজা করতে হয়।

রঙ্গলাল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলছেন—

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্যদান
পূজারীর পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী জল-ধারে
পূজি আমি তারে।
বিগলিত প্রেমের আনন্দ বারি সে যে
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) বাঃ, আপনিও তো গুণী লোক মশায়! (তাহার পর সহসা) জগমোহন, নৌকোর গতিক কিন্তু খারাপ মনে হচ্ছে।

জগমোহন। আরে ব্যস্ত হও কেন, এখনি এসে পড়বে নৌকো।

রঙ্গলাল। নৌকোর কথা শুনলেই আমার রবীন্দ্রনাথের দিন শেষে কবিতাটা মনে পড়ে—

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।
নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে—

সহসা থামিয়া গেলেন

না, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনাদের মুক্তি-টুক্তি নিয়ে সদালোচনা হচ্ছিল, আমার এ রকম ভাবে বাধা দেওয়াটা—

বরদা। না না বলুন আপনি, চমৎকার লাগছে।

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) আমিও মুক্তিকামী লোক, শিরোমণি মশায়ও তাই। আমাদের দুজনের পথ খালি বিচ্ছিন্ন।

শিরোমণি। দেখ রঙ্গলাল, ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পুনঃপুনঃ বলেছি, এখন আবার বলছি এবং যতদিন বাঁচব বলব—মুক্তি নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিষ এবং সত্যি সত্যি মুক্তি পাওয়া আর এক জিনিস। কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের যা বাণী—

রঙ্গলাল। মাফ করুন শিরোমণি মশায়, কহোল যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের বাণী বহুবার শুনেছি আপনার মুখ থেকে, কিন্তু কবির বাণীও কি তার চেয়ে কোন অংশে কম?

আবৃত্তি সুরু করিলেন

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাবো আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে
সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন

শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

আপনি কি বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় মুক্তির বার্ত্তা নেই ?

শিরোমণি। বার্ত্তা থাকতে পারে, কিন্তু কেবল বার্ত্তা পেলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ মুক্তিলাভের জন্যে যে সব বিধি-বিধান বেঁধে দিয়েছেন তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে হবে। প্রাচীন বিধানের প্রতি এই যে তোমাদের অশ্রদ্ধা এটা মোটেই ঠিক নয়। তোমাদের সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি করা দরকার। অনুতপ্ত চিত্তে আত্মানুশাসন না করলে কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—

রঙ্গলাল। আপনারা তা হ'লে চিত্তশুদ্ধি করতে থাকুন, আমি কেটে পড়ি।

বরদা। (ব্যাকুল ভাবে) না, না, না— সে কি কথা, আপনি বসুন। আপনার আবৃত্তি শোনা যাক আরও দু-চারটে।

জগমোহন। সত্যি চমৎকার আবৃত্তি করেন আপনি।

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় চটে যাবেন।

বরদা। না না চটবেন কেন ?

শিরোমণি। ও যতই না কেন কবিতা আওড়াক, একথা মানতেই হবে যে, আসক্তি ত্যাগ না করলে ব্রহ্মলাভ হয় না এবং আসক্তি ত্যাগ করতে হলে তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা চাই। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্। ১৪।৭।

কর্ম্মে আসক্তি জন্মে তৃষ্ণা এবং আনন্দ দ্বারা—এই তৃষ্ণা এবং আনন্দ ত্যাগ না করলে ভূমালাভ অসম্ভব। তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা সহজ নয় মানি, কিন্তু তার জন্যে অনুতপ্ত হও।

রঙ্গলাল। [স্মিতহাস্যে] আমার কি মনে পড়ছে জানেন ?

শিরোমণি। কি ?

রঙ্গলাল। রুবাইয়াৎ।

আবৃত্তি সুরু করিলেন

Iram indeed is gone with all its Rose
And Jamshyd's sev'n ringed cup where no one knows
But still the Vine her ancient Ruby yields
And still a garden by the water blows.

বরদা। চমৎকার, অনেক দিন পরে ফিট্‌জেরাল্ড বেশ লাগলো—বাঃ।

শিরোমণি। আমি ওসব ইংরিজি মিংরিজি বুঝি না, কিন্তু ছান্দোগ্যের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জালানিতি

বরদা। আপনি একটু চুপ করুন শিরোমণি মশাই, দোহাই আপনার। রঙ্গলালবাবু, আপনি আরও খানিকটা বলুন রুবাইয়াৎ থেকে। চমৎকার লাগছে।

শিরোমণি কিছু না বলিয়া নস্য লইলেন। জগমোহন সস্মিতমুখে বরদার দিকে চাহিলেন, রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি সুরু করিলেন

And david's lips are lock't, but in Divine
High-piping Pehlvi with wine, 'wine, wine
Red wine—'the Nightingale cries to the Rose
That yellow cheek of hers to incarnadine,
Come, fill the cup, and in the Fire of Spring
The winter garment of Repentance fling :
The bird of time has but a little way
To fly,—and lo, the bird is on the wing.
Here with a Loaf of Bread beneath the Thou
A flask of wine, a book of verse and there
Beside me singing in the wilderness,
And wilderness is Paradise enow.

বরদা। Excellent, চমৎকার। [সহসা] জগমোহন, তুমি কিন্তু ভাই দেখ একবার বেরিয়ে—

জগমোহন। যাচ্ছি যাচ্ছি, ব্যস্ত হও কেন ? শোন না রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি খানিকক্ষণ।

বরদা। [রঙ্গলালবাবুর দিকে ফিরিয়া] সত্যি চমৎকার আপনার আবৃত্তি। শিরোমণি মশায়ের সংস্কৃতের অং বং-এর পর কর্ণে যেন একেবারে মধু বর্ষণ করলেন। শিরোমণি মশায় রাগ করবেন না যেন—আমরা মানে—একটু ই'য়ে ধরণের, মানে—[হাসিলেন]

শিরোমণি। [সজোরে নস্যের টিপ টানিয়া] রাগ করবার আর কি আছে এতে। ও ভাষা বুঝিও না, ওর রসও পাই না।

রঙ্গলাল। ভাষা বোঝবার তো কিছু নেই, সুরটা কানে লাগলেই হল ! সুরটাই আসল, অমন যে ব্যাকরণের উপসর্গ, তাও সুর-সংযোগে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রলরাপ সমন্বব নিরদুরভি
ব্যধি সুদতি নিপ্ পতি পর্য্যাপরঃ

শিরোমণি। [উচ্চভাবে] আমি সব সুরই বুঝি, বুঝলে বাবা। টোলে কাব্য অলঙ্কার পড়তে হয়েছিল আমাকে ; কিন্তু তোমরা, আজকালকার ছেলেরা কেবল একটি সুরই বোঝ, আর সব বিষয়ে তোমরা অসুর।

রঙ্গলাল কোন উত্তর না দিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

(আগামীবারে সমাপ্য)

তীর ও তরঙ্গ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বার

পরদিন সারাসকাল মন্দাকিনীর এতটুকু ফুরসৎ নাই। ছেলের বাক্স সাজাইয়াছেন, বিছানাপত্তর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—লুচি, হালুয়া, আর পাতক্ষীর দিয়াছেন পথের খাবার; টিফিন-ক্যারিয়ারে নারকেলের খাবারগুলি কলিকাতা গিয়া দুদিন রাখিয়া খাইবার মত; আমসত্ব, চাল্‌তে-পিঠা, মুড়ির হাঁড়িতে রাখা শীতকালের নতুন খেজুর গুড়—এমন অনেক কিছুর গুটি তিনেক ছোট পোঁটলা।

বেলা যত বাড়ে, মন্দাকিনীর বুকের মধ্যটা কেবলি হু-হু করিতে থাকে। আর ঘণ্টা চারেক—তার পর পুত্র আর এখানে নয়। আবার দেখা পাইবেন এক বৎসর পরে—বড়দিনের ছুটিতে আসিবে তাহার ভরসা কি! শেষকালে বাড়ী হইতে ছেলেকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন নাকি? মন্দাকিনী কথাগুলি ভাবেন, আর মাঝে মাঝে আড়ালে গিয়া খানিক নিঃশব্দে কাঁদিয়া লন—পরক্ষণেই এক হাতে চোখ মোছেন, আর এক হাতে কাজ সারিতে থাকেন।··

পুত্র কাল রাত্রে যে-কথাটা বলিয়াছে, সে কি তবে সত্য? মিথ্যা হইবার তো কথা নয়। চিঠি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছে—মাকে পড়িয়া দেখিতেও দিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রথমটায় মন্দাকিনী কিন্তু কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এই কয়দিনের অবিরাম অভিযোগ ও অভিমানের সঘন বাষ্পবেদনার মধ্যে সহসা আর একটা উৎপাত পথ করিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু কাল সারা রাত আর আজ এই বেলা এগারটার মধ্যে—এই ঘণ্টা পনের যাইতে না যাইতেই অণিমা ধীরে ধীরে আড়ালে সরিয়া পড়িতেছে এবং একটি অপরিচিত যুবতি মেয়ের একখানি কল্পিত মুখ মন্দাকিনীর শাঙ্কিত মন জুড়িয়া বসিতে চায়।···

আর ঘণ্টা পাচেক!···

তারপর ছেলে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে—তাঁর নাগালের বাহিরে—সুদূর কলিকাতায়। ছেলের যাত্রার সময় যতই আগাইয়া আসে, মন্দাকিনী ততই অজানা শঙ্কায় উতলা হইতে থাকেন। কাছে থাকিয়া যাহাকে লইয়া এই সাতটা দিন এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইল, সেই ছেলের কলিকাতার দিনগুলি কল্পনা করিতেও মন্দাকিনীর বুক টিপটিপ করে। শত হ'ক তবু তো ছেলে কাছেই! অণিমাও তো বকুলতলারই মেয়ে। এ যে শত সহস্র যোজন দূরের, সব বাধানিষেধের বাহিরের, অজানা অদেখা অপরিচিতা একটি সহুরে মেয়ে।···

মন্দাকিনী নিঃশব্দে কাঁদেন। রাগে না দুঃখে, ভয়ে না অভিমানে—কে জানে। এই এক সপ্তাহ অণিমার সঙ্গে যুঝিতে গিয়া শঙ্কায় কাঁপিয়াছেন, অভিমানে ফুলিয়াছেন, রাগে দুঃখে ফাটিয়া পড়িয়াছেন—করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন এমন অনেক কাণ্ড! কিন্তু কলিকাতায় তো মন্দাকিনী নাই! মন্দাকিনীর যত শক্তি, যত উপায়, যত কলাকৌশল শুধু এখানেই—এই বকুলতলায়—এই অণিমার বেলায়!

মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে তোলপাড় সুরু হয়। চোখ বুজিয়া ভগবানের কাছে বার বার ব্যাকুল প্রার্থনা জানান।·· ছেলের সুমতি হউক্। নিশ্চয় তাঁহার ছেলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। নইলে অমন নির্লজ্জের মত নিজের মায়ের কাছে কখনো বলিতে পারে—"আমি মেয়েটিকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে এক স্টীমারে কলকাতা যাচ্ছি।"··· নিশ্চয় তাহার চরিত্র নষ্ট হইয়াছে। মিথ্যা বলিতে মুখে আটকায় না। পাপপুণ্যের বাছবিচার নাই! অণিমার সঙ্গে এ কয়দিনের ব্যাপারটা তো প্রায় তাঁর চোখের উপর দিয়াই ঘটিয়া গেল। আর কত?·· কাল তারই চোখের উপর অণিমা অমন শক্ত করিয়া তাঁরই ছেলের কোঁচার খুঁট ধরিয়া রাখিল বেহায়ার মত, তার পরেও ছেলের কথাকে তিনি বিশ্বাস করিবেন নাকি! কলিকাতায় না জানি সে আরো কত অনাসৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। কত নমিতা আছে তাহার ঠিক কি! কি নোংরা প্রবৃত্তি! পুত্র তাহার পাপের পথে পা বাড়াইয়াছে। শঙ্কিত জননী ভগবানের কাছে ছেলের কল্যাণ কামনা করেন বারবার।··· পুত্রের মনের এই কুশ্রী ব্যাধি—সুস্থ হ'ক, স্বাভাবিক হক্ সে, মানুষের মত মানুষ হক—তাঁহার বাপ ঠাকুরদার নাম যেন ডোবায় না শেষকালে! হে ভগবান।··

সুনীলের সারা সকাল কাটিয়াছে এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এপাড়া ওপাড়া—সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

সারিতে। যায় নাই শুধু অণিমাদের বাড়ীতেই। অণিমার চোখের জলকেই সে ভয় করে এখন। কাঁদিবে সে, ভীষণ কাঁদিবে। এ-কান্না আগের ও-সব হালকা কান্না নয়। এ ক্রন্দন অপমানের, চূড়ান্ত উপহাসের!

ঠাকুরদার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্ত্তা শেষ করিয়াছে। সুনীল যেন আসামী, আর ব্রজনাথ বিচারক—এমনি ভারাক্রান্ত ব্যবধান আজ। নীলুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিতে গিয়া লজ্জিত হইয়াছে। বোনের মুখে-চোখে কেমন যেন সলজ্জ ভাব। তার দাদা যেন আর সে দাদা নাই—পর না হইলেও আর তেমন আপন নয় যেন। এমন কি, বাবলুও আগের মত গলা জড়াইয়া ধরিয়া দৌরাত্ম্য করে না। ডাকিতেই কাছে আসে—যেন না আসিলে নয় এমনি ভাব।

অন্যায় কি! সে যে আজ সত্যই অপরিচিত—অপরিচিত ভাইয়ের কাছে, বোনের কাছে, নিজের মায়ের কাছে। অপরিচিত সে অণিমার কাছেও। নহিলে মেয়েটা তাহাকে অতখানি বিশ্বাস করিয়া এমন ভুলও করে! বাদলদা কি চিরকাল একই বাদলদা থাকিবে নাকি। আজ যে তার অনস্বীকার্য্য বয়স, অবিশ্বাস্য মন!···

বকুলতলা সত্যই তাহাকে ভাল করিয়া চিনে না আর। তার একটা দিক—তার সব চেয়ে বড় দিকটাই এখানে একেবারে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত! নিজের সংসারে আপন জনের কাছেও সে আজ অনেকখানি পর—বৎসরান্তে দিন কয়েকের এক বিদেশী অতিথি যেন। এক কালে পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল—এই যা ভরসা, এই যা দাবি।

সে আজ বকুলতলার কতখানি? তার মধ্যে বকুলতলাই বা কতটুকু? বার মাস থাকে সে বিদেশে। তিন শ পয়ষট্টি দিনের তিন শ পঞ্চান্ন দিনই কাটে তার কলিকাতায়—মহানগরীতে কাটে তার সকাল সন্ধ্যা, বর্ষা বসন্ত, প্রতি ঘণ্টা, প্রতিটি মুহূর্ত্ত—সমগ্র অস্তিত্ব! জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কলিকাতা শুধু তার কর্ম্মস্থলই নয়, জীবনের লীলাস্থল। মৃত্যুর পরেও তাহাকে দাহ করিতে পদ্মাপারে লইয়া আসিবে না কেহ—নিবে নিমতলায়, না হয় কেওড়াতলায়। কলিকাতাই তাহার দেশ, বকুলতলা বিদেশ—এখানে দুদিন বেড়াইতে আসে, বেড়াইয়া যায়, ভালই লাগে, একটু বৈচিত্র্য হয়, ব্যস্! ভাববিলাসের আশ্রয় না নিলে, এই তো সম্বন্ধ তাহার বকুলতলার সঙ্গে—মন্দাকিনীর সঙ্গে, অণিমার সঙ্গে, সকলের সঙ্গে!······

আজো হয় তো কিছুটা আকর্ষণ অবশিষ্ট আছে। বকুলতলার রক্তের ঋণ একেবারে শোধ হয় নাই হয় তো! তাহাও বলিষ্ঠ যৌবনের কাছে সুদূর শৈশবের মত—ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা নয় আর, একটুখানি ঐতিহাসিক সুখস্মৃতি মাত্র!

তবু নাকি বকুলতলাকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—সরল বিশ্বাসে মানিতে হইবে তার সহস্র ঋণ, তার অসংখ্য দাবী। তা হয় না। এই দুধারার দ্বন্দ্ব অসহ্য, এই দোটানার দোলন প্রাণান্ত। তাই সে কলিকাতায় বেখাপ, বকুলতলায়ও বেমানান। যেন সে ঘরেও নয়, পারেও নয়—আছে শুধু মাঝখানে—এপার একদিন ভাঙ্গিবেই—ভাঙ্গিবে বকুলতলা। ওপারে জাগিবে চড়—নূতন সৃষ্টি, স্পষ্ট সৃষ্টি।

বসিয়া বসিয়া ভাবে সুনীল। যুক্তির পর যুক্তি আসে, আবেগের পর আবেগ। কুযুক্তি? হয় তো তা-ই, হয় তো নয়। শুধুই বাষ্প? ক্ষতি নাই। এখন সে গোটা দুনিয়াকে ঢালিয়া সাজিতে পারে। আজকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজটাকে সহজ করিবার জন্যই অণিমার কাছে আর খানিক বাদেই বিদায় লইতে হইবে। বাকী আছে সেই পরিচ্ছেদটাই। দেখিতে হইবে আর এক পালা ক্রন্দন। তারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে সুনীল! মনে মনে শানাইতে থাকে অস্ত্র—খাড়া করে ঔচিত্যের পাহাড়, দাঁড় করায় পর্ব্বত-প্রমাণ সমর্থন! নমিতা হক, যে-কেহ হক—অণিমা নয়। তার মনের সঙ্গে বকুলতলা তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না, হোঁচট খাইবে পদে পদে—অনৈক্য আর অনর্থের বোঝায় জীবন হইবে ভারাক্রান্ত—অনড়, আড়ষ্ট, পঙ্গু!···

ডাক দিয়াছে নমিতা। তার চিঠির মধ্য দিয়া ডাক দিয়াছে মহানগরী—তার জীবনের, যৌবনের ডাক। কলিকাতা!······প্রতি প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই যেথানে তার মুঠার মধ্যে গোটা দুনিয়া। মস্কো থেকে মান্দালয়—হংকং থেকে হনোলুলু ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘুরিয়া আসে আধ ঘণ্টায়।—ইতালীর হুম্‌কি, জর্ম্মাণীর শক্তিসঞ্চয়, রাশিয়ার হালচাল······গোল টেবিলের তোড়জোড়, গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার, বোম্বাই পুলিশের নির্ব্বিচার লাঠিচালনা,

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী, চুরি ডাকাতি, ব্যাভিচার, নারীহরণ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, মহোৎসব—এক নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হয় সদ্য বর্ত্তমান'! বেগ আর বেগ, গতি আর গতি—জীবনের সঙ্গেই যার ছন্দ, যৌবনেরই সঙ্গে যার যতি! শতলক্ষ ঘটনার উপলখণ্ডে উচ্ছলিত হইয়া চলে সুবিপুল কর্ম্ম-প্রবাহ!

তবু সেই মহানগরীর সঙ্গে সে পুরাপুরি মিলিতে পারিল কৈ! আবার বকুলতলার মনের সঙ্গে জলের উপর তেলের মত ভাসিয়া থাকে—মিশ খায় না। তার প্রবহমান মনের এপারের তীরই শুধু ভাঙ্গিয়াছে—ভাঙ্গিতেছে। ওপারে আজো চর জাগে নাই। সে যেন ভাঙ্গা আর গড়ার মাঝখানের প্রাণান্ত 'ইতিমধ্য'। দুদিকের টান মানিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে শুধুই গুটাইয়া রাখিতে চায় নিষ্ফল ভারসাম্যের নিরাকার দুরাশায়। সে প্রজাপতি নয়, শুঁয়ো পোকা—তেমনি অদ্ভুত উৎভট উৎকট তার মনের খেলা।...

এই সাতটা দিন সে যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আজ আবার বিংশ শতাব্দী ডাক দিয়াছে তার কর্ম্মক্ষেত্রে। উঃ। এই সাত দিন খবরের কাগজ পড়িতে না পাইয়া সুনীলের যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম! এই চলন্ত মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিবে অণিমা? তা-ও কি সম্ভব? যদি সম্ভবও হয়, অণিমার সেই সাহস কোথায়? সুনীল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে প্রস্তুত। সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিবে, মানুষ হইবে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার পথ মিলিবে, সুনীলকে বাদ দিয়াও নিজের জীবন—যেমন খুশি, যেখানে খুশি—গড়িয়া তুলিতে পারিবে। সুনীল তো তাহাকে মুক্তি দিতেই চায়। কিন্তু অণিমার যে পায়ে শিকল! বিদ্রোহ করিয়া শিকল ছিঁড়িবে সেই শিক্ষা বা সেই সাহস তার কোথায়?......

"বাদলদা।"

সুনীল চমক ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখে, অণিমার ছোট ভাইটি আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। হাতে একখানি ছোট চিঠি—ভাঁজ করা।

"বাদলদা, মা আপনায় একবার যেতে বলেছে," বলিয়াই চিঠি দিয়া ছেলেটা চোরের মত চলিয়া যায়।

চিঠি দিয়াছে অণিমা:

বাদলদা, শুনিলাম আজই আপনি চলিয়া যাইতেছেন। যাইবার আগে অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করিবেন।

অণিমা

সুনীলের সারা শরীরের রক্ত আবার নাচিয়া ওঠে। অণিমা ডাকিয়াছে। অণিমার হাতের লেখা। অণিমার অনুরোধ। দেখা না করিয়া সে যাইবে না—এখনই যাইবে।

অণিমাদের ঘরে ঢুকিয়াই সুনীলের চক্ষু স্থির। এ কি কাণ্ড! অণিমা একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে তাহার জামা-কাপড় পুঁথিপত্র সব গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

"বাদলদা, আপনার সঙ্গে আমিও আজ ক'লকাতা যাচ্ছি।"

"সে কি!"

"আপনিই তো কাল নিয়ে যাবেন বলেছেন। আমি মেয়েদের বোর্ডিংএ থেকে পড়ব।"

কোথায় সেই রোরুদ্যমানা অসহায়া অণিমা। স্থির সহজ দৃষ্টি—দৃঢ়সঙ্কল্পের স্পষ্ট ছাপ মুখে চোখে। গম্ভীর কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, "কী ভাবছেন?"

"তা—হ্যাঁ—তবে, আগে থেকে—"

"আমার পড়ার খরচ চালাতে কাল না আপনি রাজি হয়েছেন! আমি চাকরি করে একদিন আপনার সব টাকা শোধ করে দেব বাদলদা।—ধুবড়ী ছেড়ে চলে না এলে এদ্দিন আমারো একটা পথ হত—আমাদের বিজয়াদি তো আমায় রেখে দিতেই চেয়েছিলেন, বাবা কিছুতেই রাজি হল না। আমার সর্ব্বনাশ করতে ওরা বাকি রাখেনি কিছু।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া অণিমা গড়গড় করিয়া বলিয়া যায়, "কাল রাত্তিরে মার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। জাত যাবে। নিন্দায় পৃথিবী রসাতলে যাবে। আমি কিন্তু যাবই। এখন আমার একটা পথ করে দিন, বাদলদা। আপনার ঋণ আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব, শপথ করছি।"

সুনীল হতবাক্। অণিমা এ-সব বলে কি। কাল ঝোঁকের মাথায় একটা কথার কথা বলিয়াছে মাত্র। অণিমা তারই উপর ভরসা করিয়া বাক্সবিছানা গুছাইয়া একেবারে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত! পাগল নাকি!

"কথা বলুন"

"কিন্তু অণিমা—"

"কিন্তু-টিন্তু শুনব না, আমি যাবই। এখানে থাকলে ওরা আমাকে ধরে বেঁধে যার তার হাতে গছিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। তার আগে আমার পথ আমিই খুঁজে নেব। আপনিই তো কাল বলেছেন, অণিমা তোর সাহস আছে?—পারবি যেতে? সাহস আমার আছে বাদলদা।"

"ন-কাকা আর কাকীমার অমতে কী করে তোকে নিয়ে যাব?"

"আমি তো আর কচি খুকী নই।"

"কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু ভাববার আছে অণিমা।"

"কিসের ভাবনা?"

"অনেক কিছু।"

"সমাজ?"

"না, সমাজের আইনের চেয়েও বড় আইন আছে অণিমা। ন-কাকা ইচ্ছে করলেই আমায বিপদে ফেলতে পারেন।"

"কিসের বিপদ? আমি তো খুকীটি নেই আর—আমায় ভাঁড়াবেন না বাদলদা। আপনারই নিয়ে যেতে সাহস নেই বলুন।"

"হঠাৎ—আগেভাগে ব্যবস্থা না করে—তোকে··· কলকাতায় কোথায় নিয়ে তুলব? মেসে তো আর মেয়েছেলে নিয়ে ওঠা যায় না।"

"দুদিন নমিতাদের বাড়ীও থাকা যাবে না?"

"দূর থেকে কলকাতা সহরটাকে যে কী ভাবিস্ তোরা। সেখানে আতিথ্য মেলে না অনু। আমি আগে কলকাতা যাই, গিয়ে সব ব্যবস্থা করি, তখন তুই রওয়ানা হবি—আমি চিঠি দেব।"

"সে আপনি দেবেন না তা বেশ জানি।" "এ সন্দেহ কেন তোর?" "আপনার কোনো কথায় আর আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এ ক'দিন তো মিথ্যার ওপর দিয়েই চলে এসেছেন। আজ একটু সত্যি কথা বলুন। আপনার সাহস আছে আমার ভার নেবার? পারবেন?"

"কলকাতা গিয়ে কার ভরসায় থাকবি জিগ্‌গেস্ করি?"

"আপনার।"

"তাহ'লে আমায় এত অবিশ্বাস করে লাভ কী শুনি? মিথ্যাই যদি ব্যবসা আমার, তোকে আমি তো সর্ব্বনাশের পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারি—আমার সঙ্গে যেতে চাস্ তবে কোন্ সাহসে?"

অণিমা এবার চুপ করিয়া থাকে। খানিক বাদে করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "পরে আমি কার সঙ্গে যাব? কে আমায় দিয়ে আসবে—কার অত দায় ঠেকেছে?"

এবার সুনীল চুপ করিয়া যায়।

অণিমা তাহার ছলনা ধরিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে, অণিমাকে লই যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই—অথবা সেই ইচ্ছাও তাহার নাই। তবে তাহাকে লইয়া এমন মাছ খেলাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

"বলুন বাদলদা, আপনারই সাহস নেই। মুখে অনেক বড় বড় কথাই বলতে পারেন, মনে ভাবেন আর।"

"অনু, তুই সব কথা ভালো করে ভেবে দেখিস্ নি। তোর মাথা এখন ঠিক নেই।"

"কাল তবে অত করে বললেন কেন?" অণিমা হতাশ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে সুনীলের মুখের দিকে! এ যেন সেই বাদলদা নয়—প্রথমদিনের সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সহাস্য বাদলদা আর নাই!—ভীরু, দুর্ব্বল, কাপুরুষ!

"অনু, আমার সঙ্গে কলকাতা যাবার অর্থ বুঝিস?"

"বুঝি!"—স্পষ্ট উত্তর।

"বাপ-মার অমতে একাজের পরিণাম কী হবে তা জানিস্?"

"জানি"—দৃঢ়কণ্ঠের জবাব।

"তোর বাবা-মা এগাঁয়ে আর টিকতে পারবে না তা ভেবে দেখেছিস?"

"দেখেছি। গাঁয়ের এ-সব শেয়াল-কুকুরের চিৎকার আমি গ্রাহ্য করিনা।" সুনীলের কালকের উক্তিটাই অণিমা আজ পাল্টা জবাবে ফিরাইয়া দেয়।

"তুই এত বড় স্বার্থপর অনু?—বাবা, মা, ভাই, বোন এদের কী গতি হবে সে সব ভাবনার মধ্যেই ধরছিস্ না। লোকনিন্দায় তাদের যে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। যাবে কোথায় তারা? গাঁয়ের মেয়েরা ন'কাকীমার ইস্কুলে আর পড়তে আসবে ভেবেছিস? খাবে কী?"

"লোকনিন্দার আরো বাকি আছে ভেবেছেন!—সারা গাঁয়ে আমাদের নিয়ে কী যে সব রটনা হচ্ছে তা যদি

শুনতেন”—এতক্ষণের তেজস্বিনী অণিমা এবার কাঁদিয়া ফেলে। নিরুপায় সুনীল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে শুধু।

“আপনাদের পয়সা আছে, লোকে মুখের উপর বলতে ভয় পায়।” অণিমা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, “আমাদের গরিব পেয়ে তারা অপমান করতে ছাড়বে কেন?”

সুনীলকে এই মহা বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন সুলতা। পুকুর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুনীলের গলার আওয়াজ পাইয়াই ঘরে ঢুকিলেন।

অণিমাদের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সুনীল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। মেয়েটা সত্যই পাগল!…

সত্যই, সুনীলের শক্তি নাই, সাহস নাই—সাহস নাই গ্রামের পাঁচজনকে অস্বীকার করিবার, সাহস নাই মন্দাকিনীর চোখের জল অগ্রাহ্য করিবার। অণিমার পায়ে শিকল, সুনীলের শিকল মনে।

সত্যই সে ভীরু। অস্পষ্ট বলিয়াই কপট, দুর্ব্বোধ বলিয়াই অক্ষম। তার এতদিনের অহঙ্কৃত আত্মপরিচয়ের তলে যে এতবড় ফাঁক ছিল তাহা টের পাইল সে আজ।

বাড়ীর উঠানে পা দিতেই মার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। রান্নাঘর হইতে নীলুকে ডাকিয়া কি যেন বলিতেছেন। সেই কণ্ঠস্বর। সেই মা! এক মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া যায় বাল্যের আর কৈশোরের খণ্ড, অখণ্ড অসংখ্য কাহিনী—মার আদর, মার উৎকণ্ঠা, মার সস্নেহ শাসন। সব চেয়ে বেশী করিয়া কি জানি কেন সহসা আজ মনে পড়িয়া গেল—বহুকাল আগের একটা তুচ্ছ ঘটনা। বাবার কাছ হইতে তাড়া খাইয়া ভয়ে ভয়ে ছয়-সাত বছরের খোকা গিয়া মার নিশ্চিন্ত কোলে আশ্রয় নিয়াছে—সেই সিঁদুর-পরা সিঁথির উপর আঁচলের চওড়া পাড়, এক দোহারা দেহকাণ্ড, শ্যামল সুন্দর একখানি মুখ, সহাস্য সলজ্জ একজোড়া চোখ! মনের পটে এক নিমেষে জাগিয়া মিলাইয়া যায় সেই ছবিখানি! মনে পড়ে পিতার চোখ রাঙানো, আর জননীর পুত্রপক্ষ সমর্থন। মনে পড়ে কতদিনের কত কথা! সেই মার জন্য সুনীল প্রয়োজন হইলে আরো কিছু ত্যাগ করিতে পারে। যেন—সুনীল নিজেকে এখন বারবার বুঝাইতে চায়—সেই মার জন্যই সে এতখানি সহ্য করিয়া গেল!

“খোকা এসেছিস?”

“হ্যাঁ মা! ডাকছো আমায়?”

“নাইতে যা এবার,” বলিতে বলিতে মন্দাকিনী বাহির হইয়া পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। সুনীলের কল্পনার রাঙা বেলুনটা ফাটিয়া যায় এক মুহূর্ত্তে। মার দিকে খানিক নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া নেয়। কোথায় সেই স্নেহসর্ব্বস্ব বধূ-মা! সুনীলের সম্মুখে এখন দাঁড়াইয়া আছে অভিমানী রাশভারী এক প্রৌঢ়া বিধবা, যাঁর দুর্দ্দমনীয় জেদের মুখে পুত্রের নিভৃত মনের দৃঢ়সঙ্কল্প সব খসিয়া ভাসিয়া যায়! তবু তাঁর মনস্কামনাই পূর্ণ হউক্।

“মা, তোমার সেই ফোটোখানা কোথায় গো?”

“কোন্ ফোটো?”

“সেই যে আমার ছোটবেলায় তোমার সঙ্গে তোলা।”

“বাক্সে রেখে দিয়েছি—নষ্ট হয়ে গেছে, ভালো বোঝা যায় না আর।”

“আমার সঙ্গে দিয়ে দাও—কলকাতায় ওর থেকে নতুন করে একটা ফোটো তুলিয়ে নেব’খন।—এখনো সময় আছে, পরে একদম নষ্ট হয়ে যাবে। ফোটোটা কাগজে জড়িয়ে আমার বাক্সের মধ্যে মনে করে রেখো কিন্তু।”

তের

মন্দাকিনী, মানদা, নীলু আর বাবলু আসিয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়াছে। আর খানিক পরেই তাহাদের গ্রামের কাছ দিয়া ঢাকা-মেল্ যাত্রী লইয়া চলিয়া যাইবে সুদূর গোয়ালন্দে—তারপর কলিকাতায়।

বাঁ দিকে গ্রামের শেষে মাঠের ওপারে বৃক্ষশ্রেণীর ওপিঠেই তারপাশা স্টেশন। ঘণ্টাখানেক হয় সুনীল বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে—সঙ্গে গিয়াছেন ব্রজনাথ আর নন্দ দাস। বহুদূরে গাছপালার মাথায় রাশি রাশি ধোঁয়া উঠিতেছে ঊর্দ্ধ আকাশে—স্টীমার এখনো তারপাশা স্টেশন ছাড়ে নাই।

নিকারীপাড়ার গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জাহাজ দেখিবে বলিয়া। মন্দাকিনীদের কুকুরটাও আসিয়া দলে ভিড়িয়াছে—একটা জাম গাছের তলায় শুইয়া লেজ নাড়ছে।

এবারের মত বর্ষা বিদায় নিয়াছে। আর সেই রুদ্র

রূপ নাই। শীতল পাটির মত নিস্তরঙ্গ পদ্মা। যেন একটা প্রবল উত্তেজনার পর প্রতিক্রিয়ার ক্লান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছে। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়াছে বহুক্ষণ। গ্রামের মধ্যে এখন অপরাহ্ণের ম্লানাভ ছায়া; কিন্তু গাঙের পাড়ে এখনো ডগ্‌ডগে রোদ।

মন্দাকিনী আঁচলে চোখ মোছেন, আর ঘন ঘন তাকান নদীপথে—দূরের বাঁকটার দিকে। পুত্র চোখের অন্তরাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে এখন তাঁর যত রাজ্যের ভয়-ভাবনা—এ-কয়দিন তবু তো সে চোখের সামনেই ছিল। আজ—এই এতক্ষণে, এই বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে মন্দাকিনী এতকালের অস্পষ্ট সত্যটাই স্পষ্ট করিয়া বুঝিলেন: ছেলে তাঁহার সত্যই পর হইয়াছে। আর সে ছোট নাই। আর তাহাকে নাগালের মধ্যে পাইতে চাওয়া নিষ্ফল প্রয়াস। সে এখন বাহিরের, সে দূরের, সে সবার—সে বকুলতলার অতি-আপন হইয়াও আর বকুলতলার নয়। সে অচেনা, সে অজানা, হিমালয়ের চূড়ার মতই অনতিক্রমনীয় তার মনের রহস্য!......

তবু এই রূঢ় কথাটা তিনি বুঝিতে চান না যে! মন মানে না কোন সত্যে। কেন ছেলে দূরের হইবে? কোথায় যাইবে সে? মন্দাকিনী তাহাকে এখনো ধরিয়া রাখিতে পারেন। বকুলতলার ছেলেকে বকুলতলায়ই বাঁধিতে পারেন—অন্ততঃ পারিতেন। এ ক'দিন ভুল করিয়া আসিয়াছেন আগাগোড়া। আর মা নয়। অনিমা পারে—অনিমাই পারিত। ভুল—মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়াছেন।...

দূরে স্টীমারের বংশীধ্বনি শোনা যায়—এই বুঝি তারপাশা স্টেশন ছাড়িয়া গেল। গাছের মাথায় অজস্র মেঘায়িত ধোঁয়া সরিয়া আসিতেছে সামনের দিকে ক্রমে ক্রমে।

কখন সবার অলক্ষ্যে অনিমা আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে একটা গাছের আড়ালে।

মানদা লক্ষ্য করিল সবার আগে। মন্দাকিনীকে উস্কাইয়া তুলিতে পারিবে এই আশায় ফিশফিশ করিয়া কহিল, "বৌমাদিদি! এ দ্যাখো, এসে দাঁড়িয়েছে।"

"কে?"

"কে আর কে!—ঐ যে বকুল গাছটার ওপাশেই।"

"কে, অনু?" মন্দাকিনী গলা ছাড়িয়াই কথাটা কহিলেন।

চোখাচোখি হইতেই অনিমা মুখ ফিরাইয়া নেয়। মন্দাকিনী কিন্তু আগাইয়া যান, "অণু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?—আয় না এখানে।"

খানিক ইতস্তত করিয়া অনিমা আর সকলের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। মন্দাকিনী যেন এক সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া তাহাকে আপাদ-শির দেখিয়া লইলেন। মেয়েটার সত্যই কপাল মন্দ। এই বয়স আর এই ভরা যৌবন লইয়াও একটা পুরুষের মনকে জয় করিতে পারিল না! তাঁর ছেলে কি এতই কঠিন, এতই বিরাট?......

"অণু"

অনিমা মাথা হেঁট করিয়াই আছে।

"অণু, নমিতা কে রে?"

অনিমা বিস্মিত হইয়া মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকায়।

"বল না মা, আমায় আর লুকোস্ নে। তুই তো সবই জানিস্!"

অনিমা যে সব কথা জানে বড়মা তাহা জানিল কি করিয়া?

"কথা বল না অণু।"

"কী?"

"নমিতাকে খোকা বিয়ে করতে চায়?"

"তার মনের কথা আমি কী করে জানব?"

"মেয়েটি কেমন রে?"

"আমি তার কী জানি বড়মা!"

"তবু—তুই তো শুনেছিস্ সব।" অসহিষ্ণু মন্দাকিনী প্রশ্ন করিতে থাকেন, "নমিতা দেখতে কেমন?"

"আমি বুঝি দেখেছি তাকে?—শুনেছি, দেখতে সে কালো।"

"অ্যঃ! তাই ছেলে কালো মেয়ে বিয়ে করতে চায়! বলে কিনা মা আমার কালো, আমিও কালো মেয়েই বিয়ে করব। এ্যাঁ!" এই সদ্য বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যেও মন্দাকিনী কোথায় যেন গর্ব্ব অনুভব করেন অপরিসীম। "তা দেশে কি আর কালো মেয়ে মেলে না রে অণু, শহুরে মেম্‌সাহেব নিয়ে আসতে হবে?"

এ-কথার জবাব দিবে কি অণিমা! পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া নিঃশব্দে মাটি খুঁটিতে থাকে।

বিস্মিত মানদা হা করিয়া চাহিয়া আছে। আসলে মাথা খারাপ এই ঠাকৃরুণেরই। ঘটনা এতদূর গড়াইবার পরেও আজ হঠাৎ এ কেমন ধারা মাথামাথি!

স্টীমার স্টেসন ছাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমে ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে মাঠের শেষের দিগন্তরেখা ধরিয়া—আর একটু আসিলেই ঝাউগঞ্জের বাঁকটা ঘুরিয়া জাহাজ বকুলতলার একটানা দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িবে।

মোড়ের মুখে এবার স্টীমার দেখা গেল। অজস্র ধোঁয়া ছাড়িয়া পাড় ঘেঁষিয়া আসিতেছে। এই এক মাইল নদী পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে বড় জোর আর দশ-বার মিনিট। শেষবারের মত সুনীলকে দূর হইতে মন্দাকিনী একবার শুধু দেখিয়া লইবেন—হয় তো দেখিতে পাইবেন সেই মেয়েটিকেও। বিচিত্র কি! হয় তো দেখিবেন তাঁর ছেলের পাশেই নমিতাও দাঁড়াইয়া আছে। যে দুঃসাহসী ছেলে তাঁর। মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াশ ধড়াশ করিতে থাকে।

"অণু।"

অণিমা সাড়া দেয় না।

"অণু, আমার ওপর রাগ করিস্ নে মা।—আজকাল আমার বুঝি মাথার ঠিক আছে! কী বলতে কী সব বলি।"

অণিমা অবাক হইয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকে শুধু—কথা বলে না। এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণটা তলাইয়া বুঝিতে চায়।

"অণু, ছেলে বড় হলে পর হয়ে যায়, না রে?"

"এ সব কী বলছ বড়মা?"

"হাঁরে অণু, নমিতা কি আমায় মানবে কখনো তোদের মতো। শহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে, সে বুঝি এক রাত্তির এ গাঁয়ে এসে বাস করবে ভেবেছিস?"

অণিমা ঔৎসুক্য আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, "বড়মা, নমিতার কথা বাদলদা সব বলেছে তোমায়?"

"তার চিঠিও দেখিয়েছে।"

"চিঠি!!"

"হাঁরে। চার-পাঁচ পৃষ্ঠার এক লম্বা চিঠি দিয়েছে খোকার কাছে। ছেলে আমায় আবার তা পড়তে দিয়েছিল কাল।"

"পড়েছ?" প্রশ্ন করে অণিমা।

"আমি বুঝি ও-চিঠি পড়ে বুঝতে পারি সব।—আর আজকাল ভালো করে দেখতেও পাই না চোখে। তুই আমায় পড়ে দিস্ তো চিঠিখানি।"

"সে চিঠি তোমার কাছেই আছে?"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া যান। ছেলের সুটকেশ হইতে জামা-কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখিবার ছলে আজ চিঠিখানি তিনি চুরি করিয়া রাখিয়াছেন।

"অণু, তোর ছেলে বড় হলে বেশি লেখাপড়া শেখাস্ নে মা!"

অণিমা শুধু চুপ করিয়া শুনিয়াই যায়।

"—লেখাপড়া শিখেও যদি" মন্দাকিনী একটু ঢোক গিলিয়া বলিয়া গেলেন, "তার চেয়ে মুখ্যু হয়ে থাকাও ভালো রে!"

বড়মার উপর অনুকম্পাই হয় অণিমার।

নীলু হা করিয়া গিলিয়া চলিয়াছে মার প্রতিটি বাক্য। কেবল বাবলু সোৎসাহে বলে "অণুদি, দাদা যেই হাত দেখাবে, পাড় থেকে আমিও অমনি রোমাল দেখাব!"

"হুঁ"

"দিদি আঁচল ওড়াবে বলেছে। তুমিও আঁচল উড়িয়ে দেখাবে অণুদি! কেমন?"

স্টীমার অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে। সামনে খানকয়েক জেলে-নৌকা পাইয়া বাঁশী ফুঁকিয়া ধমক দিল বার কয়েক। আদেশ মানিতেই হয়। এ তো আর যা-তা ব্যাপার নয়। কলিকাতার ডাক আর যাত্রী লইয়া চলিয়াছে সুন্দর দুর্দম ভাসমান লৌহ-দানব।

অস্পষ্ট দাপাদাপি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। আর কয়েক মিনিট শুধু!

"অণু"

"কী?"

"নমিতাকে তুই চিনতে পারবি?"

অণিমা তার বড়মার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে জিজ্ঞাসু চোখে।

"সে কি! তুই কিছু জানিস না?—নমিতাও যে এই স্টীমারেই কলকাতা যাচ্ছে আজ।"

"কে বললে?" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে অণিমা।

"এই তো চিঠি, এতেই লেখা আছে।"

অণিমার বুকটা একবার দুলিয়া ওঠে। বাদলদা কেবল ভীরুই নয়, সে শঠ, সে মিথ্যাবাদী! কথাটা তার কাছ হইতে লুকাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

দেখিতে দেখিতে স্টীমার বকুলতলার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে অসহ্য আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া, উৎক্ষিপ্ত ফেনায় ফেনায় সম্মুখের অবাধ বিস্তার কাটিয়া কাটিয়া, স্পর্দ্ধিত যন্ত্রশক্তি রুষিয়া ফুঁসিয়া ছুটিয়া যায় আসে—পেছনে রাখিয়া যায় ভাঙ্গনের খেলা—প্রচণ্ড বেগে ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া কূলে কূলে আছাড় খাইয়া পড়ে। এ গতি রোধ করিবে সাধ্য কার!

স্টীমার এবার বকুলতলার মুখোমুখী। মন্দাকিনীর বুকে কে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে থাকে। অণিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত।

নীলু আর বাবলু প্রায় এক সঙ্গেই চীৎকার করিয়া ওঠে, "মা, ঐ দ্যাখো দাদা—দোতলায়, ঐ যে।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চাহিয়া আছে মন্দাকিনী ও অণিমা। তীরের দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু সুনীলের উপরই নয়, দু'জোড়া সজল চোখ দেখিতেছিল সুনীলেরই পাশে রেলিঙে ভর দিয়া যে আর একজন দাঁড়াইয়া আছে সেই মেয়েটিকেও।—যে মেয়েটি এই সাতদিন বকুলতলা হইতে বহু দূরে থাকিয়াও দুইটি পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে প্রভাব বিস্তার বড় কম করে নাই।—চশমা-পরা একটি কৃশাঙ্গী তরুণী। অণিমার চেয়েও লম্বা, মন্দাকিনীর চেয়েও কালো। দূর হইতে আর কিছু বোঝা যায় না—আর কিছু ধরা যায় না। এই নমিতা!

বাবলু প্রাণপণে রুমাল দেখাইতেছে। নীলুরও আঁচল ওড়ানো থামে নাই। স্টীমার কিন্তু অনেকখানি দূরে চলিয়া গিয়াছে। সুনীলকে আর দেখা যায় না। বকুলতলা পিছনে পড়িয়া থাকে।

মন্দাকিনীর জলভরা চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইল আর একজোড়া ছল-ছল চোখের। এদিকে আর এক দফা প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া গর্জ্জিয়া লাফাইয়া ওঠে বকুলতলার ভাঙনধরা কূলে কূলে!

শেষ

এক নিমেষে

প্রিন্সিপাল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কণ্ঠে যে গান গাইতে নারি,
সে কেন দেয় সাড়া,
বক্ষে যে ভাব রাখ্‌তে নারি
সে কেন দেয় নাড়া!

উপ্‌চে হঠাৎ ব্যথার ভারে
কি যেন যায় বেড়ে,
ভাবের স্রোতে ডুবি তখন,
কথা কে নেয় কেড়ে?

অহঙ্কারের পঙ্ক মলিন
এক নিমেষে হারা,
আকাশ ভেঙ্গে হঠাৎ নামে
শ্রাবণ জলধারা।

যাদের আমি পর ভেবেছি,
দাঁড়ায় কাছে এসে;
শিশুর মত সরল প্রাণে
চিত্ত ওঠে হেসে।

ভোরের আলো স্বচ্ছবুকের
আঁধার ফেলে টুটে,
দীঘির কালো জলে যেন
পদ্ম ওঠে ফুটে।

এক নিমেষের একটি সাড়ায়
একটি নমস্কারে।
প্রভু তোমায় চেনাও তুমি
একটি আবিষ্কারে।

সভ্যতা ও আমাদের মোহ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ যে আজ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া বসিয়া আছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সহজেই এক কথায় উত্তর পাওয়া যাইবে—'সভ্যতা'। অবশ্য ইহাও মানিতে হইবে যে, অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায় মানুষের শারীরিক ক্রমোন্নতি তাহাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আগাইয়া দিয়াছে। মাছের মাথার সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের তুলনা করিলে তাহার সুব্যবহার করাটা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইবার দরকার হইবে না। মানুষের এই মস্তিষ্কের সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানুষের মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে; মন কোন একটা স্থূল বস্তু নয় কিন্তু ইহাই সভ্যতার ধারাকে বাঁচাইয়া আসিতেছে। মানুষের শরীরের উন্নত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন তাহার খাইবার ও শরীর বাঁচাইবার অনেক সুবিধা করিয়াছে সেই সঙ্গে মন ও মস্তিষ্ক তাহাকে খাওয়া পরার হাঙ্গাম কমাইয়া অন্য দিকে ফিরাইয়াছে। বন জঙ্গল ছাড়িয়া নদীর ধারে থাকিয়া চাষ-বাস করা এই সহজ উপায় মানুষের মাথাই বাহির করিয়াছে। প্রথম মানুষ হইতে আমরা দৈহিক উন্নতি কিছু লাভ করি নাই। বোধ হয় একটু চৌথস হইয়াছি এই মাত্র! কিন্তু আজ যে অবস্থায় আসিয়াছি তাহা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অশ্রান্তভাবে সভ্যতার স্তরে স্তরে ভাসিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পুরাতন জীবন ভুলি নাই। সে সব অভিজ্ঞতার উপরে নূতন দেখা-শুনার ফলে জ্ঞান জমাইয়া আমরা পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহার শেষ নাই। কারণ যদি পূর্ণতা আসিয়া যায় তখন আর উদ্যমের প্রয়োজন হইবে না। তখন হিম-শীতল পাহাড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব কি গুঁড়া হইয়া যাইব জানি না। মনে হয় সেই পাহাড়ের মাথার বরফ আবার সূর্য্যতাপে গলিয়া সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইবে।

পৃথিবীতে প্রায় ২১০ কোটি লোকের বাস। ইহারা প্রত্যেকেই যে সভ্য তাহা নহে। এখনও বর্ত্তমান সভ্যতার শেষের ধাপের দুই-তিন ধাপ পিছনের লোক খাইয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সব লোক যতদূর সম্ভব সমান তালে না চলিলে স্থানে স্থানে বিড়ম্বনা আসে এবং বিশেষ ভাবে আসে, যখন লোকচলাচলের ফলে বৈষম্যটা বেশী প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই ভাবে সমগ্র মানবসমাজকে এক সুরে বাঁধা এখনও সম্ভব হয় নাই। ভাবের আদানপ্রদানের রীতি ও বাহন অবশ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। কিন্তু সভ্যতার যে সব দান আমরা ভোগ করিতেছি সেই সবের প্রথম প্রচেষ্টার মূলে প্রয়োজনীয়তাই মুখ্য ছিল। এই প্রয়োজন-বোধের তারতম্য এখন আছে। যতদিন পর্য্যন্ত না এক উদ্দেশ্যে ও ব্যবস্থার মধ্যে সকলকে আনা সম্ভব নয় ততদিন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দলকে আগাইয়া যাইতে হইবে। পিছনের লোক টানেও খানিকটা সামনে চলিয়া আসিতে পারে। এই টান পুরাকালে বাণিজ্য ও রাজ্যজয়ের ফলে হইত।

সভ্যতার ইতিহাসে মূল এক কেন্দ্র হইতে সভ্যতার দেশে দেশে বিস্তারের কাহিনীর বদলে স্থান বিশেষের উপযোগী ও প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের সভ্যতার খোঁজ এখন পড়িয়া যাইতেছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন দেশের সভ্যতার বাইরের আবরণটা আলাদা হইতে পারে কিন্তু তাহার জন্মকথা এক। একই প্রেরণা মানুষের মাথাকে খাটাইয়াছে। ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। এই সুখের সংজ্ঞা বা বিবরণ আপাতত সভ্যতার স্রোতকে আঁকা-বাঁকা পথে চালাইতেছে। সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি বাহির করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্যই লড়াইয়ে ন্যায়ের ধ্বজা দুই পক্ষই তুলিয়া ধরে।

সভ্যতা শ্রেয়স্কর। কিন্তু সব মঙ্গলের উপায় বা হিতব্যবস্থা সভ্যতা-প্রসূত নহে। সম্পত্তিভোগের ব্যবস্থা, অকপটতা, সারল্য, পরিচ্ছন্নতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শৌর্য্য, একত্রবাসের কতগুলি নীতির উদ্ভাবন ইত্যাদি মঙ্গলপ্রসূ গুণরাজি মানুষকে জীবন রক্ষা করিবার জন্য খুব সহজ অবস্থায় আনিয়াছে। কিন্তু আরও উঁচু ধাপে উঠিতে গেলে কেবল চারিপাশের অবস্থাকে স্বায়ত্তে আনা ছাড়া খোঁজ অন্য দিকে করিতে হইবে। এই যে নানারকমের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বর্ত্তমানের বর্ব্বর আদিম প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। ইহার সবগুলিই প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহার করা যায় ও ইহাতে দৈহিক শ্রান্তি দূর করে। জিনিসের কদর বোঝা এবং জিনিষ বিচার করার ও তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়ার যে মনের অবস্থা তাহার উপরেই সভ্যতার বিকাশ নির্ভর করে।

মানুষের জীবনকে নদীর সহিত তুলনা করিলে তিনটি বিভিন্ন ধারার মিশ্রণ দেখা যায়। সাধারণ জানোয়ারের মত উদরপূর্ত্তি ছাড়া দ্বিতীয় ধারা আমাদের ভাবপ্রবণতা। ইহার বিকাশ আমাদের পরিবার পালনে ও সমাজসৃষ্টিতে। স্নেহ, প্রেম ও সহানুভূতি আমাদের পরস্পরকে টানিয়া রাখে এবং এক স্থানে বহুলোকের সমাবেশে সাহায্য করে। জঙ্গলে জন্তুরাও শাবক পালন করে বটে, কিন্তু তাহা শাবকদের নিজের শক্তির উন্মেষণ পর্য্যন্ত। তাহারাও দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু তাহাও জীবনের প্রধান ও প্রাথমিক ধর্ম্ম আত্মরক্ষার প্রেরণায়। মানুষের শিক্ষায় ও বংশপরম্পরায়, জ্ঞানচর্চ্চার দীক্ষায়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে, চিন্তাশক্তিতে, মূল্যবিচারে ও মর্য্যাদাজ্ঞানে তৃতীয় ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই জ্ঞানের বিকাশ ও পুষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান সহায়ক। ইহাই মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের মধ্যে এই তৃতীয় ধারা—কিরূপভাবে বহিতেছে তাহা এখন আলোচনা করিব। সভ্যতার মূলে আছে জ্ঞানসঞ্চয়। এই জ্ঞান-সঞ্চয় অন্যান্য অনেক গুণের মত সহজ-সংস্কার নহে। ইহা শিক্ষার আয়ত্তাধীন। শিক্ষার প্রথম সোপান অ, আ, ক, খ, গ, হ, য, ব, র, ল প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করা। কিন্তু যে বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজন একমাত্র অর্থোপার্জ্জন করা তাহার জোরে আমরা কোন জিনিষের সম্যক আলোচনা এবং যোগ্যতা বিচার করিতে অক্ষম। আত্মগরিমা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিও স্থাপন করিতে পারি না। এই বিদ্যা কেবল ব্যক্তিগত দেহের সুখ ও সুবিধার খাতিরে আমরা অর্জ্জন করি।

যুগযুগান্তরের সভ্যতার সহিত মানুষের পরিচয় ঘটে বিদ্যার মধ্যস্থতায়। আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত কিছুই নিজেদের অঙ্গসৌষ্ঠবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যুগে যুগে জীবদেহের বিকাশের সঙ্গে স্বতঃস্ফুরিত হয় না। আবার এক যুগে মানুষ যখন কোন বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে বা প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করে তাহা সেই যুগের মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যায় না। বুদ্ধির দৌলতে তাহা পরবর্ত্তীকালের মানুষের জন্য পুরাকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। নানাবিধ শিলা ও প্রস্তরলিপি ইহার প্রথম সাক্ষী। স্মরণশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন গল্পচ্ছলে সমসাময়িক ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত ছন্দোবদ্ধভাবে পিতৃ-পরম্পরায় কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছে। এই জ্ঞান সঞ্চয়ের উপায় ক্রমশ সহজ হইয়া আসিয়াছে। এই সঞ্চিত সৃষ্টির উপর যখন আবার সৃষ্টির আমদানি হয় তখনই সভ্যতার আর এক ধাপ বাড়ে। বিগত যুগের রাশীকৃত সৃষ্টিকে আমরা আয়ত্ত করি এখন বই পড়িয়া, কিন্তু নূতন ✓ সৃষ্টির জন্য অনুপ্রেরণা আসা চাই মনের ভিতর হইতে। মনকে জাগাইয়া তুলিবে কেতাবী বিদ্যার জ্ঞানের ভাণ্ডার, কিন্তু এই পুঁথিগত বিদ্যায় ফলে জ্ঞানের স্পৃহা মনে কতটা জাগ্রত হইয়াছে, কতটা চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির খোরাক জোগাড় হইয়াছে তাহার সম্মিলিত চাপে মনের খেলা সুরু হয়। এই ভাবে কপিকলের মত আমরা পশুবৃত্তি ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করি এবং আমাদের জ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির পথে রসদ জোগায়।

আমাদের দেহের ক্ষুধাটা জন্মগত কিন্তু মনের ক্ষুধাটা অর্জ্জন করিতে হয়। দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছাই আমাদের জীবনকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে। উদরপূরণের জন্য ও গাত্রাচ্ছাদনের জন্য যেটুকু শক্তি ক্ষয় ও কালক্ষেপন করা দরকার তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিয়া আনিয়া অবসর সময়ে মানুষ স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে। এই স্বপ্ন রাজ্যই কালক্রমে জীবনের শত কার্য্যে ছোঁয়া দেয় ও ক্রমশঃ আমাদের দৈনিক জীবনে মিশিয়া গিয়াছে। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিষগুলিকে মনের বিলাসের আয়োজনে ব্যয় করিয়া মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চিত ধনের মত গতযুগের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা খাটাইয়া মানুষ জ্ঞান বাড়াইয়া চলিয়াছে। আমরা প্রতিবারই পুরুষানুক্রমে চকমকি পাথর দিয়া জীবন আরম্ভ করি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা চকমকি পাথরকে অনেক সহজ করিয়া আনিয়াছেন। তাহাই আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে কি করিয়া আসিয়াছি। সভ্যতার আলোক একদিন এইখানেও জ্বলিয়াছিল। কিন্তু প্রদীপে তেল আর পড়িল না তাই শিখা অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। বহুকাল আগে যখন আমরা তখনকার সভ্যতার শীর্ষে ছিলাম তখন জীবনের নানা প্রয়োজনে এই জাল সময় মত মাটিতে বিছান গেল না। লোকসমাজ বহু দূরে দূরে ছিল। নির্দ্বন্দ্ব জীবনে কল্পনার জাল হাওয়ার অনেক উপরে উড়িতেছিল। লোকসমাজ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিল। খাদ্যের প্রয়োজন হইল দলে দলে মানুষ পাহাড়ের নীচে নদীর তীরে নামিয়া আসিতে লাগিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দ্বন্দ্বহীন জীবনে আঘাত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল; কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। ধান চালের পুঁজি ভাগাভাগি হইতে লাগিল। মনের খেলার জাল ছিঁড়িয়া গেল। তাহাকে জোড়া দিবার কথা কাহারও মনে হইল না। যখন মনে হইল তখন সুতা জড়াইয়া গিয়াছে।

খাওয়ার জন্য যখন মারামারি থামিয়া গেল তখন আমরা বলহীন অবস্থায় কোন রকমে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছি। এই সময় অন্যের আশ্রয়ে জীবনের সুখের যেন এক নূতন পথ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম। নিজের অন্তরে খোঁজ করিলাম না। নিজের পুঁজির ও খোঁজ লওয়া দরকার হইল না। যখন কেহ আমাদিগকে বিশেষ হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিল তখন প্রাচীন পুঁথি দেখাইয়া পূর্ব্বগৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। সিন্দুকের কোণায় জড় করা টাকার মত আমাদের সভ্যতার পুঁজি অলক্ষ্যে পড়িয়া রহিল। তাহার উপর সময়মত আর কিছু জোগাড় দিতে পারিলাম না ক্রমে উহা অকেজো হইয়া পড়িল। ধার করিয়া যে চলা সুরু করিলাম সেই চলা আজও চলিতেছে।

নানা দেশ হইতে টানিয়া আনিয়া রাশীকৃত করাটাই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা নয়। দেশের দৈন্যটাই তাহাতে প্রকাশ হয় বেশি। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। আমরা সভ্য হইবার জন্য যে বিদ্যা অর্জন করি বিজেতা জাতি নিজের ব্যবসা ও বাণিজ্যে সহায়তা পাইবার জন্য তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছে। শিক্ষার জন্য আমাদের গরজ নাই। আমরা দেহের প্রধান দাবীটা মিটাইতেছি এবং তাহার জন্য সব কিছু দাবাইয়া রাখিয়াছি। আমাদের মন বাহিরের জাঁকজমকটাই বেশী দেখিয়াছে। ক্রমশঃ আমরা যে বর্ব্বর তাহা মানিয়া নিলাম। নিজেদের সব কিছুতেই অশ্রদ্ধা জন্মাইলাম। তাহা মনকে বুঝাইলাম যে অন্যকে বড় আসনে বসাইলে আমাদের প্রেমের পরিচয় লোকে পাইবে। এই ভাবে অন্তরের রস শুকাইয়া গেল, বাহিরের বৃন্তচ্যুত ফুল রসহীন অবস্থায় এখন মরিয়া যাইতেছে। জাতির গৌরব বার্ত্তা নানা হট্টগোলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দেশের লাঞ্ছনা বাড়িয়া চলিয়াছে।

জীবনের এই পঙ্গুভাব প্রতিকার করা কেবল স্কুল কলেজ খুলিয়া হইবে না। নিয়মিত কয়েক ঘণ্টার অক্ষর পরিচয়ের

মধ্য দিয়া কোন ভাবধারা ঘরে ঘরে বহান যাইতে পারে না। বইয়ের পাতার বাহিরে পরিজনের সংস্পর্শে জীবনযাত্রার যে প্রণালী আমরা শিখি এবং সমাজের আচার ব্যবহারে যে সব বৃত্তি আমাদের কাজে লাগাই তাহাই শেষে আমাদের জীবনে পাথেয় হইয়া দাড়ায়। মানুষের যাহাকে চরিত্র বলি তাহার ভিত্তি করে এই সব। এই চরিত্র আমাদের তৈয়ারী হয় না। ইহাকে গড়িয়া তুলিতে হয়। খাওয়া পরার ভাবনা খানিকটা কম করিয়াও আজ পর্য্যন্ত জন্তুর মত কেবল হাত পায়ের কলকব্জাগুলি ঠিক রাখিয়া চলিয়াছি। দেহের শ্রীবৃদ্ধি করিবার বাসনাকে জাগাইয়ারাখিয়াছি কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে শ্রেয়: করিবার কোন চেষ্টা নাই।

কিছু ভাবিবার বালাই আমাদের নাই। লোহা জলে ডোবে ইহা একটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে চরম জ্ঞান করিলে লোহার জাহাজ আজ সমুদ্রে ভাসিত না। এই যে জলের উপর দিয়া যাইবার প্রয়োজন এই রকমের প্রয়োজন আমাদের একেবারেই বোধ হয় না কেন? বাহির হইতে শক্তি না পাইলে আমরা চলিতে পারি না, অন্যের তুলনায় দৈহিক বা মানসিক গঠনে আমরা হীন নহি কিন্তু তফাৎটা কেবল উদ্যমের। বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে দূরের দেশকে নিকটে পাওয়াতে অন্য জায়গার সভ্যতার দান হইতে আমাদের বঞ্চিত হইবার কোন হেতু নাই। সেই জন্যই কি আমরা নির্বীর্য্য? কারণটা বোধ হয় আমাদের জীবনের আপাততঃ স্বচ্ছন্দ গতিজনিত অবসাদ। আমাদের কোন বিষয়েই অনুরাগ নাই। আমরা অনুকরণ করিতেই ব্যস্ত, শ্রদ্ধার আদানপ্রদান নাই। শ্রদ্ধাকে বেশী করিয়া বাহিরেই বিলাইয়া দিয়াছি। এখানেই আমাদের বিচারবুদ্ধির অভাব। কোন ব্যাপারই বিশ্লেষণ করিয়া দেখি না। মানুষের মনের অবস্থার সংস্কারের উপর লোকসমাজের সভ্যতা গড়িয়া উঠে। আমাদের সংস্কার বহুদিন বদ্ধ। পুরাতন অন্ধ অবস্থা এমন আমাদের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে যে আমাদের সমাজে সভ্যতার ছাপ পাইতে হইলে অনুকরণের বৃত্তিকে একেবারে পূর্ণমাত্রায় তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ভৌগলিক ও সামাজিক কারণে সভ্যতার প্রকাশ বিভিন্ন রূপে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের বিলাস সভ্যতাকে বৈশিষ্ট্য দেয়। ইহারই রূপ ও মাপ আমাদের জীবনকে নিরলস, শান্ত ও মহিমাময় করিয়া তোলে। আমরা যখন আবার আলো জ্বালিব মনের প্রদীপ্ত শিখা আমাদের অন্ধ মোহকে দূর করিয়া দিবে। অন্তরের প্রেম ও শ্রদ্ধা এই শিখাকে জ্বালাইবে। প্রেম যখন অন্তরে জাগিয়া উঠিবে তখন সেই প্রেমের সাধনায় যে ভোগ করিব তাহার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা থাকিবে না। অতি শীঘ্রই তালহীন হইয়া জীবন একদিকের ভারে নুইয়া পড়িবে না। তাহাতে মৃত্যুর কামনা জাগিবে না। বাঁচিবার আনন্দটাই সব শ্রম, ক্লেশ ও দুঃখকে ভুলাইয়া দিবে। এই আনন্দের বাণ আমাদের সমাজে ডাকিয়া আনিতে হইবে।*

* এই প্রবন্ধের মূল বিষয়টির উপর ভিত্তি করিয়া 'সংস্কৃতি পরিষদে'র এক সাধারণ বৈঠকে একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

যাদুকরের ফাঁকি

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

আমি যাদুকর যাদুবিদ্যায় পেয়েছি সিদ্ধি মোর
যাদু-বলে আমি বহু আঁখি 'পরে এনেছি তন্দ্রা ঘোর।

সার্থক আমি, সাধনায় তবু কিছু আছে মোর বাকি
দিয়েছি, পেয়েছি, নানান নকল, আসলে জমেছে ফাঁকি।

যে মায়া-পরশে মাটি হয় সোনা, নির্জ্জীব পায় প্রাণ,
সারা বিশ্বের সৃষ্টিতে থাকে যে মহামায়ার দান,

সে মায়ার আমি জানি নাই কিছু, শিখি নাই কিছু ভাই!
সকল খেলার শেষের কথাটি তাই ক'য়ে যেতে চাই—

যে ছলনা করি' নানা কৌশলে ঢাকিয়াছি বহু আঁখি
তাহার চেয়েও নিবিড় ছলনে নিজেও আঁধারে থাকি।

দেখায়েছি যত নব নব খেলা করি' নব আয়োজন
অন্তর-মাঝে সে সবারে মোর নাহি কিছু প্রয়োজন।

তার তরে আমি ধরে দিতে পারি শ্রেষ্ঠ রূপের কায়া
যে পারিবে শুধু ধরে দিতে সেই মোর অন্তর-মায়া।

বন্ধু

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

পৌষ মাসের এক সুন্দর প্রভাত। পাখীরা কলরব করিতেছে। সূর্য্যের প্রথম কিরণ জানালার ফাঁক দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে। অণিমা দেবী ও তাঁহার স্বামী সুপ্ত।

ঘুম ভাঙ্গিতেই অণিমা দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে ভূপেন (তাঁহার পুত্র) নাই; তিনি ডাকিলেন, "ভূপা, ও ভূপা, কোথায় গেলি রে?" ভূপেন (দূর হইতে) "মা, এই যে আমি ছাগল ছানাটার কাছে বসে।"

অণিমা (তাঁহার স্বামীকে ডাকিয়া), "দেখ্‌ছ ভূপার দুষ্টামি! এই শীতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে ছাগলটার কাছে!"

দিলীপবাবু, "ঐ ছাগলটার জন্যই তো ভূপা বেঁচে গেল। কত বড় একটা রোগ হ'ল! ডাক্তারে বললে—ছাগলটাগলের সঙ্গে থাকতে হবে তবে যদি বাঁচে। মানুষ যদি কোন লোক বা পশুর কাছে কিছুদিন থাকে সে সহজে তাকে ছাড়তে পারে না; তাতে আবার সেটি ছোট ছাগল ছানা।"

অণিমা, "তবে কি একটা রোগ থেকে আর একটা রোগে পড়লে ভাল হয়।"

দিলীপ, "না আমি তা বলিনি। (ভূপেনকে ডাকিলেন) এই ভূপা, ভূপা!"

ভূপেন (দূর হইতে) "যাই বাবা।"

দিলীপ, "কি কর্‌ছিস, চলে আয়।"

ভূপেন দূরের একটি কক্ষে ছাগল ছানাটি কোলে করিয়া বসিয়াছিল। বাপের ডাক শুনিয়া ধীরে ধীরে ছাগলের মাথাটি ক্রোড় হইতে নানাইয়া ছুটিয়া আসিল।

দিলীপ, "কি কর্‌ছিলি?"

ভূপেন, "ছাগল ছানাটা কাঁদ্‌ছিল, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাই দৌড়ে গেলাম দেখ্‌তে।"

দিলীপ, "ছাগলটা কেমন আছে?"

ভূপেন, "গলাটা কেমন বেঁকে যাচ্ছে। আর আগেকার মত দাঁড় করালে, পড়ে যাচ্ছে।" বলিয়া মুখটি ম্লান করিয়া পিতার পানে চাহিল।

অণিমা, "দাঁড়াও, আজই ওটাকে আমি কাউকে দিয়ে দিচ্ছি। তোমার ছাগল নিয়ে থাকা বার কর্‌ছি।"

দিলীপ, "আহা কেন সকালে ওকে কাঁদাচ্ছ? ছেলেমানুষ, যদি ছাগল নিয়ে খেলা করে তাতে ক্ষতি কি?"

অণিমা, "দিনরাতই কি ঐ নিয়ে থাকবে?"

দিলীপ, "না, না, সব সময়ে থাকবে না; তবে সময়ে সময়ে যাবে বই-কি।"

বিশেষ ক'রে ওর বন্ধু যখন বিপদে পড়েছে, আর যদিই-বা না বাঁচে। বন্ধু থাক না একটু।" বন্ধু না বাঁচে শুনিয়া ভূপার চোখে জল আসিল। এমন সময় হঠাৎ আবার ছাগ শিশুটি চীৎকার করিয়া উঠিল। ভূপেন ছুটিয়া চলিয়া গেল।

অণিমা, "ঐ ছাগলটা যেন ভূপেনের প্রাণ, ওকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও ওর চলে না। বড্ড বাড়াবাড়ি কর্‌ছে।"

দিলীপ, "কি কর্‌ব বল; বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে পড়ে আছ। তেমন সঙ্গী সাথী নেই। কোথায় বন্ধু পাবে বল। তবু তো বন্ধুর ক্ষুধা ছাগ শিশুটা মেটাচ্ছে কতকটা। এটাও তো দরকার।"

অণিমা, "তোমার যেমন কথা।"

ভূপেন পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল, "বাবা, ছাগল ছানাটা কি কর্‌ছে একবার দেখ্‌বে চল।" এবার তার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দিলীপবাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "চল না একবার দেখে আসি, যদি কিছু উপায় করা যায়।"

তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

ছাগ শিশু প্রায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ঘাড়টা যেন ঈষৎ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অণিমা, "আর এ বাঁচবে না।"

ভূপা ইহা শুনিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল।

দিলীপ, "চুপ কর্ ভূপা, কাঁদিসনে। ও ভাল হয়ে যাবে। (তাঁহার স্ত্রীকে) চাকরটাকে ডেকে বল একটু আগুন ক'রে দিক্; জায়গাটা গরম হয়ে যাক্। তার পর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই হ'বে। এ কেবল ঠাণ্ডার জন্যে।"

অণিমা (ভৃত্যকে) "কৈলাস ! ও কৈলাস !"

ভৃত্য (অর্দ্ধ সুপ্ত স্বরে) "কি মা ?"

অণিমা, "শোন্ শীগগির ক'রে।"

ভৃত্যটি আসিয়া বলিল, "কি বলুন ?"

দিলীপবাবু, "যা, একটু আগুন ক'রে দে।"

ভৃত্য, "কোথায়—উনানে ?"

অণিমা দেবী হাসিয়া উঠিলেন।

দিলীপবাবু, "তোর মাথায়। বেটা ঘুমুচ্ছিস তা শুনবি কি ? এই ছাগলটার কাছে একটু আগুন ক'রে দে।"

তাঁহারা দুইজনে চলিয়া গেলেন। সে স্থানে রইল শুধু ভূপেন আর কৈলাস। কৈলাস তাহার প্রভুর আদেশ পালনে ব্যস্ত।

(২)

ছাগলটি হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তার দিলীপবাবুর বন্ধু, সেই জন্যই ছাগলটির দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এধারে কিন্তু ভূপেন ছাগ শিশুর জন্য বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে ছাগ শিশুটির কথা ভাবিতেছে। আজ চঞ্চল ভূপেন যেন গম্ভীর ! সুন্দর নীল আকাশে হঠাৎ কোথা হ'তে বাদল আসিয়া দেখা দিল ! তখন প্রায় এগারটা, ভোজনাদি সমাপ্ত হইয়াছে। দিলীপবাবু কাছারী গিয়াছেন। অণিমা আপন কার্য্যে ব্যস্ত। ভূপেন তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "মা, একবার ছাগলটাকে দেখে আস্‌ছি।"

অণিমা, "কি কর্‌বে ?"

ভূপেন "একটু দেখে আস্‌ব।"

অণিমা, "না।"

ভূপেন, "এই কাছেই তো হাসপাতাল।"

অণিমা, "থাক্, তবু তুমি যাবে না।"

ভূপেন ক্ষুণ্ণ মনে মায়ের নিকট হইতে ফিরিয়া গেল ! আজ আর সে একটিবার মায়ের অবাধ্য না হইয়া কোন প্রকারে থাকিতে পারিল না। কাহাকেও না বলিয়া একটিবার ছুটিয়া হাসপাতালে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার মা এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। দিলীপবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন এবং ভিতরে বসিয়া আছেন। হাসপাতালের ডাক্তার আসিয়া ডাকিলেন, "দিলীপবাবু !"

দিলীপবাবু, "আসুন" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরে দুইজনে ফিরিয়া কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

ভূপেনও তাহার বন্ধুর সংবাদ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

দিলীপবাবু ভূপেনকে দেখিয়া ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ছাগলটা কি রকম আছে ?"

ডাক্তার, "ভালই আছে। কাল সকালে লোক পাঠাবেন আমি পাঠিয়ে দিব।"

দিলীপ, "কি হয়েছিল ?"

ডাক্তার, "কিছু না, কেবল ঠাণ্ডার জন্য।"

দিলীপ, "আজ ভূপেন তো সমস্ত দিন বন্ধুহীন হয়ে আছে। বন্ধুকে দেখ্‌বার জন্য বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। তা এখন ভাল আছে তো ?"

ডাক্তার, "হ্যাঁ। তারপর আমাদের ভূপেনবাবু তাঁর কম্ফাটারটাও কোন্ ফাঁকে ছাগলটার গলায় জড়িয়ে দিয়ে এসেছে !"

দিলীপ, "তাই নাকি ! ভূপেন তুমি কম্ফাটারটা জড়িয়ে এসেছো ?"

ভূপেন কিছু বলিল না। সে তাহার মায়ের নিকট হয়তো ইহার জন্য বকুনি খাইতে পারে; কিন্তু ছাগলটি ভাল আছে এবং সকালে আসিবে শুনিয়া সেজন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বন্ধুর কুশল সংবাদের আনন্দে তাহার ভৎর্সনার ভয় দূর হইয়া গেল।

পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

পশ্চিম বাঙ্গালার উপরে অন্নকষ্ট ও দুর্দশার করাল ছায়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমা ভীষণ বন্যায় বিধ্বস্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের দুঃখকষ্টের কাহিনী সংবাদপত্রের পাঠকদের অগোচর নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ নেতৃগণ এই সকল হতভাগ্যের দুর্দশা মোচনের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাঁকুড়া ও বীরভূমে এবার সময়ে বৃষ্টি হয় নাই এবং যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও পরিমাণে বড় কম। ইহার ফলে, সময় মত ধান্য রোপণ হয় নাই। তবুও আশ্বিন কার্তিকে বৃষ্টি হইলে, ধান্য কতক পরিমাণে বাঁচিত এবং ইক্ষু আলু ইত্যাদি রবিশস্যের আবাদ হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েও বৃষ্টির অভাব হইয়াছে।

এই সকল অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য যে সকল অসংখ্য বাঁধ পুকুর আছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে মজিয়া অকর্মণ্য হইয়াছে। এই সকল জলাশয়ে অন্যান্য বৎসরে যে পরিমাণ জল থাকে, এই বৎসর বৃষ্টির অভাবে তাহাও নাই। সুতরাং সেচন করিয়া ফসলের কিয়দংশ রক্ষা করিবে, সে উপায় নাই।

যে ভীষণ দুর্দিন কালমেঘের মত ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে কেবল অন্নাভাবজনিত কষ্ট হইবে, তাহা নহে। স্নান ও পানের জন্য জল দুষ্প্রাপ্য হইবে। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে, কৃষকের প্রধান সম্বল গরু মহিষকে বাঁচান কঠিন হইয়া উঠিবে।

সরকারের তরফ হইতে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহাতে দলে দলে লোক আসিতেছে। ফেমিন কোডের বিধান অনুসারে যে সামান্য পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট আছে তাহাতে হয়ত ইহাদের নুন-ভাতের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু যে সকল কৃষক সম্প্রদায় মাটিকাটার কাজে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের কেমন করিয়া চলিবে? চাষী-খাতক আইন ও ঋণসালিশী বোর্ডের কৃপায় কর্জ পাওয়া কঠিন হইয়াছে। সম্প্রতি যে মহাজনী আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই সকল দুর্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতে হইবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্যতীত, কংগ্রেসকর্মীদের তরফ হইতে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের কর্মীগণ দক্ষিণ বীরভূমের নানাস্থানে সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু দেশবাসীগণের যথেষ্ট সহানুভূতি না পাইলে ইঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইবে না।

বিপদের সময় অস্থির হইতে নাই, শাস্ত্রে এই প্রকার বিধান আছে। কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যথাসময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় না এবং সময় মত বৃষ্টিপাত হয় না। এই অনিশ্চয়তার দরুণ শস্যহানি নিবারণকল্পেই এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে বাঁধ ও পুকুর বর্তমান আছে। তাহার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। ফেমিন ফণ্ডের যে টাকা অনাবশ্যক মাটির কাজে অপব্যয় হয়, তাহা এই সকল জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার কার্যে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়।

অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানি পশ্চিম বাঙ্গালায় অভূতপূর্ব নহে। কিন্তু প্রতি বারেই রাস্তাঘাটের কাজে বেশী ব্যয় হইয়াছে, সেচনের জলাশয়-গুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ করা হয় নাই।

কিছুদিন হইল এই সকল বাঁধ পুকুরের উন্নতির জন্য একটি আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের বিধান যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং বর্তমান দুর্বৎসরে এই আইনের ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নতুবা এবারেও রাস্তাঘাটে টাকা খরচ হইয়া যাইবে, দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা হইবে না।

ভারতবর্ষের কৃষকদের বিষয় যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্বত্রই কৃষকগণ বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস চাষের কাজ করে না। সুতরাং তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে. তাহাদিগকে এমন কোনও সহজ শিল্পকার্য শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা অবসর সময়ে সামান্য কিছু উপার্জন করিতে পারে। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পরিকল্পিত কার্য-পদ্ধতিতে চরকা ও বয়নশিল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশেষত ভারতবর্ষের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য কৃষির ফলাফল অনিশ্চিত।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে নূতন কোনও কুটিরশিল্পের প্রবর্তন হয় নাই। যাহা ছিল, তাহাও যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় মৃতপ্রায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের দুর্দশা মোচন কার্যে ইহাই প্রধান অন্তরায়। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা দুই-একজন লোকের দুই-চারি দিন প্রতিপালন হয়, কিন্তু দুই-তিনটি জেলার সমস্ত লোককে কেমন করিয়া বাঁচান যায়। যাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আজ দুর্দিনে এই সকল কথা তাহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ নানাভাবে দলিত ও বিপর্য্যস্ত। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ আজ বাঙ্গালার বুকে এক শোচনীয়
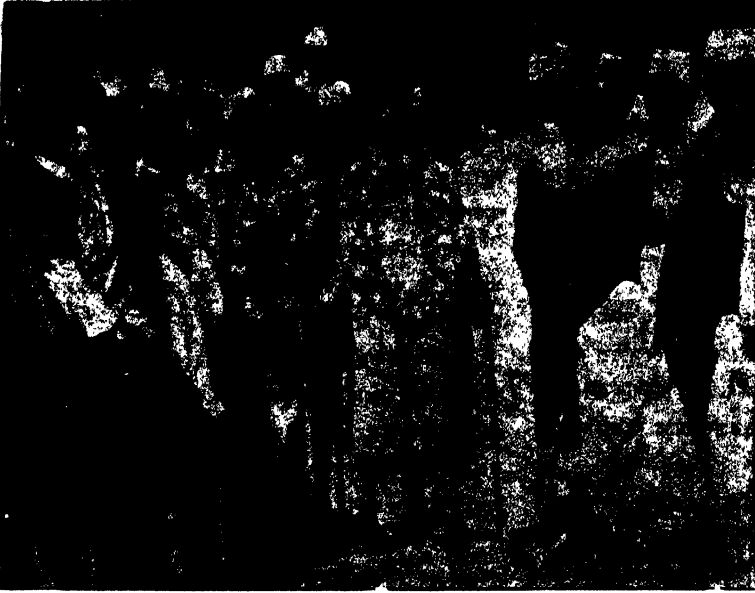
কৃষ্ণনগরে সমবেত হিন্দু নেতৃবৃন্দ—ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, নরেন্দ্রকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ, স্যার মন্মথনাথ প্রভৃতি

অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালার আকাশবাতাস আজ অপহৃতা ও উৎপীড়িতা হিন্দুনারীর আর্ত্তস্বরে মুখরিত। তাই সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দুসংগঠনের জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু আজ বুঝিয়াছে যে সংগঠন ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই। সম্প্রদায়বিশেষের সাম্প্রদায়িকতার ফলে তাহার সুস্থ দেহে জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকেই বিপদ।

এই বিপৎসাগরে নিমগ্ন অবস্থা হইতে কূল পাইতে হইলে সংঘবদ্ধভাবে কোন বিহিত চেষ্টা করা উচিত—বাঙ্গালার হিন্দুরা ইহা যে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে তাহা কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হিন্দুসভার বিগত অধিবেশনের সাফল্যে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে (গত ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর) বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার নবম অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এবং সভাপতি হইয়াছিলেন প্রসিদ্ধ হিন্দুনেতা স্যার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতির পঞ্চশতাধিক প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং দর্শক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার বিশেষত্ব এই যে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতে এবং কোন-

হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রূপ উষ্মা প্রকাশ না করিয়া তাহাদের প্রতি অবিচারের উচ্ছেদ ও সুবিচারের দাবী করিতে দেখা যায়।

১৬ই নভেম্বর সকালে নির্ব্বাচিত সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ হিন্দুনেতৃবৃন্দ ও দুই শত প্রতিনিধি কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে পৌছেন। ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণসহ বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকবৃন্দ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের দর্শন প্রতীক্ষায় আগ্রহাকুল চিত্তে সমবেত হয়। অতঃপর বেলা ২॥০ ঘটিকার সময়ে নির্ব্বাচিত সভাপতি, ডাঃ মুঞ্জে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল হিন্দু পতাকা শোভিত সুসজ্জিত হস্তী, তৎপরে ছিল শত শত সাইকেল আরোহী স্বেচ্ছাসেবক, সর্ব্বশেষে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ লাঠিহস্তে অনুগমন করিতেছিল। এরূপে শোভাযাত্রা পত্রপুষ্প সুসজ্জিত রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার কালে সভাপতির মস্তকোপরি অজস্র পুষ্প বর্ষিত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কুলবধূগণ গৃহের বাহিরে আসিয়া শঙ্খ ও উলুধ্বনির সহিত তাঁহাকে হিন্দুপ্রথায় বরণ করিতে থাকেন।
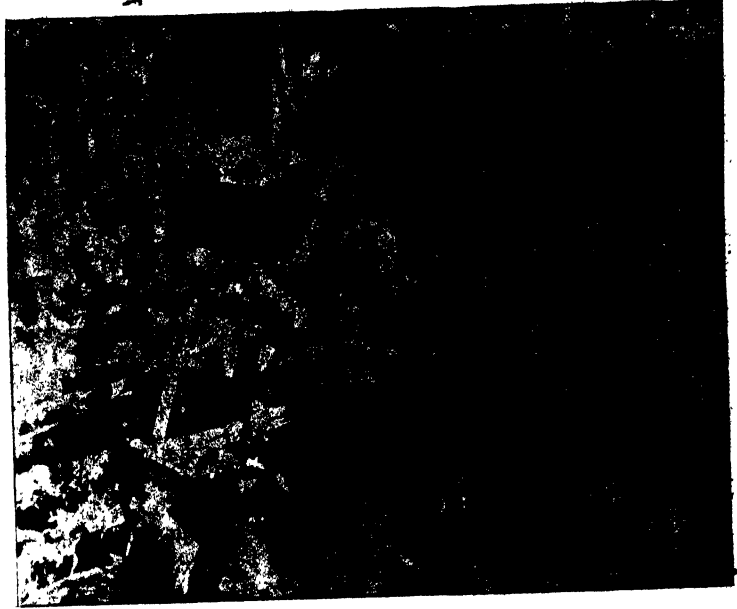
কৃষ্ণনগরে সভাপতি প্রভৃতিকে লইয়া এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রার একাংশ
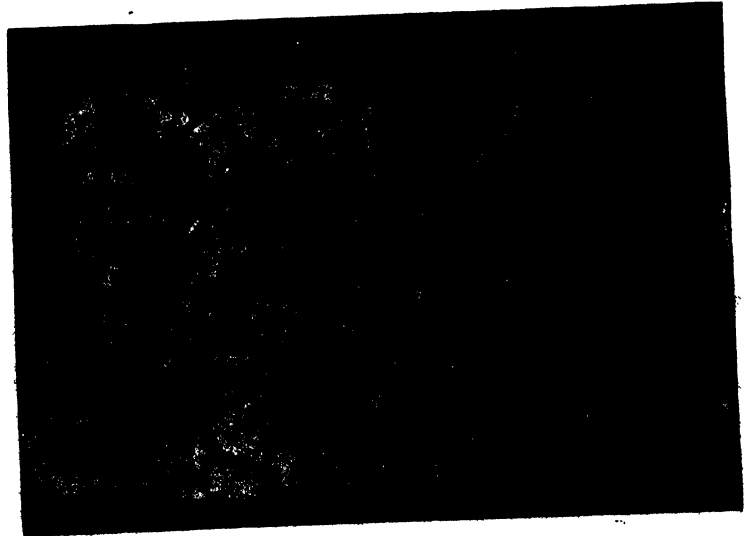
কৃষ্ণনগর হিন্দু সম্মিলনে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের গায়িকাবৃন্দ

অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটের সময় পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র দর্শকের উপযোগী নির্ম্মিত বিরাট মণ্ডপে সভার

অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি স্যার মন্মথনাথের পার্শ্বে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট থাকেন। মঞ্চের সম্মুখভাগে প্রতিনিধিরা তাঁহাদের আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে সকলকে

স্যার শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ও পাকিস্থান পরিকল্পনাদলনে সত্বর ব্রতী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুনাচুক্তির তীব্রভাবে নিন্দা করেন এবং বাঙ্গালার নারী নির্য্যাতন ও কুলটার গুলী চালনা প্রভৃতির প্রতিকার উদ্দেশ্যে হিন্দুমাত্রকেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। চারিদিকে শুনা যাইতেছে যে আগামী লোকগণনায় মুসলমানের সংখ্যাই বেশী হইবে; কিন্তু তিনি তাঁহার সমালোচনায় হিন্দুর সংখ্যাই যে বেশী হইবে তাহা সকলকে দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দেন।

বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহোদয় বলেন—"হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রতিমা বিসর্জ্জন ও শোভাযাত্রা এখন আর অবাধে নিষ্পন্ন হয় না। মুসলমান-প্রধান গ্রামে হিন্দুরমণীরা আর পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে না। হিন্দুগণ সর্ব্বদাই নানা দুঃখকষ্টে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতেছে। আর এই দুঃস্থ শ্রেণীর দুঃখ মোচনের নামে এমন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার ফলে এই জাতি হয়ত পরবর্ত্তীকালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যে নীতিতে আজ বাঙ্গালাদেশ পরিচালিত হইতেছে তাহার মূলভিত্তি সাম্প্রদায়িকতায় বর্ত্তমান। সম্প্রতি যে শিক্ষাবিল বা আইনের সৃষ্টি হইতেছে তাহার মূলেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব রহিয়াছে। ইহার ফল আপাতদৃষ্টিতে সেরূপ ভীষণ না হইলেও পরে ক্ষতিকর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবে।" অতঃপর ডাঃ মুঞ্জে হিন্দুসংগঠন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন এবং হিন্দুগণকে আশু সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। সভায় উপবিষ্ট সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁহাদের বক্তৃতা ও অভিভাষণ শ্রবণ করেন।

পরদিন প্রাতে কৃষ্ণনগর মোমিন পার্কে ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার পতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকে ঐ পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করেন। বেলা ১টার সময়ে দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশন ছয়ঘণ্টাব্যাপী চলে। এই সভার অন্যতম বক্তা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায়, তাঁহার দৃঢ়চিত্ততায় ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের সমালোচনা

হিন্দুপতাকা বহনকারী হস্তী—মিছিলের সহিত এই হস্তীও ছিল

বেশ যুক্তিযুক্ত হয়। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কুলটীর গুলী চালনার বর্ণনা এমনই মর্ম্মন্তুদ হয় যে অনেকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করেন।

অধিবেশনে গৃহীত বহু প্রস্তাবের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, মাধ্যমিক শিক্ষাবিল প্রতিরোধ, দ্বিতীয় কর্পোরেশন বিল, ধর্ম্মচর্চ্চায় বাধাসৃষ্টির প্রতিবাদ, গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রার অবাধ অধিকার ও কুলটী গুলীচালনার তদন্তের দাবী, হিন্দুসমাজে বেকার সমস্যার প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দুগণ উক্ত প্রস্তাবসমূহ যথার্থ কার্য্যকরী করিতে প্রয়াসী হইলে সত্যই সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। বিগত প্রাদেশিক অধিবেশন দেখিয়া মনে হয় যে হিন্দু আজ সচেতন হইয়াছে। সে হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। সে আর অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে রাজী নহে। সে এক্ষণে মনে করিতে শিখিয়াছে যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হইলেও সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ জাতির সংগঠন ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আসিতে পারে না, কিংবা আসিলেও তাহার পরিণাম সুখপ্রদ হইতে পারে না। এই সম্মিলন হইতে আমরা আর একটী জিনিষ দেখিতে পাই। অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির ভিতরেও জাগিবার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। বিপন্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উন্নত সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে এবং উন্নত সম্প্রদায়েরাও অনুন্নতদের সাহায্যের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছে। এই মিলিত বন্ধুভাব দেখিয়া মনে হয় যে এই ভাব হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঙ্গালী হিন্দুর সকল বিপদ অচিরেই বিদূরীত হইবে। তাহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আশা হয় যে এই ভাবের বন্যায় ভাটা পড়িবে না। উহার পরমায়ু হইবে যেমনি অব্যয়, তেমনি অক্ষয়।

জানালার ধারে

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আলোছায়া অন্ধকারে দাঁড়াইলে জানালার ধারে,
দ্বাদশীর চাঁদ বুঝি দেখা দিল মেঘের ওপার?
অথবা স্বপন এলো যেন কোন্ নদীর কিনারে
বলাকার পাখে যেন নেমে এলো ছায়া-অন্ধকার।

এলে তুমি ত্রস্ত পদে, দেখে নিলে গেছি কতদূর-
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি চোখ দুটি তারার মতন,
মলিন হাসির রেখা গোধূলির বেদনা বিধুর
অতীত দিনের ছায়া মুখে তব মধুর এমন!

বহু দূরে গেছি বুঝি?—তবু দেখি জানালার ধারে
ফিরে এলো দিনগুলি, শরতের শিশির সকাল,
নির্জ্জন মধ্যাহ্ন যত লঘু পায়ে এলো বারে বারে
চকিত চুম্বন কত বাহুডোরে কত ইন্দ্রজাল!
হয়তো গভীর রাতে বাতায়নে নাই তুমি আর
আমার মনের পথে ছায়ামূর্ত্তি এলো যে তোমার!

ছাত্রসমাজ ও দমননীতি—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে কারারুদ্ধ করায় ভারত-ব্যাপী যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহারই ঢেউ ছাত্র-মহলকেও যে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার ছাত্রদের এই মনোবৃত্তি বরদাস্ত করিতে রাজী নহেন ; বরং তাঁহারা ছাত্রদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশেই ছাত্রদের প্রতি কঠোর দমননীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। দিল্লীর খবরে প্রকাশ, দিল্লীর ছাত্রসমাজের সভাপতি মিঃ ফারোকির এম্-এ ডিগ্রী ও সম্পাদক মিঃ সিংঘির বি-এ ডিগ্রী কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যর ম্যরিস গয়ারও এই দণ্ড অনুমোদন করিয়াছেন। যে অপরাধের জন্য এই দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ নহে ; আর শাস্তিটাও গুরুতর বলিয়া মনে করা চলে ; কিন্তু স্থান কাল পাত্র-ভেদে সহজ জিনিষই যে জটিল হইয়া পড়ে, ইতিহাসে তাহার নজির ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ভাষণ—

সম্প্রতি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভারতীয় সংস্কৃতিবোধের পরিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর মানব সমাজ আজ অতি দুর্দ্দৈবের মধ্য দিয়া চলিতেছে ; উদার ও বিচক্ষণ দৃষ্টি আজ সব চেয়ে বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আজিকার সর্ব্বব্যাপী বিচ্ছেদ, হতাশা, অজ্ঞতা, অন্ধতার মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে তাহাদের সত্যিকারের কল্যাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানকে ভারতের আবশ্যক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনকে সকল দিক দিয়া উদার ও সহিষ্ণু করিয়া তুলিতে হইবে। যে উদার মনোভাব ও দৃষ্টিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এই কথাগুলি বলিয়াছেন, আজিকার দিনে যাহারা বিভেদ সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছে, তাহারা তাঁহার কথাগুলি ধীরভাবে শুনিতে চাহিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, শুনিলে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে।

বিহারে প্রাথমিক শিক্ষা ও বাঙ্গালা—

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক কে, টি, শাহের সভাপতিত্বে বিহারের শিক্ষা-সংস্কার সমিতি বার্ষিক আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে বিহারের দশ বৎসরের নিম্ন বয়সের ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার বালক-বালিকার বাধ্যতামূক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। গঠনমূলক কাজে বিহার সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের আমল হইতে যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহাতে মনে হয়, বিহার সরকার এই সুপারিশ মানিয়া লইবেন। অথচ বাঙ্গালা এ বিষয়ে যে কতটা পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহা বলা যায় না। একদিন যে বাঙ্গালা শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব্বে সমগ্র ভারতের নিকট হইতে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, আজ সাম্প্রদায়িকতা লইয়া সেই বাঙ্গালাই নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করিয়া মরিতেছে। অজ্ঞানতাই আমাদের দেশে সকল বিরোধের প্রধান কারণ ; সেই জন্যই বাঙ্গালায় বিহারের ন্যায় ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুনারীর দায়াধিকার—

হিন্দুনারীর দায়াধিকার বিল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটি আনেন, সেটি অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর প্রচলিত আইনে পিতা অথবা স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ভিন্ন আর

কোনও স্বাভাবিক অধিকার নাই ; থাকা উচিত ছিল কি-না সে আলোচনা এখন নিষ্ফল। তবে এইরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে হিন্দুসমাজে নানা অসুবিধা, অশান্তি ও সমস্যা দেখা দিয়াছে। সুতরাং দেশের কল্যাণকামীদের আমরা এবিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে বলি।

দেশীয়রাজ্যে সমাজ-সংস্কার—

ইংরেজ-শাসিত ভারতের মত দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সমাজসংস্কার আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণাপথের কোচিন রাজ্যের আইন-সভায় বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হইয়াছে। শারদা আইনে ইংরেজ-শাসিত ভারতে যে ফলের প্রত্যাশা করা গিয়াছে, অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কোচিনের এ বিবাহ-নিয়ন্ত্রণ আইন রচিত। এই আইনের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য পাত্রের বয়স অন্যূন আঠার, আর কন্যার চৌদ্দ বৎসরের কম হইতে পারিবে না। আইনের ব্যবস্থায় কোন গোল নাই ; কিন্তু আইনের প্রয়োগে তাহা যদি শারদা আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থার মতই হয় তাহা হইতে উদ্দেশ্য যত সাধুই হোক না, বাল্যবিবাহ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পরিভাষা সঙ্কলনে সরকারী প্রচেষ্টা—

ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা বোর্ড এদেশে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই কমিটির যাঁহারা সদস্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালীর নাম দেখিলাম না। সুধু তাই নহে, যে বিষয়ে ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিত সমাজের পরামর্শ অপরিহার্য্য, সে বিষয়ে পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে কোন পরামর্শই করা হয় নাই। মহারাষ্ট্র হইতেও কাহারও নাম এই কমিটিতে নাই। অথচ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। বাঙ্গালা ও মারাঠী ভাষায় অনেক দিন হইতেই পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে খানকয়েক গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সরকার-মনোনীত সদস্য দিয়া ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরিভাষা সঙ্কলন যে ভস্মে ঘি ঢালা-গোছ একটা কিছু হইবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ডিফেন্স বণ্ডে অর্থ নিয়োগ—

সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ২৭শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স ফণ্ডে ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সুদবিহীন ডিফেন্স ফণ্ডে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স ফণ্ডে মোট ২৭ কোটি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা (ইহার মধ্যে নগদ ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ও ঋণপত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা) এবং ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত ২৬শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার ডিফেন্স বণ্ড দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষে মোট ৩০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সৈন্যবাহিনীতে লোকগ্রহণ—

জরুরী অবস্থার জন্য ভারতবর্ষে যে নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হইয়াছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ লোকের নাম গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রায় ২ হাজার লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত লক্ষ লোকের মধ্যে মাদ্রাজ হইতে ৪৮ হাজার, বোম্বাই সাড়ে সাত হাজার, রাজপুতানা ও মধ্যভারত হইতে ৫ হাজার ৩শত ৫০ এবং নেপাল হইতে ৩ হাজার ৩শতের উপর লোক ভর্ত্তি হইয়াছে। এই নূতন সেনা-বাহিনীতে যে সকল লোক ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৫জন পাঞ্জাবী মুসলমান। এই সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য এককালীন ১৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়।

পরলোকে গৌরগোপাল ঘোষ—

বিশ্বভারতীর আর একজন একনিষ্ঠ সেবক, শ্রীনিকেতনের কর্ম্মী গৌরগোপাল ঘোষের অকালবিয়োগে আমরা ব্যথিত। এক সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় বলিয়াই প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন গ্রাম্যের শিক্ষা-মন্দির শান্তি-

নিকেতনকে এবং বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের মঙ্গলজনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে বিশ্বভারতী সত্যকার নিষ্ঠাবান একজনকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা গৌরগোপালের শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্ব্বাচনে মিঃ রুজভেল্ট বহু ভোটের জোরে তৃতীয় বারের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রিপাব্লিকান দলের মিঃ উইলকি এই নির্ব্বাচনে মিঃ রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রুজভেল্টের এই নির্ব্বাচন তাঁহার জনাদরের প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতব্যাপী এই সঙ্কটের মুখে তাঁহার নীতি আমেরিকার পক্ষে সর্ব্বাংশে কল্যাণপ্রদ কি-না, এ বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বৃটেনের বদান্যতা—

লণ্ডনে একটি মসজিদ ও ইসলামীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বৃটিশ সরকার এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির প্রতি বৃটিশ সরকারের শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া মুসলিম জগৎ বৃটেনের প্রতি অবশ্যই সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, বৃটিশ অধিকৃত আরব এবং মালয়ে বৃটিশ সম্রাটের প্রায় বার কোটি মুসলিম প্রজা আছে। সরকারের এই বদান্যতায় বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই বিরাট সম্প্রদায়ের নৈতিক ও অন্যবিধ সাহায্যের মূল্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

আসাম উচ্চতর পরিষদ চাহে না—

ভারত সরকারের নূতন ভারত শাসন আইনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে দুইটি করিয়া আইন পরিষদের ব্যবস্থা হয় এবং তাহাতে যে ব্যয়বাহুল্য দেখা দিয়াছে তাহা কোন কোন প্রদেশের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আসাম ব্যবস্থা পরিষদ আসামের উচ্চতর আইন সভাটি তুলিয়া দিবার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার পক্ষ (অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডল) ও কংগ্রেস পক্ষ মিলিয়া প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন, ইউরোপীয় দল যথারীতি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অবশ্য ভারত শাসন আইন সংশোধন করিবার অধিকার কোন প্রাদেশিক আইন সভার নাই। না হউক, আসামের মত দরিদ্র প্রদেশের পক্ষে ওরকম একটি প্রতিষ্ঠান জিয়াইয়া রাখা যে সম্ভব ও সঙ্গত নয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

পরলোকে বৃটিশ-প্রধান মন্ত্রী—

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহার পল্লীভবনে কিছুদিন আগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মিউনিক প্যাক্ট তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে লোকচক্ষে হেয় করিয়া দেয়, তাই এই সঙ্কট সময়েও দেশের কল্যাণ হইবে মনে করিয়া নীরবে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ তিনি সকল সমালোচনার ঊর্দ্ধে; কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবন হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, দেশের কল্যাণ কামনা তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে এবং দেশের স্থায়ী কল্যাণও তাঁহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। তিনি এই লোক ও জাতিধ্বংসকর সর্ব্বনাশা লড়াইকে এড়াইয়া চলিতেই চাহিয়াছিলেন, কেন না তিনি ছিলেন আসলে শান্তিকামী। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বেলুচিস্থানে কংগ্রেসের প্রসার—

বেলুচিস্থানের জাতীয়তাবাদীগণ ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দিবেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বেলুচিদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় ভারত আজ বিপর্য্যস্ত, তাই এই সংবাদ জাতীয়কল্যাণকামীদের মনে স্বস্তি আনিয়া দিবে বলিয়াই মনে হয়। ইহাও প্রকাশ যে, তাঁহারা শীঘ্রই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিবেন। এতদিন সেখানে কোনরূপ কংগ্রেস কমিটি ছিল না। তাই আমাদের বিশ্বাস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের আবেদন গ্রহণ করিবেন। সাম্প্রদায়িকতা যখন দেশের স্বাধীনতা লাভকে সুদূরে ঠেলিয়া দিতেছে সেই সময় বেলুচিদের এই প্রস্তাব শুভ সূচনার মতই মনে হইতেছে।

বাকিংহাম প্রাসাদের উদ্যানে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, সাম্রাজ্ঞী ও মিঃ উইনষ্টন চার্চিল—ইঁহারাই এখন বৃটাশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন

বিলাতের লর্ডস সভার উপর বোমা পড়ার পর তাহার ব্যবস্থা। অনেক স্থানে বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে

বিলাতে গাওয়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় ছাত্রাবাসে বোমা পড়িয়া
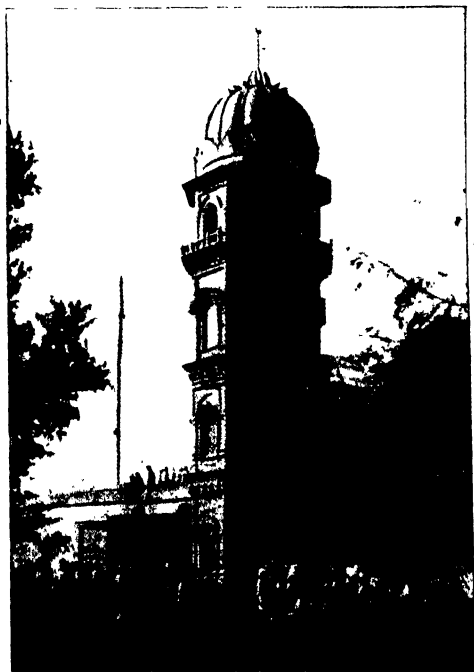
লাহোরে গুরু নানকের জন্মস্থানে অবস্থিত গুরুদ্বার। নানকের

দিল্লীতে সম্পাদক সম্মিলনে ট্রিবিউনের মিঃ সন্ধী, লীডারের মিঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ,
অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীতুসারকান্তি ঘোষ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের
ডেপুটী স্পীকার শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত

কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সাধারণের জন্য বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধ কেন্দ্র।

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন—

বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার যে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। স্পেশাল অফিসার তাঁহার রিপোর্টে কমিশনের সুপারিশ অপেক্ষা অধিক হারে ক্ষতিপূরণসহ স্বেচ্ছামূলকভাবে জমিদারী ক্রয় ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের অসুবিধাগুলিও তিনি তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ, রিপোর্ট পেশ করিবার আগে তিনি স্বয়ং জমিদারী কার্য্য সম্পর্কে সকল বিষয় জানিবার জন্য মফঃস্বল কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। স্বেচ্ছামূলক অথবা বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা থাকায় সম্ভবত বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান আইন সভার আমলে এরূপ কোন জমিদারী ক্রয় বিল উপস্থিত করিবেন না।

পরিষদে সরকারের পরাজয়—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে অতিরিক্ত রাজস্ব বিলে সরকারের যে পরাজয় ঘটিল তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরাজয় হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। অন্যান্য বারের পরাজয় শাসনতন্ত্র পরিচালনার অঙ্গীভূত সাধারণ ঘটনা মাত্র। কিন্তু এবারকার পরাজয়ের স্বতন্ত্র গুরুত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক অর্থ আছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসননীতির পরিবর্ত্তন যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই পরাজয়ের মধ্যে সরকারের জন্য সেই শিক্ষাই নিহিত রহিয়াছে। সরকারের পরাজয় হইলেও বড়লাট যে সার্টিফিকেট করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরলোকে মৌলানা সাজ্জাদ—

ফুলবাড়ী শরিফের সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম ধর্ম্মগুরু মৌলানা সাজ্জাদ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ও জমায়েৎ-উল-উলেমা হিন্দ্ নামক সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সংস্থাপক। দেশের জন্য কংগ্রেসের ডাকে তিনি অনেক দুঃখবরণ করিয়া দেশবাসীর প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের অশেষ ক্ষতি হইল।

মহিলা ছাত্রীর কৃতিত্ব—

গ্রহনক্ষত্রাদির উপাদান (য়্যাস্ট্রোফিজিক্স) সম্পর্কে গবেষণা করিয়া কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনিস্টিটিউশনের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদারকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোয়াট মেডেল দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর তিনি গত দুই বৎসর কাল উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উক্ত মেডেল পাইলেন। আমরা শ্রীযুক্তা মজুমদারের জীবনে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।
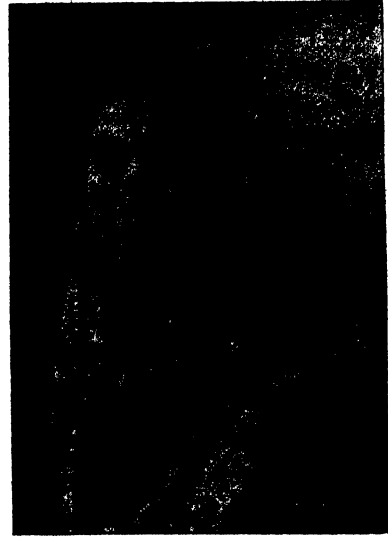
শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার

ডাক্তার দান—

অধ্যাপক ল্যারেন্স 'সাইক্লোট্রন' যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মৌলিক পদার্থের অণুগুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহার গড়ন পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে নব নব পদার্থের সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে বহু অজানা রহস্যের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে এবং নিত্যই

নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয় হইতেছে। এই যন্ত্রটি বহু মূল্যবান, কাজেই সকল শিক্ষায়তনের পক্ষে ইহা ক্রয় করা সম্ভব নহে। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এতদিন এই যন্ত্র ক্রয় করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল যে, স্যর দোরাবজী টাটা চ্যারিটির ট্রাস্টিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য যন্ত্রের মূল্যের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ষাট হাজার টাকা এই সর্ত্তে দিতে সম্মত হইয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আরও ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিলে টাটার দান পাইবেন। অধ্যাপক ল্যারেন্সের নিকট তিন বৎসর কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এমন একজন ভারতীয়ের উপর এই যন্ত্রের ভার অর্পণ করা হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এই যন্ত্র সাহায্যে গবেষণা করিবার পদ্ধতি শিখাইবার ভার দেওয়া হইবে। মহামতি টাটার দান যে এক্ষেত্রে সার্থক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাজাগুহার শিল্পনিদর্শন—

পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত ভাজাগুহাসমূহে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার পুরাকীর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য নিদর্শন এতদিন ধরিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছে। এগুলিকে সংরক্ষিত না করিলে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য নষ্ট হইবে। প্রকাশ, এগুলিকে রক্ষা করিতে মাত্র নয় হাজার টাকা আপাতত আবশ্যক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ সকল ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে বর্ত্তমানে সমর্থ নহেন বলিয়া জানাইয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিশারদেরা বলেন, ভাজাগুহাসমূহের প্রস্তর ভাস্কর্য্য যীশুখৃস্টের জন্মেরও অনেক আগে খোদিত এবং এইগুলি হইতে ভবিষ্যৎ ছাত্রেরা প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের বহু প্রয়োজনীয় নিদর্শন পাইতে পারিবেন। সরকার যদি এই সব মূল্যবান পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণে এখন সম্মত না হন তাহা হইলে ভারতে এমন কোন সুসন্তান কি নাই—যিনি বা যাঁহারা সামান্য চেষ্টা করিলেই এই মূল্যবান শিল্প-নিদর্শন সুরক্ষিত হইতে পারে?

পরলোকে লর্ড রদারমিয়ার—

বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্রব্যবসায়ী লর্ড রদারমিয়ারের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রজগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার ভ্রাতা লর্ড নর্থক্লিফের সহযোগিতায় তিনি সংবাদপত্র ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অসাধারণ ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে বিলাতের অনেকগুলি শক্তিশালী সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। 'ডেলি মেল', 'ডেলি মিরর', 'লণ্ডন ইভিনিং নিউজ' প্রভৃতি বিখ্যাত শক্তিশালী সংবাদ-পত্রগুলি গোঁড়া রক্ষণশীল দলের পক্ষে থাকিয়া বৃটিশ সরকারকে যে ভাবে শাসনকার্য্যে ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা অনন্যসাধারণ। ইংলণ্ডের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁহার মত একজন প্রবীণ শক্তিমান সাংবাদিকের মৃত্যুতে ইংলণ্ড বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

উমা ঘোষ পুস্তকসংগ্রহ—

কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কন্যা উমারাণী ঘোষের স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি অদ্ভুত পুস্তকসংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। ঐ সংগ্রহে শুধু বাঙ্গালী মহিলাদের লিখিত পাঁচ শত গ্রন্থ আছে। সম্প্রতি ঐ সংগ্রহে আরও ২৬খানা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালার সকল মহিলা-গ্রন্থকার যদি তাঁহাদের পুস্তকগুলি ঐ 'সংগ্রহ' মধ্যে দান করেন, তবে ঐ সংগ্রহ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে। এই ভাবের সংগ্রহ আমাদের দেশে দুর্লভ।

বেতারে ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা স্টেশনের পরিচালকগণ সম্প্রতি ছাত্রদের জন্য বেতারে জ্ঞান বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বেতার যন্ত্র বসাইয়া উহা গ্রহণেরও সুযোগ লইয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা 'স্কুল ব্রডকাষ্ট' বিভাগে বক্তৃতা দেওয়ান হইতেছে।

ভারতীয় সেনাদলে

বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার যুবকেরা যুদ্ধ বিভাগে যতগুলি এমার্জেন্সী কমিশন পাইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী স্বতই গর্ব্ব অনুভব করিবে। যুদ্ধ বিভাগে প্রতিদিন কয়টি করিয়া এমার্জেন্সী কমিশন খালি হয় তাহা কাহারও অজানা নাই। সেনাদলে

নিয়োগের ব্যাপারে বাঙ্গালীদের যে এখনও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে তাহা সরকার অবশ্যই জানেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তরেও তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশের সৈন্য নিয়োগের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় পাঠান ৪,৭৬১; পাঞ্জাবী মুসলমান ২৪,১৪৮ শিখ ১১,৬০৫; ডোগরা ৪,৪৬৪; গুর্খা ৩,২০৯ গাড়ওয়ালী ২,৫৯৮; কুমাওনী ১,৫৭৪; রাজপুত ৩,৯৯৭ জাট ৫,৩০৭; আহীর ১,৫৭৪; মারাঠা ৫,১৬৪ খৃষ্টান ২,৪০১; হুজার ৮৫৩; অন্যান্য হিন্দু ১৫, ২৫২ অন্যান্য মুসলমান ৭,১৯৮ এবং কুর্গী ২৯। বাঙ্গালী হিন্দু বা মুসলমান নামক কোন জাতি বা সম্প্রদায় হইতে সৈন্য নিয়োগের কোন উল্লেখই উপরোক্ত তালিকায় নাই। হয় ত তাহাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাহাদের সংখ্যাটা 'বিবিধ'এর মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। অথচ বাঙ্গালা সরকার আমাদের গর্ব্বিত হইতে বলিয়া দিয়াছেন!

বিক্রয় কর—

খুচরা পণ্য বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করিয়া দুই কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদেও কর্ত্তৃপক্ষ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভোটের জোরে সরকার যে এই বিলটিও পাশ করাইয়া লইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনাবশ্যক ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থার খাতিরে দেশের নিরন্ন, অসহায় অধিবাসীদের উপর বার বার ট্যাক্সের উপদ্রব করিয়া সরকার যে খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহা ত মনে হয় না। এই আইনটি যে দরিদ্রদের বিপক্ষেই নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহারাই যে বিব্রত হইবেন বেশী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আর একটি নূতন বিল—

বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে আর একটি নূতন বিলের নমুনা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। '১৯৪১ সালের বঙ্গীয় আইন সভার অধিকার ও ক্ষমতা রক্ষা বিল' নামে ইহা পরিচিত। বিলের নাম হইতে হঠাৎ তাহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে না, কিন্তু আসলে বিলটির উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের উপর এক আর দফা কর্ত্তৃত্বস্থাপন। বিলের কতকগুলি ধারায় বলা হইয়াছে যে, আইন সভার কার্য্যাবলীর যে সমস্ত রিপোর্ট সভাপতি কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইবে সেগুলি ছাপা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, সভাপতির কার্য্য পরিচালন, চরিত্র এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন ভুল বা মানহানিকর মন্তব্য করা যাইবে না। তৃতীয়ত, যে সমস্ত দলিলপত্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই সেগুলি আগে প্রকাশ করিয়া দিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই সব অপরাধের বিচারের জন্যও হয় ত স্বতন্ত্র আদালত গঠন করিতে হইবে। বাঙ্গালা সরকারের তূণে আরও কত অস্ত্র আছে জানিতে পারিলে বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত হইত।

পরলোকে অধ্যাপক পান্নালাল—

উত্তরপাড়া কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক পান্নালাল মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। কলেজে

পান্নালাল মুখোপাধ্যায়

তিনি ২৭ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন এবং স্বাস্থ্য-লাভের জন্য কিছুদিন হইতে মধুপুরে বাস করিতেছিলেন

পান্নালালবাবু বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অধ্যাপক ছিলেন; চিরকুমার থাকিয়া আজীবন বিদ্যাচর্চ্চায় কাল কাটাইয়াছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও ক্যালকাটা ওল্ড ক্লাবের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য্যে ছাত্র,বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত সকলেরই তিনি প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা একজন খাঁটি অধ্যাপক হারাইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজন ও গুণমুগ্ধদিগকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জানাইতেছি।

যুদ্ধে বৃটেনের দৈনিক ব্যয়—

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের বর্ত্তমানে দৈনিক প্রায় সতর কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নাকি এরূপ ব্যয় আর হয় নাই। এরূপ ব্যয়াধিক্য হইলে যে ধার ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আমেরিকার নিকট ৮৪৪ কোটি টাকা ঋণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, এই টাকায় দিন পঞ্চাশেকের কাজ চলিবে। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন স্বর্ণ বন্ধক রাখিয়া এই ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া আমেরিকা প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু লড়াই যে রকম গজগমনে চলিয়াছে তাহাতে পঞ্চাশ দিনে তাহার কোন সুরাহা হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। ততঃ কিম্?

চিকিৎসা-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত—

বাঙ্গালার প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মিলনের খুলনা অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ সুবোধ দত্ত মহাশয় যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রবীণ চিকিৎসকদের গ্রামে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, উদীয়মান চিকিৎসকদের হাতে শহরের ব্যবসা ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের পল্লীগ্রামে যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে পল্লীগ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসকের উপদ্রব কমিবে, পল্লীবাসীরাও অল্পব্যয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবে। অপর পক্ষে প্রতিষ্ঠাপন্নদের অভাবে শহরে শক্তিমান তরুণ চিকিৎসকগণের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ মিলিবে। ইহা ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কৃতী সন্তানেরা ব্যয়বহুলতার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠে যোগ দিতে পারিতেছে না। ইহাও দেশের পক্ষে ক্ষতির কারণ। সভাপতি ডাঃ দত্ত যে সব সমস্যার ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার মীমাংসায় মনোযোগী হইতে বিলম্ব করা চিকিৎসকগণের পক্ষে উচিত হইবে না।

এবারের আদমসুমারি—

রাজনৈতিক কারণে গত আদমসুমারীতে হিন্দু জনসাধারণ সহযোগিতা করে নাই। ফলে হিন্দুরা বাঙ্গালায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া যে অবিচার ও কুবিচার লাভ করিতেছে তাহাতে এই প্রদেশে তাহাদের অবস্থাটা দিন দিনই করুণ হইয়া উঠিয়াছে। এবারের আদমসুমারীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া জনসাধারণের মনে যে সকল আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয়ব্যবস্থাপরিষদে স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদমসুমারির কতকগুলি ব্যয় নির্ব্বাহের অধিকার প্রদানের জন্য একটি বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, ভোটের জোরে গৃহীতও হইয়াছে। মন্ত্রীপক্ষ হইতে যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুদের মনের সন্দেহ নিঃশেষে দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, লোকগণনা কার্য্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান গণক নিযুক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিবেন। হয়ত বাঙ্গালা সরকারের অনুরোধ রক্ষিতও হইবে, কিন্তু তাহাতেই যে সমস্যার সমাধান হইবে তাহা আমরা মনে করি না।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বেতন—

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যে রকম মোটা বেতনের বরাদ্দ, পৃথিবীর কোন দেশেই ওই পদমর্য্যাদার অনুরূপ কর্ম্মচারীর এত মোটা বেতন নাই। অথচ আমরা সকলেই জানি যে, ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, তাই এখানে জনকল্যাণকর অনেক অনুষ্ঠানই অর্থাভাবে করা যায় না। ভারতের রাজস্বের অধিকাংশই ক্ষুধিত দরিদ্র কৃষক শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া আদায় করা হয়। অথচ এই রাজস্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ যায় ভারতীয় ঋণের সুদ জোগাইতে, আর এক-চতুর্থাংশ সামরিক বিভাগে। বাকী যা থাকে তাহার চল্লিশ

ভাগ ব্যয়িত হয় রাজস্ব আদায় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য; পাঁচ ভাগ শিক্ষা, আর যাহা তলানি পড়িয়া থাকে তাহা দিয়া কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদির হাস্যকর উন্নতি বিধানের চেষ্টা হয়। ভারতে জেলা-হাকিমরা সাধারণতঃ বারশ হইতে তিন হাজার টাকা মাসিক বেতন পান। বিভাগীয় কমিশনররা চারি হাজার পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের জন-কয়েক স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন পান। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর মাসিক বেতন ৮২২৲, অন্যান্য মন্ত্রীরা ৪৪০৲ এবং সেক্রেটারীরা ৩৭৫৲ টাকা পান। জাপানে ভারতীয় সিভিলিয়ানের তুল্য চাকুরিয়াদের বেতন ৩৩৪৲ টাকা। আর গ্রেটবৃটেনে ঐ শ্রেণীর চাকুরিয়াদের বেতন ৭৭০৲ হইতে ১১০০৲ টাকার মধ্যে। ভারতে ইংরেজ চাকুরিয়াদের বেতনই সব নহে। তাঁহারা বহু প্রকার ভাতা পাইয়া থাকেন—ছুটিতে বিলাত যাওয়া-আসার খরচা ও ভাতা, বাড়ী ভাড়া, সদরে থাকিবার ভাতা, স্থানীয় ভাতা ইত্যাদি। ইহার উপর ছুটি ও পেন্সনের দরুণ ব্যবস্থা ত আছেই। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা আইন করিয়া পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীকে না খাইয়াও রাজস্ব জোগাইতে হইবে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রতিপালনের জন্য।

ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন চেষ্টা—

আমাদের দেশের স্কুল কলেজে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পঠনপাঠন চলে তাহা ঐতিহাসিকদের মতে ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্যে সমাকীর্ণ; বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বই নতুন গবেষণার ফলে মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় কংগ্রেস ভারত-ইতিহাসের ভ্রান্তিপূর্ণ অংশ বর্জ্জন করিয়া একখানি নূতন ইতিহাস রচনার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্যর যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রায় নব্বই জন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের তত্ত্বাবধানে উক্ত ইতিহাসখানি সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যগোপন করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের দোষ ক্ষালন করিতে গিয়া কোন বিশেষ দল, জাতি বা সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি করিতে বসিলে তাহা হইবে আরও ভয়ানক। জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসে বহু কালিমা থাকে, সকল দেশেরই আছে এবং তাহার সঠিক বিবরণ হইতেই জাতির ক্রমোন্নতি বা অবনতির পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিকের নিকট সত্যের স্থান সকলের উপরে; সুতরাং যে সব মনীষীর উপর ভারত-ইতিহাস-রচনার ভার পড়িয়াছে তাঁহারা কখনই সত্যের অপলাপ হইতে দিবেন না, ইহাই আমাদের কামনা।

স্কাউটের কৃতিত্ব—

তৃতীয় কলিকাতা বয় স্কাউট এসোসিয়েসনের প্রথম গ্রুপের রোভার স্কাউট শ্রীমান বিধু মোদক কিছুদিন পূর্ব্বে শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন্সে একজন মহিলা ও একজন পুরুষকে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা

শ্রীমান বিধু মোদক

করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহাকে একটি পদক উপহার দিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতিত্ব—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসবে এম্-এ. ও এম্-এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য যাঁহারা সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালী, এ সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার [illegible] ইংরেজী, শ্রীযুক্ত সমীরকুমার ঘোষ ইতিহাসে, শ্রীযুক্ত চপলেন্দু ভট্টাচার্য্য অর্থনীতি ও শ্রীযুক্ত কলাই সরকার রসায়নে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী।

বিহারে শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে যে এখনও পুরোভাগে বিদ্যমান, ইহাতে বাঙ্গালী জাতির বিশেষ গর্ব্বিত হওয়ার কথা সন্দেহ নাই। আমরা এই চারিজন বাঙ্গালীর কৃতিত্বে তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চয়—

বিগত ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬৬ কোটি ১৩ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮১ কোটি ১২ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বিল্ডিং সোসাইটিগুলির মারফত ৭৪ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য যে সকল কোম্পানী বীমার কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের মারফত ২০ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড, সাধারণ জীবনবীমা কোম্পানীগুলি দ্বারা ১৯ কোটি ৭ লক্ষ পাউণ্ড, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের মারফত ১৮ কোটি ৫৯ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড প্রভিডেণ্ট সোসাইটিগুলির মারফত ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'লণ্ডন চেম্বার অফ কমার্স জার্নেল' পত্রিকার মতে এই সঞ্চিত অর্থের বর্ত্তমানে ৪০০ কোটি পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া গত দশ বৎসরের শেষ ভাগে ইংলণ্ডের যে পরিমাণ জাতীয় ঋণ ছিল তাহার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চয় কত?

জাপ-ভারত বাণিজ্য—

সম্প্রতি 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্র ১৯৩৯ সালে জাপানের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় উক্ত বৎসরে জাপান হইতে বৃটিশ ভারতে মোট ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার ইয়েন মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছে। অপর পক্ষে জাপান বৃটিশ ভারত হইতে ১৮ কোটি ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার ইয়েনের পণ্য ক্রয় করিয়াছে। কাজেই ঐ বৎসর জাপ-ভারত বাণিজ্যে মূল্যের দিক দিয়া ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ইয়েন।

আসামের গভর্ণর সহ নিখিল আসাম ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনীর সভ্যগণ ফটো—বি, ব্যানার্জ্জী, শিলং

ভারতে ডাকমাশুলের হারবৃদ্ধি—

ভারতে অর্থসঙ্কটে জনগণ যখন বিশেষভাবে উৎপীড়িত, ঠিক সেই সময় ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে; সুতরাং আমাদের অর্থসঙ্কট যে শেষ ধাপে গিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত সরকার অত সব ভাবিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহারা অতি-রিক্ত বাজেটে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ভারতে ডাকমাশুলের হার নিম্নরূপভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

(১) ভারতে ডাক টিকিট ও ব্যবসায় সম্পর্কিত পত্রাদির হার প্রথম তোলায় এক আনা হইতে পাঁচ পয়সা। পরবর্ত্তী প্রতি তোলা পূর্ব্বের ন্যায় দুই পয়সাই রহিয়াছে

(২) বুক-পোস্ট-এর হার প্রথম আড়াই তোলা দুই পয়সার স্থানে প্রথম পাঁচ তোলা তিন পয়সার বর্দ্ধিত

হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রতি আড়াই তোলা পূর্ব্বের ন্যায় এক পয়সা আছে।

(৩) গ্রেট বৃটেন, নর্দার্ন আয়র্লাণ্ড, মিশর (সুদান সহ), প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন ও অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত দেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাকমাশুলের হার প্রথম এক আউন্স দশ পয়সা হইতে চৌদ্দ পয়সা। পরবর্ত্তী প্রত্যেক আউন্সের হার পূর্ব্বের ন্যায় চারি আনাই আছে।

(৪) ব্রহ্মদেশে প্রেরিতব্য পত্রাদির মাশুলের হার প্রথম তোলা ছয় পয়সা হইতে দুই আনা হইয়াছে। অতিরিক্ত প্রত্যেক তোলার হার পূর্ব্বের ন্যায় এক আনাই আছে।

ভারতের যে-কোন স্থানে—ব্রহ্মে, সিংহলে, আফগানিস্থানে ও তিব্বত-লাসায় প্রেরিত সাধারণ তার এক আনা ও জরুরি তারে দুই আনা অতিরিক্ত মাশুল ধার্য্য হইয়াছে।

রজনীমোহন কর—

আসামের পূর্ত্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব রজনীমোহন কর গত ৮ই নভেম্বর
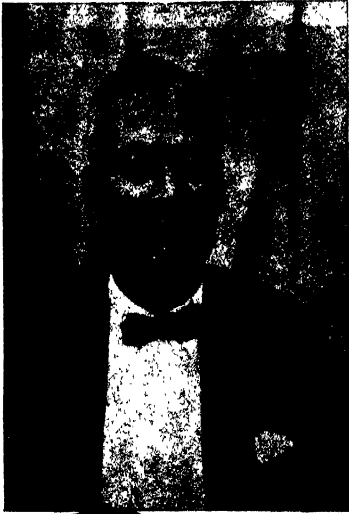
৺রজনীমোহন কর

কলিকাতা ৩২ রামনারায়ণ মতিলাল লেনস্থ বাসাবাটীতে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার পুটীজুরী গ্রামে তাঁহার বাসভূমি। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার্ব্বজনীন কার্ত্তিক পূজা—

কলিকাতা ৯নং ওয়ার্ডের সাঁঝের মজলিসের উদ্যোগে যথারীতি সপ্তম বার্ষিক সার্ব্বজনীন কার্ত্তিক পূজা হইয়াছিল।
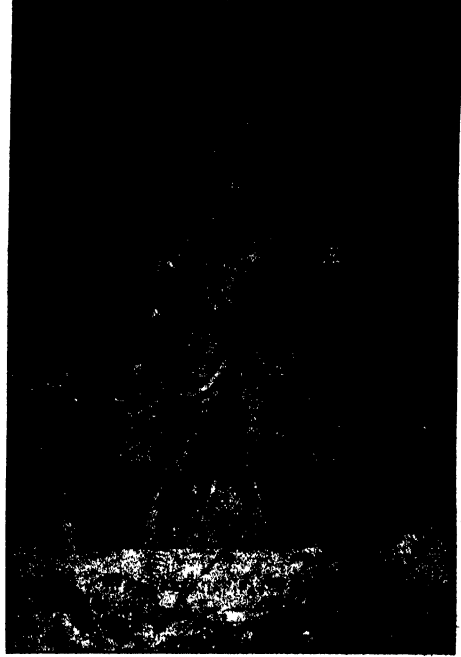
কার্ত্তিক পূজা

এবারকার বিশেষত্ব এই ছিল যে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-নেতা ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিমার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর জামসেদপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। এবার মাত্র তিনটি শাখার অধিবেশন হইবে—সাহিত্য, বৃহত্তর-বঙ্গ ও বিজ্ঞান। মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বরোদার রাজস্ব-সচিব রাজরত্ন শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়; সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও বৃহত্তরবঙ্গ শাখায় ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এখনও স্থির হয় নাই; সম্মেলন দুইদিন হইবে। এবারের সম্মেলনের 'প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তথায় ১৯৪০ সালে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য গ্রন্থরাজির একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। আমরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী—

বিহার সংস্কৃত ছাত্রী সম্মিলনের সভানেত্রী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী বিহারে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার, মহিলাদের জন্ত পৃথক পাঠ্য নির্ব্বাচন, সংস্কৃত এসোসিয়েসনে মহিলা প্রতিনিধি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন করিয়া সাফল্য

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তি—

বাঙ্গালা সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ, গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রাজবন্দীরা বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার জন্ত কতকগুলি দাবী জানান এবং দাবী পূরণ না করিলে অনশন ধর্ম্মঘট করিবেন বলিয়াও জানান। সরকার তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গত ২৫শে নভেম্বর পনর জন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। গত ২৯শে নভেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অনশন ধর্ম্মঘট করেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তিনি অসুস্থ থাকায় অনশনে তাঁহার স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক মনে করিয়া বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মুক্তিতে বিস্মিত না হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্য আমাদের চিত্তকে চিন্তিত করিয়াছে। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া দেশের কাজে যোগদান করুন ইহাই আমাদের কামনা।

অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য—

কলিকাতা ৯নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটের শ্রীমতী উমাসুন্দরী মিত্র পানের মসলা দিয়া যে বাগান বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন তাহার চিত্র আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বে আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে নানারূপ শিল্পকার্য্য প্রচলিত ছিল; এখন সেগুলি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।
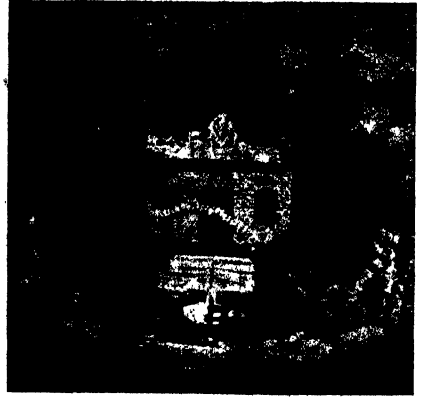
পানের মসলার বাড়ী

এ যুগে শ্রীমতী মিত্র বহু পরিশ্রম করিয়া যে পানের মসলার বাগান বাড়ী প্রস্তুত করেন, তজ্জন্ত তিনি সকলের ধন্তবাদার্হ।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—

অবসরপ্রাপ্ত স্কুলইন্সপেক্টার ও সাহিত্যসেবী বাঁকুড়া-নিবাসী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর

৺প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সুমধুর ব্যবহার ও চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্ত প্রমথবাবু সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

রাঁচি লেক—(রাঁচীর একটি দৃশ্য)   ফটো—অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁচী

সাগর-পারের ছেলের দল   ফটো—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, [illegible]
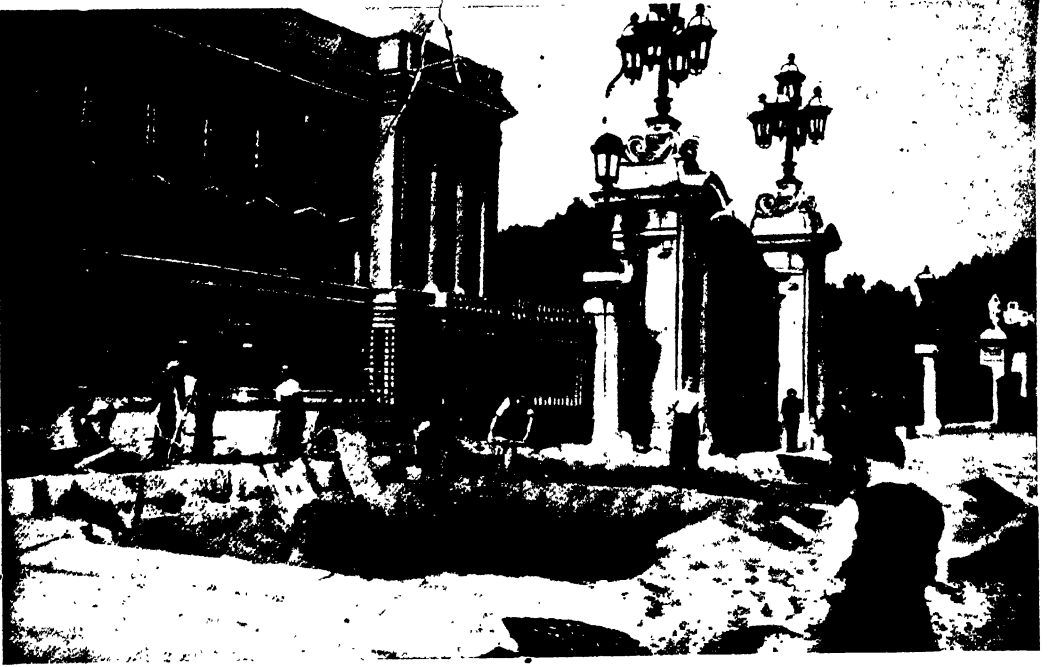
বিলাতে বাকিংহাম প্রাসাদে বোমা পড়ার পরের অবস্থা—এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

কলিকাতার গঙ্গায় (বাগবাজারে) খড়ের নৌকাসমূহে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য। ইহাতে কয়েক লক্ষ টাকার খড় নষ্ট হইয়াছে

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল ঃ

আই এফ এ পরিচালিত কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল খেলার ফাইনালে মুসলিমদল অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ১-০ গোলে হিন্দুদলকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। প্রতিযোগিতার কোন দিনের খেলাতেই ইণ্ডিয়ানদের চারদিন ব্যাপী খেলার মধ্যে যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায়। তিনদিনের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং চতুর্থ দিনে হিন্দুদল ২-০ গোলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পরাজিত করে।

বুচি (বোম্বাই) ও সোমানা নিজদলের পক্ষ থেকে গোল করেন। এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে চার

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজিত হিন্দু দল

দর্শক সমাগম হয় নাই। অসময় হ'লেও এই প্রতিযোগিতার যে গুরুত্ব ছিল তা অধিক সংখ্যক ক্রীড়ামোদিদের অনুপস্থিতিতে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সারা প্রতিযোগিতায় একমাত্র হিন্দু বনাম এ্যাংলো দিনের খেলাতে প্রতিদিন হিন্দুদলের খেলোয়াড়দের পরিবর্ত্তন করতে দেখা যায়। হিন্দুদলে গোলরক্ষক কে দত্ত অসুস্থ থাকায় প্রথম থেকেই খেলায় যোগদান করতে সক্ষম হন নি। মনোনয়ন কমিটি হিন্দুদলের খেলোয়াড় মনোনয়নে যে

বিশেষ ফ্যাসাদে পড়েছিলেন তা প্রতিদিনের ব্যাপারেই বুঝতে পারা গেছে। এত করেও তাঁদের ত্রুটি ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বৎসর প্রথম আরম্ভ—সূচনাতেই যে সব ঘটনার অবতারণা হয়েছে তাতে ক্রীড়ামোদিরা এর ভবিষ্যৎ খুব বেশী আশাপ্রদ ব'লে মনে ক'রছেন না।

রেফারীর খেলা পরিচালনার অক্ষমতায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের কয়েকজন অযথা বলপ্রয়োগে, খেলার বিধি আইন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে খেলার মাঠে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের খেলোয়াড় সুলভ সৌজন্যের অভাবের ফলে হিন্দুদলের কয়েকজন জখম হন। জয়রাম গুরুতর আঘাত পাওয়ার ফলে হাসপাতালের সাহায্য লন। এ সমস্ত ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য রেফারী নিজের ক্ষমতা এতটুকুও প্রয়োগ করেন নি। রেফারীর দুর্ব্বলতা এবং শীতের মরসুমের সুযোগই বোধ হয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের এতখানি উৎসাহিত করেছিল।

মুসলিম দল ১-০ গোলে ইউরোপীনদের পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে। ফাইনাল খেলায় হিন্দু ও মুসলিমদলের কোন পক্ষই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে গোল করতে অক্ষম হওয়ায় ঐ দিনই শেষ মীমাংসার জন্য অতিরিক্ত সময় খেলান হয়। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাবু দলের বিজয়সূচক গোলটি করেন।

ক'লকাতায় প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার ফাইনালের শেষ মীমাংসার জন্য প্রথম দিনেই অতিরিক্ত সময় খেলানর ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে আই এফ এ বোধহয় কোনদিন করেন নি। খেলার গুরুত্ব রক্ষার জন্য ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে অতিরিক্ত সময়ের আমরা যেমন পক্ষপাতী নই, দর্শক এবং সমর্থকরাও তেমনি নন্। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যেখানে, সেখানে এরূপ ঘটনা যে একটা ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেখানে জাতিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের বিচার সেখানে যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা হওয়াই উচিত। বিধি ব্যবস্থা কঠোর হ'লেও তা যদি যথাযথ ভাবে পালনে কর্ত্তৃপক্ষ পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না লন তাহলে খেলায় পরাজয় স্বীকার করেও কোন পক্ষই অগৌরব মনে করে না।

প্রতিযোগিতাটি ঐদিনেই অতিরিক্ত সময়ে না খেলিয়ে অমীমাংসিত রাখলে বোধহয় কোন পক্ষের কোনরূপ বলবার থাকত না। সিন্ধুর পেণ্টাঙ্গুলার এবার অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'য়েছে অথচ এই প্রতিযোগিতা বহুদিনের। যে কারণে একদল ভিন্নদিনে খেলায় যোগদান করতে অক্ষম এবং একমাত্র প্রশংসাপত্র ছাড়া খেলার জয়পরাজয়ের উপর কোনরূপ ট্রপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না সে কারণে কর্ত্তৃপক্ষ অনায়াসেই ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন। এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার তাহলে অপমৃত্যু ঘটত না।

মুসলিম—আলীহোসেন; সিরাজুদ্দিন, জুম্মাখাঁ; বাচ্চিখাঁ, রসিদখাঁ ও মাসুম; নূরমহম্মদ, করিম, রসিদ, সাবু ও আব্বাস।

হিন্দু—ডি সেন; পি চক্রবর্ত্তী, আর মজুমদার; এ নন্দী, প্রেমলাল ও জয়রাম; এস গুঁই, স্বামীনাথম, সোমানা, বুচি ও এস নন্দী।

রেফারী—সি এস সি টেলার

ক্রিকেট ঃ

মহারাষ্ট্র—৬৭৫
বোম্বাই-

সুদীর্ঘ সাড়ে চারদিনব্যাপী খেলার পর গতবারের রঞ্জি-ট্রপি বিজয়ী মহারাষ্ট্র মাত্র ২৫ রানে বোম্বাইকে পরাজিত ক'রেছে। প্রথম ইনিংস শেষ হ'তেই সাড়ে চারদিন সময় লাগে তাই দ্বিতীয় ইনিংস খেলার প্রয়োজন হয়নি। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এই খেলাটি বহু পুরাতন রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছে। মহারাষ্ট্র টসে

ভাণ্ডারকার

ট্রসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে নামে। সূচনা খুব ভাল হ'য়েছে। মহারাষ্ট্রের ওপনিং ব্যাটসমান ভাণ্ডারকার ও সোহানী

২০৪ ক'রে রঞ্জিট্রপি ম্যাচে প্রথম উইকেটের রেকর্ড স্থাপন করেন। গত বছর এঁরাই ইউ পির বিরুদ্ধে ১৮৩ রান ক'রে রেকর্ড ক'রেছিলেন। ৯১ রান ক'রে ভাণ্ডারকার হাভেওয়ালার বলে তাঁরই হাতে ধরা দিলেন আর সোহানী ১২০ রান ক'রে হাকিমের বলে এল বি ডব্লু হ'লেন। তাঁর খেলায় চার ছিল ১৩টা। হাজারে যখন ৭৬ রান ক'রেছেন হিন্দেলকার তাঁকে উইকেটের পিছনে লুফলেন। প্রবীণ অধিনায়ক দেওধর দিনের শেষে ৮০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। মহারাষ্ট্রের চার উইকেটে রান উঠল ৩৮৫। বোম্বায়ের ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে, তাঁরা চারটে ক্যাচ নিতে পারেনি।

দেওধর

দ্বিতীয় দিনে ক্যাপ্টেন দেওধরের খেলা আর সকলকে ম্লান ক'রে দিয়েছে; উনপঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় সংস্কৃতের অধ্যাপক দেওধর এখনও তরুণের মত শক্তি রাখেন। উইকেটের চতুর্দ্দিকে পিটিয়ে চমৎকারভাবে খেলে তিনি নিজস্ব ২৪৬ রানের মাথায় রঙ্গনেকারের বলে হিন্দেলকারের হাতে ধরা দিলেন। তাঁর খেলার আর এক বিশেষত্ব সহযোগিদের যতদূর সম্ভব দূরে রেখে নিজে সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া। তিনি আউট হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬১৫ রানে। গত বৎসর মহারাষ্ট্র বরোদার বিরুদ্ধে ৬৫১ রান ক'রে এক ইনিংসের রেকর্ড ক'রেছিলো। বোম্বায়ের ফিল্ডিং প্রথম দিনের চেয়েও খারাপ হ'য়েছে। হিন্দেলকার ও হাকিম উভয়ে ৩টি ক'রে ক্যাচ ফস্‌কেছেন; আরো দুটি ক্যাচ অপর লোকে।

মহারাষ্ট্রের এই অত্যধিক রানসংখ্যার বিরুদ্ধে বোম্বাই ব্যাট ক'রতে নামলো আর কোন রান না হবার আগেই হিন্দেলকার আউট হ'লেন। হিন্দেলকারের আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত ছিলো। বোর্ডে কোন রান উঠবার আগেই গোল্ডেনের মত খেলা শেষ হ'ল। তৃতীয়দিনে বোম্বাই ৩ উইকেট হারিয়ে রান তুললে ২১৫। কেনী আর বিজয় যথাক্রমে ৬৭ ও ৬৯ ক'রে সেদিনের মত নট আউট রইলেন। বোম্বায়ের খেলায় প্রভৃতি এই ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়াতে যদি কারো কুন্ঠিত থাকে তাহ'লে তা কেনীর প্রাপ্য। পুরো দু'দিন ফিল্ডিং করার পর কোন টীমের ব্যাটিংয়ে প্রায় সমান প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতা থাকে না। বিশেষত ভারতবর্ষে যেখানে দীর্ঘদিনব্যাপী খেলা খুব কমই হ'য়ে থাকে। কেনীর অদ্ভুত ধৈর্য্য; তাঁকে যতরকম লোভনীয় বল দেওয়া যেতে পারা যায় তা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত করা যায় নি। নব্বুই মিনিটে মাত্র দু রান ক'রেছেন। মার্চ্চেণ্ট তাঁর স্বাভাবিক খেলা দেখিয়েছেন। চতুর্থ দিনের খেলায় ৬ উইকেটে বোম্বায়ের রান সংখ্যা উঠলো ৫০১। ২০৩ মিনিট নির্ভীকভাবে খেলে মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব সেঞ্চুরী ক'রলেন; চার ছিলো ৮টা। আর ৯ রান ক'রে মার্চ্চেণ্ট হাজারের বলে আউট হ'লেন। ইব্রাহিমের ৬১ রানও উল্লেখযোগ্য। তরুণ খেলোয়াড় রঙ্গনেকার উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলে ১৬০ রান ক'রে নটআউট রইলেন। বোম্বাই অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছে। পরদিন বোম্বাই সব উইকেট হারিয়ে ৬৫০ রান তুললে। মহারাষ্ট্র ২৫ রানে জয়ী হ'ল। উদীয়মান খেলোয়াড় রঙ্গনেকারের খেলা এই ম্যাচের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রঙ্গনেকার ৩৬৫ মিনিট খেলে ২০২ রানের মাথায় সারবাটের বলে সোহানীর কাছে ধরা দিলেন, তার খেলায় চার ছিলো ২২টা। এই খেলাটিতে বোম্বায়ের

মার্চ্চেণ্ট

খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার উচ্চপ্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। হিন্দেলকার একটু ধৈর্য্যের সঙ্গে খেললে বোম্বায়ের আশাতীত

করার আশা ছিলো। শেষের দিকে হাতেওয়ালাও বিশেষ অস্থির হ'য়ে পড়েন। মহারাষ্ট্রের সমর্থকরা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি যে বোম্বাই তাঁদের এত বেশী রানের বিরুদ্ধে প্রায় সমান সংখ্যক রান তুলতে পারবে। কিন্তু পঞ্চমদিনের খেলায় মহারাষ্ট্রের পরাজয়ের সম্ভাবনাও কম ছিলো না। মহারাষ্ট্রের ফিল্ডিং বোম্বায়ের চেয়ে ভাল। প্রথম শ্রেণীর বোলারের অভাব খেলাটিতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

বাঙ্গলা :—২৫৭ ও ২৬২ (৩উই :)

বিহার :—২১৭ ও ৫৮ (৬ উই :)

বাঙ্গলা প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকার ফলে জয়লাভ ক'রেছে। বাঙ্গলা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৫৭ রান করে। রামচন্দ্র ৫১, বেরেণ্ড ৫০, সুশীল ৩৭, গণেশ ৩০ এবং কার্ত্তিক ৩১ রান করেন। বিহারের এস ব্যানার্জ্জি মাত্র ৭ রানে তিন উইকেট পান। বিহার প্রথম ইনিংসে ২১৭ রান করে। সানজানা ৫৪, বি সেন ও বাগচী উভয়ের ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। বেরেণ্ড ৫ উইকেট পেয়েছেন ৬৮ রানে। তৃতীয় দিনে বাঙ্গলার ৩ উইকেটে ২৬২ রান উঠবার পর ক্যাপ্টেন ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করেন। জব্বর ৬৮, টি ভট্টাচার্য্য ৬২, নির্ম্মল ৬১ রান। টি ভট্টাচার্য্য দুর্ভাগ্যবশতঃ রান আউট হ'য়ে যান। নির্ম্মলের খেলা বেশ ভাল হ'য়েছিলো। জব্বর ৬৮ রান ক'রলেও একাধিকবার আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

বেরেণ্ড · কার্ত্তিক বসু

বিহারের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৮ রান হবার পর সময়াভাবে খেলা শেষ হয়। বেরেণ্ড চার উইকেট পান ২৪ রানে। বিহার ফাষ্ট বলের বিরুদ্ধে মোটেই খেলতে পারেনি যদিও বেরেণ্ডের বল ততো ফাষ্ট নয়। বাঙ্গলা টীম থেকে গাবিন্স এবং কে রায় উভয়কেই বাদ
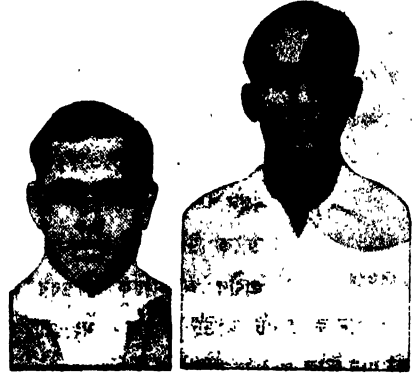
জব্বর · নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়

দেওয়ার প্রয়োজন, গতবার ইউ পির কাছে বাঙ্গলা হেরে যায়। ক্লাব অথবা জাতি বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে নিরপেক্ষ টীম মনোয়ন করা উচিত। উপরোক্ত দুটি খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কামাল এবং মোহনবাগানের এ দেবকে মনোনয়ন কমিটি স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারেন। কে রায়ের উইকেট কিপিং নিকৃষ্ট এবং ব্যাটিং নিকৃষ্টতম। একাধিক বার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুতরাং মনোনয়ন কমিটির উচিত একজন ভাল ব্যাটস্‌ম্যানকে ঐ স্থানে নেওয়া।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

এবৎসর বোম্বায়ে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য একশ্রেণীর জনসাধারণ বিশেষ চেষ্টিত হ'য়েছেন। তাঁদের মতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যখন নাকি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কারাবরণ ক'চ্ছেন সেই সময় এই শ্রেণীর আমোদ প্রমোদ করা উচিত হবে না। বোম্বাই কংগ্রেসও এই মত পোষণ করছেন এবং প্রকাশ্য ভাবে চেষ্টাও কচ্ছেন যাতে খেলা অনুষ্ঠিত না হয়। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট যদিও বলেচেন যে, এই সময় এইরূপ আমোদ প্রমোদ করা উচিত নয় তবে তাঁরা জনসাধারণের আমোদ প্রমোদে বাধা দিতে চান না এবং এই প্রতিযোগিতা চলা উচিত কি না তা কর্ত্তৃপক্ষ এবং জন-

সাধারণের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। বোম্বায়ের একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং কতকগুলি প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাঁদের সমর্থকরা খেলা বন্ধ করবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হ'য়েছেন।

আমরা যতদূর জানি বোম্বায়ে সিনেমা এবং অন্যান্য সকল আমোদ প্রমোদই বেশ পূর্ণ উদ্যমে চলছে। একশ্রেণীর জনসাধারণ এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ক্রিকেটের উপর এইরূপ অহেতুক করুণার কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। ক্রিকেট অন্যান্য আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা মোটেই ব্যয় বহুল নয় অথবা ইহা আমোদ প্রমোদের চূড়ান্ত নয়। যাঁহারা এবারের পেণ্টাঙ্গুলার বন্ধ করার পক্ষপাতী তাহারাও ইহার বিরুদ্ধে 'আমোদ প্রমোদ করা উচিত নয়' ছাড়া আর কোন যুক্তিই দেখান নাই। পিকেটিং করবার ভয়ও নাকি দেখান হয়েছে। জানিনা ইহাই হয়ত সত্যাগ্রহের নবতম টেক্‌নিক্। হিন্দু জিমখানার ৭০ জন সদস্য নাকি নোটিশ দিয়েছেন যে, যদি পেণ্টাঙ্গুলার কমিটি খেলা বন্ধ না করেন তাহা হলে হিন্দুরা খেলায় যোগদান করবে না। ১৩ই ডিসেম্বর হিন্দু জিমখানার সদস্যরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবেন। পেণ্টাঙ্গুলার কমিটি পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও খেলা চালানোর পক্ষপাতী তবে হিন্দু জিমখানাকে তাঁদের সদস্যদের মতামত জানবার জন্য সময় দিয়েছেন।

আমরা বোম্বায়ের আমোদ প্রমোদের ব্যবসায়ীদিগকে সাবধান হ'তে বলি। হুজুগের তো মাত্রাজ্ঞান কিছু নাই।

নন্দপ্রসাদ শীল্ড ফাইনাল ঃ

বাঁকুড়া ফুটবল এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক পরিচালিত নন্দপ্রসাদ শীল্ডের ফাইনালে মেদিনীপুর কলেজ টীম ২-১ গোলে চন্দননগর বয়েজ ক্লাবকে পরাজিত করেছে। খেলাটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৩৩টি টীম যোগদান করে।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দল ২-০ গোলে হিন্দু দলের নিকট পরাজিত হয়েছে

শীতলা চ্যালেঞ্জ কাপ ঃ

উক্ত কাপের ফাইনালে হিমায়হাটা ক্লাব ৪-১ গোলে ভাঙ্গুল বয়েজ ক্লাবকে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

নওনগর—১১৭ ও ১৪০

পশ্চিম ভারত রাজ্য—৫৭ ও ২০৫ (৮ উইকেট)

পশ্চিম ভারতরাজ্য দুই উইকেটে নওনগর দলকে পরাজিত করেছে।

নওনগরের প্রথম ইনিংসে কোলা ৩৫ ও এস ব্যানার্জ্জি ১১ রান করেন। নেহাল চাঁদ ৩৮ রানে ৭টি উইকেট লাভ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও পশ্চিম ভারতরাজ্য দলের আকবার খাঁ ৩০ রানে ৩টি, নেহাল চাঁদ ৪৬ রানে ৩টি ও পৃথ্বিরাজ ৩৬ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেন।

পশ্চিম ভারতরাজ্যের প্রথম ইনিংসে এস ব্যানার্জ্জি ২৬ রানে ৫, ও বিন্নু মানকদ ১৮ রানে ৩ উইকেট পান।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল বিজয়ী মুসলিম দল

পশ্চিম ভারতরাজ্যের দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে রান হয় ২০৫। পৃথ্বিরাজ ৫৩, ঠাকুর সাহেব ৪২।

দিল্লী—১১১ ও ১০৬

দক্ষিণ পাঞ্জাব—২৭৫

দক্ষিণ পাঞ্জাব এক ইনিংস ও ৫৮ রানে দিল্লী এগু ডিষ্ট্রিক্টকে পরাজিত করেছে। দক্ষিণ পাঞ্জাবের অমরনাথ ১০৫ রান করেন। আমীর ইলাহী ৩১ রানে ৫ এবং মহারাজা ২৫ রানে ৩ উইকেট পান।

সিন্ধু—২৩৯ ও ১৬৮ (৭ উইকেট)

পশ্চিম ভারত রাজ্য—২৫০ ও ১৫৯ (৪ উইকেট)

পশ্চিম ভারত রাজ্য রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় ছয় উইকেটে সিন্ধু ক্রিকেট দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম ইনিংসে সিন্ধুর দাউদ খাঁ ৬১, কিষেণ চাঁদ ৫০ ও আব্বাস খাঁ ৪৭ রান করেন। পশ্চিম ভারত রাজ্যের সৈয়দ আমেদ ৭৮ রানে ৫টা ও নেহাল চাঁদ ৭১ রানে ৪টা উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে কুমারুদ্দীনের ৬৬, গিরিধারীর ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের প্রথম ইনিংসে পৃথ্বিরাজ ৫১, উমার ৫০, সৈয়দ আমেদ নট্ আউট ২৪ রান করেন। সিন্ধুর গিরিধারী ৩৭ রানে ৩, মোবেদ ৪৮ রানে ৩ উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে মানাভাদারের নবাব ৬৯, উমার নট্ আউট ৪০ রান করেন।

টেনিস ঃ

উত্তর ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের সিঙ্গলস ফাইনালে গাউস মহম্মদ যুগোস্লোভিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় কুকুলজেভিককে ৭-৯, ৬-৭, ৬-১, ৬-৩ গেমে পরাজিত ক'রেছেন।

ডবলসে সোহানী ও সোনী ১২-১০, ৪-৬, ৭-৫, ৭-৫ গেমে কুকুলজেভিক ও ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে কুকুলজেভিক ও মিসেস কোসেনস ৭-৫,

২-৬, ৬-৪ গেমে রমারাও ও মিসেস কাওওয়ালাকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী কাণ্টোইসোন্ধী, কুমারী

কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কলিকাতার ৬নং ওয়ার্ডের কর্পোরেশন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

শ্যামা কেশরকে ৭-৫, ৬-৩ গেমে পরাজিত ক'রে বিজয়িনী হ'য়েছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে বাঙ্গলার একনম্বর খেলোয়াড় দিলীপ বসু পাঞ্জাবের একনম্বর খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেন। এই খেলার কিছুদিন আগে ইফতিকার গাউসকে পরাজিত ক'রে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। দিলীপ সেমি-ফাইনালে কুকুলজেভিকের কাছে পরাজিত হন।

সিলোন টীম ঃ

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গুলি সিলোন টীমের হ'য়ে ভারতবর্ষে খেলতে আসছেন। জয়া উইকরেমা (ক্যাপ্টেন), পোরিট, ফার্নেণ্ডো, এ গুণরত্নে, এম গুণরত্নে, হুবার্ট, জয়াসুন্দেরা, জিলা, নবরত্নে, রবার্ট, সোলোমনস্, ওয়াহিদ, ওয়ালবেঅফ্। বোম্বায়ে যে অল-ইণ্ডিয়া টীম সিলোনের বিরুদ্ধে খেলবেন তাঁদের নাম প্রকাশিত হ'য়েছে। জেকব (ক্যাপ্টেন), ইঞ্জিনিয়ার, ব্যানার্জ্জি, সি এস নাইডু, হাজারে, সৈয়দ আমেদ, ভি এম মার্চ্চেণ্ট, মানকদ, রঙ্গনেকার, ইব্রাহিম এবং মাস্তক আলি। টীম মনোনয়ন কমিটি তরুণ খেলোয়াড়দের টীমে অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন খুব আশার কথা। তবে ইঞ্জিনিয়ারের মত একেবারে নূতন খেলোয়াড়কে স্থান না দিয়ে ভাণ্ডারকার কিম্বা সোহনীকে দেওয়া উচিত ছিলো।

মিস্ এলিস মার্ব্বেল ঃ

উইম্বিলডন ও আমেরিকান লন্ টেনিস সিঙ্গলস বিজয়িনী মিস্ এলিস মার্ব্বেল পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়ের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে নিউইয়র্কস্থ ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ ও বিল টিলডেনের সঙ্গে তিনি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন। এ সংবাদ টেনিস মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বাজ, পেরী এবং অপরাপর টেনিস খেলোয়াড়দের মতই মিস্ মার্ব্বেল যে পেশাদার খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হবেন এ গুজব কিছুদিন পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে সংবাদ ভিত্তিহীন বলেই অস্বীকার করা হয়েছিল।

মিস মার্ব্বেলের শারীরিক গঠন, খেলার নিখুঁত ভঙ্গিমা ও ক্রীড়াচাতুর্য্য সত্যই যে নারীজাতির আদর্শনীয় তা সকলেই

মিস্ এলিস মার্ব্বেল

একবাক্যে স্বীকার করেন। পুরুষের পক্ষে আদর্শ খেলোয়াড় হিসাবে যতখানি গুণ থাকা প্রয়োজন তা মিস্ মার্ব্বেলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ামসীপের ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হ'ল।

পুরুষ সিঙ্গলস :

ইণ্ডিয়ান ইণ্টার ন্যাশানাল এবং বোম্বাইয়ের ১নং খেলোয়াড় কে এইচ কাপাডিয়া ২১-১৭, ১৮-২১, ২১-১০, ১২-২১, ২-১৮ গেমে ভূতপূর্ব্ব ইংলিশ ইণ্টার ন্যাশানাল বোম্বাইয়ের 'ষ্টার' খেলোয়াড় আর ই মরিটনকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস :

মিস্ এ দাস ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১৮ গেমে আর বাগকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলস্ :

এস ব্যানার্জ্জি ও আর হোসেন ২১-২০, ২১-১৯, ২১-১৯ গেমে মরিটন ও ভাসিনকে পরাজিত করেন।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

'সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল সময়াভাবে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। হিন্দুরা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রে ৩৩২ রান তোলে। ক্যাপ্টেন নওমল করেন ১৭০ আর গোপাল দাস ৫৯। মুসলীমরা এর উত্তরে ২৪১ রান করে। আব্বাস খাঁ ১ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দুদের ৭ উইকেটে ২০৪ হবার পর নওমল ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করেন। কিষেন চাঁদ করেন ৮৪। খেলা শেষ হবার ২১০ মিনিট আগে ২৯৬ রান পিছনে প'ড়ে মুসলীমরা ব্যাট ক'রতে নামলো। ৭ উইকেটে রান উঠলো ১৫৮। মুসলীমরা নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা পেলো। একমাত্র উইকেট কিপার ছাড়া হিন্দুদের বাকী দশজন খেলোয়াড়ই বল ক'রেছেন। ৫।১২।৪০

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সন্ধ্যাশঙ্খ"—২৲

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"—১৷৹

বারোয়ারী উপন্যাস "কো-এডুকেশন"—২৲

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পতিতা ধরিত্রী"—১৷৹

নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্ত্তি"—৬৲

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মুক্তবেণী"—১৷৹

দীনেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "নীলযমুনা"—৷৹

ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "ভারত সম্রাট"—১৲

সর্ব্বরঞ্জন বরাট প্রণীত নাটক "বড়বাবু"—১৷৹

সুরেশচন্দ্র পাল প্রণীত "জাগরণী"—২৲

শ্রীজিতেন্দ্রলাল মৈত্র প্রণীত "মেঘনগরের অন্ধকারা"—১৲

আবদুল কাদের প্রণীত "ক্রুসেডের ইতিহাস"—।৷৹

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রণীত "গীতাঞ্জলির ভাবধারা"—১৲

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পথের ধূলোর পদ্মরাগ"—২৲

সুকুমার ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "জ্ঞানদাস রচিত যশোদার বাৎসল্য লীলা"—৸৹

মহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রণীত "শিরোপা"—৷৹

রাধারমণ দাস প্রণীত "মৃত্যু রণ"—৸৹

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও ধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী প্রণীত "এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার"—।৶৹

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতা পুস্তক "সাহানী"—২৲

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত "নারী" ১৲

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দেহালী"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

মাঘ—১৩৪৭
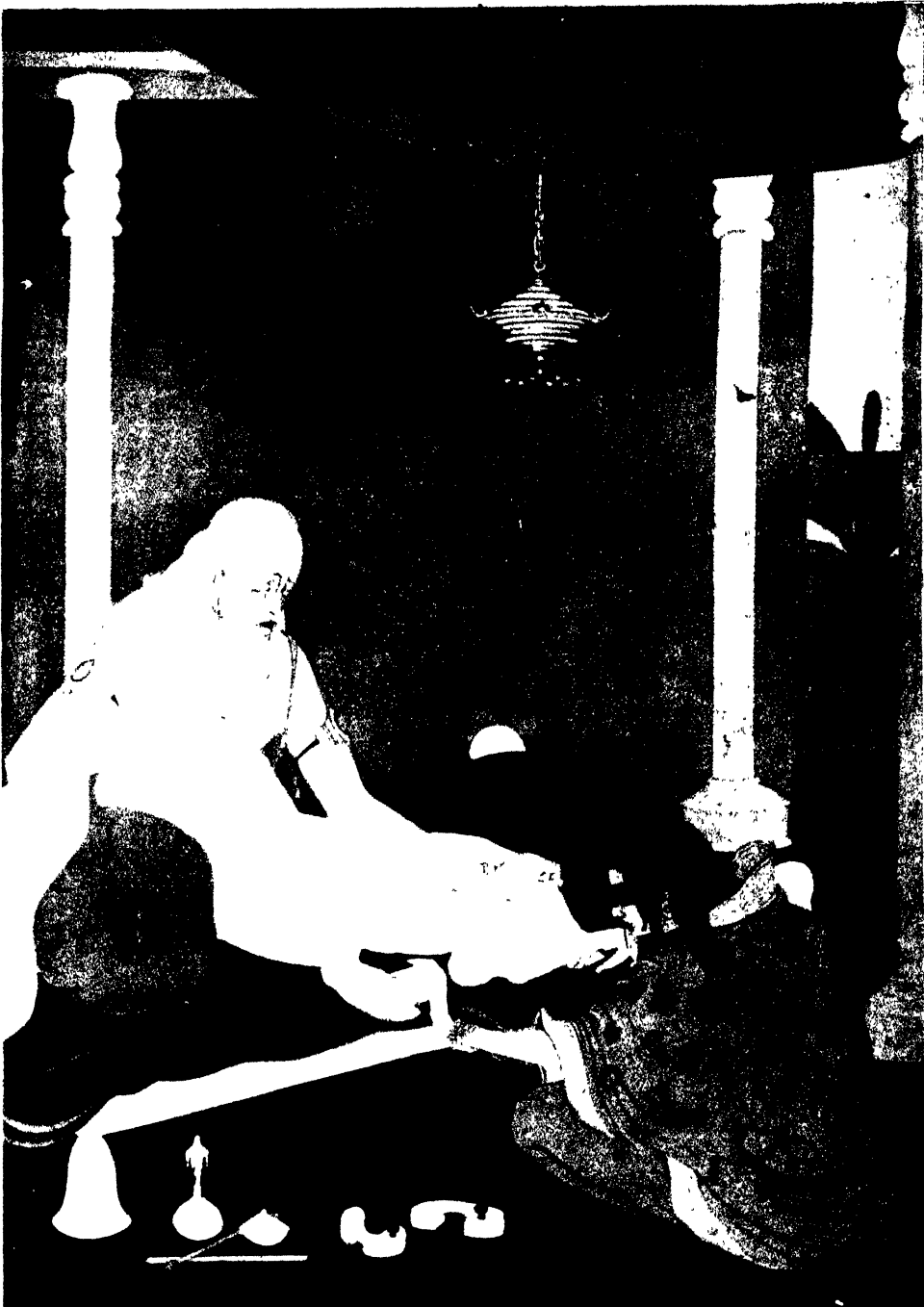
দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ

১

একটি প্রচলিত কথা আছে—"জপে তপে কি ফল ভাই, মরতে জানলে হয়"। কথাটি সরল হইলেও অত্যন্ত সারগর্ভ। জপ, তপস্যা, সদাচার, জীবনের সকল প্রকার সাধনা—সবই বিফল হয়, যদি মানুষ মরিতে না জানে। আর যে মরিতে জানে তাহার পক্ষে পৃথক্ ভাবে কোন সাধনাই আবশ্যক হয় না। এমন কত সাধকের ইতিবৃত্ত পুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায়—যাঁহারা সমগ্র জীবন কঠোর নিয়ম ও উগ্র সাধনায় অতিবাহিত করিয়াও মৃত্যুকালে লৌকিক ভাবনার প্রভাবে মরণান্তে ঐ ভাবনার অনুরূপ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টগতি লাভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এমন লোকের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যাঁহারা জীবিতকালে অতি সাধারণভাবে অবস্থান করিয়াও প্রাণত্যাগের সময় দৃঢ় ভাবনাদির ফলে তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মরণোত্তর গতি মরণকালীন ভাবনার উপর নির্ভর করে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাবভাবিতঃ॥

—গীতা—৮।৬

মনুষ্য যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করে, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সদা সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়। রাজা ভরত মৃত্যুকালে মৃগশিশুকে ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়া হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। এইজন্য সকল দেশেই আস্তিক সম্প্রদায়ে মুমূর্ষুর সাত্ত্বিক ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া সংরক্ষিত রাখিবার জন্য মরণকালে নানাপ্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার উদ্ভাবন হইয়াছে। মুমূর্ষুর দেহকে অশুদ্ধ ও অপবিত্র

স্পর্শ হইতে মুক্ত রাখা, ভগবদ্‌ভাব ও অন্য প্রকার সদ্‌ভাবের উদ্দীপক বচনাবলী উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শ্রবণ করান, সাধুজনের সংস্পর্শ, সদ্‌ভাবে পূর্ণ হইয়া তাহার সমীপে সাধারণ লোকের অবস্থান—এই সকল উপায় এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুকালীন ভাবনার এই প্রকার অসাধারণ প্রভাব আছে বলিয়াই যাহাতে ঐ সময়ে শুদ্ধ ভাবনা আয়ত্ত করা যায় তাহা প্রত্যেক কল্যাণকামীর শিক্ষা করা আবশ্যক। সমস্ত জীবনের সমগ্র চেষ্টা যোগ্য উপদেষ্টার নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ এক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে মনুষ্য নিশ্চয়ই মরণের সময় ভগবৎ-কৃপায় ইষ্ট ভাবনা আয়ত্ত করিতে পারে এবং মরণের পর তদনুরূপ গতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। উপাসকের গতি ও কর্ম্মীর গতি পৃথক্ হইলেও দুই-ই এক মূল-বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়। সুতরাং মৃত্যু-বিজ্ঞানের মূল-সূত্র বুঝিতে পারিলে সকল প্রকার গতিই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

মৃত্যু-বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন জীবনে সাধনার প্রয়োজন নাই। সাধনার খুবই প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ এমনভাবে সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে যেন জীবিত-দশাতেই মৃত্যু-সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়া নিত্য-জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। যে জীবন্তে মরিতে জানে সে মৃত্যুকে ভয় করে না। মৃত্যুকে অতিক্রম না করিলে অতিমৃত্যুদশার লাভ হয় না এবং পূর্ণ সত্তাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করাও যায় না। যিনি জীবদ্দশাতে এই উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন মৃত্যুকালে ভগবৎকৃপায় তাঁহার সেই উপলব্ধি আপনা হইতে অনায়াসেই আবির্ভূত হয়।

গতি অন্তিম ভাবের উপর নির্ভর করে, ইহা বলা হইয়াছে। ইহা পরা ও অপরা ভেদে সাধারণতঃ দুই প্রকার। যে গতিতে পুনরাবর্ত্তন নাই তাহাই পরা গতি। আর যে গতিতে ঊর্দ্ধ অথবা অধোলোকে কর্ম্মফল ভোগের পর মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা অপরা গতি। অপরাগতির অবান্তর ভেদ অনেক আছে। দেবতা, মনুষ্য, প্রেত, নরক, তির্য্যক্ প্রভৃতি যোনির ভেদবশতঃ অপরা গতি ভিন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ কেহ দেবলোকে গমন করে ও দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দিব্যভোগ আস্বাদন করে। সেইরূপ কেহ যাতনা-দেহে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। বিভিন্ন লোকে এই সকল ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে অবশিষ্ট কর্ম্মের ভোগের জন্য মনুষ্য দেহ গ্রহণ করিতে হয়। পরাগতি এক হইলেও ইহাতেও ভেদ আছে। তবে ভেদ থাকিলেও সর্ব্বত্রই তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আবর্ত্তন করিতে হয় না ; অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পরমধামে প্রবেশ হয় অথবা অবস্থা ভেদে মরণের পর স্তর-বিশেষের ভিতর দিয়াও কাহারও কাহারও গতি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় গতিও পরম গতি, কারণ ঐ স্তর হইতে অধোগতি হয় না, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হয় ও চরমে পরমপদের প্রাপ্তি হয়। তবে ইহা পরাগতি হইলেও অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর জন্য। ইহার প্রথমটি মরণোত্তর সদ্যোমুক্তি, দ্বিতীয়টি ক্রমমুক্তি। আর এক অবস্থা আছে—তখন গতি মোটেই থাকে না। এই অবস্থায় মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই পরমপদের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহা জীবিতকালে সদ্যোমুক্তি। সাধারণতঃ ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না। শুধু প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহ চলিতে থাকে—ঐ কর্ম্মের ক্ষয়ে দেহপাত হয়, তখন অন্তঃকরণ, বাহ্য ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি সব এখান হইতেই অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। লিঙ্গের নিবৃত্তি হয়, উৎক্রান্তি হয় না। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহ-কৈবল্য হয়। জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির ভেদ শুধু উপাধিগত, বাস্তবিক নহে।

জন্মান্তর বা দেহান্তর পরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলেই যে জীবের পরমপদ লাভ হয় তাহা নহে। পরমপদে যাইবার পথে ক্রমমুক্তিতে মধ্যমাধিকারীর সাধারণতঃ বিশুদ্ধ ঊর্দ্ধলোকে গতিলাভ হইয়া থাকে। যে সকল স্তর অথবা ধাম অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ধামে পৌঁছিতে হয় সেগুলি বিশুদ্ধ, তাহাতে বাসনা থাকিলেও উহা শুদ্ধ বাসনা। তন্ত্রমতে ঐ সকল স্তর মায়াতীত হইলেও মহামায়ার অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অশুদ্ধ বাসনা থাকে না বলিয়া অশুদ্ধ স্তরের অধ-আকর্ষণ ঐ সকল স্থানে কার্য্য করিতে পারে না। বিশুদ্ধ সাধন-ভক্তির আস্বাদন ঐ সকল স্তরেই হইয়া থাকে।

এইগুলি শুদ্ধ ধাম হইলেও ভগবানের পরম ধাম নহে। কর্ম্ম ও মায়ার অভাববশতঃ এই সব স্থান হইতে অধোগতি হয় না বটে, কিন্তু এখানে থাকিতে অপূর্ণতা-বোধ কাটে না; —এখানে মিলন-বিরহ আছে, উদয়-অস্ত আছে, আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, এখানে ভগবানের নিত্যোদিত সত্তার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না।

মানুষের জন্ম হয় কেন? মলিন ভোগ-বাসনাই জন্মের কারণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া, সকাম ভাবে কর্ম্ম করাতেই চিত্তে নূতন নূতন বাসনার উদ্রেক হইতেছে এবং তাহার প্রভাবে সজাতীয় প্রাচীন সংস্কার সকল উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহাকে পুষ্ট করিতেছে। কালভেদে বিভিন্ন বাসনা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রভাবে উৎপন্ন হওয়ার দরুণ এবং সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তচিত্তে পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী ও পরক্ষণবর্ত্তী বাসনা পরস্পর বিজাতীয় হওয়ার দরুণ কোন বাসনাই প্রবলাকার ধারণ করিয়া ফলোন্মুখ হইতে পারে না। যে-কোন পূর্ব্ব বাসনা পরবর্ত্তী বিজাতীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হইয়া যোগ্য উদ্দীপক-কারণের অবসর প্রতীক্ষায় অব্যক্ত ভূমিতে সঞ্চিত থাকে। মনের ক্রিয়ার সঙ্গে বাসনা-ভাবনাদির স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাণ নিশ্চল হইলে মন কার্য্য করিতে পারে না ও প্রাণ সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিলে মনের ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবেই সম্পন্ন হয়। তাহার ফলে যে সকল বাসনা ব্যক্ত হয় অথবা ভাবনা উদিত হয় তাহাও সূক্ষ্ম স্তরের। দেহস্থ প্রাণ প্রাণবাহিনী শিরাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। তদ্রূপ মনও মনোবহা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া করে। সুতরাং বাসনার বা ভাবনার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন নাড়ীর কার্য্যকারিতা দেখা যায়। মনুষ্য মরণের পূর্ব্বক্ষণে যে চিন্তা করে অর্থাৎ ঐ সময় তাহার চিত্তে যে ভাবের উদয় হয় তাহাই তাহার শেষ চিন্তা। তাহার পর দেহগত প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কোন নূতন চিন্তা উদিত হইয়া ঐ শেষ চিন্তাকে অভিভূত করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই ঐ শেষ চিন্তাই একাগ্র হইয়া প্রবলাকার ধারণ করে। দেহাশ্রিত বিক্ষিপ্ত করণ-শক্তির মৃত্যুকালীন স্বাভাবিক একাগ্রতা হইতে ঐ তন্ময়তা আরও পুষ্টিলাভ করে। একাগ্রতার ফলে হৃদয়ে একটি দিব্যপ্রকাশের উদয় হয়—মুমূর্ষুর অন্তিমভাব ঐ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে ও তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। তদনন্তর ঐ অভিব্যক্ত ভাবই জীবকে অনুরূপ নাড়ীমার্গ ও দ্বারপথ দিয়া চালনা করিয়া বাহিরে লইয়া যায় এবং কর্ম্ম অনুসারে ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করাইয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সুখ-দুঃখ ভোগ করাইতে থাকে।

মরণ কালে যে ভাবের উদয় হয় তাহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিষয় জানিতে পারা যায়। উচ্চাধিকার-বিশিষ্ট পুরুষ সাধারণতঃ নিজের পুরুষকারের বলে ভাব-বিশেষকে আয়ত্ত রাখিতে পারে। মধ্যমাধিকারী পুরুষের স্বাতন্ত্র্য পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মৃত্যুকালে ঐ ভাববিশেষকে হৃদয়ে জাগাইবার জন্য অথবা যাহাতে উহা পূর্ব্ব হইতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে জাগিয়া থাকে সেই আশায় তাহাকে সমস্ত জীবন নির্দ্দিষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টা, প্রতিকূল দৈব না থাকিলে, ভগবানের মঙ্গল বিধানে সফল হইয়া থাকে। দৈবশক্তি অথবা মহাজনদিগের অনুগ্রহ থাকিলে তৎকালে নিজের কোনও প্রকার বিশিষ্ট চেষ্টার অভাবেও অবশ্যই সদ্‌ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের অথবা ইষ্টদেবতা, সদ্‌গুরু কিংবা ঈশ্বরের দয়া ঐ অনুকূল দৈবশক্তির অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নস্তরের পুরুষ অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্ব কর্ম্মের অধীন বলিয়া জড়ের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যায়।

ভাবের উদ্বোধন যে প্রকারেই হউক, ভাবের বৈশিষ্ট্য হইতেই মরণের পরে জীবের গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন ভাব, তেমনিই গতি। যিনি জীবৎকালে ভাবের অতীত হইয়াছেন, যিনি সত্যই জীবন্মুক্ত, তাঁহার কোনই গতি নাই। বাসনাশূন্য হইলে গতি থাকে না। গীতাতে (৮।৫) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

সুতরাং অন্তকালে ভগবদ্‌ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে যে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

২

এখানে একটি রহস্যের কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক একটি ভাবের উদয়ের সহিত মন

প্রাণ প্রভৃতির অবস্থা ও নাড়ী বিশেষের ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে। তেমনিই মন প্রাণ প্রভৃতিকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত করিতে পারিলে এবং নাড়ী-বিশেষকে চালনা করিতে পারিলে তদনুরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ গতির উপর তাহার প্রভাব কার্য্য করে। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি দৈহিক ও প্রাণিক ব্যাপারের দ্বারা মনের ক্রিয়া ও ভাবাদি যে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সকলের পরিজ্ঞাত বিষয়। এই মৃত্যু-বিজ্ঞানটি এখনও তিব্বতে অনেকেই জানে এবং কার্য্যতঃ তাহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। (১) কিন্তু আমাদের দেশে তাহার জ্ঞান শাস্ত্রে এবং মহাজনদের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে—সাধারণ লোকে তাহার সন্ধান রাখে না এবং তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের দুই স্থানে এই বিজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮।৯,১০।

অর্থাৎ যদি কেহ মরণ সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে যোগবলের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ভ্রূ-মধ্যে প্রাণ আবিষ্ট করিয়া সেই তমোঽতীত পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে পারে তাহা হইলে সে তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। পরে আছে—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণানাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥
৮।১২,১৩

অর্থাৎ সকল দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া যোগধারণার আশ্রয়ে প্রাণ সকলকে মস্তকে স্থাপন করিয়া একাক্ষর শব্দব্রহ্ম ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ও ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-স্বরূপ লাভ করা যায় তাহাই গীতার শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠক দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগ, মন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি ভগবৎ-প্রাপক সকল সাধনারই সার উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা গুরুকৃপায় এই বিজ্ঞান-রহস্য যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস অল্প কথায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। নিজের বুদ্ধিগত জড়তা-নিবন্ধন যে সব ত্রুটি লক্ষিত হইবে সুধীগণ দয়া করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

৩

গীতা বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ওঁকারের উচ্চারণের পূর্ব্বে সর্ব্ব দ্বারের সংযম, হৃদয়ে মনের নিরোধ ও প্রাণের ভ্রূ-মধ্য প্রভৃতি দেশপ্রাপ্তি নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক। দ্বার-সংযম অবশ্য নবদ্বারের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের দেহ নবদ্বার-বিশিষ্ট—মরণকালে সাধারণতঃ এই নবদ্বারের মধ্যে কোন এক দ্বারকে আশ্রয় করিয়াই তাহার প্রাণ বহির্গত হয়। কর্ম্মানুসারে পুণ্যবান্ পুরুষ উপর দিকের দ্বার দিয়া, পাপী অধোদ্বার দিয়া এবং মধ্য ব্যক্তি মধ্য দ্বার পথে গতি লাভ করে (মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, অধ্যায় ২৯৮)। জীব যে প্রকার দ্বারপথে বাহির হয় তাহার উত্তরকালীন গতিও তদনুরূপই হইয়া থাকে। অথবা যে জীব যেপ্রকার গতি লাভ করিবে তাহাকে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম দেবতার প্রেরণায় তদনুকূল দ্বার দিয়াই বাহির হইতে হয়। কিন্তু পুণ্যবান্ অথবা পাপী কেহই দশম দ্বার অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইয়া নির্গত হইতে পারে না। ব্রহ্মরন্ধ্র উৎক্রমণের মার্গ। এই পথে বাহির হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। যে সকল পথে চলিলে পুনরাবর্ত্তন ঘটে সেইগুলিকে বন্ধ করাই মরণকালে নবদ্বার রোধের প্রধান উদ্দেশ্য। এইগুলিকে বন্ধ করিলে অপুনরাবৃত্তির দ্বার বা ব্রহ্মপথ সহজেই উন্মুক্ত হয়। কলসের ছিদ্র বন্ধ না করিয়া জল ভরিতে গেলে যেমন জল ভরা যায় না, তেমনিই ঐ সকল বাহ্য দ্বার রোধ না করিয়া অন্তর্দ্বার উন্মুক্ত করার চেষ্টা বিফল হয়।

(১) দ্রষ্টব্য—"With Mystics and Magicians in Tibet by Alexandra David—Noel, pp. 29-33 (Pingain Pooke Ltd, Harmonds Worth, Middlesex, England).

বাহ্য দ্বার নিরুদ্ধ হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া ভিতরের পথ বাহির করা যায়।

কিন্তু কি প্রকারে এই সকল দ্বার রোধ করিতে হয় তাহার উপদেশ গীতাতে নাই। যোগিগণ বলেন, যদিও নবদ্বারের কোন একটি দ্বারকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া-কৌশলে এই সংযম ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি মুদ্রা-বিশেষের দ্বারা গুহ্যদ্বারকে রোধ করিতে পারিলে ফললাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিছুক্ষণ ঐ বিশিষ্ট মুদ্রার অভ্যাস করিলেই একটি আবেশ-ভাবের উদয় হয়—তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় ও সর্ব্ব দ্বারপথ অর্গল-বদ্ধ হইয়া যায়। ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ঐ মুদ্রার কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে পূরক ও তদনন্তর কুম্ভক করিয়া লওয়া আবশ্যক। বায়ুকে স্তম্ভিত করিয়াই ঐ মুদ্রা সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ভাল করিয়া কুম্ভক করিতে পারিলে সমান বায়ুর তেজোবৃদ্ধি হয়, তখন প্রবল সমানের দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত সকল নাড়ী সুষুম্নাতে আসিয়া একীভূত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চরণশীল বায়ুসকল সমরসীভূত হইয়া একমাত্র প্রাণরূপে পরিণত হয়। ইহাই নাড়ী-সামরস্য। ইহার পর মধ্য নাড়ী অথবা সুষুম্না-নাড়ীকে ঊর্দ্ধস্রোতা অর্থাৎ উপরের দিকে প্রবহনশীল বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। সুষুম্না দেহস্থ যাবতীয় নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী —ইহা নাভি হইতে মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শক্তি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ত্রিবিধ সাধনের ফলে সকল নাড়ী এবং হৃদয় প্রভৃতি সকল গ্রন্থিপথ (কুম্ভক ও মুদ্রা প্রভাবে) রুদ্ধ হইয়া (ভাবনাবলে) সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধ প্রবাহের উন্মুখতা লাভ করে। এতদিন অপান শক্তির প্রাধান্যবশতঃ এইগুলি অধোমুখ ও সঙ্কুচিত ছিল। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে প্রাণশক্তি সরল গতি হারাইয়া কুটিলতা বা বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই ঐ সকল স্থানকে গ্রন্থি বলে। এইগুলি সঙ্কোচ-বিকাশশীল বলিয়া পদ্ম নামেও অভিহিত হয়।

এই দ্বারগুলি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণের দ্বারও বটে। সুতরাং এই দ্বাররোধ ব্যাপার ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তির প্রত্যাহার বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় ও প্রাণই বাহ্য জগতের সহিত মনের সম্বন্ধ-স্থাপক—ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রত্যাহৃত হইলে মনের বহির্ম্মুখ প্রেরণা বা আকর্ষণ নিবৃত্ত হয়। এইভাবে প্রত্যাহার বা দ্বার-সংযম দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ অংশ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ অংশ তখনও বাকী থাকে। তাহা মনোনিরোধের ব্যাপার। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নামক অন্তরঙ্গ যোগ বস্তুতঃ মনোনিরোধেরই ক্রমিক উৎকর্ষ মাত্র। মনের নিরোধ-স্থান হৃদয়। দ্বার-সংযমের পর ইন্দ্রিয় পথ রুদ্ধ হওয়ার দরুণ মন যদিও বাহ্য জগতে গমন করিতে সমর্থ হয় না, তথাপি দেহান্তস্থ প্রাণময় রাজ্যে উহা অবাধে সঞ্চরণ করিতে থাকে। ঐ সঞ্চরণের ফলে সুপ্ত সংস্কাররাশি উদ্দীপিত হইয়া স্বপ্নবৎ দৃশ্য-দর্শনের কারণ হইয়া থাকে। স্থৈর্য্যলাভের পক্ষে ইহা এক বিপুল প্রতিবন্ধক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনের সঞ্চরণ-মার্গ মনোবহা নাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। সমস্ত দেহব্যাপী অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বায়ুকে আশ্রয় করিয়া লূতাতন্তু-নির্ম্মিত জালের ন্যায় একটি অতি জটিল নাড়ীজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকাংশে একটি মৎস্যজালের ন্যায় এবং তাহারই ন্যায় মধ্যে মধ্যে কূট গ্রন্থি দ্বারা সংযোজিত। মানাবহা নাড়ীর নানাবিধ শাখা প্রশাখার দ্বারা এই জাল গঠিত। মনের এক এক প্রকার বৃত্তি বা ভাব এক এক প্রকার নাড়ীপথে ক্রিয়া করে, অর্থাৎ এক এক প্রকার ভাবের উদয় কালে মন এক এক প্রকার নাড়ী পথে ঘোরাফেরা করে। এই পথগুলি সামান্যতঃ সবই মনোবহা নাড়ী হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক অবান্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। রূপবাহিনী শব্দ-বাহিনী প্রভৃতি নাড়ীর সহিত মনোবহা নাড়ীর যোগ আছে। পঞ্চভূতের সার তেজ লইয়াই মনের প্রকাশ। মনের বৃত্তি-ভেদেও পঞ্চভূতের সন্নিবেশগত তারতম্য আছে: ক্রোধে তেজ, কামে জল ইত্যাদি প্রধানভাবে থাকে (যদিও প্রতি বৃত্তিতেই পঞ্চভূতের অংশ আছে)। পূর্ব্ব জন্মের বাসনা-রূপী সূক্ষ্ম বায়ু বা রেণুর দ্বারা এই জাল পরিপূর্ণ। এইগুলি মনকে কম্পিত করে। হৃদয়ের বহিঃপ্রদেশে এইরূপ একটি বিরাট্ জাল রহিয়াছে। সমস্ত দেহ এই প্রাণজালে ব্যাপ্ত। ইহাই বায়ুমণ্ডল ও মনের সঞ্চার ক্ষেত্রে—যাহার মধ্যে যথাস্থানে সমস্ত লোক-লোকান্তর ভাসিতেছে। চঞ্চল মন ইহার সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ব্যষ্টি দেহের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডেও সূর্য্য-মণ্ডলের বহিঃপ্রদেশে বিশ্ব ব্যাপিয়া এইরূপ একটি জাল রহিয়াছে। এক একটি নাড়ী এক একটি রশ্মি। এই রশ্মি

পথেই প্রাণ বা মন সঞ্চরণ করিয়া থাকে—দেহান্তরস্থ লোকেও করে, দেহের বাহিরেও করে।

মন সূক্ষ্ম প্রাণের সাহায্যে বাসনানুসারে এই জালে ভ্রমণ করিয়া যে সকল দৃশ্য দর্শন করে ও তজ্জন্য তাহাতে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পূর্ব্ব সংস্কারের পুনরভিনয়মূলক। ইন্দ্রিয়পথে যে আত্মতেজ এতদিন বাহ্য জগতে ছড়াইয়া গিয়াছিল তাহাই ইন্দ্রিয়রোধের সঙ্গে সঙ্গে উপসংহৃত হইয়া সংস্কার রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় বাহ্য অনুভব, এমন কি বাহ্যস্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়াই এই সংস্কার দর্শনগুলি খুব স্পষ্ট ও জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়—প্রত্যক্ষ বলিযাই তখন মনে হয়। সাধারণতঃ এ গুলিকে অনেকে ধ্যানজ দর্শন বলিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মূল্য খুব বেশী নহে। ইহা বিক্ষিপ্ত চিত্তেই হইয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান হারাইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল দর্শনের উদয় হইয়া থাকে। সত্যলিপ্সু যোগীকে এই প্রকার দর্শনাদি হইতে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। মনের চঞ্চলতা বা চলনশক্তি রুদ্ধ না হইলে ইহা সম্ভবপর হয়না। কিন্তু প্রাণকে স্থির করিতে না পারিলে মনের এই চঞ্চলতা পরিহার করিবার উপায়ান্তর নাই। এই জন্য দ্বার সংযমের পরে ও মনোনিরোধের পূর্ব্বে প্রাণস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যোগধারণা অবলম্বন করিয়া দেহান্তবর্ত্তী নানাপ্রকার কার্য্যসাধক প্রাণশক্তিকে ভ্রূ-মধ্যে—ভ্রূ-মধ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে হয়। প্রাণশক্তির সঞ্চার ক্ষেত্র অসংখ্য নাড়ীকে এক নাড়ীতে পরিণত করিতে না পারিলে অসংখ্য প্রাণধারাকে একপথে চালনা করা ও একস্থানে সমস্ত প্রাণের সমাবেশ করা সহজ হয় না। শ্রীভগবান্ 'যোগবল' ও 'যোগধারণা' এই দুইটি শব্দের দ্বারা এই যোজনা ব্যাপারেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

যে কথা বলিতে চাই হে বন্ধু আমার !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দিনে দিনে পলে পলে
জীবনের আয়ু হয় শেষ,
বৃথাই কোরো না বন্ধু
নিরর্থক তাহারে নিঃশেষ।

নিজেরে বিকাশ কর
হৃদয়ের প্রতিবিন্দু দিয়া,
প্রতি পত্র প্রতি পুষ্প
সবাকারে দেয় যে বলিয়া।

নিজেরে ভেবনা তুচ্ছ
বন্ধু মোর প্রতি দীর্ঘশ্বাসে,
সঞ্চয় করিয়া যাও
আপনার মহিমা বিকাশে।

যেদিকে ফিরাই আঁখি
বন্ধু মোর ! দেখিবারে পাই
আয়ু যার যতটুকু—
যায় সে যে সেটুকু দিয়াই।

গোলাপের আরক্তিমা
ক্ষণে ক্ষণে হ'য়ে আসে ম্লান,
স্বল্পায়ু গোলাপ সেও
গন্ধ তার ক'রে যায় দান।

আয়ুর স্বল্পতা দিয়ে
কোন কিছু মাপা নাহি যায়,
যে মাপে মাপুক বন্ধু !
তুমি যেন গণিও না তায়।

মুক্তি

শ্রীনবগোপাল দাস পি-এচ্-ডি, আই-সি-এস্

নন্দিনী স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। মেঘমেদুর আকাশের শ্যামলিমা, আলোছায়ার লুকোচুরি, বর্ষা আবাহনের সুর—প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যগুলি তাহার সর্ব্বদেহে মনে এক নূতন ঝঙ্কার তুলিতেছিল।

তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভাবী স্বামী সমরেশ এম্-এতে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট, জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-উপাধিধারী, কলিকাতার একটা বড় কলেজের নামজাদা অধ্যাপক। তাঁহার পাণ্ডিত্য সুধীসমাজে সুবিদিত, তাঁহার আড়ম্বরহীন ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রশংসিত, তাঁহার অমায়িকতায় ছাত্রসম্প্রদায় মুগ্ধ। বয়স তাঁহার বত্রিশ হইলে কি হয়, তারুণ্যের উচ্ছ্বলতা এখনও ফল্গুস্রোতের মত নীরবে নিভৃতে মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহার আভাস পায় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলী।

নন্দিনীর আত্মীয়া বান্ধবী সকলেই তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিল, দু-একজনের যে ঈর্ষাও হইতেছিল না এমন নয়। সুচিত্রা, যাহাকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, বলিয়া গিয়াছিল, তুই একটু সাবধানে থাকিস্ নন্দিনী, এ বিয়েতে অনেকেরই বুকে শেল বাজ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গলমত ব্যাপারটা চুকে গেলে রক্ষা পাওয়া যায়।

ইহার উত্তরে নন্দিনী শুধু হাসিয়াছিল।

সমরেশকে তাহার পছন্দ হয় নাই একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। নন্দিনী অন্ধ নয়, সমরেশের যেসব গুণ তাঁহাকে সকলের কাছে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে নন্দিনী জানে। তাহা ছাড়া তাহার নারীত্ব তৃপ্ত হইয়াছিল আর একটি কারণে, মা বাবা বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ উপরোধ সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর উপেক্ষা করার পর হঠাৎ এক সতীর্থের বাড়ীতে নন্দিনীকে দেখিয়া সমরেশের ভয়ানক ভাললাগে এবং তিনি তাঁহার চির-কৌমার্য্যব্রত ভাঙ্গিতে রাজী হন। সমরেশের এই সাদর আহ্বান নন্দিনীর জীবনের শুষ্কতা অনেকখানি দূর করিয়া দিয়াছিল, অভাব বেশ খানিকটা ভরিয়া দিয়াছিল।

তবু বলিষ্ঠ দুইটি সবল বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনলাভের সম্ভাবনায় তাহার মন পুলকিত হয় নাই। কোথায় যেন একটা তার বেসুরো বাজিতেছিল; সে অনুভব করিতেছিল ঠিক যেমনটি হইলে সব সুষ্ঠু এবং সুন্দর হইয়া উঠিত তেমনটি যেন হইল না।

অলককে নন্দিনী যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। যৌবনের প্রথম আহ্বানে সমস্ত দেহে যখন সে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী শুনিতে পাইতেছিল তখন অলকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। অলক ছিল তাহার চেয়ে বছর চারেকের বড়—তাহারই মত প্রাণবন্ত, সজীব।

অলক নন্দিনীকে প্রিয়ারূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার সঙ্গে নন্দিনীর সম্বন্ধ ছিল অনেকটা সখ্যভাবের। তাহার স্নেহ ছিল শুভসাধনের, প্রসাধনের নয়।

প্রথমে নন্দিনী এতটুকুও ক্ষুব্ধ হয় নাই। অলকের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যই ছিল একটা বিরাট উদারতা, যাহার মধ্যে বিশ্বের অসংখ্য নরনারী নিঃসঙ্কোচে আসিয়া আশ্রয় নিতে পারে, অথচ বিন্দুমাত্রও ঈর্ষ্যান্বিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পায় না। অলক যখন তাহার স্বাভাবিক বেপরোয়াভাবে নন্দিনীকে বলিত—নন্দিনী, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বর কিন্তু তোমাকে আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতে মিশ্‌তে দেবেন না—নন্দিনী কোন প্রতিবাদ করিত না বা বলিত না যে সে কখনও বিবাহ করিবে না। শুধু বলিত, সে দেখা যাবে।

তাহার পর অলকের জীবনে সত্যসত্যই একটি নারীর আবির্ভাব হইল—বন্ধু নয়, প্রিয়া। সুকৃতির মধ্যে অলক এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাইল যে, অনায়াসে সে তাহাকে

তাহার পরিচিত মেয়ে-বন্ধুদের দল হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে সুরু করিল।

নন্দিনী ব্যথা পাইল। প্রথমটায় সে সুকৃতির সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিল, অলকের ভালবাসা আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। সুকৃতির চপল চঞ্চলতা, তাহার বিলাসিতা—সমস্তই সে অলকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল—সুকৃতি অলকের ভালবাসার যোগ্যা নহে।

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। কোনপ্রকার বাধা না পাইলে অলক হয়ত ধীরে ধীরে সুকৃতির আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু এই গায়েপড়া সুকৃতি-চরিত্র বিশ্লেষণে সে নন্দিনীর উপর রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং নন্দিনীর প্রতি তাহার যে স্নেহটুকু ছিল তাহাও সে তুলিয়া লইয়া সুকৃতির কাছে উৎসর্গ করিল।

ইহার বৎসরখানেক পরে সমরেশের সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহ স্থির হইল।

নন্দিনী অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ সুকৃতি আসিয়া উপস্থিত। বেশ একটু ঈর্ষাসূচকস্বরে বলিল, খুব বর জুটিয়েছিস্ যাহোক্, এবার তোকে আর পায় কে ?

সুকৃতির প্রতি প্রীতি নন্দিনীর কোন দিনই ছিল না। সেও উষ্মাসূচকস্বরে জবাব দিল, কলেজেপড়া ভবঘুরে ছোকরার বদলে ধীমান্ প্রোফেসারের গলায় মালা দিতে কোন মেয়েরই আপত্তি হবে না আশা করি।

সুকৃতি শ্লেষটা বুঝিল, কিন্তু সেটা গায়ে না মাখিয়া বলিয়া চলিল, সেটা খুবই সত্যি, নন্দিনী।··· একজাতের পুরুষের সাথে প্রেম করা চলে, কিন্তু বিয়ে চলে না। বিয়ে—সে যে সারাজীবনের বন্ধন—তখন একটু শান্তভাবে ভাব্তে হয় বই-কি!

তাহার পর সে বলিয়া চলিল, অলককে তোর বরের কথা বল্লাম, সেও সুখী হয়েছে। ও নিজেই তোকে কন্‌গ্র্যাচুলেট্ কর্‌তে আস্‌ত, কিন্তু বেচারী আজ দিনদশেক ধরে জ্বরে বিছানায় পড়ে আছে, আমাকেই বার্ত্তাবহ ক'রে পাঠাল।

নন্দিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

—অলকের জ্বর হয়েছে? কই, কিছু শুনিনি ত! কোথায় আছে, কে দেখ্‌ছে ?

—আছে ওদের বাড়ীতেই। বুড়ী পিসীমা আছেন, যতদূর সম্ভব দেখ্‌ছেন। ডাক্তার বল্‌ছিলেন—জ্বর যদি এরকম চল্‌তেই থাকে তা হ'লে একজন নার্স রাখ্‌তে হবে। আমি ত রোজ বিকেলবেলা একবারটি অলকের খোঁজ নিয়ে আসি; তবে জানিস্ ত, আমার অসংখ্য কাজ, সবদিন একটু বসে কথা বলাও হয়ে ওঠে না!

সুকৃতির কথার মধ্যে একটা উদাসীনতার সুর নন্দিনী লক্ষ্য করিল। সে আরও চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, সীরিয়াস্ কিছু নয় ত, সুকৃতি ?

—না, সীরিয়াস কেন হবে? তবে অনেক দিন ধরে জ্বর চল্‌ছে, বেচারী বড় রোগা আর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না।

মুহূর্ত্তের জন্য অলকের চেহারাখানা নন্দিনীর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দীর্ঘ ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ বাহু, আত্ম-প্রতিষ্ঠ মুখশ্রী। কতদিন সে বক্সিং-এ বাছাই-করা গোরা বক্সারকে হারাইয়া দিয়াছে অবলীলাক্রমে। সেই অলক আজ রোগশয্যায় এত কাতর যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত নাই!

কিন্তু তাহার নিজের হাত পা যে একেবারে বাঁধা। বাগ্‌দত্তা বধূ—সে কেমন করিয়া অলকের গৃহে যাইবে? তাহার মা ত কিছুতেই রাজী হইবেন না, তাহা ছাড়া সমরেশ যদি শুনিতে পায়?—শত্রুর ত অভাব নাই, সুচিত্রা একটু আগেই সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে!

তাহা ছাড়া সে অলকের কাছে যাইবে কোন্ অহমিকায়? অলক ত তাহাকে চায় না—কোন দিন চায় নাই। সে চায় সুকৃতিকে—চঞ্চলা সুকৃতিকে, যাহার অলকের প্রতি এতটুকু দরদ নাই!··· তাহার বুক ফাটিয়া লাল অশ্রু উদ্গত হইতে চাহিতেছিল।

সংক্ষেপে সুকৃতিকে বলিল, তোরা ত ভাই রোজই যাস্, আমাকে মাঝে মাঝে খবর দিস্, কেমন থাকে।

সন্ধ্যায় সমরেশ আসিল। বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়ার পর সে প্রায়ই নন্দিনীকে দেখিতে আসে। নন্দিনী তাহার কাছে বিরাট্ একটা কৌতূহল। এতদিন সে অধ্যয়ন

অধ্যাপনায়ই ডুবিয়াছিল, এখন যেন একটু ছুটি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। তরুণ বয়সের রোম্যান্সের উদ্দীপনা হয়ত তাহার নাই, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা আছে প্রচুর।

নন্দিনী রোজই সহজভাবে সমরেশের সঙ্গে কথা বলে, তাহার সঙ্গে সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান সম্পর্কে তর্ক করে। সমরেশ বেশ প্রৌঢ় গাম্ভীর্য্যে তাহার ভাবী বধূর মানসিক কৃষ্টির উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হয়। তাহার পর হাসিগল্প, বন্ধুবান্ধবীদের কাহিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়া কখন যে দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায় তাহা সমরেশ টেরই পায় না।

সমরেশের সাহচর্য্য যে নন্দিনী উপভোগ করে না এমন নয়। মনে মনে সে সমরেশের ধীশক্তির প্রশংসা করে, তাঁহার শান্ত চাঞ্চল্যহীন চরিত্রের সম্মুখে মাথা নত করে। সময় সময় অননুভূতপূর্ব্ব একটা গর্ব্বে তাহার বুকও বুঝি ভরিয়া ওঠে।

কিন্তু সেদিন সান্ধ্য মিলনটা অন্যান্য দিনের মত জমিল না। অলকের অসুখের সংবাদ পাইয়া তাহার সংযত-করিয়া-লইয়া-আসা হৃদয়তন্ত্রী আবার যেন কেমন বেসুরো বাজিতেছিল; কথোপকথনের স্রোতে সে কিছুতেই নিজেকে চালিয়া দিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে সমরে প্রশ্ন করিল, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই আজ?

—না, বেজায় মাথা ধরেছে। ··· নন্দিনী বলিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া সমরেশ বলিল, তা হ'লে তোমায় আজ আর আট্‌কে রাখ্‌ব না, তুমি যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম ক'রো।

নন্দিনী জীবনে বোধ হয় কখনও কাহারও কাছে এতখানি কৃতজ্ঞ বোধ করে নাই, আজ সমরেশের এই নিষ্কৃতি দেওয়াতে সে একটা বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

রাত্রিবেলা খোলা ছাদে শুইয়া শুইয়া নন্দিনী অলকের কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, রোগশয্যায় পড়িয়া অলকের চোখের অন্ধকার নিশ্চয়ই কাটিয়াছে, সে সুকৃতির অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, অন্তরে অন্তরে সে হয়ত নন্দিনীকেই কামনা করিতেছে, কিন্তু ভবিতব্যের নিষ্ঠুর বিধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল একবার চুপি চুপি অলককে দেখিয়া আসে। নিভৃতে অলককে দেখিয়া আসে। নিভৃতে অলককে প্রশ্ন করে, এখনও তোমার ভুল ভাঙ্‌ল না, অলক?

কিন্তু চারিদিকে জোড়া জোড়া চোখ তাহাকে পাহারা দিতেছে। অলকের অসুখের সংবাদ নন্দিনীর মা জানেন এবং ইহাও জানেন যে, এতটুকু সুযোগ পাইলে নন্দিনী অলকের রোগশয্যার কাছে ছুটিয়া যাইবে। তাই তিনি সব সময় নন্দিনীকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন।

তাহা ছাড়া সমরেশদের বাড়ীও ত বেশী দূরে নয়। মায়ের তীক্ষ্ণ চোখ এড়াইয়া যদিও বা নন্দিনী বাহির হইয়া পড়ে, কে জানে পথের মাঝখানে তাহার সঙ্গে সমরেশেরই দেখা হইয়া যাইবে কি-না! সমরেশ যদি প্রশ্ন করে, এত রাত্রে সে কোথায় যাইতেছে, তাহা হইলে সে কি জবাব দিবে?

এই শৃঙ্খলিত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার একটা তীব্র আগ্রহ নন্দিনীর মনে গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া মরিতেছিল। অবসন্ন বন্ধন এবং তাহার সঙ্গে আরও বিধিবদ্ধ জীবনযাত্রার সঙ্কেত তাহাকে হয়ত বেপরোয়া করিয়া তুলিত, কিন্তু সুকৃতিকে পাইয়া অলক কি নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল তাহা মনে পড়িতেই সে খানিকটা আত্মস্থ হইল।

পরের দিন অলকের কোন খবরই নন্দিনী পাইল না। তাহার একমাত্র বার্ত্তাবহ সুকৃতি, কিন্তু সুকৃতিকে সেদিন রাত আটটা পর্য্যন্ত দেখাই গেল না।

সমরেশ নন্দিনীর ক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া বেশ একটু সকালে সকালেই বিদায় লইতে ছল, এমন সময় সুকৃতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নন্দিনী স্থানকালপাত্র ভুলিয়া উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সুকৃতি, অলকের খবর কি?

হাঁফাইতে হাঁফাইতে সুকৃতি বলিল, ঐ কথাই ত বল্‌তে এসেছি, নন্দিনী। আজ বড় ডাক্তার এসেছিলেন, উনি ত দেখে টাইফয়েড বলে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে গেলেন। বিকাল থেকে দু'জন নার্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

নন্দিনীর মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে শাদা হইয়া গেল। পরক্ষণেই সমরেশের কৌতূহলী চোখ তাহার দিকে নিবদ্ধ দেখিয়া

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, অলক আমাদের খুব পুরাতন এক বন্ধু, আজ কদিন থেকে জ্বর—সুকৃতি বল্‌ছে, সম্ভবত টাইফয়েড্। ··· ছেলেটি বড় ভাল।

সমরেশ স্বভাবতই সহানুভূতিসম্পন্ন। বলিল, তা হ'লে ত তোমার তাকে একবার দেখ্‌তে যাওয়া উচিত!

পলকের জন্য নন্দিনীর মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু মায়ের কথা মনে হইতেই ম্লানমুখে বলিল, আজ বাদে কাল বিয়ে, মা যেতে দেবেন্ না।

—বিয়ে, তাতে কি হ'য়েছে? বিয়ে হবে ব'লে আত্মীয়-বন্ধুদের অসুখবিসুখে যেতে নেই নাকি? ··· বিস্মিত সুরে সমরেশ প্রশ্ন করিল।

সুকৃতি এবার নন্দিনীকে উদ্ধার করিল। বলিল, না, তা নয়, তবে হিন্দুঘরের কতকগুলো সংস্কার আছে, জানেন ত সমরেশবাবু! নিতান্ত বাধ্য না হ'লে বাগ্‌দত্তা বধূকে অবিবাহিত পুরুষের রোগশয্যায় যেতে নেই, লোকে বলে তাতে অকল্যাণ হয়।

—আমি এসব সংস্কারের মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। ··· এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সমরেশ সেদিনের মত বিদায় লইল।

সারারাত নন্দিনী ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা দ্বন্দ্ব, একটা আলোড়ন চলিতেছিল। অলকের প্রতি তাহার ভালবাসা কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে নিভিয়া যায় নাই, আজ তাহার অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া তাহা সুপ্তোত্থিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল তুচ্ছ সব ঘটনা, খুঁটিনাটির সমাবেশ। রাত্রির অন্ধকারময় স্তব্ধতার মধ্যেও সে শুনিতে পাইল তাহার রক্তের দ্রুত তাণ্ডবনৃত্য, যখন সে ভাবিতে লাগিল একদিন সে কি নিরভিমান হইয়া নিজেকে অলকের কাছে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু অলক তাহার উপচার গ্রহণ করে নাই। একদিকে সমরেশের ভাবী বধূ হিসাবে তাহার কর্ত্তব্য এবং আত্মসম্মানবোধ তাহাকে বারবার প্রতিহত করিতেছিল, কিন্তু সমরেশের তাহার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাহার অতীত জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের অভাব তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল।

নন্দিনী স্থির করিল, সে সাহস সঞ্চয় করিয়া সমরেশের কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে। সমরেশের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপর তাহার বেশ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সে আশা করিল সমরেশ তাহাকে পথনির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবে। সংগ্রামক্ষত মনটার উপর হাসির আলিম্পন আঁকিয়া সহজভাবে চলিয়া বেড়ান তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন সমরেশ যখন আসিল তখন সে নিজেই প্রস্তাব করিল তাহার সঙ্গে একটু বেড়াইতে বাহির হইবে। নন্দিনীর শরীর গত কয়েকটা দিন ধরিয়াই অসুস্থ যাইতেছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সমরেশ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সানন্দে রাজী হইল।

জীবনের গোপনতম ইতিহাস—যাহা ভাবী স্বামী হয়ত কিছুতেই দরদ দিয়া বুঝিতে পারিবে না—খুলিয়া বলিব এই সাধু সংকল্প করা সহজ, কিন্তু সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। কথা পাড়িতে গিয়া বারবার নন্দিনীর জিহ্বার আগায় আট্‌কাইয়া গেল।

অবশেষে সমরেশেরই এক প্রশ্নে নন্দিনী সুযোগ পাইল। সমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, তোমাদের সেই অলক ছেলেটির আর কোন খবর পেয়েছ? কেমন আছে?

—না, আজ কোনই খবর পাইনি', বোধ হয় আগের মতই আছে।

—তোমাদের বাড়ীর অদ্ভুত সব সংস্কার আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না। একজন অতি-নিকট আত্মীয় বা বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, তুমি বিয়ের ক'নে ব'লে তোমার যাবার অধিকার নেই, এ আমার কাছে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দিনী বলিল, আমার ভয়ানক ইচ্ছা করে একবার দেখ্‌তে যেতে, কিন্তু কুসংস্কার যে আমারও নেই তা জোর ক'রে বল্‌তে পারি না!

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া নন্দিনী বলিতে সুরু করিল, সুকৃতির কাছে কাল যা শুন্‌লাম তাতে মনে হ'ল অসুখে ভুগে ভুগে বেচারী একেবারে বদ্‌লে গেছে। সুস্থ-শরীরে ওকে যারা দেখেছে তারা ওকে প্রশংসা না ক'রে পারেনি। ··· বাংলাদেশে এরকম বলিষ্ঠ, সাহসী, সুদর্শন ছেলে খুব কম মেলে।

বলিতে বলিতে নিজেরই অজ্ঞানতে নন্দিনীর মুখচোখ উৎসাহদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিয়া চলিল, আমরা ওকে জানি ছেলেবেলা থেকে, খেলার সাথী হিসাবে আমাদের পরিচয়। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও বড় হ'য়ে উঠ্‌ল্...

সমরেশ তাহার কথার মধ্যে বাধা দিয়া বলিল, তোমরাও ত বড় হয়ে উঠ্‌লে ...

হ্যাঁ, সে ত ঠিকই।... বলিয়া নন্দিন আবার তাহার কাহিনী সুরু করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার সন্দেহ হইল, সমরেশের এই মন্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নাই ত?

সে সমরেশের দিকে তাকাইল।... না, নিতান্ত সাধারণ-ভাবেই কথাটা বলিয়াছে। তাহার বিগত জীবন সম্পর্কে সমরেশের এই বিরাট্ ঔদাসীন্য তাহাকে ব্যথিত করিল। সমরেশ কি চিরকালই ধরাছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া যাইবে? তাহার স্নেহভালবাসা কি সমস্ত বিবাহিত জীবন ধরিয়া নিম্নগামীই রহিবে? নন্দিনীকে প্রিয়াভাবে সে কি কোন দিনই গ্রহণ করিতে পারিবে না? সমপ্রাণ সখা-সখীর মধুর সম্পর্ক কি তাহাদের মধ্যে কোন দিনই গড়িয়া উঠিবে না?

যে সূতা ধরিয়া নন্দিনী তাহার ইতিবৃত্ত বলিযা চলিয়াছিল তাহা যেন রূঢ় অনম্র একটা আঘাতে হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। নন্দিনী স্থির করিল, সমরেশের কাছে অলকের কথা আর বলিবে না। সমপ্রাণতার যেখানে অভাব, সেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে প্রচুর। আজ যদি অলক সমরেশের স্থানে আসীন থাকিত তাহা হইলে নন্দিনী তাহার কাছে তাহার পূর্ব্বরাগের কথা হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতে পারিত। অলকের ঈর্ষা, অলকের অভিযোগের মধ্যে সে বিচিত্র একটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সমরেশ অলক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—দুর্ভেদ্য একটা প্রাচীর দিয়া তাহার অন্তঃকরণ সুরক্ষিত, সে প্রাচীর লঙ্ঘন করা নন্দিনীর ক্ষমতাবহির্ভূত।

নন্দিনী তাহার বন্ধু সুচিত্রার একটা কথার অন্তর্নিহিত সত্য আজ উপলব্ধি করিল। ত্রিশোর্দ্ধে যাহারা বিবাহ করে তাহারা স্নেহ করিতে পারে, ভালবাসে না।

ইহার তিন দিন পরে যথারীতি সমরেশের সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের মধ্যে মালাবদলের সময় নন্দিনীর হাতটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আশু একটা দুর্ঘটনার সূচনা সে তাহার স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু দুর্জ্জয় সাহস সঞ্চয় করিয়া সব অনুষ্ঠানই সে সহজভাবে পালন করিল। শান্তভাবে নিজের পথ সে বাছিয়া লইয়াছে, প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ও সুযোগ সে যথেষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা সে গ্রহণ করে নাই। এখন পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে কেন?

সুকৃতির কল্যাণে এ কয়দিন অলকের খবর সে নিয়মিত-ভাবে পাইয়াছিল। একই ভাবে আছে—টাইফয়েড্ শক্ত অসুখ, দু-এক দিনে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে ডাক্তার বলিয়াছেন ভয়ের কোন কারণ নাই। নার্সের নিপুণ সেবা চলিতেছে, এ অসুখে সেবানৈপুণ্যই নাকি বেশী দরকার সেবাস্নেহের চেয়ে।

বিবাহের রাত্রিতে সমরেশের সঙ্গে এই প্রথম এক শয্যায় শুইতে সে কোনই সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার কাছে হাসিমুখে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল এবং স্বীকার করিয়াছিল।

তাহার অশান্তি হইতেছিল একটি কারণে। অলকের স্মৃতি সে কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতেছিল অলকের এই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম। অলক যেন কিছুতেই তাহার পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না; এতদিন সে সমস্ত বিষয়ে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াও সে যেন মৃত্যুকে উপহাস করিতে চায়। যেন সে জোর গলায় পৃথিবীর কাছে প্রচার করিতে চায়, আমি অপরাজেয়, আমি নির্ভীক, আমি সত্য।... অলকের বলিষ্ঠ দেহমনের ছায়া নন্দিনী সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছিল।

বিবাহের পরদিন নন্দিনীকে স্বামীগৃহে যাইতে হইবে। মা বারবার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। সমরেশের মত শান্ত, ধীর, স্নেহপ্রবণ স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইয়া নন্দিনী সুখীই হইবে তিনি জানিতেন, তবু মাঝে মাঝে তাঁহার স্নেহাশঙ্কিত মনে সন্দেহ খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল। তাহা ছাড়া, অলক-সম্পর্কিত সংবাদটা—জ্বরের ক্রাইসিসেও সে মৃত্যুর সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতেছে—তিনি নন্দিনীর কাছে গোপন করিয়া রাখিলেও তাঁহার মনে হইতেছিল—বোধ

হয় একবারটি নন্দিনীকে রোগীর কাছে পাঠাইয়া দিলে ভাল হইত!

সানাই-এর করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। সমরেশ ও নন্দিনী মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের বাড়ীর একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, এইমাত্র অলক মারা গিয়াছে।

নন্দিনীর মুখ ছাই-এর মত শাদা হইয়া গেল। তাহার মা রুদ্ধ অশ্রু আর সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সমরেশ বলিল—নন্দিনী, চলো, একবার ও বাড়ী হয়ে আসি।

নন্দিনী কোন কথা বলিল না। অশ্রুহীন বিবর্ণ মুখখানা তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে যাইবে।

একটু ইতস্তত করিয়া সমরেশ প্রশ্ন করিল, আমি আস্‌ব, না তুমি একাই যাবে?

সমরেশের এই প্রশ্নে নন্দিনীর মন গভীর কৃতজ্ঞায় ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, তুমি এখানেই থাকো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি।

প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে নন্দিনী অলকদের বাড়ীতে ঢুকিল। অলকের বৃদ্ধা পিসীমা অলকের বিছানার উপর লুটাইয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। নার্স জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রোগীর দেহে প্রাণ নাই—এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন। সুকৃতি একটা চেয়ারে বসিয়া রুমাল দিয়া চোখের জল মুছিতেছে। পাশের বাড়ীর জানালা হইতে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল তাকাইয়া আছে—তাহাদের মা তাহাদিগকে জানালা হইতে সরিয়া আসিতে বলিতেছে।

শুভ্র দুগ্ধফেননিভ বিছানার উপর নিমীলিতচক্ষু অলক চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—আজই সকালে বিছানার চাদর, তাহার গায়ের জামা-কাপড় বদ্‌লাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আঠারো দিনের রোগে ভুগিয়া অলকের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর পাণ্ডুরতা ছাপাইয়াও তাহার শরীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের শ্রান্তি। কিন্তু তাহার মুখের কোণে একটি অনির্ব্বচনীয় হাসি; যেন মৃত্যুর কাছে সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া সে বলিতেছে, আমি যেখানে গেলাম তাহা জন্ম-মৃত্যুর বাহিরে, সেখানে আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তোমাকে পরাস্ত করিব।

নন্দিনী স্তব্ধভাবে অলকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুকৃতি তাহার বধূবেশ আড়চোখে লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নন্দিনী যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুক্তি, মুক্তি! আজ সে মুক্তি পাইয়াছে। যে বন্ধনের নাগপাশ তাহাকে এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা আজ অযাচিতভাবে খসিয়া পড়িয়াছে। দাম্ভিক অলক শেষ পর্য্যন্ত তাহার মহানুভবতা হইতে এতটুকু ভ্রষ্ট হয় নাই।

সমরেশ নন্দিনীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এত শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসুনেত্রে সে নন্দিনীর দিকে তাকাইল।

—কি আর হবে ওখানে থেকে, সব শেষ হয়ে গেছে।...

শান্ত সহজ সুরে নন্দিনী বলিল।

তাহার পর সমরেশের ডান হাতটি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া সে বলিল, আর দেরি ক'র না, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী চল।

দিয়াশলাই-এর কথা

অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায় এম-এ

"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" বলিয়া যে জাতির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম সূক্ত রচিত হইয়াছিল সেই জাতি যে অগ্নি উৎপাদনের উপায় জানিতেন না, কিংবা অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় সেই জাতির প্রতি অবিচার করা হইবে। আজও যে সেই আর্য্যজাতির এক বিশিষ্ট শাখা অগ্নি-উপাসক। আজ ভারতের কোনও স্থানে 'সাগ্নিক ব্রাহ্মণ' আছেন কি-না জানি না, কিন্তু এই ভারতেই এমন একদিন ছিল যখন ব্রাহ্মণ-সন্তান উপবীতী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞাগ্নিকে আজীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃত-সংকল্প হইতেন। ব্রাহ্মণ সন্তানকে "দ্বিজ" করিবার জন্য যে অগ্নিকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত, সেই হোমাগ্নির পূর্ণ আহুতি হইত তাঁহার চিতাগ্নিতে। বস্তুত বেদে নীল-লোহিত, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা যে ভাবে তৎকালীন আর্য্যসন্তানদের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেন, অগ্নিও সেই হিসাবে কোন দেবতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং সেই হিসাবে অগ্নিদেব অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ অগ্নিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আজীবন শুধু সমিধই সংগ্রহ করিতেন এবং ক্ষত্রিয় রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে সাক্ষী রাখিয়া প্রজানুরঞ্জন ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। পক্ষান্তরে অবশ্য এ কথাও বলা যাইতে পারে যে তৎকালে অগ্নি-উৎপাদন করা অজ্ঞাত না হইলেও নিতান্ত সহজ ছিল না, কাজেই অগ্নিকে প্রাচীন আর্য্যেরা শুধু রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে কৃতসঙ্কল্প হইতেন কেবল তাহাই নহে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দেবতা জ্ঞানে পূজাও করিতেন।

মধ্য এসিয়াতে বাসকালীন যে জাতি অগ্নির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বহু জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, তখনও সেই অগ্নিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একদা যে "দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ" জাতি হোম-ধেনু মাত্র সাথী করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পবিত্র হোম-ধেনুটির মতই পবিত্র অগ্নিও সঙ্গে করিয়া আনেন নাই এ কথা কে বলিতে পারে? উত্তর কালে দেখা যায়, যে পৌরাণিক যুগে অগ্নি ভারতের তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে এক কুলীন দেবতা হইয়া স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তিনি দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা শ্রীমতী স্বাহা দেবীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন।

দক্ষ-প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র, সুতরাং দেব-সমাজে মহাকুলীন। তাঁহার এক জামাতা চন্দ্রদেব, অন্য এক জামাতা মহাদেব। এই মহাদেবের একটু আধটু নেশা-ভাঙ, করিবার অভ্যাস থাকিলেও তিনি যে কত বড় কুলীন তাঁহার পরিচয় আমরা পাই স্বয়ং অন্নপূর্ণার মুখে। পাটনীর নিকট নিজের পরিচয় দিতে গিয়া অন্নদা বলিতেছেন,

> "পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত।"
>
> —ভারতচন্দ্র

কাজেই—এই নেশা-খোর "অতি বড় বৃদ্ধ"টি যে কেবল কৌলীন্যের জোরেই দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অগ্নিদেব স্বাহাকে বিবাহ করিয়া এই পরম কুলীন দেবতার সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন। পরে তাঁহার আরও পদ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পদবৃদ্ধির সঙ্গে পদবীও মিলিয়াছে অনেক। তিনি অষ্টবসুর এক বসু, দ্বাদশ রুদ্রের এক রুদ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। পদবী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য দোষও যে আসিয়া জুটে নাই তাহাও নহে। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে নলের মুখে শুনিতে পাই—

> "ইন্দ্র অগ্নি বরুণ শমন,
> চারি জন তব প্রেম করি অকিঞ্চন,
> পাঠাইলা হেথা মোরে। —গিরিশচন্দ্র

পৌরাণিক প্রবন্ধাদি ঘাঁটিয়া নিতান্ত অরসিক অগ্নিকে [illegible] প্রতিপন্ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই অগ্নি ভারতের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে একাঙ্গী হইয়া আছেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতীয় সামাজিকজীবনে, ধর্ম্মজীবনে, এমন কি, কর্ম্মজীবনে পর্য্যন্ত অগ্নির প্রয়োজন। সুতরাং এহেন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষটির উৎপাদন পন্থা যে প্রাচীন ভারত জানিত না, এ কথা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণে যে তাঁহারা অগ্নি-উৎপাদন করিতেন সে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সর্ব্বজনজ্ঞাত। কিন্তু গন্ধকের ব্যবহার তৎকালে অগ্নি উৎপাদনে প্রচলিত ছিল কি-না এ কথা নিসংশয়ে বলা কঠিন। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আরণ্যক ঋষিরা স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া হয়ত দার্শনিক চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার প্রয়োজনে অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া লইতেন কিংবা কোন অগ্নিহোত্রী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। তখনকার দিনে আধুনিক ফ্যাসানের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা-পান কিংবা মুহুর্মুহু ধূম-পানের ব্যবস্থা ছিল না। গভীর দার্শনিক ঋষিরা হয়ত সর্ব্বক্ষণই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন এবং দিনান্তে সামান্য ফলমূল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

তারপর আস্তে আস্তে বাতাস ভিন্নমুখী হইল। মানুষ আস্তে আস্তে

অজানার ধ্যান ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। নূতনের আবিষ্কার, নূতনের আস্বাদন এবং নূতনের মোহ মানুষকে পাইয়া বসিল। স্যার ওয়াণ্টার রালে যোড়শ শতাব্দীর লোক। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের আমলে স্যার ওয়াণ্টার, ড্রেক্, হকিমি প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি সমুদ্রের বুকে জলদস্যুর মত ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতেন। হঠাৎ স্যার ওয়াণ্টার রালে তামাক-পাতা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের ব্যবস্থা হইল। আর ধূমপান এমনি নেশা যে দিনান্তে একবার খাওয়ার মত জিনিষ নয়। নেশা যখন বেশ পাকিয়া ওঠে তখন কতক্ষণ পরেই ধূমপান করিতে ইচ্ছা হয়। ঘন ঘন ধূমপান করিতে হইলেই অগ্নি চাই। অথচ সর্ব্ব সময় অরুণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা সহজও নহে এবং সুচারুও নহে।

অভাব বহু জিনিষের জন্মদাতা। তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তামাক খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেমন মানুষকে পাইয়া বসিল, তেমনি সহজ ও সরল ভাবে অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টাও চলিতে লাগিল। নূতনের প্রীতি মানুষের মনের চিরন্তনী বৃত্তি। ফস্‌ফরাস আবিষ্কৃত হইতে না হইতেই জার্ম্মাণীর হামবুর্গ শহরে ব্রান্ত নামক এক ব্যক্তি ফস্‌ফোরাস দিয়াশলাই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সেই দিয়াশলাই-এর আকার ও কার্য্যকারিতা খুব সুশ্রী ও সুষ্ঠু বলা যাইতে পারে না। কোন রকমে মাত্র কাজ চালান গোছের সর্ব্বপ্রথম আধুনিক আকারের দিয়াশলাই তৈয়ারী হইল মাত্র। সামান্য ঘর্ষণ ও বিনা ঘর্ষণেই এই দিয়াশলাই জ্বলিতে লাগিল। আবার সামান্য মাত্র ঘর্ষণেই সমস্ত দিয়াশলাই জ্বলিয়া মানুষের হাত-পা পোড়াইতে লাগিল। ফলে, এই জাতীয় দিয়াশলাই ব্যবহারে বিশেষ কোন নিরাপত্তা রহিল না। প্রায় দুইশত বৎসর পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন্ ওয়াকার নামক জনৈক ইংরেজ সর্ব্ব প্রথম "Safty Matches" বা নিরাপদ দিয়াশলাই আবিষ্কার করিলেন। এই দিয়াশলাই কোন অংশেই ব্রান্তের দিয়াশলাই হইতে খুব বিশেষ উন্নত হইল না সত্য, কিন্তু খুব জোরে না মারিলে ইহা জ্বলিত না, ইহাই ছিল ইহার বিশেষত্ব। ১৮৫৫ খৃঃ ষ্টক্‌হলম শহরের ল্যাণ্ড, ষ্টরম আর এক প্রকার 'নিরাপদ দিয়াশলাই" আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ লেণ্ডষ্টরমের দিয়াশলাইকেই সর্ব্ব প্রথম "নিরাপদ দিয়াশলাই" বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন এবং জন্ ওয়াকারের আবিষ্কৃত দিয়াশলাই-এর নামকরণ করেন "লুহিকার"। সে যাহা হউক, লুহিকার ও ল্যাণ্ডষ্টরমের আবিষ্কৃত দিয়াশলাই বাজারে চলিতে লাগিল এবং আস্তে আস্তে ইহা আধুনিক বেশে সজ্জিত হইয়া আধুনিক নিরাপদ দিয়াশলাই-এ পরিণত হইল।

পৃথিবীতে যখন তামাক ও অগ্নির নবীন বাহক দিয়াশলাই লইয়া নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছিল, চির-দার্শনিক ভারতও তখন নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিল না। ভারতে তখন মোগলের সাম্রাজ্য। আকবর বাদশাহের মিলন-নীতিতে ভারতের অগ্নি-গর্ভ বক্ষ-ব্যথা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের প্রভূত সম্পদ, অশেষ ঐশ্বর্য্য, স্বর্ণ-প্রসূ জমির খবর রূপকথার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্যার টমাস রো প্রভৃতি বিদেশী রাজদূত তখন ভারতে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সামাজিক জীবনেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তামাকের ধূমপান আসিয়া আস্তে আস্তে ভারতের সরল জীবন-যাত্রা প্রণালীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মোগল-যুগের প্রাচীন চিত্র হইতে দেখা যায় যে, আকবর বাদশাহের সময় হইতেই গড়গড়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গন্ধ-প্রিয় বাদশাহ জাহাঙ্গীর আফিংখোর হইলেও যে তামাক সেবন করিতেন না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তামাকের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-রক্ষার উপায়ও ভারত আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইল। কারণ তামাক সেবন ছিল তখনকার দিনের বিলাস-ব্যসন; কাজেই একই তামাক নানাভাবে নানা নামে রূপায়িত ও অভিহিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবনের ব্যবস্থাও হইল। ঠাকুর-মার মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, তখন প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই একটি মাটীর পাত্রে তুষের আগুন করা হইত এবং কতকগুলি পাট-কাঠির অগ্রভাগে গন্ধক মাখাইয়া রাখা হইত। যখনই কাহারও তামাক সেবনের ইচ্ছা হইত, তাহারা ঐ আগুনের পাত্র হইতে আগুন পাইতেন এবং অন্যান্য কার্য্যে পাট-কাঠি জ্বালাইয়া দীপ-শলাকার অভাব পূর্ণ করা হইত।

তারপর কোম্পানীর রাজত্বের শেষ দিকে ভারতে দিয়াশলাই আমদানি হইল। মুসলমান আমলে ভারত অধোবাস, বহির্বাস, উত্তরীয় ইত্যাদি ছাড়িয়া চোগা-চাপ্‌কান ধরিয়াছিল, কোম্পানীর রাজত্বে ভারত কোট-প্যাণ্ট পরিতে শিখিল, নেক্‌টাই বাঁধিল, সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিল। মধ্য যুগের সভ্যতার শিখর হইতে গড়গড়া গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সভ্য সাধারণের পকেটে সিগারেট ও দিয়াশলাই শোভা পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশেও যে দিয়াশলাই প্রস্তুতের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল না তাহাও নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৮৬-৯০) বাংলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু সেই কারখানা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, পর্য্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যাপারিক প্রেরণার অভাবে। তারপর ১৮৯৪-৯৫ খৃঃ মধ্যভারতের বিলাসপুর অঞ্চলে কয়েকটি দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপিত হইল, আমেদাবাদেও কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু তন্মধ্যে কেবল কোঠার অমৃত ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও আমেদাবাদের ইস্‌লাম ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীই বাঁচিয়া রহিল। অন্য সব কারখানা ভারতীয় শিশুর মত কেহ-বা আঁতুড়ে, কেহ-বা অন্নপ্রাশনের সময়ই বিনষ্ট হইল। মধ্যে ১৯০৫ সালে স্বদেশী যুগের শুভ প্রভাতে এবং ১৯২০ সালে স্বরাজী যুগের পবিত্র ঊষায় বাংলা ও ভারতের নানাস্থানে দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯০৫ ইং সালে দিয়াশলাই-এর কারখানাগুলি পূর্ব্বেই নানা কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বদেশী যুগের কারখানাসমূহের মধ্যে আজও কয়েকটি বাঁচিয়া আছে এবং সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। স্বরাজী যুগের আবহাওয়ায় যে সব কারখানার জন্ম হইয়াছিল এবং যাহারা আজ পর্য্যন্তও বাঁচিয়া আছে, তন্মধ্যে ইসাভি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী, মহালক্ষ্মী ম্যাচ ফ্যাক্টরী এবং বেরিলী ম্যাচ্ ওয়ার্কস্ প্রভৃতিই প্রধান।

এদিকে জাপান ও সুইডেনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল না। ১৯২৬ইং সালে দেখা যায় যে, সুইডেন ভারতের স্থানে স্থানে কারখানা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি সুইডেন কলিকাতা, অমরনাথ, প্যারেল, ধুবড়ী, রেঙ্গুন, মান্দালে প্রভৃতি ছয়-সাতটি স্থানে কারখানা খুলিয়াছে এবং অল্প কয়েকদিন হইল মাদ্রাজেও একটি কারখানা খোলা হইয়াছে। জাপান কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে একটি বিশাল ফ্যাক্টরি স্থাপিত করিয়াছে। ফলে দেশী ও বিদেশী দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী মিলিয়া কোন রকমে ভারতের চাহিদা মিটাইয়া চলিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের বন-গবেষণা বিভাগের (Forest Research Institute) দিয়াশলাই-এর কাঠির কাঠ লইয়া নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছিল; হঠাৎ এই যুদ্ধ বাধিয়া দিয়াশলাই শিল্পের ক্রমোন্নতির পথে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করিল।

সমগ্র পৃথিবীর বাৎসরিক চাহিদা গড়পড়তা প্রায় পনর কোটী গ্রোস্, তন্মধ্যে ভারত একাই শতকরা নয় ভাগ, প্রায় এক কোটী পঁচাত্তর লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই ব্যবহার করিয়া থাকে। এই এক কোটী পঁচাত্তর লক্ষ গ্রোস্ দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত জিনিষপত্রের প্রয়োজন হয় তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। এই সকল দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে চাই—

কাঠ	৬৫,০০,০০০ লক্ষ টাকার,
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	২৪,০০,০০০ "
কাগজ	১৬,০,০০০০ "
অন্যান্য জিনিষ	১১,০০,০০০ "

এই সমস্ত সম্মিলিত দ্রব্যাদির ব্যবসার মূল্য ন্যূনাধিক সোয়া কোটি হইতে দেড় কোটি টাকার মধ্যে এবং ইহাও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতকে ভারতের চাহিদা মিটাইতে হইলে আধুনিক শ্রম-লাঘবকারী নানাবিধ যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এই এক দিয়াশলাই শিল্পেই দৈনিক দশ হাজার হইতে পনর হাজার লোকের প্রয়োজন। অথচ দিয়াশলাই শিল্প চালাইবার মত যে সমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন, ভারতে তাহার কোনটারই অভাব নাই। বন-বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে কেবল দিয়াশলাই শিল্প-উপযোগী কাঠই ভারতের বনে-জঙ্গলে রহিয়াছে আঠাত্তর রকমের। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলিয়াছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও নানা জাতীয় কাঠের সন্ধান পাইব। এতদ্ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদিও এ দেশে কম নহে। ভারতের বনেও ভারতের খনি শিল্পোন্নতির প্রধান সহায়। সম্প্রতি শুধু দিয়াশলাই-আবরক কাগজ এদেশে প্রস্তুত করিতে পারা যায় না বলিয়া দেখা যাইতেছে। তবে আশা করা যায় যে তাহাও অতি শীঘ্রই এ দেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারত যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে 'দরিদ্রের মনোরথ', হইলেও ক্ষীণ আশার যে সঞ্চার হয় না তাহা নহে। এখন পর্য্যন্ত ভারতে আটষট্টি কারখানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে—

বাংলা—	২৩
মাদ্রাজ—	১৯
বোম্বাই—	১১
ব্রহ্ম—	৫
বিহার—	৩
মধ্যপ্রদেশ—	২
যুক্তপ্রদেশ—	২
আসাম—	১
পাঞ্জাব—	১
কাশ্মীর—	১
	৬৮

এতদ্ভিন্ন বহুস্থানে কুটীরশিল্প-হিসাবেও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। খাদিপ্রতিষ্ঠান কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু কাগজ ও বাঁশের কাঠি দিয়া যে দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছে তাহা সুদৃশ্য না হইলেও অকেজো নহে। অথচ এই জাতীয় কুটীরশিল্পকে সরকার সামান্য সাহায্য করিলেই হয়ত ইহার দেখাদেখি আরও দশটা কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

নিখিল ভারতীয় পল্লী-শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা All-India Village Industries Association দিয়াশলাই শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে বাঁশের শলা, তাল ও নারিকেলের কাঠি দ্বারা দিয়াশলাই-এর কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে। লেখক—পাট কাঠির প্রস্তুত দিয়াশলাই নিজে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছে। উক্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি বাজার-চলন দিয়াশলাই-এর কাঠির মত সুদৃশ্য ও সরল না হইলেও কার্য্যকারিতা হিসাবে মন্দ নহে। অকেজো কাগজ দিয়া খাদিপ্রতিষ্ঠানের মত বাক্স তৈয়ারী করাও সহজ এবং দেশেও অকেজো কাগজের কোন অভাব নাই। ময়দার আঠা প্রস্তুত করিতে অবশ্য পয়সা খরচ হয়, কিন্তু ভারতের যত্রতত্র এমন অনেক গাছ আছে যাহার রস হইতে খুব ভাল আঠা প্রস্তুত হয়। অন্য সব দেশ হইলে হয়ত এই সব গাছের আঠাই Gum Acacia কিংবা Gum Arabia নামে ফার্ম্মোকোপিয়ার ঔষধের তালিকায় স্থান পাইত। কিন্তু এত সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দিয়াশলাই-শিল্প কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, হাতের তৈয়ারী দিয়াশলাই কার্য্যকারিতা হিসাবে কলের তৈরী দিয়াশলাই-এর সমকক্ষ হইলেও কলের তৈরী দিয়াশলাই-এর মত সুদৃশ্য নহে এবং মজবুতও নহে। কাঠিগুলির সংখ্যা কম না হইলেও কাঠিগুলিও তেমন সমান ও সুশ্রী নহে। অথচ সরকারী লাইসেন্স-ষ্ট্যাম্প, আবগারী শুল্ক ইত্যাদি দিয়া হাতের তৈয়ারী দিয়াশলাই-এর দাম কলের তৈয়ারী দিয়াশলাই অপেক্ষা পড়তায় কম পড়ে না। ফলে ক্ষীণজীবী কুটীর শিল্প প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতে থাকে। ক্রেতা-সাধারণ সমান দামে সুদৃশ্য মজবুত দিয়াশলাই পাইলে হাতের তৈয়ারী কুরূপ দিয়াশলাই নিতে চায় না।

অন্যদিকে সরকারী ট্যাক্স ও মাশুলাদি দিয়া কুটীর-জাত দিয়াশলাইও সস্তা দরে বিক্রী করা যায় না। সমান দামে সুশ্রী অথচ সমান কার্য্যকরী জিনিষ পাইলে কেহই কুরূপ জিনিষ লইতে চায় না। সৌন্দর্য্য-প্রীতি মানবমনের জন্মগত তৃষ্ণা। দেশ-প্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতি নিতান্ত তীব্র না হইলে এই চিরন্তনী বৃত্তিকে অপসারিত করা সহজসাধ্য নহে। এমন কি এই পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িয়া অনেকেই সদ্‌বৃত্তি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সে যাক্‌, বর্ত্তমান দিয়াশলাই শিল্পের কথাই ধরা যাউক।

ভারতীয় ফিস্‌কাল কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে ভারতীয় বাণিজ্য শুল্ক সমিতি বিদেশজাত প্রতি গ্রোস্‌ দিয়াশলাই-এর উপর দেড়টাকা রক্ষা-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছিলেন। এই রক্ষা-শুল্কের ছত্রচ্ছায়াতে বহু নূতন কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, হয়ত তাহারা রক্ষা-শুল্কের দেওয়ালের অন্তরালে আত্ম-গোপন করিয়া কোন রকমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব শিশু-শিল্পের সুকুমার দেহও তাজা এবং মজবুত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সাবধানী সুইডেন ও জাপানের শনির দৃষ্টি ইহাদের পশ্চাতে লাগিয়াই রহিল। ফলে রক্ষা-শুল্ক হইতে বাঁচিবার প্রত্যাশায় সুইডেন আসিয়া ভারতে একাদিক্রমে ছয়-সাতটি কারখানা খুলিয়া বসিল এবং জাপানও সঙ্গে সঙ্গে সুইডেনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিল।

রক্ষা-শুল্কের ছায়ার অন্তরালে থাকিয়া প্রখর প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার আশায় যে কয়টি শিশু-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে শিশু-লীলা সাঙ্গ করিল। অবশ্য তাহার পর যে আর নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে নাই তাহা নহে, কিন্তু ছোট খাট ক্ষীণজীবী শীর্ণকায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতার ঝড়-ঝাপ্টায় পড়িয়া ছিন্নপত্রের মত উড়িয়া গেল। তারপর কুটীর-শিল্পের প্রশ্ন আসিয়া দেখা দিল। খাদিপ্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া কুটীর-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক বাদানুবাদই গত ফেব্রুয়ারী (15.2.39) মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হইয়া গেল, কিন্তু ফল হইল উল্টা। কুটীর-শিল্পের রক্ষাকারী দল ভোটে হারিয়া গেলেন। তারপর যুদ্ধ বাধিল—এক পয়সার দিয়াশলাই দেড় পয়সা এবং দেড় পয়সার দিয়াশলাই দুই পয়সায় বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত সরকারের শ্যেন দৃষ্টি না থাকিলে দর আরও বাড়িয়া যাইত, কিংবা যুদ্ধ আরও কিছুকাল চলিলে হয়ত এই অত্যাবশ্যক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষটি দর চড়াইতে হইবে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি?

প্রশ্ন

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

আজ সখি মনে হয় যেদিকে তাকাই
এই শ্যাম ধরণীর আদিকাল হ'তে
তুমি আর আমি ছাড়া কোথা কেহ নাই,
শুধু মোরা ভ্রমিতেছি সীমাহীন পথে।

আজিকে দাঁড়াতে চাই আমরা দুজনে
যৌবনের মধুলগ্নে মুখোমুখি হয়ে,
নীরবে কহিতে চাই যাহা আছে মনে
নিস্তব্ধ প্রহরগুলি যবে যাবে বয়ে।

কি কহিবে তুমি সখি, কি কহিব আমি?
সে কথা জানেন শুধু মূক অন্তর্যামী?
বাহিরে হাসিবে চাঁদ, ঝরে' যাবে ফুল,
হৃদয়ের সরোবরে নাহি রবে কূল,
থেমে যাবে হাসি-গান, মরে যাবে ভাষা,
মাঝে রবে জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসা?

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(৪)

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নরনারীর আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। আবার পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রসারিত হয়, নারীরও তেমনি সময়োচিত শিক্ষার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তা যেখানে না হয়, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিষময় হ'য়ে ওঠে, তাদের একত্র বাস দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। পুরুষ যেখানে শিক্ষায়, জ্ঞানে, অভ্যাসে, অধ্যবসায়ে তার পুরাতন গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে জগৎকে বড় ক'রে দেখ্‌তে আরম্ভ করে, নারীরও সেখানে সমানতালে পা ফেলে চল্‌তে হয়। জাপানের স্ত্রী-পুরুষ ঠিক তেম্‌নিভাবেই চলেছে। আগেকার দিনের সীমাবদ্ধ জীবন আর তাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। 'গেইসা'—ব্যবসায়ের ক্রমাবনতিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'গেইসা'—অনেকটা আমাদের দেশের বাঈজীদের মতো। খোলাখুলি গণিকাবৃত্তি তাদের ব্যবসা নয়; সামাজিক বা পারিবারিক উৎসবে তারা নাচে-গানে আনন্দ বর্দ্ধন করে। প্রাচ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্প্রদায় বহু পুরাতন কাল থেকে চলে' আস্‌ছে। জাপানেরও 'গেইসা' বিশ্ববিদিত। জাপানের যে-কোন অনুষ্ঠানে 'গেইসা' অপরিহার্য্য। আমাদের দেশের বাঈজীদের কেহ কেহ যেমন বিবাহ ক'রে সংসারী হয়ে থাকে, এদেরও অনেকে তাই ক'রে থাকে। বর্ত্তমানে 'গেইসা'-ব্যবসায় প্রায় অচল হ'য়ে এসেছে। কারণ, যদিও হাস্যে লাস্যে তা'রা মনোরঞ্জন করে, তাদের কথাবার্ত্তায় না আছে মার্জ্জিত রুচির পরিচয়, না আছে কোন গুরুত্ব; তাদের অনুগ্রাহকদের কাছে তাই তারা যেন হয়ে উঠেছে অসহ্য—বিরক্তিকর।

কামাপুরার বুদ্ধমূর্ত্তি

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ যেমন বেড়ে চলেছে, ভালো কলেজের ডিপ্লোমাও তেম্‌নি মেয়েদের বিয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে উঠছে। চীনদেশে একটা প্রথা আছে যে ক'নেকে স্বামীর বাড়ী যাওয়ার সময় কোন নামজাদা চিত্রকরের একখানা ছবি নিয়ে যেতে হয়, জাপানেও তেম্‌নি ডিপ্লোমা নিয়ে স্বামীগৃহে যাওয়াটা যেন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলে নারী-আন্দোলন ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করছে। যে সকল স্থানে এতদিন নারীর প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেখানেও ক্রমশ তারা অধিকার স্থাপন করছে। সমাজ-সেবা, সাহিত্য, চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এখন নারীদের দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং সর্ব্বত্রই তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। অর্থনৈতিক চাপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলস্বরূপ অধিকসংখ্যক নারী এখন বাইরে এসে কর্ম্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। অফিসের টেবিলে, দোকানের কাউণ্টারে, ট্রাম-বাসের কন্‌ডাক্‌টার-রূপে, হোটেলের পরিচারিকারূপে এখন হাজার

হাজার নারী দেখা যায়। বস্তুতঃ এমন কোন প্রতিষ্ঠান এখন কম দেখা যায়, যেখানে নারীশ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। পাওয়া শক্ত—যে খায় কম শোনে কম এবং কথা বলে তা'র চেয়েও কম।

নাগোয়া দুর্গ

এই পরিবর্ত্তনের ফলে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ভিতরও অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। আগেকার আমলে বিয়ের উদ্দেশ্যই ছিল বংশরক্ষা। ভারতের মতো—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ছিল জাপানীদের রীতি ও নীতি। পুত্র না হ'লে দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একমাত্র কন্যাসন্তান থাক্‌লে তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী না পাঠিয়ে জামাইকে এনে সংসারে রাখা হ'ত ঘর-জামাই ক'রে। তাকে শ্বশুর-বংশের পদবী পর্য্যন্ত গ্রহণ কর্‌তে হ'ত। জ্যেষ্ঠ পুত্র—ছেলের তরফেই হোক, আর মেয়ের তরফেই হোক—সে-ই হবে সম্পত্তির অধিকারী। কনিষ্ঠদের কোন অধিকারই নাই। জ্যেষ্ঠই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এর ফলে যত পারিবারিক ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়, আধুনিক জাপান তা আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

বিবাহ-আইনেও অনেক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে। নবদম্পতিকে নির্দ্দিষ্ট সরকারি আফিসে তাদের বিয়ের নোটিস দিতে হয়। গির্জ্জা বা মন্দিরে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ক'রে বহু লোকজন নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েও আইনের

পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগও তেম্‌নি তাদের বেশী এসেছে। প্রকৃতি তাদের হ'য়ে উঠ্‌ছে চঞ্চল এবং ঘর-কন্নার ব্যাপারে কমে' যাচ্ছে তাদের সহিষ্ণুতা। ঝাঁটা হস্তে ধূমাবতী সাজ্‌তে এখন তারা আর ততটা রাজি নয়; ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের অভাব তারা এখন অনুভব কর্‌তে শিখেছে। তারা এখন খুংখুঁতে হ'য়ে উঠেছে। ঝি না রাখ্‌লে এখন তাদের আর চলে না। ভালো ঝি পাওয়াও খুব সহজ নয়। খরচ যদিও খুব বেশী নয়, কিন্তু এমন ঝি

আরাসিয়ামার একটি মনোরম স্থান

চোখে তাদের বিবাহ সিদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না এই নোটিশ পেশ করা হয়। এমন কি, বছরের পর বছর যদি তারা একসঙ্গে

বাস ক'রে থাকে, তাদের ছেলেপিলে হ'য়ে থাকে, তবুও এই নোটিস্ না-দেওয়া হ'লে তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য নয়। তাদের সন্তানকে জারজ ব'লে রেজেষ্ট্রি করা হবে এবং মায়ের কাছে তারা থাক্‌বে তার অভিভাবকত্বে। অপর পক্ষে নোটিস্ দেওয়া হ'লে, এক-দিনের জন্য একসঙ্গে বাস না করলেও তারা স্বামী-স্ত্রী! গির্জ্জা বা মন্দিরে মন্ত্র-পড়ার কোনই মূল্য নাই; লোকজন খাওয়ানো শুধু ভূতভোজন!

মন্দিরের ভিতরের কারুকার্য্য

জাপানে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তার জন্য কোন স্বতন্ত্র আদালত নাই। সাধারণ আদালতেই বিবাহ-বিচ্ছেদের যতকিছু ব্যাপার, জারজ-সন্তানের পিতৃত্বের দাবী-সংক্রান্ত যতকিছু মামলার বিচার হয়। ফলে বহু স্ত্রীলোকই লজ্জায় ও কেলেঙ্কারির ভয়ে পারিবারিক অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌তে আদালতে যেতে সাহস পায় না। তা ছাড়া, খরচও সেখানে কম নয়। আদালত সর্ব্বত্রই সমান—যেমন বাংলায়, তেম্‌নি জাপানে।

একটি পার্কের দৃশ্য

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পারিবারিক বিধানের ভিতর বেশ একটু তফাৎ আছে। পাশ্চাত্যে স্বামী-স্ত্রীকে নিয়েই সংসার। পুত্র-কন্যার তার ভিতরে বিশেষ একটা স্থান নাই। সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ যতই প্রবল হোক, বড় হ'লে তারা পিতামাতার সংসার থেকে পৃথক্ হ'য়ে যাবে এবং নূতন সংসার পেতে বস্‌বে। এই নূতন সংসার পিতামাতার সংসারের সংস্কার, ভাবধারা, রীতি ও নীতি—কোন কিছুরই ধার ধারে না। তারা নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করে। উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে একমাত্র স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই তারা পায় না। পিতা-মাতার সংসারের ধর্ম্মগত বা নীতিগত প্রভাব তাদের উপর পড়ে না। স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গেই সেখানে পরিবারের

শেষ; তার কোন পারম্পর্য্য নাই। নূতন পরিবার যা গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে পুরাতন পরিবারের কোন দেনা-পাওনা নাই।

নিককোর বিশ্ববিখ্যাত মন্দির

প্রাচ্যের ব্যবস্থা অন্যরূপ। বহু পরিজন নিয়ে এখানে পরিবার। বয়োজ্যেষ্ঠ সংসারের কর্ত্তা; তিনি কর্ত্তব্যে কঠোর, নিষ্ঠায় দৃঢ় এবং বংশের প্রকৃতি ও সংস্কার অব্যাহত রাখতে তিনি অতি সতর্ক। জাপানীরাও পরিবারকে দীর্ঘ-

গিওন বা রথ উৎসব

দিন বাঁচিয়ে রাখা অতি আবশ্যক মনে করে। উত্তরাধিকারের মানে সেখানে কেবলমাত্র সেই সম্পত্তিলাভ নয় যার একটা বাজার দর আছে, বংশগত সংস্কার ও ধ্যান-ধারণাকে বজায় রাখাও তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। একটা বংশের প্রতিষ্ঠা হ'লে, তাকে যেরূপেই হোক বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে; তাতে রক্তের সম্বন্ধ না থাক্‌লেও ক্ষতি নাই। পুত্র না থাক্‌লে দত্তক গ্রহণে বাধা নাই। হিন্দু গার্হস্থ্য বিধানের মতো জাপানেও রক্তকে তত বড় স্থান দেওয়া হয়নি, যত দেওয়া হয়েছে বংশগত সংস্কার ও ঐতিহ্যকে।

কাজেই জাপানী সংসারে স্ত্রীকে একেবারেই পরিবারের চিরাচরিত ভাবধারার ভিতর

সেকাল ও একাল

ডুবে যেতে হয়। যতই সে পতিপরায়ণা হোক না কেন, সংসারের এই ভাবধারার সঙ্গে যদি সে সম্পূর্ণ-

রূপে মিশে যেতে না পারে, তা হ'লে সংসারের একজন ব'লেই সে গণ্য হবে না। তার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হ'তে পারে। জাপানে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা মস্ত বড় কারণ—এই ভাবগত অসঙ্গতি। বংশরক্ষার জন্য পুত্রের জন্মদানও স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে। বর্ত্তমানে অবশ্য এ অপরাধে বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব কমই হ'য়ে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এটা খুব গুরুতর অপরাধ ব'লেই গণ্য হত।

একান্নবর্ত্তিতা জাপানে ক্রমশঃই অচল হ'য়ে উঠেছে। সহজলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের যুগে, ভূমিজাত আয়ের নবাবীর আমলে যে একান্নবর্ত্তিতা ছিল অশেষ গুণের আকর, বর্ত্তমানের

চেরি ও ফুজিয়ামা

কষ্টার্জ্জিত অর্থের যুগে তা হ'য়ে উঠেছে বিড়ম্বনার উৎস। একান্নবর্ত্তিতাকে জাপান তাই অর্থনীতির ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। তাই সে দেশে এক পরিবারের লোকদের ভিতর সম্পর্ক আছে, কিন্তু সম্পর্কের জুলুম নাই; সহানুভূতি আছে, কিন্তু সমস্যা নাই।

একান্নবর্ত্তিতা অচল হওয়ায় অন্ন-সমস্যাও প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তার ফলে, আগে লোকে যে বয়সে বিবাহ কর্‌ত, ক্রমেই তা পিছিয়ে যেতে লাগ্‌ল। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় কোন পঁচিশ বছরের ছেলে অবিবাহিত থাক্‌ত না, কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পরে ত্রিশের এদিকে বিয়ে করার কথা কারও কল্পনাতেই আস্‌ত না। বিয়ের দরজা এমনি ক'রে বন্ধ হওয়ার ফলে বহু নারী পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে—চাকরির বাজারে এসে হানা দিতে লাগ্‌ল। অবস্থা আরও ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌ল। জীবনযাত্রার সমস্যা যতই ঘোরালো হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, পুরুষের বিয়ের বয়স ততই পিছিয়ে যেতে লাগ্‌ল এবং অতি অল্পদিনেই 'আদর্শ গৃহিণী ও সেবা-পরায়ণা জননীর' যে-একটা ধারণা জাপানী পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ছিল, অজ্ঞাতে কখন যে তা বিলুপ্ত হ'য়ে গেল কারো তা নজরেও পড়্‌ল না।

আজ, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করা নারীর পক্ষে খুব সাধারণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের

তসমো আগ্নেয়গিরি

আত্মানুভূতি জেগে উঠেছে এবং পুরুষের চেয়ে যে কোন অংশে তারা ছোট নয়, পুরুষের মতো তারাও যে শিল্প-বিজ্ঞানে সমান শিক্ষা-লাভের অধিকারী, জোর ক'রে তারা একথা আজ বল্‌তে আরম্ভ করেছে। 'আদর্শ গৃহিণী ও সেবাপরায়ণা জননীর' ইডিয়োলজি সামাজিক ও পারিবারিক বস্তুতন্ত্রতার সাম্‌নে অতি নিদারুণভাবেই হার মেনেছে।

পাশ্চাত্য পোষাক মেয়েদের ভিতর যখন প্রথম প্রচলিত হ'ল, অনেকের কাছেই সে ছিল একটা ভয়ানক হাসির ব্যাপার। রাজপথে মেয়েরা যখন স্কার্ট প'রে কোমর ভেঙে

বেঁটে মোটা পায়ে বিচিত্র রংয়ের মোজা প'রে সার্কাসের মেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের দেখে হাস্য সংবরণ করা অনেকের কাছেই কঠিন হ'য়ে পড়্‌ত! কিন্তু তাদের এ চেষ্টার ভিতর ছিল সত্যিকারের নিষ্ঠা। আজ প্রবাহের সঙ্গে দীর্ঘপথে যে-সব কাদা-মাটি মিশেছে, এ ফল তারই!

শুধু মেয়েদের কথা কেন, জাপানের সমস্ত কিছুই গত কয়েক বৎসর যাবৎ যেন আমেরিকার ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। জাপানের বাড়ীঘর, দোকানের সাজানো জানালা, নিওন-আলোর বাহার, জাজ্‌ বাজনা, নাচঘর প্রভৃতি দেখ্‌লে মনে হয়, মান্‌হাট্টানের সমস্ত বিলাস ঐশ্বর্য্য যেন সাগর ডিঙিয়ে জাপানে এসে হাজির হয়েছে। আধুনিক শহরের রাস্তায় দাঁড়ালে বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে যে কোথায় আছি—নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ এভিনিউ, না লণ্ডনের পিকাডেলি।

ওসাকার একটি রাস্তা

যাঁরা টোকিয়োর গিন্‌জা-রাস্তায় সন্ধ্যাকালে বব্‌-চুলো ভ্রু-আঁকা ঠোঁট-রাঙানো মেয়েদের দলে দলে ঘুর্‌তে দেখেন, তাঁরা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন না যে, তখনকার দিনের সে মেয়েদের কি কঠোর সংগ্রামই কর্‌তে হয়েছিল।

পাহাড়ের বুক চিরে জলের স্রোত যখন প্রথম প্রবাহিত হয়, তখন থাকে তা কাচের মত স্বচ্ছ; কিন্তু সাগর-সঙ্গমে পৌছিবার পথে চারিপাশের ময়লা-আবর্জ্জনার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সে হারিয়ে ফেলে তার স্বচ্ছতাকে। মানুষের জীবনও ঠিক এইরূপ। কিন্তু তার শেষ দিক্‌কার ঘোলা জল দেখে প্রথম দিক্‌কার পবিত্রতাকে অস্বীকার করা চলে না।

আজ জাপানের রাস্তায় রাস্তায় যে-সব স্ত্রীলোক চোখে পড়ে, তাদের দেখে' মনে হয় যে অতি অসহায়ভাবেই তারা হলি-উডের প্রভাবের কবলে পড়েছে। নবীনাদের ভিতর আমেরিকা-আনা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। তার কারণ এ নয় যে জল চিরকালই ঘোলা ছিল, স্রোত-

ছেলেদের পুতুল উৎসব
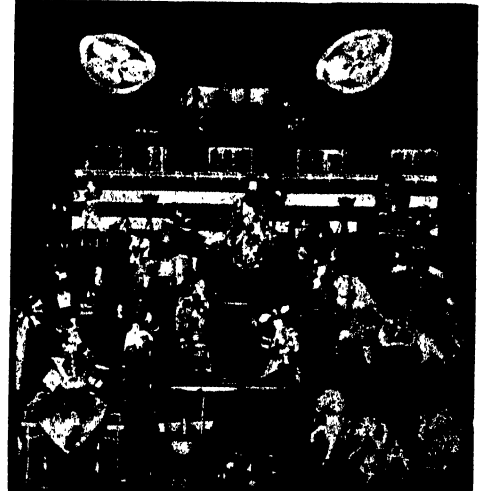
বিশ বছর আগে, জাপানে পাশ্চাত্যভাবের প্রসার হয়েছিল গবর্ণমেন্টের নির্দ্দেশে ও চিন্তাশীল মনীষীগণের প্রচেষ্টায়। কিন্তু এই আমেরিকা-আনার প্রচার কর্‌তে

কারও চেষ্টার দরকার হয়নি, কারও নির্দ্দেশের সে অপেক্ষা রাখেনি। এ যেন আপনা-আপনি হ'য়ে চলেছে। জাপান কি ভাবে চর্ব্বণ ক'রে হজম ক'রে এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের অনুকূল ক'রে তোলে, অথবা তার
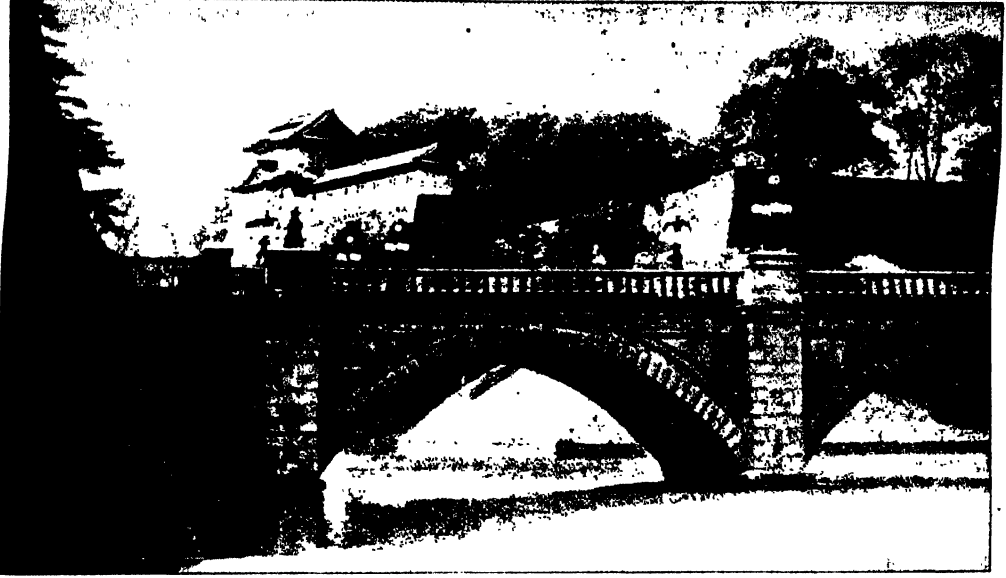
টোকিও রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথ

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাপানের পক্ষে এ একটা খুব বড় রকমের পরীক্ষা। এই আমেরিকার সভ্যতাকে কাছে নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন দেয়, এইটাই লক্ষ্য করবার বিষয়।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

গরবিণী তোর গরব ঘুচিয়া গেল
　　সিঁথির সিঁদুর পায়ের আল্‌তা সাথে
শঙ্কা পরাণে শোন্—গাহে হরিবোল
　　আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে তোর মাথে!
দুঃখের ভাত সুখে তুল্‌ছিলি মুখে
　　মোটা লালপাড় শাড়ীতে বাহার কত;
আজি ধব্‌ধবে সাদা থানে ঢাকা দেহ
　　শব যাত্রার ঠিক শবটিরই মত!
এয়োতির নোয়া-চুড়ির সাথে না বাজে,
　　মর্ম্মে হেনেছে কঠিন বজ্র তোর—

সকলের কাছে অপরাধী সম কত,
　　ঝরিছে কেবল দুইটি নয়নে লোর!
চক্ষের জল সার হ'ল আজ হতে,
　　বক্ষের মাঝে শঙ্কা ও স্মৃতি নিয়া
এমনি করিয়া কাটাইবি কত কাল,
　　সেবিকার সম সকলেরে সেবা দিয়া!
ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচিয়া গেছে—
　　বর্ত্তমানেতে চক্ষের জল সার—
অতীতের শুধু উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু
　　তোলে কম্পন হৃদয়েতে অনিবার!

মাংসের মনস্তত্ত্ব

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

আপনারা ডাক্তার নিখিলেশ চ্যাটার্জ্জির নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। কলিকাতার নামকরা ডাক্তার—এন্, চ্যাটার্জ্জি এম-এ, এম-বি—মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং হৃদ্‌রোগবিশারদ—বিডন্ ষ্ট্রীটে চারিতলা বাড়ীর সম্মুখের গেটে পিতলের ফলকে তাঁহার নাম ও টাইটেল নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়িয়াছে। আর যদি আপনার মাথার কোনও ছিট্ থাকে অথবা বুকের কোনও অসুখ হইয়াছে বলিয়া আপনার ধারণা হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবার ভাগ্য তো আপনার হইবারই কথা।

আপনারা জানেন কি-না জানি না—আমিও একজন এম-বি ডাক্তার—সম্প্রতি ডি-পি-এইচ্ টাইটেলটি নামের পিছনে লাগাইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। তবুও আমার সঙ্গে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির তফাৎ অনেক। কারণ আমার বয়স তিরিশ, আর ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি ডাক্তারি করিয়া চারতলা বাড়ী তুলিয়াছেন, কাজের চাপে স্নানাহারের ফুরসুৎ পান না—আর আমি আমার পৈত্রিক বাড়ীর দরজার সম্মুখে নামের ট্যাবলেট বসাইয়া দিবারাত্রি পাশবালিশ আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি—দিবানিদ্রা অথবা রাত্রির বিলাস নষ্ট করিবার মত সাহস কাহারও হয় না।

কিছুদিন হইল আমার সঙ্গে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির একটু বন্ধুত্বের মত ভাব হইয়াছে। অথচ মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার আমি ছাত্র ছিলাম। কলেজ ছাড়িবার পর তাঁহার অবশ্য বিশেষ খোঁজ খবর রাখি নাই—বছর খানেক আগে তাঁর সঙ্গে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে দেখা। বন্ধুটি বিবাহের পর প্যাল্‌পিটেশন্ অব্ দি হার্টে ভুগিতেছেন। তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম—ডাক্তার চ্যাটার্জ্জিকে কল্ দিতে। কারণ বিবাহের পর—বুকের অসুখ—সোজা কথা নয়। একাধারে হৃদ্‌রোগ বিশারদ ও মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের প্রয়োজন—নহিলে আমি কি দোষ করিয়াছিলাম।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি আমাকে দেখিয়া কহিলেন—কি হে, রাজু নাকি? এম-বি পাশ ক'রে ফ্যা ফ্যা করছিস্ তো—না প্র্যাক্‌টিস্ কিছু জমেছে?

—কই আর জমে স্যর। আপনারা যদ্দিন আছেন—আমাদের—আর মাথা তোলবার জো কি? ভগবান যদি দিন দেন—

মাথা নাড়িয়া ডাঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন—সে বুঝতে পেরেছি রাজু। কিন্তু যে আশা ক'রে রেখেছিস্—তার পূরণ হতে এখনও অনেক দেরী। আরও বছর তিরিশেক অপেক্ষা করতে পারিস্ তো তখন চেষ্টা দেখিস্। তোর বন্ধুর অসুখে যখন আমার ডাক পড়েছে—তখনই বুঝেছি তোর কেমন জমজমাট পসার। ... তারপর আমার বন্ধুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন—তোমার বুকের অসুখ? বুক তো বেশ চওড়াই দেখ্‌ছি বাপু—অসুখটা আবার কোথায় হ'লো! ... তারপর তাহার বুকের উপর সজোরে কয়েকটি টোকা মারিয়া কহিলেন—হুঁ, বুঝেছি। অল্পদিন বিয়ে করেছ না তুমি? ছোট টেবিলটার ওপর ফটোখানি—বউমার না? এখন বাপের বাড়ী বুঝি? ছয়মাস কাছ ছাড়া? বাপ্‌স্! যাক্, ওষুধ একটা দিচ্ছি—ঐটে নিয়ে একবার সোজা শ্বশুর বাড়ী চলে যাও—বউমাকে নিয়ে এস। ছয়মাস কাছছাড়াবাপু—বুকের আর অপরাধ কি! তিনি একটু মুচকি হাসিলেন, তারপর বত্রিশটি টাকা পকেটে পূরিয়া কহিলেন—রাজু, আমার ওখানে যাস্ মাঝে মাঝে। পসার কি করে হয় দেখ্‌তে পাবি।

মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির বাড়ী যাওয়া-আসা সুরু করিলাম। কিন্তু সুবিধা হয় না কিছুই—কেবল ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির কাছে অনেক রসাল গল্প শুনি, আর মাঝে মাঝে মুখরোচক খাদ্য খাই।

সেদিন মনে মনে ঠিক করিয়া গেলাম—নিশ্চয় আজ মনের কথা খুলিয়া বলিব। শুধু আড্ডা দিয়া আর সুখাদ্য খাইয়া আর লাভ কি! তাঁহার য়্যাসিষ্টাণ্ট করিয়া যদি মাঝে মাঝে কলে লইয়া যান—তবুও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখি ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি গুড়গুড়ি টানিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং সহাস্যে কহিলেন—রাজু, এসেছিস্ ভালই হয়েছে। মাংস-পরেটা খাবি নাকি?

—মাংস পরেটা খাব না—বলেন কি স্যর। নিশ্চয় খাব।

যে কাজের কথা বলিব ভাবিয়া আসিয়াছিলাম—তাহা বিস্মৃত হইলাম। মাংস সংযোগে পরেটা গলাধঃকরণ করিতে করিতে মনে হইল—যেন অমৃত। সোল্লাসে বলিয়া উঠিলাম—চমৎকার! আজকের রান্নাটা কে করেছে স্যর?

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি হুঁকার নল ছাড়িয়া দুই হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে খেয়ে যা, খেয়ে যা—যদি ভাল লাগে আর কিছু আসুক। কিন্তু আহাম্মক, কে রান্না করেছে ওকথা আর জিজ্ঞেস করিস না। আর আমি তো মাংস খাওয়া ছেড়েছি—জানিস্‌নে বুঝি? যে রান্না করে করুক—সে খোঁজে আমার আর দরকারই বা কি!

অবাক হইলাম। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির মাংসে কোনও দিন অরুচি ছিল না ইহা জানি—হঠাৎ এমন রুচি পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

—অবাক হচ্ছিস্ রাজু? মাংস আমার প্রিয় খাদ্য, কিন্তু প্রিয় হলেই যে তার জন্য ঝক্কি সামলাতে হবে—তার কোনও মানে আছে? হাস্‌ছিস যে? ছেলেমানুষ এখনও তুই রাজু—বুঝবি কি? তবে শোন্। সেদিন খেতে বসেছি—গিন্নি কাছে বসে খাওয়াচ্ছেন। সংসারের নানা তালে ঘোরেন—আমার কাছে বসে খাওয়ার তত্ত্বাবধান করার তাঁর ফুরসুৎ কোথায় বল্। বোধ করি সেদিন একটু ফুরসুৎ পেয়েছিলেন। বললেন—বলি মাংসটা খাচ্ছ কেমন? মনে করলাম—নিশ্চয় গিন্নির হাতের রান্না। বাটি শুদ্ধ মুখের কাছে ধরে সুপে এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম—আহা যেন অমৃত। তুমি রান্না করেছ বুঝি? সুন্দর হবে না! গিন্নি বললেন—পোড়া সংসারের জ্বালায় কি তোমার খাওয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময় আছে। নইলে নিত্যি তোমাকে মাংস রেঁধে দিতে পারিনে! তুমি যে কত মাংস ভালবাস—আমার চেয়ে আর অন্যের তা জানবার জো কি! না না, একটুও রাখতে পারবে না—আমার মাথা খাও। গিন্নিকে পরিতুষ্ট করতে বাটিটা একদম সাফ ক'রে ফেললাম। গৌরবে গিন্নির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

আমি হাসিতে লাগিলাম।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি ধমক দিয়া বলিলেন—তুই শুধু হা হা করে হাসতেই শিখেছিস্—অত হাস্‌লে প্র্যাক্‌টিস্ করবি কি ক'রে রে রাজু! তারপর শোন্। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে ওপরে যাচ্ছি—সিঁড়িতে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাব। মোহনবাগানের খেলা ছিল কি-না। আমাকে দেখেই সে বলে উঠ্‌লো—এতক্ষণে খেয়ে এলে বুঝি? না, তোমার জ্বালায় আর পারা গেল না দাদা—নিত্যি অবেলায় খাওয়া। তা মাংসটা আজ কেমন খেলে? অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালুম। হঠাৎ এ প্রশ্ন! বললাম—বেশ। ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। বলল—সত্যিই ভাল হয় নি দাদা? তোমাদের ছোটবৌমা আজ রেঁধেছেন কি-না! সত্যি ওর মাংস রান্নাটা আমার কাছে উপাদেয় লাগে। অবিশ্যি অন্য রান্নাও মন্দ নয়—কিন্তু ওর মাংসের মধ্যেই একটা বিশেষত্ব আছে। ভাবলুম—ভাইটি আমার নতুন বিয়ে করেছে। মাংসের মধ্যে তো বিশেষত্ব থাকবারই কথা। ভাইয়ের তখনও বলা শেষ হয় নাই।... দাদা, তোমার রোগীদের জ্বালায় আর পারা যায় না। নিত্যি যে অবেলায় খাওয়া তোমার। একসঙ্গে খাওয়ার একটা ইউটিলিটি আছে—জান তো? বল্ দেখি রাজু, এমন ভাই ক'জনের আছে?

আমার হাস্যসম্বরণ করা আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি পুনরায় সুরু করিলেন—একটু গড়িয়ে নেব ভাবছি—এমন সময় বোন এসে হাজির। এক গাল হেসে বললে—শুতে যাচ্ছ বুঝি? মাংসটা আজ কেমন খেলে? ... মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—চমৎকার! একটু সলজ্জ হাসি হেসে যেন বললে—মাংসটা আজ আমিই রেঁধেছি দাদা। কেমন জব্দ এখন বল দেখি। আগে যে বলতে—অকম্মার ধাড়ি—কোনও কাজের আমি নয়—আর এখন? যাই না কেন বল দাদা, তোমাদের জামাইবাবুটির রান্না কিন্তু আরও সরেস—তবে তিনি তেল ঘি একটু বেশী ঢালেন। আমাকে ফতুর করবার ফিকির আর কি! আমি ওঁর কাছেই রান্না শিখেছি কি-না। এমনি বদ অভ্যেস ওঁর দাদা—বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরে মাংস আর লুচি চাই-ই। না দেখলেই মুখটা এতখানি। সাধে কি আর ভাল ক'রে রান্না শিখতে হয়। তাই ভাবলাম একবার তোমাকে অবাক ক'রে দিই। আমার সত্যিই 'ভাল লেগেছে' দাদা? ... অবাক আমি সত্যিই হয়েছি—অস্বীকার করবার জো কি! বোনটির

আমার তিন বছর বিয়ে হয়েছে, প্রেম এখনও জমজমাট দেখতে পাচ্ছি। ··· যাক্ সেই দিনই মন স্থির ক'রে ফেললাম। রাত্রে স্ত্রীকে বললাম—দেখ, মাংসটা খেয়ে পেটটা যেন কেমন করছে। ভাবছি—মাংস খাওয়াটা ছেড়েই দেব। আর ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে—চল্লিশের ওপর ওটা না খাওয়াই ভাল, আমার তো পঞ্চাশ ঘেঁসে এসেছে। মাংসে লিভারের দোষ হয়, ব্লাড্ প্রেসার বাড়ে, কলিক পেন্ও হতে পারে। ব্লাড্ প্রেসারের ভয়টাই বেশী—দরাদ্দর কেমন লোকগুলো মরছে দেখ্ছো না। সাধ্বী স্ত্রী—আর আপত্তি করতে পারলেন না। সেই থেকে মাংস খাওয়া ছেড়েছি। তা তোর ভয় নেই রাজু, মাংস এখনও মাঝে মাঝে হচ্ছে—তোর ভাগ তুই ঠিক পাবি।—

আশ্বস্ত হইলাম। পসার না জমুক, মাঝে মাঝে মাংস জুটিবে তো।

অজয়ের চর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি বসে দেখি অজয় নদের চর,
নব নব রূপ ধরে সে নিরন্তর।
দূরে বহে স্রোত রজত রেখার মত
শত জলচর কলরব করে কত,
কাশ বনে তার যত চাতকের ঘর।

২

সোনালী উষায় প্রাতে তারে দিনমণি,
করে 'কোলারের' খাঁটি স্বর্ণের খনি।
ক্ষণেক পরেই শুভ্র রবির তেজে—
'গোলকুণ্ডার' হীরক আকর সে যে—
জগৎশেঠের বাদশাহী বন্দর।

৩

বৈকালে তার বুক দিয়া সারি সারি—
কুম্ভ লইয়া আসে যায় নরনারী।
তখন এ বেলা অপূর্ব্ব মনোলোভা,
ধরে এক নব কুম্ভমেলার শোভা—
আলো ও ছায়ার হরিহর-ছত্তর।

৪

যত দেখি তত তাতল ও সৈকত
মোর কাছে রাজে ভূতলে গগনবৎ।
পাই ও আকাশে হক্ না নেহাৎ নীচু,
তারা নয়, বটে মন-আলো-করা কিছু
করে পবিত্র প্রসন্ন অন্তর।

৫

ভূর্জ্জপত্র সম ওরে কভু দেখি
অচেনা আঁখরে কে গেছে কাব্য লেখি।
হেরি কৌতুকে, উল্লাসে বারবার
হ'ক এলোমেলো তবুও চমৎকার—
খেয়ালী কবির ছড়ানো ও দপ্তর।

৬

প্লাবন পুলক ওই সে চরের মাঝে
জল-তরঙ্গ স্বরলিপি আঁকিয়াছে।
আমি আনমনে সে সুর বাজাতে চাই,
বুঝিয়া বুঝিনে, খেই খুঁজে নাহি পাই,
আঁখিজল দেয় অকথিত উত্তর।

৭

অপরূপ হয় সে মাঘী পূর্ণিমায়
ধূলায় গঠিত দেহ তার ঝরে যায়।
ভালে শশী তার, পুণ্য শুভ্র দেহ
ভুল করিবে না যদি শিব ভাবে কেহ—
মুক্ত আত্মা অনিন্দ্য সুন্দর।

৮

অজয়ের চর ভুলায় আমার মন
দর্শনীয়ের পাই সেথা দরশন।
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি,
আমি ত তারেই কন্যা কুমারী জানি।
সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

বুদ্ধদেব ও ওমর-খৈয়াম

শ্রীসুবোধ রায়

স্বর্গীয় বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এ মেয়েদের মুখে রন্ধনশিক্ষার যে গান দিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন :—

"চিতল মাছে মেথির গুঁড়ো, ইলিশ মাছে আদা
তুমি দিও না – দিও না।"

বুদ্ধদেবের মতামতের সঙ্গে ওমর খৈয়ামের মতামত আলোচনা উক্তরূপ নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে, এ সন্দেহ অনেকের মনে উদয় হওয়ায় আমার প্রাবন্ধিক সুপ-কারিত্বের রুচি সম্বন্ধে তাঁরা হয়তো নাসিকা কুঞ্চিত করবেন ; কারণ জন-সাধারণের মতে একজন ছিলেন বাসনাজয়ী ত্যাগী সন্ন্যাসী, আর অন্যজন বাসনাময় ভোগী কবি। অতএব এই দুটো মত একসঙ্গে আলোচনা করলে হয়তো স্পর্শদোষ ঘটতে পারে।

কিন্তু এইখানেই হয়েছে গোড়ায় গলদ। খোয়াজা ওমর-ইবন ইব্রাহিম অর্থাৎ ওমর খৈয়াম যে কবি ছিলেন একথা তিনি নিজেই জানতেন না এবং তাঁর দেশবাসীরাও কেউ মানতেন না। তাঁর দেশবাসীরা অর্থাৎ ইরাণবাসীরা তাঁকে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষী, সাহিত্যিক ও চিকিৎসক বলে জানত। অর্থাৎ, কাব্যজগৎ বাদ দিয়ে তাঁকে বিজ্ঞান ও দর্শন-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে মর্য্যাদা দিত। তা হ'লে এই রুবাঈগুলি কি? এগুলি হচ্ছে, দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মত এবং তাঁর সমসাময়িকদের প্রতি নীতি-উপদেশ। কিন্তু এগুলি গদ্যে না লিখে তিনি পদ্যে লিখ্‌লেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ইরাণের জাতীয় আদর্শ, উৎকর্ষ ও চিরপ্রচলিত ভাবধারার কথা বিবেচনা করতে হবে।

ইরাণ একটী অপূর্ব্ব কাব্যময় দেশ। সেদেশে সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রেই নিজের একটী "তখল্লুস"—Pen name—বেছে নেন এবং কাব্যরচনা অভ্যাস করেন। এমন কি, সেখানে অশিক্ষিতদের মধ্যেও সত্যিকার কবির অভাব নেই। জেনারেল স্যর জন্ ম্যাকম নামে এক জঙ্গী সাহেব ১৮০০ থেকে ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইরাণে ছিলেন ভারতের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত হিসাবে। তিনি নিজে খুব ভাল পার্সী জানতেন। তিনি লিখেছেন :—"ইরাণ পুষ্পময়, কাব্যময়, কবিতার দেশ ; ইরাণের কুলিমজুর ভিখারীরাও ভাল ভাল কবিদের বাছা বাছা কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, পদে পদে কবির উক্তি, ওদেশের প্রচলিত কাহিনী থেকে উল্লেখ শুনতে হয়। ও-দেশের কাব্যে ও সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে লোক-সাহিত্যে, ভাল জ্ঞান না থাকলে ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা কওয়া বিড়ম্বনা। ইরাণের শিক্ষিত সম্প্রদায় কে যে কবি নন, তা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।"

এ হেন দেশে জন্মে এবং দেশের তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজের মধ্যমণি হ'য়ে ওমর যে নিজের দার্শনিক মতামত প্রচারে রুবাঈ ব্যবহার করবেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? এরকম উক্তি যে আমাদের সকপোলকল্পিত নয়, তার প্রমাণস্বরূপ সংক্ষেপে ওমর সম্বন্ধে যেটুকু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে তার আলোচনা করা যেতে পারে।

ইরাণের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে খোরাসান্ প্রদেশ। নেশাপুর ঐ খোরাসানেরই একটী বড় প্রাচীন নগর। এই নেশাপুর ছিল সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র—আমাদের আগেকার নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীর মত। দূর দূরান্তর থেকে ছাত্রেরা আসত এই নেশাপুরে শিক্ষালাভ করতে। কারণ এখানকার টোলের প্রদত্ত উপাধি পারস্যের সকল প্রদেশে তখন বিশেষ সম্মানিত ছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই নেশাপুরে সাহিত্য ও ধর্ম্মাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় ইমাম মওফিকের টোল অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই টোল থেকেই ওমর খৈয়াম "হকীম" (Doctor of Philosophy) উপাধি লাভ করেন। তাঁর আর যে দুজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু তাঁর সঙ্গে "হকীম" উপাধিতে ভূষিত হন, তাঁদের নাম—অবু অলী অল হাসান ও হাসান বিন সাব্বাহ্। এই "তিন বন্ধুর" সুবিখ্যাত কাহিনী বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ব'লে সবিস্তারে বললাম না। তবে অবু অলীর প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে আবার দেখা দেবে ব'লে এখানে তাঁর নাম উল্লেখ ক'রে রাখলাম।

বৈজ্ঞানিক এবং গণিত ও ফলিত জ্যোতিষীরূপে ওমর খৈয়ামের প্রধান কাজ পঞ্জিকা সংস্কার। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে জালাল উদ্দীন মালিক শাহ্ রাজ্যলাভ করেন। সেকালে ইরাণের পঞ্জিকাতে ভুল দেখা যাচ্ছিল বলে' তিনি পঞ্জিকা-সংস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং বহু অর্থব্যয় ক'রে একটী মানমন্দির স্থাপনা করেন। এই মানমন্দিরে তিনজন জ্যোতিষী নিযুক্ত হয়েছিলেন—ওমর খৈয়াম ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। ১০৭৪ খৃঃ থেকে ওমর এই গণনার কাজ আরম্ভ ক'রে শেষ করেন ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে। ১০৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে ঐ জলালী সম্বৎ প্রচলিত করা হয়।

মনীষী ওমর দেহরক্ষা করেন ১১২৩ খৃষ্টাব্দে। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর তেত্রিশ বৎসর পরে খৈয়ামের ছাত্র নিজামী উরাসী "চহার মকালা" [চারি পর্ব্ব] নামে এক পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজামী উরাসী খৈয়ামের কাছে দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। তিনি ও খৈয়াম এক নগরবাসী, খৈয়ামকে বাল্যাবস্থা থেকে ভাল ক'রেই জানতেন এবং গুরু বলে সম্মান করতেন।

খৈয়াম সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন, সবই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ; শোনা কথা তিনি লেখেন নি। উক্ত পুস্তকের তৃতীয় পর্ব্বে তিনি খৈয়ামকে একজন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ফলিত-জ্যোতিষীরূপে বর্ণনা করেছেন। পরবর্ত্তী

গ্রন্থ (১১৯০ খৃঃ) শম্‌স্ উদ্দীন জোরীর অল-মুকৃতদ্দমীন ও অল-মুতাক্করীন (প্রাচীন ও পরবর্ত্তীকালের দার্শনিক পণ্ডিতদের ইতিহাস); এতে গ্রন্থকার খৈয়ামকে উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক বলে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ১২২৩ খৃষ্টাব্দে সূফী গ্রন্থকার শেখ নজম্ উদ্দীন অবুবকর রাজী আপন গ্রন্থ "মর্সাদ-উল-আবাদ"-এ খৈয়ামকে নিরীশ্বর, অজ্ঞেয়বাদী ও জড়বাদী ব'লে নিন্দা করেছেন :—

"বিশ্বভুবনখানির কোলে কোথেকে বা কোন্ কারণে
কিছুই নাহি বুঝ্‌তে পারি, আস্‌ছি ভেসে স্রোতের টানে ;
শূন্য করি' এ-কোল আবার, দম্‌কা-হাওয়ার ঘূর্ণিবেগে
বেরিয়ে যাব কোথায়, কেন ? পাইনে যে তার কোনই মানে।"

উপরোক্ত রুবাঈ উদ্ধৃত ক'রে তিনি খৈয়ামের অজ্ঞেয়বাদের প্রমাণ দিয়েছেন এবং নিরীশ্বরবাদের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত রুবাঈটি উদ্ধৃত করেছেন :—

"শিল্পী ওগো, গড়লে যদি মর্ত্ত্যভূমি মলিনতমা,
নন্দনেরও গোপন বুকে সর্প ভীষণ রাখ্‌লে জমা,
কলঙ্কিত মানব-জগৎ যে সব পাপে, তাহার লাগি'
ক্ষমা কর মনুষ্যদের—মানুষ তোমায় করছে ক্ষমা।"

এ-ছাড়াও পাঁচ-ছ'খানি প্রামাণ্য পার্সী কেতাব আছে, যাতে খৈয়ামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত পুস্তকেই তাঁকে হয় জ্যোতিষী বা অঙ্ক-শাস্ত্রবিৎ, না হয় দার্শনিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল লুৎফ্ আলী বেগ্ নামক জনৈক ইরাণবাসী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "আতশকদা আজর" নামক একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; তাতে এক এক প্রদেশের কবিদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। খোরাসান প্রদেশের কবিদের মধ্যে পাঁচ ছয় লাইনে ওমর খৈয়ামের জীবনী ও কতকগুলি রুবাঈ আছে। তা' হলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেশের ইতিহাসে তাঁর মৃত্যুর ৬৪২ বৎসর পরে কবিরূপে তাঁর উল্লেখ এই প্রথম ও শেষ। এই টিম্‌টিমে প্রদীপালোক যদি তাঁর কবিজীবনীর উপর কিছু আলোকপাত করে থাকে, তা হলে তা ইরাণের বাইরে যায়নি। ইরাণের বাইরে বিশ্বের দরবারে তাঁকে কবি করে তুললেন ফিটস্‌জিরল্ড সাহেব ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। তবে এর পরও একথা ভুললে চলবে না যে এটা ইউরোপীয় মত—ইরাণের বিদ্বৎসমাজের সুচিন্তিত মত নয়।

অনেক ওমর-ভক্ত হয়তো মনে করবেন যে ওমর যে কবি ছিলেন না, এ-সম্বন্ধে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ এনে তাঁকে খাটো করবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আসলে ব্যাপার ঠিক উল্টো। অর্থাৎ তিনি যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এর দ্বারা আমি বলতে চাই যে, খামখেয়ালী বা ভাবাবেগে সহজেই বিচলিত হবার মত লোক তিনি ছিলেন না, কল্পনারাজ্যের রঙীন বিলাস নিয়ে তাঁর কারবার ছিল না। চিন্তাজগতে কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন সুগঠিত হয়েছিল, কার্য্যকারণ-সম্পর্ক অনুসন্ধিৎসু, বিশ্লেষণপটু, অতিশয় যুক্তিবাদী ছিল তাঁর মন ; অপরের যুক্তি ও মতবাদ খণ্ডনে তৎপর হওয়াতে তাঁর বুদ্ধি হয়েছিল অতিশয় মার্জ্জিত ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। অতএব তাঁর দার্শনিক মতামত—যা আমরা রুবাঈ-এর মধ্যে পাই—তা কোন হাল্কাবুদ্ধি-প্রসূত নয়। বহু দুঃখ ও আয়াস, চিন্তা ও যত্নলব্ধ তাঁর এই নীতিজ্ঞান—বুদ্ধের মত তাঁকেও এর জন্যে দুশ্চর তপস্যা করতে হয়েছিল ; তবে দুজনের আদর্শের পার্থক্যবশত তপস্যার প্রকৃতি হয়েছিল ভিন্ন। একথা ভুললে চলবে না যে, দূরদূরান্তর থেকে ইরাণের নানা প্রদেশ থেকে শিষ্য ও ছাত্র আসতো ওমরের কাছে দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করতে। চিন্তাজগতে ও বিদ্যার রাজ্যে এরকম আকর্ষণী-শক্তি ফাঁকি অথবা চালাকির দ্বারা লাভ করা যায় না।

মানুষ মানুষের সম্বন্ধে কুৎসা যত সহজে বিশ্বাস করে, প্রশংসা তত সহজে করে না। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে আমার চেয়ে আর কেউ বড়, একথা ভাবতেও সাধারণত মানুষের বাধে। তাই বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে যার মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, তার চরিত্রে খানিকটা কালিমা লেপন করতে পারলে মনটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে—যেমন তার চরিত্রে কালিমা দিয়ে নিজের কালিমার উপর একটা সান্ত্বনার প্রলেপ টেনে দেওয়া হ'ল। তাই অনেক ওমর-ভক্তের দুঃখের কারণ হবে জেনেও এতদিন তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে প্রচলিত যে ধারণা চলে আসছে তার প্রতিবাদ করতেই আমি বাধ্য হব। এ দেশে এবং বিদেশে "রুবাঈয়াৎ"-এর যে সচিত্র সংস্করণগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত হ'য়েছে এবং তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে যে সব টুকরো আলোচনা চোখে পড়েছে তাতে তাঁকে ইহমুখীন, ভোগসর্ব্বস্ব, লম্পটরূপেই জাহির করা হয়েছে। কিন্তু বস্তুত তিনি তা ছিলেন না। উদ্দাম সম্ভোগ থেকে দূরে, শান্ত নিভৃত দার্শনিকের সুসমঞ্জস জীবন যাপন করতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তার একটী বড় প্রমাণ এখানে দিচ্ছি। যখন সম্রাট মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর বাল্যবন্ধু আবু আলী অনেক কষ্টে তাঁকে খুঁজে বার করলেন, তখন তিনি ওমরকে নেশাপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করতে চাইলেন। তার উত্তরে ওমর বললেন—সেই চাকরি করেই যদি খেতে হ'ল, তবে তোমার বন্ধু হওয়ার আর ফল কি হ'ল ? আমি একান্তে যাতে আমার বিদ্যাচর্চ্চা নিয়ে থাকতে পারি, সেই মত একটা ব্যবস্থা করে দাও না। তদনুসারে আবু আলী ওমরকে রাজকোষ থেকে বাৎসরিক ১২০০শত মিস্‌ক্যাল সুবর্ণবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তখনকার দিনে এই আয়ে তিনি রাজার হালে থাকতে পারতেন, কারণ তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতার কয়েক স্থানে নিজেকে রিক্তহস্ত বলে বর্ণনা করেছেন। এর একমাত্র কারণ, তিনি মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন, অনেক দরিদ্র বিদ্যার্থীর সাহায্য করতেন ; কিন্তু এমন ধীর স্বভাব, আত্ম-সম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে আপনার উদারতম বন্ধুকেও কখনও নিজের অভাবের কথা জানান নি। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞানের আর একটী নিদর্শন, তিনি বিনা আহ্বানে কখনও কোনও বড়লোকের বাড়ী যেতেন না। একথা অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, তিনি সুরাকে বিষ ও সাকীকে পেত্নী মনে ক'রে জাহান্নমের ভয়ে নবদ্বার রুদ্ধ করে জীবন-

যাপন করেন নি, কিন্তু তাই ব'লে লম্পটের উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগ-প্রবণ জীবনও যে তাঁর ছিল না, একথাও জোর ক'রেই বলা যায়। একটা সুস্থ সবল দেহ মন নিয়ে, অজ্ঞাত পরলোক সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তা পরিহার ক'রে, ইহলোক এবং ইহজীবনে তিনি একটী ভোগ ও ত্যাগের সুসমঞ্জস ও বিচারসহ মধ্যপন্থা খুঁজেছিলেন এবং তাঁর রুবাঈ-এর উক্তি যদি বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে সে পথ তিনি খুঁজেও পেয়েছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর এই রুবাঈটী দেখুন :—

"বিজ্ঞেরা সব থাকুন নিয়ে শাস্ত্রবিরোধ-মীমাংসা-ভার
তোমায় আমায় ভার নেব সই এই জীবনের বোঝাপড়ার
নৈয়ায়িকের গণ্ডগোলের একটী কোণে সঙ্গোপনে
খেলার ছলে তোমার পরশ যেটুকু পাই, তাহাই আমার।"

শেষ পংক্তিটী পড়ে বুঝতে পারা যায়, কতটা নিরাসক্ত মন নিয়ে তিনি জীবনকে ভোগ করতেন। এর পর :—

"এই দুনিয়ার উর্দ্ধে-অধে, ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাই
আতসবাজির কারসাজি সব, আর কিছু নাই, আর কিছু নাই।
তপন-শিখায় কেন্দ্রে ধরি' চলেছে এই মজার ম্যাজিক
আমরা তারি রঙীন ছবি আসা-যাওয়ায় ঘুরছি সদাই।"

আর এই রহস্যময় বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে বুদ্ধের "অনির্ব্বাণ আলো" যে আলোক-পাত করেছেন, তা হ'চ্ছে এই :—

"যথেষ্ট জানিয়া রাখো ইন্দ্রজাল দোলে দৃশ্যমান
বসুধা ব্রহ্মাণ্ড গ্রহ চন্দ্র সূর্য্য গগন-মণ্ডল ;
আঘাতে সংঘাতে নিত্য ঘুরিতেছে শক্তিচক্রযান
রোধিতে যাহার গতি, নাহি, নাহি—কারো নাহি বল।"

কিন্তু তা হলে এই বিরাট বিপুল বিশ্বসৃষ্টি চালাচ্ছে কে? খৈয়ামের মতে সেটা অ-দৃষ্ট। স্রষ্টা একজন আছেন, কিন্তু তিনি অ-দৃষ্ট অ-জ্ঞাত ও অ-জ্ঞেয়। তিনি মানুষের যে ভাগ্যলিপি লিখেছেন তাও অদৃশ্য। মানুষ সেই স্রষ্টার হাতে খেলার পুতুলমাত্র।

"রাত্রিদিনের আঁধার-আলোয় ছককাটা এই ধরিত্রীটি
অদৃষ্ট তায় খেলায় দাবা নিয়ে তাহার মানুষ-ঘুঁটি ;
এদিক ওদিক দিচ্ছে সে চাল, হরিছে বল, করছে বা মাৎ
একে একে রাখছে আবার থলির ভেতর পাকড়ে টুঁটি।
সম্মতি বা আপত্তিতে ঘুঁটির কোনো নেই অধিকার
ডাইনে বাঁয়ে চলছে যেমন চালায় তারে চালকটি তার,
ঠাঁই দিয়েছে যেজন তোরে ঘরকাটা এই দাবার ছকে
সে-ই জানে—সে-ই একলা জানে অর্থ কি এই দাবাখেলার।"

এ সম্বন্ধে বুদ্ধবাণী দৃশ্যত সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী ; স্রষ্টার কথা তিনি উল্লেখই করেন নি, বরং এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার ভাষা আরও রূঢ়, নির্দ্দেশ আরও কঠোর। যথা :—

"প্রার্থনা কোরো না—তাহে আলোকিত হবে না আঁধার
স্তব্ধতার কাছে কিছু চাহিও না—কারণ, সে মূক।
ধর্ম্মালু বেদনা বহি' বাড়ায়ো না অন্তরের ভার
চাহিও না বন্ধুগণ করুণার কণা এতটুক্
অসহায় দেবতারে তুষ্ট করি' স্তবে, অর্ঘ্যদানে,
রক্তের উৎকোচে কিম্বা জোগাইয়া নৈবেদ্য আহার—"

ওমর খৈয়াম মানুষের এই অসহায় অবস্থার কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছেন এবং তা সকরুণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বুদ্ধদেবও তাই করেছেন। এ পর্য্যন্ত দুজনের দর্শনই এক। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে যে ওমর খৈয়াম এইখানেই থেমেছেন—এর ওদিকে আর পথ খুঁজে পাননি, তাই বলেছেন—

"ভুবন থেকে বাজিয়ে সপ্ত স্বর্গতোরণ-বিজয়-ভেরী
উর্দ্ধলোকে শনৈশ্চরের সিংহাসনও এলুম ঘেরি'
যাত্রাপথে কতই না সে রহস্য গিঁট পড়লো খুলে
খুললো না কো গ্রন্থি শুধু মৃত্যু এবং অদৃষ্টেরি।"

পক্ষান্তরে, বুদ্ধদেব এর পরেই শুনিয়েছেন অত্যন্ত আশার কথা। মানুষকে ঐ অসহায় অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় তিনি বলেছেন :—

"নিজেরি মাঝারে ডুবি' শুদ্ধ হ'তে হবে মুক্তিস্নানে
প্রত্যেকে রচিছে নিজে আপনার কারাগার তার।"

*　　*

"চরম প্রভুত্বপদ প্রত্যেকের আছে অধিকারে
উর্দ্ধে, অধে, চারিদিকে যত কিছু শক্তির বিকাশ
এ জগতে যত জীব ঘোরে রক্ত-মাংসের আকারে
সবাই আপন কর্ম্মে করে হৃদবেদনার চাষ।"

স্বীয় অনুভূতি-লব্ধ এই আশার ও শক্তির বার্ত্তাই বুদ্ধকে করেছে মহামানব। যে মৃত্যু ও অদৃষ্টের রুদ্ধদুয়ার ওমরকে হতাশ করেছে, সেই মৃত্যু ও অদৃষ্টকে অতিক্রম করবার পথই বুদ্ধ ব্যাখ্যাত নির্ব্বাণ-পথ।

ওমর খৈয়ামের দর্শন যতই সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী হোক্, তাঁর আত্ম-প্রত্যয় ও সত্যভাষণের সাহস ছিল অপরিসীম। তাঁর মতামত ও শিক্ষা তদানীন্তন লোকাচার ও প্রচলিত ধর্ম্মাচরণের ছিল অনেকাংশে বিরোধী। সেইজন্যে মোল্লারা ওমরকে ধর্ম্মজ্ঞানহীন বিকৃতমস্তিষ্ক ও কাফের বলতেন। একবার মোল্লাদের উত্তেজনায় নেশাপুর-বাসীরা ওমরকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল। সেই সময় তিনি মক্কার প্রধান মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উত্তেজনা কমে গেলে বাগদাদে গিয়ে কিছুকাল ছিলেন—পরে আবার নেশাপুরে ফিরে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার হচ্ছে—যে সকল মোল্লা তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের উত্তেজিত করত, তার মধ্যে অনেকেই প্রাতে ও সন্ধ্যার পর গোপনে তাঁর কাছে পাঠ নিতে আসত। এই সময়ে বড় দুঃখেই তিনি বলেছিলেন—"দু-তিন মূর্খ এরূপ বিবেচনা করেন ও নিজের মূর্খতা-হেতু

ভাবেন যে তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। গাধামিতে তাদের মত যে গাধা নয়, তাকে তাঁরা কাফের ভাবেন।"

মনীষী ওমরের জীবনের আর একটী অপূর্ব্ব ঘটনার কথা বলে তাঁর জীবনী-আলোচনা শেষ করব। এই ঘটনার কথা নিজামী তাঁর পূর্ব্বোক্ত "চহার মকালা"তে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জবানীতেই বলি :—

"৫০৬ হিঃ তে (১১১১-১৩ খৃঃ) বাহ্লিক (Balhic) নগরে খোয়াজা ইমাম ওমরের সঙ্গে আমীর আবু সায়াদের বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ; তখন সেখানে আরও কয়েকজন বিদ্বান বড়লোক ছিলেন। খোয়াজা কথা-প্রসঙ্গে বললেন—'এমন স্থানে আমার গোর হবে যে বৎসরে দুবার আমার গোর পুষ্পরেণু দ্বারা ঢাকা পড়বে।' আমি এত বড় যুক্তিবাদী বিদ্বানের মুখে এরকম অসম্ভব ও অদ্ভুত কথা শুনে মনে মনে দুঃখিত হলাম কিন্তু কিছু বললাম না। এই ঘটনার বহুকাল পরে (৫৩০ হিঃ—১১৩৫-৩৬ খৃঃ) খোয়াজার পরলোক-গমনের কয়েক বৎসর পরে আমাকে একবার নেশাপুর যেতে হয়েছিল। তখন তিনি আমার শিক্ষা-গুরু ব'লে একবার তাঁর গোর-দর্শন (জিয়ারৎ) করবার ইচ্ছা প্রবল হ'ল। একজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত ক'রে সেখানে গিয়ে দেখলাম, তাঁর গোরটী গোরস্থানের শেষ সীমাতে এক ফলবাগানের পাঁচিল ঘেঁষে আছে। সেই বাগানের একটী জর্দ্দালু ও একটী অমরূদের গাছ পাঁচিলের অপর দিক থেকে গোরের উপর ঝুঁকে রয়েছে এবং গোরটী পুষ্পরেণুর দ্বারা আচ্ছাদিত। তখন সেই চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার মনে পড়ল এবং সবিস্ময় শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই সফল হয়েছে।"

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওমরের এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল—যা সাধারণ লোকের থাকে না এবং যা একমাত্র সুগভীর মনন ও শাস্ত্র সাধনার দ্বারাই মানুষ লাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গ বুদ্ধ ও ওমরের দার্শনিক দৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা নয়। বুদ্ধ ছিলেন মহামানব, যুগযুগান্তপ্রসারী ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্ম্ম-ধারা। ওমরের জীবনী আলোচনা করে আমি এইটুকু দেখাতে চেয়েছি যে, তিনিও ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানব, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তপস্বী, সত্যবাদী, সাহসী, চিন্তাবীর, স্ব-কালের পরোপকারী, সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা-লোভহীন লোক-শিক্ষক। বুদ্ধের বাণীর সঙ্গে একই বই-এ তাঁর বাণীকে শুদ্ধ-বিবেক নিয়েই গেঁথে দেওয়া যেতে পারে এবং তা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। একজন মহামানব ও একজন খাঁটি মানবকে পাশাপাশি কেমন দেখায়, সেটা চোখ মেলে দেখ্‌লে কাউকে পাপ স্পর্শ করবে না।

উপসংহারে রুবাঈয়াতের শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তার উল্লেখ করছি। ওমর কত পদ্য রচনা করেছিলেন তা সঠিক জানা নেই। প্রাচীনতম সংগ্রহ যা পাওয়া গিয়েছে, তা' ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের লেখা এবং তাতে ১৫৮টী রুবাঈ আছে। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ পুস্তকে ৫১০—কিন্তু লক্ষ্ণৌর সংস্করণে আছে ৭৭০টি। তার মধ্যে তিনটি রুবাঈ দুবার করে লেখা ; অথবা যেটুকু প্রভেদ আছে, তাকে নূতন রুবাঈ না বলে পাঠান্তরই বলা যায়। অতএব লক্ষ্ণৌ-সংস্করণের রুবাঈ সংখ্যা ৭৬৭টি বলাই সঙ্গত। এ সংগ্রহগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ; অর্থাৎ কলিকাতার ৫১০টি সংগ্রহে এমন রুবাঈ আছে যা লক্ষ্ণৌর ৭৬৭টির মধ্যে নেই। আবার ঐ ৭৬৭টির মধ্যে মাত্র আটটিতে খৈয়ামের নাম বা ভণিতা আছে, বাকী ৭৫৯টী কার লেখা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা অসম্ভব ; কেন না, প্রথমে যে সংগ্রহ করেছিল সে দশজন লোকের মুখে শুনেই তা করেছিল। আজকালকার অনুসন্ধানে তাতে এমন রুবাঈ পাওয়া যাচ্ছে, যা অন্য কোন সংগ্রহে অন্য কোন লোকের উক্তি ব'লে আর কেউ লিখে রেখেছেন। অতএব এখন সেগুলিকে সন্দেহাত্মক বলা হয়।

স্মরণে

শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেন

পশ্চাতের সব কিছু, তুচ্ছ অতি তুচ্ছ
সুখ দুঃখ যত—
মুছে ফেলে, ভুলে গিয়ে, স্মৃতিকথা তার—
চলিতে হবেই তোরে সম্মুখের পানে,
রে মোর অবুঝ মন আজি।

ব্যথা যদি জাগে মনে কল্পনারে দিতে বিসর্জ্জন
বিস্মৃতির অস্তাচল পারে ;—
আসে যদি বাহিরিয়া বিন্দু বিন্দু জল
অবোধ ও আঁখি হ'তে,
করিও শাসন তারে বাস্তবের কঠিন বিধানে।

মনে রেখো, সংসারের কর্ম্মময় দিনে ;—
অতীত কল্পনা আর সুখস্মৃতি যত,
পশ্চাতে টানিয়া লয় বার বার, তাই
যারা চায় আপন গৌরব—
জীবনের পঙ্কিল প্রবাহে চলে শুধু পতঙ্গের মত।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড় বা রক্তলেহী বাদুড়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ঈশপের গল্পে আছে—একদা পশু (১) ও পাখীদের মধ্যে নাকি ভীষণ লড়াই বেধেছিল। সেই সুদীর্ঘকালস্থায়ী সংগ্রামে একদিন পাখীরা জয়লাভ করেছে, আবার আর একদিন পাখীদের হারিয়ে পশুরা জয়লাভ করেছে। কিন্তু সেই ভীষণ রক্তপাত ও প্রাণক্ষয়ের সময় একটি প্রাণীর আচরণ বিবদমান উভয় পক্ষেরই বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ সে—যখন পশুরা জয়লাভ করছিল তখন নিজেকে পশু বলে পরিচয় দিচ্ছিল, আবার যখন পাখীদের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখছিল তখন নিজেকে পাখী বলে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। যুদ্ধান্তে পশু ও পক্ষী উভয় দলই সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে এই সুবিধাবাদী প্রাণীটিকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং এইভাবে বিতাড়িত হ'য়ে সে সেইদিন থেকে দিবালোকে ধরা পড়বার ভয়ে রাত্রির ঘনান্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চল্‌তে বাধ্য হয়।

এই অদ্ভুত কুখ্যাত প্রাণীটি যে বাদুড় সে কথা বোধ হয় আর কাউকে নূতন ক'রে বলে দিতে হবে না। পাখীদের মত ডানা থাকা সত্ত্বেও বাদুড় পাখী নয়—আবার স্তন্যপায়ী (mammal) প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েও উড্ডয়নক্ষম। এরা স্তন্যপায়ী-শ্রেণীর অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট বর্গের (order) প্রাণী—তার বিজ্ঞানসম্মত নাম কাইরপ্‌টেরা (Chiroptera)। 'কাইরপ্‌টেরা'র অর্থ 'hand-winged' এবং সম্ভবতঃ এই কারণে এই বর্গান্তর্গত প্রাণীদের বাংলায় 'কর-পক্ষ' প্রাণী বলা হয়েছে। এদের আধুনিক চলিত ইংরেজী নাম Bat। পূর্বে Flittermouse বলেও অভিহিত করা হ'ত।

বাংলা ভাষায় এদের দু'টো চলিত নাম আছে—'বাদুড়' ও 'চামচিকা'। বোধ হয় আকারে যারা বড় তাদের নাম বাদুড়, আর যারা ছোট তারা চামচিকা নামে প্রসিদ্ধ। Bat অর্থে আমরা 'বাদুড়' এই প্রতিশব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি। চামচিকার ঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ জানি না। প্রাণিবিদ্যার পুস্তকে কাইরপটেরা অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের দুই দলে (tribe) ভাগ করা হয়েছে, যথা—মেগা-কাইরপ্‌টেরা (*Mega-chiroptera*) ও মাইক্রো-কাইরপটেরা (Micro-chiroptera) অর্থাৎ বড় বাদুড় আর ছোট বাদুড়। আমরা যাদের চামচিকা বলে থাকি তারা যে মাইক্রো-কাইরপ্‌টেরা অন্তর্গত প্রাণী সেটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। Bat অর্থে বাদুড় এই নামে যখন কারুর কোন অভিযোগ নেই তখন বড়-ছোট সব মিশিয়ে আমরাও 'বাদুড়' নাম বাহাল রাখা ঠিক করলুম। চামচিকার কি দশা হয় পরে দেখা যাবে।

পৃথিবীতে বহু প্রকারের বাদুড় দেখা যায়। কেউ ফলাশী (frugivorous) অর্থাৎ ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে; ফলাশী বাদুড়গুলি সাধারণত বড় আকারের হয়। পল্লীগ্রামে এই সব বাদুড়ের উৎপাতে গৃহস্থেরা উদ্ব্যস্ত। আবার কতকগুলি বাদুড় পতঙ্গাশী (insectivorous) এবং সাধারণত এরা ছোট আকারের। এদের দলই সর্বাপেক্ষা বেশী। এরা অনিষ্টকারী পতঙ্গ বিনাশ করে সম্ভবত মানুষের কিছু ইষ্ট সাধন করে। আবার কেউ-বা মাংসাশী (carnivorous) অর্থাৎ অন্য প্রাণী মেরে আহার করাই হচ্ছে এদের প্রধান উপজীবিকা। মাংসাশী বাদুড়ের মধ্যে বড় ও ছোট দু দলই আছে। বড়রা অনেক সময় ছোট বাদুড় ধরে খেতে ইতস্তত করে না। এদের মধ্যে একদল আছে যারা ইঁদুর পাখী প্রভৃতি প্রাণী শিকার করে খায়; আবার আর এক দল আছে যারা জলাশয় ও নদীর উপর উড়ে বেড়ায় এবং সুবিধামত মাছ ধরে খায়। পৃথিবীতে সর্বত্র এই সকল বাদুড়ই সচরাচর দেখা যায়। কিন্তু এদের ছাড়াও আরও একপ্রকারের ছোট বাদুড় আছে যারা রুধিরপায়ী (sanguinivorous) অর্থাৎ শুধু রক্ত পান ক'রে জীবনধারণ করে। এই খুনে দলের বাদুড় আমেরিকার বাসিন্দা, পৃথিবীর আর কোথাও এরকম প্রকৃতিসম্পন্ন বাদুড় আজও পাওয়া যায়নি'।

১। স্তন্যপায়ী (mammal) প্রাণী অর্থে 'পশু' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

বস্তুত প্রাণিজগতে বাদুড় একটি চিরন্তন বিস্ময়। এরা নিশাচর বলে এদের হালচাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প ও ভীতিপ্রদ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত আমাদের আলোচ্য ভ্যাম্পায়ার বাদুড়কে নিয়ে।

রক্তপায়ী বাদুড়ের সাধারণ প্রচলিত নাম Vampire। বাদুড়কে ঐ নামে অভিহিত করবার মধ্যে বেশ একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস পাওয়া যায়। ভ্যাম্পায়ার একটি শ্লাভনিক (Slavonic) শব্দ। ভ্যাম্পায়ার-বাদুড়ের অস্তিত্ব জানার ঢের পূর্বেই ঐ শব্দটি ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত ছিল। বহুকাল পূর্বে ইউরোপে রক্তপায়ী অশরীরী প্রেতাত্মাকে ঐ নামে অভিহিত করা হ'ত। তখনকার দিনে লোকেদের ধারণা ছিল যে মৃত ব্যক্তির আত্মা রাত্রিকালে কবর হ'তে উত্থিত হয়ে ঘুমন্ত প্রাণীর রক্ত পান করে। এদের আকৃতি কিরূপ সে সম্বন্ধে কারুরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তার একটা বীভৎস রূপ কল্পনা ক'রে প্রচার করত। এমন কি 'মায়'রা (Mayans) এই প্রকার একটি রক্তপিপাসু অশরীরী অপদেবতার পূজা-অর্চনাও করত। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ঐ দেশে ইউরোপীয়গণ যেতে সুরু করেন এবং তাঁরা সেখানে গিয়ে সত্যসত্যই রক্তপায়ী বাদুড়ের সন্ধান পান। তখন বাদুড়ের ঐ বৃত্তির সঙ্গে ইউরোপের তথাকথিত ভ্যাম্পায়ারের আচরণের অদ্ভুত সামঞ্জস্য থাকায় রক্তপায়ী বাদুড়কে "ভ্যাম্পায়ার" নামে অভিহিত ক'রে প্রচার করা হয়।

প্রকৃত ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের বিজ্ঞানসম্মত নাম ডেস্‌মোডাস রোটানডাস্ (*Desmodus rotundus*)। এদের জীবনযাপন প্রণালী ও আচরণ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এরা আকারে খুব ছোট—লম্বায় মাত্র চার ইঞ্চি এবং বিস্তৃত ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাপ্‌লে হয় মাত্র তের ইঞ্চি। এরা রাত্রিকালে খাদ্যান্বেষণে বার হয়, আর দিনের বেলায় ভয়ঙ্কর দুর্গম পাহাড়ের গুহাকোণে ফাটালের মধ্যে অন্য জাতীয় বাদুড়ের সঙ্গে একত্রে আত্মগোপন করে থাকে। এরা উপরের সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে সমস্ত প্রাণীর দেহে ক্ষত উৎপাদন করে এবং সেই ক্ষত স্থান হ'তে যখন প্রচুর রক্ত নির্গত হ'তে থাকে তখন জিভ্‌ দিয়ে সেই রক্ত পান করে। এরা ঠিক কুকুর বেড়ালের মত রক্ত পান করে না।—এদের রক্ত লেহনের একটা বিশেষত্ব আছে। ডেসমোডাস বাদুড়ের তলাকার সাম্‌নের দু'দাঁতের মধ্যে ব্যবধান এরূপ বিস্তৃত যে

রক্তশোষক বাদুড়—উড়ন্ত অবস্থায়। তিন শ্রেণীর এই প্রকার বাদুড় আছে—সব গুলিই আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে বাস করে

সেই ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অনায়াসে জিভ্‌ ঢুকোতে ও বার করতে পারে। প্রাণীদেহ হ'তে রক্তমোক্ষণ কালে এই দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভের সাহায্যে এরা রক্ত পান করে। রক্তমোক্ষণ বেশী হ'লে এরা ক্ষতস্থান স্পর্শ না ক'রেই রক্ত পান করে, অল্প হলে ক্ষতস্থান স্পর্শ ক'রে লেহন করতে বাধ্য হয়। এরা এই কাজ এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে যে ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। প্রত্যেক সেকেণ্ডে এরা অন্তত চারবার জিভ্‌ ভেতর-বার করতে পারে। মিনিট দশ-পনর'র মধ্যে ভরপেট রক্তপান করে গুহা নিবাসে ফিরে গিয়ে ফাটালের মধ্যে আত্মগোপন করে।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড় যখন কোন প্রাণীকে আক্রমণ করে তখন সে কিছুই জানতে পারে না। ঘুমন্ত অবস্থায় ত কোন প্রকারই যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় শিকারকে আক্রমণ করবার পূর্বে ডানার হাওয়ায় গভীর ঘুমে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। কিন্তু এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা ও অমূলক। এত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে এরা তীক্ষ্ণ দাঁতের দ্বারা ত্বকগভীর ক্ষত উৎপাদন করে যে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুই টের পায় না। কিন্তু শিশু ভ্যাম্পায়ার বাদুড় বাপ-মা'র মতন সুচতুরতার সঙ্গে শিকারকে কোন প্রকার যন্ত্রণা না দিয়ে রক্ত পান করতে পারে না। একজন প্রাণীবিৎ নিজের দেহে একটি

শিশুকে দাঁত দিয়ে বিদীর্ণ করতে দিয়ে দেখেছেন যে যথেষ্ট যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই এরা শিকারকে বাপমা'র মত আহত করবার নিপুণ কুশলতা অর্জন করে। এরা সর্বপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীকে আক্রমণ করে—তবে কেশবিরল প্রাণীকে আক্রমণ করতে সুবিধা হয় বলে তাদেরই সর্বাগ্রে মনোনীত করে—অভাবে পাখীকেও আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাধারণত ঘাড়ে আক্রমণ করে, পাখীর পা এদের আক্রমণস্থল, কিন্তু গলায়ও অনেক সময় আহত করে। সরীসৃপ বা উভচর প্রাণীকে আক্রমণ করতে এ-পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ঘনীভূত রক্ত পান করে না। বন্দী অবস্থায় এদের ফাইব্রিন-বিযুক্ত (de-fibrinated) রক্ত পান করান হয়। ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত ধারণা ছিল যে এদের লালার মধ্যে অন্যান্য রক্তপায়ী প্রাণীর মত একপ্রকার পদার্থ আছে যা ক্ষতের সংস্পর্শে আসাতে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। এ ধারণা যে সর্বাংশে ভুল তা দুজন আমেরিকান প্রাণীবিৎ বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এরা এত দ্রুত পান করে যে রক্ত জমাট বাঁধবারই অবসর পায় না। ঘরের মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্ত দেখে বা ক্ষতস্থান থেকে ছিট্ ছিট্ রক্ত পড়তে দেখে পূর্বে অনুমান করা হয়েছিল যে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের লালায় রক্ত জমাট না বাঁধবার কোন পদার্থ আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কর্মীদ্বয় বলেন যে, ঐ রক্ত ওদের পান কালেই মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে। মেঘ থেকে বৃষ্টি যখন পড়ে তখন যেমন একটি ফোঁটার পর আর একটি ফোঁটা পড়ে এবং এত দ্রুত পড়তে থাকে যে মনে হয় একটি ধারাই অবিচ্ছেদ্য গতিতে পড়ছে—তেমনি ক্ষতস্থান থেকে নিঃসৃত রক্তও পড়তে থাকে এবং তা এত দ্রুতগতিতে ভ্যাম্পায়ার তার জিভের সাহায্যে টেনে নেয় যে রক্ত জমাট বাঁধবারই অবসর পায় না—বরং মনে হয় ক্ষতস্থান থেকে রক্তের একটা ধারা চলে আসছে তার মুখের মধ্যে। অনেক সময় মেঝে ও ক্ষতস্থানের চারি পাশ যে রক্তে ভিজে থাকতে দেখা গেছে, তার কারণ রক্ত এত অবিরল ধারে আসতে থাকে যে সেকেণ্ডে চারবার জিভ্ প্রসারিত ক'রেও সব রক্ত পান করে উঠতে পারে না—কাজেই উদ্বৃত্ত রক্ত ক্ষতস্থানের চারি পাশে এমন কি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে যায়।

এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে-সকল প্রাণী কঠিন পদার্থ ভক্ষণ করে তাদের পাকস্থলী (stomach) অনেকটা থলির মত দেখতে হয়, কিন্তু যারা একমাত্র তরল পদার্থ পান করে জীবনধারণ করে তাদের পাকস্থলী নলাকার (tube-like)। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে টি-এইচ-হাক্সলী (T. H. Huxley) মহোদয় ডেসমোডাস বাদুড়ের দেহ ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখিয়েছেন যে এদের পাকস্থলী অন্ত্রাকার অর্থাৎ সরু নলের মতন। শুধু রক্ত পান করার ফলেই যে পাকস্থলী ঐ প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাদুড়েরা সাধারণত মাটিতে হাঁটে না—সম্ভবত হাঁটতে পারে না, কিন্তু ভ্যাম্পায়ার বাদুড় অবলীলাক্রমে হেঁটে যেতে পারে। মানুষের নাকের ডগায় বা পায়ের আঙুলে যখন এরা ক্ষত উৎপাদন করে তখন এরা দেহের উপর উড়ে এসে বসে না—বরং হামাগুড়ি টেনে পাশে আসে—এই সময় দূর থেকে তাদের দেখ্‌লে মনে হবে যেন প্রকাণ্ড একটা মাকড়শা হেঁটে চলেছে।

পূর্বে ধারণা ছিল ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ছত্রিশ ঘণ্টার বেশী উপবাস সহ্য করতে পারে না। পরে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা চারদিন পর্যন্ত অক্লেশে না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই বাদুড় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি যে পরিভাষার সাহায্যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তাতে আমরা একমত হ'তে পারিনি। বস্তুত ইংরেজীতে এই জাতীয় বাদুড়কে পূর্বে blood-sucking bat বল্‌ত এবং সে-হিসেবে এদের বাংলায় 'রক্তচোষক বাদুড়' বলা অযৌক্তিক হয়নি। বলা বাহুল্য, জনপ্রিয় নামের সঙ্গে অনেক সময় প্রাণীদের প্রকৃত আচরণের ইঙ্গিত লুকান থাকে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড় সম্বন্ধে পরে যে সকল নব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তারপর আর ওদের blood-sucking আখ্যা দেওয়া শোভন হয় না। গোপালবাবু blood-lapping ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'রক্তশোষক' বা 'রক্তচোষক'।

বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। Sucking অর্থে 'চোষক' ও 'শোষক' দুটো শব্দই ব্যবহার না করার কারণ এই যে suctionএ ভ্যাকুয়াম (vacuum) সৃষ্টি হয় এবং তাতে দুটি অঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন হওয়া দরকার। সে হিসেবে পরিভাষা চোষণ অর্থজ্ঞাপক। আবার absorptionএর মধ্যে osmosis ক্রিয়া লুকান আছে। সুতরাং এ অর্থে বাংলায় 'শোষণ' শব্দটি সুষ্ঠু মনে হয়।১ কিন্তু এ দুটি শব্দই আমাদের আলোচ্য বাদুড়ের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে না, বরং রক্তলেহী কথাটাই বেশী যুক্তিযুক্ত ও অর্থদ্যোতক। ১৯৩২ সালে ডঃ ডান (Dr. Dunn) সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় রক্ত চোষণ করে না—লেহন করে। পরে মিঃ ডিটমার (Ditmar) কতকগুলো ভ্যাম্পায়ার বাদুড় সংগ্রহ করে তাদের রক্তপান-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে ডঃ ডানের মত প্রমাণিত করেন।

অমূলক ঘটনার উপর নির্ভর ক'রে অনেক সময় প্রকৃতিবিৎ (naturalist) বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে যান এবং পরে সেগুলি পুস্তকের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয় দেশে দেশে। কাল্পনিক কাহিনীকে সত্যের আসনে বসিয়ে আমরা কি যে তৃপ্তি লাভ করি বলতে পারি না। এইভাবে বিজ্ঞান কাল্পনিক তথ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত বিজ্ঞানের জন্মই ভুলের মধ্যে—ভুলভ্রান্তির শীতল ছায়ায় বিজ্ঞান ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের আজন্মের সাধনা—এই ভুলের স্তূপীকৃত জঞ্জাল থেকে আসল সত্যের সন্ধান করা; কারণ বিজ্ঞানের আভিজাত্য সত্যের বিশুদ্ধতায়। ফলে প্রকৃত সত্য যখন আবিষ্কৃত হয় তখন এতদিনের প্রচারিত সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের মূলে লাগে নির্মম আঘাত—প্রকৃত সত্যকেই তখন সত্য বলে মেনে নিতে কেমন যেন দ্বিধাবোধ হয়।

অনেক প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নামের সঙ্গে এমন দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত হ'য়ে গেছে—যা আর সহজে বিলুপ্ত হবার নয়। প্রকৃতিবিদদের হাতে এই সব বাদুড় কি ভাবে নির্যাতিত হয়েছে তার একটু মনোরম ইতিহাস আছে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত নাম দেওয়া হয় ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে। প্রাণীর নামকরণের ধর্মপিতা সুইডিশ প্রকৃতিবিৎ লিনীয়াস [Linnaeus—ইহাই কার্ল ফন্ লিনে'র (Carl von Linné) ল্যাটিন নাম] আমেরিকার এক প্রকার বর্শা-নাসিকা (spear-nosed) বাদুড়ের নাম
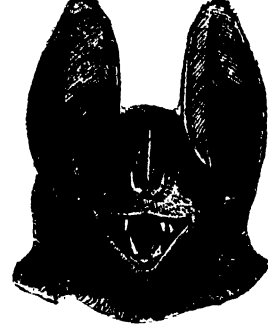
রক্তশোষক বাদুড়ের মস্তক

দেন ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রাম (*Vampyrus spectrum*)। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে আমেরিকাবাসীদের ধারণা ছিল —এরাই প্রাণীর রক্তপান ক'রে জীবনধারণ করে। এই জনপ্রবাদের উপর ভিত্তি করেই যে পূর্বোক্ত নামকরণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটি বিশিষ্ট গণ (genus) ও জাতি (species) হিসেবে প্রকৃত রক্তলেহী বাদুড় আবিষ্কৃত হয় আরও ঢের পরে। তখন কিন্তু এদের রক্তপ্রিয়তার কথা কিছুই জানা যায়নি। প্রিন্স্ ম্যাক্সিমিলিয়ান (Prince Maximillian) এই বাদুড়ের বিজ্ঞানসম্মত নাম দেন ডেসমোডাস্ রোটান্ডাস্ (*Desmodus rotundus*)। পরে মিঃ ওয়াটারহাউস (Mr. Waterhouse) এদের প্রকৃত ভ্যাম্পায়ার বাদুড় বলে সনাক্ত করেন। সেই থেকে ডেসমোডাস রক্তলেহী অর্থাৎ একজাতীয় প্রকৃত ভ্যাম্পায়ার বাদুড় বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সম্মুখ দন্ত বর্শাফলকের মত এবং ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ। এই রকম দন্তবিশিষ্ট আর এক জাতীয় বাদুড় আছে, তাদের নাম দেওয়া হয় ডেস্‌মোডাস্ মিউরিনাস্ (*Desmodus murinus*)। পরে আরও দুটি বিভিন্ন গণান্তর্ভুক্ত এইরূপ দন্তবিশিষ্ট বাদুড় আবিষ্কৃত হয়েছে—এদের বিজ্ঞান-সম্মত নাম ডিফাইলা সেণ্ট্রালিস্ (*Diphylla centralis*) এবং ডাইমাস্ ইউঙ্গি (*Diaemus youngi*)। এরা সকলেই প্রকৃত ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। শেষোক্ত বাদুড়ের

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, প্রাণী-বিজ্ঞানের পরিভাষা, পৃঃ ১-৩ (১৩৪৩)।

জীবনযাপনপ্রণালী এ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয়নি বটে, তবে তাদের সম্মুখ দন্তের তীক্ষ্ণতা এবং ডেস-মোডাসের দন্তের সমাবেশের সঙ্গে এদের দন্তেরও সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা হয়েছে যে, এরা রক্তলেহী বাদুড়ের অতি-নিকট আত্মীয়।

এদিকে ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রামকে নিয়ে আবার গণ্ড-গোলের সূত্রপাত হয়। মিঃ বেট (Mr. Bett) এদের আচরণ সম্বন্ধে জানান যে, এরা ফলাশী এবং অতি নিরীহ গোবেচারী। এমন কি মিঃ ডিটমারও এইরূপ ধারণা পোষণ করতেন।

কিন্তু ট্রিনিদাদের (Trinidad) প্রফেসর উরিক (Uhrich) এমন কতকগুলো প্রমাণ সংগ্রহ করেন—যা থেকে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রাম ফলাশী ত নয়ই, বরং এদের বেশ নিষ্ঠুর প্রকৃতির বাদুড় বলা চলতে পারে। প্রফেসর এদের প্রকৃত আচরণ সম্বন্ধে তথ্য জানবার জন্য এক জোড়া ঐ বাদুড় সংগ্রহ করে আনেন। এদের খাঁচায় বন্দী করে রেখে প্রথমে ফলমূল খেতে দেওয়া হল। কিন্তু তারা সে-সব স্পর্শই করলে না। তখন তিনি তাদের আহারের জন্য কয়েকটি ইঁদুর ও পাখী খাঁচায় পুরে দেন। এইবার তাদের আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। এরা যে কতদূর হিংস্র ও মাংস-লোলুপ তিনি তার হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে যান। অবশ্য তাঁর এই পর্যবেক্ষণ কোথাও তিনি লিপিবদ্ধ করেন নি। আমরা একথা মিঃ ডিটমারের এক প্রবন্ধ হ'তে জানতে পারি।

এরপর মিঃ ডিটমারের সঙ্গে প্রফেসর উরিকের দেখা হয় এবং আলোচনা-প্রসঙ্গে ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রামের কথা ওঠে। মিঃ ডিটমার ১৯৩৫ সালের প্রবন্ধে ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রামকে ফলাশী বাদুড় বলে উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর উরিক এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। তিনি মিঃ ডিটমারকে তাঁর পর্যবেক্ষণ ইতিহাস ও তাদের মাংসাশী আচরণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। মিঃ ডিটমার প্রথমে ভাবলেন, প্রফেসর সাহেব সম্ভবত ফাইলো-স্টোমা (*Phyllostoma*) বাদুড়ের সঙ্গে ভ্যাম্পাইরাসকে গুলিয়ে ফেলেছেন অর্থাৎ প্রফেসর সাহেব যে বাদুড় নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তারা নিশ্চয়ই ভ্যাম্পাইরাস নয়, কারণ আকারে আকৃতিতে ভ্যাম্পাইরাস ও ফাইলোস্টোমা দেখ্‌তে অনেকটা এক প্রকারের। প্রফেসর উরিক তখন তাঁকে জানান যে, তিনি যে ভ্যাম্পাইরাস বাদুড় নিয়ে পরীক্ষা করেছেন সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মিঃ ডিটমারের মনে সন্দেহের খোঁচা কাঁটার মত বিঁধে রইল। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক, এবং সেই ভুলটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া অবৈজ্ঞানিকের লক্ষণ। কাজেই প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য মিঃ ডিটমারকে বেরিয়ে পড়তে হয় ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রামের সন্ধানে। সঙ্গে নিয়ে যান প্রফেসরের সহকারীকে—কারণ এই বাদুড়ের আস্তানা ও গতিবিধি তাঁর ভাল করেই জানা ছিল।

যেসকল বৃক্ষকোটর থেকে তিনি এদের সংগ্রহ করে-ছিলেন সেখানে বহু ইঁদুরের লেজ ও পাখীর পালখ পড়ে থাকতে দেখতে পান। পরে তাদের বন্দী অবস্থায় হালচাল পরীক্ষা করে তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রাম হিংস্র ও মাংসাশী। এদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা সব সময়ই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। এরা কখনও অন্য কোন বাদুড়দলের সঙ্গে একত্র বাস করে না। অথবা এও হ'তে পারে যে অন্যেরা সর্বদা এদের সান্নিধ্য পরিহার করে চলে।

ভ্যাম্পাইরাস স্পেক্ট্রাম দেখতে বেশ বড়—প্রায় এক গজ হবে। বাজপাখীর মত এরা ছোঁ মেরে শিকার ধরে। এদের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ এবং চোয়ালের শক্তিও অসীম। দাঁতের সাহায্যে এরা ছোট ছোট প্রাণীর মস্তক অক্লেশে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে।

এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে মাংসাশী বাদুড় ছিল না বলেই জানা ছিল। কিন্তু খণ্ড খণ্ড পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে অন্ততপক্ষে একজাতীয় বৃহদাকার বাদুড়—মেগাডারমালিরা (*Megaderma-lyra*) মাংসাশী। ভ্যাম্পাইরাস বাদুড়ের বৃত্তির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়; সম্প্রতি আরও জানা গেছে যে এরা ছোট বাদুড় অর্থাৎ যাদের আমরা চামচিকা বলি, সুবিধা পেলে তাদের ধরেও খায়। এদের চলিত নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ভ্যাম্পায়ার বাদুড় (The Indian vampire bat)। অনুসন্ধানের ফলে আরও কত কি আবিষ্কৃত হ'বে—কে জানে?

সে যাক্। প্রাণীজগতে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত অন্য কোন প্রাণীর নামকরণ নিয়ে এমন বিভ্রাট ঘটেনি। যার প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ছিল ভ্যাম্পাইরাস সে হ'ল ডেস-মোডাস। আর যার নাম দেওয়া হ'ল ভ্যাম্পাইরাস—প্রথমে জানা ছিল যে তারা রক্তপায়ী, পরে জানা গেল যে তারা নিরীহ প্রকৃতির ফলাশী বাদুড়—আরও পরে এবং আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে তারা ফলাশী ত নয়ই, বরং ভয়ঙ্কর হিংস্রপ্রকৃতির মাংসাশী বাদুড়।*

---

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত প্রমাণপঞ্জী পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য লইয়াছি।

ইংরেজী

১। *Allen, G. M., Bats (1939)*

২। Ditmars, R. L, Confessions of a Scientist, New York, 1934 (*Vide*, articles : 'Vampire' and 'The Vampire Reappears.' pp. 32-52 and 191-203).

৩। Ditmars, R. L., 'Vampire Research,' *Bull. Zool*, Soc., N. Y.. vol 38 pp. 29-31, (1935)

৪। Ditmars ; R. L., 'Collecting Bats in Trinidad, *Bull. Zool.* Soc., N. Y., vol. 38 pp. 213-218 (1935).

৫। Ditmars, R. L., 'Making of a Scientist.'

৬। Ditmars, R. L., & Greenhall, 'The Vampire. Bat,' *Zoologica*, N. Y., Vol. 19, pp. 53-76 (1935).

৭। King, B. G., & Saphir, R., 'Some observations on the feeding methods of the Vampire Bat, *Zoologica*, N. Y., vol 22 pp. 281-288 (1937).

৮। McCann. C.,'The Indian Vampire (*Megaderma lyra*).' *Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.*, vol 37, p. 479 (1934).

বাংলা

১। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ার বাদুড়,' প্রবাসী, ৩৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৮০৪-৮১০ (১৩৪৬)

গান

শ্রীমতী সাহানা দেবী

নয় তো আঁধার নয় তো রাতি—দেখ না চেয়ে দেখ না রে আয়,
আলোর পালেই বয় যে তরী তবু কেন উদাসী হায়!
অপার ওই অনন্ত কোলে
আনন্দ সাগর উথলে,
দে না ঢেলে হৃদয় মেলে দেখবি পরাণ ভাসে সেথায়।

আমরা আলোর শিশু চলি চির আপন হাতটি ধ'রে
সমুখ দিয়ে কতই রঙে আলোর স্বপন খেলা করে।
আজ আমাদের ভাসে ভালো
চিরকালের আলোর আলো!
আজ সে তার ওই আলোর গোঠে মোদের জীবন-ধেনু চরায়।

আজ আমরা তারি সুরে বলব কথা তারি ভাষায়,
ফুটবে দূরের অচিন তারা আমাদের এই আঁখি তারায়।
আজ যে নবীন লগ্ন ধ'রে
বিছাবো প্রাণ পথের পরে;
আজ আমরা চলব শুধু, চলার এ পথ মেশে যেথায়।

এলো সে আজ ধূলার জীবন ধূলা ঝেড়ে দিতে তুলে!
এসেছি আজ সকল দিয়ে বিকাতে ওই চরণমূলে।
এলাম কত জনম পরে
আজ আমাদের আপন ঘরে;
আজ আমাদের জীবন দিয়ে জ্বালব জীবন অমর শিখায়।

পথ বেঁধে দিল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। সিঁড়ির উপর মঞ্জু একাকিনী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। মুখে প্রফুল্লতা নাই; চোখের পাতা যেন একটু ফুলিয়াছে, দেখিলে সন্দেহ হয় লুকাইয়া কাঁদিয়াছে।

সম্মুখে ফটকের দিকে উন্মনাভাবে তাকাইয়া মঞ্জু বসিয়াছিল। তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল ও দৃঢ়; কিন্তু আজ তাহাকে কিছু বেশী রকম বিমর্ষ দেখাইতেছিল।

চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে তাহার চোখে সচেতনতা ফিরিয়া আসিল; যেন ফটক দিয়া কেহ প্রবেশ করিতেছে। সে চেষ্টা করিয়া মুখে একটু স্বাগত হাসি আনিয়া বলিল—

মঞ্জু: আসুন মিহিরবাবু!

কবি-প্রকৃতি মিহির মঞ্জুর মুখের ভাবান্তর কিছুই দেখিতে পাইল না; এক গাল হাসিয়া মঞ্জুর পাশে সিঁড়ির উপর আসিয়া বসিল; পকেটে হাত পুরিয়া কয়েকখানা পোস্টকার্ড আয়তনের ফটোগ্রাফ বাহির করিতে করিতে বলিল—

মিহির: কয়েকখানা স্ন্যাপ্-শট্ তুলেছি। দেখুন দিকি, কার সাধ্য বলে জাপানী ছবি নয়—

ছবিগুলি হাতে লইয়া মঞ্জু একে একে দেখিতে লাগিল। প্রথম ছবিটি নৃত্যরত সাঁওতাল মিথুনের। ছবিটি উপর হইতে সরাইয়া নীচে রাখিয়া মঞ্জু দ্বিতীয় ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

এটিতে রঞ্জন ও ইন্দু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নেপথ্যে সাঁওতাল-নৃত্য দেখিতেছে। মঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ ছবিটার পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর ইন্দুকে নির্দেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু: ইনি কে?

মিহির গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—

মিহির: আমি চিনি না; বোধ হয় রঞ্জনবাবুর বান্ধবী—

মঞ্জু তিক্ত হাসিল।

মঞ্জু: রঞ্জনবাবুর অনেক বান্ধবী আছেন দেখছি—

ছবিটা তলায় রাখিয়া মঞ্জু তৃতীয় ছবি দেখিল। একটি ছাগল দেয়ালে সম্মুখের দুটি পা তুলিয়া দিয়া প্রাংশুলভ্য লতার পানে গলা বাড়াইয়াছে। সেটি অপসারিত করিয়া পরবর্ত্তী ছবির উপর দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জু শক্ত হইয়া উঠিল। মোটর বাইকে রঞ্জন ও মলিনা। দেখিতে দেখিতে মঞ্জুর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

মঞ্জু: নির্লজ্জ!

মিহির ভুল বুঝিয়া বলিল—

মিহির: অ্যাঁ! হ্যাঁ—নির্লজ্জ বই-কি।—নির্লজ্জতাই হচ্ছে আর্টের লক্ষণ—

মঞ্জু: নিন্ আপনার আর্ট, আমি দেখতে চাই না—

ছবিগুলি সক্রোধে ফিরাইয়া দিয়া মঞ্জু অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।—

এই সময় কেদারবাবু পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হাতে লাঠি, বাহিরে যাইবার সাজ। মঞ্জু তাঁহার পদশব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মিহির ছবিগুলি হাতে লইয়া বোকার মত বসিয়াছিল, সেও সেগুলি পকেটে পুরিতে পুরিতে দাঁড়াইয়া উঠিল।

মঞ্জু: বাবা, বেরুচ্ছ নাকি?

কেদার: হ্যাঁ, একবার ডাক্তারের বাড়িটা ঘুরে আসি। দাঁতের ব্যথাটা আবার যেন ধরব-ধরব করছে।

মঞ্জু: তা হেঁটে যাবে কেন? দাঁড়াও না আমি গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিচ্ছি—

কেদার: হুঁঃ—গাড়ী! আমি হেঁটেই যাব—এইটুকু তো রাস্তা—

সিঁড়ি দিয়া নামিতে উদ্যত হইয়া তিনি থামিলেন।

কেদার: তুই আজ বেড়াতে গেলি নে?

মঞ্জু মুখ অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে তাকাইল। তারপর হঠাৎ মিহিরের দিকে সচকিতে চাহিয়া সে চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু: বেড়াতে! হ্যাঁ—যাব।—মিহিরবাবু, আপনি

একটু দাঁড়ান, আমি গাড়ী বের ক'রে নিয়ে আসি; আপনিও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন—

মঞ্জু দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কেদারবাবু বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিলেন। মিহির অবাক হইয়া বোকাটে মুখে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাইতে লাগিল।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

ফটকের সম্মুখে মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; চালকের আসনে মঞ্জু। সে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু: আসুন মিহিরবাবু—

মিহির বিহ্বলভাবে মঞ্জুর পাশে গিয়া বসিল।

মঞ্জুর মুখ কঠিন সে গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

এমন সময় পিছনে ফট্‌ফট্‌ শব্দ। পরক্ষণেই রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল—

রঞ্জন: মঞ্জু!

মাথা একটু নীচু করিতেই তাহার চোখে পড়িল মিহির মঞ্জুর পাশে বসিয়া আছে; রঞ্জন থামিয়া গেল।

মঞ্জুর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না; সে উপেক্ষাভরে একবার রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া গাড়ীর কলকব্জা নাড়িয়া গাড়ী চালাইবার উপক্রম করিল। রঞ্জন আগ্রহসংহতকণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন: মঞ্জু, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।—

নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যভরে মঞ্জু মুখ তুলিল।

মঞ্জু: আমার সঙ্গে আবার কি কথা!

মঞ্জুর গাড়ী চলিয়া গেল।

রঞ্জন বিস্মিত ও আহতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কেদারবাবু আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন; রঞ্জন জানিতে পারিল না। কেদারবাবু তীক্ষ্ণ-চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, যে পথে মঞ্জুর গাড়ী চলিয়া গিয়াছিল সেই পথে তাকাইলেন, তারপর গলার মধ্যে একটি হুঙ্কার ছাড়িলেন।

কেদার: হুঁ:—

রঞ্জন চমকিয়া পাশের দিকে তাকাইল।

কেদার: ওরা চলে গেল?

রঞ্জন: আজ্ঞে হ্যাঁ—

সে নিজের মোটর বাইকের কাছে গিয়া আরোহণের উদ্যোগ করিল। কেদারবাবু অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রঞ্জন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

কেদার: ওহে শোন—

রঞ্জন ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া কেদারবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

রঞ্জন: আজ্ঞে?

কেদার: তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

রঞ্জন: আজ্ঞে বলুন।

কেদারবাবু বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, একটু চিন্তা করিলেন।

কেদার: আজ নয়—আজ আমি একটু ভাবতে চাই—

রঞ্জন: যে আজ্ঞে—

রঞ্জন ফিরিয়া গিয়া নিজের গাড়ীর উপর বসিল।

কেদার: কাল তুমি এসো—বুঝলে?

রঞ্জন: আজ্ঞে—আচ্ছা—নমস্কার—

রঞ্জনের গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিকে মঞ্জুর গাড়ী গিয়াছিল সেইদিকে চলিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্ব্বত্য ভূমি। রঞ্জনের মোটর বাইক ধীরে ধীরে চলিয়াছে; রঞ্জন সচকিতভাবে আশেপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে।

যে স্থানে তাহাদের গাড়ী দাঁড়াইত সেখানে আসিয়া দেখিল মঞ্জুর গাড়ী নাই। তারপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, অদূরে একটি গাছের নীচু ডাল হইতে দুটি জুতাপরা পদ-পল্লব ঝুলিতেছে। গাছের পাতায় চরণ দুটির স্বত্বাধিকারিণীর ঊর্দ্ধাঙ্গ দেখা যাইতেছে না।

রঞ্জন পা দুটি মঞ্জুর মনে করিয়া দ্রুত গাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মুখের সাগ্রহ ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া বিরক্তির আকার ধারণ করিল। বৃক্ষারূঢ়া তরুণী সাবলীল ভঙ্গীতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া কলহাস্য করিল।

ক্ষুব্ধ হতাশ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন: সলিল্‌ দেবী! আপনিও এসে পৌঁছে গেছেন!—আচ্ছা, নমস্কার!

রঞ্জন পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্প দূর গিয়াই পিছু ডাক শুনিয়া তাহাকে থামিতে হইল।

সলিলা : শুনুন—রঞ্জনবাবু!

সলিলা রঞ্জনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সলিলা : এত দিন পরে দেখা, আর কোনও কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন!—উঃ, আপনি কি নিষ্ঠুর!

রঞ্জন : নিষ্ঠুর! দেখুন—মাফ করবেন। আজ আমার মনটা ভাল নেই।

সে আবার গমনোদ্যত হইল। এমন সময় পিছন হইতে মীরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মীরা : মন ভাল নেই! কী হয়েছে রঞ্জনবাবু?

দৈবী আবির্ভাবের মত মীরা দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা মিশাইয়া বলিলেন—

মীরা : শরীর ভাল নেই বুঝি?

রঞ্জন : (দৃঢ়স্বরে) না, শরীর বেশ ভাল আছে—মন খারাপ।

এইবার মলিনা দেবীর মধুর স্বর শোনা গেল; ভোজ-বাজির মত আবির্ভূতা হইয়া তিনিও এইদিকেই আসিতেছেন।

মলিনা : কেন মন খারাপ হল রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল; মলিনার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে বলিল—

রঞ্জন : আপনার পা তো বেশ সেরে গেছে দেখছি—

মলিনা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যে বলিল—

মলিনা : তা সারবে না? আপনি কত যত্ন ক'রে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন।—জানিস ভাই, সেদিন কে এসেছিল—

ইন্দুর ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা গেল।

ইন্দু : জানি—আমরা অনেকবার শুনেছি।

তরুণীত্রয় চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল ইন্দু কখন তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রঞ্জন আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বোধ করি ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিল।

ইন্দু সহজ ভাবে বলিল—

ইন্দু : সবাই দাঁড়িয়ে কেন? আসুন রঞ্জনবাবু, ঘাসের ওপর বসা যাক—

রঞ্জন : বেশ, যা বলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতী-চতুষ্টয় প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন।

রঞ্জন : এবার কি করতে চান?

মীরা : এবার? তাই তো—

সকলেই চিন্তিত। মলিনা উজ্জ্বল চোখ তুলিয়া চাহিল।

মলিনা : আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।—আসুন, পাঁচজনে মিলে লুকোচুরি খেলা যাক—

ইন্দু : (ঠোঁট উল্টাইয়া) লুকোচুরি।

রঞ্জন : লুকোচুরি—

হঠাৎ তাহার মাথায় কূটবুদ্ধি খেলিয়া গেল। মেয়েরা তাহার মতামত অনুধাবন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল—

রঞ্জন : তা মন্দ কি! আসুন না খেলা যাক। এখানে লুকোবার জায়গার অভাব নেই।

রঞ্জনের মত আছে দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মলিনার উত্তেজনা সবচেয়ে বেশী।

মলিনা : বেশ। প্রথমে কে চোর হবে?

রঞ্জন : আমি আঙুল মটকাচ্ছি।

রঞ্জন পিছনে হাত লুকাইয়া আঙুল মট্‌কাইল; তারপর তরুণীদের সম্মুখে হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। তরুণীগণ নানাপ্রকার আশঙ্কার অভিনয় করিতে করিতে গলার মধ্যে চাপা হাসি হাসিতে হাসিতে এক একটি আঙুল ধরিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ স্বরে বলিল—

রঞ্জন : আমিই চোর হলাম। বুড়ো আঙুল মট্‌কেছিল।

তরুণীগণ সকলেই খুশী হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মীরা : বেশ। আপনি তা'হলে চোখ বুজে বসুন। কিন্তু বুড়ী হবে কে?

রঞ্জন চট্ করিয়া বলিল—

রঞ্জন : ঐ যে আমার গাড়ীটা বুড়ী।

মীরা : আচ্ছা—

চারিটি যুবতী চারিদিকে চলিলেন। রঞ্জন দু'হাতে চোখ ঢাকিল।

মলিনা : (যাইতে যাইতে) টু না দিলে চোখ খুলবেন না যেন।

রঞ্জন মাথা নাড়িল। তরুণীগণ পা টিপিয়া টিপিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারিদিক হইতে টু শব্দ আসিল। রঞ্জন চোখ হইতে হাত সরাইয়া সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর হঠাৎ তীরবেগে নিজের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুট দিল।

তরুণীগণ কিছুই জানিলেন না। রঞ্জন মোটরবাইক ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাতে স্টার্ট দিয়া লাফাইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তরুণীগণ বাহির হইয়া আসিয়া স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যভাবে পলাইতে পলাইতে রঞ্জন পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া হঠাৎ সবলে ব্রেক্‌ কশিল। এর একশত গজ দূরে অসমতল ভূমির উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঞ্জু ও মিহির বিপরীত মুখে চলিয়াছে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া রঞ্জন পদব্রজে তাহাদের অনুসরণ করিল।

মঞ্জু ও মিহির পাশাপাশি চলিয়াছে; পিছন দিক হইতে রঞ্জন যে দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। কাছাকাছি পৌছিয়া রঞ্জন গলা চড়াইয়া ডাকিল—

রঞ্জন: মঞ্জু!

মঞ্জু ও মিহির থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুর মুখ অপ্রসন্ন। রঞ্জন কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ পিছু ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক পা গিয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—

মঞ্জু: আসুন মিহিরবাবু!

মিহির ইতস্তত করিতেছিল; আহ্বান শুনিয়া যেই পা বাড়াইয়াছে অমনি রঞ্জনের হস্ত কাঁধের উপর পড়িয়া তাহার গতিরোধ করিল। মিহির ভ্যাবাচাকা খাইয়া রঞ্জনের মুখের পানে তাকাইল। রঞ্জন গম্ভীরমুখে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

রঞ্জন: আপনি ঐদিকে যান—

বলিয়া বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

মিহির: ঐদিকে?

রঞ্জন: হ্যাঁ, ঐদিকে।

কাঁধের কামিজ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রঞ্জন মিহিরকে একটি অনুচ্চ ঢিবির উপর লইয়া গেল; দূরে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল—

রঞ্জন: দেখ্‌ছেন?

মিহির দেখিল—দূরে চারিটি তরুণী একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে যে পথে রঞ্জন পলাইয়াছিল সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। মিহিরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে একবার রঞ্জনের দিকে সহাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া দ্রুতপদে ঢিবি হইতে নামিয়া তরুণীদের অভিমুখে চলিল।

এইরূপে মিহিরকে বিদায় করিয়া রঞ্জন আবার মঞ্জুর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

মঞ্জু ইতিমধ্যে খানিকদূর গিয়াছে। পিছন হইতে তাহার চলনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় সে অত্যন্ত রাগিয়াছে। সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, রঞ্জন আসিতেছে—মিহির পলাতক। সে সক্রোধে আরও জোরে চলিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে রঞ্জনের গলা আসিল—

রঞ্জন: মঞ্জু! দাঁড়াও!

মঞ্জু দাঁড়াইল না; একটা উঁচু চ্যাঙড়ের পাশ দিয়া মোড় ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনও সেইখানে মোড় ফিরিয়া মঞ্জুর অনুসরণ করিল।

ক্রমে মঞ্জু নদীর বালুর উপর গিয়া পড়িল। অদূরে ছোট নদীর বুকের উপর মাঝে মাঝে পাথরের চাপ বসাইয়া পারাপারের সেতু রহিয়াছে; ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মঞ্জু সেই সেতু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

পিছন হইতে রঞ্জন ডাকিল—

রঞ্জন: মঞ্জু! শোনো—

কিন্তু শুনিবে কে? মঞ্জু তখন নদীর কিনারায় গিয়া পৌছিয়াছে। সে সেতুর প্রথম ধাপের উপর লাফাইয়া উঠিয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল—রঞ্জন অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আর দ্বিধা না করিয়া দ্বিতীয় পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার মনের অবস্থা এমন যে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নদী পার হইয়া যেখানে খুশী চলিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

নদীর ঠিক মাঝখানে যে পাথরটি বসানো আছে তাহা

সবচেয়ে বড়। সেটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মঞ্জু চকিতের ন্যায় পিছু ফিরিয়া দেখিল রঞ্জন নদীর কিনারায় প্রথম ধাপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

রঞ্জন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—

রঞ্জন : মঞ্জু, আর যেও না—জলে পড়ে যাবে—

রঞ্জন তখন বাকি পাথরগুলি লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া রঞ্জনের মুখে হঠাৎ একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল। সেও নদী লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইল।

ওদিকে মঞ্জু তখন প্রায় পরপারে পৌঁছিয়াছে। শেষ ধাপে পৌঁছিতেই পিছন হইতে একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার তাহার কানে আসিল; সে চমকিয়া পিছু ফিরিয়া ক্ষণকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিল।

নদীর মাঝখানের পাথরটার ঠিক পাশে রঞ্জন জলে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতেছে; তাহার অসহায় হাত পা আস্ফালন দেখিয়া মনে হয় সে ডুবিল বলিয়া, আর দেরী নাই।

মঞ্জু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পাথরের কিনারায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে রঞ্জনের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু : এই যে—রঞ্জনবাবু, আমার হাত ধরুন!

রঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে মঞ্জুর প্রসারিত হাত-খানা ধরিয়া ফেলিল। মঞ্জু প্রাণপণে টানিয়া তাহাকে পাথরের কিনারায় লইয়া আসিল।

এখানেও গলা পর্য্যন্ত জল। মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু : এবার উঠে আসুন—

রঞ্জন মুখের জল কুলকুচা করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—

রঞ্জন : আগে বল আমার কথা শুনবে।

মঞ্জুর মুখ অমনি শক্ত হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্রসর হইল। রঞ্জন তাহা দেখিয়া বলিল—

রঞ্জন : শুনবে না? বেশ—তবে—

মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া সে আবার ডুবিবার উপক্রম করিল। তাহার মাথা জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গেল; একটা হাত যেন শূন্যে কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া মস্তকের অনুবর্ত্তী লইল। ভয় পাইয়া মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল—

মঞ্জু : ও রঞ্জনবাবু!

রঞ্জনের মাথা আবার জাগিয়া উঠিল।

রঞ্জন : বল কথা শুনবে?—শুনবে না? তবে—

রঞ্জন আবার ডুবিতে উদ্যত হইল।

মঞ্জু : শুনবো শুনবো—আপনি আগে উঠে আসুন।

মঞ্জু হাত বাড়াইয়া দিল; রঞ্জন হাত ধরিয়া পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

গত কয়েক মিনিটের ব্যাপারে মঞ্জুর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল; সে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। রঞ্জনও সিক্ত বস্ত্রাদি সমেত তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—

রঞ্জন : উঃ! কী গভীর জল!

শঙ্কিতমুখে মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু : কত জল?

রঞ্জনের অধর কোণে একটি ক্ষণিক হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল; সে গম্ভীর মুখে যেন হিসাব করিতে করিতে বলিল—

রঞ্জন : তা—প্রায়—আমার কোমর পর্য্যন্ত হবে!

মঞ্জুর অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পুরুষ জাতির হীন প্রবঞ্চনায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সে রঞ্জনের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বসিল।

রঞ্জন : পিছু ফিরলে চলবে না; কথা দিয়েছ, আমার কথা শুনতে হবে।

দুর্লঙ্ঘ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু : কি বলবেন বলুন—আমি শুনতে পাচ্ছি।

রঞ্জন তখন উঠিয়া মঞ্জুর পিছনে নতজানু হইয়া বসিল; গলা পরিষ্কার করিয়া যোড় হস্তে বলিল—

রঞ্জন : আপনার কাছে অধমের একটি আর্জ্জি আছে—

মঞ্জু আবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; রঞ্জনের হাস্যকর ভঙ্গিমা দেখিয়া হাসি পাইলেও সে মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। রঞ্জন দীনতা সহকারে বলিল—

রঞ্জন : আমার বিনীত আর্জ্জি এই যে, আমি বড় বিপদে পড়েছি, আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন—

মঞ্জু নিরুৎসুক স্বরে বলিল—

মঞ্জু : কি বিপদ?

মর্ম্মান্তিক মুখ-ভঙ্গী করিয়া রঞ্জন আকাশের পানে তাকাইল।

রঞ্জন : কি বিপদ! এমন বিপদ আজ পর্য্যন্ত মানুষের

হয়নি।—একটি নয় দুটি নয়, চার চারটি তরুণী আমাকে তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে—আনাচে কানাচে ওৎ পেতে বসে আছে, সুবিধে পেলেই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।—মেঘনাদবধ পড়েছ তো—

—রক্তচক্ষু হর্য্যক্ষ যেমতি
কড়মড়ি ভীম দন্ত পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে

শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখের মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়াছিল : অধরপ্রান্তে হাসি উছলিয়া উঠিতেছিল। তবু সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল—

মঞ্জু : এই বিপদ!

রঞ্জন : এটা সামান্য বিপদ হ'ল! রাত্রে দুশ্চিন্তায় আমার চোখে ঘুম নেই ; দিনের বেলা বাড়ীতে থাকতে ভয় করে—এখানে পালিয়ে আসি। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? আজ তো চারজনে একসঙ্গে ধরেছিল—

মঞ্জু আর বুঝি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। চাপা বিকৃত স্বরে সে বলিল—

মঞ্জু : তা আমি কি করব?

রঞ্জন এবার তাহার উক্ত-হনুমানভঙ্গী ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল, সহজ মিনতির স্বরে বলিল—

রঞ্জন : মঞ্জু, কেউ যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারে তো সে তুমি। সত্যি বলছি, তুমি যদি কিছু না কর, ওরা কেউ না কেউ জোর করে আমাকে বিয়ে করে ছাড়বে!

মঞ্জু : তা বেশ তো—ভালই তো হবে।

ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রঞ্জন মঞ্জুর কাঁধ ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। মঞ্জু পুরা ফিরিল না, আধাআধি ফিরিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, তুমি এ কথা বল্‌তে পারলে? মন থেকে?

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু : তা আর কি বলব? আমি কি করতে পারি?

রঞ্জন : তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো।

মঞ্জু গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিল।

মঞ্জু : কি ক'রে বাঁচাব?

রঞ্জন মঞ্জুর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—

রঞ্জন : বুঝতে তো পেরেছ, তবে কেন দুষ্টুমি করছ? সত্যি মঞ্জু, বল আমাকে বিয়ে করবে!

মঞ্জু হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মঞ্জু : হাত ছেড়ে দাও।

রঞ্জন : ছাড়ব না। আগে বল বিয়ে করবে।

মঞ্জু ঘাড় নীচু করিয়া রহিল ; মুখ টিপিয়া বলিল—

মঞ্জু : কেন? ওদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে?

রঞ্জন : শুধু তাই নয়।—

রঞ্জন তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া আনিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, এখনও মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে? বেশ বল্‌ছি—আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।—এবার বল, বিয়ে করবে?

মঞ্জুর নত মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিয়াছিল ; সে উত্তর না দিয়া নখে পাথরের উপর আঁচড় কাটিতে লাগিল।

রঞ্জন : বল। না বললে ছাড়বো না।

মঞ্জু এবার চোখ দুটি একটু তুলিল।

মঞ্জু : তুমি কি সায়েব?

রঞ্জন কথাটা বুঝিতে পারিল না।

রঞ্জন : সায়েব? তার মানে?

মঞ্জু : বাবাকে বলতে হবে না?

রঞ্জন : (বুঝিতে পারিয়া) ও—ঃ! না, সায়েব নই।—তাঁকেও বলব, আমার বাবাকেও বলব। কিন্তু তার আগে তোমার মনের কথাটা তুমি বল মঞ্জু—

মঞ্জু : সব কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে হবে?

রঞ্জন : হ্যাঁ।

মঞ্জু হাসিয়া পাশের দিকে চোখ ফিরাইল ; তারপর ঘাড় তুলিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন : কই, বললে না?

মঞ্জু অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ঐ ছাখো—

রঞ্জন চোখ তুলিয়া দেখিল, কিছু দূরে নদীর কিনারায় এক সারস-দম্পতি আসিয়া বসিয়াছে। তাহারা পরস্পর চঞ্চু চুম্বন করিতেছে, গলায় গলা জড়াইয়া আদর করিতেছে।

দুজনে পাশাপাশি বসিয়া পক্ষী-দম্পতির অনুরাগ-নিবেদন দেখিতে লাগিল। তারপর রঞ্জন মঞ্জুর কাছে আরও ঘেঁষিয়া বসিয়া এক হাত দিয়া তার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া লইল।

ফেড্ আউট্।

(আগামী বারে সমাপ্য)

স্বাধীন বৈষ্ণবরাজ্য মণিপুর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

যেদিন আমরা ইম্ফাল পৌছলাম সেদিন উল্টো রথ। পথে দু'একটী গ্রামে রথপূজা ও রথটানা দেখলাম। বাঙ্গালার মত খোল-করতাল সহযোগে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে; কীর্ত্তনসহ রাস্তার ওপর রথ পূজা হয়, রথের আকৃতি কিন্তু ভিন্ন রকমের। প্রধানতঃ কাঠ, বাঁশ ও কাপড় দিয়ে রথগুলি তৈরী। মহারাজার রথটী তাঁর প্রাসাদের সামনে বিস্তৃত রাস্তায় টানা হয়। হাতীর ওপর রাজপরিবারের সকলে শোভাযাত্রায় যোগ দেন; প্রকাণ্ড রথ—মোটা লম্বা রসার সঙ্গে লোহার তারের দড়ি রথে বাঁধা। মণিপুরীরা খুব উৎসবপ্রিয়, কাজেই এমন একটা উৎসবে গানবাজনা হৈ চৈ করা খুব স্বাভাবিক। ইম্ফালের সংরক্ষিত এলাকায় এক মাড়োয়ারীর ঠাকুরবাড়ীতে এবং মহারাজার এলাকায় প্রতি ৫।৭ মিনিট অন্তর নাটমন্দিরে নাটমন্দিরে কীর্ত্তনের আয়োজন ছিল। সাধারণতঃ একটু বেশী রাত্রে কীর্ত্তন সুরু হয় ও রাত্রি ২টা ২॥০টা পর্য্যন্ত চলে। পুরুষেরা ও মেয়েরা পৃথক পৃথক দলে কীর্ত্তন গায়, একসঙ্গে গায় না। মেয়েদের মধ্যে কোন কোন দল মণিপুরী বেশে মণিপুরী ভাষায় কীর্ত্তন গায়, আবার কোন কোন দল বাঙ্গালীর মত শাড়ী ব্লাউস পরে কীর্ত্তন গায়। মণিপুরী বেশে যারা গায় তাদের নাচের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যের নিজস্ব সংযম, ছন্দ এবং তাল আছে, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাতে তালি দিয়ে তাল রাখে; একজন মূলগায়ক গান গায়, অন্যান্য সকলে তার পুনরাবৃত্তি করে। যারা বাঙ্গালী পোষাকে গান গায়, তাদের নৃত্যের মধ্যে আধুনিক বাঈজীর লাস্যভঙ্গী বেশ সুস্পষ্ট; এরা কিন্তু সুন্দর বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তন গায় অথচ তার একবর্ণেরও অর্থ বোঝে না। দুএকটী উচ্চারণ ছাড়া প্রত্যেকটী উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও যেখানে যেমন ঝোঁক দিয়ে বলা দরকার ঠিক সেইমত উচ্চারণ করে। এখানে কীর্ত্তনের আর এক মজা এই যে, একই আসরে বিভিন্ন দল পর পর গেয়ে যায়। শ্রোতার দল একজায়গায় বোসেই বিভিন্ন দলের গান শুনতে পান। এক একটী গ্রামে একাধিক বিষ্ণুমন্দির এবং প্রত্যেক বিষ্ণুমন্দিরের সঙ্গে নাটমণ্ডপ। মালিকের অবস্থানুসারে নাটমণ্ডপের আয়তন বা চাকচিক্যের পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে সাধারণতই নাটমণ্ডপগুলি বেশ প্রকাণ্ড। কতকগুলি নাটমণ্ডপ বেশ সাজান দেখলাম। উৎসবের দিন বড় রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটলে প্রতি ৫।৭ মিনিট অন্তর এক একটী মণ্ডপে কীর্ত্তনের দল দেখা যায়, তা ছাড়া অদূরবর্ত্তী বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে গানবাজনার আওয়াজ শোনা যায়। রাস্তায় দলে দলে মেয়েপুরুষ মণ্ডপ থেকে মণ্ডপান্তরে চোলেছে। গানের অত্যন্ত কঠিন রাগ রাগিণী এদের অনেকেই বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মতভাবে আলাপ করে। কীর্ত্তনের

বিদ্যুৎ সরবরাহের জলপ্রপাত

সময় অনেকেই 'পেলা' দেয়। 'পেলা' দিতে আসরে ঢুকবার সময় প্রণাম কোরে ঢুকতে হয় এবং মূল গায়িকাদের হাতে 'পেলা' দিয়ে আসর থেকে বেরুবার সময় আবার প্রণাম কোরতে হয়। সিকি, দুআনী এবং পয়সা পর্য্যন্ত দেবার প্রথা আছে। যার হাতে 'পেলা' দেয় সে কিন্তু ফিরেও দেখে না যে কি দিল, সঙ্গে সঙ্গে সে মাটীতে ফেলে দেয় এবং গানের পর তা দলের লোক কুড়িয়ে নেয়। গান আরম্ভের পূর্ব্বে মণ্ডপের মালিক প্রত্যেক দলকে পান-সুপারী দিয়ে বরণ করে। যেখানে গান হয় সেখানে কিছু

পাতা থাকে না ; শ্রোতাদের জন্য একরকম সরু পুরু মাদুর অনেকগুলি পাতা থাকে। একদিন একটী আসরে আধুনিক ও প্রাচীন বিভিন্ন রকমের প্রায় দশ বারটী যন্ত্রসহযোগে পুরুষদের জয়দেবের গীতগোবিন্দের আবৃত্তি শুনলাম ; বড় সুন্দর লাগল। এই ভাবে এখনও এখানে অতীতের সংস্কৃতি ধর্ম্মের সঙ্গে জনসমাজের মাঝে বেঁচে আছে ; লোকশিক্ষার পুরাতন ব্যবস্থা সচল রোয়েছে। একদিন এদের যাত্রা দেখলাম ; সেও রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ নিয়েই। খুব সম্প্রতি 'কর্ণার্জ্জুন', 'ভীষ্ম' প্রভৃতি পৌরাণিক ও দু'একখানা সামাজিক বাঙ্গালা নাটকও এদের ভাষায় অনূদিত হোয়ে অভিনীত হোয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের মারফতই এদেশের নূতন সাহিত্য গোড়ে উঠছে। অভিনয়ে স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গেই অভিনয় করে। এখানে একটী সাধারণের রঙ্গালয় আছে। মাঝে মাঝে সেখানে অভিনয় হয়। এখানকার পুরুষেরা ঠিক বাঙ্গালীর মত কাপড় ও পাঞ্জাবী বা শার্ট পরে। বাঙ্গালীর সঙ্গে পার্থক্য বোঝা যায় ওদের উন্নত হনু ও ফোলা ফোলা চোখে এবং কপালের তিলকে। প্রায় প্রত্যেক মেয়ে পুরুষই রসকলি ও তিলক কাটে। মেয়েদের পোষাক কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণতঃ বগলের নীচে দিয়ে ঠিক বুকের ওপর থেকে নিজেদের হাতে বোনা ৪ হাত লম্বা রঙ্গীন "ফানেক" পরে, গায়ে জড়ান থাকে একখানা খুব পাতলা সাদা বা রঙ্গীন চাদর। চুলগুলি বেশ সুবিন্যস্ত, কপালে তিলক। সাধারণতঃ এদের রং হলদেটে ফর্সা, হনু উন্নত, চোখ ফুলো ফুলো, মুখ থ্যাবড়া, বেঁটে গড়ন ; এদের অনেককে ফর্সা মেঝেনের (সাঁওতাল রমণী) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে সকলেই যে ফর্সা এমন নয়। স্কুলে-পড়া আধুনিক মেয়েরা গায়ে ব্লাউস ও চাদর নেয়, আর "ফানেক" পরে কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত। এদের সাধারণ নিয়ম, অবিবাহিত মেয়েরা সামনের চুলগুলো সমান কোরে ছেঁটে কপালে ফেলে রাখে, আর বিবাহিতারা কপালের চুল উল্টে পেছন দিকে বাঁধে। আধুনিক অবিবাহিতা মেয়েরা এই নিয়মও মানে না, তারা সামনের চুল দুধারে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে গুছিয়ে রাখে। আধুনিক মেয়েরা শাড়ীর ভক্ত। সাধারণতঃ বাজারে বা রাস্তাঘাটে বর্ষীয়সী এবং দরিদ্র কর্ম্মী মেয়েদেরই দেখা যায়, কাজেই মণিপুরের সত্যকার সুন্দরী দেখতে হোলে গ্রামে যাওয়া প্রয়োজন। গ্রামের প্রতি ঘরে তাঁত আছে, প্রত্যেক মেয়েই অবসর সময়ে তাঁত বোনে। যে মেয়ে তাঁত বুনতে জানে না তার বিয়ে হয় না—এমনি একটা কথা এখানে চলতি আছে। এখন মিলের সুতো যথেষ্ট মাথা গলিয়েছে, তবুও চরকা একেবারে ওঠে নি।

এদের বিয়ে সাধারণতঃ দুরকমের, প্রজাপতি ও গন্ধর্ব্ব-মতে। মা বাপ দেখে পছন্দ কোরে পাচজন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ কোরে যাগযজ্ঞ কোরে যে বিয়ে দেন তা প্রজাপতি মতে ; সাধারণতঃ বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র ঘরে প্রথম বিয়েটা এইভাবেই হয়। এ বিয়েতেও কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, শুধু পান সুপারী দিয়েই বিদায়। দ্বিতীয় মতটা হোল এই যে, যদি কোন পুরুষ কোন কুমারী বা বিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ধরা না পোড়ে একরাত্রি লুকিয়ে থাকতে পার তবে পরদিন সকাল থেকে গন্ধর্ব্ব মতে সে ঐ নারীর স্বামী হবে। কিন্তু যদি ঐ রাত্রিতে কন্যার আত্মীয় স্বজন তাকে খুঁজে বের কোরতে পারে তবে কন্যা-লাভ ত বরাতে ঘোটবেই না—উল্টে ইচ্ছামত উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা কন্যাটী নিয়ে যাবে এবং তার ওপর জরিমানা দিতে হবে। তবে সাধারণতঃ কন্যার আত্মীয়স্বজন খুব বেশী খোঁজাখুজী করে না, কারণ একবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেও পরদিন আবার পালাতে পারে। বর্ত্তমানে খোঁজাটা একটা লৌকিক আচারে দাঁড়িয়ে গেছে। স্ত্রী বা কন্যা হারালে বাড়ীর লোকরা একবার আত্মীয়স্বজনের বাড়ী লাঠিসোটা নিয়ে ঘুরে খবর দিয়ে আসে এবং নেহাৎ আপত্তিকর সম্বন্ধ না হোলে আন্তরিক বাধা দেয় না। মণিপুরে হিন্দুদের মাত্র দুরকম জাত, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। নাগারা শূদ্রদের কাজ করে, আর আছে দেশী খৃষ্টান ও মুসলমান, তবে এদের সংখ্যা নগণ্য (গত আদমসুমারী অনুযায়ী মণিপুরী হিন্দুদের সংখ্যা ২৫৭২৫৫ জন, খ্রীষ্টান ৯০৪০১, মুসলমান ২২৮৬৮ জন)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে কোরলে তার ছেলে ব্রাহ্মণ হবে, তবে স্ত্রী পরিবারের মধ্যে জায়গা পাবে না ; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে কোরলে ছেলে ক্ষত্রিয় হবে এবং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয় পরিবারে স্থান পাবে না। এখানে এক একজন পুরুষ সাধারণতই পাচ সাতটা বিয়ে করে। স্ত্রী এখানে দুর্বহ নয়. বরং তারাই ভারবাহী। সাধারণতঃ মেয়েরাই এখানে নানা গৃহশিল্প দ্বারা উপার্জ্জন করে ও

হলচালনা ছাড়া বাকী কৃষিকাজও করে, কাজেই এক একজন স্ত্রী উপার্জ্জনের এক একটী অবলম্বন। যার যত স্ত্রী তার অর্থভাগ্য ততই সুপ্রসন্ন। সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এক এক স্ত্রী বাতিল হয় ও নূতন স্ত্রী ঘরে আসে। ইহাই এখানকার প্রথা বোলে স্ত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে খুব বেশী ঝগড়াঝাটি হয় না। বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় এখানে বিধবা নামে কোন জিনিষ নাই, মণিপুর চির-সধবার দেশ। স্বামীস্ত্রীর পরস্পরে মিল না হোলে উভয়ের যে কেউ অপরকে ত্যাগ কোরতে পারে; পাঁচজন সালিশী ডেকে বোঝাপড়া করে ছাড়াছাড়ি হয়। তবে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ কোরলে স্বামীর পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হয়। টাকা দিয়ে বিচ্ছেদ হোলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে একটা নাদাবী লিখিয়ে নেয়, যাতে ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছ থেকে পূর্ব্বস্বামী পূর্ব্বঅধিকারের জোরে কোন টাকা আদায় না কোরতে পারে। কুমারী ও সধবা চুল বাঁধার রকমফেরে বোঝা যায়, সধবারা সিঁদুর পরে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ছুঁৎমার্গ খুব বেশী উৎকট নয়, কিন্তু "মায়াং" (আসামী ও বাঙ্গালীদিকে সাধারণতঃ বলে, যদিও সহজ অর্থ বিদেশী) বাড়ীর ভেতর ঢুকলে বা খাবার জিনিষ ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। যদি কোন মেয়ে "মায়াং"এর সঙ্গে বাস বা মায়াংকে বিবাহ করে, তবে সেই গ্রামের সমস্ত লোকের জাত যাবে। হিন্দুর আদর্শ মতে এখানে মহারাজা সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। মহারাজার পাটরাণী ছাড়া আরও অনেক রাণী আছেন। কেউ জাতিচ্যুত হোলে, মহারাজকে ডালি দিলে তিনি যদি তুষ্ট হন তাকে জাতে তুলে দিতে পারেন। বর্ত্তমান প্রজা-আন্দোলনের ফলে সাধারণ প্রজার এই অন্ধ রাজভক্তির ব্যতিক্রম ঘটছে।

বর্ত্তমানে মহারাজা শাসন করেন তাঁর নিজের মনোনীত একটী শাসন-পরিষদের সাহায্যে। বর্ত্তমানে এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮ জন; এর মধ্যে মহারাজকুমার মাসিক ৩০০৲ এবং অন্যান্য সদস্যরা ১৫০৲ হিসাবে ভাতা পান শুনলাম। বর্ত্তমান প্রজা-আন্দোলনের দাবী এই যে শাসন-পরিষদের সদস্য সংখ্যা আরও বাড়িয়ে একশত করা হোক এবং এর মধ্যে ৮০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হবেন। এই প্রজা-আন্দোলনের মূলে আছে মাড়োয়ারীদের নির্ম্মম শোষণ। কয়েকবৎসর পূর্ব্বেও মাড়োয়ারীরা শতকরা মাসিক ৩৲ টাকা থেকে ৬৲ সুদ নিয়েছে, এখনও মাসিক ২৲ টাকা ২॥০ সুদ সাধারণ হার বোলে পরিগণিত। এখানকার চাষীকে ধানের মণ ।৵০, ।১০ দিয়ে নিজেরা বাইরে চালান দিয়ে প্রচুর লাভ কোরেছে, দেশের প্রায় সমস্ত ব্যবসাই এরা হাত কোরেছে, তবু এরা মণিপুরীকে বেশী বেতন দেবে না, ন্যায্য দাম দেবে না। ক্রমশঃ যখন লোকের চোখ ফুটল তখন যোগ্য নেতার সাহায্যে তারা প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। আন্দোলনের ফলে সংরক্ষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বাজারটী একেবারে উঠে গেছে। আমাদের পূর্ব্বাগত যাত্রীরা এই বাজার সম্বন্ধে নানা লোভনীয় বর্ণনা কোরে গেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তা শ্মশানের মত পোড়ে আছে। মণিপুর স্ত্রী-প্রাধান্যের দেশ;

নাগাপল্লীতে একজন আধুনিকা নাগাধাত্রী

রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূতও এখানে নারী। এখানকার যত কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন—আজ পর্য্যন্ত মেয়েদের নেতৃত্বে মেয়েরাই চালিয়ে এসেছে। সংরক্ষিত এলাকায় পুলিশে তাদের ওপর অসদ্ব্যবহার করায় তারা বাজারটীকে শ্মশান কোরে ইম্ফাল নদীর অপর তীরে মহারাজার এলাকায় রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় কোরে বাজার বসিয়েছে। ওপরে আচ্ছাদন নাই, বোসবার উচ্চাসন নাই, আসনের শৃঙ্খলা নাই, তবু তারা রোজ বিকাল ৫টা ৬টায় এসে রাস্তার দুধারে পাশের মাঠে বাজার বসায়, কেনাবেচা চলে।

বাজারের পূর্ব্বশ্রী নাই, তবে স্বাধীনতা আছে। সন্ধ্যায় যখন শত শত চীরকাঠ প্রদীপ শিখার মত এক একজন দোকানীর সামনে জ্বলে, তখন দূর থেকে মনে হয় দেওয়ালীর উৎসব লেগেছে। রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত বাজার খোলা। এখানে বিক্রেতা সকলেই নারী, ক্রেতাও অধিকাংশ নারী। প্রকাণ্ড বড় বড় ডালা এবং থালা এরা অবলীলাক্রমে হাত না দিয়ে মাথায় নিয়ে (জিনিষপত্র সহ) চলে। তরকারী-পত্র বেশ সস্তা, আলুর মণ ৮০, অসময়ের বাঁধাকপি এক-পয়সায় একটা। ধানের মণ পাঁচ থেকে ছয় আনা। কিন্তু বিদেশী ব্যবসাদারদের শোষণ ও রপ্তানির ফলে ধানের দর দু'টাকার ওপর ও চালের দর চার টাকার ওপর উঠে গিয়ে-

উৎসব বেশে নাগা ও নাগিনী

ছিল। তার ফলে আন্দোলন সুরু হয়—'রপ্তানি বন্ধ কর'। জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এমনি অসম্ভব বাড়ায় দেশের গরীবেরা অনাহারে রইল, ফলে আন্দোলন প্রাণ পেল। আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমানে রপ্তানি বন্ধ হোয়ে গিয়েছে এবং বিদেশী বণিকরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। চালের কলগুলি সবই বন্ধ দেখলাম। আন্দোলনের অগ্রদূতেরা অনেকেই অবশ্য আজ কারাগারে আবদ্ধ। বর্ত্তমানে এই নিয়ম শুনলাম যে ধানের দাম মণ পিছু ২৲ বা ৩৲ টাকার বেশী উঠলে রপ্তানি বন্ধ হবে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ রপ্তানি খুললে ধানের দর দশ থেকে বার আনা, চালের মণ ২৲ টাকা ২।০। এই আন্দোলনের ফলে এখানের সিনেমা বন্ধ হোয়ে যায়, কারণ তার মালিক ছিল মাড়োয়ারী। বর্ত্তমানে একজন মণিপুরী সিনেমা ঘরটা ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছেন। আলু, লঙ্কা, পাগড়ীর কাপড়, ধান ও চাল প্রধানতঃ মণিপুর থেকে রপ্তানি হয়। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য কোরতে গেলে বৃটিশ প্রজাকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের কাছে দরখাস্ত কোরতে হয়; তিনি তা মহারাজার দরবারে পাঠান। তাঁর এবং দরবারের মঞ্জুরী পেলে তবে বাণিজ্য করা যেতে পারে। এখানে ১২।১৩ জন বাঙ্গালী ব্যবসাদার আছেন; এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। পোষ্ট অফিস, থানা এবং পলিটিক্যাল এজেণ্টের অফিসের কর্ম্মচারীরও অধিকাংশই বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের পাড়া এখানে "বাবুপাড়া" বোলে পরিচিত। এখানে বাঙ্গালীদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটী বাঙ্গালী স্কুল আছে—বয়স্কদের মিলন ক্ষেত্র 'ভিক্টোরিয়া ক্লাব' আছে। এই সব প্রবাসী বাঙ্গালীদের ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে দেওয়া এক সমস্যা। বিশেষ কোরে এঁদের বাড়ীর নববধূ বা নবাগতা আত্মীয়াদের অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে। মাত্র ১০।১২টী পরিবার, তার বাইরের আকর্ষণ বিশেষ কিছু নাই। প্রায় পল্লীর মত শান্ত নীরব আবহাওয়ার মধ্যে ছোট্ট সহরের জীবন মন্থর গতিতে চোলেছে। বাঙ্গালীরা যেমন এখানে বাবু বোনেছে, তেমনি পাঞ্জাবীরা মোটরের ব্যবসা একচেটে কোরেছে, অন্যান্য ব্যবসা মাড়োয়ারীদের করতলগত।

ইম্ফাল থেকে ২৮ মাইল দূরে "লকটাক" হ্রদ এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। ইম্ফাল থেকে ১২।১৪ মাইল দূরে একটী জায়গাকে এরা অর্জ্জুনের বাসস্থান বোলে নির্দ্দেশ করে। এখানে নাকি অনির্ব্বাণ আগুণ জ্বোলছে, এদের যাবতীয় শুভকাজের হোমাগ্নি সেখান থেকেই আনে। মণিপুরই হোল চিত্রাঙ্গদার দেশ, সেই সূত্রেই অর্জ্জুনের সঙ্গে এখানকার সম্পর্ক। গুরুজনদিগকে মণিপুরীরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। রাস্তা ঘাটে দেখা হোলে কোমর থেকে নীচু হোয়ে মাটীতে দুই বা এক হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়। এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব রাস এবং দোল। এ ছাড়া জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, হরি শয়ন, হরি উত্থান, বারুণী স্নান প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। প্রত্যেক উৎসবেই কীর্ত্তনের আয়োজন হয়। দোলের সময় ইম্ফালের শ্রী ফিরে যায়।

দলে দলে স্ত্রী পুরুষ রঙ ও আবীর নিয়ে রাস্তায় উৎসব-উন্মত্ত হোয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোন পুরুষ কোন মেয়ের মুখে আবীর দিয়ে দেয় তবে সেই দলে যত মেয়ে থাকবে সকলেই তার কাছ থেকে পয়সা আদায় কোরবে, না দিলে গা থেকে চাদর, জামা, ছাতা কেড়ে নেবে। তবে সুবিধা এই যে এক পয়সা, আধ পয়সাও দেওয়া চলে। রাসোৎসব প্রায় ৭ দিন ধোরে চলে। মণিপুরের উৎসব-জীবন দেখতে হোলে এই সময় আসা উচিত। বারুণীর স্নানের সময় স্ত্রীপুরুষ দল বেঁধে রাত্রি ২টা ২॥০ টায় বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে ৭ মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর নদীতে স্নান কোরবার জন্যে যায়। এর মধ্যে পুণ্যস্পৃহা যত থাক বা না থাক, উৎসবের নেশা যথেষ্ট আছে। শ্রাবণ মাসে হরিশয়ন, তার পর উৎসব ও সব শুভকাজ বন্ধ থাকে ; আবার কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ থেকে উৎসব সুরু হয়। অর্থাৎ কৃষি কাজের সময়টা উৎসব বন্ধ থাকে, আবার ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব সুরু হয়। হিন্দুরা মৃতদেহ পোড়ায়, মুসলমানরা কবর দেয়।

মহারাজার শাসন-ব্যবস্থার দরবার হোল উচ্চতম বিচারালয়, তার নীচে 'চেরাব' এবং তার নীচে পঞ্চায়েৎ। অবশ্য দরবারের হুকুমও মহারাজা নিজে রদ কোরতে পারেন। বৃটিশ প্রজার পক্ষে উচ্চতম বিচার-পরিষদ পলিটিক্যাল এজেণ্ট।

পোলো খেলার জন্মভূমি মণিপুর। হিমালয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থিত এই ছোট্ট দেশ থেকে এই খেলা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পোড়েছে। এখনও এখানের পোলো মাঠে সপ্তাহে তিন দিন পোলো খেলা হয়।

ইম্ফালের মধ্যে দ্রষ্টব্য মহারাজার গোবিন্দজীর মন্দির। মন্দিরটী প্রাসাদের সংলগ্ন, অবারিত দ্বার। কোঁচা ঝুলিয়ে দেবদর্শন নিষেধ। মন্দিরের প্রহরীরা অজ্ঞ দর্শকদিগকে নিষেধ করে। মন্দিরের চূড়াটী স্বর্ণমণ্ডিত, সামনে প্রকাণ্ড নাটমণ্ডপ। মণ্ডপের একধারে আধুনিক ষ্টেজ। মন্দিরের ঠিক সামনেই দরবার-কক্ষ। প্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। প্রাসাদের কাছেই উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়। ইম্ফালে ছ'টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং আশে পাশে অনেক মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এগুলি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি মহারাজার শিক্ষাবিভাগের অধীন। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মীরা আসাম, কাছাড় প্রভৃতি আক্রমণ করে, সে সময় মণিপুর-রাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, তার ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে একটী সখ্য চুক্তি হয়। চন্দ্রকীর্ত্তির পুত্র সুরচন্দ্রের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে মণিপুরে ইংরেজ প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। দেশের জনসাধারণ এবং মহারাজার অন্যান্য ভাই ইংরেজের প্রতিপত্তি ভাল চোখে না দেখায় তাঁদের ষড়যন্ত্রে সুরচন্দ্রের ভাই কুলচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করেন এবং সুরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হোয়ে শিলচরে পালিয়ে যান। এর ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রাজ-

নাগা ও নাগিনী

ভ্রাতাদের খণ্ড যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুরচন্দ্রের কপালে আর সিংহাসনপ্রাপ্তি ঘটে নি। বর্ত্তমান মহারাজা সার চূড়াচন্দ সিং সিংহাসন লাভ করেন। এঁর সঙ্গে প্রাচীন রাজবংশের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই ; শুনলাম মণিপুর রাজপরিবারের প্রাচীন প্রাসাদ বর্ত্তমানে ক্যাণ্টনমেণ্টের সামিল। বর্ত্তমান প্রাসাদগুলি নবনির্ম্মিত। ইংরেজ অধিকারের পর প্রাচীন রাজবংশের সঙ্গে প্রাচীন প্রাসাদও নষ্ট হোয়ে গেছে।

ইম্ফাল নদীর ধারে 'মহাবলীর আশ্রম' আছে। এখানকার

ঠাকুর হনুমান, বর্ত্তমানে এঁর ভক্ত মাড়োয়ারীরাই বেশী। এই আশ্রমের বাগানে জীবন্ত মহাবীরের প্রাচুর্য্যও খুব।

মণিপুরী ভাষায় একটা স্থানীয় সংবাদপত্র আছে। অক্ষর বাঙ্গালা, তবে ভাষা ভিন্ন। শিক্ষিত মণিপুরীরা বাঙ্গালা ও ইংরেজী জানে, বাঙ্গালার প্রাচীন সংস্কৃতিও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে। মণিপুরী পুরুষদের বাইরে আসতে কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় না—কিন্তু নারীদের বাইরে যেতে দিতে ষ্টেটের যথেষ্ট আপত্তি আছে; সাত দিনের বেশী বিদেশী মণিপুরে থাকলে ৫৲ দিয়ে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অধিকাংশ যাত্রীরই পাহাড়ী রাস্তার দরুণ মাথা ঘোরে ও বমি হয়। বাসের সামনের আসনগুলিতে কম কষ্ট হয়, মাঝের বা পিছনের আসনে প্রাণ বেরিয়ে আসে। ফেরার পথে "ঘাস পানি" নামে এক জায়গার আনারস খুব বিখ্যাত শুনে কিনলাম। আনারসগুলো সত্যিই এত সুন্দর যে শুধু খোসা ছাড়িয়ে চিনি নূন না দিয়েও চমৎকার খেতে লাগে, 'চোথ' প্রায় নাই বোল্লেই হয়।

অল্পায়াসে ও ব্যয়ে যাঁরা প্রকৃতির পার্ব্বত্য ও শ্যামল শোভা দেখতে চান এবং ভিন্নভাষাভাষী বিদেশের কৌতুকপ্রদ আবহাওয়ায় আনন্দ পেতে চান তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাঞ্চলের কাশ্মীর—মণিপুর যেতে অনুরোধ করি। তবে ভাষানভিজ্ঞতার জন্য জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে বড় অসুবিধা হয়, এজন্যে সম্ভব হোলে সামান্য ভাষা শিখে গেলে ভ্রমণের পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায়।

আবোল-তাবোল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীমান্ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

কল্যাণীয়েষু !

সারাটা দিন তোমার রেকর্ড "আবোল-তাবোল" বাজিয়ে যখন
সন্ধ্যা এল—মনে হ'ল : "ছড়ায় না হয় লিখলামই বা
ঘুরছে মনে যেসব খুশি। মানুষ যখন মনের মতন—
মনের কথা ব'লে দুটো মনের বাণী শিখলামই বা !

পয়লা নম্বর : "আবোল-তাবোল" লাগে আমার বরাবরই
বেজায় ভালো। "কার না লাগে ?"—বলবে টুকে হয়ত তুমি।
কিন্তু উঁহুঃ, ভুল তোমারই—জানো না কি অনাদরই
ওড়ায় আঁখি—রসশ্যামল উঠতে যখন চায় কুসুমি' ?

বিশেষ ক'রে আমাদের এই মনমরাদের দেশে রে ভাই,
মনের প্রাণের হোলিখেলায় পাণ্ডুরা সব তুণ্ড নেড়ে
বলেন না কি : "গেল—গেল—জয়ী হ'ল প্রগল্‌ভরাই—
"বিজ্ঞবচন আউড়ে ওদের ধর্ ধর্ ধর্ টুঁটি—তেড়ে !"

এ কথাটা দিন যত যায় ততই বুঝি ঠেকে শিখে।
গম্ভীরাত্মা বিরসতায় তাই তো আজো শিরপা ভুলে
উধাও ছুটি না মেনে হায় থানা পগার দিগ্বিদিকে :
নীরসতার চেয়ে ভালো বিষ খাওয়াও চায়ে গুলে।

এই যে মনোভাব—অথ, এর শুনতে কি চাও সাইকলজি ?
মানে—আহা, শুনলেই বা ! ব্যথা দিয়ে তুমিও যদি
না বোঝো ভাই ব্যথা—আকুল দ-য়ে যে হায় আমি মজি !
তাই তো দোহাই দিই—হোয়ো না তুমিও শেষে বেদরদী।

ছেলেবেলা থেকেই আমার কেটেছে দিন গল্পে গানে
কাব্য-হাসি-তর্ক-আলাপ-মজলিশের ঐ খোশ খেয়ালে।
খেলাঘরেই পিতৃদেবের অট্টহাসি বাজত কানে :
হাঁটি-হাঁটি-পা-পা হ'ল "হাসির গানের" তালে তালে।

দেখতে দেখতে হ'লাম দোয়ার তাঁর সভা আর গান-আসরে।
আঁখর দিতাম রংদারি—সব তাঁরই স্নেহের আস্কারাতে।
একদিকে সুর রাঙল আলো ছায়ার মিড়ে প্রাণবাসরে :
অশ্রুমেঘে রচল হাসি ইন্দ্রধনু—রূপ জাগাতে।

তাই হ'ত ম্লান প্রায়ই এ-প্রাণ পরে যখন পড়ল চোখে :—
হাসির রসের গানের দোলায় হয় না উতল জনে জনে !
গানের মতন গান গায় হায় কজন গভীর ব্যথায় শোকে ?
দিলদরিয়া হাসি হাসে কয়টা বা দিল্ কলস্বনে ?
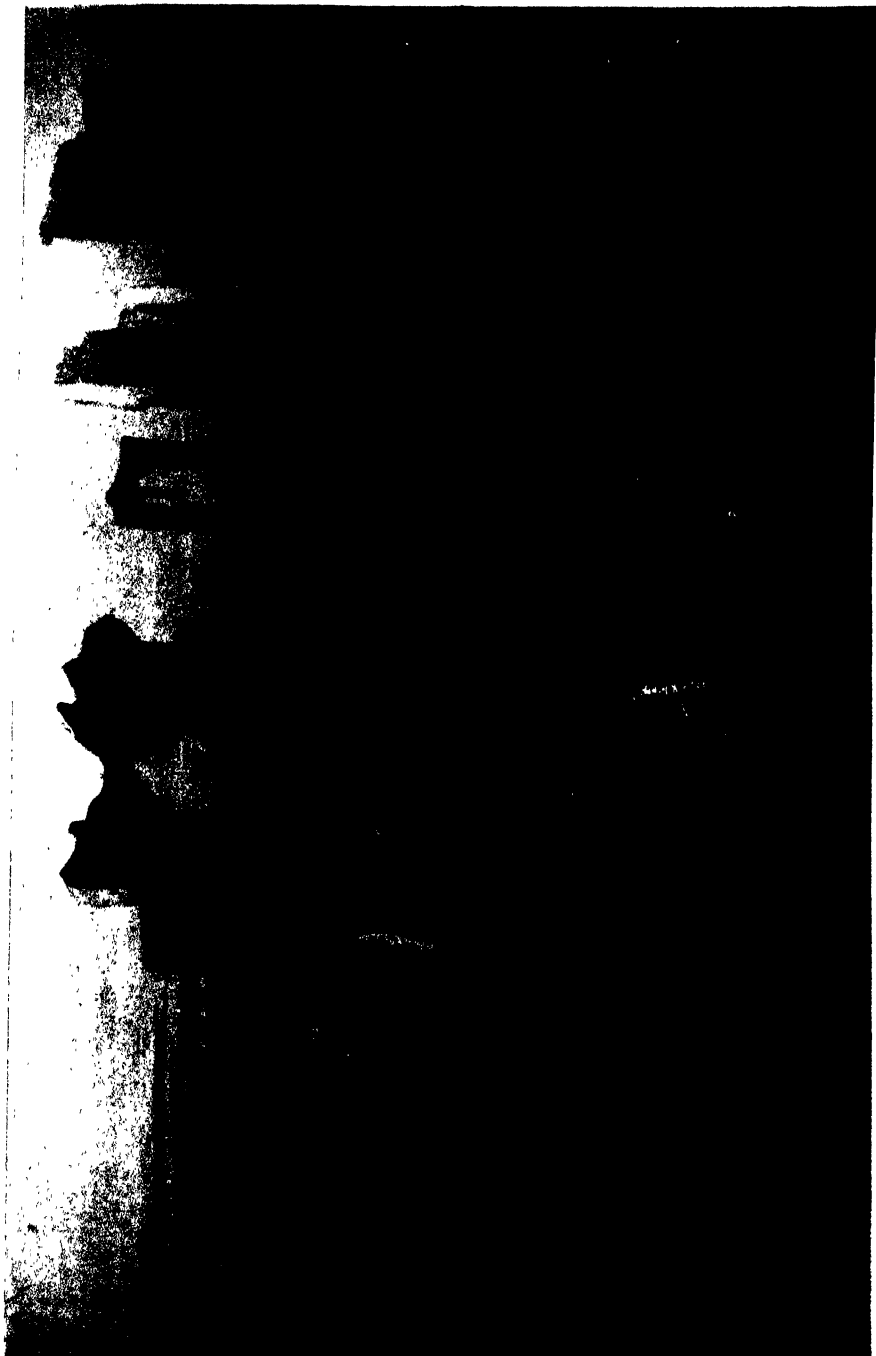
৺রায় সুকুমার মোটের উপর পাননি তো তাই কল্কে তেমন
হোমরাও চোমরাওরা সবাই ঘনঘটা আনল হেঁকে,
বলল : "এসব কী ফাজলামি করছে ওরা ? বিদ্যে যেমন
বুদ্ধিও তো তেম্‌নি হবে—" ঢাক পিটোলো বিষম রেগে।

"বুদ্ধিমন্ত" কিন্তু তাঁরাই—নিজের মনে নেই তো শিখা,
তাই দেখলেন ভগবানের নিরাকারেও দারুণ দাড়ি।
পণ্ডিত যে! যুক্তি দিলেন : ঝরণাগুলোই মরীচিকা,
সত্যি শুধু ধূ ধূ মরু—নেই যার রস, শ্বশুরবাড়ি।

স্বভাব-জামাই দুনিয়াটা হায় মানল না সে-পরোয়ানা :
তাই তো মিলন-ফসল আজও ধূলায় উছল ফুলে ফলে।
কী অবাধ্য!—ধূসরেরা যতই বলেন : "না না না না",
রঙিনরা গায় : "হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ"—হাসির ধুমে, জলে স্থলে!

ফাগুন দেখে তাই জ্বললেন আগুনশর্মা। কেন?—কারণ
প্রবীণ যখন দাড়ি নাড়েন—নবীন করে মুখটা হাঁড়ি,
আর, ওমা! যেই প্রবীণ করেন মুখটা হাঁড়ি—নবীন বারণ
না মেনে দেয় উড়িয়ে হেসে, বৃথা করা শমন জারি।

দেখ দেখি! বলে ওরা : "আকাশও যে পড়ে গ'লে
"মাটিতে মেঘ-মূর্ছনাতে হাওয়ার হাসির ছন্দ-ডাকে।
"তুষার দিল জন্ম যারে সেই স্ফটিকও পড়ে ঢ'লে
"কালো মাটির ভালোবাসায় আলোকণ্ঠী সিন্ধুরাগে।

"হাসির আলো আছে ব'লেই তারই কোলে অশ্রু রাঙে,
"তাই তো জীবন-কাঁটাবনে গন্ধরাজের বসন্ত ছায়।
"গতির নীলিম নূপুরবোলেই পাষাণ কারা নিত্য ভাঙে :
"অন্ধকারের গুমট কাটে দম্‌কা হাওয়ার দুরন্ততায়।

"বলিসনেরে তাদের "জ্ঞানী" চায় না যারা ফুলফোয়ারা।
"রসিক যে নয়—নয় সে প্রেমিক, প্রেমিক যে নয়—
সে হায় শুধু
"জ্ঞানগম্ভীর আদাটাতে থাবি খেয়েই আজো সারা!
"দুর্ভাগা হায়—থাকতে তরু করল বরণ মরু ধূ ধূ!

"তাই তো পাগল বাজিয়ে মাদল ঢেউ তুলে ধায় শ্যামলতায়
"রূপ রঙ রস গন্ধ ধ্বনির তরঙ্গিত আশীর্বাদে।
"আঁধার বিমুখ হয়ই গানে : কিরণই চায় বন্যাধারায়।
"শিষ্ট গুহায় ফলে না ফল—লক্ষ্মীছাড়াই লক্ষ্মী সাধে।"

এম্‌নি যে-দুরন্তপনা তারই রাজার রঙ্গ গুণী!
ছড়িয়ে দিলে অর্কেস্ট্রার ঝংকারের ঐ ফুলঝুরিতে
নির্মলতার নর্মলীলায় বইয়ে সুরের সুরধুনী :
বাচালতার ঘোড়শোয়ার আজ হ'ল পাখি গগন-গীতে।

না না, এটার মানে আছে, ধোঁয়াটে নয় অর্থহারা।
কি জানো ভাই? কথার পিঠে অর্থ চাপাও—হবেই ভারি।
ছন্দে হাজার হাল্কা করো—করতে তাকে মাটিছাড়া
সুর ছাড়া আর কেউ পারে না, তাই সুরেলা—বংশীধারী।

ছন্দ ভাবের যদি থাকে ঢেউয়ের নেশা—সুরের সাথেই
চলে শুধু অধরা ঐ বৈদেহীদের লেনাদেনা।
কবি ফাঁকি দেয় খাঁচাকে—গুণীর সুরের সুখের ফাঁদেই
তখন তারা দেয় ধরা—তাই, সুর পারে যা কেউ পারে না।

এই "সুরেরই" গুণী ব'লে বাসি তোমায় প্রথম ভালো
ক্রমে তুমি দেখিয়ে দিলে তুমিও বহুরূপী ভোগে।
তোমাকে তাই আদর তো ভাই করবই আজ আমরা—আলো
জ্বাললে ব'লে রকমারি রংমশালের যোগাযোগে।

কেউ কেউ হায় বলবেই : "এটা এমনই কী কাণ্ড হ'ল?
"ননসেন্সের ছড়ায় কেবল ননসেন্সের বাদ্যি বাজে!"
তবে সেটা বলবে তারাই বুদ্ধি যাদের নেহাৎ ঘোলো
Sound যদি হয় sense এর echo—রসিক মনের ময়ূর নাচে।

"ওরিজিনাল" হয় প্রতিভা—আপ্‌নার পথ নেয়ই কেটে :
সুকুমারের আগ্‌লাতে পথ ধুন্ধুমারও তাই তো হারে।
বিশেষ, "প্রাণের প্রেমিক" সাথে "গানের-গুণী" জুটলে—ফেটে
পড়ে খুশির ফোয়ারা, বলে : "যে পারে সে আপ্‌নি পারে।"*

* জ্ঞানপ্রকাশ ৺সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের দুটি ছড়া সুর দিয়ে গ্রামোফোনে গেয়েছেন—তাই শুনে।

পুরাণ-পরিচয়

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

(ক) পুরাণ কাহাকে বলে ?

পুরাণ অতীত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ। ইহা যে ইতিহাস তাহা পুরাণ নিজেই সাক্ষ্য দেয়। বায়ু পুরাণে আছে : নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন লোমহর্ষণ-সূতকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার নিকট হইতে বহুবিধ ইতিকথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রমিক প্রশ্নমুখে সকল তত্ত্ব অবগত হন। ভাগবতে আছে : শুকদেব ঋষিকে প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষিত মহারাজও ঐরূপ ক্রমিক বিভিন্ন প্রশ্নমুখে সমস্ত জিজ্ঞাসার অন্ত করেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে : মৈত্রেয় জিজ্ঞাসু হইয়া যে সকল তথ্য অবগত হইতে মানস করেন, ক্রম প্রশ্ন-মুখে পরাশর ঋষি তাহা মৈত্রেয়কে উত্তর দিয়া বিদিত করেন। মৎস্য পুরাণে, কূর্মপুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে···সর্বত্রই এইরূপ জিজ্ঞাসুর দল ক্রমিক-প্রশ্নের অবতারণা করিয়া সূতাদির নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতেন। যদিও দেশ আজ পুরাণকে আধ্যাত্মিক চর্চার আধার-রূপে বুঝিতেছেন, তথাপি পুরাণ সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সেই সকল প্রশ্নকারীর দল কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ব্রহ্মতত্ত্বাদি অবগত হইতে প্রশ্নসকল উপস্থাপন করিতেন না ; জানিতেন, বিশ্বসৃষ্টি ও লয়ের কথা ; জানিতেন, সৃষ্টির পর হইতে তথা-কথিত কাল পর্য্যন্ত গণমানবের রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক আদির উত্থান-পতনের কথা ; জানিতেন, দেশের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়াদি।···

পুরাণ যে ইতিহাসই, তাহার প্রমাণ পুরাণ স্বয়ং আত্মলক্ষণাকালে প্রকাশ করে—

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
> বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥—বায়ুপুরাণ, ৪র্থ

—সর্গ অর্থাৎ বিশ্বাদি সৃষ্টি ; প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়াদি ; বংশো অর্থাৎ রাজা, ঋষি, অসুর, দেবতা আদির প্রথম পুরুষ হইতে পর পরপুরুষের নাম সারণী ; বংশানুচরিত অর্থাৎ সেই সকল জনগণের মধ্যে প্রধান প্রধান জনের জীবনের ছোট-বড় ইতিকথা, যাহাকে ইতিহাস dynasty-সংবাদ বলে এবং মন্বন্তর অর্থাৎ মনুকাল যদ্দ্বারা পূর্বোক্ত জনগণের সময়জ্ঞান হইতে পারে—এই সকলের সন্ধান পুরাণে পাওয়া যাইবে ; যেহেতু পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণ। কাজেই পুরাণ যে অতীত ভারতের ইতিহাস তাহাতে আর দ্বি-মত থাকিতে পারে না। তথাপি যদি কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে না পারেন, তবে বলিতে হয় :

> যস্মাৎ পুরাহ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্।
> নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥—বায়ুপুরাণ, ১ অঃ

—বাস্তবিক সর্ব পাপ হইতে পুরাণ শ্রবণে মুক্তি পাওয়া যায় কি-না, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ কারণ নাই ; তবে যে একটি পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবিষয়ে অন্য মত কাহারও থাকিতে পারে না, মনে হয়। অজ্ঞানতাও পাপ।

(খ) পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব

অনেকে মনে করেন—ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই, পুরাণ ঠিক ইতিহাস নহে। তদুত্তর এই :

পুরাণ ইতিহাসই। কারণ, একথা সত্য—আজ আমরা যাহাকে যেরূপে অবগত হইতেছি, শত বৎসর পূর্বে বা পরে তাহাকে তদবস্থায় কেহ নিশ্চয়ই জানিতাম না বা জানিব না। কালের পার্থক্যে জ্ঞান, বিচার বা রুচির পার্থক্য হয়। কাজেই বর্তমানের বিচারে আমরা যাহাকে History বা ইতিহাস বলিয়া বুঝি, তাহার যে ক্রম ও রীতি আমরা লক্ষ্য করি, অতীতে বা ভবিষ্যতে তাহা যে ভিন্নরূপে সংঘটিত হইতে পারে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। পুরাণ যেকালে প্রচলিত হয় সেকালে উহা ইতিহাসরূপেই প্রচলিত হইত। সেকালে ইতিহাসের লক্ষণ ছিল—

> ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
> পুরাবৃত্তকথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে ॥—দেবী ভাগবত

—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গাশ্রিত আলোচনা-সমন্বিত পুরাবৃত্তই ইতিহাস। ইহাই ছিল অতীত ভারতের ইতিহাস-লক্ষণাজ্ঞান। তাঁহারা বলিতেন :

> ইতিহেত্যব্যয়ম্ পারম্পর্যোপদেশাভিধায়ি,
> তস্যাসনম্ আসঃ অবস্থান মোতদ্বিতি।
> —বিষ্ণুপুরাণে (১।১।৪) শ্রীধর স্বামীধৃত বচন

'ইতিহ' শব্দ অব্যয়, ইহার অর্থ পরম্পরা-সম্বন্ধযুক্ত উপদিষ্ট কাহিনী—এইরূপ কাহিনী যাহাতে 'আস' অর্থাৎ অবস্থিত, তাহা ইতিহাস।

অতীত ভারতের ইতিহাস (পুরাণ) ও বর্তমান ভারতের History অংশ-বিশেষে একার্থ প্রতিপাদক হইলেও সম্পূর্ণত এক নহে। অমরকোষে লক্ষিত হয়—'পারম্পর্যোপদেশেস্যাদৈতিহ্যমিতিহাঽব্যয়ম্', ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্'। পরম্পরাপ্রাপ্ত প্রাচীন ঘটনার বিবরণ ইতিহাস। এই বিবৃতিকে অবশ্য ইতিবৃত্ত বা historical account বলা যায়। কিন্তু কাল যাপনা বা মন্বন্তরখণ্ড ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ না হওয়ায়—ইতিহাস আধুনিক অর্থে History বা ইতিবৃত্ত নহে। পুরাণই প্রকৃত History বা ইতিবৃত্ত। ইতিহাস পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনী। ঐতিহ্য বা পুরাবৃত্ত ইতিহাসের অঙ্গ। 'ইতিহ' শব্দ ঐতিহ্য শব্দ হইতেই সাধিত হইয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই : ইতি+হ+আস, যাহা বর্তমান সুধীগণের মতে ইতিহাস শব্দে সাধ্য, তদনুসারে History অর্থে ইতিহাস নিরুক্তি হইলেও প্রাচীন মতে ইতি+হ+আস=ইতিহাস নহে, ইতিহ+আস=ইতিহাস। কাজেই প্রাচীন নির্দ্দেশে পুরাণই ইতিহাস শব্দের প্রকৃত নিরুক্তি।

(গ) পুরাণের পুরাণত্ব

দু-একশত বা দু-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কিম্বা তদূর্দ্ধ কোন সম-সম কালে যে পুরাণগুলি রচিত হয় নাই, তাহা সত্য। হয়তো কথাটি কেমন কেমন লাগিবে। কারণ পুরাণগুলির মধ্যে যে সকল বিবৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে এমন অনেক বিষয় বিশেষ করিয়া স্মার্তবিধানাদি যাহা লক্ষিত হয় তদনুসারে পুরাণকে প্রাচীন কোন এক যুগের বলিয়া প্রত্যয় করা শক্ত হয়। ইহা সত্য; তাই বলিয়া পুরাণের প্রাচীনতার পক্ষে ইহা কোন বাধক নহে।

প্রায় প্রত্যেকখানি পুরাণই বারাহ মন্বন্তরের শেষভাগে অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর পরে ও বৈবস্বত মনুর আরম্ভকালে রচিত হইয়াছে। পুরাণসকল লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যায়।

(ঘ) পুরাণ সৃষ্টির কাল

পুরাণ যে ঠিক কবে, কোন্ সময় হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, পুরাণ লক্ষ্য করিলে তাহাও স্পষ্ট জানা যায়। প্রত্যেক পুরাণে সূত-সংবাদ কালে মুনিগণের কাছে কথিত হইয়াছে—'অতীত ছয় মনুর কথা আপনাদের বলিলাম, এক্ষণে সপ্তম মনুর অধিকার কাল'—অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ—এই ছয় মনুকাল গত হইয়া সপ্তম যে বৈবস্বতমনু—তাহার অধিকার আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণ সৃষ্টির মূলের কথা এই :

বেনপুত্র পৃথুরাজ প্রকৃত প্রজাপালক রাজা ছিলেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ, কৃষিকর্ম, বয়নকর্ম আদির প্রবর্তক।

> রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ।
> তস্য স্তবার্থমুৎপন্নৌ নৈপুণৌ সূত মাগধৌ ॥
>
> —ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৬৮।৯৬

ঐ যজ্ঞশালে অন্যান্য রাজন্যবর্গের সমক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে ও তদনুরূপ প্রজাহিতকামী সকল নৃপতিই হউন—এই বাসনায় ঋষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার স্তবাদি কর্মসাধনার্থে সূত ও মগধগণের সৃষ্টি হয়। এই সূত মাগধগণ কর্তৃক স্তবাদি কীর্তনের মূলে যে রাজশক্তি সমন্বিত মুনিগণ ছিলেন, তাহার প্রমাণ—

> তাবূচুর্মুনয়ঃ সর্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
> কর্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্ ॥
>
> —ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৬৮।১৪৩

মুনিগণ যখন বলিলেন—হে সূত মাগধগণ! তোমরা এই নৃপতির স্তুতি গান কর, ইনি স্তবের উপযুক্ত। তখন তাহারা বলিল :

> ন চাস্য কর্ম বৈ বিদ্মঃ ন তথা লক্ষণং যশঃ।
> স্তোত্রং যেনাস্য কুর্যাবো রাজ্ঞস্তেজস্বিনো দ্বিজা ॥
>
> —ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৬৮।১৪৪

হে দ্বিজগণ! শক্তিশালী এই রাজার স্তোত্র সম্বন্ধে আমরা যে কিছুই জানি না, তবে কি বর্ণনা করিব? তাহাতে ঋষিগণ বলিলেন—'ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি'—ভবিতব্য কর্ম দ্বারা স্তব কর, পরে ভবিষ্যতে শিখিয়া গাহিবে। তাহারা গাহিল—

> ততস্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ।
> অনূপদেশং সূতায়, মগধং মাগধায় চ ॥—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৬৮।১৪৭

—পৃথুরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সূত ও মাগধগণকে যথাক্রমে অনূপদেশ ও মগধ দেশ দান করিলেন।

পুরাণের সূচনা বা আরম্ভ এইখানেই। কাজেই পুরাণ প্রাচীন গ্রন্থ। পৃথুরাজ বৈবস্বত মনুর প্রারম্ভে ছিলেন।

(ঙ) পুরাণ প্রচলন ও সংরক্ষণ নীতি

পৃথুরাজার যজ্ঞশালে যে সূত ও মাগধগণ সৃষ্ট হয়, তাহারা তৎকালে নিজেদের কর্তব্য ধর্মকর্মও মুনিগণের নিকট বিদিত হয়। পরে, মাগধগণ এক একজন রাজার রাজ-সভায় স্থান পায় ও তাহার কর্তব্য হয়—সেই রাজার বংশানুক্রমিক চরিতাদি কণ্ঠস্থ রাখা এবং সূতগণের ধর্মনির্দিষ্ট হয়—তাহারা ভ্রমণশীল হইবে; যখন যে রাজ্যে উপস্থিত হইবে—রাজার সানন্দ আতিথ্য লাভ করিবে এবং সেইকালে মাগধগণের নিকট হইতে রাজার বংশানুচরিত শিক্ষা করিয়া ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান করিবে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় :

বৈদেশিক ইতিবৃত্তকারগণেরও ভারতীয় পরিপন্থীগণের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়—অতীত ভারতে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তাঁহাদের ধারণা—প্রাচীন গ্রীক্‌গণ ও মিশরীয়গণ লিখিতে জানিতেন। তাঁহাদের এই প্রকার ধারণার অনুকূলে যুক্তি এই : অতীত ভারতীয়গণ চিরদিনই শ্রুতি ও স্মৃতি সাহায্যে আলোচ্য বিষয়গুলি ধারণা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মনুসংহিতায় আছে—'শ্রুতিস্তু বেদবিজ্ঞেয়ো, ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈস্মৃতি'—বেদশ্রুতি ও ধর্মশাস্ত্র স্মৃতি নামে পরিচিত। বেদাদি শ্রুতিশাস্ত্র যুক্তির উপর স্থাপিত নহে—ঐতিহ্য বা tradition ইহার ভিত্তি। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা যুক্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা লিখনপদ্ধতি জানা না থাকিলে অধিগত করা দুরূহ।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি স্পষ্ট প্রমাণ মৎস্যপুরাণ, ২১৫।২৩-২৫ শ্লোক, যেখানে আছে :

> কার্যাস্তথাবিধাস্তত্র দ্বিজমুখ্যাঃ সভাসদঃ।
> সর্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
> লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্বাধিকরণেষু বৈ।
> শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণীগতান্ সমান্ ॥

আন্তরাণ্ বৈ লিখেদ্ যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায় বাক্যকুশলঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।
পুরুষান্তরতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাংশবল্পাপ্যলোলুপাঃ॥

—এখানে এই যে উত্তম লেখকের কি কি গুণ থাকা চাই বর্ণিত হইয়াছে—ইহা কি লিখন-প্রণালী অপ্রচলিত থাকার পরিচয় দিতেছে? ভবিষ্যপুরাণে ২১৭ অধ্যায়ে—পুরাণ লিখনের যে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে, ইহাতেও কি অতীত ভারতীয়গণ লিখন-প্রণালী জানিতেন না বুঝিতে হইবে? অন্যত্র: পুরাণগুলি, উপনিষদাদি গ্রন্থসকল লক্ষ্য করিলে আমরা যে দেখিতে পাই, পুরাকালে অনেকেই অষ্টাদশ বিদ্যাশিক্ষা করিতেন এবং কালে সেই সকল বিদ্যা যথা-অধিগত হইত তেমনি 'হুবহু', অনেকদিন পরেও অপরকে বলিতে পারিতেন। লিখন বা পঠন ব্যতীত এ যুক্তি ভিত্তিহীন ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না কি? ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে, প্রতিটি পুরাণের শেষভাগে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ঐ পুরাণ লিখিয়া অপরকে দান করিলে দানের পুণ্য, যজ্ঞের পুণ্য···আদি প্রাপ্তি হয়—ইত্যাদি প্রেরণামূলক বিধি আছে। কাজেই মাগধ বা সূতগণের পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসাধন-ব্যাপারে শ্রুতিমাত্রই গ্রন্থের অভাবপূর্ণ করিত—ইহা অনুমান করা যায় না। তাহারা নিশ্চয়ই গ্রন্থ সংরক্ষণ করিত। বিষ্ণুপুরাণে আছে—পরাশর-ঋষি বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালে তিনখানি গ্রন্থের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ-ত্রয় সংহিতা নামেবিদিত ছিল, লোমহর্ষণ সংহিতা তন্মধ্যে মনে হয় একখানি।

বিষ্ণুপুরাণ ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

সূতাঃ পৌরাণিকা প্রোক্তা মাগধা বংশবেদিনঃ।
বন্দিনস্ত্বমল প্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব সদৃশোক্তয়ঃ॥

—পুরাণ সংরক্ষণ-ব্যাপারে কয়েক শ্রেণীর মনই থাকিত। বন্দিগণ রাজ্যের প্রয়োজনীয় দিক লক্ষ্য রাখিত ও তাহা রাজাকে সাধন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইত। নৃপতিগণও লোকপ্রিয় হইতে যথাসম্ভব তাহা সাধন করিতেন। মাগধগণ পরে রাজ-চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিত। এই মাগধগণই state historian ছিল। ইহারা যে রাজার আশ্রয়ে থাকিত সেই রাজার পুরুষানুক্রমিক রাজ-নাম বা বংশাবলী, শাসন-কার্য, চরিত্র, দেশের ভৌগলিক সংস্থিতি ও বিশেষ বিশেষ জনের (দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মুনি বা মনুষ্যাদির) জীবনী আদি গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিত। পরে যথাকালে সূতগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইত;—সূতগণও স্ব স্ব গ্রন্থে সেই সকল উপাখ্যান নকল করিয়া লইত ও পরে মুনিগণের আশ্রয়ে (মনুষ্যগণের আশ্রয়ে) আসিয়া তাহা পড়িয়া শুনাইত। এই মুনিগণ তাহা আবার নকল করিয়া লইতেন।

(চ) পুরাণের তথ্য স্বীকৃতি

পৌরাণিক বিবৃতি সর্বৈবভাবে গ্রাহ্য কি-না? প্রশ্ন স্বাভাবিক। উত্তরও তদ্রূপ সহজ; কোন বস্তুই কালিক সম্বন্ধে 'হুবহু' ঠিক থাকিতে পারে না—ইহা যেমন সত্য পৌরাণিক বার্তা সম্বন্ধেও এ অভিধা তদ্রূপ প্রযোজ্য। পুরাণ বলিলেই যে তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইবে, এমন কথা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না বা এই অনুরোধও কেহ করে না। তবে পুরাণের ঘটনা প্রায়শই সত্য—ইহা মানিতে হয়। ভ্রম-প্রমাদ, প্রকাশকালের অনবধানতা-হেতু সামান্য বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি, বর্ণনা বিশেষে অনুরাগ বা দ্বেষ ভাব বোধে কোথাও অধিকোক্তি বা অতিরঞ্জিত করা, কোথাও বা সংক্ষেপোক্তি স্বাভাবিক। এই মুহূর্তের শ্রুত উপাখ্যান পর মুহূর্তে যথাশ্রুত বলা শক্ত। ইহা প্রথমোক্ত বক্তার সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, দ্বিতীয়োক্ত শ্রোতার সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কাজেই পুরাণের বার্তাসকল অবিচারে গ্রহণ বা বর্জন করা চলে না। বিচার করিতেই হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি: সূতগণ পুরাণের বক্তা। কাজেই সূত-প্রোক্ত ইতিকথাই পুরাণের মূলভিত্তি—original source বলিতে হয়। যদিও পুরাণে আছে—

মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্॥ —বায়ুপুরাণ

ক্ষত্রবৃত্তি সূতের মধ্যমধর্ম; রথ, নাগ, অশ্বচালনা বা চিকিৎসা আদি তাহাদের জঘন্য ধর্ম; তথাপি—

স্বধর্ম এষ সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্॥
বংশানাং ধারণং কার্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাস পুরাণেষুদিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ —বায়ুপুরাণ

অমিততেজা দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর, নৃপাদির বংশক্রম ও বংশানুচরিত কীর্তন করাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পৌরাণিকগণ কীর্তন করেন। সূতগণ তাহাদের এই উত্তম ধর্ম পালন করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। মাগধগণের নিকট তাহারা যাহা শুনিত, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিত এবং কার্যকালে 'হুবহু' বলিয়া যাইত। তাহাদের এই 'হুবহু' বলার পক্ষে পৌরাণিক সাক্ষ্য এই:

শৃণুযাদি পুরাণেষু বেদেষ্বাশ্চ যথাশ্রুতম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুত্বা বৈ সুমহাত্মনাম্॥

* *

তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাশক্তি যথাশ্রুতি।
বক্তুমিজ্ঞাতুং ময়া শক্যমৃষিমাত্রেণ সত্তমাঃ॥ —মৎস্যপুরাণ

(ছ) পুরাণে সূতোক্তি, শ্রুতি প্রমাদ ও প্রমাদকার

যদিও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পুরাণে সাধারণত তিনপ্রকার প্রমাদ লক্ষিত হয়—অধিকোক্তি প্রমাদ, অনুক্তি প্রমাদ ও শ্রুতি প্রমাদ। তথাপি

মনে হয় শ্রুতি প্রমাদই ইহাদের মূল কারণ এবং এই সকল প্রমাদের মূলে—পুরাণ সঙ্কলনকারী ঋষিগণই অধিকতর দায়ী ও সূতগণ আংশিকরূপে দায়ী।

পুরাণকে ইতিহাসরূপে দেখিলে স্মৃত্যাদি বিচার-বিধি (পূজা, ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত আদি), যেথানে সেথানে দেবতাবিশেষের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কালী আদি) আত্ম সাক্ষাৎকার ও অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশসাধন, নৃপতিবিশেষের চরিত্রে অপ্রয়োজনীয় ও গাল্পিক উপন্যাস নিবেশ করা আদি—অধিকোক্তি কোথাও বা বর্ণনযোগ্য স্থলে বক্তব্য বিষয়ের সন্নিবেশ না করিয়া, কোথাও বা পত্রাদি বংশক্রমে সংক্ষেপার্থে নাম ব্যক্ত না করিয়া কাহিনীর সমাপ্তি করা আদি—অনুক্তি প্রমাদ এবং শ্রুতি প্রমাদ অর্থাৎ কোন একটি নৃপতিবিশেষের নাম কোথাও বৃহদ্রথ, বৃহদুথ, বৃহদুক্থ ইত্যাকার প্রমাদ।

মাগধগণের নিকট হইতে সূতগণের এবং সূতগণের নিকট হইতে ঋষিগণের শ্রুতিমুখে পুরাণ সংকলন প্রথায় মনঃসংযোগের তারতম্যে ও কর্মকালে পটুতার ইতরবিশেষ তারতম্যে বা শ্রুত কথা দ্রুতলেখাকালে অসাবধনতা হেতু ভ্রম হইত। ইহা ছাড়া ভ্রমের অপর একটি কারণ অনুমান করা যায়, মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্বে সুদীর্ঘকাল যে নকলকরা প্রথা ছিল—তাহাও।

সূতগণ পুরাণেয় ঐতিহাসিক অঙ্গই শুধু বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সেই সকল অংশে স্মৃত্যাদি অংশ সন্নিবেষ্টা যে ঋষিগণ তাহা নিম্নোক্ত পুরাণ-প্রমাণে বুঝিতে বাকী থাকে না।

> স্বধর্ম এষ সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
> দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্॥
> বংশানাং ধারণং কার্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
> ইতিহাস পুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
> ন হি বেদেষু অধিকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।
>
> —বায়ুপুরাণ

(জ) পুরাণকার ও ব্যাসদেব

সমস্ত পুরাণ বেদব্যাস রচিত বলা থাকিলেও মূলত তাহা ঠিক্ নহে। তবে যতদূর অনুমান করা যায় তাহা এই: বেদব্যাস পুরাণের একজন সংস্কারক ও অধ্যাপক ছিলেন; লোমহর্ষণ সূত তাঁহার কাছে পুরাণ অধ্যয়ন করে। বিষ্ণুপুরাণখানি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উহাতে বেদব্যাসের কোন অধিকার নাই বা ছিল না; উহা পরাশর ঋষির অধিকারে ছিল। বিষ্ণুপুরাণের গোড়াতেই আছে:

> ইতিহাস পুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্
> ধর্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াত্মজম্॥
> পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
> মৈত্রেয় পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভি বাদ্য চ॥
>
> ইতিপূর্বং বশিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা।
> যদুক্তং তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎ প্রশ্নাদখিলং মম॥
> সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে।
> পুরাণ সংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্॥

—পরাশর ঋষিই মৈত্রেয়কে এই পুরাণ শ্রবণ করান। পরাশর ঋষি আবার তাহা বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য ঋষির নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের ৬৷৮৷৪২ শ্লোকে দেখা যায়: ব্রহ্মা-ঋভু-প্রিয়ব্রত-ভাগুরি-স্তব-মিত্র-দধীচ-সারস্বত-ভৃগু-পুরুকুস-নর্মদা-ধৃতরাষ্ট্র ও পুরণ-বাসুকি-বৎস-অশ্বতর-কম্বল-এলাপত্র-বেদশিরা-প্রমতি-জাতুকর্ণ-পরাশর-মৈত্রেয়-শমীক আদি ক্রমিক বিষ্ণুপুরাণের সংস্কারক (successive editors) ছিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ কালানুযায়ী ও কা নিক যুগসীমা পর্যন্ত তৎগ্রন্থখানিকে কালিক (up-to-date) করিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বায়ুপুরাণ মৎস্যপুরাণ আদিও এইরূপে কালিক সংস্কারকগণের হস্তে রূপায়িত হইয়াছে। যদিও পুরাণে সূতগণের বর্ণনা কেবল ইহার ইতিহাস অংশই, তথাপি লোক-শিক্ষাদানের সুকরার্থে ও সুখকরার্থে পুরাণের কালিক সংস্কারকগণ তাহাতে অনেক কিছু রূপক কল্পনা, অলৌকিক উপাখ্যান উপন্যাস, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, স্মৃত্যাচারাদি সন্নিবেশ করিয়াছেন—আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, জ্যোতিষশা আদিও এইরূপে পুরাণে স্থান পাইয়াছে—মনে হয়।

নারদীয় পুরাণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়: পূর্বকালে শতকোটি শ্লোকাত্মক একখানি মাত্র পুরাণ ছিল। পরে ঐ পুরাণ হইতেই সমুদয় পুরাণশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণান্তরে এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে আছে: মহামতি বেদব্যাস কলিযুগাগত ব্রাহ্মণগণের অল্পমেধা ও অল্পপ্রতিভা হইতেছে ও হইবে দর্শন করিয়া বেদরূপ দুষ্প্রবেশ্য গ্রন্থখানিকে সহজ বোধের নিমিত্ত যেমন বেদকে চতুর্ধা ভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—তেমনি নূতনতর এক সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত একখানি চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ-সংহিতাও প্রণয়ন করেন এবং তাহা লোমহর্ষণ নামক সূতকে শিক্ষা দেন। লোমহর্ষণ আবার সেই ব্যাস-কৃত পুরাণ-সংহিতাখানি—সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি—নামক ছয় শিষ্যকে শিক্ষা দেন। কালে এই চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক ব্যাস-সংহিতা পুরাণখানিই অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হয় এবং যাঁহারা ইহা বিভাগ করেন তাঁহারা নিজ নিজ নাম গোপন করিয়া—ব্যাস-কৃত মূল হেতু ব্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল পুরাণের নাম—

১। ব্রহ্মপুরাণ...	...	১০,০০০	শ্লোকযুক্ত
২। পদ্মপুরাণ...	...	৫৫,০০০	"
৩। বিষ্ণুপুরাণ...	...	২৩,০০০	"
৪। বায়ুপুরাণ	...	২৪,০০০	"

৫। ভাগবত পুরাণ (দেবী ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত নহে। উহা বোপদেব-কৃত, উহার শ্লোক-সংখ্যা অনেক বেশী প্রায় ৮০,০০০) ... ১৮,০০০ "
৬। নারদীয়পুরাণ ... ২৫,০০০ "
৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ... ৯,০০০ "
৮। অগ্নিপুরাণ ... ১৫,০০০ "
৯। ভবিষ্যপুরাণ ... ১৪,০০০ "
১০। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ... ১৮,০০০ "
১১। লিঙ্গপুরাণ ... ১১,০০০
১২। বরাহপুরাণ ... ২৪,০০০
১৩। স্কন্দপুরাণ ... ৮১,০০০
১৪। বামনপুরাণ ... ১০,০০০
১৫। কূর্মপুরাণ ... ১৭,০০০
১৬। মৎস্যপুরাণ ... ১৪,০০০
১৭। গরুড়পুরাণ ... ১৯,০০০
১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ... ১২,০০০

চণ্ডীদাস

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

কি রসে রসিয়া নান্নুরে বসিয়া গাহিলে কানুর গান,
শ্রবণেতে পশি মরমে পরশি আকুল করিল প্রাণ;
অন্তরে বঁধু, ছিল কত মধু, যে বুঝে পীরিতি-রীত
সেই জন জানে হৃদে বহুমানে অমর তোমার গীত।
হে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
শীতল জানিয়া তেঁই ও চরণ চরণে হইনু দাস।

পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর ভুবনে আনিল যেই,
তোমার পীরিতি রসের সায়রে আপনি ডুবিল সেই;
তব হিয়া ছাড়ি যেতে আন বাড়ী পরাণ নাহি যে চায়,
দিয়ে সুরে সুর মুরলী মৃদুর মধুর মধুর গায়;
রসিক চণ্ডীদাসে
মজাতে আসিয়া, মজিয়া মজিল চতুর সে পীতবাসে!

শ্রীমাধব পদ সাগরে মিলিতে বাসনা হইল ব'লে,
জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিলে পীরিতি-নদীর জলে;
পীরিতি-নদীর শ্যাম দুটি তীর শ্যামল তাহার জল,
করিতে সিনান, পরশন, পান অমিয়-সমান ফল;
নাবিক চণ্ডীদাস
তীরে উতরিল, কতজনে নিল শ্যাম-নগরীর পাশ।

ধিক্ ধনিজনে, ধিক্ তার ধনে, ধিক্ এ দগধ দেশ,
এমন পীরিতি-স্মিরিতি রাখিতে নাকরে যতন-লেশ;
নিলাজ-হৃদয় সব জন হয় নিপট-কপট-প্রাণ,
কিছু নাহি দিয়া নিত-নিত গিয়া করিছে অমিয় পান;
অমর চণ্ডীদাস,
গানে তুমি রাজা, চিরদিন তাজা, না কর কিছুর আশ।

তব গীতিগুণ' স্মরি পুন পুন হরষ-সাগরে ভাসি,
সাধনার রীত জানি বিপরীত পরিনু প্রেমের ফাঁসি;
অতি সুশীতল তব পদতল অমেয় রসের ঠাঁই,
তারি রসফল করি সম্বল, ভাবনা কিছুই নাই!
হে কবি চণ্ডীদাস,
'মধুর জানিয়া সঙ্গীত তব হইনু মরম-দাস।

জঙ্গম

বনফুল

১২

মানুষের সহিত পশুর প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য ত আছেই, অনেক সময় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকে। এক একজন লোকের সহিত এক একটা পশুর অদ্ভুত রকম মিল, দেখিলেই একটা বিশেষ পশুর কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে লোকটি হাওড়ায় একটা মুদির দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিলেই ঘোড়ার কথা মনে হয়। মুখটা ঠিক ঘোড়ার মুখের মত—খানিকটা যেন লম্বা হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা লম্বা চুল, দাঁতগুলাও লম্বা লম্বা এবং এব্ড়ো-খেব্ড়ো, যেন একটা আর একটার ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দাঁতেই বিশ্রী হলুদ রঙের ছোপ। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, পরনের কাপড়টাও ময়লা কিন্তু বেশ কায়দা করিয়া মালকোঁচা মারিয়া পরা। দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু ভয় হয় ভদ্রলোকের চোখ দুটি দেখিলে। খুব বড় বড় কিম্বা খুব ছোট ছোট নয়, মাঝারি ধরণের সাধারণ চোখ। এককালে হয় তো সাধারণ চোখের মতই খানিকটা সাদা এবং খানিকটা কালো অংশ ছিল, এখন কিন্তু সাদা অংশটি পীতাভ এবং কালো অংশটি ঈষৎ বাদামি গোছের হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে ইহাতে হয় তো ভীতিকর কিছু দেখা যাইবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই ভয় হইবে। ভদ্রলোক যদিও জ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই চোখের দৃষ্টিতে একটা সহৃদয়তার সুন্দর পরদা টাঙাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হইলেই পরদা সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরালে যে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে তাহা মানুষের নয়—পিশাচের। পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া ভদ্রলোক খোলা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছেন এবং লক্ষ্য করিতেছেন মুদির দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কখন কমিবে। মুদির দোকান নির্জ্জন না হইলে তাঁহার সওদা খরিদ করা হইবে না।

একটু পরই মুদির দোকান নির্জ্জন হইল এবং খগেশ্বর-বাবু ওরফে হারাণবাবু ওরফে যতীনবাবু ওরফে কেষ্ট-বাবু ওরফে তিন নম্বর আগাইয়া গেলেন এবং মুদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা, আমার সওদাটা এবার দাও দিকি।"

"কি চাই বলুন ?"

"বেশী কিছু নয়, আধ পোটাক সুপুরি। সবগুলি কিন্তু কাণা হওয়া চাই—"

মুদি একটু বিস্ময়ের ভান করিল।

বলিল, "সবগুলো কাণা ? কি হবে কাণা সুপুরি দিয়ে !"

হলুদ রঙের দন্তগুলি বিকশিত করিয়া খগেন বলিল, "ওষুধ।"

"কিসের ওষুধ ?"

"চুলকানির।"

মুদি বাছিয়া বাছিয়া আধপোয়া কাণা সুপারি ওজন করিয়া দিল এবং প্রসঙ্গত বলিল, "কারফরমা লেনের মোড়ে একটা বিড়িওয়ালা আছে চুলকানির অব্যর্থ ঔষধ সে জানে।" খগেশ্বর ঠিকানাটা টুকিয়া লইলেন। এই ঠিকানাটারই প্রয়োজন। এই ঠিকানা জনৈক কাণা-সুপারি-ক্রেতাকে দিবার জন্য মুদিও পয়সা খাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল।

কারফরমা লেন চিৎপুর অঞ্চলে। একটি ট্যাক্সি সহযোগে খগেশ্বর রওনা হইলেন। কারফরমা লেনের কাছাকাছি আসিয়া ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিলেন এবং কিছুটা দূর হাঁটিয়া গিয়া দেখিলেন—কারফরমা লেনের মোড়ে সত্যই একটা বিড়ির দোকান রহিয়াছে। থাকিবেই তাহা খগেশ্বরবাবু জানিতেন। জনৈক বৃদ্ধ মিঞা বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছিল।

খগেশ্বর আগাইয়া গিয়া বলিলেন, "মিঞাসাহেব, ভাল গোলাপী বিড়ি চাই এক বাণ্ডিল—"

মিঞাসাহেব বিড়ি দিলেন।

খগেশ্বর বলিলেন, "আর একটি মেহেরবানি করতে হবে। শুনেছি তুমি খুঁজলির ভাল দাবাই জানো—বলে দিতে হবে সেটি আমাকে—"

মিঞাসাহেব সবিস্ময়ে বলিল, "খুজ্‌লির দাবাই! আমি জানি তা কে বললে আপনাকে ?"

এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে খগেশ্বর বলিলেন, "যে মুদির কাছ থেকে কাণা সুপুরি কিনলাম আধপোয়া, সে-ই তো তোমার নাম বাতলালে মিঞাসায়েব।"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিঞাসাহেব একবার খগেশ্বরের পানে চাহিলেন। "দেখি সুপুরি—"

মিঞাসাহেব সুপারিগুলি একটি একটি করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। হাঁ, সবগুলিই কাণা বটে।

বলিলেন, "দাবাই আমার কাছে নেই, আছে হাড়কাটা-গলির হীরেমন বিবির কাছে। তাকে গিয়ে বলুন আমার খুজলি হয়েছে, আপনার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারখানার ধুলো আমার একটু চাই। এই বললেই যা চাইছেন তা পাবেন।"

মিঞাসাহেব গম্ভীর মুখে পুনরায় বিড়ি পাকাইতে সুরু করিলেন। মিঞাসাহেব আর কোন কথা বলেন না দেখিয়া খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, "ঠিকানাটা ?"

"ঠিকানা নিতে হলে সুপুরিগুলি রেখে যেতে হবে।"

"বেশ।"

সুপারিগুলি হস্তগত করিয়া মিঞাসাহেব হীরেমন বিবির ঠিকানাটা দিলেন।

হাড়কাটা গলিতে হীরেমন বিবির দ্বারস্থ হইয়া খগেশ্বর দেখিলেন যে, হীরেমন নামটা শুনিয়া অন্তর যেরূপ উন্মুখ হইয়া ওঠে বিবি আসলে সেরূপ কিছু নহেন। এককালে হয় তো রূপসী ছিলেন, এখন কিন্তু কুশ্রী নানারোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ বারাঙ্গনা। রুক্ষ কেশ, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কাল-সার দেহ। একটা খাটের উপর বসিয়া আছেন, হাঁপানির টান উঠিয়াছে।

স্বল্পান্ধকার ঘরটাতে প্রবেশ করিতেই হীরেমন অতি কষ্টে প্রশ্ন করিলেন, "কে, কি চাই ?"

খগেশ্বর তাঁহার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারের ধূলি প্রার্থনা করিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হীরেমন বিবি বলিলেন, "আপনি ক নম্বর ?"

"তিন নম্বর।"

"কাকে কাকে চেনেন আপনি ?"

"খগেশ্বরবাবুকে, হারাণবাবুকে, যতীনবাবুকে, কেষ্টবাবুকে আর ম্যানেজারবাবুকে—"

"তা হলে এই রসিদটায় সই ক'রে দিন।"

হীরেমন অতি কষ্টে উঠিলেন এবং একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটি তালা লাগানো ছোট বাক্স এবং একটি কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা ছিল—"হীরেমন বিবির নিকট ঔষধ পাইলাম।"

"ওইটেতে সই ক'রে দিন—"

খগেশ্বর পকেট হইতে একটি ছোট কপিং পেন্সিল বাহির করিয়া বাঁ হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিলেন 'তিন নম্বর।' এই স্বল্প পরিশ্রম করিয়াই হীরেমন বিবি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হাঁপানিটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "এই বাক্সটা নিয়ে যান। ওর ভেতরে সব লেখা আছে। বাক্‌সে হরফওয়ালা তালা লাগানো আছে। তালা খোলবার কৌশল আপনি জানেন তো ?"

"না।"

"আমিও জানি না।"

"তা হলে খুলবো কি ক'রে ?"

"মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে যে অন্ধ ভিকিরিটা আঁচল পেতে বসে' থাকে মেডিকেল কলেজের সামনে, তাকে গিয়ে জিগ্যেস করুন ক পয়সায় দিন চলে তোমার ? সে যা উত্তর দেবে সেই কথাটি অক্ষর সাজিয়ে ঠিক করলেই তালা খুলে যাবে।"

"আচ্ছা"

খগেশ্বর বাক্সটা লইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় হীরেমন বিবি বলিলেন, "বলবেন ম্যানেজারবাবুকে, আমি মরছি, তাঁর কি একটুও দয়া হয় না আমার ওপর! মাসে মাত্র দশটাকায় কি চলে আমার ?"

হীরেমন বিবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

খগেশ্বর বলিলেন, "বলব আমি—"

বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ম্যানেজার-বাবুকে বলিলেই যদি টাকা পাওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খগেশ্বর সিঙ্গিকে তাহা হইলে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া এখানে আসিতে হইত না।

মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে মেডিকেল কলেজের সামনে একটা অন্ধ ভিখারী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল—"এক পয়সা দিলা দে রাম—"

খগেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোড়টা অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইতেই নিম্নস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"ক পয়সায় দিন চলে তোমার ?"

ভিক্ষুক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

খগেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষুক মৃদুকণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিল, "বাক্‌সা লায়া হ্যায় তো সেভেন নেই লায়া হ্যায় তো ঢন্ ঢন্।"

খগেশ্বর সরিয়া গিয়া একটা ল্যাম্পপোস্টের নিকটে দাঁড়াইয়া এলোমেলো ইংরেজী অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া seven কথাটি সাজাইয়া ফেলিলেন। তালা খুলিয়া গেল।

বাক্সের ভিতর একটি ঠিকানা ও একটি চাবি রহিয়াছে। চাবির গায়ে একটি কাগজে লেখা 'খিড়কি দরজা'। ম্যানেজারবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

ঠিকানায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। চাবি দিয়া খিড়কি দরজা খুলিয়া খগেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রাঙ্গণে খগেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল উপরের ঘর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। মিনিট খানেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খগেশ্বর পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই কাঠি বাহির করিলেন এবং সেটা নাকে দিয়া খুব জোরে একবার হাঁচিলেন। হাঁচির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। উপরে উঠিবার সিঁড়িটাও আলোকিত হইল। খগেশ্বর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং গিয়াই বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটাতেই তিনি ফরাসে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গে দামী শাল জড়ানো, মুখে প্রসন্ন হাস্য। বাড়িতে জনপ্রাণী আর কেহ নাই।

"এই যে শ্রীগরুড়, এসে পড়েছ দেখছি !"

বিনীত নমস্কার করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তো ? মুদি, বিড়িওলা, হীরেমণ আর অন্ধ ভিকিরি এই চারজনকে পার হয়ে এসেছ নিশ্চয়।"

সশ্রদ্ধকণ্ঠে খগেশ্বর বলিলেন, "তাই এসেছি—"

ম্যানেজার স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন দেখিয়া খগেশ্বর বলিলেন, "ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলাম না।"

"কর্ত্তার কত বিচিত্র খেয়াল, আমিই কি ছাই সব বুঝতে পারি। যা বলেন, হুকুম তামিল ক'রে যাই। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ শুনে কর্ত্তা বললেন, ওকে সোজা-সুজি ঠিকানা দিও না। মুদি, বিড়িওলা আর হীরেমণের কাছে মুখটা চিনিয়ে তবে যেন আসে। সেই রকম ব্যবস্থাই করলাম। হ'ল অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয় !"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি ! লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন !"

খগেশ্বর বলিলেন, "উদ্দেশ্যটা কি কিছু বুঝলেন ?"

"ঠিক অবশ্য বুঝি নি। যতদূর আন্দাজ করছি সেটা এই যে, ওই মুদি ওই বিড়িওলা আর ওই হীরেমণ ইদানীং কর্ত্তাকে কিছু মাল সাপ্লাই করেছে। ভবিষ্যতে তুমি যদি দেহাত থেকে কোন টাটকা মাল আমদানি ক'রে আনতে পার—ওদের কারো হেফাজতে এনে দিলেই মালটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেইজন্যেই সম্ভবত তোমার মুখটা চিনিয়ে দিলেন ওদের। কাজের লোক ওরা, মাল জোগান দেয়, পাহারা দেয়, পাচার করে। এসব অবশ্য আমার আন্দাজ। কর্ত্তার কথা খোদ কর্ত্তাই জানেন। যাক ওসব কথা। তোমার কথা শুনি। আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছ কেন শুনি ? সংক্ষেপে বল—"

খগেশ্বর সংক্ষেপেই বলিল, "টাকা—"

"টাকা ? কত টাকা ?"

"যা দেবেন। দিন চলা ভার হয়েছে আমার। চাকরি গেছে, পরিবার গেছে, মেয়ে গেছে, কিই বা আছে, সবই তো জানেন আপনি। আপনার কর্ত্তার সেবাতে জীবনটাই উছ্‌ছুগু করেছি বলতে গেলে !"

ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল খগেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গাঁজা কতটা করে খাও আজকাল ?"

"আজ্ঞে দৈনিক চার আনার।"

"সৌদামিনীর কাছে পাও টাও কিছু ?"

"একটি আধলা না। গেলে দেখাই করে না। নিজের মেয়ে-পরিবার যে এমন দুশমনের মতো ব্যাভার করবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। না খেতে পেয়ে মরছিল, লাথি ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটতো, আপনার কাছে এনে দিলাম, আপনি বললেন কর্ত্তার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে। নিজের চোখেও দেখলাম। এখন বেশ সোনাদানা পরে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে মশাই। আর বললে বিশ্বাস যাবেন না ম্যানেজারবাবু, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে পর্য্যন্ত দেয় না !"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

খগেশ্বরই পুনরায় কথা কহিলেন, "কর্ত্তা কি আজকাল যান-টান ওদের কাছে ?"

"রামোঃ, কর্ত্তার সখ ওই দু-এক দিনই। দু দিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নতুন মালের জন্যে খেপে ওঠেন। নতুন মাল সন্ধানে থাকে তো বলো, ভাল দাম দিয়ে কিনবেন। হাজার টাকা পর্য্যন্ত নগদ পেতে পারো।"

"একটা ভাল মালের চেষ্টায় আছি—"

"বয়স কত ? বেশী বয়সের চলবে না, সে সব দিন গেছে !"

"বয়স চোদ্দ-পনেরো—"

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, "বেশ তো, জোগাড় কর—"

"আপাতত কিছু চাই আমার, বড় অভাবের মধ্যে আছি !"

বৃদ্ধ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কুড়িটি টাকা খগেশ্বরকে দিলেন এবং বলিলেন, "এখন এই নিয়ে যাও, দিন পনেরো পরে এসো আবার।"

"এই বাড়িতেই ?"

"না, এ বাড়িতে নয়, এ বাড়ি বদলাতে হবে। আর বলো কেন, সাত দিন অন্তর অন্তর বাড়ি বদলাতে হচ্ছে। ঠিকানা ঠিক পাবে এবার যেমন ক'রে পেলে। এবার অবশ্য মুদি বিড়িওলা আর হীরেমণ থাকবে না। অন্য লোকেদের মারফৎ আসবে। কর্ত্তার হুকুম এই। প্রত্যেকবার নতুন রকম সঙ্কেতের তালা দিতে হবে। এবারকার তালাটা ঠিক খুলেছিল তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেভেন কথাটা হতেই খুলে গেল তালা—"

"তালা চাবি আর বাক্স দিয়ে যাও সব। এবার অন্যরকম তালা দিতে হবে—"

"এই যে—"

খগেশ্বর তালা-সমেত কাঠের বাক্স ও খিড়কির চাবিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিলেন।

সহসা চাপা গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, "ওটা কিসের শব্দ ?"

"একজন আমলার জ্বর হয়েছে, সে-ই ওরকম করছে ও ঘরে পড়ে পড়ে।—ও কিছু নয়।"

দ্বিতলের অপর প্রান্তে অজ্ঞান বন্দিনীর কথা খগেশ্বরকে বলিবেন এমন কাঁচালোক বৃদ্ধ নহেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খগেশ্বরকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাও এখন। বড় ক্লান্ত আছি আজ, ঘুমুবো এবার।"

খগেশ্বর হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "কুড়ি টাকায় কুলোবে না আমার, আরও কিছু দয়া করুন।"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন, "ওই তো তোমার দোষ শ্রীগরুড়, কিছুতেই তোমার খাঁই মেটানো যায় না !"

আরও দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

খগেশ্বর ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলেন—যত শীঘ্র সম্ভব তিনি উক্ত মালটি সরবরাহ করিবেন।

খগেশ্বর চলিয়া গেলে ম্যানেজার ধীরে ধীরে উঠিলেন ও খিড়কির দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কুব্জ দেহটা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গোঙানিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ চীৎকারে পরিণত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন—এইবার জ্ঞান হইয়াছে আর দেরি করা অনুচিত হইবে।

বারান্দাটা পার হইয়া ওদিকের একটা ঘরের দিকে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেই ঘরটার ভিতর হইতেই চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘরের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

হতবুদ্ধি মেয়েটির চীৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর মুহূর্ত্তেই আরও তীব্র তীক্ষ্ণ মর্ম্মান্তিকরূপে তাহা অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আর কিছু শোনা গেল না।

১৩

অচিনবাবুর কারখানি নিঃশব্দগতিতে আসিয়া বেলার বাসার সম্মুখে থামিল। জনার্দ্দন সিংহের মারফত নিজের কার্ডখানি পাঠাইয়া দিয়া অচিনবাবু স্টিয়ারিংএর উপর ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই বেশবাসসম্বৃত করিয়া সস্মিতমুখে বেলা বাহির হইয়া আসিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনিই কার্ড পাঠিয়েছেন?"

অচিনবাবু মোটর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে নিখুঁত ভদ্রতা বিকীরণ করিয়া অতিশয় সুষ্ঠু-ভঙ্গীতে একটি নমস্কার করিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা অশোভন হইতেছে দেখিয়া বেলা বলিলেন, "আসুন, ভেতরে আসুন—"

উভয়ে আসিয়া বাহিরের ঘরটাতে উপবেশন করিলেন। অচিনবাবু হাসিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিলেন, "একটি দয়া করতে হবে মিস্ মল্লিক—"

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মেয়ে বেলা নহেন। ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন। অচিনবাবু বলিলেন, "আপনার বাজনার খ্যাতি চারদিকে শুনতে পাই; আপনার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই তা-ও জানি, তবু এসেছি নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে।"

"ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।"

"লিলুয়ায় একটা বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে চ্যারিটি পারফরমেন্স করছি আমরা। নাচ, গান বাজনা থাকবে সব রকমই। এর থেকে যা টাকা বাঁচবে সেটা ভাল কাজেই খরচ হবে, মেয়েদের একটা ইস্কুল করবার ইচ্ছে আছে আমাদের। আপনাকে একটা কিছু বাজাতে হবে সেখানে —এস্রার সেতার—যা হোক। আমি নিজে কারে ক'রে নিয়ে যাবো, কারে পৌছে দিয়ে যাবো। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার!"

"কখন হবে?"

"দিন দশেক পরে, সন্ধে সাতটা থেকে সুরু"।

"সন্ধেবেলায় আমার ছুটি তো নেই, বাজনা শেখাতে যেতে হয় একজায়গায়।"

"বেশ তো, কোথায় বলুন না, একদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব আমি। সে ভার আমি নিচ্ছি।"

"সেটা ঠিক হয় না।"

"না না, মিস্ মল্লিক, কাইণ্ডলি আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমাদের চাই-ই—"

"আমাকে মাপ করুন, আমার সময় কম।"

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "দেখুন, একটা সৎকার্য্যের জন্যে এটুকু ত্যাগস্বীকার যদি না করেন তা হলে—"

"বেশ, আপনাদের স্কুলে আমি না হয় কিছু চাঁদা দেব—"

"সে তো দিতেই হবে, এটা হ'ল উপরি পাওনা। আপনি না থাকলে ফাংশানটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে—"

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "আমি কথা দিতে পারলাম না কিন্তু।"

"বেশ, আর একদিন আসব আমি, কথা আপনাকে দিতেই হবে।"

বেলা স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। অপ্রত্যাশিত এই বিপদটার হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায় মনে মনে সেই চিন্তাই তিনি করিতে-ছিলেন। অচিনবাবু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। সৎকার্য্যের জন্যে কিছু করা একটা মহাপুণ্য তো বটেই, তা ছাড়া এর আর একটা দিকও আছে। অনেক বড় বড় লোকের কাছে টিকিট বিক্রি করছি আমরা, তাঁদের কাছেও আপনার গুণের পরিচয়টা দেওয়া হবে। যাই বলুন, মিড্‌ল্ ক্লাস পিপ্‌ল তো আপনাদের গুণের যথোচিত মূল্য দিতে পারে না—"

অচিনবাবু আরও হয়তো কিছু বলিতেন কিন্তু বেলা সহসা নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখবো। আসুন তা হলে—"

বেলা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অচিনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-মুখে অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইলেন, জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠিটা খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিয়া তাহার

পর সেটা নাড়িয়া নিবাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দগতিতে গাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

অচিনবাবুর গাড়ি চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর গুপ্তের গাড়িখানি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর গুপ্ত গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং জনার্দ্দন সিংহের সেলামের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় বেলার সহিত তাঁহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য কাঁপিয়া থামিয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া বেলা সহজকণ্ঠেই বলিলেন, "আমি বেরুচ্ছিলাম, আপনার কি বিশেষ কোন কাজ আছে ?"

"তোমাকে কিছু বলতে চাই"।

প্রফেসার গুপ্ত কিছুদিন হইতে বেলাকে, অবশ্য বেলার সম্মতিক্রমেই, 'তুমি' বলিতে সুরু করিয়াছেন।

"আমাকে ? বেশ বলুন।"

"এখানে সে কথা বলা যাবে না, চল মাঠে যাই—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেলা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, তাই চলুন, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

"কি, বল ?"

"আপনার বলবার যত কথা আছে আজই শেষ ক'রে ফেলতে হবে। এর জন্যে মাঠে যতক্ষণ বসে থাকতে বলেন আজ বসে থাকব। কাল থেকে কিন্তু আর নয়!"

প্রফেসর গুপ্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা তিনি বলিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

"তাহলে একটু দাঁড়ান, এখুনি আসছি আমি—"

বেলা দেবী ভিতরে গেলেন ও মাঠে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

"চলুন—"

*

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, মাঠে অন্ধকার নামিতেছে। একটি নির্জ্জন স্থান বাছিয়া বেলা ও প্রফেসার গুপ্ত উপবেশন করিলেন। মোটরে যদিও উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছিলেন, কিন্তু একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

প্রফেসর গুপ্তই প্রথমে কথা কহিলেন, "তুমি মানুকে কি সত্যিই আর বাজনা শেখাবে না ?"

"ও ঘটনার পর আর তো আপনার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছিলেন আমার জন্যে, এ কথা শোনার পর আর কি আপনার বাড়িতে যাওয়া চলে, আপনিই বলুন। ভাগ্যিস্ বেঁচে গেছেন, না বাঁচলে কি হ'ত বলুন তো!"

"সেটা কি আমার দোষ ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, "আপনার দোষ সত্যি আছে কি-না, সে অপ্রিয় আলোচনা করবার অধিকার আমার নেই। আমার নিজের কোন দোষ নেই এইটুকুই আমি জানি—আর সেটা আপনিও জানেন। অথচ—"

আমার দোষ ক্ষালনের চেষ্টা আমি করছি না, কারণ এটাকে আমি দোষ বলে মনে করি না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা হয়তো প্রকাশ করেছি, তাতে দোষের তো কিছু নেই।"

"আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হলে নিশ্চয় দোষের আছে। আপনি বিবাহিত, সমাজের নিয়ম মেনেই আপনার চলা উচিত। হঠাৎ আমাকে ভাল লাগবার কারণই বা কি, তা তো আমি বুঝতে পারছি না, আরও বুঝতে পারছি না সে কথা আপনি প্রকাশ করছেন কেন ?"

প্রফেসার গুপ্ত ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ভালবাসা কোন দিন কোন আইন মেনে চলে নি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, এর বেশী আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি জীবনে সুখী নই বেলা—"

প্রফেসার গুপ্তের একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। "সুখী নন কেন ? আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালবাসতে পারেন নি ?"

"পারলে আমার এ দুর্দ্দশা হত না।"

"পারেন নি কেন, আপনার স্ত্রী তো লোক খারাপ নন।"

"লোক খারাপ কি ভালো তা বিচার করে কেউ কাউকে ভালবাসে না। মন্তর পড়ে বিয়ে করলেই ভালবাসা

জন্মায় না। মনের মিল হওয়াটাই আসল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এতটুকু মনের মিল নেই। কোন দিক থেকেই নেই। আমার মানসিক সুখদুঃখ আনন্দ অবসাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এতটুকু সম্পর্কই নেই। আমি উপার্জ্জন করব তিনি খরচ করবেন, আমার চাল-চলনের প্রতি তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টি রাখবেন, কোন মেয়ের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা দেখলে তা নিয়ে কথায় কথায় শ্লেষ করবেন, কোন কারণে যদি তাঁর স্বার্থে একটুও আঘাত করি তা হ'লে তাই নিয়ে গঞ্জনা দেবেন, কথায় কথায় প্রকাশ করবেন যে তাঁর মত মহিয়সী মহিলা আমার মত লোকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেলেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঝগড়া অথবা তর্ক ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য কোন প্রকার আলাপ বহুকাল হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। রাস্তার একটা অশিক্ষিত কুলি অথবা অমার্জ্জিত গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে তিনি সর্ব্বদাই তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং সর্ব্বদাই সন্দেহ করেন যে হয়তো আমি তাঁকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি অবশ্য সে সন্দেহের ন্যায্য খোরাক যে সরবরাহ না করি তা নয়, করি—কারণ আমার মন সর্ব্বদাই ক্ষুধিত।"

একটু থামিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় বলিলেন, "অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম যে তোমার মধ্যে আমার মন হয়তো আশ্রয় পাবে। সব কথা শুনলে হয়তো তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, হয়তো একটু প্রশ্রয় পাবো। আমার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গী ক'রে এক ডেলা আফিং খেয়েছেন বলেই তার দুঃখটা তুমি বড় ক'রে দেখো না। আমার দুঃখ আরও গভীর।"

প্রফেসার গুপ্ত নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রফেসর গুপ্তই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

"তুমি কিছু বলছ না যে—"

"বলবার কিছু নেই।"

"কিছুই নেই?"

"না।"

প্রফেসার গুপ্ত চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা বলিলেন, "আপনার আর কিছু কি বলবার আছে?"

"সবই তো বললাম।"

"তবে চলুন, এবার ওঠা যাক্।"

বেলা উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

"ওদিকে কোথা, আমার কার যে এদিকে। রাস্তা ভুলে গেলে না কি—"

"রাস্তা ভুলি নি। আমি ট্যাক্সি ক'রে ফিরব। আপনি বাড়ি যান—"

বেলা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

১৪

মৃন্ময়কে আজকাল প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইতেছে। কি যে এক ছাই কাজ জুটিয়াছে—বাড়িতে একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই। এ রকম চাকরি করার চেয়ে অনাহারে থাকাও বরং ঢের ভাল। আজ এখানে, কাল সেখানে, একদিনও কি সুস্থির হইয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জো আছে। যেন চরকির মতো বেড়াইতেছে! একটা মানুষ কতই বা ঘুরিতে পারে, সকল জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। হাজার হোক, মানুষ তো, কল তো আর নয়। উপর-ওলা সাহেবদের জ্ঞান গম্যি, দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছুই নাই! উনি না হয় ভালমানুষ লোক, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যান, তাই বলিয়া তাঁহারই উপর সব কাজের ভার চাপাইতে হইবে? আক্কেলকে বলিহারি যাই! ইত্যাকার নানারূপ চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি হাতের লেখা লিখিতেছিল। যদিও চিনু এখনও পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছে না—কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হাসির হাতের লেখা সত্যই অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। খানিকটা লিখিয়া হাসি সোজা হইয়া বসিল, খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত দিয়া সেটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর খাতাখানাকে একটু দূরে সরাইয়া নানাভাবে নিজের লেখাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই হাতের লেখায় স্বামীকে চিঠি লিখিলে তাহা কি খুব হাস্যকর হইবে? উনি হাসিবেন? ককখনো না।

বরং খুশিই হইবেন, আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন। কালই একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। খুব লুকাইয়া কিন্তু! ঠাকুরপো যেন না জানিতে পারে। ঠাকুরপো জানিতে পারিলে কিন্তু লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। জ্বালাইয়া মারিবে। এমনই তো ফাজিলের চূড়ামণি। চিঠিটা লিখিয়া ঝিয়ের মারফৎ রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এমন সময় কে আসিল! "বউদি, কপাট খোলো—"

চিন্ময়ের গলার স্বর। ঠাকুরপো আজ এত সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল কেন! হাসি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র আড়াইটা বাজিয়াছে। এত সকাল সকাল আসিবার মানে কি। অকারণ ভয়ে হাসির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কোন খারাপ খবর-টবর পায় নাই তো! নীচে পুনরায় কড়া নাড়িয়া চিন্ময় ডাকিল, "বউদি!"

হাসি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কপাট খুলিতেই চিন্ময় বলিল, "ঘুমুচ্ছিলে তো?"

"আহা, ঘুমুবো কেন, লিখছিলাম। তুমি এখন এলে যে?"

"ক্লাস হ'ল না, প্রফেসারের অসুখ করেছে।"

চিন্ময় উপরে চলিয়া গেল। কপাট বন্ধ করিয়া হাসিও উপরে আসিল। হাসির হাতের লেখা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, "সুন্দর হচ্ছে তো লেখা তোমার বউদি।"

"যাও আর ঠাট্টা করতে হবে না।"

হাসি হাতের লেখার খাতাটা বন্ধ করিয়া দিল।

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বেশ হচ্ছে। আচ্ছা তুমি ডিক্‌টেশন লিখতে পারো?"

"ডিক্‌টেশন কি আবার?"

"আমি বলব, তুমি শুনে শুনে লিখবে।"

"তা আমি পারি বোধ হয়"

"ঘোড়ার ডিম পারো!"

"নিশ্চয় পারি।"

"এই নাও কাগজ, লেখো—"

"ভুল হলে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি—"

"না না, ঠাট্টা করব কেন। লেখোই না আগে দেখি—"

হাসি কাগজ কলম লইয়া বসিল।

চিন্ময় বলিতে লাগিল—

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তুমি ন'টার সময় গোলদীঘির পূর্ব্বদিকের একটা গেটে থাকিও। ইতি—ক খ গ ঘ

লেখা হইয়া গেলে চিন্ময় বলিল, "কই দেখি, বাঃ চমৎকার হয়েছে। থাক আমার কাছে এটা—"

কাগজখানা সে পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

হাসি প্রশ্ন করিল, "ওর মানে কি?"

"মানে আবার কি, যা মনে এল তাই বললাম—"

চিন্ময় একটু হাসিল; তাহার পর বলিল, "অমন ক'রে চেয়ে আছ যে! এ কাগজটা এখন থাক আমার কাছে। একমাস পরে আবার তোমাকে দিয়ে লেখাব খানিকটা, তারপর দুটো মিলিয়ে দেখব উন্নতি হয়েছে কি-না—" এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

"এসেই যাচ্ছো কোথায় আবার?"

"মাঠে। খুব ভাল ম্যাচ আছে একটা, দেখে আসি।"

"খিদে পায় নি? খাবে না কিছু?"

"না।"

চিন্ময় বাহির হইয়া গেল।

হাসি পুনরায় লিখিতে বসিল।

ক্রমশঃ

আলো ও আলোক-চিত্র গ্রহণ

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এস্সি

আলোক-চিত্র গ্রহণের রহস্য সম্যক্ বুঝিতে হইলে আলোর স্বরূপ কিছুটা জানা দরকার। জ্বলন্ত গ্যাস ম্যান্টল্, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্ব্ অথবা সূর্য্য—যাহা হইতেই আলোক নির্গত হউক না কেন তাহার স্বরূপ একই। অর্থাৎ আলো বিকীরণকারী উজ্জ্বল (উত্তপ্তও বটে) পদার্থ যে সমস্ত অণু-পরমাণু লইয়া গঠিত তাহার অভ্যন্তরস্থ বিদ্যুতিনগুলি (electrons) প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে—যেমন ঘড়ির দোলক (pendulum) দক্ষিণে এবং বামে দুলিতে থাকে। এই কম্পনশীল বিদ্যুতিন চতুর্দ্দিকে আলোক-তরঙ্গ প্রেরণ করিতে থাকে—যেমন কম্পমান ঘণ্টা চতুর্দ্দিকের বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করে অথবা পুষ্করিণীর মধ্যে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে উহার নিস্তব্ধ জলতলের উপর দিয়া চতুর্দ্দিকে তরঙ্গমালা প্রবাহিত হইয়া যায়—শব্দ-তরঙ্গের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে বায়ুর ন্যায় একটী জড় মাধ্যমের (material medium) প্রয়োজন হয়—তেমনি আলোক-তরঙ্গের ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে একটী মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। আলোক-তরঙ্গ প্রেরিত হইবার জন্য যে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে "ঈথর" নাম দিয়াছেন। ইহা বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে—এমন কি কঠিন বস্তুর অভ্যন্তরেও ইহা বিদ্যমান। ঈথরের স্বরূপ কি তাহা অল্প কথায় বলা বড় শক্ত—ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহা অন্তত বায়ুর ন্যায় কোন জড় পদার্থ নহে। দোলনশীল বিদ্যুতিন যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে তাহা প্রবাহিত হইয়া যাইবার জন্য ঈথরের যে সব গুণ থাকা দরকার তাহা সমস্তই উহাতে আরোপ করা হইয়া থাকে। উজ্জ্বল পদার্থের অসংখ্য বিদ্যুতিনের সমস্তগুলিই যে একইভাবে দুলিতে থাকে তাহা নহে। উহাদের দোলন-সময় (period of vibration) এক নহে। বিদ্যুতিনের দোলনকে ঘড়ির দোলকের দোলনের সঙ্গে পূর্ব্বেই তুলনা করা হইয়াছে। ঘড়ির দোলক বামদিকে যতটা যাইবার তাহা গেলে সেই মুহূর্ত্ত থেকে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে যতটা যাইবার গিয়া পুনরায় বামদিকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাকেই একটী পূর্ণ দোলনের সময় অথবা সংক্ষেপে দোলন-সময় বলা যাউক। বিভিন্ন বিদ্যুতিনের দোলন-সময় বিভিন্ন। এক সেকেণ্ড সময়ে যতবার এইরূপ পূর্ণ দোলন সাধিত হয় তাহাকে দোলন-সংখ্যা (frequency of vibration) বলিব। এই এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে আলোক-তরঙ্গ বাহিরের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যায়—যতটা যায় তাহাকেই আলোর গতিবেগ বলা হয় (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) এবং দোলন-সময়ের মধ্যে (যাহা এক সেকেণ্ড অপেক্ষাও অনেক কম সময়) যতটা যায় তাহাকে ঐ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গান্তর (wave-length) বলা হয়। জলের ঢেউএর কথা বিবেচনা করিলে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গান্তর হইবে একটী ঢেউ-এর শীর্ষ হইতে ঠিক পরবর্ত্তী ঢেউ-এর শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত যে দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য তাহাই। ইহাকে একটী সম্পূর্ণ ঢেউও বলিতে পারি। যে সময়ের মধ্যে বিদ্যুতিন একটী পূর্ণ দোলন শেষ করে সেই সময়ের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এইরূপ একটী পূর্ণ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অন্য তরঙ্গগুলি ইহারই পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, যেমন পরবর্ত্তী দোলনগুলিও পূর্ব্ব-দোলনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক সেকেণ্ডে তরঙ্গ যতটা অগ্রসর হইবে তাহার মধ্যে ততগুলি পূর্ণ তরঙ্গ থাকিবে—যত নাকি উহার দোলন-সংখ্যা অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বিদ্যুতিন যতবার পূর্ণ দোলন শেষ করিতে পারিবে। অতএব দোলন-সংখ্যাকে তরঙ্গান্তর দিয়া পূরণ করিলে তরঙ্গের গতিবেগ পাওয়া যাইবে।

যে-কোন পদার্থের সামান্য একটুর মধ্যেও অসংখ্য বিদ্যুতিন বিদ্যমান। উহার বিভিন্ন বিদ্যুতিন বিভিন্নভাবে আন্দোলিত হয় বলিয়া (অর্থাৎ দোলন-সংখ্যা বা দোলন-সময় বিভিন্ন বলিয়া) ঐ উজ্জ্বল পদার্থ হইতে যে বিকীরণ (radiation) চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িবে তাহার মধ্যে ছোট-বড় নানা আকৃতির ঢেউ থাকিবে অর্থাৎ এই বিকীরণ মিশ্র বিকীরণ হইবে। কিন্তু ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য যাহাই হৌক না কেন উহার গতিবেগ সর্ব্বদাই এক। সুতরাং তরঙ্গান্তর বড় হইলে ঢেউ-এর সংখ্যা অর্থাৎ দোলন-সংখ্যা কম এবং তরঙ্গান্তর ছোট হইলে দোলন-সংখ্যা বেশী হইবে—কারণ উভয়ের পূরণফল একই অর্থাৎ গতিবেগের সমান। আলোর রং কি হইবে তাহা নির্ভর করে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। লাল আলোর তরঙ্গান্তর বেগুনি আলোর তরঙ্গান্তর অপেক্ষা বড়। অন্যান্য রংগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকে। কোন কঠিন পদার্থ (যেমন সূর্য্য অথবা ইলেকট্রিক বাল্বের অভ্যন্তরস্থ তার) উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণপূর্ব্বক আলোক বিকীরণ করিতে থাকিলে—এই বিকীরণ মিশ্রবিকীরণ হইবে অর্থাৎ এই বিকীরণের মধ্যে ছোট-বড় নানা আকারের তরঙ্গ থাকিবে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্বেত আলোসমুদয় বিভিন্ন রংবিশিষ্ট আলোর সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে ঐ সাদা আলো ত্রিশির কাচখণ্ডের বা প্রিজ্‌মের (prism) ভিতর দিয়া চালনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রিজ্‌মের ভিতর হইতে অপর দিকে বাহির হইয়া আসিয়া উহা আর সাদা থাকে না। রামধনুর মধ্যে যে সব রং দেখা যায় অর্থাৎ বেগুনি, ঘননীল, নীল, সবুজ, পীত, কমলা, লাল প্রভৃতি সমস্ত রংই তখন উহার মধ্যে দেখা যাইবে। সুতরাং বলা যায় যে প্রিজ্‌মের সাহায্যে সাদা আলোর বিশ্লেষণ হয়।

এখন কি প্রকারে আমরা একটী পদার্থ দেখিতে পাই তাহার আলোচনা করা যাউক। কোন পদার্থের উপর সাদা আলো পড়িলে উহা হয় প্রতিফলিত (reflected) হইয়া একদিকে, না হয় বিক্ষিপ্ত (diffused) হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আর পদার্থটী যদি স্বচ্ছ হয় (যেমন কাচ) তাহা হইলে ঐ আলো উহার ভিতর দিয়া গিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বস্তুর উপর আপতিত আলো উহা দ্বারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে শোষিতও হইতে পারে। কিন্তু যে আলো প্রতিফলিত, বিক্ষিপ্ত অথবা ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় তাহাই আমাদের চোখের ভিতর প্রবেশ করিয়া চোখের পরকলার (eye-lens) সাহায্যে চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত অক্ষিপটের (retina) উপর ঐ বস্তুর একটী প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে। এই আলোময় প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটের ঐ অংশে উত্তেজনার সৃষ্টি করে যাহা স্নায়ুমণ্ডলী কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলেই—'আমরা ঐ বস্তুটী দেখিতেছি'—এই উপলব্ধি হয়। বস্তুর উপর যে সাদা আলো পড়ে তাহার মধ্যে সমস্ত রংই বিদ্যমান। যদি ঐ সমুদয় রংই বস্তুর গায়ে লাগিয়া বিক্ষিপ্ত হয়—কোনটাই শোষিত না হয়—তাহা হইলে ঐ বস্তুটীকে সাদা দেখাইবে—যেমন সাদা কাগজ, কাপড় বা মার্ব্বল। আর যদি সমুদয় রংগুলিই শোষিত হয়—কিছুই বিক্ষিপ্ত না হয়—তাহা হইলে উহাকে কালো দেখাইবে—যেমন কয়লা, চুল ইত্যাদি। বস্তুত একটী জিনিস কালো বলিয়া বোধ হয় শুধু এই জন্যই—যে উহা হইতে কোন আলোই বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে না। কোন একটী পদার্থের রং নীল বলিলে ইহাই বুঝাইবে যে, যখন সাদা আলো উহার উপর পড়ে তখন সাদা আলোর ভিতরে যে সব রং আছে তাহার নীল ব্যতীত অপর সকল রংই ঐ পদার্থ দ্বারা শোষিত হয় এবং শুধু নীল রংটাই বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের চোখের ভিতর প্রবেশ করে। নীল বস্তুর উপর সাদা বা নীল ব্যতীত অন্য কোন রং-বিশিষ্ট আলো পড়িলে উহা কালো দেখাইবে—কারণ ঐ আলো উহাতে শোষিত হইবে। অতএব কোন বস্তু সাদা, কাল বা অপর রং-বিশিষ্ট কেন দেখায় তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

এই বিভিন্ন রং-বিশিষ্ট আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য কতখানি তাহা একটু আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই বলা দরকার যে, এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি বা এক সেন্টিমিটর অপেক্ষাও এত অধিক ছোট যে মাপকাঠি ইঞ্চি অথবা সেন্টিমিটর হইলে চলিবে না। ইহা অপেক্ষাও অনেক গুণ ছোট মাপকাঠির দরকার। এইরূপ একটী অতি ক্ষুদ্র মাপকাঠির নাম দেওয়া হইয়াছে—এঙ্‌ষ্ট্রম। ইহার দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটরের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ। সংক্ষেপে আমরা ইহাকে এ° বলিব। লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৮০০০এ°। বেগুনি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪০০০এ°। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উজ্জ্বল পদার্থের অভ্যন্তরস্থ সংখ্যাতীত বিদ্যুতিনগুলি অসংখ্য প্রকারে আন্দোলিত হইতে পারে—সেই কারণেই নানা রং-এর (অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট) আলো উহা হইতে নির্গত হয় যাহার একত্র সমাবেশে উহাকে সাদা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যত প্রকারের তরঙ্গের উদ্ভব হইতে পারে তাহার দৈর্ঘ্য যে কেবল ৮০০০ হইতে ৪০০০এ°-তেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে; পরন্তু ৮০০০এ° অপেক্ষা অনেক বড় এবং ৪০০০এ° অপেক্ষা অনেক ছোট তরঙ্গেরও সৃষ্টি হইতে পারে—কিন্তু সেগুলি আমাদের অক্ষিপটে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে না অর্থাৎ চোখের সাহায্যে আমরা তাহাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারি না। সুতরাং তাহাকে আমরা দৃশ্যমান আলো বলি না। বস্তুত তথাকথিত অন্ধকারের ভিতর এরূপ অনেক অদৃশ্য বিকীরণ থাকিতে পারে। চোখে দেখিতে পাই না বলিয়াই অন্ধকার বলি। কিন্তু অন্য যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের উপস্থিতি দেখান যায়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৮০০০এ° অপেক্ষা অধিক হইলে তাহাদের বেতার-তরঙ্গ বলা হয়। আর যদি ৪০০০এ° অপেক্ষা ছোট হয় তাহা হইলে তাহাদের অতি-বেগুনি (ultra-violet), আরও ছোট হইলে রঞ্জন-রশ্মি, আরও ছোট হইলে গামা-রশ্মি (যাহা রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু হইতে স্বতঃবিচ্ছুরিত হয়) এবং সর্ব্বাপেক্ষা ছোট যে তরঙ্গ তাহাকে কস্‌মিক্ তরঙ্গ (cosmic wave) বলা হয়। এই কস্‌মিক রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ইহা মহাব্যোম হইতে প্রতি-নিয়তই ধরাপৃষ্ঠে আপতিত হইতেছে। ইহার ব্যাখ্যাও অধুনা একপ্রকার পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন কঠিন পদার্থ অত্যুত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণ করিলে উহার অভ্যন্তরস্থ বিদ্যুতিনগুলি যত প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে এবং করে তাহার মধ্যে মাত্র অত্যল্প কয়েক প্রকারের তরঙ্গই আমাদের চোখের উপর ক্রিয়াশীল। উহাদের তরঙ্গান্তর ৮০০০এ° হইতে ৪০০০এ° হইলেই আমরা উহা উজ্জ্বল বলি অর্থাৎ উহা আলো বিকীরণ করে—বলি। ইহাকেই দৃশ্যমান আলো (visible light) বলা হয়। এই দৃশ্যমান আলোর উভয় দিকে—অর্থাৎ ছোট এবং বড় তরঙ্গ-বিশিষ্ট আরও বিকীরণ আছে যাহা চোখের উপর ক্রিয়াশীল না হইলেও অন্য এমন যন্ত্র আছে যাহার উপর উহা ক্রিয়াশীল বলিয়া তাহার সাহায্যে উহাদের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাও পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে বেতার-তরঙ্গ, উত্তাপ, আলো, রঞ্জনরশ্মি, গামারশ্মি প্রভৃতি মূলত একই অর্থাৎ ঈথরের তরঙ্গমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে—প্রভেদ শুধু উহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। একটী কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হইতে থাকিলে উহার অভ্যন্তরস্থ পরমাণু এবং বিদ্যুতিনগুলি আন্দোলিত হইতে থাকার দরুণ উহা হইতে উত্তাপরশ্মি তরঙ্গাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। তাপমান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহা আলোকরশ্মিও বিকীর্ণ করিতে থাকে—অর্থাৎ উহাকে আমরা উজ্জ্বল বলিয়া দেখিতে পাই। তাপমান আরও বাড়িলে উহা হইতে এমন অনেক ক্ষুদ্র তরঙ্গান্তর-বিশিষ্ট বিকীরণ বাহির হইবে যাহা আমরা দেখিতে পাই না—অর্থাৎ অতি-বেগুনি রশ্মি।

এক্ষণে মনে করা যাউক, সূচীভেদ্য অন্ধকার গৃহে একটী কেট্‌লীতে ফুটন্ত জল রাখা হইল। উহার তাপমান এত অধিক নহে যে উহা হইতে আলোক-তরঙ্গ নির্গত হইবে—অর্থাৎ আমরা উহা দেখিতে পাইব না। কিন্তু আমরা দেখিতে না পাইলেও উহার ভিতরের পরমাণুগুলি

আন্দোলিত হইতে থাকার দরুণ উত্তাপ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এখন যদি ঐ ঘরে কোন কাল্পনিক জীব প্রবেশ করে যাহার চোখের গঠনপ্রণালী এইরূপ যে তাহার অক্ষিপটে উত্তাপ-তরঙ্গ পড়িলে উহা উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে সেই জীব গাঢ় অন্ধকারের ভিতরও ঐ কেট্‌লী অনায়াসে দেখিতে পাইবে। বাদুড়, পেচক, শৃগালাদি নিশাচর জীবজন্তুর চোখের গঠনপ্রণালীতে হয়ত এইরূপ কোন বিভিন্নতা আছে যাহাতে উত্তাপ-তরঙ্গের সাহায্যে তাহারা দেখিতে পায়। দিনমানে যে সমস্ত বস্তু সূর্য্যের আলো এবং উত্তাপ শোষণ করিয়া লয়, রাত্রিকালে তাহারা উত্তাপ-তরঙ্গাকারে তাহা বিকীর্ণ করে—হয়ত বা তাহারই সাহায্যে এই সব নিশাচর রাত্রিকালে তথাকথিত অন্ধকারে চলাফেরা করিয়া থাকে। আবার চামচিকা প্রভৃতি কোন কোন জীবের আচরণ লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, উহারা প্রখর দিবালোকে ভাল দেখিতে পায় না। বোধ হয় দিনের বেলার দৃশ্যমান আলোকের প্রাখর্য্য হেতু এবং ঐ ঐ আলো উহাদের অক্ষিপট উত্তেজিত করিতে পারে না বলিয়া উহারা দেখিতে পায় না।

আলোর সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহার সাহায্যে এইবার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্যক্ বোঝা যাইবে। কোন বস্তু আমরা দেখিতেছি —ইহার অর্থই হইল এই যে, ঐ বস্তুনির্গত নিজস্ব আলো কিংবা অপর উজ্জ্বল বস্তু হইতে প্রাপ্ত আলো বস্তুর উপর পড়িয়া তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের অক্ষিপটের উপর পড়িয়া তাহার সাময়িক রূপান্তর ঘটাইয়াছে। অন্ধলোকের অক্ষিপটের এই রূপান্তর সাধনের ক্ষমতা নাই বলিয়াই সে দেখিতে পায় না। অবশ্য যাহার চক্ষু একেবারেই নাই তাহার কথা স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে জীবজন্তুর অক্ষিপট ব্যতীতও এমন জিনিস থাকিতে পারে এবং আছে যাহা আলোর প্রভাবে রূপান্তরিত হয়। রঙিন ছবি, কাপড়, জামা ইত্যাদির রং আলো লাগিয়া ক্রমে ক্রমে ফ্যাকাসে হইয়া যায়—যাহাকে আমরা বলি যে রং জ্বলিয়া গিয়াছে—ইহাও আলোকের প্রভাবে রূপান্তর ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি এমন কোন জিনিসের সাক্ষাৎ মেলে যাহার উপর আলো পড়িলে—তাহা যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন—শুধু যে তাহার রূপান্তর হইবে তাহা নয়, পরন্তু রূপান্তরের পরিমাণ আলোকের গাঢ়ত্বের উপর নির্ভর করিবে —অর্থাৎ ঐ বস্তুর যে অংশে যত চড়া আলো পড়িবে সেই অংশ তত বেশী রূপান্তরিত হইবে—তাহা হইলে সেই বস্তুর সাহায্যে আলোকচিত্রগ্রহণ করা সম্ভব হইবে। কাচপুটের সাহায্যে যাহার আলোকচিত্র গ্রহণ করিব তাহার একটী আলোময় প্রতিচ্ছবি (real image) ঐ বস্তুটীর উপর ফেলিলেই উহার খানিকটা রূপান্তর হইবে—প্রতিচ্ছবির সেই অংশে বেশী রূপান্তর হইবে যে অংশে বেশী আলো পড়িয়াছে এবং সেই অংশে কম রূপান্তর হইবে যেখানে কম আলো পড়িয়াছে। কালো চুলওয়ালা একজন যুবকের আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার সময়ে দেখা যাইবে যে, প্রতিচ্ছবির যে অংশে চুল সেই অংশে প্রায় কোন আলো না পড়ায় (কারণ চুল কালো, অতএব কোন আলো বিক্ষিপ্ত করে না) সেখানে পদার্থটীর কোন রূপান্তর ঘটিবে না ; আর যে অংশে সাদা পোষাক সেই অংশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রূপান্তর ঘটিবে, কারণ সাদা অর্থই এই যে ঐ অংশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলো বিক্ষিপ্ত হইয়া বস্তুটীর উপর পড়িয়াছে। সিলভার ব্রোমাইড, এমন একটী রাসায়নিক পদার্থ—যাহার উপর আলো পড়িলে—তাহা যত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন—উহার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। এই পদার্থটীর মধ্যে দুইটী মৌলিক উপাদান বিদ্যমান—সিলভার বা রৌপ্য এবং ব্রোমিন। সিলভার ব্রোমাইড, জিলাটীন এবং জল একত্র করিয়া একটী ঘন আরক (emulsion) প্রস্তুত করা হয় এবং কাচের প্লেট অথবা সেলুলয়েডের ফিল্মের উপর উহার একটী পাতলা প্রলেপ দিয়া উহাকে শুকানো হয়। অবশ্য এই সমস্ত প্রক্রিয়াই অন্ধকারে অথবা কমলা রং-এর আলোতে সমাধা করা হয়। কারণ কমলা রং-এর আলো ঐ ব্রোমাইডের কোন রূপান্তর সাধন করিতে পারে না। ইহাই ফোটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্‌ম্।

আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমেই একটী ক্যামেরার প্রয়োজন হয়। ইহা একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার সম্মুখভাগে মাত্র একটী ছিদ্র থাকে—যাহার ভিতর দিয়া বাহিরের ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে। অবশ্য ঐ ছিদ্রটী বন্ধ করিবার ব্যবস্থাও আছে এবং উহা বন্ধ করিলে বাহিরের কোন আলোই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ছিদ্রের প্রবেশ-পথে কয়েকখানি কাচপুট (lens) আছে যাহার সাহায্যে ক্যামেরার সম্মুখভাগস্থ কোন পদার্থের প্রতিকৃতি ক্যামেরার পশ্চাৎভাগের পর্দ্দার উপর গিয়া পড়ে। কাচপুট হইতে পর্দ্দার দূরত্ব বাড়ানো-কমান যায়। ইহার প্রয়োজন আছে, কারণ যে পদার্থের আলোক-চিত্র লওয়া হইবে, কাচপুট হইতে তাহার যে দূরত্ব উহারই উপর নির্ভর করে—উহার প্রতিকৃতি সুস্পষ্টভাবে কাচপুটের পশ্চাতে কত দূরে পড়িবে—তাহা। পর্দ্দাটি ঠিক সেইখানে থাকা চাই। আলোকচিত্র তুলিতে প্রকৃতপক্ষে এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে। অথচ ফোটোগ্রাফ তুলিতে গিয়া ফোটোগ্রাফার যে অত্যধিক সময় নেন তাহার কারণ এই যে, তিনি পর্দ্দাটি সম্মুখে এবং পশ্চাতে সরাইয়া কোন্ অবস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাহাই বাহির করেন। তাহা ছাড়া, কে কোন্ অবস্থায় থাকিলে সুন্দর ছবি উঠিবে তাহাও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয়। কালো কাপড়ে ঢাকা ফোটোগ্রাফিক প্লেটটী পর্দ্দার জায়গায় বসান হয় এবং ক্যামেরার ছিদ্রপথটী বন্ধ করিয়া ঐ কালো কাপড়-খানা সরাইয়া ফেলা হয়। এইবার ছিদ্রপথটী খুলিলে বস্তুর অথবা মানুষের (যাহার আলোকচিত্র লওয়া হইতেছে) প্রতিচ্ছবি ঐ প্লেটের উপর পড়িয়া উহার উপরিস্থিত যে ব্রোমাইডের প্রলেপ আছে তাহার রূপান্তর সাধন করিবে। সাধারণত এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্য ছিদ্রটী খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ঠিক কতটুকু সময় খোলা রাখা হইবে তাহা নির্ভর করে তখনকার দিনের আলোর প্রাখর্য্যের উপর। আজকাল অবশ্য ষ্টুডিয়োতে কৃত্রিম আলোর সাহায্যেও ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। অনেক দোকানের সম্মুখে যে বড় বড় হরফে লেখা থাকে, "দিবারাত্র ফোটো তোলা হয়" ইহার রহস্য এই। আলো আলো প্রখর হইলে কম সময় এবং মৃদু হইলে বেশী সময় খোলা রাখা

হয়। প্লেটের উপর প্রতিকৃতির যে ছাপ পড়িল তাহা এই অবস্থায় দেখা যায় না—সেইজন্যই ইহাকে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি (latent image) বলা হয়। ইহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইলে অন্য প্রক্রিয়ার দরকার হয়। তাহাকেই developing বা পরিস্ফুটকরণ বলা হয়। এই কার্য্য কতগুলি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে করা যায়। উহাদিগকে developer বা পরিস্ফুটকারক বলা হয়। ইহাদের কার্য্যই হইল, আলো মুহূর্ত্তের জন্য প্লেটের উপর পড়িয়া যে রূপান্তর আরম্ভ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করা। শুধু তাই নহে, যেখানে আলো যত প্রখরভাবে পড়িয়াছে সেখানে এই developerএর কার্য্য তত বেশী পরিমাণ হইবে। ব্রোমাইডের উপর আলো পড়িলে উহা হইতে ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থটী বিযুক্ত হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট থাকে রৌপ্য। যদিও একটুক্রা রূপার রং সাদা তথাপি প্লেটের উপর আলো এবং developerএর সাহায্যে যে রূপা উৎপন্ন হয় তাহার রং কালো। কারণ কোন একটী জিনিসের রং উহার কণাগুলি কত সূক্ষ্ম তাহার উপর নির্ভর করে। রূপা অত্যন্ত সূক্ষ্মাকারে কালো দেখা যায়। যে সোনা "তপ্ত কাঞ্চন" রং বলিয়া আমরা তারিফ করি, তাহাও অতি সূক্ষ্ম কণাকারে প্রায় কালোই দেখায়। Developer পদার্থটী জলে গুলিয়া উহার মধ্যে প্লেট ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ইহা অন্ধকারে অথবা এমন আলোতে করিতে হইবে যাহা ব্রোমাইডের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই প্রতিকৃতিটী পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। মনে করা যাউক যে একটী মানুষের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। দেখা যাইবে যে প্রতিচ্ছবির যে অংশে চুল ছিল সেখানকার রং কতকটা ছাইয়ের মত অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিত প্লেটের রং। এইখানে ব্রোমাইড ব্রোমাইডই আছে, কারণ চুল কালো বলিয়া সেখানে প্রায় কোন আলোই না পড়ার দরুণ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং developerও সেখানে কোন ক্রিয়া করিতে পারে নাই। আর প্রতিচ্ছবির যেখানটায় সাদা কাপড়-চোপড় ছিল সেখানে বেশী আলো পড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং developerও সেখানে বেশ একটু পুরু আবরণের কালো রূপা তৈয়ার করিয়াছে। সুতরাং সে স্থানটা খুবই কালো। প্রতিচ্ছবির অন্যান্য অংশে যে অনুপাতে আলোক সম্পাত হইয়াছে সেই অনুপাতে পুরু অথবা পাতলা কালো রূপার স্তর পড়িবে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রতিকৃতিটী এইবার সাদায় কালোয় বেশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে অপরিবর্ত্তিত ব্রোমাইড সেখানটা ছাইয়ের রং, আর যেখানটা খুবই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানকার রং পুরুস্তর রূপার দরুণ কালো—অর্থাৎ যুবকের মাথার কালো চুল এবং গোঁফ বৃদ্ধের পাকা চুল এবং গোঁফের ন্যায় দেখাইবে। ইহাতে অবশ্য বৃদ্ধের খুশী হইবার কারণ থাকিলেও যুবকের মোটেই খুশী হইবার কথা নয়। এই যে প্রতিকৃতি পাওয়া গেল-যাহাতে সাদা জিনিস কালো এবং কালো জিনিস সাদা হইয়া উঠিয়াছে ইহাকেই নেগেটিভ্ বলা হয়। এই নেগেটিভ্‌কে এখনও আলোর মধ্যে বাহির করা চলে না, কারণ ইহার মধ্যে এখনো অপরিবর্ত্তিত ব্রোমাইড আছে—যাহার উপর আলো পড়িলে সমস্ত প্রতিকৃতিই নষ্ট হইয়া বিভ্রাট বাঁধাইবে। অতএব এই অপরিবর্ত্তিত ব্রোমাইড এমনভাবে সরাইয়া ফেলা দরকার যাহাতে রূপার উপর কোন ক্রিয়া না হয়। ইহাকে fixing the image বা "প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা" বলা যাইতে পারে। ইহা করা হয় হাইপো (hypo) নামক রাসায়নিক পদার্থটী জলে দ্রবীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে। কারণ এই রস ব্রোমাইডকে দ্রবীভূত করিয়া সরাইয়া ফেলিবে, পরন্তু রূপার উপর ইহার কোনই ক্রিয়া নাই। সুতরাং যেখানে ছাই অথবা প্রায় সাদা রং-এর ব্রোমাইডের প্রলেপ ছিল সেখানে এখন আর কিছুই না থাকায় স্বচ্ছ এবং সাদা কাচ বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং নেগেটিভে এই যে সাদা-কালোর প্রতিকৃতি পাওয়া গেল—ইহার গভীর কালো অংশ রৌপ্য নির্ম্মিত, সুতরাং অস্বচ্ছ এবং একদম সাদা অংশ স্বচ্ছ, কারণ সেখানে স্বচ্ছ কাচ বা সেলুলয়েড (ফিল্মের পক্ষে) ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং অন্যান্য জায়গায় আলোক-সম্পাতের অনুপাতানুযায়ী পাতলা ঈষৎ কালো রূপার আবরণ থাকায় আংশিক স্বচ্ছ। বিভিন্ন অংশের স্বচ্ছতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা মনে রাখা প্রয়োজন, কারণ নেগেটিভ্ হইতে পসিটিভ্ ছবি (যাহাতে কালো কালোভাবেই এবং সাদা সাদাভাবেই ওঠে) কি প্রকারে করা সম্ভব তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহার আবশ্যকতা আছে। নেগেটিভকে অবশ্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তমভাবে জলে ধৌত করা আবশ্যক যাহাতে উহার উপর হইতে সমস্ত অবাঞ্ছনীয় রাসায়নিক পদার্থ বিদূরিত হইতে পারে। তারপর উহাকে শুষ্ক করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, একটী আলোকচিত্রের নেগেটিভ তৈরী করিতে পরপর নিম্নলিখিত চারিটী প্রক্রিয়া করিতে হয়:—(১) আলোক-সম্পাত অর্থাৎ আলোময় প্রতিচ্ছবি প্লেটের উপর পড়িতে দেওয়া (exposure), (২) পরিস্ফুটকরণ (developing), (৩) প্রতিষ্ঠাকরণ (fixing), ও ধৌতকরণ। এইবার পসিটিভ্ ছবি প্রস্তুত করার বিষয় আলোচনা করা যাউক। সাধারণত এই ছবি কাগজে তোলা হয়। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মত ফটোগ্রাফিক কাগজ তৈরী করিতে কাগজের উপর ব্রোমাইডের একটি প্রলেপ লাগাইতে হয়। এইরূপ একখানি কাগজ নেগেটিভের পশ্চাতে লাগাইয়া কিছুক্ষণের জন্য আলোতে ধরিতে হয়। নেগেটিভের যে সব জায়গা পুরুস্তরের রূপা থাকার দরুণ অস্বচ্ছ তাহার ভিতর দিয়া কোন আলো গিয়া কাগজের উপরে পড়িবে না—সুতরাং সেখানকার ব্রোমাইড রূপান্তরিত হইবে না। কাজেই develop এবং fix করিবার পর ঐ জায়গায় শুধু কাগজ থাকার দরুণ সাদা দেখাইবে। আর নেগেটিভের যে জায়গায় সাদা অর্থাৎ শুধু স্বচ্ছ কাচ বিদ্যমান সেই জায়গার ভিতর দিয়া অনেক আলো পশ্চাতে অবস্থিত কাগজের উপর পড়িয়া উহার বহুল পরিমাণ রূপান্তর ঘটাইবে। সুতরাং develop করিবার সময়ে সেইখানে ঘন হইয়া কাল রূপার স্তর পড়িবে। অতএব নেগেটিভের কালজায়গা ছবিতে সাদা হইয়া উঠিবে এবং সাদা জায়গা কালো হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ ছবিতে মূল বস্তুর সাদা সাদাই উঠিবে এবং কালো কালোই উঠিবে। সুতরাং পক্ককেশ বৃদ্ধ এবং কৃষ্ণকেশ যুবা কাহারও কোন আপশোষের কারণ থাকিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে,

নেগেটিভ হইতে ছবি তুলিতে হইলে ফোটোগ্রাফিক কাগজখানাকে পর পর ঐ চারিটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই হইল আলোকচিত্র তুলিবার বৈজ্ঞানিক রহস্য। অবশ্য ইহার পরও ছবির উপরে শিল্পীর তুলি চালনার সাধনা আছে—তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে আলোকচিত্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অত্যন্ত সাধারণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। উহার খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে মোটেই প্রবেশ করা হইল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়ে, এমন কি আলোকচিত্র গ্রহণ ব্যাপারেও এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে, শুধু মাত্র সাধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে উহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় না। এমন কি, এমন কথাও নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে "আলোকচিত্র" এই নামেরই অধুনা কোন উপযোগিতা নাই। বরঞ্চ ইহাকে "বিকীরণচিত্র" বলিলে তাহাই খুব উত্তম হইবে। ইংরেজীতেও ইহাকে photograph না বলিয়া Radiograph বলাই সঙ্গত। ইহার কারণ বলিতেছি। যত প্রকারের বিকীরণ (radiation) সম্ভব তাহার মাত্র অত্যল্প অংশ অর্থাৎ যে অংশকে দৃশ্যমান আলোক (visible light—৮০০০এ° হইতে ৪০০০এ° যাহার তরঙ্গান্তর) বলা হয় তাহা দ্বারাই পূর্ব্বে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইত। অর্থাৎ ইহাও বলা যাইতে পারে—যাহা চোখের সাহায্যে দেখা যায় এ পর্য্যন্ত তাহারই চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইত। কিন্তু অধুনা অদৃশ্য বিকীরণের সাহায্যেও চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। দৃশ্যমান আলোক অপেক্ষা হ্রস্বতর তরঙ্গন্তের বিশিষ্ট বিকীরণ (যেমন রঞ্জনরশ্মি) অথবা উহাপেক্ষা দীর্ঘতর তরঙ্গান্তর-বিশিষ্ট বিকীরণ (যেমন—উত্তাপ রশ্মি—infrared radiation)-এর সাহায্যেও বস্তুর হুবহু চিত্র গ্রহণ আজকাল সম্ভব। ইহা দ্বারা মানুষের অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইয়াছে। ইহার জন্য শুধু প্রয়োজন এমন রাসায়নিক পদার্থ—যাহা অবশ্য সিলভার ব্রোমাইড হইতে বিভিন্ন—যাহা ঐসব বিকীরণের সাহায্যে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ বহু প্রকারের রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান অধুনা পাওয়া গিয়াছে। ফোটোগ্রাফিক প্লেট বা কাগজের উপর ব্রোমাইডের প্রলেপ না লাগাইয়া ঐ পদার্থের প্রলেপ লাগাইতে হইবে। আজকাল সম্পূর্ণ অন্ধকার গৃহের ও যাবতীয় পদার্থের চিত্র এই ভাবে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ চোখে না দেখিতে পারিলেও ফোটোগ্রাফের সাহায্যে তাহা দেখা যায়। আলোক-চিত্র গ্রহণ যে কতভাবে মানুষের উপকার সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে তাহার আভাব মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে—উহাতেই শুম্ভিত হইতে হয়।

আলোকচিত্রের সাহায্যে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণা বহুল পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের পরীক্ষামূলক প্রমাণ আলোকচিত্রের সাহায্যেই পাওয়া গিয়াছিল। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে অন্ত্র, পাকাশয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির চিত্রগ্রহণ রোগনির্ণয়ব্যাপারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে চোখে দেখা না গেলেও রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে চিত্র তুলিলে উহা পরিষ্কার দেখা যায়—সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসায় ইহা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ত গেল অত্যন্ত হ্রস্ব তরঙ্গান্তর-বিশিষ্ট বিকীরণের সাহায্যে গৃহীত চিত্র। উত্তাপ রশ্মির সহায়তায় চিত্র গ্রহণ (Infrared photography) সম্ভব হওয়ায় বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আসিয়াছে। কত প্রকারে যে ইহাকে কাজে লাগান হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্ধকার গৃহে রক্ষিত ফুটন্ত জল-বিশিষ্ট কেট্‌লী চোখে না দেখা গেলেও উহার চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, রঞ্জনরশ্মির ন্যায় উত্তাপরশ্মির সাহায্যে চিত্র গ্রহণ ও রোগনির্ণয়ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। Varicose veins (রক্তবাহী শিরা বাড়িয়া গিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়) এবং lupus (চর্ম্মের নীচের এক প্রকার ক্ষয় রোগ) প্রভৃতি অসুখে রোগাক্রান্ত স্থানের infrared photograph তোলা হইয়াছে। ইহা অন্য কোন আলো দ্বারা সম্ভব নহে। জালিয়াতি ধরিতে এই প্রকার ফোটোগ্রাফের জোড়া নাই বলিলেও চলে। কোন সত্যিকারের দলিলের ভিতর পরবর্ত্তী কালে প্রতারণাপূর্ব্বক জাল করিয়া নূতন কিছু সন্নিবেশিত হইলে যদি উহার চিত্র উত্তাপরশ্মির সাহায্যে তোলা হয় তাহা হইলে যে অংশ জাল করা হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে ধরা পড়িবে। জালিয়াত অবশ্য এমন কালি ব্যবহার করিবে যাহা দেখিতে মূল দলিলের কালির অনুরূপ। কিন্তু দৃশ্যমান আলোকের কাছে অর্থাৎ চক্ষুর সাহায্যে উহা একই প্রকার হইলেও উত্তাপরশ্মির কাছে উহার সামান্যতম প্রভেদ থাকিলেও তাহা ধরা পড়িবে। দেখিতে সম্পূর্ণ একই রকমের দুইটী কালির একটী হয়ত উত্তাপরশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ এবং অপরটী অস্বচ্ছ—সুতরাং ভিন্ন:চিত্র উঠিবে। ঠিক এই ভাবেই সেন্সর (censor) কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা লেখার মূল অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। সেন্সরের কালি মূল কালির উপর এমন ভাবে লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মূল লেখা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং পড়া যায় না—অর্থাৎ সাধারণ আলোতে। কিন্তু সেন্সরের কালি যদি উত্তাপরশ্মির কাছে স্বচ্ছ হয় এবং উহার নীচের কালি (মূল লেখার)—যাহা নিশ্চয়ই বিভিন্ন কালি—যদি অস্বচ্ছ হয় তাহা হইলে চিত্রে ঐ মূল লেখাটি উঠিবে। যেমন স্বচ্ছ কাচের পশ্চাতে কোন বস্তু রাখিলে আমরা তাহা দেখিতে পাই। কুয়াসাচ্ছন্ন দিবসে দূরের বস্তু আমরা দেখিতে পাই না—সুতরাং উহার চিত্রগ্রহণও সম্ভব নহে, কিন্তু উত্তাপরশ্মির সাহায্যে উহার বেশ পরিষ্কার চিত্র তোলা সম্ভব হইয়াছে। ঐ একই কারণে যতদূর হইতে আলোকচিত্র তোলা সম্ভব, উত্তাপরশ্মির সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূরের জিনিসের চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। আজকাল এরোপ্লেনে চড়িয়া শত্রু শিবিরের চিত্র গ্রহণ করিয়া উহার সমস্ত গুপ্ত তথ্য জানা একটা রেওয়াজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বেতারে ঐ সমস্ত চিত্র বহুদূরে অবস্থিত মিত্রপক্ষের সামরিক ঘাঁটিতে পর্য্যন্ত প্রেরণ করা হইয়া থাকে (elevasion)—কারণ চিত্র-গ্রহণকারী উড়ো জাহাজটী যদি বিমানধ্বংসী গোলার কৃপায় ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করার সুযোগ নাই পায়! এ যাবৎ আলোকচিত্র শুধু সাদায় কালোয়ই উঠিত—সুতরাং নানাপ্রকার জমকালো রং-বিশিষ্ট কাপড়জামা পরিধান করিয়া ওঠে

রক্তবর্ণ এবং গণ্ডে গোলাপী রং মাখিয়া যে সুন্দরীগণ ক্যামেরার সম্মুখে বসিতেন তাঁহারা যখন দেখিতেন চিত্রে সে সব কিছুই ওঠে নাই তখন তাঁহাদের ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। আজকাল কিন্তু ফোটোগ্রাফির এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে তাঁহাদের আর এ ক্ষোভ থাকিবে না—আলোকচিত্রে ও সমস্ত রং প্রায় যথাযথ উঠিবে। ব্যাপারটা একটু জটিল সুতরাং তাহার আলোচনা এখানে করা হইবে না।

ইহা ছাড়াও লোকের অবসর বিনোদনের জন্য ফোটোগ্রাফাদির অবদানও নগণ্য নহে। এ যাবৎ শুধু নিশ্চল পদার্থের নিশ্চল চিত্র দেখিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। কিন্তু উহাতে গতি আরোপ করিয়া উহাকে জীবন্ত করা হইয়াছে। এই ভাবেই চলচ্চিত্রের উদ্ভব। শুধু তাহাই নহে, ফিল্মের পাশে শব্দ-তরঙ্গের পর্য্যন্ত চিত্র তোলা হইয়া থাকে এবং এইভাবে গতিশীল ছবির সঙ্গে বাক্য জুড়িয়া দিয়া সবাক্ চিত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কামান সশব্দে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, জার্মান টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জমান ব্রিটিশ জাহাজের আরোহিবৃন্দ আকুল আর্ত্তনাদ তুলিয়াছে, কমন্স্ সভায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ইহার প্রত্যুত্তরে জার্মানীর বিরুদ্ধে "ব্লকেড" ঘোষণা করিতেছেন, পাল্টা জবাব হিসাবে হিট্‌লার সদম্ভ আস্ফালন পূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে তাঁহার নূতন উদ্ভাবিত মারণাস্ত্রের কথা শুনাইতেছেন, ডার্ব্বি রেসে মাননীয় আগা খাঁ মহাশয়ের ঘোড়া প্রথম যাইতেছে—এই প্রকার কত না ঘটনা আমরা বহু যোজন মাইল দূরে থাকিয়াও নিকটবর্ত্তী প্রেক্ষাগৃহে গেলেই শুধু দেখিতেই পাইব না, প্রত্যেকটি শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইব—বিজ্ঞানের কৃপায় ইহাও সম্ভব হইয়াছে। কবি কাউপার তাঁহার মৃতা জননীর একখানি নিশ্চল আলেখ্য পাইয়া কত আবেগভরে তাঁহার সেই অমর কবিতাটি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার মা যদি বিংশ শতাব্দীর মানুষ হইতেন তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর কবিকে শুধু নিশ্চল প্রতিকৃতি পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইত না—অনায়াসে তাঁহাকে দেখান যাইত তাঁহার মা রীতিমত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন কি দোলনার কাছে গিয়া পরম স্নেহভরে তাঁহাকে যে আদর করিয়াছেন, গণ্ডে যে চুম্বন আঁকিয়া দিয়াছেন—তাহার প্রত্যেকটী শব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরেও তাঁহার পক্ষে শোনা সম্ভব হইত।

স্মরণ

কাব্যরঞ্জন শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল এম্-এ

ভুল্‌তে পারি সকল কথা,
পারি না—সেই স্মৃতিটি,
পালিয়ে গেছে কোকিল—তবু
কর্ণে বাজে গীতিটি!
দগ্ধ হ'ল মাটির কায়া—
রইল বেঁচে এ কোন্ মায়া!—
স্মরণ সে যে মরণজয়ী—
এই ধরণীর রীতি কি?

সকল স্মৃতি ভুল্‌তে পারি,
পারি না—সেই লাবনী,
নিত্য যাহে সুধার স্রোতে
সিক্ত হ'ত অবনী!—
দিবসরাতি ছন্দে গানে
ফুটত যাহা আমার প্রাণে;—
নীরস মরু করত সরস—
আন্‌ত রসের প্লাবনই!

ভুল্‌তে পারি সকল স্মৃতি,
পারি না—সেই হাসিটি,
বিরহিণী রাধার হিয়ায়
বাজে শ্যামের বাঁশিটি!
সে নয় হাসি—মুক্তাঝরা,
ভুবনজয়ী—পাগল-করা;—
অধর থেকে পড়ত খ'সে
কুন্দফুলের রাশি কি?

কথা—শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক

শ্যামলা জননী

("মার্চ্চ্" গীতি)

নীল নির্ম্মল সিন্ধু মথনে সুধার ভাণ্ড সম
কবে উঠেছিলে সুজলা, সুফলা, শ্যামলা জননী মম ?
পিতা হিমালয় স্নেহধারা ঢালি' সিক্ত করিল হিয়া,
সিন্ধু জননী কল-কল্লোলে উঠিল উল্লসিয়া !
অরুণ আসিয়া উজল হাসিয়া ঘুচাল গভীরতম,
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম !

শীতল পবন করিল ব্যজন নামিল শ্রাবণ ধারা
চন্দনা পিক পাপিয়া দোয়েল পুলকে আপন হারা !
ষড় ঋতু তা'র যৌতুক ভার আনিল তোমার দ্বারে,
আমের মুকুল শিউলী বকুল ফুটিল পথের ধারে !
কুসুম গন্ধে গীত-সুছন্দে মঞ্জুল মনোরম
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম !

সুন্দর বনে শার্দ্দূল সনে নাগেরা করিত খেলা
তপোবন-ছায়ে শিখি-কুরঙ্গে বসাত মোহন মেলা,
অমৃত-লোকের শান্তি মাধুরী পুণ্য-পূরিত প্রাণ
সে দিনো আমরা ছিলাম সকলে "অমৃতের সন্তান" !
আমরা তোমার আশীষে জননী, ছিলাম অমরোপম !
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম !

II সা -া মা মা | মা -া মা মা I রগা -মপা -া পা | পা পা .পা -া I
নী ০ ০ ল নি র্ম ম ল সিং ০০ ন্ ধু ম থ নে ০

I মা মপা -ধা -া | ধা -া ধা -া I ধর্সা -া পা -া | -া -া -া -া I
সু ধাং ০ র্ ভা ন্ ড ০ স ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

I পা পধা -ণা ণা | ণা -া ণা ণা I ণা র্সা সধা -া | ধা ণা ধপা -া I
ক বেং ০ উ ঠে ০ ছি লে সু জ লা ০ সু ফ লা ০

I পা ধা পমা -া | মা পা মগা -া I রগা -মপা মা -া | -া -া -া -া I
শ্যা ম লা ০ জ ন নী ০ মং ০০ ম ০ ০ ০ ০ ০

I মা মপা -ধা ধা | ধা -া ধা -পা I পা পধা -ণা ণা | ণা -া ণা ণা I
(১)পি তাং ০ হি মা ০ ল য়্ স্নে হ০ ০ ধা রা ০ ঢা লি'
(২) ষ ড়় ০ ০ ঋ তু ০ তা র্ যৌ ০০ ০ তু ক ০ ভা র্

I ধণা -র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -র্রা র্রা -া | -া -া -া -া I
(১)সিং ০ ক্ ত ক রি ল ০ হিং ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০
(২)আং ০ নি ল তো মা র ০ দ্বাং ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I র্রা র্মা র্মা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I র্সা -র্রা র্রা ণা | ণা -া ণা ণা I
(১)সি ন্ ধু ০ জ ০ ন নী ক ০ ল ০ ক ল্ লো লে
(২)আ ০ মে র্ মু ০ কু ল্ শি উ লী ০ ব ০ কু ল্

I ণা র্সা র্সা ধা | ধা -া ধা -ণা I পধা -ণা ণা -া | -া -া -া -া I
(১)উ ঠি ল ০ উ ল্ ল ০ সিং ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০
(২)ফু টি ল ০ প ০ থে র ধাং ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা ণা -া | ধণা -র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা -া | ণর্সা -র্রা র্রা র্রা I
(১)অ রু ণ ০ আং ০ সি য়া উ জ ল ০ হাং ০ সি য়া
(২)কু সু ম ০ গং ০ ন্ ধে ০ গী ০ ত সু ছং ০ ন্ দে ০

I র্রা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা র্জ্ঞা I জ্ঞর্মা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
(১)ঘু চা ল ০ গ ০ ভী র ত ০ ম ০ ০ ০ ০ ০
(২)ম ন্ জু ০ ল ০ ম নো র ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

I { র্সা র্রা র্জ্ঞা -া | ণা -র্সা র্রা -া I ধা ণা র্সা -া | পা ধা ণা -া I
উ ঠি লে ০ যে ০ দি ন্ সু জ লা ০ সু ফ লা ০

I মা পা ধা -া | ধরা -া রা গা I গপা -া মা -া | -া -া -া -া } II
শ্যা ম লা ০ জ ০ ন নী ম ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া গা গা | ধা ধা ধা -া I পা -া পা পা | পধা -া রা রা I
(৩)শী ০ত ল প ব ন ০ ক ০ রি ল ব্য ০ জ ন
(৪)সু ন্ দ র ব ০ নে ০ শা য়্ দূ ল স ০ নে ০

I গর্রা -া র্রা র্রা | র্সা -া ণা ধা I ধর্সা -া ণা -া | -া -া -া -া I
(৩)না ০ মি ল শ্রা ০ ব ণ ধা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০
(৪)না ০ গে রা ক ০ রি ত খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I ণর্রা -া -া র্রা | র্রা -া র্রা -া I সর্রা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া জ্ঞা -া I
(৩) চ ০ ন্ দ না ০ পি ক্ পা ০ ০ পি য়া দো ০ য়ে ল্
(৪) ত ০ পো ব ন ০ ছা য়ে শি ০ ০ খি কু র ০ ঙ্গে ০

I র্রা র্মা জ্ঞা -া | র্রা -া র্সা না I নর্রা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
(৩) পু ল কে ০ আ ০ প ন হা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০
(৪) ব সা ত ০ মো ০ হ ন মে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ণা র্সা -া | পা -ধা ণা -া I মা -পা -ধা ধা | গা -মা মা পা I
অ মৃ ত ০ লো ০ কে র্ শা ০ ন্ তি মা ০ ধু রী

I রা -গা মা -া | সা -রা গা মা I মা -ধা -পা -ণা | -ধা -া -া -া I
পু ০ ণ্য ০ পূ ০ রি ত প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I রা র্রা -া র্রা | র্রা র্রা র্রা -র্সা I সর্জ্ঞা জ্ঞা -া -া | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -া I
সে দি ০ নো আ ম রা ০ ছি ০ লা ০ ম্ স ক লে ০

I র্রা -া র্সা -া | না -া না -া I না -র্রা র্সা -া | -া -া -া -া I
অ ০ মৃ ০ তে ০ র ০ স ন্ তা ০ ০ ০ ০ ন্

I র্মা র্মা র্রা -া | রজ্ঞা -া র্সা -া I র্সা র্সা র্রা ণা | ণর্সা র্সা ধা -া I
আ ম রা ০ তো ০ মা র্ আ শী ০ যে জ ন নী ০

I ধা -ণা পা -া | মা পা ধা ধর্সা I ণা -া -া -া | -া -া -া -া I
ছি ০ লা ম্ অ ম রো প ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ণা র্সা -া | পা -ধা ণা -া I মা পা ধা -া | গা মা পা -া I
উ ঠি লে ০ যে ০ দি ন্ সু জ লা ০ সু ফ লা ০

I রা গা মা -া | সা রা গা পা I মা -া -া -া | -া -া -া -া II II
শ্যা ম লা ০ জ ন নী ম ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

প্রথম কলির "পিতা হিমালয়" প্রভৃতির-ও দ্বিতীয় কলির "বড় ঋতু তা'র" প্রভৃতির সুর একই প্রকার হওয়ায় উহাদিগকে (১) ও (২) চিহ্নিত স্থানে বসান হইল। সেইরূপ, দ্বিতীয় কলির "শীতল পবন" ইত্যাদির ও তৃতীয় কলির "সুন্দর বনে" ইত্যাদির সুর একই প্রকার হওয়ায় উহাদিগকে (৩) ও (৪) চিহ্নিত স্থানে দেওয়া হইল।

বীণার ঝঙ্কার

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

১

আড়ি-পেতে পরের কথা শোনা অশিষ্টতা। কিন্তু বাপ-খুড়াকে পর ভাবা অশিষ্টতার চরম-সীমা। বিশেষ যুগল গুরু-জনের প্রসঙ্গের বিষয় যখন সে স্বয়ং।

বাইসিকেলের টায়ারে হাওয়া দেওয়া বন্ধ রেখে, চাকার সিকের ফাঁকে ফাঁকে শচীন্দ্রনাথ উপরের বারান্দায় দৃষ্টি-নিক্ষেপ কল্লে। তার পিতার মাথার পিছনের তৈলাক্ত টাক উষার আলোয় চক্‌চক্‌ করছিল। পিতৃব্যেরও মুখ অন্য দিকে ছিল।

বিজনবাবু বল্লেন—দাদা, শচীর বিয়ের একটা বন্দোবস্ত কর। বৌদিদি একটু ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

বিপিনবাবু বল্লেন—নবীন সমাজ স্থির করেছে যে বিবাহ নিবিড় ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেমন আপরুচি খানা, তেমনি আপরুচি বিবাহ করনা।

বিজন অসন্তুষ্ট হ'ল। বল্লে—আধুনিকতার ওপর অভিমান ক'রে নিজের ছেলের অনাগত কালকে জটিল ক'রে লাভ কি দাদা? বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব চিরদিন বাপ-খুড়োর।

—তুমিই না হয় সেই সনাতন দায়িত্বটুকু মাথায় নাও।

বিজন বল্লে—না দাদা, সত্যি বলছি। কবে একটা কাকে বিয়ে ক'রে বসবে—কিম্বা ওর নাম কি ক'রে বসবে—তখন সমস্ত সংসারটা খাপ্‌ছাড়া হয়ে উঠ্‌বে।

কনিষ্ঠের কাঁধে হাত রেখে অগ্রজ বল্লে—ভালই ত। ওর নাম কি করে বস্‌বে না। তবে নিজে দেখে যদি একটা কাকেও বিয়ে করে আনে, তোমার বৌদিদি আর আমার বৌ-মা লাল-পেড়ে সাড়ির আঁচলে গাছ-কোমর বেঁধে, উলু দিয়ে তাকে ঘরে তুলে নেবে। সত্যি কথা, সে আমাদের না ছাড়লে আমরা তাকে ছাড়ব না।

শচীন্দ্র ভাবলে—সে অলক্ষিতে যথেষ্ট শুনেছে। এবার প্রবীণ-মুখ নবীন-রবির কিরণ-স্নাত করার উদ্দেশ্যে কর্ত্তারা কেহ বাগানের দিকে মুখ ফেরাতে পারেন। শচী উঠে দাঁড়ালো। সবল হাতে দু-চাকার গাড়ি-খানা তুলে নিয়ে, পা টিপে বাহিরে গেল। তারপর গ্রাম্য-পথে একেবারে বিজলী বাগানের পুকুরের চাতালে।

সেখানে প্রকাণ্ড চাঁপা-গাছের ছায়ায় বসে শচীন্দ্রনাথ ভাব্‌লে। একমাস পূর্ব্বে বিবাহ সম্বন্ধে তার জননীর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, স্মরণ করলে।

—পাশটাশ করলি বাবা, এবার ওঁকে বলি তোর বিয়ে দিতে।

—বিয়ে যে করব মা আমি। সে নিজের কাজের ভার বাবার ওপর চাপিয়ে তাঁকে বিরক্ত করব কেন?

তার মা তার চুল ধরে টেনে দিয়েছিলেন। মার কানে-ঢোকা সকল কথা সুড়্‌সুড় ক'রে বাবার কানে পৌছায়।

সে আবার ভাবলে। উহু! বাবার কথায় তো অভিমানের আমেজ ছিল না। তার মনোনয়নের ফলে ঘরে-আনা জীবনসঙ্গিনীর অভ্যথনা সম্বন্ধে তাঁর কথায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার সারাজীবনের সৌন্দর্য্য-সাধনার যে ফল সে ঘরে আনবে—তার মুখ নিশ্চয় উল্লসিত কর্ব্বে তার মা এবং খুড়িমাকে।

একসঙ্গে এতখানি গভীর চিন্তা তার জীবনের ইতিবৃত্তে বিরল। তার বিচার-শক্তি তখনও সক্রিয় ছিল। কিন্তু সে বাধা পেলে। কারণ, তার বন্ধু নীলকমল তার নয়ন-পথে পড়লো—অদূরে ছাতিম-গাছের ছায়ায়।

অতঃপর মিত্র-যুগল পূজার ছুটিতে দেশ-ভ্রমণের পরামর্শে আত্ম-নিয়োগ করলে।

২

তারা অন্য দুটি বন্ধু সমভিব্যাহারে গেল পুরী-তীর্থে। সাগর-কূলে বিপিনবাবুর বাল্যবন্ধু হর্ষবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর সাজানো বাড়ি—লোকালয়ের বাহিরে স্বর্গদ্বার পার হ'য়ে আরও দক্ষিণে। এই "নিভৃত নিলয়"-এ চার বন্ধু কালীঘাট থেকে শ্রীমন্দিরের ছড়িদার অবধি সকল মানুষের অমীমাংসিত আলোচনায় দিন যাপন করছিল।

—সুলিয়ারা সুখী, বল্লে শৈলপতি।

—কিন্তু—ঐ দেখ, বল্লে শচী।

নীলকমল বল্লে—দেখো, শুনো, কহো মাত্‌।

পঞ্চানন বল্লে—শব্দ পেলে বন্‌কী চিড়িয়া ফস্‌-রাং ক'রে উড়ে যাবে। কিন্তু লুকিয়ে দেখ।

শৈলপতি বল্লে—কী হয়েছে? শাশ্বত-তত্ত্বের আলোচনা চিত্ত-বৃত্তিকে প্রসারিত করে। সুন্দর শাশ্বত—অতএব অনুশীলনের সামগ্রী।

সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী বাঙ্গালী তরুণী সাগর-বেলার নিভৃতে, সাগরের দীপ্ত সুষমায় পরিতুষ্টা। সে আপন মনে গান গাহিতেছিল। তার সুরের কুহক-জালকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করছিল হিল্লোল। তার বস্ত্রাঞ্চল পাগল-হাওয়ার যেন ক্রীড়নক। দুষ্ট মলয়ানিল পাগলের মত যখন তার অঙ্গের বসন নিয়ে টানাটানি করছিল—তরুণীর সরমজড়িত বাহুলতা দুষ্টের অপচেষ্টা বিফল করছিল। এ বিরোধ বিরক্ত করছিল বন্ধুদের কাঁচা মনকে। অবশ্য তারা স্পষ্ট বুঝলে না বিরক্তির কারণ। বাহুলতার সাফল্য, না পবনের পরাজয়?

কয়েকদিনই ঠিক্ এই সময় যুবতী এসে ঐ স্থলে বসে নিজের মনে গান গাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আসছিল একটি ভদ্রলোক—বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের কিছু কম। যুবতী কৃতজ্ঞ হাসিতে তাকে তুষ্ট কর্ত্ত।

আজ ভদ্রলোকের আগমনে শচী কয়েকদিনের বিচার-ফল মনের মাঝে চেপে রাখ্‌তে পারলে না।

সে বল্লে—লোকটাকে ছাই দেখ্‌তে।

এ বিষয়ে তর্ক উঠ্‌লো না—যেমন তাদের প্রত্যেক প্রসঙ্গে ওঠে।

নীলকমল বল্লে—বিউটি এণ্ড দি বীস্ট।

শৈলপতি শিশুকাল থেকে অঙ্কের খাতায় কবিতা লেখে। সে বল্লে—উষার আলোর কাজল-কালো প্রচ্ছদ-পট।

পঞ্চানন বল্লে—অত কবিতার ভাষা বুঝিনা। লোকটাকে দেখলে মনে হয় মাখন-চোরা।

তাদের ক্রমবর্দ্ধমান অসূয়া এ সিদ্ধান্তে শান্তি পেলে এবং যৌথ-গবেষণার ফলে তারা সিদ্ধান্ত করলে যে, সুন্দরী কোনো অচিন্‌দেশের রাজকুমারী কিম্বা ঐরকম কোনো একজন। আর লোকটা তার পিতার কর্ম্মচারী।

শচী বল্লে—রাজারা অবুঝ। ঐরকম একটা দুশমন-চেহারার সঙ্গে দিনের পর দিন কুমারীকে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে অচিন্ দেশের রাজা সুরুচির পরিচয় দেননি।

২

রাত্রে চাঁদের আলো মেখে সাগরের ঢেউগুলো ভীষণ হুটোপাটি করছিল। তাদের খেলা দেখতে দেখতে বিনাদপুরের জমিদারের ছেলে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মিত্র বি-এ নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল—

—যে সব যুবতী বালু-বেলায় বসে তরঙ্গের তালে না গান গাইতে পারে তারা কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ফুটপাথের মত একঘেঁয়ে এবং কঠোর।

সে ভাবলে—বাবা তো তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন পাত্রী মনোনয়ন কর্ব্বার। এই সাগরসেঁচা সুষমাকে দেশে নিয়ে যেতে পারলে বাবা নিশ্চয় তার রুচির সুখ্যাতি করবেন।

সে চাঁদের আলোতে তার জননীর স্নেহের হাসি দেখলে।

কিন্তু—

সাগর গর্জ্জন করে বল্লে—বোকাটা! গাছে কাঁঠাল—

ঢেউ বাকিটুকু বল্লে না। আবার গড়িয়ে ফিরে গেল সমুদ্রে।

পরদিন প্রভাতে যখন অচিন্‌পুরের রাজকুমারীর সঙ্গী তাকে নিতে এলো, বন্ধু চতুষ্টয় সাঁতারের পোষাকে তাদের সম্মুখীন হ'ল।

শচীন্দ্রের পশমী পোষাক—জাঙ্গিয়া গাঢ় সবুজ—বুক লাল—পিঠে দুটা এড়ো পটী মাত্র। তার বর্ণ গৌর, দেহ কোমল—অথচ চলবার সময় তার মাংস-পেশীগুলা আত্ম-প্রকাশে ব্যস্ত।

নীলকমল শ্যামবর্ণ। দেহ সুগঠিত। মানুষটা একটু বেঁটে।

শৈলপতির মুণ্ডটা সুগঠিত একটু মেয়েলি ধরণের। টানাটানা চোখ, অপ্রশস্ত কপাল। দেহটি কিন্তু গণেশ-ঠাকুরের মত—লম্বোদর, সুন্দর।

পঞ্চানন পাঁচফিট দশইঞ্চি উঁচু। গৌরবর্ণ। কিন্তু অতি শিশুকাল থেকে গ্রামের মাঠে মালকোঁচা বেঁধে ফুটবল খেলে সক্ষম পা দুটাকে ধনুক ক'রে ফেলেছিল—আর

ধাবমান গোলার পিছনে ছুটে ছুটে একটু কোল-কুঁজো হ'য়েছিল।

মোটকথা তাদের মধ্যে শচীনের অর্দ্ধ-নগ্ন দেহই দ্রষ্টব্য—এ-কথা বিনা তর্কে বাকী তিনজনের স্বীকার্য্য।

অকস্মাৎ এই নাইয়ে চতুষ্টয়কে দেখে চকিতা হরিণীর মত পালাবার সময় অপরিচিতার কুরঙ্গ আঁখি শচীন্দ্রের দেহে ক্ষণকালের জন্য সংবদ্ধ হল।

পঞ্চাননের পিতা বিপিন মিত্রের জমিদারীর খাজাঞ্চি। সে নিজে যাদবপুরে যন্ত্র-শিল্পের ছাত্র। অপরিচিত বাবুটিকে ধরে পাচু বল্লে—ক্ষমা করবেন। আপনাদের বিরক্ত করলাম। আমরা অন্যত্র যাচ্চি।

সে বল্লে—বিলক্ষণ। এত বড় সমুদ্র কূল—আমরা অন্যত্র যাচ্চি।

পঞ্চাননের সাহস অবশিষ্ট মিত্রদের হৃদয়ে বলসঞ্চার করলে।

শৈলপতি বল্লে—কী হামজুল্লি! এই বালিয়াড়ির পিছনে মানুষ থাকতে পারে এ সন্দেহ আমাদের মনে জাগেনি।

—তাতে কি হয়েছে?

বিবাদপুরে অমায়িকতার খ্যাতি আছে নীলকমলের। সে বল্লে—এই অভদ্রতার দুশ্চিন্তায় আমরা আজ নাইতে গিয়ে জলে ডুবে মরব। আপনারা বসুন। আমরা অন্য ঘাটে যাই।

তখন শৈল ও পাঁচু—বসতে হবে, নিশ্চয় বসতে হবে—ব'লে বায়না ধরলে।

শচী নীরবকর্ম্মী। ইত্যবসরে সে মহিলার প্রতি চোরাই দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। মহিলার আঁখি দুটিও নিষ্ক্রিয় ছিল না। চোখোচোখি হ'লেই উভয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছিল।

ওরা তিনজনে যখন ভদ্রলোককে সৌজন্য-বরিষণে প্লাবিত করছিল—শচীন্দ্র মনে মনে দুটা কবিতা আওড়ালে। একটা ইংরেজী—যার নির্দ্দেশ, সাহসী ব্যতীত কারও লভ্য নয় সুন্দরী। অপরটি বাঙ্‌লা—পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই। এই শব্দব্রহ্মের মদির-উত্তেজনায় সে সটান যুবতীর কাছে গিয়ে জোড়হাতে বল্লে—আমাদের অপরাধ হ'য়েছে। ক্ষমা করবেন।

হাসলে, যুবতীর দুই গাল টোল খায়। সে হেসে বল্লে—কী বলছেন! সাগরে স্নান কর্ব্বার জন্যই তো পুরীতে আসা।

শচীন সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি সাগরে স্নান করেন?

বাকীটুকু ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারলে না—কখন, কোন্ ঘাটে?

বন্ধুত্রয় বুঝলে শচীটা অকুতোভয়। তারা ভদ্রলোককে একরকম ঠেলা দিয়ে নিয়ে এলো শচীর কাছে।

শচী বল্লে—তোমরা শুনেছ? রাজকুমারী সমুদ্র-স্নানের পক্ষপাতী।

অপরিচিতেরা সমস্বরে বল্লে—রাজকুমারী?

শচী বল্লে—আপনি।

ভদ্রলোক বিকশিত-দশন হ'য়ে বল্লে—ওর নাম রাজকুমারী তো নয়। ওর নাম—মানে—

নিঃসঙ্কোচে উর্ম্মিমালার দিকে তাকিয়ে যুবতী বল্লে—আমার নাম সাগরিকা।

ভদ্রলোক বল্লে—সাগরিকা আমার ছোটো বোন। ও সমুদ্রকূলে ভিজাগাপটমে জন্মেছিল ব'লে আমার মা ওর নাম রেখেছিলেন—সাগরিকা।

সাগরিকা একটু হেঁসে বল্লে—আমাদের নাম সব ঐ রকম জন্মস্থান ধরে হয়। দাদা এদেশে জন্মেছিলেন ব'লে ওঁর নাম জগন্নাথ।

পঞ্চানন বল্লে—কী সর্ব্বনাশ। ভাগ্যিস্ আপনি সাক্ষী-গোপালে বা কুম্ভকোনামে জন্মাননি।

এতে আবহাওয়া ফিকে হ'ল। তাদের আরও পরিচয় হ'ল। জগন্নাথ মল্লিক পারলাকীমেদী ষ্টেসনের পার্শেল ক্লার্ক।

শৈলপতি মনে মনে কেবল আওড়াচ্ছিল—সাগরিকার ভাই জগন্নাথ—কাকাতুয়ার ভাই রামছাগল।

তাদের পিতা আউল-রাজ্যের দেওয়ান। এতে শচী আশ্বস্ত হল—রাজকুমারী না হোক মন্ত্রী-নন্দিনী।

নীলকমল ভাবলে—পুরীতে জন্মালেও লোকটা মানুষ হয়েছিল আউলে—তাই পেঁচার মত মুখ।

তারা কয়েকদিনের জন্য পুরীতে এসে বাস করছিল—বলরামপ্রসাদ হোটেলে।

৩

তিনদিনের মধ্যে নিভৃত-নিলয়ের অধিবাসীদের সঙ্গে বলরামপ্রসাদনিবাসীদের ঘনিষ্ঠতা পেকে উঠ্‌লো। চতুর্থ দিনে সাগরিকা বালিয়াড়ির আড়ালে ব'সে আপন মনে গাহিতেছিল—

মরিব মরিব সখি—

মনে মনে বালাই যাট বলে শচীন্দ্র মিত্র তার অব্যবহিত দূরে অলক্ষ্যে বস্‌লো।

সাগরিকা মধুর কণ্ঠে গাহিল—

ন ভাসায়ো রাধা-অঙ্গ
না পুড়ায়ো জলে—

অতঃপর আত্ম-গোপন অসম্ভব হ'ল। শচীকে দেখে সাগরিকা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। হাওয়ার অভদ্র আক্রমণ হতে সম্ভ্রম-রক্ষা ক'রে সাগরিকা বল্লে—আমি বুঝেছিলাম, কে যেন বালির আড়ালে।

শচী বল্লে—আমিও বুঝেছিলাম যে ঐ রকম একটা দুর্ঘটনা আপনার গানের কথাগুলাকে উল্টো-পাল্টা ক'রে দিয়েছে।

—ওমা! তাই নাকি? কী লজ্জার কথা।

—লজ্জার কথা! মোটেই না। আমার তো মনে হয় না পুড়ায়ো জলে—রাধার চরম বিহ্বলতার পরিচয়। কারণ শ্যামের নামটুকুই তার কামনার ধন। জল ভেজায় কি পোড়ায়—এ তুচ্ছ জড়ের অন্ধ-শক্তির বিচারে তার আগ্রহ নাই।

সাগরিকা পায়ের স্যাণ্ডাল খুলে বালির উপর বাঁ পায়ের বুড়া আঙুলে পাতিহাঁসের মতো কি একটা পাখী আঁকছিল। সে বল্লে—হ্যাঁ। তা অবশ্য।

শচীন্দ্র মুগ্ধ হল। সঙ্গীতকলার সাথে চিত্রকলা, আর তাদের পিছনে ক্ল্যাসিকাল রমণীসুলভ লজ্জা।

শচী বল্লে—মিস্ মল্লিক, যে সব কথা মনে আসছে বল্‌তে পারছি না।

—তারা কি সব কথা?

—কাল রাত্রে যে সব কথা ভেবে রেখেছিলাম। আপনি কি রকম জানেন?—যেমন সাগর। সমুদ্র অগাধ, মানুষকে ভয় দেখায়—

—কী সর্ব্বনাশ! আমি তো কাকেও ভয় দেখাইনি মিঃ মিত্র।

শচী খাই হারিয়ে ফেলেছিল। সে বল্লে—না। মানে ভয়ের দিক নয়। সাগরের অন্তর রত্নে ভরা। মাত্র রত্ন কেন? সাগর সেচে সুধা উঠেছিল। আপনিও তেমনি।

—কী বলছেন? ছিঃ! ছিঃ!—বলে অপাঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালে সাগরিকা।

সে ক্ষণিক বিজলী চাহনী উত্তেজিত করলে শচীকে।

সে বল্লে—যদি অপরাধ করে থাকি—

—কী বলছেন। ছিঃ।

এবার শচী একটু ঝঞ্ঝাটের মাঝে পড়লো—দোটানা পর পর দুটা তরঙ্গের মাঝে পড়লে যেমন হয়। সাহস! তার মন বল্লে—সাহস।

সে বল্লে—আপনার বিনয় এবং লজ্জা যাই বলুক—অমৃত-ভরা আপনার অন্তর।

এবার সাগরিকা সোজাসুজি হাসলে—যেমন চাঁদ হাসে কুমুদের উপর। সে বল্লে—কি ক'রে সন্ধান পেলেন? আমি তো নিজে জানি না।

—খুঁজে বেড়ানো হ'ল মানুষের ধর্ম্ম। তা না হ'লে সে এত বড় হত না। যৌবনে সে খুঁজে বেড়ায়—এক সুরে বাঁধা প্রাণ। নিজের তারে ঝঙ্কার দিলে দরদে বেজে ওঠে, এমন বীণা।

—বীণা! নিশ্চয় আপনার সে বীণাকে খুঁজে পেয়েছেন। তাকে সঙ্গে আনেননি?

শচী বল্লে—তাকে সঙ্গে আনতে হয়নি। কি জানি কোন্ পুণ্য-ফলে বিধাতা তাকে টেনে এনেছেন এই অশান্ত সাগরকূলে। তাকে খুঁজে পেয়েছি। আমার সার্থক বীণা—অনাগত কালকে সঙ্গীত-মুখর করবার বাজনা, আমার অন্তরাত্মার লুকানো সুরে-বাঁধা বীণা।

—কী ব্যাপার!

এ বে-তালা, বে-সুরো শব্দে শচী পিছনে চাইল। সাগরিকার ভ্রাতা জগন্নাথ! সে সাগরিকার মুখের দিকে চাইল। তার চির-রক্তিম ঠোঁটে ফ্যাকাশে রঙের আমেজ দেখলে। তার ভোমরা কালো চোখের তারা সরম-মলিন। সে আবার জগন্নাথ মল্লিকের দিকে চাইল। বিরক্তির

পূর্ব্বাভাষ যে বিস্ময়—তার ছায়া দেখ্‌লে তার মুখে। সে সাগরের দিকে চাইল। সেই একভাব—উদ্বেল অশান্তি।

একটু কৈফিয়ত-চাওয়া সুরে মল্লিক আবার বল্লে—কী ব্যাপার ?

সত্যাই তো ব্যাপার বোঝানো গুরুতর ব্যাপার। কি বলা উচিত ? কিন্তু স্তম্ভিত শচীনের কানে বীণা বেজে উঠ্‌লো যখন সে শুন্‌লে—তুমি সবটা শুনতে পাওনি দাদা ? শচীনবাবু কলেজে থিয়েটার করেন। তিনি পূজার ছুটির আগে—বীণার ঝঙ্কার—নাটকে ফটিক্‌চাঁদের ভূমিকা অভিনয় করেছেন। বীণা নাটকের নায়িকা। ফটিকচাঁদ—

—বুঝেছি। আবার গোড়া থেকে হবে না শচীবাবু ?

শচীবাবু তখনও যোল-আনা ধাতস্থ হননি। তার মনের বীণায় ঝড়ের রাগিণী বাজছিল। তার ধুয়া হচ্ছে—সাগরিকা, সাগরিকা, চতুরা মধুরা সাগরিকা—এস তরঙ্গায়িত, এস প্রাণে।

সাগরিকা বল্লে—এ কি বারোয়ারি তলার যাত্রা দাদা, যে এক একজন বড়লোক শ্রোতা এলে আবার গৌর-চন্দ্রিকা ফাঁদতে হ'বে ?

অদূরে হর্ষবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর নিভৃত-নিলয়ের বারান্দায় বসে মিত্র-ত্রয়—শচীনমিত্র-সাগরিকামল্লিক নাটকের মূক অভিনয় দেখছিল। যখন জগন্নাথ এসে তাদের পিছনে দাঁড়ালো নাটকের ক্লাইম্যাক্স দেখবার আশায় তাদের প্রাণের তার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌লো।

শৈলপতি বল্লে— কাকাতুয়ার ভাই রামছাগল যদি শচীর গায়ে হাত তোলে তো আমরা গিয়ে তাকে প্রহারেণ য়্যান্টি-ক্ল্যাইম্যাক্স সৃষ্টি করব।

কিন্তু কিসে যে কি হ'ল তারা বুঝলে না। অভিনয় হ'ল মিলনান্ত। শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রহিল। অতএব তারা ধীরে ধীরে চরের উপর গেল।

তাদের পেয়ে জগন্নাথের রসবোধ বিকশিত হ'ল। সে বল্লে—এই যে শৈলপতিবাবু, আপনি কি সেজেছিলেন ?

শচীন্দ্রের সহজ-ভাব ফিরে এসেছিল। সে বল্লে—আমাদের কলেজের সেই বীণার ঝঙ্কার অভিনয়ের কথা হচ্ছিল।

—ওঃ! বীণার ঝঙ্কার! আমি সেজেছিলাম—

তাকে উপস্থিত বিপদের হাত থেকে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য নীলকমল বল্লে—তামাক।

৪

পরদিন প্রভাতে বন্ধুরা বল্লে—শচীন, তুমি চালিয়ে যাও। সাগরিকার মত প্রত্যুৎপন্নমতি নারী হিতোপদেশের বাইরে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

শৈলপতি বল্লে—আজ চমকদার মাদ্রাজী সাড়ি।

—কানে উড়িয়া মাকড়ি, ব্যাসর।—বল্লে পাঁচু।

—আজ আমরা রামছাগলকে ধরে স্বর্গদ্বারের ঘাটে গল্প করব—যতক্ষণ না তুমি এসে খবর দাও—কেল্লা ফতে।—বল্লে নীলু।

তিনজনে সমস্বরে বল্লে—চালাও ফটিকচাঁদ!

আজ মুগ্ধ করলে সাগরিকার সঙ্গীত শচীনকে। অনেক ভ্রমণ-বিলাসী পান্টি মেরে সে গান শুনলে।

গানের শেষে শচী তার সাড়ির সুখ্যাতি করলে। তার জননীর আদেশে তাকে অনেক মাদ্রাজী ও কট্‌কী সাড়ি কিন্‌তে হ'বে। বন্ধুদেরও অনেক জিনিস-পত্র কিন্‌তে হবে।

সাগরিকা তাদের সহায়তা কর্ত্তে সম্মত হ'ল। সে পাড় পছন্দ করবে, তার দাদা দর-দাম ঠিক্ ক'রে দেবে।

তার পর আসল কথা বল্লে শচী।

—আপনিও কায়স্থ, আমিও কায়স্থ।

কথার প্রত্যুত্তর দিলে সাগরিকার অমায়িক হাসি।

শচী বল্লে—আমার পিতা জমিদার। অতি-আধুনিক তাঁর মনোবৃত্তি, আর তেমনি দারুণ উদার।

সমাচারে কুমারীর হর্ষ হ'ল।

—তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন নিজের স্ত্রী মনোনয়ন করবার।

আনমনে সাগরিকা বল্লে—ভাল কথা। সুপাত্রী খুঁজুন। নিশ্চয় পাবেন।

একটু অসংযতভাবে শচীন্দ্রনাথ বল্লে—পেয়েছি সাগরিকা, পেয়েছি। শুভক্ষণে পুরী এসেছিলাম।

সাগরিকা তার প্রতি একটু কঠোরভাবে তাকালে।

—সাগরিকা, আমার অন্তরাত্মা শুন্‌ছে আশার উদাত্ত সুর, তোমার গানের সুরে।

—কি সব বলছেন ?

সে নিজের মনে বলে গেল—আমার যুগ-যুগান্তের জমাট-বাঁধা মূক কামনা আজ ভাষা পেয়েছে। সে জন্ম-জন্মান্তর তোমাকে খুঁজেছে।

সাগরিকার কথায় বোঝা গেল—জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তর বাজে। আসল বর্ত্তমান কাল—যার মধ্যে আরও আসল তার ভ্রাতার শুভাগমন।

সে বল্লে—এত বেলা হ'ল, দাদা এলেন না কেন ?

তার পর স্বর্গদ্বারের দিকে চলতে আরম্ভ করলে। চাবুক-খাওয়া ফক্স-টেরিয়ারের মত শচী তাকে অনুসরণ করলে।

কিছু দূর গিয়ে শচীন্দ্র বল্লে—মিস মল্লিক !

—কি বলছেন মিঃ মিত্র ?

সে বল্লে—যদি আমার মনের কথাগুলা লিখে দি আপনি পড়বেন ?

এবার সাগরিকা হাস্‌লে। সে বল্লে—বীণার ঝঙ্কারে ফটিকচাঁদের অভিনয় আপনি করেন ভাল। কেমন প্রেমের উপন্যাস লিখ্‌তে পারেন দেখাতে চান। বেশ লিখবেন।

সে আবার হাসলে—গালে টোল খাওয়া হাসি।:

—তুমি বড় নিষ্ঠুর সাগরিকা।

—তুমি বড় ছেলেমানুষ শচী।

তুমি ! শচী !

শচী বিশ্বাস করতে পারলে না। বল্লে—হ্যাঁ।

স্পষ্ট স্পষ্ট প্রত্যেক কথা উচ্চারণ ক'রে বল্লে সাগরিকা—তুমি বড় ছেলেমানুষ শচী। আমার বাবা আছেন। তিনি পাত্র খুঁজছেন। দাদাকে বল্লে তিনি বন্দোবস্ত করবেন। ছিঃ ! আমার বড় লজ্জা করছে—কি সব ছাইভস্ম বল্লাম।

দু হাতে চোখ ঢেকে সাগরিকা কিছুদূর চল্‌লো। শেষে একটা ঝিনুক কুড়িয়ে সাগরে ফেল্‌লে।

শচীন প্রথমে ডান পায়ে ভর দিয়ে ঘুরলে—তার পর বাঁ পায়ে। শেষে একটা তুড়িলাফ দিলে।

৫

বলরামপ্রসাদ সমুদ্রতীরে দেশী হোটেল। দেশী হোটেলের পাঁচ-সাত রকম গন্ধ এবং বহু কণ্ঠের শব্দবর্জ্জিত। কারণ ম্যানেজার পরিশ্রমী এবং হোটেলের দৈনিক ভাড়া অন্য পান্থ-নিবাস হ'তে অধিক।

কাকাতুয়া এবং রামছাগল পাশাপাশি দুটি কক্ষে বাস করছিল। উভয়ের ঘরের মাঝের দরজা খোলা—বাইরের দরজা বন্ধ। সমুদ্রের হাওয়া যুগল-ঘরের অবাধা জিনিষপত্র-গুলাকে যথাসম্ভব কাঁপাচ্ছিল।

সাগরিকা ছিল জগন্নাথের বাহুবন্ধনে।

জগন্নাথ বল্লে—মাই ডিয়ার পটলমণি, কাল উধাও হওয়া চাই।

সাগরিকা বল্লে—নরু আর দু-চার দিন থাকলে হয় না। জায়গাটা বেশ লাগছে।

নরু বল্লে—ঐ ছোঁড়াটাকে ভাল লাগছে বুঝি।

পটলমণি নরেন্দ্রের কান ধরে টান দিলে।

নরেন বল্লে—মাইরি। তোর মা তোকে সার্থক লেখা-পড়া শিখিয়েছিল। সাগরিকা—বেশ নাম। ঐ নামে বোম্বাই গিয়ে সিনেমা করলে কি হয় ?

সে বল্লে—জগন্নাথ নামটা তোমারও কি মন্দ হয়েছে ? বি-এ কি ক'রে পাশ করেছিলে ?

নরেন হাসলে। বল্লে—সে সব অতীতের কথা আর তোলো কেন অতি-প্রিয়। তার পর চিটিঙ্‌বাজী ক'রে ক'রে কলিকাতা ত্যাগ করলাম। তোমার মা তোমার মারফত বোকা রাজা-রাজড়া ধরবে বলে গান শেখালে, নাচ শেখালে, ম্যাট্রিক পাশ করালে। আমি হুমো পাখির মত তোমাকে উধাও ক'রে—

পটলমণি সস্নেহে তার মুখ টিপে ধরলে। বল্লে—অতীতকে কবর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ যা বর্ত্তমান কাল তা অতীত হবে।

—ঠিক্ বলেছ। এখানে চুরি-চামারি করে বোম্বাই পালিয়ে যাব। তুমি হ'বে সাগরিকা—

—তুমি বোকা। এই বল্‌ছ ছোঁড়া চারটের যা' কিছু আছে লুট্ করবে। ও নামে যে ওরা ধরবে।

নরেন হাসলে। হাসিতে পৈশাচিকতার আমেজ। সে বল্লে—বোকা তুমি। সেয়ানা ঠক্‌লে বাপকে বলে না। ওরা কি বাপকে বল্‌বে—ছদ্মবেশী জুয়াচোরের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে—

—বুঝেছি। বল্লে পটলমণি।

সে ভাবলে। তার জন্ম সম্ভ্রান্ত নয়। কিন্তু সে একনিষ্ঠ। তার জন্ম-দোষ মাত্র ঐতিহ্য—কবরে গেছে।

আজ সে জুয়াচোরের জীবনসঙ্গিনী। তারা অর্থসংগ্রহ করছে সম্ভ্রান্ততার ছাপ লাগিয়ে, বোম্বাই শহরে ফিল্ম তারকা হবার চেষ্টা করবে বলে। বোগাস চেক দিয়ে কাপড় কিনেছে। হোটেলওয়ালাকে বোগাস চেক দিয়ে টাকা নিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে খবর আসবার পূর্ব্বে পালাবে। পরে এ সব অতীতের মধ্যে ডুবে যাবে।

এই দুস্তর নীতি-সাগরে ভাসতে ভাসতে সে শচীন্দ্রকে স্মরণ করলে। নিরেট মূর্খ। অজ্ঞাতকুলশীলকে বিবাহ ক'রে ঘরে নিয়ে যাবার উচ্চাভিলাষ। কিন্তু সে নিজে খেলেছে ভাল।

যেন তার মনের কথা বুঝে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বল্লে—আমি হঠাৎ ওদের কথা শুনে ফেলেছিলাম। ষণ্ডা ছোঁড়াটা প্রেম-পাগলা। তাই তো তোমায় বল্লাম পটল, ওদের কাছে মেনকার পার্ট করতে। তোমারও অভিনয়-প্র্যাক্টিস হ'ল; আর ছোঁড়াও কাল আরও শিক্ষা পাবে—প্রেমের আসল কাঁটা কি ভীষণ।

৬

পরদিন ছোকরা-চতুষ্টয় শিক্ষা পেলে।

বন্ধুরা রাত্রে ফিরে এলো বেড়িয়ে। উড়ে চাকর তাদের হাতে পত্র দিলে। উপরে শচীন্দ্রের নাম। কোণে লেখা—ফ্রম—সাগরিকা মল্লিক।

লে বাবা! তারা এমন হর্ষ-ধ্বনি করলে যে সাগরের ঢেউ ভয়ে সাগরে পালিয়ে গেল। তার পর পত্র পাঠের আগ্রহ। তার পর—

কারণ পত্রে লেখা ছিল।

ফটিকচাঁদ,

এই পত্র পাঠান্তে যখন বাক্স-প্যাটরা খুলবে—বুঝবে পাপিষ্ঠা সাগরিকা ছলনা ক'রে বেয়ারাকে বাজারে পাঠিয়ে—তোমাদের যথা সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। মোট এক হাজার সাত টাকা তিন পয়সা। এ কথা উপলব্ধির পর তোমাদের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার সাগরের গর্জ্জনের সঙ্গে মিলে ঐক্যতান বাজবে—সে বিষাদ-বীণার সঙ্গীত অভাগিনী সাগরিকা শুনতে পেলে না। নমস্কার! অপরাধ নিও না। টাকা হাতের ময়লা, তার জন্য শোক ক'র না। ইতি— সাগরিকা

এক ঘণ্টা পরে যখন তাদের কথা ফুটলো—

কবি বল্লে—সোনা বলে জ্ঞান ছিল—

নীলু বল্লে—গরীবের ছেলে—মা'র কট্‌কি থালা কেনা হ'ল না।

পাঁচু বল্লে—দয়া ক'রে টিকিট ক'খানা রেখে গেছে।

শচী বল্লে—বাবাকে লেখ, তারে কিছু টাকা পাঠাতে—আর আমার জন্যে জানা-ঘরের শান্ত শিষ্ট পাত্রী দেখ্‌তে।

হায় রে নিষ্ঠুর প্রাণ! তবু নাহি মোর পানে চায়

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শৈশবের বেলাভূমে ওরা ছিল মোর নর্ম্মসাথী,
ওরা ছিল যৌবনের সহচরী—পুষ্পমাল্য গাঁথি'
বসন্তের সমীরণে গানে গানে আলোকধারায়
উহাদের সনে আমি হর্ষভরে প্রভাতী তারায়
প্রাণের চন্দন দিনু।
সেই কথা পড়ে মোর মনে—
ওরা কি ফিরিবে কভু অনাগত কোনো শুভক্ষণে?
একান্ত আগ্রহভরে ডাকিতেছি—ওরে ফিরে আয়,
হায়রে নিষ্ঠুর প্রাণ! তবু নাহি মোর পানে চায়।
অবাধ্য চঞ্চল ওরা চলিয়াছে দিবস-তরণী
দিগন্তের অন্তরালে, উর্ম্মিনাচে সুনীলবরণী।
অন্তরের পুষ্পপুঞ্জ সাজাইয়া দিয়েছি আমার,
বিনিময়ে দিয়ে গেছে স্মৃতিমাখা আলোক আঁধার।
ফিরিবে কেমনে ওরা?
ধরণীতে ফিরেছে কি কেহ!
ওরে তোরা ফিরে আয় তুলে নে রে মোর জীর্ণদেহ,
সম্মুখে আসিবে দিন পাল তুলে জীবনের ঘাটে,
কুড়ায়ে প্রাণের পণ্য ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর হাটে
উহাদের মত যাবে, চাহিবে না আমাদের পানে!
তারা কি দাঁড়াবে কভু ওরা সব মিশিবে যেথানে!
কালের বিহঙ্গ ওড়ে পক্ষ মেলি' বিশ্ব পারাবারে,
সৈকতে দাঁড়ায়ে একা, কোল দাও, দেবতা আমারে।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি, এফ্-আর-এ-এস্-বি, এফ্-আর-জি-এস্

ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে বর্ত্তমান বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের বাহিরে তাঁহার ধর্ম্ম বিশেষভাবে বিস্তৃত হয় নাই। এমন কি, যিশু খৃষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য-প্রদেশ, মথুরা ও উজ্জয়িনীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম সুবিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি উত্তর বাঙ্গালায়, নেপাল ও কাশ্মীরে, গান্ধার ও কাম্বোজে, সুরাষ্ট্র ও তাম্রপর্ণিতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করেন। ইহা ব্যতীত মিশর, সিরিয়া ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সুদূর দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। কেবল যে আফগানিস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহা নহে; মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতেও এই ধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যে সকল প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার নাম উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং গান্ধার ও কাশ্মীরে মধ্যন্তিক নামে একজন স্থবীর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। মহীশূর এবং কাশ্মীরে মহাদেব নামে একজন প্রচারক ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সুবর্ণভূমিতে সোণ-উত্তর ধর্ম্ম প্রচার করেন।

সুঙ্গদিগের ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। মধ্যদেশ হইতে জালান্ধর পর্য্যন্ত বহু বিহার ধ্বংস করেন এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণনাশ করেন। পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ কুক্কুট বিহার তিনি নষ্ট করেন এবং সাগল দেশের চতুর্দ্দিকস্থ দেশসমূহে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণ নাশ করেন। কাহারও কাহারও মতে নাগার্জ্জুন এবং অশ্বঘোষের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এই সকল ধ্বংস সংঘটিত হইয়াছিল। সুঙ্গদিগের সময়ে মধ্যদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের বিবরণ আমরা পাই; কিন্তু ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসী যবনদিগের রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল। রাজা মিনান্দর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ব্যাক্‌ট্রিয়ার যবনদিগের সময়ে বহু স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেকালের বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধের জীবনের ঘটনাসকল প্রস্তরসমূহে খোদিত ছিল। যিশু খৃষ্টের পূর্ব্বে ও পরে একশত শতাব্দীর মধ্যে মধ্যদেশে ভারুত ও সাঁচীতে বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ছিল।

সম্রাট কণিষ্কের পূর্ব্বে বৌদ্ধসঙ্ঘ আঠারটী দলে বিভক্ত ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে একটি নূতন যুগ আনয়ন করেন। তিনি বহু বিহার স্থাপন করেন এবং জালান্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। তাঁহারই রাজ্যে অশ্বঘোষ এবং নাগার্জ্জুন নামে দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বৌদ্ধসঙ্ঘের কলহের নিষ্পত্তির জন্য সম্রাট কণিষ্ক একটী সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং তিব্বতীদের মতে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের কলহ দূর করেন। নাগার্জ্জুন এবং অশ্বঘোষের সাহায্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এই সময়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পর্য্যটক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের চারিটী সম্প্রদায় তখন এখানে অবস্থিত ছিল, যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক। প্রথম দুইটী হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং শেষ দুইটী মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের পোষকতা করে। মথুরায় হীনযান এবং মহাযান বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞও বাস করিত। পাটলিপুত্রে একটী হীনযান এবং একটী মহাযান বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফা-হিয়ান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার মতে উদ্যান, পাঞ্জাব, মথুরা এবং প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম উন্নত ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রাবস্তী, সারনাথ, পাটলিপুত্র এবং আরও অনেক দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে কাবুল, কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল। কার্‌লি, নাসিক, অমরাবতী, জগয্যপেত, গোলি এবং নাগার্জ্জুনিকোণ্ডের গহ্বর হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এই ধর্ম্মের বহু উপাসক ছিল। পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সাতবাহন রাজাদের পরে ইক্ষ্বাকুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ

শতাব্দীতে পল্লব চোড় দেশে সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মদেশ ও মালয় দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারে পল্লব ও চোড়েরা বহু সাহায্য করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর একজন চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং নালন্দায় আসেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কনৌজ দেশের রাজা হর্ষ-বর্দ্ধন। এই চৈনিক পরিব্রাজকের মতে তক্ষশিলা হইতে পশ্চিমে পুণ্ড্রবর্দ্ধণ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিকে সমতট পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণভাগে চোড় দেশ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সুবিস্তৃত ছিল। ব্রাহ্মণ এবং জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করে। কাশ্মীর এবং দক্ষিণে বৌদ্ধ সঙ্ঘ প্রবল ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে তান্ত্রিক-দিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাল রাজাদিগের সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তান্ত্রিকদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়। মহাযান বৌদ্ধসঙ্ঘে তান্ত্রিকেরা অনেকগুলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে সাহায্য করিয়াছিল, যথা—যোগাচার, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান এবং বজ্রযান। পাল রাজাদিগের পর সেন রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি হইতেছিল। বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস হয়। বিক্রমশিলা এবং ওদন্তপুরীর সুপ্রসিদ্ধ বিহারদ্বয় নষ্ট হয়, বহুসংখ্যক ভিক্ষুর মৃত্যু হয় এবং বহু লোক বৌদ্ধ পুঁথি সঙ্গে লইয়া নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজে পলায়ন করে। কেহ কেহ উৎকল ও উত্তর ভারতে আশ্রয় লয়। মগধ দেশ হইতে যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পলায়ন করে তাহারা কলিঙ্গ এবং কোঙ্কানে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থিতি পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকলেও বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল। নেপালে বৌদ্ধ সাহিত্য অনেক আছে এবং বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য আছে। তিব্বতে বর্ত্তমানে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা কাহারও কাহারও মতে তান্ত্রিকদিগের ধর্ম্মের ন্যায়।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য সম্রাট অশোক বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর ধর্ম্মপ্রচারকগণ, রাজন্যবর্গ এবং বণিকগণ এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। যবন দেশে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক মহারক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। সম্রাট অশোকের চেষ্টায় যে সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত লান্‌কিও দেশে এক শত সঙ্ঘারাম ছিল এবং ছয় হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু হীনযান ও মহাযান অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিল। পার্থিয়ায় একজন যুবরাজ বৌদ্ধ শ্রমণ হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আরবী পণ্ডিত আল্‌বেরুণী বলেন যে পুরাকালে খুরাসান, পারস্য, ইরাক, মজুল এবং সিরিয়ার প্রত্যন্ত দেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। পরে বৌদ্ধদিগকে এই সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাল্‌খের পূর্ব্বদিকস্থ কতকগুলি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সম্রাট অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকের চেষ্টায় আফগানিস্থানের অন্তর্গত কতকগুলি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারিত হয়। গান্ধার, যবন এবং কাম্বোজদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সম্রাট তাঁহার ধর্ম্মমহামাত্রদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। স্থবীর মধ্যন্তিক কাশ্মীরে ও গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন্। কুশান রাজাদিগের সময়ে মধ্য ও পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকস্থ উচ্চস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। সিথিয়া-পার্থিয়া এবং কুশান রাজাদিগের মুদ্রা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আফগানিস্থানের কতকগুলি দেশে বিশেষভাবে ছিল। সম্রাট কণিষ্ক বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, এবং নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আফগানিস্থানের বহু স্থান হইতে বহু স্তূপ ও মৃত্তিকাপাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মৃত্তিকা পাত্রে কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দাতার নামোল্লেখ আছে। এই দাতা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ সিথিয়াবাসী, কেহ কেহ যবন এবং কেহ কেহ ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসী। আফগানদেশ হইতে খরোষ্ঠী ধর্ম্মপদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। জালালাবাদে এবং হেড্ডার নিকটে কাপিশার উপত্যকায় বহু বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে। হেড্ডায় যে সমস্ত ভগ্ন স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গান্ধার স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। কাবুলের অন্তর্গত কোহিস্থানে একটী বৌদ্ধ নগরের স্মৃতি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পর্য্যটক ফা-হিয়ান ভারত পরিদর্শন করেন, তখন গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল; কিন্তু

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হূনদিগের অত্যাচারে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কীরা বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়ক ছিলেন। তুর্কীদিগের একজন নেতা প্রভাকর মিত্র নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যথেষ্ট সমাদর করেন। বাল্‌খ দেশ বৌদ্ধশিক্ষার একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এখানে বহু বিহার ছিল এবং বিহারের মধ্যে নববিহার উল্লেখযোগ্য। বামিয়ান দেশে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ছিল এবং এই বিহারে লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের ভিক্ষু বাস করিত। কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বামিয়ানের রাজা একজন প্রগাঢ় বৌদ্ধ ছিলেন। লম্পক দেশে কতকগুলি বিহার ছিল এবং এই সকল বিহারে মহাযান বৌদ্ধভিক্ষুরা বাস করিত।

ইৎসিং নামে একজন চৈনিক পর্য্যটক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার মতে সমরকন্দের কোন একজন লোক মহাবোধি তীর্থে গমন করেন। তোখারিস্থানবাসীরা পূর্ব্ব ভারতের কোন একটী স্থানে যাত্রীর বাসের জন্য আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। জগুড়দেশের কতকগুলি বণিক যাত্রীর সুবিধার জন্য মহাবোধিতে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই সকল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব্ব-ভারতের সহিত পশ্চিম-ভারতের বৌদ্ধদের একটী নিকট সম্বন্ধ ছিল।

মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত চীন তুর্কীস্থানের অধিকাংশ স্থান মরুভূমিময়। তালামাকান এবং লোপ মরুভূমি সুবিস্তৃত। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাসগড়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। এই দেশের লোকরা বৌদ্ধ ছিল এবং সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অনেকগুলি ভিক্ষু এখানে বাস করিত। ইয়ারকন্দ এবং খোটানে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতি লাভ করে। এখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উপাসক ছিলেন। তোখারায় এবং সমরকন্দে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

খাসগড় ও তুরকানের মধ্যভাগে কাচনগর অবস্থিত। এখানে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু কুমারজীব লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে চীনভাষায় কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন। ক্রমে কাচ মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের একটী কেন্দ্র হইয়াছিল। চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং-এর মতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল এবং অনেক বিহার ও বৌদ্ধমূর্ত্তিও ছিল।

তুরকান নামে আর একটী সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এইস্থান হইতে সংস্কৃত, চীন ও অন্য ভাষায় লিখিত বৌদ্ধপুঁথি পাওয়া যায়। ফাহিয়ানের সময়ে খোটানে বহুসংখ্যক মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষু ছিল। ফাহিয়ান এখানে কোন একটী বিহারে বাস করিতেন এবং এই বিহারে আরও তিন হাজার ভিক্ষু ছিল। এব-নর হ্রদের নিকটে দুইটী স্থান স্যার অরেল স্টাইন আবিষ্কার করেন। এই স্থান দুইটীতে এক সময়ে উন্নত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে অনেক তিব্বতীয় এবং প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়, যথা—খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত প্রাকৃত ধর্ম্মপদের পুঁথি, সারিপুত্র-প্রকরণ, অশ্বঘোষ বিরচিত সৌন্দরানন্দকাব্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উদানবর্গের পুঁথি, সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের পুঁথি ইত্যাদি।

আগামী বারে সমাপ্য

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

তিন

বেশ পরিপাটি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকাতে নতুন জল সাজিয়া পদ্ম স্বামীর আহার-শেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনিরুদ্ধের খাওয়া শেষ হইতেই হাতে জল তুলিয়া দিয়া হুঁকাটি তাহার হাতে দিল—খাও।

টানিয়া বেশ গল-গল করিয়া যখন অনিরুদ্ধ নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়াছে, তখন সে বলিল—আমার কথাটা ভেবে দেখ। রাগ এখন একটু পড়েছে তো!

—রাগ? অনিরুদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুইটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে;—এ রাগ আমার তুষের আগুন, জনমে নিববে না। আমার দু-বিঘে বাকুড়ির ধান—; কথা সে শেষ করিতে পারিল না, পদ্মের ডাগর চোখ দুটি তখন নিরুদ্ধ অশ্রুতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—মুহূর্তে ফোঁটা কয়েক জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার বলিল—কাঁদছিস কেন তুই? দু-বিঘে জমির ধান গিয়েছে যাকগে! আমি তো আছি রে বাপু! আর দেখ না—কি করি আমি!

চোখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম বলিল—কিন্তু থানা-পুলিস ক'র না বাপু! তোমার দু-টি পায়ে পড়ি আমি। ওরা সাপ হয়ে দংশায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে। আমার বাপের ঘরে ডাকাতি হ'ল—বাবা চিনলে একজনাকে, কিন্তু পুলিস তার গায়ে হাত দিলে না। অথচ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল বাবার। মেয়ে ছেলে গুষ্টি সমেত নিয়ে টানাটানি, একবার দারোগা আসে, একবার নেস্‌পেকটার আসে, একবার সায়েব আসে—আর দাও এজাহার। তার পরে ক'জনাকে কোথা হতে ধরলে, তাদিগে সনাক্ত করতে জেলখানা পর্য্যন্ত মেয়ে-ছেলে নিয়ে টানাটানি। তা ছাড়া গালমন্দ আর ধমক।

—হুঁ। চিন্তিতভাবে হুঁকায় গোটা কয়েক টান দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কিন্তু এর একটা বিহিত করতে তো হবে। আজ না হয় দু-বিঘে জমির ধান গেল। কাল আবার পুকুরের মাছ ধ'রে নেবে—পরশু ঘরে—

—অনি ভাই রয়েছ নাকি? অনিরুদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে গিরীশ ডাকিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম আধ-ঘোমটা টানিয়া এঁটো বাসন কয়খানি তুলিয়া লইয়া খিড়কির ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দু-বিঘে বাকুড়ির ধান একবারে শেষ ক'রে কেটে নিয়েছে, একটি শীষ প'ড়ে নাই।

গিরীশও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুনলাম।

—থানায় ডায়রী করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বউ বারণ করছে। বলছে, ছিরু পাল চুরী করেছে—এ কথা বিশ্বাস করবে কেন! আর গায়ের লোকও তো আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।

—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যেতে আবার নাকি চণ্ডীমণ্ডপে জটলা হয়েছিল। আমরা নাকি অপমান করেছি গায়ের লোকদের। জমিদারের কাছে নালিশ করবে শুনছি।

ঠোঁটের একদিক বাঁকাইয়া অনিরুদ্ধ এবার বলিয়া উঠিল—যা-যা! জমিদার! জমিদার আমার কচু করবে!

কথাটা গিরীশের খুব মনঃপূত হইল না, সে বলিল—তাই ব'লেই বা আমাদের দরকার কি। জমিদারেরও তো বিচার আছে, তিনিই বিচারই করুন কেন!

অনিরুদ্ধ বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—উঁহু! ছাই বিচার করবে। জমিদার নিজেই আজ তিন বছর ধান দেয় নাই। জমিদার ঠিক ওদের রায়ে রায় দেবে; তুমি জান না।

বিষণ্ণভাবে গিরীশ বলিল—আমি পাই নাই চার বছর।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই দেখ ভাই, যখন বলেছি মুখ ফুটে—করব না, তখন আমার মরা-বাপ এলেও আমাকে করাতে পারবে না; তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক। তুমি ভাই এখনও বুঝে দেখ।

গিরীশ বলিল—সে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। তুমি না মিটোলে আমি মি-টোব-না!

অনিরুদ্ধ প্রীত হইয়া কল্কেটি তাহার হাতে দিল। গিরীশ হাতের ছাঁদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নই, জমিদার ক'জনার বিচার করবে করুক না! নাপিত-বায়েন-দাই-চৌকিদার নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার—সবাই ধুয়ো ধরেছে, ও ধান নিয়ে কাজ আমরা করতে পারব না। তারু নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জ্জুনতলায় এক ইট পেতে বসেছে— বলে, পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ কল্কেটি ঝাড়িয়া আবার নতুন করিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—তা বইকি! পয়সা ফেল, মোয়া খাও; আমি কি তোমার পর!

গিরীশের কথাবার্ত্তার মধ্যে বেশ একটি বিজ্ঞতা প্রচারের ভঙ্গি থাকে, এটা তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে, সে বলিল—এই কথা। আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কাল ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল—তখন ধান নিয়ে কাজ ক'রে আমাদের পুষিয়েছে—আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়!

বাহিরে রাস্তায় ঠুন-ঠুন করিয়া বাইসিক্লের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—অনিরুদ্ধ!

ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ।

অনিরুদ্ধ গিরীশ দুজনেই বাহির হইয়া আসিল। মোটাসোটা খাটো লোকটি, মাথায় বাবরি চুল—জগন্নাথ ঘোষ বাইসিক্ল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার কোথাও পড়িয়া শুনিয়া পাস করে নাই, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিনপুরুষের বংশগত বিদ্যা; পিতামহ ছিলেন কবিরাজ, বাপ জেঠা ছিলেন কবিরাজ এবং ডাক্তার একাধারে দুই; জগন্নাথ কেবলই ডাক্তার, তবে সঙ্গে দুই-চারিটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দেয়—তাহাতে চট করিয়া ফলও হয় ভাল। গ্রামের সকল লোকই তাহাকে দেখায়, কিন্তু পয়সা বড় কেহ দেয় না। ডাক্তার তাহাতে খুব গররাজী নয়, ডাকিলেই যায়, বাকীর উপরেই বাকী দেয়। ভিন্ন গ্রামেও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পসার আছে—সেখানকার রোজগারেই তাহার দিন চলে। কোন দিন শাক ভাত, আবার কোন দিন যাহাকে বলে এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জন, যেদিন যেমন রোজগার। এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিবান প্রতিষ্ঠাশালী লোক ছিল। ধনীর গ্রাম কঙ্কনায় পর্য্যন্ত যথেষ্ট সম্মান মর্য্যাদা পাইত; কিন্তু ওই কঙ্কনার লক্ষপতি মুখুজ্জেদের এক হাজার টাকা ঋণ ক্রমে চারি হাজারে পরিণত হইয়া ঘোষেদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়াছে। এই সম্পত্তি এবং সেকালের-সম্মানিত প্রবীণগণের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সে সম্মান মর্য্যাদা চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ অকাতরে চিকিৎসা এবং ঔষধ সাহায্য করিয়াও সে সম্মান ফিরিয়া পায় নাই। সে কাহাকেও রেয়াত করে না, রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চকণ্ঠে বলে—চোরের দল সব, জানোয়ার! গোপনে নয়, সাক্ষাতেই বলে। তাহাদের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও অতি কঠিন প্রতিবাদ সে করিয়া থাকে।

অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ বাহির হইয়া আসিতেই ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলিল—থানায় ডায়রী করলি?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে তাই—

—তাই আবার কিসের রে বাপু? যা, ডায়রী ক'রে আয়।

—আজ্ঞে, বারণ করছে সব; বলছে—ছিরু পাল চুরী করেছে—কে একথা বিশ্বাস করবে।

—কেন? ও বেটার টাকা আছে ব'লে?

—তাই তো সাত-পাঁচ ভাবছি ডাক্তারবাবু।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া জগন্নাথ বলিল—তা হ'লে এ সংসারে যাদের টাকা আছে তারাই সাধু-আর গরীব মাত্রেই অসাধু নাকি? কে বলছে এ কথা?

অনিরুদ্ধ এবার চুপ করিয়া রহিল, বাড়ীর ভিতরে বাসনের টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পদ্ম ফিরিয়াছে, সব শুনিতেছে। উত্তর দিল গিরীশ, গিরীশ বলিল—আজ্ঞে, ডায়রী ক'রেই বা কি হবে ডাক্তারবাবু, ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া থানার জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাব। এক সঙ্গে মদ-ভাং খায়—তারপর—

ডাক্তার বলিল—জানি আমি। কিন্তু দারোগা টাকা খেলে—তারও উপায় আছে। বাবারও বাবা আছে। দারোগা টাকা খায়—পুলিসসায়েব আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। তার ওপরে কমিশনার আছে। তার ওপরে ছোটলাট, ছোটলাটের ওপরে বড়লাট আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তা তো বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু মেয়ে-ছেলেকে এজাহার ফেজাহার দিতে হবে, সেই হাঙ্গামার কথা আমি ভাবছি!

—মেয়েদের এজাহার? ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মাঠে ধান চুরী হয়েছে তাতে মেয়ে-ছেলেকে এজাহার দিতে হবে কেন? কে বললে? এ কি মগের মুলুক না কি?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল।—তা হ'লে আমি আজ্ঞে এই এখুনি চললাম।

ডাক্তারও বাইসিক্লে উঠিয়া বলিল—যা, তুই নির্ভাবনায় চলে যা। আমি ও-বেলা থানায় যাব। চুরী করবার জন্যে ধান কেটে নিয়েছে এ কথা বলবি না; বলবি—আক্রোশ্ বশে আমার ক্ষতি করবার জন্যে চুরী করেছে।

অনিরুদ্ধ আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল না পর্য্যন্ত, পাছে পদ্ম আবার বাধা দেয়। সে ডাক্তারের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিল, গিরীশকে বলিল—গিরীশ, কামার-শালের চাবীটা নিয়ে এস তো ভাই, চেয়ে।

ও-পারের জংশনের কামারশালার চাবী। গিরীশকে ভিতরে ঢুকিয়া চাহিতে হইল না, দরজার আড়াল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবীটা আসিয়া তাহার সম্মুখে প'ড়িল। গিরীশ হেঁট হইয়া চাবীটা তুলিতেছিল—পদ্ম দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—ডাক্তার ও অনিরুদ্ধ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। সে এবার আধ-ঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া বলিল—একবার ডাক' ওকে।

মুখ তুলিয়া একবার পদ্মের দিকে একবার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া গিরীশ বলিল—পেছন ডাকলে ক্ষেপে যাবে।

—তা তো যাবে। কিন্তু ভাত, ভাত নিয়ে যাবে কে? আজ কি খেতে-দেতে হবে না!

গিরীশ ও অনিরুদ্ধ সকালে উঠিয়া ও-পারে যায়—তাহার পূর্ব্বেই তাহাদের ভাত হইয়া থাকে—যাইবার সময় সেই ভাত তাহারা লইয়া যায়। সেই খাইয়াই তাহাদের দিনটা কাটে। রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া খায়। গিরীশ বলিল—আমাকেই দাও, আমিই নিয়ে যাই।

* * *

সংসারে পদ্ম একা মানুষ। বৎসর দুয়েক পূর্ব্বে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর হইতেই সমস্ত দিনটা তাহাকে একা কাটাইতে হয়। সে নিজে বন্ধ্যা। পল্লীগ্রামে এমন অবস্থায় একটি মনোহর কর্ম্মান্তর আছে—পাড়া-বেড়ানো। কিন্তু পদ্মের স্বভাব যেন উর্ণনাভ-গৃহিণীর মত। সে সমস্ত দিন আপনার গৃহস্থালীর জাল বুনিয়াই চলিয়াছে। ধান-কলাই রৌদ্রে দিতেছে, সেগুলি তুলিতেছে, মাটি ও কুড়ানো ইটে ঘরে বেদী বাঁধিতেছে; ছাই দিয়া মাজিয়া তোলা বাসনের ময়লা তুলিতেছে—শীতের লেপ কাঁথাগুলি পাড়িয়া নতুন পাট করিতেছে; ইহা ছাড়া—নিয়মিত কাজ—গোয়াল পরিষ্কার, জাব কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, তিন-চারবার বাড়ী ঝাঁট দেওয়া তো আছেই।

আজ তাহার কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। সে খিড়কির ঘাটে গিয়া পা-ছড়াইয়া বসিল। অনিরুদ্ধকে থানায় যাইতে বারণ করিয়াছে, হাসিমুখে রহস্য করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সে কেবল ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণের জন্য। অন্য দিকে দু-বিঘা বাকুড়ির ধানের জন্য তাহার দুঃখের সীমা ছিল না। আপন মনেই সে মৃদুস্বরে ছিরু পালকে অভিসম্পাত দিতে সুরু করিল।

—কাণা হবেন—কাণা হবেন—অন্ধ হবেন তিনি;—হাতে কুষ্ঠ হবে, সর্ব্বস্ব যাবে—ভিক্ষে ক'রে ক'রে খাবেন।

সহসা কোথায় প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে মনে হইল। পদ্ম কান পাতিয়া শুনিল। গোলমালটা বায়েনপাড়ায় মনে হইতেছে। প্রচণ্ড রূঢ় কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় কে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। ওই ছোঁয়াচটা যেন পদ্মকে লাগিয়া গেল। সেও এবার উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া শাপ-শাপান্ত আরম্ভ করিল—

—জোড়া বেটা ধড়ফড় করে মরবে, এক বিছানায় এক-সঙ্গে। আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নির্ব্বংশ হবেন—নির্ব্বংশ হবেন। নিজে মরবেন না, কাণা হবেন—দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথাসর্ব্বস্ব উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে।

বেশ হিসাব করিয়া—ছিরু পালের সহিত মিলাইয়া সে শাপ শাপান্ত করিতেছিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল খিড়কির পুকুরের ও-পারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিরু পাল গালি-গালাজগুলি বেশ উপভোগ করিয়া হাসিতেছে। ছিরু এইমাত্র পাতুবায়েনকে মারপিট করিয়া ফিরিতেছিল, বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই বিক্রমোদ্ভূত। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর শাপ-শাপান্ত শুনিয়া দাঁড়াইয়া

হাসিতেছিল। সে হাসির মধ্যে অন্য একটা ক্রূরপ্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল। পদ্ম দেখিয়া উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে না কি? কিন্তু দিবালোককে তাহার বড় ভয়। সে স্পন্দিত বক্ষে চিন্তা করিতেছিল। সহসা পদ্মর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু একটা কিসের প্রতিবিম্বিত আলোকচ্ছটা তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

—ধার পরীক্ষে করতে এক কোপে দুটো পাঁটা কেটে আমার কাজ বাড়িয়ে গেলেন পুরুষ। রক্তের দাগ ধোয়া নাই—ঘরে ভ'রে রেখে দিয়েছে। আমি এখন ব'সে ব'সে ঝামা ঘষি!

পদ্মের হাতে একখানা বগি দা। রোদ পড়িয়া ঝকমক করিতেছে, তাহারই ছটা আসিয়া চোখে পড়িতেই ছিরু পাল চোখ ফিরাইয়া লইল। পরক্ষণেই সে দুম দুম শব্দে পা ফেলিয়া আপনার বাড়ীর দিকে পথ ধরিল। পদ্মের মুখে নিষ্ঠুর কৌতুকের একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চার

কালীপুরের চাষের মাঠ অধিকাংশই গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে। শিবপুর, কালীপুরের উত্তর গায়েই একটি দীঘির ওপারে অবস্থিত—উত্তরের মাঠটা সমস্তটাই শিবপুরের সীমানা—পূর্ব্বদিকে ও উত্তর দিকের অর্দ্ধেকটা শিবপুরের সামিল। উত্তর-পশ্চিমে যে গ্রামের মাঠ, সে গ্রামে নাকি লক্ষ্মী বসতি করেন না, গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যে গ্রামের চাষের সীমানা—সেখানে নাকি লক্ষ্মীর অপার করুণা। অন্তত প্রবীণেরা তাই বলে। মাঠ উত্তর এবং পশ্চিম দিকে হইলে দেখা যায়—গ্রাম অপেক্ষা মাঠ উঁচু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য—দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে কৃষিক্ষেত্র হইলে—গ্রামের জলটুকু সমস্তই মাঠে গিয়া পড়ে; গ্রাম ধোয়া জলের উর্ব্বরতা প্রচুর। ইহা ছাড়াও গ্রামের পুকুরগুলির জলের সুবিধা ষোল আনা পাওয়া যায়। এই কারণে শিবপুর এবং কালীপুর পাশাপাশি গ্রাম হইলেও দুই গ্রামের জমির দামের অনেক প্রভেদ। কালীপুরের লোকের অনেক অহঙ্কার—শিবপুরের লোকে সহ্য করিয়া থাকে। অথচ একদিন শিবপুরের অধিবাসী চৌধুরীদেরই জমিদারী ছিল কালীপুর। দ্বারকা চৌধুরী সেই বংশোদ্ভূত। চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারকা চৌধুরীরও একপুরুষ পূর্ব্বের ঘটনা। চৌধুরীরা সে কথা এখন ভুলিয়া গিয়াছে, কোন দুঃখও হয় না—আভিজাত্যের কোন ভাণও নাই। এ অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে সমান ভাবেই মেলামেশা করেন, এক মজলিসে বসিয়া তামাক খান—সুখ-দুঃখের গল্প করেন। তবে চৌধুরীর কথাবার্ত্তার সুরের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। চৌধুরী কথা খুব কম বলেন, যেটুকু বলেন সেও অতি ধীর মৃদু স্বরে। কথার প্রতিবাদ করিলে চৌধুরী তাহার প্রতিবাদ আর করেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীর কথা স্বীকার করিয়া লন, কোন ক্ষেত্রে চুপ করিয়া যান, কোন ক্ষেত্রে মজলিস হইতে চলিয়া আসেন। মোট কথা চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। তিনটি ছেলে। বড় ছেলেটি দস্তুর হইয়াও মূর্খ। সে গাঁজা খায়—গরুবাছুর লইয়া থাকে, গর্দ্দভের মত নির্ব্বোধ—তবে তেমন করিয়া চীৎকার করে না; কেবল অতি সামান্য কারণেই হাতের আড়াল দিয়া হি-হি করিয়া প্রচুরেরও অতিরিক্ত পরিমাণে হাসে। মেজটিও দস্তুর, আকারেও খুব দীর্ঘ—সে চাষবাস দেখিতে বাপকে সাহায্য করে—এবং দু-দশ টাকা লইয়া খুব গোপনে অতিদরিদ্রদের মধ্যে সুদী কারবার করে; তাহার আশা অনেক—তিল কুড়াইয়া তাল নয়—পাহাড় গড়িবে—তাহাদের পূর্ব্বসম্পদ ফিরাইয়া আনিবে। ছোটটি দস্তুর নয়—সুশ্রী সবল তরুণ কিশোর, ম্যাট্রিক পাস করিয়া—নিজের উদ্যমে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া আই-এ পড়িতেছে।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সকালেই ছাতাটি মাথায়—বাঁশের লাঠিটি হাতে করিয়া কালীপুরের দক্ষিণ মাঠে নদীর ধারে রবি-ফসলের চাষের তদ্বিরে চলিয়াছিলেন। কালীপুরের জমিদারীর স্বত্ব চলিয়া গেলেও—সেখানে মোটা জোত এখনও আছে। কালীপুরের দক্ষিণ মাঠটির নাম 'অমরকুণ্ডার মাঠ'; অর্থাৎ এখানকার ফসল কখনও মরে না; এ মাঠের হাজা-শুকা নাই। মাঠটির মাথায় বেশ বিস্তৃত দুইটি ঝর্ণার জলা আছে; প্রশস্ত একটি অগভীর জলা হইতে নালা বাহিয়া অবিরাম জল বহিয়া চলিয়াছে; অথচ জলাটি কাণায় কাণায় অহরহই পরিপূর্ণ। জল কখনও শুকায় না; এই ধারাই অমরকুণ্ডার

মাঠের উপর ধরিত্রী মাতার বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা। নালা বাহিয়া জল একেবারে নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। জলাভাবের সময় নালায় বাঁধ দিয়া যাহার যেদিকে প্রয়োজন—জল-স্রোতকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়। অগ্রহায়ণের প্রথম, হৈমন্তী ধান পাকিতে সুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের একপ্রান্ত হইতে শেষপ্রান্তে নদীর বাঁধের কোল পর্য্যন্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ের অপূর্ব্ব শোভা। ধানের প্রাচুর্য্যে মাঠের আল পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্ণার নালার দুই পাশের বিসর্পিল বাঁধের উপরের তালগাছগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে উর্দ্ধলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজও শরতের নীলের আমেজ রহিয়াছে; এখনও ধূলা উড়িতে আরম্ভ করে নাই। দূরে আবাদী মাঠের শেষ প্রান্তে নদীর বন্যারোধী বাঁধের উপর ঘন সবুজ শরবন একটা সবুজ রঙের সুদীর্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় চুণকাম করা আলিসার মত চাপ বাঁধিয়া সাদা ফুল দেখা দিয়াছে। কালীপুরের পশ্চিম দিকে—সম্ভ্রান্ত ধনীদের গ্রাম কঙ্কনা; গ্রামবনরেখার উপরে সাদা-লাল-হলুদ রঙের দালানগুলির মাথা দেখা যাইতেছে। একেবারে ফাঁকা প্রান্তরে ইস্কুল—হাসপাতাল—বাবুদের থিয়েটারের ঘর—পরিষ্কার আগাগোড়া দেখা যায়। বাবুরা হালে ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন টাকায় এক পয়সা; টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা পাইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্ব্বণ উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার হয়। চৌধুরী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস। বৎসরে দেড় টাকা দুই টাকা তাঁহাকে ঐ ঈশ্বরবৃত্তি দিতে হয়। অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে, জলের মধ্যে মাঠে প্রচুর মাছ জন্মায়; আল কাটিয়া দিয়া কাটের মুখে ঝুড়ি পাতিয়া হাড়ী বাউড়ী ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেতের মধ্যেও অনেকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দেখা যায় না—কেবল ঘন ধানগাছগুলি চিরিয়া একটা চলন্ত রেখা দেখা যায়, যেমন অগভীর জলের ভিতর মাছ চলিয়া গেলে জলের উপর একটা রেখা জাগিয়া ওঠে। অনেকে ঘাস কাটিতেছে; কাহারও গরু আছে—কেহ ঘাস বেচিয়া দুই-চারি পয়সা রোজগার করে।

অমরকুণ্ডার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত আলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার পথ; প্রশস্ত অর্থে একজন বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, দুইজনে কষ্টেও চলিতে পারে; এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরুবাছুর নদীর ধারে চরিতে যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিলেন—গরু-গুলির মুখের জাল খুলিবার মত গো-চরও আর রহিল না। বাঁধের ওপাশে নদীর চর ভাঙিয়া রবিফসলের চাষের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায়ও ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্দ্ধেকের উপর জমি কঙ্কনার বিভিন্ন ভদ্রলোকের অধীনে চলিয়া গিয়াছে। অনেক চাষীর জমি আর একেবারেই নাই। তাহারাই প্রথম নদীর ধারে গো-চর ভাঙিয়া রবিফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখা-দেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য চরের জমি খুবই উর্ব্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া—পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা ফসলের কাণ্ড বাহিয়া শীষের মধ্যে ফলিয়া ওঠে। গম-সরিষা প্রচুর হয়; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলাকুঁড়ি' বা ছোলাকুণ্ড। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশী। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়। নদীর ওপারের জংশনে আলুর বাজারও ভাল। কলিকাতা হইতে মহাজনেরা ওখানে আলু কিনিতে আসে। এ কয়মাসের জন্য তাহাদের এক একজন লোক আড়ত খুলিয়া বসিয়াই আছে—আলু লইয়া গেলেই টাকা। মোটা চাষী যাহারা, তাহারা বিশ-পঞ্চাশ টাকা দাদনও পায়। সকলের টানে চৌধুরীকেও গো-চর ভাঙিয়া আলু-গম-ছোলার চাষ করিতে হইতেছে। চারিপাশে ফসলের মধ্যে তাঁহার গো-চরে গরু চরানো চলে না; অবুঝ অবোলা পশু কখন যে ছুটিয়া গিয়া ফসলের উপর পড়িবে—সে কি বলা যায়! তাহার উপর অমরকুণ্ডার মাঠে দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কনার ভদ্রলোকের জমি সব পড়িয়া থাকে, তাহারা রবিফসলের হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না; আর খইল-সারেও টাকা খরচ তাহারা করিবে না। কাজেই তাহাদের জমি ধান কাটার পর পড়িয়াই থাকে। অধিকাংশ জমি চাষ হইলে—সেখানে জমি পতিত

রাখিয়া গরু চরানো যেমন অসম্ভব, অধিকাংশ জমি পতিত থাকিলে—সেখানে জমি চাষ করাও তেমনি অসম্ভব। গরু ছাগলকে আগলাইয়া পারা যায়; কিন্তু মানুষ ও বানরকে পারা যায় না। খাইয়াই শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু কালীপুরের দোয়েম—সোনার দোয়েম!

কি কাল যুদ্ধই না ইংরেজরা করিল জর্মানদের সঙ্গে। সমস্ত একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। দুঃখ দুর্দ্দশা সব কালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত আর কখনও হয় নাই। কাপড়ের জোড়া ছ-টাকা, ওষুধ অগ্নিমূল্য —মায় সূচের দাম চার গুণ হইয়া গিয়াছে। ধান চালের দরও বাড়িয়াছে—কিন্তু কাপড় চোপড়ের সমান কি? জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কনার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল। আজ আপশোষ করিলে কি হইবে! মরুক হতভাগারা মরুক! অঃ—সেই তেরশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে কয়েক বছর আগে; আজ তেরশো উনত্রিশ সাল—আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কনার বাবুরা ধূলার মুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে—আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধূলা বই কি। মাটি কাটিয়া কয়লা ওঠে—সেই কয়লা বেচিয়া পয়সা। যে কয়লার মণ ছিল তিন আনা চৌদ্দ পয়সা—সেই কয়লার দর আজ চৌদ্দ আনা! গোদের উপর বিষ-ফোড়ার মত—এই বাজারে আবার পঞ্চায়েত বসাইয়া ট্যাক্স চড়াইয়া দিল। ইউনিয়ন বোর্ড! বাবুরা সব পঞ্চায়েত সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল —আর তোমরা এখন দাও ট্যাক্স! ট্যাক্স আদায়ের ধুন কি? চৌকিদার দফাদার সঙ্গে লইয়া বাঁধানো খাতা বদলে দুগাই মিস্ত্রি যেন একটা লাটসাহেব!

সহসা চৌধুরী চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কে কোথায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না? লাঠিটি বগলে পুরিয়া রৌদ্রনিবারণের ভঙ্গিতে ভ্রূর উপরে হাতের আড়াল দিয়া এপাশ ওপাশ দেখিয়া চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ পিছনেই বটে। ওই গ্রামের মুখে কয়জন লোক আসিতেছে, উহাদেরই ভিতর কেহ কাঁদিতেছে। যে কাঁদিতেছে—সে স্ত্রীলোক, তাহাকে দেখা যাইতেছে না, সামনের পুরুষটির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। আ-হা-হা! পুরুষটা কেউটে সাপের মত ফিরিয়া মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া দুম-দাম করিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। চৌধুরী এখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—এই, এই; আ-হা-হা! ওই!

তাহারা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি চীৎকার বন্ধ করিল; পুরুষটিও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। চৌধুরী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া —আবার রওনা হইলেন। ছোটলোক কি সাধে বলে! লজ্জা-সরম, রীত-করণ উহাদের হইলও না—হইবেও না। স্ত্রীলোকের চুলে হাত দিলে শক্তি ক্ষয় হয়। রাবণ যে রাবণ, যাহার দশটা মুণ্ড, কুড়িটা হাত, এক লক্ষ ছেলে—একশ লক্ষ নাতি, সীতার চুলের মুঠি ধরিয়া—একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গেল।

বাঁধের কাছাকাছি চৌধুরী পৌছিয়াছেন—এমন সময় পিছনে পদশব্দ শুনিয়া চৌধুরী ফিরিয়া দেখিলেন। পাতু বায়েন হন হন করিয়া বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। পিছনে কিছুদূরে ধুপ্ ধুপ্ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে একটি স্ত্রীলোক। বোধ হয় পাতুর স্ত্রী। সে এখনও গুন গুন করিয়া কাঁদিতেছে—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিতেছে। চৌধুরী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাতু যে গতিতে আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া না দিলে উপায় নাই। উহার আগে আগে চলিবার শক্তি চৌধুরীর নাই। পাতু কিন্তু নিজেই পথ করিয়া লইল, সে পাশের জমিতে নামিয়া পড়িয়া ধানের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌধুরীকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—দেখেন চৌধুরী মশায়, দেখেন!

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কপালে একটা সদ্য ঘাতচিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানা রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে।

—ওগো, বাবুমাশায় গো! খুন করলে গো! সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—এ্যা-ও! পাতু গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আবার চেঁচাতে লাগলি মাগী?

সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল; সে গুন গুন করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গরীবের কি দশা করেছে দেখেন গো; আপনারা বিচার করেন গো!

পাতু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিঠ দেখাইয়া বলিল—দেখেন, পিঠ দেখেন। পাতুর পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্ম্মম প্রহারচিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাগ একটা দুইটা নয়—দাগে দাগে পিঠটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত!

প্রৌঢ় চৌধুরী অকপট মমতায় সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন, আবেগবিগলিত স্বরেই বলিল—আ-হা-হা। পাতু—?

—আজ্ঞে, ওই ছিরু পাল! রাগে গন-গন করিতে করিতে প্রশ্নের পূর্ব্বেই পাতু উত্তর দিল—কথা নাই, বাত্তা নাই, এসেই একগাছা দড়ির বাড়িতে দেখেন কি ক'রে দিলে, দেখেন! সে আবার পিছন ফিরিয়া ক্ষতবিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল। তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হাতখানা চেপে ধরলাম তো—একগাছা বাখারীর ঘায়ে কপাল একেবারে ফাটিয়ে দিলে!

ছিরু পাল? শ্রীহরি ঘোষ? অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিয়াছে! চৌধুরীর চোখে অকস্মাৎ জল আসিয়া গেল। এক এক সময় মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশায় মানুষ এমন বিচলিত হয় যে, তখন আপনার সকল সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া নির্যাতিতের দুঃখ যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে; চৌধুরী এমনই একটি অবস্থায় উপনীত হইয়া সজল চক্ষে পাতুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার দন্তহীন মুখের শিথিল ঠোঁট দুইটি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পাতু বলিল—মোড়লদের ফি-জনার কাছে গেলাম। তা কেউ রা কাড়লে না। শত্রুর সব দুয়োর মুক্ত!

পাতুর বউ গুন গুন করিয়া কাঁদিতেছিল—ওই সব্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু এক ধমক কষিয়া দিল—এ্যাই—এ্যাই—আবার ঘ্যান ঘ্যান করে!

চৌধুরী একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কেন এমন করে মারলে? কি এমন দোষ তুমি করেছ যে—

অভিযোগ করিয়া পাতু কহিল—সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে বলতে গেলাম—তা তো আপুনি শুনলেন না, চ'লে গেলেন। গোটা গেরামের লোকের 'আঙোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়; অথচ আমি কিছুই পাই না। তা' কম্মকার যখন রব তুললে, তখন আমিও বলেছিলাম—যে আমি আর আঙোটজুতি জোগাতে লারব। কাল সনঝেতে পালের মুনিষ এসেছিল—আমি বলেছিলাম—পয়সা আন গিয়ে। তা আমার বলা বটে! আজ সকালে উঠে এসেই কথা নাই বাত্তা নাই—আথালি-পাথালি দড়ি দিয়ে মার!

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিলেন। পাতুর বউ বার বার ঘাড় নাড়িয়া মৃদু বিলাপের সুরে বলিল—না গো—বাবুমাশায়—

পাতু তাহার কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল—আমার পেট চলে কি ক'রে—সেটা আপনকারা বিচার করবেন না—আর এমুনি ক'রে মারবেন?

চৌধুরী কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—শ্রীহরি তোমাকে এমন ক'রে মেরেছে—মহা অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে, হাজার বার লক্ষ বার সে কথা সত্যি। কিন্তু 'আঙোটজুতি'র কথাটা তুমি জান না বাবা পাতু। গাঁয়ের ভাগাড় তোমরা যে দখল কর—তার জন্যেই তোমাদিগে—গাঁয়ের 'আঙোটজুতি' যোগাতে হয়। এই নিয়ম। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে—তোমরা চামড়া নাও, হাড় বিক্রী কর—তারই দরুণ তোমার ওই 'আঙোটজুতি'। মাংস কাটিয়া লইয়া যাওয়ার কথাটা আর চৌধুরী ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

পাতু অবাক হইয়া গেল; সে বলিল—ভাগাড়ের দরুণ?

—হ্যাঁ। তোমাদের প্রবীণেরা তো কেউ নাই, তারা সব জানত!

—শুধু তাই লয় মাশায়; ওই পোড়ামুখী কলঙ্কিনী গো।—পাতুর বউ আবার সুর তুলিল!

পাতু এবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তো 'আঙোটজুতি'ও লয়। আপনারা ভদ্দনোক যদি আমাদের মেয়ের পানে তাকান—তবে আমরা যাই কোথা বলুন?

প্রৌঢ় প্রবীণ ধর্ম্মপরায়ণ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন—রাম! রাম! রাম! রাধে! রাধে!

পাতু বলিল—আজ্ঞে, রাম রাম লয়, চৌধুরী মাশায়। আমার ভগ্নী দুগ্‌গা একটুকু বজ্জাত বটে; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মাশায় ছিরু পাল ফষ্টি-নষ্টি করবে। যখন তখন পাড়ায় এসে ছুতো নাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বসবে। আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন! চিরকাল একভাবে গেল;

পালকে বসতে দেবে—ফুস ফাস করবে। ঘরে মশায় আমারও বউ রয়েছে, তাই মাকে আর দুগ্‌গাকে আমি ঘা কতক ক'রে দিয়েছিলাম! মোড়লকেও বলেছিলাম—ভাল ক'রেই বলেছিলাম—চৌধুরীমশাই যে—আমাদের জাত-জ্ঞেতে নিন্দে করে—আপুনি আর আসবেন না মশায়। আসল আক্রোশটা হ'ল সেই।

লাঠি ও ছাতায় চৌধুরীর দুই হাতই ছিল আবদ্ধ, কানে আঙুল দিবার উপায় ছিল না, সে ঘৃণাভরে থুতু ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—রাধাকৃষ্ণ হে! থাক পাতু, থাক বাবা—ওসব কথা আমাকে আর শুনিও না। আমার কি হাত আছে বল! রাধে রাধে হে।

পাতু কিন্তু রুষ্ট হইল, সে কোন কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পিছন পিছন তাহার স্ত্রী আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল—স্বামীর নীরবতার সুযোগ পাইয়া সে আবার সুরু করিল—হারামজাদী আবার ঢং ক'রে ভাইয়ের দুখে ঘটা ক'রে কাঁদতে বসেছে গো! ওগো আমি কি ক'রব গো!

পাতু বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিল; সঙ্গে সঙ্গে বউটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—আঁ—!

পাতু মুখ খিঁচাইয়া বলিল—চেল্লাস না বাবু! তোকে কিছু বলি নাই—তু থাম। ধাক্কা দিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া সে পশ্চাদ্‌গামী চৌধুরীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—আচ্ছা চৌধুরী মশায়, আলেপুরের রহমৎ স্যাখ যে কঙ্কনার রমেন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল করছে, তার কি?

আশ্চর্য্য হইয়া চৌধুরী বলিলেন—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। ভাগাড়ের চামড়া তাদিগে ছাড়া কাউকে বেচতে পাব না আমরা। বলে, জমিদার আমাদিগে বন্দোবস্ত করেছে। খালছাড়ানোর মুজুরী আর নূনের দাম—তার ওপর দু-চার আনা ছাড়া দেয় না। অথচ চামড়ার দাম এখন আগুন।

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি কথা পাতু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিছে যদি হয় পঞ্চাশ জুতো খাব, নাকে খত দোব।

—তা হ'লে—চৌধুরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—তা হ'লে হাজার বার তুমি বলতে পার ও কথা। গাঁয়ের লোক পয়সা দিতে বাধ্য! কিন্তু জমিদারের গমস্তা নগদীকে জিজ্ঞাসা করেছ কথাটা?

পাতু বলিল—গমস্তা নগদী কেন, জমিদারের কাছেই যাব আমি। ডাক্তার ঘোষ মশায় বললে, থানায় যা। তা থানা কেন—জমিদারের কাছেই যাই; দুটো বিচারই হয়ে যাক। দেখি জমিদার কি বলে!

সে আবার ফিরিল এবং সোজা পথ-আলটা ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকের একটা আল ধরিয়া কঙ্কনার দিকে মুখ করিল। বৃদ্ধ চৌধুরী ঠুক ঠুক করিয়া নদীর চরের দিকে অগ্রসর হইল। নদীর ওপারের জংশনের কলগুলার চিমনি এইবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর চৌধুরী আসিয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। সব করিয়া সব হইল—চামড়া বেচিয়া রমেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে? ব্রাহ্মণের ছেলে! (ক্রমশঃ)

খুলে দেবো দ্বার

শ্রীমতী চিত্রা দেবী

আমি খুলে দেবো দ্বার
ওগো বন্ধু আমার
আসিবে যেদিন তব
পুণ্য পূজার লগন,

মোর অনুরাগ
যদি ছড়াইয়া ফাগ
বিরহ ব্যাকুল করে
শূন্য মানস গগন;

যদি এ পর্ণপুটে
ফাগুন জাগিয়া ওঠে
সোহাগ প্রদীপ জ্বালি
করিব বরণ তারে,

আমি খুলে দেবো দ্বার
ওগো বন্ধু আমার
আসিবে যেদিন তব
বারতা কুঞ্জদ্বারে।

বানপ্রস্থ

নাটিকা

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বরদা। বেশ, খিদে পাচ্ছে কিন্তু ক্রমশ। জগমোহন (চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন) তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো তো!

জগমোহন। আচ্ছা এই উঠলাম। আমি গিয়েই বা কি করব, আমি নদীর পানে চেয়ে থাকলেই তো নৌকো বোঁ বোঁ ক'রে এসে পড়বে না। যাক্—বার বার বলছ যখন যাচ্ছি—

রাগের ভান করিয়া চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। আপনাদের সঙ্গে খাবার নেই না কি? আমাদের সঙ্গেও যা ছিল সব খতম হয়ে গেছে। খানিকটা মাস্টার্ড পড়ে আছে খালি। শিরোমণি মশায়, আপনার কথাগুলো আছে, না নিঃশেষ করেছেন?

শিরোমণি। সে কোন্ কালে—

পুনরায় নস্ত লইলেন

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় আমাকে ছেড়ে থাকতেও পারবেন না, যেখানে যাব আমার সঙ্গে যাওয়া চাই—অথচ আমার সঙ্গে মতের মোটে মিল নেই—খালি ঝগড়া আর ঝগড়া—

শিরোমণি। ঝগড়া হবে না, এমন দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পেয়েছ—সেটা কেবল ভোগ-বিলাসেই কাটিয়ে দেবে? তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, কেবল ভেসে চলা?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) তাই কি ছাই জানি। রবি ঠাকুরের ভাষায়—কী চাই কী চাই বচন না পাই মনের মতন রে—

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে
চকিত চলার কচিৎ হাওয়ার
মন কেমন করে
নবীন চিকণ অশথ পাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কী চাই কী চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।

বরদা। বাঃ

শিরোমণি। কিন্তু এ সমস্তই হ'ল দেহজ মোহের বিকার, কিন্তু দেহটা যে কিছু নয় একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। গীতার কথা ভুললে চলবে না – বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

বরদা। দোহাই শিরোমণি মশায়, সংস্কৃতের কচকচি একটু থামান। এবার একটু কাব্যালোচনা হোক। চমৎকার লাগছে রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি—

শিরোমণি। বেশ তাই হোক—আমি চললাম।

সক্রোধে চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) উনি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই দিলেন। নীহার একা রয়েছে—

গলা খাঁকারি দিলেন

বরদা। নীহার কে?

রঙ্গলাল। সে আছে একজন।

বরদা। যাক্ সংস্কৃতের কচকচি থামলো—বাঁচা গেল।

রঙ্গলাল। সংস্কৃতকে অশ্রদ্ধা করবেন না মশাই, সংস্কৃতে কালিদাস কাব্য লিখেছেন—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিবস্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব।

৩।৫৩-৫৪॥

বরদা। আহা চমৎকার!

রঙ্গলাল। কালিদাস আপনার পড়া আছে?

বরদা। এককালে বি-এ পাশ করেছিলুম—সেই সূত্রে কুমারসম্ভবের খানিকটা পড়তে হয়েছিল বই কি।

রঙ্গলাল। মনে আছে সেখানটা আপনার, মদনের সঙ্গে বসন্ত যেখানে মহাদেবের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন সেখানের বর্ণনাটা—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা।
৩।৩৬-৩৭॥

বরদা। (সোচ্ছ্বাস) আহা, কাণ যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি, সংস্কৃতের মত ভাষা নেই—

রঙ্গলাল। যে কোন ভাষাতেই সুর লাগলে মিষ্টি হয়। ফারসী গজল কত মিষ্টি! একেবারে মাতিয়ে দেয়—

বুল্‌বুল্ জেতো অমোপ্‌তুহ্‌, শীরিঁ
সুখনীরা সুখনীরা সুখনীরা
গুল্ অজ্ রুখৎ অমোপ্‌তুহ্‌, নাজুক্
বদনীরা বদনীরা বদনীরা। *

সুরই আসল, ছন্দই আসল—ভাষা কিছু নয়। এই সুর, এই ছন্দ এই নেশা—পাগল করে দেয় মানুষকে। এরই উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন বোধ হয়—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—

বরদা। (দ্বারের পানে চাহিয়া) কিন্তু জগমোহন এখনও ফিরল না, আজ না খেয়ে মরতে হবে দেখছি। তামাকের জন্যও প্রাণটা আইঢাই করছে।

রঙ্গলাল। সিগারেট খাবেন?

বরদা। না, সিগারেট আমি খেতে পারি না। তামাক না হ'লেও চলবে—কিন্তু খেতে না পেলে আমি মারা যাব। বেশ খিদে পেয়েছে মশাই—

রঙ্গলাল। আপনি মরতে ভয় পান?

বরদা! তা পাই বই কি, আপনি পান না?

রঙ্গলাল। না। রবার্ট ব্রাউনিঙ-এর সঙ্গে মিলিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করে—

For sudden the worst turns best to the brave
The black minute's at end
And the elements rage, the fiendish voices that rave
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall first become a peace out of pain
Then a light, then thy breast
O, thou, soul of my soul, I shall clasp thee again
And with God be the rest!

নেপথ্যে মিষ্ট মেয়েলি গলায় গান ভাসিয়া আসিল—

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে"

বরদা। (উৎকর্ণ) চমৎকার মিষ্টি গলা তো—কে গাইছে মশাই?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) নীহার পালিয়ে এসেছে।

বরদা। নীহার মেয়েমানুষ নাকি?

রঙ্গলাল। নিশ্চয়, রীতিমত মেয়েমানুষ!

উঠিয়া গেলেন এবং জানালা দিয়া ডাকিলেন

নীহার, ভেতরে এসো—

নীহার প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবু চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন

তুমি পালিয়ে এলে যে?

নীহার। শিরোমণি মশায়ের কাছে থাকা যায়!

বরদা ও রঙ্গলাল উভয়েই হাসিলেন

বরদা। বসুন, বসুন (সরিয়া স্থান করিয়া দিলেন) রঙ্গলালবাবু, ইনি বুঝি আপনার—

রঙ্গলাল। না, কেউ হন না (একটু হাসিয়া) অথচ সব হন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

* জ=z-এর মত উচ্চারণ, খ=guttural খ্‌হ্‌, শ=sh, স=s

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া
দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে
তারই সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

বরদা। ইনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন ?

রঙ্গলাল। চমৎকার, একখানা শুনিয়ে দাও না নীহার !

নীহার। কোন্‌টা গাইব ?

রঙ্গলাল। যা তোমার খুশি।

নীহার। হার্মোনিয়মটা আনতে বলুন তা হ'লে হীরুকে। খালি গলায় আমি গাইতে পারব না।

রঙ্গলাল। বেশ তো হার্মোনিয়মটা আসুক না। এইখান থেকে ডাকলেই শুনতে পাবে বোধ হয় হীরু—

জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন

হীরু ! হীরু !

(নেপথ্য হইতে হীরু) আজ্ঞে হ্যাঁ—

রঙ্গলাল। হার্মোনিয়মটা আনো এখানে।

(নেপথ্য হইতে হীরু) যে আজ্ঞে।

বরদা। আশ্চর্য্য ব্যাপার, জগমোহনের কোন পাত্তা নেই !

রঙ্গলাল। শিরোমণির সঙ্গে আবার শাস্ত্রালাপ সুরু করেছেন বোধ হয়। শিরোমণি মশায় লোক পেলে তো ছাড়বেন না।

বরদা। কিন্তু নৌকোটার কি হল ? হু হু ক'রে হাওয়াও উঠেছে একটা—

রঙ্গলাল। এ রকম নির্জ্জন স্থানে এরকম হু হু ক'রে হাওয়া উঠলে কি রকম যেন অদ্ভুত লাগে আমার। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে—

হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন—

হীরু হার্মোনিয়ম লইয়া প্রবেশ করিল ও সেটি নীহারের সম্মুখে রাখিল

নীহার। (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) তুই ওইখানে থাকিস যেন। আমার ওড়নাখানা বাইরেই আছে, উড়ে না যায় দেখিস—

হীরু। যে আজ্ঞে

হীরু চলিয়া গেল। রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি করিয়া চলিলেন

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যা কিরণ
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কি লাগি তোমার
বিলাস হেন !

বরদা। এইবার একখানা গান হোক। আপনি থামুন।

রঙ্গলাল। এ কবিতার শেষটা আরো চমৎকার, শুনুন না—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ
শুধু কানে আসে জল কলরব
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ু ভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
"কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি,"
কহিবে না কথা দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

বরদা। এইবার গান হোক—কবিতা থামান আপনার।

নীহার। কোন্‌টা গাইব।

রঙ্গলাল। সেই গজলটা গাও না।

নীহার হার্মোনিয়ম টানিয়া লইল এবং একটি উর্দ্দু গজল গাহিল। খুব দরদ দিয়া গাহিল

বরদা। (সোচ্ছ্বাসে) চমৎকার!

রঙ্গলাল। ভাল লাগল আপনার?

বরদা। চমৎকার, চমৎকার—খুব চমৎকার!

রঙ্গলাল। নীহার আর একটা শুনিয়ে দাও তা হ'লে।

বরদা। হাঁ৷ হাঁ৷—আর একটা হোক। বাইরে তখন যেটা গাইছিলেন—

নীহার। গানের সুরের আসনখানি-টা?

বরদা। হাঁ৷।

রঙ্গলাল। বেশ তো, শুনিয়ে দাও।

রঙ্গলালবাবু পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিলেন সিগারেট নাই

আমার সিগারেটের টিনটা কি তোমার য়্যাটাচিতে আছে?

নীহার। হাঁ৷।

রঙ্গলাল। চাবিটা দাও তো নিয়ে আসি আমি। (বরদার দিকে ফিরিয়া) আপনি গান শুনুন ততক্ষণ—আমি সিগারেট নিয়ে আসি। (চলিয়া গেলেন)

নীহার গান ধরিল—"গানের সুরের আসনখানি"। গান শেষ হইয়া গেল, তবু রঙ্গলালবাবু ফিরিলেন না

বরদা। (অভিভূত) সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। (একটু ইতস্তত করিয়া) আপনি, মানে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে আপনার—

নীহার। না, সম্পর্ক কিছু নেই।

বরদা। আপনি তা হ'লে—

নীহার। (সলজ্জে) আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না—

বরদা। (গলা খাঁকারি) ও হাঁ৷—আচ্ছা—

নীহার। আর একটা গান শুনবেন?

বরদা। হাঁ৷ হাঁ৷ নিশ্চয়ই! (সহসা) জগমোহন গেল ত গেলই!

নীহার গান ধরিল—'ঘুম ঘোরে এলে মনোহর।' বরদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীহারের পানে চাহিয়া রহিলেন

নীহার। (সলজ্জ কণ্ঠে) অমন ক'রে দেখছেন কি!

বরদা। তোমাকে। মনে পড়ছে প্রথম যৌবনে যে মেয়েটিকে পাগলের মত ভালবেসেছিলাম সেও ঠিক যেন তোমারি মত দেখতে ছিল। আজ যেন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল এই নির্জ্জনে। বড় ভাল লাগছে!

মুগ্ধভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

নীহার। (কুণ্ঠিত) আর একটা গান গাইব?

বরদা। গাও।

নীহার ধরিল—'বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে'। বরদা উন্মুখ-দৃষ্টিতে নীহারের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। গান চলিতে লাগিল। সহসা গানের মাঝখানেই বরদা বাধা দিলেন—

গান থাক—চল আমরা দু'জনে বেড়াই গিয়ে—

নীহার। কোথায়?

বরদা। নদীর ধারে। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে, চল সেইখানে বসি গিয়ে। চল আর গান ভাল লাগছে না।

নীহার। (একটু ইতস্তত করিয়া) চলুন।

পাশের দরজাটা দিয়া উভয়ে চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন ও রঙ্গলাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রঙ্গলালের মুখে সিগারেট

জগমোহন। বরদা আবার কোথা গেল?

রঙ্গলাল। (জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন) নীহারের সঙ্গে ওই পূবদিকের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। বেশ জমে গেছেন মনে হচ্ছে। থাক যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকেন ততই ভাল। আপনাদের নৌকার তো কোন পাত্তাই নেই—

জগমোহন। আমি এখন কি করি বলুন তো?

রঙ্গলাল। নৌকো না আসবার কি কারণ হতে পারে?

জগমোহন। যে কারণটা আমার মনে হচ্ছে তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে তো ভয়ানক ব্যাপার।

রঙ্গলাল। কি?

জগমোহন। মাঝি ব্যাটাদের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে এসেছিলাম, তারা তাই নিয়ে যদি তাড়ি খেয়ে থাকে, তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ। তা হ'লে আজ আর নৌকো আসবেই না। আর না যদি আসে তা হ'লে বরদা আমাকে আর আস্ত রাখবে না!

রঙ্গলাল। বেশ তো আমার নৌকোটা নিয়ে এগিয়ে দেখা যাক্। স্রোতের মুখে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে।

জগমোহন। আপনারা তা হ'লে এখানেই বসবেন বলছেন ?

রঙ্গলাল। চলুন না আমিও যাই। বেড়াতেই তো বেরিয়েছি। বরদাবাবু ততক্ষণ একটু অন্যমনস্ক থাকুন—

হাসিলেন। তাহার পর জগমোহনের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

আরে না না মশাই, আমার ওসব কম্‌প্লেক্‌স্ নেই। কাঙালের মতো কোন জিনিস আঁকড়ে থাকা আমার স্বভাবই নয়। তা ছাড়া, নীহার সন্দেশ নয় যে বরদাবাবু টপ করে গালে ফেলে দেবেন। যদি দেনও (হাসিয়া) I dont mind! চলুন।

জগমোহন। কিন্তু শিরোমণি মশায় ?

রঙ্গলাল। হ্যাঁ শিরোমণি মশায় একটা প্রব্‌লেম্ বটে। এই যে শিরোমণি মশায় আসছেনও দেখছি—

শিরোমণি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র

শিরোমণি মশায়, কাপড় বদলে এলেন যে—

শিরোমণি। আমাদের ফিরতে দেরি আছে তে ?

রঙ্গলাল। একটু দেরি আছে—

শিরোমণি। তাহলে আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরেই নিই এখানে।

রঙ্গলাল। বেশ তো, সন্ধ্যাহ্নিকের সরঞ্জাম তো আপনারসঙ্গেই আছে, মায় কুঁজোয় ক'রে গঙ্গাজল পর্য্যন্ত এনেছেন আপনি। আনতে বলব হীরুকে—?

শিরোমণি। আমি বলেছি—ওই যে এসেও পড়েছে।

হীরু প্রবেশ করিল। তাহার হাতে গঙ্গাজলের কুঁজো, কোশাকুশি, কুশাসন

রঙ্গলাল। চলুন জগমোহনবাবু, আমরা যাই তা হ'লে।

জগমোহন। চলুন।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসন প্রভৃতি পাতিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী আবৃত্তি করিতে করিতে সাড়ম্বরে আহ্নিক সুরু করিলেন। খানিকক্ষণ পরে বরদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছু পিছু নীহার। বরদার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—

নীহার। আপনি অমন ক'রে হঠাৎ উঠে এলেন যে ?

বরদা। জগমোহনটা গেল কোথা! ভয়ামক খিদে পেয়েছে আমার—

জানালার কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে

জগমোহন—জগমোহন—জগমোহন—জগা—

শিরোমণি মহাশয় প্রাণায়াম করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। হীরু প্রবেশ করিল

হীরু। আজ্ঞে, ওনারা লৌকো ক'রে চ'লে গেলেন।

বরদা। (সবিস্ময়ে) নৌকো ক'রে চ'লে গেলেন! কোথা গেলেন!

হীরু। আপনার নৌকোটার খোঁজেই বেরিয়েছেন। আপনাকে আর দিদিমণিকে এইখানে অপিক্ষে করতে বলে গেলেন।

বরদা। অপিক্ষে করতে বলে গেলেন!

হীরু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলিয়া গেল

বরদা। উঃ, এমন ফ্যাসাদে মানুষে পড়ে!

নীহার। চলুন, আমরা তা হ'লে একটু বসে গল্প করি ওই বারান্দায় গিয়ে।

বরদা। চল—

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শিরোমণি মহাশয় আরও খানিকক্ষণ পরে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শিব-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্—" ইত্যাদি। খানিকক্ষণ পরে হীরু আসিয়া প্রবেশ করিল

হীরু। ওই বাবুটি কোথা গেলেন ?

শিরোমণি স্তোত্রপাঠ বন্ধ করিলেন

শিরোমণি। (রাগতভাবে) কেন ?

হীরু। ওনাদের লোকোটা ডুবে গেইচে, তলার পাটাতন একখানা নাকি আলগা ছিল, সেটো হঠাৎ খুলে গিয়ে ডুবে গেইচে লোকোটা। একটা মাঝি আইচে সাঁতরে—

শিরোমণি। একটু নির্ঝঞ্ঝাটে পুজো করবারও জো নেই। বাবু ওদিকের বারান্দায় আছে, বলগে যা—

হীরু চলিয়া গেল। শিরোমণি পুনরায় স্তোত্র পাঠে মন দিলেন। ওষ্ঠাধর খানিকক্ষণ স্তোত্রপাঠ চলিল। বরদা প্রবেশ করিলেন। দৃঢ়-নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত। পিছু পিছু নীহার

নীহার। অমন অস্থির হচ্ছেন কেন ?

বরদা। আমার মাথা ঘুরছে—

নীহার। মাথা ঘুরছে ? একটু বসুন না, বলেন তো (ইতস্তত করিয়া) একটু বাতাস ক'রে দি—

শিরোমণি সক্রোধে উঠিয়া পড়িলেন

শিরোমণি। ওরে হীরু, এসব জিনিসপত্তর নিয়ে আর একটা ঘরে চল্। কি পাপের ভোগেই পড়েছি আমি—

পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসিয়া জিনিস পত্র লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল

নীহার। বাতাস ক'রে দেব একটু ?

বরদা। (রুক্ষকণ্ঠে) না—

নীহার। তাতে ক্ষতি কি ! দিই না একটু—

বরদা। (অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে) না ! জগা রাস্কেলটা—

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিকতর উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তারপর সহসা দাঁত কড়মড় করিয়া

ওই মাঝি ব্যাটার হাড় ঠেঙিয়ে গুঁড়ো ক'রে দেব আমি। ব্যাটা, পাজি, হারামজাদা ! (উচ্চৈঃস্বরে) হীরু, হীরু—

হীরুর প্রবেশ

হীরু। আজ্ঞে, কি বলছেন ?

বরদা। (সক্রোধে) ডাক মাঝি ব্যাটাকে, জুতিয়ে ব্যাটার পিঠের চামড়া তুলে ফেলি। পাটাতন আলগা ছিল ! ইয়ার্কি—

নীহার। না, না, গরীবমানুষকে আর মারধোর ক'রে কাজ নেই। হীরু, তুই যা।

হীরু চলিয়া গেল

বরদা। (অসংলগ্নভাবে) স্কাউণ্ড্রেল, রোগ্, রাসকেল্, সোয়াইন্—

নীহার। (বরদার বাহুমূলে হাত দিয়া, সানুনয়ে) একটু স্থির হোন্—

বরদা ঝটকা মারিয়া নীহারের হাত সরাইয়া দিলেন

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) চুপ কর, ফাজিল কোথাকার।

নীহার। (অভিমান ক্ষুণ্ণকণ্ঠে) এতে আর ফাজলামির কি দেখলেন !

বরদা কোন উত্তর দিলেন না। ব্যর্থ আক্রোশে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। নীহার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল

নীহার। তা হ'লে ততক্ষণ একটা গান গাই, শুনুন—

বরদা উত্তর দিলেন না। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন নীহার হার্মোনিয়মটি টানিয়া লইয়া বসিল এবং গান ধরিল। বরদা—পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন

আমার মনটি করিয়া চুরি
আমার প্রাণটি করিয়া চুরি
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে
এতদিনে এলে ফিরি, হে সখা,
এতদিনে এলে ফিরি।

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া ও চীৎকার করিয়া) গান থামাও !

নীহার কিন্তু গান থামাইল না, আর একটু মুচকি হাসিয়া গাহিয়া চলিল—

কত মরু গেছে কত সাগরে
কত সাগর শুকাল বারি
কত নদী গেছে পথ ভুলি, হে সখা,
কাল গেছে কত গি-ই-রি

বরদা। (দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ক্ষিপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) একশো বার বলছি, আমার খিদে পেয়েছে —খিদে পেয়েছে, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে—গান-টান কিচ্ছু ভাল লাগছে না—চুপ কর তুমি—

নীহার তবু থামে না

তবে রে তোর গানের নিকুচি করেছে !

ক্রুদ্ধ বরদা কোণ হইতে একটা মুগুর তুলিয়া সবেগে সেটা হার্মোনিয়মের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত চীৎকার করিয়া নীহার সরিয়া দাঁড়াইল। হার্মোনিয়মের পাশ দিয়া গিয়া মুগুরটা গঙ্গাজলের কুজোটাকে স-শব্দে চুরমার করিয়া দিল

যবনিকা

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

এপারে শিখিপুচ্ছ—ওপারে বনপলাশী—মাঝ দিয়া বহিয়া গেছে কলঙ্কিনীর খাল।

বর্ষার আগমনে খালের রূপ বাড়িয়াছে, দুই পাড়ে সে যেন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে—সুরূপা ষোড়শীর হাসির মতই সে হাসি যেন কল্ কল্ করিতেছে অন্তরের ঐশ্বর্য্যে, এখনই যেন সে কৌতুকে থান্ থান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কিন্তু গরবিনী কলঙ্কিনীর ভারি আজ গরব বাড়িয়াছে, ভরা-রূপের ভারে সে আজ থম্ থম্ করিতেছে। অন্তরে তাহার রূপের চেতনা জাগিয়াছে, বাহিরে সেই রূপ-চৈতন্য চমৎকার বান ডাকাইয়াছে।

বনপলাশীর ভৈরব দত্তের ছেলে সুন্দর অপরাহ্নে তাহাদের বাড়ীর পিছুকার আমবাগানের পথ দিয়া ঘাটে আসিয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই কলঙ্কিনীর খালের রূপ দেখিতে লাগিল। বিস্ময় ও পরিতৃপ্তি যেন তাহার দুই চোখ ভরিয়া তুলিল। খালের ঘাটে তাহাদের বাড়ীর নৌকাটি পাড়ের একটি গাছের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা ছিল। সুন্দর ভাবিতেছিল, নৌকা লইয়া সে একবার খালে খালে একটু ঘুরিয়া আসিবে কি-না। এমন সময় তাহার নজরে পড়িল, ওপারে নিশি সজ্জনের বাড়ীর ঘাটের উঁচু পাড়ে ঠিক একটা বাতাবি লেবুর গাছের নীচে কে যেন চোখে কাপড়-চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তেই সে চিনিল, এ সেই নিশি সজ্জনের প্রথম পক্ষের মেয়ে টিয়া। টিয়াকে সুন্দর এযাবৎ এই ঘাটেই বহুদিন বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে দেখিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই সে ভাল করিয়া টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। তবে লোকের মুখে সুন্দর টিয়ার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে; আরও শুনিয়াছে, মা-মরা মেয়ে টিয়াকে নাকি নিশি সজ্জনের দ্বিতীয় পক্ষ রূপসীর হাতে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে দিবারাত্র লাঞ্ছিত হইতে হয়। টিয়ার প্রতি তাই তাহার নিজ মনের অগোচরে কেমন যেন একটু সহানুভূতি ছিল; কিন্তু টিয়ার পূর্ব্বপুরুষ—অর্থাৎ শিখিপুচ্ছ গাঁয়ের সজ্জন-বংশ যে বনপলাশীর দত্ত-বংশের চিরশত্রু তাহাও সুন্দরের অবিদিত ছিল না; কাজেই সুন্দরের সে সহানুভূতি কোন দিনই তেমন মাথা তুলিতে পারে নাই। আজ সুন্দর জীবনে এই প্রথম টিয়ার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি ফেলিয়া তাকাইল, অবশ্য এতদিনে এই প্রথম অসঙ্কোচে তাকাইবার সুযোগও সে পাইয়াছিল—যেহেতু টিয়ার চোখ তাহার কাপড়ের আঁচল দিয়া চাপিয়া ধরা ছিল। টিয়া একবার ক্ষণিকের জন্য মুখের উপর হইতে কাপড়ের আঁচল সরাইয়া লইল, সুন্দর সেই সুযোগে টিয়ার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। টিয়া কাঁদিতেছে! সুন্দরের অমনি মনে হইল, হয় ত টিয়ার সৎ-মা রূপসী আজ তাহাকে গঞ্জনা দিয়াছে, তাই হয় ত সে ঘাটে কাজের অছিলায় আসিয়া কাঁদিতেছে। টিয়ার ত তবে বড় দুঃখের জীবন! সুন্দরের মনে আজ টিয়ার জন্য বড় ভাবনা ধরিয়া গেল। টিয়ার জন্য সে সত্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আবার দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপায় দুঃখবোধ তাহার তরল হইয়া আসিল। সুন্দর তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠিয়া আমবাগানের দিকে চলিয়া গেল। অল্প পরেই আবার সে একটা ছাতির শিক্ ও হাতে চার-পাচটি পিটুলি ফল কোথা হইতে যেন সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। টিয়া তখনও পূর্ব্ববৎ চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতেছিল। সুন্দর ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভাবিল, তারপরে মুখে দুষ্ট হাসি খেলাইয়া শিকের মাথায় একটা পিটুলি গাঁথিয়া শিকের অপর মাথা ধরিয়া টিয়ার কপাল লক্ষ্য করিয়াই শিকটাকে শূন্যে দোলাইয়া একটা ঝাঁকি দিয়া পিটুলি ফলটা ছুঁড়িয়া মারিল অতি ভয়ে ভয়ে—যাহাতে ফলটা গিয়া টিয়ার কপালে লাগিলেও খুব জোরে না লাগে। কিন্তু ফলটা ওপারের ঘাটের অতি কাছে জলের উপর গিয়া পড়িয়া একটা টুপ্ করিয়া আস্তে শব্দ করিল। টিয়া তাহা টেরও পাইল না। সুন্দর শিকে ফুঁড়িয়া আবার একটা পিটুলি ফল ছুঁড়িল। এবারও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। ইহাতে সুন্দরের কেমন জিদ্ চাপিয়া গেল, সে আবার ছুঁড়িল।

এবার ঠিক টিয়ার কপালে গিয়াই তাহা লাগিল এবং একটু জোরেই লাগিল, অথচ সুন্দর কিন্তু অত জোরে তাহা

লাগাইতে চায় নাই। টিয়া মুহূর্ত্তে চোখের উপর হইতে কাপড়ের আঁচল সরাইয়া লইয়া কপালে হাত তুলিয়া দিয়া বলিল, উঃ!

তারপরেই টিয়া সম্মুখে অপর পারের ঘাটের পানে দৃষ্টি ফেলিতেই দেখিতে পাইল, সুন্দর সেখানে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে, আর তাহার হাতের শিকের মাথায় আর একটা পিটুলি ফল গাঁথা রহিয়াছে। টিয়া সকলই তখন বুঝিতে পারিল এবং লজ্জায় সে যেন একেবারে মরিয়া গেল। তাহার গোপন কান্না ত তবে বুঝি আর গোপন রহিল না, সুন্দর ত সকলই আজ দেখিয়া ফেলিয়াছে, জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু সেখানেও সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, হঠাৎ ছুটিয়া সে বাড়ীর দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুন্দর যত জোরে সম্ভব হাসিয়া পলায়ন-তৎপর টিয়াকে যেন অপ্রতিভ করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইল।

টিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে পর সুন্দরের চোখে নিজের বোকামি ধরা পড়িল। আজ এই প্রথম সুন্দরের মনে হইল, টিয়া যে দেখিতে সুন্দর তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছু নাই; কিন্তু কি দুর্ব্বুদ্ধিতে যে টিয়াকে সে আরও ভাল করিয়া আরও কিছুক্ষণের জন্য এমন সুযোগ সত্ত্বেও না দেখিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল তাহা সে এখন আর ভাবিয়া পাইতেছিল না। আর তাহার এই অকারণ দুর্ব্যবহারে টিয়া না জানি কত ক্ষুণ্ণই হইয়াছে, হয় ত জীবনে কোন দিনই টিয়া তাহার এই দুর্ব্যবহার আর ভুলিতে পারিবে না। সত্যই একাজটা যে তাহার পক্ষে কত বড় ছেলেমানুষি হইয়া গিয়াছে তাহা সে এখন অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, নৌকায় উঠিয়া ওপারে গিয়া নিশি সজ্জনের বাড়ী হইতে টিয়াকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া ইহারই জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চায়—কিন্তু বংশ-পরম্পরায় যে শত্রুতা এই দুই পারের দুই বাড়ীতে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারই গ্লানি কেমন করিয়া যেন মুহূর্ত্তে মাথা তুলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা হইয়া দাঁড়াইল। তারপরে সমস্ত ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়া সুন্দর হাতের পিটুলি ফল গাঁথা ছাতির শিকটা খালের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ করেচি! আমার খুশী, আমি পিটুলি ফল ছুঁড়ে ওকে মেরেচি। কেন ও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবে শুনি? মানুষের কান্না আমার দু'চক্ষের বিষ! ও আমি কিছুতেই দেখতে পারি না।...

টিয়ার কান্না সহসা থামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুন্দরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণের অর্থ সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ঘাটের পথ ধরিয়া বাগানের ভিতর দিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন সে সুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতেই ফিরিল। সুন্দরকে সে ইতিপূর্ব্বে ঘাটেই বহুবার দেখিয়াছে, কখনও আবার হয় ত খালের জলে সাঁতরাইতেও দেখিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই এযাবৎ সে সুন্দরের সঙ্গে একটা কথাও কহে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। কাজেই সুন্দরের দিক হইতে আজিকার এই আচরণ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত। প্রথম তাই সে সুন্দরের প্রতি কেমন যেন রুষ্ট হইল, পরে একটু একটু করিয়া সকল দিক ভাবিয়া দেখায় সে বুঝিল যে, সুন্দরের এ আচরণ সত্যই হাস্যকর! কাজেই সুন্দরের প্রতি কিছুমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ আর সে পোষণ করিতে পারিল না! শুধু কপালের উপর হাত বুলাইয়া সে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে মৃদু হাসিল। কিন্তু বাড়ীর উঠানে পদার্পণ করিতেই টিয়ার অন্তরের হাসি ও কৌতুকবোধ মুহূর্ত্তেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং অতি-নিকট ভবিষ্যতে পিতার শাসনের জন্য সে নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। কারণ বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই সে দেখিল যে, তাহার সৎ-মা রূপসী পশ্চিমের ঘরের দাওয়ার উপর অভিমানে ফাটিয়া পড়িয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিশি সজ্জনের কাছে বলিয়া চলিয়াছে—না বাপু, এখানে আর আমি একদণ্ডও থাকতে পারব না, তার চেয়ে তুমি আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসো। এই অতটুকু মেয়ে—না হয় গর্ভেই ধরিনি—তা ব'লে এমন ক'রে মুখের ওপর যা-তা অপমান ক'রে যাবে? কেন, কিসের জন্যে আমি সে অপমান মুখ বুজে সইব শুনি?

নিশি সজ্জন ইহাতে বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিল, হুঁ, অপমান যে তোমার হয়েচে সে ত অনেকক্ষণ বুঝেচি; কিন্তু কেন টিয়া তোমাকে অপমান করতে গেল, কি হয়েছিল, তাই বল' না?

রূপসী ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, থাক্ সে আর ব'লে কাজ কি! বড়র মেয়ে যখন টিয়া, তখন ত তার দোষ তোমার চোখে পড়বে না, কাজেই ব'লেও কিছু লাভ নেই।

নিশি সজ্জন বলিল, হ'লই বা সে বড়র মেয়ে, কিন্তু তাই বলে সে যদি অন্যায়ভাবে তোমার অপমান করে ত শাসন তাকে আমার করতে হবে বই কি!

রূপসী তখন বলিল, আমার অপরাধ—টিয়াকে আমি আমার এঁটো বাসনগুলো ঘাট থেকে ধুয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলাম, কেন না, দুপুরবেলা খেয়ে উঠলেই ঘুমে আমার চোখ ভরে আসে। আর একথা কেই বা না জানে যে, এ আমার বহুকালের অভ্যাস। টিয়া তার উত্তরে মুখ ঘুরিয়ে চ'লে গেল এমনভাবে—যে বাড়ীর দাসদাসীকেও মানুষ অমন হেনস্থা করতে পারে না কিছুতে।

তারপরে কণ্ঠ আরও করুণ করিয়া রূপসী বলিল, আমার মেয়ে করবে আমার অপমান! হায়! এতও আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল!

টিয়া এসব শুনিয়া একেবারে কাঠ মারিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। নিশি সজ্জন বা রূপসী কেহই তখনও টিয়ার আগমন টের পায় নাই।

নিশি সজ্জন সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিল, টিয়া! টিয়া! অ টিয়া!

টিয়া মাথা নীচু করিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল! এমন তাহাকে প্রায়ই দাঁড়াইতে হয়।

নিশি সজ্জন গম্ভীর কণ্ঠে টিয়াকে প্রশ্ন করিল, টিয়া, তোর ছোটমা যা বলে তা সব সত্যি তা হ'লে?

রূপসী এমন সময় চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মাগো! তবে কি আমি মেয়ের নামে মিথ্যে বানিয়ে নালিশ করতে গেলাম নাকি? এও আমাকে শুনতে হ'ল!

টিয়া অতি সংযতকণ্ঠেই বলিল, না, ছোটমা মিথ্যে বলবেন কেন।

নিশি সজ্জন সহসা রূঢ় হইয়া বলিল, এরকম রোজ রোজ তোর নামে যদি আমাকে নালিশ শুনতে হয় ত সে বড় ভাল কথা না। আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে, তার এটুকু বুদ্ধিও ত থাকা উচিত। নিজের মা না হ'লেও মা ত—তার সঙ্গে রোজ ঠোকাঠুকি হওয়া আমি পছন্দ করিনে। এখন থেকে সাবধান হ'য়ে চলতে তোকে বলচি।

টিয়া অতি ভয়ে ভয়ে আবার বলিল, আমার তখন হাতে আর একটা কাজ ছিল—তাই ছোটমা'র কাজ করতে একটু দেরী হ'য়ে গিচলো এই যা, নইলে সে বাসন ত আমিই ধুয়ে এনেচি।

রূপসী সঙ্গে সঙ্গে অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, বা; বেশ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে শিখেচিস্ ত টিয়া। বলি; মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে তখন ব'লে যাস্‌নি যে, রোজ রোজ আমি বাসন মাজতে পারব না?

টিয়া তখন বলিল, কে তবে তোমার এঁটো বাসন আজ ধুয়ে-মেজে এনে দিলে শুনি?

রূপসী ব্যঙ্গ-কঠিনকণ্ঠে উত্তরে বলিল, আহা! আমাকে কেতাথ' করেচো একেবারে! না ধুয়ে দিলেই পারতিস্! আমার যেন আর রথ নেই! বলি, সতীনের মেয়ে ঘরে না থাকলে আমার আর এঁটো বাসন মাজা হ'ত না! ম'রে যাই মেয়ের ঠেস্ দে'য়া কথা শুনে।

টিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, নিশি সজ্জন সহসা তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, আর একটা কথাও এ নিয়ে চলবে না। ছোটমা'র সঙ্গে না বনে ত মামার বাড়ী গিয়ে থাক। কিন্তু এখানে থেকে অষ্টপ্রহর দু'জনে পান থেকে চুন খসা নিয়ে যে প্রলয় বাঁধাবে—সে হবে না।

ও মাগো!—দু'জনে আমরা প্রলয় বাঁধাচ্ছি! একথাও আমাকে শুনতে হ'ল!—বলিয়া রূপসী সহসা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া সরব কান্না জুড়িয়া দিল।

নিশি সজ্জন মহা বিপদে পড়িয়া কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, ফের যদি কোন্ দিন আবার ছোটমা'র সঙ্গে তোর ঝগড়া বাধে টিয়া, ত সেই দিনই আমি তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো জানবি।

বলিয়া নিশি সজ্জন সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিতেই উঠানের একপাশে মনোহরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

মনোহর এক মুখ হাসি লইয়া বলিল, দিদি কোথায় জামাইবাবু? ঐ দাঁড়িয়ে বুঝি টিয়া কাঁদচে? কেন, ওর

আবার এত দুঃখু কিসের? আপনি বুঝি কিছু বলেচেন তবে ওকে?

টিয়া তখন সত্যই কাঁদিতেছিল।

•

দু-দশ গাঁয়ের মধ্যে শিখিপুচ্ছের নিশি সজ্জনের বেশ নাম-ডাক আছে। এককালে সজ্জন-বংশের প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা হাটে-ঘাটে সর্ব্বত্র আলোচিত হইত, এখন আর তেমনটি না হইলেও নিশি সজ্জনকে অনেকেই বেশ সমীহ করিয়া চলে এবং ভয়ও করে। নিশি সজ্জনের অবস্থা বেশ ভালই বলিতে হয়, শরীরে তাহার অসীম শক্তি, সাহস তাহার দুর্জ্জয়, কিন্তু সমস্তকিছু সত্ত্বেও নিশি সজ্জন রূপসীর কাছে কেমন যেন একটু ছোট হইয়া আছে। ইহার কারণটা অবশ্য কোন দিনই সে ভাবিয়া দেখে নাই, কিন্তু বেশী সময়ই সে যেন অন্যায় করিতেছে জানিয়াও রূপসীর আব্দার-শাসন-খেয়াল সমস্তই অবিচারে মানিয়া লইতেছে। না মানিয়া লইয়া যেন তাহার আর উপায় নাই—কাজেই। রূপসীর মাত্রাজ্ঞানহীন খেয়ালের প্রশ্রয় দিতে গিয়া কতদিনই যে সে টিয়ার উপর অযথা অন্যায় আচরণ করিয়াছে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে—তাহার আর হিসাব নাই। রূপসীর মনস্তুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে নিশি সজ্জনকে এমন সব কাজ করিয়া বসিতে হয় যে পরে তাহারই জন্য অন্তর তাহার অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

টিয়ার উপর আজিকার ব্যবহারও যে তাহার নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়াছে তাহাতে তাহার নিজেরও আর সন্দেহ ছিল না এবং মনোহরের আগমনে সেই কথাটাই তাহার মনে বার বার জাগিতেছিল। আর রূপসীর বুদ্ধি-শুদ্ধির উপরে নিশি সজ্জনের কেমন যেন একটা অনাস্থা আসিয়া গিয়াছিল। কাজেই রূপসী পাছে মনোহরের আগমনে আরও বেসামাল হইয়া ওঠে সেই ভয়েই নিশি সজ্জন কোনও রকমে আত্মীয়তা বজায় রাখার মত দু-একটা কথা—যাহা নিতান্ত না বলিলেই নয়—বলিয়া কাজের অছিলায় বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল।

নিশি সজ্জন চলিয়া গেলে মনোহর বরাবর উঠানের অপরপ্রান্তে—যেখানে দাঁড়াইয়া টিয়া চোখের জল কাপড়ের আঁচলা দিয়া মুছিতেছিল সেখানে আগাইয়া গিয়া টিয়ার অতি কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে—টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল! বলি, কপাল তোমার ফুলল কেমন ক'রে? কেঁদে কেঁদে ত মানুষের চোখই ফোলে জানতাম।

টিয়া মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইল না।

ওদিকে রূপসীও নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠানে নামিয়া আসিল এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্তের কান্নার কোনও আভাস কণ্ঠে প্রকাশ করিতে না দিয়া মনোহরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হ্যাঁ মনোহর, বলি, শিখিপুচ্ছে কি আসা হয় দিদির সঙ্গে দেখা করতে, না তার সতীনের মেয়েটির সঙ্গে?

মনোহর ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, কারণ অপ্রতিভ হইতে সে কোন অবস্থাতেই জানে না। আর রূপসীর কথা সে কোন দিনই বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না; যেহেতু রূপসীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে সে সচেতন, আর রূপসীর সঙ্গে তাহার বয়সের পার্থক্যও খুব সামান্য এবং সর্ব্বোপরি রূপসী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্যে আনিবার মত দুর্ব্বল মনোবৃত্তি তাহার নাই বলিয়াই সে মনে করে।

মনোহর অতি সহজকণ্ঠেই তাই তাহার দিদির অভি-যোগের উত্তরে বলিল, না দিদি, আমাকে তেমন স্বার্থপর তা ব'লে ভেবো না—যে আসব শুধু আপনার দিদিটির সঙ্গে দেখা করতে। আসি আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গেই দেখা করতে। আর তা না করলে পর দশজনেই বা ভাববে কি, আর বলবেই বা কি? লোকের কথা আমার বড় গায়ে লাগে। তাই সবার মন রেখে আমার কাজ। ত্রুটি কিছুতে হবার জো-টি নেই।

রূপসী মনোহরের কথায় ভারি বিপদে পড়িয়া গেল। ইহার পরে যে আর কি বলিয়া মনোহরকে আক্রমণ করা যাইতে পারে এবং টিয়াকে সেই সঙ্গে একটু আঘাত দেওয়া যায় তাহা সে আর ভাবিয়া পাইতেছিল না।

অগত্যা রূপসী মনোহরের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাতে টান দিয়া বলিল, আয়, আমার ঘরে গিয়ে বসবি চল্, তারপরে তোর মুখে বাড়ীর সব কথা শুনব।

টিয়া আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, আবার খালের ঘাটের দিকেই সে চলিয়া গেল। মনোহর দিদির সঙ্গে চলিতে চলিতে একবার পিছু ফিরিয়া বলিল, অ টিয়া,

টিয়াপাখী, যেও না বল্‌চি। গেচ' কি আমার মাথার দিব্যি! দিদির ঘরে এসো, গপ্‌পো করব তোমার সঙ্গে, —সেই সেবার নব-দূর্ব্বাদলে যাত্রা আমাদের জমল কেমন … সেই সব গপ্‌পো! পার্ট শুনতে চাও ত এন্‌তার পার্ট শোনাবো … মাইরি বলচি!

টিয়া কিন্তু মনোহরের কথা শুনিয়াও ফিরিল না। মনোহরকে তাহার কেন জানি ভাল লাগে না, মনোহরকে সে ভয়ের চক্ষে দেখে।

টিয়া যখন তাহাদের খালের ঘাটের উঁচু পাড়ের বাতাবি-লেবুর গাছটার একটা হেলানো ডালের উপর বসিয়া মাটিতে পা রাখিয়া দত্তদের বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া রহিল—তখন বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার আর বড় বিলম্ব নাই। টিয়া তাহার কপালের ফুলা অংশটুকুতে বার বার হাত বুলাইয়া ভাবিতেছিল, আবার মনোহর আসিয়াছে। যে কয়দিন মনোহর এখানে থাকিবে সে কয়দিন তাহার দুর্ভাবনার আর অন্ত থাকিবে না। —মনোহরের কথা-বার্ত্তা চাল-চলন তাহার একেবারেই ভাল লাগে না। আরও বিশেষ করিয়া তাহার ভাল লাগে না মনোহরের গায়ে পড়িয়া আপনার লোক সাজিবার ভাবটি। এখানে যখন সে থাকে তখন অষ্টপ্রহর সে যেন টিয়ার সন্ধান করিয়া ফেরে, আজে-বাজে যত অকারণ কথা কহে, ভাব-ভঙ্গীতে বড় প্রিয়জন বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পায়, গৃহকর্ম্মে অহেতুক বাধা জন্মায়; ফলে তাহার দিদির চক্ষে টিয়াকে সে আরও বিষ করিয়া তোলে। টিয়া মনোহরকে একেবারেই দেখিতে পারে না। মনোহরের এখানে অবস্থানকালে কেবলই টিয়া কামনা করে, তাহার সত্বর বিদায় গ্রহণের এবং বিদায় গ্রহণ করিলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচে। তবে মনোহর এককালে বেশী দিনের জন্য এখানে থাকিতে পারে না; সে মহাকালের উমাপতি ঘটকের যাত্রা-পার্টিতে কাজ করে, পালা গাহিতে তাহাকে যাত্রা-পার্টির সঙ্গে সঙ্গে এ-গ্রামে সে-গ্রামে ছুটাছুটি করিতে হয় এবং ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সে সময় করিয়া শিখিপুচ্ছে দিদির বাড়ী ঘুরিয়া যায়। আই দুই দিনের বেশী একযোগে সে দিদির বাড়ীতে কখনও বড় একটা থাকিতে চায় নাই।

টিয়া বসিয়া বসিয়া এই যে বিরক্তিকর মনোহর তাহারই কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু দৃষ্টি তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল আর একজনকে—যে খেলাচ্ছলে আজ পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহার কপাল ফুলাইয়া দিয়াছিল—সেই নিঠুর সুন্দরকেই। সুন্দরের আচরণের অসঙ্গতি আর তাহাকে এখন পীড়া দিতেছিল না। সুন্দরকে সে ত কত দিন কত ভাবে দেখিয়াছে, কিন্তু কোন দিনই তাহার সহিত কথার আদান-প্রদান হয় নাই, যেহেতু বংশানুক্রমে তাহারা পরস্পরের শত্রু। অথচ টিয়া বা সুন্দর কেহই কোন দিন স্বচক্ষে সে শত্রুতার নিদর্শন কিছু দেখে নাই। কোনও এককালে নাকি এই দুই বংশের শত্রুতার ফলে কলঙ্কিনীর খালের জলও লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে সব তাহাদের শোনা কথা—গল্প-কাহিনীর মতই মনে হইয়াছে। নিশি সজ্জন ও ভৈরব দত্তের আমলে কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এযাবৎকাল ঘটে নাই। আর না ঘটার জন্য যদি কেহ দায়ী হয় ত সে ভৈরব দত্ত। কারণ ভৈরব দত্তকে তাহার ধান-চালের কারবার দেখিতে বৎসরের মধ্যে বেশী সময়ই শহরে ব্যবসা-স্থলে থাকিতে হয়। তাহার উপরে আবার সে একটু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গোলমালের মধ্যে কিছুতেই থাকিতে চাহে না। নিশি সজ্জনের প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নপ্রকার। সে চাহে, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা উভয়পক্ষে বাধুক—সে একবার আপন শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়া বংশমর্য্যাদা কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিবে। কিন্তু এযাবৎ ভৈরব দত্ত তাহাকে সেরূপ কোনও সুযোগ দেয় নাই। এমন কি, ভৈরব দত্তের পূর্ব্বপুরুষেরা নিশি সজ্জনের পূর্ব্বপুরুষের সহিত দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার নির্দ্দিষ্ট একটা স্থান লইয়া কলঙ্কিনীর খালে যে একটা বাৎসরিক দাঙ্গায় মাতিয়া উঠিত তাহাও এখন বন্ধ হইয়া গেছে। আর বন্ধও হইয়াছে ভৈরব দত্তেরই জন্য। ভৈরব দত্ত খালের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিমা ডুবানো লইয়া দাঙ্গা বাধাইতে রাজী হইতে পারে নাই এবং যে স্থান লইয়া এতকাল এত দাঙ্গা হইয়া গেছে সে স্থানে অনায়াসেই সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা বিনা বাধায় ডুবাইতে দিয়া নিজে তাহা হইতে কিছুদূরে প্রতিমা ডুবাইবার আয়োজন প্রতি বৎসর করিতেছেন। ভৈরব দত্তের এত সাবধানতা সত্ত্বেও নিশি সজ্জন প্রতি বৎসরই দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা

করে, কিন্তু কোন বৎসরই সে সফলকাম হইয়া উঠিতে পারে না।

টিয়া ক্রমে সুন্দরের কথাই ভাবিতে লাগিল। মনোহরের কথা সেই সঙ্গে তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। হইলই বা সুন্দর তাহার বংশ-পরম্পরায় শত্রু, তথাপি সুন্দরকে তাহার কেন জানি ক্রমেই ভাল লাগিতে লাগিল। শত্রুর তাহার অভাব কি! গৃহেই কি তাহার শত্রুর অভাব আছে যে সুন্দর শত্রু বলিয়া তাহার সহিত সে আলাপ করিতে পারিবে না! আর তাহা ছাড়াও সুন্দর নিজে ত তাহার শত্রু নয়, সে তাহার পূর্ব্বপুরুষের শত্রুর বংশধর মাত্র। না, যেমন করিয়াই হউক্ সে সুন্দরের সঙ্গে আলাপ করিবে। কিন্তু কি উপায়ে যে তাহা সম্ভব তাহা সে আর ভাবিয়া পাইতেছিল না।

টিয়ার চোখের সাম্‌নে দিয়া খাল ধরিয়া বহু নৌকা চলিয়া গেল; সে কিন্তু যে নৌকাটি সন্ধান করিতেছিল সে নৌকাটিকে আর খাল ধরিয়া চলিতে দেখিতেছিল না— অর্থাৎ যে নৌকাটি তাহাদেরই ঘাটের অপর পারের ঘাটে বাঁধা থাকে। সুন্দরদের ঘাটে তাহাদের নৌকা বাঁধা নাই দেখিয়াই সে ঠিক করিয়াছিল যে, সুন্দর নিশ্চয় নৌকা লইয়া বৈকালের দিকে খালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কি কোথাও কাজে গেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া ঘনাইবার পূর্ব্বেই খালের জলে টিয়া সহসা একখানি নৌকা দেখিতে পাইল— সে নৌকা বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর, আর নৌকায় দত্ত-বাড়ীর সুন্দর বৈঠা দিয়া হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। টিয়ার অন্তর মুহূর্ত্তে উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াই লজ্জায় যেন কেমন জড় হইয়া গেল। টিয়া কোনও রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া পলাইতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন দুই হাত দিয়া তাহার দুই চোখ চাপিয়া ধরিয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—

টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল,
পায়ে ধরি, পেড়ো না গাল।

টিয়া কণ্ঠ শুনিয়াই একটা ঝট্‌কান দিয়া চোখ ছাড়াইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মুখের চেহারা তাহার মুহূর্ত্তে কেমন যেন ভয়-চকিত হইয়া উঠিল।

মনোহর একটু হাসিয়া বলিল, আমি কি সাপ, না বাঘ— যে একেবারে আঁৎকে উঠলে টিয়া?

টিয়া তাহাতেও কথা কহিল না। ক্রোধে সে শুধু নীচেকার ঠোঁট দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

মনোহর পথের মাঝে ভাল করিয়া নামিয়া টিয়ার গৃহে ফেরার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া খুব একচোট হাসিয়া লইয়া বলিল, আমি যাত্রার দলের ছেলে ব'লে তুমি আমাকে দেখতে পার' না টিয়া, তাই নয় কি?

টিয়া এইবার কথা কহিল, বলিল, না, তা মোটেই নয়। তোমার স্বভাব আমার ভাল লাগে না ব'লেই তোমাকে আমি দেখতে পারি না। কেন তুমি এখানে আসতে গেলে আমাকে বিরক্ত করবার জন্যে শুনি?

এমন সময় ওপারের ঘাটে নৌকার শিকলটা যেন অর্থযুক্ত ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল।

মনোহর তাড়াতাড়ি বলিল, ও আমি এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি টিয়া, আমারই অন্যায় হ'য়ে গেচে। ওপারের নাও যে আজকাল এ-ঘাটে এসে লাগচে তা আমি জানতাম না। আচ্ছা, এই আমি চ'লে যাচ্ছি।

ক্রমশঃ

মানুষের মূর্ত্তিচিত্র

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিত সমাজ ঘটা করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক, কবি বা ঔপন্যাসিকদের আদর, পূজা বা জয়ন্তী সম্পাদন করেন। বাঙ্গালী শিল্পীদের ভাগ্যে পূজা সম্মান ত দূরের কথা, আধুনিক প্রতিভাশালী অনেক শিল্পীর ভাগ্যে—তাঁহাদের শিল্প-সৃষ্টির যথার্থ গুণ-গ্রহণ বা সমালোচনা পর্য্যন্ত আমরা করিতে প্রস্তুত নহি। অনেক সময়, আমরা এই শিল্পীর কলা-সৃষ্টির গুণ-গ্রহণে বিমুখ হইয়া ওজর তুলি যে, আধুনিক বাঙ্গালী অতীন্দ্রিয় বাস্তব

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর ৺জলধর সেন

হইতে বিচ্ছিন্ন, আধ্যাত্মিকতার ধূমে আচ্ছন্ন যত সব প্রাচীন সেকেলে পৌরাণিক বস্তু অবলম্বন করিয়া শিল্প-সৃষ্টি করেন, যাহার সহিত ইংরেজী শিক্ষিত য়ুরোপের আধুনিক ধারায় পরিস্নাত বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী সমাজের মানসিকতার সহিত কোনও যোগ নাই। কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইলেও হয় ত আংশিকরূপে সত্য। কারণ আদমসুমারির সংখ্যা অনুসারে এদেশে আন্দাজ শতকরা সাতজন লোক
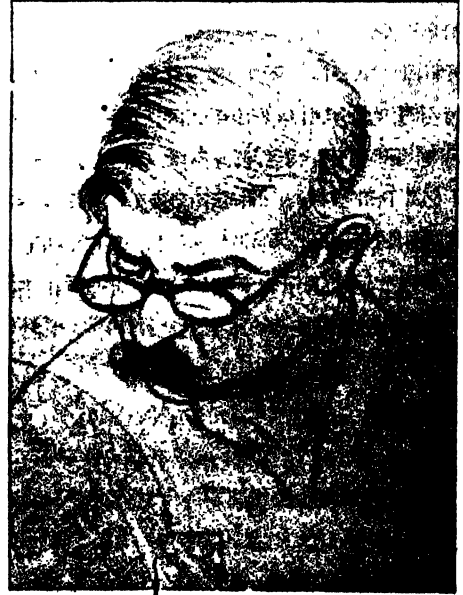
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

'শিক্ষিত' অর্থাৎ লিখিতে পড়িতে জানে। ইহার মধ্যে হয় ত শতকরা চারজন লোক ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী এবং সম্ভবত আধুনিক য়ুরোপীয় ভাবধারায় পরিপুত ও উচ্চশিক্ষিত। সুতরাং বাকী শতকরা ৯৬ জন 'যে তিমিরে সে তিমিরে'—অর্থাৎ প্রাচীন পৌরাণিকতার 'পঙ্কিলে' আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই প্রাচীন সেকেলে সংস্কারে অন্ধ ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত বাঙ্গালীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'আমরা পৌরাণিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি' একথা খাটে না। তথাপি, আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীদের

শ্রীনন্দলাল বসু

মধ্যে এমন অনেক তুলি বা লেখনী-সেবক আছেন—যাঁহারা প্রাচীন পৌরাণিক দেবতাদের উপেক্ষা করিয়া আধুনিক কালের বাস্তব জগতের মানুষের প্রতিকৃতি লিখিতে বিশেষ কৌশল ও কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। অনেকে এখন আপনাদের ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরের মূর্ত্তিচিত্র না রাখিয়া, নিজের বা আত্মীয়দের ছায়াচিত্র (photograph) বা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট—অর্থাৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে ছায়াচিত্রের পরিবর্দ্ধিত মূর্ত্তিচিত্রাদির দ্বারা গৃহসজ্জা করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যন্ত্র ও রসায়নের ছায়া-প্রতিকৃতি রসহীন যান্ত্রিক

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। শিল্পীর কলমের বা তুলিকার আঘাতে উজ্জীবিত চিত্র-রচনা বা রেখা-রচনার (drawing)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রতিকৃতিতে যে জীবন্ত রসের আস্বাদ পাই—ক্যামেরার যন্ত্রে নির্ম্মিত প্রতিকৃতিতে সে রস অনুসন্ধান করিয়াও পাই না। য়ুরোপের রসিক সমাজ অনেক সময় এই ক্যামেরার যান্ত্রিক প্রতিমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া শিল্পীর হাতে লেখা সজীব রসে সিক্ত জীবন্ত প্রতিকৃতির আদর করেন। আমাদের দেশে, ছায়া-যন্ত্রের ফটোগ্রাফ ও ব্রোমাইড পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ সুন্দর সরস মূর্ত্তি-চিত্র করিতে পারেন এইরূপ একাধিক প্রতিভাশালী কৌশলী চিত্র-শিল্পী আছেন যাঁহাদের সরস লেখনীর জীবন্ত মূর্ত্তিচিত্র কোনও ছায়া-যন্ত্র ফটোগ্রাফে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না।

কলিকাতা কেশব একাডেমীর শিল্প-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—এইরূপ একজন প্রতিভাশালী মূর্ত্তি-লেখক।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

এনলার্জমেণ্ট এখনও রাজত্ব করিতেছে। অথচ, অতি অল্প মূল্যে শিল্পীর হাতের লেখা সুন্দর রেখা-চিত্র (pencil drawing) বা কালির চিত্র (ink drawing) যথেষ্ট ইনি দেশের গণ্যমান্য অনেক মহাপুরুষের সুন্দর রেখা-চিত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যে তাঁহার রচিত কয়েকটি মূর্ত্তিচিত্রের নমুনা এই সংখ্যায় আমরা মুদ্রিত করিলাম।

স্বরূপ

শ্রীঅনন্তকুমার সরকার

শুনিবে কি আমি কে ?
নাশিতে, শাসিতে, প্রেম বিতরিতে আসি আমি যুগে যুগে।
আমি বিজ্ঞান, আমিই ভক্তি, নিষ্কাম আমি কর্ম্ম,
সত্যের বাণী প্রচার করাই চিরকাল মম ধর্ম্ম।
লীলার কারণে আমি ক'রে থাকি সৃজন, পালন, লয় ;
মৃত্যু যে মোর পদানত দাস, আমারে সে করে ভয়।
(আমি) কখনও উগ্র, কখনও শান্ত, কখনও পুলক-প্রাণ,
(আমি) দুষ্টের করি বিনাশ-সাধন, শিষ্টের পরিত্রাণ।
ভক্ত যে মম প্রাণ-প্রিয়তম, হৃদে মোর তার স্থান,
অসম্ভবে সম্ভব করি রাখিতে তাহার মান।
নিদাঘ-তপন-তাপিত মরুতে ছাড়ি আমি নিশ্বাস,
অরুণ-রঙ্গীন-প্রভাত-সমীরে বিলাই কুসুম-বাস।
ভূমিকম্পন মহামারীরূপে আনি আমি হাহাকার,
শীতলিতে আমি দগ্ধ-বসুধা ঢালি ধারা বরষার।
শারদ নিশায় চান্দ্র গগনে হাসি জোছনার হাসি,
মলয়-মথিত প্রেমিক-পরাণে ঢালি মধু রাশি রাশি।
রুদ্ররূপেতে তাণ্ডবে ছাড়ি প্রলয়-ডমরু-তান,
শ্যামরূপে হরি বাঁশরীর স্বনে জগ-জন-মন-প্রাণ।
দম্ভোলি-নাদে নিধি-কল্লোলে ছাড়ি আমি হুঙ্কার,
(আমি) মুরলীর গানে মধু-বৃন্দাবনে মোহি মন শ্রীরাধার।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল প্রতিবাদ-সম্মিলন

গত ৬ই পৌষ শনিবার বিকালে কলিকাতা কালীঘাটের হাজরা পার্কে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ সম্মিলন আরম্ভ হইয়া তিন দিন ধরিয়া তাহা চলিযাছিল। শিক্ষাকার্য্যে আজীবন ব্রতী দেশপূজ্য আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি ঐ সম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ১২শত লোক সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৫শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। পুরুষ শিক্ষক ছাড়াও বহু মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু দেশমান্য ব্যক্তি সম্মিলনে তাঁহাদের বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিশ্রম ও চেষ্টায় সম্মিলন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণীতে জানাইয়াছিলেন—"মাতৃভাষার সেবায় ও বাঙ্গালার শুভানুধ্যানে আমার জীবনের ৭০ বৎসর কালেরও অধিক অতিবাহিত করায় আমার এই নিবেদন করার অধিকার জন্মিয়াছে। আমার বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা জনহিতকর কার্য্যকলাপে যোগদানের অন্তরায় হইয়াছে। আমার মাতৃভূমির সংস্কৃতির নিজস্ব ধারার অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি এবং এমন কি রোগশয্যা হইতেও এই ক্ষুদ্র নিবেদন প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

বাঙ্গালার হিন্দু রক্ষা আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ সার শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতিবাদ সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্থাপিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটিকে কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বৃটীশ রাজত্ব ভারতবর্ষে আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এতকাল পর্য্যন্ত দেশের লোককে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট নানা আকারে কর আদায় করিয়াই চলিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষার মত নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও লোকের প্রতি কর্ত্তব্যের অতি সামান্য অংশই পালন করিয়াছেন। জনসাধারণ ও জননায়কেরা মিলিয়াই আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহা দ্বারাই এতাবৎকাল দেশে শিক্ষা বিস্তারের কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা প্রচারে এই যে স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা দেশের লোক স্থাপন করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের দায় আপনারাই বহন করিয়াছে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের নাম দিয়া তাঁহারা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

সম্মিলনের সভাপতিরূপে আচার্য্য রায় মহাশয় যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হইল শিক্ষা পরিচালনা সম্বন্ধে নীতিনির্দ্দেশ। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরিচালনা অংশত সরকারী শিক্ষা বিভাগের এবং অংশত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব একীভূত করাই প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য এই বিলে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐক্যসাধনের নামে যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে ঐক্যের পরিবর্ত্তে পরিচালন কর্ত্তৃত্ব আরও বিভক্ত হইবে। গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় তো থাকিবেই, তাহার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড জুটিবে। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আচার্য্য রায় এই বলিয়া এই বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন জানাইয়াছেন —"বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব একীভূত করার উপযোগিতায় আমি সন্দিহান। বর্ত্তমানে প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিধা কর্ত্তৃত্ব মোটের উপর ভালই চলিয়াছে। কিছু কিছু সংস্কার করিয়া

লইলে এবং মধ্যশিক্ষার উৎকর্ষ ও প্রসারের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য মিলিলে ইহা হইতে আরও উৎকৃষ্টতর ফললাভ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার যে সকল ত্রুটি, তাহা দ্বৈধ কর্ত্তৃত্বের ফলে ঘটে নাই, অর্থাভাবে ঘটিয়াছে।"

আচার্য্য রায়ের এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অনেক সহজসাধ্য হইয়া ওঠে, স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড গঠনেরই প্রয়োজন হয় না। আচার্য্য রায় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য স্থানে এরূপ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনে সুফল পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ৮ ঘণ্টা আলোচনার পর ৪টি প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দিনই সম্মিলন শেষ হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে সম্মিলন এমন একটি পৃথক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের দাবী করেন যে, বোর্ড হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্য্য করিবে। বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডটি যদি বাঙ্গালা প্রদেশে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে সম্মিলন হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়কে উক্ত বোর্ডে কার্য্য না করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটী-গুলিকে ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দকে উক্ত বোর্ড ও উহার অনুমোদনপ্রার্থী বিদ্যালয়কে বয়কট করিতে আহ্বান জানান। এই প্রস্তাবে সম্মিলন যে অভিমত প্রকাশ করেন, এই প্রদেশের সকল দল ও উপদলের প্রতিনিধিবৃন্দ একবাক্যে তাহাতে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। (ক) বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটির তীব্র নিন্দা করিয়া ও অবিলম্বে উহার প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া (খ) সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি 'বঙ্গীয় শিক্ষা অর্থ ভাণ্ডার' স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করিয়া ও (গ) সর্ব্বদলের প্রতিনিধিসহ একটি শক্তিশালী কমিটী গঠন করিয়া—সম্মিলনে ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে সেই কমিটীর নাম দেওয়া হইয়াছে—বঙ্গীয় শিক্ষা কাউন্সিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন—সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সম্পাদক—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কোষাধ্যক্ষ—কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। সহকারী সম্পাদক—হরিচরণ ঘোষ। হিসাব পরীক্ষক—জি-বসু।

কার্য্যকরী কমিটীর সদস্যগণ—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (চেয়ারম্যান), সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র-নাথ বসু, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দিনাজপুর), নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রশান্তকুমার বসু, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, নলিনীরঞ্জন মিত্র, মৃণালকান্তি বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, রমণীমোহন রায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্তা ইলা সেন।

যে সকল কারণে এই শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, সেই কারণগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বিলটিতে শিক্ষার স্বার্থকে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিচার বুদ্ধির অধীন করা হইয়াছে এবং জাতীয় শিক্ষার একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যে সংস্কৃতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন বিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে। (২) মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা বিলের উদ্দেশ্য। প্রধানত ব্যক্তিগত দান ও উৎসাহের ফলে বাঙ্গালার মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইয়াছে; সেই ব্যক্তিগত দান ও উৎসাহকে সঙ্কুচিত করাই বিলের উদ্দেশ্য। (৩) মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কোনরূপ পরিকল্পনার আভাষই বিলে নাই এবং মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবহারিক শিক্ষার সংগঠন ও উন্নতিসাধনের যে প্রয়োজনীয়তা এত বেশী অনুভূত হইয়াছে সেই ব্যবহারিক শিক্ষাদানের কোনরূপ ব্যবস্থাই বিলে নাই। (৪) বিলে যে আর্থিক সংস্থান করা হইয়াছে তাহা মাধ্যমিক

শিক্ষালয়গুলির সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অপ্রচুর; যথেষ্ট সাহায্য ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার কোন উন্নতি বা সংস্কারই সম্ভব নহে। (৫) বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গঠনতন্ত্রটি অত্যন্ত অসন্তোষজনক। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের সহায়তা লাভের প্রয়োজনীয়তা বিলে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতিতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি গ্রহণের কোন ব্যবস্থাই নাই। বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটি-গুলির বা অভিভাবকদের অথবা শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণের পক্ষ হইতে বোর্ডে কোন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। বোর্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর; (৬) মাধ্যমিক শিক্ষার কার্য্যপরিচালন ব্যবস্থাটা সহজ ও সরল করার পরিবর্ত্তে বিলে শিক্ষার কার্য্য পরিচালনার যন্ত্রটি জটিল ও ঘোরালো করিয়া তোলা হইয়াছে। (৭) বাঙ্গালায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে বর্ত্তমানে যে সব সুযোগসুবিধা আছে বিলের দ্বারা তাহা নিদারুণভাবে সঙ্কুচিত হইবে এবং দুই বৎসর পর বর্ত্তমান সমস্ত বিদ্যালয়ের অনুমোদন স্বভাবতই প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া বিলে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার ফলে জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইবে। (৮) বাঙ্গালার হিন্দুগণ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রদের শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্র সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং তদপেক্ষাও অধিক হারে মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলির জন্য অর্থ সরবরাহ করেন; বিশেষ করিয়া সেই হিন্দুদের শিক্ষাবিষয়ক স্বার্থের সঙ্কোচন করাই বিলের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত বোর্ডে বহুসংখ্যক সদস্য শিক্ষাগত স্বার্থের প্রতিনিধিরূপে বোর্ডে যাইবেন না; তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হিসাবে বোর্ডে যাইবেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে। উপরোক্ত কারণে প্রস্তাবিত বোর্ড জনসাধারণের আস্থা লাভ করিতে পারিবে না। (৯) যদিও আইনের দ্বারা পৃথক একটি ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষা বোর্ড ইতিপূর্ব্বেই বহাল আছে তথাপি বোর্ডে অযৌক্তিক ও অধিক পরিমাণ ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (১০) বিলে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাটি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে রাখা হইয়াছে; অথচ ঐ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যবিষয় স্থির করার ও পাঠ্য পুস্তক নির্ণয় করিয়া তাহা প্রকাশ করার অধিকার হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা একটি বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করাই বিলের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় আর্থিক দিক হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সঙ্কুচিত করা হইবে ও তাহাতে উচ্চ শিক্ষার স্বার্থকে প্রবলভাবে আঘাত করা হইবে। (১১) পাঠ্য বইসমূহের নির্দ্ধারণ ও প্রস্তুত করার ক্ষমতা বিলে এমন কতকগুলি স্পেশ্যাল কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে, যেগুলি বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক চরিত্রের হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে যোগ্যতার দিক হইতে পাঠ্যপুস্তকগুলির অত্যন্ত অবনতি ঘটিবে। বিলটির দ্বারা বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের মৌলিকতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং এই প্রদেশের সংস্কৃতি ধ্বংস হইবে। এইরূপ যে হইবে তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িক প্রভাবাধীন শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে স্পষ্টত দেখা যাইতেছে। (১২) স্যাডলার কমিশনের সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে বিলটি প্রণীত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিলটি সর্ব্ববিষয়েই স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলির বিপরীত এবং মাধ্যমিক বোর্ড গঠনের জন্য যে সব সর্ত্ত থাকা উচিত বলিয়া কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন বিলে সেই সর্ত্তগুলি পালনের কোন ব্যবস্থাই নাই।

কন্যাকুমারী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম-এ

অয়ি শুচিস্মিতা সিন্ধুস্নাতা কন্যাকুমারী তুমি কি মাতা ?
তুমি সে সাধিকা চির আরাধিকা যোগমগনা তপস্যারতা !

সীমাহীন মহা জলধির বুকে মুক্তি লভিল যেথায় ধরা
একাকিনী সেই বিজনপ্রান্তে কি সাধনে রত আপনহারা !

কোথা গিরিরাজ জনক তোমার কোথায় জলধি অতলস্পর্শ !
কার তরে এই চির অভিসার কে জাগালো প্রাণে বিপুল হর্ষ ?

ত্রিজগৎ মাঝে আর কেবা আছে শিবের সমান যোগ্যবর ?
তাঁরি গলে বর মাল্য অর্পিতে মহাতপ যুগ যুগান্তর।

ভাঙ্গিল ধেয়ান টলিল আসন মহাযোগীশ্বর করুণাকর,
বরবেশে সাজি পরমোল্লাসে বৃষভবাহনে চলিলা হর।

পথ সুদুস্তর বৃষভমন্থর বিবাহ-লগন হইল পার,
স্তম্ভিত পথে বরের যাত্রা নিয়তির গতি দুর্নিবার।

হেথায় বালিকা অর্ঘ্য সাজায় অক্ষত সিন্দুর কজ্জলে
মঙ্গল শঙ্খ সঘনে বাজায় ললাটিকা শোভে উজ্জ্বলে।

কুরুবক মালা করে লয়ে বালা অধীর প্রতীক্ষা—ভেটিবে বর,
রূপের ঝলকে চমকে বিজলি উজলিছে মহীমহাসাগর।

কোথা বর কোথা বিবাহবাসর নিরানন্দ সারা জগৎময় !
ব্যর্থ জীবন ব্যর্থ আরাধন সুকুমারী চিরকুমারী রয় !

মলয়ে শ্বসিল দীর্ঘনিশ্বাস জলধি উঠিল উচ্ছুসি
দূরে নটরাজ উর্দ্ধ তাণ্ডবে নাচে বাঘাম্বর পড়িল খসি।

বরমালা কন্যা ফেলিল সলিলে পুলিনে ছড়ালো অর্ঘ্যথালি
দাঁড়াইল যেন পাষাণ প্রতিমা আভরণ সব ফেলিল খুলি।

দিগ্‌বধূগণ-নয়ন-অশ্রু শেফালি হইয়া ঝরিল পায়,
অযুতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠে কুমারী-পূজার বেলা যে যায় !

যুগযুগান্ত বহি একান্তে বিরহের গুরু দুঃখ-ভার,
মহাযোগিনী-বিগ্রহ রাজে চিরকুমারীর ব্যর্থতার।

বরমালা করে তেমনি রয়েছে মিলনের আশা অন্তহীন
ধ্যান ধরি' বালা অপলক নেত্রে যাপিছে বিরলে রজনী দিন

ভারতমাতার চরণ পদ্ম চুমিছে সিন্ধু-সঙ্গমে,
যেথা দুখহীন অসীমশান্তি বিরাজে স্থাবর জঙ্গমে ;

গগনে পবনে চির বসন্ত বহে ধরণীর বিজয়-বাণী
যুগে যুগে সেথা ব্রতচারিণী পতি-আশে রাজে কুমারীরাণী।

যে বরণ ডালা মনোদুখে বালা ছড়ায়ে ফেলিল বালুকাতটে
সেই অক্ষত সেই কজ্জল সে সিন্দুর আছে তেমনি বটে !

আজিও সিন্ধু নিতিনিতি মালা গাথিয়া সাজায় তটের বুকে
বরুণ আলয়ে জলকন্যাগণ মঙ্গলশঙ্খ বাজায় সুখে।

[ভারতের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারী (Cape Comorin)। তিন দিকে তিন বিশাল সমুদ্র—পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর—তাহারই সঙ্গমে যে স্থলবিন্দু, তাহাতেই কন্যাকুমারীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থলপুরাণে গিরিরাজকন্যা উমার তপস্যার কাহিনী বিবৃত আছে। কন্যাকুমারী হইতে আট কি দশ মাইল দূরে শুচীন্দ্রম্ মন্দিরে শিবের মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এই যে, শিব সেই পর্যন্ত আসিতে আসিতে কলিযুগের আরম্ভ হয়। কলিযুগে দেবতাদের বিবাহ নাই। চিদম্বরমে শিবের উর্দ্ধতাণ্ডব নটরাজমূর্ত্তি আছে। কন্যাকুমারীর বালুকা দেখিতে আতপ চাউলের ন্যায়। সমুদ্রের কোলে লাল এবং কালো বালুও রহিয়াছে—উহাই বরণ ডালার সিন্দুর এবং কজ্জল।]

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

আজ আমরা 'ভারতবর্ষ'এ যাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিব, তিনি যে কত দিক দিয়া বাঙ্গালা দেশে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কিন্তু কোন দিন জমিদারপুত্রের মত হন নাই ; যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছেন। তাঁহার পোষাক দেখিয়া বা তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তিনিই যে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, সি-এস আই, ভারতরত্ন—তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। তিনি সাধারণ মোটা থান ধুতি পরিধান করিতেন, মোটা টুইলের শার্ট পরিতেন। অতি অল্পদামের বোম্বাই চাদর গায়ে দিতেন ও তৎকালে প্রচলিত পেনেলা জুতা পায়ে দিতেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বালক, কি বৃদ্ধ— যিনি যে কাজে রাজা প্যারীমোহনের নিকট যাইতেন, সকলকেই তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া সকলের অভাব অভিযোগ শুনিতেন ও দুঃখীর দুঃখ নিবারণে চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। এই সকল কারণে তিনি বহুদিন সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া বাস করিয়া গিয়াছেন এবং আজিও তাঁহার কথা স্মরণ করিলে লোকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া থাকে। জয়কৃষ্ণবাবু সারা জীবনে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র প্যারীমোহন সেগুলিকে শুধু উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিয়া ও তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না—তিনি নিজেও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্যারীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলে তিনি স্বনামখ্যাত রামতনু লাহিড়ী ও ডাক্তার গ্রাণ্টের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এল ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এম-এ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তিনিই প্রথম এম-এ ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার পর পনর বৎসরেরও অধিক কাল তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতি করিয়াছিলেন। ধনী জমিদারের পুত্রের পক্ষে এইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করা বা আইনের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা সে দিনে অসাধারণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। ১৮৭৯ সাল হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে তিনি কয়েকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। সে সময়ে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা হয় ও প্যারীমোহন সেই আলোচনায় যোগদান করিয়া নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করেন। ঐ আইনের আলোচনার মধ্যভাগে রায়বাহাদুর কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হওয়ায় বাঙ্গালার জমিদারগণ তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের লোকের অভাব হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন—কিন্তু প্যারীমোহন এমন ধীরতা ও স্থিরতার সহিত কৃষ্ণদাস পালের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, সকলকেই তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হইয়াছিল। প্যারীমোহন এক দিকে যেমন জমিদারের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন, অন্য দিকে তেমনই প্রজার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। তাঁহার এই পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির জন্য ১৯০৭ সালে পুনরায় যখন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা হয় তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন।

তিনি বহুদিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জমিদার-সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে এসোসিয়েশন নানাভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্যারীমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ফেলো ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে নামক বাঙ্গালী পরিচালিত রেলপথের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

পুস্তক পাঠে তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল এবং তিনি

প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা কাল বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন।

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪টা ৪০ মিনিটের সময় ৮৩ বৎসর বয়সে প্যারীমোহন স্বর্গারোহণ করেন।

জীবনের শেষ পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানের কাজই উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনি নির্জ্জনে বাস করিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু কর্ম্মের প্রতি তাঁহার আগ্রহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। জনসেবা ও রাজসেবার পুরস্কার-স্বরূপ ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিকটোরিয়ার স্বর্ণ জুবিলী উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা ও সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করেন। পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে প্যারীমোহন উত্তরপাড়ার রেল স্টেশন খোলার ব্যবস্থা করেন এবং লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কলেজ এখনও তাঁহার স্মৃতিবক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে বহু দরিদ্র ছাত্র তথায় অতি অল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করিতেছে। তাঁহার পিতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরপাড়ায় যে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে তাহা আরও উন্নতি লাভ করে।

শিক্ষা বিস্তারে দান এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য। পিতা একত্রিশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, পুত্র এই কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা পূর্ণাঙ্গ করেন। উত্তরপাড়ায় জলের কল, বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন কিংস হাসপাতাল, সেণ্ট জন্স এম্বুলেন্স, ভিকটোরিয়া স্মৃতিসৌধ, রিপন কলেজ প্রভৃতির জন্যও তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা সমিতিতে তাঁহার পঁচিশ হাজার টাকা দান তাঁহাকে বিজ্ঞান জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও প্রচারের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং স্বাধীনচেতা হইয়াও তিনি আচার ও নিষ্ঠা সারা-জীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সময়নিষ্ঠ লোক এ যুগে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি অনুরাগ হওয়ায় তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দান করিতেন ও বহু রোগীর চিকিৎসা করিতেন।

১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে আমরা 'ভারতবর্ষ'এ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ত্রিবর্ণ চিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবন কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রায় দশ বৎসর পরে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজা প্যারীমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইলাম।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ শুধু ধনে নয়, জ্ঞানেও বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশে আরও বহু সুধী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমরা

আবুল হোসেন

আমরা ডুবিয়া আছি মৃত্যুর অতল অন্ধকারে,
কবর গহ্বরে আজি মনুষ্যত্ব লুকায়েছে মুখ;
আহার, বিহার, সুপ্তি! শান্তির নির্বিঘ্ন ছায়াতলে
কাটে দীর্ঘ রাত্রি দিন অবিচ্ছিন্ন অনায়াস সুখে;
দগ্ধ হ'তে অগ্নি জ্বালে কোথা সেই দুরন্ত দুর্ম্মুখ?
শুনায়েছি যুগে যুগে শোণিত লোলুপ দেবতারে
আমরা ক্ষমায় বাণী। অহিংসার স্নিগ্ধ ছত্রতলে
টানিয়াছি বিশ্বে। ওরা হাসিয়াছে করুণা-কৌতুকে।
আমরা মরিয়া গেছি। আমাদের প্রাণহীন মমি
পাথরে খোদাই মূর্ত্তি। অস্থিসার নির্ব্বাক কঙ্কাল
পুরাতনী ইতিহাস ঐতিহ্যের পিরামিডতলে
রয়েছে দাঁড়ায়ে আজো। দক্ষিণের পবন প্রণমি'
বয়ে যায়। আমাদের স্পন্দন জাগে না মর্ম্মতলে
অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা আমরা খোলস একতাল।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

মধ্য প্রাচী

গ্রীস তাহার সমুদ্রাংশ ও ঘাঁটি বৃটেনকে ব্যবহার করিতে দিয়াছে, এই অভিযোগে গত ২৮এ অক্টোবর ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণের সপ্তাহকাল পরেও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রীস শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিবে—ইটালী ইহাই আশা করিতেছে। অথবা বোধ হয় জার্ম্মান সৈন্যও গ্রীসের উপর নিপতিত হইবে, ইহার জন্যই ইটালী প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেড় মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধের গতি যে দিকে চলিয়াছে তাহাতে জনসাধারণ অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রীস আক্রমণের পূর্ব্বে পূর্ণ তিন মাস ইটালী প্রস্তুত হইয়াছে এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। জল, স্থল এবং বিমান—সর্ব্বক্ষেত্রেই সে নিজেকে অজেয় করিবার ত্রুটি করে নাই; সদম্ভ উক্তির দ্বারা মুসোলিনী ইহা সাধারণকে জানাইতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, সামরিক অবস্থানের দিক দিয়াও ইটালীর অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক ছিল না। ইটালীর ডোডেকানিজ, ঘাঁটি হইতে পোর্ট সৈয়দের দূরত্ব চারি শত মাইলের অনধিক, সুতরাং ইহা সহজ বিমান পাল্লার মধ্যে অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বৃটেনের যে কোন ঘাঁটি হইতে ক্রীটের দূরত্ব অপেক্ষা ডোডেকানিজ হইতে ক্রীটের দূরত্ব অনেক কম। মাল্টা হইতে টিউনিসের দূরত্ব নব্বই মাইল, সিসিলি হইতে উহার ব্যবধান আরও অল্প। সুতরাং যুদ্ধের প্রারম্ভে সকল দিক দিয়াই ইটালীর অবস্থা যে অনুকূল ছিল ইহা নিঃসন্দেহ।

তবে ইটালী দ্বারা বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকৃত হওয়ার পর হইতেই ভূমধ্যসাগরে বৃটেন যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের অগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিবার প্রারম্ভেই সে ক্রীট দ্বীপে যথেষ্ট সৈন্য অবতরণ করাইয়াছে। গ্রীসকে সে যে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছিল তাহার অন্যথা হয় নাই। আজ গ্রীসের প্রত্যেক বিমান ঘাঁটি রাজকীয় বৃটিশ বিমানবাহিনীর কর্ত্তৃত্বাধীন। গ্রীক বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ইটালীয় সৈন্যদিগকে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের বাহিরে তাড়াইয়া আলবেনিয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। অসংখ্য ইটালীয় সৈন্য আজ গ্রীকগণের হস্তে বন্দী, ইটালীর প্রভূত রণসম্ভার বর্ত্তমানে গ্রীসের করতলগত।

একদিকে ইটালীয় সৈন্যগণ যেমন গ্রীকদিগের হস্তে পর্য্যুদস্ত হইতেছে, অপর দিকে উত্তর আফ্রিকায় ইটালীকে তেমনই শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে। মিশরের সীমান্তে ইটালীর অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি এবং ঐ অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র ছিল সিদিবারানী। মার্শাল গ্র্যাৎসিয়ানী পরিচালিত লিবিয়ার ইটালীয় সৈন্যগণ মিশরের সীমান্তে সিদিবারানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় শক্তি প্রসারের চেষ্টায় কিছুদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছিল। বর্ত্তমানে এই অগ্রবর্ত্তী ইটালীয় ঘাঁটি মিত্রশক্তির প্রবল আক্রমণে ইটালীর হস্তচ্যুত হইয়াছে। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, দুই ডিভিসন অর্থাৎ একত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজার বন্দী হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যাও নিশ্চয় এরূপ অবস্থায় সামান্য নয়। সুতরাং ইটালীর দুই ডিভিসন সৈন্যই এখানে নষ্ট হইয়াছে। মিত্রশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণের তীব্রতার সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া ইটালীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটিশ-বাহিনী ইটালীয় এলাকায় প্রবেশ করিয়া লিবিয়ায় সংগ্রাম করিতেছে। বার্দ্দিয়া, টব্রুক এবং সল্লামের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমানে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে আদ্দিস্আবাবা-জিবুতি রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত। ইটালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং আবিসিনিয়ায় বিদ্রোহ আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

সিদিবারানীর যুদ্ধে ইটালী প্রভূত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন করিতে হইলে লিবিয়াতেও প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং মিত্র-শক্তির জয়লাভ প্রয়োজন। সিদিবারানীর সংগ্রাম এই বৃহৎ সমর-নাট্যের প্রথম অঙ্ক মাত্র। কিন্তু এই উভয় স্থানের শোচনীয় পরাজয়ে ইটালীর পরিকল্পনা সফল হইবার সম্ভাবনা আর রহিল না।

হিটলার ও মুসোলিনী ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আফ্রিকা ও পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরকে নাৎসি-ফ্যাসিস্ত হ্রদে পরিণত করা প্রয়োজন। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন্ পরিকল্পনা সম্ভব সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্যই মুসোলিনীর গ্রীস আক্রমণ ও উত্তর আফ্রিকার সাগরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ দখল করিবার চেষ্টা বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। মুসোলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, সুয়েজ পর্য্যন্ত নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইলে একদিকে যেমন পোর্ট-সৈয়াদ অবধি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত শক্তি বিস্তারের প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনই গ্রীস পর্য্যন্ত জয় করিয়া পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরের উত্তর উপকূল আপন দখলে আনা একান্ত আবশ্যক। ভূমধ্য-সাগরে ইটালীর যে সকল ঘাঁটি আছে উহা ব্যতীত যদি ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূল নিজ অধীনে আনা যায় তাহা হইলে স্বভাবতই ঐ স্থানে বৃটিশ প্রভাব প্রভূত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং পশ্চিম এশিয়ায় শক্তি বিস্তারের পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সাহায্যে আসিবে। কিন্তু গ্রীসের সহিত যুদ্ধে এবং উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাজিত হওয়ায় বর্ত্তমানে ইটালীর এই পরিকল্পনা সুদূরপরাহত।

দুইটি যুদ্ধক্ষেত্রেই ইটালীর এই পরাভবের ফলে সাধারণের মধ্যে

একটি মাত্র প্রশ্ন প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—জার্ম্মানী এখন কি করিবে? ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র, বিশেষত ফ্রান্সকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরাভূত করিতে পারায় হিটলার আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটেনও জার্ম্মানীর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেইজন্য হিট্‌লার অন্তরীক্ষ হইতে বৃটেনের উপর প্রবল বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। কারণ, বর্ত্তমান যুগে আধুনিক রণ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় বিমান শক্তির গুরুত্ব এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই জন্যই বৃটেনের উপর বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষিত হইতেছে। বেসামরিক অঞ্চলের উপরই বোমা বর্ষিত হইয়াছে অধিক। কারণ, জার্ম্মানী আশা করিয়াছিল যে তাহাতে বৃটেনের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে এবং অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কায় ও জনসাধারণের চাপে বৃটেন সরকার নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতে পারে। এদিকে বৃটেন যাহাতে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে না পারে তজ্জন্য হিট্‌লার ইটালীকে মধ্য প্রাচীতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বিচারে বোমা বর্ষণদ্বারা বৃটেনকে পরাভূত করিবার এই শরৎকালীন প্রচেষ্টা আমরা ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি। বৃটেনের সামরিকশক্তি, বৃটিশ বৈমানিকগণের কৃতিত্ব ও বৃটিশ জনসাধারণের অনমনীয় দৃঢ়তাই হিট্‌লারের বিফলতার কারণ।

সেইজন্য জার্ম্মানী তাহার রণনীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বৃটেন আক্রমণের জন্য বিমানের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে, মধ্য প্রাচীতে জার্ম্মানী মনোনিয়োগ করিয়াছে। গ্রীস, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি সকলের সহিত কূটনৈতিক আলোচনা করা হইয়াছে। বিনাযুদ্ধে অথবা ভয় দেখাইয়া অনেক রাষ্ট্রকেই জার্ম্মানী 'এক্সিস'শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। রুমানিয়া তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে; রাজা ক্যারল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রুমানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, এন্টনেস্কুর ডিক্টেটরী শাসন সেখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রীস বৃটেনের প্রতিশ্রুতির উপরে নির্ভর করিয়া থাকায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো এবং মলোটভের সঙ্গেও গোপন আলোচনা বাদ যায় নাই। এদিকে বৃটেনের উপর আবার কয়েকদিন যাবৎ প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করা হইতেছে। লণ্ডন, বার্মিংহাম ও শেফিল্ডের উপরই প্রধানত বোমা বর্ষিত হয়। ইটন কলেজও বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত। তুরস্ককে হাত করিবার আশা এখনও হিট্‌লার পরিত্যাগ করেন নাই। তুরস্কে এই মর্ম্মে জার্ম্মানী নাকি প্রচার কার্য্য চালাইতেছে যে, জার্ম্মানীর সম্মতি ব্যতীতই ইটালী স্বেচ্ছায় বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। অর্থাৎ প্রচারের মর্ম্ম বোধ হয় এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইটালীকে সাহায্য করিবার জন্য জার্ম্মানীর কোন বাধ্য বাধকতা নাই। ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে শোচনীয় ইহা নিঃসন্দেহ। গ্রীসের সহিত যুদ্ধে কোরিট্‌জার পতনের পর হইতেই ইটালীতে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। বার্লিন হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মার্শাল ব্যাডগ্‌লিও ইটালীয় সৈনিকদের প্রতি সামরিক শান্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাডগ্‌লিও তাঁহার পদ হইতে আজ অপসারিত। মঃ পিয়ারে লাভাল আর মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মঃ ফ্লাদাঁ পররাষ্ট্রসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মঃ পেতাঁ জানাইয়া দিয়াছেন। উপরন্তু ইটালীতে বিরুদ্ধমতবাদী একদলকে হত্যা করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। মুসোলিনীর সদম্ভ উক্তির অন্তরালে ফ্যাসিস্তদল ও সমর বিভাগে যে গভীর গলদ ছিল, দূষিত ক্ষতের মতই আজ তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলেও, জার্ম্মানী কি সত্যই ইটালীকে ত্যাগ করিবে? ইটালী এক্সিস্-শক্তির এক প্রাচীন অঙ্গ। ইটালীর পরাজয়ে কি এক্সিস্ শক্তির পরাজয় ও অগৌরব নয়? আর, ইটালীকে পরিত্যাগ করিতে দেখিলেই কি বলকান রাষ্ট্রসকল বৈষ্ণবীভঙ্গীতে দুই হাত মাথায় তুলিয়া "প্রভুর ইচ্ছা" বলিয়া জার্ম্মানীর অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? তবে?

অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, শীতকালে ঘন কুয়াসার আবরণের অন্তরালে সঙ্গোপনে জার্ম্মানী ইংলিস প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে অবতরণ করিবে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয়। যে ঘন কুয়াসার সুবিধা জার্ম্মানী গ্রহণ করিবে, সেই কুয়াসা বৃটিশ ও জার্ম্মানী উভয় পক্ষের সৈন্যদেরই সমান অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। বৃটেন ও জার্ম্মানীকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থা না করিয়া বসিয়া নাই। এতদ্ব্যতীত ইংলিশ প্রণালীর অপর তীরে প্রেরিত জার্ম্মান সৈন্যগণের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংযোগ রক্ষা করার প্রশ্ন আছে। উপরন্তু এইভাবে বৃটেন আক্রমণ করিলে ইটালীর তাহাতে সুবিধা হইবার কোন আশা নাই। বৃটেনের যে সকল সৈন্য মাতৃভূমির বাহিরে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান করার কোন প্রয়োজন বৃটেনের নাই।

তাহা হইলে জার্ম্মানী কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে? ইটালীর অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হওয়ায় জার্ম্মানীর কূটনৈতিক কার্য্যপন্থা ক্ষুণ্ণ হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। তবে জার্ম্মানী কি বুলগেরিয়ার পথে তুরস্কের দিকে অগ্রসর হইবে? কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মানী এই পন্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া বোধ হয় না।

স্পেনের সাহায্যে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মানীর তৎপর হওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিগত বৎসরে জার্ম্মানী চুম্বক মাইন ব্যবহার করিলেও এ বৎসরে তাহা সে ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সমুদ্রবক্ষে তাহার তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডুবো জাহাজ ও রণপোতের সাহায্যে সে যাত্রী জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইতেছে। কিন্তু যাত্রী জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইয়া যে যুদ্ধ জয় করা যায় না ইহা হিট্‌লারের অজ্ঞাত নয়। তবে ইহার উদ্দেশ্য কি? হিট্‌লার বোধ হয় এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব। সেইজন্য অর্থনৈতিক অবরোধের চেষ্টা তিনি করিতেছেন। এই কারণে স্পেনের সাহায্যে জিব্রাল্টারের মধ্যস্থতায় ইয়োরোপের সহিত আফ্রিকার সংযোগ সাধনের চেষ্টা জার্ম্মানী করিতে পারে এবং ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে খুবই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত, এশিয়া ও আমেরিকা হইতে প্রেরিত মালবাহী বৃটেনগামী বাণিজ্যপোতগুলিকে মধ্যপথে অবরোধ করিবার উদ্দেশে

জার্ম্মাণী পশ্চিমে আফ্রিকার কোন সুবিধাজনক বন্দরাদি দখলের চেষ্টা হয়ত করিবে। এদিকে রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে, ইটালীর এই অভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নত করিবার জন্য জার্ম্মাণী হয়ত সামরিকভাবে ইটালীর কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে। জার্ম্মাণী হইতে গোয়েন্দা ও সামরিক কর্ম্মচারী আনিয়া ইটালীর জনসাধারণের নৈতিক সাহসকে উদ্দীপ্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু হিট্‌লারের ন্যায় কূটরাজনীতিক কি এক্ষেত্রে শুধুই বেগার দেবেন? অথবা এই কার্য্যের বিনিময়ে ইটালীর অধিকৃত ফ্রান্সের কয়েকটি স্থান স্পেনকে দিয়া তাহার মনস্তুষ্টি ও স্বকার্য্য সাধনের উদ্যোগ করিবেন? তবে যুগোশ্লোভিয়ার মধ্য দিয়া জার্ম্মাণী পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয় কিনা ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বিগত ১৭ই জুলাই বৃটেন ব্রহ্মচীন পথ সাময়িকভাবে তিন মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ২৭শে সেপ্টেম্বর বার্লিনে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কয়েকদিন পরে ১৭ই অক্টোবর তিন মাস পূর্ণ হওয়ায় ঐ দিন চীনব্রহ্ম পথ উন্মুক্ত হয়। পথ উন্মুক্ত হওয়ার পর চীন জানায় তাহাদের মাল কানমিন্দে পৌঁছিয়াছে, পক্ষান্তরে বিমান আক্রমণ দ্বারা মেকং নদীর সেতু বিধ্বস্ত করিয়া গমনাগমনের উপায় জাপান নষ্ট করিয়া দিয়াছে। জাপানের কথা সত্য হইলেও তাহা সামরিক অসুবিধা ঘটাইত মাত্র। যাহাই হউক, জাপান ত্রিশক্তি চুক্তির ফলে অন্যদিকে মনঃসংযোগ করিবার প্রয়োজন বোধ করায় চীনের উপর আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করে। কিন্তু তাহা হইলেও সুদূর প্রাচী সে সময় নিস্তব্ধ হইয়া যায় নাই। জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের প্রতি মনোনিবেশ করে। থাইল্যাণ্ড (শ্যামরাজ্য) জাপানের তাঁবেদার হইয়া দাঁড়িয়া যায়। কিছুদিন আগে থাইল্যাণ্ড ইন্দোচীনে হানা দেয়। সম্প্রতি উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফরাসী বিমান বাহিনী থাইল্যাণ্ডের বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে। সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটাইবার জন্য থাইল্যাণ্ড-সরকার ফরাসী ইন্দোচীনের নিকট "সীমান্ত কমিশন" নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়াছেন। এদিকে জাপান কয়েকদিন পূর্ব্বে নানকিং গভর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ওয়াং-চিঙ্-ওয়েইর সহিত চুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু বিপদ হইয়াছে রাশিয়াকে লইয়া। রাশিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে চীনের সহিত তাহার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে। জাপ-নানকিং চুক্তির মধ্যে কমিণ্টার্ণ বিরোধী একটি ধারা আছে। জাপান সোভিয়েট রাশিয়াকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, রাশিয়ার সহিত বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে উহা সন্নিবেশিত হয় নাই। কিন্তু রাশিয়া তাহাতে পূর্ব্বমতের কিছুই পরিবর্ত্তন করে নাই। আমেরিকা চীনকে দশ কোটী ডলার ঋণ দিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। জাপান অবশ্য এ কথা জানাইয়া দিয়াছে যে যদি আমেরিকা বর্ত্তমান সংগ্রামে লিপ্ত হয় তাহা হইলে জাপানও যুদ্ধ করিতে ছাড়িবে না। বৃটেনও চীনকে এক কোটী পাউণ্ড ঋণ দিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সুতরাং চীনের অবস্থা এখন ভালই। চীনযুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া জাপান যে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিবে সে সুবিধা পাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। চীনের সহিত জাপান যদি এখন পূর্ব্বের সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করে, তাহা হইলেও এতদিন প্রতিকূল অবস্থা ও বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়া চিয়াং-কাই-শেক যে বর্ত্তমানে এত সুযোগ ত্যাগ করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হইবেন ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

চণ্ডীদাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কোথা কবে জন্ম নিলে পণ্ডিতেরা করিছে বিবাদ
তাই নিয়ে। তব পদ-কমলের মাধুরীর স্বাদ
দ্বন্দ্ব-কোলাহলে আজ দাদুরীর কলরবে হায়
কমল-মাধুরী-সম সরোবরে কোথায় হারায়!

এ পৃথ্বী বিপুলা বটে, তাই বলি অন্নজল দিয়া
রক্তমাংসময় তব একখানি শরীর গড়িয়া
তোমারে করিবে বন্দী, হেন শক্তি আছে কি তাহার?
কাল নিরবধি বটে, তাই বলি' জীবন তোমার
পরিচ্ছিন্ন পরিমিত করিবে সে বর্ষের গণ্ডীতে
হেন স্পর্দ্ধা আছে তার? যত দ্বন্দ্ব করুক পণ্ডিতে

সর্ব্বদেশময় তুমি হে বিরাট সর্ব্বযুগময়,
জুড়িয়া রয়েছ তুমি চিরদিন সকল হৃদয়।

জন্ম তবু নিলে তুমি, বাঙ্গালীর মনোবৃন্দাবনে
বিরহিণী শ্রীমতীর গূঢ়মর্ম্ম কুটীর-অঙ্গনে
স্বপ্নময়ী বেদনায়। স্থূল দেহ করনি ধারণ
গীতিময় রূপ ধরি' বিশ্বময় আত্ম বিকিরণ
করেছিলে একদিন। রসজ্ঞের স্বপ্নে তুমি আজো,
যেমন সেদিন ছিলে গীতদেহে তেমনি বিরাজো।

কোথায় পরম সত্য সন্ধানিব রূপে কিংবা ভাবে?
নিজেই অসত্য হ'য়ে দেশকাল কি সত্য জানাবে?

ভাবে আছ, রসে আছ। মধুগন্ধে তৃপ্ত যেইজন,
পদ্মের মৃণাল কোথা কভু সেকি করে অন্বেষণ?
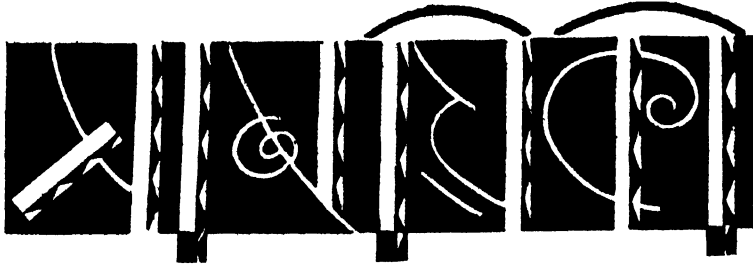
স্মৃতি-তর্পণ—

আজ হইতে এক বৎসর পূর্ব্বে গত ১৩৪৬ সালের ২৪শে মাঘ ভারতবর্ষের কর্ণধার সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। আমরা এই এক বৎসরকাল আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল দিক দিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। আমাদের এই অভাব কখনও পূর্ণ হইবার নহে—তাহা জানিয়াও আমরা সকল সময়ে ইহা সহ্য করিতে সমর্থ হই না। আজ এক বৎসর পরে তাঁহার পরলোকগমন দিবসে আমরা তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি সুধাংশুবাবুর আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদিগকে প্রদান করুন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নূতন সম্মান—

আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে 'বিদ্যা-বাচস্পতি' উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ ভারতীয় প্রাচীন কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। বহু মহামহোপাধ্যায় ও সুপণ্ডিত এই সমাজের পরিচালক। তাঁহারা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে এই সম্মান প্রদর্শনে যোগ্য তারই সম্মান করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের এই কার্য্যকে সাধুবাদ দিতেছি।

রামগড়ে নূতন বন্দীনিবাস—

হাজারিবাগের রামগড়ে—যেখানে রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল সেখানে—প্রায় তিনশত একরেরও অধিক জমি লইয়া যুদ্ধে বন্দীদের জন্য একটি বন্দীনিবাস নির্ম্মাণ করা হইতেছে। সমস্ত জায়গাটা কাঁটা তার দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। বন্দীনিবাসের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভারতে প্রেরিত ইতালীয় বন্দীদিগকে এইখানেই রাখা হইবে। প্রথমত এই বন্দীনিবাসে সতের শত বন্দীর এবং ঐ সব বন্দীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত সৈন্যদের অবস্থানের উপযোগী ব্যবস্থা করা হইবে। এই বন্দীনিবাসের ব্যয় কোথা হইতে আসিবে—ভারত সরকার, না বৃটিশ সরকার—তাহা অবশ্য আমাদের জানিবার কথা নহে।

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষি—

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমেয়। সেখানে সকল প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীর মোট তৈল-সম্পদের মধ্যে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ, সারা পৃথিবীর কয়লা-সম্পদের শতকরা বিশ ভাগ এবং সারা পৃথিবীতে যত কাঠ পাওয়া যায় তার শতকরা সাড়ে সতের ভাগ—এক রুশিয়ারই সম্পদ। সোভিয়েট ইউনিয়নে লৌহ-পাথরের পরিমাণ খুব বেশী। তাহার আনুমানিক পরিমাণ দশ হাজার কোটী টন। ইহার শতকরা বাষট্টি ভাগ লোহা। এ ছাড়া বাকী যে নিকৃষ্ট ধরণের লৌহ-পাথর আছে তাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টন। লোহা ছাড়া তথায় তামা, দস্তা, সিসা ও আরও অনেক ধাতুর যোগান রহিয়াছে। ঐ দেশে সোভিয়েটের সোনার খনিগুলিতে সোনা প্রচুর মেলে। রুশিয়ার চাষোপযোগী উর্ব্বর ভূমির পরিমাণ পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে বেশী। সেদেশে চাষোপযোগী জমি মোট সোয়া দুই শত কোটি হেক্টর। গত-পূর্ব্ব বৎসর উহার মধ্যে দশ কোটি চব্বিশ লক্ষ হেক্টর আবাদ করা হইয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু আমরা সেই সব সম্পদকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করিতে পারি না। অথচ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদেরই সব চেয়ে বেশী

দরকার ওই সব প্রাকৃতিক সম্পদকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসনীয় উদ্যম—

প্রাচীনযুগের সাহিত্য এবং শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ হইতে একটি পুঁথি সংগ্রহশালা খোলা হইয়াছে। অতি অল্পদিনের চেষ্টায় এই সংগ্রহশালায় অন্যূন ২১৬২ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৈদিক যুগের বহু দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান নিদর্শনও আছে। ইহা ছাড়া এই সংগ্রহে বৈদিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতিও আছে। এই সমস্ত তৈজসপত্রের উপরে যজ্ঞবেদীর চিত্রাদি উৎকীর্ণ আছে।

ডাঃ জয়াকরের গোয়া প্রবেশে বাধা—

পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার 'সরস্বতী মন্দির সাহিত্য সমিতি' তাহাদের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বোম্বায়ের খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীযুত মুকুন্দ রামরাও জয়াকরকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোয়ার পর্ত্তুগীজ সরকার তাঁহার গোয়া-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুত জি-ভি-মাবলঙ্কারকে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার প্রবেশও নিষিদ্ধ হয়। গোয়া সরকারের নিকট সঙ্গত কারণ প্রদর্শনের দাবী করিতে ডাঃ জয়াকর ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ডাঃ জয়াকর বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতম বিচারপতি; তবুও তাঁহার প্রতি ভারতের পর্ত্তুগীজ সরকারের এইরূপ মনোভাব কেন কে বলিবে?

পাট শিল্পের গবেষণা—

ভারত সরকার তিন লক্ষ পঁচাশী হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতার শিল্প রাসায়নিক পরীক্ষাগারগুলিতে পাটের নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণার প্রসার করিতে সংকল্প করিয়াছেন, এ সংবাদে আমরা সরকারকে সাধুবাদ দিতেছি। নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা হইবে:—(১) সূক্ষ্ম পাটের সূতা বুনন (২) শন প্রভৃতি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তন্তুর সংমিশ্রণে পাটের সূতা বুনন (৩) পাট ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তন্তুর দ্বারা সুদৃশ্য বস্ত্র নির্ম্মাণ (৪) বয়ন-প্রণালী উন্নয়ন (৫) বিবিধ বিষয়ে পরীক্ষামূলক কার্য্য করা, যথা—পাট হইতে ঘরের ছাদ নির্ম্মাণের গৃহ-সজ্জার ও ইনসুলেটিং উপকরণ প্রভৃতি তৈয়ারির ব্যবস্থা; পট্টবস্ত্র রঞ্জন, চাকচিক্য সম্পাদন এবং শোধকরণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বাৎসরিক দশ হাজার টাকা খরচের বরাদ্দ করা লইবে।

ডঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর নূতন পদ—

আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম যে অক্সফোর্ডের সিনিয়র গবেষক-সভ্য ডঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। ডঃ চক্রবর্ত্তীর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান। আমরা তাঁহাকে এই সম্মানে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে ইয়াকুব আলি চৌধুরী—

বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব আলি চৌধুরী সাহেব সম্প্রতি তাঁহার স্বগ্রাম ফরিদপুর জেলার পাংশায় মাত্র চুয়ান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। পরলোকগত চৌধুরী সাহেব ছিলেন সরল, বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কার ও চিন্তাশীল লোক। তাঁহার প্রণীত 'নূরনবী', 'শান্তিধারা', 'ধর্ম্মের কাহিনী' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল সমাদৃত হইবে। দেশের প্রতি তাঁহার মমতা কোন রাজনীতিকের অপেক্ষা কম ছিল না। সুবক্তা বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'কোহিনূর' এক সময় মাসিকপত্র জগতে বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল সাম্প্রদায়িকতার কোলাহলে তিনি কখনও লিপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাধ্যতামূলক জীবনবীমা পরিকল্পনা—

বাঙ্গলা সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের বাধ্যতামূলক জীবনবীমা করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। জীবন বীমা যেভাবে স্বেচ্ছামূলক প্রবৃত্তিতে বিস্তার পাওয়া উচিত ছিল, আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটে নাই।

সে ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জীবন বীমা প্রবর্ত্তন হওয়া মন্দ নয়। তবে এই বীমা ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে এবং যথাসম্ভব বাঙ্গালার বীমা কোম্পানীতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিলে দেশের অর্থ শোষণেরই ব্যবস্থা হইবে। অপর পক্ষে দেশীয় ও বিশেষভাবে বাঙ্গালার বীমা কোম্পানীগুলিরই যে শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, বীমা-ভাণ্ডারের অর্থে দেশের শিল্পবাণিজ্য গড়িয়া উঠারও সহায়তা করিবে।

সাংবাদিকের সম্মান—

'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অতি প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নটরাজনের সংবাদপত্রসেবাক্ষেত্রে কৃতিত্ব স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত জয়াকরের নেতৃত্বে একটি স্মারক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির ইচ্ছা, অন্যূন দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নটরাজন চেয়ার অফ জর্ণালিজ্‌ম্ নামে সাংবাদিকতা শিক্ষা দিবার জন্য একটি বক্তৃতার প্রতি বৎসর ব্যবস্থা করেন। নটরাজনের কর্ম্মশক্তিকে স্বীকার করিয়া উহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থার আয়োজন বোম্বাই প্রদেশবাসীরা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীমাত্রেরই সমর্থন লাভ করিবে। একজন সাংবাদিকের কাজের প্রতি জনসাধারণের এই আস্থায় সকল সাংবাদিকই গৌরব অনুভব করিবেন। আমরা শ্রীযুক্ত নটরাজনের এই গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-জয়ন্তী—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ভারতের সকলস্থান হইতেই এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য আবেদন প্রচারের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আচার্য্য রায় মহাশয়কে কিভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই; তবে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহার নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চেয়ার খুলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থার অনুকূলে অনেকেই মত দিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা উদ্যোগীদের সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

লোক গণনায় হিন্দুর কর্ত্তব্য—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবারের লোকগণনায় হিন্দুদের স্বার্থ যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় তাহার জন্য নিখিলবঙ্গ লোকগণনা সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা প্রীত হইলাম। এই সমিতি সমগ্র বঙ্গদেশকে পাঁচ বিভাগে ভাগ করিয়া জেলা কমিটিগুলি গঠন করিয়া দিবেন এবং তাহাদের কার্য্যাবলী যথাযথ হইতেছে কি-না তাহা পরিদর্শন করিবেন। জেলা কমিটিগুলি আবার থানা ও ইউনিয়ন বোর্ডে বিভক্ত হইয়া কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবে। আমাদের বিশ্বাস, এবার সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দু অধিবাসীরা লোকগণনায় হিন্দু মহাসভার নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে আবশ্যক সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কেন না, ইহারই উপর হিন্দু সাধারণের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত—

ভারতীয় সিবিল সার্বিসের শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত সম্প্রতি তাঁহার কর্ম্মবহুল চাকরি-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। চাকরি-জীবনে তিনি বহু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পুরাদস্তুর সিবিলিয়ানী মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার নির্ভীক স্বাধীন মন ও দুর্দ্দমনীয় স্বদেশপ্রীতিই তাঁহাকে চাকরি-জীবনে তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী উন্নতি লাভের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাঁহার চেষ্টা দেশবাসী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জেলাম্যাজিস্টেট হইয়াও তিনি স্বহস্তে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছেন, জঙ্গল ও আগাছা উৎপাটন করিয়াছেন, কোদালহস্তে খাল ও

পুকুর সংস্কারে কর্ম্মীদলের অধিনায়ক হইয়াছেন। বাঙ্গালার লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধার, নারীশিক্ষার জন্য 'সরোজনলিনী' আন্দোলন ও সর্ব্বশেষে ব্রতচারী আন্দোলন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। শেষোক্তটি ভারতের অনেক স্থানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-হিসাবে গণ-আন্দোলন দমন করিয়া আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেন নাই বলিয়াই সরকার তাঁহাকে কোন প্রকার উপাধি বা সম্মান প্রদান করেন নাই। তাঁহার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাসই হইবে সরকারী উপাধি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।

জীবিকা গ্রহণের মনস্তত্ত্ব—

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষক শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এ বৎসর 'জীবিকাগ্রহণের মনস্তত্ত্ব' সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জুবিলি' পুরস্কার পাইয়াছেন। মনস্তত্ত্ব বিভাগ হইতে 'জুবিলি' পুরস্কার ইতিপূর্ব্বে আর কেহই লাভ করেন নাই। বিষয়টিও যে সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করিয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে গিয়া কোন্ দিকে যাইবে স্থির করিতে পারে না। ভাগ্যক্রমে যাহার যে কাজ জুটিয়া যায়, তিনি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সে কাজ তাঁহার মনঃপূত না হয় তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু সহজাত শক্তি ও মনোবৃত্তির ধারা অনুসারে যিনি যে ক্ষেত্রের যোগ্য তিনি সেই ক্ষেত্র অধিকাংশ স্থলেই লাভ করেন না। সেইজন্য তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক সময়ই কল্যাণজনক হয় না। কাজেই আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ শিক্ষার সে ত্রুটি আবিষ্কারে মনোযোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

আদমসুমারির ব্যয় নির্ব্বাহ—

বাঙ্গালায় লোক গণনার কাজে যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা সঙ্কুলানের জন্য সরকারকে, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট অর্থ আদায় করিবার ক্ষমতা দিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে এক বিল পাশ হইয়াছে। ভারত সরকার আগামী আদমসুমারি ব্যাপারে বিভিন্ন জাতিবর্ণ-হিসাবে হিন্দু সমাজের লোকগণনা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাঙ্গালা সরকার জাতিবর্ণহিসাবে ভাগ করিয়া হিন্দু সমাজের লোক গণনার উপর জোর দিতেছেন। জাতি হিসাবে হিন্দুদিগকে গণনা করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে তাহা মিটাইবার জন্যই বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান বিলটি পাশ করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

বীরভূমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ—

বীরভূমে প্রায় এগার লক্ষ লোকের বাস; তাহাদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। এ বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য শতকরা দশ ভাগ শস্যও কৃষক পায় নাই; তাহার উপর পশুদের আহার্য্য নাই; পুষ্করিণী জলশূন্য। পানীয়ের অভাব ইতিমধ্যে লক্ষিত হইতেছে, বহু নরনারী ইতিমধ্যেই অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সরকার পক্ষও ইহার ভয়ালতা বুঝিতে পারিয়া সজাগ হইয়াছেন ও ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পরিষদে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বীরভূমের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে কিছুদিন পূর্ব্বে এক যুক্ত বিবৃতিতে বীরভূমের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতায় 'বীরভূম দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি' নামে একটী সমিতি বীরভূমের তরুণ ও ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতায় বীরভূমবাসীদের 'বীরভূম সম্মেলন' নামে যে বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আছে তাঁহারাও বীরভূমের দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে একটী সাহায্য সমিতি খুলিয়াছিলেন। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে দুইটী সমিতি একসঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিতেছেন—কারণ তাহাতে কাজের পরিমাণও বাড়িবে এবং কাজের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ যুক্ত সমিতি 'বীরভূম দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি' নামেই কাজ করিতেছে। সমিতির অফিস ১৫৯ এ বহুবাজার ষ্ট্রীটে যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুত ব্রহ্মগোপাল মিত্রের নামে যে কোনো সাহায্য প্রেরণ করা চলিবে।

চারুকলা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা—

বাঙ্গালা দেশের উচ্চ ইংরেজী স্কুলগুলির যে সকল শিক্ষক চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী বৎসরের গোড়াতেই একটি স্বল্পকালব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য যে নূতন পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে 'চারুশিল্পের বোধ' (রেখাঙ্কন ও চিত্রাঙ্কন) অন্যতম অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ে যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের সাহায্যকল্পে এই ব্যবস্থা করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকায় শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ নীতিবিষয়ক বক্তৃতা, চারুশিল্প সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, চিত্রাঙ্কন,

শ্রীমতী উষারাণী মুখোপাধ্যায়—সাঁওতাল পরগণার কংগ্রেসকর্ম্মী লম্বোদরবাবুর পত্নী। ইনিও সম্প্রতি কারাবরণ করিয়াছেন

ভাস্কর্য্য, স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতেছি।

ভারতের হাইকমিশনার—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের এজেন্ট জেনারল্ আছেন শ্রীযুক্ত রাম রাও। সম্প্রতি এক সরকারী ঘোষণায় তাঁহার পদবী বদলাইয়া তাঁহাকে ভারতের 'হাইকমিশনার' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের হাইকমিশনার অতঃপর অন্যান্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক হাই-কমিশনারদের অনুরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করিবেন। কিন্তু ইহাতে উল্লসিত হইবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। যতদিন ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা না পায় ততদিন বিদেশে তাহার প্রতিনিধিদের এজেন্ট জেনারল্, হাইকমিশনর, কন্সাল্, য়্যাম্বেসেডার—যে-কোন নামই দেওয়া হোক না, তাঁহার পদমর্য্যাদা বা সম্মান তাহাতে বাড়িবে না।

স্যর রাধাকৃষ্ণনের ভাষণ—

সম্প্রতি কলিকাতায় বহুনিন্দিত মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদে যে সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের বিরুদ্ধে যে সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নানা কারণেই বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য। স্যর রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন, সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী ভারতে মহাজাতিগঠনের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। স্যর রাধাকৃষ্ণন রাজনীতিক নেতা নহেন, হিন্দু মহাসভার সদস্যও নহেন, তিনি শিক্ষাব্রতী; সুতরাং তাঁহার মতের গুরুত্ব কতখানি, তাহা আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী অনুধাবন করিলে উপকৃত হইবেন।

সহযোগিতার আবেদন—

সম্প্রতি বৃটিশ কমন্স সভার সকল দলের নয়জন সদস্য মিলিয়া ভারতবাসীদের প্রতি সহযোগিতার আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আবেদনে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর যথারীতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বড়লাটের প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তাঁহাদের সুদীর্ঘ আবেদনে বৃটিশসুলভ কূটনীতির পরিচয় যেমন আছে, উদারদৃষ্টিতে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের আগ্রহ তেমন নাই। ভাষার হের-ফেরে বক্তব্য বিষয়ের যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে তাহা নহে; বড়লাট লিনলিথগো যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কংগ্রেসকে নিরাশ করিয়াছেন, এই তথাকথিত আবেদনে সেই সব যুক্তিই ভাষার আবরণে আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, যতক্ষণ না

বৃটিশ রাজনীতিক ধুরন্ধরেরা সরল, সহজ ও স্পষ্টভাষায় ভারতের দাবী ভারতবাসীর দিক দিয়াই ভাবিয়া লইবেন বলিয়া আশ্বাস দিবেন, ততক্ষণ এ ধরণের মিলন চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

এবার বড়দিনের ছুটিতে জামসেদপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন বরোদা রাজ্যের সচিব রাজরত্ন শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সম্মিলনীতে যোগদান করিতে না পারায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। সাহিত্যশাখার সভাপতি হন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস মহাশয়। বিজ্ঞান শাখায় ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ, বৃহত্তর বঙ্গশাখায় ডঃ কালিদাস নাগ ও মহিলা-বিভাগে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু সভানেত্রীত্ব করেন। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এবারের সম্মিলনীর বৈশিষ্ট্য এই প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে গত এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে শিশুসাহিত্য বিষয়ক পুস্তকই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। মোট সাত শত

সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস

পুস্তক ও ২৪খানা সাময়িক পত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির অবহেলায় ও ত্রুটিতে এই প্রদর্শনী তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। গ্রন্থ প্রকাশকদের নিকট তেমনভাবে প্রদর্শনীর বিষয় অনুরোধ জ্ঞাপন করা

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডক্‌টর বীরেশচন্দ্র গুহ

হয় নাই বলিয়াই পুস্তক সংখ্যা এত কম হইয়াছে, তথাপি এ প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়। টাটা কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত জে, জে, গান্ধী মহাশয় সম্মিলনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

মূল-সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে প্রসঙ্গত বলেন—'জীবনযাত্রার সকল স্তরে বাঙ্গালী আজ পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। রাজনীতিক, আর্থিক ও অন্য সকলক্ষেত্রে বাঙ্গালা আজ পরাজয়ের সম্ভাবনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তমিস্রা রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণতম আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছে। অন্যদিকে যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালী সাহিত্য প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহার পুষ্টি ও প্রগতি ঘটিয়াছে।'

সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে এদেশের সম্মিলনের চিরাচরিত রীতিকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি অভিভাষণে একটি মনোজ্ঞ গল্পের আকারে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গত বলিয়াছেন—'সাহিত্যিকেরা প্রধানত সাহিত্যের

সৌন্দর্য্য ও আর্ট লইয়া কারবার করিবেন, অথবা জন মনোভাবের সামাজিক দিকটা লইয়াই বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন? সাহিত্য কিসের জন্ম এবং সাহিত্য কাদের জন্য?···'তাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এমন ভাবে, যেন একদিন শিক্ষাবিস্তার হলে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টি উপভোগ করিতে পারে। এমন এক রস দিয়ে যাবে, যা সমাজ-বিপ্লবের আগে বা রাষ্ট্র-বিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না। এমন এক অমৃত পরিবেষণ করবে যা ইদানীন্তন দেবতারা খেয়ে শেষ করে দেবেন না, যা তথাকথিত দৈত্যদের জন্যও মজুত থাকবে।··· জমিদারের অত্যাচার,

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মহিলা (ক) বিভাগের পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ —ফটো শ্রীপান্না সেন

কলওয়ালার স্বেচ্ছাচার, 'জাগো কিষাণ-মজদুর' ইত্যাদি লিখে শ্রেণী-সাহিত্য পরিবেষণ করা কঠিন নয়। কিছু গরম মসলার সঙ্গে মার্কস্ বাটা মিশিয়ে ওকে স্বাদু করতে পারা সহজ। কিন্তু সাহিত্য বলে যদি তাকে গণ্য করা হয়, তবে শ্রেণীসাহিত্য কেন নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য বলেই তা গণ্য হবে। কিন্তু আমার সোনার তরীতে যদি সোনার ধানই না থাকল, তবে বাকী সব থেকে হবে কী। ও কি সাহিত্য হবে? যখন বলি—আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক—তখন শুধু এই কথাই বলি যে, সোনার ধানের জন্যই সোনার তরী। তা ব'লে অন্য জিনিষকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মহিলা (খ) বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ —ফটো শ্রীপান্না সেন

দিল্লীতে ভারতীয় মহিলা সম্মেলনে সমবেত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী, লেডী প্রতিমা মিত্র প্রভৃতি

কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ায় ভ্রমণে গিয়াছেন

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে প্রাক্তন ছাত্র মিলন উৎসব

লণ্ডনে দরিদ্র ব্যক্তিগণের বাসগৃহ—বোমা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

লণ্ডনে কাউণ্টি কাউন্সিল হলের সম্মুখে বোমা পড়িয়া এরূপ গর্ত্ত হইয়াছে

রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীতে গৃহীত নূতন শিক্ষানবীশদল ব্যায়াম করিতেছে

সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবুর লিখিত 'বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ', অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের 'বাংলাভাষার নীতি ও আদর্শ', মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের 'বাংলাভাষায় বিজাতীয় শব্দ' ইত্যাদি কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়।

বিজ্ঞান শাখায় সভাপতি ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ 'বিজ্ঞান ও মানবতা' সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। 'বৃহত্তর বঙ্গ' শাখায় সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। উভয় শাখাতেই বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ বিজ্ঞান বনাম সাহিত্য এবং জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর অখণ্ডতা এবং ঐক্য লাভের ও বজায় রাখার সমস্যা সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু। মহিলা বিভাগেও বাঙ্গালা ভাষায় মহিলার স্থান ও দান সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সম্মিলনীর আগামী অধিবেশন কাশীতে হইবে স্থির হইয়াছে। সম্মিলনীতে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে আগামী আদমসুমারিতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা —তাহা লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ অন্যতম। আর একটি প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বঙ্গের বাহিরে ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান রেডিও স্টেশনেই প্রতি সপ্তাহে বাঙ্গালা প্রোগ্রামের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কলিকাতা ও ঢাকার রেডিও স্টেশনে অবাঙ্গালী প্রোগ্রামের যেভাবে ব্যবস্থা করা হয়, সেই ধারায় বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের বেতারস্টেশনগুলির কর্ম্মসূচীতেও বাঙ্গালা প্রোগ্রামের অনুরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথের রোগমুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ এবং সুস্থ দেহে আরও দীর্ঘকাল জীবন ধারণের কামনা এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, রাজরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সত্বর রোগমুক্তির প্রার্থনা সম্মেলন করেন। গত কয়েক বৎসরে যে সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের জন্য সম্মেলন শোকপ্রকাশও করেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী—

এবারেও জব্বলপুরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ সাধনচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীমান্ সাধনচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত বৎসরে তাঁহারা লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমরা এই দুইটি যশস্বী যুবকের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী কুমারী গৌরী গঙ্গোপাধ্যায় এ বৎসর বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'পেডলার পদক' লাভ করিয়াছেন। ব্যবহারিক রসায়নে প্রথম স্থান
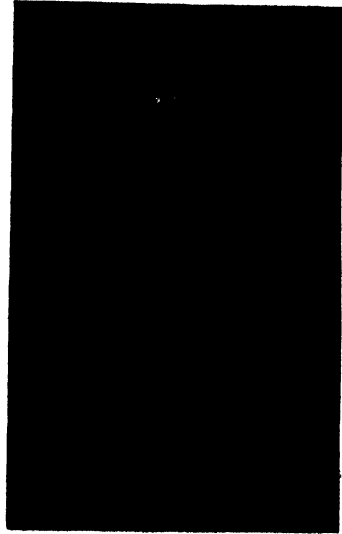
কুমারী গৌরী গঙ্গোপাধ্যায়

অধিকারীকে এই পদক দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী গৌরীই সর্ব্বপ্রথম এই পদক পাইলেন। ইনি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। আমরা শ্রীমতীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ব্রহ্মে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে এবারে 'নিখিল ব্রহ্ম বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলন' সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শাসনকার্য্যের অজুহাতে ব্রহ্ম ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও এই দুইটি দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক হইতে নিবিড়ভাবে জড়িত। ভবিষ্যতে যে এই দুই দেশ আবার একত্র হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বদেশের সঙ্গে মিলনসেতু হিসাবে প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠুক—ইহাই আমরা কামনা করি।

পরলোকে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের অকালবিয়োগে এক-জন নিষ্ঠাবান অক্লান্ত কর্ম্মী সাহিত্যসেবীর অভাব হইল। যে কয়জনের আপ্রাণ চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছে নলিনীরঞ্জন তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার রচিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত' তাঁহার তথ্য সংগ্রহ, লিপিকুশলতা ও যোগ্যতার পরিচায়ক। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার যেখানেই কোন সাহিত্য সভা বা সম্মিলন আহূত হইয়াছে, সেখানেই নলিনীরঞ্জন উৎসাহী কর্ম্মীরূপে দেখা দিয়াছেন। ছোট-বড়, নবীন-প্রবীণ—সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকের তিনি আপনজন ছিলেন। দারিদ্র্য ও বহুবিধ সাংসারিক দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার যে সদাজাগ্রত উৎসাহ ছিল তাহা অন্যের মনেও উৎসাহের সঞ্চার করিত। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র আটান্ন বৎসর

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গ ও অগণিত বন্ধুবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ মৎস্য ব্যবসায়ী, বাঙ্গালীর সুপরিচিত জেলেপাড়া সঙের প্রবর্ত্তক গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহস, সততা ও অধ্যবসায় সম্বল করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে অসামান্য কর্ম্মনিষ্ঠায় কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছেন, বিশ্বাস মহাশয় তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন। ভারতের বহু ভাইস্‌রয় ও বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর ইঁহাকে নিয়োগপত্র (warrent of appointment) দ্বারা সম্মানিত করেন। স্বীয় সমাজের ও জাতীয় ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইনি যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন, সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলিকেও সেইরূপ আগ্রহ সহকারে সাহায্য করিতেন। বিশ্বাস মহাশয় দুই পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া
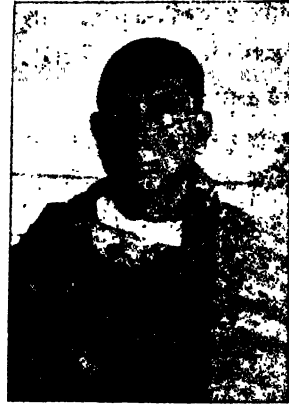
গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস

গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ও সুলেখক। আমরা তাঁহাদের পিতৃশোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জাহাজ ব্যবসায়ে পক্ষপাতিত্ব—

ভারতের উপকূল বাণিজ্য সম্পর্কে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত শান্তি-কুমার এন্ মোরারজী জানাইতেছেন যে, বৃটিশ মূলধনে পরি-পুষ্ট মোগল লাইনের জাহাজগুলি করাচী, কলিকাতা, বোম্বাই ও লোহিতসাগরের বন্দরসমূহে যাতায়াত করিতেছে। আসলে তাহাদের গতিবিধি কোনমতেই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ভারতের পশ্চিমভাগে বিভিন্ন বন্দরের দেশীয় বাণিজ্য-জাহাজের পরিচালনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। বার বার আবেদন নিবেদন করিয়াও ইহার একখানি জাহাজ দেশীয় লোকদের হাতে দেওয়া হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বৃটিশ মূলধনে পুষ্ট বিদেশীয় কোম্পানীর জাহাজগুলিকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি দিয়া আসলে দেশীয় জাহাজ ব্যবসার ও নৌবাণিজ্যের উচ্ছেদে সরকার সহায়তা করিতেছেন। ভারতীয় জাহাজকোম্পানীসমূহকে শতকরা পনর টাকা ভাড়া বাড়াইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই; অপরপক্ষে কিন্তু মোগল লাইনের বীমা-ব্যয় সরকার বহন করিতেছেন এবং তাহাদের ভাড়াও শতকরা পঁচাত্তর টাকা বাড়াইবার অনুমতি দিয়াছেন। এই অসাম্য সম্পর্কে আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গালায় দলাদলি—

বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সভাপতির মধ্যে বিবাদের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিতান্তই অপ্রীতিকর। এই উপলক্ষে প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি বিবৃতির আকারে যেসব অশোভন উক্তি প্রচারিত হইতেছে তাহা সঙ্গত নহে, বরং তাহাতে বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্ব্বলতাই প্রকাশিত হইতেছে। অপর পক্ষে বাঙ্গালায় যাঁহারা প্রকৃত নেতৃস্থানীয় তাঁহাদিগের বহিষ্কারের ফলে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলন যে দুর্ব্বল হইয়াই পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতে হইলে সকলকেই নিয়মানুবর্ত্তিতা মানিয়া লইতে হয়, তেমনই তাহা কঠোরভাবে প্রযুক্ত না হইলেও সঙ্গত হয়। আমরা অবশ্য কোন পক্ষেরই ওকালতি করিব না; আমরা চাই যে অবিলম্বে এই অপ্রীতিকর অবস্থার একটা সুমীমাংসা হইয়া দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় পরিণত হয়।

কৃতী বাঙ্গালী যুবক—

গত বৎসর গৃহীত ভারতীয় অডিট্ ও একাউন্ট্‌স্ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঈস্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীতে ট্রান্সপোর্টেশন অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী-ছাত্র; জীবনে যত পরীক্ষা দিয়াছেন সকলগুলিতে তিনি বৃত্তি পাইয়াছেন। সাহিত্যের

জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিও তাঁহার অনুরাগ আছে। তাঁহার পিতা হুগলী ভদ্রকালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত) বিহার সরকারের পূর্ত্তবিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জীবনে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

প্রবাসী বাঙ্গালীর পরলোকগমন—

সাঁওতাল পরগণার রাজমহলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মনোহর দে মজুমদার মহাশয় ব্লাড-প্রেসারে ৭০

মনোহর দে

বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। দে-মজুমদার মহাশয়ের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত শেখরনগর গ্রামে। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি সামান্য বেতনে পুলিশে চাকরি লইয়া সাঁওতাল পরগণায় যান। কিছুকাল চাকরি করার পর সামান্য তিনশত টাকা মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসা সুরু করেন। নিজের সততা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বহু টাকা অর্জ্জন করিয়া অনেক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সাংবাদিকের পরলোকগমন—

ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লিমিটেডের পরিচালক অক্ষয়কুমার সরকার মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে দারুণ যক্ষ্মারোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিক-জীবন আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সংবাদপত্রের সহিত সংশ্রব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লিঃএর তিনখানি পত্রিকা—খেয়ালী, ভ্যারাইটিজ ও চিত্রালী তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইত। অমায়িক প্রকৃতির জন্য অক্ষয়কুমার বন্ধুমহলে সকলের প্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননী ও তাঁহার অগণ্য বন্ধুবান্ধবদের আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি

পরলোকে প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতা পুলিশের দক্ষিণ টাউন বিভাগের সহকারী কমিশনর রায় প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গত ১লা জানুয়ারী প্রাতে সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫০ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে পুলিশ বিভাগে সামান্ত দারোগার

প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়

পদে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে তিনি উন্নতি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি সহকারী পুলিশ কমিশনার পদে উন্নীত হন। তিনবার তিনি অস্থায়ীভাবে ডেপুটি কমিশনরের পদে কার্য্য করেন। তাঁহার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে পুলিশ মেডল্, রায় সাহেব ও রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করা হয়। ভাল খেলোয়াড় ও সুঅভিনেতা বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। নিজের অমায়িক ব্যবহারে সহরের অসংখ্য ক্লাব ও বারোয়ারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় পরিণত বয়সে বোম্বাই শহরে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সাংবাদিকের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রের সম্পাদনা করেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে পাঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া যখন বাঙ্গালার জাতীয়তা আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়া পাঞ্জাবে সেই আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন তখন তিনি সেখানে একখানি সংবাদপত্র ও একটি কলেজ স্থাপনা করেন। সুরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনে ডাঃ শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ট্রিবিউন-এর প্রধান সম্পাদক হন। শীতলা-কান্তের অবর্ত্তমানে নগেন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদে থাকিয়া ট্রিবিউন-এর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। দীর্ঘকাল তিনি এই পদে কার্য্য করিয়া যোগ্যতার পরিচয় দেন। পরে এলাহাবাদে আসিয়া আর একখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পরে 'লীডার' রূপে সুপরিচিত হয়। পরে বাঙ্গালায় আসিয়া তিনি বেঙ্গলীর সহিত যুক্ত হন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সমানভাবে তিনি লিখিতে পারিতেন। 'ভারতবর্ষ'-এরও তিনি লেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন—

আমরা অবগত হইলাম যে, গত অগ্রহায়ণ মাসে 'ভারতবর্ষ-এ প্রকাশিত 'পুলিশের আরাম' শীর্ষক মন্তব্যে একটু ত্রুটি আছে। উক্ত আরাম-নিবাস নির্ম্মাণের যাব-তীয় ব্যয় কলিকাতা পুলিশ-ক্লাব বহন করিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করা হয় নাই।

সুধাংশুশেখর

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

মাত্র এক বছর হলো সুধাংশুশেখর মরজগতের বন্ধন কাটিয়ে সরে গেছেন। এমনি পৌষের একটী দিনে তাঁর চলে যাবার ডাক আসে। দুঃখ এই যে এ ডাক অকালেই এসে তাঁকে আমাদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই আমাদের শোকের আঘাত একটু বেশী করেই বেজেছিল। শুধু আত্মীয় পরিজন বা ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বন্ধুমণ্ডলই শোকার্ত্ত হন নি, যাঁরা সুধাংশুশেখরের চবিত্রবত্তা কীর্ত্তি ও কর্ম্ম সাধনার সকল ইতিহাস জানতেন তাঁরাও এ দুঃখকর ঘটনার নিদারুণ আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে পড়েন। আজ বৎসর ঘুরে এসেছে কিন্তু সুধাংশুশেখবের অভাব যেমন ভাবে আমাদের বিঁধেছিল তার তীব্রতার আজও লাঘব হয় নি। তার কারণ আমরা তাঁর ওপর এমন কতগুলি ব্যাপাবে একান্ত নির্ভর ছিলাম, তাঁর সহজ প্রতিভার কাছে আমরা এমন কিছু বস্তুর প্রত্যাশী ছিলাম যা মিটিয়ে দেবার পক্ষে আজকের দিনে দ্বিতীয় কাউকে দেখছি না।
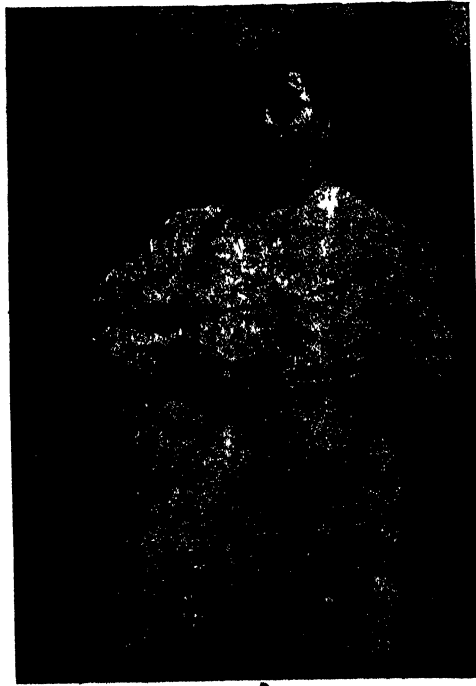
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুশেখরকে স্মরণ করতে বসে আজ এই সব অনেক কথাই স্মরণে আসছে। এটা পারিবারিক বিলাপ নয়; আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতি বাঙালী ঠিক এই সত্যই অনুভব করবেন—যদি তাঁরা সুধাংশুশেখরের সুকীর্ত্তির পরিচয় পেয়ে থাকেন।

Public Man হিসাবে সুধাংশুশেখরের যে স্থান ছিল আমরা আজ তাঁর [illegible] স্মরণে [illegible] তারই মর্যাদা বিচার করছি। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁর মত কৃতকর্ম্মা আরও অনেককে পাওয়া যাবে। ব্যবসায় সাফল্য ও লাভের অঙ্কের পরিমাণ শুধু খতিয়ে দেখলে তাঁর চরিত্রের বৃহত্তর দিকটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। তিনি যে ধরণের ব্যবসায়ে নিজের সমস্ত কর্ম্মশক্তি ও সাধনাকে নিযোজিত করেন সেইটের গুরুত্ব আগে বিবেচ্য। পুস্তক প্রকাশ ও পত্রিকা পরিচালনা মূলতঃ এসব সমাজ ও জাতির বৃহত্তর সংস্কৃতির সেবা মাত্র। তাঁর ব্যবসা প্রতিভাকে তিনি যে বিশেষ করে এই পথে উৎসর্গ করেন সেটা তাঁর আদর্শ, উৎকৃষ্ট রুচি ও সমাজ ও সাহিত্য সেবকের চরিত্রোচিত নিষ্ঠার প্রমাণ। অন্য ব্যবসায়ে তিনি পরিশ্রম করলে হয়তো সাফল্যের দিক দিয়ে, লাভের দিক দিয়ে আরও কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন; প্রকাশকের সুকঠোর দায়িত্ব গ্রহণ তিনি করেছিলেন এবং এই দায়িত্ব পালনে তিনি যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ঐতিহ্য রেখে গেছেন তার মূল্য আজ আমরা কতকটা উপলব্ধি করে উঠতে পারছি। জাতির জীবনে সুযোগ্য প্রকাশকের দান কতখানি, আর তার মূল্য কত—তা একটু উদার দৃষ্টি নিয়ে তলিয়ে দেখলেই সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবে। প্রকাশকের সাধনা যে বাণীর সাধনা, সেখানে টাকার ঝনৎকারই শ্রেষ্ঠ নয়, প্রকাশকের [illegible] ও সাহিত্যের রমণীয় রচনায় অন্যতম অর্ঘ্য,

এ সত্য সুধাংশুশেখরের কর্ম্মবিচিত্র জীবনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সন্দেহ নেই।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁরা জানেন এই মৃদুভাষী, সংযতবাক্ ও কর্ম্মোৎসাহী মানুষটীর অন্তঃকরণ কি কোমল ধাতুতে তৈরী ছিল। যাঁরা অল্প-পরিচিত, দূর থেকে তাঁকে বিচার করেছেন তাঁরা, তাঁর আন্তরিক গুণগ্রামের সবটুকু পরিচয় পান নি। ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্যের মধ্যেও তিনি নিজেকে, ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য বা অহমিকাকে রূঢ়ভাবে পশ্চাতে ঠেলে রেখেছিলেন। একমাত্র জাগ্রত নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণা সম্বল করে তিনি সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনও দুর্ভাগ্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে—যখন তাঁর সরল আন্তরিকতাপ্রসূত মত অযথা বিরুদ্ধ ধারণার জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর ব্যবসায় রীতি একটী বলিষ্ঠ আদর্শে পরিপুষ্ট ছিল এবং সে আদর্শের অবমাননা তিনি হতে দেন নি। সেজন্যে তাঁকে হয়তো কেউ কেউ ক্ষণিকের জন্য ভুল বুঝেছে এবং আমরা জানি এটা সুধাংশুশেখরের পক্ষে কতটা বেদনার কারণ হয়েছিল। 'সবার মাঝারে থেকে সবা হতে দূরে' তিনি থাকতেন। কোন উৎকট আভিজাত্যের প্রকোপে তিনি তা করেন নি। তাঁর নিজের ঐকান্তিক আদর্শ নিষ্ঠাকে কোন অবাঞ্ছিত আবহাওয়ার সংক্রামকতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার অভীপ্সা থেকেই তাঁর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল।

আজ আমরা তাঁর কর্ম্মজীবনের আলোচনা করছি; কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না আমরা এমন এক কর্ম্মসাধকের কথা বলছি যাঁর সাধনা একটী সুমহৎ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল শুধু এবং কালের ডাক এসে অকালে তাঁর সাধনাকে ক্ষান্ত করে দেয়। সুতরাং কোন প্রবীণ কর্ম্মিৎ-কর্ম্মা সাধকের কথা আমরা আলোচনা করছি না। যা হতে পারতো তার অপ্রাপ্তির অনুশোচনা আজ আমাদের বিশেষ করে পীড়িত করছে।

যিনি চিরকাল নিজেকে আড়ালে রাখবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন, সস্তা যশের আকাঙ্ক্ষা যাঁকে কোনদিন প্রলুব্ধ করে নি--তাঁকে আজ এই স্মৃতি বাৎসরিকী উপলক্ষে স্তুতির মধ্যে টেনে এনে আমরা হয়তো আমাদের স্বাভাবিক স্বজন-বাৎসল্যের, প্রীতি ও অনুরাগের পরিচয় দিচ্ছি; কিন্তু তাতে সুধাংশুশেখরের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও অনন্যসাধারণতার কতখানি পরিচয় দেওয়া হল তা বলতে পারা যায় না।

যাই হোক, আমরা তাঁকে ভুলতে পারি নি। তাঁর তিরোধানে আমরা আত্মীয় বিয়োগের দুঃখ অনুভব করছি। তাঁর আরব্ধ ব্রত যদি সহস্র দুর্বিপাক অতিক্রম করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তবে আমরা কতকটা আশ্বস্ত হব, ঋণ মুক্তির প্রসন্নতা ফিরে পাব।

ব্যবসায়ী, সাহিত্যসেবী ও কর্ম্মসাধক সুধাংশুশেখর—সুখে দুঃখে ও ভাল মন্দে গড়া মানুষ সুধাংশুশেখর—নিরহঙ্কার ও বন্ধুবৎসল—আজ তাঁর কথা স্মরণ করতে গিয়ে শোকবেদনার মাঝেও থেকে থেকে ইংরাজ কবির উক্তি মনে পড়ে—Death has left on him, only the beautiful!

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ঃ
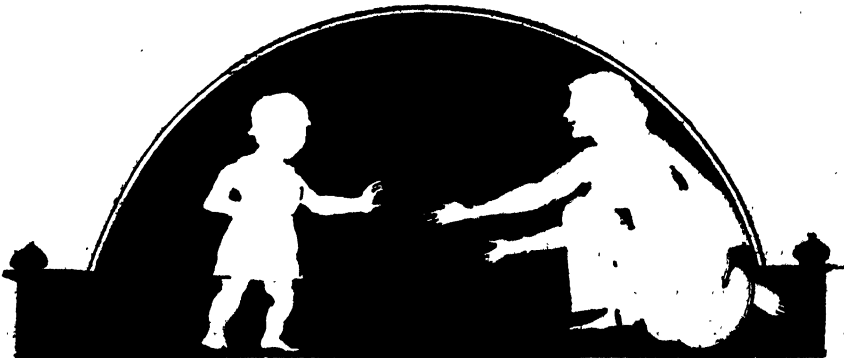
ইউ পি ঃ—১৯১ ও ২২৬

বাঙ্গলা ঃ—১৪৭ ও ১২৬

ইউ পি ১৪৪ রানে বিজয়ী।

ইউ পি গতবারের মত এবারও বাঙ্গলাকে পরাজিত ক'রেছে। অনেকে আশা ক'রেছিলেন বাঙ্গলা হয়ত গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। যাঁরা ইউ পির খেলা দেখেছেন তাঁরা একবাক্যে তাঁদের প্রশংসা না ক'রে পারবেন না। পালিয়া ও দিলওয়ারকে বাদ দিলে ইউ পি সম্পূর্ণভাবে তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত; ছ'জন খেলোয়াড় আলিগড় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের। পালিয়ার অধিনায়কত্ব নিখুঁত। তিনি শুধু বড় বড় ম্যাচ খেলেন নি। তার থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেছেন। ক্রিকেটই হ'চ্ছে একমাত্র খেলা—যাতে অধিনায়কত্বের উপর খেলার অনেকখানি ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পালিয়ার অধিনায়কত্ব চমৎকার, তাঁর থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তাঁর দলের খেলোয়াড়রাও তাঁর ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন এবং পালিয়াও উভয় ইনিংসে তাঁর প্রতি আস্থা রাখবার মত খেলা দেখিয়েছেন। বাঙ্গলার ক্যাপ্টেন টসে জেতা ছাড়া আর সব বিষয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু তার

পালিয়ার অধিনায়কত্বে ইউ পি দল মাঠে ফিল্ডিং করতে নামছে

সদ্ব্যবহার ক'রতে পারেন নি। প্রথম ইনিংসে ইউপির রান ওঠে ১৯১। এই রান সংখ্যাকে আমরা কোনমতেই বেশী ব'লতে পারিনা বরং বেশ কম রানেই তাদের ইনিংস শেষ হয়েছে ব'লতে হবে। কে ভট্টাচার্য্য এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী ক'রতে পারেন। তিনি ৪১ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছেন। ইউ পির তরুণতম খেলোয়াড়

ফানসেলকার সর্ব্বোচ্চ রান করেন ৫১; পালিয়া ৪৫। তাঁরা উভয়েই আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফিল্ডিং ভাল হ'লে আরও কম রানে তাদের ইনিংস শেষ হ'ত। বাঙ্গলা এক ঘণ্টার ওপর ব্যাট ক'রে ১ উইকেটে ২০ রান করার পর সেদিনের মত খেলা শেষ হ'ল। বাঙ্গলা এইখানে খুব ভুল ক'রেছে। এতবেশী সতর্কতা অবলম্বন করা মোটেই উচিত হয়নি। বোলারদের অযথা সম্মান দেখান হ'য়েছে; স্বাভাবিক ভাবে খেলে যাওয়া উচিত ছিলো; তাতে রান সংখ্যাও বেশী উঠতো। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাত্র ১৪৭ রানে বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো। রান তোলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউ পি প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হ'তে সক্ষম হ'য়েছিলো। দিনের শেষে ইউ পি ৩ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। ৩ উইকেট প'ড়ে যায় মাত্র ২১ রানে। প্রথম ইনিংসের মত এবারও পালিয়া ও ফানসেলকার খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন। তরুণ খেলোয়াড় ফানসেলকারের খেলা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি রান ক'রেছিলেন ২৭ কিন্তু উইকেটে ছিলেন ৮৫ মিনিট এবং পালিয়াকে খুব চমৎকার ভাবে খেলিয়েছিলেন। ইউ পি-ব্যাট্সমানদের একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার—তাঁরা প্রত্যেকে বেশ দায়িত্ব নিয়ে খেলেছেন।
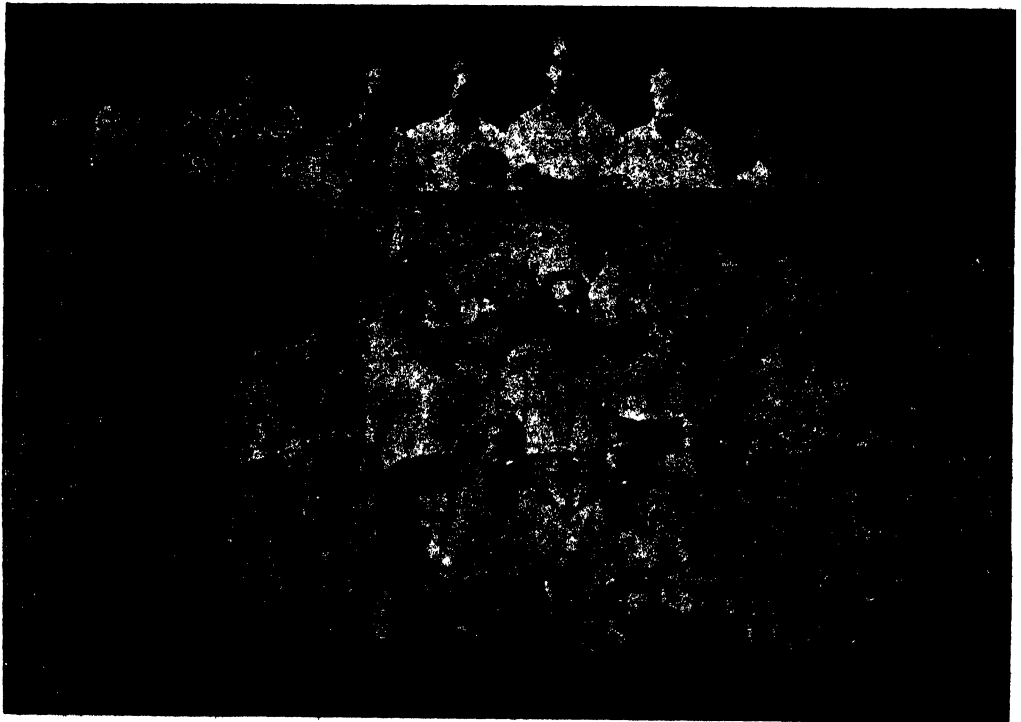
ইউ পি ও বাঙ্গলা প্রদেশের সম্মেলিত খেলোয়াড়বৃন্দ

সুশীল ৩৮ রান ক'রে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আউট হ'লেন; কামাল নট আউট রইলেন ৩১ রান ক'রে। রামচন্দ্রের ২৫ রানও উল্লেখযোগ্য। যাঁরা রান তোলার চেষ্টা ক'রেছেন তাঁরাই অল্প বিস্তর সফল হ'য়েছেন। ঐ তিনজন খেলোয়াড় ছাড়া বাকী সকলেই 'ডিফেন্সিভ' খেলা খেলে এবং অযথা বোলারদের সম্মান দেখিয়ে খেলা নষ্ট ক'রেছেন। গতবার বাঙ্গলা প্রথম ইনিংসে দু'শতোর অনেক বেশী

ইউ পির দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২২৬ রানে। পালিয়া ৬৫ রান ক'রে নির্ম্মলের বলে বোল্ড হ'ন। শুক্লাচর, কিয়ানৎ ও খাজা যথাক্রমে ৩৯, ৩০ ও ২১ রান করেন। কমল ৪টে উইকেট পান ৬০ রানে এবং বেরেও ৭১ রানে ৩টে। বাঙ্গলার ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে। ২৭০ রান পিছনে থেকে বাঙ্গলা দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করলে; সময় আছে মাত্র আড়াই ঘণ্টার কিছু কম। ইউ পির বোলিং

কলিকাতায় নারী-শিক্ষা সমিতির প্রদর্শনীতে সার এস-রাধাকৃষ্ণন ও ময়ুরভঞ্জের রাজমাতা সুচারু দেবী

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রীযুত ভবানী চরণ লাহা (দক্ষিণ দিক হইতে তৃতীয়)

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাক্তন ছাত্র মিলন উৎসব
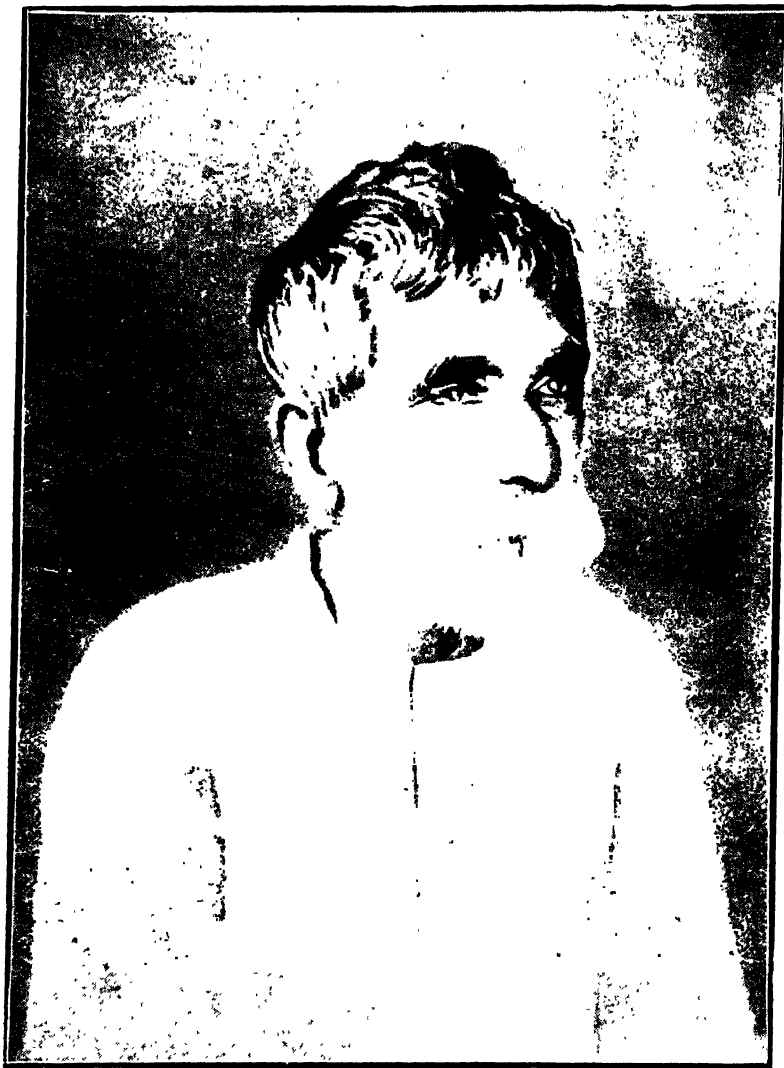
আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সম্প্রতি আচার্য্য রায়ের বয়স অশীতি বৎসর হওয়ায়

তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন চলিতেছে

বাঙ্গলার ক্যাপ্টেনের যথেষ্টই জানা ছিলো। তাঁর কি ক'রে ধারণা হ'ল ঐ রকম বোলিংয়ের বিরুদ্ধে আড়াই ঘণ্টায় ২৭১ রান তোলা সম্ভব হ'তে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আর যাই হোক এটাকে আমরা সৎসাহস বলি না। অবশ্য নির্ম্মল ও জব্বর প্রথম জুটি রান খুব দ্রুত তুলে ১৮ মিনিটে ৩৩ করে। কিন্তু দ্রুত রান তোলা মানে এই নয় যে, উইকেটের কথা চিন্তা না ক'রে প্রতিটি বল যে কোন উপায়ে মারতে হবে। ইউ পি বোলাররা এর যথেষ্ট সুযোগ গ্রহণ ক'রেছেন আর তাঁরাই শেষ পর্য্যন্ত সফল হ'য়েছেন। একমাত্র কে ভট্টাচার্য্য স্বাভাবিক ভাবে খেলে ৩০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। জোর ক'রে রান তোলা এক জিনিষ আর Reckless হওয়া আর এক। ক্রিকেট Reckless হয়ে খেলার নয়। খুব পিটিয়ে খেলতে গেলেও এখানে স্থির মস্তিষ্কে খেলতে হয়। আলেকজেণ্ডার ৬ ওভার বল দিয়ে ২০ রানে চারটে উইকেট পেয়েছেন; ফিরাসাৎ ৩৯ রানে ৩। টীম মনোনয়ন কমিটি সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার।

বালীগঞ্জ ক্লাব থেকে বেরেণ্ড ছাড়া আর যে দুজন খেলোয়াড়কে নেওয়া হ'য়েছিলো তাঁদের খেলা দেখে মনে হয় তাঁরা কোন প্রথম শ্রেণীর ক্লাব ম্যাচে খেলার উপযুক্ত নন। শুধু উইকেট কিপিংয়ের জন্য একটি খেলোয়াড়কে টীমে নেওয়া যেতে পারে না তাও বেডওয়েলের উইকেট কিপিং এমন কিছু ভাল নয়। তাঁর স্থানে এ দেবকে টীমে নেওয়া উচিত ছিলো। উইকেট কিপার হিসাবে তিনি মন্দ নন তবে ব্যাটিংয়ে চমৎকার। বালীগঞ্জ ক্লাবের অপর খেলোয়াড়টির স্থানে পি ডি দত্তকে সচ্ছন্দে নেওয়া যেত। ভাল টীম তৈরী করা যাচ্ছে না অতএব একটা বড় ক্লাব থেকে দুজন পুরাতন খেলোয়াড় নিয়ে কোনক্রমে ম্যাচ জেতা আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার উদ্দেশ্য নয়। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা হয় যাতে প্রতি প্রদেশের উদীয়মান খেলোয়াড়রা বড় বড় ম্যাচ খেলতে পান আর তার থেকে নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরী হয়। এতে নাম ক'রতে পারলে তবে অল্-ইণ্ডিয়ায় তাঁরা সুযোগ পাবেন। উদীয়মান খেলোয়াড়রাই সুযোগ পেলে খেলার উন্নতি ক'রতে পারেন। ইউ পি এটা খুব ভাল ক'রে বুঝেছে। বাঙ্গলা এবং আর দুএকটি প্রদেশই বোধ হয় এটা বুঝতে পারেনি। পরাজয়েরও একটা শিক্ষা আছে অবশ্য তাঁদেরই কাছে যাঁরা শিক্ষা কি তা জানেন।

ভারতবর্ষ:—২৫১ ও ২৯৩ (৫ উইকেট)

সিলোন:—৩৭২ ও ৮২ (২ উইকেট)

সময়াভাবে খেলা ড্র হ'য়েছে।

ভারতবর্ষ প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৫১ রান করে। সর্ব্বোচ্চ রান করেন এস গাঙ্গুলী ৬৯; তারপরই নির্ম্মল ৫৩।
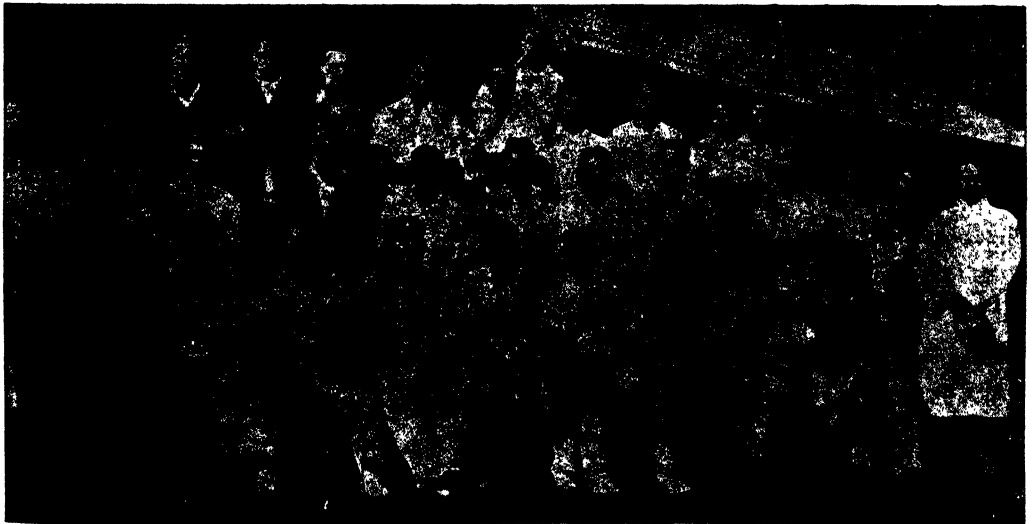
কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে অল্ ইণ্ডিয়া ও সিলোন দলের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গাঙ্গুলীর ওপনিং খুব ভাল হ'য়েছে। তাঁর একটা দুর্ভাগ্য ছিলো, কয়েক বছর তিনি ক্লাব ম্যাচে বেশ ভাল খেলেও বড় খেলায় ভাল ফল ক'রতে পারছিলেন না। এবার সেটা হয়নি। নির্ম্মল বেশ চমৎকার খেলেছেন। সিলোনের কেলার্ট ও এম গুনরত্ন যথাক্রমে ৭০ ও ৭৯ রান দিয়ে চারটি ক'রে উইকেট পেয়েছেন।

সিলোন দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৯৬ রান করে। নাইডু চমৎকার ভাবে বোলার চেঞ্জ ক'রে মাত্র ২৪ রানে তিনটে উইকেট ফেলে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিন সিলোনের ইনিংস শেষ হ'ল ৩৭২ রানে। তাঁদের ক্যাপ্টেন জয়বিক্রম ১৩৮ রানে ব্যানার্জ্জির বলে মেজরের হাতে ধরা দেন। তিনি ১৮৯ মিনিট খেলে ৮৬ রানের মাথায় একবার মাত্র আউট হবার সুযোগ দিয়ে-

এস্ ব্যানার্জ্জি

ছলেন; চার ছিলো ১৫টা। সিলোনের ক্যাপ্টেন ছাড়া পোরিট, জি গুণরত্ন এবং জয়সুন্দর বেশ ভাল ব্যাট ক'রেছেন। দলের শেষ খেলোয়াড় জয়সুন্দর ব্যানার্জ্জিকে অদ্ভুত ভাবে পিটিয়েছেন। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং খারাপ হ'য়েছে; উইকেট কিপিং তৃতীয় শ্রেণীর। কে ভট্টাচার্য্য ৪৯ রানে তিনটে উইকেট পেয়েছেন। ভারতবর্ষ ১২১ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করলে আর দিনের শেষে এক উইকেট হারিয়ে রান উঠলো ৪২।

গাঙ্গুলীর ওপনিং এবারও খুব ভাল হ'য়েছে। তিনি ১৩৮ মিনিট খেলে ৬৪ রান ক'রেছেন, চার ছিলো ৪ টে। নাইডু ৫০ রান ক'রে আউট হন। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন; তাঁর খেলা বেশ দর্শনীয় হ'য়েছিলো। নির্ম্মলের খেলা খুব ভাল হ'য়েছে, উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার ভাবে পিটিয়ে খেলে ৭৩ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন। ব্যানার্জ্জিও আউট হননি রান ক'রেছেন ২৫। নাইডু নির্ম্মলের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছেন; গাঙ্গুলী ও ব্যানার্জ্জিরও। ব্যানার্জ্জি সম্বন্ধে তিনি ব'লছেন, ভাঙ্গনের মুখে ব্যানার্জ্জিকে পাঠিয়ে তিনি বহুবার সুফল পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে লাঙ্কাসায়ার এবং বোম্বাইয়ে হিন্দু ও পার্শী দলের খেলার উল্লেখ করেন। এ ছাড়া সিলোনের খেলার কিছুদিন পরে অনুরূপ ক্ষেত্রে নাইডুর একাদশের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলায় টীমকে রক্ষা ক'রেছেন। গাঙ্গুলী, মানকদ, মাস্তক আলি এবং মেজর নাইডুর মত চারটি উইকেট যখন মাত্র ৩৮ রানে চলে যায় সেই সময় ব্যানার্জ্জি এসে নিজস্ব ৮৯ রান করার পর আউট হ'ন।

নাইডু ৫ উইকেটে ২৯৩ রান ওঠার পর ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রলেন। সিলোন দু' উইকেটে রান তুললো ৮২। সময়াভাবে খেলা ড্র হ'য়ে গেল।

নির্ম্মলের 'ফুটওয়ার্ক' বেশ ভাল; ড্রাইভ, পুল এবং অন্যান্য মারগুলিও দর্শনীয়। নাইডুর মতে নির্ম্মল শীঘ্র অল্-ইণ্ডিয়া খেলোয়াড় হ'তে পারবেন। ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে মেজর নাইডুর মত ব্যক্তির অভিমতের মূল্য যথেষ্ট। আমাদের মনে হয় নির্ম্মল এবং আরও দুএকজন উদীয়মান খেলোয়াড়ের নাইডুর মত বিচক্ষণ ও প্রবীণ খেলোয়াড়ের নিকট অন্ততঃ কিছুদিন নির্ভুল 'ফুটওয়ার্ক' এবং বিভিন্ন রকমের মার শিক্ষার প্রয়োজন।

সিলোনের বিরুদ্ধে যে টীম গঠিত হ'য়েছে তাকে ভারতীয় একাদশ নাম দেওয়া উচিত হয়নি। আমরা অবশ্য একথা বলি না যে, এগার জন টেষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে ভারতবর্ষ সিলোনের বিরুদ্ধে খেলবে; তবে আমরা অবশ্য এটুকু আশা ক'রতে পারি যে, যাঁদের দলে নূতন নেওয়া হবে তাঁরা উদীয়মান খেলোয়াড় হবেন, এবং বড় ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ভাল খেলোয়াড় হ'তে পারবেন। কিন্তু টীম মনোনয়ন ব্যাপারেও রাজনীতি পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে জোর ক'রে লোক নেওয়া

হ'য়েছে তাও ভাল বাছাই হয় নি। মেজর নাইডুর মত একজন খেলোয়াড়কে ক্যাপ্টেন ক'রে ভারতীয় একাদশ নাম দিয়ে তারপর যেভাবে একটা জোড়াতালি দেওয়া টীম তৈরী করা হ'য়েছে তাতে ক্যাপ্টেন এবং ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা হয়নি। এ দেব সিলোনে তাদের বিরুদ্ধে ভাল খেলেছিলেন। গত বছর এবং এবছর স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর ব্যাটিং এভারেজ বেশ ভাল অথচ তাঁকে ভাল ম্যাচ খেলবার সুযোগ দেওয়া হয় না। সিলোনের খেলার কয়েক দিন পরে মেজর নাইডুর একাদশের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলায় দেব অতি অল্প সময়ে নাইডু, ব্যানার্জি ও মাস্তকের বলে উইকেটের চারিদিকে পিটিয়ে খেলে সমস্ত দর্শকদের এবং মেজর নাইডুকে এত মুগ্ধ ক'রেছিলেন যে, নাইডু খেলার শেষে বলেছিলেন, 'He possesses all-round hits and has the making of an All-India cricketer' কিন্তু টীমে স্থান পান টাউফিক, নাটাল ও হাণ্ট। সত্যি সত্যিই যদি বাঙ্গলা দেশে এমন খেলোয়াড়ের অ ভা ব হ'য়ে থাকে যাঁদের টীমে নিলে ম্যাচ জেতার পক্ষে কিছু সুবিধা হয় অথবা, ব্যক্তিগত ভাবে ঐসব খেলোয়াড়দের উন্নতিরও কোন আশা থাকে তাহ'লে বাঙ্গলা থেকে খেলোয়াড় না নেওয়াই উচিত। হাণ্টের মত উইকেটকিপার নেওয়ার চেয়ে বাইরের থেকে উইকেট কিপার আনানোই ভাল ছিলো। নাটাল বা টাউফিকের চেয়ে অনেক ভাল খেলোয়াড় বাঙ্গলা দেশেই আছেন।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দল

রোহিণ্টন বেরিয়া ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২০৬ ও ২০০

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—২০৬ ও ১৫৩ (৫ উঃ)

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ৫ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংসের ২০৬ রানের মধ্যে ডি সেনা ৬৪ ও এস দাস ৩০ রান করেন। ডি সেনা ৭৯ মিনিটে ৫টা বাউণ্ডারী ও একটা ৬ করেছিলেন। রঙ্গরাজ ৭২ রানে ৫ উইকেট এবং গুরুদাচার ৭৫ রানে ৫ উইকেট পান। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংসে

৬ উইকেটে মাত্র ১০৫ রান উঠে। আট উইকেটের জুটীতে পানসেলকার ও রেড্ডী ৬৩ রান করে দলের শোচনীয় অবস্থার গতি পরিবর্ত্তন করেন। পানসেলকারের যখন কোন রানই উঠেনি তখন অনিল দত্তের বলে উইকেট কিপার

এস আর বাহারী (ক্যাপটেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)   নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি (ক্যাপটেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পানসেলকারের অতি সোজা ক্যাচ ফেলে দেন। স্থানীয় দলের ফিল্ডিং মোটেই ভাল হয়নি। অধিনায়ক নির্ম্মলের বল ভাল হয়েছিল, ৪১ রানে ২টা উইকেট পান। তাঁর একই ওভারে দু'টো ক্যাচ কেউ লুফতে পারেননি। এস ব্যানার্জি ৪৮ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন। সাধুর বল ভাল হয়েছিল কিন্তু কোন উইকেট পড়েনি। রেড্ডি ৫০, দাসতোর ৫৯ ও পানসেলকার ৪২ রান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে আরম্ভ করে। দলের এই সংকট অবস্থায় এন চ্যাটার্জ্জি ও ডি সেনা খেলার শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। নির্ম্মল চমৎকার ভাবে খেলে ৪১ রান করেন। ডি সেনা প্রায় ৪০ মিনিটে ৫০ রান ক'রে রঙ্গরাজের বলে খাজার হাতে ধরা দেন। তিনি কয়েকবার আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এইচ সাধুর ৩২ ও বি ব্যানার্জির ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। বি ব্যানার্জি উভয় ইনিংসেই লাষ্ট ম্যান থেকে ভাল খেলেছিলেন। বেনারস দলের ফিল্ডিং ভাল হয়েছিল। রঙ্গরাজ ৬৮ রানে ৬ উইকেট ও গুরুদাচার ৮৩ রানে ৩ উইকেট পান। বেনারস দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে তাদের প্রয়োজনীয় ১৫৩ রান তুলে নেয়। অনিল দত্ত মাত্র ৩১ রানে ৪টা উইকেট লাভ করেন।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ফাইনাল ঃ

মুসলীম—৩৮১ ও ৪৮ (৩ উইকেট)

রেষ্ট—২০২ ও ২২৬

মুসলীমদল ৭ উইকেটে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় হিন্দুদল যোগদান করে নি।

রেষ্টদল টসে জয়লাভ ক'রে প্রথমে ব্যাট করতে নামে। ক্যাপ্টেন জে হ্যারিস ৮২ রান করেন। এম কোহেনের ৩৮ রানও উল্লেখযোগ্য। আমির ইলাহি ৮৮ রানে ৭টা উইকেট পান। মুসলীমদলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৮১ রানে, মাস্তকআলী ১১০ রান করেন। ওয়াজীর আলীর ৫৯, দিলওয়ার হোসেনের ৫৪ ও নাসিরুদ্দিনের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। মাস্তকের খেলা খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। রেষ্টদলের ফিল্ডিং ভাল হয়নি; অনেকগুলি সহজ ক্যাচ নষ্ট হয়েছে। হ্যারিস ৪০ রানে ৪টা উইকেট পেয়েছেন। রেষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠে ২২৬। মাসকারেনহাস দলের সর্ব্বোচ্চ ৪৯ রান করেন। মুসলীমদলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৪৮ রান উঠে; হাজারী মাত্র ১৫ রানে ২টি উইকেট পান।

সিলোন :—২৩৪ ও ১৩৪

অল ইণ্ডিয়া :—৪৭৮ (৭ উইকেট ডিক্লিয়ার্ড)

সিলোন এক ইনিংস ও ১১০ রানে পরাজিত হ'য়েছে। ক'লকাতার চেয়ে বোম্বায়ের টীম যথেষ্ট শক্তিশালী
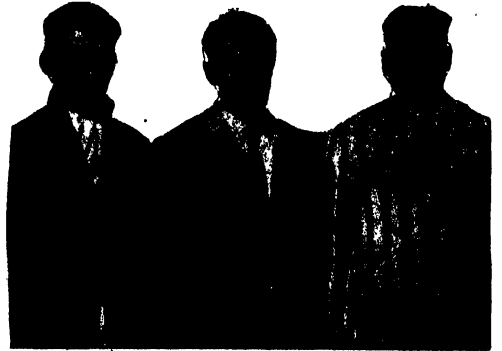
নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ

হ'য়েছে। ক'লকাতার টীমে অল-ইণ্ডিয়া ব্যাটসমান কেউ ছিলেন না। অধিনায়ক হিসাবে নাইডুর খ্যাতি হয়ত

পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ব্যাটসমান হিসাবে নাইডুর বোধহয় আর ততখানি দক্ষতা নেই। বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসমান বিজয় খেলছেন। যে সব উদীয়মান খেলোয়াড় টীমে স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রঙ্গনেকার, হাজারে এবং অধিকারীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ রঙ্গনেকারের খেলা সমগ্র ভারতের ক্রীড়ামোদিদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। এছাড়া প্রবীণ ক্যাপ্টেন দেওধর এখনও তরুণের মত উৎসাহ ও শক্তি নিয়ে খেলেন এবং সেদিনও বোম্বায়ের বিরুদ্ধে 'ডবলসেঞ্চুরী' ক'রেছেন।

প্রথম দিনের খেলায় দর্শক সমাগম হ'য়েছে আটহাজার। সিলোন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে এবং তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে। জি গুণরত্ম মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পেলেন না; মেণ্ডিস ৪২ রান ক'রেছেন। চিপ্পা ৩৮ রানে পাঁচটি আর সৈয়দ আমেদ ৪৯ রানে তিন উইকেট পেয়েছেন। সি এস নাইডুর ভাগ্য ভয়ানক খারাপ তিনি খুব ভাল বল ক'রেও ইঞ্জিনিয়ারের খারাপ উইকেট কিপিংয়ের জন্য বেশী উইকেট পান নি। বহুবার ইঞ্জিনিয়ার ষ্টাম্প করার সুযোগ অপব্যবহার ক'রেছেন। ভারতবর্ষ দিনের শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান করে; বিজয় ৫২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৭ উইকেটে ৪৭৮ হবার পর দেওধর ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করেন। বিজয় ১৬৫ মিনিট খেলে ১৩৭ রান দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হ'য়ে যান; তিনি মাত্র ৭৩ রানের সময় একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। রঙ্গনেকার ১০৭ মিনিট খেলে ১১৭ রান ক'রে পোরিটের বলে মেণ্ডিসের হাতে ধরা দেন। তাঁর খেলায় 'চার' ছিলো ১১টা। অধিকারীর ৯০ এবং দেওধরের ৬৯ রানও উল্লেখযোগ্য।

তরুণ খেলোয়াড় রঙ্গনেকার ও অধিকারীর সাফল্য ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল ক'রবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

সিলোন ২৪৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করলে। হাজারে এবং সি এস নাইডুর বলে কোন খেলোয়াড়ই সুবিধা করতে পারেন নি। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন এ গুণরত্ম ৩৭। হাজারে ৩৪ রানে চার এবং নাইডু ৩২ রানে তিন উইকেট পান।

সিলোনের খেলার ফলাফল ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রথম খেলায় তারা মাদ্রাজকে পরাজিত করে তারপর ক'লকাতায় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং বোম্বায়ের খেলায় তারা পরাজিত হ'লো। অবশ্য

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায়
দিল্লীর ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ

তাদের খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের প্রশংসা আমাদের ক'রতেই হবে। সিলোনের লোক সংখ্যা পাঞ্জাবের ঠিক পঞ্চমাংশ

কিন্তু তাদের দেশে ক্রিকেট খেলার চর্চ্চা আছে। আমরা যদি তাদের হারিয়ে দিই তাতে আমাদের গৌরবের কিছু নেই বরং হারাতে না পারাটাই অগৌরবের। সিলোন এবং ভারতবর্ষ থেকে যদি এই রকম প্রতি বৎসর টীম পাঠানোর বন্দোবস্ত হয় তাতে উভয়দেশের ক্রিকেট খেলার যথেষ্ট উন্নতি হ'তে পারে।

ব্যাডমিণ্টন ঃ

ব্যাটমিণ্টন ক্রমশঃ সব দেশেই বেশ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে এমন কি টেনিসের ডেভিস কাপের অনুকরণে যাতে ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা হ'য় তার চেষ্টাও চলছে।

সম্প্রতি ভবানীপুর ওয়াই এম সিএ কোর্টে অল-ইণ্ডিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানসীপের মত তিনটি বড় বড় প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। এবারের অল-ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা পেনাংয়ের বিখ্যাত তরুণ খেলোয়াড় চী চুন কেংয়ের উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান ও জয়লাভ। কেং একজন খুব উচ্চ শ্রেণীর খেলোয়াড়। এখানে তাঁকে একমাত্র মাডগাউকারের সঙ্গে জোর দিয়ে খেলতে দেখা গিছলো আর তাঁকে তিনি ষ্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন। অল-ইণ্ডিয়া ফাইনালে তিনি বোম্বাইয়ের পটবর্দ্ধনকে ১৫-৯

মালয়ের খ্যাতনামা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় চু চুন কেং নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন

১৮-১৫ গেমে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েছেন। কেং একটু জোর দিয়ে খেললে পটনবর্দ্ধনকে অনেক কম পয়েণ্টে হারাতে

তরুণ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় এইচ বসু এ বৎসর ইষ্টইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত হয়েছেন

পারতেন। কেং বিভিন্ন রকমের দর্শনীয় ষ্ট্রোক দিয়ে খেলেন; স্মাসিংও চমৎকার। ১৯৩৯ সালে তিনি সাতবার পেরাক চ্যাম্পিয়ান এবং তিনবার সামুয়েলের মত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের বিজয়ী টীম চোং ফোরকে পরাজিত করেন। পর পর চারবার অল-ইণ্ডিয়া বিজয়ী লুইয়ের চেয়ে তাঁর খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাল কিনা তা বলা শক্ত। লুই এবার প্রতিযোগিতার যোগদান ক'রতে পারেন নি।

বোম্বাইয়ের ম্যাগউ ভ্রাতৃদ্বয় ডবলসে পাঞ্জাবের হরনারায়ণ ও জহুরকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হন।

মহিলাদের খেলায় দুবছর পরে আবার কুমারী গস কুমারী কুককে পরাজিত ক'রে বিজয়িনী হ'য়েছেন।

এবারের ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন মাডগাউকার। উভয় প্রতিযোগিতাতেই বাঙ্গলার উদীয়মান খেলোয়াড় সুনীল বসু ফাইনালে পরাজিত হন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে উভয় খেলোয়াড়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লেছিলো; তৃতীয় গেমে সুনীল একটু ভাল ক'রে খেলতে পারলে মাডগাউকারকে পরাজিত ক'রতে

পারতেন। সেমিফাইনালে তিনি গতবারের বিজয়ী টি ব্যানার্জ্জিকে সহজেই পরাজিত ক'রেছিলেন। টি ব্যানার্জ্জির চেয়ে তাঁর খেলা অনেকাংশে উন্নত এবং বর্ত্তমান বৎসরে তাঁকে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। তিনি এবার সাউথ ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়ী হ'য়েছেন। অল-ইণ্ডিয়ায় তিনি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত খেলোয়াড় ডি ম্যাগ-উকে সহজেই পরাজিত ক'রেন।

ডুরাণ্ড কাপ ফাইনাল ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ও বোম্বে রোভার্স কাপ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভারত-বর্ষের ফুটবল খেলার ইতিহাসে পূর্ব্বেই এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের খেলোয়াড় মহলে তাদের গৌরবের সংবাদ আজ অবিদিত নয়। এবৎসর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ডুরাণ্ড কাপে যোগদান ক'রে উক্ত কাপ বিজয়ী হ দলের সম্মান আরও বৃদ্ধি করেছে। দলের এ সাফল্যে ভা তীয় ক্রীড়ামোদী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করবেন। ইতিপূর্ব্বে বে-সামরিক কোন ফুটবল ক্লাবই ডুরাণ্ড কাপ জয়ের সম্মান অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফাইনালে রয়েল ওয়ার উইক সায়ার দলকে ২-১ গোলে তারা পরাজিত করে।

ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী মহামেডান দলের খেলোয়াড়গণ এবং মহামান্য বড়লাট বাহাদুর

ডুরাণ্ড কাপ ফাইনাল খেলায় মহামেডান দলের গোলের সম্মুখের একটি দৃশ্য ; মহামেডান দল ২-১ গোলে বিজয়ী হয়েছে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

কলিকাতা সাউথ ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন টেনিসের খেলা শেষ হয়েছে। ভারতের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি। ফলে পাঞ্জাবের এস এস আর সোহানী পুরুষের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডবলসে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় সোহানীর এই কৃতিত্ব এইবারই প্রথম। সুইডিস ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ম্যাক্স এলমারের খেলা দর্শকদের মোটেই চমৎকৃত করতে পারেনি। ফাইনালে যাওয়া ত দূরের কথা সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালেই তরুণ খেলোয়াড় জে মি মেটার কাছে হেরে যান।

বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস—এস এল আর সোহানী ৬-১, ৬-৪, ৬-০ গেমে জে মি মেটাকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস—এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনী—জেমি মেটা ও ওয়াই আর সাবুরকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস—এস আর সোহানী ও মিসেস সি কারগিন ৬-৩, ৬-২ গেমে জি মি মেটা ও মিসেস ফুটিটকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—মিসেস মাস্‌সি ৬-২, ৬-২ গেমে মিস ডিক্‌সনকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলস—এস ব্রুক এডওয়ার্ডস ও এন আয়ার ৮-৬ গেমে এইচ ব্রুক ও এস মেয়ারকে পরাজিত করেন।
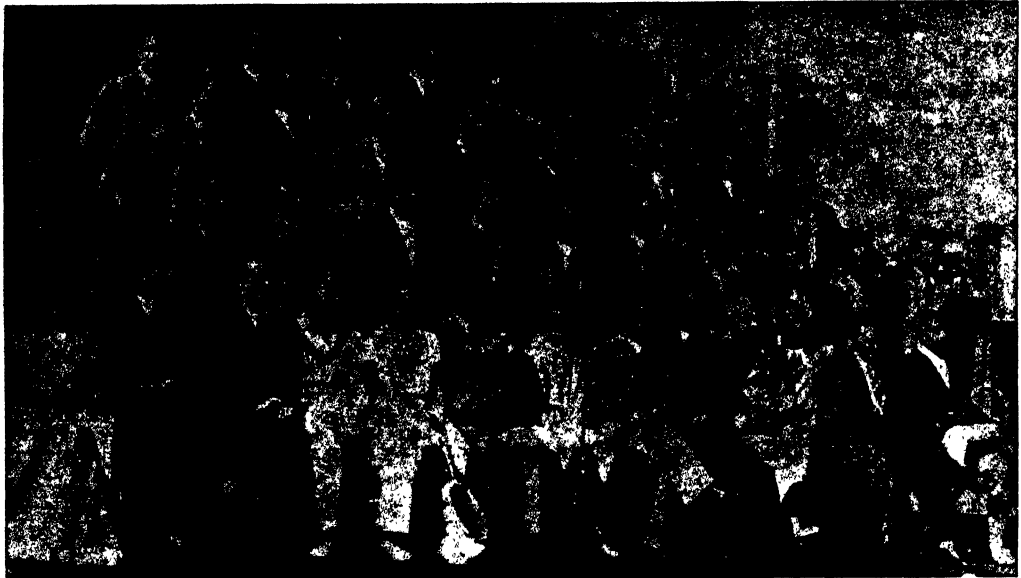
ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়গণ ও সাউথ ক্লাবের পরিচালকগণ

সাহিত্য সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নরেন্দ্র দেব প্রণীত "ওমর-খৈয়াম" ৭ম সং—৪৲
তা... বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হারাণো সুর"—২।৹
প্রভাস দা... প্রণীত "হিটলারের পতন"—১।৹
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, বি-এল প্রণীত "কৌতুক কথা"—১৲
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আলো ছায়ার খেলা"—২৲
মতিলাল দাশ প্রণীত নাটক "নব্যা ও সবিতা"—১।৹
ভবেশচন্দ্র রায় ও নরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত "আধুনিক যুদ্ধ"—২৲
ডক্টর সত্যনারায়ণ প্রণীত "রোমাঞ্চক রাশিয়ায়"—২।৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গাঁয়ের বৌ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

হিন্দু-মুসলমান

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

এদেশে প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের বাস—হিন্দু এবং মুসলমান। এ কথা একান্তভাবে সুনিশ্চিত যে বাঙ্গলার সুদিন ততক্ষণ আসবে না যতদিন এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে ভালবাসতে না শিখবে, আর উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের প্রথমত বাঙ্গালী—আর তারপর হিন্দু কিম্বা মুসলমান হিসাবে ভাবতে না শিখবে। এই মঙ্গলপ্রসু মানসিকতার সৃষ্টি কি ক'রে করা যেতে পারে সেই হচ্ছে বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যার আলোচনায় তিনটি প্রশ্ন এসে দেখা দেয়; আর তাদের উত্তরের উপর সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। প্রশ্নগুলি হচ্ছে—(১) দুই সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান বিরোধের কারণ কি, (২) কি উপায় অবলম্বন করলে সে বিরোধ দূরীভূত হতে পারে এবং (৩) কি উপায়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় একত্ববোধের সৃষ্টি করা যেতে পারে?

বিরোধের কারণ কি সেই প্রশ্নেরই প্রথমত আলোচনা করা যাক; মানুষ কেন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে, আর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে? কেন সে সমাজবিশেষকে ভালবাসে আর সমাজবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে? পাঠক একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমাদের ভালবাসার কারণ হচ্ছে, যে সব জিনিসকে আমরা ভালবাসি, যে সব জিনিস আমরা চাই, সেইসব জিনিস ব্যক্তি এবং সমাজ-বিশেষের মধ্যে পাই বলেই তাদের আমরা ভালবাসি; পক্ষান্তরে বিরোধের কারণ হচ্ছে, যে সব জিনিসকে আমরা ভালবাসি—ব্যক্তি কিম্বা সমাজ-বিশেষ থেকে সে সব জিনিসের বিপদের কারণ আছে বলেই তাদের প্রতি আমরা বিরোধের ভাব পোষণ করি। আর যথন ব্যক্তি কিম্বা সমাজ-বিশেষ থেকে আমাদের প্রিয় জিনিসের সুবিধার কিম্বা বিপদের কোনটিরই

সম্ভাবনা থাকে না তখন সেই ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি আমরা ঔদাসীন্যের ভাব পোষণ করি। প্রতিবেশিক সমাবেশের দরুণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের জীবন এমনই ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট যে, হয় তারা পরস্পরের জীবনকে সুভাবে প্রভাবান্বিত করবে, নয় কুভাবে প্রভাবান্বিত করবে; এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং হয় তারা পরস্পরকে ভালবাসবে, নয় ঘৃণা করবে; ঔদাসীন্যের ভাব পরস্পরের প্রতি তারা পোষণ করতে পারে না।

আপাতত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা অর্থাৎ বিরোধের ভাবটাই প্রবল। তার কারণ কি? আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কারণগুলিই বর্ত্তমান বিরোধের জন্য মুখ্যত দায়ী, যথা—(১) ঐতিহাসিক শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী, (২) ধর্ম্মগুরুদের অবাঞ্ছ[illegible] প্রভাব, (৩) সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন স[illegible] প্রভাব, (৪) চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অ[illegible]তক প্রতিযোগিতা, (৫) বর্ত্তমান রাজনীতিক জীবনে এই চাকুরী-জীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য, (৬) অতীতের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনবার দুরাশা এবং দুঃস্বপ্ন, (৭) বিভিন্ন ধরণের জীবনধারণপ্রণালী, (৮) সম্মিলিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির অভাব, (৯) ভবিষ্যতের বিষয় কোন সুস্পষ্ট ব্যাপকতর সামবায়িক আদর্শের অভাব এবং (১০) বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জীবনে অবাঙ্গালীর অতিরিক্ত প্রভাব।

ছেলেবেলা থেকে আমরা পড়ে আসছি সুলতান মাহ্‌মুদ ভারত আক্রমণ ক'রে হিন্দুদের অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, মন্দিরের বিগ্রহাদিকে ধূলিসাৎ করেছিলেন, পুরোহিতদের লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত করেছিলেন, হিন্দু জনসাধারণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। তারপর আমরা পড়ি সুলতান আলাউদ্দীন কেমন ক'রে রাণী পদ্মিনীর লোভে রিপুপরবশ হয়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয় চিতোরের বীর যোদ্ধারা অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেছিলেন, চিতোরের কুল-ললনারা রাণী পদ্মিনীর নেতৃত্বে প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তারপর আমাদের পড়ান হয় আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামির কথা। তাঁর গোঁড়ামির ফলে কি ভাবে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, মহারাষ্ট্র বীরেরা কি ভাবে শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, শিখেরা মহারাজ রণজিত সিংহের অধিনায়কত্বে কি ভাবে হিন্দু রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আমরা বাঙ্গালার শেষ নওয়াব হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার এবং স্বৈরাচারের বিষয় কত কি পড়ি। এইসব অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক, অর্দ্ধ-কাল্পনিক বিষয় এমন ভাবে লিখিত হয়, এমনভাবে এ সবের শিক্ষা দেওয়া হয় যে হিন্দু ছেলেদের মনে মোস্‌লেম বিদ্বেষ আপনা থেকেই জেগে ওঠে। আর বাল্যজীবনের শিক্ষা এমন গভীর ভাবে ছাত্রের অন্তরে প্রবেশ করে যে, পরে তার বিষময় প্রভাব থেকে তার মনকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুক্ত করা যায় না।

দেশে যদি নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি আমরা করতে চাই, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তা হ'লে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ঐতিহাসিক পুস্তকাদির আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে, ইতিহাস শিক্ষার প্রণালীও বদলে দিতে হবে। ইতিহাসের লেখক এবং শিক্ষকদের একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে অন্যায় এবং অত্যাচার মুসলমানেরও একচেটিয়া জিনিস নয়—আর হিন্দুরও একচেটিয়া জিনিস নয়। দু-একজন মুসলমান বাদশা যদি প্রজাপীড়ন ক'রে থাকেন, তাঁরা মুসলমান হিসাবে তা করেন নি, তাঁদের স্বভাবেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের স্বৈরাচারের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের এবং মুসলমান জাতির কোন সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে অসংখ্য মুসলমান বাদশা, নওয়াব, সুবেদার প্রভৃতি ন্যায়বিচার এবং উদারতার যে পরকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত তো ভারতবর্ষের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। দু-একজন অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার অনাচার অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেয়ে অসংখ্য মহানুভব শাসনকর্ত্তাদের মহানুভবতার কথা স্মরণ করাই ভাল।

ইতিহাসের লেখক এবং শিক্ষকদের ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্বদা এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে বাস করতে হবে। সুতরাং অতীতের সেই সব ঘটনার বিষয়ের আলোচনার দরকার—যা থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নেহ প্রীতি এবং ঐক্যের ভাব বাড়তে পারে। আর যে সব ঘটনার আলোচনা

পুরাতন ক্ষতকে নূতন ক'রে জাগিয়ে দেয়, সে সবের যত কম উল্লেখ হয়, যেখানে সে সবের উল্লেখ অপরিহার্য্য সেখানে নিরপেক্ষ ভাবে যাতে ঘটনাবলীর আলোচনা হয়, কোন বিশেষ জাতিকে দোষী না ক'রে যাতে প্রকৃত অপরাধীর উপরই দোষারোপ করা হয়, অন্যায় এবং অত্যাচার যে কোন বিশেষ জাতির কিম্বা সমাজের বিশেষত্ব নয়, বরং সর্ব্বদেশেই এবং সর্ব্ব সমাজেই এরূপ হয়ে থাকে, তার প্রতিকার জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তোলায় নয়, বরং তার প্রতিকার হচ্ছে, যে অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ সেই সব অন্যায় এবং অত্যাচার সম্ভব হয়েছে সেই অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে সমাজ-জীবন থেকে বিদূরিত করা—এই সব মূল্যবান নীতি সম্মুখে রেখেই ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা করা দরকার; যাঁরা পাঠ্য নির্ব্বাচন কিম্বা প্রকাশ করেন, তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই সব নীতি অনুসৃত হয়েছে কি-না সেইদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ নির্ব্বাচন এবং প্রকাশ করা; শিক্ষকগণেরও এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব আছে। ইতিহাস পড়াবার সময় তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, ছাত্রদের এই সব সত্যের বিষয় অবহিত করা, আর ইতিহাসের শিক্ষা যাতে তাদের মনে জাতি-বিদ্বেষের বীজ বপন করতে না পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা!

ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজক এবং পুরোহিত সমাজ-জীবনে অপরিহার্য্য। অথচ ধর্ম্ম নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বত্রই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের, এমন কি সমধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি অনুদার ভাব এবং তাদের মানসিকতা বোঝবার ধৈর্য্য এবং ক্ষমতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা এবং অজ্ঞতা কেবল ভারতীয় যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকদের এই মানসিকতা সমাজ-জীবনে অশেষ অকল্যাণের সৃষ্টি করে। আর সেই জন্যই দেখতে পাই—যেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় জীবনকে নূতন ভিত্তিতে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে সেখানেই পুরোহিতদের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধা এসে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারকদের তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিতদের কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের যুগের তুর্কি বিপ্লব পর্য্যন্ত সেই একই সত্যের পুনরভিনয় হয়েছে। যাঁরা বঙ্গদেশে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, এক কথায় যাঁরা দেশে নূতন কিছু করতে চান, তাঁদেরই যাজক সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাঁদের সহযোগিতা কখনও তাঁরা পাবেন না।

পুরোহিতরা মানুষের অজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে চিরকাল স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক'রে এসেছেন। অজ্ঞ অসহায় নরনারীর উপরই তাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রভাবের তাঁরা অপব্যবহারই করেছেন। তাঁদের প্রভাবকে সংযত করতে হ'লে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যাতে সাধারণের মধ্যে সম্যক বিস্তার হয় তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কেবল বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করলে চলবে না। সাময়িক এবং সাধারণ সাহিত্যের সাহায্যে সে শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দিতে হবে। বক্তৃতার সাহায্যে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির সাহায্যে সে শিক্ষাকে প্রচার করতে হবে। আর সেই শিক্ষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, পর-ধর্ম্মের প্রতি, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সৃষ্টি করতে হবে। সেই শিক্ষার সাহায্যে তাদের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। আর সেই শিক্ষার সাহায্যে তাদের মধ্যে আর্ত্ত মানবের প্রতি প্রীতি এবং সমবেদনার ভাবকে সঞ্চারিত করতে হবে।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনার যুগেই আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য জন্মলাভ করে। ইংরেজের প্রভাব তখন বাঙ্গালীর জীবনে এবং মানসক্ষেত্রে অপ্রতিহত। বাঙ্গালী হিন্দু ইংরেজকে তখন আদর্শ মানব বলেই মনে করত, আর ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকে শিক্ষার আদর্শ-পন্থা বলেই বিশ্বাস করত। আর ইংরেজের বাক্যকে বেদবাক্যের মতই অকাট্য বলে তারা মেনে নিত। ইংরেজ মুসলমানদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা মুসলমানদের প্রতি এবং তাদের ধর্ম্ম ইসলামের প্রতি বৈর ভাব পোষণ করতেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং মনের স্বাভাবিক ভাব প্রকাশের জন্য মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধর্ম্মকে তাঁরা মসীবর্ণে চিত্রিত করতে তখনকার যুগে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁদের লেখা পড়ে বাঙ্গালী হিন্দুর মনে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ভাব স্বতই জেগে উঠত, আর সে ভাব

প্রকাশ পেত তাঁদের সৃষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যে। সে যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য তাই মোসলেম বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত! সে সাহিত্য হিন্দু-মোসলেম বিরোধ জাগিয়ে রাখতে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে।

তখনকার যুগের ভারতীয়েরা আমলাতন্ত্রমূলক ইংরেজ-শাসনকে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারকার মতই চিরস্থায়ী নিসর্গের অন্তর্গত বলে মনে করতেন, আর সেই শাসনের অধীনে হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের তাঁরা বিশেষ কোন প্রয়োজন অনুভব করতেন না; তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে সে মিলনের কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য তখনকার যুগের কোন কোন কবি স্বাধীনতার বিষয় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই সব রচনাকে নিছক ভাবানুশীলনের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া যায় না। স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ভারতবর্ষের কোন সুস্পষ্ট ছবি বা পরিকল্পনা তাঁদের মনে ছিল না। টড প্রভৃতি একদেশদর্শী গল্পমূলক ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ে কবির স্বভাবসুলভ ভাবের আতিশয্যে কাল্পনিক এক স্বর্ণ যুগের সুখস্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন এই পর্য্যন্ত!

এখন হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের প্রয়োজন আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। এখন প্রত্যেক প্রকৃতিস্থ বাঙ্গালী বোঝেন, হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন না হলে এদেশ রসাতলে যাবে, বাঙ্গালী নিজ দেশে পথের ভিখারী হবে। সুতরাং এখন আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতন একটা রূপ দিতে হবে। হিন্দু বিদ্বেষ এবং মুসলমান বিদ্বেষ যাতে সাহিত্যে তিলমাত্র স্থান না পায় তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্যানুভূতি যাতে সাহিত্যে সম্যকভাবে ফুটে ওঠে তার জন্য চেষ্টা এবং সাধনা করতে হবে। আর বাঙ্গালার জাতীয়তার আদর্শ যাতে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

এযুগে সাময়িক সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী। দু-একটি দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা যেখানে যায় না এমন একটি পল্লীগ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকা-সমূহের অধিকাংশ পরিচালকদের মধ্যে আদর্শের এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব একান্তভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। তাঁদের অসংযত লেখা সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক বিষ প্রত্যহ দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ অবশ্য লাভের ব্যবসা, তা না হ'লে এমন অপকর্ম্ম এত আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা কেন করতে যাবেন? যাঁরা বাঙ্গালার সত্যিকার মঙ্গল চান, আশা করি তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ব্যাধির প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করবেন। যাঁরা মিথ্যার প্রচার ক'রে লাভবান হচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সত্যের প্রচার ক'রে তাঁদের লাভের বন্যায় ভাঁটি আনতে পারা যায়। এসব লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। বলাবাহুল্য, আর্থিক সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখলেই এঁরা নূতন সুরে গাইতে আরম্ভ করবেন। এঁদেরই লেখা তখন আমাদের উদ্দেশ্যকে সার্থকতার পথে আগিয়ে দেবে।

ভারতে তথা বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রথম রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা আরম্ভ করেন এবং রাজনৈতিক সংস্কার এবং পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ লাভ করে—আর তারই প্রভাবে পড়ে তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেন। বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশই হয় চাকুরীজীবী, অথবা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথমত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। বর্ত্তমানে অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন অনেকটা জনসাধারণের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমানেও কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা এবং কর্ম্মীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সুতরাং স্বভাবতই শ্রেণীগত স্বার্থই তাঁদের চক্ষে সবচেয়ে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা দেয়। আর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির একদেশ-দর্শিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারাই সব সমস্যাকে কোনঠাসা ক'রে দেশের রাজনীতিকে তিক্ত এবং বিষাক্ত ক'রে তোলে। কেন না চাকুরীর সংখ্যার একটা সীমা আছে। পক্ষান্তরে উমেদারদের সংখ্যার কোন সীমা পরিসীমা নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উমেদারদের মধ্যে চাকুরীর ভাগবণ্টন নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি হয়। উমেদারদের রাজনীতিক সমর্থকেরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়িকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে তাকে জটিল এক জাতীয় সমস্যায় পরিণত করেন। কলহ কোন্দলের

তাড়নায় প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের কথা, দেশের প্রকৃত সমস্যা সমূহের কথা সকলে ভুলে যান। চাকুরী সমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল ও মীমাংসার অতীত এক সমস্যারূপে দেখা দেয়। প্রকৃত রাজনীতি ব্যাহত হয়; প্রকৃত রাজনৈতিক সমস্যার কথা সকলে ভুলে যায়। এর প্রতিকার কি?

অবশ্য যাঁরা দৈনন্দিন রাজনীতি নিয়ে আছেন, তাঁরা এ সমস্যার মীমাংসা ভাগ-বাঁটোয়ারার সাময়িক একটা হার নির্দ্দিষ্ট ক'রে কতক পরিমাণে করতে পারেন। কিন্তু এভাবে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। কেন না, শিক্ষার হার শিক্ষিতের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় নিত্য পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং দাবীর পরিবর্ত্তন রোজই হতে থাকবে আর তাই নিয়ে নিত্য নূতন কলহের নিত্য নূতন তিক্ততার সূত্রপাত হবে। এখন উপায় কি?

প্রথম উপায় হচ্ছে, রাজনৈতিক আলোচনাকে এত ব্যাপক ক'রে তোলা যে তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে অর্থনৈতিক গণস্বার্থই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। দেশের লোকের মন যখন সত্যই এই বিরাট সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরী সমস্যা স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যতম তুচ্ছতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সে সমস্যা তখন দেশের লোককে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা আদর্শভ্রষ্ট করতে পারবে না। তবে এ পরিস্থিতির সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন এবং শিক্ষার সাহায্যে সাধারণের মনকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার দিকে সম্যকভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন। একাজ হিন্দুদের মধ্যে কতকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মোটেই হয় নি। তাই মুসলমানদের মধ্যে হাতুড়ে রাজনীতিকদের প্রভাব এত বেশী।

মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য এবং রাজনীতিক চেতনার অভাব আজ সমস্ত দেশকে বিপন্ন ক'রে তুলেছে। শিক্ষার দৈন্য থেকেই আসে রাজনৈতিক চেতনার অভাব। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে যাতে শিক্ষার বিস্তার—আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, যতদূর সম্ভব দ্রুত হয় তার জন্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষয়ে হিন্দুরা অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁরা যদি নিঃস্বার্থভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন, মুসলমানদের বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সাধনায় সুসম্বদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করেন, মাতৃভাষার প্রতি তাদের মনে ভালবাসার ভাব জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হন, তা হ'লে তাঁদের সেই মঙ্গল প্রচেষ্টা থেকে অদূর ভবিষ্যতে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে। ইংরেজ মিশনারীরা এই ভাবেই বাঙ্গালা দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বে আধুনিক জীবনধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। করাসী এবং আমেরিকার মিশনারীরা এই ভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক সাম্রাজ্যে আধুনিক জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন। বাঙ্গালা দেশে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলেই আমার মনে হয়; মুসলমানদের বিশিষ্ট এক দল নিশ্চয় এ বিষয় আন্তরিকতার সঙ্গে হিন্দুদের সহযোগিতা করবে। আর মঙ্গল সাধনায় উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য সুদৃঢ় এক ভিত্তি রচনা করবে।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের মন স্বভাবতই সংকীর্ণতার দিকে যায়, উদারতার দিকে যায় না। তারা নিজের গ্রামের বিষয় এত পক্ষপাতিত্ব করে যে ভিন্ন গ্রামের লোকের সঙ্গে তাদের কলহ উপস্থিত হয়, নিজের শ্রেণীর প্রতি এত পক্ষপাতিত্ব করে যে ভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাদের কলহ উপস্থিত হয়। এই ভাবে তারা শ্রেণীগত স্বার্থ নিয়ে সর্ব্বদাই বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে কলহে রত থাকে। এই শ্রেণীর লোক তাদের মনের ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতাকে সাম্প্রদায়িক আকার দিয়ে দেশের ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে কলহ করে, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর লোকই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য প্রধানত দায়ী। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে—আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। উভয় স্বপ্নই যে আকাশ-কুসুমের মতই অলীক সে কথা তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না এবং বোঝবার শক্তিও তাদের নাই। অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; আর তার ফলস্বরূপ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর কলহ; মারামারি, কাটাকাটি আর খুনোখুনি!

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে উদার সার্ব্বজনীন মনোভাবের সৃষ্টি করা। সাধনার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে উদার মনোভাবের সৃষ্টি করতে হবে, আর সেই উদার মনোভাব সাহিত্যে

প্রকাশ করতে হবে। তাঁরা যদি তা করতে পারেন তা হ'লে তাঁদের সাহিত্যসাধনা সার্থক হবে; আর তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের সাহায্যে তাঁরা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারবেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল কথার উদারতায় প্রকৃত কাজ হবে না; মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও সেই উদারতা দেখাতে হবে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষদের সম্মান করতে হবে, তাঁদের আদর্শের তাঁদের সাধনার সম্মান করতে হবে, তাঁদের জীবনে এবং সাধনায় যে সব প্রশংসনীয় জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, মুক্তকণ্ঠে সে সব স্বীকার করতে হবে। তার পর পর-ধর্ম্মের প্রতি, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি, ভিন্ন জাতির প্রতি অসংযত আক্রমণ যাতে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হয় তার জন্য দেশব্যাপী আলোচনা ও আন্দোলন চালাতে হবে। আর যারা এই সব গর্হিত আচরণ করে তারা যাতে কোন সমাজে প্রশ্রয় না পায়, তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর তাদের মতবাদের অসারতা সুযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে। তারপর দৃষ্টান্ত এবং প্রচারকার্য্যের দ্বারা উচ্চতর আদর্শের গৌরব দেশময় ঘোষণা করতে হবে। উচ্চতর আদর্শ সত্যই যদি একবার মাথা তুলে দাঁড়ায় তা হ'লে নীচতাকে পরাভব স্বীকার করতেই হবে। আকাশে সূর্য্যোদয় হ'লে অন্ধকার কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? উচ্চতর আদর্শ মাথা তুলে দাঁড়ায় নি বলেই নীচতার এতটা আস্ফালন। আমাদের সমস্ত চেষ্টা এবং সাধনাকে এই উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করতে হবে। সাফল্যের আসতে বিলম্ব হতে পারে বটে, কিন্তু সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রয়োজন কেবল ধৈর্য্যের এবং ঐকান্তিক সাধনার।

যা অপরিচিত, তাকেই মানুষ ভয় করে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আর যা পরিচিত, যত কুতসিৎ এবং অবাঞ্ছনীয়ই হোক, তাকে গ্রহণ করতে, তাকে নিয়ে ঘর করতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের সামাজিক মিলনের বিরলতা, তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জীবনধারণপ্রণালী, তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি। সুখের বিষয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে এই বিভিন্নতা এই দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে! বিশেষ ক'রে এই বাঙ্গালা দেশে। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কে হিন্দু আর কে মুসলমান তা তাদের দেখলেই চেনা যেত—তাদের কথা শুনলেই বোঝা যেত; আর তাদের আচার ব্যবহার অতি স্পষ্ট ভাবেই তা ঘোষণা করত। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের বিষয়ে সে কথা বলা চলে না। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের এক সঙ্গে বসে আহার বিহার করা অভাবনীয় ব্যাপার বলেই মনে হত। এখন কিন্তু তা নিত্যই ঘটছে। এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের আচার এবং সংস্কারগত বৈষম্য ক্রমেই কমে আসছে। যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে এবং প্রকৃতির তাড়নাতেই এই পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এখন মিলনের আদর্শ সম্মুখে রেখে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যুগধর্ম্মের সাহায্য এবং সমর্থন করি, তা হ'লে সম্প্রদায়গত দূরত্ব আরও দ্রুত কমে যাবে, আর ঐক্যের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে।

প্রাচীন হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল, আর তাই সমধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য এবং প্রীতির বন্ধন যাতে দৃঢ় হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকারের উৎসব অনুষ্ঠান পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সব ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বিষয় এখানে আমার কিছু বলবার নাই। তবে এখন আমরা আমাদের জীবনকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতেও গড়তে চাই। সুতরাং তার উপযোগী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম রাষ্ট্র নেতা মুসলিনির সারগর্ভ বাক্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বিখ্যাত লেখক এমিল লুডবিন ইটালার রাষ্ট্র-নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "Do you think there is any notable difference between the composition of a modern revolutionist and that of the early days?"

জবাবে মুসোলিনী বলেন,

"The form has changed. One condition, however, has been requisite through all the ages—courage, physical as well as moral. For the rest, every revolution creates new forms, new myths, new rites; and the would-be revolutionist, while using old traditions, must refashion them. He must create new festivals, new gestures, new forms which will

themselves in turn become traditional. The airplane festival in new today. In half a century it will be encrusted with the patina of tradition."—Talks with Mussolini—Emil Ludwig.

মানুষকে যেমন ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, প্রত্যেক আদর্শকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, উৎসব, সম্মেলন প্রভৃতি symbol বা অভিজ্ঞানের সাহায্যে। জাতীয়তার আদর্শকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে এদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। আর আমাদের সাধনাকে সার্থক করতে হলে, আমাদের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আমাদের ভুলে যেতে হবে আমরা হিন্দু কি মুসলমান, আর্য্য কি অনার্য্য। এখন পর্য্যন্ত যে এ আদর্শ এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে, যাঁরা বাহ্যত এ আদর্শের অনুসরণ করেন তাঁদের অনেকেই বস্তুত এ আদর্শের আড়ালে ধর্ম্ম কিম্বা গোষ্ঠীমূলক আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই, গোষ্ঠীর সঙ্গেও আমার বিবাদ নাই। তবে ভণ্ডামির সঙ্গে সত্যই আমার বিবাদ আছে। যখন ধর্ম্মীর আদর্শের অনুসরণ করি, তখন ধর্ম্মের দিক থেকে কথা বলা দরকার। যখন গোষ্ঠীর আদর্শের অনুসরণ করি, তখন গোষ্ঠীর দিক থেকে কথা বলা দরকার। আর যখন জাতীয়তার আদর্শের অনুসরণ করি, তখন নিছক জাতীয়তার দিক থেকেই কথা বলা দরকার। অন্যথায় ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

জাতীয়তার আদর্শ দিয়ে বিচার করলে যে স্বনামধন্য মহাপুরুষের নাম সর্ব্বাগ্রে আমার মনে আসে তিনি হচ্ছেন মোগল সম্রাট জালালুদ্দীন আকবর। হিন্দু, মোসলেম, খৃষ্টান, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর সম্মিলিত জাতীয়তার বিরাট স্বপ্ন তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার তিনিই হলেন সত্যিকার স্রষ্টা। আমার মনে হয় তাঁর সেই স্বর্গীয় স্বপ্নকে ভারতবাসীর মনে চিরতরে জাগিয়ে রাখবার জন্য বৎসরের একটি দিনকে অন্তত তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেশময় সেদিন আনন্দোৎসব হওয়া উচিত; রাত্রে প্রত্যেক গৃহকে প্রত্যেক রাজপথকে আলোক-মালায় সজ্জিত করা উচিত; সঙ্গীতে, নৃত্যে, আতসবাজীর ঐন্দ্রজালিক মায়ার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

বাঙ্গালার জাতীয়তার কথা ভাবতে গেলে প্রথম যে মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়ে তিনি হ'লেন শাহীদ নওয়াব সিরাজদ্দৌলা। আনন্দ এবং আশার বিষয় এই যে তাঁর স্মৃতি রক্ষার বিষয় বাঙ্গালী এখন যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছে।

বর্ত্তমান যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত বাঙ্গালী জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্মৃতি-উৎসবও উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বৎসরের প্রথম দিনকে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতিই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে। দিল্লীর মোগল বাদশারা প্রাচীন ইরাণের নওরোজ পর্ব্ব কত ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। আমার মনে হয়, এই বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমান-নির্ব্বিশেষে ১লা বৈশাখে সকলেরই মহাসমারোহের সঙ্গে জাতীয় পর্ব রূপে নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন করা উচিত। আর এই পর্ব্বকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র জাতির সেদিন পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেলামেশা করা উচিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এর অধিক কিছু বলবার কিম্বা দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়াবার দরকার নেই। জাতীয় আদর্শ সত্যই যদি কাম্য হয়, তা হ'লে সে আদর্শের প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার উপযোগী উৎসব অনুষ্ঠান আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য। এই সত্যটি মনে রেখে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করতে হবে। আদর্শের প্রতি সত্যই যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, ক্রিয়া কর্ম্ম নিরূপণ করতে বেগ পেতে হবে না।

বার্নড শ চিন্তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, living thoughts—জীবন্ত চিন্তা এবং dead thoughts মৃত বা প্রাণহীন চিন্তা। ভাষার মধ্যে যেমন জীবন্ত এবং মৃত ভাষা আছে—চিন্তার মধ্যে, আদর্শের মধ্যেও তেমনি জীবন্ত চিন্তা, জীবন্ত আদর্শ এবং মৃত চিন্তা, মৃত আদর্শও আছে। মৃত ভাষায় কেউ কথা বলে না। কিন্তু মৃত চিন্তাকে নিয়ে অনেক ভাবুককেই ভাবের চর্চ্চা করতে দেখি; মৃত আদর্শকে নিয়ে অনেক তথাকথিত আদর্শবাদীকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি। তবে মৃত ভাষায় যেমন প্রাণের সঞ্চার করা যায় না, তেমনি মৃত ভাবের মধ্যে মৃত আদর্শের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করা যায় না। পাঠক গালিবারের ট্রাভলস্-এ পড়ে থাকবেন বামনদের রাজ্যে, লিলিপুট

দেশে ডিম্বের সরু দিক থেকে ভাঙ্গা উচিত কি চওড়া দিক থেকে ভাঙ্গা উচিত তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্রের মত মহা এক গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। আমাদের কাছে ব্যাপারটি তুচ্ছ বলে মনে হয়, কিন্তু যারা এই নিয়ে বিষম সমরানলের সৃষ্টি করেছিল, তাদের কাছে বিষয়টি মোটেই তুচ্ছ ছিল না। সমস্যাটি তাদের কাছে জীবন্ত আকারে দেখা দিয়েছিল, আর আমাদের কাছে সেটি প্রাণহীন মৃত। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বিলাত প্রত্যাগত লোকেদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখা উচিত কি-না তাই নিয়ে মহা এক আন্দোলন চলেছিল। এখন কিন্তু সে বিষয় নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। বিষয়টি একদিন জীবন্ত সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছিল, আর এখন সেটি মৃত; তার মধ্যে প্রাণের সাড়া নাই। এই বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে নামাজের "আমীন" শব্দ জোরে বলা উচিত কিম্বা মৃদুভাবে মনে মনে বলা উচিত—তাই নিয়ে কত মারামারি, কাটাকাটি, এমন কি খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সে নিয়ে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে দেখি না। যে সমস্যা একদিন জীবন্ত প্রাণবন্ত সমস্যারূপে মানুষের মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করত, সে সমস্যা এখন প্রাণহীন, নিস্পন্দ, মৃত। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন কেউ প্রয়োজন অনুভব করে না। এখন সেটি dead thoughts, dead ideas-এর অন্তর্গত।

আমাদের দেশবাসীদের জড়তার প্রধান কারণ, হিন্দু মুসলমানের বিরোধের প্রধান কারণ—আমাদের জীবনের তুচ্ছতার প্রধান কারণ—আমরা জীবন্ত চিন্তা এবং মৃত চিন্তার মধ্যে প্রভেদ করতে শিখিনি। কোন্ ভাব কোন্ আদর্শটি সত্যই জীবন্ত, আর কোন্ ভাব কোন্ আদর্শটী প্রকৃত পক্ষে মৃত সে বিষয় স্থির ধীর বুদ্ধির সাহায্যে ভাবতে শিখিনি। যেদিন সে ভাবে ভাবতে শিখব, সেদিন আমাদের ব্যার্থতারও শেষ হবে। আমাদের জীবন সাধনা সেদিন সত্যিকার সার্থকতার পথে এসে পৌছুবে। এ বিষয় প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরা সত্যই দেশের যথেষ্ট উপকার করতে পারেন। মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং ধারালো বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে তাঁরা বুঝতে পারবেন কোন্ চিন্তা আর কোন্ আদর্শ বর্ত্তমান যুগে প্রাণহীন, অচল; কোন্ আদর্শ এবং চিন্তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন এখন পাওয়া যায়; তাতে নিপুণ লেখনীর সাহায্যে মৃত আদর্শের সৎকারে আর জীবন্ত আদর্শের সম্প্রসারণে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। আমি দেখে সুখী হলুম, সুসাহিত্যিক বন্ধুবর কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব এই শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর রচিত 'পথ ও বিপথ' গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রবাহের প্রকৃত উৎস হচ্ছে গণসেবা। "ইহাই দেশের গৌরব সংবাদ—দেশ যে মৃতের দেশে পরিণত হয়নি তার প্রমাণ এই গণচেতনা।" বাঙ্গলাদেশে অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক আছেন—তাঁরা যদি এইভাবে এক একটি জীবন্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিম্বা মৃত আদর্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে সচেষ্ট হন, তা হ'লে দেশ মঙ্গলের পথে দ্রুত আগিয়ে যাবে। সত্য নিজগুণে এবং নিজ শক্তিতে মানুষের মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, সত্যকে মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। বাকি কাজ সত্য নিজেই করে যাবে।

বিদেশীর প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে নিত্যই বেড়ে চলেছে, আর তার ফল মোটেই ভাল হচ্ছে না। বিদেশীর গোঁড়ামি বাঙ্গালীর জীবনে সংক্রামিত হচ্ছে, বিদেশীর পশ্চাদমুখিতা বাঙ্গালীর জীবনে সংক্রামিত হচ্ছে, বিদেশীর সাম্প্রদায়িকতা বাঙ্গালীর জীবনে সংক্রামিত হচ্ছে, আর বিদেশীর অতীতমুখী মানসিকতা বাঙ্গালীর জীবনে সংক্রামিত হচ্ছে। বিদেশীর কুটিল প্রভাবে বাঙ্গালী তার জাতীয় স্বার্থের কথা ভুলে যাচ্ছে, বিদেশীর প্রভাবে বাঙ্গালী তার অতীতের কথা ভুলে যাচ্ছে, তার ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাচ্ছে। বিদেশীর প্রভাবে বাঙ্গালী তার আদর্শের কথা, তার mission-এর কথা ভুলে যাচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে এখন বাঙ্গালীর প্রকৃত কাজ হচ্ছে, প্রকৃত কর্ত্তব্য হচ্ছে, বাঙ্গালীত্বের জীবনদায়িনী আদর্শকে সম্মুখে রেখে নিজদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া; বিদেশীর বিষাক্ত প্রভাব থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। আমার বিশ্বাস, এই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর সবচেয়ে জীবন্ত আদর্শ, এই আদর্শের সাধনাই তাকে মঙ্গলের পথে, সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে; এই আদর্শের কল্যাণ-স্পর্শই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তার সমাজ-দেহকে মুক্ত করবে; এই আদর্শের সঞ্জীবনী-সুধাই তাকে পূর্ণতর জীবনের সন্ধান দেবে। সব ছেড়ে এই আদর্শের সাধনাতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল বাঙ্গালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।

বনফুল

১৫

যেমন করিয়া হউক রোজগার করিতে হইবে। উপার্জ্জন করিতে না পারিলে মানুষের কোন মূল্যই নাই। টাকা দিয়া প্রেম কিনিতে যাইবার প্রয়াস হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রের প্রেম করিতে যাইবার প্রয়াস অধিকতর হাস্যকর। যে নিঃস্ব তাহার এই মানসিক বিলাসের অধিকার নাই। তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্য না থাকিলে তাহা খনির তিমিরগর্ভে রত্নরাজীর মত চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবে। অন্তরনিহিত ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাহিরের ঐশ্বর্য্য প্রয়োজন। খনিকে খনন না করিলে মণির সন্ধান মিলিবে কিরূপে? মণি আবিষ্কার করিবার পর খনিত্র অনাবশ্যক, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্ব্বে খনিত্র না হইলে চলে না। খনিত্র একটা চাই। কিছু টাকা না থাকিলে কিছুই করা যায় না। টাকাটা যে অতি তুচ্ছ জিনিস তাহাও টাকা না থাকিলে প্রমাণ করা যায় না। অর্থ থাকিলে তবেই তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহত্ত্ব প্রকট করা সম্ভব, কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের মুখে ত্যাগের মহিমার কথা মানায় না। অর্থের অপেক্ষা প্রেম বড়, এ কথার মর্ম্ম মুক্তোকে বুঝাইতে হইলে প্রথমেই মুক্তোকে পাওয়া দরকার এবং সেজন্য টাকার প্রয়োজন। মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহার মনে নিজেকে শঙ্কর নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস নিজের উপর তাহার আছে। কিন্তু মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়াই যে দুরূহ। অত টাকা কোথায় পাইবে সে! অবিলম্বে উপার্জ্জন করা দরকার। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব? এই কলিকাতা শহরে কে তাহাকে চেনে? চিনিলেও বা কত টাকার চাকরি সে পাইতে পারে, বড় জোর মাসে পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অল্প টাকায় মুক্তোকে তো পাওয়া যাইবে না! ... কেহ কিছু টাকা ধার দেয় না? মাসে মাসে তাহাকে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু কে-ই বা ধার দিবে? সহসা শঙ্করের শৈলর কথা মনে পড়িল। সে বড় লোকের পত্নী। তাহার হাতে কিছু টাকা থাকিতে পারে, তাহার নিকট হইতে কোন ছুতায় ধার করিয়া আনাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রফেসার গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টিউশনি হয় তো তাহাকে জোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

রবিবারের দুপুর। শঙ্কর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল, উঠিয়া বসিল। শৈলর সহিত আজই দেখা করিতে হইবে। প্রফেসার গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টিউশনিও হয় তো তাহাকে জোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিতও দেখা করা দরকার। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈল একদিন যাইতেও বলিয়াছিল তাহাকে। এখন হয় তো সে একা আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। শঙ্কর তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি কিন্তু শঙ্করকে চিনিয়াছিলেন। "নমস্কার শঙ্কর-বাবু, চিনতে পারছেন?"

চিনিতে না পারিলেও সব সময় সেটা বলা যায় না। শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবুই পুনরায় বলিলেন, "চেনবার কথা অবশ্য নয়, একটিবার মাত্র তো দেখা। প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে টি পার্টিতে—হয়ে গেল অনেকদিন!"

শঙ্করের মনে পড়িল। সোনাদিদি ইঁহাকে শঙ্করের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাও মনে পড়িল, সোনাদিদি ইঁহার নাম দিয়াছিলো অগতির গতি। ভদ্রলোক নাকি ভারি পরোপকারী লোক। শঙ্কর আর একবার প্রকাশবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। খদ্দরের মোটা কোট ও মোটা চাদর গায়ে, কয়েক দিনের না-কামানো গোঁফ দাড়ি মুখে, চক্ষুতে স্বচ্ছ সরল দৃষ্টি। প্রকাশবাবু ঠিক তেমনি আছেন।

প্রকাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কবিতাটা

পড়লাম কাগজে, ভারি সুন্দর লাগলো। আমাদের একটা কাগজ বার হচ্ছে, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু—"

"আচ্ছা—"

"সেই হস্টেলেই থাকেন তো এখন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা যাব একদিন। এখন চলি, নমস্কার।"

"নমস্কার!"

প্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। শঙ্কর পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিবার পর সহসা তাহার মনে হইল—এ সে কি করিতেছে! শৈলর কাছে হাত পাতিয়া টাকা চাহিবে! শৈলর টাকা লইয়া সে ··· না, তাহা অসম্ভব। তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

শঙ্কর ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিল। একেবারে বিপরীত দিকে চলিতে সুরু করিল। দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছে অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হইবে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল—কি আশ্চর্য্য, টাকাটাই শেষে এত বড় হইয়া দাঁড়াইল! মুক্তো তাহাকে চায় না—টাকা চায়। আশ্চর্য্য!

কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুক্তো আসিয়া প্রবেশ করিল।

"এ কি, হঠাৎ আপনি যে এ সময়ে!"

"এলাম"—

মুক্তো একদৃষ্টে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল—"বসুন, আসচি এখুনি—"

শঙ্করকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। অবকাশ দিলেও যে শঙ্কর বিশেষ কিছু বলিতে পারিত তাহা নয়। বলিবার মত কোন বক্তব্য তাহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল না। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল মুক্তো ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিবে। বলিবার তো কিছু নাই। সত্যই কি কিছু নাই? সত্যই কি মুক্তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না? মুক্তোর মুখ দেখিয়া কথাবার্তা শুনিয়া তাহা তো মনে হয় না।

"আপনি এখানে হামেসা কি করতে আসেন মোশায় বলুন তো—"

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল—লুঙ্গিপরা গুণ্ডা গোছের একটা লোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ঘাড়ে একদম চুল নাই, সামনে ঘোড়ার মত চুল, মাংসল মুখে নিষ্ঠুর একজোড়া চোক, অধরোষ্ঠের নীচে এক গোছা মিশ কালো নূর, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে বটে—কিন্তু পুরাপুরি নাই, মাঝখানে খানিকটা কামাইয়া ফেলাতে মাত্র ঠোঁটের দুইপাশে খানিকটা করিয়া ঝুলিতেছে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে লোকটার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"মোতলবখানা কি মোসায়ের—"

শঙ্কর নির্ব্বাক।

"জোবাব দিচ্ছেন না যে বড়—"

"তোমাকে জবাব দেব কেন, তুমি কে?"

"হামি তোমার বাপ! সালা হারামিকা বাচ্ছা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—"

"খবরদার!"

শঙ্কর হঠাৎ ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মুক্তো ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

"এ কি কাণ্ড, বাঘা এসব কি হচ্ছে—"

বাঘা বলিল, "বাঃ, তুমিই তো বিবিজান আসতে বললে হামাকে। আভি বলছো এসব কি হচ্ছে? গরদনিয়া না দিলে কি এ হারামির বাচ্ছা নিকলবে—"

"আচ্ছা, যা তুই—"

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঘা বাহির হইয়া গেল। যেন পোষা কুকুর!

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "লোকটা কে?"

"ও বাঘা। আমাদের আপনার লোক।"

"আপনার লোক মানে?"

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, "আপনার লোক মানে কি তা জানেন না? যারা বিপদে আপদে রক্ষে করে তারাই আপনার লোক। ওরা ছাড়া আমাদের আপনার লোক আর কে আছে বলুন—"

শঙ্কর বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপদে আপদে রক্ষা করে!

"অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন, চা আনতে দিয়েছি।"

শঙ্কর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

"শঙ্করবাবু, একটি কথা শুনে যান, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—শুনুন—শুনে যান—"

শঙ্কর আর ফিরিয়া চাহিল না। যতক্ষণ দেখা গেল মুক্তো শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু বেশীক্ষণ দেখা গেল না। কতটুকুই বা গলি, শঙ্কর দেখিতে দেখিতে তাহা পার হইয়া গেল। মুক্তো তবু সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুণ্যলেশহীন অন্ধকার পতিতা-জীবনে একটিমাত্র পুণ্য-প্রেরণার শিখা জ্বলিয়াছিল। সেই শিখার ইন্ধন জোগাইতে গিয়াই সে নিঃস্ব হইয়া গেল। শঙ্করের মত ছেলেকে সে নষ্ট করিতে চাহে নাই। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যেমন করিয়া হোক পঙ্কিলতা হইতে ইহাকে সে রক্ষা করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু হার মানে নাই, শঙ্করকে পঙ্ককুণ্ড হইতে সত্যই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখন তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় উন্মথিত করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল তাহা স্বস্তির নিশ্বাস নহে। তাহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছিল—তুমি এ কি করিলে, এ কি করিলে—ও যে চলিয়া গেল! মুক্তো বুঝিয়াছিল শঙ্কর আর আসিবে না। শূন্য গলিটার পানে চাহিয়া তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া এমন একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল যাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল ব্লাইণ্ড লেন, বাহির হইবার পথ নাই। ফিরিতে হইল। কিছুদূর আসিবার পর দেখিতে পাইল একটা বাড়ির দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বাহির হইয়া সামনের বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতেছে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

"এই গলি থেকে বেরোবার রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারো, আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

মেয়েটি বলিল, "আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে গেলেই রাস্তা পাবেন।"

শঙ্কর আগাইয়া গেল। আগাইয়া গিয়া সত্যই দেখিল—ডান দিকে বাহির হইবার পথ রহিয়াছে। আরও খানিকটা গিয়া বউবাজারে পড়িল। সামনেই একটা ট্রাম পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। একটু পরেই কিন্তু নামিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে পয়সা ছিল না এবং সেকথা মনেও ছিল না। শঙ্কর আবার হাঁটিতে লাগিল। গলির সেই মেয়েটির মুখখানি মাঝে মাঝে মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি। মুক্তোর মুখখানিও মনে পড়িল। পড়ুক—কিন্তু মুক্তোর কাছে আর সে যাইবে না। যাইবার আর উপায় নাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকাপতন হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন হইতে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া শঙ্করের চোখে পড়িল—একটা পাগলা ডাস্টবিন্ হইতে এঁটোভাত তুলিয়া খাইতেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। শঙ্করের মনে পড়িল—এই লোকটাই কিছুদিন আগে সার্কুলার রোডে মাথায় কাগজের টুপি পরিয়া সকলকে নির্ব্বিকারচিত্তে সেলাম করিয়া বেড়াইতেছিল। এখনও নির্ব্বিকারচিত্তে ডাস্টবিন হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেছে। ভণ্টু অথবা বঙ্কিম মহাশয় দেখিলে মোস্তাককে চিনিতে পারিত।

শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে হস্টেলের দিকেই ফিরিতে লাগিল। মুক্তোর কাছে আর যাইবে না ইহা ঠিক করিবার পর হইতে শঙ্করের মন যেন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন কারাবাসের পর যেন সহসা মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল তাহার নামে একটি জরুরি টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিতেছেন।

অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবার একটা ওজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

১৬

যদিও সে মনে মনে এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। আসিয়াই যে দুইজন কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিছুকাল

পূর্ব্বে যখন সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল যে তাহার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই তখন তাহাই তাহার সত্য মনোভাব ছিল। কিন্তু এখন তাহার আর সে মনোভাব নাই। দুই দিনে সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহে মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। মুক্তোকে সে পাইবে না, পাইতে পারে না এবং এখন পাইতে চাহেও না। তাহার পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সে যে মানে মানে দূরে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে এজন্য সে আনন্দিত। পঙ্কিল স্পর্শ! এখন মুক্তোর স্পর্শকে পঙ্কিল স্পর্শ মনে হইতেছে!

বাড়িতে আসিয়া দেখিল—বৈঠকখানায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সর্ব্বাগ্রে চুপি চুপি সংবাদটি দিল—ইঁহারা তাহার বিবাহের সম্বন্ধে পাকা কথা কহিতে আসিয়াছেন। সাড়া পাইয়া মা বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুষ্ক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। চোখ-মুখের দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় অর্থহীনভাবে শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শঙ্কর প্রণাম করিল। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আয় ভেতরে আয়—"

শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শঙ্করকে বিছানায় বসাইয়া হাত দিয়া চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, "একবারও মাকে মনে পড়ে না!"

শঙ্কর এতদিন যে জগতে বিবরণ করিতেছিল সে অন্য জগত। অনেকদিন পরে সহসা মায়ের কাছে আসিয়া সে যেন নিজেকে ঠিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না। মায়ের কথা শুনিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল। মুখে বলিল, "কলেজের ছুটি ছিল না—"

মা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হাতমুখ ধোও, খাবার আনি।"

বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্করের মনে সহসা সেকালের মায়ের মুখখানা ফুটিয়া উঠিল—যখন মা টকটকে লালপাড় শাড়ি পরিতেন, যখন তাঁহার মুখখানি মহিমায় প্রদীপ্ত ছিল। পরক্ষণেই পাগলিনীর ছবিটাও মনে পড়িল। জানালার গরাদের সঙ্গে হাত বাঁধা, অসংলগ্ন আর্ত্তচীৎকার! এখন আবার এ কি চেহারা—সশঙ্কিত অসমর্থ, ক্লান্ত—সমস্ত জীবনীশক্তি কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

অম্বিকাবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"তুমি চা-টা খেয়ে বাইরে এসো একবার, ওঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন একটু—"

"ওঁরা কারা?"

"শিরিষবাবু আর মুকুজ্যে মশাই, শিরিষবাবুর বন্ধু।

"শিরিষবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—"

যদিও শঙ্করের মত বদলাইয়াছিল, তথাপি সে বলিল—"আমি তো বলেছিলাম—"

"জানি, চিঠি পেয়েছি তোমার। কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হল না, আই অ্যাম সরি। চা-টা খেয়ে বাইরে এসো—"

"আমার মতের কি কোন দাম নেই বলতে চান?"

"তোমার নিজের দামই যখন এখনও পর্য্যন্ত অনিশ্চিত, তখন তোমার মতের দাম সুনিশ্চিত হবে কি করে?"

"তার মানে?"

"এটা কি সত্যি কথা নয় যে আমার দামেই তুমি সমাজে এখনও পর্য্যন্ত বিকোচ্ছ? সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমার অভিরুচি এবং অভিমতই মানতে হবে তোমাকে। তোমার স্বতন্ত্র মত তখনই সহ্য করব যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যতক্ষণ তা না করতে পারছ ততক্ষণ আমার কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে!"

শঙ্করের মাথার ভিতর যেন দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কে যেন সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিল। ইচ্ছা হইল তখনই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু সে পারিল না। কিছুই পারিল না। একটা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না। বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—"চা-টা খেয়ে এসো বাইরে—ডোন্ট্ বি এ ফুল—"

শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মানসপটে

মুক্তোর মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল, যেন শুনিতে পাইল মুক্তো বলিতেছে—"এ ক'টা টাকায় কি হবে, এই নিন্ আপনার টাকা, গরীবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু।—"

টাকা, টাকা, টাকা! টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সম্মান করে না, এমন কি পিতাও না! শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তর-বাসী আত্মসম্মানহীন কাঙালটা বিবাহ করিবার লোভে এতবড় অপমান সহ্য করিয়াও উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে কথাবার্ত্তা চলিতেছে—শঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

শিরিষবাবু মিনতি সহকারে বলিতেছিলেন—"দেখুন, আমি অতি দরিদ্র, অত টাকা আমি দিতে পারব না। একটু বিবেচনা করতে হবে।"

অম্বিকাবাবু বলিলেন, "বিবেচনা ক'রেই বলছি। আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু বেশী নয়।"

"আমার পক্ষে বেশী। আপনি দয়া না করলে—"

"দেখুন, যারা কথায় কথায় দয়া প্রার্থনা করে সেই সব আত্মসম্মানহীন লোকের ওপর আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা কমে যায়। যখন পড়তাম তখন করালিচরণ বলে একটি ছেলে আমাদের মেসে থাকত। তার অনেক দোষ ছিল কিন্তু তার আত্মসম্মানের জন্যেই তাকে আমরা সবাই খাতির করতাম। আমাকে দাদা দাদা বলত, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল, কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার ওই আত্মসম্মান-বোধের জন্যে। সেদিন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। সে জ্যোতিষ চর্চ্চা করছে শুনে তার কাছে আমার এক আত্মীয়ের কুষ্ঠি নিয়ে গেলাম দেখাতে। সে প্রথমেই বললে—অম্বিকদা, দশ টাকা দক্ষিণা লাগবে কিন্তু। আমি তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, দশ টাকা আপনার কাছে না নিলেও আমার চলে যাবে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু আত্ম-সম্মানটা খোয়াবেন কেন? আমাদের দেশের লোক কিছুতে এ সামান্য কথাটা মনে রাখে না। তারা সর্ব্বদাই সকলের কাছে গলবস্ত্র হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে। আশা করি আপনি তাদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।"

শিরিষবাবু এই তীক্ষ্ণ বক্তৃতাটি শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, "সত্যিই বড় দরিদ্র আমি।"

মুকুজ্যে মশাই স্মিতমুখে বসিয়াছিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা টাকার জোগাড় করা যাবে। উনি যা বলছেন তা ঠিকই—"

শিরিষবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, "আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু তো বেশী নয়—"

শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

বলিল, "আমি এক পয়সা পণ চাই না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, বিনাপণেই আমি বিয়ে করে আসব। মেয়েও দেখতে চাই না আমি।"

সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

অম্বিকবাবু শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া সিগারের ছাইটা ধীরে ধীরে ঝাড়িলেন। তাহার পর শিরিষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তো মামলা মিটেই গেল। সংসার-সমুদ্রে বিনা নৌকোতে পাড়ি দেবার সাহস বাবা-জীবনের আছে দেখছি; আপনাদেরও যদি ওর দুঃসাহসের ওপর ভরসা থাকে, দিন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে—আই হ্যাভ নো অব্‌জেকশন্। আমি ওদের সুবিধের জন্যেই নৌকোর চেষ্টায় ছিলাম।"

চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি সিগারে একটি মৃদুটান দিলেন। মুকুজ্যে মশাই একদৃষ্টে শঙ্করের দিকে চাহিয়াছিলেন।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না, বাহির হইয়া গেল।

১৭

অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করের বিবাহ হইয়া গেল।

বলাবাহুল্য অম্বিকাবাবু বিবাহে যোগদান করেন নাই। শঙ্কর বন্ধুবান্ধব কাহাকেও, এমন কি ভণ্টুকেও খবর দেয় নাই। শিরিষবাবু অমিয়াকে গহনাপত্র ছাড়া নগদ এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শঙ্কর সে টাকা গ্রহণ করে নাই। সত্যসত্যই বিনাপণে সে অমিয়াকে বিবাহ করিল। শুভদৃষ্টির সময় শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল—মেয়েটি তো অচেনা নয়, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িল কিছুদিন আগে একটা ব্লাইণ্ড লেনে ঢুকিয়া সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই মেয়েটিই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

অমিয়াও সবিস্ময়ে দেখিল যে একাগ্রমনে শিব-পূজা করা সত্ত্বেও ক্যালেণ্ডারের শিবের চেয়ে তাহার স্বামী ঢের বেশী সুন্দর হইয়াছে। শান্তি, বিলু, কমলি, টগর, এমন কি রেণুদির বরের চেয়েও তাহার বর দেখিতে ভালো।

কেমন চমৎকার চোখ দুটি!

১৮

শঙ্কর হস্টেলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল তাহার জীবনের এই প্রধান ঘটনাটি কত সহজে ঘটিয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সে বিবাহ করিবে। সহসা সে আবিষ্কার করিল যে তাহার জীবনের গতিকে যতবার সে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে ততবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর সে ঠিক করিয়াছিল অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশ-সেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারি করিয়া, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি করিয়া এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিয়া অদ্ভুত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুকাল তাহার কাটিয়াছিল। এ উন্মাদনা কিন্তু বেশী দিন রহিল না। আই. এস-সি. এবং বি. এস-সি. পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশ-সেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশ-সেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। সুতরাং ঠিক করিয়াছিল আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চাই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু এ সব মফঃস্বলীয় কল্পনা কলিকাতায় আসিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর নিজেকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করিল। দেখিল তাহার মন অনিবার্য্য টানে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বিজ্ঞান নয় সাহিত্য। আরও আবিষ্কার করিল যে নারী-সঙ্গ-বর্জ্জিত জীবন আর যেই যাপন করিতে পারুক সে পারিবে না। তাহার একজন সঙ্গিনী চাই। তাহার এই অন্তর্নিহিত কামনার টানে মিষ্টিদিদি, রিণি, মুক্তো আকস্মিকভাবে আসিল ও চলিয়া গেল। অমিয়ার মুখখানি তাহার মনে পড়িল। কত ছেলেমানুষ এবং কত লাজুক। ফুলশয্যার রাত্রে লজ্জায় চোখই খুলিল না। কোথায় ছিল এই অমিয়া? কোন্ অজ্ঞাতলোক হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার জীবনে এমন কায়েমি আসন দখল করিয়া বসিল।

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চিঠি দিয়া গেল। বাবার চিঠি। শঙ্কর এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিতেছিল, তবু সে পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

কল্যাণবরেষু,

বিবাহ-ব্যাপারে তোমার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। অপরের টাকা না লইয়া স্বাবলম্বী হইবার সাহস তোমার আছে ইহার প্রমাণ তুমি দিয়াছ; শক্তিও যে আছে সে প্রমাণও আশা করি দিতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাস হইতে তোমার খরচ দেওয়া আমি বন্ধ করিলাম। যে সমর্থ তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে অসমর্থ অসহায় লোক অসংখ্য। নিজেদের আত্মীয়, তোমার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করিয়াছে। যে টাকাটা তোমাকে দিতাম তাহা তাহাকে দিলে সে বেচারা বোধ হয় এম. এ-টা পাশ করিতে পারিবে। টাকাটা তাহাকেই দিব স্থির করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্পর্দ্ধার অনুরূপ শক্তি ও আত্মসম্মান দান করুন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

শ্রীকমলেশ রায় এম্-এস্-সি

পদার্থ বিজ্ঞান আলোচনা

বর্ত্তমান সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান বড় অল্প নহে। বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানই নহে, ইহা জাতীয় ভাষা সৌষ্ঠবেরও অঙ্গ। বহু সুলেখক বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার চাহিদাও দিন দিন বাড়িতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আদর্শমান স্থাপনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পরিভাষা-পুস্তিকাবলী সকলের আদর্শ হইবে। বলা বাহুল্য ইহা এখনও অসম্পূর্ণ, ক্রমে ক্রমে ইহাতে আরও শব্দের সমাবেশ হইবে। কিন্তু এখন যাহা আছে তাহাদেরও সমালোচনা ও প্রয়োজন মতো সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদার্থ বিজ্ঞানের (Physics) পরিভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কিছু সংশোধন ও কিছু নূতন শব্দের অবতারণা করিব ইহাই ইচ্ছা। অবশ্য এস্থলে প্রদত্ত পরিভাষাই যে চরম হইবে তাহা নহে; ইহা লেখক, পাঠক ও বিদ্বৎমণ্ডলীর অনুমোদন-সাপেক্ষ রহিল বলিয়া মনে করি।

পরিভাষা প্রবর্ত্তনে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা প্রথমে বিচার্য্য। শ্রীযুত রাজশেখর বসু তাঁহার চলন্তিকা অভিধানে লিখিয়াছেন "...পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার নব রচিত পরিভাষা যদি বস্তুবাচক হয় তবে চলিবার পক্ষে বাধা আছে, কিন্তু যদি জাতি বা ক্রিয়া বাচক হয় তবে বহু পরিমাণে চলিবে।" (২য় সং ৬২৬ পৃঃ)।

পরিভাষা প্রবর্ত্তনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়া মনে করি:

(১) সুপ্রচলিত বিদেশী শব্দের পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন, যথা—অক্সিজেন, রেডিয়াম, ইলেক্‌ট্রণ ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মধ্যে বস্তুবাচক শব্দই প্রধান।

(২) প্রচলিত বাংলা শব্দ অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবে, পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন শব্দ প্রচলন করা অনুচিৎ; যথা:—Spectrum—বর্ণচ্ছত্র (প্রচলিত), বর্ণালি (নূতন)। Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ (প্রচলিত), মহাকর্ষণ (নূতন বা স্বল্প প্রচলিত), ইত্যাদি।

(৩) ব্যাখ্যামূলক বা অর্থসূচক প্রতিশব্দ পরিভাষা গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৪) একই শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ চলিতে পারিবে, যদি সুষ্ঠু হয়।

(৫) যে পর্য্যন্ত সুষ্ঠু প্রতিশব্দ সঙ্কলিত না হয় তদবধি বিদেশী শব্দই ব্যবহার করা সমীচীন।

নিম্নলিখিত তালিকার বাম পার্শ্বে যে ক্রমিক সংখ্যা আছে সেই সংখ্যা অনুসারে তালিকার শেষে তাহাদের সমালোচনা প্রদত্ত হইল।

বিদেশী শব্দ	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত পরিভাষা	সংশোধিত, নূতন (অন্যান্য)	প্রবর্ত্তক
(১) Physics	পদার্থ বিদ্যা	পদার্থ বিজ্ঞান	
(২) Alternating	পরিবর্ত্তী	দ্বিরাভিমুখী	
(৩) „ current	পরিবর্ত্তি প্রবাহ	দ্বিরাভিমুখী প্রবাহ	
(৪) Alpha rays	আলফা কণা	আলফা রশ্মি	
(৫) „ particles		আলফা কণা	
(৬) Applied science	ফলিত বিজ্ঞান	ব্যবহারিক বিজ্ঞান	
(৭) Axis, neutral	উদাসীন অক্ষ	নিষ্ক্রিয়াক্ষ	লেখক
(৮) Axis, optical	আলোক অক্ষ	কিরণাক্ষ	„
(৯) Anion	অ্যানায়ন	ধনাম্বু	„
(১০) Amplitude	বিস্তার	ক্ষেত্র	„
(১১) „ of oscillation	—	দোলন ক্ষেত্র	„
(১২) „ Vibration	—	কম্পন ক্ষেত্র	„

(১৩)	Boiler	বয়লার	(ফুটনাধার)	লেখক
(১৪)	Bomb calorimeter	বম্ ক্যালরিমিটার	(বিস্ফোর তাপমান বা বিস্ফোর তাপমান যন্ত্র)	"
(১৫)	Beam (of light)	রশ্মি	কিরণ, রশ্মিগুচ্ছ	"
(১৬)	Circuit	বর্ত্তনী	(চক্র)	
(১৭)	Chart	চিত্র	তালিকা, তালিকা চিত্র, চিত্রতালিকা	"
(১৮)	Coagulation	তঞ্চন	পিণ্ডাপত্তি	যোগেশচন্দ্র রায়
			পিণ্ডায়ন	লেখক
(১৯)	C. G. S. System	সি, জি, এস্, মান	সে, গ্রা, সে, মান	"
(২০)	Cation	ক্যাটায়ণ	ঋণাণু	"
(২১)	Coil, Induction	আবেশ কুণ্ডলী	প্রণোদন কুণ্ডলী	"
(২২)	Calorimeter	ক্যালরিমিটার	তাপমান, কলরিমান,	"
(২৩)	Charge, electrical		তড়িৎ, বিদ্যুৎ, তড়িৎ পরিমাণ, বিদ্যুৎ পরিমাণ	"
(২৪)	Charge, bound	বদ্ধ আধান	বদ্ধ তড়িৎ, বদ্ধ বিদ্যুৎ	"
(২৫)	Charge, free	মুক্ত আধান	মুক্ত তড়িৎ, মুক্ত বিদ্যুৎ	"
(২৬)	Charge, induced	আবিষ্ট আধান	প্রণোদিত বিদ্যুৎ,—তড়িৎ	"
(২৭)	To charge with electricity	—	বিদ্যুতাধান করা, তড়িতাধান করা	"
(২৮)	Conduction	পরিবহন	পরিচালন	
(২৯)	Convection	পরিচলন	পরিবাহন	
(৩০)	" current	—	পরিবাহন স্রোত	
(৩১)	Conductor	পরিবাহী	পরিচালক	
(৩২)	Cathode ray	ক্যাথোড রশ্মি	ঋণরশ্মি	
(৩৩)	Cell	সেল	কোষ, বিদ্যুৎকোষ	জগদানন্দ রায়
(৩৪)	Centre of gyration	ভ্রমিকেন্দ্র	আবর্ত্তনকেন্দ্র, আবর্ত্তকেন্দ্র, ঘূর্ণ্যকেন্দ্র	লেখক
(৩৫)	Carbon filament	—	অঙ্গার তন্তু	"
(৩৬)	Convergent	—	অভিসারী	রাজশেখর বসু
(৩৭)	Curve (graph)	—	ছকচিত্র	লেখক
(৩৮)	Dispersion (of light)	বিচ্ছুরণ	বিস্তার, বর্ণবিস্তার	"
(৩৯)	Dispersive power	—	বিস্তার শক্তি,	"
(৪০)	Discharge, oscillatory	পরিবর্ত্তি মোক্ষণ	স্পন্দমোক্ষণ	"
(৪১)	Filament	—	তন্তু	"
(৪২)	" metal	—	ধাতব তন্তু	"
(৪৩)	Focus	ফোকস	কিরণকেন্দ্র,	"
			দহন বিন্দু	নিখিলরঞ্জন সে
(৪৪)	Focal length	ফোকস দূরত্ব	কিরণকেন্দ্রান্তর	লেখক
(৪৫)	Focus, real	সৎ ফোকস	প্রত্যক্ষ কিরণকেন্দ্রান্তর	"
(৪৬)	Focus, vertual	অসৎ ফোকস	পরোক্ষ কিরণকেন্দ্রান্তর	"
(৪৭)	Finder (—telescope)	—	নির্দ্দেশক, (—দূরবীক্ষণ)	"
(৪৮)	F. P. S. System	এফ্, পি, এস্, পদ্ধতি	ফু, পা, সে, মান	"

(৪৯)	Graph paper, Squared paper	ছককাটা কাগজ	ছক কাগজ	লেখক
(৫০)	Graph	লেখ, চিত্র	ছক চিত্র	"
(৫১)	Gravitation	মহাকর্ষণ	(মাধ্যাকর্ষণ)	
(৫২)	Graduation	অংশাঙ্কন	(ক্রমাঙ্কন)	লেখক
(৫৩)	Half-value period	—	অর্দ্ধহ্রাস কাল	"
(৫৪)	Horse power	আশ্ব, হর্সপাওয়ার	অশ্বসামর্থ,	রাজশেখর বসু
			অশ্ববল, অশ্বশক্তি	"
(৫৫)	Heat unit	—	তাপমাত্রা, তাপ একক	লেখক
(৫৬)	Induction	আবেশ	প্রণোদন	"
(৫৭)	Induced	আবিষ্ট	প্রণোদিত	"
(৫৮)	Induction coil	আবেশ কুণ্ডলী	প্রণোদন কুণ্ডলী	"
(৫৯)	Isothermal	—	সমোত্তাপ	"
(৬০)	Isotherm	—	সমোত্তাপ রেখা, সমোত্তাপ চিত্র	"
(৬১)	Lactometer	ল্যাক্টোমিটার	(দুগ্ধমান)	"
(৬২)	Motion	গতি	বেগ	
(৬৩)	Momentum	—	বেগভার,	রাজশেখর বসু
			ঘাতমান	লেখক
(৬৪)	Moment of force	—	ঘূর্ণ্যবল	
(৬৫)	Moment, rotational	—	ঘূর্ণ্য শক্তি	"
(৬৬)	Moment of inertia	—	ঘূর্ণ্যজাড্য	"
(৬৭)	—meter (e.g. Spectro—, Sono—, etc.)	—মাপক	—মান,—মানযন্ত্র	"
(৬৮)	Neutral	উদাসীন	নিষ্ক্রিয়	লেখক
(৬৯)	Normal pressure (mechanics)	—	অভিলম্ব চাপ	"
(৭০)	Neucleus	নিউক্লিয়স	কেন্দ্রীণ, কেন্দ্রাণু, কেন্দ্রকণা,	
			পরমাণুবীজ	মেঘনাদ সাহা
(৭১)	Negative	নেগেটিভ	(ঋণাত্মক, ঋণ—)	লেখক
(৭২)	Note (musical)	—	স্বর	"
(৭৩)	Optical glass	—	বীক্ষণ কাঁচ	"
(৭৪)	Optical quality	—	বীক্ষণ গুণ	"
(৭৫)	Optical instrument	—	বীক্ষণ যন্ত্র	
(৭৬)	Positive	পজিটিভ, পরা, পর	ধনাত্মক, ধন	
(৭৭)	Positive ray	পজিটিভ রশ্মি, পর রশ্মি	ধনরশ্মি	
(৭৮)	Pole, negative	নেগেটিভ মেরু	ঋণমেরু	
(৭৯)	Pole, positive	পজিটিভ মেরু	ধনমেরু	
(৮০)	Paralax	লম্বন	তীর্য্যকতা, তীর্য্যতা	লেখক
(৮১)	Paralax error	—	তীর্য্যকতা ভ্রম, তীর্য্যকবিভ্রম	"
(৮২)	Proportion	—	অনুপাত	

(৮৩)	Pressure	প্রেষ, চাপ		
(৮৪)	Pressure, atmospheric	বায়ু প্রেষ, বায়ু চাপ		
(৮৫)	Phase	দশা	(কলা)	
(৮৬)	Photosphere	—	আলোকমণ্ডল	লেখক
(৮৭)	Pencil of rays	—	রশ্মিশলাকা	লেখক
(৮৮)	Quantum of energy	—	শক্তিখণ্ড	„
(৮৯)	Quantum of action	—	কর্ম্মখণ্ড	„
(৯০)	Quantum theory	—	শক্তিখণ্ড বাদ	„
(৯১)	Ratio	অনুপাত	অনুপাতাঙ্ক	
(৯২)	Resonance box	অনুনাদীবাক্স	তুম্ব, খোল, অনুনাদী তুম্বী—খোল	লেখক
(৯৩)	Resonator	—	অনুনাদক	যোগেশচন্দ্র রায়
(৯৪)	Real (—image,focus,etc)	সৎ	মূর্ত্ত প্রত্যক্ষ	লেখক „
(৯৫)	Radio active	তেজস্ক্রিয়	(বিকীরক)	„
(৯৬)	Radioactivity	তেজস্ক্রিয়া	(বিকীরকতা, বিকীরতা)	„
(৯৭)	Radioactivity, artificial	—	কৃত্রিম—	„
(৯৮)	Radioactivity, induced	—	প্রণোদিত—	„
(৯৯)	Refrigerator	হিমায়ক	হিমাধার	
(১০০)	Radiation	—	বিকীরণ	
(১০১)	Rontgen ray	রোন্‌জেন রশ্মি	(রঞ্জন রশ্মি)	লেখক
(১০২)	Resolution (optical)	—	বিশ্লেষণ	„
(১০৩)	Resolving power	—	বিশ্লেষণ শক্তি	„
(১০৪)	Sensitive	সুবেদী	(সচেতন)	„
(১০৫)	Siphon	সাইফন	শুণ্ডনল	
(১০৬)	Simple Harmonic Motion	সরল দোল গতি	সরল দোলন বেগ	„ „
(১০৭)	Source	প্রভব	(উৎস, উৎসকেন্দ্র, উৎসমূল)	লেখক
(১০৮)	Sequence	—	পর্য্যায়, ক্রমপর্য্যায়	„
(১০৯)	Sacharimeter	—	শর্করামান	
(১১০)	Solinoid	সলিনয়েড	সর্পিল (সর্পিল কুণ্ডলী)	
(১১১)	Spectrum	বর্ণালি	বর্ণছত্র	লেখক
(১১২)	Spectrometer	বর্ণালিমাপক	বর্ণমান	„
(১১৩)	Spectroscope	বর্ণালিবীক্ষণ	বর্ণবীক্ষণ	„
(১১৪)	Spectrograph	বর্ণালি-লিক্	বর্ণছত্র গ্রাহক	
(১১৫)	Velocity	বেগ	গতি	
(১১৬)	Variable (—velociy, motion)	বিষম—	অসম—	
(১১৭)	Vacuum tube	টরিসেলীয় নল	শূন্য নল, বায়ু শূন্য নল	
(১১৮)	Vertual (—focus, etc.)	অসৎ—	অমূর্ত্ত— (পরোক্ষ—)	যোগেশচন্দ্র রায় লেখক
(১১৯)	Vibrating motion	কম্পগতি	কম্পনবেগ	„
(১২০)	X-ray	এক্স্‌-রশ্মি	এক্স্‌-রে	

(১) '—বিদ্যা' শব্দটী a plied science ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; Physics অর্থে 'পদার্থ বিজ্ঞান' বহুকালাবধি চলিয়া আসিয়াছে।

(২, ৩) 'স্থিরাভিমুখী' কথাটি 'পরিবর্ত্তী' অপেক্ষা সুন্দর ও শ্রুতিসুখকর। কোনও প্রবন্ধ লেখককে এই শব্দটি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি, লেখকের নাম স্মরণ না থাকায় উল্লেখ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

(৪, ৫) ইংরাজীতে alpha ray ও alpha partide উভয়ই প্রচলিত। অতএব আলফা রশ্মি ও আল্‌ফা কণা উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পরিভাষা পুস্তিকায় ray, beta —'বীটা রশ্মি' ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

(৯) Positive ও Negative যথাক্রমে ধন ও ঋণ অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ion বা ionized atomকে ধনাণু ও ঋণাণু বলা অসঙ্গত হইবেনা—শব্দ দুইটি সরলও।

(১৫) রশ্মি=ray.

(১৬) চক্র বা বিদ্যুৎচক্র পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

(১৯) লিখিবার ও বলিবার সময় সেন্টিমিটার—গ্র্যাম—সেকেণ্ড ব্যবহৃত হইবে ; ইহাদের সংক্ষেপ বা আদ্যক্ষর সে-গ্রা-সে। গ্র্যা বা গ্রা উভয়ই চলিতে পারে। বাংলা হরফে সি, জি, এস্ লেখা অর্থহীন। F. P. S. System ক্ষেত্রেও একই যুক্তি, ৪৮ দ্রষ্টব্য।

(২০) (৯) দ্রষ্টব্য।

(২১) আবেশ অর্থে ভাবাবেশ, বিহ্বলতা আসক্তি, অভিনিবেশ ইত্যাদি। প্রণোদন শব্দটী induction এর প্রকৃত অর্থ।

(২২) তাপমাত্রা পরিমাপ করিবার যন্ত্রকে 'তাপমান' বা 'তাপমান যন্ত্র' বলা সঙ্গত। 'ক্যালরি' অথবা 'থার্ম' উভয় এককেই তাপ পরিমাপ করা যাইতে পারে এই যন্ত্রের সাহায্যে। সাধারণ অর্থে 'ক্যালরিমান'ও চলিতে পারে। Thermometer=উত্তাপমান বা উষ্ণতামান যন্ত্র।

(২৪, ২৫, ২৬) এস্থলে charge অর্থে electrical charge। এক্ষেত্রে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ শব্দ 'আধান' অপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য ও সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক।

(২৮) To conduct অর্থ পরিচালনা করা যেমন : To conduct music, orchestra, class ইত্যাদি। তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদির conduction ও 'পরিচাল' হইবে, ইহা পূর্ব্বেকার বাংলা বিজ্ঞান পুস্তকাদিতেও পাওয়া যাইবে।

(২৯) Convection=পরিবাহন, ইহাই পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। ইহাই ঠিক। তরল ও বায়বীয় পদার্থে তাপ এই উপায়ে প্রকৃতপক্ষে 'বাহিত' হয়।

(৩১) ২৮ দ্রষ্টব্য।

(৩২) ৯ দ্রষ্টব্য।

(৩৪) 'ভ্রমণ' অপেক্ষা 'ঘূর্নন' ও 'আবর্ত্তন' শব্দদ্বয় gyration শব্দের অধিকতর উপযোগী।

(৩৮) বিচ্ছুরণ শব্দটি radiation, বিশেষতঃ particle radiation, অর্থে উপযোগী। Dispersion সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, ইহার প্রতিশব্দ বিচ্ছুরণ একেবারেই অচল।

(৪০) Oscillatory শব্দে স্পন্দন, কম্পন প্রভৃতি সুপ্রযোজ্য।

(৪৩) অধ্যাপক সেন focus-এর জার্ম্মান প্রতিশব্দ Brenn-punkt (=Burning point) হইতে দহনবিন্দু শব্দের পক্ষপাতী। তবে 'দহন' শব্দটি তাপের সহিত অধিক সংশ্লিষ্ট, 'কিরণ' যে-কোনও রশ্মির পক্ষে প্রযোজ্য।

(৪৮) ১৯ দ্রষ্টব্য।

(৫১) 'মাধ্যাকর্ষণ' বহুকাল হইতে প্রচলিত, উহাকে বাতিল করিবার প্রয়োজন নাই।

(৫৪) ইহাদের মধ্যে 'অশ্বশক্তি' শব্দটি সর্ব্বাধিক প্রচলিত।

(৫৬) ২১ দ্রষ্টব্য।

(৬২) Motion ও Velocity'র প্রতিশব্দ উল্টাপাল্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ অর্থেও Motion=বেগ। এতদ্ভিন্ন স্কুলপাঠ্য অনুবাদ পুস্তকাদিতে Velocity=গতি, Motion=বেগ (Manual of Translation—বেণীমাধব গাঙ্গুলী ও অন্যান্য অভিধান দ্রষ্টব্য) ছাত্রেরা পড়িয়া আসিতেছে।

(৮৩, ৮৪) প্রেষণ শব্দের অর্থ প্রেরণ। প্রেষ শব্দটি প্রেষণ শব্দের অপভ্রংশ হইলে দুষ্ট প্রয়োগ হইয়াছে। পেষণ শব্দের সহিত pressure-এর কিছু যোগ আছে। pressure হইতে 'প্রেষ' করা নিরর্থক।

(৯১) Ratio ঠিক অনুপাত নহে, অনুপাত=proportion। Ratio একটি সংখ্যা বা অঙ্ক। অবশ্য proprotion বা অনুপাতের সহিত ইহার বিশেষ যোগ আছে। এই সকল বিবেচনায় 'অনুপাতাঙ্ক' শব্দটি ratio'র উপযুক্ত প্রতিশব্দ বলিয়া মনে হয়।

(৯৯) হিমায়ক শব্দটি Refrigeratorএর abstract অর্থ, 'হিমাধার' কথাটি refrigerator machineটির কথাই যেন স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১০২) প্রকৃত উচ্চারণ 'রোয়েণ্ট্‌গেন', বানান Rontgen (o'র মাথায় দুইটি বিন্দু হইবে)। ইংরাজীতে Roentgenও লিখিত হয়। 'রঞ্জনরশ্মি' কথাটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

(১০৬) Motion=বেগ, ৬২ দ্রষ্টব্য।

(১১১) 'বর্ণচ্ছত্র' বহুকাল হইতে প্রচলিত।

(১১৫) ৬২ দ্রষ্টব্য।

(১১৭) Toricelian tubeটি vacnum বটে, কিন্তু vacnum tube মাত্রেই টরিসেলীয় নল নামে অভিহিত হইবে, ইহা সুযুক্তি নহে।

(১১৯) ৬২ দ্রষ্টব্য।

বারান্তে অন্যান্য প্রতিশব্দের অবতারণা করিব ইচ্ছা রহিল।

বার্লিনে অলিম্পিক

ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী এম্‌-বি, এম্‌-সি-ও-জি

গ্রীক সভ্যতার পতনের পরেও অলিম্পিক উৎসবের স্মৃতি এবং মাধুর্য্য নষ্ট হয়নি, গল্পে, কবিতায়, ইতিহাসে চলে আসছে। অলিম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরাতন মন্দির আবার খুঁজে বার করা হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারণ Pierre De Coubertin এই ক্রীড়ার পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর চেষ্টায় প্যারিসে একটী আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হয়—সেই থেকে পুরাতন অলিম্পিকের আদর্শ নিয়ে তাকে বর্ত্তমান সভ্যতার ছাঁচে ঢেলে প্রতি চার বছর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই উৎসব চলেছে এবং দিনে দিনে মানুষ যতই স্থান এবং কালকে জয় করছে, ততই এই উৎসবে লোক সমাগম এবং এর আনন্দ বাড়ছে। আরম্ভ থেকে যথাক্রমে উৎসব হয়েছে—এথেন্‌স্‌ ১৮৯৬, প্যারিস ১৯০০, সেণ্ট লুই ১৯০৪, লণ্ডন ১৯০৮, স্টক্‌হল্‌ম ১৯১২—১৯১৬ সালে বার্লিনে হবার কথা ছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্য হয়নি। এণ্টওয়ার্প ১৯২০, প্যারিস ১৯২৪, এমস্টারডাম ১৯২৮, লস্‌ এঞ্জেল্‌স্‌ ১৯৩২, বার্লিন ১৯৩৬ – ১৯৪০ সালে 'টোকিও'তে হবার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য বন্ধ রইল।

অলিম্পিক ক্রীড়ায় যে শুধু শারীরিক শক্তির পরীক্ষা হয়, তা নয় এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা পৃথিবীর যৌবনের উৎসব, আর তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ভিতর যে এক মহামানব জাতি আছে তার সন্ধান করা। এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কোলাহলে এবং যুদ্ধের মধ্যে দেখা যায়, অন্ততঃ আমি যেটুকু দেখেছি তার থেকে ধারণা হয়েছে—যে যৌবন তার আনন্দ আর খেলার মধ্যে—যুদ্ধবিপদের ধার ধারে না। খেলায় হেরে গেলেও বিজেতার সঙ্গে এক সঙ্গে খেলে বেড়ায় তার জয়ে সুখ্যাতি এবং আনন্দ প্রকাশ করে। আর অলিম্পিক ক্রীড়া পল্লীতে (Olympic Village) ভিন্ন জাতীয় ছেলেরা সব যে কি আনন্দে দিন কাটিয়েছে তা তারা কোনদিন ভুলবে না। প্রত্যেক জাতির মোড়লরাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। তারাই জাতির স্বার্থ আর জাতীয় গৌরবের নামে যুবকদের নাচিয়ে তোলে—যার ফলে জগতে বিরোধের সৃষ্টি হয়। যাক সব বড় বড় কথা!

সিটে ফিরে এসে দেখি গ্যালারি সবগুলিই প্রায় ভরে উঠেছে, ধারে কিছু কিছু খালি আছে। সেদিন সকালের 'প্রোগ্রাম' ছিল Hammer Throw—৩১ জন প্রতিযোগী। সময় লাগবে অনেক। প্রত্যেককে তিনবার করে ছুঁড়তে দেওয়া হবে। ৩১ জন লোক সবাই ওভার-কোট পরে কম্বলমুড়ি দিয়ে সারবন্দী হয়ে সেই সুড়ঙ্গ দরজা দিয়ে যখন মাঠে এসে পৌছিল তখন দর্শকদের মধ্যে সমবেত হাততালি এবং হর্ষধ্বনিতে ভীষণ শব্দ হল। ভিতরের মাঠের এক কোনে লাল মাটির একটী ছোট সার্কল্‌ বা গোলাকার গণ্ডি কাটা আছে, সেখান থেকে ছুঁড়তে হবে শিকে গাঁথা একটী ভারি লোহার বল। যে সবচেয়ে বেশী দূরে ছুঁড়তে পারবে সেই জিতবে। ছোঁড়বার জায়গা থেকে দূরত্ব মেপে তিনটে বৃত্ত কাটা আছে—৪৫, ৫০, ৫৫ মিটার। ৩১ জনের মধ্যে যারা অন্তত ৪৬ মিটার ছুড়তে পারবে, তারা সেমি-ফাইনালে উঠবে। তারপর তারা আবার তিনবার করে ছুঁড়তে পাবে। এতে প্রথম হল একজন জার্ম্মাণ, দ্বিতীয়ও হল একজন জার্ম্মাণ, আর তৃতীয় হল সুইডেন। জার্ম্মাণরা যখন ছুঁড়ছিল তখন সারা ষ্টেডিয়ম কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠছিল। ঘণ্টাখানেক এটা দেখে আমরা আবার বেরুলাম। ষ্টেডিয়মের মধ্যেই একটা দোকানে 'ফিল্‌ম' কিনতে পেলাম। অলিম্পিকের ছাপ দেওয়া কত জিনিষই বিক্রয় হচ্ছে, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সঙ্গে রেস্ত কম—কাজেই সস্তা দেখে দু'একটী কিনলাম, একখানি অলিম্পিক রুমাল, একটী নোটকেস ইত্যাদি। তারপর জলযোগ করবার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়লাম। 'টিউব ষ্টেশনের' এর ধারে কালকের সেই রেস্তোঁরাতে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে—'স্যানেজ', রুটী আর দুধ নিয়ে খেতে বসা গেল। খেতে খেতে একদল আমেরিকার টুরিস্টদের আর একজন ক্যানাডাবাসীর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। বিকেলের খেলা তিনটেয় আরম্ভ হল। এবেলা ভাল প্রোগ্রাম ছিল,

কাজেই ষ্টেডিয়ম একেবারে ভর্ত্তি। Hammer Throw শেষ হলে ৪০০ মিটার 'বেড়া-দৌড়ে'র (Hurdle-race) হিট্ আরম্ভ হল। প্রত্যেক খেলার আগেই নাম ডাকা হচ্ছে মাঠ থেকে, আর আমরা সকলে লাউড স্পীকার দিয়ে খুব জোরে শুনতে পাচ্ছি। তারপর যখন বিজেতার এবং দেশের নাম ঘোষিত হল তখন আবার উত্তেজনা দেখা গেল দর্শকদের মধ্যে। বেশীরভাগই জয়ী হ'ল জার্ম্মাণ। প্রত্যেক খেলার পরে বিজেতাদের সম্মান প্রদর্শনের যে অনুষ্ঠান হয় সেটা বড় চমৎকার। মাঠের একধারে একটা Platform বা উঁচু মঞ্চ আছে। তার উপরে উঠে মধ্যখানে বিজেতা দাঁড়ায়, তার দুপাশে আর দুজন—যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে। তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তিনটি সাদা পোষাকপরা মেয়ে, Laurel বা পুষ্পলতিকার মুকুট নিয়ে। প্রথমের নাম এবং দেশ ঘোষিত হলে প্রেসিডেণ্ট তার সঙ্গে করমর্দ্দন করেন এবং মাঝের মেয়েটী তার মাথায় পরিয়ে দেয় সেই 'ল্যরেল্' আর হাতে দেয় একটী ওক্ বৃক্ষের চারা—বিজেতা এটা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে পুতে দেবে—গাছ বড় হয়ে তাকে এবং তার দেশের লোককে তার বিজয়ের কথা বহুদিন স্মরণ করিয়ে দেবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়কে আর দুটী মেয়ে 'ল্যরেল্' পরিয়ে দেয়। তারপর স্কোর বোর্ডের নীচের ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ড থেকে বেজে ওঠে জার্ম্মাণীর জাতীয় সঙ্গীত—তখন সকলে দাঁড়িয়ে ওঠে, আর জর্ম্মাণরা নাজী স্যালুটের ধরণে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এর ছবি একটা তুলেছি। ঠিক এই অনুষ্ঠানের সময় স্কোর বোর্ডের উপরে তিনটী পতাকা ওড়ান হয়, বিজয়ীর দেশের জাতীয় পতাকা। যাদের দেশ জেতে তাদের মন গর্ব্বে ভরে ওঠে।

এর পর একশো মিটার ফ্লাট রেসের দুটো 'হিট্' হল। এগুলোয় আমেরিকারই প্রাধান্য দেখা গেল। আমাদের বেচারী গ্রেট বৃটেনের কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না! তারপর মেয়েদের ঐ রেসের ৬টা হিট্ হল। মেয়েরা ছেলেদের মতই সর্টস্ বা 'জাঙ্গিয়া' পরে দৌড়ায়, গায়ে থাকে জাতীয় চিহ্নাঙ্কিত একটা গেঞ্জী। মাঠে নামে অবশ্য ফুলপ্যাণ্ট আর সোয়েটার পরে, কিন্তু দৌড়াবার আগে বড় পায়জামা খুলে ফেলে। কোনরকম লজ্জা নেই, কেউ কিছু মনেও করে না। ছেলেরাও দৌড়াতে এসেছে, মেয়েরাও এসেছে; কোন তফাত নেই। দেখাগেল, যারা দৌড় দিচ্ছে—তাদের মধ্যে অনেককে মেয়ে বলে চিনতেই পারা যায় না—বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটু দীর্ঘতর কেশ, তাও সকলের নয়। আমেরিকার যে মেয়েটী খুব ভাল দৌড় দিল—এবং শেষ পর্য্যন্ত 'ফার্স্ট' হয়েছিল—সে যেমনি লম্বা তেমনি পৌরুষ ভাবাপন্ন। তাই খেলার বিষয়ে সে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। ফাইনালে উঠল। দুজন আমেরিকান, তিনজন জার্ম্মাণ, আর একজন পোলাণ্ডের মেয়ে। পোলাণ্ডের এই মেয়েটীই গেলবারে প্রথম হয়েছিল।

ছেলেদের একশত মিটার ফাইনালের সময় চারিদিকে ভীষণ চাঞ্চল্য। আমেরিকার তিনজন, আর জার্ম্মাণী হল্যাণ্ড সুইডেনের এক একজন করে দৌড়াচ্ছে। দৌড় দেখে সকলেই জানত—আমেরিকার ওই কাল লোকটাই জিতবে। তার নাম হচ্ছে জেসি আওয়েন্স্ (Jessi owens.) আরম্ভ থেকেই সারা ষ্টেডিয়াম একেবারে গম্‌গম্ করতে লাগল। আমাদের যা উত্তেজনা হচ্ছিল—না জানি যারা দৌড়াবে তাদের কি অবস্থা হয়েছিল। দেখতে দেখতে দুটী কাল লোক এবং একটী সাদা লোক জিতল। শেষ সীমানার দুপাশে বিচারক এবং সময়রক্ষকরা সারবন্দি হয়ে দুটো কাঠের ছোট গ্যালারীতে বসেছিল। 'আওয়েন্স' খুব সহজেই প্রথম হল। আগে থেকেই ফটোগ্রাফার ও সিনেমা গ্রহীতারা সব নিজস্ব জায়গায় মোতায়েন হয়ে বসে ছিল। টকাটক্ ছবি উঠতে লাগল, আর বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের সপ্রশংস দৃষ্টি সেই দিকে। সমবেত জনসমুদ্রে সকলের মুখ থেকেই উত্তেজনার অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এক মহাধ্বনির সৃষ্টির করছে। এ বিরাট দৃশ্যের মহানতা না দেখলে বোঝা যায় না।

পরের দিন আমাদের বন্ধু Frau Schwalbeর আসার কথা, ৯টার সময় আমাদের গাড়ী করে খেলা দেখতে নিয়ে যাবে। 'লর্ডলি স্টাইলে' অর্থাৎ জমিদারী চালে যাব, আর 'কার-পার্কে' গাড়ী রাখব, এই সব ভাবতে আমাদের বেশ মজা লাগছিল। কিন্তু সাড়ে নটা বাজার পরও গাড়ী বা রঙিন মহিলা কারও দেখা নেই, আমরা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম—ভাবলাম বোধ হয় ফস্‌কে গেল। ফোন করাতে শ্রীমতী বললেন, 'আমার উঠতে দেরী হয়ে গেছে—আমি দশ মিনিটের ভেতর

আসছি।' সত্যিই এলেন তিনি। বন্ধুদ্বয় গাড়ীর পিছনের সিটে এবং আমি পাশে বসে রওনা দিলাম। যেতে যেতে এটা ওটা টুকরো টুকরো গল্প হতে লাগল। খেলার মাঝে বেরিয়ে কোথাও দূরে গিয়ে 'ল্যাঞ্চ্' করা হবে ঠিক হল। বার্লিনের আশে পাশে কত জায়গা আছে। আমার মন্দ লাগছিল না, উৎসবে মত্ত বার্লিন সহর, তার মধ্যে আমাদের গাড়ী ছুটেছে, পাশে সুন্দরী মহিলা—আর চাই কি? হলই বা ক্ষণিক—তবু এই ক্ষণিকের আনন্দই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? মনে মনে বরাতের তারিফ করতে লাগলাম। কিন্তু মনের কোণে এই মায়াবিনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু সন্দেহ জাগতে লাগল। পরে বুঝেছিলাম যে শ্রীমতী তাঁর নিসঙ্গ জীবনে—একটু বৈচিত্র্য খুঁজছেন। গাড়ী থাকাতে অলিম্পিকের Car Park বা 'থান-কেয়ারি' দেখবার সৌভাগ্য হল। সেও এক বিরাট ব্যাপার।

সেদিনও প্রোগ্রাম ভালই ছিল। লংজাম্প, ২০০ মিটারের হিট, আর মেয়েদের ডিস্ক-থ্রো—এই তিনটে সকালবেলা। লং জাম্প বহুকালব্যাপী, দু'জায়গায় হচ্ছিল—৬১জন প্রতিযোগী। একের পর একে ফাইনালে ওঠবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল—তাতে আমাদের তত মনোযোগ দেবার অবকাশ হয়নি, কারণ ওদের ফাইনালটাই হবে আকর্ষণীয়। ওদিকে Franenরা (জার্মাণ ভাষায় 'মহিলা') ডিস্ক ছোঁড়া আরম্ভ করেছে। এই চাকৃতি ছোঁড়াটা খেলার মধ্যে সবচেয়ে মাধুর্য্যপূর্ণ। ছোঁড়বার আগে এর অঙ্গভঙ্গী এবং কায়দা দেখলেই শারীরিক গঠন, শক্তি ও ভঙ্গীর একত্র সমাবেশ বুঝতে পারা যায়। Statue অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি কিংবা ছবি দেখেও তেমন প্রতীয়মান হয় না। আর এই খেলাটি সেকালের অলিম্পিকেও ছিল। তাই পুরাতন গ্রীক ভাস্কর্য্যে এর অনেক প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। পুরুষদের ডিস্ক ছোঁড়া দেখবার সৌভাগ্য হয়নি—শুধু পৃথিবীর বাছা বাছা মেয়েদের এই চাকৃতি নিক্ষেপ কৌশল দেখেই অনেক আনন্দলাভ করেছি। প্রথম হ'ল জার্ম্মাণী, দ্বিতীয় পোলাণ্ড এবং তৃতীয়ও জার্ম্মাণী—২০০ মিটারের আটটা হিট্ হ'ল। এই দৌড়ের জন্য ৪৮জন প্রতিযোগী এসে ঢুকলেন—তখন সারা ষ্টেডিয়ামে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেল—কারণ ২০০ মিটার দৌড়ান নাকি খুব উত্তেজনাপূর্ণ। প্রত্যেক হিটের আগে ৬জনের নাম ডাকা হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে দেশের নাম ত আছেই। তারা ৬জনে, খানিক দৌড়ে এবং লাফালাফি করে শরীর গরম এবং পায়ের জড়তা ভেঙে নিল। তারপর 'শুরু দাগা' অর্থাৎ Starting Pointএর মাটী খুঁড়ে নিজেদের সুবিধে মত করে নিল—এ দৌড়ে Start বা শুরু করার উপরই হার জিত অনেকটা নির্ভর করে। সব কজন প্রতিযোগীর দৌড়ের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়েছিল—'আওয়েন্সের' দৌড়—খুব দ্রুত, চমৎকার আর খুব সহজ ভঙ্গী—দ্বিতীয় লোকের সঙ্গে ছিল তার শুরুতেই অনেকখানি তফাত। শেষেও জিতেছিল আওয়েন্সই এবং রেকর্ড সময়ে। এর খুব নাম বেরিয়ে গেছে এবং যে ছবি ছাপা হয়েছিল, দুদিন পরে আর তা' পাওয়া যায়নি। এর নাম বেরিয়ে গেল—Flying man আর Black Panther অর্থাৎ 'উড়োবাজ' আর 'কেলেচিতে'! এবার ওলিম্পিকে কাল নিগ্রোদেরই জয় জয়কার বলে—সাদা লোকেরা মনের দুঃখে এবং হিংসায় বলে ফেলেছে—Black Man's Olympic! নিগ্রোরা জিতেছে—১০০, ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প—আর সবগুলিতেই করেছে একেবারে নূতন রেকর্ড। তার মধ্যে কাল আওয়েন্স্ একাই তিনটিতে প্রথম হয়েছে, ১০০, ২০০ মিটারে ও লং জাম্পে।

সকালের খেলা শেষ হবার আগেই সাড়ে বারটায় বেরিয়ে পড়লাম—দূরে কোথাও গিয়ে, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোন নির্জ্জন হোটেলে একটু আরাম করে খাওয়া যাবে বলে। গাড়ী আছে আর ভাবনা কি? বার্লিনের জলাশয়ের সৌন্দর্য্য দেখবার সৌভাগ্য হল। আমাদের সঙ্গিনী ও পথপ্রদর্শিকা যেতে যেতে পরিস্কার ইংরাজিতে সকল দ্রষ্টব্যের পরিচয় আমাদের দিলেন। একটা ব্রীজ পার হবার সময় গাড়ী থামিয়ে বার্লিনের সৌন্দর্য্য দেখালেন। লণ্ডনের চেয়ে বার্লিনের সৌন্দর্য্য অনেক বেশী, কারণ পাহাড়, বন আর জলাশয়ের একত্র সমাবেশ এদেশে দেখিনি—বার্লিনের চারিদিকেই জলাশয় আর তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামের শেষে আছে See তার মানে 'লেক'। বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট গ্রাম্য রাস্তায় এসে পড়লাম। গ্রাম্য হলেও পিচের রাস্তা, মোটর চালাবার খুব সুবিধা। মেমসাহেব বেশ জোরেই চালাচ্ছেন, ঘণ্টায় ৪০-৪৫ মাইল। একটা হোটেলে নামা হল। ভেতরে গিয়ে দেখি মস্ত মাঠ—ফুলের বাগান—লেকের ধারেই। টেবিল সব ভর্ত্তি। লোকের ভিড় এবং দৃষ্টি এড়িয়ে

জলাশয়ের ধারে গেলাম—বেশ চমৎকার, বাঁধান ঘাট—সেখানে ছোট ছোট মোটর বোট বাঁধা আছে। গ্রীষ্মকালে বোটে ঘুরে বেড়াতে বেশ মজা। খানিক ঘুরে বেড়ান গেল। এখানে জলযোগ করা মেমসাহেবের মনঃপুত না হওয়ায় (বোধ হয় ভিড়ের জন্য) আমাদের আরও ভাল জায়গায় নিয়ে চললেন। আমাদের আপত্তি নেই, যত ঘোরা যায় ততই ভাল। আর পল্লীগ্রামের গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলাশয় দেখতে দেখতে—একটা ছোট নির্জ্জন হোটেলে এসে পৌছলাম। এটা বেশ ভাল বলে মেমসাহেবের পছন্দ হল। খুব আরাম করে চোব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খেতে খেতে আমাদের দেশের এবং এদেশের অনেক গল্প করা গেল। মেমসাহেব আমাদের কাছে তাঁর দেশের অনেক কথা জানলেন—আমরা আমাদের দেশের অনেক কথা জানালাম—মেম সাহেব বললেন—অনেক ভেতরকার কথা, যা সাধারণ লোকের টের পাবার উপায় নেই। এখনকার গভর্ণমেণ্টের খারাপ দিকটা। আবার মেমসাহেব বলে দিলেন—কাউকে বলো না যেন, আমার গর্দ্দান যাবে। আমরা আশ্বাস দিলাম—কোন ভয় নেই। এখানকার রান্না বেশ ভালই লাগল। চিংড়ি মাছের স্যাল্যাড্ (Salad)—অনেকটা আমাদের দেশের রায়তার মত টক্‌টক্, তারপর মাংস—বেশ ভাল রান্না সিদ্ধ এবং ভাজার মাঝামাঝি, তারপর পিঠের মত একরকম জিনিষ, কমলাসব (Orange Wine) দিয়ে তৈরী করা—বেশ খেতে লাগল। আর পানীয় ছিল Apple Wine. অর্থাৎ আপেলের সরবৎ! Wine হলেও এতে মদ নেই। মেমসাহেব মদ খান না। এটা শেখা গেল। কোথাও খেতে গেলে এর পরে Apple Wine খেতাম। জল পাওয়া যায় না—তার বদলে 'বীয়ার' খাওয়াই রীতি—অনেক বাঙালীই খায়—এতে খুব অল্প পরিমাণ মদ আছে—একদিন খেয়েছিলাম একটা পার্টিতে—তিত বলে আমার একটুও ভাল লাগে নি। পেটভরে খেয়ে দেয়ে বেশ আরাম ও তৃপ্তি হল, কারণ এখানে এসে অবধি সেই গুপ্ত সাহেবের 'পেটেণ্ট্' রান্না আর মোটা ডাল-ভাতে অরুচি ধরে গিয়েছিল। 'বিল' এল, আমাদের মধ্যে একজন (Dr. Gadekar) টাকাটা দিলেন। কথা ছিল পরে ভাগাভাগি করা হবে। এখনো সময় আছে, প্রস্তাব হ'ল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাংলো দেখতে দেখতে কাঁচা রাস্তায় পড়লাম। একটা অতি সুন্দর ছবির মত বাড়ী দেখিয়ে মেমসাহেব বলল—এটা হচ্ছে একজন Film-actressএর সিনেমা অভিনেত্রীর বাড়ী—বাড়ীটা এত চমৎকার—একেবারে পাহাড়ের গায়ে—দেখে লোভ হতে লাগল। এখনো মাথায় বাড়ী করার সখ আছে, তাই ভাল বাড়ী দেখলে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুধারে ঘন বনের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা, ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মত—একটা ছবি তোলার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। একেবারে জলের ধারে এসে এদের Swimming Bathবা 'সাঁতার ঘাট' দেখলাম—বিলাতে যেমন সব Lido আছে—অর্থাৎ বড় বড় চৌবাচ্ছা—Swimming Pool—এখানে তার দরকার হয় না। এন্তার লেক পড়ে আছে—খুব সাঁতার কাটে এরা। মেমসাহেবের সাঁতারের বড় সখ, আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন—তবে আমরা তিন দিনের অতিথি, সময় করে উঠতে পারিনি—বললাম—আবার ত আসছি তখন আপনার সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দেওয়া যাবে।

ফিরবার পথে একবার গাড়ী বিগ্‌ড়েছিল, মেমসাহেবের মুখ চুণ, ভাবটা যেন—এখন কি করি!—আমরা সবাই ত গাড়ী সম্বন্ধে একেবারে বড় ওস্তাদ। কাজেই আমার যেমন স্বভাব, বসে বসে মজা দেখতে লাগলাম, আর মেমসাহেবের মুখের চেহারার ঘনঘন পরিবর্ত্তনটুকু বিশ্লেষণ আরম্ভ করলাম। শর্ম্মা একজন mechanical Engineer অর্থাৎ 'যন্ত্রবিদ্' নিজের গাড়ীও আছে—একটু আধটু উপদেশ দিল—যাহোক একটু পরেই গাড়ী আবার চলতে লাগল আপনা-থেকেই। কিছু না বললে খারাপ দেখায়—তাই বললাম—বোধ হয় কার্ব্যুরেটরে ময়লা পড়ছে—পেট্রল অবাধে যেতে পাচ্ছেনা; দেখলাম কথাটা মেমসাহেবের মনঃপুত হল—বললেন—হ্যাঁ—মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে বটে! যাক্, বরাতে ধাপ্পাটা খুব লেগে গেল।

বিকেলের প্রোগ্রাম আরও ভাল ছিল। ২০০ মিটার দৌড়ের সেমিফাইন্যাল, মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল, লঙ্‌-জ্যাম্পের ফাইন্যাল, ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল, আর ৫০০০ মিটারের-হিট্। তিনটে ফাইন্যালই খুব উপভোগ্য হয়েছিল। তার মধ্যে ৮০০ মিটারটা সবচেয়ে বেশী। কি সুন্দর দৌড় দৌড়ায় ওই দুজন কাল ভদ্রলোক—সাদা চামড়ারা কেউ তাদের ধরতেই পারে না। রেকর্ডএ

আছে, গ্রেট ব্রিটেনএর আগে চার বার ফার্স্ট হয়েছে অর্থাৎ ১৬ বছর ধরে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—কিন্তু এবারে তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। ফার্স্ট হ'ল—আমেরিকা যুক্তপ্রদেশ, সেকেণ্ড—ইটালি, থার্ড হল—ক্যানাডা। এত উত্তেজনার মধ্যেও দেখছিলাম মেমসাহেব বেজায় উসখুস্ করছে এবং যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি বললাম—তোমার কি ভাল লাগছে না? বল্লে—খুবই ভাল লাগছে, কিন্তু আমার একটী বিশেষ জরুরি 'এনগেজমেণ্ট' আছে—বাড়ীতে একজন বন্ধু আসবেন, ঠিক বেলা ৫টার সময়। আমরা বললাম—এর পরেই যে সব ভাল ভাল খেলার Item আছে—আর একটু বসে দেখে যাও। বলল—তাহলে আমি তাকে ফোন করে দেরীতে আসতে বলে দিয়ে আসি—বলে চলে গেল। একটী জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম এবং চোখে বিসদৃশ ঠেকেছিল—বিজেতাদের বিজয়মাল্য পরাবার পর যখন জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছিল, তখন মেমসাহেব একবারও হাত তোলেননি—যদিও ইনি জার্ম্মান—জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আমার মনে হয় ইনি নাজিবিরোধী এবং পরে এঁর যেরূপ ইহুদীপ্রীতি দেখেছিলাম তাতে হয়ত ইহুদীর গন্ধও এঁর মধ্যে থাকতে পারে। খেলা চলতে লাগল,আমাদেরও সিগারেট নিঃশেষ হতে লাগল, মাথার উপর দিয়ে দারুণ রৌদ্রের পর কয়েক পসলা বৃষ্টিও হয়ে গেল—তবে উৎসাহের চোটে সে সব গায়ে লাগল না। সবার শেষে ৫০০০ মিটারের হিট আরম্ভ হল—১২ পাক দৌড়। প্রথম বারে একজন ভারতীয় ছিল, তার দৌড়টা দেখবার জন্যই বসেছিলাম। পাঞ্জাবী শিখ—তার সুগঠিত চেহারা দেখে সকলেই আনন্দ পাচ্ছিল—কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ল তার দৌড়ের বহর দেখে—অনেক পেছিয়ে—প্রায় দেড়পাক পেছনে পড়ে যখন সে দৌড় শেষ করল—তখন তার শেষ করার সাফল্যে খুবই হাততালি পড়েছিল—তবে দুঃখের বিষয় সেটা উপহাসের। মেমসাহেবের মুখের চেহারায় পালাই পালাই ভাবটা বড়ই ধরা পড়ছিল—কাজেই আমরাও তাঁর সঙ্গে উঠে পড়লাম। শর্ম্মা হকি দেখতে গেল—আমরা দুজনে নিখরচায় মোটর চড়বার আশায় বান্ধবীর সঙ্গ নিলাম। মেমসাহেব বললেন—বড় ক্লান্ত লাগছে। বললাম—আমাদের আর বাড়ী পৌছে দিতে হবে না—বরং চল আমরাই তোমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে যাই তারপর বাসে চলে যাব। গল্পের মাঝে মেমসাহেব নিজের বাড়ীর কথা অনেক বলেছিল—কেমন সুন্দর ছোট্ট বাড়ী তৈরী করেছে, নিচে কটা ঘর, ওপরে কটা ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, ছোট বাগান, সবই বলেছিল—আমাদেরও দেখবার খুব সখ হয়েছিল। মেমসাহেব পথের পরিচয় দিতে দিতে আমাদের বাড়ী অবধি নিয়ে গেল। বাড়ীতে আর ঢুকলাম না। প্রবেশ দ্বারে 'গুড্‌বাই' করে শ্রান্ত দেহে বিদায় নিলাম। ফিরে আবার আমাদের একটা পার্টিতে যেতে হবে। মেমসাহেব এর মধ্যে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন—কবে সেটা ফোনে ঠিক্ হবে সাব্যস্ত হ'ল। সারাদিন খেলা দেখার পর নূতন রাস্তায় পথ খুঁজে হাঁটতে বড়ই শ্রান্তি লাগছিল, দেশলাইএর অভাবে সিগারেট ধরাতে পারিনি। সেও এক ট্র্যাজেডি! বন্ধু গাড়েকার যেন আমার চেয়ে আরও বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল—ভেবেছিলাম সারাদিনের ক্লান্তি—কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম—তা নয়—কারণটা হচ্ছে অর্থনাশ। কথায় কথায় টের পেলাম যে আজকে আমাদের মেমসাহেবকে নিয়ে খাবার বিল হয়েছে ৩৪ মার্ক! শুনে ত চক্ষু চড়কগাছ! এই ব্যাপার নিয়ে পরে অনেক হাসাহাসি করেছিলাম—সকলেই বলেছিলাম একবাক্যে যে এটা আমাদের ওলিম্পিকের আক্কেল সেলামী—এত যে বিল হতে পারে—ধারণা ছিল না। মনে মনে মেম-সাহেবের উপর অনেক রকম সন্দেহ হয়েছিল—হয়ত হোটেলওয়ালার কাছে 'কমিশন' মারবে কিংবা আরও কত কি; কিন্তু পরে সে সন্দেহ কমেছিল। মোট কথা, সেদিন ডিনার টেবিলে তিন জনে প্রাণ ভরে খুব হাসা গেল, আর প্রতিজ্ঞা করা গেল যে এ মায়াবিনীর সঙ্গ বর্জ্জন করতেই হবে। ও বেচারীর হয় ত. কোন দোষ না থাকতে পারে—তবে আমরা গরীব পরদেশী, বাঁধা পাথেয়ের পথিক—আমাদের কি এত দিলদরিয়া খরচ করা পোষায়! গাড়েকার ডিনার টেবিলের প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। শর্ম্মা কিছু দিন পরেই চলে গেল। আমিই একা শেষ পর্য্যন্ত বিদেশিনীর বন্ধুত্ব রক্ষা করেছিলাম এবং ফেরবার আগে একদিন সুন্দরীর কাছে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম। ক্রমশঃ

পথ বেঁধে দিল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্।

অপরাহ্ণ। ঝাঝায় রঞ্জনের বাড়ীতে একটি ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রঞ্জন বেশভূষা করিতেছে ও মৃদুকণ্ঠে সুর ভাঁজিতেছে। পাঞ্জাবীর গলার বোতামটা খোলা রাখিয়া দিয়া চুলে বুরুশ ঘষিতে ঘষিতে রঞ্জন আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইল—ভৃত্য রমাই একটি পোস্টকার্ড হাতে লইয়া প্রবেশ করিতেছে।

রমাই মধ্যবয়স্ক কৃশ ও বেঁটে, পুরুলিয়া জেলার আদিম অধিবাসী। রঞ্জন আয়নার ভিতরে রমাইয়ের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন: কি রে রমাই?

রমাই: একটি পোস্টকাট্ আইছেন আজ্ঞে।

রঞ্জন পোস্টকার্ড হাতে লইয়া বলিল—

রঞ্জন: বাবা লিখেছেন—

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

রঞ্জন: বাবা আসছেন। রমাই—বাবা আসছেন! ভালই হ'ল—

রমাই: কবে আসতেছেন কুর্ত্তাবাবু আজ্ঞে?

রঞ্জন: অ্যাঁ—কবে? (চিঠির উপর আবার চোখ বুলাইয়া)—কই তা তো কিছু লেখেন নি। আজ কালের মধ্যেই আসবেন নিশ্চয়। ভালই হ'ল—আমাকে আর কলকাতা যেতে হ'ল না—(রমাইয়ের পিঠে সস্নেহে একটি চাঁটি মারিয়া) কি চমৎকার যোগাযোগ দেখেছিস রমাই? বাবাও ঠিক এই সময় এসে পড়ছেন—

রমাই: যোগাযোগটা কিসের আজ্ঞে?

রঞ্জন বিস্মিতভাবে তাহার পানে তাকাইল, তারপর হাসিয়া উঠিল।

রঞ্জন: ও—তুই বুঝি জানিস না। শিগ্‌গিরি জানতে পারবি।—এখন যা, বাবার ঘর ঠিক ক'রে রাখ গে—

রঞ্জন চেয়ারের পিঠ হইতে একটা কোঁচানো চাদর তুলিয়া গায়ে জড়াইতে লাগিল।

রমাই: আজ কি বাড়ীতে চা খাওয়া হবেন না আজ্ঞে?

রঞ্জন: না আজ্ঞে, আজ অন্য কোথাও চা খাওয়া হবেন আজ্ঞে।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে রঞ্জন বাহির হইয়া গেল। রমাই তাহার প্রবীণ বহুদর্শী চক্ষুদুটি একটু কুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। সম্মুখের বন্ধ দরজা ভেদ করিয়া সঙ্গীতের চাপা আওয়াজ আসিতেছে।

কেদারবাবু ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলেন; অমনি সঙ্গীতের পূর্ণ আওয়াজ মেঘভাঙা রৌদ্রের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কেদারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কাট্।

মঞ্জু পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুলে বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে; তাহার মন যেন কোন্ স্বপ্নলোকে ভাসিয়া গিয়াছে; অন্তরের মাধুর্য্য-রসে আবিষ্ট চোখদুটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেয়ালে টাঙানো রঞ্জনের ছবিটিকে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যাইতেছে।

মঞ্জু গাহিতেছে—

"দখিন হাওয়া—
আমার বুকের মাঝে পরশ দিয়ে যায়।
—দখিন হাওয়া।
কার নয়ন দুটি মরম বিঁধে চায়—
দখিন হাওয়া।
আমি মন হারালাম নদীর কিনারায়—
দখিন হাওয়া।"

গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই কেদারবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং নিঃশব্দে একটি সোফায় গিয়া বসিয়াছিলেন। মঞ্জু জানিতে পারে নাই। গান শেষ করিয়া

মঞ্জু যখন ফিরিয়া বসিল তখন সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; সলজ্জ ধরা-পড়িয়া-যাওয়া ভাব। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জু: বাবা—! ডাক্তারের বাড়ী থেকে কখন ফিরলে?

কেদার: এই খানিকক্ষণ। গান শেষ হয়ে গেল?

মঞ্জু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া কেদারের পাশে আসিয়া বসিল।

মঞ্জু: জাপানী গান কি-না, তাই তিন লাইনে শেষ হয়ে গেল।— ডাক্তার কি বললেন?

কেদার বিরক্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ মুখভঙ্গী করিলেন।

কেদার: কী আর বলবে! যত সব গো-বদ্যি। রোগ আরাম করতে পারে না, বলে 'দাঁত তুলিয়ে ফেল।' হুঃ! কিন্তু মরুক গে ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

কেদার যেরূপ গম্ভীরকণ্ঠে কথাটা বলিলেন তাহাতে চকিত আশঙ্কায় মঞ্জু তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিল।

মঞ্জু: কি কথা বাবা?

কেদার পিঠ ঠেসান দিয়া বসিলেন; ফাঁসির হুকুম-জারি করার মত কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—

কেদার: আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি—

মঞ্জুর মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু উৎকণ্ঠা কমিল না। কেদার হাকিমীকণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—

কেদার: আমি তোমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছি—সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চাইবে আশা করি এতটা স্বাধীন এখনও হওনি।

মঞ্জুর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল: চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। ঢোক গিলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু: না বাবা।

কেদার সন্তুষ্ট হইয়া গলার মধ্যে একটি হুঙ্কার করিলেন। তাঁহার স্বর একটু নরম হইল।

কেদার: বেশ।—এখন আমার কাছে সরে আয়।

পূর্ব্বগামী কথোপকথনের মধ্যে মঞ্জু নিজের অজ্ঞাতসারে কেদার হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল; এখন আবার তাঁহার পাশে ঘেঁষিয়া বসিল। কেদার সহসা হস্ত প্রসারিত করিয়া রঞ্জনের ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিলেন—

কেদার: এবার ছাখ্ দেখি, ঐ ছেলেটাকে পছন্দ হয়?

কেদার মঞ্জুর পানে চোখ ফিরাইলেন। মঞ্জু চকিত কটাক্ষে ছবিটা দেখিয়া লইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ফেলিয়াছিল; অস্পষ্ট লজ্জারুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু: আমি জানি না।

কেদার কিন্তু এরূপ অ-সন্তোষজনক কথায় তৃপ্ত হইবার পাত্র নয়; তিনি মঞ্জুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

মঞ্জু: (নতচক্ষে)—তুমি যা বলবে তাই হবে।

বলিয়া লজ্জারুণ মুখখানা কেদারবাবুর বগলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। কেদারের মুখে এতক্ষণে সত্যসত্যই প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিল; হয় তো তাঁহার অধরোষ্ঠের কোণ উর্দ্ধমুখী হইয়া একটু হাসির আভাসই প্রকাশ করিল।

কেদার: বেশ—আমার মেয়ের মুখ থেকে আমি এই কথাই শুনতে চাই—(রঞ্জনের ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) ছোকরা সব দিক দিয়েই সুপাত্র! সায়েন্স্ পড়েছে—দেখতে শুনতেও ভাল—এখন কেবল ওর বংশ পরিচয়টা পেলেই—

বহির্দ্বারের কাছে গলা ঝাড়ার শব্দ শুনিয়া কেদার সেইদিকে ফিরিয়া দেখিলেন—রঞ্জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছে; পিতাপুত্রীর ঘনিষ্ঠ ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে।

কেদার: (প্রশান্তকণ্ঠে) এসো রঞ্জন—তোমার অপেক্ষা করছি—

মঞ্জু পিতার কুক্ষি হইতে মুখ তুলিয়া রঞ্জনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু যতক্ষণে রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইতেছিলেন মঞ্জু ততক্ষণে অলক্ষিতে ভিতরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল; কিন্তু তাহার ঘর ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা সফল হইল না। কেদারবাবু ডাকিলেন—

কেদার: মঞ্জু, তুই যাস নি—আমাদের কথা এমন কিছু গোপনীয় নয়—

দ্বারের কাছেই পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুল ছিল, মঞ্জু সঙ্কুচিতভাবে তাহারি উপর বসিয়া পড়িল।

রঞ্জন ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছিল; কেদারবাবু [illegible] তাহাকে সোজাসুজি বলিলেন—

কেদার: তোমাকে ডেকেছিলুম।—মঞ্জুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। আমার দাঁতের রোগ, কোন্ দিন আছি কোন্ দিন নেই—

রঞ্জন: আজ্ঞে সে কি কথা!

কেদার: না না, তোমরা ছেলেমানুষ বোঝ না—দাঁত বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ; কিন্তু সে যাক, তুমি কায়স্থ তো?

রঞ্জন: আজ্ঞে হ্যাঁ—উত্তর রাঢ়ী।

কেদার: বেশ বেশ।

ওদিকে মঞ্জু চুপটি করিয়া বসিয়া শুনিতেছে; সে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া ফেলিল। কেদার বলিতে লাগিলেন—

কেদার: এতদিন তুমি যাওয়া-আসা করছ অথচ তোমার কোনও পরিচয়ই নেওয়া হয়নি।—তোমার বাবার নামটি কি বল তো।

রঞ্জন: আজ্ঞে আমার বাবার নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদারবাবু হাসিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন; তারপর ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় চক্রাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া উঠিল।

কেদার: প্র—! কি বললে তোমার বাপের নাম?

রঞ্জন: আজ্ঞে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জনও হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়াইল। কেদারের কণ্ঠে একটি অন্তর্গূঢ় মেঘগর্জ্জন হইল।

কেদার: প্রতাপ সিংগি! তুমি—প্রতাপ সিংগির ব্যাটা—অ্যাঁ!

রঞ্জন: আজ্ঞে হ্যাঁ।—কিন্তু—

কেদারবাবু রক্তনেত্রে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

কেদার: তোমার বাপের গালে এতবড় আব্ আছে?

বলিয়া হাতে কমলালেবুর মত আকার দেখাইলেন। রঞ্জন বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিল—

রঞ্জন: আজ্ঞে না, অতবড় নয়—এতটুকু—

বলিয়া সুপারির আকার দেখাইল। কেদার সহসা সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

কেদার: ব্যস্—আর সন্দেহ নেই। তুমি সেই দুশমনের বাচ্ছা—!

মঞ্জু কাঠ হইয়া বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল; রঞ্জন বিভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল; কেদার তাহার মুখের সামনে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কেদার: তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয় ছোকরা! প্রতাপ সিংগির ব্যাটা হয়ে তুমি আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? বেল্লিক বেয়াদপ!

হঠাৎ টেবিল হইতে একটি ফুলদানি তুলিয়া লইয়া তিনি দু'হাতে সেটা মাটিতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল।

মঞ্জু: বাবা!

আহত সিংহের মত কেদার কন্যার দিকে ফিরিলেন।

কেদার: খবরদার! যদি আমার মেয়ে হোস্, একটি কথা কইবি না—

মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধর দংশন করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। কেদার রঞ্জনের দিকে ফিরিলেন; ডান হাতের মুষ্টি তাহার নাকের কাছে ধরিয়া এবং বাঁ হাতের তর্জ্জনী বহির্দ্বারের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি চীৎকার ছাড়িলেন—

কেদার: ঐ দরজা দেখতে পাচ্ছ? সোজা বেরিয়ে যাও। আর যদি কখনও আমার বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ—মাথা ফাটিয়ে দেব। যা—ও!

রঞ্জন মোহাচ্ছন্নের মত কেদারবাবুর মুষ্টির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন মাথা ঝাড়া দিয়া নিজেকে কতকটা সচেতন করিয়া লইল, তারপর তন্দ্রাহতের মত বলিল—

রঞ্জন: আচ্ছা—আমি যাচ্ছি।

সে দ্বারের দিকে ফিরিল।

মঞ্জু মিউজিক টুলে বসিয়াছিল; তাহার নিপীড়িত চক্ষু দুটি এতক্ষণ ব্যাকুলভাবে এই দৃশ্যের মর্ম্মানুসন্ধান করিতেছিল; রঞ্জন দ্বারের অভিমুখী হইতেই সে পিয়ানোর উপর হাত রাখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিয়ানো আর্ত্ত বেসুরাকণ্ঠে আপত্তি জানাইল।

কেদার চীৎকার করিয়া চলিলেন—

কেদার: যত সব ঠগ্ জোচ্চোর দাগাবাজ! প্রতাপ সিংগির ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

রঞ্জন দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, একবার দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। অমনি কেদারবাবুর বজ্রনাদ আসিল—

কেদার: বেরোও!

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

মঞ্জু সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল তিনি আর কিছু না পাইয়া গট্‌গট্‌ করিয়া দেয়ালে লম্বিত রঞ্জনের ছবিটার পানে চলিয়াছেন। মঞ্জু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু: বাবা!

ছবির নিকটে পৌছিয়া কেদার কট্‌মট্‌ করিয়া একবার মঞ্জুর পানে তাকাইলেন, তারপর দু'হাতে হেঁচ্‌কা মারিয়া ছবিটাকে দেয়াল হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর ঝড়ের শক্তি ফুরাইয়া গেলে প্রকৃতি যেমন ক্লান্ত নিঝুম হইয়া পড়ে, কেদারবাবুর ক্রুদ্ধ আস্ফালনও তেমনি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিল; তিনি অবসন্ন-দেহে ফিরিয়া গিয়া একটা কোচে বসিয়া পড়িলেন। গালে হাত দিয়া একবার অনুভব করিলেন। যেন দন্তশূলের পূর্ব্বাভাস পাইতেছেন।

মঞ্জু পিয়ানোর পাশে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ফ্যাকাসে রক্তহীন মুখে ঠোঁটদুটি অল্প কাঁপিতেছিল। কেদার তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ঈষৎ ভাঙা গলায় ডাকিলেন—

কেদার: মঞ্জু, এদিকে এস।

মঞ্জু একবার চোখ তুলিল; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেদার পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন—

কেদার: বোসো।

যন্ত্রের পুতুলের মত মঞ্জু নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল। কেদার একবার গলা-খাঁকারি দিলেন; যে জোর মনের মধ্যে নাই তাহাই যেন কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিলেন; তারপর অন্যদিকে তাকাইয়া বলিলেন—

কেদার: ও আমার শত্তুরের ছেলে; ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

মঞ্জু প্রথমটা উত্তর দিল না, তারপর মনের ব্যাকুলতা যথাসম্ভব দমন করিয়া বলিল—

মঞ্জু: ওঁকে কেন অপমান করলে বাবা? উনি তো কিছু করেন নি!

কেদারবাবুর মুখ একগুঁয়ে ভাব ধারণ করিল।

কেদার: না করুক—ওর বাপ আমার শত্তুর!

মঞ্জু: কিন্তু—কি নিয়ে এত শত্রুতা?

কেদার স্মৃতির ফুটন্ত জলে অবগাহন করিলেন, কিন্তু অনুভূতিটা আরামদায়ক হইল না। ঝগ্‌ড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তাহা অনেক সময় এমন লঘু প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কেদার প্রশ্নটা এড়াইয়া গেলেন।

কেদার: তা এখন আমার মনে পড়ছে না—পঁচিশ বছরের কথা। কিন্তু সে যাই হোক, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। বুঝলে?

মঞ্জু হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। কেদার কন্যার মনের ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না; আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাহার মুখের আকৃতি হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিল। তিনি চাপা আবেগের স্বরে বলিলেন—

কেদার: মঞ্জু, আমার আর কেউ নেই, ছেলে বলতে মেয়ে বলতে সব তুই। তোর বুড়ো বাপের মনে যাতে আঘাত লাগে এমন কাজ তুই বোধ হয় করবি না—

মঞ্জু আর পারিল না, কেদারবাবুর উরুর উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল; তারপর বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু: না বাবা, সে ভয় তুমি কোরো না—

ডিজল্‌ভ্‌।

বাড়ীর পাশে জানালা হইতে কিছু দূরে রঞ্জনের ফটোখানা ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। জাপানী ফ্রেম কেদারবাবুর প্রচণ্ড দাপট সহ্য করিতে পারে নাই।

মঞ্জু পাশের একটা দরজা দিয়া সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছবিটি তুলিয়া ভাঙা ফ্রেম হইতে উদ্ধার করিল, তারপর বুকের মধ্যে লুকাইয়া যেমন সন্তর্পণে আসিয়াছিল তেমনি বাড়ীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কাট্‌।

ঝাঝার রঞ্জনের বাড়ীর সম্মুখস্থ খোলা বারান্দা। বাড়ীটি রাস্তা হইতে খানিকটা পিছনে অবস্থিত; ফটক পার হইয়া

বড় বড় ঝাউয়ের শাস্ত্রী-রক্ষিত কাঁকরের সড়ক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়া বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়াছে। ফটক হইতে বারান্দা দেখা যায় না।

বারান্দার উপর টেবিল চেয়ার পাতা হইয়াছে; টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট্ মাখন কেক্ ইত্যাদি। একটি চেয়ারে বসিয়া প্রতাপবাবু টোস্টে মাখন মাখাইয়া তাহাতে কামড় দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইতেছেন। ভৃত্য রমাই আশেপাশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বারান্দার নীচে জুতার মশ্‌মশ্ শব্দ শুনা গেল; প্রতাপ পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ অন্যমনস্কভাবে আসিতেছিল, পিতাকে বারান্দার উপর আসীন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মন এত শীঘ্র পিতৃদর্শনের জন্য প্রস্তুত ছিল না; সে কতকটা বিস্ময়ভাবেই বলিয়া উঠিল—

রঞ্জন: বাবা!

তারপর আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক মুখে হাসি আনিয়া সে তাড়াতাড়ি বারান্দার উপর উঠিয়া গেল।

প্রতাপও কামিজের হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; রঞ্জন আসিয়া প্রণাম করিতেই তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধটা ছিল প্রায় সমবয়স্ক বন্ধুর মত।

প্রতাপ: কেমন আছিস?

রঞ্জন: (মুখ প্রফুল্ল করিয়া) ভাল আছি বাবা। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে!

প্রতাপ: এম্‌নি—অনেক দিন তুই কাছছাড়া—ভাবলুম একবার দেখে আসি!

প্রতাপ স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিলেন; রঞ্জন তাঁহার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিল। পিতার কথায় সে একটু কোমল হাসিল।

রঞ্জন: ও। ভালই তো, তবু দুদিন বিশ্রাম করতে পারবে।—রমাই, আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়—

রমাই প্রস্থান করিল। রঞ্জনের পক্ষে প্রফুল্লতার মাত্রা বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল; প্রদীপে যখন তৈলের অভাব তখন কেবল মাত্র সলতে উস্কাইয়া তাহাকে কতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা যায়! প্রতাপ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিতে তুলিতে তীক্ষ্ণচক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

রমাই পেয়ালা লইয়া ফিরিল; রঞ্জনের সম্মুখে রাখিতে রাখিতে বলিল—

রমাই: বাইরে চা খাওয়া হলেন না আজ্ঞে?

রঞ্জন সচকিতে চোখ তুলিল; তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঘাড় হেঁট করিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—

রঞ্জন: না।

প্রতাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। রঞ্জন একচুমুক চা খাইয়া বাঁ হাত গালে দিয়া বসিল। প্রতাপ টোস্টের পাত্রটা তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলেন, রঞ্জন মাথা নাড়িয়া সেটা তাঁহার দিকে ফেরত দিল। তখন প্রতাপ আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—

প্রতাপ: কি হয়েছে রঞ্জন?

রঞ্জন সোজা হইয়া বসিয়া মুখে হাসি আনিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন: কই—কিছুই তো হয়নি!

প্রতাপ: তবে গালে হাত দিয়ে অমন ক'রে বসে আছিস কেন?—(সহসা) হাঁরে, দাঁতের ব্যথা নয় তো?

বলিতে বলিতে তিনি নিজের পকেটে হাত পুরিলেন।

রঞ্জন হাসিয়া ফেলিল।

রঞ্জন: না বাবা, দাঁত ঠিক আছে।

প্রতাপ: তবে? অমন ক'রে বসে আছিস, কিছু খাচ্চিস না—এর মানে কি?

রঞ্জন চায়ের পেয়ালাটাও সরাইয়া দিয়াছিল, এখন আবার কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে একবার চুমুক দিল; মুখে হাসি আনিয়া যথাসম্ভব সহজ সুরে বলিল—

রঞ্জন: বললুম তো বাবা, কিছু নয়—

প্রতাপবাবুর ধৈর্য্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তিনি হঠাৎ টেবিলের উপর একটা কিল মারিলেন। চায়ের বাসনগুলি সশব্দে নাচিয়া উঠিল।

প্রতাপ: নিশ্চয় কিছু।—আমি শুনতে চাই।

রঞ্জনের মুখ গম্ভীর হইল; সে কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন: বাবা, কেদার রায় বলে কাউকে তুমি চেনো?

প্রতাপ চেয়ার ছাড়িয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ: কেদার—! সেই বেল্লিক হনুমানটা ?—

(তিনি আবার দৃঢ়ভাবে বসিলেন) হ্যাঁ, চিনতুম তাকে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু সে উল্লুকটার কথা কেন ?

রঞ্জন ক্লান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন: না, কিছু নয়।—এখানে তাঁর মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—

প্রতাপ গুন-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ: কি বললি—সেই ক্যাদার বোষ্টেটের মেয়ের সঙ্গে তোর আলাপ! আস্পর্দ্ধা কম নয় তো ক্যাদারের! আমার ছেলেকে ফাঁসাতে চায়—

ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের স্বরে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন: বাবা, তুমি ভুল করছ—তিনি—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রতাপ গর্জ্জিতে আরম্ভ করিলেন—

রঞ্জন: হ'তে পারে না, হতে পারে না—

তিনি উন্মত্তবৎ হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তারপর রঞ্জনের নিরীহ স্কন্ধে গদার মত বাহু সজোরে নিপাতিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন—

প্রতাপ: রঞ্জন, তুই যদি বাপের ব্যাটা হোস, আর কখনও ওর বাড়ীতে মাথা গলাবি নে—

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

রঞ্জন: না বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কেদারবাবু বলেছেন, তাঁর বাড়ীতে মাথা গলালেই তিনি আমার মাথা ফাটিয়ে দেবেন।

প্রতাপ আবার দাপাদাপি করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ: কী! এতবড় আস্পর্দ্ধা—আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেবে। দেখে নেবো—পুলিসে দেবো হতভাগা নচ্ছারকে—

দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনও লাভ নাই দেখিয়া রঞ্জন বাড়ীর ভিতর দিকে চলিল। প্রতাপ হাঁকিলেন—

প্রতাপ: শোন্‌!

রঞ্জন ফিরিল।

প্রতাপ: কাল রাত্রের গাড়ীতে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব—

রঞ্জন: (উদাস কণ্ঠে) বেশ!

রঞ্জন আবার গমনোদ্যত হইল।

প্রতাপ:—আমি রাজার বাড়ীতে তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

রঞ্জন অধর দংশন করিল।

রঞ্জন: বিয়ে আমি করব না বাবা—

প্রতাপ: করবি না! (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আচ্ছা সে দেখা যাবে। কলকাতায় চল্‌ তো আগে। এ বুনো যায়গায় আর নয়, কালই রাত্রের গাড়ীতে।

রঞ্জনের মুখে চোখে একটা চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল। সে অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিল—

রঞ্জন: কাল রাত্রের গাড়ীতে—

ফেড্‌ আউট্‌। (ক্রমশঃ)

দোল-লীলা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কুঙ্কুম-উৎসবে পড়ে' গেছে সাড়া আজ. ব্রজনারী ছুটে চলে রঙ্গে ;
অরুণিত তরুশাখা, অরুণিত শুকশারী, রক্তিমা যমুনা-তরঙ্গে !
ফাগুয়ার ছড়াছড়ি—রঙ যায় গড়াগড়ি, ছোটে লাল মধুকরপুঞ্জ ;
অরুণিত লতাকুল—অরুণিত মধুস্বর, অরুণিত কুসুম-নিকুঞ্জ !

নিদারুণ মন্মথ ফুলশরে জর্জ্জরা কামিনীরা রঙ-রসে মগ্না,
পিচ্‌কারী বরষায়, রাধা আজ কানু-পায় পিরীতির লালিমায় লগ্না !
সন্ধ্যার আকাশের আবীরের রঙ জিনি মধুবন যৌবনে মত্ত ;
মুকুলিত সরোরুহ অরুণিত সুরভিত, মাধবিকা রঙে রাঙা সত্য !

নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় লাল রঙ গলে' যায় জেগে ওঠে লালিমায় চন্দ্র,
আবরণ আভরণ লালে হল' সব লাল, বিকশিত হোলিয়ার ছন্দ !

নারীর অবস্থাত্রয়

যতীন্দ্র

বেদান্তাচার্য্য মহামনীষী বিদ্যারণ্যমুনি বলিয়াছেন—মাংসময়ী নারী ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁহাকে মাতা, পত্নী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি কল্পনা মানবের সৃষ্টি। একই নারী মূর্ত্তি কাহারও জননী কাহারও পত্নী কাহারও কন্যা কাহারও ভগিনী হইয়া বিভিন্নমনে বিভিন্নরূপে ভোগের সাধন হইতেছে।

কন্যারূপিণী

কন্যাই পিতামাতার স্নেহের দুলালীরূপে তাঁহাদিগকে নানাভাবে আনন্দ দিয়া এই ঘাত-প্রতিঘাতময় বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারে তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনকে সমধিক সুখী করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে মধুময় করিতেছে। মহামায়া যেন স্বয়ং কন্যারূপ ধারণ করিয়া পিতামাতাকে তাঁর এই সংসার-বন্ধনের মধ্যে রাখিয়া খেলা দেখিতেছে। সেই খেলা যাঁহারা খেলিতেছেন তাঁহারা একেবারে মত্ত। আর তিনি ঐ খেলার মধ্যে জড়িত না হইয়া প্রফুল্লমনে নির্ব্বিকারচিত্তে দেখিয়া যাইতেছেন। নবনীতকোমল অমল-ধবল মৃদুমন্দ গন্ধবিশিষ্ট—শেফালিকার মত স্নেহবিজড়িত অতি পবিত্র এই আনন্দময়ী মূর্ত্তিই নারী জীবনের নির্ব্বিকার নিষ্কলুষ অবস্থা। তাই শাস্ত্রে কুমারীকে সাক্ষাৎ জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছে। রক্তমাংসনির্ম্মিত এই জীবন্ত প্রতিমায় দেবী বুদ্ধিতে কুমারী পূজার বিধান। কুমারীকে কুমারীজ্ঞানে নহে, সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে মহামায়ার অর্চ্চনা।

পিতামাতার আদর্শ জীবনই কন্যার জীবনকে ধীরে ধীরে এমনভাবে গঠিত করে, যাহাতে সে ভবিষ্যতে গৃহিণী জননী হইয়া সংসারে ঘাত-প্রতিঘাতরূপ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে। কন্যার ভবিষ্যত জীবনের জন্য পিতামাতাই সম্পূর্ণ দায়ী। তাই কন্যাকেও পুত্রের মতই লালনপালন বা শিক্ষা দিবার বিধান।

জায়ারূপিণী

সংসারের বিভিন্ন রীতিনীতি পিতামাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া কন্যা যখন অপরের কুললক্ষ্মী গৃহিণীরূপে পতিগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পিতামাতার নিকট হইতে আশৈশব যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহার সহায়ে নিজেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্বেচ্ছায় পতির গৃহে পত্নী বা সহধর্ম্মিণীরূপে প্রবেশ করেন। পতির সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহার ভাগ্যের সহিত নিজ ভাগ্যকে যেন একীভূত করিয়া দিয়া এই সংসার পথের যাত্রী হন। দুইটি পৃথক প্রাণী ভাবে-প্রেমে আশাআকাঙ্ক্ষায় এক হইয়া যান বলিয়া জায়া পতি উভয়কে দম্পতি বলে।

পত্নী পতির সর্ব্বোতোভাবে অনুসরণকারিণী বলিয়া তাঁহাকে পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা, পতিই ধ্যান জ্ঞান, ইহলোক পরলোক, পতিই তাঁহার একমাত্র গতি—এ দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজেই খুব বেশী, তাই হিন্দুর পারিবারিক জীবন যত শান্তিপূর্ণ অন্য জাতির তত নয়। পতির সহধর্ম্মিণীরূপে হিন্দু-নারীই সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কত পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী নারী হিন্দু জাতিকে সতীত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরবে ভূষিত করিয়া অমর হইয়াছেন। হিন্দু জাতির সেই চির-আরাধ্যা রমণীরত্ন সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি যাঁহারা পতির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ করিয়া চিরতরে হিন্দু জাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ত্যাগতিতিক্ষা আজ হিন্দুনারীর সম্পদ, জাতীয় জীবনের গৌরবের বস্তু।

সেই জনকনন্দিনী সীতা, যাঁহাকে প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র ছলনাপূর্ব্বক বনবাস দিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু স্বামী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও স্বামীর প্রতি একটিও কটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়া বরং রামানুজ লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার সময় লক্ষ্মণের নিকট বলিয়াছিলেন, "ত এব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ"—তিনিই যেন জন্মে জন্মে আমার স্বামী হন, তবে এই বিয়োগ ব্যথা যেন আর আমায় সহ্য করিতে না হয়। এই একটি মাত্র কথাতেই সতীকুলমণি জনক-নন্দিনী তাঁহার হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত করিয়া পতিভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমা চিরদিনের জন্য তাঁহাকে দেবীত্বের আসনে বসাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ঐ অত্যুজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিতা আজও বহু হিন্দু ললনা রহিয়াছেন যাঁহারা স্বামীর ভুলত্রুটি অন্যায়-অত্যাচার উপেক্ষাই করিয়া যান। তাঁহাদের এই সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় ক্ষমা গুণের সুযোগ লইয়া হিন্দুসমাজ বহু প্রকারে তাঁহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিলেও আজ তাঁহারা জননী জনকনন্দিনীর মতই উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন। এই অসীম ধৈর্য্য বা ক্ষমা গুণের অধিকারিণী বলিয়াই তাঁহারা 'দেবী' নামে অভিহিতা।

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদং অর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি(১) ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রুতি স্বয়ংই জগৎসৃষ্টিকার্য্যে পুরুষ-প্রকৃতিকে সমান মর্য্যাদা দিয়াছে। বেদের ঐ ভাব অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালে পুরাণে শিবশক্তি অভেদ বা অর্দ্ধ নারীশ্বরমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রচার বা কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ১।৪।৩

আদি দর্শনশাস্ত্রকার মহামুনি কপিল সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ-প্রকৃতি উভয়কেই অনাদি অনন্ত এবং ঐ দুইটিই চরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষ নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু ভোক্তা। প্রকৃতি জড় হইয়াও পুরুষের সান্নিধ্যবশত পুরুষের ভোগাপবর্গ নিমিত্ত যেন চেতনের মত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। চুম্বক লৌহের নিকটে যেমন সাধারণ লৌহেরও গতি দেখা যায়—সেইরূপ। অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্যগণ একমাত্র পরমপুরুষ পরমাত্মারই সত্তা স্বীকার করিলেও ব্যবহারিক জগতে তাঁরই অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মায়া স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষ জ্ঞান শক্তি বা প্রজ্ঞা, আর মায়া প্রাণশক্তি ক্রিয়াশক্তি বা প্রকৃতিস্থানীয়া। জ্ঞানই একমাত্র পরমার্থ সত্য হইলেও প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তির সহায়েই তাহার অনুভব সম্ভব। অতএব কোন কিছুর অনুভব করিতে হইলেই প্রকৃতি-স্থানীয় প্রাণের সাহচর্য্য একান্ত আবশ্যক।

জননীরূপিণী

অবান্তর দার্শনিক বিষয় ত্যাগ করিয়া এখন আবার প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিব। পত্নী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মতানুবর্ত্তন করেন বলিয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলে। কিন্তু উহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা নহে। তাঁহাকে জননী হইতে হইবে। জননী হইয়া সন্তান পালন করিতে হইবে। সন্তান পালনে জননীকে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। মনু বলেন—অপত্য-জননে পিতামাতা যে কষ্ট সহ্য করেন, শত বর্ষেও সন্তান তাহা পরিশোধ করিতে পারে না। (২) সন্তানকে গর্ভে স্থান দিয়া অবধি মাতা নিজের রক্তে তাহাকে পোষণ করিতে থাকেন। তখন হইতে মাতার সমস্ত চেষ্টা সন্তানের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিজ রক্তরূপ স্তন্যদানে সন্তানের তুষ্টি পুষ্টি বর্দ্ধন করেন। সন্তান কিসে সুস্থ থাকিবে, কিসে সে ভাল হইবে, কিসে তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইবে সতত সেই চিন্তা। এই কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া লালনপালন করিলেও কিন্তু বিনিময়ে কোন কোন সন্তান সতত শুভাকাঙ্ক্ষিনী জননীর প্রতিও দুর্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। তথাপি মাতা তাহাকে ক্ষমাই করেন। ক্ষমা ভিন্ন দুষ্ট সন্তানের প্রতিও ক্রোধ হয় না ; মাতার স্নেহের ধারা সর্ব্বদা নিম্নাভিমুখী, এই অহেতুক স্নেহ ধারায় একমাত্র মাতাই সন্তানের উষর হৃদয়কে সুশীতল করিতে সমর্থ। ইহাই মাতার মাতৃত্ব। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

মাতৃত্বই নারী জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব। তাই তাঁহাদিগকে মাতৃজাতি বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে উহাই সহজাত সংস্কারের ন্যায় আশৈশব অনুস্যূত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ঐ ভাবটি শিশুকাল হইতেই রহিয়াছে—চলন-বলন ক্রীড়া-কৌতুক আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঐ ভাবটিই পরিস্ফুট। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিবার সময় এমন একটি দেহ দেন যাহা মাতা হইবারই সম্পূর্ণ উপযোগী। রক্তমাংসপিণ্ড শরীর পুরুষ ও নারীর সমান হইলেও গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের নিমিত্তই ভগবান তাঁহাদিগকে আরও কয়েকটি অবয়ব বেশী দিয়াছেন। জরায়ু গর্ভাশয় স্তনের স্থূলত্ব প্রভৃতিও নারীর মাতৃত্বই সূচিত করিতেছে। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য তরুণীর তুঙ্গ-স্তনের যতটুকু সার্থকতা তদপেক্ষা স্তন্যদান করিয়া সন্তান পালনে পীযূষ-পূর্ণ পীনপয়োধরের সার্থকতা অনেক বেশী। গর্ভাশয় বা জরায়ু প্রভৃতি বিশেষ অঙ্গ সকল গর্ভধারণেই সার্থক হয়। যে অঙ্গ দ্বারা নারী পুরুষের আনন্দদায়িনী হন, সেই অঙ্গ সহায়ে সন্তান প্রসব করিয়া জননী হন বলিয়া শাস্ত্র ঐ অঙ্গকে সৃষ্টিকর্ত্তা "ব্রহ্মার দ্বিতীয় মুখ" বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে এবং "গর্ভ ধেহি সিনীবালি" বলিয়া ঐ অঙ্গের পূজা শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান। নারী গর্ভধারণ ও সন্তানপালন করেন বলিয়াই বেদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপাসনায় "যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ" বলিয়া তাহাকে অগ্নি-রূপে কল্পনা করিতে উপদেশ দিয়াছে। নারীর শরীরই শুধু যে সন্তান ধারণ পালনের উপযোগী তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার মনও স্নেহমমতা করুণা প্রভৃতি এমন কতকগুলি জননীসুলভ গুণমণ্ডিত যাহা নারীর নিজস্ব। পুরুষের মধ্যে তাহা নাই বলিলেই চলে। আজীবন মাতৃভাবে ভাবিত হইয়া নারী যখন সন্তানের জননী হন, তখন তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং কুলকে পবিত্র করেন। তাঁহার দ্বারাই সেই বংশের ধারা অব্যাহত রহিল বলিয়া তাঁহার গর্ব্বানুভব করা স্বাভাবিক। তাঁহার হৃদয়ের রক্তে সৃষ্ট পুষ্ট সন্তান সেই বংশ রক্ষার জন্য প্রসব করিয়াছেন বলিয়া সকলের নিকট তিনি অধিকতর আদরিণী হন। তাই জননীত্বেই নারী জীবনের চরম পরিণতি।

নারী নিজের রক্তে সৃষ্ট পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করিয়া বংশের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং পুন্নাম নরক ভোগ হইতে পুরুষকে রক্ষা করেন। নারী সন্তানের জননী হইলে তবেই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। পুত্রলাভ করাই দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য, ভার্য্যাগ্রহণ হইতেছে ঐ উদ্দেশ্য-লাভের উপায়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডঃ প্রয়োজনম্" এবং ধর্ম্মপত্নীতে যে পুত্র বা প্রজা উৎপন্ন করা তাহা স্বামীর—পতির দ্বিতীয় জন্ম। পতিই জগৎ উপভোগ করিবার জন্য পুনরায় নিজেকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। পতিই পত্নীর মধ্য দিয়া জন্মলাভ করেন বলিয়া পত্নীর অপর নাম জায়া। 'জায়তে পুত্ররূপেণ আত্মাঽস্যামিতি' এই অর্থে জায়া শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব জায়া—(জন্+অক্ স্ত্রী আপ্) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহাতে বা যাহার দ্বারা নিজের জন্মলাভ হয় (ক)। ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইল নারীকে জননী হইতে হইবে, মাত্র পুরুষের ভোগ্যবস্তু হইয়া উপভোগেচ্ছা-চরিতার্থ করিলেই চলিবে না।

মনুস্মৃতি সমাজের এবং নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের বিষয় অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিলেও সন্তান লাভের বিষয়ে

(২) মনুসংহিতা ২।২২৭

(ক) পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহজায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ। মনু, ৯।৮

তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছে। বংশ নাশের সম্ভাবনায় বা অপুত্রক অবস্থায় পতিবিয়োগ হইলে তাঁহাদিগকে সন্তান লাভে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন। স্বামী বিদ্যমানে বা অবিদ্যমানে, স্বামীর আজ্ঞায় বা অন্য কোন গুরুজনের আজ্ঞায়, দেবর অথবা ঐ বংশের অপর কাহারও দ্বারায় সন্তান উৎপন্ন করাইয়া বংশধারা রক্ষা করিবেন। (৩) মনু বংশলোপের সম্ভাবনায় বা নিজের অপত্যহীন অবস্থায় বিধবা হওয়ায় বিবাহিতা যুবতী নারীকে পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কন্যা বা কুমারীর প্রতিও ঐ একই বিষয়ে মনু খুব উদার। তিনি বলিতেছেন, কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসরের মধ্যে পিতা যদি তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে কুমারী নিজেই আপনার ইচ্ছানুযায়ী উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।(৪) কন্যার ঋতুকালে তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে না পারায় ঋতুরোধে অপত্যরোধ করিয়াছেন বলিয়া সেই পিতা সেই কন্যার উপর আধিপত্যরহিত হইয়াছেন (৫) কারণ গর্ভধারণ করিয়া সন্তানের জননী হইবে বলিয়াই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি।(৬) এই সকল শ্লোকের দ্বারায় জানা যায়, মনু স্মৃতি প্রভৃতির নির্দ্দেশে নারীর জীবন মাতৃত্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মহাত্মা গান্ধী নিজে বিবাহিত হইয়াও খুব সংযত জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তিনি উপদেশ দিয়াছেন—যদি তুমি বিবাহিত হও তবে স্মরণ রাখিও তোমার স্ত্রী কেবল তোমার বন্ধু, তোমার সাথী এবং তোমার সহধর্ম্মী মাত্র। তিনি তোমার বাসনা পরিতৃপ্তির যন্ত্র নহেন। তোমার শরীর ও মনের ধর্ম্ম আত্মসংযম সুতরাং যৌনসম্মিলন তখনই হইতে পারে যখন এই কার্য্যে উভয়েরই সম্মতি থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ও বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর এই বাক্যকে অবজ্ঞা করিয়া উপভোগের উদ্দাম লালসায় কেহ কেহ এমন সাংঘাতিক কথাও বলিয়াছেন—স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া বিবাহিত ব্যক্তিদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করাবার উপদেশ আমি দিতে চাই না। সে দেবেন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষেরা—যাঁরা গর্ভনিরোধের কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করাকে পাপাচরণ বলে মনে করেন।" ধর্ম্মভূমি ভারতমাতার সুসন্তানগণ—যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল, তাঁহারাও যখন আমাদের সনাতন রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করিয়া, পাশ্চাত্যের দুর্দ্দমনীয় কামোপভোগ বাসনায় হিতাহিতরহিত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার মায়াবরণে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করেন এবং পাশ্চাত্যের অবাধ মিলন প্রচারে ব্রতী হন, তখন তাহা দেখিয়া আর্য্য ঋষির বংশধর মাত্রই দুঃখে ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইবেন সন্দেহ নাই। কালের কুটিল গতিতে যাঁহারা ভোগ করিয়াও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহারা যতই বৈজ্ঞানিক উপায় দেখান, তাহাকে মন গ্রহণ করিতে অস্বীকারই করে। কারণ তাহা ভ্রূণ হত্যা বা তাহারই নামান্তর মাত্র। জন্মনিরোধের এই সকল উপায় দ্বারা নারীর স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধিতা করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই ঘটিতেছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় নারী প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে ভারতীয় নারী জীবনের মহত্ব এবং পাশ্চাত্য নারী ভোগের উদ্দাম প্রেরণায় কোথায় যাইতেছে তাহা পাশ্চাত্য মণীষীগণের মতানুযায়ী দেখাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য নারী সমাজ পত্নীত্বকে আদর্শ করিয়া বা ভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া কিসে স্থিরযৌবনা থাকা যায় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ; আর ভারতীয় নারী সমাজধর্ম্মকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া সহধর্ম্মিণীত্ব বা মাতৃত্বকে আদর্শ করিয়া সমস্ত চেষ্টা সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নারীর আদর্শ ও চিন্তাধারা তাই সম্পূর্ণ পৃথক। যে সকল বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার নামে ভারতীয় নারীগণকে তাঁহাদের নিজস্ব আদর্শ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে উপদেশ দেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ ও ভারতীয় নারীর আদর্শ এক নহে। ভারতের জাতীয় আদর্শ ধর্ম্ম বা ত্যাগ, পাশ্চাত্যের জাতীয় আদর্শ ভোগ বা অন্য কিছু। হিন্দুর বিবাহ সুসংযত জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত—পরস্পরের কামনা চরিতার্থই দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে।

সন্তান লাভের আশায় একদিন অসূর্য্যম্পশ্যা রাজরাণী বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে নন্দিনী কামধেনুর সেবা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এখনও ভারতীয় নারী স্বাভাবিক মাতৃত্বের প্রেরণায় অপরের পুত্রকে পালিত পুত্র করিয়া তাঁহাদের মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ইহা অবশ্য নিঃসন্তান বা বন্ধ্যা রমণীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। মা হইবার প্রবল প্রেরণাই অপরের সন্তানকে নিজের সন্তান বোধ করায়। সন্তানের জননী হইবার আশায়, সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া মান সম্মান ভুলিয়া এখনও হিন্দু রমণী বীরেশ্বর তারকেশ্বর প্রভৃতি দেবতার দ্বারে হত্যা দেয়। তাঁহারা এখনও মনে করেন নিঃসন্তান নারীর জীবন বৃথা। অতি অপরিচিত ব্যক্তির মুখ হইতেও মা শব্দ শুনিলে তাঁহাদের হৃদয়ে বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক হয়। তাই অপরিচিত ব্যক্তিকেও ক্ষণিকের মধ্যেই পুত্রবৎ ভাবিতে পারেন। আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যদেশে হিন্দু রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তখন তিনিও হিন্দুনারীর আদর্শ যে মাতৃত্ব তাহাই বলিয়াছিলেন—'ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার পরিণতি। নারীশব্দ উচ্চারণেই হিন্দুমনে মাতৃভাবের উদয় হয়। ভগবানকে তাহারা মা বলিয়া ডাকে।'

তপস্বিনী বা ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয় ব্যতীত নারীর আর একটি অবস্থা আছে তাহা বৈধব্য বা তপস্বিনী—ব্রহ্মচারিণী অবস্থা। নারীর মধুময় জীবনকে বিষময় করিবার জন্য তাঁহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিবার জন্য অদৃষ্টের

(৩) মনুসংহিতা, ৯।৫৯
(৪) „ ৯।৯০
(৫) „ ৯।৯৩
(৬) „ ৯।৯৬

কঠোর পরিহাসরূপে এই বৈধব্য দশা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। যে নারী ভোগসুখের প্রাসাদ কল্পনা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত তাঁহাকে বিধির বিধানে সমস্ত ভোগসুখের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া ত্যাগের পোষাক পরিধান করিয়া সংসারের নশ্বরতা চিন্তা করিতে হইতেছে। একমাত্র ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা এই বুদ্ধি দৃঢ় করিতে হইতেছে। ভগবানই সংসারের সার ভাবিয়া তাঁহার শোকাকুল চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে জগৎপতিকে চিন্তা করিবার উপদেশ দেন। বিধবার এই সকরুণ অবস্থা ভাবিলে মনে হয় তিতিক্ষা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিধবারূপে আবিভূ'তা হইয়াছেন।

পতির স্থূল দেহ লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গেলেও বিধবা পত্নীর মর্ম্মমধ্যে তিনি সদা অবস্থিত থাকেন। যাঁহারা পতির পরিবর্ত্তে জগৎপতিকে হৃদয়াসনে বসাইয়া পূজা করেন, তাঁহারাই জীবনে যথার্থ শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হন। বিধবার জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত ভীষণ, তাঁহাকে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর মধ্যে বাস করিতে হইতেছে অথচ ভোগ্য বস্তুতে ভোগ্য বুদ্ধি না করিয়া ত্যাজ্য বুদ্ধি দৃঢ় করিতে হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় 'বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।' চিত্ত চাঞ্চল্যের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হয় না তাঁহারাই ধীর ব্যক্তি। এই অবস্থা কুমারী অবস্থারই নামান্তর মাত্র। কুমারীর মন ভাবী ভোগ সুখের আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ থাকে, বিধবার মন ভোগসুখের আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দিন দিন শুদ্ধ পবিত্র হইয়া যথার্থ আনন্দলাভের অধিকারিণী হয়। ইহাই পার্থক্য।

মজিদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

লেখা-পড়া জান্‌ত অতি কম,
বিষয়-আশয় ছিলই না ক মোটে,
নাই ক কিছুই কিন্তু মনোরম—
এমন কুসুম পথের ধারেই ফোটে।

২

মিথ্যা কথা কইত সে যে ঢের,
লেগেই ছিল অভাব অনটন,
সাধু যে নয় নিত্য পেতাম টের।
তবু তার কি ছিল আকর্ষণ!

৩

ঠক্‌তে ভাল লাগত তাহার কাছে,
তাড়িয়ে দিলে আসত আবার ফিরে,
এমন মানুষ কমই দেশে আছে
বক্‌লে যারে রাগ্‌তে দেখিনি রে।

৪

না এলে সে লাগত ফাঁকা ফাঁকা,
পুকুরধারে শঙ্খচিলের মত,
না ডাক্‌লেও ইচ্ছা হ'ত ডাকা
গুণ দেখিনি—দোষ দেখেছি শত।

৫

যেমন কঠিন, তেম্‌নি ছিল নত—
ভাল আমায় বাস্‌ত নিষ্কপটে,
অজয়ের সে বানের জলের মত
ময়লা ঘোলা তবু মধুর বটে।

৬

ভৃত্য এবং বন্ধু ছিল দুই—
ব্যথার ব্যথী, না বল্‌লে হয় ভুল,
সত্য বটে নয় সে টগর যূঁই
'কেয়া' সে তার কাঁটাই যেন ফুল।

৭

তার কত দর—কতই যে দরকার
বুঝত না ক মনুষ্যসমাজ
ধাৃ ত না যে ফুল কি ফলের ধার
আনন্দের সে পাতাবাহার গাছ।

৮

রৌদ্রে মাঠের খেজুর গাছের প্রায়
লাগত ভাল ছিন্ন তাহার ছায়া;
নেই ক সে ত, আজকে কাঁদি হায়
কোথায় ছিল এত গভীর মায়া!

মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্‌-এ

যোগধারণা কি প্রকারে করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। কুম্ভকের প্রভাবে সমান বায়ু উত্তেজিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সব নাড়ীকে এক নাড়ীতে পরিণত করে (নাড়ী-সামরস্য) এবং সব বায়ুকে প্রাণের ধারাতে পর্য্যবসিত করে। ইহাই যোজনা-ব্যাপারের রহস্য। দ্বার-সংযম বা প্রত্যাহার দ্বারা যেমন মনের ইন্দ্রিয়াভিমুখী-বহুমুখী-ধারা রুদ্ধ হয় সেই প্রকার এই যোগধারণার প্রভাবে প্রাণের বহুমুখী ধারা একত্র মিলিত হয়। প্রাণের বিভিন্ন ধারা ইড়া ও পিঙ্গলা পথে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে ভ্রূ-মধ্যে গুপ্ত-ধারা সুষুম্নার সহিত মিলিত হয় ও একত্ব লাভ করে। যোগিগণের ঊর্দ্ধ ত্রিবেণী-সঙ্গম ইহারই নামান্তর। অথবা প্রথমে মূলাধারে অধঃ ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে ঐ দুই ধারা সুষুম্নার সঙ্গে সঙ্গত হয়, তার পর ঐ একীকৃত ধারা ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া ভ্রূ-মধ্যে আনীত হয় ও স্থির হয়। এদিকে বিক্ষিপ্ত মনঃশক্তিও চঞ্চলতা পরিহার করিয়া হৃদয়-প্রদেশে ঘুমাইয়া পড়ে। মন স্থির হইলে উহা আর নাড়ী পথে থাকে না, কারণ নাড়ীসকল মনের সঞ্চরণ মার্গ মাত্র। মন যতই স্থির হইতে থাকে ততই উহা নাড়ীচক্রস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। তখন মনের চঞ্চলতা শান্ত হয়—মন নিরুদ্ধবৃত্তিক হইয়া অবস্থান করে।

এই হৃদয় বা দহরাকাশই স্থির মনের আবাস—

> যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে।
> হৃদয়ং তদ্‌ বিজানীয়ন্মনসঃ স্থিতিকারণম্‌॥

হৃদয় পুরীতৎ নাড়ী দ্বারা বেষ্টিত শূন্যময় অবকাশ। যখন মন এই অবকাশ প্রাপ্ত হয় তখন তাহা নির্বাত প্রদেশে অবস্থিত হয় বলিয়া অচল হয়। ইহাই মনের নিরোধ। মন নিষ্ক্রিয় হইলে বৃত্তিজ্ঞান থাকে না। এই জন্যই সুষুপ্তিতে মানসিক বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভাব হয়। দ্বারসংযম ও মনোরোধ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ অবস্থাটি কিয়দংশে সুষুপ্তির সদৃশ। দ্বারসংযম বশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় বলিয়া জাগ্রৎ জ্ঞান জন্মিতে পারেনা এবং মনের বৃত্তি স্তম্ভিত হওয়ার ফলে স্বপ্ন-জ্ঞানও উদিত হয়না। সুতরাং ইহা জাগ্রত ও স্বপ্ন নামক অবস্থাদ্বয়ের অতীত সুষুপ্তিবৎ অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুধু সুষুপ্তি বলিলেও ঠিক ইহার পরিচয় দেওয়া হয় না—বস্তুতঃ ইহা একপ্রকার জড়বৎ অবস্থা। কারণ সুষুপ্তিতে মনের কার্য্য না থাকিলেও প্রাণ স্থির থাকেনা। মনুষ্য অজ্ঞানে মগ্ন থাকিতে পারে, জ্ঞান ও জ্ঞানমূলক কোনও বৃত্তি তাহার না থাকিতে পারে, কিন্তু তখনও দেহরক্ষার উপযোগী শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নানাবিধ প্রাণক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাণ সকলও আপন আপন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থান বিশেষে স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায়, মন ও প্রাণ উভয়ই নিস্তব্ধ হওয়ার দরুণ মনুষ্য একপ্রকার শব-অবস্থায় উপনীত হয়।

কিন্তু মনের এই সুষুপ্তিবৎ স্থিরতা প্রকৃত স্থৈর্য্য নহে। ইহা তমোগুণের আবরণ—ইহাকে ঠিক নিরোধ বলা চলে না। কারণ একাগ্রতার পরই নিরোধের স্থান। একাগ্রতার ক্রমবদ্ধ সূক্ষ্ম ভূমি সকল অতিক্রম করিলে নিরোধ আপনিই উপস্থিত হয়। এই জন্য যোগিগণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরই নিরোধাত্মক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে যোগপদে বরণ করেন। তাহা উপায়প্রত্যয় সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব না হইয়াও যদি প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ মনের নিরোধ হয় তাহা হইলে উহা অসম্প্রজ্ঞাত হইলেও ভবপ্রত্যয় মাত্র, যোগ-পদবাচ্য নহে। মনকে শুদ্ধ না করিতে পারিলে তাহাকে স্থায়ী ভাবে নিরুদ্ধ করা যায়না, কারণ বীজসংস্কার ঐ প্রকার নিরোধেও অক্ষুণ্ণভাবেই বর্ত্তমান থাকে। মগ্ন বস্তুর পুনরু-খানের ন্যায় আবার তাহার ব্যুত্থান হয় বা পুনরাবৃত্তি হয়। প্রজ্ঞার উদয় হইয়া ক্রমশঃ উহার নিরোধ হওয়া আবশ্যক। যেমন পূর্ণিমার পর চন্দ্রকলার ক্রমিক ক্ষয় নিবন্ধন একেবারে কলাহীন অমাবস্যার উদয় হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রকার।

এই জন্য হৃদয় হইতে মনকে চেতন করিয়া উঠাইতে হয়।

বস্তুতঃ চেতন করা ও উঠান একই ব্যাপার। সুষুম্নার স্রোতই চৈতন্যের ধারা—মনকে জাগাইয়া উর্দ্ধমুখী সুষুম্নার ধারায় ফেলিতে হয়। এই জাগ্রৎ মনকে মন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে—এক হিসাবে ইহা প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর মূর্ত্তিরূপেও বর্ণিত হইতে পারে। শিবসূত্রে "চিত্তং মন্ত্রঃ" এই সূত্রে চিত্ত বা মনকেই মন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণ সুষুম্না স্রোত বাহিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, এখন মনকেও ঐ স্রোতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই প্রাণ ও মনের পূর্ণ মিলন সম্ভবপর হইবে। এই মিলন সংঘটিত না হওয়া পর্য্যন্ত দিব্য জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে যে মনোরোধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা অশুদ্ধ মনের রোধ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ইহার পর বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী মনের বিকাশ ও উর্দ্ধারোহণ পথে ক্রমিক নিবৃত্তি গীতা-বর্ণিত ওঁকারের উচ্চারণান্তর্গত ব্যাপার বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

৪

আর এক কথা। হৃদয়রূপ শূন্যে যেমন অসংখ্য নাড়ীর পর্য্যবসান হয়, তেমনি এই অসংখ্য নাড়ী একীভূত হইয়া যে উর্দ্ধস্রোতা মহানাড়ীর বিকাশ হয় তাহারও পর্য্যবসান এক মহাশূন্যে হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশে যেমন সঞ্চার নাই, তেমনি সেই মহাকাশেও সঞ্চার নাই। হৃদয়াকাশ গতাগতির অতীত নহে—কারণ বহুমুখে চলনশীল মন এখানে আসিয়া লীন হইলেও ব্যুত্থিত হইয়া আবার বহুমুখেই চলিতে থাকে। তেমনি ঐ মহাশূন্যও গতাগতির অতীত নহে, কারণ ওখানে একীভূত মন বিলীন হইলেও আবার জাগিয়া উঠিয়া এক মুখেই ধাবিত হয়। বহুমুখীগতি চিরতরে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু চিরদিন নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ হয় নাই, সেই জন্য ঐ মহাশূন্য হইতেও মনকে উঠাইয়া লইতে হয়। ইহার পর উঠিলে আর নাড়ী নাই, গতিও নাই। উহাই বাস্তবিক নিরোধ। তবে গতি না থাকিলেও ওখানেও মনের কিঞ্চিৎ স্পন্দন থাকে। উহা বিকল্পস্বরূপ, যাহাকে শাস্ত্রকারগণ মনের স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিকল্পেরও উদয়াস্ত আছে। যখন এই কম্পনের পর্য্যবসান হয় তখনই বিকল্পহীন চৈতন্য-সূর্য্যের সাক্ষাৎকার হয়। ইহা মনের অতীত ভূমি। ইহার উদয়াস্ত নাই বলিয়া ইহা নিত্য উদিত ও চির প্রকাশমান। ইহাই পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম। মন তখন ঐ প্রকাশের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া বিমর্শ রূপে অথবা চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তি-রূপে অবস্থান করে। এই স্বরূপ বিমর্শই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বাক্ অথবা শব্দব্রহ্ম স্বরূপ ওঁকার। ইহা নিষ্কল হইয়াও সর্ববিদ্যাস্বরূপ।

অতএব হৃদয় হইতে মূল মন্ত্ররূপ এই ওঁকারের উচ্চারণই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির সোপান। নিষ্কল ওঁকাররূপী জ্যোতিতে উহার এগারটি কলার প্রকাশ হয়। উচ্চারণের প্রভাবে উহার এক একটি পর-পর বিকাশ প্রাপ্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ অনুভূতির উদয় হয়। ক্রম-বিকাশের মার্গে নিম্নস্থ কলার অনুভূতি উর্দ্ধস্থ কলার অনুভূতিতে অঙ্গীভূত হয়। যোগিগণ এই এগারটি কলার অনুভব পর-পর করিয়া থাকেন। ইহাদের নাম—অ, উ, ম, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী ও সমনা। ওঁকার উচ্চারণ করিতে হইলে মন্ত্রের অবয়ব ক্রমশঃ এই এগারটি অবস্থাতে উপনীত হয়। ওঁকারের এই এগার কলার অনুভবের পরই ইহার নিষ্কল অনুভব উদিত হয়—তাহাই পরম অনুভূতি। এই উভয় অনুভূতি এক সঙ্গে অদ্বৈত পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে যে পথ গিয়াছে উহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধককে অগ্রসর হইতে হয়—প্রণবের যাবতীয় কলার ও তৎসংশ্লিষ্ট দেবতা এবং স্তর প্রভৃতির অনুভব ঐ পথেই হইয়া থাকে। মূলাধার অথবা নাভি হইতে যে গতির কথা হঠযোগাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা জাগরণের পূর্ব্বকালীন আনুষঙ্গিক ব্যাপার। মন্ত্র চেতন হইলে হৃদয়াকাশে আদিত্যবৎ তাহার উদয় লক্ষিত হয়। হৃদয়, কণ্ঠ ও তালুমূল—এই স্থানত্রয় অ, উ ও ম এই তিন কলার কেন্দ্র। তালুটি মায়া-গ্রন্থির স্থান। হৃদয় ও কণ্ঠেও দুইটি গ্রন্থি আছে। ভ্রূ-মধ্য বিন্দুগ্রন্থির স্থান—এখানে জ্যোতির দর্শন পাওয়া যায়। এই জ্যোতিটি অ, উ এবং ম এই তিনটি মাত্রার মন্থন-জনিত উহাদেরই সারভূত তেজোবিশেষ। এই তিন মাত্রাতে জগতের যাবতীয় ভেদ অন্তর্গত এবং বিন্দু উহাদের পিণ্ডাকার অভিব্যক্ত স্বরূপ। এই স্বরূপ অবিভক্ত জ্ঞানাত্মক। অ, উ এবং ম-এই তিন কলাতে সমস্ত মায়িক জগৎ অবস্থিত। স্থূল, পুর্য্যষ্টক (লিঙ্গ) ও

শূন্য অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনভাগে বিভক্ত সমগ্র দ্বৈত জগৎ ওঁকারের এই প্রথম তিন কলাতে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ইহারই একদেশ মাত্র। মায়া-গ্রন্থি ভেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়িক জগৎ ও তৎকারণ-স্বরূপিণী মায়া অতিক্রান্ত হইয়া যায়। মায়িক জগতে মন্ত্র ও দেবতা অথবা বাচক ও বাচ্যে ভেদ থাকে। এই জগতে দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রকে আপনা হইতে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে। এই ভেদ-দর্শন মায়ার কার্য্য, ইহা মায়িক স্তরের সর্ব্বত্রই উপলব্ধ হয়। বিন্দুতে এই বৈচিত্র্যের অনুগত অভেদ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অনন্ত ভেদের একীভূত ভাবের অর্থাৎ অভিব্যক্ত রূপে দর্শন। অনন্ত জ্ঞেয় পদার্থ এখানে একটি জ্ঞানের আকারে প্রতিভাসমান হয়—ইহাই জ্যোতীরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিন্দুই ঈশ্বর-তত্ত্বের অধিষ্ঠান ভূমি। ঈশ্বর যোগীশ্বর। যে সাধক বিন্দু সাক্ষাৎকার করেন তিনি এক হিসাবে নিখিল স্থূলপ্রপঞ্চেরই দর্শন করেন। বিন্দু ধ্যান করিলে যে ত্রিকালদর্শী হওয়া যায় ইহাই তাহার কারণ। ধ্যানের উৎকর্ষ বশতঃ ঈশ্বর-সাযুজ্য পর্য্যন্ত উপলব্ধ হইতে পারে। এই বিন্দুসিদ্ধিই লৌকিক দৃষ্টিতে দিব্যচক্ষু অথবা তৃতীয় নেত্রের বিকাশ বলিয়া বর্ণিত হয়।

যোগিগণ বিন্দু হইতে সমনা পর্য্যন্ত আটটি পদের সন্ধান পান। এইগুলি সবই আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রারের কর্ণিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মার্গের অন্তর্গত—এই মার্গ মায়ার অতীত হইলেও মহামায়ার সীমামধ্যে অবস্থিত। যাঁহারা অশুদ্ধ বিকল্পজালরূপী মায়িক বা ভেদময় জগৎ হইতে বিশ্রামলাভ করাকেই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করেন তাঁহারা আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া মহামায়ার রাজ্যে প্রবেশ করাকেই মুক্তিলাভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা মুক্তিপদ নহে। যদিও এখানে কর্ম্মজাল উপসংহৃত ও মায়া ক্ষীণ, তথাপি বিশুদ্ধ বিকল্প আছে। পরমপদের যাত্রীর পক্ষে তাহাও বন্ধ-স্বরূপ। মহামায়ার রাজ্য ভেদাভেদময়—অভেদ-দর্শন আছে বলিয়া ইহা উপাদেয় হইলেও চরম উপাদেয় নহে। কারণ ভেদ-দর্শন সম্যক্‌রূপে অস্তমিত না হইলে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক পদে আরূঢ় না হইতে পারিলে পূর্ণতার আস্বাদন পাওয়া যায় না।

মায়িক জগতে যেমন বিবিধ লোক আছে, মহামায়ার শুদ্ধ রাজ্যেও তেমনি অনেক ধাম আছে। প্রত্যেক স্তরে সেই স্তরের উপযোগী জীব আছে, ভোগ্য বস্তু আছে, ভোগের উপকরণ আছে। প্রত্যেক স্তরের অনুভূতি পৃথক্ পৃথক্। যতই উর্দ্ধে আরোহণ করা যায় ততই অভেদানুভব বাড়িতে থাকে, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি প্রবলতা লাভ করে, ব্যাপ্তি অধিক হইতে থাকে এবং দেশ ও কালগত পরিচ্ছেদ কমিতে থাকে।

অকারের মাত্রা এক, উকারের দুই এবং মকারের তিন, সাকল্যের ছয় মাত্রা। বিন্দু অর্দ্ধ-মাত্রা। অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতির মাত্রা ক্রমশঃ আরও কম। বিন্দু হইতে সমনা পর্য্যন্ত মাত্রাংশ যোজনা করিলে এক মাত্রা হয়।* মায়াজগতে মন্ত্রের ছয় মাত্রা হইলেও মায়াতীত পদে উহা এক মাত্রা মাত্র। ঐ এক মাত্রাও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর হইতে হইতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া কার্য্য করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিন্দুতে জ্ঞেয় ও জ্ঞান অথবা বাচ্য এবং বাচক অভিন্নরূপে জ্যোতির আকারে স্ফুরিত হয়। এই অভিন্নতা উপরে আরও পরিস্ফুট হয়। এদিকে যতই উর্দ্ধে আরোহণ করা যায় ততই জ্ঞানাত্মক জ্ঞেয়ভাব ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই তিনের মধ্যে প্রথম অবস্থায় বা মায়ার ভূমিতে পরস্পর পার্থক্য খুব স্পষ্ট অনুভূত হয়। পরে অনন্ত বিভিন্ন জ্ঞেয় রাশি এক বিশাল জ্ঞানে পিণ্ডিত হইয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশমান হয়। এক অভেদ জ্ঞান তখন থাকে, তাহার গর্ভে যাবতীয় ভেদ নিহিত থাকে। এই জ্ঞান ও প্রাথমিক জ্ঞান এক প্রকার নহে। প্রাথমিক জ্ঞান অশুদ্ধ বিকল্পরূপ ছিল, কিন্তু এই জ্ঞান বিকল্পরূপ হইলেও

---

* মাত্রাংশ এইরূপ—

বিন্দু—অর্দ্ধমাত্রা
অর্দ্ধচন্দ্র—১/৪ মাত্রা
নিরোধিকা—১/৮ "
নাদ—১/১৬ "
নাদান্ত—১/৩২ "
শক্তি—১/৬৪ "
ব্যাপিনী—১/১২৮ মাত্রা
সমনা—১/১২৮ "
সমষ্টি—১ মাত্রা।

বিশুদ্ধ। ইহার পর ক্রমশঃ এই বিশুদ্ধ বিকল্প শান্ত হইতে থাকে। মহামায়ার ঊর্দ্ধসীমা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশুদ্ধ বিকল্প একেবারে শান্ত হইয়া যায়। তথন উহা জ্ঞাতাতে অস্তমিত হয়—একমাত্র জ্ঞাতাই তথন থাকে। ইহাই শুদ্ধ আত্মার দ্রষ্টারূপে স্বরূপ-অবস্থিত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বাবস্থার জ্ঞাতা আর এখনকার জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা ঠিক এক নহে। পূর্ব্বের জ্ঞাতা বিকল্প স্পৃষ্ট ছিল, কারণ তাহার জ্ঞান হইতে বিকল্প বিদূরিত হয় নাই। কিন্তু এই জ্ঞাতা বিকল্পের অতীত। এই অবস্থায় দ্রষ্টা আত্মা সমগ্র মনোরাজ্য বা বিকল্পময় বিশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপন বোধমাত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্বাতীত আত্মা নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের প্রভাবে সমনা ভূমি লঙ্ঘন করিয়া নিজেকে নির্ম্মল ও নির্ব্বিকল্পরূপে চিনিতে পারে।

কিন্তু ইহা পূর্ণতা নহে। কারণ এই অবস্থায় বিশ্ব বা বিকল্প হইতে নিজ নির্ব্বিকল্পস্বরূপের ভেদ প্রকাশমান থাকে। ইহা অক্ষর অবস্থা বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে পূর্ণতার সঙ্কোচ রহিয়াছে। ইহার পর পরাশক্তি বা উন্মনা শক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ করে। তথন বিকল্প ও নির্ব্বিকল্পের ভেদও তিরোহিত হইয়া যায়। পূর্ণ ব্রহ্ম সেই জন্য নির্ব্বিকল্প হইয়াও বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বময়। উহা যুগপৎ নিরাকার ও সাকার এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্ত আকারময়। তথন বুঝা যায় এক পূর্ণই স্ব-স্বাতন্ত্র্য বলে বা আপন স্বরূপ-মহিমায় আপন নিরঞ্জন স্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসমান হয়।

প্রাণের সূক্ষ্ম কলার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কলার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, লোক ও পদার্থরাশি ফুটিয়া উঠে ও অনুভূতিগোচর হয়। ক্রমে নিম্নকলার অনুভূতি ঊর্দ্ধকলার অনুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সুতরাং বিকল্প ভূমির যাহা অন্তিম অনুভূতি তাহা অবশ্যই জাগতিক অনুভূতির চরম—সেই অনুভূতিতে অধস্তন সকল স্তরের অনুভূতিই অঙ্গীভূতরূপে বর্ত্তমান থাকে। কাজেই মহামায়া স্তরে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐ স্তরের উপযোগী সকল গুণের বিকাশই থাকে। ইহাই দ্রষ্টা আত্মার ভিন্নাভিন্ন ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন। পূর্ণ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পূর্ব্বে ইহা অবশ্যই উদিত হয়।

৫

কিন্তু ইহাও সর্ব্বাত্মভাব নহে। কারণ এই অবস্থায় আত্মা বিশুদ্ধ বা অনাত্মবিবিক্ত নহে এবং বিশ্বকে অভিন্নরূপে দর্শন করে না। এই বিশ্বদর্শন শুদ্ধ বিকল্পময়—সুতরাং মনোময়, ইহা মহামায়ার বিলাস মাত্র। বস্তুতঃ ইহাও অনাত্মবস্তু। নির্ব্বিকল্পবোধের দ্বারা ইহার পরিহার হইলে আত্মার শুদ্ধতা ও কেবলত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—তথন বিশ্বদর্শন থাকে না। তারপর স্বরূপভূতা চিদানন্দময়ী পরাশক্তির অনুগ্রহে—যে শক্তি স্বাতন্ত্র্যরূপে সদাকাল ভগবানের স্বরূপের অবিনাভূত—আত্মা ভগবানের সহিত নিজের একাত্মতা বুঝিতে পারিলে যে নিত্য দর্শন লাভ করে তাহা আত্মার স্বরূপেরই দর্শন, অনাত্মদর্শন বা ভেদদর্শন নহে। কারণ তথন আত্মা বিশ্বাতীত হইয়া স্বরূপ শক্তির উল্লাসে বিশ্বকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিকাশরূপে দর্শন করে। ইহা ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থায় যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি নিত্য ষড়্‌গুণের অভিব্যক্তি হয় তাহা মহামায়া স্তরের সর্বজ্ঞত্বাদি হইতে পৃথক, কারণ ইহা অভেদমূলক।

আমরা একাক্ষর ব্রহ্মের বা মূলমন্ত্রের ঊর্দ্ধপ্রবাহে বিন্দু অবস্থার আভাস কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। ভ্রূ-মধ্যস্থ বিন্দু-গ্রন্থি ভেদ করিয়া ঐ প্রবাহ অর্দ্ধচন্দ্র ও নিরোধিকাতে গমন করে। বিন্দু ভেদ হইলেই এক হিসাবে ভেদময় সংসার উল্লঙ্ঘিত হয় বলা চলে। বিন্দু ভেদ করিতে পারিলেই সাধক স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক প্রসিদ্ধ দেহ। সূক্ষ্মদেহ দুই প্রকার। একটি পুর্য্যষ্টক স্বরূপ—ইহা পঞ্চ তন্মাত্রা এবং মনঃ বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট অবয়ব বিশিষ্ট। (২) পুর্য্যষ্টক ছাড়াও আর একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে। তাহাকে শূন্যদেহ বলে। তাহা নিরবয়ব। বিন্দু অতিক্রান্ত হইলেই জীব এই তিন প্রকার দেহের অতীত

(২) সাংখ্য মতে লিঙ্গশরীরে সতের অথবা আঠার অবয়ব স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ ইহার সহিত তাহার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কারণ এই আটটি অবয়বের সহিত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিলেই অষ্টাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে। সুরেশ্বরাচার্য্যের মতে পুর্য্যষ্টকের অবয়ব ৮টী পুরী এই :—জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমষ্টি, কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমষ্টি, প্রাণ-সমষ্টি, অন্তঃকরণ-সমষ্টি, ভূত-সমষ্টি, অবিদ্যা (বাসনা), কাম ও কর্ম্ম। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে প্রাণ স্থূল দেহ, পুর্য্যষ্টক এবং শূন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

হইয়া যায়। সুতরাং বিন্দু লঙ্ঘন করা এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি ভেদময় অবস্থা ছাড়াইয়া যাওয়া একই কথা। বিন্দু ঈশ্বরবাচক ও স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ। ইহার উপরে ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ও তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে নিরোধিকার স্থান। শ্রেষ্ঠ যোগী ভিন্ন অন্য সাধকের উর্দ্ধগতি রোধ করে বলিয়া ওঁকারের এই কলাকে আচার্য্যগণ নিরোধিকা বলিয়া বর্ণনা করেন। অর্দ্ধচন্দ্র ভেদ করিয়া ইহাকেও ভেদ করিতে হয়। এক বিন্দু-জ্যোতিই ঐ দুই স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিন্দুতে জ্ঞেয়ের প্রাধান্য থাকে, তবে এই জ্ঞেয় অভিব্যক্ত একাকার জ্যোতি মাত্র। অর্দ্ধচন্দ্রে জ্ঞেয়ের প্রাধান্য কতকটা কমিয়া যায় এবং নিরোধিকাতে উহা মোটেই থাকে না। সেইজন্য নিরোধিকা কলা উর্দ্ধমুখ স্পষ্ট রেখারূপে অভিব্যক্ত হয়। বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিরোধিকা—ইহাদের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি কলা আছে। সুতরাং বিন্দুজ্যোতিতে পনেরটি কলা ভাসিতেছে। এই বিন্দু আবরণই প্রথম আবরণ—ইহার মধ্যে শান্ত্যতীত ভুবন, অর্দ্ধচন্দ্র ভুবন ও নিরোধিকা ভুবন নামে পরিচিত তিনটি ভুবন রহিয়াছে। ইহার পর মন্ত্রস্রোত ব্রহ্মরন্ধ্র ও শক্তিস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহা প্রথমে নাদ ও নাদান্ত ভূমি আশ্রয় করে। ললাট হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত এই ভূমি বিস্তৃত। বিন্দুতত্ত্বে যে জ্ঞেয়-প্রাধান্যের পরিচয় পাই তাহা ক্রমশঃ নিরোধিকাতে শান্ত হইয়া যায়। তাই এখানে সমস্ত বাচকের অভিন্নতার অনুভূতি প্রধানভাবে হইয়া থাকে। বিন্দুতে বাচ্য ও বাচকের ভিন্নতা তিরোহিত হয়; কিন্তু বিভিন্ন বাচকের পরস্পর ভিন্নতা তিরোহিত হয় না। নাদ ও নাদান্তে তাহাও তিরোহিত হয়। এই ভূমিতে সমস্ত বাচকের অভেদ বিমর্শপ্রধান ভাবে থাকে। পাঁচটি ভুবন নাদ-আবরণের অন্তর্গত এবং নাদান্তের ভুবন-সংখ্যা মাত্র একটি। নাদান্তে যে ভুবনটি আছে তাহা সুষুম্না নাড়ীর অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। এই নাদ ও নাদান্ত ভূমির সাধারণ অধিষ্ঠাতা—সদাশিব। ইনি স্ববাচক নাদ হইতে অভিন্ন ও শব্দাত্মক। নাদান্ত স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র—এখানে নাদের বিশ্রাম হয়। ইহা দেহের উর্দ্ধকপাট-ছিদ্র। ইহা ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। মূর্দ্ধার মধ্যদেশ শক্তিস্থান। এখানে শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণাপানের মিলন বশতঃ একটা অনির্ব্বচনীয় স্পর্শময় তীব্র আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। সুষুম্নার ক্রিয়া ভিন্ন অন্য ক্রিয়া এখানে থাকে না। শব্দবৃত্তি এখানে শান্ত হইয়া আনন্দস্পর্শরূপে পরিণত হয়। এখানে আসিলে সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ভেদ থাকে না—নিত্যসৃষ্টি মাত্র থাকে, দিন ও রাত্রি একাকার হইয়া দিনমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। স্থূল প্রাণের সঞ্চরণ হৃদয় হইতে এই পর্য্যন্তই হইতে পারে। শক্তির আবরণে সূক্ষ্মাদি শক্তি চতুষ্টয় যুক্ত পরাশক্তির একটি ভুবন আছে। অতি দুর্ভেদ্য এই শক্তিকলা ভেদ করিয়া উর্দ্ধপ্রবেশযোগে ব্যাপিনীকলা বা মহাশূন্যে প্রবেশ করিতে হয়। মহাশূন্যে প্রাণের সঞ্চরণ নাই, সুষুম্নার ক্রিয়াও অস্তমিত, নিত্যসৃষ্টি সেখানে তিরোহিত এবং পূর্ব্ববর্ণিত নিরবচ্ছিন্ন মহাদিনের আভাসও সেখানে পাওয়া যায় না। কলনাত্মক কাল সেখানে সাম্যরূপে অবস্থিত। এই মহাশূন্য শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নবর্ত্তী সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক ও ধারক। ব্যাপিনীতে পাঁচ কলার পাঁচটি ভুবন আছে। "দিব্যকরণ" ধারারূপ উপায় বিশেষের আশ্রয় না করিলে ব্যাপিনীকে ভেদ করা ও পরাগতি লাভ করা অসম্ভব। ব্যাপিনীর পরেই সমনা বা মহাসমনার বিকাশ অনুভব করা যায়। ইহার অধিষ্ঠাতা পঞ্চকৃত্যকারী শিব। মহামায়া মন, বিকল্প অথবা ইচ্ছাশক্তি নামে বিখ্যাত। মহামায়া অবস্থায় যে মননাত্মক বোধটি অবস্থিত থাকে তাহাতে স্পর্শ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই থাকে না। কারণ ঐ সকল পূর্ব্বেই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। উহা মন্তব্যহীন মনন। তাই উহা বস্তুতঃ নির্ব্বিকল্প বোধ-স্বরূপ।

মনঃ অথবা মহামায়ার স্বরূপভূত এই মননকেও ত্যাগ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই মনের ত্যাগও মনের দ্বারাই সম্ভবপর। অবিকল্প মনের দ্বারা অবিকল্প শুদ্ধ মনকে পরিহার করিতে হয়। শুদ্ধ মন একাগ্রতার প্রকর্ষ লাভ করিলে আপনিই অব্যক্ত হইয়া যায়। ইহাকেই মনের ত্যাগ বলে। আত্মা বা জীব কর্ত্তৃক স্বকীয় সঙ্কোচাত্মক জ্ঞানের প্রশমন এবং প্রকৃত মনোনিরোধ একই ব্যাপার। এই সঙ্কোচাত্মক স্বকীয় জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞেয়াভাসের ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই ইচ্ছা পরিত্যক্ত হইলেই আত্মা শুদ্ধ জ্ঞাতৃমাত্ররূপে, সত্তামাত্র স্বরূপে বা চিন্মাত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বিশুদ্ধ কৈবল্য—দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থিতিরূপ অবস্থা। এই অবস্থায় আত্মার আপন জ্ঞান-ক্রিয়া বা চৈতন্য উন্মুক্ত হয়। সকল প্রকার বন্ধন কাটিয়া যাওয়ার জন্য এই অবস্থাকে মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করা

হইয়া থাকে। ইহা মনের অতীত মননহীন বা ইচ্ছাহীন বিশুদ্ধ অবস্থা। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাও পরমপদ নহে ও গীতোক্ত ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য নহে। পূর্ণাহন্তা ও চিদানন্দরসঘন স্বাতন্ত্র্যময় রূপ ইহার নাই। সুতরাং আত্মা বিশ্বোত্তীর্ণ (Transcendent) হইয়া স্বচ্ছ ও চিদ্রূপ হইলেও পূর্ণ হয় না। তাই উহা মুক্ত হইলেও ভগবদ্ধর্ম্মে বঞ্চিত থাকে। এইখানে ভগবানের স্বাতন্ত্র্যময়ী নিত্যসমবেতা স্বরূপশক্তির বা উন্মনা শক্তির উল্লাসরূপিণী পরাভক্তির আবশ্যকতা আছে। ভগবান্ গীতাতে (৮।১০) "ভক্ত্যা যুক্তঃ" এই বাক্যাংশে পরা-ভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। (৩)

উন্মনা শক্তি যুগপৎ অশেষ বিশ্বের অভেদ দর্শনরূপে স্ফুরিত হয়। আত্মা ঐ শক্তির আশ্রিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা বা পূর্ণত্ব লাভ করে। তখন আর চলন থাকে না, সঙ্কোচ একেবারে কাটিয়া যায়, আত্মা ব্যাপকতা লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বরূপে এবং তদুত্তীর্ণরূপে একসঙ্গেই প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ আত্মা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় নির্বিকল্প পদে স্থিতি লাভ করে। পরে ভগবানের পরমা শক্তির অনুগ্রহে নিজের পূর্ণত্ব উপলব্ধি করে —ভগবদভিন্ন বলিয়া নিজেকে অনুভব করে। তখন বুঝিতে পারে ঐ পূর্ণ সামরস্যময় স্বরূপে একদিকে যেমন অনন্ত শক্তির সামরস্য, অপর দিকে তেমনি শক্তি ও শক্তিমানেরও সামরস্য। উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, এক অখণ্ড বোধ বা প্রকাশরূপেই স্ফুরিত হয়—বন্ধন-মোক্ষের ভেদ, সবিকল্পক ও নির্বিকল্পের ভেদ, মনঃ ও আত্মার ভেদ, দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ চিরতরে বিগলিত হইয়া যায়। উহাই পুরুষোত্তম স্বরূপ বা ভগবৎ-স্বরূপ অথবা অব্যক্ত। ঐ অবস্থাতীত অবস্থা উপলব্ধি করাই পরাগতি।

গীতাতে আছে (৮।২২)—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥

পরম পুরুষই যে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক, তাঁহার অন্তরেই যে সর্বভূত (বিশ্ব) স্থিত রহিয়াছে, তাহা এখানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্যা ভক্তি ভিন্ন তাঁহার এই স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। (৪) এই বিশ্বরূপই যে তাঁহার "পরমরূপ" তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্পষ্ট বুঝাইয়া-ছেন (গীতা ১১.৪৭)। (৫) ইহা "তেজোময়"—শুদ্ধ চিন্ময়-রূপ। "বেত্তা" ও "বেদ্য"—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—ইহার অন্তর্গত (গীতা ১১।৩৮)—ইহাই গীতোক্ত "পরম ধাম" (গীতা ১১।৩৮) বা বিষ্ণুর পরম পদ।

(৩) কারণ অন্যত্র ভগবান্ পরাভক্তিকে ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মক রাগদ্বেষ প্রভৃতির অতীত অবস্থার পরবর্ত্তী এবং ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান ও তাদাত্ম্য (প্রবেশ) লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) বিশ্বরূপদর্শন যে "অনন্যভক্তি" ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় না তাহা অন্যত্রও বলা হইয়াছে (গীতা ১১, ৫৪)—
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

(৫) রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ"।

দুঃখ-ব্যথা কুসুম হ'য়ে—

শ্রীলতিকা ঘোষ

দুঃখ-ব্যথা কুসুম হ'য়ে
ফুট্‌ক্ মম অন্তরে—
সকলি যে গো তোমার বরাভয়!

বেদনা-ক্লেশ—দুঃখ-গ্লানি
পথ চলার ছন্দ রে—
কাহার কাছে না মানি পরাজয়!

আঘাতে তব ধন্য হ'ব
জপিব মধু মন্ত্ররে—
বিপদে যেন না করি কভু ভয়।

নিবিড়ভাবে তোমারে প্রিয়
পূজিব হিয়া কন্দরে—
সকল দুঃখে করিব আমি জয়।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষ

বসন্তের জাগরণ

ভারতবর্ষ

লঙ্কাচরের মাঠ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

হাড়েমাসে মিলিয়া দোহারা লম্বা দেহ। প্রশস্ত বুকের ছাতি ও লোহার মতই শক্ত কঠিন হাতের কব্জি। মাথাভর্ত্তি একরাশ কোঁকড়ানো চুলের গোছা কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। একখানা লাঠির সাহায্যে দু-এক শ লোকের মহড়া লইবার শক্তি সে রাখে। লাঠিখেলায় বিশখানা গ্রামের ওস্তাদ, তাই সে অঞ্চলের সকলেই তাহাকে সর্দ্দার বলিয়া ডাকিত।

সর্দ্দার হইলেও কালুর অন্তঃকরণটা ছিল শিশুর মত স্বচ্ছ ও কোমল। বাব্‌রি চুল উড়াইয়া সে যখন সর্দ্দারী মেজাজে হাঁক ছাড়িতে ছাড়িতে আগাইয়া চলে, তখন কে বলিবে যে ঐ পাথরের মত শক্ত দেহটির ভিতরে ভিতরে সঙ্গোপনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্নেহের উৎস লুকাইয়া আছে। প্রত্যক্ষভাবে তখন মানুষ টের পায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত কালু সর্দ্দার বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর উঠানে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়ে—আর পঙ্গপালের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কেহ তাহার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কেহ বা পিঠে, কেহ বা বাব্‌রি চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে আদর করিতে সুরু করিয়া দেয়। কালুর স্নেহশীলতা তখন উপ্‌চাইয়া পড়ে ওই কচি কচি নিষ্কলঙ্ক অবোধ শিশুগুলির উপর। লোক তখন চিনিতে পারে পাড়ার ছেলে মেয়েদের এই খেলার সাথীটির ভিতরের মানুষটিকে।

সংসারটি অতি ক্ষুদ্র। একমাত্র বিধবা ভগ্নী ও ছোট্ট ছেলেটি। আর আপন বলিতে সংসারে তাহার কোথাও কেহ নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বেও সংসারের এমন শ্রী তাহার ছিল না। দেহ ও মন ঢালিয়া দিয়া যাহাকে একান্ত ভালবাসিয়াছিল সেই স্ত্রী অকস্মাৎ মারা গিয়া কালুকে দিশেহারা করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ভগবান সুখী হইলেন না। মাতৃহারা শিশুটিকে যাহার হেপাজতে রাখিয়া কালু নিশ্চিন্তে চলাফেরা করিত সেবার মহামারীর এক দম্‌কা হাওয়ায় সেই একমাত্র ভগ্নীটির জীবনপ্রদীপও নিভিয়া গেল। সেইদিন হইতে ক্ষুদ্র শিশুপুত্র হারাধনকে ছাড়িয়া সর্দ্দার এক পা-ও নড়িতে পারে না। অষ্টপ্রহর তাহাকে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে হয়।

ছোট্ট দুইটি কচি বাহু বাড়াইয়া দিয়া কালাচাঁদের গলাটি জড়াইয়া হারু ডাকে—বাব্—বা—বা! কম্পিত আগ্রহে শিশুর শুভ্র গণ্ড অশ্রান্ত চুম্বনে রাঙাইয়া দিয়া সর্দ্দার তাহার উত্তর দেয়—বাব্—বা—। ছোট্ট ছেলেটিকে সম্মুখে বসাইয়া একটা রবারের বল গড়াইয়া দিয়া ছেলেকে লইয়া সর্দ্দার খেলা করে। বলের মৃদু আঘাতে হারু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। নাচিয়া নাচিয়া ছোট্ট দুইটি কচি হাতে শব্দহীন হাততালি দেয়।

এমনি করিয়াই ঐ মা-মরা ছেলেটি পিতার স্নেহ-কোমল পক্ষপুটে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কালু ভুলিয়া গেল তাহার জীবনের নিঃসঙ্গতা ও বিগত দিনের স্তূপীকৃত ব্যথা।

ছোট্ট ছেলেকে ঘরে রাখিয়া আগের মত দেশবিদেশে গিয়া আর রোজগারের সুবিধা নাই, তাই সর্দ্দার নিকটেই নড়াইলের জমিদার বাড়ীতে চাকুরী লইল। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহার কার্য্যের তৎপরতা ও বিশ্বস্ততা বড়বাবুর দৃষ্টি এমন আকর্ষণ করিল যে, নিম্নতম সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে কালুই হইয়া উঠিল সবচেয়ে প্রিয় বরকন্দাজ। ব্যাঙ্কে যাইতে কালু, সদর খাজনা দিয়া আসিতে কালু, চেক্ ভাঙাইতে কালু। কালু সর্দ্দার না হইলে যেন বড়বাবুর কোন কাজই হয় না।

সেবার লাটের খাজনা সদরে পৌছাইয়া দিতে হইবে।

বড়বাবু ডাকিলেন, কালু!

তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া হারুর হাত ধরিয়া গিয়া কালু সেলাম ঠুকিয়া বলিল—হুজুর!

বড়বাবু বলিলেন, আগামী কাল লাটের খাজনা দেবার শেষ দিন। তোমার আজকেই যশোর যেতে হবে। শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও গে।

ছোট্ট ছেলে হারাধনকে কাঁধের উপর তুলিয়া সর্দ্দার

বলিল, কালুর আর তৈরি হওয়া কি কর্ত্তা? সে—অষ্ট-প্রহর তৈরি হয়েই থাকে! তবে অসুবিধা যা-একটু এই ছেলেটাকে নিয়ে।

সর্দ্দারের কথায় জমিদার একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু কালু, তোমাকে ছাড়া এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নির্ভর করা চলে তেমন আর একজনও কর্ম্মচারীদের মধ্যে আছে ব'লে আমার জানা নেই। তা ছাড়া, এত সময়ও এখন আর নেই যে ভেবে চিন্তে কাউকে পাঠাব।

বলিতে বলিতে আল্‌মারি খুলিয়া জমিদার টাকার তোড়া ও কাগজ-পত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। সদরে গিয়া কাহার নিকটে কি কাজ করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া দেরাজ টানিয়া বড়বাবু আরও পাঁচটা টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও, তোমার হারুকে পোষাক আর খাবার কিনে দিও।

হারুকে কোলে করিয়া লাঠি হস্তে কালু জমিদারের আদেশ পালন করিতে সদলবলে বাহির হইয়া পড়িল। ছেলেকে লইয়া সে গ্রামের একটি দূরসম্পর্কের আত্মীয়ার কাছে রাখিবার জন্য গেল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যতবার সে ছেলেটিকে আত্মীয়ার কোলে তুলিয়া দেয় ততবারই হারু তাহার দুটি কোমল বাহু দিয়া পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ওঠে। ও যে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র এগার দিন পরেই মায়ের সহিত স্নেহের সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বাপের কোলেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। ত আর কাহারও কোলে যাইতে চাহে না।

সহসা সাথীরা তাহার বলিয়া উঠিল, বেলা যে গেল সর্দ্দার, এতটা পথ কখন যাবে?

আকাশের দিকে একবার চাহিয়া কালু দ্রুত কঠিন হস্তে হারুকে নিজের বক্ষ হইতে নামাইয়া আত্মীয়ার কোলে তুলিয়া দিল। যেমন দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের কান্না দেখিয়া কালু বুঝিল যে তাহাকে রাখিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বিলম্ব করিলে হয়ত মাঠের সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার ধরিতে পারা যাইবে না। অথচ খাজনা দিবার কালই শেষ দিন। কালু নিতান্তই নিরুপায় হইয়া এই দূরের পথেও তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের আশা ভরসা একমাত্র পুত্রটিকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইল।

বর্ষাকাল। গ্রামের সংকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত পথ পার হইলেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। মাঠের উপর দিয়া সুদীর্ঘ একটি পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ষ্টীমারঘাটে। হারুকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কালু চলিয়াছে লাটের খাজনা পৌছাইয়া দিতে, সঙ্গে দুই জন লাঠিয়াল ও আরও একজন বন্দুকধারী সিপাই।

দেখিতে দেখিতে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া পৌছিল। অদূরেই প্লাবিত ভৈরব নদের উচ্ছ্বলিত বন্যার ঘোলা জলে চতুর্দ্দিক থৈ থৈ করিতেছে। মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত ধান্যের কচি কচি সবুজপাতার উপর অস্তমান সূর্য্যের রশ্মি ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

প্লাবিত মাঠের এক-তৃতীয়াংশ পথ তাহারা প্রায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এমন সময় নদীর অনতিদূরের এই সুবিস্তৃত জনমানবহীন প্রান্তরটিকে সন্ধ্যা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়া একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলিল। মাঠটা নিরাপদ নহে। আশেপাশে প্রায়ই খুন জখম লাগিয়াই আছে। কিন্তু এই স্থানটা ফাঁকা, কোথাও বন জঙ্গল নাই যে দুর্ব্বৃত্তেরা অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে।

ক্রমশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কালুরও ছোট্ট দলটি তখন নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। স্টেশনে পৌছিতে পারিলেই তাহারা এখন বাঁচে!

হঠাৎ অনন্তগ্রাসী অন্ধকারের গর্ভ হইতে মোটরের হেড-লাইটের মতন একটা তীব্র আলোর জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া এক একবার পথের মলিনতা নাশ করিয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার তাহাকে গাঢ়তর অন্ধকারে ডুবাইয়া ফেলে! মাঝে মাঝে দূরে ঝুপ-ঝাপ বৈঠার শব্দ ফাঁকা মাঠের মৃদু জলো-হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। তারপরে ক্রমশই অতি নিকটে কল্‌কল্ হল্‌হল্ নৌকার দুধারে ঢেউ ভাঙার শব্দ। সহসা যোজনব্যাপী নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া লক্ষাচর মাঠের বুকখানা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এক উৎকট বীভৎস চীৎকারে। আর সঙ্গে স নৌকা হইতে কতকগুলি লোক চক্ষের পলকে লাফাইয়া

পাড়ে আসিয়া পড়িল। দস্যুরা কালুর সম্মুখে বন্দুকধারী রক্ষীটির হাত হইতে বন্দুকটী ছিনাইয়া লইতেই—কালু আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কালুসর্দ্দার ঘাবড়াইবার মত মানুষ নহে। সে তখন দ্রুতহস্তে মাথার পাগড়ী খুলিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় ছেলেটিকে পিঠের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। এদিকে জমিদারের অপর লাঠিয়াল দুইজন—যদিও নামেই মাত্র লাঠিয়াল, তবু তাহারা আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টা করিতে কসুর করিল না। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর লাঠির কঠিন আঘাতে দুইজনই আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। অস্ত্রহীন হিন্দুস্থানী সিপাইটি প্রাণের ভয়ে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

এইবার দস্যুদল তাহাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়া কালু সর্দ্দারকে আক্রমণ করিল। কিন্তু পাঁচ-দশজন লোকের মুষ্টিমেয় শক্তিকে ভয় করিবার মত মানুষ সে নয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহার ওস্তাদের নাম স্মরণ করিয়া বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িল দুর্ব্বৃত্তদের উপর। সর্দ্দারের লাঠির সম্মুখে লড়িবার শক্তি ডাকাতদের মধ্যে একজনেরও ছিল না। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ লাঠির এক একটি আঘাতে—কেহ বন্যার অথৈ জলে আহত হইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল, কেহ-বা রাস্তার উপরেই ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তস্রোতের মাঝে মৃত্যু যন্ত্রণার করুণ আর্ত্তনাদে নৈশ আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিল! বাতাস ভারী হইয়া উঠিল মুমূর্ষুর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে, অন্ধকার হইয়া উঠিল আরও ভয়ঙ্কর।

লাঠির সুকৌশল প্যাঁচে ডাকাতের কবল হইতে কালু ক্ষত দেহে জমিদারের টাকার থলিটা বাঁচাইল বটে; কিন্তু অচিন্তিত দুর্দ্দৈবের হাত হইতে তাহার একমাত্র নয়নের মণি হারাধনকে বাঁচাইতে পারিল না। কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ সড়কির ফলা আসিয়া কচি দেহটি বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—একটা ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে পড়িয়া তাহার সেদিকে হয়ত খেয়ালই ছিল না। একবার মাত্র 'বাবা' বলিয়াই হারাধন পিতার পৃষ্ঠদেশে নেতাইয়া পড়িল। তাজা গরম রক্তের প্রবল ধারায় কালুর কাপড়খানা রাঙাইয়া উঠিল।

কালুসর্দ্দার অপলক চোখে মৃত পুত্রের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। চোখ তাহার শুষ্ক, মুখে একটা গম্ভীর ভাব—অতলস্পর্শ সীমাহীন সমুদ্রে ঝড়ের পূর্ব্বকার স্তব্ধ ভাবেরই মতন বুঝি তাহা ভয়ঙ্কর!

কিছু সময় এইভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর কালু তাহার সঙ্গীদের নাম ধরিয়া ডাকিল। কিন্তু সেই ডাক মাঠের বুকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া অতল অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। সাড়া আর আসিল না। তার পর পুত্রের শিথিল শীতল মৃত-দেহটি বুকের উপর তুলিয়া লইয়া একাকীই আগাইয়া চলিল।

একে অন্ধকার আকাশ। তাহার উপর হঠাৎ অধিকতর পুরু আর একটা বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের কালো আবরণ পড়িয়া নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর তথায় ভাদ্রের সীমাহারা কূলপ্লাবী অগাধ জলরাশি ভৈরবের বক্ষ মথিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আবর্ত্তের পর আবর্ত্তের প্রতিঘাতে তাহার উপকূলবর্ত্তী এই পথটিও বিধ্বস্ত। হৃদয়ের তীব্র বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া কালু যখন পুত্রের দাহকার্য্য সমাধা করিল, সুদূর হইতে একটা বাজপক্ষীর উচ্চকণ্ঠ জানাইয়া দিল—রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর।

ষ্টীমার স্টেশন। যাত্রীপূর্ণ ষ্টীমার ততক্ষণ স্রোতের অনুকূলে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পরের ষ্টীমারটা কাল সেই সকাল ছ'টায়! অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়া দিয়াছে অথচ নিকটে কোথায়ও থাকিবার মতন তেমন সুবিধাও তাহার নাই যে রাত্রিটা সেখানে কাটাইয়া দেয়। সর্দ্দার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল!

সহসা খানিকটা দূরে পথের সংলগ্ন একটা বাড়ীতে আলোর ক্ষীণরশ্মি দেখিয়া কালু সেদিকেই আগাইয়া চলিল। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, তাহার মধ্যে মিট মিট করিয়া একটা তেলের বাতি জ্বলিতেছে, মনে হয় যেন লোকও সেখানে আছে। আস্তে আস্তে সে ডাকিল—ঘরে কেউ আছ?

প্রথম দু-এক ডাকে তো সাড়াই মিলিল না। পরে একটু রুক্ষ কণ্ঠে উত্তর আসিল, এত রাত্রে এই ভরা গাঙে আর পাড়ি ধরি না।

কালু বুঝিল—বাড়ীর মালিক ঐ ঘাটেরই একজন পাটনী।

—পারে যেতে চাই না, একটু আশ্রয় চাই। নড়াইল

জমিদারবাবুদের আমি বরকন্দাজ, সকালের ষ্টীমারে যশোর যাব।

বাবুদের নামে এত রাত্রিতেও সে ওখানে একটু আশ্রয় পাইল।

পরের দিন প্রাতেই জমিদারের কানে এই দুর্ঘটনা উঠিল পলায়িত হিন্দুস্থানী দরওয়ানটির মুখে। টাকার ও কালুর দুশ্চিন্তায় বাবুরা উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে থানায় রিপোর্ট গেল, জরুরী টেলিগ্রাম পৌছিল সদরে কালেক্টর সাহেবের কাছে। ঘণ্টাকয়েক পরে তারের উত্তর আসিল, কালুসর্দ্দারের মারফৎ জমিদারের মালগুজারি—সরকারী মালখানায় যথাসময়ে নিয়মিতভাবে জমা হইয়া গিয়াছে। সংবাদটি পাইয়া জমিদার দুশ্চিন্তার হাত হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

দিনের পর রাত আসে আবার দিন হয়, কিন্তু কালু আর ফিরিয়া আসে না। সংবাদপত্র ও লোকের সাহায্যে জমিদারের অক্লান্ত চেষ্টা চলিল তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল!

তাহার পর কত শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের মধ্য দিয়া মাস, মাসের পর বৎসরও ঢলিয়া পড়িয়াছে কালের কোলে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত জমিদার নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কালুর আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না!

তিন বছর পরের কথা। ভৈরব নদের সেই ছোট্ট জাহাজ ঘাটটির পাড়ে এক শীতের রাত্রে অবতরণ করিল অজয় ও মেনকা। কোলে তাহাদের দুই বৎসরের শিশুপুত্র।

অজয় এই অঞ্চলেরই লোক। পাঁচ বছর পরে সে কর্ম্মস্থল হইতে দেশে ফিরিতেছে—বাড়ী তাহার লঙ্কাচর মাঠের ওপারে।

ঘাটের উপরেই একটা বুড়া অশ্বত্থ গাছ। নিম্নে তাহার দুই-তিনটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুণ্ড। কতকগুলি লোক তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া হাসি গল্পে সময় কাটাইতেছে। অদূরেই যে সব ছোট ছোট অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর দেখা যায়, বোধ করি ঐগুলি গাড়োয়ানদেরই বস্তি।

গ্রামে পৌছিতে অন্য কোনরূপ যান-বাহনাদির ব্যবস্থা সেখানে নাই। তাই গরুর গাড়ীর আড্ডায় গিয়া অজয় গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিলে কোন গাড়োয়ানই সম্মত হইল না। সকলেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল—না কত্তা, গায়ে আমাদের অতো তাকত নেই। যে ডাকাতের মাঠ সে, দিনের বেলায়ই যেতে গা কেঁপে ওঠে, আর এখন ত রাত!

মেনকা বলিল—কি করবে এখন, আমার যে বড্ড ভয় করছে।

অজয় একটু হাসিয়া বলিল, ডাকাতি—হেঃ হেঃ! যত সব বাজে কথা। রাত্রিতেই যাব। নইলে এখানে থাক্‌বে কোথায়? তা ছাড়া, এই কন্‌কনে শীত, খোলা মাঠে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছেলেটা যে বাঁচবে না! দেখছ না, এরই মধ্যে ও তোমার কোলে কাঁপ্‌তে সুরু করেছে।

অতীত পাঁচ বছর এ অঞ্চলের খবর অজয় রাখিত না। নিকটেই যে সামান্য দু-চার ঘর পরিবার লইয়া একটা বিরল বসতি আছে তাহাতে বাস করে দুলে ও বাগ্দীশ্রেণীর ছোট জাত। একে তাহাদের শিক্ষার অভাব—তাহার উপর দারিদ্র্যের কশাঘাতই ইহাদিগকে হীন চৌর্য্যবৃত্তি, সুযোগ পাইলে ধনরত্নের বিনিময়ে মানুষের জীবনকেও বিপদাপন্ন করিয়া তুলিতে শিখাইয়াছে। পথিকের ধনসামগ্রী লুণ্ঠন, কখনও বা বাধাদানে নিহত করা—এরূপ সংবাদ গল্পেরই মত সে যখন চাকুরীর পূর্ব্বে গ্রামের বাড়ীতে থাকিত তখন লোকের মুখে শুনিয়াছে। তাই মনে হয় না যে সেখানে কোথাও থাকা আজ তাহাদের পক্ষে নিরাপদ।

অনেক বলিয়া কহিয়া বক্‌শিসের লোভ দেখাইয়া শেষ পর্য্যন্ত অজয় একজন কমবয়সী বলিষ্ঠ গাড়োয়ানকে সম্মত করাইল। বিদেশী এই গাড়োয়ানের গায়ে শক্তি আছে এবং সাহসও আছে প্রচুর, সর্ব্বোপরি বক্‌শিসের লোভে কাহারও বাধা না মানিয়াই সে রাজি হইয়া গেল।

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। কিছুদূর যাইতেই মেনকা বলিল—ঐ ঘণ্টাগুলো খুলে ফেল্‌তে হ'বে। কে জানে ওর শব্দ শুনে হয়ত ডাকাতেরা দূর থেকেও আমাদের সন্ধান পেতে পারে।

চাঁদের আলোয় অলস মন্থরগতিতে গরুর গাড়ী লোকালয় ছাড়িয়া যে বিস্তৃত মাঠটায় আসিয়া পড়িল—সেইটাই লঙ্কাচরের মাঠ! .

দিক-প্রসারিত ফাঁকা মাঠ। পথের বর্ত্তমান বিপদের

সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও অন্যান্য লোকের মুখে ডাকাতির কথা শুনিয়া পথিক ও চালক একটু ভয়ে ভয়েই চলিয়াছে। সুউচ্চ পথের নিম্নে দুই ধারে কলাই ও যবের ক্ষেত। হিমের ভারে উন্নত গাছগুলি নববধূর মত ঘোম্‌টা টানিয়া লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আনত শীর্ষ-গুলির ডগায় শিশিরের ফোঁটা ফোঁটা জল চন্দ্রালোকে মনে হয় যেন মুক্তার নোলকের মতন দুলিতেছে। কদাচিৎ শস্যপূর্ণ সমতল প্রান্তরের মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আহার সন্ধানে মত্ত একাধিক বন্য বরাহের বিকট গোঙানি, কখনও বা শূন্যে নিশাচর পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ও ডানার ঝটপট্ শব্দ শুনিয়াই অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তাহাদের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে।

আরও কিছুদূর এইভাবে চলিবার পর শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদের আলো ম্লান করিয়া দিয়া অন্ধকার মাঠের বুকে নামিয়া আসিল।

অজয় গাড়ীর ভিতর বসিয়া বসিয়া তরল অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিজের ও মেনকার বুকের ভারটাকে কিঞ্চিৎ লঘু করিবার জন্যই তাহার সহিত নানারূপ হাসি তামাসা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অজয়ের হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মেনকাও সেইদিকে তাকাইয়া বলিল—ওগো শুন্‌ছো, যদি সত্যি সত্যি কিছু ঘটে যায়, তা হ'লে কি হ'বে?

কি ঘটবে?

ঐ ডাকাত—

বাধা দিয়া অজয় বলিল, পাগল!…

অদূরে পথের ধারে একটা মরা খেজুরগাছের ঝোপ দেখাইয়া দিয়া মেনকা বলিল, দেখ্‌ছ না কে ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে? বলিয়াই মেনকা আঁতকাইয়া উঠিয়া দুইবাহু বাড়াইয়া অজয়ের গলা এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে অজয় আর হাসিয়াই বাঁচে না।

হাসি শুনিয়া মেনকা বুঝিতে পারিয়া বলিল—কি মানুষ তুমি গো, এতেও হাসি? অন্ধকারে ওটা দেখ্‌লে মানুষ ব'লে কা'র না মনে হয়?

অজয় বলিল, আত্মরক্ষার জন্য তুমি এত ব্যস্ত যে ছেলেটাকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলে। গলাটা ছাড় ত একবার।

—না ছাড়ব না। আমার বুঝি ভয় করে না?

অজয় হাসিয়া বলিল, আমার গলা ধরে থাক্‌লেই কি ভয় ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে? দুষ্ট!

—যাবেই ত।

—কিন্তু গাড়োয়ানটা দেখে ফেল্‌লে কি ভাব্‌বে বল ত?

—কি আর ভাববে? ভাববে বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভাব।

ছেলেটা তখন জাগিয়া উঠিয়া মায়ের কোলে বসিয়া খেলিতে সুরু করিয়া দিল।

অজয় বলিল, তোমার চেয়ে দেখছি মণ্টুর সাহস ঢের বেশী।

—তা হ'বে না, ছেলে কার? নির্ভীক ত হ'বেই! অচেনা অজানা মুখ দেখলেও ওর ভয় করেনা। তার কোলে ঝাঁপিয়ে ওঠে। দু বছরের ছেলে কুকুর-বেরালের সঙ্গে খেলা করে, নতুন হাঁট্‌তে শিখে জলে জঙ্গলে আঁধারে যেতেও যে ভয় পায় না। তা কি তুমি জান না?

সুদীর্ঘ মাঠ আর ফুরাইতে চায় না! অন্ধকারে দৃষ্টি হারাইয়া যায়। কোথায় যে ইহার শেষ হইয়াছে ঠাওর করিবার উপায় নাই। লঙ্কাচরের মাঠের মধ্যস্থলে একটা বহুদিনের পরিত্যক্ত দীঘি আছে। সংস্কার অভাবে চতুঃপার্শ্ব তাহার অশ্বত্থ, পাকুড়, তাল, বেতস ও নানাজাতীয় জংলা গাছে সমাচ্ছন্ন। সূর্য্যের আলো ভয়ে সেখানে প্রবেশ করে না। এমনিই ঘন বনে সে স্থানটা আচ্ছাদিত।

নীরব নিথর রাত্রি, অন্ধকার ক্রমশ সূচীভেদ্য হইয়া উঠিতেছে! শীতের আকাশ থম্‌থম্ করিতেছে। সেই ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে এক অজ্ঞাত ভয়ে মেনকার গা-টা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

মেনকা বলিল, আর কতদূর গো?

হঠাৎ একটা অজ্ঞাত মানুষের মুখ হইতে উচ্চ—বিকট —বীভৎস হাসির হাঃ হাঃ শব্দ সেখানকার আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া উত্তর দিল, 'আর দূর নাই'!

মেনকা অজয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ও মা!

গাড়ী তখন দীঘির মাঝামাঝি পথে আসিয়া পড়িয়াছে।

অজয়ের মুখে আর কথা যোগাইল না। আসন্ন বিপদের বিভীষিকায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিল। কোথায়ও কিছু দেখিতে পাইল না।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কতকগুলি ভারী পদশব্দ শোনা গেল। কাহারা যেন দ্রুতপদে এদিকেই অগ্রসর হইতেছে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অজয় বৃথাই দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

অনাগত বিপদের দুশ্চিন্তায় নির্ব্বাক অজয়ের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল! শেষে কি-না স্ত্রী-পুত্রকে ডাকাতের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে।

পিছন ফিরিয়া গাড়োয়ান ডাকিল, বাবু!

অজয় উত্তর করিল, শুনেছি, জোরে হাঁকাও!

গাড়োয়ানের কণ্ঠ তখন মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে। গলা হইতে শব্দ আর বাহির হইতে চাহে না!

সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আর বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতই মরণের অগ্রদূতেরা খড়্গ হাতে হানা দিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল, সামাল যাত্রী!

ডাকাতদের ভীষণ কণ্ঠস্বরে সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

নিশুতিরাতে জনমানবহীন সেই লক্ষাচর প্রান্তরের বুক অসহায় যাত্রীদের মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদে মুখর হইয়া উঠিল। গাড়ীর উপর হইতে প্রাণভয়ে ভীত গাড়োয়ান লাফাইয়া পড়িল পথের নীচে। কিন্তু মমতাহীন হিংস্র ডাকাতের নির্দ্দয় অস্ত্রের মুখ হইতে সে রেহাই পাইল না। মুহূর্ত্তে মাথাটি তাহার একটি মাত্র আঘাতেই দেহ ছাড়িয়া একটু দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

দস্যুসর্দ্দারের বড় সাক্‌রেদ মোঙ্‌লার হাতের প্রজ্বলিত মশালের তীব্রতায় আলোকিত মাঠের মর্ম্মস্পর্শী এই হত্যা-কাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যে মেনকা মণ্টুকে বুকে চাপিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল!

সবল হাতের দু টানেই গাড়ীর টিনের আচ্ছাদন ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া ভাঙিয়া পড়িল। মশালের আলোর জ্যোতিঃ খড়্গের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া সূর্য্য-কিরণের মতই চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। টাট্‌কা রক্তের ধারা তখনও বহিয়া পড়িতেছে তাহার গা দিয়া। কম্পমান অজয় ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে ডাকাতের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, কে? কালু! তুমি…এর বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

কালুর শ্রুতিশক্তি তখন এক অতীত স্নেহের প্রবাহে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের কথায় সাড়া দিবার মত জ্ঞানও আর তাহার নাই।

অকস্মাৎ তাহার উত্থিত খড়্গ শিথিল ভাবে নামিয়া আসিতেই বিস্ময়াভিভূত মোঙ্‌লা দেখিতে পাইল—ছোট্ট শিশুটির পানে নিবদ্ধ দৃষ্টি সর্দ্দারের চক্ষু অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অস্ত্রের সন্ধান বরাবরই লক্ষ্যভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোন দিন কোন কারণেই ব্যর্থ হয় নাই—আজ তাহার এমন কেন হইল?

কালু তখন উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল, ওরে মোঙ্‌লা, আমার হারাধনকে ফিরে পেয়েছি।—আমার হারাধন—হারু রে ··

মোঙ্‌লা বলিল, সে কি সর্দ্দার! পাগল হ'লে নাকি?

—ওরে না রে না, পাগল হইনি, দেখছিস না অবিকল সেই মুখ!

সহসা অতবড় শক্তিশালী হিংস্র দানবের হাত দুইটি কাঁপিয়া উঠিল—ছোট্ট একটা শিশুর সম্মুখে। মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে খড়্গ কোন এক সময় মাটীর উপর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রবল রক্তপিপাসা—মুহূর্ত্তে যেন কোথায় উড়িয়া গেল! পাহাড়ের বুকে একটা খরস্রোতা ঝরণার মতই স্নেহের শতধারা তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বহিয়া চলিল একটা অতীত স্মৃতির উদ্দেশে।

আপনার অজ্ঞাতে দুর্দ্দান্ত ডাকাতের রক্তমাখা হাত দুইটি কম্পিত আগ্রহে মণ্টুর দিকে আগাইয়া গেল।

দানবের এই আকস্মিক ভাববিকার লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু-ভয়ে নির্জ্জীব অজয়ের প্রাণে সাড়া আসিল। পাশেই সংজ্ঞাহীনা মেনকার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া অজয় মণ্টুকে ডাকাতের প্রসারিত হস্তে তুলিয়া দিল। কোলে উঠিয়াই সর্দ্দারের গলার কণ্ঠীগাছ লইয়া মণ্টু খেলিতে খেলিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। উৎক্ষিপ্ত সে হাসির ঝরণায় পুত্রহারা পিতার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় ভাসিয়া গেল।

মণ্টু অজয়ের দিকে চাহিয়া ডাকিল—বা—বা—বা।

শিশুকণ্ঠের সেই আধ আধ ডাক সর্দ্দারের কানে

অমৃতের পরশ বুলাইয়া দিল। হারাধনও একদিন এমনি করিয়া ডাকিয়াছে। তারপর কোথা হইতে যেন কি হইয়া গেল!

সাহস পাইয়া অজয় বলিল, আমাদের ছেড়ে দাও সর্দ্দার। আমাদের সঙ্গে টাকা পয়সা বিশেষ কিছু নেই, যা আছে আমি নিজে হাতে তোমায় তুলে দিচ্ছি।

কালু খানিকক্ষণ অজয়ের দিকে চাহিয়া পরে মোঙ্লাকে ডাকিয়া বলিল—ওরে জল নিয়ে আয়, মা আমার ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে!

কালু সর্দ্দারের বুকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মতই যে করুণার নির্ঝরিণী লুকাইয়া ছিল, মোঙ্লার সাকরেদী-জীবনের এই কয়বছরে তাহাকে দেখিয়া ইহার বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। তাই আশ্চর্য্য হইয়া একবার সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার আদেশ পালন করিতে গেল।

মণ্টু আবার ডাকিয়া উঠিল—বা—ব্—বা!

কালু মণ্টুকে জোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। যেন সেই কতদিনকার পলাইয়া যাওয়া বুকের নিধি—মাতৃহারা সেই হারাধনকে আজ তাহার অতৃপ্ত বক্ষে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে।

মেনকা চোখ মেলিয়া চাহিতেই কালুসর্দ্দার বলিল—মা, তুই ভয় পাস্ নি। আমিও তোর ছেলে।

পতিতার দীক্ষা

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

'তোমার ও দেবদেহে এলে মোর পাপগেহে,
কেমনে বরণ প্রভু করি?
পঙ্কিল পল্বল সম কলুষিত দেহ মম,
তোমারে বরিতে লাজে মরি।

নাহি পূজাফুলদল, আছে শুধু আঁখিজল,
চরণ সেবিতে মম সাধ;
কলঙ্কিনী পতিতার আছে কি সে অধিকার?
কহ দেব! ক্ষমি অপরাধ।'

শুনি' আম্রপালী কথা অন্তরে পাইয়া ব্যথা
ভগবান্ বুদ্ধ তারে ক'ন,
'তুমি অতি ভাগ্যবতী, নহ কভু হীন-মতি;
ব্যর্থ নহে তোমার জীবন।

করিয়াছ নিমন্ত্রণ, কর এবে আয়োজন
অতিথির সমাদর তরে;
বিগত জীবন স্মরি' কাঁদ কেন দুঃখ করি'?
মহোৎসব আজি তব ঘরে।

আঁধারে আলোক রাজে, তেমতি তোমার মাঝে
জ্বালি' দিব দিব্য-প্রেম-শিখা,
সে অনলে করি' দগ্ধ তোমারে করিব শুদ্ধ,
মুছে দিব দুর্ভাগ্যের লিখা।

অমৃতের পাত্রখানি তব হস্তে দিব আনি',
মৃত্যুরে করিবে তুমি জয়;
নব জন্ম করি' দান তোমারে নূতন প্রাণ
দিব, নারী! নাহি তব ভয়।'

এত বলি' তথাগত করিলেন মন্ত্রপূত
পতিতার তনুমন প্রাণ;
আম্রপালী কহে, 'প্রভু! নাহি যেন ভুলি কভু
করুণার তব অবদান।

তোমার চরণ ধূলি মাথায় লইয়া তুলি'
যাব আমি দেশ-দেশান্তর,
তোমার দীক্ষার কথা প্রচারিব যথাতথা,
বাণী তব শাশ্বত সুন্দর!'

কৃষ্ণধামালীর গান

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণধামালীর গান সম্বন্ধে আমাদের দেশের একদল পণ্ডিতের মধ্যে উপভোগ্য মতান্তর আছে। কেহ ইহার মধ্যে উৎকট অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়াছেন ; তাঁহার মতে ধামালীশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে —কৃষ্ণধামালী ও শুক্লধামালী। কৃষ্ণ ও শুক্লের মধ্যে প্রভেদ শুধু অশ্লীলতার পরিমাপে। সেজন্যই নাকি উক্ত গান মাঠে গীত হয়, লোকাবাসের বিশুদ্ধ বাতাসে তাহার স্থান নাই। আবার কেহ মনে করেন, ধামালী গানের এক প্রকার অস্তিত্বই নাই—তাহাদের স্বীকার করা শুধু মন-গড়া ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

সে যাহা হউক, শিক্ষার ধারা অনুসারে গবেষণার একটা মোহ আছে। একজন হয়ত পল্লীর প্রান্তর হইতে কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সাহিত্য-ব্যঞ্জনের মধ্যে যোজনা করিলেন ; কিন্তু পরিবেশন করিতে গিয়া দেখা গেল, কাহারও নিকট তাহা বিস্বাদ মনে হইয়াছে, তিনি পাচক ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন ; বেগতিক বুঝিয়া পাচকঠাকুরও খুন্তি (কলমরূপ) লইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি যাহা রন্ধন করিয়াছেন তাহা উপাদেয়—ব্যঞ্জনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ তাহার হয়ত কোন স্থানে ক্ষত আছে। বস্তুত এরূপ গবেষণায় আসল তথ্য গোলাইয়া গিয়া জট বাঁধিতে থাকে।

সেরূপ কোন গবেষণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে পল্লী-গীতিকা সঙ্কলনের মধ্যে কতকগুলি শব্দের দিকে নজর পড়িয়াছে, কতক-গুলি গানের সম্বোধন স্থলে কানাই, কালা, মাধব, কানু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। সাধারণত পল্লীবাসীরা এরূপ সম্বোধনমূলক গানগুলিকে কানাইধামালীর গান বলিয়া আখ্যা করিয়া থাকে—তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। কানাইধামালীর গানই যে মার্জ্জিত ভাষায় "কৃষ্ণধামালী" তাহা বোধ করি ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করিবেন।

শুক্লধামালীর গানের সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। কৃষ্ণের বিপরীত শব্দ শুক্ল,এরূপ ধারণায়ও বিশেষ বিচার নাই। উহাকে অতিরিক্ত অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও আপত্তি থাকিতে পারে। তাহা করিলে পল্লীকবিদের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়—শ্লীলতা রক্ষা করিয়া তাহারা গান করিতে পারে, ইহার প্রমাণ অনেক আছে। বিশেষত সাহিত্য যদি শুধু শ্লীলতানুশীলনে যত্নবান হইত, তাহা হইলে জগতে এত কাব্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। সাহিত্যক্ষেত্র তাহা হইলে তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইত এবং সেস্থানে শ্বাস ধ্যান ভিন্ন উপায় থাকিত না। শ্লীলতা-অশ্লীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়াই সাহিত্য। সত্য শিব সুন্দরের মোহ আদর্শবাদীদের পক্ষে প্রযোজ্য।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীগীতিতে আমরা অল্পবিস্তর কৃষ্ণ-ধামালী গানের সন্ধান পাই। দেশ কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গানগুলি বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই গানগুলি কোন জেলার নিজস্ব নহে—ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহা বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রসার লাভ করিয়াছে।

উত্তর বঙ্গের "ভাওয়াইয়া গানে"র মধ্যে আমরা কৃষ্ণধামালীর গান অনেক পাই। রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় চৈত্রমাসের মদনোৎসবের মধ্যেও কৃষ্ণধামালী গানের কিছু কিছু সন্ধান পাইয়া থাকি। উহাকে মদন কামের পূজা, কিংবা জাগ গান বলা হয়। "জাগ গান" আবার দুই ভাগে বিভক্ত—চেংড়া জাগ, বুড়ো জাগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তলীলা পর্য্যন্ত জাগ গানের অন্তর্ভুক্ত।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক গানগুলিতে উভয়কে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে।—তাহাদিগকে সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আনা হইয়াছে। সেস্থানে কৃষ্ণ হয়ত হাল বহিতেছেন, মাঠে গরু চরাইতেছেন—রাধা কখনও কলসীতে জল ভরিতেছেন, কখনও জল সরাইয়া মাছ মারিতেছেন। এস্থলে কয়েকটি গান আংশিকভাবে উল্লেখ করিতেছি। কানাই রৌদ্রে হাল বহিতেছে, তাহার জন্য কন্যা* উতলা হইয়া পড়িয়াছে। কানাইর বয়স হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই।

> ও সুন্দর কানাই রে—
> আষাঢ় (ও) শ্রাবণ (ও) মাসে
> আঞ্চির জলে কানাই মাটি ভেজে
> ওদে না ঘামিল রে গাও।
> ও সুন্দর কানাই রে—
> দুয়ারের আগে রে কানাই,
> হালখানি জুরিচ
> ওদে না ঘামিল রে গাও॥
> ধিক্ ধিক্ তোর বাপ্ রে মাও,
> এমন ব'সে কানাই নাই হয় বিভাও,
> পড়া যাউক তোর দলান কোঠা বাড়ী রে—।

কোন সময় হয়ত কানাইকে বাঁক ঘাড়ে করিয়া মাথায় রাজপাগড়ী বাঁধিয়া মাঠের পথের দিকে যাইতে দেখা যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া

---

* কন্যা শব্দ পল্লীগীতিতে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কন্যা অর্থে যুবতী স্ত্রী বুঝায়।

কন্যা উন্মনা হইয়া পড়িয়াছে। কানাই-এর মুখের দুইটা মধুর কথা শুনিবার জন্য তাহার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।—

কানাই, ঘাড়ে দেখোঁ তোর নাল বাকুয়া
হস্তে দেখোঁ নাল সিকিয়া রে—
মাথে দেখো মনির আজ পাগরী রে—
ও তুমি কোথা হইতে কোথা যাও,
রে নিঠুর, মধুর কথা কআ যাও ॥

কন্যা মাছ মারিতেছে, গায়ে কাদা মাখিতেছে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কানাইও দুই-চারিটা গানের পদ ধরিল।

ঐ যে, মাল্লি বান্দ রে কন্যা,
পানি আরও ছেক।
সুন্দর গায়ে কই না কাদা রে মাখ—
পরপুরুষের সঙ্গে কিসের মৈচ্ছ মার রে ॥
মাছ মার রে কন্যা ইলিসা,
মাছ মার রে কন্যা খলিসা,
বেছে মৈচ্ছ মার চন্দনা আর কুরুসারে ॥

এইরূপে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়া কানাই-এর সহিত কন্যার পিরীতি হইয়াছে। পাড়ার লোক তাহা আবার জানিয়া ফেলিয়াছে—সেজন্য তাহাকে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু সে ওরূপ নিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ-স্বরূপ মনে করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কানাই-এর সহিত তাহার দেখা নাই। তাহার জন্য সে বনবাসে বাড়ী বাঁধিয়াছে, তবুও কানাই আপন হইল না।

ও মোর কালা মানুষ ভাল,
না বুঝে কালা সন্ধ্যা কাল,
না বুঝে কালা একেলা নারীর কাম রে—
ওদিয়া (১) গেইছেন কাইল,
তার জন্য মোরে পাড়ে গাইল,
সেও গাইল মোর শুনে পাড়ার লোকে ॥
ও তোর পিরীতির আশে,
বাড়ী বান্দিনু বনবাসে,
তবু কালা না হলু (২) রে আপন ॥

কালার জন্য কলঙ্কের পসরা মস্তকে বহন করিয়া কন্যা বনবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেখানে সুপারী গাছের "চারা" পাতিয়াছে, কলা গাছ রোপণ করিয়াছে। সুপারী গাছ বড় হইয়াছে, সুপারী ফলিয়াছে—কলা গাছে বড় পাতা হইয়াছে, কলা ধরিয়াছে, কিন্তু কালার সঙ্গে এখনও দেখা নাই।

ওরে বান্দিনু বাড়ী,
গুয়া (৩) উনু সারি সারি—
গুয়ার বাগুচায় ঘিরিয়া লইলে বাড়ী রে—
আসিবে মোর প্রাণের গুয়া (৪)
তায় পাড়াইবে গাছর গুয়া
মুই নারীটা ফাঁকিয়া (৫) খাইম তাক্।
ওরে আসিবে মোর প্রাণের নাথ
তায় কাটিবে কলার পাত,
মুই নারীটা বসিয়া খাইম (৬) বোল ভাত ॥
ও কি ও প্রাণ কালা রে—
ওরে মহাকালের ফল যেমন,
মোর নারীর যৈবন যেমন (৭)
খাআ দেখ কালা যৈবন কেমন মিঠা রে ॥

কালার গানগুলিকেও কানাই ধামালীর গানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ গান অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। 'কালার' ধুয়া ধরিয়া মাহুতকে উপলক্ষ্য করিয়াও গান আছে—সেগুলিও কৃষ্ণ ধামালীর অন্তর্ভুক্ত কি-না, তাহা বিচারসাপেক্ষ। যাহা হউক, কালা কিংবা কানাই-এর জন্য কন্যার আকুতির অন্ত নাই—সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব কানাইর নিকট অর্পণ করিয়াছে। গোপনে তাহার নিকট সে অভিসার করিয়াছে—কিন্তু তাহাদের গোপন কথা কেমন করিয়া যেন প্রকাশ হইয়া পড়িল। কানাই মাঠে মাঠে ধেনু চরাইয়া বেড়ায়, রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। কিন্তু তাহাদের উভয়ের পিরীতির কথা নিজেদের মধ্যে রাখিতে পারিল না, ইহাই বিশেষ আক্ষেপের বিষয়। এমন কি, কানাই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। কানাই-এর সহিত বাল্যকালের প্রেম ভোলা যায় না—রহিয়া রহিয়া জাগিয়া ওঠে। তাই বুকে পাষাণ বাঁধিয়া সে অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করে।

ও নাগর কানাইরে—
ওরে অবোধকালে করিছি পিরীত
তুমি আমি জানি।
এখন কেনে লোকের মুখে নানান কথা শুনি,
ওরে দুইজনায় কইরাছি পিরীত, খাবার নিবার আশে।
বাদি (৮) হইল পাড়ার লোকে, পিরীত ভাঙ্গল শেষে ॥
ওরে, নাউ কাটিনু কালা কালা,
চালে থুনুরে(৯) দাও।
অবোধ কালে করিয়া পিরীত
আজিও ঝাল্লায়(১০) গাও ॥

---

(১) ওদিয়া—ঐ দিক দিয়া (২) হইলে

(৩) রোপণ করিলাম (৪) প্রিয় (৫) ফাক করিয়া (অর্থাৎ কাটিয়া) (৬) খাইব (৭) সে রকম (৮) বাদ সাধিল (৯) রাখিলাম, থুইলাম। (১০) চিকমিক করে, জ্বালা করে

ও নাগর কানাইরে—
বনে বনে চরাও রে ধেনু
আখোয়ালে(১১) মতি।
এলা(১২) কেনে বেড়াইল তোর
গোপন পিরীতি॥
ওরে, ধনেটি খাইল টিয়ে
কেমনে কাটাব রাত্রি
বুখে পাষাণ দিয়ে॥

উপরি-উক্ত গীতাবলী উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান হইতে উদ্ধৃত হইল—গানগুলি রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গেও অনুরূপ গান শুনিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলা হইতে উক্ত গানের অনুরূপ পদ যাহা পাইয়াছি, এস্থলে তাহার কিছু প্রকাশ করিতেছি।—

ও কি হায়, পরাণের মাধব রে—
যখন করিলাম পেম তুমি আর ও আমি।
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি॥
যখনে করিলাম পেম
সান বাঁধা ঘাটে।
আশমানের চন্দ্র সূর্য্য তুলে দিল হাতে॥
বেলা গেল সঙ্গে(১৩) হল,
সঙ্গে লাগাও বাতি।
ফুলশাখে(১৪) বিছানা পাতে
জাগ্‌ব কত রাতি॥
রাত (ও) এক পহরের কালে,
চালে ডাকে চুয়ো।(১৫)
পান খেয়ে যাও প্রাণের বন্ধু
আড়ে কাটা গুয়ো॥

* *

রাত (ও) প্রভাতের কালে পুবে উদয় ভানু
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু॥

কানাই কিংবা মাধবকে নিকটে পাইয়া সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল। এখন তাহার অদর্শনে মন কেমন করে—তাহার জন্ম সে বিনিদ্র রজনী যাপন করে। শেষ রাত্রে তাহার সহিত দেখা হয়, আবার সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়।—ইহাই উক্ত গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। খুলনা জেলায়ও অনুরূপ গান শোনা যায়।

ও নাগর কানাইরে—
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল, ও কানাইরে—
ও সে জ্বালে মোমের বাতি।

(১১) রাখালের ভাব, রক্ষা করিবার প্রকৃতি। (১২) এখন। (১৩) সন্ধ্যা (১৪) ফুলশয্যা (১৫) ইঁদুর

না জানি মোর প্রাণনাথ,
আস্‌বে কত রাতি॥
ও নাগর কানাইরে—
রাত্র একফর(১৬) হইল কানাইরে—
বেড়ানে(১৭) দিলে মন।
রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন, জাগব কতক্ষণ॥
রাত্র দুই ফর হইল
ও সে গাছে ডাকে শুয়ো।
গা তুলে খাও বাটার পান
নারী কাটে গুয়ো॥

*

রাত্র চার ফর হইল কানাইরে—
কোকিল ছাড়ে বাসা।
রাধিকার সঙ্গে প্রেম করিয়া
না পুরিল আশা রে॥

ফরিদপুর অঞ্চলে মাধবকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি গান শোনা যায়। যৌবনে মাধবের সঙ্গে প্রেম হইয়াছে, এ প্রেমের কথা ভোলা যায় না। সাদা কাপড়ে কালির দাগের মত মনের মধ্যেও দাগ লাগিয়া গিয়াছে। মন পরিষ্কার ভাবে তাহা বুঝিতে পারে।

আজ কেন রে যৈবন তুই,
মিছে পাগল করিসরে হায়!
ধোপ্‌ কাপড়ে কালির ফোটা
মাধব! যাবে যৈবন রবে খোটা॥

*

আড়ায় যেমন ময়না রে পোষে,
ও মাধব, ছুটে গেলি আর না আসে।
আড়ায় যে মন ময়না রে পাখী,
ও মাধব, তাই দেখে প্রাণ বেঁধে রাখি॥

আমরা সাধারণভাবে কৃষ্ণধামালী গানের উল্লেখ করিয়াছি। নদীর পথে মাঝিরা যে সারি গান করে, তাহার মধ্যেও উক্ত গান পাওয়া যায়। খুলনা জেলার একটি সারি গান এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।—গানের বিষয়বস্তু এইরূপ ··· কৃষ্ণও মাঝি হইয়া নৌকা লইয়া ঘাটের নিকট আসিয়াছে, রাধা দুধের পসরা মাথায় করিয়া ঘাটের কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে ওপারে যাইতে হইবে, বেলা বহিয়া যাইতেছে, সেজন্য—সে মাঝির নিকট কাতর মিনতি জানাইতেছে। মাঝিও তাহাকে লইয়া ছলনা আরম্ভ করিয়াছে। সকল সখির নিকট হইতে সে "আনা" গ্রহণ করিবে, আর রাধিকার নিকট হইতে সে কানের সোনা লইবে।

পার কর পার কর কানাই,
বেলার দিকে চায়ে। (১৮)

(১৬) এক প্রহর (১৭) বেড়াইতে (১৮) চাহিয়া।

দধি দুগ্ধ জল নষ্ট
দিবা গেল বয়ে ॥
সকল সখি পার করিতে লব আনা আনা।
রাধিকারে পার করিতে নিব কানের সোনা ॥

কানাই মাঝির চুক্তি স্বীকার করিয়া রাধা নৌকার উপর ৩৮৩৯। বসিল, নৌকাখানি বুঝি-বা দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, রাধিকার ভার বোধ করি সহ্য করিতে পারিবে না।*

তুমি ও সুন্দর কানাই
তোমার ভাঙ্গা নাও। (১৯)
কোথায় থোব দুধের পসর রে'কানাই
কোথায় থোব পাও ॥

*

—ভাঙ্গা নয় নৌকাখানি,
রাধে, পসরি সার।
কত হস্তি ঘোড়া করলেম পার
তোর কি এত ভার ॥

*

অর্দ্ধেক গাঙে যায়ে কানাই
নৌকায় দিল নাচা। (২০)
উড়িল রাধিকার প্রাণ
কানাইর গাওর ভাঙ্গিল পাছা ॥
—বাহ বাহ বাহ কানাই,
বাহে ধর কূল।
এ ধন যৌবন দিব কানাই—
গঙ্গায় দিব পুল ॥

রাধিকা ঘাটে আসিয়া কলসীতে জল ভরিতেছে। তাহাকে একা পাইয়া কানাই তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। রাধিকার ভয় করে পাছে যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। সেজন্য সে কানাইকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছে। কানাইও যেন নাছোড়বান্দা—তাহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিল। একটা কিছু না করিয়া যেন সে আজ ফিরিবে না। তাহাদের মধ্যে উভয়ের যৌবনকে লক্ষ্য করিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল।

জল পোরো রাই বিনোদিনী,
জলে দিয়া ঢেউ।
নয়ন মেলে কও কথা
ঘাটে নাই কো কেউ।

—দেখিয়া যমুনার কেউ রে
ও নাগর প্রাণ কাঁপেরে থরে।
আজ আমি কব না কথা
যা ফিরে তোর ঘরে।—
—কেমন তোমার মাতা পিতে
কেমন তোমার হিয়ে।
বার বছর হয়েছে বয়স
না দিয়েছে বিয়ে ॥
—ভাল আমার মাতা পিতে
ভাল আমার হিয়ে।
তোমার চায়ে সুন্দর কুমার
সেই করেছে বিয়ে ॥
পরের নারী দেখে কুমার জ্বলে পুড়ে মর।
নিজ ধন ভাঙ্গায়ে কুমার বিয়ে না রে কর ॥
—কোথায় পাব টাকাকড়ি
কোথায় পাব আইয়ে (২১)।
তোমার মত সুন্দরী নারী,
কোথায় পাব যাইয়ে ॥
—আমার মত সুন্দর নারী,
কুমার যদি চাও।
উলুর ছোটা কলসী নিয়ে
যমুনায় ভাসাও ॥
—কোথায় পাব কলসী নারী
কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও যমুনার জল
আমি ডুবে মরি ॥

উপরি-উক্ত গানটি যশোহর জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। খুল্না জেলার একটি গানের সঙ্গে উক্ত গানের শেষের দিকের সামঞ্জস্য আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তুমি ও যে সুন্দর কানাই,
আমি তোমার মামি।
কোন্ সাহসে বল রে কানাই
জল ফেলাব আমি ॥
তুমিও যে সুন্দর কানাই,
না করিলে বিয়ে ॥
পরের রমণী দেখি কানাই,
মর জ্বলে পুড়ে ॥
কোথায় পাব টাকাকড়ি—
কোথায় পাব মাইয়ে (২২) ॥

* নৌকাবিলাস গানের মধ্যেও অনুরূপ ভাব আছে।
(১৯) নাও—নৌকা (২০) নাচন।

(২১) আইয়ে, এয়োতি—ইহার দ্বারা পরকীয়া ভজন সূচিত হয়।
(২২) মেয়ে।

তোমার মত সুন্দরী পেলে
করতেম আমি বিয়ে ॥

দক্ষিণবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে উক্তরূপ গান অনেক প্রচলিত আছে। আমরা এস্থলে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর জেলার একটি গান তুলনার জন্য উল্লেখ করিতেছি। রঙ্গপুরের সাধারণের গ্রাম্য "ভাওয়াইয়া গানের' মধ্যেও উহা শোনা গেলে "চলমল সাধুর গান" নামে একটি গানের উহা অন্তর্ভুক্ত।

"চলমল সাধুর" গানের বিষয়বস্তু এইরূপ। লক্ষ্মীমাতার পুত্র চলমল সাধুর সহিত পাটগ্রামের শঙ্খ রাজার কন্যা দুবুলার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সাধু বাণিজ্যে গমন করে, দুবুলার কাতর মিনতি তাহাকে নিবৃত্ত করাইতে পারে নাই। বার বৎসর ধরিয়া তাহার সহিত দেখা নাই। একদিন ঘাটের পথে সাধুর সহিত দুবুলা সুন্দরীর সাক্ষাৎকার হইল: কিন্তু কেহ কাহাকে চিনিতে পারিল না। না চিনিতে পারিলেও তাহারা উভয়ে পরস্পরকে উপলক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিল। শেষে উভয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। নদীর ঘাটের পথে যে গান হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহার দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত গানের সহিত অন্যান্য দূরবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলের সহিত ভাষা ও ভাবে মিল আছে।

ও নাথ কন্যা ও, জল ভর রে সুন্দর কইনা
জলে দিয়া ঢেউ
একলা ঘাটে আইসাছ কন্যা
সঙ্গে নাইকো কেউ ॥
—তুমি ত রাজার ছাইলা(২৩) বিভাও(২৪) করতে পার।
পরার রমণী দেখে কেন জলে পুড়ে মর ॥
—আমি ত রাজার ছাইলা বিভাও করতে পারি।
তোমার মত সুন্দর কন্যা মিলাইতে নারি ॥
—সাধু, আমার মত সুন্দর কন্যা যদি মিলাইতে চাও।
গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝম্প দেও ॥
—কোথায় পাব কলস কন্যা কোথাও পাব দড়ি।
তুমি হইলেন যবুনার জল আমি ডুবে মরি ॥

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগীতির দিকে দৃষ্টি দিলে বোধ করি, আমরা পুর্ব্বোক্ত প্রকারের গান পাইতে পারি। উত্তরবঙ্গের সুদূর পল্লী অঞ্চলে যে গান প্রচলিত আছে, দক্ষিণবঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও সেরূপ পাইতেছি; পূর্ব্ব কিংবা পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও সেরূপ গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

মামা ও ভাগিনাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক কুরুচিপুর্ণ গান পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রাকৃত ভাব তাহাতে আত্মগোপন করিয়া আছে। বাংলার পল্লী অঞ্চলের "মেঠোগ্রামে" উক্ত ভাব অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাকেই বড় করিয়া ধরিলে পল্লীগীতির প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইবে। এ বিষয়েও একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। রঙ্গপুরের একটি গান এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

ও চাঁদ, আমার বাড়ী তোমার বাড়ী
মধ্যে হীরা নদী।
কি যাব তোমার বাড়ী রে চাঁদ
পাঙ্খা (২৫) নাই দেয় বিধি ॥
একবার আসিয়া কি ও মোর সোনার চাঁদ
যান ত দেখিয়া হে ॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী,
মধ্যে ব্যাতের আড়া।
কি যাব তোমারে বাড়ী,
আমার কপাল পোড়া ॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী,
একে ত আঙ্গিনা।
আত হ'লে ও মোর সোনার চাঁদ
দিন হইলে ভাগিনা ॥

গানটির প্রথম দিক্‌টা একেবারে মন্দ নয়; শেষের দিকে পদ পড়িয়া অনেকের নৈতিক মনে আঘাত লাগে। মামি ও ভাগিনার এইরূপ আপত্তিকর সম্বন্ধের মধ্যে আমরা কানাইধামালীর গানের গন্ধ পাইতে পারি। যাঁহারা কৃষ্ণধামালীর গানকে অশ্লীলতার নামান্তর মাত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত গানের সহিত দক্ষিণবঙ্গের একটি গানের অপূর্ব্ব মিল আছে। এস্থলে তাহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। গানটি খুল্‌না জেলায় শোনা যায়।

বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী,
মধ্যে ক্ষীরো নদী।
উড়ে যাবার আশায় করি
পয়ার (২৬) দেয় নি বিধি ॥
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী,
মধ্যে নলের বেড়া।
হাত বাড়ায়ে পান দিতে
দেখ্‌লো দেওর (২৭) ছোড়া ॥
পান দিলাম সুপারী দিলাম,
চুণো দিয়ে খাইও।
আর(ও) কোন কথা থাকে,
কদমতলায় যাইও ॥

(২৩)। ছাইলা=ছেলে। (২৪)। বিভাও=বিবাহ

(২৫) পাঙখা=পাখা। (২৬) পয়ার অর্থেও "পাখা" বুঝায়।
(২৭) দেবর, রঙ্গপুরে "দেওরা" বলে।

উত্তরবঙ্গের একটি গানের মধ্যে পাওয়া যায়—

আমার বাড়ী যান হে দেওরা,
খাইতে দিব পান।
আর শুইতে দিমো (২৮) শীতল পাটি
যৈবন করব দান॥

পূর্ব্ববঙ্গের "মহুয়া"র গানের মধ্যে একস্থানে দেখিতে পাই।—

অতিথ বলিয়া যদি আইও আমার বাড়ি।
বাপেরে কহিয়া আমি বইতে দিতাম পিড়ি॥
শুইতে দিতাম শীতল পাটি বাটা ভরা পান।
আসৃত যদি সোনার অতিথ যৌবন করতাম দান॥

আলোচনা করিতে করিতে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যেস্থান হইতে চলিয়া আসা বড়ই কষ্টসাধ্য। পাঠকের ধৈর্য্যের বাঁধ না ভাঙ্গিলেও প্রবন্ধের গণ্ডী পার হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। পল্লীর প্রেম-গীতি-কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষ্ণধামালীর গানও যে উক্ত প্রেম-গীতির অংশস্বরূপ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তবে কৃষ্ণধামালীর গান যে প্রকৃতভাবে কাহাকে বলে, তাহা এখনও জানা যায় নাই—কল্পিত বিষয় কি না তাহাও বিচারসাপেক্ষ।

(২৮) দিমো=দিমু (পূর্ব্ববঙ্গ)=দিব।

যে জন চলিয়া যাবে

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমারি তরে মা সঁপিয়া হৃদয়, তোমারি তরে মা সঁপিয়া দেহ,
সকল দুঃখ বরিয়া জীবনে যে জন একদা চলিয়া যাবে
অশ্রুপথের বেদনা মাখিয়া শূন্য করিয়া গেহ—
বল মা আমারে, তুমি কি সেদিন শোক-সঙ্গীত গাবে?

একটি জীবন তোমারি সেবায় সহিয়া কত না নির্য্যাতন
আঁধার করিবে আপনার যশ মরুর ধূলায় তোমারি তরে,
স্নেহবঞ্চিত করিবে তাহারে কত আপনার জন,
অশ্রু তোমার রাখিবে কি মাগো তাহারি বুকের 'পরে!

যদিও সমাজ ঠেলে দেবে পায়ে, অরাতি দণ্ড দেবে গো এসে
ভগ্ন বীণায় তুলিয়া দীপক তুমি কি জাগাবে বহ্নিশিখা?
স্বার্থের লাগি অরাতির কাছে ঘৃণ্য হলেও শেষে—
তোমার সেবায় জীবন সঁপিয়া পরেছে হোমের টীকা।

মরমে তোমার স্বর্গ-প্রেমের জড়ায়েছে তার স্বপ্ন যত,
এই ধরণীর আলোক-ছায়ার হেরিয়াছে রূপ তোমারি কোলে;
জীবন-প্রভাতকুঞ্জে প্রথম শুনেছে কাকলী কত,
তোমারি তরে মা দুঃখ বেদনা সকল ভাবনা ভোলে।

দখিনা বাতাস ছিল তার সাথে সোনালী মেঘেরা করিত খেলা,
নীরব রাতের বাতায়নে বসি' শুভ্র তারকা করিত গান।
স্বপনের রাণী ঘুমেতে তাহার ভাসাত সুখের ভেলা,
চম্পকবাস শৈশবে তার জুড়াত কোমল প্রাণ।

শেষের সময় দেবতার কাছে আত্মকাহিনী জানাবে যবে,
তোমার কথাটি ফুটিয়া উঠিবে তাহারি সকল কথার মাঝে।
পিছল পথের রিক্ত পথিক কহিবে করুণ রবে—
'আশিস্ কর মা, ফিরিয়া আসিতে পারি যেন তোর কাছে।'

হয় তো ফিরিতে পারিব না আর তব গৌরব প্রভাতে আমি,
বন্ধুরা সব রহিবে তোমার বিজয়পতাকা উচ্চে ধরি';
ধন্য তাহারা—অভাগা শুধুই সুদূরের পথগামী—
সেদিন তুমি কি নয়নের জল ফেলিবে আমারে স্মরি'?

তোমার লাগিয়া যে জন নিজেরে যুগের খড়্গে দিবে গো বলি,
ওপারে তাহার মহিমামুকুট গর্ব্বে রচিবে স্বর্গলোক।
যে জন একদা চলিয়া যাবে মা শত লাঞ্ছনা দলি'
তাহারি বিরহে মুক্তি-দিবসে করিবে কি তুমি শোক?

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতকলা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এল-সি

সঙ্গীতকলার আলোচনা বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক সমজদারদের পক্ষে অতি কঠিন হয়ে পড়েছে। সঙ্গীতকলার কোন পরিচিত ধ্বনির অনুকরণ মাত্র নয়, গ্রীক মূর্ত্তি বা রিনেসাঁস যুগের চিত্রের মত একে realistic ভাবে বিচার করা চলে না। জগতে নিখিল ধ্বনি-বিতানকে সুসম্বদ্ধ করার সাধনায় নানা সভ্যতার কৃতিত্ব বা সারবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সমস্ত বিচিত্র ধ্বনিকে ছন্দের সূত্রে গ্রথিত না করতে পারলে সঙ্গীত বা সুরবীথিকা কলালীলার দাবী করতে পারে না। নিগ্রো সঙ্গীতের উল্লোল উদ্ভটত্বকেও এযুগে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে কারণ ইউরোপের দানের ভিতর একটা বিরাট অপূর্ণতা ও শূন্যতা আছে। এই শূন্যতা পূরণ এযুগে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

জার্ম্মেণ কলাবিদ্‌গণ সঙ্গীতকলাকে "Anderstreben of all arts" বলে থাকেন। এর মানে হচ্ছে সঙ্গীতই সকল artএর লক্ষ্যস্থানীয়—সকল কলাই সঙ্গীতকলার মত abstract নিরুপাধি বা বস্তুনিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করছে। ইউরোপে subject matterকে মর্য্যাদা দিতে ইদানীং কোন আর্টই চেষ্টা করে না। সঙ্গীতে বাক্যটি প্রধান নয়—বিষয়বস্তুর মূল্য এতে কম—সুরের মূল্যই সবচেয়ে বেশী। কাজেই সুরের রাজ্যে প্রবেশ করে' ইউরোপীয় সঙ্গীত বায়বীয় অবাস্তবের ক্ষেত্রে এসে পড়েছে। সঙ্গীতে ধ্বনি-রূপ রচনার patternই চরম ও শেষ কথা। সুরের pattern রচনা করাই হ'ল উচ্চসাধনার ব্যাপার। এ পথে ইউরোপ বেশী দূর যায় নি। অবস্ত তন্ত্র Abstract music ইউরোপের ইতিহাসের গোড়ায় ছিল। ক্রমশঃ তা প্রাণে দুঃসহ হয়ে পড়ল। এজন্য সঙ্গীতকে operaর সহিত যুক্ত ক'রে Wagner এই কলাকে বস্তুতান্ত্রিক করে তুল্লেন। গল্পের হের ফের, উত্থান পতন, সুখ দুঃখকে সুরের ভাষায় অনুকরণ করাই হল বড় কাজ। এভাবে একবার বাস্তবতার ক্ষেত্র হ'তে ক'রে সঙ্গীতকে ইউরোপ আবার বস্তুবাদের খাঁচায় পুরেছে।

এই গেল একদিক্; অপরদিক হচ্ছে ইউরোপের সঙ্গীতের রথ এক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চলে না। সাতটি হোক্ না হোক্ অনেক ঘোড়ায় তাকে চালান হয়—সে সব সাতদিকে ছোটে। Popley সহজ ভাষায় বলেন "In western music it is the cluster of notes rather than individual notes which have special value". এরূপ অবস্থায় সুরের democracyর রাজ্যে ইউরোপ আত্মসমর্পণ করেছে। এটা নিম্নস্তরের কেলি—উচ্চ স্তরের আরোহণ নয়। ভারতীয় সঙ্গীতে ও ধ্বনির বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সেগুলো একটি পুষ্পহারের মত কল্পিত হয়ে' কোন রাগিণীর সুষমাকে মুকুরিত ক'রে তোলে। তাতে পাঁচমিশেলি ভাব নেই। বস্তুতঃ ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভিতর ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভারতীয় সঙ্গীতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই লক্ষ্য করবার বিষয়।

তত্ত্বের দিক হ'তে এই দুটি কলাকে বিচার করতে গেলে আরও গভীর জায়গায় উপস্থিত হ'তে হয়। ইউরোপীয় সঙ্গীতে বৈচিত্র্যই মুখ্য। এর মানে হচ্ছে ইউরোপে প্রত্যেকটি ধ্বনির একটা ইন্দ্রিয়গত বা 'objective' স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। এই স্বতন্ত্র ধ্বনিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতকে বাড়িয়ে তুলে একটা সাময়িক sensation জাগ্রত ক'রে চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করাই হল এ শ্রেণীর সঙ্গীতকলার উদ্দেশ্য। তত্ত্বের দিক হতে ভারতীয় কল্পনা একেবারে বিপরীত। ইউরোপ 'নাদে'র সন্ধান নিতে হাটে মাঠে ছুটে গেছে। পাথরের টুকরোর মত সে সব সাজিয়ে সঙ্গীতকারেরা catalogue ক'রে রেখেছে। কাণে এ সবের মিশ্র একটা কিছু রচনা করাই হল ইউরোপের বাহাদুরী।

অপরদিকে হিন্দু কল্পনায় 'নাদ' কল্পনা অতি সুদূরগামী ব্যাপার। তার মূল তুরীয় স্তরে নিহিত। সমগ্র ব্যাপারটি subjective এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য গভীর তত্ত্ব। কাজেই হিন্দু সঙ্গীতের ভিতর রাগ রাগিণী যে ঐক্যকে বহিরঙ্গ রূপ দিয়েছে—কোন বিশিষ্ট রূপ ও রসের লীলা-প্রসঙ্গে—হিন্দু অনুভূতি সে ঐক্যকে তুরীয় স্তরে অনুভব করেছে এবং সঙ্গীতকলার বহিরঙ্গ ধ্বনিসুষমার রত্নকদম্বকেও সে আলোকেই ঐক্যের পাদপীঠে স্থাপন করেছে।

হিন্দুকল্পনা সকল ধ্বনির ভিতর ঐক্য অনুভব করেছে। মতঙ্গ বলেন—"সা চ একা অনেকা বা একৈব শ্রুতিরিতি"

ধ্বনি এক—আবার তার অনুরণন অসীম। বর্ণ যেমন শুধু সাতটি নয় সীমাহীন, তেমন ধ্বনির রণনও বাইশটি বা ছয়ষট্টি শুধু নয়—তা' অনন্ত। ব্যবহারিক দিক হ'তে হিন্দু সঙ্গীতকার বাইশটি শ্রুতিকে মুখ্য করেছে—কিন্তু তত্বের দিক হ'তে তা' অসীম। এ রকমের একটা বিরাট অনুভূতি হিন্দু সঙ্গীতকলার ভিত্তিস্থানীয় হয়েছে।

তা' ছাড়া ভারতে ধ্বনিকে যে তুরীয় মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে—এমন আর কিছুকে দেওয়া হয় নাই। সঙ্গীত-রত্নাকর মতে 'নাদ' দুপ্রকার আহত ও অনাহত। যা' আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা আহত—যা' স্বতই উৎপন্ন হয় তা' অনাহত। শারদাতিলকতন্ত্রমতে পরা-শক্তি হইতেই নাদের উদ্ভব। সৃষ্টিকালে নাদ হতে উৎপন্ন মাতৃকার অ-উ-ম হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব উৎপন্ন হয়েছেন। রত্নাকর মতে এই দেবতারা নাদাত্মক। নাদ হ'তে ষড়জাদি ধ্বন্যাত্মক স্বর একদিকে—অন্যদিকে বর্ণাত্মক শব্দ সমূহ উদ্ভূত হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক নাদ হচ্ছে সঙ্গীতের উপাদান এবং বর্ণাত্মক নাদ হচ্ছে মন্ত্রাদির পরিপোষক।

হিন্দু সঙ্গীতকারগণ ধ্বনিকে তুরীয় শক্তিরই রূপান্তর বলেছেন। কাজেই বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক যাদুঘর হ'তে প্রাপ্ত ধ্বনির টুকরোগুলির inspiration হিন্দু সঙ্গীতকারকে প্রবুদ্ধ বা অন্দোলিত করেনি। নাদ অবাঙ্‌মনসো-গোচর—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। ভূমার মাঝে তাঁরা ধ্বনির উৎস খুঁজেছেন এবং সৃষ্টির আদিতে ধ্বনিকে শক্তিরূপী প্রবর্ত্তক বলে লক্ষ্য করেছেন। এরূপ অবস্থায় ধ্বনিলালিত্যের সহিত তুরীয় অখণ্ডতার যোগ স্থাপিত হয়েছে এবং মানুষের অন্তর্লোকেও অনুভূত অনাহত সুরের সুষমা ছায়াপাত করেছে।

ফলে সঙ্গীতকারগণ ধ্বনির ভিতর দিয়ে ধ্বনির অতীত লোকের সহিত সামাজিকতা করতে লোকদের উৎসাহিত করেছেন। এটা হ'ল সঙ্গীতের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার পথ।

ইউরোপীয় সঙ্গীতকলার শ্রী জাগ্রত হয় Harmony রচনার ভিতর। Harmonyর ভিতরকার মূল সূত্র হচ্ছে বিরোধ বা contrast—তা একান্তভাবে ব্যতিরেকী ব্যাপার। প্রতিমুহূর্ত্ত নূতন নূতন বিরোধ সৃষ্টি করে' একটা বিরোধ-মূলক তান-সৃষ্টির মূলে আছে আমাদের ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতিকেই ঐকান্তিক মর্য্যাদা দেওয়া। এর জন্য কোন উচ্চতর প্রেষণার প্রয়োজন হয় না। কোন ইউরোপীয় আলোচক বলেন—"In western music the salient notes are made by the momentary impulse of the harmony, of the counterpoint and it is the cluster of notes rather than individual notes which have special value."

ভারতীয় সঙ্গীতে এইরূপ বৈপরীত্যের ইমারত তৈরী হয় না—তা অন্বয়ী বা সামঞ্জস্যের প্রেরণায় মূর্ত্তিমান। ভারতীয় কলার উদ্দেশ্য রসের ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটন। মানুষের অন্তরেই সকল রূপবীথিকার শেষ আবেদন চলে। সেই গভীর প্রদেশে উৎসারিত রসকদম্ব সাময়িক ব্যাপার নয় এবং ক্ষণিক উত্তেজনারও ব্যাপার নয়। সে সব চিরন্তন। অসীম মানবত্ব সৃষ্টির শেষ পুলক পর্য্যন্ত এই সমস্ত রসপ্রেরণায় শিহরিত হবে। শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রস কোন বিশেষ কাল স্থান বা জাতির আকস্মিক সম্পদ্ নয়। কাজেই এসব চিরন্তন ও চিরনবীন সৌন্দর্য্যস্বপ্নকে জাগ্রত করতে না পারলে সকল রচনাই ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ইউরোপের ফ্যাসন দিন দিন বদ্‌লাচ্ছে—অপূর্ণতা অতৃপ্তি ও অধীরতায় পাশ্চাত্য সঙ্গীত পরিপূর্ণ—এজন্য সকল জাতির এমন কি নিগ্রোদেরও কলা লালিত্য হ'তে উপকরণ সংগ্রহ করতে ইউরোপ উৎসুক।

ভারতীয় কলা রাগরাগিণী কল্পনা করে' এক একটি মনোবিহারের রাজপথ রচনা করেছে। এসব বদলান চলে না, যদিও নানা আলঙ্কারিক বিভবে এদের সুশোভন করা চলে। সে স্বাধীনতা ভারতের প্রতি রচনায় আছে। একই রাগিনী বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠস্বরে একটা নূতন জ্যোৎস্না স্নাত সুষমায় মণ্ডিত হয়—কিন্তু কেউ মূল রাগিণীকে ধ্বংস করতে চায় না। এজন্য মার্গ বা classical সঙ্গীতের রাগ রাগিণী-গুলিকে এদেশের কলাবিদ্‌গণ অপৌরুষেয় বলেন। দেশী সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের পশ্চাতে মার্গ সঙ্গীতের চিরন্তন প্রেরণা বর্ত্তমান—একথা ভুললে চল্‌বে না। মার্গসঙ্গীত ইন্দ্রিয়ের জড় আবরণ ভেদ করে' গভীরতর অধ্যাত্ম স্তরে উপস্থিত হয়—যে স্তরে জরা মরণ নেই—যা চিরনবীন ও চিরপ্রফুল্ল।

এজন্য এ শ্রেণীর সঙ্গীত সমগ্র জাতীয় চিত্তকে সংহত করে। মার্গসঙ্গীতের উৎপত্তি ও আদর্শ এজন্যই দিব্য বলা হয়। এ সঙ্গীত মুক্তিদান করে' ধর্ম্মস্থানীয় হয়ে পড়েছে ভারতবর্ষে। অন্বয়াত্মক সুরহিল্লোলে অর্থাৎ melodyতে চিত্ত একাগ্র হয়। যে জায়গা হ'তে নাদের আবির্ভাব সে জায়গার সহিত সামাজিকতা এরূপ একোন্মুখী শব্দকুণ্ডলী সম্ভব করে। সকল দুঃখ ও পীড়ার অপর পারেই মুক্তি। ধীরে ধীরে চিত্তকে এমনি ভাবে আন্দোলিত করে' ভারতের সঙ্গীতকলা হৃদয়ের সকল গ্রন্থিকে ভেদ করে দেয়—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি।" এই আরোহণ আনন্দের সহস্রারের দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে ছিন্নবৃন্ত অবরোহণ সাময়িক সঙ্গীতকে কতকগুলি জমকাল উত্তেজনা ও মনোহর বুজরকীর ভিতর দিয়ে নিয়ে যায়—বিরোধী ব্যঞ্জনার সাহায্যে—যা ক্ষণভঙ্গুর sensation সৃষ্টির সাহায্যে মুগ্ধ করে। এরকম সৃষ্টির স্থানও হিন্দু রচনায় আছে। শাস্ত্রোক্ত দেশী সঙ্গীতের উন্মাদনার মূলে আছে এই জাগ্রত ধ্বনির নব নব ব্যূহ রচনার প্রয়াস।

আধুনিক চিত্র ও গান চায় বস্তুতন্ত্র ঐহিকতার মায়ায় আচ্ছন্ন হ'তে—এই ভাবেই ইউরোপীয় সঙ্গীতকলা সমাদৃত হচ্ছে। এই শ্রেণীর কলা চায় রূপরসগন্ধের স্নায়বিক sensation—চিত্তের পরম শান্ত ও শিবভাব নয়। অথচ আহত ধ্বনির সাহায্যে অনাহততে না পৌছলে তুরীয় গমকের সাহচর্য্য লাভ হয় না—অখণ্ড সৃষ্টি খোলে না। রাগ রাগিণীর ভিতর দিয়ে এই পরমলোকে বিচরণ মানুষের একটা অধিকার। যিনি রসস্বরূপ—তাঁ'কে পেতে হলে রসের অখণ্ড প্রকাশের পথে যাওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ভক্তদের সঙ্গীতকাররূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সঙ্গীতকলাকে শুধু কর্ণের বহিরঙ্গ সেবার বস্তুরূপে কেউ ভারতে দেখে নি। চিত্তের সকল দিককে ও মানবিকতার সকল আদর্শকে বিকশিত করে' ভারতীয় কলা অগ্রসর হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতকলা সাময়িক ও দেশী সঙ্গীতকেও স্থান দিয়েছে—তা' না হ'লে অধিকার ভেদে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও রসচর্চ্চা ব্যর্থ হয়। অরূপের পথে রূপের সঙ্গেও বোঝাপড়া প্রয়োজন। এ দুটিই অঙ্গাঙ্গী। এদেশেও বৈচিত্র্য ও বহুত্বের পথ বর্জ্জিত হয় নি, এজন্য ইউরোপীয় সঙ্গীতকলায় শাশ্বত সংযম না থাকলেও হিন্দুকলা তা'কে গ্রহণ করতে পারে—যথাযোগ্য বহিরঙ্গ শোভনতা আরোপ করে। তা'তে ইউরোপীয় কলাও সমৃদ্ধ হবে এবং ভারতীয় সঙ্গীতও আধুনিক বাস্তবতার সহিত সঙ্গত হয়ে মহীয়ান্ হবে। এরূপে এ দুটি কলার যুগ্মকরের সম্বর্দ্ধনায় মানব চিত্তের আনন্দ উপচিত হবে সন্দেহ নেই।

নিখুঁত প্রেমেরি দায়

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ভালবেসো মোরে ভাল বাসো যদি নিখুঁত প্রেমেরি দায়
দুরাপ যে প্রেম কৈবল্যের অমল অহৈতুকী—
বাসিও আমারে দেহের কিনারে ভাসি প্রেম দরিয়ায়
অমানিশীথের চকোর যে প্রেমে পাগল ঊর্দ্ধ মুখী।
ক্ষমা কোরো প্রিয় ভাল বাসিও না ফুল্ল হাসির রেখা
বাসিও না ভালো সরস নধর ডালিম লালিমা ধর
কপোলে কপালে কর চরণের গতিবিভঙ্গে লেখা
নব সঞ্চার এ তনু লতায় অতনুর মর্ম্মর।
ফাগুনের প্রেম কুসুমকোমল শুকায় ফুলেরি মত
মলয়ের প্রেম মিলায় হেলায় তাহারি বিদায় সনে
মেঘমল্লারে বরষার প্রেম পল্‌কা মেঘেরি মত
চোখের মোহের মরীচিকা প্রেম শুধু পিপাসার ক্ষণে।
হৃদয়ের সনে অটুট বাঁধনে বাঁধা যায় পাকে পাকে
দিবে যদি সখা দাও সেই প্রেম বাঁধা দাও আপনাকে।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

(পাঁচ)

গল্পে শোনা যায়, যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে যমদূতেরা রামের বদলে শ্যামকে লইয়া যায়, শ্যামের বদলে আসিয়া ধরে রামকে। তাহাদের অনুকরণে হইলেও ক্ষেত্র বিস্তৃততর করিয়া লইয়া রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশতঃ প্রায়ই শ্যামকে লইয়াই টানাটানি করে। পুলিশও মানুষ, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। পরদিনই একটা পুলিশ-তদন্ত হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ আক্রোশের কারণ দেখাইয়া ছিরু পালকে সন্দেহ করিলেও পুলিশ আসিয়া মাঠ-আগলদার সতীশ বাউড়ীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তছনছ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটাকে জেরা করিয়া নাজেহাল করিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অবশ্য একবার ছিরু পালের খামার-বাড়ীটাও ঘুরিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে দুই বিঘা জমির আধ-পাকা ধানের একগাছি খড়ও কোথাও মিলিল না।

পুলিশ আসিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিল—গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরেরাও আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের নক্ষত্র সভাসদের মত চারিপাশে জমিয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বলিতেছিল—ছিরু পাল বসিয়াছিল—পুলিশের অতি নিকটেই অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। তাহার আকর্ণবিস্তৃত মুখগহ্বরের পাশে চোয়ালের হাড় দুইটা কঠিন ভঙ্গিতে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধ সম্মুখেই উপু হইয়া বসিয়াছিল। সে মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। তদন্ত শেষে পুলিশ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও উঠিল, সে চাহিয়া না দেখিয়াও বেশ অনুভব করিতেছিল যে সমস্ত গ্রামের লোক কঠিন প্রতিহিংসা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়—নিরুপায়ে মানুষকে সহ্যও করিতে হয়—কিন্তু যন্ত্রণার ভাবী ইঙ্গিত মানুষের পক্ষে অসহ্য। সে পুলিশেরই পিছন পিছন আসিয়া ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষের ডাক্তারখানার দাওয়ায় বসিল। ডাক্তার ওখানে যায় নাই, সে রোগী বিদায় করিতেছিল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া হাসিয়া সে বলিল—কি রে, কৌটোর মধ্যে ঢাক খুঁজে পেলে না দারোগাবাবু ?

অনিরুদ্ধ খুঁটিতে ঠেস দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

মিনিম গ্লাসে ওষুধ ঢালিয়া—গ্লাসটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ওষুধের পরিমাণ দেখিতে দেখিতে ডাক্তার বলিল—দু'খানা দরখাস্ত ক'রে দিচ্ছি দাঁড়া; একখানা পুলিশসায়েবকে, একখানা এস-ডি-ও কে। জমাদার—ছিরু পালের এক-গ্লাসের ইয়ার।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু; ও আর থাক।

ডাক্তারের চোখ মুহূর্তে মিনিম গ্লাস হইতে অনিরুদ্ধের মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। পরমুহূর্তে হাসিয়া ডাক্তার বলিল—ভয় পেয়ে গেলি—এরই মধ্যে ?

অনিরুদ্ধ হাত দুইটা উপরের দিকে তুলিয়া দেহখানাকে যথাসম্ভব টানিয়া হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙিয়া লইল—তারপর বলিল—ভয় আর কি ডাক্তারবাবু, তবে ও-সব ঝঞ্ঝাট হাঙ্গামা কত পোয়াব বলুন ? হাকিম পেস্কার উকীল মোক্তার, আদালত ঘর—এ আর কত করব। তার চেয়ে দেখাই যাক—কতদূর কে করতে পারে! ধরতে যেদিন পারব ডাক্তারবাবু, সেদিন লোহা-পেটা ক'রে ছেড়ে দোব।

ডাক্তার বলিল—তাতে তোর বিপদ হবে অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ তাচ্ছিল্যভরে হাসিল—বিপদ ? ছিরু পালের গাঁদা শরীর দেখে ভাবেন বুঝি ছিরু পাল সাক্ষাৎ ভীম ? ডাক্তারবাবু,আমি কামারের ছেলে—আগুনের আঁচে—লোহা পিটে আমি মানুষ। ধরতে পারলে—ওর হাড় আমি পিষে ফেলব। ক্রোধে প্রতিহিংসায় অনিরুদ্ধ ভীষণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল—না—না। বিপদ তোর তাতেই হবে। চোর হোক আর ডাকাত হোক—খুন কিংবা সাংঘাতিক জখম তুমি

তাকে করতে পার না। তাতে উল্টে তোমারই সাজা হয়ে যাবে।

—কি হবে? জেল, না হয় ফাঁসী? তাই স্বীকার! অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল, পিছনের দিকে দুটি হাত নিবদ্ধ করিয়া ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে ওই চণ্ডীমণ্ডপটার সম্মুখ দিয়াই সে আপনার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। স্থির দৃষ্টি সম্মুখের দিকে রাখিয়া সে চলিতেছিল—যেন কোনদিকে তাহার দৃকপাত নাই।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছিল। পুলিশ চলিয়া যাইবার পরই সমবেত প্রত্যেক জনটি আপন আপন মন্তব্য ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছে; কেহ কাহারও কথা শোনে না দেখিয়া প্রত্যেকেই কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। সদ্গোপ সম্প্রদায়ের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সু-চক্ষে দেখে না; কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার যখন পুলিশে খবর দিয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিশ ঢুকাইয়া দিল, তখন অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যের অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিয়া বিষয়টা উচ্চতায় এবং গুরুত্বে খুব বড় হইয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টবক্তা দেবদাস ঘোষের গলাটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উচ্চ—সে মাইনর পাস—গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া থাকে—সকল কলরবের ঊর্দ্ধে তাহারই কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। দেবদাস সমাজতত্ত্ব লইয়া আপন মনেই দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছিল—কামার ছুতোর, ধোপা নাপিত, কাজ করব না বললেই তো হবে না। এর জন্যে রীতিমত নালিশ চলবে। হাইকোর্ট—বিলাত পর্য্যন্ত মামলা চলবে। এই ধর তোমার চৌকীদার—আগে চৌকীদার ছিল জমিদারের হাতে—গভর্ণমেণ্ট যেই চৌকীদার নিজের হাতে নিলে—অমনি জমিদারের কাছায় পাক দিয়ে চৌকীদারী চাকরাণ জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে খাস ক'রে নিলে। গ্রামের যে যা কাজ করে—ছাড়তে হ'লে তার ক্ষতি-পূরণ লাগবে। ইয়ার্কি নয়।

শ্রীহরি কেবল তেমনি গম্ভীরভাবে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিয়াছিল; এতখানি যে হইবে সে তাহা আশঙ্কা করে নাই। অনিরুদ্ধের দুর্দ্দান্ত সাহসকে সে অস্বীকার করে না, তাহার ভরসা ছিল—চক্ষুলজ্জার ভয়; গ্রামবাসীর ওই বস্তুটিকেই ঢালের মত আড়াল দিয়া সে এতকাল স্বচ্ছন্দমত বিচরণ করিয়া আসিয়াছে। থানার জমাদার তাহার বন্ধু—সে শ্রীহরির মর্য্যাদা যথাসাধ্য বজায় রাখিয়াও ইঙ্গিতে তাহাকে সাবধান করিয়া গিয়াছে। নতুবা এখনই সে ছুটিয়া গিয়া অনিরুদ্ধের কণ্ঠনালীটা টিপিয়া ধরিত—যেমন করিয়া অন্ধকার রাত্রে লোকের গোয়াল হইতে পাঁটা-খাসীর কণ্ঠনালী রোধ করিয়া হত্যা করিয়া বাহির করিয়া আনে।

অনিরুদ্ধ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্বাসস্থলী পূর্ণ করিয়া বুকটাকে আরও খানিকটা চওড়া করিয়াই চণ্ডীমণ্ডপটা পার হইয়া গেল। পথে শ্রীহরির খামার-বাড়ীতে শুকাইতে-দেওয়া ধান পায়ে পায়ে ওলোট-পালোট করিয়া দিতে দিতে ছিরুর মা অশ্লীল ভাষায় গাল ও নিষ্ঠুরতম আক্রোশে নির্ম্মমতম অভিসম্পাত দিতেছিল। অনিরুদ্ধ সেও গ্রাহ্য করিল না, ধীর দৃঢ় গমনে সে সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া বাহির-দরজাটিতেই দাঁড়াইয়াছিল। থানা-পুলিশকে তাহার বড় ভয়। ছিরুর মায়ের অশ্লীল গালি-গালাজ এবং নিষ্ঠুর অভিসম্পাতগুলি এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। পদ্মও দুরন্ত মুখরা মেয়ে—গালি-গালাজ অভিসম্পাত সেও অনেক জানে। কাহারও স্পষ্ট নামোল্লেখ না করিয়া—তাহার অবস্থার সহিত মিলাইয়া এমনভাবে অভিসম্পাত দিতে পারে যে শব্দ-ভেদী বাণের মত ঠিক ব্যক্তিটির একেবারে বুকে গিয়া আমূল বিঁধিয়া যায়। কিন্তু আজ উৎকণ্ঠায় শাপ-শাপান্তগুলি মুখে আসিতেছিল না। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া গভীর আশ্বাসে সে একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পরমুহূর্ত্তেই চোখ মুখ দীপ্ত করিয়া সে অনিরুদ্ধকেই বলিল—আমিও এইবার গাল দোব কিন্তু!

অনিরুদ্ধের অবস্থাটা ঠিক শীতের বরফের মত, অনুত্তপ্ত স্থির সংকল্পে সে অবিচলিত-চিত্ত। স্ত্রীকে একটা ঠেলা দিয়া সে বলিল—না, গাল দিতে হবে না—ঘরে চল।

পদ্ম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—না, ঘরে যাব কেনে? কানের মাথা খেয়েছ? গালগুলা শুনতে পাচ্ছ না?

—তবে যা, গাল দিগে; গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর গিয়ে!

পদ্ম গজ গজ করিতে করিতে গিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে তেল বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—কি খোয়ারটা আমার করছে, শুনতে পাচ্ছ না তুমি? পদ্ম ও অনিরুদ্ধ নিঃসন্তান, তাই ছিরুর মা অনিরুদ্ধের নিষ্ঠুরতম মৃত্যু কামনা করিয়া পদ্মের জন্য কদর্য্যতম অশ্লীল ভবিষ্যতের নির্দ্দেশ দিয়া অভিসম্পাত দিতেছে। তেলের বাটি পাশে রাখিয়া সে স্বামীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহাকে তেল মাখাইতে বসিল। কর্কশ কঠিন হাত আগুনের আঁচে রোমগুলি পুড়িয়া কামানো দাড়ির মত করকরে হইয়া আছে। তেল দিতে দিতে পদ্ম বলিল—বাবা, হাত তো নয়, যেন উখো। শুধু হাত নয়—হাত পা বুক—মোট কথা দেহের সম্মুখ ভাগের অনাবৃত অংশটাই এমনি দগ্ধরোম।

অনিরুদ্ধ সে কথায় কান না দিয়া বলিল—আমার গুপ্তিটা বার ক'রে বেশ ক'রে মেজে রাখবি তো।

পদ্ম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমারও দা আছে, কাল মেজে ঘষে সান দিয়ে রেখেছি। নিজের গলায় মেরে একদিন দুখানা হয়ে পড়ে থাকব কিন্তু।

—কেনে?

—তুমি খুন-খারাপী ক'রে ফাঁসী যাবে—আর আমি 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি' ভোগ করতে বেঁচে থাকব না কি?

অনিরুদ্ধ কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলিল—হুঁ! অর্থাৎ পদ্মের 'হাড়ির ললাট ডোমের দুর্গতির' সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই, নতুবা ছিরেকে ঘায়েল করিয়া জেল খাটিতে বা হত্যা করিয়া ফাঁসী যাইতে বর্ত্তমানে তাহার আপত্তি ছিল না।

—বারণ করলাম, থানা-পুলিশ ক'র না। কথা কানেই তুললে না। কিন্তু কি হ'ল? পুলিশ কি করলে? গাঁয়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া বিবাদ বেড়ে গেল। আর আমি গাল দোব বললেই—একবারে বাঘের মত হাঁকিড়ে উঠছে—'না, দিতে পাবি না।'

রুদ্ধ-ক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে তাহার সাহসও হইল না প্রবৃত্তিও হইল না। বন্ধ্যা পদ্মকে লইয়া তাহাকে বড় সন্তর্পণে চলিতে হয়, সামান্য কারণে নিতান্ত বালিকার মত সে অভিমান করিয়া মাথা খুঁড়িয়া—কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তোলে—আবার কখনও প্রবীণা প্রৌঢ়া যেমন দুরন্ত ছেলের আবদার অত্যাচার সহ্য করে, তেমনি করিয়া হাসি-মুখে অনিরুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করে—অনিরুদ্ধের হাতে মার খাইয়াও তখন সে খিল খিল করিয়া হাসে। কখন কোন্ মুখে পদ্ম চলে—সে অনিরুদ্ধ বেশ বুঝিতে পারে। আজিকার কথার মধ্যে তাহার আবদারের সুর ফুটিতে আরম্ভ কবিয়াছে—সেইটুকু বুঝিয়াই সে দারুণ বিরক্তি সত্ত্বেও আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল। কোন কথা না বলিয়া সে আপনার পা-খানা টানিয়া লইয়া বলিল—কই, গামছা কই?

পদ্ম কিন্তু এটুকুতেও অভিমানে ফোঁস করিয়া উঠিল; মুখে সে কিছু বলিল না, কিন্তু বিদ্যুতগতিতে মুখ তুলিয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল—পরমুহূর্ত্তেই তেলের বাটিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বেলা পানে তাকিয়ে দেখেছিস? ছেঁয়া কোথা গিয়েছে দেখ। তিনটে বাজে।

গম্ভীরমুখে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর উঠানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্ম গামছাখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের হাতে দিয়া বলিল—ব'স, আমি জল এনে দি, বাড়ীতেই চান ক'রে নাও।

গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—সে দেরী হবে পদ্ম। আমি যাব আর আসব। পানকৌড়ির মত ভুক ক'রে ডুবব আর উঠব। ভাত তুই বেড়ে রাখ। সে দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম ভাত বাড়িতে রান্নাঘরের শিকলে হাত দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাত ডাল তরকারী সব তো হিম হইয়া গিয়াছে। বাবুর মুখে রুচিবে কি? বাবু নয়, নবাব। যত আয়, তত ব্যয়। কামার কুমোর ছুতার নাপিত স্বর্ণকার ইহাদের অবশ্য খরচে বলিয়া চিরকাল বদনাম, কিন্তু উহার মত—অর্থাৎ অনিরুদ্ধের মত খরচে পদ্ম কাহাকেও দেখে নাই। ওপারে সহরে কামারশালা করিয়া খরচের বাতিক বাড়িয়া গিয়াছে। এক টাকা সেরের ইলিসমাছ কে এ গ্রামে খাইয়াছে? এখন একটা কিছু গরম না করিয়া

দিলে নবাব কেবল ভাতে আর হাতে ছুঁইয়াই উঠিয়া পড়িবে। খিড়কীর ডোবাটার পাড়ে পদ্ম প্রথম আশ্বিনেই কয়েক ঝাড় পেঁয়াজ লাগাইয়াছিল, সেগুলা বেশ ঝাড়ো গোছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পেঁয়াজের শাক আনিয়া ভাজিয়া দিলে কেমন হয়? পদ্ম খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্য করিল—দুয়ারের পাশে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড়ের খানিকটা মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—গত কালের ছিরুপালের সেই বীভৎস হাসি! কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কে? কে দাঁড়িয়ে গো?

সাড়া পাইয়া মানুষটি চকিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিল। পদ্ম আশ্বস্ত হইল—পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। পরমুহূর্তেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—ছিরুপালের বউ! চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মেয়েটি—এককালে সুন্দরী ছিল সে, কিন্তু এখন অকালবার্দ্ধক্যে জীর্ণ। চোখে তাহার সকরুণ মিনতি। ছিরুপালের বউ বিনা ভূমিকায় দুটি হাত যোড় করিয়া বলিল—ভাই কামার বউ!

পদ্ম কোন কথা বলিতে পারিল না; ছিরুপালের বউকে সে ভাল করিয়াই জানে, এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। কত বড় ভাল ঘরের মেয়ে যে, তাও সে জানে। তাহার কত বড় দুঃখ তাও সে চোখে দেখিয়াছে—কানে শুনিয়াছে—ছিরুপালের প্রহার সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, ছিরুর মায়ের গালিগালাজ সে শুনিয়াছে।

ছিরুর বউ তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল—তোমার পায়ে ধরতে এসেছি ভাই।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া পদ্ম বলিল—না—না—না!

—আমার ছেলে দুটিকে তোমরা গাল দিয়ো না ভাই; যে করেছে তাকে গাল দাও—কি বলব আমি তাতে!

ছিরুপালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুটি মাত্র অবশিষ্ট। তাও পৈত্রিক ব্যাধির বিষে জর্জ্জরিত—একটি রুগ্ন, অপরটি প্রায় পঙ্গু।

সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পদ্মের একটা আত্ম-অজ্ঞাত হিংসা আছে; এই মুহূর্তে কিন্তু সে হিংসাও তাহার স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছিরুপালের স্ত্রী বলিল—তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। চাষীর মেয়ে—আমি জানি। তুমি ভাই এই কটা রাখ—বলিয়া সে স্তম্ভিত পদ্মের হাতে দুইখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—লুকিয়ে এসেছি ভাই, জানতে পারলে আমার আর মাথা থাকবে না—বলিয়াই সে দ্রুতপদে ফিরিল। দরজার মুখে গিয়া সে আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুটি যোড় করিয়া বলিল—আমার ছেলেদের কোন দোষ নাই ভাই; আমি যোড়হাত ক'রে যাচ্ছি।

পরমুহূর্তেই সে খিড়কীর দরজার ও-পাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। পদ্ম যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

কিছুক্ষণ পরে তাহার এই স্তম্ভিত ভাব কাটিয়া গেল—অদূরবর্ত্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। আবার একটা গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে। সকল কোলাহলের উর্দ্ধে একজনের গলা শোনা যাইতেছে। পদ্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল;—অনিরুদ্ধ? না, সে নয়। তবে? ছিরুপাল? কান পাতিয়া শুনিয়া পদ্ম বুঝিল—এ ছিরুপালের কণ্ঠস্বরও নয়। তবে? সে দ্রুতপদে আসিয়া বাহির দরজার সম্মুখে পথের উপর দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট বুঝিল—এ কণ্ঠস্বর এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণবাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের। পদ্ম এবার নিশ্চিন্ত হইল। মুখে খানিকটা ব্যঙ্গ-হাস্যও দেখা দিল। হরেন্দ্র ঘোষাল পাগলও খানিকটা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ গ্রামে সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার চলা চাই। ছিরুপাল সাইকেল কিনিলে—সে সাইকেল এবং কলের গান কিনিয়া ফেলিল জমি বন্ধক দিয়া। ছিরুপাল নাকি রহস্য করিয়া রটনা করিয়াছিল—সে এবার ঘোড়া কিনিবে। হরেন্দ্র মানরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল—ছিরুপাল ঘোড়া কিনিলে সে একটা হাতী কিনিবে। আজ আবার বামুনের কি রোখ মাথায় চাপিয়াছে কে জানে? পথে কেহ একটা ছোট ছেলেও নাই যে জিজ্ঞাসা করে!

ঠিক এই সময়েই পদ্ম দেখিল, অনিরুদ্ধ আসিতেছে। কাছে আসিয়া পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্ম বলিল—মরণ! হাসছ কেনে?

অনিরুদ্ধ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।

—যা গেল? কথা ব'লেই তো মানুষে হাসে!

চেঁচামেচি কিসের? হ'ল কি? হরু ঠাকুর এমন চেঁচাচ্ছে কেনে?

বহু কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত ঠাকুরকে ভারী জব্দ করেছে। আধখানা কামিয়ে দিয়ে—আবার প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়া কোনমতে অনিরুদ্ধ কথাটা শেষ করিল। তারা নাপিতও তাহাদের দেখাদেখি বলিয়াছে, ধান লইয়া গোটা বৎসর সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ সে করিতে পারিবে না। যাহাদের জমি নাই—হাল নাই—তাহাদের কাছে ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের আছে—তাহারাও সকলে দেয় না। সুতরাং ধানের কারবার ছাড়িয়া সে নগদ কারবার সুরু করিয়াছে। হরুঠাকুর আজ কামাইতে গিয়াছিল—তারা নাপিত পয়সা চাহিয়াছিল। খানিকটা বকিয়া অবশেষে পয়সা দিব বলিয়াই হরুঠাকুর কামাইতে বসে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত—একে নাপিত ধূর্ত্ত—তায় তারা। আধখানা কামিয়ে বলে—কই, পয়সা দাও ঠাকুর? হরু বলে—কাল দোব। তারাও অমনি ক্ষুর ভাঁড় গুটিয়ে ঘর ঢুকে ব'লে দিয়েছে—তা হ'লে আজ থাক —কাল বাকীটা কামিয়ে দেব। এই চেঁচামেচি গালাগাল—হিন্দী—ফার্সী ইংরিজী! গাঁয়ের লোক আবার জটলা পাকাচ্ছে। অনিরুদ্ধ আবার প্রবল কৌতুকে হাসিয়া উঠিল—সে হাসির তোড়ে তাহার মুখের ভাত ছিটাইয়া উঠানময় হইয়া গেল।

পদ্মের খানিকটা শুচি-বাই আছে; তাহার হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু সে আজ কিছুই বলিল না। অনিরুদ্ধের এত হাসিতেও সে এতক্ষণের মধ্যে একবারও হাসে নাই। কথাটা অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ মনে হইল। সে গভীর বিস্ময়ে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোর কি হ'ল বল দেখি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—ছিরু পালের বউ এসেছিল।

—কে? বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিল।

—ছিরু পালের বউ। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিয়া পদ্ম কাপড়ের খুঁটে বাঁধা নোট দু-খানি দেখাইল।

অনিরুদ্ধ নীরব হইয়া রহিল।

পদ্ম আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মায়ের প্রাণ!

অনিরুদ্ধ আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, যেন ঝাঁকি দিয়া নিজেকে টানিয়া তুলিল—বলিল—বাবাঃ, রাজ্যের কাজ বাকী প'ড়ে গিয়েছে। এই খেয়ে-দেয়ে এক কোশ পথ ছুটতে হবে।

পদ্ম কোন কথা বলিল না। হাতমুখ ধুইয়া মশলা মুখে দিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ একমুখ হাসিয়া বলিল—একখানা নোট আমাকে দে দেখি।

পদ্ম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধ আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল—লোহা আর ইস্পাত কিনতে হবে পাঁচ টাকার। ছিরে শালাকে টাকা দিতে খদ্দেরের পাঁচ টাকা ভেঙেছি। আর—

পদ্ম কোন কথা না বলিয়া একখানা নোট অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি নিজে একটি—মাইরী বলছি—একটি টাকার বেশী একটি পয়সা আমি খরচ করব না। কতদিন খাই নাই বল্ দেখি।

অর্থাৎ মদ।

পদ্ম তবুও কোন কথা বলিল না। অকস্মাৎ যেন অনিরুদ্ধের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

(ছয়)

হরু ঘোষালের আধখানা দাড়ি কামাইয়া বাকীটা রাখিয়া দেওয়ায় তারা নাপিতের যতই পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকুক এবং গ্রামের লোকে প্রথমটা হরু ঘোষালের সে অর্দ্ধনারীশ্বরের মত রূপ দেখিয়া হাসিয়া যতই হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলুক—প্রতিক্রিয়ার ঘটনাটা কিন্তু ততই ঘোরালো এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হরিশ মণ্ডল প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি—লোকটির বোধ-শক্তিও আছে। সেই প্রথম বলিল—হাসিস না তোরা; হাসির ব্যাপার এটা নয়। গাঁয়ের অবস্থাটা কি হ'ল ভেবে দেখেছিস?

সকলেই হাসির বেগের প্রবলতা খানিকটা সম্বরণ করিয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিল। হরিশ গম্ভীরভাবে বলিল—অরাজক!

ভবেশ পাল—ছিরুর কাকা—স্থূল ব্যক্তি, তবুও বুদ্ধিমত্তার ভাণ তাহার আছে, সেও গম্ভীরভাবে বলিল—তা বটে!

দেবদাস বুদ্ধিমান যুবক—সে ব্যাপারটা চকিতে অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—তা তো হবেই আপনার। সে আপনি আটকাবেন কি ক'রে? গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের? ওই কামার ছুতোরের ব্যাপারে—ছিরু--দ্বারিক চৌধুরীর অপমান করলে, চৌধুরী উঠে চ'লে গেল; জগন ডাক্তার তো এলই না—উল্টে অনিরুদ্ধকে উস্কে দিলে।

ভবেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরি নাম সত্য হে! 'কলি শেষে একবর্ণ হইবে যবন'—এ কি আর মিথ্যে কথা বাবা! এমনি ক'রেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব যাবে।

হরিশ বলিল—লুটনী দাই কি বলেছে জান? আমার বউমায়ের ন'মাস চলছে তো! তাই ব'লে পাঠিয়েছিলাম যে রাত-বিরেতে কোথাও যদি যাস, তবে আগে খবর নিয়ে যাস যেন! তা বলেছে—আমাকে কিন্তু নগদ বিদেয় করতে হবে।

গভীর চিন্তায় ভোর হইয়া ভবেশ বলিল—হুঁ!

হরিশই বলিল—রাজা বিনে রাজ্যনাশ যে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের জমিদার যে হয়েছে—থেকে না-থাকা!

দেবদাস বলিল—জমিদারের কথা বাদ দেন। জমিদার আমাদের বরং ভালই। এ কাজ তো জমিদারের নয়—আপনাদের। আপনারা কই শক্ত হয়ে ব'সে ডাকুন দেখি মজলিস; ঘাড় হেঁট ক'রে সবাইকে আসতে হবে। আসবে না—চালাকী না কি? বিপদ আপদ নাই তাদের? লোহাতে মুড় বাঁধিয়ে ঘর ক'রে সব? চৌধুরীকে ডাকুন—জগন ডাক্তারকে ডাকুন—ডেকে আগে ঘর বুঝুন—তারপর কামার, ছুতোর, বায়েন, দাই, ধোপা, নাপিত এদের ডাকুন। আর ন্যায্য বিচার করুন।

হরিশ মাতব্বরগণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দেবদাস কিন্তু বলেছে ভাল। কি বলেন গো সব?

ভবেশ বলিল—উত্তম্ কথা।

নটবর বলিল—হ্যাঁ, তাই করুন তা হ'লে।

দেবদাসের উৎসাহের সীমা ছিল না, সে বলিল—আজই বসুন সব সন্ধ্যের সময়। আমি আসর ক'রে দিচ্ছি, ইস্কুলের চল্লিশ বাতীর আলো এনে দিচ্ছি; খবরও দিচ্ছি সকলকে। কি বলছেন?

হরিশ আবার সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি গো?

—তা বেশ!

—খানিকটা তামাক আর আগুনের যোগাড় যেন রেখো বাপু!

বহুকাল পরে চণ্ডীমণ্ডপটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও চণ্ডীমণ্ডপটা এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জম-জমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্ত্তন গান হইত, পাশা-দাবাও চলিত, সলা-পরামর্শে গ্রামখানির কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপটি। গ্রামে কাহারও কুটম্ব-সজ্জন আসিলে—এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া-কর্ম্ম—অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ সবই অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। ধূলায় এবং কাল গতিকে—অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিব-মন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্ব্বপুরুষ—জগনের পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল। প্রথমে সে অবশ্য এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া রোগী দেখিত। তারপর অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যও বটে এবং জমিদারের গমস্তার সঙ্গে কি কয়েকটা কথান্তরের জন্যও বটে—কবিরাজ ঔষধালয় এবং বৈঠকখানা তুলিয়া তামাক ও পানের স্বাচ্ছন্দ্যে মজলিস জমাইয়া—চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ভাঙন ধরাইয়া দিয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকের বাড়ীতেই একটি করিয়া বাহিরের ঘরের পত্তন হইয়াছে; সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র গ্রাম জুড়িয়া অনেকগুলি ছোট মজলিস জমিয়া উঠে। কেহ বা একাই একটি আলো জ্বালিয়া সম্মুখস্থ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তবে এখনও জগন ডাক্তারের ওখানেই মজলিসটি বড় হয়। জগনের রূঢ় দাম্ভিকতা সত্ত্বেও—রোগীর বাড়ীর লোকজন যায়; আরও কয়েকজন যায়—ডাক্তারের অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সংবাদের প্রত্যাশায়। দেবদাস ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও

যায়। সেই চীৎকার করিয়া কাগজ পড়ে, অন্য সকলে শোনে। অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হইয়াছে, স্বরাজপার্টির উগ্র বক্তৃতায় এবং সমালোচনায় কাগজের স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মনে চমক লাগে—স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে যেন একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়।

আজ দেবদাসই সকলকে সম্ভাষণ করিতেছিল, সেই উদ্যোক্তা। মজলিস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হইতেই সে বেশ আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুলগাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেব মূর্ত্তি সেখানে গাছের শিকড়ে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে; সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত হয়। সেখানে একটা মোটা শুকনা ডাল জ্বালিয়া আগুন করা হইয়াছে। সেই আগুনের চারি পাশে গ্রামের জনকতক হরিজন আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মজলিস কেবল জন-কয়েকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দ্বারকা চৌধুরী, জগন ডাক্তার, ছিরু পাল এবং আরও দুই একজন এখনও আসে নাই।

চল্লিশ-বাতীর আলোয় উজ্জ্বল চণ্ডীমণ্ডপটির উপরের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল—বেশ লাগছে বাপু!

হরিশও একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—এইবার কিন্তু একবার মেরামত করতে হবে—চণ্ডীমণ্ডপটিকে। বলিয়া সে সপ্রশংস কণ্ঠে বলিল—কি কাঠামো দেখ দেখি! ওঃ—কি কাঠ!

দেবদাস বলিল—ষড়দলে লেখা আছে কি জানেন?—যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী। মানে চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী যতদিন থাকবে—এও ততদিন থাকবে।

—তা থাকবে বাপু! বলিহারী—বলিহারী! ভবেশ পাল অকারণে উচ্ছ্বসিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই দ্বারকা চৌধুরী লাঠি হাতে ঠুক-ঠুক করিয়া আসিয়া বলিলেন—ওঃ, তলব যে বড় জোর গো!

দেবদাস ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল—জগন ডাক্তার ও ছিরুর জন্য। আবার সে দুটি ছেলেকে দুজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জগন ডাক্তার আসিল না, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—তাহার সময় নাই। চোখে চশমা লাগাইয়া সে নাকি খবরের কাগজ পড়িতেছে। ছিরুও আসে নাই; তাহার জ্বর হইয়াছে, তবে সে বলিয়াছে—'পাঁচ জনে যা করবেন তাই আমার মত।'

দেবদাস আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ছিরুর বিনয়ে।

* * *

ছিরুর কথাটা অস্বাভাবিক দোষে দুষ্ট; বিনয়ের ধার শ্রীহরি ঘোষ ধারে না। জ্বর তাহার হয় নাই। সে নির্ম্মম আক্রোশে গর্ত্তের ভিতরের আহত অজগরের মত মনে মনে পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে দাওয়ার উপর উপু হইয়া বসিয়া সে প্রকাণ্ড বড় হুঁকাটায় ক্রমাগত একঘেয়ে টান টানিয়া যাইতেছিল ও প্রখর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উঠানের একটা বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। নানা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে।

ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে কি হয়? মনটা আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে। পরক্ষণেই মনে হয়, না। সদ্য-সদ্য আক্রোশের কথাটা বড় হইয়া—আবার এমনি ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। আজই পঞ্চাশ টাকা জমাদার বন্ধুকে দিতে হইয়াছে! সেই লইয়া তাহার মা এখনও বক-বক গজ-গজ করিয়া তাহাকে গালি পাড়িতেছে।

—মর তুই মর রে! এমন রাগ তোর! সবুর নাই! হাঁদা—গাড়োল কোথাকার! পঞ্চাশ টাকা আমার খল-খল করে বেরিয়ে গেল! বুকে বাঁশ চাপিয়ে যাও তুমি—আমার হাড় জুড়োক!

শ্রীহরি চুপ করিয়া আছে। অন্য সময় হইলে এতক্ষণ সে বুড়ীর চুলের মুঠা ধরিয়া উঠানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া নির্ম্মম প্রহার আরম্ভ করিত। কিন্তু আজ গভীর নিষ্ঠুরতম চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

—অনিরুদ্ধ ওপার হইতে রাত্রি নয়টা দশটার সময় ফেরে। অতর্কিত আক্রমণে—না! সঙ্গে গিরীশ ছুতার থাকে। দুজনকেও ঘায়েল করা অবশ্য খুব শক্ত নয়; শেষ করিয়া দেওয়াই বা এমন কি কঠিন? শ্রীহরির মিতে চন্দ্র গড়াঞী সানন্দে তাহাকে সাহায্য করিবে।

পরক্ষণেই সে চমকিয়া উঠিল। ফাঁসী হইয়া যাইবে! তাহার সে চমক এত পরিস্ফুট যে তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি বৃদ্ধা মা পর্য্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে বলিল—মর মুখপোড়া! ছোট ছেলের মত চমকে উঠে যেন, দেয়ালা করছে!

শ্রীহরি অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল—পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া—হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া দিয়া বলিল—এই ! কল্কেটা পাল্টে দে !

কথাটা বলা হইল তাহার স্ত্রীকে। ছিরুর স্ত্রী উনান-শালে ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। পাশেই ল্যাম্পের আলোয় ছিরুর বড় ছেলেটা বই খুলিয়া—একদৃষ্টে বাপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। শীর্ণ রুগ্ন বছর দশেকের ছেলেটা—গলায় এক বোঝা মাতুলী—বড় বড় চোখে অদ্ভুত স্থির অকম্পিত দৃষ্টি দিয়া বাপের প্রতিটি ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীহরির ছোট ছেলেটা প্রায় পঙ্গু এবং বোবা ; সেটাও একপাশে বসিয়া আছে—মুখের লালায় সমস্ত বুকটা অনবরত ভিজিতেছে। বড় ছেলেটিই উঠিয়া আসিয়া কল্কেটা লইয়া গেল। শ্রীহরি ছেলেটার দিকে একবার চাহিল। ছেলেটা অদ্ভুত, শ্রীহরির মার খাইয়াও কাঁদে না, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। উহার জন্য এখন উহার মাকে প্রহার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মাকে সে যেন আগলাইয়া ফেরে। মারিলে পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠে। সেদিন একটা সূচ সে প্রহার-রত শ্রীহরির পিঠে বিঁধিয়া দিয়াছিল। ছেলেটার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রীহরি স্ত্রীর দিকে চাহিল—উনানের আগুনের আভায় শীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে—চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার মুখ ! শ্রীহরি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

—অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে পাচীল ডিঙাইয়া—পদ্ম কামারনীকে বাঘের মত মুখে করিয়া—শ্রীহরির বুকখানা ধ্বক ধ্বক করিয়া লাফাইয়া উঠিল ! দীর্ঘাঙ্গী সবল দেহ কামারনীর দাথানা কিন্তু বড় শাণিত ! চোখের দৃষ্টি তাহার শীতল এবং ক্রূর ! দাখানার রৌদ্র-প্রতিফলিত ছটায় ছিরুর চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল !

—বায়েনদের দুর্গা—কামারনীর চেয়ে দেখিতে অনেক ভাল—যৌবনও তাহার উচ্ছ্বসিত। দেহবর্ণে সে গৌরী। লীলা-লাস্যও তাহার অপূর্ব্ব। কিন্তু তাহার আকর্ষণ শ্রীহরিকে আর তেমন বিচলিত করে না। দুর্গার দাদা পাতু আবার তাহার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করিয়াছে। শ্রীহরির মুখে তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জমিদারের ছেলের সোনার নিমফলের গোট তাহার কাছে বাঁধা আছে ! শ্রীহরি অকস্মাৎ উঠিল।

শ্রীহরির স্ত্রী কল্কেতে নতুন তামাক সাজিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। তামাক শ্রীহরিকে আকর্ষণ করিল না। দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলানো জামাটা হইতে বিড়ি দেশলাই বাহির করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। অন্ধকার গলিপথে পথে ঘুরিয়া সে আসিয়া হরিজন পল্লীর প্রান্তে উপস্থিত হইল।

প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে ! পল্লীর প্রান্তে বহুকালের বৃদ্ধ বটগাছ, গ্রামের ধর্ম্মরাজতলায়—প্রতি সন্ধ্যায় উহাদের মজলিস বসে। গান-বাজনা হয়, ভাসান, বোলান, ঘেঁটু গানের মহলা চলে—আবার দুর্নিবার কলহও বাধিয়া উঠে। আজ কলহ বাধিয়াছে। শ্রীহরি একটা গাছের অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিল।

পাতু চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে।

দুর্গার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজও উঠিতেছে—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোসাই। দাদা সাজছে—দাদা ! মারবি কেনে তু ? আমি যা খুসী তাই করব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি ?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মাও চীৎকার করিতেছে। শ্রীহরি হাসিল—তাহাকে লইয়াই আন্দোলন চলিতেছে !

সহসা সে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল দুর্গাদের পল্লীর দিকে। পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। সব গিয়া ওইখানে জুটিয়াছে। শ্রীহরি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িল দুর্গাদের বাড়ীতে। বাড়ী অর্থে প্রাচীর-বেষ্টনীহীন একটুকরা উঠানের দুইদিকে দুখানা ঘর ; একখানা দুর্গা ও দুর্গার মায়ের—অপরখানা পাতুর। শ্রীহরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাতুর ঘরখানার দিকে। পাতুর সেই মোটাসোটা ছোটখাটো বিড়ালীর মত বউটা কোথায় ? শ্রীহরি হতাশ হইল। দরজাটা বন্ধ—দাওয়াটাও শূন্য।

একটা কুকুর অকস্মাৎ গোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয় চুরি করিয়া চামড়া খাইতে আসিয়াছিল। শ্রীহরি হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, সুকৌশলে হাতের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে লুকাইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইল। দুর্গার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে কে জানে ? গাছের আড়ালে আবার সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কিন্তু ঝগড়াটা ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি আবার একটা বিড়ি ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে সে গাছতলা হইতে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা পাতুর চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত লঘুপদে আপন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপে প্রবল আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীহরি হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের ঊর্দ্ধলোকে অন্ধকার আকাশ রক্তাভ আলোয় ভয়াল হইয়া উঠিল। আকাশের নক্ষত্র মিলাইয়া গিয়াছে। পোড়া খড়ের জ্বলন্ত অঙ্গার আকাশে উঠিয়া নিবিয়া যাইতেছে ফুলঝুরির মত। আগুন ! আগুন ! আর্ত্ত চীৎকার—শিশু ও নারীর উচ্চ কান্নার রোলে শূন্য-লোকের বায়ুতরঙ্গ মুখর হইয়া উঠিল।

চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস ভাঙিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অবশেষে 'বিশ্বভারতী' বাসের গতি মন্থর হয়ে এলো।

মেঘে মেঘে মলিন মধ্যাহ্ন। রাঙা মাটীর পথের ধারে-ধারে গাছের শাখা-প্রশাখায় আছড়ে পড়েছে শ্রাবণের

রায় বাহাদুর শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম-বি-ই

স্তিমিত রোদ্দুর। শ্রীনিকেতনের সীমানায় আমরা প্রবেশ করলাম।

ছাত্ররা আমাদের নিয়ে এগিয়ে গেল। ভিজে মাটীর সোঁদা গন্ধে পাখীর কাকলীতে প্রকৃতির সজীব সৌন্দর্যে মুখরিত আশ্রম। আমাদের শহুরে চোখে নামলো পারহীন বিস্ময়।

শ্রীনিকেতনের চার পাশ কোনও দিন ছিল অরণ্যে ঘেরা —আজও সেকথা বোঝা যায়। এখানকার কর্মীরা ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলছেন অরণ্য—বর্ষা বাধা পায় ব'লে। অরণ্য ধ্বংস করতে গিয়ে বহু প্রয়োজনীয় বৃক্ষও নষ্ট হ'য়ে যায়। এতেও প্রচুর ক্ষতি হয় গ্রামবাসীর।

গুরুদেব তাই 'বৃক্ষরোপণ' বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেছেন। এ উৎসবে মহাসমারোহে বেদ-সঙ্গীতে চারদিক প্রতিধ্বনিত ক'রে গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় বৃক্ষ রোপণ করেন

দেশের অপরূপ রূপ একদিন মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল গ্রামের পাতায় শাখায়। শহরের সংহারে আজ সে-সৌন্দর্য ভস্মীভূত। আজ শুধু পড়ে আছে কঙ্কাল। এই কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাই শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য।

গুরুদেব শুধু সাহিত্যিক নন। তিনি কর্মী, তিনি দেশপ্রেমিক। মর্মে মর্মে তিনি উপলব্ধি করেছেন দেশের [illegible] উন্নতি করতে হ'লে সর্বপ্রথম প্রয়োজন গ্রাম-সংস্কার। [illegible] ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দেড়েক দূরে গুরুদেব শ্রীনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজীতে বলা চলে, 'The Abode of Prosperity'.

অকস্মাৎ শ্রাবণের সজল হাওয়া আমাদের গায়ে [illegible]। মর্মর সুরু হল গাছে গাছে। মাথার ওপরে [illegible] বিশাল আকাশ—আর চারপাশে সুদূর [illegible] নামলো। দ্রুত পদক্ষেপে উপস্থিত [illegible] কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible]

শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যাঁরা [illegible] করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ [illegible] নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা সমীচীন। আজ তিনি নাই,

স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ

কিন্তু এই আশ্রমের প্রতি কণাই তাঁর অতুল পরিশ্রমের সাক্ষ্য দেয়। ...

বর্তমানে শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনিকেতনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অনেকাংশে এই আশ্রম তাঁর কাছে ঋণী। শ্রীনিকেতনের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সুকুমারবাবু আমাদের অনেক কথাই শোনালেন এবং নিজে আমাদের নিয়ে বেরুলেন আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখাতে। ওদিকে বৃষ্টির অবসান হ'ল।

গ্রামবাসীদের শক্তি হয়তো আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে-শক্তি অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। শ্রীনিকেতনের কক্ষে কক্ষে শিক্ষার বিচিত্র সুর ধ্বনিত।

কর্তৃপক্ষ নিরক্ষর গ্রামবাসীর জন্য সযত্নে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষার্থীদের দিক থেকেও সাহায্যে গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি ও সমবায় সমিতির উন্নতির কথা শিক্ষকেরা তাদের বুঝিয়ে দেন।

গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্যে আবার আলাদা 'ভবন' খোলা হয়েছে। তার নাম 'শিক্ষা-চর্চা-ভবন'। শিক্ষকদের শিক্ষা আরও উন্নত করাই এই ভবনের উদ্দেশ্য—যেন তারা ভবিষ্যতে সুবিবেচনার সঙ্গে গ্রাম-সংস্কার করতে পারেন।

আজ শ্রাবণের জলভরা সরস মধ্যাহ্নে কে যেন অকস্মাৎ আমাদের টেনে এনেছে নূতন পৃথিবীতে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সীমানায় ক্ষণে ক্ষণে কাণে বাজে মহাসঙ্গীত। প্রকৃতির প্রাণময় প্রকাশমুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে বিচিত্র জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। বাঁচার গানে, জাগরণের মন্ত্রে, জীবনের জীবন্ত প্রকাশে সজীব চারধার।

পল্লী সংস্কার প্রতিষ্ঠান ও তাহার কতিপয় কর্ম্মী

সজীব সাড়া পাওয়া গেছে। গ্রাম্য বালকের চরিত্র গঠনের দিকেও শিক্ষকেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাদের মন প্রফুল্ল করতে, জীবনের চঞ্চল স্রোতে তাদের মাতিয়ে রাখতে এরা সতত সতর্ক। নাচ, গান এবং নানাপ্রকার খেলায় মাতিয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদের মন জয় ক'রে নেন—সম্পর্ক সহজ ক'রে তোলেন।

স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যও এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অপরাহ্নে প্রায়ই তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আলোচনা করা হয়, সরল সহজ বই পড়ে শোনানো হয় এবং ম্যাজিকল্যাণ্টার্নের

এখানকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতি চেয়ে অপার আনন্দে মন ভরে যায়। মনে হয় আবার ফিরে এসেছে গ্রামে সে-সৌন্দর্য, সে-অনাবিল আনন্দ। চোখে পড়ে বাঙলার সত্যিকারের রূপ।

এরা উৎপাদন করেছে নানাপ্রকার ধান, গম, আলু, আক—এমন কি, তামাকও। এই আশ্রম মন দিয়েছে আশে পাশের গ্রামগুলির সংস্কারে। তাই ক্রমে ক্রমে এদের শক্তি ও সাহস বেড়ে যাচ্ছে। নব উদ্যোগে, নব উৎসাহে, নব অনুপ্রেরণায় গ্রামবাসীরা আজ জেগে উঠেছে। আবার আগের মত সোনা ফলবে ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রে—আবার

জেগে উঠবে ঘুমন্ত নির্জীব প্রাসাদের প্রতি কক্ষ। তার আর দেরী নেই।

সমবায় সমিতিগুলির প্রতি গুরুদেবের আস্থা প্রচুর। শ্রীনিকেতনে নানাপ্রকার সমবায় সমিতি আছে, আর এগুলি ভালভাবে পরিচালনা করবার জন্য কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেনার দায়ে গ্রামবাসীর জীবন বর্তমানে জ্বালাময় দুঃস্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছে। অনাহারে অনিদ্রায় প্রচুর পরিশ্রম করাও তাদের পক্ষে সুকঠিন—একথা সর্বজনবিদিত।

এই ব্যাঙ্ক শুধু গ্রামবাসীদের অল্প সুদে টাকা ধার

এদের সব সময় খুব অল্প মূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এখানকার প্রধান চিকিৎসক সুযোগ্য এবং গুণী।

আমরা শহরবাসী। পঙ্গু প্রভাত, ম্লান মধ্যাহ্ন, নীরস দিন নীরবে অতিবাহিত করি প্রাচীর ঘেরা নিঃসাড় কারাকক্ষে—শহরের সংকীর্ণ সসীম সীমানায় বসে ভাবি, শহর-সভ্যতার বোঝা নামিয়ে কোন দিনও কি আমরা ছুটে যাব না আমাদেরই একান্ত আপনার জনের কাছে—বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে? গুরুদেবের মহান আদর্শ কোন দিনও কি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে না—যারা আমাদের মেরুদণ্ড তাদেরই মেরুদণ্ডে আজ ধরেছে ঘুণ!

শ্রীনিকেতনে তাঁত শিল্প

দেয় না—আরও অনেক জনহিতকর কাজে অর্থের সদ্ব্যবহার করে। পুকুর খনন, জল সেচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য এখানকার কর্তৃপক্ষ একথা মুহূর্তের জন্যও ভোলেন নি যে, গ্রামবাসীদের প্রকৃত কর্মী ক'রে তুলতে হ'লে দৃষ্টি রাখতে হবে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি। দূর করতে হবে তাদের পারিবারিক দৈনন্দিন অশান্তি।

কোন কালে বীরভূম অঞ্চলের লোকালয়গুলি স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে আনন্দ-মুখরিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আর সেদিন নেই। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার দুরারোগ্য ও সংক্রামক রোগে সে-আনন্দ আজ কোথায় মিলিয়া গেছে।

শ্রীনিকেতনের হাসপাতাল যথাসাধ্য চেষ্টা করে এই সমস্ত রোগের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করছে।

আর কতদিন অলীক অহঙ্কার বুকে ব'য়ে উদাসীনতার চাপে নিশ্চিন্তে আমরা দূরে সরে থাকব!

মধ্যাহ্নের মৃত্যু হল। অপরাহ্নের আরম্ভ। আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টি বিচিত্র—এই আসে, এই যায়। আমরা এবার কুটীর-শিল্পের দিকে মনোযোগ দিলাম।

শ্রীনিকেতনের কুটীরশিল্প সত্যই আকর্ষণীয়। মৃৎ-শিল্প, বয়ন শিল্প, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ সমস্তই এখানে শেখানো হয়। বর্তমানে এদের কর্মের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্ছে, কারণ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এরা আজ। এদের কাজের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব—রুচির পরিচয়। ব্যাগ, জুতা, চটি প্রভৃতির ডিজাইন্ এত সুন্দর যে দেখলেই

বিক্রয় হচ্ছে। জনসাধারণের ক্রয়ের সুবিধার জন্য ক'লকাতায় শ্রীনিকেতনের একটি শাখা খোলা হয়েছে।

ভরা বনপথে—আশ্রমের ছায়াতে আলোতে বাঁশরী উঠেছে বেজে।

গ্রামে সব্জী চাষ

এই সমস্ত শেখানো হচ্ছে গ্রামবাসীদের স্বাধীন জীবন যাত্রার জন্য, তাদের আত্মনির্ভর ক'রে তোলবার জন্য। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা গেছে আজ।

আজ শ্রীনিকেতন শ্রীমণ্ডিত হ'যে উঠেছে রূপে রসে রঙে। সজীব ঘাসে ছাওবা মাঠে-মাঠে, রজনীগন্ধাব গন্ধে

"দুঃসহ ব্যথা হ'যে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।
পোহায রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতেব মহা-মানবেব
সাগব-তীরে।"

তোমারে পূজিব শুধু

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল

তোমাবে পূজিব শুধু
ধন মান তেযাগিযা দূবে,
তোমারে ভাবিব শুধু
অন্তরের অন্ততম পুরে।
ডাকিব তোমারে শুধু
কভু যদি নাহি দাও সাড়া,
তব ধ্যান শুধু মোরে
হরষে করিবে আত্ম-হারা।
তোমারে বন্দিতে দেব,
সারা বিশ্ব পায়ে দিব বলি,

শত সুখ শত ব্যথা
দ্বাব হ'তে যাবে দূরে চলি।
করুণা পরশে তব
মুগ্ধপ্রাণ রবে অবিরল,
তপ্ত অশ্রুধাবা হবে
একমাত্র মম কাম্য ফল।
সার্থক জীবন মম
চিরানন্দে রহিবে ডুবিয়া,
অনন্তের পূজারী যে
অনন্তেতে যাইব মিশিয়া।

কথা ও স্থর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম **স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক**

দোলন-চম্পা *

তাল—ত্রিতালী

দোলন চাঁপা বনে দোলে,
দোল পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম পল্লব কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥
যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি,
ফুল হ'য়ে দোলে ধরায় আসি,
আরতির মৃদু জ্যোতি প্রদীপ কলি
দোলে যেন দেউল-আঙ্গিনাতে॥
বন-দেবীর ওকি রূপালী-ঝুম্‌কা
চৈতী সমীরণে দোলে,
রাতের সলাজ আঁখিতারা
যেন তিমির আঁচলে।
ও-যেন মুঠিভরা চন্দন-গন্ধ
দোলেরে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও-কিরে চুরিকরা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রা যামিনীর মোহন হাতে॥

	৩					০					১					+				
II	সা	-গা	জ্ঞা	পা	|	-া	জ্ঞা	পা	-া	|	-া	গা	মা	মনা	|	ধধা	-া	া	া	I
	দো	০	ল	ন		০	চাঁ	পা	০		০	ব	নে	দো		লে				
I	া	া	না	সা	|	র্সধা	-ণা	ধা	পা	|	জ্ঞা	পা	-া	গা	|	মা	-া	রা	সা	I
	•	•	দো	ল্		পূ	০	র্ণি	মা		রা	তে	০	চাঁ		দে	র্	সা	থে	

I া া গা -া | ম্া -া রা সা | রা -া সা -া | া া গা ক্মা I
০ ০ শ্যা ম্ প ল্ ল ব কো ০ লে ০ ০ ০ যে ন

I পা -ক্মা পা -ক্মা | গা মা মধা -া | না র্সা -া ধা | ধা ণা ধা পা II
দো ০ লে ০ রা ০ ধা ০ ল তা ০ য় দো ল না তে

৩ ০ ১ +
II পা ক্মা পা -ধা | গা মা মধা -া | পা -না ধা র্সা | না -া -া -া I
যে ন দে ব্ কু মা রী র্ শু ০ ভ্র হা সি ০ ০ ০

I র্সা র্গা র্মা -র্রা | র্সা -ননর্সা র্সধা -পা | ধা ণা -া ধা | পা -া -া -া I
ফু ল্ হ' য়ে দো ০০০ লে ০ ধ রা য়্ আ সি ০ ০ ০

I সা গা ক্মা -পা | সা গা -া ক্মা | পা -া ক্মা পা | -া ক্মা পা -া I
আ র তি র্ মৃ দু ০ জ্যো তি ০ প্র দী প্ ক লি ০

I গা -মা রা -সা | সধা ণধণধা -ণপা -া | না র্সা -া -র্সাধ | ধা ণা ধা পা II
দো ০ লে ০ যে ০০ ন ০ দে উ ০ ল্ আ ঙি না তে

৩ ০ ১ +
II া রা সান সা | গা -া ক্মা পা | ধা না র্সা -া | র্সধা -া পা -া I
০ ব ন দে বী র্ ও কি রূ পা লী ০ ঝু ম্ কা ০

I া ধা -র্সণা ধা | পা ক্মপা গা মা | মনা র্সনর্সনা -র্সধা -া | -া -া -া -া I
০ চৈ ০ তী স মী ০ র ণে দো ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I ক্মা পা -া -ক্মপা | গা মা -গমা রা | গা -া রা সন্া | সা -া সা ন্া I
রা তে ০ র্ স লা ০ জ্ আঁ ০ খি তা রা ০ যে ন

I সা গা ক্মা পা | ক্মা পা -া ক্মা | পা -া -া গমা | মর্সা ধা -া -া I
তি মি র আঁ চ লে ০ দো লে ০ ০ দো০ লে০ ০ ০ ০

I পা -না -ধা ধর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা -া র্সা র্সা | র্সধা -ণা ধপা -া I
ও ০ যে ন মু ঠি ভ রা চ ন্ দ ন গ ন্ ধ০ ০

I র্সা না র্সা র্সর্গা | র্গর্মা র্মর্রা র্সা -া | না র্সা না র্রর্সা | র্সধা -ণা ধা -া I
দো লে • রে• গো পি নী র্ গো প ন আ ন ন্ দ ০

I ধা -র্সণা ধা পা | ধা র্সণা ধা পা | হ্মা পহ্মা পা হ্মা | পা -া -া -া I
ও • কি রে চু রি ক রা শ্যা মে র্ নূ পু ০ ০ র্

I া গা -া মার | রা রা সা -া | গা মা মরা সা | রা -া সা -া II II
০ চ ন্ দ্রা যা মি নী র্ মো ০ হ ন হা ০ তে ০

* রাগটি কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম-রচিত। আদি কয়েকটি রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ-ফলে কত যে নূতন রাগের সৃষ্টি এতাবৎকাল হ'য়ে এসেছে এবং হ'তে পারে, এই রাগটি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এমনি ক'রেই ভারতের সঙ্গীত-সম্পদ চিরদিন বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। ইহার পিছনে থাকা দরকার—কৃষ্টি ও প্রতিভা।

এ-রাগের আরোহাবরোহ :—সা গা হ্মা পা, গা মা না ধা, পা না ধা র্সা।
র্সা না ধা ণা ধা পা হ্মা পা, গা মা রা সা॥

বাদী—পঞ্চম। সম্বাদী—ষড়্‌জ। গতি-বক্র।

নিশীথ আকাশে ডুবে যায় চাঁদ

বন্দে আলী মিয়া

কৃষ্ণতিথির আধো-জোছনায় ঘরখানি গেছে ভরি
নিশীথ বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে যেন কাঁপিতেছে শর্ব্বরী ;
দূর্ বনতলে জ্বলিছে জোনাকি মাটির তারকা সম
কাক্-জোছনায় আজি এ ধরণী সুন্দর অনুপম।
নারিকেল শাখা কাঁপে থর থরি
রজনীগন্ধা উঠিছে শিহরি
শেফালী ঝরিয়া আঁকে আলিপনা সবুজ ঘাসের 'পরে
আমি চেয়ে আছি ম্লান নভতলে দূর্ অচেনার তরে।

আজি ক্ষণে ক্ষণে আসে সৌরভ করবীর ফুল হতে
জানি তুমি গেছ চির-পর হয়ে—আসিবে না কোন মতে,
সে-দিন কাননে ফুলতোলা ছলে মোর পানে তুলি আঁখি
ইসারাতে কেন ঘর হতে তুমি নিয়েছিলে মোরে ডাকি।

যদি জান মনে মিছে এ স্বপন
ভেঙে যাবে এই বৃথা আয়োজন
তবে কেন বল আসি বারে বারে করিলে এ অভিনয়!
আজি একা ঘরে মনে মনে তাই মানি তোমা পরাজয়।

হয় তো বা আজ নবীন সাথীর বাঁধা আছ বাহু ডোরে
জানি গো পাষাণী ক্ষণেকের লাগি মনে পড়ে না কো মোরে,
আমার আকাশে তেমনি প্রভাত তেমনি সন্ধ্যা হয়
তোমার লাগিয়া কুসুমে কুসুমে জাগে আজি বিস্ময়।
নতুন সাথীর শিথিল বাঁধনে
একদা আমারে পড়িবে গো মনে
সে দিন আমি যে ভুলে যাব তোমা মনে রাখিব না আর
নিশীথ আকাশে ডুবে যায় চাঁদ—ঘেরিয়া আসে আঁধার।

বনজ্যোৎস্না

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

নিত্য নূতন শাড়ীর চমক লাগাইয়া চলনভঙ্গীর ভিতর অপূর্ব্ব ছন্দ-মাধুর্য্য তুলিয়া বান্ধবীদের সহিত কলহাস্যে মুখরিত হইয়া মহানগরীর রাজপথ বহিয়া যে মেয়েটি বহু পুরুষের ঈপ্সিত দৃষ্টির মাঝে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় তাহার কথাই বলিতেছি।

বনজ্যোৎস্না—বাড়ীতে এবং বান্ধবীদের কাছে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বন।

সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে। বাপ মসিজীবী কেরাণী—মার্চ্চেণ্ট অফিসের বিশ বৎসরের চাকরি-জীবনের মাঝে রিটায়ার করিবার সময় একশত টাকা বেতন হইয়াছে। গোটা তিনেক ছেলে—সবাই অমানুষ। কেহ বাজারের পয়সা মারিয়া ফোর্থ ক্লাশে সিনেমা দেখে—কেহ রেস কোর্সে যায় কিংবা ওস্তাদ রাখিয়া খেয়াল ঠুংরী শোনে।

মা কিছুটা একেলে—উকীলের কন্যা এবং ডাক্তারের ভগিনী। আধুনিক কালের রুচিসম্পন্ন ভ্রাতৃবধূদের সংস্পর্শে একেলে মতবাদটাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীরা তাঁহার ডায়োশেসনে পড়ে—টেনিস খেলে—সে রঙের ছোঁয়া তাঁহার জীবনেও স্পর্শ করিয়াছে। ছেলেদের আশা ছাড়িয়া তাই মেয়েটিকেই মানুষ করিতে চলিয়াছেন।

মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানান—এত পয়সা খরচ ক'রে মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছো—কি হবে শুনি? সব ভস্মে ঘি ঢালা—শেষ পর্য্যন্ত ওই তোমার মতন হেঁসেলের হাঁড়ি ঠেলা বইতো নয়।

গৃহিণী পাল্টা জবাব দেন—সাংসারিক বুদ্ধি তোমার একটুও নেই। এই প্রগতির যুগ—তোমরা সব সেকেলে। এই লেখা-পড়া গান-বাজনা শেখানো মানেই মেয়েকে ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়া। ছেলেগুলো তো সব অমানুষ হল, এখন যা কিছু ভরসা আমাদের বন। ওই মিত্তির বাড়ী দেখ—এক মেয়ে ইলা ভাল বর-ঘরে পড়ে বাপের বাড়ীর সমস্ত সংসার চালাচ্ছে।

সেই হইতে বনজ্যোৎস্না বন্—সাজিয়া গুজিয়া বাসে চাপিয়া স্কুলে যায়। স্কুল হইলে বাস ভাড়ার খরচও বাঁচিয়া গেছে।

—কেন মা মিথ্যে বাসের ভাড়া, কত মেয়ে তো হেঁটেই কলেজে যায়!

মাও বুঝিলেন এ অপব্যয়ের কোন যুক্তি নাই, মেয়ে যখন শিক্ষিত ও সোমত্ত হইয়া এই স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছে—সংসারেরও যখন সাশ্রয় হয়।

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বন কলেজে পড়িতেছে। বাড়ীতে সঙ্গীতশিক্ষক রাখিয়া বাংলা গানও শিখিতেছে।

ভাইয়েরা° বলে—বন একটু বুঝে সুঝে চলিস্—হাজার হোক্ মেয়েমানুষ তো—পাড়ার লোকেরা সব যা-তা নিন্দে করে।

বন ক্ষেপিয়া ওঠে—যত সব ইডিয়ট্, কাজকর্ম্ম নেই, কেবল মেয়েদের নিয়ে আলোচনা।

কিন্তু বনের ভক্তেরও অভাব নাই।

সামনের বাড়ীর প্রফেসর বোস—পাশের বাড়ীর এম্-বি, ডি-টি-এম্ ডাক্তার—ওদিককার বাড়ীর এম্-এ, বি-এল্ বন্ বলিতে অজ্ঞান। বনের মার্জ্জিত রুচি—নিত্য নূতন শাড়ীর ডিজাইন—তাহার কণ্ঠনিঃসৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বুঝি বা সকলকেই পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আর কলেজের ছেলেদের তো কথাই নাই—বন তাহাদের করুণার চক্ষেই দেখে।

পিছনের ঘাড়-কামানো সঙ্গীতশিক্ষকটি সেদিন গান শিখাইতে গিয়া অর্গানের রিডটি সংশোধনকালে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া ফেলে।

বিদ্যুতের তেজে বন্ জ্বলিয়া ওঠে—আপনি আর কাল থেকে আসবেন না—আপনার মতন অভদ্র লোকের কাছে আমি আর গান শিখব না।

বেচারি ঘাড়-কামানো নিরুত্তরে বাহির হইয়া যায়। বন রেডিও কিনিয়া প্রতি রবিবার সকালে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়—

'এমন দিনে তারে বলা যায়—'

বনের পিতা সেদিন এক পাত্রের সম্বন্ধ আনিলেন। তাঁহারই অফিসের নবনিযুক্ত এক কেরাণী—বি-এ পাশ করিয়াছে।

ফার্ষ্ট-এপয়েণ্টমেণ্ট চল্লিশ টাকা পাইয়াছে। ছেলেটি দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়।

গৃহিণী বাধা দিলেন—ভারী বি-এ পাশ! আর আড়াই বছর পরে বনও আমাদের বি-এ পাশ করবে? আমি ভাবলুম—কোন ব্যারিষ্টার কিংবা ডাক্তার বুঝি!

কর্ত্তা নীরব রহিলেন।

—যা খুশী করগে—আমি আর তোমাদের এর মধ্যে নেই।

বনের পড়িবার ঘরে সেদিন টেবিল ঝাড়িবার কালে রাইটিং প্যাডখ্যানির ভিতর হইতে একখানি গোলাপী খাম বাহির হইয়া আসিল।

প্রফেসর বোস কবিতায় চিঠি দিয়াছেন—সে সব কি লেখা—বনের মা হাজার হোক্ কেরাণীর স্ত্রী, অতশত বুঝিলেন না।

প্রথমে বিরক্ত হইলেও শেষে অন্তরে খুসীই হইলেন। যাহোক্ মেয়েটার একটা হিল্লে হ'ল!

সম্বন্ধের প্রস্তাবনাকালে প্রফেসর বোস তো হাসিয়াই খুন! বনকে তিনি স্নেহ করেন—তার রুচির এবং কৃষ্টির তিনি ভক্ত—তাই বলে বিয়ে?

আর যে মহান ব্রত তাঁহার—শিক্ষকতা করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়াই তিনি তাঁহার আদর্শ জীবন কাটাইবেন।

বন শুনিল এবং সেইদিন হইতে সামনের বাড়ীর দিকে ঘন করিয়া পর্দ্দা আঁটিয়া দিল।

কয়েকদিন ধরিয়া এম্-বি, ডি-টি-এম্ ডাক্তারটি খুবই আসা-যাওয়া করিতেছে বনেদের বাড়ী।

বনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় রাত্রি জাগিয়া চিকিৎসা করিল। ফিস্ দিতে গেলে হাসিয়া বলিল: আমি আপনাদের বাড়ীরই ছেলে—এতটা চামার হইনি যে আপনাদের কাছে ফিস্ নেবো। আপনারা স্নেহ করেন—এই আমার সৌভাগ্য!

ছেলেটির যেমন মিষ্ট কথা তেমনি ভদ্র ব্যবহার।—গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন—একবার দেখ না, ছেলেটি তো বেশ!

প্রসঙ্গ তুলিতেই ডাক্তারের পিতা বলিলেন: তা ছেলের যদি মত হয়ে থাকে আমার তাতে অবিশ্যি অমত নেই—কিন্তু ধরুন, ছেলের বিয়েতে তো আর ঘর থেকে খরচ করতে পারি নে—কমে-সমে দশ হাজার।

দশ হাজার! বনের পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এম্-বি, ডি-টি-এম্-এর গমনাগমন বন্ধ হইয়া গেল।

এম্ এ, বি-এল্ উকীল ভিন্ন জাতি—ভিন্ন গোত্র।

বনের বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে।

দেহ-যৌবন রূপমাধুর্য্য কলেজের পুস্তকের ভারে আর বৈশাখের খরদীপ্ত প্রখরতায় দিনে দিনে পরিম্লান হইয়া আসে।

বিচিত্র শাড়ীর ঔজ্জ্বল্য আর চলার ভঙ্গী—তাও যেন অতি পুরাতন হইয়া আসিয়াছে।

সিনেমায় বাসে মহানগরীর রাজপথে গৃহ-বাতায়নের ফাঁকে যে রূপটি প্রভাতের সূর্য্যের সোনালী রং-এ উদ্ভাসিত ছিল আজ যেন তা অস্তমিত—শুধু গোধূলির গাঢ় অবসাদ আর ক্ষীণ স্তিমিত ধূসর রেখায় পর্য্যবসিত।

বয়স পঁচিশ পার হইয়া গেছে। রূপেগুণে পছন্দ-সই বর আর মিলিল না।

তবুও জনতার স্রোতে ডুবিয়া যাওয়া যায় না।

বি-এ পাশ করিয়া বন শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে। বৃদ্ধ মাতাপিতা, অনুপযুক্ত ভাইদের ভরণপোষণ চালাইতেছে।

ক্লান্ত অবসাদ-মুহূর্ত্তে দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাসে রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায় কয়েকটি জীবনের কয়েকটি চিত্র। প্রফেসর বোসের আদর্শ শিক্ষানীতি—পাঁচটি সন্তানের জনক। এম্-বি, ডি-টি-এম্-এর দশ হাজার বর-পণে বিক্রীত স্ত্রী—তাহাদের সংসার! দিবসের সাংসারিক মালিন্যের পর নীল আলো জ্বালাইয়া রাত্রির কাব্য!

পাড়ার চিরবিচ্ছিন্ন কুখ্যাত বাড়ীটির অধিবাসিনী বন নিদ্রাহীন গাঢ় রজনীর দীর্ঘতর অবকাশে গভীর দীর্ঘশ্বাসে কল্পনা করে—তাহার ছেলেমেয়ে হইলে কি আদর্শ শিক্ষাতেই না সে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

ডক্‌টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি এইচ্‌-ডি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বহু পুরাকাল হইতে বৌদ্ধদিগের নিকট চীনরাজ্য সুপরিচিত ছিল। প্রবাদ আছে যে সম্রাট অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকেরা চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আনয়ন করেন। হান রাজ্যের কোন একজন রাজা বুদ্ধদেবের ভক্তগণের অন্বেষণে দুইটী রাজদূত প্রেরণ করেন। এই দুইটী রাজদূত কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় ভিক্ষু সমভিব্যাহারে চীন রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। এই দুইটী ভারতীয় ভিক্ষু সর্ব্বপ্রথম চীনভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই দুইজন ভিক্ষুর আগমনের পূর্ব্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন একজন চৈনিক রাজদূত ইণ্ডো-সিথিয়ান রাজদরবার হইতে একটী বৌদ্ধগ্রন্থ আনেন। নাগার্জ্জুনিকোণ্ড শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চৈনিক স্থবীরেরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি চলাচলের পথ ছিল। চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে উত্তরদিকস্থ পথ অবলম্বন করেন। তিব্বতের মধ্য দিয়া চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে একটী পথ খোলা হয়। এই পথ দিয়া প্রভাকর মিত্র চীনে গমন করেন। চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে গমনাগমনের জন্য যেমন স্থলপথ ছিল তেমনি জলপথও ছিল। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারে তিব্বতীরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

কাম্বোডিয়া, চম্পা, জাভা এবং সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। লোকচেম নামে একজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহারই একজন শিষ্য শতাধিক বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইণ্ডো-সিথিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মরক্ষ বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তক চীনভাষায় অনুবাদ করেন। পার্থিয়াবাসী লোকোত্তম অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় তর্জ্জমা করেন। পার্থিয়ার পরে বৌদ্ধধর্ম্ম সগ্‌দিয়ায় বিস্তারিত হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাখ্যাকার্য্যে কাচবাসী কুমারজীব চীনদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম কুমারজীব সর্ব্বপ্রথম চীনভাষায় প্রণয়ন করেন এবং যে সকল মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা—অশ্ব ঘোষ বিরচিত সূত্রালঙ্কারশাস্ত্র, নাগার্জ্জুনকৃত দশভূমি বিভাস শাস্ত্র, বসুবন্ধু প্রণীত শতশাস্ত্র, হরিবর্ম্মণ কৃত সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র এবং ব্রহ্মপালসূত্র।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে খোটান যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কোন একজন চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার জন্য খোটানে আগমন করেন। তিনি চীনভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। আর একজন খোটানদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গমন করেন এবং পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক সুপ্রসিদ্ধ মহাযান গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন একজন চৈনিক যুবরাজ খোটানে আসিয়া বুদ্ধসেন নামে একজন ভারতীয় শিক্ষকের নিকট মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে খোটান এমন একটী মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র হইয়াছিল যে কাশ্মীর হইতে ধর্ম্মক্ষেম নামে একজন ভারতীয় ভিক্ষু মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম অধ্যয়নের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি চীনদেশে গমন করিয়া চীনভাষায় মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র তর্জ্জমা করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতের রাজা স্রং-স্যান্-গ্যাম্-পো একটী চীন ও একটী নেপালদেশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই দুই রাজকন্যা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা পদ্মসম্ভবকে এবং শান্তরক্ষিত নামে আর একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ করেন। তিব্বতে লামাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন পদ্মসম্ভব। সাম্-এ নামে একটী বিহার বৌদ্ধশিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র

ছিল। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে ভিক্ষুরা এখানে আসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ইতিহাসে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। যখন মুসলমানেরা বাঙ্গালা ও বিহার জয় করে তখন অনেকগুলি ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু ও পণ্ডিত তিব্বত ও নেপালে পলায়ন করেন। চীন ও মধ্য এশিয়ার প্রচলিত ধর্ম্মের উপর তাঁহাদের প্রভাব অধিক ছিল। কুবলাই খাঁ নামে কোন একজন লোকের নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠ-পোষকতায় অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হয়; তাহাদের মধ্যে মূলসর্ব্বাস্তিবাদ কর্ম্মবাচার নাম উল্লেখযোগ্য। চীন ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ ত্রিপিটকের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ত্রিপিটকের কতকগুলি সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং কতকগুলি চীন বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাম্বোডিয়ার রাজা কৌণ্ডিণ্য জয়বর্ম্মণ চীন-রাজদরবারে নাগসেন নামে একজন ভারতীয় বৌদ্ধকে পাঠাইয়াছিলেন। ফু-নান অর্থাৎ প্রাচীন কাম্বোডিয়ার মন্দ্রসেন এবং সঙ্ঘভরত নামে দুইজন ভিক্ষু চীনদেশে গমন করিয়া কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

চম্পা দেশে চাম্ অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে জাভা ও সুমাত্রা বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই দেশদ্বয়ে সুপ্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক ইৎসিং, বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং বজ্রবোধি আসেন।

চীন সাম্রাজ্যের তাংদিগের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল। এই সময়ে কতকগুলি ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গমন করিয়া চীনভিক্ষুর সহিত একত্র কার্য্য করেন। আরও দেখা যায় যে, এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চীন বৌদ্ধভিক্ষু হুয়েন্ সাং, ইৎসিং, সং-য়ুন্ প্রভৃতি সকলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম জানিবার জন্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। চীনদেশবাসীর গার্হস্থ্য জীবনের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ভারত চীনদেশকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

ভারত ও চীনের সহযোগিতার ফলে সুপ্রসিদ্ধ চীন ত্রিপিটকের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আটটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুস্তক এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ্যপুস্তক এই ত্রিপিটকের অন্তর্গত।

কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে সর্ব্বপ্রথমে আসে এবং চীন ত্রিপিটকের সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ কোরিয়ায় ছিল; পরে জাপানে আনা হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোরিয়ার সহিত জাপানের কলহ হয় এবং কোরিয়া জাপান সম্রাটের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছায় তাঁহাকে কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ ও মূর্ত্তি উপহার দেয়। ভারত ও তিব্বত হইতে কতকগুলি বণিক ও ধর্ম্মপ্রচারক কোরিয়ায় গমন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ওয়াং রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হয়। অনেক সুন্দর সুন্দর বিহার নির্ম্মিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি নষ্ট করা এবং রাজ্যে বৌদ্ধশিক্ষা বিস্তার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

জাপানে বৌদ্ধদিগের বারটী সম্প্রদায় ছিল, যথা—কুশ, যোষিৎসু, রিস্সু, স্যান্রন্, হোস্সো, কেগন, টেনডাই, সিঙ্গন, জোডো, জেন, সিন্ এবং নিচিরেন। এই সকল সম্প্রদায়ই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; কেবল কুশ, যোষিৎসু ও রিস্সু হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়ক ছিল। জাপানে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক বিষয়ের উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

সিংহলে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক স্থবীর মহেন্দ্র এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকে প্রেরণ করেন। দেবানং প্রিয় তিস্র এই সময়ে সিংহলের রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করেন। বহু সংখ্যক নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে অনেক বিহার ও স্তূপ নির্ম্মিত হয় এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সিংহলের রাজা দুট্ঠগামণির সময়ে সিংহল দ্বীপের সামাজিক উন্নতি-কল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। রাজা বট্ঠগামণির সময়ে বৌদ্ধ নীতিশিক্ষাগুলি লিখিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল বৌদ্ধসঙ্ঘে কলহের সৃষ্টি হয়। মহাবিহারের ভিক্ষুগণের সহিত অভয়গিরি বিহারের বৈতুল্য ভিক্ষুগণের

বহুদিন ব্যাপী কলহ চলিতেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ দক্ষিণ ভারত হইতে সিংহল দ্বীপে পদার্পণ করেন। তৎকালীন সিংহলের রাজা মহানামের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বৌদ্ধ পিটকের অন্তর্গত পুস্তকগুলির অর্থকথা প্রণয়ন করেন। তিনি যে সকল টীকা লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধমার্গ, সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, মনোরথ-পূরণী এবং সারত্থপ্রকাশিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা পরাক্রমবাহুর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন জীবন লাভ করে। তিনি বহু বিহারের সংস্কার করেন এবং ভিক্ষুদিগের জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি নিয়ম করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহল দ্বীপের রাজনৈতিক গোলমালের সৃষ্টি হয়; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত চোড় দেশের ভিক্ষুগণের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন পরিলক্ষিত হয়। শরণঙ্কর নামে একজন বৌদ্ধশ্রমণের সাহায্যে তৎকালীন শ্রীবিজয়রাজসিংহ নামে একজন সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্যাম দেশ হইতে ভিক্ষুগণকে সিংহলে আনয়ন করেন। ১৮১৫ সালে সিংহল দ্বীপ ইংরেজদিগের হস্তগত হয় এবং এখনও পর্য্যন্ত থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতাবস্থায় এখানে বিদ্যমান আছে।

শ্যাম দেশেও থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এখানকার কতকগুলি পুরাতন স্থানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যাম রাজ্যে আজকাল যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। শ্যামবাসীরা সিংহল বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রাচীনতা স্বীকার করে এবং সিংহল হইতে একজন ধর্ম্মপ্রচারককে তাহাদের দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্যামরাজ্যের রাজধানী অজুথিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কায়-তাক্-সিন্ নামে একজন চৈনিক ব্যাঙ্ককে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং চক্রী নামে কোন একজন লোক কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হন। শ্যামরাজ্যের পরবর্ত্তী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমগ্র বৌদ্ধ ত্রিপিটক সংশোধিত হইয়া একটী বড় হল ঘরে সুরক্ষিত হয়।

প্রবাদ আছে যে সম্রাট অশোক ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আনয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে সকল বৌদ্ধ পুস্তক পুরাতন প্রোম দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব্ব-ভারতের মগধের অন্তর্গত দেশগুলির সহিত ব্রহ্মদেশের একটী নিকট-সম্বন্ধ ছিল। পুরাতন প্রোমে অনেকগুলি বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্থাপত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পেগান দেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। নিম্ন ব্রহ্মদেশে সিংহলীয় সঙ্ঘ ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশীয় সঙ্ঘের উন্নতিকল্পে সিংহল দেশবাসী ভিক্ষুগণ যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং রাজা ধর্ম্মচেতির সংস্কারের ফলে সিংহলীয় সঙ্ঘের উন্নতি সাধিত হয়। চৈনিক ভূপর্য্যটক ইৎসিংএর বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে সর্ব্বাস্তিবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ছিল। উচ্চ ব্রহ্মদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। মিন্দোন্-মিন্ নামে একজন ব্রহ্মদেশবাসী ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধসঙ্ঘের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। ভিক্ষু-দিগের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম করেন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে ইণ্ডোচীনে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইণ্ডোচীনের অন্তর্গত চম্পা রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না। সমন্ত নামে পাণ্ডুরাঙ্গ দেশের একজন বৌদ্ধ জিন এবং শিবের উদ্দেশ্যে বিহার এবং মন্দির উৎসর্গ করেন। চম্পা, জাভা এবং সুমাত্রায় শৈবধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। রাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্ম্মণ লোকেশ্বরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার পর আর একজন মহাযান বৌদ্ধ স্থবীর আর একটী লোকেশ্বর বিহার নির্ম্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করেন। চম্পা রাজ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুরাঙ্গ দেশের রাজা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বুদ্ধ লোকেশ্বরের একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। চম্পার ভগ্নাবশেষ হইতে লোকেশ্বর এবং প্রজ্ঞাপারমিতার শিলামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চম্পার বৌদ্ধেরা আর্য্যসমিতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্তও ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চম্পায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

চম্পার স্থায় ফিউনান রাজ্যে শৈব এবং বৌদ্ধধর্ম্ম একত্র অবস্থিত ছিল। ইৎসিংএর মতে ফিউনানের লোকেরা সর্ব্বপ্রথমে দেবদেবীর উপাসক ছিলেন: পরে সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতি লাভ করে। ফিউনান রাজ্যের কোন একজন নিষ্ঠুর রাজা বৌদ্ধদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করেন এবং একটী মাত্র ভিক্ষুকেও সেখানে থাকিতে দেন নাই। ফিউনান রাজ্যের ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকগুলি অনুবাদের জন্য চীনদেশে আনেন এবং ইঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘপাল ও মন্দ্রসেনের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়।

ফিউনান রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত মালয় দেশ একটী বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাম্বোজেরা ক্ষমতাশালী হইয়া ফিউনান রাজ্য ধ্বংস করে। কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধদেবতা লোকেশ্বরের পূজা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রথম সূর্য্যবর্ম্মণ পরমনির্ব্বাণপাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোফবুরির চতুর্দ্দিকস্থ দেশগুলিতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে থামার রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং রাজধানী পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম নষ্ট হয়।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক ফাহিয়ানের মতে জাভা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, এখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অধিক ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ম্মণ এখানে আসেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে তিনি কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে আমাদের জানা নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য জাভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জাভা—বিশেষতঃ মধ্য এবং পশ্চিম জাভা—শৈব রাজন্যবর্গের হস্ত হইতে সুমাট্রার কোন একটী বৌদ্ধরাজ্যের অধীনে আসে। সুমাট্রা ব্যতীত মধ্য জাভা এবং মালয় পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত রাজ্য শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্রদের অধীনে ছিল। শৈলেন্দ্ররা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন রাজা মহাযান তারাদেবীর সম্মানের জন্য মধ্য জাভায় কলসান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মধ্য জাভার অন্তর্গত বরবুদুরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির শৈলেন্দ্রদিগের দ্বারায় নির্ম্মিত। চৈনিক ভূপর্য্যটক ইৎসিংএর মতে সুমাট্রা একটী হীনযান বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ইৎসিংএর পরে শৈলেন্দ্রদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতি লাভ করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মাদ্রাজের অন্তর্গত নেগাপতম দেশে শৈলেন্দ্রদিগের কোন এক রাজার অর্থানুকূল্যে এবং একজন চোড় যুবরাজের অনুমতিতে একটী বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হয়। নালন্দায় বলপুত্রদেব নামে আর একজন শৈলেন্দ্ররাজ্যের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। নালন্দার সুপ্রসিদ্ধ গুরু ধর্ম্মপাল সুমাট্রায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। পাল রাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা ও মগধে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল। সুমাট্রা, জাভা এবং কাম্বোডিয়ার কোন কোন অংশে বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। জাভা দেশে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বরবুদুরের মন্দির বৌদ্ধ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য জাভা হইতে দূরীভূত হইয়া শৈব রাজন্যবর্গ পূর্ব্ব জাভায় বসবাস করেন। শৈলেন্দ্রদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের নষ্ট রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করেন এবং মধ্য জাভায় শৈবধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। বর্ত্তমান জাভায় বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অনেক সময় লাগিয়াছিল। হলাণ্ডের অন্তর্গত লাইডেনের যাদুঘরে যে সুপ্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি রক্ষিত আছে তাহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেন্ এ্যারক্ রাজ্যে ছিল। হাম উরুকএর রাজত্বকালে ভূজঙ্গ নামে কতকগুলি সুশিক্ষিত ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এবং কতকগুলি বৌদ্ধ ছিল। রাজধানীর দক্ষিণদিকে বৌদ্ধেরা বাস করিত। এই সময়ে কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার নির্ম্মিত হয়। বলিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যদিও এই দ্বীপে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহা হইলেও এখানে হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য যথেষ্ট আছে। সমাপ্ত

প্রতিধ্বনি

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

বৈশাখের এক দুর্যোগ রাত্রে চলিয়াছি বল্লভগঞ্জ হইতে মেঘনা-নদী পাড়ি দিয়া সাত ক্রোশ দূরস্থিত সাভারপুর গ্রামে। নৌকা তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে মাঝখানের জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করিয়া। বিদ্যুতের তীব্র আলোকচ্ছটায় এক একবার চোখ ঝল্‌সাইয়া যাইতেছে, আমি ত্রাসার্ত—চীৎকার করিয়া ডাকিতেছি, "মাঝি!" নির্বিকার মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। বিদ্যুতের আলোতে মাঝির নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিতেছি।

"বাবু!"—নিতান্ত সহজ উত্তর।

"আকাশের অবস্থা দেখ্‌ছ তো। কোথাও পারে ভিড়িয়ে না হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। শীগ্‌গির-ই ঝড় বইতে সুরু করে দেবে।"

"আপনার কিচ্ছু ভয় নেই, বাবু। সামনে কোথাও পার নেই। ভোর নাগাদ আপনাকে সাগরপুরে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেব। বোশেখ মাসে এরকম ঝড়-বৃষ্টি হয়েই থাকে।"—সেই নিতান্ত সহজ উত্তর।

"কিন্তু এ তো সামান্য ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ নয়, মাঝি" —আমার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া ওঠে।

"মেঘনায় বোশেখ মাসে এই ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ সামান্যই বাবু।"

অগত্যা চুপ করিয়া থাকিতে হয়। শংকিত মনটা লইয়া আকাশের দিকে আর একবার চাহিয়া দেখি। অশান্ত ধমনীগুলি দুলিয়া দুলিয়া ওঠে। প্রাণপণ শক্তিতে চোখ বন্ধ করিয়া থাকি।

"বাবু!" মাঝি ডাকিতেছে। প্রথমটায় ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিলাম না।

"ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

উত্তর দিলাম, "না।"

"আপনি একটুকও ভয় করবেন না। ছিদাম মাঝি আজকের লোক নয়। বোশেখের বহু দুর্যোগ রাত্রিতে সে মেঘনা নদী পাড়ি দিয়েছে। এর চেয়ে শত গুণে ভয়ংকর রাত্রি—শত গুণে।"

"কিন্তু দৈবের কথা বলা যায় না তো।" আমি অন্ধকারে মাঝিকে দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলাম। তাহার জীবন্ত দেহটা অন্ধকারের সঙ্গে কোথায় যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

উত্তর পাইলাম, "দৈব টৈব কিছু নয় বাবু। এসব ক্ষেত্রে সব অভিজ্ঞতা। আমার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আজকের দুর্যোগ রাত্রির কাছে কিছুতেই হার মান্‌বে না।"

উত্তর দিবার কোনও প্রয়োজন বোধ না করায় চুপ করিয়া রহিলাম।

এম্‌-এ পাশের পর জীবনে প্রথম চাকুরী করিতে চলিয়াছি সাগরপুরে এই দুর্যোগ রাত্রে। মনে হইতেছে, আমার এই যাত্রাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। এই ঝড়-ঝঞ্ঝা সকলই যেন মিথ্যা, সকলই যেন অর্থহীন। আকাশ ধরণীময় এ কি পাগলামি! এ কোন্ নিষ্ঠুর খেয়াল! চমকিয়া উঠিলাম, শাণিত বিদ্যুত আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া পালাইয়া গেল তীব্র আর্তনাদে।

"নদীর কোথাও বাজ পড়েছে বোধ হয় মাঝি?" ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

উত্তর আসিল—"হুঁ"। আবার সমস্ত স্তব্ধ। মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

"রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো—ভোর নাগাদ আমরা নিশ্চয় পৌঁছে যাব। পালে বেশ হাওয়া লাগছে"—মাঝি কহিল। আমি বিন্দুমাত্রও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

মাঝি বলিয়া চলিল, "আপনাদের কোনও সাহস নেই বাবু। মেঘনার তীরে বাস ক'রে মেঘনাকেই আপনারা ভয় ক'রে চলেন! মেঘনা আমাদের মা। কালী করাল মূর্তি ধারণ করলেও কখনও সন্তানের অমংগল করেন না।"

আমি বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া কহিলাম, "ওসব আমি কিছু বিশ্বাস করিনে মাঝি।"

"কিন্তু দৈব?" মাঝি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। হিংস্র

নদীবক্ষের উপরে মাঝির অট্টহাস্য ভয়ংকর হইয়া আমার কানে বাজিয়া উঠিল।

*　　　*

নাগরপুর হইতে মেঘনার অপর পারে বল্লভগঞ্জে যাইতেছি। মাঝখানে দিগন্ত প্রসারি মেঘনা নদী। আকাশের সূর্য তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। মাঝি আপন মনে দাঁড় টানিয়া সারি গান গাহিতেছে। কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া চলিয়াছি পেন্সন্ লইয়া। যৌবনের দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকারের যাত্রা ফুরাইয়া গিয়াছে।

অশান্ত তরংগগুলি সুদীর্ঘকাল দাপাদাপির পরে যেন বিষ-দাঁত-ভাঙা সাপের মত ঝাঁপির অন্তরালে চুপ করিয়া আছে। মাঝি সাতাশ-আঠাশ বছরের যুবক। ধমনীতে যৌবনের উদ্দামতা, দেহে যৌবনের কঠোরতা। কর্মস্রোতের তীব্র গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

ডাকিলাম, "মাঝি!"

উত্তর পাইলাম, "আজ্ঞে।"

"বল্লভগঞ্জে কখন নৌকা লাগ্‌বে বল্‌তে পারো?"

"তা বাবু সন্ধ্যা নাগাদ পৌছবে বলেই তো আশা কর্‌ছি।"

মাঝি ফস্ করিয়া একটি বিড়ি জ্বালাইয়া লইল। চাহিয়া দেখিলাম মাঝির বাহুর মাংসপেশিগুলি যেন যৌবনের তেজে উদ্ধত হইয়া আছে।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। মনের মধ্যে কত অস্পষ্ট কথা ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মনে পড়িল এক দুর্যোগ রাত্রির কথা। এই মেঘনার হিংস্র তরংগগুলি আমাদের নৌকাটাকে লইয়া সেদিন কি মাতামাতিই না করিয়াছে!

"আর কখনও যাননি বুঝি সাগরপুরে?" মাঝি বিড়িটায় শেষটান দিয়া নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"যাব না কেন? সাগরপুরেই যে আমার বাস্তভিটে।" আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম।

কথায় কথায় গল্প জমিয়া উঠিল, মাঝি কহিল, "আমার বাবা ছিল দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে সেরা মাঝি। ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্যোগ রাত্রি কোন কিছুই গ্রাহ্য কর্‌ত না সে। আমরা বল্‌তাম, 'বাবা, তুমি সাপ নিয়ে খেলা কর্‌ছ, একটা আপদ বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?' বাবা দিব্যি সহজ হেসে উত্তর দিত, 'বিষ দাঁত ভেঙে ফেলে দিয়েছি রে—ভয় কর্‌বার আর কিছুই নেই।' বাবার একটি মাত্র মন্ত্র সম্বল ছিল—'মাভৈঃ'। আমাদের সে সাহসও নেই, সে শক্তিও নেই।"

মাঝি নৌকার মোড় ফিরাইয়া দিল। নদীর জলে শব্দ উঠিতেছে ছলাৎ ছলাৎ ছপ্ ছপ্। দিগন্তবিস্তারি জল-রেখা ঝক্ ঝক্ করিয়া মৃদু মৃদু দুলিতেছে। নৌকা চলিয়াছে মাঝ নদীর উপর দিয়া।

আমি ভাবিতেছি, আমার জীবনে একটি দুর্যোগ রাত্রি আসিয়াছিল সেই কথা।

মাঝি বলিয়া চলিল, "ছিদাম মাঝির নাম আজ পর্যন্ত গাঁয়ের ছোট ছেলেটিও জানে। আমার বাবা মরেছিল এক দুর্যোগ রাত্রিতেই এই মেঘনার বুকে ঝাপ দিয়ে অন্য নৌকার এক আরোহিণীকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে। আরোহিণীকে নৌকায় তুলে দিয়েই বাবা ঝুপ্ ক'রে তলিয়ে গেল, আর উঠ্‌ল না। পরে জান্‌তে পেরেছিলাম, কুমীরে তাকে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।"

শুনিলাম মাঝি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে। নৌকাটা একটু ঘুরিয়া আবার দক্ষিণ দিক ধরিয়া চলিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, "তোমার বাবা শ্রীদাম মাঝি! সে এক দুর্যোগ রাত্রে আমাকে মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে সাগরপুর গ্রামে পৌছে দিয়েছিল। সে আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা।"

বিস্মিত মাঝি আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরে দুজনেই চুপ্‌চাপ্।

বল্লভগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিড়িয়াছে। বিদায়ী সূর্য তখন পশ্চিমের দিক্‌বলয়ে রক্তরাগ লেপিয়া দিয়াছে। নৌকা হইতে নামিবার সময় দেখিলাম কাঠের বৈঠার উপরে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করা নামটি "শ্রদাম তাঁতি।"

মাঝি প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আমি তখনও এক দুর্যোগ রাত্রির কথা ভাবিয়া চলিয়াছি।

কৃত্তিবাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাংলার বাল্মীকি কবি, দেবীর আদেশ লভি'
শুভক্ষণে কবে নাহি জানি,
সীতার নয়ন জলে বসিয়া অশোক-তলে
লিখেছিলে রামায়ণখানি।

তাল-পত্রে সেই লেখা সে-ত অশ্রু জল-রেখা,
অনল অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাংলার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে,
পাষাণ হৃদয়-ও তায় গলে।

জানকীর আঁখি নীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর
ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,
তাঁদের পায়ের কাছে নতশিরে আজ্ঞা যাচে
শত শত দেবর লক্ষ্মণ।

কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাই নিয়ে যোঝাযুঝি
ভায়ে ভায়ে, তুচ্ছ তা ত নয়,
হে কবি, তোমার গান গলায় তাদের প্রাণ,
আঁখি জল দ্বন্দ্ব করে জয়।

শাশুড়ী তোমার গানে বধূরেও বক্ষে টানে,
ভুলে যায় অবলা-পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা ভুলে যায় সব ব্যথা
গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।

কি মহিমা রচনার! উদয়ন-কথা আর
কহে না ক' গ্রাম-বৃদ্ধদল,
তাহাদের চারি পাশে যুবা শিশু কেন আসে?
তব বাণী তাদের সম্বল।

পশারী পশরা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে
শুনে যদি রামায়ণ পাঠ;
গুহকের ভাগ্য স্মরে, দুই চোখে ধারা ঝরে,
ভুলে যায় বেচা-কেনা, হাট।

বঞ্চক 'মুরারি শীল' ছাড়ে না যে একতিল,
মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
পাপ করি দিন কাটে, সাঁঝে রামায়ণ পাঠে
রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।

শিখাইলে কী যে সত্য, গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ু দত্ত'
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়,
কৃপণ তোমার গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে,
যক্ষদেরও হৃদয় গলায়।

দিনে হাটে হট্টগোল কাড়াকাড়ি ডামাডোল,
সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরা কাণ্ডটি পড়ি
দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।

বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায়
দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার,
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন জলে
একই কথা শুনে বার বার।

তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা,
স্নিগ্ধ শান্ত, গ্রীষ্মের দিবস,
জরা-জীর্ণ গ্রন্থখানি, কি সুধা তাতে না জানি,
শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।

মোদকের খই-চুড় তব গীতি সুমধুর
আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই
দাম নিতে মুদি যায় ভুলে।

জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা-নির্যাতন করে
তব পুঁথি পড়ে মাতা তার,
প্রজা রঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর,
গ'লে যায় তার কর-ভার।

রাজা রাণী রাজভ্রাতা		রাজার নন্দিনী, মাতা—
দৈবদণ্ড তাহাদেরই কত !
একথা যতই স্মরে		বৈরাগ্যে হৃদয় ভরে,
দুঃখী ভুলে নিজ দুঃখ শত।
অসংযত রসনায়		যে ভ্রম করিল হায়
অযোধ্যার নির্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে		তারি প্রায়শ্চিত্ত করে,
চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।

চির শিরঃসজ্জাহীন		এই বঙ্গ দীন হীন,
নগ্ন শিরে ছিল লজ্জা-ভার,
রাম-নামাবলীখানি		আর্যাবর্ত হ'তে আনি
জড়াইলে নত শিরে তার।
সপ্তকাণ্ড দীপ-ভাতি		দিয়া তুমি সারা রাতি
ভারতীর করিলে আরতি,
সেই দীপ হ'তে আজি		জ্বলে লক্ষ দীপরাজি,
তোমা তারা জানায় প্রণতি।
আর কারে নাহি জানি		মানি শুধু তব বাণী,
শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি		নূতন জনম লভি
অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।

এ রাম মোদেরি মত		সেধেছে, কেঁদেছে কত,
অদৃষ্টেরে দিয়াছে ধিক্কার,
এ রাম মোদেরি মত		করিয়াছে ভক্তি নত
নীল পদ্মে পূজা অধিকার।
এ রামে আপন জানি		বক্ষে লইয়াছি টানি,
দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে		অবিরল অশ্রুপাতে
পম্পা হ্রদে বাড়ায়েছি নীর।

রাম নারায়ণ নিজে		সীতাদেবী মা লক্ষ্মী যে
একথা ত পড়ে না ক' মনে,
হৃদয়-শোণিত ছানি		সীতার প্রতিমাখানি
গড়ি মোরা যজ্ঞ সমাপনে।

তুমি রস-গঙ্গা হ'তে		আনিলে নূতন স্রোতে
আগে আগে দেখাইয়া পথ
নব রস-ভাগীরথী,		উদ্বেল তাহার গতি,
তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল		ভাসাইল খাল বিল,
একাকার গোষ্পদ পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে		লতা-তৃণে শস্যে ফুলে
ফলিতেছে সোনার ফসল।

বধূরা গাগরী ভরে		নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান		জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
'জয় রাম' গায় নর-নারী।

সেই রসধারা বাহি'		জয় সীতারাম গাহি'
ভেসে যায় কত 'মধুকর'।
লঙ্কায় বাণিজ্য তরে		যুগে যুগে যাত্রা করে,
ধনপতি চাঁদ সদাগর।
শত শাখা-প্রশাখায়		সে ধারা বহিয়া যায়,
উদ্বেলিত অশ্রুর তুফানে,
'এহো বাহ্য' নহে শেষ		চলে যায় নিরুদ্দেশ
শেষ ধারা অনন্তের পানে।

তাসের খেলা

যাদুকর পি-সি-সরকার

আলোচ্য প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষ'এর পাঠক পাঠিকাদিগকে দুইটি অত্যাশ্চর্য্য তাসের খেলা শিখাইব মনস্থ করিয়াছে। ম্যাজিকের কৌশল কোনটিই খুব কঠিন নহে। যে-কোন ব্যক্তি বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা অভ্যাস করিলেই সর্ব্বপ্রকার খেলা দেখাইতে সক্ষম হইবেন। আমি এদেশে এবং বিদেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, পৃথিবীর কোন দেশের ম্যাজিকই কঠিন নহে। লণ্ডন ও আমেরিকাতে বর্ত্তমানে

হাতকড়ি ও দড়ির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে রত যাদুকর পি-সি-সরকার

যে সমস্ত খেলা দেখান হয় সেগুলি অধিকাংশই যন্ত্রকৌশলে সাধিত হয়। বহু মূল্যবান যন্ত্র, বাক্স, স্প্রীং, বিদ্যুৎ, চুম্বক প্রভৃতির সাহায্য লইয়া তাহাদের খেলা রচিত হয়। আর অপরপক্ষে ভারতীয় যাদুবিদ্যা প্রধানত হস্তকৌশল, মনঃসংযোগ, ইচ্ছাশক্তি চালনা, চিন্তাপাঠ প্রভৃতি অতিশয় গুপ্তবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইউরোপীয় খেলাগুলি যে-কেহ শিখিতে পারিলেও প্রকৃষ্ট ভারতীয় যাদুবিদ্যা
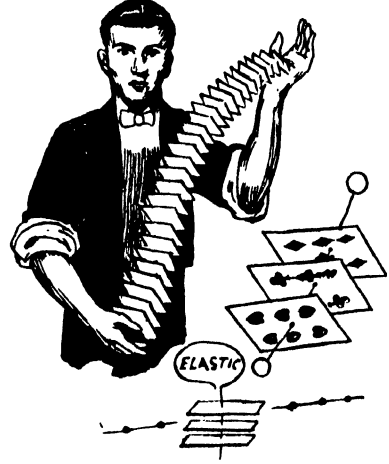
রবারের সুতার সাহায্যে প্রস্তুত-প্রণালী

একমাত্র সাধনা দ্বারাই সম্ভবপর। বলা বাহুল্য, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাকেই সাধনা বলে। জাপানের ও চীনের
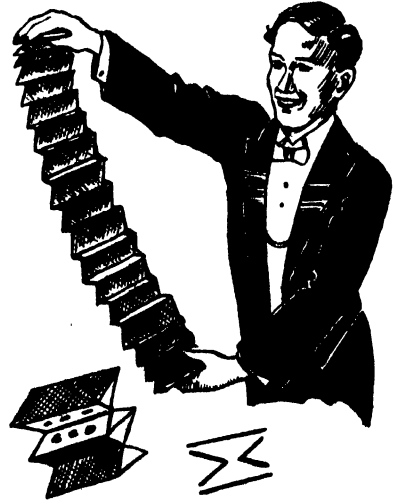
আঠা দ্বারা প্রস্তুতের প্রণালী

ম্যাজিকও অত্যন্ত কঠিন। উহা শিক্ষা করিতে হইলেও কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। সে যাহা হউক, এইবার

দুইটি আধুনিক অথচ চমকপ্রদ খেলার কৌশল প্রকাশে প্রয়াস পাইব।

সকলেই দু-চারটি তাসের খেলা দেখাইতে ইচ্ছুক এবং পৃথিবীর সকল দেশের যাদুকরগণই অপরাপর খেলার সঙ্গে
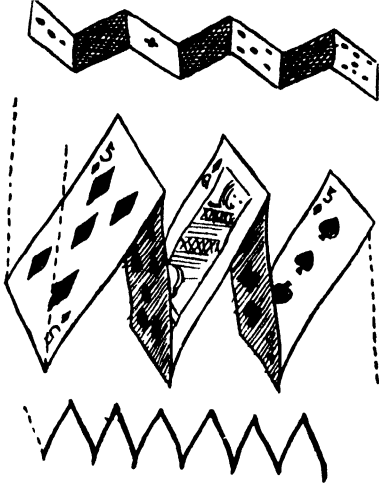
আঠা দ্বারা প্রস্তুতের অপর একটী প্রণালী

তাসের কতকগুলি খেলা দেখাইবেন ইহা সুনিশ্চিত। কাজেই তাসের কতকগুলি লেখা উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত। অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে ব্যবসায়ী যাদুকরগণ রঙ্গমঞ্চে কোন তাসের খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যখন তাসের প্যাকেট হাতে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হন তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যজনক-ভাবে সাফল (shuffle) করেন। তাসগুলি এক হাত হইতে অন্য হাতে বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যায়। এই সাফল করার নানারূপ নাম আছে। একপ্রকার সাফলের নাম জলপ্রপাত (waterfall shuffle), কারণ ইহাতে জলপ্রপাতের ন্যায় এক হাত হইতে অপর হাতে একটি একটি তাস সোঁ-সোঁ শব্দে চলিয়া যায়। কেহ কেহ ইংরেজীতে ম্যাজিক সাফল বা ইলেকট্রিক সাফলও বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক খ্যাতনামা যাদুকরই তাসের খেলা দেখাইবার পূর্ব্বে ও পরে এই ম্যাজিক সাফল দেখাইয়া থাকেন। কারণ ইহা দেখিয়া দর্শকগণ যাদুকর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা করেন। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য খেলাটির কৌশল অতিশয় সহজ। ইহা নানাভাবে সম্ভবপর। প্রথমত নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা। দ্বিতীয়ত তাসের প্যাকেটে কৌশলযুক্ত তাস ব্যবহার করিয়া। আমি বহু বৎসর অভ্যাসের পর কিছুদিন হয় হস্তকৌশলে ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এ যাবৎ কাল আমি কৌশলযুক্ত প্যাকেট ব্যবহার করিয়াই এই খেলা দেখাইয়াছি। কিরূপে তাসের প্যাকেটে আমি কৌশল করিতাম এইবার তাহাই বর্ণনা করিব। আমি বিলাত হইতে ম্যাজিকের সরু রবারের সূতা (thread elastic) কিনিয়া আনিয়া তাহার সাহায্যে সমুদয় তাসগুলি গাঁথিয়া এই খেলা দেখাইতাম। তাহাতে এক হাত হইতে তাসগুলি লাফাইয়া অপর হাতে যাইত। সূতায় মাঝে মাঝে গাঁট দেওয়া থাকিত বলিয়া তাসগুলি দ্বিতীয় চিত্রের অনুরূপভাবে যাতায়াত করিত। ইহা দেখিতে খুবই আশ্চর্য্যজনক। তবে যাঁহারা বিলাত হইতে ঐ সূতা না আনাইয়া কাজ করিতে চাহেন তাঁহারা বাড়ীতে বসিয়া অনুরূপ 'ট্রিক প্যাকেট' তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন। উহা নানাভাবে তৈয়ার করা সম্ভবপর: তবে তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ প্রণালী দুইটি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুলি
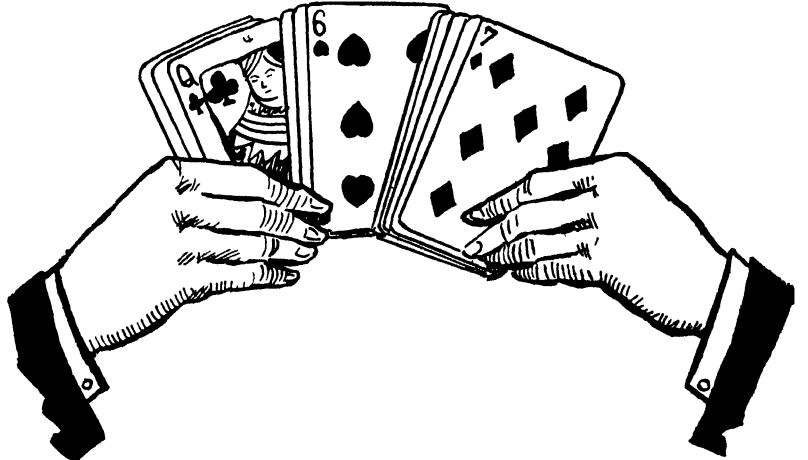
বিশেষ প্রস্তুত প্যাকেটের সম্মুখের দৃশ্য

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে সকলেই ইহা অতিশয় সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৃতীয় চিত্রে তাসগুলি ভাঁজ করিয়া হারমোনিয়ামের বেলোজের ন্যায় তৈয়ার করিতে হয়। তৃতীয় চিত্রে দুইটি সরল রেখা ও দুইটী চক্ররেখা দ্বারা উহার প্রস্তুত-প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চক্ররেখা দ্বারা প্রদর্শিত তাস দুইটিকে ভাঁজ করিয়া লইতে হয়। তারপর উহাদিগকে ভাল তাসের সঙ্গে আঠা দ্বারা আটকাইয়া লইতে হয়। এইভাবে প্রস্তুত তাসের প্যাকেট দেখিতে অনেকাংশে ফোল্ডিং হারমোনিয়ামের ন্যায় দেখাইবে। সাফল্ করিবার প্রণালীও উক্ত বাদ্যযন্ত্রের ন্যায়ই। এইভাবে বিশেষ প্রস্তুত প্যাকেটের উপরে ও নীচে কতকগুলি আল্গা (loose) ভাল তাস রাখিতে হয়। খেলা দেখাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ হাত হইতে আল্গা তাসগুলি মাটীতে ফেলিয়া দিতে হয়। ঐগুলি পড়িবামাত্র ছড়াইয়া যাইবে। যাদুকর ঐ অনবধানতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া একে একে ঐ আল্গা তাসগুলি তুলিয়া লইবেন এবং তারপর খেলাটি দেখাইবেন। এরূপ করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাসগুলি ছড়াইয়া পড়ায় দর্শকগণের ধারণা হইল যে ঐ প্যাকেটের সবগুলি তাসই ঐরূপ আল্গা অর্থাৎ বিশেষ প্রস্তুত নহে। যদিও তাহা সত্য নহে—অর্থাৎ সমস্তই বিশেষভাবে তৈয়ারী। তারপর খেলা দেখাইলে দর্শকগণ আরও বিস্মিত হন।

বিশেষ প্রস্তুত প্যাকেটের পেছনের দৃশ্য

এইবার ম্যাজিক সাফলের সর্ব্বাপেক্ষা সহজপ্রণালী বর্ণনা করিব। চতুর্থ চিত্রে উহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এক প্যাকেটের প্রত্যেকটি তাস এমন ভাবে জোড়া দেওয়া হয় যে তাসের উপরের অংশ উপরের তাসের সহিত এবং নীচের অংশ নীচের তাসের সহিত লাগান থাকে। চতুর্থ চিত্রটি ভাল করিয়া দেখিলে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী সহজে বোধগম্য হইবে। যে-কেহ এই চিত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাড়ীতে তাসের প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া খেলা দেখাইতে পারিবেন। আমার অভিজ্ঞতা হইতে এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, এই খেলাটি দেখিয়া ষাট বৎসরের নীচের সমস্ত ছেলেমেয়েই অত্যন্ত আনন্দিত (ও বিস্মিত) হইবেন।

এইবারে যে তাসের খেলাটির কৌশল প্রকাশ করিব ইহা আরও আশ্চর্য্যজনক ও আরও সহজসাধ্য। খেলাটির ইংরেজী নাম 'Disappearing Card' বা পলায়মান তাস। যাদুকর কতকগুলি তাস তাঁহার হাতে ফেলিয়া ধরিয়া দর্শকদিগকে সেগুলি হইতে যে কোন একটি তাস মনে মনে চিন্তা করিতে বলিবেন। অথচ যাদুকরের মায়ামন্ত্র প্রভাবে ঠিক সেই তাসটি ঐ প্যাকেট হইতে অদৃশ্য হইবে। যতজন খুশী বা যতটি খুশী তাস চিন্তা করিলেও যাদুকর সেই তাস কয়টি অদৃশ্য করাইবেন। খেলাটি দেখিতে বা শুনিতে অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর—কিন্তু ইহার কৌশল অ, আ, ক, খ-এর ন্যায় সহজ। এই খেলা দেখাইতে মাত্র ২৬-টি তাস ব্যবহার করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি তাসই বিশেষ প্রস্তুত। অর্থাৎ উহাদের কোনটিরই পেছন নাই দুইদিকেই তাস। এক প্যাকেটের মধ্য হইতে যে-কোন ২৬টি তাস বাছিয়া লইয়া উহার পিছনে অপর ২৬টি তাস আটা দ্বারা পিঠাপিঠি করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়।

তবে একদিক হইতে দেখাইলে যে ২৬টি তাস দেখাইবে প্যাকেটটী কৌশলে উল্টাইয়া ধরিলে অপর ২৬টি তাস দেখা যাইবে। প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহা সহজে বুঝান যাইবে। পঞ্চম চিত্রে মনে করুন ২৬টী (বা কতকগুলি) তাস দেখান হইয়াছে যাহা হইতে দর্শকগণ যে-কোন একটি তাস মনে করিবে। মনে করুন দর্শকগণ মনে করিল হরতনের ছয় বা চিড়াতনের বিবি। তারপর তাসগুলি উল্টাইয়া যাদুকর যখন ষষ্ঠ চিত্রের ন্যায় দেখাইবেন তখন দর্শকগণ দেখিবেন সমস্ত তাসই আছে কেবল তাঁহাদের চিড়াতনের বিবি বা হরতনের ছয়—উহাই নাই। খেলাটি যতবার খুশী করা চলে। অথচ কৌশল জানা না থাকিলে—যত চালাকই হউন না কেন, কেহই ইহার মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন না—ইহা সুনিশ্চিত। আপনারা বাড়ীতে চেষ্ট করিয়াই দেখুন।

ওই যায় !

শ্রীমতী সাহানা দেবী

আজি সোনার স্বপনে রঙিন গগন এ কী এ আলোকে চায়
আজি ধরণীর পারে সুনীল সরণী উজলি' ওই কে যায়।
আজি কে যায় নবীন লগন মেলে,
কে যায় অপার আঁধার ঠেলে,
কে যায় মরণ-শিয়রে জ্বেলে
আপন অমরতায় !
আজি ধূলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি ওপারের ঢেউ ভেসে এসে লাগে এ পারের এই কূলে,
আজি ধূলিমাখা বীণা ঝঙ্কারি' ওঠে অপরূপ সুর তুলে।
আজি কে লয় তুলিয়া কমল করে
পথিক-পরাণ আপন ঘরে,
গতি ছন্দিয়া জীবন 'পরে
চুমিয়া চিত কে ভায়।
আজি ধূলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি রাতের আকাশে কত চাঁদ হাসে কত যে তারকা গায়,
আজি উষার পবনে সুখশিহরণে এ কী এ হরষ ছায়।
আজি গগনে ভুবনে কোন এ খেলা,
ধূসর উষরে রঙের মেলা,
রুদ্ধ শিলার প্রাণের ভেলা
কে আজি উজানে বায়।
আজি ধূলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

তার একটি রেখায় উছল অসীম আবরি' সীমার গান,
তার একটি আঁখির তারায় উজল লক্ষ রবির দান।
তার একটি মণির অতলতলে
অসীম আলোর রং উথলে
হিয়ায় নিখিল বিশ্বদোলে
নিঃস্ব মধুরিমায়,
আজি ধূলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি অপার সে ওই সত্তায় মোর তনু মন হ'ল লয়,
আজি তারি সুরে মোর জীবন জলধি শত তরঙ্গে বয়।
মোর কূল নাই আমি অকূলধারা,
নিমেষে নিমেষে রভসে হারা !
মোর প্রাণে আজি চন্দ্রতারা
কিরণ পরশ পায়।
আজি অপার সে ওই সত্তায় মোর তরীখানি ডুবে যায়।

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পরদিন ভোরে উঠিয়াই মনোহর কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা অপ্রয়োজন বোধে দেখা-সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেল। ইহাতে বিস্মিত কেহ হইল না, কেন না মনোহরের প্রকৃতিই ঐপ্রকার, লৌকিকতা আত্মীয়তার সে বড় ধার ধারে না।

মনোহরের এই যে আসা-যাওয়া—ইহাকে বড় করিয়া দেখার প্রয়োজন কাহারও হয় না—একমাত্র টিয়ার ছাড়া। টিয়া মনোহরের এই যাতায়াত উদ্দেশ্যহীন বলিয়া প্রথম প্রথম ভাবিত সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন আর তাহা সে ভাবিতে পারে না। টিয়া কাল সারারাত বিনিদ্র কাটাইয়া ছোট-মা রূপসীর কথাটাই হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করিয়াছে এবং ছোট-মা যে নেহাত মিথ্যা কিছু বলে নাই সে-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছে। মনোহর এখানে আসে তবে তাহার দিদির সঙ্গে দেখা করিতে নয়, আসে তাহারই সঙ্গে দেখা করিতে, আসে একটু রঙ্গ-তামাসা করিতে! টিয়া এ-কথা যতবারই ভাবিয়া দেখে ততবারই ছোট-মা'র মনের অন্তঃস্তলে কি যে পৈশাচিক উল্লাস ভবিষ্যতের পানে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া নিথর বসিয়া আছে—একটা যোগ্য মুহূর্তের জন্ম তাহাই অনুমান করিয়া অন্তরে গিরিপ্রদেশের হিম-শৈত্য অনুভব করিয়াছে, কিন্তু সে জানে ইহার প্রতিবাদ তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। যদি তাহার দিক হইতে মনোহরের এই গতায়াতের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তো রূপসীর দিক হইতে অমনি আসিবে আবেগময় সমর্থন—যাহার তোড়ে তাহার ভীরু প্রতিবাদ সামান্ত তৃণখণ্ডের মত বিপুল জলধির ঘূর্ণাবর্তে নিমেষে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিবাদেও তাহার প্রবৃত্তি নাই। সে জানে সে নিরুপায়।

বর্তমানে মনোহর যে আবার কিছুদিনের জন্ম নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহারই আনন্দে টিয়া ভোরের আলোককে শুভের সূচনা বলিয়া সহজে গ্রহণ করিতে পারিল। রাত্রের এঁটো বাসনের পাজা লইয়া সে খালের ঘাটে গেল, ঘাটে বাসনগুলি নামাইয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল—ছাই আর শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিতে—অবশ্য যে-ঘাটে নিত্য বাসন মাজা হয় সে-ঘাটে যে এ-সবের অভাব থাকা সম্ভব নয় তাহা জানিয়াও সে উপরে উঠিয়া আসিল—সেই বাতাবি লেবু গাছটির কাছে। এখান হইতে ভৈরব দত্তের বাড়ীর রান্নাঘরের বেড়াটা পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—আর ঐ রান্নাঘরের দক্ষিণ দিয়াই বাড়ীর উঠান হইতে খালের ঘাট পর্য্যন্ত পায়ে-চলা পথের রেখাটি আমবাগানের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে। সুন্দরকে আসিতে হইলে ঐ পথেই ঘাটে আসিতে হইবে। সুন্দর আসিলেও আসিতে পারে। এতক্ষণে কি আর তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে যদি ঘাটে এখন চোখ-মুখ ধুইতে আসে—সে বেশ হয়! কিন্তু আবার যদি সুন্দরের মাথায় সেদিনের মত দুর্ব্বুদ্ধি চাপে, আবার যদি সে তাহাকে পূর্ব্ববৎ পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়। টিয়া সঙ্গে সঙ্গে একবার কপালে হাত বুলাইয়া ফেলিল; কিন্তু সে-দাগ তখন আর বর্তমান নাই, রাত্রের মায়ায় সে যেন কোথায় মিলাইয়া গেছে।

টিয়া ওপারের চতুর্দ্দিকে একবার তন্ন তন্ন করিয়া দৃষ্টি বুলাইল, তারপরে পাড় হইতে কতকটা দূর্ব্বা ছিঁড়িয়া লইয়া ঘাটে নামিয়া আসিল, যেহেতু ছোট-মা'র ঘুম ভাঙ্গার আগেই তাহাকে বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিয়া বাড়ীর উঠান-ঘরের দাওয়া প্রভৃতি নিকাইয়া রাখিতে হইবে এমনভাবে—যেন রূপসী ঘর হইতে বাহির হইয়া ভিজা দাওয়া বা উঠানে পা ফেলিয়া না অপ্রতিভ হইয়া ওঠে পায়ের দাগ পড়ার দরুণ। তাহা হইলে টিয়ার আর রক্ষা থাকিবে না এবং যে গাল-মন্দ অবিলম্বে সুরু হইয়া যাইবে তাহা সারা দিনমান তো বিনা ক্লেশে চলিবেই, রাত্রেও থামিবে কি-না বলা দুষ্কর। তবে রক্ষা এই যে, রূপসীর যে-বেলায় ঘুম ভাঙ্গে সে সময়ের মধ্যে একটা খাল শুকাইয়া যাওয়াও খুব যে বিচিত্র একটা কিছু ব্যাপার তাহা বলিয়া তো বোধ হয় না।

টিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘাটের উপর

বাসন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাজিতেছিল। গত বর্ষায় বেদিয়াদের কাছ হইতে সে যে চারগাছি রঙীন্ কাঁচের চুড়ি দুই হাতের জন্ম কিনিয়াছিল তাহার দুইগাছি কবেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন যে দুইগাছি বাঁ-হাতে অবশিষ্ট ছিল তাহা বাসনের গায়ে লাগিয়া মাঝে মাঝে চিন্ চিন্ করিয়া উঠিতেছিল—যে-কোন মুহূর্ত্তে হয় তো বা খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহা তো যাইতেই পারে। সেদিকে টিয়ার কোন খেয়াল ছিল না। শুধু সর্পাকারে স্বর্ণ-বলয় দুইটি সে দুই হাতের শীর্ষসম্ভব স্থানে ঠেলিয়া আঁটিয়া রাখিয়া দিয়াছিল যাহাতে বার বার সে দুইটিকে না সরাইতে হয়, কেন না কাজের তাহাতে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

টিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু মন তাহার পড়িয়াছিল দত্তদের পাছ-দুয়ারের খালের ঘাটের দিকে।

হঠাৎ একসময় টিয়া দৃষ্টি তুলিয়া ওপারের ঘাটের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, সুন্দর একখানি বৈঠার উপর দেহের ভার আনমিত করিয়া দিয়া নিনিমেষ বেহায়া দৃষ্টি পাতিয়া যেন তাহারই পানে চাহিয়া আছে। কুমারী কন্যার ঘোম্‌টা টানিয়া মুখ ঢাকিবার রীতি নাই, থাকিলে টিয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিতে পারিত; কাজেই সামান্য একটু সে ঘুরিয়া বসিয়া মুখটি যথাসম্ভব আড়াল করিতে প্রয়াস পাইল এমনভাবে—যাহাতে সুন্দরকে ইচ্ছামত সে যে-কোন অবস্থায় প্রয়োজন হইলেই দেখিতে পায়, আর সুন্দর সেই ঘাটে যতক্ষণ রহিল ততক্ষণ প্রয়োজন তাহার আর ফুরাইল না।

সুন্দর তাহাদের নৌকার 'পরে গিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকা জলে বোঝাই হইয়া ছিল—কাজেই বৈঠাটি পাশে পাটাতনের উপর নামাইয়া রাখিয়া নৌকার ভিতরে রক্ষিত নারিকেলের মালাটি লইয়া সুন্দর জল সেঁচিয়া ফেলিতে লাগিল। আর এত ঘটা ও শব্দ করিয়া সুন্দর জল সেঁচিতে লাগিল যে ওপারে আনত-শির টিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে বাধ্য হইল। সুন্দর তাহা বুঝিতে পারিয়াও নিরস্ত হইল না। নৌকার জল সেঁচা শেষ হইলে খুব চিন্তিতের মত সে বৈঠা তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল। খালে স্রোতের তেমন কোন প্রাবল্য ছিল না যে নৌকা মুহূর্ত্তে কোথাও ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, নৌকা একস্থানেই যেন হেলিয়া দুলিয়া ঐকান্তিক বিরাম খুঁজিতেছিল, নৌকার উপরের আরোহী সুন্দর যেন ততোধিক। অথচ এ আচরণে সুন্দর যে টিয়ার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে তাহাও সে বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই বাধার দিকটা বহু পূর্ব্বেই শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর হঠাৎ এ বিসদৃশ অসামঞ্জস্যের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে গিয়া একটু অপ্রত্যাশিত আচরণের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। হঠাৎ বৈঠা জলে নামাইয়া একটা চাড় দিয়া নৌকার আগা-গলুইটা টিয়ার দিকে ফিরাইয়া আর একটা ঈষৎ চাপে নৌকাটিকে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অকারণ অর্থহীন উল্লাসে সহসা হাসিয়া উঠিয়াই আবার থামিয়া গেল। টিয়া তেরছা দৃষ্টিতে সকলই লক্ষ্য করিল এবং নৌকা ঘাটের দশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ার আগেই কাপড়টা অপরিচ্ছন্ন হাতে সাম্‌লাইয়া ধরিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সহজ লঘু স্বচ্ছন্দ গতিতে পাড়ে উঠিয়া গেল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সুন্দর যেন তাহাকে ঘাট হইতে জোর করিয়া তাহার নৌকায় তুলিয়া লইতে আসিয়াছে। সুন্দর অমনি মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বৈঠা চাপিয়া ধরিল এমন ভঙ্গীতে যেন তাহার কঠোর কর্ত্তব্য সহসা স্মরণে জাগিয়াছে। কিন্তু তখন আর লুকাইবার সাধ্য কিছু সুন্দরের ছিল না, সে টিয়ার কাছে ধরা দিয়াছে খামোখা একেবারে, এটুকু দৌর্ব্বল্য ধরা সে না দিলেও পারিত। সেজন্য আফসোস করা অবশ্য সুন্দরের স্বভাবও নয়, রীতিও নয়। সে তাই টিয়ার দিকে ফিরিয়া সহজ অবিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমি যেন কেউটে সাপ একটা, পাছে ছোবল্ মারি তাই পালালে বুঝি?

টিয়া কথা বলিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু না বলিয়া এত বড় সুযোগকে ব্যর্থ হইতে দিতেও সে পারিল না; তাই বলিল, না, সাপ কেন হতে যাবে। শিখিপুচ্ছের সজ্জন-বংশের চিরকালের শত্রু তোমরা, তাই সেদিন পিটুলি ফল ছুঁড়ে মেরে শত্রুতার প্রথম নমুনা যা দেখালে তাতে ভয় না ক'রেও তো পারি না।

সুন্দর একটু হাসিয়া বলিল, তা শত্রু চিরদিন শত্রুই থাকে।

টিয়া এইবার বিশেষ ঠেস্ দিয়া কথা কহিল, বলিল, তা

শত্রুতাই যদি করবার সাধ তো গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে এলে কেন? একেবারে সড়্‌কি-বল্লম নিয়ে বেরুলেই পারতে। কলঙ্কিনীর খাল আবার লালে লাল হ'য়ে উঠত, দেশের লোক সম্ভ্রম ও আতঙ্কে চেয়ে থাকত। ভৈরব দত্তের ছেলের নামে টি টি প'ড়ে যেত—সেই-তো বেশ হ'ত!

হুঁ, তা হ'ত বই-কি! কিন্তু ভৈরব দত্তের ছেলে তো আর তা' বলে নিশি সজ্জনের মেয়ের সঙ্গে লড়াই করতে বেরুতে পারে না সড়্‌কি-বল্লম নিয়ে! দেশের লোক যে হাসবে তা হ'লে!—বলিয়া সুন্দর মৃদু একটু হাসিয়া আবার বলিল, তাই তো সড়্‌কি-বল্লম ছেড়ে এবার তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়েচি। দেখা যাক্ ফলাফল!

টিয়া সহসা বলিয়া ফেলিল, অ! টিয়া পাখী বিঁধবার মতলবে বুঝি এবার তীর-ধনুক সম্বল করেচ? ঠিকই তো, যার যেমন অস্ত্র!

বলিয়া ফেলিয়াই টিয়া মুহূর্ত্তে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুন্দর টিয়ার কথা বলার অপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইল, টিয়ার সলাজ বঙ্কিম পলায়ন-তৎপর ভঙ্গীটি আরও চমৎকার, আরও মনোমুগ্ধকারী। সুন্দর আজিকার ভোরের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে সার্থক জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ ও বর্ষণক্লান্ত রাত্রের পর ভিজা সূর্য্যের সলাজ উঁকি-ঝুঁকির মত অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিল।

বাসনগুলি ঘাটেই পড়িয়া রহিয়াছে, কাজেই টিয়া বেশীক্ষণ আর বাগানের মধ্যে অর্থহীন ঔদাস্য লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিল না। কিন্তু সুন্দর তখনও সেই ঘাটের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে নৌকা লাগাইয়া অপেক্ষা করিতেছে কি-না কে জানে, সেই ভয়েই সে ঘাটের দিকেও অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। একটু একটু করিয়া ভয়-বিব্রত পদে সে আবার ঘাটে নামিয়া আসিল। সুন্দর আশে-পাশে কোথাও নাই দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বাসনগুলি মাজিয়া ঘষিয়া আবার যখন সে সেগুলিকে পাঁজা করিয়া বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিল তখন বেশ বেলা চড়িয়া গিয়াছে, কারণ তখনই ঠিক তাহার সৎ-মা রূপসী তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া একটি কঠিন অসন্তোষ-ব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় নিবিড় আলস্য ভাঙ্গিতে গা মট্‌কাইতেছিল। টিয়াকে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াই মুহূর্ত্তে সে কঠিন একটি সরল রেখায় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল এবং টিয়া একটি ঢোক্ গিলিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—কি, মনোহর বিদেয় হয়েচে বুঝি, তার ঘরের দরজা যে খোলা রয়েচে দেখচি? আবার কবে আসবে ব'লে গেল শুনি?

টিয়া বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল - কেন, সে কি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব যে আমাকে ব'লে যাবে? ব'লে যদি কিছু যেতই তো সে তো তোমাকেই ব'লে যেত, আমাকে কিসের জন্যে বলতে যাবে শুনি?

না, আমার তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি কি-না সে জন্যেই একথা জিগ্যেস্ করলাম। যদি তোকে কিছু ব'লে গিয়ে থাকে—এই আর কি!—বলিয়া রূপসী নিজের পুরু ঠোঁট কেমন একটু জিব দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে সাম্‌লাইল।

টিয়াও রান্নাঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সে হয় তো রাত থাকতেই উঠে চ'লে গেচে, আমার ঘুম তখনও ভাঙ্গে নি।

রূপসী দেখিল, এদিক দিয়া টিয়াকে তেমন সুবিধা করা গেল না, আর একদিক দিয়া তাহাকে তবে আক্রমণ করা যাক্। অমনি সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, তখনও ঘরের দাওয়া ও উঠান নিকানো শেষ হয় নাই। রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়াইয়া তাই সে ডাকিল, অ টিয়া, বলি রাত থাকতে উঠে তো ঘাটে যাওয়া হয়েছিল, আর ফেরা হ'ল তো এই বেলা ন'টা নাগাদ! বাবা! বাবা! কি যে মেয়ের মনের কথা, আর কি যে তার কাজের ছিরি! এ যেন পরের বাড়ীর কাজ করা হচ্ছে, প্রাণ নেই কোন কাজে। বলি, এই এত বেলায়ও ঘর-দোর-উঠান সবই তো প'ড়ে আছে, একটু গোবর জলের ছিঁটে বুলোতেও এত আলিস্যি! আমারও যেমন কপাল!

টিয়া রান্নাঘরে বাসন নামাইয়া রাখিয়া নিরুত্তরে আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট-মা'র সকল কথাই তাহার কানে গিয়াছিল, কিন্তু উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া সে বোধ করিল না। অবশ্য, উত্তর দিলে বিবাদ বেশী এবং উত্তর না দিলেও সে বিপন্মুক্ত নয়, কাজেই বৃথা বাক্য-ব্যয়ের স্পৃহা তাহার মধ্যে জাগিল না। ঘরের দাওয়া ও উঠান নিকানোর কাজেই সে নিজেকে ব্যাপৃত করিল। রূপসী আশে-পাশে ক্ষণিকের জন্য

বাকা-মুশল ঘুরাইয়া টিয়াকে হতভম্ভ করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু তেমন কোন কিছু সে তন্মুহূর্তেই হাতড়াইয়া না পাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইয়া শেষে বলিয়া ফেলিল—অনেক দেমাকী দেখেছি এযাবৎ, মাকে দেখিনি, কিন্তু তার ছাঁ'টিকে দেখ্‌চি; আর এই যদি তার নমুনো হয় তো ভগবান আমাকে খুব বাঁচান বাঁচিয়েচেন—

বলিয়া রূপসী আপন বাক্‌-পটুতার ভূয়সী গর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল চোখ মুখ ধুইতে—সর্ব্বাঙ্গে তখনও তাহার জড়াইয়া আছে রাত্রির অবসাদ, যেমন করিয়া ভোরের দুর্ব্বাদলকে জড়াইয়া থাকে রাত্রের শিশির।

টিয়ার সহসা আজ আবার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে আজ প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর আগেকার কথা—যখন সজ্জন-বাড়ী বলিতে সেই একমাত্র মহিয়সী নারীর কথাই সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে জাগিত। এখনও তাহার সুখ্যাতি গাঁয়ের ঘরে ঘরে কারণে-অকারণে উচ্চারিত হইয়া থাকে। রূপসীর কানেও সেকথা যে লোকে গুঞ্জরণ করে নাই এমন নয় এবং তাহা হইতেই রূপসীর কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সে চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া বসবাস করিতেছে, কাজেই পাড়ার অন্যান্য মেয়ে ও বধূদের কাহারও সহিত সে তেমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই বা চাহেও নাই।

টিয়া সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল দিয়া মায়ের স্মৃতি-তর্পণ করিল এবং মুহূর্ত্তে আবার তাহা সে সাম্‌লাইয়াও উঠিল। টিয়ার মন অনেকটা বালির মত—দাগ পড়িলেও মিলাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না, জল পড়িলেও অবিলম্বে আবার তাহা শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে বালির মত টিয়ার মন সে-মনেও একটা জিনিষ গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছে এবং সে-দাগ আর কখনও মিলাইবে বলিয়াও তো মনে হয় না—সে সুন্দর। সুন্দরকে তাহার ভাল লাগিয়াছে, বড় ভাল লাগিয়াছে, যেমন ভাল লাগে বিজয়োদ্ধত ফেনোর্ম্মি-উচ্ছ্বসিত সাগরকে বেলাভূমির—ঠিক তেমনটি। ফলে ঘাটের কাজ তাহার বাড়িয়াছে, একবারের জায়গায় যে কতবার সে বাতাবী লেবু গাছটার তলা দিয়া ঘাটে যাইতেছে তাহার আর ঠিক নাই। কিন্তু বেশী সময়ই তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, কেন না সুন্দরের দেখা প্রায়ই মেলে না।

সজ্জন-বাড়ীর সাম্‌নের দিকে শিখিপুচ্ছের রায়েদের একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। সেই দীঘির জলই শিখি-পুচ্ছের গৃহস্থের পানীয় জল। প্রত্যহ বৈকালের দিকে গ্রামের মেয়ে ও বধূরা দল বাঁধিয়া পশ্চিম দিকের শান-বাঁধানো ঘাটে যায় গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া পানীয় জল তুলিয়া আনিতে। টিয়া এতদিন বৈকালে সেখানেই গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া জল আনিতে যাইত; কিন্তু এখন শুধু সে একবার যায় কলসী ভরিয়া পানীয় জল তুলিয়া আনিতে এবং গা-ধোওয়ার কাজ খালের জলেই অনায়াসে চলিতে পারে বলিয়া অধুনা তাহার ধারণা জন্মিয়াছে ও তাহাই সে মানিয়া চলিতেছে।

সেদিনও তাই টিয়া রান্না ও পানীয় জল রায়েদের দীঘি হইতে কলসী ভরিয়া আনিয়া দিয়া একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে বেশ একটা ছায়া-সুনিবিড়তা বিরাজ করিতেছে, শুধু পাখীর কল-কাকলি অদূরের বন-বিতানে একটা তন্দ্রাতুর মূর্চ্ছনা জাগাইয়া বসিয়াছে।

টিয়া ক্ষণিকের জন্য একবার বাতাবি লেবুর আভূমি-নুইয়া-পড়া ডালটার উপর মাটিতে পা রাখিয়া উপরের আর একটা ডাল ধরিয়া বসিয়া রহিল কিসের যেন প্রতীক্ষায়। সুন্দরদের ঘাটের নৌকাটি তখন ঘাটে ছিল না। হয় তো সুন্দরই নৌকাযোগে কোথাও বাহির হইয়াছে। এখনই হয় তো আবার ফিরিয়া আসিবে—নাও আসিতে পারে। খাল দিয়া বার বার তিন-চারখানি নৌকা চলিয়া গেল—তন্মধ্যে একখানি আবার বেপারীদের নৌকা। সব নৌকাই উপর দিকে উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে বকফুলী নদীর উদ্দেশ্যে হয় তো, মাত্র একখানি দক্ষিণ দিকে স্রোতের মুখে মুখে চলিয়া গেল হাজারখুনীর বিলের পানে। এই হাজারখুনীর বিল এ-অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ জিনিষ—বর্ত্তমানে তাহার যে-কোন এক পার হইতে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় রওনা হইলে অপর পারে পৌছিতে সূর্য্য অস্তে নামিয়া যায়, এত বড় বিল এ-অঞ্চলে আর নাই। আবার গ্রীষ্মকালে হাজারখুনীর বিলের মাঝ দিয়া পায়ে-চলা পথও প্রস্তুত হয়—

শুধু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে জল বারোমাসই বর্ত্তমান থাকে এবং সেগুলিকে অনেকটা বৃহৎ পুষ্করিণী বা দীঘির মত দেখিতে হয়। বর্ষাকালে হাজারখুনীর বিল নৌকায় পাড়ি দেওয়া বেশ বিপদসঙ্কুল—কেন না একটু জোরে বাতাস বহিতে সুরু করিলেই জলরাশি উত্তাল হইয়া ওঠে—এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত সাগর-সদৃশ ঢেউ উচ্ছল কলহাসি হাসিয়া ওঠে। আর ঝড় উঠিলে তো কথাই নাই। হাজারখুনীর বিলের তাই নাম-ডাক আছে। উত্তর দিকের বকফুলীরও নাম-ডাক আছে—অশান্ত দামাল বলিয়া নয়, বরং তাহারই উল্টা; তবে বকফুলীরও স্রোত সাধারণ নদী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খরধার। দুই পাড়ে নানা গঞ্জ, বাজার-হাট, বসতি-বহুল গ্রাম, মঠ ও মাঠ রাখিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার গতি। বকফুলীই এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রশস্ত রাজপথ। দিনে ও রাত্রে তিনখানি ষ্টীমার এই বকফুলী দিয়া যাতায়াত করে, মোটর-বোট বা লঞ্চের তো কথাই নাই। আর নৌকা চলে অসংখ্য—দিবারাত্রের সমস্ত সময় জুড়িয়া।

টিয়া কখন যে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল নিজের চিন্তায় তাহা নিজেও সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার চমক্ ভাঙ্গিল ওপারে সুন্দরের গলা শুনিয়া। সুন্দর পাড়ে দাঁড়াইয়া নৌকার 'পরে উপবিষ্ট তাহারই সমবয়সী শ্রীমন্তকে ডাকিয়া বলিল, উঠে আয় শ্রীমন্ত। আজ জ্যোৎস্না রাত আছে, রাত ক'রে যাওয়া যাবে'খন হাজারখুনীর বিলে।

শ্রীমন্ত একলাফে ডাঙায় গিয়া উঠিল। তারপরে সুন্দরের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই যে-–ওপারে, ওই তো নিশি সজ্জনের মেয়ে টিয়া না?

শ্রীমন্ত আস্তে করিয়া কিছু আর বলে নাই। কাজেই টিয়ার কানে তাহার সব কথাই পৌছিল। সুন্দর কি যেন শ্রীমন্তর কানের কাছে লইয়া গিয়া আস্তে করিয়া বলিয়া একটা ঝট্‌কা টানে শ্রীমন্তকে বাগানের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। শ্রীমন্ত তবুও একবার সুন্দরের টানে আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও পিছু ফিরিয়া টিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেলিল। টিয়া অমনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। টিয়া ইতিপূর্ব্বে শ্রীমন্তকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, আর শ্রীমন্তও যে টিয়াকে দেখিয়াছে তাহাতে টিয়ার সন্দেহ নাই। তবে শ্রীমন্ত কেন যে আজ আবার তাহাকে এমন বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইল তাহা কে জানে। হয় তো সুন্দর তাহারই সম্বন্ধে শ্রীমন্তকে কিছু বলিয়াছে এবং বিশেষ কিছুই হয় তো বলিয়াছে। টিয়ার সহসা মুখে-চোখে কেমন যেন একটু লজ্জার রং ধরিল। আবার মুহূর্ত্তে নিজেকে সে সাম্‌লাইয়া লইয়া ঘাটে নামিল। যত দ্রুত সম্ভব গা-ধোওয়া অনাড়ম্বরে শেষ করিয়া শ্রীমন্তর ফিরিয়া চাওয়ার যথা-কারণ গবেষণা করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ভিজা কাপড় পরিয়াই বাতাবি লেবুর গাছের ডালের উপর রক্ষিত শুক্‌নো কাপড়খানি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঘাটে কাপড় ছাড়িতে আজ তাহার কেমন যেন বাধিল।

রাত্রে নিরালা নির্জ্জন অন্ধকার শয্যায় নিদ্রাহীন চোখ বুজিয়া টিয়া চেষ্টা করিয়াছে কলঙ্কিনীর খাল দিয়া একখানি নৌকা চলার শব্দ শুনিতে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। একবার যেন সে ঐ খালের দিক হইতেই একটা বাঁশের বাঁশী ফুকারিয়া উঠিতে শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া তাহার মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া কিছুই সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। হইতে পারে—সুন্দর আর শ্রীমন্ত খাল দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে হাজারখুনীর বিলের দিকে, তাহাদেরই মধ্যে কেহ হয় তো বাঁশী বাজাইতেছে—আবার তাহা নাও হইতে পারে। বাহিরে জ্যোৎস্না তখন ঝলমল্ করিতেছে। আজ রাত্রে সুন্দর আর শ্রীমন্ত হাজারখুনীর বিলে হয় তো নৌকা লইয়া বিলাস-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। না জানি তাহারা কাহার কথা একান্তে আলোচনা করিতেছে। হইতে পারে তা—যে শ্রীমন্ত সুন্দরকে টিয়ার কথা তুলিয়া বিব্রত করার প্রয়াস পাইতেছে। তাহা তো আর খুব কিছু অসম্ভব না। কারণ শ্রীমন্ত আজ বৈকালের দিকে টিয়াকে ঘাটে অমন বার বার নিরীক্ষণ করিয়া তবে দেখিল কেন? নিশ্চয় তবে তাহাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া কথা উঠিয়াছে। আর এই রাত্রের নিঃসঙ্গ আকুলতার মধ্যে উভয়ে অত কাছাকাছি নৌকায় বসিয়া তরঙ্গায়িত জ্যোৎস্নার নিবিড়তম আবেশের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া সেকথা নূতন করিয়া আবার তুলিবে না কি! হয় তো তুলিলে তুলিতেও পারে। আবার টিয়ার কেমন জানি মনে হয়, না তুলিয়া তাহাদের যেন আর নিস্তার নাই। সেই পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারার গল্প কি আজ সুন্দর না করিবে। লজ্জায় টিয়ার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

টিয়ার ঘরের পিছনের বাগানের নিস্তব্ধ গভীর বিজনতা ভাঙিয়া দিয়া—একটা কি পাখীর ডানা যেন ঝট্‌পট্ করিয়া উঠিল—তারপরেই রাত্রের নিস্তরঙ্গ বুকে ঘা মারিয়া গুরু-গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইল—বুদ্-বুদুম্। টিয়ার এ ডাকের সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল তাই; তাহা না হইলে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠাও কিছু অন্যায় হইত না। পাখীটির নাম ভুতুম-পেঁচা, যেমন কদাকার ও বিশাল তাহার মূর্ত্তি, তেমনই আবার বিপুলায়তন ঘোরালো দুইটি চক্ষু, আবার ডাকটিও তেমনই ভয়-জাগানে। নিশীথে সহসা প্রথম পরিচয় ঘটিলে সংজ্ঞা হারানো খুব আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া কেহ বিবেচনা করিবে না। টিয়ার পূর্ব্ব-পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কেমন জানি ভয় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সে হাজারখুনীর বিলে সুন্দরের নৌকা যে ছলাৎ-ছল শব্দ তুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা ভুলিয়া গেল। বকফুলীর দিক হইতে একটা মোটর-বোটের সিটির ফুঁ যেন দিগ্-দিগন্ত মাড়াইয়া দিল। টিয়া নিদ্রায় সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা পাইল।

সকালবেলা শ্রীমন্ত সোজা একেবারে সজ্জন-বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্ত বনপলাশীর অনাদি ঘোষের তৃতীয় পুত্র। এককালে অনাদি ঘোষের পয়সা ছিল—এখন আছে শুধু দেমাক। টিয়া উঠানে একটা বঁটি পাতিয়া একরাশ নারিকেল পাতা লইয়া পাতা হইতে কাঠিগুলি ছাড়াইতেছিল, আর একপাশে সেগুলিকে জড়ো করিয়া রাখিতেছিল। এমন সময় শ্রীমন্ত সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। টিয়া ক্ষণিকের জন্য একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল। তারপরেই আবার সে সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

শ্রীমন্ত আশে-পাশে আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া টিয়াকেই জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ টিয়া, তোমার বাবা গেলেন কোথা?

টিয়া সলাজকণ্ঠে জবাব দিল, বাবা এই তো এতক্ষণ এখানেই ছিলেন, আবার বুঝি রায়েদের বাড়ীর দিকেই গেলেন তবে। আপনি দাওয়ায় উঠে চেয়ারটায় বসুন না—আমি রায়েদের বাড়ী থেকে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।

বলিয়া টিয়া কাপড়টা সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীমন্ত অমনি বলিল—না থাক, তোমার আর কষ্ট ক'রে রায়েদের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, আমিই বরং পথে তাঁর সঙ্গে দেখাটা ক'রে যাব'খন।

টিয়া অধিকতর লজ্জাকাতর একটি ভঙ্গিমায় বলিল—না, কষ্ট আর কি!

তবু!—অতি আস্তে করিয়া বলিয়া শ্রীমন্ত মুহূর্ত্তে টিয়ার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা প্রখর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। টিয়ার সহসা মনে হইল, শ্রীমন্ত যেন তাহাকেই দেখিতে আসিয়াছিল; দেখা হইয়াছে, চলিয়া গেল। কাজ শুধু তাহার অছিলা মাত্র। একথা মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই টিয়ার সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ ও শ্রীমন্তর পক্ষে বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শ্রীমন্ত ইহা ভাল করে নাই, এই কথাই তাহার কেবল মনে জাগিতেছিল।

শ্রীমন্ত চলিয়া গেলে রূপসী তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—অ টিয়া, ও এসেছিল কে শুনি?

ছোট-মা'র কথার ভঙ্গীতে টিয়ার সর্ব্ব শরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখিয়া বলিল, বনপলাশীর অনাদি ঘোষের ছেলে শ্রীমন্ত ঘোষ এসেছিল বাবার খোঁজে।

অঃ! আমি বলি কে না কে আবার!—বলিয়া রূপসী আবার তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌন শর্ব্বরীর কোলে তারা-দীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়,
বিশীর্ণা নটিনী নদী নিঃসার-কল্লোলে যায় বহি',
অনুচ্চ উভয় কূলে নিশীথের তন্দ্রা রহি রহি
টুটে যায়;—চিত্ত মম নিঃসন্দেহ হ'তে নাহি চায়।
স্বপ্নের কল্পিত রূপ লক্ষ্য থেকে অলক্ষ্যে মিলায়;
নিতল তিমির অঙ্কে দীপ্তিহীন তারকা জাগিছে,
অমর্ত্ত্য পুলকস্পর্শ হারা-হৃদি নিয়ত মাগিছে,
কল্পনার আদি-অন্ত স্বপ্নভঙ্গে কোথায় লুকায়?

চারুকলার ক্রমোন্নতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে বাংলাদেশে কলাশিল্পের যেন একটা মৃদুস্রোত বহিতেছে। অনাদৃত চারুশিল্পের পক্ষে বৎসরের মধ্যে আজ তাহা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এত অল্প কালের মধ্যে এই নিঃস্ব দেশের কলা-সম্পদের যে উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহাতে দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায়—যদি সাধনার বিঘ্ন না ঘটে তবে আর পঁচিশ বৎসরে দেশ শিল্প-গৌরবে যে কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারিবে। অযত্ন অনাদর সত্ত্বেও ললিতকলার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা যথার্থই বিশেষ গৌরবের অধিকারী হইয়াছি।

'বাপের পেশা' —হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

শিল্পকলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরম মিত্র। এই সাধারণ কথাটী আমরা অন্য প্রবন্ধেও বলিয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশের লোক তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে এইটী খুবই আশার কথা। অবশ্য ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিবার হেতু নাই, কারণ কোন জাতির মধ্যে যথার্থ প্রাণ-শক্তি থাকিলে সাময়িক দুর্ব্বলতা সেখানে কখনই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চারুশিল্পের ভাণ্ডারে কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল না। তখন দেশের শিল্পীর কোন উচ্চ জ্ঞান ও দানের পরিচয় আমরা পাই নাই। পটের নামান্তর ছিল—তৈল চিত্র। সে চিত্র কোন মূল্য বহন করিত না। কালের গুণে কয়েক

'রামধনু' —কুমার রবীন রায়

না। তাহাদের ধারণা—দেশের শ্রীবৃদ্ধির পথে অনায়াসলব্ধ বহু ফলের মধ্যে 'কদলী' ত্যাগ করিলেও তেমন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। এরূপ ধারণা নিতান্তই অনিষ্টকর। এই কলার প্রকৃত নাম—রূপ, সৌন্দর্য্য। সমস্ত জগৎই রূপের দাস। রূপ আগে, গুণ তাহার পরে। ইহার দৃষ্টান্ত নিয়তই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তথাপি আমরা দেখিয়াও বুঝি না।

এতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রতিবৎসর শীতকালে কলা-শিল্পের মাত্র একটী প্রদর্শনী হইত। কিন্তু গতবৎসর হইতে কোন সম্পর্ক ছিল না, শুধু ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের বন্ধনীতে উহা আবদ্ধ থাকিত। ইহা ব্যতীত আর একটী অভাবও ছিল। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ বহু আয়াসে যে শিল্পসংগ্রহ করিতেন তাহা দোষগুণের বিচারের বিশেষ অধীন হইত না। প্রদর্শনীর কলেবর বৃদ্ধির দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকিত।

'হুড্রু প্রপাত'

—বিমল মজুমদার

'শকুন্তলা'

—ভাস্কর কে-সি-রায়, এ-আর-সি-এ

কলাশিল্পীর ক্রমাকটাক্ষের ফলে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রদর্শনীর বিশেষ

সম্প্রতি সোসাইটী অফ্ মডার্ণ আর্ট নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠান কলিকাতার চৌরঙ্গীতে একটী বিশিষ্ট চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—যথার্থ

শিল্প ও শিল্পীর যোগ্য সমাদর করা। এই প্রদর্শনীটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সম্পদ ছিল যথেষ্ট। প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠান দর্শকের মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এরূপ প্রদর্শনীর দ্বারা কলা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধনেরই সহায়তা হইবে।

'চিন্তাস্রোত' —পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রদর্শনী-কক্ষে বিভিন্ন চরিত্রের চিত্রকে একস্থানে উপযুক্ত-ভাবে সন্নিবেশ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমজনক কার্য্য। এই কার্য্যে মার্জ্জিতরুচি, ঐক্যতার জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রয়োজন। বর্ণোজ্জ্বল বিশাল একটী নৈসর্গিক চিত্রের পার্শ্বে মৃদু-মধুর সলজ্জ নায়িকাকে স্থাপন করিলে তাহা মৃত্যুদণ্ড তুল্য হয়। এই কারণে স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া অতি অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রতি চিত্রের স্থান দান করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত চিত্র প্রদর্শনীটী এই কার্য্যে সিদ্ধিকাম হইয়াছে, তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

স্বর্গীয় গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'বিসর্জ্জন' নামক রঙীণ চিত্রটী বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। ইহা প্রতিমা নিরঞ্জনের একটী সান্ধ্য-দৃশ্য। সামান্য বিষয়বস্তুকে বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ করিয়া শিল্পী চিত্রিত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় সারদা উকীলের বহু চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। পেন্সিলে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে মাধুর্য্য ও রেখার কোমলতা উভয়ই বিদ্যমান। কৃষ্ণলীলার বহু চিত্র এই শিল্পী অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সব আলেখ্যে শারীরিক গঠনের ত্রুটীর কথা দর্শকের কেহ কেহ উল্লেখ করিলেও, ভাব এবং নির্ম্মাণের শক্তিতে চিত্রগুলি যে উচ্চাঙ্গের তাহা স্বীকার না করিবার উপায় নাই। 'বুদ্ধ ও সহচরগণ' চিত্র-খানিতে শিল্পীর বর্ণের খেলা বেশ উজ্জ্বল ও কৌশলপূর্ণ।

শ্রীযুক্ত পুলিন কুণ্ডুর "প্রিয়-মার্কা" সিগারটী বেশ সযত্নে চিত্রস্থ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক মুখমণ্ডলের ত্রিসীমানায়ও চিন্তার দৌরাত্ম্য নাই। প্রতিকৃতি চিত্রে ইনি অনেককাল পূর্ব্বেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "অনন্তের সুর" চিত্রটী সর্ব্বাংশে প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ফকীরের শুষ্ক চিত্রে ভাব, প্রেম ও কল্পনার এত রস সঞ্চালন যিনি করাইতে পারেন তিনি অশেষ শক্তিশালী সন্দেহ

'তীরবর্তী তরুণী' —শৈলজ মুখার্জি
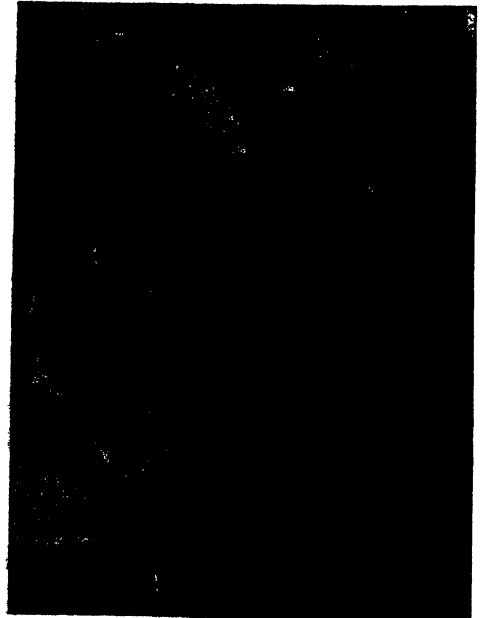
নাই। তাঁহার 'কর্দ্দমে কমল' প্রদর্শনীতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দ' অপূর্ব্ব হইয়াছে। অন্তরের ভাব তিনি বাহ্যিকরূপে—মুখে প্রতিফলিত করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দও অতি সুন্দর হইযাছে।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "চিন্তাস্রোত" একটা উৎকৃষ্ট জল-রং চিত্র। তীব্রোজ্জ্বল বর্ণপ্রয়োগ না করিয়াও যে মধুর ও প্রাণস্পর্শী চিত্র নির্ম্মাণ সম্ভব হয়, পূর্ণবাবু তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ইঁহার 'জহরতের বাক্স'টী বেশ মূল্যবান। 'চৈতন্য'র চিত্রটীতে বেশ একটা দেবভাব রহিয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ' —স্বর্গীয় সারদা উকীল

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর 'বিষ্ণু' চিত্রখানি আধুনিক হইলেও নির্ম্মাণ চাতুর্য্যে নূতনত্ব আছে। সূক্ষ্ম তুলিকার সাহায্যে সোণালী পশ্চাদ্‌পটের উপর মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত। চিত্রখানি প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অতুল বসুর বহু চিত্র আমরা দেখিয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে ইনি পূর্ব্বেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনীতে তাঁহার নৈসর্গিক চিত্রগুলিও সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'সেতুর পাশে নৌকা' চিত্রটী যথার্থই সুন্দর। 'অজানা স্থান' চিত্রটীতে বর্ণের খেলা বেশ উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।

শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলীর নাম এদেশের লোকের নিকট সুপরিচিত। যদিও তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে যশস্বী, তথাপি তাঁহার 'গৃহহারা' চিত্রটী দর্শক মাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করিয়াছে।

'কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা' —রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পাঞ্জাবের শিল্পী ঠাকুর সিংএর দান এবার তাঁহার নৈসর্গিক চিত্র অপেক্ষা 'এ্যালিফেণ্টা গুহা'তেই অধিক

'যাত্রা' —ভাস্কর প্রমথ মল্লিক

আবদ্ধ। কাশ্মীরের দৃশ্যগুলিতে ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের 'মা ও ছেলে' খড়ি-চিত্রটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামান্য কয়েকটী রেখাপাতেই অবাধ্য ছেলের স্বরূপটী শিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অঙ্কিত রমোয়ণের চিত্রাবলী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা' চিত্রটির ভাবব্যঞ্জনা অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শৈলজ মুখার্জ্জির চিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 'তীব্রবতী তরুণী'র মুখখানায় তুলিকার বেশ সবলতা দেখা যায়। তাঁহার 'সিকিম তোরণ'ও উল্লেখযোগ্য চিত্র।

শ্রীযুক্তবিমল মজুমদার যে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতি চিত্রেই অল্প বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। রাঁচীর 'হুড্রু প্রপাত' এবারকার শ্রেষ্ঠ চিত্র।

কুমার রবীন রায়ের লাক্ষা নির্ম্মিত চিত্রগুলি প্রদর্শনীতে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বিভিন্ন বর্ণের লাক্ষাকে শিল্পী প্রয়োজন মত ভাব ও কল্পনার মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া বিশেষ নূতনত্বের ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রদর্শনীতে আর একটি দর্শনীয় ও উপলব্ধির উপযুক্ত বিষয় ছিল—রাগ-রাগিনীর কল্পিত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি। দুই-শত বৎসর পূর্ব্বের বর্ণপাত বর্ত্তমানেও সমভাবেই উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল।

প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষের নিদর্শনও যথেষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত প্রমথ মল্লিকের 'শৌর্য্য' শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার 'যাত্রা' গ্রাম্য মাঝির নিখুঁৎ প্রতিমূর্ত্তি। ভাস্কর কে, সি, রায়ের 'শকুন্তলা' প্রদর্শনীকে সুন্দরতর করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। দেহভঙ্গী, লাস্য ও কোমলতা একত্রে মিলিয়া কঠিন উপাদানকেও নম্রতর করিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর, কামাক্ষ্যা দাস, হৃষীকেশ দাসগুপ্ত প্রভৃতির শিল্পগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রহেলিক

নাটক

শ্রীযামিনীমোহন কর

পরিচয়

গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টর), কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস (তাঁর সহকারী), দামোদর সামন্ত (হোটেল "ক্যাসিনো"র ম্যানেজার), সুশীলা (হোটেলের ঝি), রতনলাল মণ্ডল (পুলিশ জমাদার), নীহার রায়, মালিনী দেবী, গণেশদাস সকসেরিয়া (হোটেলের অধিবাসী), বংশী, অনাথ (হোটেলের লিফ্‌ট-মেন), বনমালী সাহা, ত্রিদিবেন্দ্র-নারায়ণ নন্দী (আগন্তুক), ডাক্তার দে (পুলিশ ডাক্তার)

প্রথম অঙ্ক

হোটেল ক্যাসিনো। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনের ফ্ল্যাট। সকাল সাড়ে সাতটা। ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য টেলিফোন করছেন

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—হ্যাঁ, ম্যানেজার সাহেবকে একবার ডেকে দিতে পারেন ? আচ্ছা, ধন্যবাদ—

ডিটেক্‌টিভ কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাসের প্রবেশ

তারপর কার্ত্তিক, ডেড্ বডি ঠিক ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছ তো ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। ডাক্তার কি বললেন ?

কার্ত্তিক। বললেন—"রাইগর মর্টিস সেট ইন করেছে, আর এখনও রয়েছে। সাত-আট ঘণ্টা তো বটেই।"

গিরিজা। তা হ'লে রাত্রি বারোটা-একটা নাগাদ ধরা যেতে পারে।

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুলেটটা বার করা হ'লেই আপনাকে ফোনে খবর দেবেন বলেছেন।

গিরিজা। আচ্ছা। (ফোনে) হ্যালো—কে ? ম্যানেজার সাহেব ? একবার ওপরে এলে ভাল হয়। দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল। না, না, বেশীক্ষণ লাগবে না !

টেলিফোন রাখলেন

গিরিজা। লোকটার সম্বন্ধে কোন খোঁজ পেলে ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে না। "হুজ হু" "ইয়ারবুক" "প্রমিনেণ্ট মেন" কোনটাতেই ওঁর নাম খুঁজে পাওয়া গেল না।

গিরিজা। আশ্চর্য্য !

কার্ত্তিক। হয় ত ওঁর নাম পদবী সবই মিথ্যে।

গিরিজা। হতে পারে। হাঁ, ওঁর মনিব্যাগ, সিগার কেস—

কার্ত্তিক। দেরাজেই সব রেখে দিয়েছি।

গিরিজা। হুঁ। দেখ কেউ যেন হাতটাত না দেয়। আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। তোমার তো এই প্রথম মার্ডার কেস ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হাঁ !

গিরিজা। খুব মন দিয়ে সব লক্ষ্য করবে। কি ভাবে ক্লু ধরতে হয়, কোন্ লাইনে জেরা করতে হয়—বুঝলে ? বই পড়া বিদ্যা আর সত্যিকারের কেস ট্রাই করা, দুটোতে অনেক প্রভেদ। বুদ্ধি, দৃষ্টি, চিন্তা—সব অতি প্রখর হওয়া চাই। সব শুদ্ধ খুনের কেস পনেরোটা করেছি, তার মধ্যে বারোটাকেই ধরে দোষী প্রমাণ করেছি। এরকম রেকর্ড সচরাচর থাকে না বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কার্ত্তিক। আর তিনটের স্যর কি হ'ল ?

গিরিজা। সে অনেক কথা।

কার্ত্তিক। আপনার অ্যাভারেজটা নষ্ট করে দিলে।

গিরিজা। কি ?

দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

আসুন—

দরজা খুলে ম্যানেজার দামোদর সামন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন

ভেতরে আসুন—

সেইখান থেকেই চারিধারে ভীতভাবে দেখতে লাগলেন

কার্ত্তিক। ভয়ের কিছু নেই। লাশ তো চালান দেওয়া হয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন

গিরিজা। বসুন। আর কোন খবর জানতে পারলেন ?

দামোদর। (বসে) আজ্ঞে না। খাতায় তো আর কিছু লেখা নেই। মাস দুয়েক থেকে এখানে আছেন। প্রত্যেক মাসের টাকা অগ্রিম দিয়ে দেন, সুতরাং—

গিরিজা। সে তো বটেই। আচ্ছা, কোন লোকজন—

দামোদর। আমি ঠিক জানি না। হোটেলের স্টাফ, ঝি চাকর তারাও কিছু বলতে পারলে না।

গিরিজা। মুস্কিল!

দামোদর। বিলক্ষণ! কিন্তু আমার অবস্থাটা একটু ভাবছেন? হোটেলের বদনাম—হয় ত ভয়ে কেউ আর আসবেই না। লোকটা নিজের মাথার খুলি নিজে উড়িয়ে দিয়ে—

কার্ত্তিক। নিজে নয়—

দামোদর। মানে?

গিরিজা। অন্য কোন ব্যক্তি—

দামোদর। অ্যাঁ! বলেন কি?

গিরিজা। অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দামোদর। অর্থাৎ আমার এই হোটেল "ক্যাসিনো"তে কুমারবাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে?

কার্ত্তিক। তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যাড্ লাক্।

গিরিজা। আপনার হোটেলের চারতলায় যাঁরা আছেন, তাঁদের নামের একটা লিস্ট করেছেন?

দামোদর। হ্যাঁ। সঙ্গেই এনেছি।

গিরিজা বাবুর হাতে একটা স্লিপ দিলেন

গিরিজা। ধন্যবাদ। এঁরা বুঝি এই তলায়ই থাকেন? বেশ, বেশ। আচ্ছা, এই দরজাটা দিয়ে কোন্ ঘরে যাওয়া যায়?

একটা দরজা দেখালেন

দামোদর। ওদিকে আর একজন থাকেন। আর বারে একজন খুব বড় ফ্ল্যাট চাওয়ায় দেওয়ালে এই দরজাটা ফুটিয়ে দিয়েছিলুম। এখন ওটা বন্ধ ক'রে দু'টো ফ্ল্যাট ক'রে দিয়েছি।

গিরিজা। ওঘরে কে থাকেন?

কার্ত্তিক দরকারী কথা নোট করছেন

দামোদর। নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।

গিরিজা। আপনার লিফ্‌টে ক'জন লোক কাজ করে?

দামোদর। দু'জন। একজন সকাল সাতটা থেকে চারটে, আর একজন চারটে থেকে রাত বারোটা অবধি। অবশ্য অনেক বেশী লোক বাইরে থাকলে একটা অবধিও থাকে। দিনে থাকে বংশী, আর রাতে অনাথ। কালকে অনাথ রাত্রে বিশেষ কাজ থাকার দরুণ আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে বংশীর সঙ্গে ডিউটি বদলাবদলি ক'রে নিয়েছিল—

গিরিজা। এখন লিফ্‌টে কে আছে?

দামোদর। বংশী।

গিরিজা। আচ্ছা, এই সব ঘরের কাজকর্ম কে করে?

দামোদর। ঘর পরিষ্কার আর বিছানা ঠিক ক'রে রাখার ভার সুশীলার ওপর।

গিরিজা। তার কাছ থেকে হয় ত—

দামোদর। তাকে পাঠিয়ে দেব?

গিরিজা। দিলে ভাল হয়।

দামোদর দরজার কাছে গেলেন

আচ্ছা, আর একটা কথা। আমাদের আসার আগে এঘরে কেউ এসেছিল?

দামোদর। প্রথমে সুশীলা, তারপর আমি।

গিরিজা। মেজেয় কার্ট্রিজ কেস পড়েছিল?

দামোদর। কিছু দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরিজা। আচ্ছা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম।

দামোদর। কষ্ট ত আপনাদের। আমি নীচে অফিসেই রইলুম। যখনই কোন দরকার হবে খবর দেবেন। ফোন করলেই হবে। তাঁকে যে এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

গিরিজা। কিছু না। আমাদের কর্ত্তব্য। আর এখানে তো পোস্টমর্টেম হতে পারত না।

দামোদর। পোস্ট—না, না, বটেই তো, বটেই তো—

প্রস্থান

কার্ত্তিক। ভদ্রলোক অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

গিরিজা। খুব স্বাভাবিক। ঝিকে নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়।

কার্ত্তিক। কেন? মাথায় ছিটফিট আছে নাকি?

গিরিজা। ছিট না থাকলেও ফিট থাকতে পারে।

কার্ত্তিক। নীচে থেকে এক বালতি জল দিয়ে যেতে বলব?

দরজায় খট খট ধ্বনি

গিরিজা। ভেতরে এস।

ঝাঁটা হাতে সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। (দূর থেকে) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কার্ত্তিক। ভেতরে এস না। ভয় পাচ্ছ কেন?

সুশীলা। ভয় পেতে যাব কেন?

এগিয়ে এল

গিরিজা। তোমার নাম কি?

সুশীলা। সুশীলা। ম্যানেজারবাবুর কাছে শোনেননি?

গিরিজা। কোথায় থাক?

সুশীলা। কখন?

কার্ত্তিক। কখন মানে?

সুশীলা। দিনে না রাতে?

গিরিজা। (রেগে) দিনে রাতে আবার কি?

সুশীলা। (চেঁচিয়ে) দিনে থাকি এই হোটেলে, আর রেতে থাকি আমার বাসায়।

গিরিজা। তোমার বাসার কথাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে?

সুশীলা। কেন?

কার্ত্তিক। জান, আমরা পুলিশের লোক।

সুশীলা। পুলিশ তো কি হয়েছে? তারা কি আমাদের পাড়ায় যায় না নাকি? আমি থাকি কাঁসারীপাড়ায়।

গিরিজা। তুমি ভয় পেয়েছ বলে ত মনে হচ্ছে না।

সুশীলা। ভয় পাব কেন? এ সব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। যেখানেই চাকরি করতে যাই সেখানেই একজন না একজন কেউ মরে। হয় ছাত থেকে পড়ে, না হয় বাস চাপা পড়ে, কিংবা ঘরে আগুন লেগে অথবা বিষ খেয়ে। সেই জন্যেই ত এবার হোটেলে চাকরি নিয়েছি। এক সঙ্গে তো আর সব লোক মরতে পারবে না।

কার্ত্তিক। ওঃ। অপঘাতে মৃত্যু তা হ'লে অনেক দেখেছ! আমরা কি প্রশ্ন করব—

সুশীলা। সে আমার জানা আছে। এঁর এখানে কে আসত, শেষ কখন দেখেছি, গোলমাল শুনেছি কি না—

গিরিজা। থাক, আর বলতে হবে না। এই ঘরে তুমিই প্রথম এসেছিলে না?

সুশীলা। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘর পরিষ্কার করতে।

গিরিজা। এসে কি দেখলে?

সুশীলা। সে তো আপনারা জানেনই।

গিরিজা। ঘরের মেজেয় কার্টি্রজের কেস দেখেছিলে?

সুশীলা। কাঠের কেস?

গিরিজা। না—না। (দেরাজ থেকে একটা রিভলবার বার করে) এটা কার জানো?

সুশীলা। না। ও আমারও আছে, দু আনা দিয়ে দোলের সময় রং খেলার জন্যে কিনেছিলুম।

গিরিজা। নাঃ, তুমি এবার যেতে পার।

সুশীলা। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল, এতক্ষণ কত কাজ এগিয়ে যেত।

কার্ত্তিক। কুমারবাহাদুর লোক কেমন ছিলেন জান?

সুশীলা। আজ্ঞে না—আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল না।

গিরিজা। (রেগে) যাও এখান থেকে।

সুশীলার প্রস্থান

কার্ত্তিক। কি ফাজিল রে বাবা!

গিরিজা। হোটেলের ঝি ওইরকমই হয়ে থাকে।

কার্ত্তিক। হিস্টিরিয়া কি ফিট কিছু তো হ'ল না।

গিরিজা। হুঁ। ডাকের চিঠিগুলো আন তো, দেখি।

কার্ত্তিক। আনছি।

পাশের ঘরে গেলেন

গিরিজা। কেস্‌টা কোথায় গেল?

চারধারে খুঁজতে লাগলেন। পাশের ঘর থেকে কার্ত্তিক চিঠিগুলো নিয়ে ফিরে এলেন

কার্ত্তিক। এই নিন্। কি দেখছেন?

গিরিজা। রিভলভার রয়েছে। একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু কেস কই? (একটু পরে) দেখি চিঠিগুলো।

একটা নিয়ে খুলতে গেলেন

কার্ত্তিক। খুলবেন?

গিরিজা। বাজে বোকো না। স্রেফ দেখে যাও কি ভাবে কাজ করতে হয়। (একটা চিঠি খুলে) জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণের চিঠি। চৌরঙ্গী টেরেস। লিখেছেন—"বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২২শে মে রাত্রিতে আটটার সময় আমার বাড়ী আপনার ডিনারের যে নিমন্ত্রণ ছিল, তাহা ক্যানসেল্ করা হইল।" হুঁ, তবে তো ত্রিদিবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কুমারবাহাদুরের আলাপ ছিল বলে মনে হচ্ছে।

কার্ত্তিক। কিন্তু কতখানি—

গিরিজা। তাতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ডিরেক্টরী থেকে তাঁর নম্বর দেখে তাঁকে ফোন কর।

চিঠিটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে ও নোট বুকে লিখতে লাগলেন

কার্ত্তিক। হ্যালো, সাউথ 0527। ইয়েস প্লীজ।

গিরিজা। (চিঠির খাম দেখে) ভারী আশ্চর্য্য তো?

কার্ত্তিক। কেন? কি হ'ল?

গিরিজা। চিঠির ওপর লেখা আছে তিন তারিখ, আর খামের ওপর ছাপ রয়েছে সতেরোই অর্থাৎ কালকের।

কার্ত্তিক। তাই তো। এতদিন চিঠিটা কোথায় ছিল?

গিরিজা। নিশ্চয়ই তাকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেটা গাফিলি না ইচ্ছাকৃত?

কার্ত্তিক। হয় তো চাকরদের দোষ। (টেলিফোনে) হ্যালো, ইজ দ্যাট সাউথ 0527? ত্রিদিবেন্দ্রবাবু আছেন? একবার দয়া ক'রে ডেকে দেবেন? বলবেন পুলিশের লোক। আচ্ছা, ধরে আছি। (গিরিজাকে) ত্রিদিবেন্দ্রবাবুকে ডাকতে গেছে।

গিরিজা। দেখি আমাকে দাও। (ফোন নিয়ে) হ্যাঁ—কে? ত্রিদিবেন্দ্রবাবু? নমস্কার! দেখুন, আপনি কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চেনেন? তাঁর এক আকস্মিক বিপদ—অ্যাঁ, কি বললেন? চেনেন না! নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি? কি আশ্চর্য্য! কিন্তু—আচ্ছা দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, একবার হোটেল "ক্যাসিনো"তে আসতে পারবেন? আমি সেইখান থেকেই কথা বলছি। না না, তা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, বটেই তো। বুঝতে পারছি কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। বেশী দেরী হবে না। আসা প্রয়োজন। উপায় নেই! আমার কর্ত্তব্য—মাফ করবেন। হ্যাঁ, এখুনি। যত তাড়াতাড়ি হয়। বেশীক্ষণ লাগবে না। আচ্ছা—ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে দিলেন

কার্ত্তিক। আসতে চাইছিলেন না?

গিরিজা। না। বললেন, কুমারবাহাদুরকে চেনেন না। হয় তো খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চান না।

কার্ত্তিক। কিন্তু খুনের কথা তো আপনি বলেন নি।

গিরিজা। (ভেবে) তা বটে। (একটু পরে) হ্যাঁ, ততক্ষণ হোটেলের কতকগুলো লোককে জেরা ক'রে দেখা যাক। অবশ্য বিশেষ কিছু সুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না।

কার্ত্তিক। হতেও তো পারে। এদের মধ্যে কারুর সঙ্গে আলাপও তো থাকতে পারে।

গিরিজা। হুঁ। রাত্রে কোন গোলমাল যদি শুনে থাকে। রতনলালকে নামগুলো দিয়ে এস আর এক এক জন ক'রে পাঠিয়ে দিতে বলে দাও।

কার্ত্তিক। আচ্ছা স্যর।

কার্ত্তিক চলে গেলেন ও অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। ইত্যবসরে গিরিজা একটা চেয়ার এক জায়গায় সন্তর্পণে সরিয়ে রাখলেন

কার্ত্তিক। ওটা কি করছেন?

গিরিজা। এই জায়গাটায় রক্তের এবং পায়ের দাগ রয়েছে। পাছে মাড়িয়ে ফেলে চেয়ার দিয়ে ঢেকে রাখলুম।

কার্ত্তিক। (ঝুঁকে দেখে) পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হীললেস জুতো।

গিরিজা। রবার সোল বলেই মনে হচ্ছে।

কার্ত্তিক। তবে আর কি, একটা ক্লু তো পাওয়া গেল।

গিরিজা। তোমার মাথা। কলকাতায় লাখ লাখ লোক রবার সোলের জুতো পরে। মনে হয় জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রের কাছ থেকে অনেক দরকারী তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। মিস্ নীহারবালা রায়ের সঙ্গে এখন দেখা করবেন?

গিরিজা। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দাও।

রতনলাল বাইরে গেল। মিস্ রায় ঢুকলেন

গিরিজা। আসুন। কার্ত্তিক, একটা চেয়ার দাও। বসুন।

কার্ত্তিক একটা চেয়ার গিরিজাবাবুর সামনে এগিয়ে রাখলেন। মিস্ রায় বসলেন

নীহার। ধন্যবাদ।

গিরিজা। বড়ই দুঃখিত। আপনাকে কষ্ট দিতে হ'ল। বেশীক্ষণ আটকাব না। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজা-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, আর ইনি হ'লেন আমার সহকারী।

কার্ত্তিক। নমস্কার!

নীহার। নমস্কার!

গিরিজা। আপনার নাম?

নীহার। নীহারবালা রায়।

গিরিজা। আপনি কোথায় থাকেন?

নীহার। এই হোটেলে।

গিরিজা। মানে, এই হোটেলে তো আপনি সম্প্রতি এসেছেন। তার আগে—

নীহার। দেশ বর্দ্ধমান জেলার চুরপুনী। তবে এখন এইখানে স্থায়ীভাবে থাকব মনে করেছি।

গিরিজা। কলকাতায়—হোটেলে!—

নীহার। হ্যাঁ। একটা মেয়ে কলেজে চাকরি পেয়েছি। একলা থাকার পক্ষে হোটেলই প্রশস্ত। (একটু থেমে) এসব জিজ্ঞেস করবার কারণ জানতে পারি কি?

গিরিজা। আজ এই ঘরে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ তাকে হত্যা করেছে বলে সন্দেহ করি।

নীহার। কি ভয়ানক কথা!

গিরিজা। মৃতের নাম কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইন। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল কি?

নীহার। না। নামও শুনি নি।

গিরিজা। লম্বা দোহারা চেহারা, বড় বড় গোঁফ, ফরসা রঙ্—

নীহার। না, দেখিনি। মাত্র দু দিন এসেছি। চোখ নিয়ে একটু কষ্ট পাচ্ছি বলে ঘর থেকে মোটে বার হই নি।

গিরিজা। কাল ক'টার সময় শুতে গিছলেন?

নীহার। রাত দশটা হবে।

গিরিজা। রাত্রে গোলমাল কি অন্য কোন শব্দে আপনার ঘুম ভেঙ্গে গিছল কি?

নীহার। না। সকালে ঝি চা নিয়ে আসায় ঘুম ভাঙ্গল।

গিরিজা। আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট দিলুম।

নীহার। না, না, কষ্ট আর কি।

উঠে দরজার কাছে গেলেন

গিরিজা। এখন ঘরেই থাকবেন তো? যদি দরকার হয়—

নীহার। কিন্তু আমার যে দু-চারটে কাজ রয়েছে—

গিরিজা। ঘণ্টা তিনেকের জন্য অন্তত আপনাকে থাকতে অনুরোধ করছি—

নীহার। দরকারী কাজ ছিল—

গিরিজা। এটাও তো খুব দরকারী। যদি কোনো সাহায্য—

নীহার। আমি যা জানি বলেছি। এ ছাড়া আর—

গিরিজা। তবুও—সরকারী কাজ, মাফ করবেন।

নীহার। অগত্যা।

মিস্ রায়ের প্রস্থান

কার্ত্তিক। বিশেষ এগোলো বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরিজা। না।

কার্ত্তিক। উনি তো কিছুই জানেন না স্যর। মিথ্যে ওঁকে আটকে রাখলেন! বেচারীর কাজকর্ম্মের ক্ষতি হ'ল। সমস্ত রাতই উনি ঘুমিয়ে ছিলেন।

গিরিজা। কি ক'রে জানলে? তুমি কি কাছে ছিলে?

কার্ত্তিক। (লজ্জিত হয়ে) আজ্ঞে না। এই প্রথম দেখলুম।

গিরিজা। পুলিশের কাজে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। মালিনী দেবী এসেছেন।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

রতন। (দরজার কাছে গিয়ে) ভেতরে আসুন।

মালিনী দেবীর প্রবেশ ও রতনলালের প্রস্থান

কার্ত্তিক। দাঁড়িয়ে রইলেন? বসুন।

চেয়ার এগিয়ে দিলেন

মালিনী। (হেসে) নিশ্চয়ই, বসব বই কি!

চেয়ারে বসলেন

গিরিজা। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

মালিনী। আলাপ ক'রে সুখী হলুম।

গিরিজা। আপনি কি করেন?

মালিনী। আমার নাম শোনেন নি!

গিরিজা। হয় তো শুনে থাকব। ঠিক মনে পড়ছে না।

মালিনী। আগে নীরেন বোসের দলে নাচতুম। এখন ফিল্মে। আমার ছবি "বিজনচারিণী", "যৌবনপাখী"—

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। আপনি একজন ফিল্মস্টার।

গিরিজা। স্বামীর সঙ্গে কেস—

মালিনী। সে তো অনেক পুরোনো কথা।

গিরিজা। আপনি বাবু মৃগাঙ্কনাথ দত্তের স্ত্রী না?

মালিনী। ছিলুম। এখন চিত্রতারকা মালিনী দেবী।

গিরিজা। আপনার তখন নাম ছিল—

মালিনী। মাধবী।

কার্ত্তিক। ঠিক হয়েছে। আপনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে স্বামী ও পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে গিছলেন।

মালিনী। দেড়শ' টাকা মাইনের জ্যার্নালিস্টের স্ত্রী থাকলে আজ হোটেল "ক্যাসিনো"তে থাকা আর দু'খানা গাড়ী রাখা সম্ভবপর হ'ত না। আর যখন ফিল্মে নামবই ঠিক করলুম তখন একটা ছেলে নিয়ে লটবহর বাড়ানো প্রয়োজন মনে করলুম না।

গিরিজা। আপনাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করব।

মালিনী। বেশ তো। কোন কাগজে বেরোবে?

গিরিজা। তার মানে?

মালিনী। খবরের কাগজে ছাপবেন তো?

গিরিজা। না। এই ঘরে কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইন থাকতেন। কেউ তাকে হত্যা করেছে। মৃতদেহ ঘরে পাওয়া গেছে।

মালিনী। শুনেছি। সুশীলা বলেছে। (চারিধারে চেয়ে) ঘরটা বেশ সাজানো। ভদ্রলোক বেশ পয়সাওয়ালা।

গিরিজা। কাল আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?

মালিনী। না। কাল সকাল ছ'টায় বেরিয়েছিলুম আর ফিরলুম রাত বারোটায়। শুটিং ছিল। "আজকালকার মেয়ে"তে আমি নায়িকার ভূমিকায় নামছি।

গিরিজা। আপনাদের শুটিং শেষ হ'ল ক'টার সময়?

মালিনী। দশটায়।

গিরিজা। তারপর কি করলেন?

মালিনী। সোজা বাড়ী চলে এলুম।

গিরিজা। তাতে দু'ঘণ্টা লাগল?

মালিনী। কখন ফিল্মে প্লে করেছেন?

গিরিজা। না।

মালিনী। তবে বুঝবেন না। শুটিং শেষ হলে রেস্ট নিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, কিছু খেয়ে ব্যারাকপুর থেকে এখানে আসতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে।

গিরিজা। বারোটা বেজেছে কি করে জানলেন?

মালিনী। ঘড়ি কেনবার পয়সা আমার আছে।

গিরিজা। একলা ফিরলেন?

মালিনী। এসব কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

উঠে দাঁড়ালেন

গিরিজা। কথার উত্তর দিন। একলা ফিরলেন?

মালিনী। (বসে) হ্যাঁ। কেন?

গিরিজা। লিফ্‌টে চড়ে ওপরে উঠেছিলেন?

মালিনী। নিশ্চয়। সমস্ত দিন খেটেখুটে রাত বারোটার সময় হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় ওঠবার সখ হয়নি।

গিরিজা। লিফ্‌টম্যান আপনাকে ওপরে নিয়ে এল?

মালিনী। কেন আসবে না? আমি কি অমনি থাকি?

গিরিজা। ঘরে গিয়ে কি করলেন?

মালিনী। হাসলুম, কাসলুম, একবার ডানদিকে চাইলুম, তারপর বাঁ দিকে চাইলুম—

কার্ত্তিক। না, না, তা নয়। উনি জিজ্ঞেস করছেন ঘরে গিয়ে কি আপনি কিছুক্ষণ জেগে গল্পের বই পড়লেন, না তখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন, অথবা জেগে শুয়ে রইলেন—

মালিনী। (হেসে) সোজা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। বড্ড ক্লান্ত হয়ে গিছলুম কি-না।

গিরিজা। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন?

মালিনী। না। তিন মিনিট সাড়ে ছাপ্পান্ন সেকেণ্ড জেগেছিলুম।

গিরিজা। রাত্রে আপনার ঘুম ভেঙ্গেছিল কি?

মালিনী। না।

গিরিজা। কোন শব্দ শুনেছিলেন? ধরুন গুলির শব্দ?

মালিনী। কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গুলির শব্দ—স্বপ্নে বলছেন কি?

গিরিজা। আপনার ঘুমোবার আগে, এই ঘরে কোন রকম গোলমাল, কি ঝগড়া—

মালিনী। না, কিছু শুনি নি।

গিরিজা। ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন।

মালিনী উঠে দাঁড়ালেন

কার্ত্তিক। এখন কিছুক্ষণ ঘরেই থাকবেন। কোথাও বার হবেন না।

মালিনী। (উৎসাহিত হয়ে) কেন, আপনি আসবেন?

কার্ত্তিক। (লজ্জিত হয়ে) না, না, তা বলছি না—

মালিনী। (হেসে) আচ্ছা থাকব। আপনাদের এই ব্যাপার তো কাগজে বেরোবে। তাতে আমাকে একটু পাবলিসিটি দিয়ে দেবেন। আপনাদের আমার লেটেস্ট একখানা ছবি দেব। সেইটাও সঙ্গে দিলে চমৎকার হবে।

কার্ত্তিক। গ্র্যাণ্ড হবে। ছবিতে নাম লিখে দেবেন।

মালিনী। নিশ্চয়ই। আচ্ছা তবে যাই।

মালিনীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। বেশ মেয়েটি—

গিরিজা। মেয়ে দেখতে গেলে আর এসব কাজ এগোবে না। ভয়ানক মিথ্যাবাদী।

কার্ত্তিক। কি বলেন স্যর ?

গিরিজা। কখন এসেছিল, একলা না সঙ্গে কেউ ছিল, কত রাত অবধি সঙ্গী এখানে ছিল—

কার্ত্তিক। সে তো লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করলেই খোঁজ পাওয়া যাবে।

গিরিজা। হুঁ। তাকে ডেকে পাঠাতে হবে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। গণেশদাস সকসেরিয়াকে পাঠিয়ে দেব ?

গিরিজা। হ্যাঁ, দাও।

রতনলালের প্রস্থান ও গণেশদাসের প্রবেশ

গণেশ। রাম রাম বাবু। সোব ভালো আছেন ?

গিরিজা। নমস্কার।

কার্ত্তিক। বসুন।

চেয়ার এগিয়ে দিলেন। গণেশদাস বসলেন

গণেশ। কেঁও বাবু, কিছু চোরী হয়েছে ?

গিরিজা। তার চেয়ে বেশী। খুন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গণেশ। খুন ! হত্তিয়া !! কুমারবাহাদুর—

গিরিজা। হ্যাঁ।

গণেশ। তিনি কাকে হত্তিয়া করেছেন ?

গিরিজা। তিনি করেন নি। তাঁকে কেউ হত্যা করেছে।

গণেশ। রাম রাম। এটা তো বোড়ো অন্যায় আছে।

গিরিজা। আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গণেশ। বোলেন।

গিরিজা। আপনার নাম ?

গণেশ। গণেশদাস সকসেরিয়া, (একটু থেমে) লিঃ।

কার্ত্তিক। লিমিটেড !

গণেশ। হাঁ। হামি তো একঠো কম্পানী আছে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে চিনতেন ?

গণেশ। কেনো চিনবে না। হামরা দু'জনেতে একই তলায় থাকে। হামারও ওঁরই মতন বড়া ফ্ল্যাট। বেশ ভালা আদমী ছিলেন। কে তাঁকে মেরেছে জানেন ?

গিরিজা। সেইটাই তো আমরা বার করবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি রকম আলাপ ছিল ?

গণেশ। দেখা হোনেসে "রাম রাম", "নমস্কার" এই সব বোলেছে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর কিছু বলতেন না ?

গণেশ। না। তিনি বড়া আদমী ছিলেন। আচ্ছা বাবুজী, হামি এবার চোলে।

উঠে দাঁড়ালেন

গিরিজা। এক মিনিট। আর দু-একটা কথা আছে।

গণেশ। একটু জল্‌দি কোরেন।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের কোন বন্ধুবান্ধব ছিল ?

গণেশ। আমি জানে না।

গিরিজা। কাল তাঁকে দেখেছিলেন ?

গণেশ। না।

গিরিজা। কাল রাত্রে ?

গণেশ। না। এবার হামি একটু যাবে। আমার খুব জরুরী কাজ আছে। নিজের ঘরে থাকবে। দরকার হোলে ডেকে পাঠাবেন।

গিরিজা। কেন ? এত তাড়া কিসের ?

গণেশ। বোল্‌নেসে আপনি বুঝতে পারবেন। হামি শেয়ারের দালালি করে। একজনকে কুছু শেয়ার বিক্রী কোরবে। হামার ঘরে সে বসে আছে। আগের দফায় এই লোক যখন আসিয়াছিলে, তখন সত্যবাবু হামাকে ঠসিয়ে হামার নাম লিয়ে এর সঙ্গে কাজ করেছিলে। পরে এই লোক হামার কাছে বলেছিলে। দেরী হোলে সে আবার চলিয়া গেলে হামার লুকসান হোবে।

গিরিজা। না, দেরী হবে না। রাত্রে কখন ফিরেছিলেন ?

গণেশ। সাড়ে এগারা হোবে।

গিরিজা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন না লিফ্‌টে।

গণেশ। সিঁড়ি দিয়ে। লিফ্‌ট উপরে ছিলো। ঘন্টি বাজিয়েছিলে, লেকিন লিফ্‌ট নামলে না। খারাব হয়েছিলো।

গিরিজা। কোন্ তলায় লিফ্‌টটা আটকে ছিল ?

গণেশ। হামি উপ্‌রে এসে দেখলে হামাদের তলে লিফ্‌ট খড়া আছে, লেকিন তাতে কোনো আদমী আছে না।

গিরিজা। ওঃ। তারপর আপনি শুতে গেলেন ?

গণেশ। হাঁ।

গিরিজা। কোন গোলমাল কি গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন ?

গণেশ। না।

কার্ত্তিক। এমন কিছু আপনি জানেন কি, যাতে আমাদের কোন সাহায্য হতে পারে ?

গণেশ। যদি কুছু টাকা কোরতে চান তো এই সময় জুট কিনতে পারেন। আয়রণও খারাব হোবে না—

গিরিজা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। যান, আপনার কাজ সেরে ফেলুন।

গণেশ। কুছু না। সীতারাম সোব ঠিক কোরে দেবে।

কার্ত্তিক। ঘণ্টা দু'য়েক কোথাও বেরোবেন না। হঠাৎ কোনো দরকার হোতে পারে।

গণেশ। আমি নিজের ঘরে থাকবে। আচ্ছা, রাম রাম।

প্রস্থান

গিরিজা। যাক্‌, কিছু সন্ধান মিলল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় বংশী লিফ্‌ট ছেড়ে এই তলায় কি করছিল ?

কার্ত্তিক। প্রায় কুমারবাহাদুরের মৃত্যুর সময়।

গিরিজা। বংশীকে একবার ডেকে পাঠাতে হবে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। নিশিকান্তবাবুর কোনো খবর পাচ্ছি না।

গিরিজা। ম্যানেজারকে বলে দিলুম সকলকে ঘরে থাকতে বলতে। দেখি, মাঝের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে।

দরজার কাছে গেলেন। কার্ত্তিকও সঙ্গে গেলেন

গিরিজা। এ কি ! দরজার ছিট্‌কিনি খোলা !

কার্ত্তিক। (ধাক্কা দিয়ে) কিন্তু ওধার দিয়ে বন্ধ।

গিরিজা। এ দিকটাও তো বন্ধ থাকা উচিত ছিল। নাঃ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। রতন, লিফ্‌টম্যান বংশীকে আর ম্যানেজার দামোদরবাবুকে পাঠিয়ে দাও।

রতন। আজ্ঞে দিচ্ছি।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক। "হোটেল ক্যাসিনো" লেখা কাঁধের ব্যাজটা কোন চাকরের পোষাক থেকে খুলে পড়েছে বলেই মনে হয়।

টেবিল থেকে ব্যাজটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন

গিরিজা। হয় তো কোনো রকম ঝুটোপুটি হয়েছিল, সেই সময় ছিঁড়ে পড়েছে। কেউ লক্ষ্য করে নি।

কার্ত্তিক। বংশীর আঙুলের ছাপ নেওয়া দরকার।

গিরিজা। হুঁ।

একটা অ্যাশট্রে রুমাল দিয়ে ভালো কোরে মুছে দূরে টেবিলে রেখে দিলেন

এইতেই কাজ চলে যাবে।

কার্ত্তিক। দেরাজে যে নোটগুলো আছে তাতে রক্ত মাখা আঙুলের ছাপ আছে। ট্রের ছাপের সঙ্গে মিলে গেলে—

রতনলালের প্রবেশ

রতন। বংশী এসেছে স্যর।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

রতনলালের প্রস্থান। ঘরে ঢুকে বংশী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল

বংশী। (সেইখান থেকে) আমাকে ডেকেছেন হুজুর ?

কার্ত্তিক। হুঁ, এগিয়ে এস।

বংশী এগিয়ে এল

গিরিজা। আমরা পুলিশের লোক, জানো বোধ হয় ?

বংশী। হ্যাঁ হুজুর।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর মারা গেছেন, শুনেছ ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। কেউ তাঁকে খুন করেছে মনে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে রোজ দেখতে, তার সঙ্গে কথা বলতে—

বংশী। দেখেছি বটে কিন্তু কথা প্রায় বলিনি বললেও চলে। খুব গম্ভীর ছিলেন। অনাথকে একটু ভালবাসতেন।

কার্ত্তিক। অনাথ কে ? যে লিফ্‌টম্যান রাতে থাকে ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। তাকে স্নেহ করতেন কি ক'রে জানলে ?

বংশী। আপনি অনাথকেই জিজ্ঞেস করবেন। সে রোজ রাত্রে কুমারবাহাদুরকে বিছানায় শুইয়ে দিত।

কার্ত্তিক। কেন ?

বংশী চুপ ক'রে রইল

গিরিজা। অত্যন্ত মদ খেতেন কি ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাতাল হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। জোর করে না শুইয়ে দিলে শুতেন না। অনাথ একদিন তাই দেখতে পেয়ে তাকে ব্যবস্থা ক'রে শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই রোজই—

গিরিজা। কাল রাতে অনাথের জায়গায় তুমি ছিলে। তুমিও কি গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছিলে ?

বংশী। আজ্ঞে না। আর কাউকে উনি বিশ্বাস করতেন না। কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে চাইতেন না।

গিরিজা। কাল কত রাত্রে উনি বাড়ী ফিরেছিলেন ?

বংশী। রাত সাড়ে ন'টা হবে।

গিরিজা। তারপর আর বেরিয়েছিলেন ?

বংশী। (একটু ভেবে) আজ্ঞে না।

কার্ত্তিক। (একটা সিগারেট ধরিয়ে) বংশী !

বংশী। আজ্ঞে।

কার্ত্তিক। ঐ অ্যাশট্রেটা দাও তো।

বংশী। (অ্যাশট্রে এনে) এইখানে রাখব ?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, রাখ।

সামনের টেবিলে রাখল

গিরিজা। কাল রাতে লিফ্‌ট্ ছেড়ে কোথা গিছলে ?

বংশী। আজ্ঞে না।

গিরিজা। ঠিক ক'রে মনে ক'রে দেখ। ধর, এই চারতলায় কোন সময়—

বংশী। না হুজুর।

গিরিজা। মালিনী দেবী ক'টার সময় এসেছিলেন ?

বংশী। মনে পড়ছে না। বারোটার কাছাকাছি হবে।

গিরিজা। আর মিস্ রায় ?

বংশী। তিনি সন্ধ্যার সময়ই ফিরে এসেছিলেন।

গিরিজা। গণেশবাবু ক'টায় এসেছিলেন ?

বংশী। দশটার সময়।

গিরিজা। এঁরা সকলেই একা এসেছিলেন ?

বংশী। হ্যাঁ হুজুর।

গিরিজা। আচ্ছা দেখ, নিশিবাবু কেমন লোক ?

বংশী। আজ্ঞে, আমি তাঁকে কোনদিন দেখি নি।

গিরিজা। সে কি রকম ? এখানে থাকেন—

বংশী। হয়ত' লিফ্‌ট খোলবার আগেই চলে যান, রাতে ফেরেন। তাই আমার সঙ্গে দেখা হয় না।

গিরিজা। এই তলায় কাল কেউ নতুন এসেছে ?

বংশী। আজ্ঞে না।

গিরিজা। কাল রাত্রে কোন রকম গোলমাল কি গুলির আওয়াজ কিছু শুনেছিলে ?

বংশী। না হুজুর।

গিরিজা। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কেউ কখনও দেখা করতে এসেছিল ?

বংশী। না। (একটু ভেবে) একটা কথা—

গিরিজা। কি ? বল।

বংশী। একজন লোক একদিন ওঁর খোঁজ করতে আসে। তিনি তখন বাইরে। আসতেই তাঁকে জানাই। তাতে বলেছিলেন কখনও যেন লোকটাকে আসতে দেওয়া না হয়। অনাথকেও বলেছিলেন।

গিরিজা। তাই নাকি ! ভদ্রলোকের নাম কি ?

বংশী। আজ্ঞে নামটা পেটে আছে, মুখে আসছে না।

গিরিজা। এটা কতদিন আগেকার ঘটনা ?

বংশী। প্রায় মাসখানেক হবে। তারপর সেই ভদ্রলোক আট-দশবার কুমার বাহাদুরের খোঁজে এসেছিলেন।

গিরিজা। অনাথও তাঁকে দেখেছে ?

বংশী। না হুজুর। তিনি বিকেলের আগে আসতেন। কখনও পরে আসেন নি।

গিরিজা। অনাথের হয়ত' নামটা মনে থাকতে পারে ?

বংশী। তা পারে।

গিরিজা। অনাথ এসেছে ?

বংশী। আজ্ঞে না। অন্যদিন এতক্ষণ এসে পড়ে। এবার যাব হুজুর ? লিফ্‌টে আমিই এখন আছি।

গিরিজা। আচ্ছা যাও।

কার্ত্তিক। এক মিনিট। তোমাদের এই পোষাকগুলো তো বেশ। সকলকে দেওয়া হয় বুঝি ?

বংশী। আজ্ঞে না। শুধু লিফ্‌ট্ ম্যানদের।

কার্ত্তিক। ক'টা ক'রে দেওয়া হয় ?

বংশী। আমার একটা, আর অনাথের একটা। অনাথের আগে যে লিফ্‌ট্‌ম্যান ছিল তার পোষাকটা নীচের ঘরে পড়ে আছে। সেটা আমাদের কারুর গায়ে হয় না।

কার্ত্তিক। ওঃ। আচ্ছা যাও। কিন্তু হোটেলের বাইরে যেও না, দরকার হতে পারে।

বংশী। আচ্ছা হুজুর।

বংশীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। বংশীর পোষাকের কাঁধটা তো ছেঁড়া ছিল না।

গিরিজা। না। তবে বদলে নেবার সময় পেয়েছে।

কার্ত্তিক। জামা তো ওদের মোটে একটা ক'রে।

গিরিজা। তা বটে।

কার্ত্তিক। গণেশবাবুকে লিফ্‌টে ক'রে আনবার কথাটা নিয়ে একটু গোল হচ্ছে।

গিরিজা। হুঁ। একজন কেউ মিথ্যে কথা বলছে। আঙ্গুলের ছাপ কি রকম উঠেছে?

কার্ত্তিক। (অ্যাশট্রে ভালভাবে দেখে) পরিষ্কার।

গিরিজা। বেশ। রতনলাল!

রতনলালের প্রবেশ

রতন। কি বলছেন স্যর?

গিরিজা। এই নোটগুলো নাও—রুমালে ক'রে নাও, হাত দিও না, আর এই অ্যাশট্রেটাও নাও।

কার্ত্তিক। দু'টোতেই আঙ্গুলের ছাপ আছে। আপিসে মিলিয়ে দেখে ফলাফল আমাদের ফোনে জানাবে।

গিরিজা। রুমালে বেঁধে খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। যেন ছাপ মুছে না যায়।

রতন। না স্যর।

সব রুমালে বেঁধে নিল

গিরিজা। হোটেলে কেউ কুমারবাহাদুরকে চিনত বললে?

রতন। না স্যর। সকলেরই এক কথা। মুখচেনা আছে মাত্র। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না।

গিরিজা। হুঁ। দামোদরবাবুকে আসতে বলেছ?

রতন। হ্যাঁ। একটা কাজ সেরেই আসছেন বললেন।

গিরিজা। আচ্ছা যাও। হ্যাঁ শোন, তুমি নিজে না গিয়ে আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

রতন। আচ্ছা স্যর।

রুমালে বাঁধা জিনিষ নিয়ে রতনলালের প্রস্থান

কার্ত্তিক। আঙ্গুলের ছাপ এক হ'লে কাজ অনেকটা এগোতে পারে।

গিরিজা। আর যদি না মেলে তা হ'লে বংশীকে বাদ দেওয়া চলবে।

কার্ত্তিক। বংশী যে লোকের কথা বললে—যাকে কুমারবাহাদুর খুব ভয় করতেন—

গিরিজা। এখনও কিছু বলা শক্ত। বংশী যদি দোষী হয় তো সে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবে বই কি।

দরজায় খট খট ধ্বনি

কার্ত্তিক। কে? ভেতরে আসুন।

দামোদরবাবুর প্রবেশ

দামোদর। কিছু মনে করবেন না। একটা কাজে আটকে পড়ে দেরী হয়ে গেল।

গিরিজা। না, না, ঠিক আছে। বসুন।

দামোদরবাবু বসলেন

পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবুর সম্বন্ধে কি জানেন বলুন তো।

দামোদর। বিশেষ কিছু জানিনে। তিনি অদ্ভুত লোক। অবশ্য খারাপ ভাবে একথা বলছি না—

গিরিজা। একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

দামোদর। তিনি চিঠি লিখে ঘর ভাড়া করেন, সঙ্গে এক সপ্তাহের ভাড়াও পাঠিয়ে দেন। চিঠিটা "মেডেন্স" হোটেল থেকে এসেছিল। যিনি ওরকম হোটেলে থাকেন, তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না।

কার্ত্তিক। শুধু এক সপ্তাহের ভাড়া?

দামোদর। হ্যাঁ। তিনি লিখেছিলেন যে একটা ফ্ল্যাট চাই, কিন্তু তিনি যে আসবেনই তার কোন ঠিক নেই। অবশ্য ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন কেমন লেগেছিল, তবে যখন অগ্রিম টাকা দিচ্ছেন—

গিরিজা। সে তো বটেই।

দামোদর। কখন আসেন কখন যান টেরই পাই না।

কার্ত্তিক। কেউ এলে আপনারা খোঁজ রাখেন না?

দামোদর। কতলোক আসছে যাচ্ছে, আমি আপিসে বসে কি তার খোঁজ রাখতে পারি। প্রথমে ভেবেছিলুম এক সপ্তাহ পরে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবেন, কারণ তাঁর আসবার কোন চিহ্নই দেখলুম না। কিন্তু গত সোমবারে একজন চাকর এসে আমায় একটা সীল করা খাম দিল। খুলে দেখি নিশিকান্তবাবু আর এক সপ্তাহের ভাড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর ফ্ল্যাটের চাবিটা চেয়েছেন। চাকরটা চাবি নিয়ে চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল কিছু জিজ্ঞেস করলে হ'ত। তখন সে চলে গেছে। আর করকরে টাকা হাতে এলে—

কার্ত্তিক। কে আর ছাড়তে চায়?

দামোদর। (হেসে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। আপনি কখনও তাঁকে দেখেন নি?

দামোদর। না, বোধ হয় কেউই দেখে নি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। অনাথ একদিন দেখেছিল। রাত্রি সাড়ে আটটা হবে। আমি তখন একটা কাজে বাইরে গিছলুম। অনাথ লিফ্‌ট্ থেকে উঁকি মেরে দেখলে নিশিকান্ত-বাবুর ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে লিফ্‌টে উঠলেন। জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন—'আমার নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়। কাল আসব বলে ঘরটা একবার দেখতে এসেছিলুম।' তার পর লিফ্‌ট্ নীচে নামতেই চলে গেলেন।

কার্ত্তিক। আপনাকে এসব কথা কে বললে ?

দামোদর। আমি ফিরে আসতে অনাথ বলেছিল।

গিরিজা। আচ্ছা, ওঘরটা একবার খুলতে পারেন ? দরজার এধারটা খোলা রয়েছে—

দামোদর। (দরজার কাছে গিয়ে দেখে) কিন্তু তা তো থাকবার কথা নয়। দু দিক থেকেই বন্ধ থাকা উচিত। (ধাক্কা দিয়ে) ও দিকটা বন্ধ রয়েছে। আমি গিয়ে খুলে দিচ্ছি। আমার কাছে সব ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঝি-চাকররা ঘর পরিষ্কার করে।

প্রস্থান

কার্ত্তিক। কিছুই তো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।

গিরিজা। না। এই নিশিকান্তবাবুকে নিয়ে আবার এক ফ্যাসাদ। লোকটার অমন লুকোচুরির দরকার কি ?

কার্ত্তিক। আর আসব বলে এলেনই না বা কেন ?

গিরিজা। তার ওপর আবার কেউ তাঁকে চেনে না।

কার্ত্তিক। এক অনাথ ছাড়া।

গিরিজা। সেও একবার মাত্র দেখেছে। টুকে নিচ্ছ তো ?

কার্ত্তিক। (নোটবুক দেখিয়ে) হ্যাঁ। প্রত্যেক কথাটি নোট ক'রে নিচ্ছি। শর্ট হ্যাণ্ডে।

গিরিজা। দামোদরবাবু ও ঘরে ঢুকেছেন। দরজা খোলবার চেষ্টা করছেন, শুনতে পাচ্ছ ?

কার্ত্তিক। হুঁ। এ ঘরে নড়া চড়া করলে আর এক ঘর থেকে শোনা যায়। সুতরাং কুমারবাহাদুরের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য ওঘরে ওৎপেতে থাকা আশ্চর্য্য নয়।

গিরিজা। ধীরে। বড্ড তাড়াতাড়ি এগোচ্ছো।

মাঝের দরজা খুলে দামোদর ঢুকলেন

দামোদর। এ ঘরের এখনও কাজ হয় নি—

গিরিজা। (দরজার কাছে গিয়ে) সাবধান! নড়বেন না। পায়ের দাগ দেখছি। কার্ত্তিক দেখ, এ ঘরের পায়ের দাগের সঙ্গে ওঘরের পায়ের দাগ হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কার্ত্তিক। (দেখে) একই রবার সোলের জুতো—

গিরিজা। একেবারে এক। কোনও ভুল নেই।

হঠাৎ ওঘরে গিয়ে কার্ত্তিক দরজার পাশ থেকে কি একটা তুলে নিয়ে এলেন

কার্ত্তিক। এ যে কার্ট্রিজ কেস দেখছি।

গিরিজা। (দেখে) তাই তো। (রিভলভারটা টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে ফিট ক'রে) ঠিক ফিট করেছে। আমি এইটাই ভেবেছিলুম, তবে ওঘরে আশা করি নি।

দামোদর। (অবাক হয়ে) কিন্তু এসবের অর্থ কি ?

গিরিজা। অর্থ এই যে, নিশিকান্তবাবু আর ফিরবেন না।

দামোদর। কেন ? তিনিই কি কুমারবাহাদুরকে—

গিরিজা। বলা যাচ্ছে না, তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ—

দামোদর। এ তো ভারী মুস্কিল। হোটেলটা দেখছি এরাই পাঁচজনে মিলে উঠিয়ে দেবে।

প্রস্থান

গিরিজা। এইবার ঠিক হয়েছে।

কার্ত্তিক। কি ?

গিরিজা। নিশিবাবু আর কুমারবাহাদুর যাঁকে ভয় করতেন উভয়ে এক লোক। বংশী তাঁকে দেখেছে। তাই নাম ভাঁড়িয়ে ঘর ভাড়া করলেন। আর রাতে ছাড়া আসতেন না, কারণ বংশী রাতে থাকে না।

কার্ত্তিক। তা হ'লে নিশিকান্ত তাঁর নাম নয় ?

গিরিজা। না।

কার্ত্তিক। ও ঘরে কার্ট্রিজ কেসটা গেল কেমন ক'রে ?

গিরিজা। আমার মনে হয়, এই মাঝের দরজাটা খুলে এইখানে দাঁড়িয়ে কুমারবাহাদুরকে গুলি করা হয়েছিল।

কার্ত্তিক। গুলি ক'রে কার্ট্রিজ কেসটা বার না করলে কি সেটা আপনি বেরিয়ে পড়ে ?

গিরিজা। সাধারণত বেরোয় না, তবে হঠাৎ হাতের চাপ লেগে বেরিয়ে গেলেও যেতে পারে।

কার্ত্তিক। যে রিভলভারটা ফেলে গেছে, সে গুলি করবার পর নিজে ইচ্ছে ক'রেই খালি কেসটা বার করে নি।

গিরিজা। মনে তো হয় না। রিভলভারে নম্বর লেখা আছে। থানায় পাঠিয়ে দিই। লাইসেন্স বুক থেকে মালিকের নাম-ধাম সংগ্রহ হয়ে যাবে।

একটা কাগজ হাতে রতনের প্রবেশ

কার্ত্তিক। কি খবর? হাতে রক্তমাখা ওটা কি?

রতন। আমি বাইরে যে বেঞ্চটায় বসে আছি, সেটার তলায় এটা পড়েছিল। একটু আগে হঠাৎ নজরে পড়ল।

গিরিজা। প্রথম থেকেই ছিল কি?

রতন। বলতে পারি না স্যর। লক্ষ্য করিনি।

গিরিজা। কাগজটা দেখি। (হাতে নিয়ে) এ যে কি লেখা রয়েছে! আচ্ছা, তুমি যাও।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক। তাই ত।. যেন নভেল মনে হচ্ছে।

গিরিজা। পড় ত' শুনি।

কার্ত্তিক। (পাঠ) "মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড়। যেন প্রলয় উপস্থিত। আকাশ গুমরে গুমরে কাঁদছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। বাসন্তীর মনের অবস্থাও তদ্রূপ। সে ভাবছে—" এ কি!

গিরিজা। কি হ'ল?

কার্ত্তিক। এই দেখুন। লেখা বন্ধ ক'রে একটু ফাঁক দিয়ে আবার কি একটা—

গিরিজা। (কাছে গিয়ে দেখে) তাই তো!

কার্ত্তিক। "বনমালী সাহা রিভলভার হাতে পিছন থেকে ঘরে ঢুকেছে। সামনে আরশিতে দেখতে পাচ্ছি। যদি আমার কিছু হয়, তবে—" এইখানে লেখা থেমে গেছে।

গিরিজা। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো। কাগজটার ওপর কালকের তারিখ রয়েছে। সামনে আরশিও রয়েছে।

কার্ত্তিক। তবে এ ঘটনা সত্যি। কালই ঘটেছিল, আর আততায়ীর নাম বনমালী সাহা।

গিরিজা। ঠিক হয়েছে। (চেঁচিয়ে) রতন, রতন! (কার্ত্তিকের প্রতি) হয়ত' এই লোকটাকেই কুমারবাহাদুর ভয় করতেন।

কার্ত্তিক। সে তো বংশীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

রতনের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, বংশী কোথায়?

রতন। লিফ্‌টে।

গিরিজা। এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।

রতন। দিচ্ছি। প্রস্থান

গিরিজা। (মাঝের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে) নিশিকান্ত আর বনমালী যে একই লোক—তাতে আর সন্দেহ নেই।

কার্ত্তিক। অর্থাৎ বনমালী নাম ভাঁড়িয়ে নিশিকান্ত সেজে পাশের ঘরে থাকতেন।

গিরিজা। হুঁ। (রিসিভার তুলে) লাইন প্লীজ। (কার্ত্তিককে) "মেডেন্স" হোটেলের নম্বর কত?

কার্ত্তিক। জানি না।

গিরিজা। পুলিশে চাকরি কর আর এত বড় হোটেলটার নম্বর জান না। ডিরেক্টরী থেকে দেখে দাও।

কার্ত্তিক। (দেখে) পি. কে. 0123

বংশীকে নিয়ে রতনলালের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, "মেডেন্স" হোটেল চেন? (ফোনে) পি. কে. 0123 প্লীজ, ইয়েস। (রতনকে) একবার এখুনি সেখানে যাবে। গিয়ে—(ফোনে) মিস্টার বনমালী সাহা আছেন? না, না, ডাকতে হবে না।—কি বললেন? আজই চলে যাবেন। ওঃ, এমনি জিজ্ঞেস করছিলুম।—না কিছু বলতে হবে না। ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে বনমালীবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এখানে চলে আসবে। কোন আপত্তি শুনবে না। বলবে ডিটেক্‌টিভ পুলিশের কাজ। আর একবার মিস্ রায়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে যাবে। রতনের প্রস্থান

বংশী, নামটা শুনে কিছু মনে পড়ছে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। যে লোকটির সঙ্গে কুমারবাহাদুর দেখা করতে নারাজ ছিলেন, এ তাঁরই নাম। তখন ঠিক মনে করতে পারছিলুম না।

কার্ত্তিক। তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে তো?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। কতবার দেখেছি।

গিরিজা। অনাথ এসেছে?

বংশী। না। হয়ত' অসুখ করেছে। তা না হ'লে এতক্ষণ এসে পড়ত।

কার্ত্তিক। কোথায় থাকে? ডাকতে পার?

বংশী। কাছেই। এখুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গিরিজা। হ্যাঁ। গিয়ে একবার দেখ।

বংশীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। অনাথকে না পাওয়া গেলেই মুস্কিল। বনমালীকে নিশিকান্তরূপে কেবলমাত্র অনাথই দেখেছে।

গিরিজা। আর নিশিকান্তকে বনমালীরূপে বংশী দেখেছে। সুতরাং দু'জনকেই এক সঙ্গে চাই। তুমি এই রিভলভারটা কাউকে দিয়ে থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

রিভলবার নিয়ে কার্ত্তিকের প্রস্থান

টেলিফোন বাজল। গিরিজা রিসিভার তুলে নিলেন

হ্যালো—হ্যাঁ, আমি গিরিজা। গুলিটা বের করেছ? রিভলভারটা পাঠাচ্ছি। ফিট হয় কি-না দেখ। হ্যাঁ, আঙ্গুলের ছাপের জন্য কতকগুলো নোট আর একটা অ্যাশট্রে পাঠিয়েছি। পেয়েছ? ওঃ পরীক্ষা চলছে। আচ্ছা, হ'লেই খবর দিও। অ্যাঁ, কি বললে? ডান হাতের ন'খে খানিকটা চামড়া আর রক্ত লেগেছিল? হ্যাঁ বুঝেছি। কাউকে খিমচে নিলে যে রকম হয়। মাংস শুদ্ধ উঠে এসেছে। ওঃ আচ্ছা ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে দিলেন। দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

গিরিজা। আসুন, ভেতরে আসুন।

মিস্ নীহার রায়ের প্রবেশ

বসুন মিস্ রায়।

নীহার। (বসে) যা জানতুম সবই তো বলেছি।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

নীহার। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

গিরিজা। এই পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবুকে চিনতেন? অ্যাঁ, কি হ'ল! মিস্ রায়—(দরজার কাছে গিয়ে) কার্ত্তিক, শিগ্‌গির এস।

কার্ত্তিক। (দরজায় এসে) কি স্যর?

গিরিজা। মিস রায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কার্ত্তিক। তাই তো, ভারী মুস্কিল।

গিরিজা। তুমি গিয়ে সুশীলাকে চট ক'রে ডেকে আন।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

গিরিজা ব্যস্তভাবে রাইটিং প্যাড্ তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন

একটু পরে সুশীলাকে নিয়ে কার্ত্তিকের প্রবেশ

সুশীলা। আমার ঘরের কাজ—

গিরিজা। দেখ, ইনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন—

সুশীলা। ও কিছু নয়। মুখে জল দেন নি কেন?

ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল এনে সুশীলা মিস্ রায়ের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। একটু হাওয়া করতেই জ্ঞান ফিরে এল

নীহার। আমি—এ কি!

গিরিজা। আপনি অজ্ঞান হয়ে গিছলেন।

নীহার। ছিঃ ছিঃ, আপনাদের কষ্ট দিলুম।

গিরিজা। না, না। বরং আমরাই আপনাকে কষ্ট দিলুম। সেজন্য খুবই দুঃখিত।

নীহার। এখন যেতে পারি? বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

গিরিজা। নিশ্চয়ই। সুশীলা, ওঁকে ঘরে পৌছে দাও।

নীহার। আমি একলাই যেতে পারব।

উঠে ধীরে ধীরে চলে গেলেন

সুশীলা। এবার আমিও যাই। আমার কাজকর্ম্ম—

গিরিজা। তুমি এই পাশের ঘরের লোকটিকে দেখেছ?

সুশীলা। না, একবারও না।

গিরিজা। দেখলে চিনতে পারবে?

সুশীলা। আপনি পারেন? প্রস্থান

গিরিজা। কি বললে?

কার্ত্তিক। যাকে দেখনি তাকে কি ক'রে চিনবে?

গিরিজা। তাও তো বটে।

কার্ত্তিক। মিস্ রায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?

গিরিজা। জানিনে। এসেই বললে শরীর খারাপ। পরে পাশের ঘরের লোকটিকে চেনেন কি-না জিজ্ঞেস করতেই অজ্ঞান।

কার্ত্তিক। এইবার স্যর আমিও অজ্ঞান হব।

গিরিজা। কেন? তোমার আবার কি হ'ল?

কার্ত্তিক। খিদেয় প্রাণ যে বাপান্ত।

গিরিজা। হ্যাঁ, একটু চা খেলে মন্দ হ'ত না।

কার্ত্তিক। চলুন হোটেলের রেস্তরাঁ থেকে কিছু খেয়ে আসি।

গিরিজা। কিন্তু ঘরটা—

কার্ত্তিক। তালা বন্ধ করে দেব। আর বাইরে একটা পুলিশ মোতায়েন ক'রে দেওয়া যাবে।

গিরিজা। বেশ, চল। উভয়ের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

মধ্যপ্রাচী

সিদিবারাণীর পতনের পর বৃটিশ সৈন্যগণ যে উত্তর আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীকে মিশর হইতে তাড়াইয়া লিবিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এ কথা ভারতবর্ষের গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃটিশ বাহিনীর উৎকৃষ্টতর রণ-কৌশলের ফলে সল্লাম ও ক্যাপুজো দুর্গের পতন হয়। ইহার পর লিবিয়ায় প্রবেশ করিয়া বৃটিশ সৈন্য ইটালীর গুরুত্বপুর্ণ ঘাঁটি বার্দিয়া দুর্গ অবরোধ করে। তিন সপ্তাহের অধিক কাল প্রবল যুদ্ধের পর বার্দিয়ার পতন ঘটে। লণ্ডন হইতে এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সিদিবারাণী ঘাঁটির ইটালীয় অধিনায়ক জেনারেল আর্জেন্টিনা বার্দিয়ার পতনের পর তোব্রুক অভিমুখে পলায়ন কালে বৃটিশ সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। গত সংখ্যায় আবিসিনিয়ার বিদ্রোহ আসন্ন বলিয়া যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, রয়টারের সংবাদে প্রকাশ সম্রাট হাইলে সেলাসী সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কয়েকজন দুঃসাহসী বৃটিশ অফিসার হাবসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদ্রোহী হাবসীবাহিনী সংগঠিত হইয়াছে। তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধুনিক রণ-কৌশলে শিক্ষাদান করা হইতেছে। আবিসিনিয়ার মেটেমা অঞ্চলে বৃটীশ টহলদারী বাহিনীর হস্তে একদল ইটালীয় সৈন্য পর্য্যুদস্ত। ইরিত্রিয়া হইতে ১৮ মাইল উত্তরে ইন্দ-মিশরীয় সুদান সীমান্তে অবস্থিত কামালা দুর্গ বৃটিশ-বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। সমগ্র রণক্ষেত্র হইতে ইটালীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। এদিকে বৃটিশ সৈন্য তোব্রুক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর। মার্শাল গ্র্যাৎসিয়ানী যে সৈন্যবাহিনী লইয়া মিশরের প্রান্তে অবস্থিত সিবা মরুদ্যানের উপর আক্রমণ চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সৈন্যদল তোব্রুক হইতে দেড়শত মাইল দক্ষিণে জেরাবুব মরূদ্যানে বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ। ইটালীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত তাহাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এদিকে রোমের রেডিও হইতেই নাকি ঘোষণা করা হইয়াছে যে সমগ্র ইটালীয় সাম্রাজ্যই ইটালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একমাত্র বিমান পথ ব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য কোন সংযোগ আর নাই। আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে ইটালীর ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা নাকি প্রায় এক লক্ষ! এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, বৃটিশের হস্তে তোব্রুকের পতন হইয়াছে। এই সকল সংবাদ নির্ভুল হইলে ইটালীর অবস্থা যে সত্যই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মুসোলিনী সদম্ভ উক্তির দ্বারা বারবার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভুত্বই এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় তাঁহার উক্তির অসারতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, বিড়াল আজ থলি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অপ্রতিহত প্রভুত্ব থাকিলে মার্শাল গ্র্যাৎসিয়ানী তিনমাসকাল ধরিয়া নিয়মিত উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ না করায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন না, ইটালীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইটালীর সংযোগও আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত না। বৃটিশের প্রভুত্বই যে ভূমধ্যসাগরে সুপ্রতিষ্ঠিত ইহা যেমন সুনিশ্চিত, আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর সাফল্যজনক বিজয়লাভও তেমনই উল্লেখযোগ্য। ইহাও প্রকাশ যে, এই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলের সাহায্য বিশেষভাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ একদিকে যেমন বৃটিশের উল্লেখ-যোগ্য বিজয়, অপরপক্ষে তেমনই ইটালীর এই পরাজয়ে ক্ষতির পরিমাণ অপরিমিত। পুর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরে ঈজিয়ান সাগরের তীর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ তীরে আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনাকে আর ইটালী মনের কোণেও স্থান দিতে পারিবে না। অধিকার বিস্তারের স্থানে তাহার অধিকারভুক্ত লিবিয়াই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে একের পর এক পরাজয়ে সৈনিকদের উপর নৈতিক ফলাফলও আশঙ্কাজনক।

আফ্রিকায় বৃটিশের সহিত যুদ্ধে ইটালী যেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, গ্রীসের সহিত যুদ্ধেও সেইরূপ ইটালী বিশেষ কোন সাফল্য অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়াছে। গত মাস অপেক্ষা ইটালী বর্ত্তমানে সামান্যই উন্নতিলাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রীকবাহিনী খিমেরা দখল করিয়াছে। উত্তরাঞ্চলে তাহারা এল্‌বাসান্ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; অপর দল ভ্যালোনার সন্নিকটে উপস্থিত। গ্রীক ও বৃটিশ বিমানবাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ভ্যালোনার বন্দর বিধ্বস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের শেষভাগ হইতে গ্রীক বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে উভয় পক্ষেরই সমান অসুবিধা হইবার কথা। অসুবিধাকর আবহাওয়া শুধু গ্রীকদের আক্রমণের সময় বাধা সৃষ্টি করিবে, অথচ ইটালীয় প্রতিরোধ বাহিনীর কোনই অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ইটালীর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ অবধি তাহারা ভ্যালোনার নিকটবর্ত্তী একমাত্র ক্লিসুরা অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি ইটালীর প্রতিরোধ ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইলেও এবং তদুদ্দেশ্যে আলবানিয়ায় বহু সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিলেও ইটালীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক। গ্রীসের সহিত যুদ্ধেও তাহার বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। আলবানিয়ায় ইটালীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল সোদ্দু পদত্যাগ করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণা অনুসারে তিনি অসুস্থতার জন্য কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে তাঁহাকে অন্য কোন কারণে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে বলিয়া যদি ভবিষ্যতে কোন সংবাদ শোনা যায়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। জেনারেল হিউগো ক্যাবেলুরো তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আবার রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যে সকল আলবানিয়ান সৈন্যকে বলপূর্ব্বক ইটালীর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে। ফলে ইটালীয়দের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইটালীর কয়েকখানা জাহাজ ও ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে। বৃন্দিসি ও কয়েকটি বন্দরে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে নাকি বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। হিটলারের প্রধান সহযোগী 'এক্সিস্' শক্তির অন্যতম সভ্য ইটালী ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরের রণক্ষেত্রেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

যে মহামানবের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় মহাত্মা গান্ধী বড়দিনের সময় ভারতের সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন, পূর্ণিমা অমাবস্যা মানিতে প্রস্তুত হিটলারের সে মহামানবের কথা স্মরণ করিবার অবসর হয় নাই। রণ-দানবের পৈশাচিক লীলা বড়দিনের সময় ইয়োরোপে সমভাবেই চলিয়াছে। শেফিল্ড, মিড্‌ল্যাণ্ড, পোর্টস্‌মাউথ্‌ প্রভৃতি স্থানে সমভাবে বোমাবর্ষণ দ্বারা ধ্বংস সাধনের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। স্থানে স্থানে অগ্নিপ্রজ্বালক বোমাও নিক্ষেপ করা হইয়াছে। গিল্ডহল, ট্রিনিটি হাউস এবং কয়েকটি গির্জ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বৃটিশবিমানবহরও সমানভাবেই পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। খাস বার্লিন, ব্রিমেন, কীল, ম্যান্‌হিম জেলা, নেপল্‌স্‌, মিলান, জেনোয়া প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করিয়াছে। লোরিয়েণ্ট এবং বর্দোর ইউ-বোট-ঘাঁটিও বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও বৃটিশ রণ-বিমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, জার্মানী এবং ইটালীর বিভিন্ন কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইংলণ্ডের উপর জার্মানীর আক্রমণের গুরুত্ব অত্যধিক। বৃটেনের ক্ষতিও হইয়াছে যথেষ্ট। এ পর্য্যন্ত নাৎসী আক্রমণে নিহত বৃটিশের সংখ্যা মিঃ চার্চ্চিল তাহার বক্তৃতায় উল্লেখও করিয়াছেন।

শুধু ইংলণ্ডে নহে, সমুদ্র বক্ষেও জার্মানীর তৎপরতা হ্রাস পায় নাই। জার্মানীর অর্থনীতিক অবরোধের সঙ্কল্পের কথা গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। খাদ্য অথবা উপকরণ যাহাতে বৃটেনে সরবরাহ হইতে না পারে, সে বিষয়ে জার্মানী বিশেষ সচেষ্ট। বৃটেনের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার ও দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানী ব্রেষ্ট, সেণ্টনেজার, বর্দো প্রভৃতি ঘাঁটি সকল ব্যবহার করিতেছে। তদুপরি আয়র্লণ্ড নিরপেক্ষ থাকায় জার্মানীর সুবিধা হইয়াছে যথেষ্ট। দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের ঘাঁটিসকল বৃটেন ব্যবহার করিতে না পারায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা উপলব্ধি করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ সম্প্রতি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জার্মানী কি করিবে, তাহার গতি কোন্ দিকে হইবে, এ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। জার্মানীর সহিত অপরাপর রাষ্ট্রের সম্বন্ধের কথা লইয়াও অনেকে অনেকরূপ সন্দেহ করিতেছিলেন। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মতদ্বৈধ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করায় যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির আশঙ্কা করা যাইতেছিল। মঁসিয়ে পিয়ারে লাভালের পুনর্নিয়োগ লইয়া মঁসিয়ে পেতঁ্যার উপর জার্মানী চাপ দেওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে। মঃ পেতঁ্যা ও মঃ লাভালের মধ্যে যে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সেই সকল কারণ দূরীভূত হইয়াছে। ভিসি মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্য্যাবলী ধীর গতিতে চলিয়াছে। ফ্রান্সের রণপোত এবং সমুদ্রতীরের ঘাঁটিসকল জার্মানী বহুদিন হইতেই নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য দাবী করিয়া আসিতেছে। লাভাল-পেতঁ্যা ঘটিত সমস্যার সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের যে কিছু বোঝাপড়া হয় নাই, সে কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। কারণ হিটলারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বৃটিশ শক্তির কেন্দ্রস্থল ইংলণ্ডে আঘাত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এবং সামুদ্রিক পথ অবরোধ করিয়া ইংলণ্ডের অর্থনীতিক অবরোধ সফল করিবার জন্য ফ্রান্সের পশ্চিম কূলের ঘাঁটিসকল এবং নৌশক্তি জার্মানী নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না।

এদিকে সাংবাদিক ও পর্য্যটক বেশে বহু জার্মান সৈন্য নাকি বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। বুলগেরিয়া-সরকার অবশ্য জানাইয়াছেন যে, কোন বৈদেশিক শক্তি তাঁহাদের রাজ্যে নাই; কিন্তু তথাপি তুরস্ক এই সৈন্য প্রবেশের অনুমতি দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে। রুশিয়া হইতে বলা হইয়াছে যে, সৈন্য প্রবেশের পূর্ব্বে জার্মানী তাহাকে কিছুই জানায় নাই, বুলগেরিয়াও এ সম্বন্ধে তাহার সহিত কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসে নাই। অর্থাৎ রুশিয়ার ভাব হইতেছে, তোমরা দুজনে যাহা ভাল বোঝ কর। যতদূর সম্ভব, এই সৈন্য প্রবেশে রুশিয়ার বিশেষ কোন আপত্তি অন্তত বর্ত্তমানে নাই।

অবশ্য অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই বোধ হয় জার্মানীর সহিত রুশিয়ার বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিবে। 'রেড্‌ ষ্টারে' এক স্বাক্ষরিত পত্রে মঃ ষ্ট্যালিন লিখিয়াছিলেন যে, রুশিয়া শীঘ্রই এক বিরুদ্ধ সামরিক শক্তির সম্মুখীন হইতেছে। অসতর্ক অবস্থায় শত্রুরা যাহাতে তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাহাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। রুশিয়ার এই উক্তি এবং কিছু দিন যাবৎ তাহার রহস্যজনক নীরবতায় সকলে অধীর উৎকণ্ঠায় তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট।

সম্প্রতি জার্মানীর সহিত তাহার একটি অর্থনৈতিক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির একটি সর্ত্ত অনুসারে জার্মানী কলকব্জার বিনিময়ে রুশিয়া হইতে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মাল পাইবে।

রুমানিয়াতেও জার্মান সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক ডিভিসন নূতন জার্মান সৈন্য রুমানিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ঐ সংখ্যা শীঘ্রই আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

বৃটেনের উপর সম্প্রতি কয়েক দিন ধরিয়া প্রবল ভাবে বোমা বর্ষণ করা হইতেছে। জার্মানীর তুলনায় বৃটেনের সমর সম্ভার যে কম এবং বৃটিশ সৈন্যগণ যে পূর্ণভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নয়, একথা মিঃ চার্চিল ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকার নিকট যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহাতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটেনকে "অস্ত্রশস্ত্র ইজারা দেওয়া বা ধার দেওয়া" সংক্রান্ত একটি বিল কংগ্রেসে পাশ করাইতে ইচ্ছুক। এই দিক দিয়া বৃটেন নিঃসন্দেহে যথেষ্ট লাভবান হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত নগদ মূল্যের বিনিময়ে বৃটেনকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইতেছিল। ইহাতে বৃটেনের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ জয়ের উপর মার্কিন বণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ নজর দিবার প্রয়োজন হয় নাই। মালের বিক্রয় এবং নগদ মূল্যপ্রাপ্তির মধ্যেই উভয়ের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উক্ত বিল পাশ হইলে আমেরিকার সরকার ও বণিকদিগের স্বার্থ যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হইবে। দ্বিতীয়ত "জনসন্ এক্ট"কেও বৃটেন এইভাবে এড়াইতে সক্ষম হইল।

কিন্তু বৃটেনের উপর আক্রমণাত্মক কার্য্য সমভাবে চালাইলেও প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর গোল বাধিয়াছে ইটালীকে লইয়া। আফ্রিকা এবং পূর্ব্ব-এশিয়ায় বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরকে সম্পূর্ণরূপে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হিটলার তাঁহার অন্যতম সহযোগী মুসোলিনীর উপর যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। আফ্রিকায় ইটালীয় সৈন্য একটির পর একটি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ইটালী সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই, ভূমধ্যসাগরও এখনও সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ-প্রভাবান্বিত অঞ্চলরূপে আছে। ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ে এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জার্মানীকে বাধ্য হইয়া এই দিকে মনোযোগ দিতে হইয়াছে। সিসিলি দ্বীপ জার্মান-বাহিনী অধিকার করিয়াছে। ইটালীর অভ্যন্তরেও বহু জার্মান সৈন্য পৌঁছিয়াছে। জার্মানীর সিসিলি দ্বীপ অধিকার করার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। আফ্রিকার ইটালীয় সৈন্যদের সাহায্য করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে শক্তি বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। অধিকন্তু গ্রীসের অসুবিধার সৃষ্টি করিতে হইলে বৃটিশের সহিত গ্রীসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর অভিমুখে চালিত বৃটিশ জাহাজগুলিকে মধ্যপথে আটক করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ ঘাঁটিগুলিকেও শক্তিহীন করা প্রয়োজন। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই জার্মানী সিসিলি অধিকার করার পরেই মাণ্টার উপর বোমাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্পেনের সহযোগিতায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে শক্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে জিব্রাল্টার আক্রমণের সম্ভাবনাও এখনও দূরীভূত হয় নাই। সম্প্রতি হিটলার এবং মুসোলিনী আবার গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আমরা প্রতিবারই লক্ষ্য করিয়াছি যে, কোন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং সাক্ষাতের পরেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এবারেও অনুরূপ ধারণা করিবার কোন কারণ না থাকাই সম্ভব। 'এক্সিস' শক্তির এই দুই পাণ্ডার সাক্ষাতের ফলাফল বিশেষ লক্ষ্য করিবার।

সুদূর প্রাচী

ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের সজ্বর্ষ ক্রমশই জমিয়া উঠিতেছে। উভয় দেশের সীমারেখায় অবস্থিত মেকং নদীর নিকটবর্ত্তী ভূ-ভাগ সম্পর্কে থাইল্যাণ্ড দাবী উত্থাপন করাতেই এই সজ্বর্ষের সূত্রপাত। মাসাধিক কাল পূর্ব্বে সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটাইবার জন্য থাইল্যাণ্ড-সরকার ফরাসী ইন্দোচীনের নিকট "সীমান্ত কমিশন" নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা না হওয়ায় সজ্বর্ষেরও অবসান হয় নাই। থাইল্যাণ্ডের বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে কাম্বোডিয়া এবং সিসোফেন নগর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সারাণ্ডারে অবস্থিত ফরাসী ইন্দোচীনের সৈন্যগণের আক্রমণ থাইল্যাণ্ডের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। মেকং নদীতে ফরাসী ইন্দো চীনের সৈন্য বোঝাই সাতখানি নৌকা থাইল্যাণ্ড বিমানবাহিনী ডুবাইয়া দিয়াছে। অপর পক্ষে থাইল্যাণ্ডের দুইখানি রণতরী ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইন্দোচীন দাবী করিতেছে। ফরাসী দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মঃ গ্যারো নাকি থাইল্যাণ্ডের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের নিকট থাই-সৈন্যদের গুলিবর্ষণ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

এদিকে চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাপান দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। ইচাং বন্দরের চতুঃপার্শ্বে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। আক্রমণ-রত জাপ সৈন্য দুইবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। এখানকার বিমান ঘাঁটি অধিকার করিতে পারিলে চীনের রাজধানী আক্রমণ করা সুবিধাজনক বলিয়াই এই যুদ্ধ এত তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছে। নানা সাহায্যে উদ্দীপ্ত চীন সংগ্রাম চালাইয়াছে প্রবলভাবে। সম্প্রতি রুশিয়ার সহিত চীনের একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে রুশিয়া চীনকে সমরোপকরণ প্রেরণ করিবে এবং বিনিময়ে চীন পনের লক্ষ ষ্টার্লিং মুদ্রার চা রুশিয়ায় সরবরাহ করিবে। চীনের খনিজ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে রুশিয়ার উৎপাদন যন্ত্রাদির বিনিময় ব্যবস্থাও ইহার মধ্যে আছে। স্মরণ থাকিতে পারে, জাপান কিছুদিন পূর্ব্বে নানকিং গভর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ওয়াং-চিঙ্গ-ওয়েইর সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। এই চুক্তির সর্ত্তের মধ্যে একটি কমিণ্টার্ন-বিরোধী ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। জাপান ইহার কারণ সম্বন্ধে রুশিয়াকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও রুশিয়া যে উক্ত চুক্তির কথা বিস্মৃত হয় নাই, চীনের সহিত বর্ত্তমান চুক্তিই তাহার বিশেষ প্রমাণ।

সম্প্রতি জাপ ডায়েটে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুকা এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—রুশিয়ার সহিত যে ভ্রান্তিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ মাৎসুকা বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে জাপানও সেই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইবে। এদিকে সমরসচিব লেঃ-জেনারেল টোজো বলেন যে চীন-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি সাফল্যপূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও চীন-জাপান বিরোধের অবসানের আশু সম্ভাবনা নাই বলিয়াই তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত চীন যখন রুশিয়ার সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ এবং তাহার অবস্থা যখন পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তখন সে যে রাতারাতি জাপানের সহিত সন্ধি করিতে ছুটিবে না ইহা স্বাভাবিক।
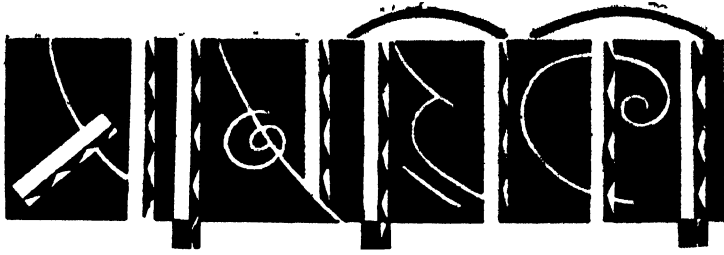
দেবানন্দপুরে শরৎস্মৃতিবার্ষিকী—

গত ২৬শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি হুগলী-জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাহার স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ সৈন্যদল পরিদর্শন করিতেছেন

সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এবার ঐ সঙ্গে রবিবাসরের অধিবেশনের আয়োজন হওয়ায় জলঝড় সত্বেও সেদিন দেবানন্দপুরে কলিকাতা হইতে বহুলোক গমন করিয়াছিলেন। রবিবাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় দেবানন্দপুরের অধিবাসীরা ছাড়াও নিকটস্থ স্থানগুলির বহু অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র-স্মৃতিসমিতির সভাপতিরূপে হুগলী জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভায় সকলকে জানাইয়াছেন—শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি ও তদুপরিস্থ বৈঠকখানা গৃহখানি স্থানীয় পল্লীসেবক সমিতি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ক্রয় করিয়াছেন এবং তথায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্মৃতিমন্দিরের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে এবং শীঘ্রই মন্দির নির্ম্মিত হইবে। মন্দিরের একদিকে পল্লী-পাঠাগার রাখা হইবে ও অপর দিকে একটি মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র খোলা হইবে। কিন্তু এখনও আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। সে জন্য তিনি সকলের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। খগেন্দ্রবাবু সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাহার একাংশ আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম—"মানুষকে শরৎচন্দ্র যে মর্য্যাদা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান যুগের যুগবাণী। যুগে যুগে পরিবর্ত্তমান জগতের যে অনবস্থা ঘটছে, তাকে ভালই বলি আর মন্দই বলি—তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে মানবতার দাবী আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছে। জগতে ব্যক্তিত্বের চিরনিষ্পেষিত বার্ত্তা আজ আর্ত্তনাদ করে উঠেছে সকল বাধাবিধান অতিক্রম করে। এমনটি আগে কখনও হয়নি। সমাজকে আমরা চিরদিন খুব বড় করেই দেখেছি। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ সমাজকেই ধ্রুব

ডিউক অফ্ উইণ্ডসর ও তাঁহার পত্নী বাহামাতে
এক ক্লাবে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন

সত্য বলে মেনে নিয়েছিল এবং ব্যক্তিত্বকে তার নিকট বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আজ মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব

আবিষ্কার করেছে কারখানা হাটবাজারের মধ্যে। কুলি মজুর দীনদরিদ্র—যাদের দিকে আমরা কখনও মুখ তুলে চাই

দক্ষিণ আমেরিকায় লর্ড ও লেডী উইলিংডন

নি—তারাই আজ পৃথিবীর অধিকার করায়ত্ত করবার জন্য লক্ষ হাত বাড়িয়েছে। আমরা যতই দাঁতে দাঁতে পিষে জগতের এই পরিস্থিতিকে অভিসম্পাত করি না কেন, একে অস্বীকার করবার অধিকার কারও নেই। পুরাতনের শিকলে যাদের মন এখনও দাঁড়ের পাখীর মত উড়ে উড়ে দাঁড়েতেই আছাড় খাচ্ছে, তাদের পক্ষে নূতনের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্রকে এখনও ঠিক মনের সঙ্গে বরণ করে উঠতে পারি নি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের এই তন্ত্র না মেনে ত উপায় নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্র রুদ্রযামলতন্ত্রের দিন চলে গেছে—নূতন যুগের নূতন তন্ত্রকে মানতেই হবে। পুরাতন সৌধে অশ্বত্থ বট ধ্বংসের শিকড় প্রবেশ করিয়েছে। সুতরাং সে প্রাচীন সৌধের মায়া ত্যাগ করতেই হবে। শরৎচন্দ্র এই সত্য যেমন করে বুঝেছিলেন, তেমন করে বোধ হয় আর কোন লেখকই বুঝতে পারেন নি।” যাঁদের চেষ্টায় সে দিন দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মৃতিসভা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তারা দেশবাসী সকলের ধন্যবাদের পাত্র—কারণ তাঁদের জন্যই এতগুলি লোক শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শন করে ধন্য হতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা—

অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, স্মৃতিরক্ষা কমিটি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি তিন

ভারতে আনীত ইটালীয় বন্দী

বৎসর অন্তর বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখককে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। স্মৃতিরক্ষা-কমিটির এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছে; শরৎ-চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় আমাদের জানা নাই। তবে এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের স্মৃতিরক্ষায় মাত্র তিন হাজার টাকার বেশী সংগৃহীত হইল না!

হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর বি. এন্. রাও ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ কার্য্যের ভার পাওয়ায় বড়লাট কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান য়্যাড্ভোকেট ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয়কে বিচারপতি স্যর বি. এন্. রাওয়ের অনুপস্থিতিকালে কিংবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর পাল একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, সুপণ্ডিত। তাঁহার যোগ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম।

পরলোকে জেম্স্ জয়েস—

সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ ঔপন্যাসিক মিঃ জেম্স্ জয়েস মাত্র ছাপান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও ঔপন্যাসিক হিসাবে জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও মণীষী। তাঁহার লেখা একদল পাঠক সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিল, আর একদল তেমনই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সুবৃহৎ ও বহুনিন্দিত-প্রশংসিত 'ইউলিসিস' একদা জগতের পাঠকসমাজকে উদগ্র আধুনিকতার প্রভাবে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার প্রশংসা ও নিন্দা এমন পাশাপাশি প্রচারিত হয় যে, তাঁহার প্রতিভার সঠিক বিচার করা সহজসাধ্য নহে। তাঁহার প্রচারিত নীতি ও সত্যের নির্ভীক নগ্নতা দেখিয়া কোন কোন রাজ-সরকার তাঁহার গ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে একজন প্রকৃত শক্তিমান লেখকের অভাব হইল।

১৯৪০-এর অক্টোবরে লণ্ডনের দৃশ্য—নাজি বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ঠিক আছে

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত কাশীধামে সুসম্পন্ন

হইয়াছে। বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণগুলি হইতে ও বিভিন্ন শাখায় আলোচিত বিষয় হইতে ভারতে বিজ্ঞান প্রচেষ্টার যে সকল তথ্য জানিতে পারা যায়—তাহাতে স্বতই মনে হয় যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন এবং আরও কয়েকজন ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, আমাদের ভাব-জীবনে এখনও বিজ্ঞানের একটি আবহাওয়া গড়িয়া ওঠে নাই—প্রত্যক্ষ জীবনেও বিজ্ঞানের প্রভাব পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, বিজ্ঞান এখনও আমাদের দেশের মাটি হইতে রস আহরণের সুযোগ পায় নাই; আমরা এখনও পাশ্চাত্যের মুখের দিকে তাকাইয়া আছি—নিজের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া ইহা এখনও জাতির নিজস্ব সম্পদে পরিণত হইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের এই পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্তেরই পরিচয় দেয়। বিজ্ঞান-কংগ্রেস ভারতীয় বিজ্ঞানের গতিকে আত্মকেন্দ্রিক খাতে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বের অপরাপর দেশের বিজ্ঞান প্রচেষ্টার সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিবেন ইহাই আমরা সাগ্রহে কামনা করিতেছি।

পশ্চিম মরুভূমিতে ভারতীয় সৈন্যদল

পরলোকে ব্যাডেন পাওয়েল—

তিরাশী বৎসর বয়সে স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৮ সালে তিনি স্কাউট আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে বলিতে গেলে প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে ছেলেরা নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরোপকার ও জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

কাশ্মীর রাজ্যে উর্দ্দু—

কাশ্মীর রাজ্যের নরপতি হিন্দু, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রজাই মুসলমান; তাই রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে হিন্দি

ভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া উর্দ্দু ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ফলে হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়; হিন্দি-উর্দ্দু বিতর্কের মীমাংসা করিতে গিয়া স্থির হইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ভাষা হিসাবে হিন্দি বা উর্দ্দু শিক্ষা দেওয়া হইবে না। প্রাথমিক (মাধ্যমিকও) বিদ্যালয়ে সাধারণ উর্দ্দুই শিক্ষার বাহন হইবে। প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সরল উর্দ্দু দেবনাগরী অথবা পারসী অক্ষরের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সকল বিতর্কের সহজ ও অভিনব সমাধানের জন্য ছাত্রদের মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাই তুলিয়া দিতে হইবে। একেই ত ইংরেজী শিক্ষার দাপটে লোক মাতৃভাষার সম্মান দিতে চাহে না, তার উপর যা-ও দেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে ইহার প্রতিকার সম্ভাবনায় আমরা আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যের এ ব্যবস্থায় আমাদের আশঙ্কা বাড়িল বই কমিল না। জিজ্ঞাসা করি—নিজাম রাজ্যের হিন্দু প্রজারা যদি অনুরূপ দাবী করিয়া বসে তাহা হইলে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় কি?

আসানসোলে কুষ্ঠাশ্রমে বাঙ্গলার গভর্ণর—সার ষ্ট্যানলী হার্বার্ট—সঙ্গে মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়
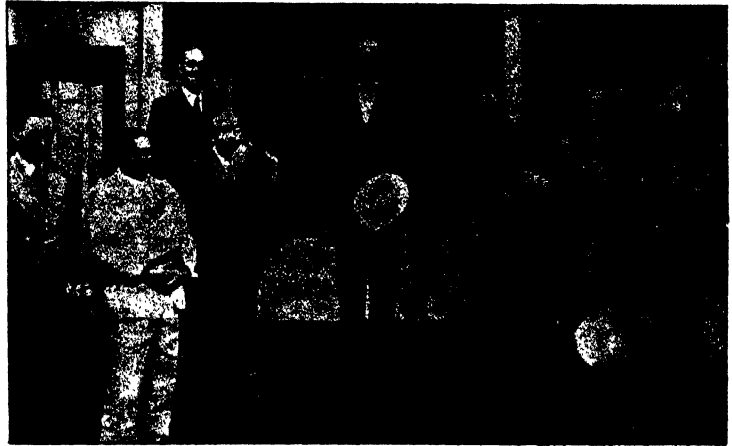
আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা-সম্মিলন—

গত ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী শনি ও রবিবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মহাসম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে দেশনেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তথায় ধন্বন্তরি পতাকা উত্তোলন করেন এবং ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। শরৎবাবু তাঁহার বক্তৃতায় দেশবাসীকে পুনরায় বিদেশী চিকিৎসাপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অনুরাগী হইতে আহ্বান করেন এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করেন। প্রথম দিনের সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুত অনাথনাথ রায় ও মূলসভাপতি শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলন হয়। সভায় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত 'ষ্টেট্ ফ্যাকাল্টি অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিনের' বহু কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাতে অতঃপর নির্ব্বাচিত সদস্যদ্বারা ফ্যাকাল্টি গঠিত হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৮ সালে যেরূপ আইন গঠন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থা পরিষদকে তদনুরূপ আইন স্থির করিতেও অনুরোধ করা হইয়াছে। ফ্যাকাল্টির দ্বারা কবিরাজগণ উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইতেছেন—এ কথা সম্মিলনে সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং কবিরাজগণ যাহাতে এলোপাথিক ডাক্তারগণের সহিত তুল্যাধিকার লাভ করেন, সেজন্যও গভর্ণমেণ্টকে সকলে একবাক্যে দাবী জানাইয়াছেন। বাঙ্গালার মফঃস্বল হইতে বহু কবিরাজ এই সম্মিলনে যোগদান করায় সম্মিলনটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতির একান্ত চেষ্টায় এবার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের বহু অসুবিধার কথা এই

গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় সিভিক গার্ড প্রদর্শনীতে বাঙ্গালার গভর্ণর —ফটো পান্না সেন

সম্মিলনের মারফতে সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সিঙ্গুরে সুরেন্দ্র মল্লিক স্মৃতি—

হুগলী জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯-৪০ বর্ষের বোর্ডের কার্য্যের যে বার্ষিক বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। স্বর্গত দেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবী তাঁহার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে মোট ৯১ হাজার ৫শত টাকা দান করায় ঐ অর্থে তথায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রসূতি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। জেলা বোর্ডের পরিচালনাধীনে ঐ প্রতিষ্ঠান নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 'রকফেলার ফাউণ্ডেসন' হইতেও ঐ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথম ৫ বৎসর যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহার কিছু অংশ 'রকফেলার ফাউণ্ডেসন' হইতে পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষে এরূপ প্রতিষ্ঠান এই নূতন। শুধু অর্থ হইলেই কোন বড় কাজ হয় না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ও হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সমবেত চেষ্টায় শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীর প্রদত্ত অর্থে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল—ইহা সমগ্র বাঙ্গালার লোকের পক্ষেই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় যে প্রকৃতই একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যের দ্বারাই প্রমাণ হইয়া গেল।

অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা—

মিড্‌ল্ ঈস্ট কম্যাণ্ড ও ফার্ ঈস্ট কম্যাণ্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিবার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমশ বিদেশের অর্ডার সরবরাহে সমর্থ হইতেছে। সাত কোটি টাকা ব্যয়ে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারের যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক কারখানায় আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

নূতন ধরণের আলু—

আলুতে মেদবৃদ্ধি করে আশঙ্কায় কেহ কেহ আলু ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। সম্প্রতি আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক প্রদেশে কোন বাগানের মালিক শ্বেতসারবিহীন আলু উৎপাদন করিয়াছেন। ইহার নাম 'টপাটো'। আলু এবং টমাটোর বীজের সমন্বয় করিয়া ইহা উৎপন্ন হয়। শ্বেতসার-বিনষ্টকারী টমাটো আলুর শ্বেতসার নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই শ্রেণীর আলু ব্যবহারে মেদ বৃদ্ধির আশঙ্কা নাই বলিয়া উক্ত বাগানের মালিক দাবী করিতেছেন। টপাটো আলুর ন্যায়ই একপ্রকার উদ্ভিদ। মাটির নীচে টপাটো এবং মাটির উপরে টমাটো জন্মায়। প্রায় সাতটি

ভারতীয় বিমান বাহিনীতে একদল যুবক বিমান-চালক—ইহারা মৃত্যুকে ভয় করে না

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই নব আবিষ্কৃত আলু উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর কৃষিজীবীর সংখ্যা—

লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিকস্-এর অধ্যাপক মিঃ হল জাতি-সংঘের অর্থনীতিক সমিতির নিকট জীবিকা-নির্ব্বাহের উন্নততর ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে একখানি স্মারক-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ হল উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশে যে আদমসুমারি গৃহীত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এবং যে সকল দেশে তাহা গৃহীত হয় নাই তাহার আনুমানিক সংখ্যা-বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া দেখা যায় যে গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দুইশত কোটির উপর ছিল। তাহার মধ্যে নব্বই কোটি লোক লাভজনক কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং তাহার মধ্যে কৃষিকার্য্যে আনুমানিক পঞ্চান্ন কোটি লোক নিযুক্ত ছিল। উহার অর্দ্ধেকের বেশী এশিয়া মহাদেশের। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই বিশ কোটির অধিক লোক কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া মিঃ হল উল্লেখ করিয়াছেন।

সরকারী রেলপথের আয়—

বিগত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে সরকারী রেলপথসমূহের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। ইহা গেল বছরের এই সময়ের আয়ের তুলনায় ৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা এবং তারও আগের বছরের এই সময়ের আয় অপেক্ষা ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী।

শ্রমিক ধর্ম্মঘটের হিসাব নিকাশ—

১৯৪০ সালের ১ এপ্রিল লইতে ৩০ জুন পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১০১টি শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫শত ৮০জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং মোট ২৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ২শত ৬৩টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। উক্ত ১০১টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে ৬২-টিই ছিল মজুরীবৃদ্ধির দাবী সংক্রান্ত। এই সময়ে আসামে ২, বাঙ্গালায় ৩৫, বিহারে ৪, বোম্বাইয়ে ২৫, মধ্যপ্রদেশে ৭, মাদ্রাজে ১২, উড়িষ্যায় ১, পাঞ্জাবে ৯, সিন্ধুতে ২ এবং সংযুক্ত প্রদেশে ৪-টি ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায়—কাপড়ের কলে ৩৮-টি, চটকলে ৮-টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৪-টি এবং বিভিন্ন শিল্পে বাকী ৪৫-টি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। এই এতগুলো ধর্ম্মঘটের ২০-টিতে ধর্ম্মঘটীরা সাফল্যলাভ করে, আটটিতে তাহাদের দাবী আংশিক মিটানো হইয়াছে এবং ১৭টি ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইয়াছে।

ভারতীয় পদাতিক সৈন্যগণ ইরিত্রীয়ার সীমান্তে আটবারা নদী পার হইতেছে—নদীতে কুম্ভীরের উপদ্রব খুব বেশী

পরলোকে আঁরি বার্গশ —

প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও পৃথিবীবিখ্যাত মণীষী আঁরি বার্গশ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল বিরাশী বৎসর। ইনি জাতিতে ছিলেন ইহুদি, তাই শক্তিমান নাৎসীদের হাতে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন

অনেকখানিই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণু আবিষ্কারে যে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং পদার্থজগৎ মনোজগতের আভাসমাত্র বলিয়া যে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—বার্গশঁর 'স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিবর্ত্তন'-এর মতবাদের দৌলতে তাহা অনেকখানি সমৃদ্ধ। জীন্স, য়্যাডিংটন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের দার্শনিক আলোচনায় যে মতবাদ অসম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত—বার্গশঁর দর্শনেই তাহা পাওয়া যায় পরিণত ও পূর্ণরূপে। মণীষার উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের পালা পৃথিবীতে আজও শেষ হয় নাই; তবু বার্গশঁর ন্যায় মণীষীরা অমর—কোন ডিক্টেটারের রক্তচক্ষু তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই, পারিবেও না কোনদিন।

ভিক্ষুক-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—

আইনের সাহায্যে মাদ্রাজ শহরের ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি একটি বিল প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা আইনে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজেই একটি ভিক্ষুকশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আইনের বলে ম্যাজিস্ট্রেট যে-কোন ভিক্ষুককে উক্ত আশ্রমে ভর্ত্তি করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য মাদ্রাজ কর্পোরেশন একটি আশ্রম খুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন—রুগ্ন এবং বয়স্ক ভিক্ষুকদের জন্যও কালক্রমে কর্পোরেশন আর একটি পৃথক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত বিলের মর্ম্ম এই যে, ষোল বৎসরের অধিকবয়স্ক কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদের বিচার করিবেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং উক্ত বিচারকই এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষুকশালায় ভর্ত্তির নির্দ্দেশ দিবেন। তিন বৎসরের অধিককাল কোন ভিক্ষুককে এই ওয়ার্ক-হাউসে রাখা হইবে না। ভবিষ্যতে ভিক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বিলে ভিক্ষুকদের জন্য কর্ম্মসংস্থান এবং কর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইলে ভিক্ষুককে শাস্তি দেওয়ারও বিধান আছে। কলিকাতায় এরকম একটা ব্যবস্থার প্রত্যাশা কি আমরা করিতে পারি না?

ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনীতে নবনিযুক্ত যুবকবৃন্দ—সকলেই নাবিকবেশে সজ্জিত

আড়িয়ল বিলে কচুরীপানা—

আড়িয়ল বিল ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ ও দক্ষিণ সদর

অনন্তের সুর — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার
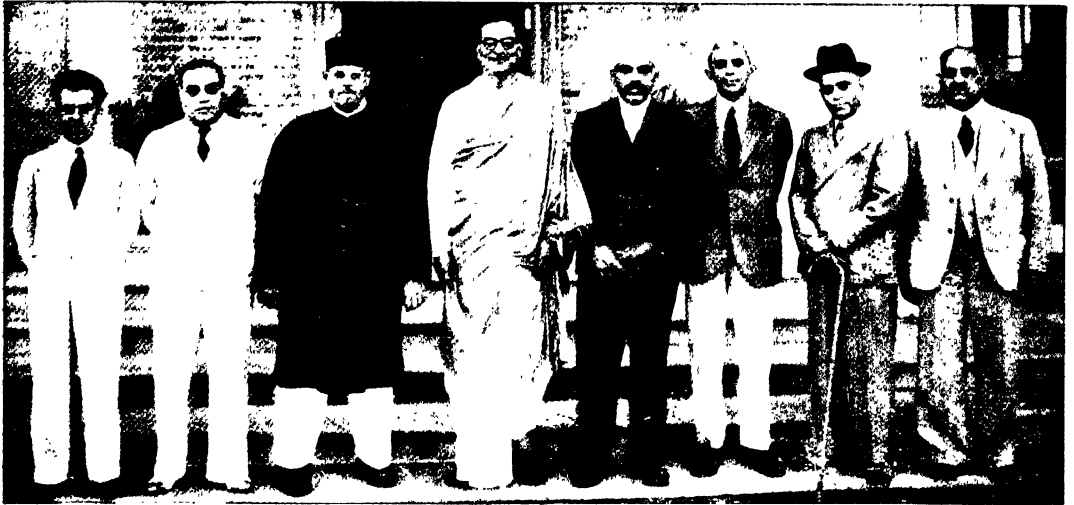
মহকুমার শ্রীনগর, দোহার ও নবাবগঞ্জ থানার মধ্যে বিস্তৃত। ইহার আয়তন সমগ্র ঢাকা জেলার ষোল ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১২৪ বর্গ মাইল। যত দূর জানা যায়, ১৯২১ সালে প্রথম এই বিলে কচুরী পানা আসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিল ছাইয়া ফেলে। ফলে চাষীদের ফসল নষ্ট হইতে থাকে। কচুরী আসার আগে বিলে প্রচুর ধান ফলিত, চাষীরাও প্রচুর ফসল পাইত; কিন্তু কচুরীপানার আবির্ভাবের পর হইতে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ চাষীদের জমির খাজনা নিয়মিতই জোগাইতে হইতেছে। যাহাতে বিলে কচুরীপানা আসিতে না পারে তাহার জন্য বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইয়াছে; অবশ্য তাহার ব্যয় চাষীদের নিকট হইতেই আদায় করা হয়। অথচ এ সত্ত্বেও চাষীরা বিশেষ ফললাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রতীকার কল্পে সম্প্রতি ঢাকার মালিকান্দায় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। অবিলম্বে কচুরীপানার প্রতীকার করিতে না পারিলে নিরন্ন কৃষককুলকে বাঁচানো সম্ভব হইবে না। আমরা সরকারকে এ বিষয়ে তৎপর হইতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।

খুলনা বালিকা বিদ্যালয়ে গভর্ণর-পত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট

ভারতে সত্যাগ্রহ—

মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহাতে এ যাবৎ ভারতের আঠারটি বিভিন্ন প্রদেশের ২৯ জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ১১জন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ১৭৬ জন; কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ২২ জন ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য ৪০৬ জন ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন। এই সত্যাগ্রহের পরিণাম কি, কে বলিবে।

ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণে হতাহত—

গত সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর এই চারিমাসে বৃটেনে যে জার্মাণীর বিমান আক্রমণ হইয়াছে তাহাতে মোট ২৪,৬৬৯ জন নিহত ও ৩১,৩০৮ জন আহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডিসেম্বর মাসে মোট ৩,৭৯৩ জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৫,০৪৪ জন অসামরিক ব্যক্তি আহত হইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১,৪৩৪ স্ত্রীলোক ও ৫২১ জন শিশু নিহত হয় এবং আহতদের মধ্যে ১,৭৭৫ জন স্ত্রীলোক ও ৩০৭টি শিশু আছে। এই লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ যে কবে শেষ হইবে এবং কি তাহার পরিণাম তাহা কে বলিবে?

ঠাকুর ল-লেকচারার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪১ সালে ঠাকুর ল লেকচার দিবার জন্য স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে 'বৃটিশ ভারতে সালিসী'—এই বিষয়ে তাঁহাকে বারটি বক্তৃতা দিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার মত একজন কৃতী আইনজ্ঞের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইবে।

ভারত সরকারের আয়ব্যয়—

সম্প্রতি সংশোধিত আকারে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের যে মাসিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়—গত নবেম্বর মাসের শেষে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় রাজস্বের আয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা কম পড়িয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম আট মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের তুলনায় শুল্ক বিভাগের আয় পাঁচ কোটি টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ আয় চব্বিশ লক্ষ টাকা ও লবণ-শুল্কের আয় দুই কোটি আটাশ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের আয় তিয়াত্তর লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া পনর কোটি আটার লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য আট মাসে রাজস্বের খাতে ত্রিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়; ইহার পরিবর্ত্তে রেল বিভাগ এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় যথাক্রমে পঁচিশ কোটি আটাশ লক্ষ এবং ছিষট্টি লক্ষ টাকা হওয়ায় উক্ত ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া পাঁচ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে।

জাপানী পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি—

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত আট মাসে ভারতে জাপান হইতে ভারতে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ তের কোটি

মাদ্রাজে বাঙ্গালার ব্রতচারী দল

এবং আয়কর ও অন্যান্য ট্যাক্স বাবদ আয়ের পরিমাণ আলোচ্য সময়ে যথাক্রমে এক কোটি চুরাশী লক্ষ, একান্ন লক্ষ এবং উনিশ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। গত নবেম্বর মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ সাতাত্তর কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আগের বৎসর ঐ সময় ইহার পরিমাণ উনসত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা ছিল। দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ ছত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আগের বৎসর এই সময়ে এই ব্যয়ের পরিমাণ আটাশ কোটি আঠার লক্ষ টাকা ছিল। বিবিধ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ

টাকার অধিক দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সময় ইহার পরিমাণ ছিল সাড়ে এগার কোটি টাকা। আলোচ্য সময়ে যন্ত্রপাতি, রঞ্জনদ্রব্য এবং এই প্রকার অন্যান্য জাপানী জিনিষের আমদানি বৃদ্ধিতে মনে হয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে উপরোক্ত জিনিষের আমদানি বন্ধ হওয়ায় জাপান তাহার সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে। অপর পক্ষে, ঐ সময়ে জাপানে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ পৌনে ছয় কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। আগের বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল সাড়ে আট কোটি টাকারও উপর। ভারতে কার্পাসজাত

জাপানী পণ্যের আমদানিই ছিল বেশী, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা কমিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে জাপানী যন্ত্রপাতি ও রঞ্জন-দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি বাড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক

জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত—মূল সভাপতি শ্রীগুরুসদয় দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রভৃতি

জিনিষের দাম বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইরূপ জিনিষের আমদানি বাড়িতেই দেখা যায়।

বিক্রয় কর বিল ও পাঞ্জাব পরিষদ—

পাঞ্জাবেও বাঙ্গালার মতই একটি বিক্রয় কর বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে এই বিলটি উপলক্ষ করিয়া একটি ভারী মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে। জাতিগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় সরকারের পক্ষ হইতে এই বিলটি পরিষদে পেশ করিয়াছেন; কিন্তু বিলটি আলোচনার সময় তাঁহার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী স্যর উইলিয়াম রবার্ট বিলের বিরোধিতা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিল পাশ হইলে পাঞ্জাবের শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। কংগ্রেসী দলের অধিকাংশ সভ্য অনুপস্থিত বিধায় পরিষদের বাহিরের মতামত সংগ্রহ করাই জনমত নির্দ্ধারণের প্রধান উপায় বলিয়া তিনি এই বিলটি প্রচারের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অবস্থা সুবিধার নয় বলিয়া স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহাশয় জবাব দিতে বাধ্য হন। যাহাতে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দেন। পাঞ্জাবের তুলনায় বাঙ্গালায় বিক্রয় করের পরিমাণ ঢের বেশী, অথচ সেই অবস্থায় পাঞ্জাবে বিক্রয় করের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন?

খাকসার আন্দোলন দমন চেষ্টা—

সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের প্রশ্নোত্তরকালে সরকার পক্ষ হইতে জানা গিয়াছে যে পাঞ্জাবে খাকসার আন্দোলন দমনের জন্য সরকারের ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১,৯৪,৭৩০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এক বৎসরকাল লাহোর শহরে এই প্রসঙ্গে একজন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, একজন ইন্সপেক্টর, বিশজন হেড কনস্টেবল ও ছয়শত কনস্টেবল মোতায়েন করিতে হইয়াছিল; ইহাতে মাসে ২১,৭৭০ টাকা খরচ হইয়াছে। এই বিপুল অর্থব্যয় করিয়া খাকসারদের যতটুকু দমন করা হইয়াছে তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে জানা নাই; অথচ দরিদ্র দেশের অতগুলা টাকা খামকাই ব্যয়িত হইল! ইহার জবাবদিহি কে করিবে?

কুমারী কবিতা মিত্র—

কুমারী কবিতা মিত্র বারাকপুর নিবাসী শ্রীযুত কালীপদ মিত্র মহাশয়ের কন্যা। ইনি অতি অল্পবয়সে

কবিতা মিত্র

অপূর্ব্ব নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নানা স্থানে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমান অমল সাহা—

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্ধদিগকে শিক্ষাদানপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া শ্রীমান অমল সাহা সম্প্রতি

অমল সাহা

জাপান, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ভারতে অন্ধদের চিকিৎসাদান বিষয়ে অগ্রণী পরলোকগত রেভাঃ এল-বি-সাহার পৌত্র। অমলের বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। তিনি এদেশে অন্ধদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিবেন।

ভারতীয় কাগজশিল্প—

গত বৎসর ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্ত বিদেশী কাগজ এদেশে খুব কম আমদানি হওয়ায় ভারতীয় কাগজের কলগুলিতে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগের বৎসর এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যে স্থানে ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার হন্দর, আলোচ্য বর্ষে সেই স্থানে তাহা ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার হন্দরে দাঁড়াইয়াছে। নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে কাগজের আমদানি বন্ধ হইবার ফলে বর্ত্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কাগজ-শিল্প অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। তবে কাগজের মূল্যের সহিত কাগজ প্রস্তুতের উপাদানগুলিরও দাম বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় কাগজশিল্পের সম্মুখে প্রচুর সুযোগ বিদ্যমান। আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোট ১৩টি কাগজের কলের জন্ত ২২ লক্ষ টাকার ২ লক্ষ ৩৪ হাজার হন্দর কাঠের মণ্ড আমদানি হয়। আগের বৎসরে তাহার মূল্য ও পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬ লক্ষ টাকা এবং ২ লক্ষ ৭৭ হাজার হন্দর। এ বৎসর নরওয়ে ও সুইডেন হইতে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার হন্দর এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৭১ হাজার হন্দর কাঠের মণ্ড আমদানি হয়। তার আগের বৎসর উক্ত দেশগুলি হইতে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হন্দর এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার হন্দর মণ্ড আমদানি হইয়াছিল। বাকী অংশ ফিনল্যাণ্ড হইতে আমদানি হয়। আলোচ্য বৎসরে কাগজ ও পোস্টবোর্ডের আমদানির পরিমাণ আগের বৎসরের ৩১ লক্ষ হন্দর হইতে কমিয়া ২৭ লক্ষ ৯৯ হাজার হন্দরে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার মূল্যের পরিমাণ ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত—

জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা উকীল পরম ধার্ম্মিক ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি এক শত বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি প্রিন্সিপাল ডাঃ পি-কে-রায়, সার
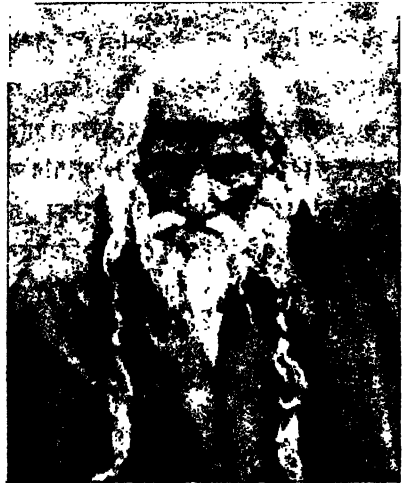
ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত

কে-জি-গুপ্ত প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া পরে ১৮৮৪ সাল হইতে তিনি

জলপাইগুড়িতে ওকালতী করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর জেলার বেদগাঁওয়ে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার পুত্রগণও সকলেই কৃতী। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার অন্যতম পুত্র।

পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য—

২৪ পরগণা বারাকপুর তালপুকুরনিবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি ৯৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ সরকারী চাকরীর পর অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারে ব্রতী

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য

হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র বর্ত্তমান।

পরলোকে স্বামী প্রণবানন্দজী—

'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর দেহরক্ষা করার সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রই দুঃখিত হইবেন। তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমে নাম ছিল বিনোদবিহারী দাস, ফরিদপুর জেলার বাজিৎপুরে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে তিনি

স্বামী প্রণবানন্দ

বাজিৎপুর ষড়যন্ত্র মামলায় লিপ্ত হইয়া পড়েন, পরে সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর নীরব তপস্যা তাঁহার মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিতে পারে নাই; তাই তিনি 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' স্থাপন করিয়া তাহাকে বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া স্বামীজী অসংখ্য তীর্থকামীর অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-বিয়োগে বাঙ্গালার হিন্দুরা একজন প্রকৃত কর্ম্মী সন্ন্যাসীকে হারাইল।

বাঙ্গালায় মোজাগেঞ্জি শিল্প—

একখানি বৃহদাকার পুস্তকে সকল শিল্পের সাধারণ পরিচয় থাকা অপেক্ষা এক একটী শিল্প সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে কয়েকখানি পুস্তক লিখিত হইলে শিল্পের প্রসারের অনেক

সুবিধা হইয়া থাকে। ইহাতে বিভিন্ন পুস্তকের মূল্য হ্রাস পায় এবং যাহার যে খানি প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সরকার হইতে ইতোপূর্ব্বে বাঙ্গালায় কার্পাস শিল্পের উপর একখানি পুস্তিকা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের শ্রীমুকুল গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি তাহা সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় মোজা গেঞ্জি সংক্রান্ত ব্যবসা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। পুস্তিকা পাঠ হইতে উক্ত শিল্পের নানা দিক অবগত হইয়া কোনও নূতন ব্যবসায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কি না তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালায় ৩৩ লক্ষ টাকা মূলধনে ১২৫টী মিল চলিতেছে, তাহাতে কম বেশ ৪৫০০ লোক উপজীবিকা অর্জ্জন করে। ইহা ছাড়া কুটীরশিল্প হিসাবে প্রস্তুত দ্রব্যাদি মিলিয়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মত মাল প্রতি বৎসরে উৎপাদিত হয়। ১৯৩২ সালে স্থাপিত রক্ষণশুল্ক দ্বারা জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে শিল্পটীকে রক্ষা করা হয় এবং ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হয়। এখন স্বদেশী মিলগুলির মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছে এবং শিল্পে প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। মিল-মালিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালার শিল্প সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে

গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্যে রত কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ

জাপানের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন; এই পুস্তিকায় তাহাও সুবিস্তারে আলোচিত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শ্রীযুত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীমান দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি সম্প্রতি লণ্ডনস্থ পলিটেকনিক

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

কলেজ হইতে ‘সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং’ বিদ্যায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুদ্ধের সময় নানা অসুবিধা সত্বেও তিনি লণ্ডনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে বৃটীশ কিনেম্যাটোগ্রাফিক সোসাইটীর সদস্য করা হইয়াছে। ইনি দমদম কাদিহাটী নিবাসী শ্রীযুত শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। আমরা ইঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও সিনেটের সিদ্ধান্ত—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বাঙ্গালার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া দেশের সকল সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই মনে করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই বিল সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল বহু ভোটে সেই রিপোর্ট সিনেট সভায় গৃহীত হইয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে এই বিরুদ্ধতাকে রাজনৈতিক স্বার্থপরতাপ্রণোদিত হিন্দুদের আন্দোলন বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করা হইলেও সরকার পক্ষের সকল

চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সিনেট সভার ভোটের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে হিন্দু-মুসলমান ও খৃস্টান নির্ব্বিশেষে সকল স্বাধীনমনা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই রিপোর্ট সমর্থন করিয়া বিলের বিরোধিতা করিয়াছেন। জনকয়েক শান্তিকামী ব্যক্তি নিরপেক্ষ ছিলেন এবং যে একুশ জন রিপোর্টের বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী, লীগ সদস্য বা লীগদলের সমর্থক। খানবাহাদুর তসদ্দক আহমেদ, অধ্যাপক এম্ জেড সিদ্দিকী, এস্ ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি মুসলিম প্রধানগণ লীগদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীন-চিত্তের পরিচয় দিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউসনের সরস্বতী প্রতিমা—ফটো—শ্রীপান্না সেন

কিন্তু আমরা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের আচরণে অবাক হইয়া গিয়াছি। তিনি যে শুধু রিপোর্টের বিরোধিতাই করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি যে ভাবে ডক্টর জেঙ্কিন্সের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও সংস্কৃতির উপর সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সে যাহাই হোক, সিনেটের ন্যায় শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞদের দ্বারা গঠিত সভাও যে বিলের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিছক 'রাজনৈতিক স্বার্থপরতা প্রণোদিত হিন্দুদের আন্দোলন' নয়। আশা করি, বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলীর মনে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। অতঃপর তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া কি আমরা আশা করিতে পারি না?

টালা স্পোর্টিংক্লাবের সরস্বতী প্রতিমা—ফটো—মাষ্টার গুপলু

পরলোকে প্রতিমা দেবী—

নলডাঙ্গা রাজপরিবারের কন্যা ও হেতমপুররাজের দৌহিত্রী কলিকাতার খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, সি, চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী প্রতিমা দেবী গত ১৮ই পৌষ

প্রতিমা দেবী

পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং দানের জন্য তিনি বহুজনপরিচিত ছিলেন।

শ্রীমান শৈলেশকুমার বসু—

শৈলেশকুমার দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টনিবাসী রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি এবার পাটনা

শৈলেশকুমার বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতির অনার্সে প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর।

সুভাষচন্দ্র—

গত ১৩ই মাঘ রবিবার শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাঙ্গালার নরনারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী জেলের কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করায় কয়েদীরা অনশন ধর্ম্মঘট করেন। সুভাষচন্দ্র ইঁহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া নিজে অনশন অবলম্বন করেন এবং দিন কয়েক বাদে অসুস্থ অবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়া চিকিৎসিত হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের হয়। কিন্তু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

অসুস্থতার জন্য আদালতে হাজির হইতে না পারিয়া তিনি মুক্ত ছিলেন। ঐ দিন সহসা তাঁহাকে আর তাঁহার ঘরে দেখা গেল না। এক বস্ত্রে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কেহ বলেন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, আর কেহ বা বলেন অন্য কিছু। সম্ভব অসম্ভব জল্পনাকল্পনার আর সীমা নাই। দেশবাসীমাত্রই এই ঘটনায় মর্ম্মাহত। তিনি সুস্থ দেহে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আরব্ধ কার্য্য গ্রহণ করুন শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালোরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের 'দীপালী সম্মিলনী'র বার্ষিক উৎসব, সভাপতি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—১৩৪৭, সভাপতি—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

কলিকাতা যাদুঘরে ফাইন আর্টস্ একাডেমীর প্রদর্শনীতে গভর্ণর-পত্নী লেডী হার্বার্ট
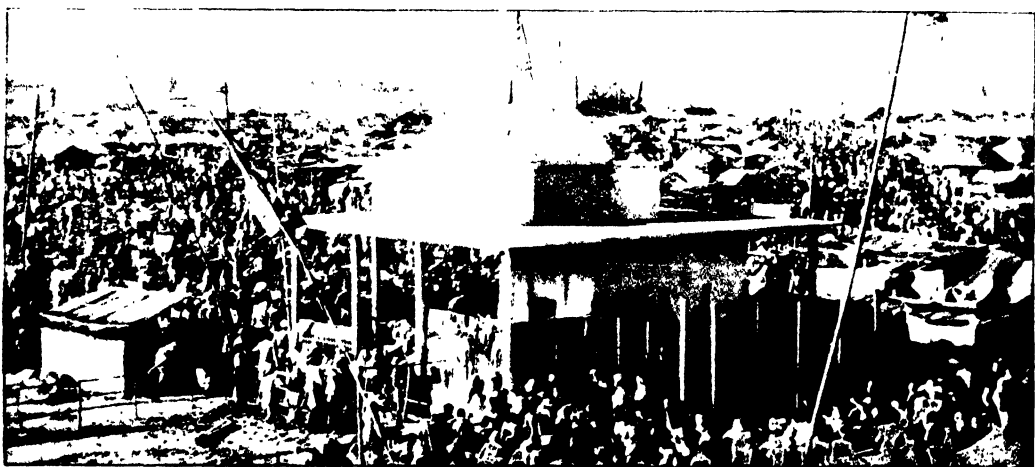
গঙ্গাসাগরের একটি মন্দির—দূরে সমুদ্রে বহু যাত্রীপূর্ণ ষ্টীমার

শ্রীক্ষেত্রনাথ বায়

ভাইসরয়ের একাদশ—৩০২ ও ১৮৯ (৭ উইকেট)

বাঙ্গলা গভর্ণরের একাদশ—৩৬৪ ও ১২৩

ভাইসরয়ের একাদশ ৩ উইকেটে বিজয়ী হযেছে।

ইডেন উদ্যানে খেলা সুরু হযেছে। আবহাওয়া বেশ চমৎকার, দর্শক সংখ্যাও খেলাব উপযুক্ত। দর্শকবা একটু হতাশ হ'লেন, পাতৌদীব নবাব হাঁটুর আঘাতেব ফলে খেলতে পারবেন না ব'লে। তাঁব স্থানে বাঙ্গলাব গভর্ণবের একাদশের ক্যাপ্টেন হ'যেছেন মেজর নাইডু। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট খেলোযাড পাতৌদী ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আজ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও হবেন কিনা সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বে যতবাব তিনি বড বড় ম্যাচে খেলবার জন্য নিমন্ত্রিত হ'যেছেন প্রতিবাবই শারীবিক অসুস্থতাব জন্য তা রক্ষা ক'রতে পারেননি।

নাইডু টসে জিতে মাস্তক ও গাঙ্গুলীকে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। উইকেটের অবস্থা বেশ ভাল। বল কচ্ছেন নিসাব ও অমবনাথ। গাঙ্গুলী খুব সতর্কতা অবলম্বন ক'বে খেলছেন। মাস্তকেব খেলা খুব নির্ভীক; তাঁর দৃষ্টি দ্রুত বান তোলার দিকে। প্রথম ওভাবেই তিনি অমরনাথকে দুবাব বাউণ্ডারীতে পাঠিযেছেন। নিসারের ২য ওভাবে একটা ক্যাচ দিযেছিলেন, আজমৎ নিতে পারলেন না। ৪০ মিনিট খেলে তাঁব নিজস্ব ৫০ বান পূর্ণ হলো।

নিসারকে বদলে আমীর এলাহিকে আনা হ'যেছে। তাঁব বলে মাস্তক আজমতেব হাতে ধবা দিলেন, নিজস্ব ৫৯ বানেব মাথায। পালিযা গাঙ্গুলীব সঙ্গে যোগ দিলেন। এক ঘণ্টায দলেব শত বান পূর্ণ হ'লো। বান বেশ দ্রুত উঠছে। গাঙ্গুলী পিটিযে খেলতে সুরু ক'রেছেন কিন্তু ২৮ বানেব মাথায নিসার তাঁকে স্লিপে লুফলেন। মেজর নাইডু এসেই মানকদকে বাউণ্ডারীব ওপর পাঠিযেছেন। তবে তিনি বেশীক্ষণ উইকেটে থাকতে পারেননি; মিড-অফে মানকদের বলেই নিসাবেব হাতে আটকে গেলেন। নির্ম্মল কোন বান কবাব আগেই মানকদ তাঁকে বোল্ড ক'রলেন। মানকদ আবার পরেব ওভাবেই পালিযার উইকেট পেলেন;

সি এস নাইডু — এস ব্যানার্জি — মাস্তক আলি — টম লংফিল্ড

তাঁর বল মারাত্মক হ'চ্ছে। ১৩৫ রানে পাঁচটা উইকেট পড়ে গেল। ভাল ব্যাটসমান সকলেই আউট হ'য়ে গেছেন। নাইডু ব্যানার্জ্জিকে পাঠালেন। ব্যানার্জ্জির ওপর তাঁর
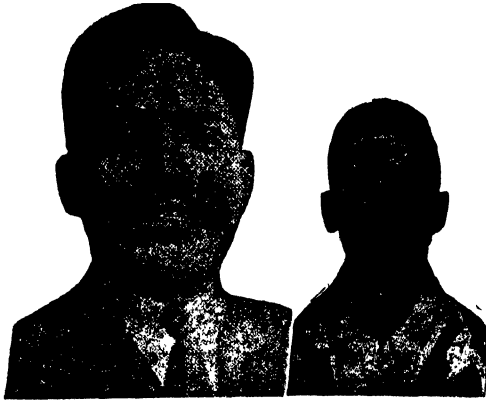
অমরনাথ জাহাঙ্গীর খাঁ

যথেষ্ট আস্থা। ভাঙ্গনের মুখে টীমকে রক্ষা ক'রে ব্যানার্জ্জি এবারও সে আস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দিলওয়ার ও ব্যানার্জ্জি খেলছেন। রানসংখ্যা বেশ উঠ্‌ছে। আমীর বেশী রান দেওয়ায় তাঁকে বদলে দেওয়া হ'লো। লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে রান উঠেছে ১৯০। ২২০ রানের মাথায় অমরনাথ, দিলওয়ার ও ব্যানার্জ্জির জুটি ভাঙ্গলেন। তাঁদের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ৮৫ রান ওঠে। দিলওয়ার ৩১ রান ক'রে আউট হ'লেন; চার ছিলো ৬টা। দলের আর ২৪ রান যোগ হবার পর ব্যানার্জ্জি আমীরের বলে ষ্টাম্পড হ'লেন। তাঁর নিজস্ব ৬২ রান ক'রতে ৭২ মিনিট সময় লাগে। দলের সঙ্কট মুহূর্ত্তে এসে তিনি উইকেটের চারিদিকে নির্ভীকভাবে পিটিয়ে খেলে দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেন; তাঁর খেলায় বাউণ্ডারী ছিলো ৮টা। লংফিল্ড ১৮ রান ক'রে আউট হ'য়েছেন। জাহাঙ্গীর খাঁ ও রামসিং মিলে আবার দ্রুত রান তুলছেন। চায়ের সময় ৮ উইকেটে রানসংখ্যা উঠেছে ৩৩৭। জাহাঙ্গীর বোলারদের অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পিটিয়ে খেলছেন এবং মাত্র ৩১ মিনিটে নিজস্ব ৫০ রান ক'রেছেন। রামসিংও সহযোগির নির্ভীকতা দেখে দ্রুত রান তুলছেন।

চায়ের পর যখন খেলা সুরু হ'ল মহারাজা নিজে বল ক'রতে এলেন। ৩৫০ রানের মাথায় কোমরুদ্দিন আমীরের বলে জাহাঙ্গীরকে লুফলেন। বাঙ্গলা-গভর্ণর দলের ইনিংস শেষ হ'ল ৩৭৪ রানে। রামসিংয়ের ৪৫ উল্লেখযোগ্য।

ভাইসরয়ের একাদশের ব্যাটিং সুরু ক'রলেন হিন্দেলকার ও মানকদ। হিন্দেলকার লংফিল্ডকে দুবার বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে তাঁরই বলে উইকেটের পিছনে ধরা দিলেন। মারওয়াৎ মানকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮ রানের মাথায় ব্যানার্জ্জি মারওয়াতের উইকেট নিলেন। সেদিনের মত খেলা শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা সুরু হ'ল। আগের দিনের নট-আউট ব্যাটসম্যান মানকদ ও কোমরুদ্দিন খেলছেন। ৪৪ রানের মাথায় লংফিল্ড আশ্চর্য্যভাবে মানকদকে এক হাতে লুফলেন; ক্যাচটি নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। অমরনাথ এসে খেলায় যোগ দিলেন। রান বেশ দ্রুত উঠতে লাগলো। ৮০ রান ওঠার পর পালিয়ার স্থানে মেজর নাইডু নিজে বল ক'রতে এলেন।

কোমরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের বলে দিলওয়ারের হাতে ধরা দিলেন। তিনি ৬৫ মিনিট খেলে রান তুলেছেন ৪২; চার ছিলো ৫টা। তাঁর খেলা বেশ দর্শনীয়। শত রান পূর্ণ হবার পর জাহাঙ্গীরের স্থানে ব্যানার্জ্জি বল ক'রতে এলেন। ব্যানার্জ্জির বল অত্যন্ত 'ফাষ্ট' হ'চ্ছে, অপর দিকে রামসিং 'স্লো' বল দিচ্ছেন। ব্যানার্জ্জির 'বাম্পার' ব্যাটসম্যানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অমরনাথ কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে খেলছেন। নাইডুর ঘন ঘন বোলার পরিবর্ত্তনেও কোন ফল হ'চ্ছে না। লাঞ্চের সময় ৪ উইকেটে ১২৯ রান উঠেছে।

৯৫ মিনিট খেলে অমরনাথ নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ ক'রলেন। তিনি খুব দায়িত্ব নিয়ে খেলছেন। ১৯১ রানের মাথায় মেজর খুব তৎপরতার সঙ্গে নাজির আলিকে রান আউট ক'রলেন। এইবার মহারাজা নিজে এলেন,

দিলওয়ার হোসেন হিন্দেলকার

আর প্রথম ওভারেই রামসিংকে তিনবার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। ব্যানার্জ্জির বাম্পারে তিনি অস্বস্তি বোধ

ক'রছিলেন। রামসিংই শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ঠকালেন তাঁর নিজস্ব ২৪ রানের মাথায়। দলের রান সংখ্যায় আর মাত্র দুরান যোগ হবার পর অমরনাথ জাহাঙ্গীরের বলে

পাতিয়ালার মহারাজ

দিলওয়ারের হাতে ধরা দিলেন। অমরনাথকে ইতিপূর্ব্বে এতবেশী সতর্কতার সঙ্গে খেলতে দেখা যায়নি। তবে খুব দায়িত্ব নিয়ে খেললেও তাঁর খেলার স্বচ্ছন্দগতি ক্ষুন্ন হয়নি। তিনি বিভিন্ন রকম দর্শনীয় মার দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ক'রেছেন। ১৮৫ রানেসাতটা ভাল ভাল উইকেট চ'লে গিয়েছে। ব্যাট কচ্ছেন উদীয়-মান খেলোয়াড় আজামাৎ হায়াৎ ও রামা বলীন্দর। ২১২ মিনিটে ২০০ রান উঠলো। নাইডু নূতন বল নিতে দেরী কচ্ছেন দেখে দর্শক বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রলেন। ৫৫ রান তুলে অষ্টম উইকেট জুটি ভাঙ্গলো; বলীন্দর আউট হ'লেন। ২৫০ রান ওঠবার পর নাইডু ব্যানার্জ্জিকে নূতন বল দিলেন। ২৯৯ রানের মাথায় হায়াৎ—এলাহী জুটি ভাঙ্গলো। এঁদের জুটি রান তুলেছেন ৫৯। আমীর ২৯ রান ক'রে আউট হ'লেন। তিনি যাবার পরই আজমৎ পাতিয়ার হাতে ধরা দিলেন। এই ম্যাচে তাঁর রানই সর্ব্বোচ্চ। দেড় ঘণ্টার ওপর নির্ভুল ও নির্ভীক ভাবে ব্যাট ক'রে আজামাৎ নিজস্ব ৬৫ রান ক'রেছেন। ৩০২ রানে ভাইসরয়ের একাদশের ইনিংস শেষ হ'য়েছে। সময়াভাবে খেলাও সেদিনের মত শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় কতকগুলি দর্শক বার বার নাইডুকে বোলার পরিবর্ত্তনের জন্য চীৎকার ক'রেছেন। জাহাঙ্গীর তাঁদের দিকে বল ছুঁড়ে এই গোলমাল থামাবার চেষ্টা ক'রে বিফল হননি। দর্শকরা যদি অন্যায় ক'রে থাকেন তাহ'লে জাহাঙ্গীরের কাজও প্রশংসনীয় নয়। নাইডুরও মত তাঁরও এটাকে উপেক্ষা ক'রলেই ভাল হ'ত। নাইডু কে ভট্টাচার্য্যকে আরও বেশী ওভার বল না দেওয়ায় অনেকে খেলার মাঠে ও বাইরে নাইডুর বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছেন শুনেছি। তাঁদের মতে ভট্টাচার্য্যের ওপর নাকি অবিচার করা হ'য়েছে। ক্রিকেটে এই অবিচার কথার কোন মূল্য নেই। টীমের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ স্বীকার এখানে ক'রতেই হবে। টীমে যখন একই টাইপের তিনজন বোলার র'য়েছেন তখন ক্যাপ্টেনের পক্ষে তাঁদের সকলের প্রতি সমান বিচার করা একটু শক্ত। তাছাড়া নাইডু যে স্লো বোলারদের উপর আক্রমণের বেশীর ভাগ দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে

মেজর নাইডুর একাদশ ও মোহনবাগান ক্লাবের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ভট্টাচার্য্যের তুলনায় ভাল বল ক'রেছেন। মনে পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত কাপ্টেন উডফুল তাঁর ক্রিকেটের বইতে এক স্থানে লিখেছেন—'A few years back in a Test Match against South Africa, that champion of Australian slow bowlers of my day, Clarrie Grimmett was not called upon to bowl a single ball in either innings. This must have been a unique experience in his long and honoured career,...... the diminutive South Australian was not given the opportunity of demonstrating his prowess, and yet we heard no words of complaint.' অবশ্য তাই ব'লে আমরা বলছি না, যে সেখানে ব্যারাকিং হয় না। ব্যারাকিং সব দেশের দর্শকরাই ক'রে থাকেন। অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের দর্শকও, যেখানে শতাব্দী ধরে ক্রিকেট খেলা চলছে।

তৃতীয় দিনের খেলা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রেছিলো; আর সে উত্তেজনা খেলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিলো।

৬২ রানে এগিয়ে থেকে নাইডু, মাস্তক ও গাঙ্গুলীকে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। গভর্ণর একাদশের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২৩ রানে শেষ হ'ল। এবারও ব্যানার্জ্জি সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছেন ২৯। সকলেই খুব কম সময়ের ভেতর দ্রুত রান তোলার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু কেউও বিশেষ সফল হননি অমরনাথের বল খুব কার্য্যকরী হ'য়েছে। তিনি ১৪ ওভার বল দিয়ে ৩০ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছেন। ক্যাচ না ফেললে তিনি আরও বেশী উইকেট পেতেন।

হিন্দেলকার ও মানকদ ভাইসরয়ের একাদশের ২য় ইনিংস সুরু ক'রলেন। আরম্ভ খারাপ হয়নি। নাইডু কয়েকবার বোলার পরিবর্ত্তন ক'রে কোন ফল পেলেন না। শেষে নিজে বল করাতে মানকদের উইকেট পেলেন। এর পর ভাঙ্গন সুরু হ'ল। কোমরুদ্দিন ২, অমরনাথ ০, নাজির আলি ৭ ক'রে আউট হ'লেন। হিন্দেলকারও বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। ৫টা উইকেট পড়ে গেল ৭৭ রানে। আজামাৎ হায়াৎ ও মহারাজা খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন। মহারাজা খুব দ্রুত রান তুলছেন, আজামৎ খেলছেন খুব ধীরে ধীরে। মহারাজা লংফিল্ডের বলে নাইডুর হাতে ধরা দিলেন। ৭ উইকেট গেল ১২৪ রানে। এখনও গভর্ণরের একাদশের জয়লাভের আশা রয়েছে। নাইডু বহু রকমভাবে লোভনীয় বল দিয়েও আজামৎকে বিচলিত ক'রতে পারলেন না। শেষপর্য্যন্ত তিনি ৬১ রান ক'রে নট আউট রইলেন। ভাইসরয়ের একাদশ জয়ী হ'লেন ৩ উইকেটে। সমগ্র ম্যাচের ভেতর ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তরুণ খেলোয়াড় আজামাৎ হায়াৎ, অমরনাথ, এস ব্যানার্জ্জি, মাস্তক ও

রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে সিভিক গার্ডসদের সাত মাইল সাইকেল রেসে প্রতিযোগিগণ ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ

জাহাঙ্গীর খাঁ এবং বোলিংয়ে মেজর নাইডু, অমরনাথ ও মানকদ। তৃতীয় দিনের খেলায় মেজর একেবারে বিশ্রাম না নিয়ে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী যেরূপ সুন্দর ভাবে বল ক'রে গেছেন তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। লং ফিল্ড ও রাম সিংয়ের বোলিংও প্রশংসনীয়। উইকেট কিপিংয়ে হিন্দলকার ও দিলওয়ার উভয়েই সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে দিলওয়ার বহুবার আম্পায়ারকে অহেতুক আবেদন জানিয়েছেন। এইখানে হিন্দলকার তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছেন। গভর্ণরের একাদশের ফিল্ডিং উন্নততর। আম্পায়ারিং সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা করা উচিত হবে না যদিও কয়েকটি বিচারে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। অবশ্য যে সব খেলোয়াড়রা মাঠে ছিলেন তাঁরা এবং ব্যাটসমানরা নিজে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। তাঁদের মতে, অনেকেই আম্পায়ারিংয়ের ত্রুটির জন্য তাঁদের ভেতর অনেকের লাভ ও ক্ষতি হ'য়েছে।

রোহিণ্টন বারিয়া ক্রিকেট কাপ ঃ

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—৪৯২

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়—১৭৪ ও ১৫০

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় রোহিণ্টন বারিয়া ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল এক ইনিংস ও ১৬৮ রানে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখান এইচ অধিকারী ১২৯ রান ও আর এস কুপার ১২৪ রান করে। এছাড়া সিদ্ধির নট আউট ৯২, এস সোহানীর ও ইউ চিপ্পার ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। রঙ্গরাজ ১১৪ রানে ৪, গুরুদাচারী ১৮৮ রানে ৩ ও ফান-সালকার ১১ রানে ১টি উইকেট লাভ করেন।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭৪ রানে। জে ফানসালকার দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৬ রান করেন। এম রায়জী ৪৪ রানে ৫টা, ইউ চিপ্পা ৩৬ রানে ২টি উইকেট পান। কাশী দলের দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র গুরুদাচারী ৬৬ রান ক'রে যা কিছু ব্যাটীংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ঢাকুরিয়া 'জুনিয়ার ফোর্স' বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রু'

এন কোলা ২৬ রানে ৪ এবং এস সিদ্ধি ৩২ রানে ৪ উইকেট লাভ করেন। এইবার নিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল উপর্য্যুপরি তিনবার উক্ত কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করলে।

কুচবিহার কাপ ফাইনাল ঃ

কাষ্টমস—২৫৮ ও ১১ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ট্রপিক্যাল স্কুল—১৮৭ ও ৮০

কাষ্টমস ১০ উইকেটে ট্রপিক্যাল স্কুল দলকে পরাজিত ক'রে কুচবিহার কাপের ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে।

ট্রপিক্যাল স্কুল দলের উভয় ইনিংসেই সন্তোষ গাঙ্গুলি দলের সর্ব্বোচ্চ ৪৮ ও ৪৪ রান করেন। প্রথম ইনিংসে পি মুখার্জির ৪০ রান উল্লেখযোগ্য। গাঙ্গুলির দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বিজিত দলের যা কিছু গৌরব ছিল। গাঙ্গুলি সাতবার দড়ির ধারে বল পাঠিয়ে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রান আউট হ'য়ে যান। ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রথম ইনিংসে কংকয়েষ্ট ২৯ রানে ৫টা উইকেট পান। কাষ্টমস দলের প্রথম ইনিংসে হার্ভেজনষ্টন উভয় দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৮৩ রান করেন। এ কে দাস করেন ৬৩ রান। কে ভট্টাচার্য্য ৮২ রানে পান ৪টা উইকেট। ট্রপিক্যালের দ্বিতীয় ইনিংসে হজেসের বলই মারাত্মক হয়েছিল। হজেস ৩৬ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছিলেন ৫টা।

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় যে সব দর্শক মূল্য দিয়াও টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি সেই সব উৎসাহী ক্রীড়ামোদীর ভীড়

ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট লীগ ঃ

বিদ্যাসাগর কলেজ—১৭৬ ও ১৩৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ—১০১ ও ১০৩

ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট লীগের ফাইনালে বিদ্যাসাগর কলেজ ১০৭ রানে প্রেসিডেন্সি কলেজকে পরাজিত ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম ইনিংসে হিমাংশু মুখার্জি উভয় দলের প্রথম ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ ৫০ রান করেন। এস মুস্তাফির ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য।

ডি দাস ৪৪ রানে ৩ ও নির্ম্মল চ্যাটার্জি ৬০ রানে ৩ উইকেট পান।

প্রেসিডেন্সির প্রথম ইনিংসে অধিক রান তুলেন এন চ্যাটার্জি ৪৭। হিমাংশু মুখার্জি উভয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসেও সর্ব্বাধিক ৩২ রান করেন।

জে দত্ত ১৩ রানে ৩ ও মুস্তাফি ২৩ রানে ৩টে উইকেট পান।

প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় ইনিংসে অনিল দত্ত ২৯ রানে ৪ ও মুস্তাফি ২২ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস প্রতিযোগিতা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা যোগদান করলেও প্রতিযোগিতাটি প্রথম শ্রেণীর হয়নি। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে বহুদিন থেকেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যথেষ্ট খ্যাতি রয়ে গেছে। সুতরাং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় যে বর্ত্তমান বৎসরেও নিজদের পূর্ব্ব অর্জ্জিত সুনাম রক্ষা করতে সক্ষম হবে এ সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদীদের কিছুমাত্র সন্দেহ হয়নি। আমরা কয়েক বারই তাদের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখেছি। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা ছাড়াও তাদের ছাত্রদের সুষ্ঠ দৈহিক গঠন এবং উদ্যম যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যতবার স্পোর্টস হয়েছে ততবারই তারা আমাদের ছাত্রদের বহু দূরত্ব পয়েণ্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, ছাত্রদের এবং কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে

দলাদলি, নিরুৎসাহ এবং অমনোযোগীতাই যে এর কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যাঁরা ছাত্রদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রা তাঁরাই নিশ্চিতভাবে বসে আছেন।

এ বৎসর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বেশীর ভাগ বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছেন। মোট পয়েন্টের ফলাফল: (১) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪ (২) লক্ষ্ণৌ ১৪ ও আলীগড় ১৪ (৩) পাটনা ১ পয়েন্ট।

ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস ঃ

ইণ্টার কলেজের ২৮তম বার্ষিক খেলাধূলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আনন্দ মুখার্জ্জি ৩৬ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা যোগদান করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে স্থান লাভ করা ছাড়া আনন্দ মুখার্জি লং জাম্প, হাই জাম্প ও পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কলেজ চ্যাম্পিয়ানসীপ—সিটি কলেজ (৯৮ পয়েণ্টস), (২) আশুতোষ কলেজ (৬০ পয়েণ্টস), (৩) স্কটিশচার্চ্চ কলেজ (৪৯ পয়েণ্টস)।

এলিস মার্ব্বেলের পরাজয় ঃ

ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ ইণ্টার ন্যাশানাল টেনিস খেলোয়াড় মিস্ মেরী হার্ডউইক সাতটা পেশাদারী খেলায় পরাজিত হ'য়ে সম্প্রতি আমেরিকান এবং উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান মিস্ এলিস মার্ব্বেলকে ৬-৪, ৪-৬, ৬-২ গেমে পরাজিত ক'রেছেন। ১৯৩৮ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপের সেমি-ফাইনাল খেলায় মিস মার্ব্বেল প্রথম পরাজিত হ'ন মিস্ হেলেন জ্যাক-

এলিস মার্ব্বেল আনন্দ মুখার্জ্জি

বের কাছে। সেই থেকে তিনি কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করেন নি।

মিস এলিস মার্ব্বেল প্রথম পেশাদার টেনিস খেলায় ৮-৬, ৮-৬ গেমে মিস মেরী হার্ডউইককে ম্যাডিসন স্কোয়ারে গার্ডনে পরাজিত করেন।

আমেরিকান লন টেনিস ঃ

আমেরিকান লন টেনিস এসোসিয়েশন তাদের টেনিস খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা সরকারী

ম্যাকনীল

ভাবে প্রকাশ করেছেন। ডোনাল্ড ম্যাকনীল পুরুষদের তালিকায় পৃথিবীর এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ববি রিগসকে স্থান-চ্যুত ক'রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছেন। বিল টিলডেন,

হেনরী কোসে, ভাইন্স এবং ডোনাল্ড বাজ প্রভৃতি পৃথিবীর খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়দের মত ম্যাকনীলও পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করবেন কিনা এই নিয়ে ইতিমধ্যে টেনিস মহলে বেশ জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ডন ম্যাকনীলের বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ২২। কেনিয়োন কলেজ থেকে তিনি ডিগ্রি উপাধি লাভ করেন। গত বৎসরে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ঈজিপ্ট এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে বিভিন্ন টেনিস খেলায় যোগদান করেন এবং নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গত বৎসর ভন ক্রামকে পরাজিত ক'রে ফ্রেঞ্চ হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। এ বৎসর 'নিউ ওরলিয়নস সুগার বাউল,' ইউ এস ক্লে কোর্ট চ্যাম্পিয়ানসীপ, ইণ্টার কলেজিয়েট টুর্ণামেণ্ট এবং পৃথিবীর এক নম্বর খেলোয়াড় রিগসকে পরাজিত ক'রে আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। ম্যাকনীল একজন জনপ্রিয় টেনিস খেলোয়াড়। এ ছাড়া তিনি একজন কৃতি ছাত্র—বৈদেশিক উচ্চপদস্থ চাকুরীর জন্য তিনি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানে আর নেই—টেনিস খেলায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে প্রচুর অর্থ এবং সম্মান অর্জ্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

পুরুষদের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা :	মহিলাদের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা :
(১) উইল ডোনাল্ড ম্যাকনীল	(১) মিস এলিস মার্বেল
(২) আর এল রিগস	(২) মিস হেলেন জ্যাকব
(৩) জে আর হাণ্ট	(৩) মিসেস আর জে কেলেহার
(৪) এফ আর পার্কার	(৪) মিস ভার্জিনিয়া ওয়েলফানডম
(৫) এফ এল কোভাক্স	(৫) মিস আর এফ হার্ডউইক
(৬) জে এ ক্রামার	(৬) ডোরাথি বাণ্ডি
(৭) ই টি কুক	(৭) মিস এস পালফ্রে
(৮) এইচ প্রসোফ	(৮) মিস পাউলিন বেটেজ
(৯) বি এম গ্র্যাণ্ট	(৯) মিস ভি স্কট
(১০) এফ এস স্রোইডার	(১০) মিস হেসেন বার্ণহার্ড

পি ডি দত্তের ১,০০০ রান ঃ

বর্ত্তমান বৎসরের ক্রিকেট খেলায় যোগদান ক'রে কালীঘাট ক্লাবের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় পি ডি দত্ত ১,০০০ রান পূর্ণ করেছেন। এছাড়া তিনি ৫০টি উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি এ বৎসরের কোন প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট ম্যাচে খেলবার সুযোগ পান নি।

পার্শী জিমখানা টেনিস টুর্ণামেণ্ট ঃ

পার্শী জিমখানা টেনিস টুর্ণামেণ্টের খেলায় পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী দিলীপ বসু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পি ডি দত্ত দিলীপ বসু

ফাইনালে বসু ৬-৪, ৬-০ গেমে জে চিরঞ্জীবকে পরাজিত করে সিঙ্গলস বিজয়ের সম্মান পেয়েছেন। ফাইনালের 'Initial set'এ চিরঞ্জীভ নিখুঁত সার্ভিস এবং ক্রস কোর্ট সর্টে বসুকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিলেন কিন্তু বসু প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হ'ন। অবশেষে কেমব্রিজ ব্লুকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

সাহিত্য সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীতড়িৎকুমার বসু প্রণীত চিত্র-নাট্য-রূপী-কথাসাহিত্য "দাবী"—১৷৹

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "পরিণীতা"—১৲

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "তরুণ-তুর্কী"—১৷৹

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "পথের উদ্দেশে"—২৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "নিষ্ঠুর নিয়তি"—১৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র"—১৷৹

শ্রীবিমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "আধুনিক অভিনয় শিক্ষা"—৷৹

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি সম্পাদিত "অমরকোষ-স্বর্গবর্গঃ তথা চাণক্যসূত্রম সানুবাদম"—৷৹

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প "বর্ষায়"—২৲

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "পল্লী সেবক উপেন্দ্রনাথ"—৷৵৹

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে শ্রীঅনিলবরণ রায় সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ৪ খণ্ড—৸৹, ১৷৵৹, ১৷৵৹ ও ১৷৵৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শিকারী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৪৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ভারতীয় সভ্যতার ভবিষ্যত

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আজও আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন অনেকেই রহিয়াছেন যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই, তাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করা কেবল সময় ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার নহে, পরন্তু দেশের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অনিষ্টকর; কারণ যত শীঘ্র আমরা আমাদের অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আধুনিক ভাব ও আদর্শ-সকল গ্রহণ করিতে পারিব ততই আমাদের কল্যাণ ও প্রগতির পথ পরিষ্কৃত হইবে।* কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও আমাদের দেশের পাশ্চাত্য-ভক্তেরা ভারতীয় সভ্যতার প্রতি উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন—পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরা আদৌ সেরূপ নহেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আমেরিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও গবেষণার বিশেষ আয়োজন আছে—আটটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে† সংস্কৃত ও Indology পড়াইবার সুব্যবস্থা (chair) আছে এবং ২১৮-টি প্রধান প্রধান মিউজিয়ম ও লাইব্রেরীতে ভারতীয় কৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের অনুশীলন করিবার উপযোগী নানা পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য উপাদান সংগৃহীত আছে; কিন্তু আমেরিকার সুধীগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা

* "If India breaks away completely from her ancient life and tradition and accept modern ways and ideals—the day she does so her progress will be stupendous."—*Pandit Jawaharlal Nehru.*

† Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Johns-Hopkins, Pennsylvania, Chicago and California.

এখন বলিতেছেন যে, আমেরিকার প্রত্যেক ছাত্রকে ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। American Council of Learned Societies হইতে আমেরিকায় ভারত-বিষয়ক চর্চ্চা ও অনুশীলন সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে (Bulletin No. 28, 1939) তাহাতে W. Norman Brown লিখিয়াছেন :—

"The aim is to indicate by brief reference the importance which Indic civilization has had for the world, still has and may be expected to have, with the deduction that it demands our extended study.... We must remember that the students now passing through our educational machinery will live their effective lives during the second half of the twentieth century and it takes no gift of prophecy to predict that at that time the world will include a vigorous India, possibly politically free, conceivably a dominant power in the Orient and certainly intellectually vital and productive. How can Americans who have never met India in their educational experience be expected to live intelligently in such a world?... We believe consequently, that no department of study, particularly in the humanities, in any major university can be fully equipped without a properly trained specialist in the Indic phases of its discipline. We believe too, that every college which aims to prepare its graduates for intelligent work in the world which is to be theirs to live in, must have on its staff a scholar competent in the civilization of India. And we believe that every library or museum which means to meet more than strictly provincial interests must include Indic materials in its collections and Indic specialists on its staff."

ইহার ভাবার্থ—ভারতের সভ্যতা অতীতে জগতের জন্য কি করিয়াছে, এখন কি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি করিতে পারে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে, আমাদের দেশে ভারতীয় সভ্যতার অধ্যয়নের ব্যবস্থা আরও বিস্তৃতভাবে করা আবশ্যক। এ-কথা বলিতে ভবিষ্যদ্বক্তার শক্তির প্রয়োজন হয় না যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে—যখন আজিকার ছাত্রগণ সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিবে—ভারত জগতের মধ্যে তখন একটি শক্তিশালী দেশ হইয়া উঠিবে, সম্ভবত সে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবে, এমনও হইতে পারে যে সে প্রাচ্য দেশে প্রাধান্যশালী শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে সে যে জীবন্ত ও সৃষ্টিশীল হইয়া উঠিবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও স্থান নাই। তাহা হইলে যে-সকল আমেরিকাবাসী শিক্ষালাভকালে ভারতীয় সভ্যতার সহিত পরিচিত না হইবে, তাহারা তখন কেমন করিয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইবে ?

ভারতের ভবিষ্যত অন্ধকার ভাবিয়া যাঁহারা ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে এই আশার বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই আশ্বাসিত হইবেন। ভারতীয় সভ্যতার নব অভ্যুদয়কে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছে, আর আজও আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় সভ্যতার নামে নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন! আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য অগ্রগামী দেশে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও আর্টের চর্চ্চা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর আমাদের দেশের যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহারা আজও পাশ্চাত্য ভাবধারা শিক্ষা দিতেই তাহাদের প্রায় সমস্ত শক্তিটুকু ব্যয় করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দেন তাঁহাদিগকে আটটি প্রশ্নপত্রের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, তাহাদের মধ্যে কেবল একটিতে ভারতীয় দর্শন নামমাত্র স্থান পাইয়াছে! লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে যখন বাংলার গবর্ণর ছিলেন তখন তিনি এই ব্যবস্থা দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানে ভারত পাশ্চাত্যের যত পশ্চাতেই পড়িয়া থাকুক না কেন, দর্শনশাস্ত্রে ভারত যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। উল্লিখিত আমেরিকান পুস্তিকায় মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন :—

"No other people of record has been so greatly preoccupied with these subjects as has the Indian and has joined them in a team, with philosophy always functioning to serve religion ... When the intellectual West dis-

covered the *Vedas* at the end of the eighteenth century, this Indian attitude of mind had a profound influence, which helped to mould the German romantic movement of the nineteenth century and in another field, led to the scientific study of the history and comparison of religions. When Schopenhaur read the *Upanishads* in a Latin translation of a Persian translation from the Sanskrit, he felt that he had at last come to a clear and beautiful, though early and unsystematic treatment of the fundamental problem of man's relation to the universe and he found in those texts "the comfort of his life, the solace of his death." Indic thought was responsible for many of the most important currents in our own American Transcendentalist School, probably the most distinctive American philosophical movement of the nineteenth century. Long before the eighteenth century, classic Greece had in India a by-word for metaphysical profundity."

ভারতবাসী যে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা লইয়া যুগ যুগ ব্যাপৃত ছিল, যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের সভ্যতা শুধু চীন, জাপান ও সমগ্র প্রাচ্য দেশ নহে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজও তাহার স্থান এত নগণ্য কেন? ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একটি কথা না জানিয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে গ্রাজুয়েট হওয়া যায় কেন? শিক্ষায় এই গোড়ায় গলদ থাকাতেই আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ এমন পরানুবাদ ও পরানুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধনের দিন কি আজিও আইসে নাই? কেহ কেহ হয়ত আপত্তি তুলিতে পারেন যে, ভারতীয় দর্শনে বহুকাল হইতেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ চলিতেছে, নূতন কিছুই সৃষ্টি হইতেছে না, তাই আমাদিগকে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। মিঃ ব্রাউন ইহার উত্তর দিয়াছেন, "Whether that be true or not hardly signifies. The important point is that Indian thinkers to-day have become aware of the problems which modern science has brought to philosophy. It is only fair to suppose that with a reflective tradition of at least three thousand, and possibly five thousand years behind them, they may make definite contributions to modern thinking which would not have come from westerners, because the Indians will draw from their own philosophic heritage as well as from that of Europe and will employ both in their treatment of current problems."

কিন্তু বাস্তবিকই কি দার্শনিক চিন্তায় আধুনিক ভারতের মৌলিক দান কিছুই নাই? শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ও অভিবিকাশ হইয়াছে তাহার সহিত যাঁহারা কিছুমাত্র পরিচিত আছেন তাহারা কখনই এমন কথা বলিতে পারিবেন না। তাঁহার অধুনা প্রকাশিত THE LIFE DIVINE গ্রন্থখানি দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার বাণীর সহিত পরিচিত না হইয়াও আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা দর্শনশাস্ত্রে বি-এ ও এম-এ ডিগ্রী লাভ করিতেছেন, এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার সংশোধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ভারতীয় সাহিত্যে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য থাকিলেও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও সমুচ্চ বিকাশ হইয়াছিল—ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সে ধারা আজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হয় নাই। যে-সভ্যতা সাহিত্যে ও সুকুমারশিল্পে এমন সুদীর্ঘকালব্যাপী বহুল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই, এখনও নূতন নূতন আদর্শ ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া চলিয়াছে, সে সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি যে কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয়। মিঃ ব্রাউন ভারতের কাব্য, নাটক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে গল্পসাহিত্যে জগৎ ভারতের নিকট যেমন ঋণী, এমন আর অন্য কোন প্রাচীন জাতির নিকটেই নহে। সাধারণভাবে তিনি বলিয়াছেন, "To day, as throughout her whole known history India maintains a vigorous and productive literary tradition, not an imitator of any other people, but ever independent and creative." ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "Architecture and the plastic arts have had a career in India

which we can study since the third millennium B. C. and can claim to understand since the third century B. C. India's art has had a unique history of them and technique, and has never been excelled for imaginative power."

শুধু কাল্‌চারের উচ্চতর জিনিষগুলিতেই নহে, কার্য্যকরী বিদ্যাতেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না; তাহা উল্লেখ করিয়া মিঃ ব্রাউন বলিয়াছেন, "Science—natural, social and humanistic—has had a long and important treatment in India. Medicine, astronomy, mathematics, law, political and social organisation are all described in many books belonging to a tradition coming from antiquity, with increasing amplification in the hands of successive authors."

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতীয় সভ্যতা অতীত কালে মহান ও সর্ব্বতোমুখী ছিল ইহা স্বীকার করিলেও এখন আর সে-সবের চর্চ্চা করিয়া লাভ কি? ভারতের সেই সভ্যতা ত ভারতকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই—এখন কি নূতন দিক হইতে নূতন জীবনীশক্তি আহরণের চেষ্টা করাই ঠিক নহে? ইহার উত্তর এই যে, ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের ন্যায় একটা জাতি বা সভ্যতার জীবনেও তারুণ্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য আসে এবং শেষ অবস্থায় সে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে এমন কোন অন্তর্নিহিত শক্তি যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে সে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা এই শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছে, কতবার তাহার গ্লানি ও পতনের অবস্থা আসিয়াছে কিন্তু সে মরে নাই—সে সভ্যতার ভিত্তি যে আধ্যাত্মিকতা, যাহার উৎস রহিয়াছে বেদ, উপনিষদ, গীতায় এবং শত শত মহাপুরুষের সাধনায়—তাহাই মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যুগে যুগে ভারতকে নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে এবং আজও আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে এইরূপই এক নব অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব পাশ্চাত্য হইতে বহু জিনিষ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও আমাদের এই যে বিরাট, মহান, অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি-সম্পন্ন অধ্যাত্ম-সভ্যতা, ইহাকে অবহেলা করিয়া যেন আমরা পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ধাবিত না হই। পাশ্চাত্য রূপের অন্তরালে উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আমাদের নিকট এখন আসিতেছে, তাহা যে আমাদের স্বকীয় প্রাচীন জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সেইখানে তাহাদের এমন গভীরতর ও মহত্তর অর্থ পাওয়া যাইবে যাহা হইতে আমরা আরও মহান ও উৎকৃষ্ট রূপ-সংগঠনের সন্ধান পাইব। যাঁহাদের নিকট আমরা নূতন সভ্যতা শিক্ষা করিতে চাহিতেছি তাঁহারাই আজ ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহে ভারতীয় সভ্যতা হইতে শিক্ষা ও শক্তি আহরণ করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এ-বিষয়ে মিঃ ব্রাউন বলিয়াছেন—

"The stream of ancient Indic culture is beating against the co-ercive banks of Islamic and European-Christian culture at more points than political. In literature, despite the stifling effect of a college educational system—not based upon the culture of the country, there has been an unceasing productivity in the vernacular languages ...

"The considerations advanced in the foregoing discussion justify us in making two major generalisations about India today. One is that her civilization has been a continuum for twentyfive hundred years, possibly five thousand, varying in detail and development, yet having a common skeletal basis of religion, art, thought. It is a culture which has been attacked by at least three powerful invading cultures and is still under attack from two of them. The other is that the reshaping of India now taking place, is not a process of discarding the traditional civilization for a new one imported from the West, but rather consists in adapting the inherited to meet the demands of the modern world with its improved industrial organization, means of communication and political and social theory. The current conflicts spring from the resistance which the indigenous offers to the foreign; the resolution of the conflicts will come when India has selected from the foreign those things which she thinks necessary to perfect her destiny.

"Since India's culture is bound to persist, it follows concomitantly that we must study India and her culture to gain from it those features, large or small, that will contribute to our own and to assist her in getting from

us those phases of our own civilization which she can use. We need intellectual understanding on each side to make a satisfactory adjustment of East with West."

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আমেরিকার সুধীজনের কিরূপ মনোভাব, এখানে তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় কেন দিলাম তাহার কারণ সুস্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একজন লোক আসিয়া হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদিন সে গীতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বুঝি কোনও ইংরেজ গীতার প্রশংসা করেছে!"

উল্লিখিত পুস্তিকায় মিঃ ব্রাউন ভারতীয় সভ্যতার বহিরঙ্গেরই কিছু পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সভ্যতার যাহা মর্ম্মকথা—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্—তাহার নিগূঢ় রহস্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বেদ ও উপনিষদের যুগের ঋষিরাই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্বেও ভারতে যে সভ্যতা ছিল তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও সে সভ্যতা তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া স্থায়ী হইতে পারে নাই—তাহার মধ্যে সারবস্তু যাহা কিছু ছিল আর্য্য সভ্যতার মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতীয় সভ্যতা বলিতে আমরা এখন এই সভ্যতাই বুঝি, এই সভ্যতাই অন্তত তিন সহস্র বৎসর কাল আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া তাহার পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে হইলে ভারতের সেই প্রাচীন ঋষিদের সাধনা ও দৃষ্টি অন্তত কতক পরিমাণে থাকা প্রয়োজন, শুধু বুদ্ধিচালনা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। তাই আমাদের সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে আমাদিগকে আমাদের দেশেরই যোগী ও ঋষিদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ যোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টি লইয়া আর্য্য পত্রিকায় ভারতীয় সভ্যতার যে গভীর ও বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতেছে ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, আর্ট, রাজনীতি, সমাজনীতির অপূর্ব্ব দিক্‌দর্শন—এই অতিপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর আমাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না। A DEFENCE OF INDIAN CULTURE নামে সেই প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।* তাঁহার THE RENAISSANCE IN INDIA † নামক ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে ভারতের নব-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে অনেক গভীর কথা বলা হইয়াছে।

আমরা যে অপূর্ব্ব ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাহা অলক্ষ্যে আমাদের প্রাণ, মন, আমাদের স্বভাব, চরিত্র গঠন করিয়াছে তাহার সহিত আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারি ততই ভাল, নতুবা আমরা নিজদিগকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিব না।

আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতা অন্য কোন সভ্যতার তুলনায় হীন নহে, মানবজীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তি ও সম্পদ নিহিত রহিয়াছে; আমরা যে আমাদের সভ্যতার গৌরব বোধ করি সেটা বৃথা গর্ব্ব নহে। অনেক বিষয়েই আমাদের এই সভ্যতা জগতের অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারত এতদিন যে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছে ইহাই মানবজাতির চরম সীমা, ইহার ঊর্দ্ধে আর মানুষ যাইতে পারিবে না—আমরা যে সব প্রাচীন অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি হারাইয়াছি, সেই কালকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ মনোভাব মারাত্মক হইবে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার IS INDIA CIVILISED? ‡ গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"নিজেদের উপর এবং নিজেদের কৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের উপর বিশ্বাস, ইহাই হইতেছে স্থায়ী ও শক্তিশালী জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন; দ্বিতীয় প্রয়োজন হইতেছে দোষ ত্রুটি গুলি স্বীকার করা এবং মহত্তর সম্ভাবনাসকল দর্শন করা; ইহা ব্যতীত সুস্থ ও জয়যুক্ত নবজীবন লাভ করা সম্ভব নহে। আমাদের ভবিষ্যতের যে চেষ্টা—তাহাতে আমরা একটি সত্যকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বিবেকানন্দ এই সত্যটিকে অতি স্পষ্টভাবেই দেখিয়াছিলেন,

* এই গ্রন্থের শেষ চারি অধ্যায়ে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে যে গভীর আলোচনা ও সুস্পষ্ট পথ-নির্দ্দেশ আছে তাহা বাংলা ও হিন্দীতে অনূদিত হইয়া ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

† এই পুস্তকটি "ভারতের নবজন্ম" নামে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে।

‡ "ভারত কি সভ্য" নামে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

—সত্যটি এই যে, যদিও আমাদের সভ্যতার অন্তর্নিহিত ভাব ও আদর্শসকল খুবই উৎকৃষ্ট ছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই মূল তত্ত্বে চিরকালের জন্য মূল্যবান এবং আভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগতভাবে সে-সব আমাদের দেশে খুবই ঐকান্তিকতা ও শক্তির সহিত অনুসৃত হইয়াছিল (অন্তত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে)—তথাপি সমাজের সমষ্টিগত জীবনে সে-সবের প্রয়োগ আমাদের দেশে কখনই যথেষ্ট সাহস ও পূর্ণতার সহিত করা হয় নাই এবং তাহা ক্রমশই বেশী বেশী সঙ্কীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমাদের সমাজের উপর দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের একটা ক্রমবর্দ্ধমান ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। প্রথম প্রথম বাহিরের জীবন ও আভ্যন্তরীণ আদর্শ এই দুইয়ের মধ্যে কোনরকম সমন্বয় সাধন করিবার একটা উদার প্রয়াস ছিল, কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তি হয় সমাজের অচলায়তন বিধি-বিধানে; অধ্যাত্ম আদর্শবাদের একটা নীতি ভিত্তিস্বরূপ থাকে, বাহ্যিক ঐক্য ও সহযোগিতা-মূলক নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-সকলকে বাঁচাইয়া রাখা হয়; কিন্তু সমাজের সাধারণ জীবনে কড়াকড়ি বন্ধন ও ভেদবৈষম্যমূলক জটিলতার ভাব ক্রমশই বাড়িয়া ওঠে, আর স্বাধীনতা, ঐক্য, মানবের মধ্যে দেবত্ব—এই সব মহান বৈদান্তিক আদর্শ কেবল ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সাধনার জন্যই রাখিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে ঘটিল প্রসারণ ও গ্রহণ-শক্তির ন্যূনতা এবং ইহার পরিণাম হইল এই যে, যখন বাহির হইতে প্রবল ও আক্রমণশীল শক্তিসকল—ইস্লাম—ইউরোপ—ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল তখন সমাজ কেবল সীমাবদ্ধ ও গতিহীন আত্মরক্ষাতেই সন্তুষ্ট রহিল—যেমন সঙ্কীর্ণভাবেই হউক, আত্মরক্ষার বিকাশ যত ক্ষুণ্ণ করিয়াই হউক, কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িল। এইভাবে স্থিতি ও জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সে স্থিতি বস্তুত সুনিশ্চিত ও প্রাণময় নহে, কারণ বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যতীত তাহা অসম্ভব, আর সে জীবন-রক্ষাও মহান সতেজ জয়শীল হইল না। কিন্তু এখন আর প্রসারণ ব্যতীত জীবনটি রক্ষা করাও সম্ভব নহে। এখন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে, আমাদের যে মহত্তর প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল পুনরায় সেইটি আরম্ভ করা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, ধর্ম্ম, আর্ট, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন সর্ব্বত্রই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও জ্ঞানের পূর্ণ ও মহান অর্থ অনুযায়ী সাহসের সহিত এবং সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্নভাবে জীবনের বিস্তার করা। আমরা যে সামঞ্জস্য বিকাশ করিয়াছিলাম তাহা ছিল অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ও স্থিতিশীল; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, যতদিন না আমরা পূর্ণতার অবস্থা লাভ করিতেছি ততদিন সামঞ্জস্যের রূপটি অপূর্ণ ও সাময়িক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; তাহার প্রাণশক্তি বজায় রাখিতে হইলে এবং তাহার চরম লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে এমনভাবে নিজেকে পরিবর্ত্তিত ও প্রসারিত করিতেই হইবে যেন তাহা প্রশস্ততর ও অধিকতর বাস্তব ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের কাল্চার ও সভ্যতার এইরূপ বৃহত্তর প্রসারের চেষ্টাই এখন আমাদিগকে করিতে হইবে—আমাদের সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক ঐক্যের মহত্তর বিকাশ এবং সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে, অন্তত শেষপর্য্যন্ত, একটা সামঞ্জস্য ও ঐক্যসাধন।

তুমি আর আমি

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়

তব নয়নের নীলাভ ছায়ার তলে
মোর হৃদয়ের কবিতা বেঁধেছে নীড়
তব বিরহের অশ্রুঝরণা জলে
আমার ছন্দ খোঁজে সুর বাঁশরীর।
তব জীবনের প্রেমের প্রদীপখানি
এই ভুবনের যেখানে রয়েছে জ্বালা

মোর সাধনার মানসী-মর্ম্মবাণী
নিভৃতে সেথায় গাঁথিছে জয়ের মালা।
তুমি আর আমি এক হয়ে আছি মিলে
অচিন্তনীয় সুগভীর পরিচয়ে
পূর্ব্বাচলের সোনালী রূপালী নীলে
যুগে যুগান্তে অমরার সুধা লয়ে।

পথবেঁধে দিল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্

পরদিন অপরাহ্ন। রঞ্জন নিজের ঘরে বসিয়া খানিকটা রবার ও একটা দ্বিভুজ পেয়ারার ডাল দিয়া গুল্তি তৈয়ার করিতেছে। কাজটা যে সে গোপনে সম্পন্ন করিতে চায় তাহা তাহার দ্বারের দিকে সতর্ক নজর হইতে প্রমাণিত হয়।

গুল্তি প্রস্তুত শেষ করিয়া সে রবার টানিয়া পরীক্ষা করিল, ঠিক হইয়াছে। একটা কাগজ গুলি পাকাইয়া গুল্তিতে সংযোগ করিয়া অদূরস্থ ড্রেসিং টেবিলে রক্ষিত একটি প্ল্যাস্টারের পরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। পরী টলিয়া পড়িলেন।

সন্তুষ্ট হইয়া রঞ্জন গুল্তি পকেটে রাখিল; তারপর দ্বারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

চিঠি লেখা হইলে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া রঞ্জন উঠিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে চলিল।

কাট্।

এই বাড়ীরই আর একটা ঘরে প্রতাপ রেলজার্নির উপযুক্ত সাজ-পোষাক করিয়া অত্যন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। ঘরের একটা জানালা বাগানের দিকে। সেই জানালা হইতে দরজা পর্য্যন্ত পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরাজের মত যাতায়াত করিতে করিতে প্রতাপ মাঝে মাঝে জেব-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতেছেন।

একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘড়ি দেখিলেন; তারপর বিরক্তভাবে নিজ মনেই বিড়্ বিড়্ করিলেন—

প্রতাপ: সময় যেন কাটতে চায় না। এখনও ট্রেনের সময় হতে—পাঁচ ঘণ্টা।

হঠাৎ জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন; তারপর জানালার গরাদ ধরিয়া অপলকচক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জানালার বাহিরে কিছুদূরে একটা মেতির ঝাড়ের বেড়া বাড়ীর সমান্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ দেখিলেন, বেড়ার ওপারে সন্তর্পণে গা ঢাকিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে। তাহার মুখ বা দেহ পাতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; কেবল ঝাড়ের পত্রবিরল তলার দিক দিয়া সঞ্চরমান পদযুগল দেখা যাইতেছে। পদযুগল যে কাহার তাহা প্রতাপের চিনিতে বিলম্ব হইল না।

যতক্ষণ দেখা গেল প্রতাপ পদযুগল দেখিলেন; তারপর চক্ষু চক্রাকার করিয়া চিন্তা করিলেন। গালের আবটি ধরিয়া টিপিতে টিপিতে তাঁহার মাথায় একটা কূটবুদ্ধির উদয় হইল, চাদর কাঁধে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

কাট্।

বাড়ীর ফটকের ঠিক অভ্যন্তর। ফটকের পাশে দরোয়ানের কুঠুরি, তাহার পাশে গারাজ-ঘর। একজন গুর্খা দরোয়ান রঞ্জনের মোটর বাইক বাহির করিয়া আনিতেছে; রঞ্জন ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

মোটর বাইক রঞ্জনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গুর্খা দরোয়ান দুই পা জোড় করিয়া স্যালুট্ করিল। রঞ্জন গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়া স্টার্ট্ দিতে গিয়া থামিয়া গেল। শব্দ করা হয় তো নিরাপদ হইবে না, এই ভাবিয়া সে নামিয়া পড়িল। মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন: না, হেঁটেই যাব।

বলিয়া মোটর বাইক আবার দরোয়ানকে প্রত্যর্পণ করিয়া রঞ্জন দ্রুত পদক্ষেপে ফটক হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

বাগানের একটি ঝাউগাছের আড়ালে প্রতাপ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; রঞ্জন বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিলেন; তারপর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন দরোয়ান গাড়ীটা আবার গারাজে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি চাপা গলায় ডাকিলেন—

প্রতাপ: এই! স্‌স্‌!

গুর্খা দরোয়ান পিছু ফিরিয়া মালিককে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জোড় পদে স্যালুট্ করিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রতাপ: ছোটবাবু কোন্ দিকে গেল?

দরোয়ান হিট্‌লারি কায়দায় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঞ্জন

যেদিকে গিয়াছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিল। প্রতাপ আবার তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রচরণে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিলেন।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঝাঝার একটি পথ। দুই-চারিটি পথিক দেখা যায়। রঞ্জন পথের মাঝখান দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বহুদূর পশ্চাতে প্রতাপ রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন।

ক্রমে রঞ্জন দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল; প্রতাপ কাছে আসিতে লাগিলেন। একটা কুকুর তাঁহার সন্দেহজনক ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাঁহার পিছু লইল। উত্যক্ত হইয়া শেষে প্রতাপ একটি ঢিল কুড়াইয়া লইয়া কুকুরের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুর পলায়ন করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

কেদারবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি গিয়াছে। কলিকাতার গলি নয়; পদতলে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দুই পাশে ফণি-মনসার ঝাড়। ঝাড়ের অপর পাশে বাগান-ঘেরা বাড়ী।

রঞ্জন সাবধানে এই গলির একটা মনসা-বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখে কেদারবাবুর দ্বিতল বাড়ীর পার্শ্বভাগ। রঞ্জনের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে একটি জানালা চোখে পড়ে। দ্বিতলের জানালা, গরাদ নাই, কিন্তু কাঁচের কবাট বন্ধ।

কাট্‌।

দ্বিতলের ঘরে মঞ্জুর শয়ন কক্ষ। নানাপ্রকার ছোট-খাট মেয়েলি-আসবাব চোখের প্রীতি সম্পাদন করে। ঘরটি কিন্তু বর্ত্তমানে ঈষদন্ধকার।

মঞ্জু নিজের শয্যার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দু হাতে রঞ্জনের ছবিখানি সম্মুখে মাথার বালিসের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছে। তাহার মুখখানি অত্যন্ত বিরস।

দেখিতে দেখিতে তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল; অশ্রুনিরোধের চেষ্টায় ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়াও কোনও ফল হইল না; ছবির উপর মাথা রাখিয়া মঞ্জু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কাট্‌।

রঞ্জন জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল, সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া মাটিতে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। তারপর একটি ছোট নুড়ির মত পাথর কুড়াইয়া লইয়া পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহাতে মোড়কের মত মুড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রতাপবাবু কিয়দ্দূর পশ্চাতে বেড়ার পাশে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন; উৎকণ্ঠিতভাবে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিতেই তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ফণিমনসার কাঁটা ফুটিল। তিনি চকিতে আবার খাড়া হইলেন।

রঞ্জন গুল্‌তি বাহির করিয়া তাহাতে নুড়িটি বসাইয়া-ছিল, এখন অতি যত্নে জানালার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া নুড়ি নিক্ষেপ করিল।

জানালার একটা কাচ ভাঙিয়া নুড়ি ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্‌।

মঞ্জু ঘরের মধ্যে পূর্ব্ববৎ কাঁদিতেছিল, কাচ ভাঙার শব্দে মুখ তুলিল। কাচ-ভাঙা জানালা হইতে তাহার চক্ষু মেঝের উপর নামিয়া আসিল; কাগজ মোড়া নুড়িটি দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সেটি কুড়াইয়া লইল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

> "মঞ্জু, আজ আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি, আমারও বাবা এসেছেন। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। যে পাথরের আড়ালে রোজ আমাদের দেখা হত, সেইখানে আমি অপেক্ষা করব। তুমি আসবে কি ?
>
> তোমার রঞ্জন"

চিঠি পড়া শেষ হইয়া যাইবার পরও মঞ্জু চিঠি হাতে ধরিয়া তেম্‌নিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; চিঠিখানা স্খলিত হইয়া মেঝেয় পড়িল। মঞ্জু অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—

মঞ্জু : একবার—শেষবার—

কাট্‌।

বেড়ার ধারে রঞ্জন ব্যগ্র ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে।

জানালা খুলিয়া গেল; মঞ্জুর পাংশু মুখখানি দেখা গেল। নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া সে কিছুক্ষণ রঞ্জনকে দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে সম্মতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়িল।

ডিজল্‌ভ্‌।

দ্বিতলে মঞ্জুর শয়নকক্ষের দরজার সম্মুখে কেদারবাবু

দাঁড়াইয়া আছেন ; দরজা ভেজানো রহিয়াছে। কেদারের মুখে রুক্ষ বিষণ্ণতা। মঞ্জুর মনে দুঃখ দিয়া তিনিও সুখী নন।

কেদার দ্বারে মৃদু টোকা দিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। দ্বিতীয়বার টোকা দিয়াও যখন জবাব পাওয়া গেল না, তখন তিনি ডাকিলেন—

কেদার : মঞ্জু!

এবারও সাড়া নাই। কেদার তখন উদ্বিগ্নমুখে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে কেহ নাই। কেদার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইলেন। ভাঙা জানালাটা চোখে পড়িল ; তারপর মেঝেয় চিঠিখানা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন।

চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ভীষণাকৃতি ধারণ করিল ; তিনি সেটা মুঠির মধ্যে তাল পাকাইয়া গলার মধ্যে হুঙ্কার দিলেন, তারপর দ্রুতবেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। মিহির জাপানী ছন্দে হেলিতে দুলিতে ফটক দিয়া প্রবেশ করিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখ হইতে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া প্রায় টাউরি খাইয়া পড়িল। কেদারবাবু ক্রুদ্ধ বন্য মহিষের মত তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিহির কোনও মতে সামলাইয়া লইয়া চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্ব্বত্য স্থান। যে পাথরের ঢিবিটার উপর রঞ্জন ও মঞ্জু প্রথম দিন আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই তলদেশে একটা পাথরে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিক দিয়া মঞ্জু আসিবে, তাহার অপলক দৃষ্টি সেইদিকে স্থির হইয়া আছে।

কাট্‌।

পার্ব্বত্য স্থানের আর এক অংশ। প্রতাপ একটা ঝোপের আড়াল হইতে অনিশ্চিতভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন—যেন কোন্‌ দিক্‌ দিয়া অগ্রসর হইলে অলক্ষ্যে রঞ্জনের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছেন না। শেষে তিনি ঝোপের আড়ালে থাকিয়া বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাট্‌।

মঞ্জু আসিতেছে। যেস্থানে সাধারণত তাহাদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত সেখান হইতে সিধা রঞ্জনের দিকে আসিতেছে। শুষ্ক মুখে করুণ আগ্রহ ; চুল ঈষৎ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। সম্মুখ দিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে সে একবার হোঁচট খাইল, কিন্তু তাহা জানিতেও পারিল না।

রঞ্জন মঞ্জুকে দেখিতে পাইয়াছিল ; সে কাছে আসিতেই দুই হাত বাড়াইয়া তাহার দুই হাত ধরিল।

দু'জনে পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; মুখে কথা নাই। দু'জনের চোখেই আশাহীন ক্ষুধিত আকাঙ্খা! মঞ্জুর শ্বাস একটু দ্রুত বহিতেছে। অবশেষে রঞ্জন ধরা-ধরা গলায় বলিল—

রঞ্জন : মঞ্জু! এই আমাদের শেষ দেখা—আর দেখা হবে না।

মঞ্জু হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নীরবে মাথা নাড়িয়া অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল। রঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

রঞ্জন : বেশ, দেখা না হোক। কিন্তু তুমি চিরদিন আমাকে এমনি ভালবাসবে?

মঞ্জু রঞ্জনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—

মঞ্জু : বাস্‌বো।—আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!—

রঞ্জন দৃঢ়মুষ্টিতে হাত ধরিয়া তাহাকে আরও একটু কাছে টানিয়া আনিল।

কাট্‌।

পাথরের পশ্চাতে কিছুদূরে অসমতল কঙ্করপূর্ণ জমির উপর দিয়া কেদার হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছেন।

কাট্‌।

মঞ্জু ও রঞ্জন। দু'জনের চক্ষু যেন পরস্পরের মুখের উপর জুড়িয়া গিয়াছে। রঞ্জন একটু মলিন হাসিল।

রঞ্জন : আমরা কেউই নিজের বাবার মনে দুঃখ দিতে পারব না ; তা যদি পারতুম আমরা নিজেরা খেলো হয়ে যেতুম, আর আমাদের ভালবাসাও তুচ্ছ হয়ে যেত—

মঞ্জুর চোখে আরতি প্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

মঞ্জু : কেমন ক'রে তুমি আমার মনের কথা জানলে?

রঞ্জন : তোমার মনের কথা আর আমার মনের কথা এক হয়ে গেছে মঞ্জু—

কাট্।

প্রতাপ কঙ্করপূর্ণ ভূমির উপর হামাগুড়ি দিতেছেন।

কাট্।

মঞ্জু বিদায় চাহিতেছে। তাহাদের হাতে হাত আঙুলে আঙুল শৃঙ্খলিত হইয়া আছে; রঞ্জন এখনও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। মঞ্জু রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু : এবার ছেড়ে দাও—

ধীরে ধীরে রঞ্জনের অঙ্গুলির শৃঙ্খল শিথিল হইয়া গেল; মঞ্জু স্খলিতপদে অশ্রু-অন্ধ নয়নে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। চোখে অপরিসীম বিয়োগ-ব্যথা লইয়া রঞ্জন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মঞ্জু চলিয়া যাইতেছে; যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আবার চলিতে লাগিল।

কাট্।

কঙ্করপূর্ণ স্থান। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে হামাগুড়ি দিয়া প্রতাপ ও কেদার প্রবেশ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পরস্পরে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

তারপর কাছাকাছি পৌঁছিয়া দুজনে একসঙ্গে মুখ তুলিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল; পঁচিশ বৎসরের অদর্শন সত্ত্বেও চিনিতে বিলম্ব হইল না।

দুইটি অপরিচিত কুকুর পথে সাক্ষাৎকার ঘটিলে যেমন দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া গূঢ় গর্জ্জন করে, ইহারাও তদ্রূপ গর্জ্জন করিলেন; তারপর চতুষ্পদ ভাব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার প্রথম কথা কহিলেন।

কেদার : এঁ—: ! তুই ! আমার বোঝা উচিত ছিল যে এ একটা নচ্ছার উল্লুকের কাজ।

প্রতাপ : চোপ-রও ভাল্লুক কোথাকার! আমার ছেলে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিস!

যুযুৎসুভাবে উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

কেদার : (সচীৎকারে) ফাঁদ পেতেছ! দাঁড়া রে নচ্ছার, তোর ছেলেকে পেলে তার হাড় একঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করব। এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার মেয়েকে চিঠি লেখে!

প্রতাপ (আস্ফালন করিতে করিতে) তবে রে বেঁড়ে-ওস্তাদ! মারবি আমার ছেলেকে! পুলিস ডেকে তোকে হাজতে না পুরি তো আমার নাম প্রতাপ সিংগিই নয়—

কাট্।

রঞ্জন যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল; রুমাল বাহির করিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। মুছিতে মুছিতে হঠাৎ থামিয়া সে শুনিতে লাগিল, অনতিদূর পশ্চাৎ হইতে কর্কশ কলহের আওয়াজ আসিতেছে।

রঞ্জনের বিস্মিত মুখের ভাব ক্রমশ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

কাট্।

কেদার ও প্রতাপ। তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ক্রমে সপ্তমে চড়িতেছে।

কেদার : শয়তানি করবার আর জায়গা পাস্‌নি—হতভাগা হাতী—

প্রতাপ : বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাস্কেল রামছাগল!

কাট্।

রঞ্জন শুনিতেছিল; এতক্ষণে কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাহার মাথার চুল প্রায় খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার বিবর্ণ মুখ হইতে বাহির হইল—

রঞ্জন : বাবা! কেদারবাবু!

কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া রঞ্জন কিছুক্ষণ হাত কচ্‌লাইল; তারপর দ্বিধাভরে মল্লভূমির দিকে চলিল।

কাট্।

কেদার যথাযোগ্য হস্ত আস্ফালন সহকারে বলিতেছেন—

কেদার : ইচ্ছে করে এক চড় মেরে তোর আব্-শুদ্ধ গালটা চ্যাপ্‌টা ক'রে দিই।

প্রত্যুত্তরে প্রতাপ কেদারের মুখের সিকি ইঞ্চি দূরে নিজের বদ্ধ মুষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : ইচ্ছে করে একটি ঘুষি মেরে তোর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দিই।

কেদার উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য বাহির না হইয়া সহসা আর্ত্ত কাতরোক্তি নির্গত হইল। তিনি হাত দিয়া গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদার : অ্যা—উ! উহু হু হু—আ রে রে রে রে—

যন্ত্রণায় তিনি মাটির উপর সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলেন; নিজের মুষ্টির দিকে উদ্বিগ্ন সংশয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন—হয় তো অজ্ঞাতসারে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। কেদারবাবুর আক্ষেপোক্তি হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিল। তখন প্রতাপ ধমক দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি হয়েছে—কাঁদছিস কেন? আমি তোকে মেরেছি—মিথ্যেবাদী কোথাকার?

কেদার : আরে রে রে রে রে—দাঁত রে লক্ষ্মীছাড়া—দাঁত—রে রে রে রে—

প্রতাপ কণ্টকবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ :—দাঁত?

কেদারের স্কন্ধ ধরিয়া ঝাকাঝাকি দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি বল্লি—দাঁত? দাঁত ব্যথা করছে?

কেদার : হাঁ রে বোম্বেটে—দন্তশূল! নইলে তোকে আজ—হু হু হু—

প্রতাপ : দন্তশূল! এতক্ষণ বলিস্ নি কেন রে গাধা?

ত্বরিতে পকেট হইতে গুলি বাহির করিয়া তিনি কেদারের সম্মুখে ধরিলেন।

প্রতাপ : এই নে—খেয়ে ফ্যাল্। দু'মিনিটে যদি তোর দন্তশূল সেরে না যায় আমার নামই প্রতাপ সিংগি নয়—

কেদার সন্দিগ্ধভাবে বড়ি নিরীক্ষণ করিলেন।

কেদার : এঁ:? খুনে কোথাকার, বিষ খাইয়ে মারবার মৎলব? অ্যা—উ!

কেদার হাঁ করিতেই প্রতাপ বড়ি তাঁহার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

প্রতাপ : নে—খা। আহাম্মক—

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বেই কেদার বড়ি গিলিয়া ফেলিলেন।

কাট্।

রঞ্জন অনিশ্চিত পদে অগ্রসর হইতেছিল; তাহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ। কিছু দূর আসিয়া সে একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। কলহের কলস্বরে মন্দা পড়িয়াছে; কেদারবাবু থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটু কুন্থন করিতেছেন। রঞ্জন অন্তরালে দাঁড়াইয়া সবিস্ময় আগ্রহে দেখিতে লাগিল।

কাট্।

দুইটি ঢিবির উপর কেদার ও প্রতাপ বসিয়া আছেন। কেদারের মুখ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি; তাঁহার দন্তশূল যে এমন মন্ত্রবৎ উড়িয়া যাইতে পারে তাহা যেন তিনি ধারণাই করিতে পারিতেছেন না; বিহ্বলভাবে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রতাপের দিকে আড় চক্ষে তাকাইতেছেন। প্রতাপের মুখে বিজয়-দীপ্ত হাসি সুপরিস্ফুট। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রতাপ মস্তকের উন্নত ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি বলেছিলুম? সারলো কি না?

কেদার মিন্-মিন্ করিয়া বলিলেন—

কেদার : আশ্চর্য্য ওষুধ! কোথায় পাওয়া যায়?

প্রতাপ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : হেঃ হেঃ হেঃ—এ আমার তৈরি ওষুধ। চালাকি নয়, নিজে আবিষ্কার করেছি—

কেদার : (ঘোর অবিশ্বাসভরে) আবিষ্কার করেছিস! তুই?

প্রতাপ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি না তো কে?—

তিনি উঠিয়া গিয়া কেদারের ঢিবির উপর বসিলেন।

প্রতাপ : এর নাম হচ্ছে বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা। বুঝ্লি? এই বড়ি বার ক'রে সতের লাখ টাকা করেছি—

কেদার একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কেদার : বলিস্ কি! আমি যে অভ্রের খনি ক'রে মোটে এগারো লাখ করেছি—

প্রতাপ সপ্রশংস নেত্রে কেদারের পানে তাকাইলেন।

প্রতাপ : তাই নাকি!—তা এগারো লাখ কি চাট্টিখানি কথা না কি! কটা লোক পারে?

তিনি কেদারের পিঠে প্রশংসা-জ্ঞাপক চপেটাঘাত করিলেন। কেদারের মুখে সহসা হাসি ফুটিল।

কাট্।

রঞ্জন পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; তাহার মুখ অপরিসীম আনন্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এই সময় কেদার ও প্রতাপ উভয়ের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল।

রঞ্জন পা টিপিয়া টিপিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল; তার-পর পিছু ফিরিয়া সোজা দৌড় দিল। দৌড়িতে দৌড়িতে সে যে "মঞ্জু" "মঞ্জু" উচ্চারণ করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না।

কাট্।

কেদারবাবুর গৃহের ফটকের সম্মুখ। মঞ্জুর মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল; পশ্চাতে মিহির।

মিহির: চল্লেন? একটা জাপানী কবিতা লিখেছিলুম—

মঞ্জু মোটরের চালকের সীটে প্রবেশ করিতে করিতে ভারী গলায় বলিল—

মঞ্জু: মাপ করবেন মিহিরবাবু, আমার সময় নেই।— হ্যাঁ, বাবা এলে বলে দেবেন, তাঁর জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেলুম—

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়া মঞ্জু চলিয়া গেল। মিহির করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাট্।

রঞ্জনের বাড়ীর ফটক। গুর্খা দরোয়ান স্বস্থানে দণ্ডায়মান আছে। রঞ্জন দৌড়িতে দৌড়িতে বাহির হইতে প্রবেশ করিতেই দরোয়ান পদযুগল সশব্দে জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন: দরোয়ান, জল্‌দি—জল্‌দি ফট্‌ফটিয়া নিকালো—

দরোয়ান স্যালুট করিয়া মোটর বাইক আনিবার জন্য প্রস্থান করিল। রঞ্জন নিজের উৎফুল্ল অথচ ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা রুমাল দিয়া মুছিতে লাগিল।

কাট্।

ঢিবির উপর পরস্পরের স্কন্ধ জড়াজড়ি করিয়া প্রতাপ ও কেদার বসিয়া আছেন; উভয়েরই চক্ষু আর্দ্র। পুনর্মিলনের অকাল বর্ষা দু'জনেরই মন ভিজাইয়া দিয়াছে।

কেদার: (নাক টানিয়া) ভাই, আমি কি মিছিমিছি তোর ওপর রাগ করেছিলুম? তুই আমাকে 'কদু রায়' বলেছিলি কেন? আমার নামটাকে বেঁকিয়ে অমন ক'রে ডাকা কি তোর উচিত হয়েছিল?

প্রতাপ: ভাই, তুইও তো আমাকে 'আবু হোসেন' বলেছিলি। আমার গালে আব আছে বলে আমাকে আবু হোসেন বলা কি বন্ধুর কাজ হয়েছিল?

কেদার: (চক্ষু মুছিয়া) রেখে দে ওসব পুরানো কথা—চল্ বাড়ী যাই।

উভয়ে উঠিলেন।

প্রতাপ: আগে আমার বাড়ীতে তোকে যেতে হবে কিন্তু।

কেদার: না, আমার বাড়ীতে আগে—

উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কেদার: আমার মেয়েকে তো তুই এখনও দেখিস নি। (সগর্ব্বে) অমন মেয়ে আর হয় না—

প্রতাপ: (গর্ব্বোদ্দীপ্ত কণ্ঠে) আর আমার ছেলে? তুই তো দেখেছিস্—কেমন ছেলে?

সন্তানগর্ব্বে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া হাস্য করিতে করিতে চলিলেন।

কাট্।

কেদারবাবুর ফটকের সম্মুখ। রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সিঁড়ির উপর মিহির বিমর্ষভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে।

রঞ্জন: মিহিরবাবু! মঞ্জু কোথায়?

মিহির: (বিরস কণ্ঠে) তিনি মোটরে চড়ে চলে গেলেন। আমার জাপানী কবিতা শুনলেন না—

রঞ্জন: চলে গেলেন? কোথায় চলে গেলেন?

মিহির: তা জানি না। ঐ দিকে। আপনি শুনবেন কবিতা—

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না; লাফাইয়া গিয়া গাড়িতে চড়িল।

রঞ্জন: আর এক সময় হবে।

তাহার মোটর-বাইক তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড। মঞ্জুর মোটর কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। মঞ্জু চালকের আসনে বসিয়া; তাহার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির হইয়া আছে; ঠোঁট দুটি দৃঢ়বদ্ধ।

কাট্।

রঞ্জনের গাড়ী ঝাঝার সীমানা পার হইয়া গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডে আসিয়া পড়িল। গাড়ী উল্কার বেগে ছুটিয়াছে। একটা গ্রাম্য-কুকুর কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল, তারপর হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

কাট্।

বাড়ীর সম্মুখের বারান্দায় মিহির, কেদার ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছেন। কেদার বড়ই ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছেন।

কেদার: অ্যাঁ চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে?

মিহির: তা তো জানি না।—কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনবাবু এলেন, তিনিও খবর পেয়ে মঞ্জু দেবীর পিছনে মোটর বাইক ছোটালেন।

কেদার ও প্রতাপ উদ্বিগ্নভাবে মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন।

মিহির: মঞ্জু দেবী আপনার জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেছেন—

কেদার: (খিঁচাইয়া) এতক্ষণ তা বলনি কেন?—এস প্রতাপ।

দুজনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনাহূত মিহির আবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া গালে হাত দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখে সহসা প্রাণ-সঞ্চার হইল। ফটকের সম্মুখ দিয়া চারিটি তরুণী—ইন্দু মলিনা সলিলা মীরা—যাইতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিরীহ বাড়ীটার দিকে তীব্র কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

তাঁহারা অন্তর্হিত হইতে না হইতেই মিহির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতপদে সিঁড়ি নামিয়া তরুণীদের পশ্চাদ্বর্তী হইল।

কাট্।

ড্রয়িং রুমে কেদার মঞ্জুর পত্রপাঠ শেষ করিয়া বিহ্বল প্রতাপের পানে তাকাইলেন।

কেদার: কলকাতায় চলে গেছে!—কি করি প্রতাপ?

প্রতাপ আশ্বাস দিয়া কেদারের পৃষ্ঠে কয়েকটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন।

প্রতাপ: কিছু ভেবো না, আমার রঞ্জন তাকে ঠিক ফিরিয়ে আনবে।—বোসো—

উভয়ে একটি সোফায় বসিলেন; কেদারের মন কিন্তু নিরুদ্বেগ হইল না।

কেদার: ছেলেমানুষের কাণ্ড—কিছু বোঝে না—আমাদের মত মাথা ঠাণ্ডা তো নয়।—শেষে কি করতে কি করে বসবে—

প্রতাপ: আরে না না, কোনও ভয় নেই। আসল কথা, দু'টোতে দু'জনের প্রেমে পড়ে গেছে—ভীষণভাবে।

কেদার: হুঁ—দুটোই বেহায়া। সেই তো হয়েছে ভাবনা।—কি করা যায় এখন!

প্রতাপ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, বোধ করি মনে মনে রাজকন্যাকে পুত্রবধূ করিবার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। তারপর কেদারের উরুর উপর একটি চাপড় মারিলেন।

প্রতাপ: ঠিক হয়েছে! এক কাজ করি এসো—

কেদার সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন।

প্রতাপ: ও দুটোর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক!

কিছুক্ষণ পরস্পর তাকাইয়া রহিলেন। তারপর উভয়ে একটু হাসিলেন; হাসি ক্রমে প্রসারলাভ করিল। শেষে উভয়ে পরস্পর হাত ধরিয়া দীর্ঘকাল কর-কম্পন করিতে লাগিলেন।

কাট্।

মঞ্জুর গাড়ী চলিয়াছে।

মঞ্জুর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে; ঠোঁট কাঁপিতেছে; মুখের বাহ্য দৃঢ়তা আর রক্ষা হইতেছে না।

সহসা সে চলন্ত গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটিতে পাইল না; গাড়ী স্বেচ্ছানুযায়ী কিছু দূর গিয়া ক্রমে মন্দবেগ হইয়া অবশেষে থামিয়া গেল।

মঞ্জু অশ্রু-ধৌত মুখ তুলিয়া দেখিল গাড়ী নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে সেল্‌ফ্-স্টার্টার দিয়া গাড়ীর শরীরে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিনের স্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিল না।

ব্যর্থ হইয়া মঞ্জু গাড়ী হইতে নামিবার উপক্রম করিল।

কাট্।

রঞ্জনের মোটর-বাইক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে।

কাট্।

মঞ্জু একান্ত ম্রিয়মান মুখচ্ছবি লইয়া মোটরের ফুটবোর্ডে বসিয়া আছে। তাহার যেন আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

দূরে অস্পষ্ট ফট্-ফট্ শব্দ শোনা গেল; ক্রমে শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মঞ্জু প্রথমটা কান করে নাই; তারপর সচকিতে ঘাড় তুলিয়া সেইদিকে তাকাইল।

দূরে রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। শব্দ ও গাড়ী নিকটতর হইতে লাগিল। শেষে রঞ্জনের মোটর-বাইক মঞ্জুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল, মুখ গম্ভীর। কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে দু'জনের পানে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন : গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে ?

মঞ্জু উত্তর দিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িল।

রঞ্জনের অধরপ্রান্ত একটু নড়িয়া উঠিল।

রঞ্জন : আমি জানি কি হয়েছে—পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে—

মঞ্জু অধর দংশন করিয়া অধোমুখে রহিল।

রঞ্জন উঠিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মঞ্জু চোখ তুলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু : আবার কেন এলে ?

রঞ্জন গম্ভীরভাবে একটু হাসিল।

রঞ্জন : তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম।—তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার আবার ভাব হয়ে গেছে—ভীষণ ভাব।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া মঞ্জু আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু : কি—কি বললে ?

রঞ্জন আর গাম্ভীর্য্যের অভিনয় বজায় রাখিতে পারিল না; অন্তরের চাপা উল্লাস উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। সে দু'হাতে মঞ্জুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন : যা বললুম—দুজনে একেবারে হরিহর আত্মা! —চল, ফিরে যেতে যেতে সব বল্‌ব।

ডিজল্‌ভ্‌।

মঞ্জুর গাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। রঞ্জনের মোটর বাইক তাহার পিছনের সীটে উঁচু হইয়া আছে।

রঞ্জন গাড়ী চালাইতেছে। পাশে মঞ্জু। মঞ্জুর মাথাটি রঞ্জনের স্কন্ধের উপর আশ্রয় লইয়াছে; চক্ষুদুটি পরিতৃপ্তির আবেশে স্বপ্নাতুর।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপর মঞ্জুর নরম চুলের মধ্যে নিজের গাল রাখিয়া সস্নেহে একটু নাড়া দিল। মঞ্জু সুখাবিষ্ট চোখ তুলিল।

ফেড আউট্‌।

শেষ

যক্ষের মিনতি

শ্রীনীলরতন দাশ

ওগো আষাঢ়ের নব জলধর! বারেক থামো না ভাই,
তাপিত প্রাণের গোপন মিনতি তোমারে জানাতে চাই।
হেরি বাদলের বারিধারা আজি উদ্বেল মম হিয়া,
অন্তর-ভরা বিরহ বেদনা স্মরি' মোর প্রাণপ্রিয়া।
গৃহহারা আমি বঞ্চিত-প্রিয়া-চারু-মুখদরশন
বরষের তরে রামগিরি শিরে লভেছি নির্ব্বাসন।
যক্ষরাজার নাহি ক' বিচার, ক্রুদ্ধ সে নিরদয়;
একা মোর দোষে প্রেয়সীও শেষে কত না যাতনা সয়!
কোথায় অলকা কুবেরনগরী—কোথা রামগিরি আর—
দু'জনের মাঝে ব্যবধান আজি বিরহের পারাবার!
সহচরহারা বিরহবিধুরা চক্রবাকীর সম
অঝোরে অশ্রু ফেলিছে নীরবে হায় প্রিয়তমা মম!
আমার বারতা ল'য়ে যাও সখা, কুবেরের অলকায়—
কান্তা যেথায় যাপিছে জীবন বিচ্ছেদ-বেদনায়।
কহিও প্রিয়ারে রামগিরিশিরে কোন মতে তব স্বামী
বিরহের ব্যথা বহিয়া বক্ষে জাগিছে দিবসযামি।
শয়নে স্বপনে তোমারই মূর্ত্তি ধ্যান করি' প্রতিদিন
অন্তরে তার জাগে হাহাকার, শরীর শীর্ণ ক্ষীণ।
বান্ধবী! শুন, কাতরা হইয়া করিও না দেহপাত,
শাপ অবসানে দয়িতের সনে হ'বে পুনঃ সাক্ষাৎ।
শীতঋতুগতে নববসন্তে প্রকৃতি পুলক-ভরা,
বিরহঅন্তে মিলন তেমনি মধুর পাগল করা।
চারি মাস পরে কান্ত তোমারে লইবে বক্ষে তুলি'
শুভ মিলনের আশায় রহ গো বিরহবেদনা ভুলি'।
আমার বার্ত্তা জানায়ে প্রিয়ারে তাহার কুশল আনি'
বাঁচাও, দরদী বন্ধু আমার প্রবাসী পরাণখানি।
মহৎ বংশে জন্ম তোমার, পুষ্কর তব নাম—
হে মহান্ মেঘ! দয়া ক'রে মোর পুরাও মনস্কাম।
তৃষিত ধরণী কর সুশীতল ঢালি' তুমি শীতল বারি—
আমি কি পাব না তোমার করুণা, হে জলদ তৃষাহারী?
সুন্দর! আজ বন্ধুর কাজ কর তুমি দয়া ক'রে—
বিরহী যক্ষ মরে যে কাঁদিয়া বিরহিণী প্রিয়া তরে!

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের আলোচনামূলক প্রবন্ধরাজি অঞ্জনশলাকার মত নূতন নূতন তত্ত্ব ও বিতর্ক উন্মীলিত করিয়া ভারতবর্ষের পাঠক-মণ্ডলীকে ধন্য করিতেছে। আমরা বহুকাল এ জাতীয় অপূর্ব্ব আলোচনা মাসিকপত্রে দেখি নাই। তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধেই বাঙ্গালার তৎকালীন মহামনীষী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা অশেষশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার নব্যনৈয়ায়িকগণ সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি "অনুমান-দীধিতি"র বহুস্থলে "সার্ব্বভৌম" মত উদ্ধৃত করিয়া প্রায়শঃ খণ্ডন করিয়াছেন। অন্যূন ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত "পণ্ডিত" পত্রিকার পরিশিষ্টে কাশীর বিখ্যাত সরস্বতীভবনে রক্ষিত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম রচিত দুইটী গ্রন্থের নাম ছিল—সমাসবাদ ও চিন্তামণিব্যাখ্যা। (Supplement to the *Pandit*, Vols. VII-IX, p. 150 & 188) সমাসবাদ পরবর্ত্তী রামভদ্র সার্ব্বভৌম রচিত, বাসুদেব রচিত নহে, এ বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ নাই। ১৮৮৮ খৃঃ অধ্যক্ষ Venis সাহেব পুথির তালিকা গ্রন্থাকারে পৃথক্ মুদ্রিত করেন, তন্মধ্যে (পৃঃ ১৯৯) বাসুদেব সার্ব্বভৌম রচিত (১৮৫ সং পুথি) চিন্তামণিব্যাখ্যার নাম "সারাবলী" এবং পত্র সংখ্যা ১৯৯ লিখিত আছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কাশী সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অশেষ পরিশ্রমসহকারে এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু উপাদান সংগ্রহ করেন এবং বাসুদেব, তদ্‌ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি এবং পিতা মহেশ্বর রচিত গ্রন্থের আবিষ্কারমূলে বাঙ্গালায় নব্যন্যায়চর্চ্চার ইতিহাসে আলোকপাত করেন। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের ইংরাজি প্রবন্ধ বাঙ্গালায় বিশেষপ্রচার লাভ করে নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতেই বহু নূতন কথা অনেকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বাঙ্গালার নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় নব্যন্যায়চর্চ্চার বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণতির ফলে অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম রচিত নব্যন্যায় গ্রন্থের আলোচনার কোন সার্থকতা আছে, ইহা পরিগ্রহ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। আমরা এ বিষয়ে প্রবীণ শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের আগ্রহ দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি।[১] তাহার ফলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধের স্থানে স্থানে সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমে সংক্ষেপে তাহার কারণ বলিব।

১। "প্রত্যক্ষমণি মাহেশ্বরী" নামে একটী গ্রন্থ কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। শ্রীযুত কবিরাজ মহাশয় (Sarsswati Bhanana Studies, vol IV., pp. 61-69) এই মহেশ্বর বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ হইতে অভিন্ন হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ঐ কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—(ইহার নূতন সংখ্যা ন্যায় বৈশেষিক ৩০১) ইহা আদ্যন্তখণ্ডিত। প্রথম পত্র নাই; দ্বিতীয়পত্রের আরম্ভে আছে:—"* * * মণিনামধারণোপযোগিমণিসারূপ্যমাহ—যত ইতি। প্রসঙ্গাদিতি স্মৃতস্যোপেক্ষানর্হত্বাদিত্যর্থঃ। কেচিদিহোপোদ্ঘাতঃ সঙ্গতিঃ নিষ্ফলস্য উক্ত্যসম্ভবেন উক্তসিদ্ধার্থত্বাদেতচ্চিন্তায়া ইত্যাহুঃ।" ৩০৯ক পত্রে আছে—"বিশেষণোপলক্ষণ বিচারঃ সমাপ্তঃ। অতঃপরমা-সমাপ্তিমূলব্যাখ্যা।" ২৭৪খ পত্রে পাওয়া যায়, "ইদঞ্চালোককৃৎ যথা ইত্যত্র চ বক্ষ্যতি।" "আলোককৃৎ" এই শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থ যে পক্ষধরমিশ্রের আলোকের প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু গ্রন্থোপরি প্রথমতঃ "মাহেশী আলোকটীকা" এইরূপ পরিচয়লিপি ছিল, তাহা কাটিয়া (মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কর্ত্তৃক) "প্রত্যক্ষমণি মাহেশ্বরী" পরে লিখিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সরস্বতী-ভবনে 'মহেশ ঠক্কুর রচিত "আলোকদর্পণে"র (প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তহীন) দুইটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (ন্যায়-বৈশেষিক, ৩৫০ এবং ৩৫১ সং পুথি)—উভয় স্থলেই পূর্ব্বোদ্ধৃত ২য় পত্রের বাক্য অবিকল পাওয়া যায় (৩৫০ সং গ্রন্থের ৩ক পত্রের ২-৩ পঙ্‌ক্তি এবং ৩৫১ সং গ্রন্থের ৭ক পত্রের ৭-৮ পঙ্‌ক্তি)। "আলোকদর্পণে"র প্রারম্ভে দেখা যায়—

> শঙ্করং জগদম্বিকয়োরঙ্কে পঙ্কেন খেলন্তং।
> লম্বোদরমবলম্বে যং বেদ ন তত্ত্বতো বেদঃ॥
> গৌর্য্যা গিরীশাদিব কার্ত্তিকেয়ো বোধীরয়া চন্দ্রপতেরলব্ধি।
> আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ॥

অত্র শ্লোকানাং ব্যাখ্যা টীকাকৃতা সুকরত্বাদুপেক্ষিতা সা ত্বিয়ং—প্রারিপ্সিত ...(৩৫১ সং পুথি)।

অপর পুথিতে (৩৫০) শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণ, বিরিঞ্চি, শিব এবং

১। কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শাস্ত্রী এবং সরস্বতীভবন পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের নিকট পুথি দেখার অনুমতি এবং সুযোগ দানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সরস্বতীর নমস্কারস্বরূপ অতিরিক্ত ৪টী শ্লোক পাওয়া যায়। এই মহেশের অন্যতর ভ্রাতা ভগীরথ ঠক্কুর, নামান্তর মেঘ ঠক্কুর, পক্ষধরমিশ্রের ছাত্র ছিলেন। মহেশ তাঁহার গ্রন্থের কতিপয় স্থলে প্রগলভের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীপ্রগলভস্তু উভয়বাদিসিদ্ধং প্রামাণ্যগ্রাহকত্বং যত্তান্তভিন্না যাবতী জ্ঞানগ্রাহিকা সামগ্রী তদগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বমিত্যাহ।"

(৩০১ সং পুথির ৪২খ পত্র, ৩৫১ সং পুথির ৪৩-৪৪ পত্র)

২। সরস্বতী ভবনে "বিদ্যাবাচস্পতি" রচিত চিন্তামণি টীকার (শব্দ খণ্ডের) এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থকারকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর (?) বিদ্যাবাচস্পতির সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন। এই আদ্যন্তহীন গ্রন্থ ও (ন্যায়বৈশেষিক ২৮১ সং পুথি) আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথম পত্র না থাকায় গ্রন্থকারের নাম কিম্বা উপাধি গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও পাওয়া গেল না। নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপির পার্শ্বে পরিচয়সূচক "বি· বা·", "বিদ্যা·", "বি· শা" এবং "বিদ্যাবা·" লিখিত আছে। এই গ্রন্থ ও পক্ষধর মিশ্রের আলোকের (শব্দ খণ্ডের) উপর টীকা বটে। ২য় পত্রের প্রারম্ভাংশ আমরা "গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ" রচিত "শব্দালোকবিবেক" গ্রন্থের একটি অন্তহীন (৩৬৬ সং) প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি—অবিকল একই গ্রন্থ। বিলুপ্তপ্রায় এই বিখ্যাত বাঙ্গালী গ্রন্থকারের পরিচয় শ্লোক নাগরাক্ষরে লিখিত। শেষোক্ত প্রতিলিপি হইতে আমরা উদ্ধৃত করিলাম :

নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবোভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্ব্যূহায় বিষ্ণবে॥
মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যা-সুধাক্ষালিত চেতসা।
গুণানন্দেন কৃতিনা শব্দালোকো বিবিচ্যতে॥

সুতরাং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা ও ভ্রাতা নব্যন্যায়ের গ্রন্থকার ছিলেন এবিষয়ে প্রমাণ এখনও পাওয়া গেল না। (৩) সরস্বতী-ভবনের "সারাবলী" গ্রন্থের প্রতিলিপিও নাগরাক্ষরে লিখিত এবং আদ্যন্তহীন —প্রথম ৩ পত্র নাই এবং শেষেও কতিপয় পত্র নাই। অনুমানখণ্ডের অনুমিতি হইতে বাধগ্রন্থের কিয়দংশ পর্য্যন্ত চিন্তামণির টীকা ইহাতে পাওয়া যায় এবং রঘুনাথ শিরোমণির "অনুমানদীধিতি" অপেক্ষা এই গ্রন্থ আকারে বৃহৎ বলিয়া বোধ হইল। ব্যাপ্তিবাদের টীকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থ মধ্যেও (ন্যায়বৈশেষিক ২৮০ সং পুথি) গ্রন্থকারের নাম কিম্বা গ্রন্থের নাম আমরা কোথায়ও খুজিয়া পাই নাই—কেবল পার্শ্বে "চি· সা·", "সার্ব্ব·" এবং "সার্ব্ব· টী·" লিখিত আছে। প্রতিলিপির উপরে গ্রন্থের নাম "সারাবলী" লিখিত রহিয়াছে—ইহাও বিন্ধ্যেশ্বরী-প্রসাদের কল্পিত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই গ্রন্থ যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমরচিত, তাহা সম্পূর্ণ বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে যে সামান্য আলোচনা করিয়াছি, তদ্দারা এই গ্রন্থই যে "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি খণ্ডন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তিনটি প্রমাণ লিখিত হইল :—

(ক) ব্যাপ্তিপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণে দীধিতিকার "সাধ্যবদ্ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ…" বলিয়া ৭মী তৎপুরুষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দীধিতিপ্রসারিণী"কার কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম ঐস্থলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন (৪০ পৃঃ) "সাধ্যাভাবপদবৈয়র্থ্যমিতি সার্ব্বভৌমদূষণমদ্ধর্তু মাহ—সাধ্যবদ্ভিন্নে য ইতি।" তৃতীয়লক্ষণের অবতারণাকালে বস্তুতঃই সরস্বতী-ভবনের উল্লিখিত গ্রন্থে এইরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছে :—

"সাধ্যাভাবপদস্য বৈয়র্থ্যমাশঙ্ক্যাহ সাধ্যবদিতি" (১২ক পত্র)

(খ) "সিংহব্যাঘ্রীর দীধিতি"গ্রন্থে "কেচিত্তু" বলিয়া যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা "সার্ব্বভৌমমত" বলিয়াই টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বতন গ্রন্থের বচন অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া "সপরিষ্কার" কিম্বা "বহুধা পরিস্কুর্ব্বন্" এতই পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত করেন যে চিনিয়া লওয়া প্রায় অসাধ্য। বর্ত্তমান স্থলে দীধিতির সন্দর্ভ এই :

"কেচিত্তু, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যং হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণে তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবদ্বৃত্তিত্বাভাবস্তদধিরণভিন্নত্বমর্থঃ তেন…ইত্যাহুঃ।"

সরস্বতী-ভবনগ্রন্থের ("সারাবলী"র) সন্দর্ভ এই : (১২খ পত্র)

"সাধ্যাসামানাধিকরণ্যং সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাব স্তদনধিকরণত্ব-মিত্যর্থঃ।"

দীধিতিকার এখানে সার্ব্বভৌমের ক্ষুদ্র উক্তি আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া বিস্তারপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন অজ্ঞাতপূর্ব্ব দীধিতি টীকাকারের গ্রন্থে এই পরিবর্ত্তন ও তাহার সার্থকতা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। সরস্বতী-ভবনেই রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার রচিত "অনুমান দীধিতিপ্রতিবিম্ব" নামক গ্রন্থের এক খণ্ডিত প্রতিলিপি (ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণ পর্য্যন্ত) অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের হস্তগত হয়। তন্মধ্যে সিংহব্যাঘ্রীর উক্ত স্থলের টীকায় লিখিত হইয়াছে :—

"নমু সাধ্য-সামানাধিকরণ্যাভাবস্তদধিকরণত্বমিত্যেবং সার্ব্বভৌমোক্তং কিমিত্যুপেক্ষিতমিত্যত আহ তেনেতি।" (৫৬ খ)

সরস্বতী-ভবনের তথাকথিত "সারাবলী" গ্রন্থ যে বস্তুতঃই সার্ব্বভৌম রচিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

(গ) ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণে দীধিতিকার সার্ব্বভৌমের 'কূট'-ঘটিত এক ব্যাপ্তিলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"অন্যে তু বৃত্তিমদবৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাব সমুদায়াধিকরণ বৃত্তি-ত্বাভাবাস্তত্ত্বং…ইত্যাহুঃ, তন্ন" ইত্যাদি। এই লক্ষণ ও প্রায় অবিকল ঐ গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে—

"মৈবং, সাধ্যাভাবকূটাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবা বৃত্তিমদবৃত্তয়ো যাবন্ত স্তাবদাশ্রয়ত্বং ব্যাপ্তিরিতি বিবক্ষণাৎ।" (১৪ ক পত্র)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই গ্রন্থে পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদের মত বহুস্থলে

উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় তাহার সূচি প্রকাশ করিয়াছেন। যজ্ঞপতির বচন ১২ বার উদ্ধৃত এবং খণ্ডিত হইয়াছে। ৫৩ক পত্রে "নরসিংহ" নামক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক নব্যনৈয়ায়িকের বচন লিখিত হইয়াছে। ১৫৪ক এবং ১৬৮ক পত্রে যথাক্রমে "প্রত্যক্ষমণি পরীক্ষা" এবং "শব্দমণি পরীক্ষা" গ্রন্থের দোহাই আছে—সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থেরই পৃথক্ অংশ। এতদনুসারে বর্ত্তমান গ্রন্থের নাম "অনুমানমণিপরীক্ষা" বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, "সারাবলী" নহে। তাঁহার নিজ অধ্যাপকের মত দুইস্থলে উদ্ধৃত আছে; যথা,—

অত্রাস্মদগুরুচরণাঃ—সাধ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারেণ প্রকৃত সাধ্যব্যাপ্ত্য-বগাহি-পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষতোপরক্ত-পক্ষধর্ম্মতাবগাহি-জ্ঞানজন্যোঽসাক্ষাৎ কার্য্যশাব্দোঽনুমিতিরিত্যর্থঃ। ইত্থমপি তু…ইত্যাহুঃ। (৮-৯ পত্র, অনুমিতিপ্রকরণ)

অত্রাস্মদ্‌গুরুচরণাঃ—ধূমাদিহেতৌ অঞ্জনবত্ত্বাদ্যুপাধিতানিরাসায় ব্যভি-চারোন্নয়নসমর্থত্বে সতীতি বিশেষণীয়ং, ন চৈবং সাধনা-ব্যাপকপদবৈয়র্থ্যং …ইত্যাহুঃ। (৯৮ খ, উপাধিবাদ)

কিন্তু বাসুদেবের এই গুরু কে ছিলেন, এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। পক্ষধরমিশ্রের অনুমানালোকের অনুমিতিপ্রকরণে উদ্ধৃত বচন আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং বাসুদেব পক্ষধরমিশ্রের ছাত্র ছিলেন, এই প্রবাদ প্রমাণসিদ্ধ নহে। তবে এ বিষয়ে আরও বিচারালোচনা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন 'কেচিত্তু,' 'উত্তানাস্তু,' 'কশ্চি-দ্বিপশ্চিন্মন্যো' প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সমসাময়িক এবং পূর্ব্বতন কত নব্য নৈয়ায়িকের মত যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই। বাসুদেবের পূর্ব্বগামী নৈয়ায়িকদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রকরণের একস্থলে বাসুদেব লিখিয়াছেন :—

"উত্তানাস্তু সাধ্যাভাববতি যদ্বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ তন্ন…" (১৪ক পত্র)

রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থেও এই মত অবিকল উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে এবং একমাত্র মথুরানাথ ব্যতীত দীধিতির সমস্ত টীকাকারগণ (কৃষ্ণদাস হইতে গদাধর পর্য্যন্ত) ইহা প্রগলভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রগলভ বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণাবলি আমার পৃথক্ এক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। মথুরানাথ অনুমান দীধিতির টীকায় উদ্ধৃত মতটীকে বিশারদ মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিশারদলক্ষণমুপন্যস্য দূষয়তি ষদ্বিত্যাদিনা" (২) কিন্তু বিশারদ বলিতে তৎকালে একমাত্র সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদকেই বুঝাইত। সার্ব্বভৌম কখনও "উত্তানাস্তু" বলিয়া পিতৃমতের উপর কটাক্ষ করিতে পারেন না। মথুরানাথের উক্তি অগ্রাহ্য হইলেও ইহাতে "বিশারদ" নামক শিরোমণির পূর্ব্বগামী একজন বাঙ্গালী নব্য-নৈয়ায়িকের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় বলিয়া আমাদের ধারণা এবং তিনি আপাততঃ বাসুদেব-পিতা হইতে অভিন্ন ধরা যাইতে পারে।

বিশারদ ভট্টাচার্য্য

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বাসুদেবের পিতার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল। কাশীর সরস্বতী ভবনে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র (জলেশ্বর)"বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্য" বিরচিত "শব্দালোকোদ্যোত" গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি আছে (ন্যায়বৈশেষিক ৩৫৮ সং পুথি, পত্র সংখ্যা ৫২, লিপিকাল ১৬৪২ সম্বৎ)। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালী এক মহানৈয়ায়িকের লুপ্তকীর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাসুদেবের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে কোন দেবতার নমস্কার না করিয়া নিজ পিতৃদেব সার্ব্বভৌমের বন্দনা করিয়া অপূর্ব্ব দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। যথা,—

> নৈগমে বচসি নৈপুণং বিদঃ
> সার্ব্বভৌমপদ সাভিধং মহঃ।
> জীর্ণ তর্কতমু জীবনৌষধং
> জৈমিনের্জয়তি জঙ্গমং যশঃ ॥১
> কংসরিপোরবতারে
> বংশে বৈশারদে জাতং।
> উত্তংসং খলু পুংসা (?)
> তং বন্দে সার্ব্বভৌমাখ্যং ॥২

এই শ্লোকে বিশারদ-সার্ব্বভৌমের পিতাপুত্র সম্বন্ধ পরিস্ফুট না হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। কারণ উক্ত জলেশ্বর বাহিনী-পতির পুত্র মহাপণ্ডিত স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য শেষে আত্ম-পরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন :—

> গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতাদভূদ্ভূমণেঃ
> সর্ব্বোর্ব্বীপতি-সার্ব্বভৌম-পদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
> তস্মাদাস জলেশ্বরো বুধবরো সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাং
> স্বপ্নেশেন কৃতং তদঙ্গজনুষা সদ্ভক্তি মীমাংসনম্ ॥
>
> (শাণ্ডিল্যসূত্র, মহেশ পালের সং, পৃ ১০৯)

এই শ্লোকেও "ভূমণি" বিশারদের সমগ্র গৌড়দেশে প্রতিষ্ঠার কথা

---

(২) অনুমান দীধিতির মাথুরী টীকা দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (১০৩৮ সং সংস্কৃত পুথি, ব্যাপ্তিবাদ, ৪৩ক পত্র দ্রষ্টব্য)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়ও একটী প্রতিলিপি আছে (২০৯৮ সং পুথি, ৬৮ খ পত্র)। আমরা উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

খ্যাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস এবং পৌত্র রুদ্রন্যায়বাচস্পতিও স্ব স্ব গ্রন্থে বিশারদ হইতেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই বিশারদের প্রকৃত নাম মাত্র দুই স্থলে লিপিবদ্ধ আছে—চৈতন্য ভাগবতে মহেশ্বর বিশারদ এবং সার্ব্বভৌমের স্বরচিত অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় নরহরি বিশারদ। শেষোক্ত শ্লোক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শ্রীবন্দ্যান্বয়কৈরবামৃতরুচো বেদান্ত বিদ্যাময়াৎ
ভট্টাচার্য্যবিশারদান্নরহরের্ব্ব (?) প্রাপ ভাগীরথী। ইত্যাদি

এস্থলে সার্ব্বভৌম পিতামাতার নামদ্বয়ই (নরহরি বিশারদ এবং ভাগীরথী) কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ও পরে তাঁহার "ন্যায় পরিচয়" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এইমতই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য "নদীয়া কাহিনী" নামক গ্রন্থের এক পাদটীকায় নরহরি বিশারদকে সার্ব্বভৌমের পিতামহ বলা হইয়াছে (পৃ ১৫৭, ২য় সং), যদিও মূল গ্রন্থমধ্যে (পৃঃ ১১০) এইরূপ উক্তি নাই। পরে, 'ভারতবর্ষের' জনৈক লেখক (১৩৩৬ বাং, আশ্বিন সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৭-৮) তাহাই বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা নবদ্বীপ অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, নদীয়া কাহিনীর এই উক্তি কল্পনাপ্রসূত। আমরা পরে দেখিব, কোন কুলপঞ্জিকা দ্বারাই ইহা সমর্থিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থকার ও প্রবন্ধলেখকগণ নির্ব্বিবাদে এইরূপ কল্পিত বস্তু মুদ্রিত করিয়া সত্যনির্ধারণে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

সার্ব্বভৌমের বচনানুসারে তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদ বেদান্তজ্ঞ ছিলেন এবং মথুরানাথের উক্তি হইতে তাঁহার নৈয়ায়িকত্বও সপ্রমাণ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বিশারদ নামে একজন বিখ্যাত স্মৃতিনিবন্ধকার বঙ্গের সুলতান বারবকসাহের রাজত্বকালে ১৩৯৭ শকাব্দের পরে গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) তিনিও অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ নবদ্বীপের প্রবাদ অনুসারে সার্ব্বভৌমের পিতা স্মার্ত্ত ছিলেন। (নবদ্বীপ মহিমা, ১ম সং, পৃঃ ৩৪ ; ২য় সং, ১৫৭ পৃঃ)। সার্ব্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী ছিলেন। (চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য-ষষ্ঠ এবং কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ষষ্ঠাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। শচীদেবীর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপের (১৪৭৫ খৃঃ) জন্মের পূর্ব্বে সাত আটটি কন্যা সন্তান নষ্ট হয়। সুতরাং নীলাম্বরের জন্ম-তারিখ অনুমান ১৪১৫-২০ খৃঃ মধ্যে পড়িবে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জন্মতারিখ অনুমান ১৪৪৫-৫০ খৃঃ ধরা যায়।

সার্ব্বভৌমের চিন্তামণিব্যাখ্যা নবদ্বীপ অবস্থান কালে রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের রচনাকাল অনুমান করিতে হইলে সার্ব্বভৌমের উড়িষ্যাযাত্রার আনুমানিক কাল নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। ১৫০৯ খৃঃ সার্ব্বভৌমের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ, তৎকালে সার্ব্বভৌম উড়িষ্যায় পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং ১৫০০ খৃঃ পূর্ব্বেই তিনি উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি উৎকল গমন করেন, কিন্তু তৎকালে প্রতাপরুদ্র রাজা নহেন ; সুতরাং জয়ানন্দের উক্তি সর্ব্বাংশে গ্রহণীয় নহে। ১৪৮০-৯০ খৃঃ মধ্যে তাঁহার নব্যন্যায়ের টীকা রচিত হইয়া থাকিবে।

যাহারা নবদ্বীপের নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও উড়িষ্যার বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, জলেশ্বর বাহিনী-পতির নব্যন্যায় গ্রন্থের আবিষ্কারে তাহাদের মত নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হইতেছে। জলেশ্বরের প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসা শাস্ত্রে প্রবীণতা স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত তাঁহার প্রসিদ্ধ শ্লোকে ও তিনি ষড়্দর্শনবিদ্ বলিয়াই নিজেকে খ্যাপন করিয়াছেন :

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং, পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী, শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণি যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং, কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী
ধারা কা চন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্ত মাকর্ষতি ॥

(৯৯ শ্লোক)

জলেশ্বরের "শব্দালোকোদ্যোত" গ্রন্থে একাধিক স্থলে "পিতৃচরণাস্তু" এবং "অস্মাকং পৈতৃকঃ পন্থাঃ" বলিয়া সার্ব্বভৌমের নব্যন্যায়শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জলেশ্বর যে উড়িষ্যাবাসী ছিলেন, "মহাপাত্র" উপাধি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

উড়িষ্যার রাজসভায় অবস্থানকালে সার্ব্বভৌম "অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক চূড়ান্তভাবে অদ্বৈতবাদের নির্দ্দেশক।

দেবো নিদ্রাজ্ঞানবশেন সাক্ষী জীবো মনঃ স্পন্দিতমীশ্বরশ্চ।
জগন্তি জীবানপি বীক্ষতে যঃ স্বস্থঃ স্বয়ং জ্যোতিরহং স একঃ ॥

সুতরাং এই গ্রন্থরচনাকালে তিনি চৈতন্য মত অবলম্বন করেন নাই। গ্রন্থশেষে সার্ব্বভৌম স্বকীয় পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করিয়াছেন :

কর্ণাটেশ্বর-কৃষ্ণরায়-নৃপতে-র্গর্ব্বাগ্নিনির্ব্বাপকো
যত্র ক্ষুদ্রভরোহ ভবৎ গজপতিঃ শ্রীরুদ্রভূমীপতিঃ।
তস্য ব্রহ্মবিচারচারুমনসঃ শ্রীকূর্ম্মবিদ্যাধর
স্থানন্দো মকরন্দশুদ্ধিবিধিনা সান্দ্রো ময়া মন্ত্রিতঃ ॥

কর্ণাটরাজ কৃষ্ণরায় ১৫১০ খৃঃ সিংহাসনারোহণ করেন। ১৫১২ খৃঃ তাঁহার উৎকল অভিযান আরম্ভ হয়। সুতরাং এই গ্রন্থ ১৫১১ খৃঃ এর পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। চৈতন্যচরিতকারদের মতে ১৫০৯ খৃঃ চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে প্রথম দর্শন কালেই স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

(৩) অস্মল্লিখিত "হরিদাস তর্কাচার্য্য" প্রবন্ধ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭।

কিন্তু তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ঐ সময়ের পরে "অদ্বৈত মকরন্দে"র টীকা করিয়া অদ্বৈতমত সমর্থন করিতে পারেন না।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ১৫৩২ খৃঃ সার্ব্বভৌম পুরীত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে শেষলীলার সূত্রবর্ণনায় পাওয়া যায় ;—

"পথে সার্ব্বভৌম সহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিরাজ গোস্বামী যথাস্থানে ইহা বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের শেষ অঙ্কে বারাণসীগামী সার্ব্বভৌমের উক্তি পাওয়া যায় :—"হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি"। তিনি শেষজীবন কাশীতেই যাপন করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডের টীকাকার রামানন্দবন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি এক "বাসুদেব" নামক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাক্যাগ্রহে টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রথম শ্লোকের গণেশবন্দনার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—"অত এ বেদানীমপি গণেশস্যাগ্রে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যা দক্ষিণাত্যাশ্চ স্বকর্ণৌ ধৃত্বা শিরোধুননং শিরঃ কুটনঞ্চ কুর্ব্বন্তীতি"। উক্ত বাসুদেব এবং সার্ব্বভৌম উভয়ই আমাদের আলোচ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।[৪] সার্ব্বভৌম খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও প্রায় নবতিবর্ষ বয়সে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনুমান করা চলে।

সার্ব্বভৌম পুত্র জলেশ্বর একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শব্দালোকোদ্যোতের ২৮১ পত্রে লিখিত আছে—

অধিকং শংধিকরণে (?) প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।

ইহা মীমাংসাশাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থ হইতে পারে। শেষপত্রে আছে :—"এবং প্রত্যয়ং বিনাপীত্যাদি ছন্দ (? শব্দ)-প্রকাশটিপ্পন্যাং প্রপঞ্চিতং তত্রৈবানুসন্ধেয়ম্।" এই "শব্দপ্রকাশ" গ্রন্থ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, নব্যন্যায়ের শব্দখণ্ডের ন্যায় কোন গ্রন্থ হইবে সন্দেহ নাই।

জলেশ্বর-পুত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য ষড়দর্শনবিৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন। শাণ্ডিল্য সূত্রভাষ্যের একস্থলে আছে :—

"প্রমাণ বিচারো, স্মৃতি ন্যায়তত্ত্বনিকষে বেদান্ততত্ত্বনিকষে চ নিরূপিত ইতি নেহ প্রতন্যতে।" (পৃঃ ১০৬-৭, মহেশ পালের সং)। এতদ্ভিন্ন, তিনি বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীর উপর "প্রভা" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। Hall : contributious p. 6) কিন্তু ভক্তিসূত্রের ভাষ্যকাররূপেই তিনি চিরজীবী হইয়াছেন। ভক্তিসূত্রের অন্য টীকাকার মৈথিল ভবদেব মিশ্র স্বপ্নেশ্বরের মত শ্রদ্ধাসহকারে পদে পদে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে জলেশ্বর কিম্বা স্বপ্নেশ্বর চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন না, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে ও এইরূপ প্রতিপন্ন হয় এবং চৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবর্ণনায়ও সার্ব্বভৌম ভিন্ন তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির অধস্তন কোন বংশধরের নাম পাওয়া যায় না।

বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের চিরপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে রঘুনাথ শিরোমণি—সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। যদিও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অনেক প্রবাদই অমূলক প্রতিপন্ন হইতেছে—তথাপি বিরুদ্ধ প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সনাতন গোস্বামী এবং সম্ভবতঃ জলেশ্বর বাহিনীপতি ও তাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সার্ব্বভৌমের অন্য কোন ছাত্রের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রঘুনন্দনের ও পরবর্ত্তী ছিলেন, এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে।

পরন্তু প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া যুক্তি ও প্রমাণপক্ষপাতী বহু ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধকার পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপূর, জয়ানন্দ, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির প্রামাণিক উক্তি উপেক্ষা করিয়া যাহারা এখনও অদ্বৈতপ্রকাশের অমূলক উক্তিই আকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, তাহাদের চিত্তবৃত্তির স্বরূপবর্ণনায় অগ্রসর হইলে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। আমরা এ বিষয়ে আর একটি নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পুথি সংগ্রহে চৈতন্যচরিত বিষয়ক একটি নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে :—ব্রজমোহন দাস রচিত চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ[৫] (গ্রন্থসংখ্যা ১৬৭৩, পত্রসংখ্যা ৫০, লেখক কৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মা, লিপিকাল ১৬২৫ শক ১৩ ফাল্গুন)। এই গ্রন্থে কতিপয় অজ্ঞাত-বৈষ্ণবগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; যথা, চৈতন্যতত্ত্বামৃত, ভক্তিভাবপ্রদীপ, জয়কৃষ্ণ দাস ঠাকুর রচিত বিচার-সুধার্ণব, নরহরি দাস রচিত চৈতন্যসহস্র-কৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশ, নারায়ণতত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি। বৃন্দাবনদাস ও মুরারির চরিতগ্রন্থ ইহার উপাদান এবং গ্রন্থমধ্যে একস্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের (১৩ ক পত্রে) এবং "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী"র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুমান হয় জীবগোস্বামীর জীবদ্দশায় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থে চৈতন্যের অবতারতত্ত্ব, বিভিন্ন জন্ম পাট নির্ণয়, শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর লীলা সূত্র বর্ণিত হইয়াছে—সর্ব্বত্র কিছু নূতন কথা পাওয়া যাইবে। মহাপ্রভুর বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এই গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল।
অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল॥

৪। অস্মল্লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধ I. H. Q., XOI., pp. 66-7 দ্রষ্টব্য।

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথিশালার অধ্যক্ষ—সুযোগ্য শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'ভক্তিভাবপ্রদীপ' নামক একটি আন্তহীন বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রতিলিপিও (৪৪৯৯ সং পুথি) দ্রষ্টব্য।

পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য।
অষ্টাদশ বিদ্যা এতে প্রভু হৈলা দক্ষ॥

(৪৫ খ পত্র)

এই গ্রন্থে সার্ব্বভৌমের একটি অভিনব শ্লোক ও উদ্ধৃত হইয়াছে :
"শুন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বচন। তথাহি—

অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে,
ন ভবতি বিমলাধী র্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ।
উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টি (:)
প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শঙ্কা তমিস্রে॥"

(৪০ ক পত্র)

কুলপরিচয় ও বংশাবলী

সার্ব্বভৌম অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় "শ্রীবন্দ্যান্বয়" বলিয়া কুলপরিচয় দিয়াছেন। নদীয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে "বন্দ্য আখণ্ডল" বংশীয় বহু পরিবার বিদ্যমান আছে—অনেকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশধর বলিয়া পরিচয়ও দিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই বাসুদেব হইতে বিশ্বাসযোগ্য নামমালা দেখাইতে পারেন না। বাসুদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, আড়বান্দির বিখ্যাত (বন্দ্যোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য্য পরিবার বাসুদেব বংশসম্ভূত। ৬ আমরা এই প্রসিদ্ধ বংশের প্রাচীন দলীল পত্র আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—ইহারা নবদ্বীপরাজ রাঘব রায়ের দানভাজন মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দন্যায়বাগীশ হইতে নাম গণনা করেন। কিন্তু বাসুদেব হইতে গোবিন্দ পর্য্যন্ত নাম পরম্পরা তাঁহাদের অজ্ঞাত। আখণ্ডলবংশে বহুকাল যাবৎ কুলাভাব ঘটিয়াছে এবং সম্বন্ধনির্ণয়-ধৃত মুলো পঞ্চাননের এক কারিকানুসারে অনেক অজ্ঞাত কুল বংশ "আখণ্ডল" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

বাসে যথাযথ কুলে, কাঁটা খনে বলে।
আমাটে, কলিকাতা, বন্দ্যোরো আখণ্ডলে॥

(সম্বন্ধ নির্ণয়—বংশাবলী, ১২৬ পৃঃ)

এইভাবে বাসুদেবের কোন অধস্তন বংশধরের বিশ্বাসযোগ্য কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩০৫ সনে আখণ্ডল বংশের সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ধারা মুদ্রিত করিয়া এক অভিনব বস্তু প্রকাশ করেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণকাণ্ড) প্রথম ভাগ, প্রথমাংশ ১ম সং, পৃঃ ২৯৫-৬)। যে একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিয়া ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা রাণাঘাট নিবাসী ৺ সাতকড়ি ঘটকসংগৃহীত কুল পঞ্জিকা (ঐ, ২৩৬ পৃ পাদটীকা)। অদ্য ৪০ বৎসর যাবত্ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ নির্ব্বিচারে এই বংশাবলী ও শ্লোকসমূহের প্রামাণ্য মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রিত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত ৪০ বৎসরের সংস্কার এখন দূর করা অতিদুরূহ ব্যাপার। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬০-৬২) প্রামাণিক কুলপঞ্জিকার সহিত উক্ত বংশাবলীর অংশবিশেষের (নলডাঙ্গা শাখার) মারাত্মক বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কুলশাস্ত্র ও তাহার প্রামাণ্যবিষয়ে শিক্ষিত সমাজে যেরূপ বিরাট অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বিরাজমান, তাহাতে কৃত্রিম অকৃত্রিম ভেদ নির্ণয়পূর্ব্বক সত্যনির্ধারণ প্রায় অসাধ্য হইয়াছে এবং যাহা কিছু সর্ব্বাগ্রে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তাহারই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ কুলপঞ্জিকানুসারে আখণ্ডল বংশের বংশলতার প্রয়োজনীয় অংশ এই :—
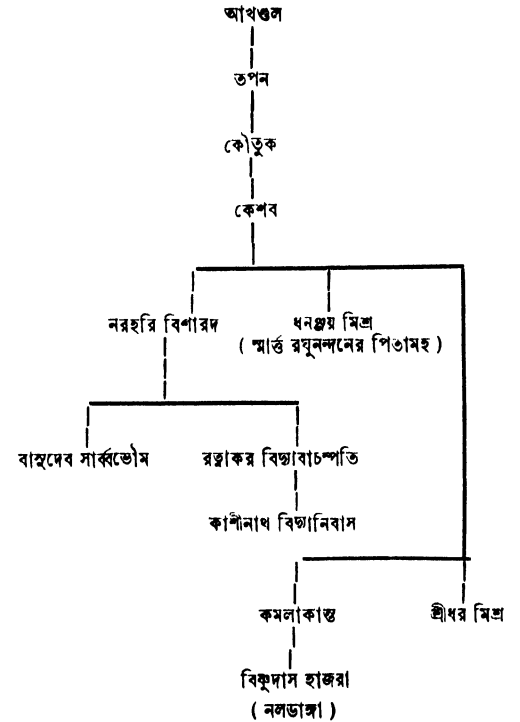
এই বংশে কুলাভাব ঘটিলেও নলডাঙ্গারাজ শাখার গৌরবে ঘটকগণ ইহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর পর মহেশ মিশ্রের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা রাঢ়ীয় কুলীনগণের একমাত্র প্রামাণিক কুলগ্রন্থ। এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রাঢ়-বঙ্গের সর্ব্বত্র ঘটকসমাজে প্রচারিত ছিল। আমরা এযাবৎ বিভিন্নস্থানে ইহার ৭ খানা প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও নবদ্বীপ লাইব্রেরীর পুথিতে আখণ্ডল বংশ নাই। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুথিতে নলডাঙ্গা শাখা মাত্র লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত ৪ খানা পুথিতে নলডাঙ্গার সহিত বিশারদ শাখার ও বর্ণনা আছে—পরম্পর অনৈক্যসত্ত্বেও বংশলতা বিশুদ্ধভাবে যতদূর নির্ণয় করা গিয়াছে নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

৬। নবদ্বীপ-মহিমা (১ম সং, পৃঃ ৩৪), নদীয়া-কাহিনী (২য় সং, পৃঃ ৩৩২)

৪ খানা পুথিতে তপনের পুত্র "শিব-ব্যাস-বামনকাঃ" লিখিত আছে। একখানি মাত্র পুথিতে আছে, তপনের পুত্র "দামো-নিলো-পভোকাঃ"—সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতেও শেষোক্ত নাম রহিয়াছে। ইহাই প্রমাণসিদ্ধ ; কারণ, পভোক অর্থাৎ প্রভাকরের কুলক্রিয়ার বর্ণনা আছে "পভোকস্থার্ত্তি চং ধর্ম্ম উচিত মুং বশিষ্ঠ"। ধ্রুবানন্দের মহাবংশের ৩১শ সমীকরণকারিকায় (৩৪ পৃঃ) মুখবংশীয়বশিষ্ঠের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় "বন্দ্যপ্রভাকরে"র নাম আছে। যে সকল পুথিতে পভোকের নাম বাদ পড়িয়াছে তাহাতে বামনের পুত্র "সতানন্দ রত্নাকরৌ" লেখা আছে। একক পুথিখানিতে নারায়ণের পুত্র "রতোসাবোকৌ" রহিয়াছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এই শেষোক্ত পুথিতেই জলেশ্বর এবং চন্দনেশ্বর ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী নামগুলি পাওয়া যায়—অন্য ৩টি পুথিতে একমাত্র জলেশ্বরের নাম উল্লেখপূর্ব্বক বংশলতা সমাপ্ত হইয়াছে। চন্দনেশ্বর ও বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নেশ্বরের নাম থাকায় এই তালিকার প্রামাণ্য নিঃসন্দিগ্ধ। কুলক্রিয়ার অংশ পুথিখানা হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল : "নারায়ণস্থার্ত্তি চং চকো ক্ষেম্য চং বিশো অত্রহানিঃ তৎসুতৌ রতোসাবোকৌ। রতো অকৃতী তৎসুতাঃ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তি বিশারদ ভট্টাচার্য্য শ্রীকান্তাঃ। বিশারদস্থার্ত্তি গাং শ্রীকান্ত উচিত মুং হিরণ্য ক্ষেম্য চং গোপীনাথ আচার্য্যঃ। তৎসুতাঃ সার্ব্বভৌম-বিদ্যাবাচস্পতি রঘুপতিভট্টাচার্য্য বিদ্যা-নিবেশকাঃ (?)। সার্ব্বভৌমস্থ ক্ষেম্য মুং রাঘব চক্রবর্ত্তী চং পরমানন্দ চং মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যঃ তৎসুতৌ জলেশ্বর-চন্দনেশ্বরৌ, জলেশ্বরস্থ বাহিনীপতিখ্যাতি লভ্য চং কৃষ্ণানন্দ আর্ত্তি গাং দ্বৌ তৎসুতাঃ সপনেশ্বর-নীলকণ্ঠ-পোপীনাথাঃ..."

(পুথি $\frac{M\ 3/38}{7}$ ১৬৪ পত্র)

আমরা বাহুল্য ভয়ে নলডাঙ্গা শাখার আলোচনা করিলাম না—সতীশবাবুর গ্রন্থে তাহা দ্রষ্টব্য। বসু-ধৃত বংশলতার দুইটিশাখার (নলডাঙ্গা ও বিশারদ) উদ্ধতন নামপর্য্যায় সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবাচস্পতি ও বিদ্যানিবাসের নামদ্বয় রত্নাকর এবং কাশীনাথ সম্পূর্ণ কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পিতামহ-পৌত্রের এক নাম থাকা অসম্ভব। বসুধৃত বংশলতার তৃতীয় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের ধারা ও সম্পূর্ণ কল্পিত—রঘুনন্দন আথগুল বংশীয় বংশজ ছিলেন না—তিনি সাগরদিয়ার বিখ্যাত কুলীনবংশীয় ছিলেন ইহাই চিরন্তন প্রবাদ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সম্বন্ধ নির্ণয়কার যে ক্ষিতীশ বংশের কারিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সাগরদিয়াকুলের বর্ণনায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :

"রঘু গঙ্গা-পৌত্র স্মার্ত্ত, পিতা হরিহর।"

(সম্বন্ধনির্ণয়—বংশাবলী, পৃ ২৭

•

এ বিষয়ে আমরা সাদরে বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা আহ্বান করিতেছি—সত্য নির্ধারিত হইয়া কৃত্রিমতার স্বরূপ সম্যক্ প্রকাশিত হউক। ধ্রুবানন্দমিশ্রের বর্ণনায় আথগুলের ৫ পুত্র (৩ পুত্র নহে) "হতকুল

ছিলেন তাহা মোটেই বুঝা যায় না। আমাদের উদ্ধৃত বচনে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে বিশারদের পিতামহ প্রথমতঃ কুলভঙ্গ করেন এবং পিতা "অকৃতী" অর্থাৎ কুলক্রিয়ায় নিকৃষ্ট ছিলেন। তাহার ফলে বংশের কৌলীন্য ধ্বংস হয়। মহেশের কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে বাহিনীপতির কন্যা বিবাহ করিয়া দুইজন মহাকুলীনের কুলভঙ্গ হইয়াছিল—ফুলিয়া-মেলের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অনন্তের পুত্র রঘু ("অয়ং জলেশ্বরে মগ্নঃ পরীবর্ত্তী ভাবঃ") এবং কাচনার মুখবংশীয় সুরানন্দ পুত্র বিশাই ("বাহিনীপত্যাং গতঃ")। সংগৃহীত বিবরণে বিশারদ জামাতা গোপীনাথাচার্য্য ছাড়া সার্ব্বভৌমের তিন জামাতার নাম নূতন পাওয়া যাইতেছে। সার্ব্বভৌমের অধস্তন ৬ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বংশের সমস্ত ধারা বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। নবদ্বীপাদি অঞ্চলে নিশ্চয়ই এই বংশ এখনও বাঁচিয়া আছে—কিন্তু তাহাদের পরিচয় উদ্ধার করা প্রায় অসাধ্য।

আখণ্ডল লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক (ঘর্ম্মাংশু পুত্র) দেবলের প্রপৌত্র ছিলেন। দেবলের বাড়ী ছিল "ভাবড়াহুরা" গ্রামে, একখানা পুঁথিতে তদনুসারে বন্দ্যবংশের এই ধারার নাম "ভাবড়াহুরিয়া" প্রকরণ লিখিত হইয়াছে। দেবল হইতে বিশারদ ৯ম পুরুষ অধস্তন এবং কালগণনায় ইহাতে কোনই অসামঞ্জস্য ঘটে না।

নিশি শেষে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আজি নিশি-শেষে চাহি নীল নভে
ফিরাতে পারিনে আঁখি,
গগনেতে চলে এত সমারোহ
আমি কি খপর রাখি ?
জ্যোতি সুন্দর অগণিত তারা—
আমারে করিল যেন দিশেহারা
সুর-প্রতিভার হেন সমাবেশে
বিমুগ্ধ হয়ে থাকি।

২

এত আলো, এত সুমধুর আলো—
এত আলো মনোলোভা,
বিরাটের এ যে বিরাট আরতি
এ ত নয় শুধু শোভা !
এ যে প্রেমলিপি আলোক-আঁখরে
প্রাণকে মাতায় বিমোহিত করে,
এ যে ইঙ্গিত নয়নে নয়নে
একেবারে মাখামাখি।

৩

নিম্নে আঁধার—উপরে আলোর
উৎস উৎসারিত,
জনম ভরিয়া দেখিতাম—যদি
হাজার নয়ন দিত।
শবাসনা যবে প্রসন্ন হ'ন
সাধক কি হেরে এমনি গগন ?
এত রূপ, এত মধু কি কখনো
থাকে—না রাখিলে ঢাকি ?

৪

দিন ত নেহাৎ দীন এর কাছে
রাতে সমারোহ এত !
শেষেই যাহার এত মধু তার
প্রথমে না জানি কত ?
এ রূপের কেন পাই নাই ওর
হায় রে নদির যৌবনে মোর !
দুর্ব্বল আঁখি বুঝিতে নারিছে
কত কি যে দিলে ফাঁকি।

৫

বিশ্বরূপ ত দেখিয়া ফেলিনু
কি রয়েছে আর বাদ
কণিকা হউক, আমি ত পেয়েছি
অমৃতের আস্বাদ।
মন্দির-পথ পেয়েছি আলোকে—
গরুড়-স্তম্ভ পড়িয়াছে চোখে,
দেখা ত হবেই, হোক যত দেরী—
দুয়ারে বসিয়া ডাকি।

৬

সমীরে আসিছে কুসুমের বাস
মঙ্গল ক্ষণ গণি'
পুরাঙ্গনারা আনে 'ইতু' ঘট
উঠিছে হুলুধ্বনি।
জীবনে অমর মুহূর্ত্ত মোর
লয়ে—হ'ল আজ শুভ নিশি ভোর,
গণ্ডূষে পান করেছি সাগর
যা থাকে থাকুক বাকি।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

সাত

একা পাতুর ঘর নয়, পাতুর ঘরের আগুন ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া প্রায় সমস্ত হরিজন-পল্লীটাই পুড়িয়া গেল। বড় গাছের আড়াল পাইয়া খান দুই-তিন ঘর কেবল বাঁচিয়াছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুড়িয়া গেল। সামান্য কুটীরের মত ছোট ছোট ঘর—বাঁশের হালকা কাঠামোর উপর অল্প খড়ের পাতলা ছাউনি—কার্ত্তিকের প্রথম হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় রোদে শুকাইয়া বারুদের মত দাহ্য বস্তু হইয়াই ছিল; আগুন তাহাতে স্পর্শ করিবামাত্র বিস্ফোরণের মতই অগ্নিকাণ্ডটা ঘটিয়া গেল। গ্রামের লোক অনেকেই ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী ছেলের দল, তাহারা চেষ্টাও অনেক করিয়াছিল, কিন্তু জল তুলিবার পাত্রের অভাবে এবং বহ্নিমান সংকীর্ণ চালগুলিতে দাঁড়াইবার স্থানের অভাবে—তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। তাহাদের মুখপাত্র ছিল জগন ডাক্তার। অগ্নিদাহের সমস্ত সময়টা চীৎকার করিয়া সেনাপতির মত আদেশ উপদেশ বাতলাইয়া এমন গলা ফাটাইয়া ফেলিল যে, আগুন নিভিতে নিভিতে তাহার আওয়াজ বসিয়া গেল।

রাত্রে উহাদের সকলকে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইতে অনুমতি দেওয়া হইল, কিন্তু—আশ্চর্য্য মানুষ উহারা—কিছুতেই ওই পোড়াঘরের মায়া ছাড়িয়া আসিল না। সমস্ত রাত্রি উহারই মধ্যেই কোনরূপে স্থান করিয়া এই হেমন্তের শীতজর্জ্জর রাত্রে অনাবৃত স্থানে রাত্রি কাটাইবে। ছেলেগুলা অবশ্য ঘুমাইল, মেয়েগুলা গানের মত সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল, আর পুরুষেরা পরস্পরকে দোষ দিয়া নিজের কৃতিত্বের আস্ফালন করিল এবং দগ্ধগৃহের আগুন তুলিয়া ক্রমাগত তামাক খাইল। প্রায় ঘরেই দু-একটা গরু, দু-চারিটা ছাগল আছে, আগুনের সময় সেগুলাকে তাহারা মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, সেগুলা এদিকে ওদিকে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—রাত্রে সন্ধানের উপায় নাই। হাঁস-মুরগীও প্রত্যেকেরই আছে—তাহার কতকগুলা পুড়িয়াছে—চোখে দেখা না গেলেও গন্ধে অনুমান করা গিয়াছে। যেগুলা পলাইয়া বাঁচিয়াছে—সেগুলা ইতিমধ্যেই আসিয়া আপন আপন গৃহস্থের জটলার পাশে পালক ফুলাইয়া যথাসম্ভব দেহ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া গেল। অন্য সম্পদের মধ্যে কতকগুলা মাটির হাঁড়ি—দু-চারিটা পিতল কাঁসার বাসন—ছেঁড়া-কাপড়ের জীর্ণ এবং ময়লায় দুর্গন্ধযুক্ত কয়েকখানা কাঁথা-বালিশ মাদুর-চ্যাটাই, মাছ ধরিবার পলুই, দু-চারিখানা কাপড়—তাহার কতক পুড়িয়াছে বা পোড়াচালের ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। যে যাহা বাহির করিয়াছে—সে সেগুলি আপনার পরিবার-বেষ্টনীর মাঝখানে—যেন সকলে মিলিয়া বুক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষরাত্রে হিমের তীক্ষ্ণতায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য কাতর কান্তির নীরবতার মধ্যে কখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকাল হইতেই জাগিয়া উঠিয়া মেয়েরা আর এক দফা শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে কাঁদিতে বসিল। একটু রোদ উঠিতেই কোমর বাঁধিয়া মেয়ে-পুরুষে পোড়া খড়ের ছাইগুলি ঝুড়িতে করিয়া আপন আপন সারগাদায় ফেলিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। পোড়া কাঠগুলি একদিকে জড়ো করিয়া রাখা হইল—জ্বালানির কাজে লাগিবে। ছাইয়ের গাদার ভিতর হইতে চাপা-পড়া বাসন যাহার যাহা ছিল—সেগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। এ সমস্ত কাজ ইহাদের মুখস্থ। ঘরের উপর দিয়া বিপর্য্যয় ইহাদের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। প্রবল বর্ষা হইলে—জীর্ণ-আচ্ছাদন ঘরগুলি পড়িয়া যায়, নদীর বাঁধ ভাঙিলে বন্যার জল আসিয়া পাড়াটা ডুবাইয়া দিলে ব্যাপকভাবেই ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে; মধ্যে মধ্যে জ্বালানির জন্য সংগৃহীত শুকনা পাতায় মদ্যবিভোর সন্ধ্যায় নিজেরাই আগুন লাগাইয়া ফেলে। বিপর্য্যয়ের পর সংসার গুছাইবার শিক্ষা এমনই করিয়া পুরুষানুক্রমেই ইহাদের হইয়া আসিতেছে। ঘর দুয়ার পরিষ্কারের পর আহার্য্যের ব্যবস্থা

করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসী ভাতই সকালে ইহাদের খাদ্য, ছোট ছেলেদের মুড়ি দেওয়া হয়; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট বাচ্চাগুলা ইহারই মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। দু-একজন ছেলেগুলার পিঠে দুম দাম করিয়া কিল চড় বসাইয়া দিল।

—রাক্ষসাদের প্যাটে যেন আগুন লেগেছে। মর মর, তোরা মর্!

ঘর দুয়ার পরিষ্কার হইয়া গেলে মনিব-বাড়ী যাইতে হইবে—তবে আহার্য্যের ব্যবস্থা হইবে। মনিবেরা এসব ক্ষেত্রে চিরকাল সাহায্য করিয়া থাকে। এপাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে কাজ করিয়া থাকে। বাঁধা বেতনে অথবা বৎসরের উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। ছোট ছেলেরা পেটভাতায়; অথবা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান এবং বৎসরে চারখান সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কেরা মাসে আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পায়—ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানেরা অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষের শ্রমিকের কাজ করে। মনিব, সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়—ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ সমেত সে ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত। অজন্মার বৎসরে—এই ঋণ শোধ না হইলে—আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এ প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না—বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যই অন্তরে অন্তরে পোষণ করে। দায়-দৈবে মনিবেরা চিরকাল সাহায্য করে। সেইটাই অতিরিক্ত করুণা। সেই করুণার ভরসায় আহার্য্যের চিন্তায় এমন ব্যাকুল তাহারা নয়। মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থদের ঘরে সকালে বিকালে বাসন মাজা—আবর্জ্জনা ফেলিয়া পাট-কাজ করে। সেখান হইতেও কিছু পাওয়া যাইবে। এ ছাড়াও দুধের দাম কিছু কিছু পাওনা আছে। সে পাওনা কিন্তু গ্রামে নয়। চাষীর গ্রামে চাষীদের ঘরেই দুধ হয়, হরিজনেরা তাহাদের গরুর দুধ পাশের বড়লোকের গ্রাম কঙ্কণায় বেচিয়া আসে। ঘুঁটেও সেখানে বিক্রয় হয়।

পাতুর কিন্তু এসব ভরসা নাই। সে জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে; গ্রামের সরকারী শিবতলা কালীতলা এবং পাশের গ্রামের চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়, সেই হেতু বৎসরে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহের আমল হইতে পাইয়া থাকে। নিজের দুইটা বলদ আছে—সেই হালে কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমি ভাগে চাষ করে। এ ছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্ব্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী সেখদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু-চারি টাকা দাদন স্বরূপে দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ আয় তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। নেহাত পারিশ্রমিক অর্থাৎ—তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। এই লইয়া চামড়াওয়ালার সঙ্গে মনান্তরও হইয়া আছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্রলোকের জমি ভাগে চাষ করে সে কিছু দিলেও দিতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকে খত না লেখাইয়া কিছু দিবে না। সেও অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। খতকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্য্যন্ত নালিশ করিয়া বাড়ীটা লইয়া বসিলে—সে কোথায় যাইবে! পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্পত্তি এই বাড়ীটুকু।

নির্ব্বাক হইয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সে ছাই জড়ো করিয়াই চলিয়াছিল। ছিরুপালের কাছে সেদিন মার খাইয়া তাহার মনে যে উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে উত্তেজনা দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই উত্তেজনা বশেই সেদিন অমরকুণ্ডার জোলে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে ছিরুপাল সম্পর্কে আপনার সহোদরা দুর্গার যে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়াছিল—জমিদারের কাছেও সেই কথা প্রকাশ করিয়া নালিশ করিয়াছিল। সেই লইয়া গত সন্ধ্যায় স্বজাতির মধ্যে তাহার লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি তো আপন মুখেই বলেছ হে; চৌধুরী মশায়ের কাছে বলেছ, জমিদারের কাছারিতে বলেছ! বলেছ কি না?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—তবে? তুমি পতিত হবে না ক্যানে, তা বল!

কথাটা পাতুর ইহার পূর্ব্বে খেয়াল হয় নাই। সে চমকিয়া

উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হন-হন করিয়া বাড়ী গিয়া বোন দুর্গার চুলের মুঠিতে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া মজলিসের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। ধাক্কা দিয়া দুর্গাকে মাটির উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—সে কথা এই হারামজাদী ছেনালকে শুদোও। ভিন্নভাতে বাপপড়শী; আমি ওর সঙ্গে পেথকান্ন।

দুর্গার পিছনে-পিছনে তাহার মা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল, সকলের পিছনে পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও গুন গুন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। তারপর সে এক চরম অশ্লীল বাক-বিতণ্ডা। স্বৈরিণী দুর্গা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার প্রত্যেক মেয়েটির কু-কীর্ত্তির গুপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া পাতুর মুখের উপর সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিল—ঘর আমার, আমি নিজের রোজকারে করেছি, আমার খুশী যার ওপর হবে—সে-ই আমার বাড়ী আসবে। তোর কি? তাতে তোর কি? তু আমাকে খেতে দিস, না দিবি? আপন পরিবারকে সামলাস তু।

পাতু আরও ঘা-কতক লাগাইয়া দিয়াছিল। পাতুর বউটি ঘোমটার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ননদকে গাল দিতে সুরু করিয়াছিল। মজলিসের মধ্যে উত্তেজিত কলরব হাতাহাতির উত্তাপের সীমানায় বোধ করি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই আগুন জ্বলিয়া ওঠে।

এই দুই দিনের উত্তেজনা, তাহার উপর এই অগ্নিদাহের ফলে গৃহহীনতার অপরিমেয় দুঃখ তাহাকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়-গিরির মত করিয়া তুলিয়াছিল। সে নীরবেই কাজ করিতেছিল। পাতুর বউ কিন্তু এখনও গুন গুন করিয়া কাঁদিতেছে। সে এতক্ষণ ছাগল গরুগুলিকে অদূরবর্ত্তী খেজুর-গাছগুলির গোড়ায় খোঁটা পুতিয়া বাঁধিয়া, হাঁসগুলিকে নিকটবর্ত্তী পুকুরের জলে নামাইয়া দিয়া স্বামীর কাজে সাহায্য করিতে আসিল; জড়ো-করা ছাই ঝুড়িতে পুরিয়া সে সারগাদায় ফেলিতে আরম্ভ করিল। পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এ্যাই দেখ, মিহি-গলায় আর ঢং ক'রে কাঁদিস না বলছি। মেরে হাড় ভেঙে দোব বলছি—হ্যাঁ।

ঘর পুড়িয়া যাওয়ার দুঃখে এবং সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগের ফলে পাতুর বউয়ের মেজাজও খুব ভাল ছিল না, সে বন্ধ-বিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস করিয়া উঠিল—ক্যানে, ক্যানে আমার হাড় ভেঙে দিবি শুনি! বলে—'দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধ'রে'—সেই বিত্তান্ত। নিজের ছেনাল বোনকে কিছু বলবার ক্ষেমতা নাই—

পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান তখন লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পাতুর ঘরের সম্মুখেই—একই উঠানের ওপাশে দুর্গা ও তাহার মায়ের ঘর; তাহারাও ঘরের ছাই পরিষ্কার করিতেছিল। বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু পাতুর নির্যাতন-ব্যবস্থা দেখিয়া বউকে আর দংশন করিল না, বিজ্ঞভাবে ভাইকেই বলিল—হ্যাঁ, বউকে একটুকুন শাসন কর, মাথায় তুলিস না!

সেই মুহূর্ত্তেই জগন ডাক্তারের ধরা-গলা শোনা গেল, সে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—ছাড়, ছাড়, হারামজাদা বায়েন, ম'রে যাবে যে!

কথা বলিতে বলিতেই ডাক্তার আসিয়া পাতুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিল; পাতু বউকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দেখেন দেখি হারামজাদীর আস্পদ্ধা, ঘরে আগুন টাগুন লাগিয়ে—

—জল আন, জল। জলদি, হারামজাদা গোঁয়ার!—জগন বলিয়া উঠিল। বউটা অচেতন হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া নাড়ী ধরিল।

পাতু এবার শঙ্কিত হইয়া ঝুঁকিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ একমুহূর্ত্তে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো—আমি বউকে মেরে ফেললাম গো!

পাতুর মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবা! কি করলি রে!

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওরে জল—জল, জল আন্!

ছুটিয়া জল লইয়া আসিল দুর্গা। সে বউয়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; ডাক্তার ছপাছপ জলের ছিটা দিয়া বলিল—কই, মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দে দেখি দুগ্‌গা!

কিন্তু ফুঁ আর দিতে হইল না, বউ আপনিই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পর সে

উঠিয়া বসিয়া তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমাকে আর মেমতা করতে হবে না রে, সংসারে আমার কেউ নাই রে! গলা তাহার ধরিয়া গিয়াছে, আওয়াজ বাহির হয় না, তবু সে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিল।

* * *

জগন ডাক্তার কতগুলি ঘর পুড়িয়াছে গণনা করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লইল—কতগুলি মানুষ, তাহাও লিখিয়া লইল। খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদনের খসড়া সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় চার-পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ, চাল, পুরানো কাপড়, অর্থ সংগ্রহের জন্ম একটা সাহায্য-সমিতি গঠনের সংকল্পও তাহার আছে। সকলকে ডাকিয়া ডাক্তার বলিল—সব আপন-আপন মুনিবের কাছে যা, গিয়ে বল্, দুটো ক'রে বাঁশ—দশ গণ্ডা ক'রে খড়, পাঁচ-সাত দিনের মত খোরাকি আমদিগে দিতে হবে। আর যা লাগবে—চেয়ে-চিন্তে আমি যোগাড় করছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে—আমি লিখে রাখছি, ও-বেলায় গিয়ে সব টিপসই দিয়ে আসবি।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, সায়েবের নামে তাহারা ভড়কাইয়া গিয়াছে। সায়েব-সুবাকে ইহারা শাসনকর্ত্তা বলিয়াই জানে; কনেস্টবল দারোগার উপরওয়ালা হিসাবে সায়েবের নামে পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া ওঠে। তাহার কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া আবার কোন্ ফ্যাঁসাদ বাঁধিবে কে জানে!

জগন বলিল—বুঝলি আমার কথা? চুপ ক'রে রইলি যে সব!

এবার সতীশ বাউরী বলিল—আজ্ঞে, সায়েবের কাছে—

—হ্যাঁ, সায়েবের কাছে।

—সে আবার কি না কি ফ্যাঁসাদ হবে মাশায়।

—ফ্যাঁসাদ কিসের? জেলার কর্ত্তা, প্রজার সুখ দুঃখের ভার তার ওপর। দুঃখের কথা জানালেই তাকে সাহায্য করতে হবে। করতে বাধ্য।

—আজ্ঞে, উ মাশায়—

—আবার কি?

—আজ্ঞে, কনেস্টবল দারোগা—থানা পুলিশ—সে মাশায় হাজার হাঙ্গামা!

ডাক্তার এবার ভীষণ চটিয়া গেল, তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে সে চটিয়া যায়। তাহার উপর এই সুযোগে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরিচিত হওয়ার একটা প্রবল বাসনা তাহার ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার অনেক দিনের। কেবলমাত্র মান-মর্য্যাদা লাভের জন্যই নয়, দশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার আছে। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরাই ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সভ্যপদগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে। ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলিই কঙ্কণার বিভিন্ন বাবুদের জমিদারি, ভোট প্রকাশ্যে দিতে হয়, কাজেই সকলে আপন আপন জমিদারদের ভোট দিতে বাধ্য হয়। গতবার জগন ঘোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া মাত্র তিনটি ভোট পাইয়াছিল। সরকার-তরফ হইতে মনোনীত সভ্যপদগুলিও কঙ্কণার বাবুদের একচেটিয়া। সায়েব-সুবা উহাদেরই চেনে, কঙ্কণাতেই তাঁহাদের যাওয়া-আসা; সভ্য মনোনয়নের সময় তাহাদের দরখাস্তগুলিই মঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে এমন একটি পরহিত-ব্রত লইয়া সায়েবের সহিত দেখা করিবার সংকল্পটি ডাক্তারের বহু-আকাঙ্ক্ষিত এবং পরম কাম্য। সেই সংকল্প পূরণের পথে বাধা পাইয়া ডাক্তার ভীষণ চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে মর্ গে তোরা, প'চে মর্ গে! হারামজাদা মুখ্যুর দল সব!

—কি হ'ল কি, ডাক্তার?—বলিয়া ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী পিছনের গাছপালার আড়াল অতিক্রম করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী ইহাদের এই আকস্মিক বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছে। এ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য চৌধুরী আজও যথাসাধ্য পালন করে। ব্যবস্থাটার মধ্যে দয়ারই প্রাধান্য, কিন্তু প্রেমও খানিকটা আছে।

ডাক্তার চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—দেখুন না, বেটাদের মুখ্যুমি। বলছি—ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত কর্। তা বলছে কি জানেন? বলছে,—থানা-পুলিশ, দারোগা—

চৌধুরী বলিল—এর জন্যে আর সায়েব-সুবো কেন ভাই? গাঁয়ের পাঁচজনের কাছ থেকেই ওদের কাজ হয়ে যাবে। আমি তোমার প্রত্যেককে দুগণ্ডা ক'রে খড় দোব। পাঁচটা বাঁশ দোব। এমনি ক'রে—

ডাক্তার আর শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—যাস বেটারা এর পর আমার কাছে। আরও কিছুদূর আসিয়া দাঁড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল রে? কাল রাত্রে?

চৌধুরী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তা দরখাস্ত করতেই বা দোষ কি বাবা সতীশ? ডাক্তার বলছে। আর সায়েবের যদি দয়াই হয়—সে তো তোমাদেরই মঙ্গল! তাই বরং তোমরা যাও ডাক্তারের কাছে।

সতীশ বলিল—তা হাঙ্গামা কিছু হবে না তো চৌধুরী মাশায়? আমাদের সব সেই ভয় হচ্ছে কিনা!

—না। হাঙ্গামা কিছু হবে ব'লে তো মনে নেয় না বাবা! না—না। হাঙ্গামা কিছু হবে না।

অপরাহ্ণে সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের কাছে হাজির হইল। আসিল না কেবল পাতু।

ডাক্তার খুশী হইয়া উঠিয়াছিল, সে বেশ করিয়া সকলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—পাতু কই—পাতু?

সতীশ বলিল—পাতু, আজ্ঞে আসবে না। সে মাশায় গায়েই থাকবে না বলছে।

—গায়েই থাকবে না? কেন, এত রাগ কেন রে?

—সে মাশায় সে-ই জানে। সে আপনার উপারে জংসনে গিয়ে থাকবে। বলে—যেখানে খাটব সেইখানে ভাত!

- দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে!

—জমি ছেড়ে দেবে মাশায়। বলে—ওতে পেটই ভরে না, তা উ নিয়ে কি হবে! উ-সব বড়নোকের কথা ছেড়ে দেন। পাতু বায়েন আমাদের বড়নোক। উকিল ব্যালেস্টার মানুষ।

—আহা তাই হোক। সে বড়নোকই হোক। তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক। দলের পিছনে ছিল দুর্গা, সে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। তারপর বলিল—সে যদি উঠেই যায় গা থেকে—তাতে নোকের কি শুনি? উকিল ব্যালেস্টার—সাত-সতেরো ক্যানে শুনি? সে যদি চ'লেই যায়—তাতে তো ভাল হবে তোদেরই। ভিক্ষের ভাগ তোদের মোটা হবে।

জগন ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিল—থাম্—থাম্।

—ক্যানে, থামবে ক্যানে? কিসের লেগে? এতকথা কিসের?—বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল।

—ওই! এই দুর্গা, টিপ-সই দিয়ে যা!

—না।

—তা হ'লে কিন্তু সরকারী টাকার কিছুই পাবি না তুই।

এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ মচকাইয়া দুর্গা বলিল—আমি টিপ-সই দিতে আসি নাই। তোমার তালগাছ বিক্রী আছে শুনে এসেছিলাম কিনতে। ভিখ করব ক্যানে? গলায় দড়ি! সে আবার মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া আপন মনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে বাঁশ জঙ্গলে ভরা পালপুকুরের কোণে আসিয়া দুর্গা দেখিল, বাঁশবনের আড়ালে শ্রীহরি পাল দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা হাসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—টাকা চাই। এতগুলি! ঘর করব।

শ্রীহরি গ্রাহ্য করিল না, প্রশ্ন করিল—কিসের দরখাস্ত হচ্ছে রে?

—সায়েবের কাছে। ঘর পুড়ে গিয়েছে—তাই—

—তাই আমাকে সুবে ক'রে দরখাস্ত করছে বুঝি? শালা ডাক্তার, শালাকে—। শ্রীহরির মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল।

দুর্গা গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছিরুর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমিই তো দিয়েছ আগুন!

—দিয়েছি! তুই দেখেছিস?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—চুপ কর, এতগুলো টাকাই দোব আমি।

দুর্গা আর উত্তর করিল না। ঠোঁট বাঁকাইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিয়া—আপন পথে চলিয়া গেল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া ছিরু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

দুর্গা মেয়েটি বেশ সুশ্রী মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্য্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে দুর্লভ এবং আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা মানুষের মনকে মুগ্ধ করে—আকর্ষণ করে।

পাতু নিজেই দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়াছিল—আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন; হারামজাদীর স্বভাব আর গেল

না। দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।

এ স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্য্যন্ত দেখিয়াও দেখে না; বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের স্বচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে। কিন্তু দুর্গার উচ্ছৃঙ্খলতা সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সে স্বেচ্ছাচারিণী—স্বৈরিণী, কোন সীমাকেই অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কণার জমিদারদের প্রমোদভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সে জানে, লোকে বলে—দারোগা হাকিম পর্য্যন্ত তাহার অপরিচিত নয়। সেদিন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুখার্জ্জী সাহেবের সহিত সে পরিচয় করিয়া আসিয়াছে গভীর রাত্রে, দফাদার তাহার শরীর-রক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। দুর্গা ইহাতে অহঙ্কার বোধ করে, নিজেকে স্বজাতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। নিজের কলঙ্ক সে গোপন করে না। এ স্বভাবের জন্য লোকে দায়ী করে তাহার মাকে। তাহার মা নাকি কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করাইয়া এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দায়ী তাহার মা নয়। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কঙ্কণায়। দুর্গার শাশুড়ী কঙ্কণার এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগান-বাড়ী ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জ্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিল। ঘরে ছিল বাবু; দুর্গা সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের দরজার দিকে ফিরিবার চেষ্টা করিতেই দেখিল—দরজা বাহির হইতে বন্ধ। বাড়ী ফিরিল সে—কাপড়ের খুঁটে বাঁধা পাঁচ টাকার একখানা নোট লইয়া। আতঙ্কে ভয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে—সেইদিনই সে পলাইয়া আসিয়াছিল মায়ের কাছে। মায়ের চোখে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই পথ সে কন্যাকে দেখাইয়া দিল। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

ছিরু পালের সহিত দুর্গার একান্তভাবে ব্যবসায়ের সম্বন্ধ। তাহার প্রতি এতটুকু কোমলতা কোন দিন তাহার ছিল না। আজ তাহার প্রতি দুর্গার ঘৃণা—আক্রোশ জন্মিয়া গেল। পাতুর সহিত তাহার যতই বিরোধ থাক, জাতি জ্ঞাতিদের যতই সে হীন ভাবুক—আজ তাহাদের জন্যই সে মমতা অনুভব করিল।···ছিরু পালের মদের সঙ্গে গরু-মারা বিষ মিশাইয়া দিলে কি হয়?

—ডাক্তোর কি বললে? গাছ বেচবে?—প্রশ্ন করিল দুর্গার মা। চিন্তা করিতে করিতে দুর্গা কখন আসিয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছে—খেয়াল ছিল না।

সচকিত হইয়া দুর্গা উত্তর দিল—না।

—বেচবে না?

—জিজ্ঞেসা করি নাই।

—মরণ! গেলি ক্যানে তবে ঢং ক'রে!

দুর্গা একবার কেবল তীব্র তীর্য্যক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল, কথার কোন জবাব দিল না।

কন্যার আত্মবিক্রয়ের অর্থে মা এখন বাঁচিয়া আছে—দুর্গার চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মা সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল—হামদু স্যাথ পাইকার এসেছিল।

দুর্গা এবারও কথার উত্তর দিল না।

মা আবার বলিল—আবার আসবে, ধম্মরাজতলায় পাড়ার নোকের সঙ্গে কথা কইছে।

দুর্গা এবার বলিল—ক্যানে কি দরকার তার? আমি বেচব না গরু ছাগল। দুর্গার একপাল ছাগল আছে, কয়েকটা গাই এবং একটা দামড়া বাছুরও আছে। অগ্নি-কাণ্ডের সংবাদ পাইয়া সেখ নিজেই ছুটিয়া আসিয়াছে। এই পাড়ায় ছাগল গরু কেনে—প্রয়োজনে চার আনা আট আনা হইতে দু চার টাকা পর্য্যন্ত অগ্রিমও দেয় হামদু সেখ। পরে ছাগল গরু লইয়া টাকাটা সুদ সমেত শোধ লইয়া থাকে। আজও সে আসিয়াছে ছাগল গরু কিনিতে, দু একজনকে অগ্রিমও দিবে। এত বড় বিপদে এই দারুণ প্রয়োজনের সময়—হামদু কর্জ্জ করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে। দুর্গার পালিত দামড়া বাছুরটার জন্য হামদু অনেকবার তোষামোদ করিয়াছে, কিন্তু দুর্গা বেঁচে নাই। আজ সে আবার আসিয়াছে এবং দুর্গার মাকে গোপনে চার আনা পয়সা দিয়াছে। সওদা হইলে, পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আরও চার আনার প্রতিশ্রুতি হামদু দিয়াছে। মেয়ের কথাটা

মায়ের মোটেই ভাল লাগিল না—খানিকটা ঝাঁঝ দিয়া বলিল—বেচবি না তো, ঘর কিসে হবে শুনি ?

—তোর বাবা এসে দেবে, বুঝলি হারামজাদী ! আমি আমার শাঁখাবাঁধা বেচব। দুর্গা দুই-চারিখানা সোনার গহনাও গড়াইয়াছে ; অত্যন্ত সামান্য অবশ্য, কিন্তু তাহাই ইহাদের পক্ষে স্বপ্নের কথা।

দুর্গার মা এবার বিস্ফোরক বস্তুর মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু দুর্গা তাহাতে দমিবার মেয়ে নয়, সে বলিয়াই গেল—ক' আনা নিয়েছিস—হামদু স্যাখের কাছে ? আমি কিছু বুঝি না মনে করছিস, ধান চালের ভাত আমি খাই না, নয় ?

বিস্ফোরণের মুখেই দুর্গার মা প্রচণ্ড বর্ষণে যেন ভিজিয়া হিম হইয়া গেল। সে অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, প্যাটের মেয়ে হয়ে তু এতবড় কথা আমাকে বললি !

দুর্গা গ্রাহ্য করিল না, বলিল—দাদা কোথা গেল ? বউটাই বা গেল কোথা ?

মা আপন মনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুর্গার প্রশ্নের উত্তরও তাহারই মধ্যে ছিল—গভ্যে আমার আগুন ধরিয়ে দিতে হয় রে, নেকনে আমার পাথর মারতে হয় ! জ্যান্তে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারলে রে। যেমন ব্যাটা—তেমুনি বেটী। বেটী বলছে চোর। আর আর ব্যাটা হ'ল ছ্যাশের-বার ! ছ্যাশের লোকে তালপাতা কেটে আপন আপন ঘর ঢাকলে—আর আমার ব্যাটা গাঁ ছেড়ে চললো। মরুক—মরুক ড্যাকরা —এই অঘ্রাণের শীতে মরুক।

অত্যন্ত রূঢ়স্বরে দুর্গা বলিল—বলি, রান্না-বান্না করবি, না প্যান-প্যান ক'রে কাঁদবি ? পিণ্ডি গিলতে হবে না ?

—না মা, আর পিণ্ডি গিলব না মা। তার চেয়ে গলায় দড়ি দোব মা !—দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া জবাব দিল।

দুর্গা আর কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একগাছা গরু-বাঁধা দড়ি লইয়া মায়ের কোলের কাছে ফেলিয়া দিল ; তারপর সে পাড়ার মধ্যে চলিয়া গেল আগুনের সন্ধানে।

হরিজন-পল্লীর মজলিসের স্থান—ওই ধর্ম্মরাজের বকুল-গাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল ; কাণ্ডটি প্রায় শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্ব্বের কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্দ্ধোৎপাটিত হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াই আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্ম্মরাজের আশ্চর্য্য লীলা। এমন করিয়া শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছ কে দেখিয়াছে ! গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া, মানত করিয়া লোকে ধর্ম্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়। আশ-পাশের ছায়াবৃত স্থানটি পরিচ্ছন্ন তক তক করিতেছে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়, সেই মাড়ুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়। হামদু সেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরুছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল ; কয়টা ছাগল—দুইটা গরু অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এগুলি কেনা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষেরা সকলেই গিয়াছে জগন ডাক্তারের ওখানে, হামদুর কারবার চলিতেছিল মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ বা চাচী, কেহ ভাবী। হামদু একটা খাসী লইয়া এক বাউড়ী ভাবীর সঙ্গে দর করিতেছিল—ইয়ার কি আছে, তুই বল ভাবী ! সেরেফ খালটা, আর হাড় ক'খানা। পাঁচ স্যার গোস্তও হবে না ইয়াতে। স্যার তিনেক হবে। ইয়ার দাম পাঁচ সিকা বলেছি—কি অন্যায় বলেছি বল। পাঁচজনা তো রয়েছে—বলুক পাঁচজনায়। আর ই অসময়ে লিবে কে বল ? গরজ এখনি, তুর না—গরজ পরের, তুর বুঝ কেনে। বলিতে বলিতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ও দুগ্গা দিদি, শুন গো, শুন। তুর বাড়ী পাঁচবার গেলম। শুন—শুন !

দুর্গা আগুনের সন্ধানে পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, সে দূর হইতেই বলিল—বেচব না আমি।

—আরে না বেচিস, শুন—শুন। তুকে বেচতে আমি বলি নাই।

—কি ? দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল।

—আরে বাপরে ! দিদি যে একবারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলি গো !

—হ্যাঁ, তাই বটে ! গিয়ে আমাকে রাঁধতে হবে। কি বলছ, বল ?

—ভাল কথাই বলছি ভাই ; বলছি ঘরে টিন দিবি ? সন্ধানে আমার সস্তায় টিন আছে।

—টিন ?

—হ্যাঁ গো! একবারে নতুন। কলওয়ালারা বেচবে। কিনবি? একবারে নিশ্চিন্দি! দেখ! গোটা চালিশ টাকা।

দুর্গা কয়েক মুহূর্ত ভাবিল। মনশ্চক্ষে দেখিল—তাহার ঘরের উপর টিনের আচ্ছাদন—রোদের ছটায় রূপার পাতের মত ঝকমক করিতেছে! পরমুহূর্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—উঁহু! না।

—তুর টাকা না-থাকে, আমাকে ইয়ার পরে দিস। ছ মাস, এক বছর পরে দিস!

—উঁহু! দুর্গা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁ—হু—! ও দামড়ার নামে তুমি হাত ধোও তো হামদু ভাই। ও আমি এখন দু-বছর বেচব না।—বলিয়া হাসিতে হাসিতেই সে চলিয়া গেল। আগুন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল—দড়িগাছটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, মা সেটা স্পর্শও করে নাই। উনানে আগুন দিয়া এখন সে পাতুর সঙ্গে বচসায় নিযুক্ত। দুই বোঝা তালপাতা উঠানে ফেলিয়া পাতু হাঁপাইতেছে এবং মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ বাঘের মত চাহিয়া আছে। পাতুর বউ, কাঠকুটা কুড়াইয়া জড়ো করিতেছেন, রান্না চড়াইবে।

দুর্গা বিনা ভূমিকায় বলিল—বউ, রান্না আর করতে হবে না। আমিই রাঁধছি, একসঙ্গেই খাব সব।

পাতু দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ দুগ্‌গা—দেখ! মায়ের মুখ দেখ! যা মন তাই বলছে! ভাল হবে না কিন্তুক!

—কি করবি বল? আমিই বা কি করব বল? গভ্যে ধরেছে! মা! তাড়িয়েও দিতে লারবি, খুন করতেও লারবি।

—একশো বার। তোর কথার কাটান নাই। কিন্তুক—ই গাঁয়ে থাকব কি সুখে—তুই বল দেখি!

—সত্যিই তুই উঠে যাবি নাকি? হ্যাঁ দাদা? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি?

পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তাতেই তো আবার এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম দুগ্‌গা! নইলে—জংসনের কলে কাজ—ঘর সব ঠিক ক'রে এসেছিলাম দুপর বেলাতে।—দু'হাত ছাঁদাছাদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—ওঠ্। ওই দেখ্ কখানা লম্বা বাঁশ রয়েছে আমার; ওই কখানা চাপিয়ে-তালপাতা দিয়ে ঘরখানা ঢাক। পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখনও যায় নাকি? তুই চালে ওঠ, আমি বউ দু'জনাতে তুলে দিচ্ছি সব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাতু উঠিল। দুর্গা কাপড়ের আঁচল কোমরে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—ওই গাঁদা সতীশ! সতীশ বাউড়ী, মিনষে—জগন ডাক্তোরকে বলছে—পাতু বায়েন বড় লোক, ব্যালেষ্টার—উকীল! তা আমি বললাম—আগা তোর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক! বলে—বড় নোক গা থেকে উঠে যাবে! যাবে! তোদিগে—ভিটে দানপত্ত লিখে দিয়ে যাবে। তোরা ভোগ করবি!

বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খাটিতে পারে খুব, খাটো পায়ে—দ্রুতগতিতে লাটিমের মত পাক দিয়া ফেরে। সে ইহার মধ্যে বাঁশগুলাকে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।

—পাতু রয়েছ? পাতু?

—কে?

—আমি থানদার ভূপাল লোহার! থানদার অর্থে চৌকীদার। চৌকীদারের আবির্ভাবে সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাতুর হাতের তালপাতাখানা খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

—কিগো থানদার?

—আবার কি! তোমার সব ডাক পড়েছে হে!

—কোথা?

—পেসিডেন বাবুর কাছে, ইউনান বোডে। গাঁয়ের লোকের কাছেও বটে। ট্যাক্সোর ঢোল দিতে হবে আর নবান্নোর ঢোল।

(ক্রমশঃ)

প্রহেলিকা

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য

গিরিজা। এতক্ষণে মালিনী দেবীর আসা উচিত ছিল।

কার্ত্তিক। হয় ত' ছবি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমি তো বহুক্ষণ তাকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি।

দরজায় খটখট ধ্বনি

ঐ বোধ হয় এসেছেন। (দরজা খুলে) আসুন, মালিনী দেবী।

মালিনী। (ঢুকে) কই আমার ঘরে গেলেন না ?

কার্ত্তিক। কাজে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।

গিরিজা। বসুন।

মালিনী। (বসে) থ্যাঙ্ক ইউ।

গিরিজা। আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, কারণ—

মালিনী। এক মিনিট। (কার্ত্তিকের প্রতি) দেখুন বেছে বেছে এই ছবিটা আমার পছন্দ হয়েছে।

কার্ত্তিককে ছবি দিলেন

কার্ত্তিক। (নিয়ে) ধন্যবাদ।

মালিনী। ভাল ক'রে দেখুন।

কার্ত্তিক। (দেখে) চমৎকার !

মালিনী। বেশ ভাল উঠেছে। কি বলেন ? কারা তুলেছে জানেন ? ঐ যে বোর্নিও না কি আছে—

কার্ত্তিক। বোর্ণিও অ্যাণ্ড গিল্ডারস্টেন—

মালিনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোর্নিও অ্যান গিলিডারটেন। কেমন পোজটা ?

গিরিজা। এইবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

মালিনী। নিশ্চয়ই। দেখুন ছবি কিন্তু বার করা চাই।

গিরিজা। আমরা এই পাশের ঘরের লোকটির সম্বন্ধে জানতে চাই।

মালিনী। গিয়ে আলাপ ক'রে এলেই পারেন। আপনারা পুলিশের লোক। যার বাড়ীতে ইচ্ছে ঢুকে পড়া, যাকে তাকেহায়রাণ করা—এ তো আপনাদের নিত্য কর্ম্ম।

গিরিজা। পরামর্শটা ভাল, কিন্তু তিনি এখন নেই। আপনার ঘরের সামনে তার ঘরের দরজা, তাই—

মালিনী। তাই কি ?

গিরিজা। যদি আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে থাকে। তাঁর নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়।

মালিনী। না, আমি তাঁকে চিনি না। আপনি কি বলতে চান ঘরের সামনে দরজা থাকলেই গায়ে পড়ে গিয়ে আলাপ করব। সে রকম মেয়ে আমি নই।

গিরিজা। কিন্তু স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মত মেয়ে তো আপনিই।

মালিনী। তাতে আপনাদের কি ? বার বার এক কথা বলার কি প্রয়োজন ? বেশ করেছি, চলে এসেছি। একটা জার্নালিস্ট স্বামী, দেড়শ' টাকা মাইনে আর ত্রিশ টাকার ফ্ল্যাট। তাতে আমার পোষাতো না। আমার বাবা গদাই মিত্তির শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা করেছিলেন। আমার রুচিও তেমনি হয়েছিল। যে সব সোসাইটীতে তিনি আমায় মিশিয়েছিলেন তারপর অমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটাই তাঁর অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু আপনি সে কথা ক্রমাগত তুলছেন কেন ? এ কেসের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

গিরিজা। কিচ্ছু না। তবুও তুলছি, কারণ আপনার স্বামী আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিলুম। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

মালিনী। দেখা হ'লে আপনার বন্ধুকে বলবেন যে মাস্টার আর জার্নালিস্টদের বিয়ে করা শোভা পায় না, বিশেষ ক'রে আমাদের মত মেয়েদের।

কার্ত্তিকের হাত থেকে ছবি কেড়ে নিয়ে প্রস্থান

গিরিজা। ওকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। কার্ত্তিক গণেশবাবুকে ডেকে দিতে বলো।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

চেয়ারে বসে গিরিজা কার্ত্তিকের নোট বইতে লিখতে লাগলেন। কার্ত্তিক এলেন

কার্ত্তিক। একটা চাকর যাচ্ছিল। তাকে বলে দিয়েছি। লোকটা এবার ক্ষেপে উঠবে।

গিরিজা। উপায় কি? তবে সময় নষ্ট করাবে না। আমাদের চেয়ে ও বেশী ব্যস্ত।

কার্ত্তিক। বনমালীবাবুকে নিয়ে রতনের এতক্ষণ ফেরা উচিত ছিল।

গিরিজা। তুমি একবার মিস্ রায়ের কাছে যাও। নিশিকান্তবাবুকে চেনেন কি-না জিজ্ঞেস কোরো।

দরজার কাছে গণেশকে দেখা গেল

আসুন গণেশবাবু, ভেতরে আসুন।

গণেশ এলেন ও কার্ত্তিক চলে গেলেন

গণেশ। এবার কি চাহেন? জানেন আমার কাজের—

গিরিজা। কিছু মনে করবেন না। আধ মিনিট। বসুন।

গণেশ। (বসে) জল্‌দি করিয়া বলিয়া ফেলেন।

গিরিজা। এই পাশের ঘরের লোকটির সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? নাম নিশিকান্ত—

গণেশ। হামি কুছু জানে না।

গিরিজা। এই হোটেলে কোন দিন তাঁকে দেখেছেন?

গণেশ। কেমন দেখতে আছেন?

গিরিজা। তা তো আমি জানি না।

গণেশ। আপ যাকে দেখা নহিঁ সেই আদমীকে হামি চেনে কি-না—বাবুজী, আপকে লিয়ে হামি এক গিলাস সরবত পাঠিয়ে দেবে।

গিরিজা। মানে, আমি জিজ্ঞেস করছিলুম, এই ফ্ল্যাটে কাউকে আসতে যেতে দেখেছেন কি?

গণেশ। না।

গিরিজা। আচ্ছা, এখন যেতে পারেন। ধন্যবাদ।

গণেশ চলে গেলেন

গিরিজা খাতায় লিখতে লাগলেন। কার্ত্তিক এলেন

গিরিজা। মিস রায় কি বল্লেন? চেনেন?

কার্ত্তিক। না। কখনও দেখেন নি পর্য্যন্ত।

গিরিজা। আমিও তাই ভেবেছিলুম। এখন অনাথ এসে পড়লে বাঁচি। হ্যাঁ, আপিস থেকে ফোন করছিল, কুমারবাহাদুরের ডান হাতের ন'খে রক্ত আর চামড়া লেগেছিল।

কার্ত্তিক। তার মানে হুটোপাটির সময় কারুর গা থিমচে গিছল।

দরজায় খটখট ধ্বনি

কে? কি চাও?

অনাথ। (নেপথ্যে) আমায় ডেকেছিলেন?

কার্ত্তিক। কে তুমি?

অনাথ। (নেপথ্যে) আমি এখানকার লিফ্‌টম্যান। আমার নাম অনাথ।

গিরিজা। ওঃ! অনাথ? ভেতরে এস।

অনাথের প্রবেশ

গিরিজা। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

এক দৃষ্টে অনাথকে দেখতে লাগলেন

অনাথ। আজ্ঞে আমার একটু জ্বরের মত হয়েছিল।

গিরিজা। ওঃ। অনাথ—তোমার নাম কি?

অনাথ। অনাথ।

গিরিজা। আর কোন নাম আছে?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনাথ। আমি কিন্তু আপনাকে এই প্রথম দেখলুম।

গিরিজা। অনেক দিন আগেকার কথা। তুমি কিংবা ঠিক তোমার মত দেখতে কেউ—হ্যাঁ, আমরা পুলিশের লোক। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে আজ সকালে মৃত অবস্থায় এই ঘরে পাওয়া যায়। মাথায় গুলির আঘাত।

অনাথ। এই মাত্র এসে বংশীর মুখে শুনলুম।

গিরিজা। এখুনি একজন ভদ্রলোক আসবেন। তুমি তাঁকে চেন কি-না বলবে।

অনাথ। কে?

গিরিজা। পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবু। তাঁকে চেন?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার তাঁকে দেখেছিলুম।

গিরিজা। আবার দেখলে চিনতে পারবে তো?

অনাথ। পারব। লিফ্‌টে ওপর থেকে নীচে নিয়ে গিছলুম। দু-একটা কথাও হয়েছিল।

গিরিজা। কোন ভুল হবে না ?

অনাথ। না।

গিরিজা। যাক্ বাঁচা গেল। তিনি ঘরে ঢুকবেন, তুমি তাঁকে ভাল ক'রে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ না ডেকে পাঠাই বাইরে অপেক্ষা করবে। চিনতে পেরেছ তা জানতে দেবে না।

অনাথ। কাকে চিনব ?

গিরিজা। তুমি দেখে বলবে সেই ভদ্রলোক নিশিকান্ত-বাবু কি-না। তিনি অন্য নামে পরিচয় দেবেন।

অনাথ। কি নাম ?

গিরিজা। বনমালী সাহা।

অনাথ। ওঁকেই তো কুমারবাহাদুর ভয় পেতেন। আমাদের বলে দিয়েছিলেন উনি এলেই যেন বলে দিই যে তিনি ঘরে নেই।

গিরিজা তুমি বনমালীবাবুকে দেখেছ ?

অনাথ। না। বংশী অনেকবার দেখেছে।

রতনলাল এলেন

রতন। বনমালীবাবু এসেছেন।

গিরিজা। ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

রতন চলিয়া গেলেন ও বনমালীবাবু এলেন

বনমালী। আমাকে এরকমভাবে ডেকে আনবার কারণ জানতে পারি কি ?

অনাথ চলে গেলেন

গিরিজা। বসুন।

বনমালী। (বসে) ধন্যবাদ।

গিরিজা। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, আর ইনি আমার সহকর্ম্মী।

বনমালী। এটা তো থানা নয় ?

গিরিজা। না। হোটেল 'ক্যাসিনো'। কেন, আপনি কি আগে কখনও এখানে আসেন নি ?

বনমালী। না। কলকাতায় এই প্রথম এসেছি।

গিরিজা। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চিনতেন ?

বনমালী। জগদীশপ্রসাদ পাইন ? কই না। এ নামে কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

গিরিজা। তাই নাকি ?

বনমালী। এক কাজ করুন না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো তাকে এখানে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করুন আমায় চেনেন কি-না ? তা হ'লেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

গিরিজা। উপায় থাকলে তাই করতুম। তাঁকে কাল রাত্রে কেউ হত্যা করেছে।

বনমালী। তা হ'লে আর কি করা যাবে বলুন ?

গিরিজা। তিনি মারা গেছেন শুনে আপনি বিশেষ দুঃখিত হলেন বলে তো মনে হল' না।

বনমালী। রোজ কত কোটি লোক মারা যাচ্ছে। সকলের জন্য দুঃখ করতে হলে তো কেঁদে কেঁদেই মরতে হয়। যাকে চিনিনে তার মরা-বাঁচায় আমার কি ?

গিরিজা। তা বটে। আচ্ছা, আপনি কি হোটেল ক্যাসিনোতে এই প্রথম এলেন ?

বনমালী। হ্যাঁ। কারণ এখানে আসতে হলে কলকাতায় আসা দরকার।

গিরিজা। কার্ত্তিক, একবার বংশীকে ডেকে আন' তো।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

আপনার স্মরণশক্তি কি একটু কম ?

বনমালী। পুলিশে চাকরির চেষ্টা কখনও করি নি, তাই ঠিক বলতে পারছিনে।

গিরিজা। বংশী নামে এখানে একজন লিফ্‌টম্যান আছে, তাকে চেনেন ?

বনমালী। না। এখানে কখনও এলুম না—অথচ এখানকার লিফ্‌টম্যানকে চিনব, এ কি কম কথা ?

গিরিজা। তা ঠিক। আচ্ছা বনমালীবাবু, আপনি লোকের চেহারা মনে রাখতে পারেন ?

বনমালী। তা একটু পারি বলেই মনে হয়।

বংশীকে নিয়ে কার্ত্তিকের প্রবেশ

গিরিজা। বংশী, তুমি এঁকে চেন ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি কয়েকবার এসে কুমার-বাহাদুরের খোঁজ করেছিলেন।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর দেখা করেছিলেন ?

বংশী। আজ্ঞে না। তিনি বলে দিয়েছিলেন যে ইনি এলেই যেন বলে দেওয়া হয় যে তিনি বাইরে গেছেন।

গিরিজা। কোন ভুল হচ্ছে না তো ?

বংশী। আজ্ঞে না। ঠিক চিনতে পেরেছি।

গিরিজা। এঁর নাম বলতে পার ?

বংশী। বাবু বনমালী সাহা।

গিরিজা। বনমালীবাবু কি বলেন ?

বনমালী। যাক্‌, এ নিয়ে বেশী—

গিরিজা। বংশী, তুমি এবার যেতে পার।

বংশী চলে গেল

আপনি তবে কুমারবাহাদুরকে চিনতেন ?

বনমালী। হ্যাঁ।

গিরিজা। এতক্ষণ মিথ্যা কথা কইছিলেন কেন ?

বনমালী। মানে—সামান্য একটু আলাপ ছিল মাত্র।

গিরিজা। প্রায়ই ওঁর খোঁজে আসতেন কেন ?

বনমালী। আমার কাছ থেকে উনি কিছু টাকা ধার করেছিলেন। তারই তাগাদায়।

গিরিজা। রিভলভার উঁচিয়ে কি টাকা আদায় করেন ?

বনমালী। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

গিরিজা। কাল রাত্রে টাকা আদায় করতে আপনি কুমারবাহাদুরের ঘরে ঢুকেছিলেন কি ?

বনমালী। না। কাল এই হোটেলের কাছেও আসি নি।

গিরিজা। মিথ্যা কথা। আমি জানি—

বনমালী। কি ক'রে জানলেন ?

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের কাছ থেকে।

বনমালী। তিনি মরবার পর আপনাকে বলেছেন—

গিরিজা। না, তিনি মরবার আগে লিখে গিছলেন।

কার্ত্তিক। যাতে লোকে জানতে পারে কে তাঁকে ত্যা করেছে। (পাঠ) "বনমালী সাহা রিভলভার হাতে পিছন থেকে ঘরে ঢুকছে। সামনের আরশিতে দেখতে পাচ্ছি। যদি আমার কিছু হয় তবে—" ব্যস্‌, এইখানেই তাঁর লেখা শেষ হয়ে গেছে—

গিরিজা। এবং সেই সঙ্গে তাঁর জীবনেরও শেষ।

বনমালী। (হঠাৎ চমকে উঠে) তাই তো, চেয়ারে বসলে আরশিতে সব দেখা যায় দেখছি।

গিরিজা। এইবার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারছেন বোধ হয় ?

বনমালী। আপনারা কি মনে করেন আমি দোষী ?

গিরিজা। ঘটনাচক্রে তাই দাঁড়িয়েছে।

বনমালী। আমি কিন্তু কুমারবাহাদুরকে ইচ্ছে করে হত্যা করিনি। অ্যাক্‌সিডেণ্ট—

গিরিজা। আপনি তবে স্বীকার করলেন—

বনমালী। (চমকে) অ্যাঁ, কি বললেন ?

গিরিজা। স্বীকারোক্তি দিতে রাজী আছেন ?

বনমালী। অগত্যা।

গিরিজা। মনে থাকে যেন যে আপনি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করছেন, আমরা বাধ্য করিনি। আর দরকার হ'লে আপনার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহার করতে পারি।

বনমালী। তা জানি।

গিরিজা। বলুন। কার্ত্তিক, এঁর বক্তব্য একটা আলাদা কাগজে লিখে নাও।

বনমালী বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

বনমালী। আমি খুব গরীবের ছেলে। কলেজে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার দু-একটা হীন কাজে সাহায্যও করেছিলুম। তারপর বহুদিন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। আমি অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে উকিল হই। সেই সময় একটা জঘন্য কাজের জন্য সে আমার সাহায্য চায়। আমি রাজী হই না। উকিল হয়ে পয়সার জন্য দু-চারটে এমন কাজ করেছিলুম যা নীতি কিংবা ন্যায়ের চোখে গর্হিত। কুমারবাহাদুর কোন রকমে তা জানতে পারে এবং দু-একটা অকাট্য প্রমাণ জোগাড় ক'রে আমার কাছে আসে। বলে, তার কাজটা ক'রে দিলে প্রমাণগুলো ফেরত দেবে, নইলে ব্ল্যাকমেল ক'রে টাকা আদায় করবে। ক'বছর থেকে তার পীড়ন সমভাবে চলছিল। কিন্তু এবছর আমি দু-একটা ভাল কেস পাওয়াতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বলে। আমি মরিয়া হয়ে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। দেশে অনেক লোকের মধ্যে থাকে বলে সুবিধা হত' না। সে হঠাৎ কলকাতায় আসতে আমিও অনুসরণ করি। কাল সুযোগ বুঝে আমি তার ঘরে ঢুকি। তখন রাত একটা হবে। আমার তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে প্রমাণগুলো আদায় করতে এসেছিলুম। ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আমি রিভলভার উঁচিয়ে ঢুকে দেখি সে মাতাল অবস্থায় কি যেন লিখছে। নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠে আমার দিকে

চেয়ে বললে—"কে? বনমালী? কি চাও?" তার নেশা ছুটে গেছে। আমি বললুম—"তোমার কাছে আমার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে সেগুলো দাও।" সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"ওটা নামাও, দিচ্ছি।" আমি রিভলভার না নামিয়েই বললুম—"আগে দাও।" যন্ত্রচালিতের মত সে সেল্‌ফের কাছে গিয়ে হঠাৎ বললে—"আরে চাবিটা যে দেরাজে রয়ে গেছে।" এই বলে ফিরে এসে দেরাজ খুললে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, এমন সময় দেখি সেও রিভলভার বার করে আমায় বলেছে—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" আমি গত্যন্তর না দেখে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি। ঝুটোপুটিতে রিভলভারটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়। আর কুমারবাহাদুরেরটা কি ক'রে যেন ছুঁড়ে যায়। সে আমার হাতের মধ্যে নেতিয় পড়ে। দেখলুম তার মাথার মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সে মারা গেছে। আমি তাড়াতাড়ি নিজের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ি।

গিরিজা। ধন্যবাদ। আপনার স্টেটমেণ্টে প্রায় সবই সত্যি কথা বলেছেন। অবশ্য দু-একটা—

বনমালী। কেন আমি তো সবই সত্য বলেছি।

গিরিজা। যা বলেছেন তা সত্য, কিন্তু কিছুটা বাদ গেছে।

বনমালী। কই মনে পড়ছে না তো।

গিরিজা। এই পাশের ঘরটা কি ভাড়া নিয়েছিলেন?

বনমালী। (অবাক হয়ে) না।

গিরিজা। কার্ত্তিক, একবার অনাথকে ডেকে আন তো।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

আপনি কি বলতে চান যে নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় নামে পরিচয় দিয়ে এই পাশের ঘরটা ভাড়া নেন নি? এ হত্যাটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট নয়, আগে থেকে হিসেব করে ঠাণ্ডা মেজাজে—

অনাথকে নিয়ে কার্ত্তিক এলেন

অনাথ, তুমি নিশিকান্ত বাবুকে চেন?

অনাথ। একবার দেখেছিলুম।

গিরিজা। আবার দেখলে চিনতে পারবে?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। এই ঘরে নিশিকান্তবাবু কে?

অনাথ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল

কই দেখাও। চুপ করে রয়েছ কেন?

অনাথ। তিনি তো এ ঘরে নেই।

গিরিজা। বল কি! (বনমালীকে দেখিয়ে) ইনি নিশিকান্তবাবু ন'ন?

অনাথ। না।

গিরিজা। (নিরাশ হয়ে) আচ্ছা, তুমি যেতে পার'। নীচে থেক'।

অনাথ চলে গেলেন

কার্ত্তিক। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন কোন্ আলোটা জ্বলছিল?

বনমালী। টেব্‌ল ল্যাম্প।

গিরিজা। ঝুটোপুটিতে আলোটা পড়ে ভেঙ্গে গেছল?

কার্ত্তিক। আমরা সকালে এসে সেটা ভাঙ্গা অবস্থায় পাই।

বনমালী। না, আমার সামনে সেটা ভাঙ্গেনি। অজানা নতুন ঘরে হঠাৎ আলো নিভে গেলে নিজের রিভলবার খুঁজে নিয়ে পালানো সম্ভবপর হ'ত না।

গিরিজা। আপনার হাতে রক্ত লেগেছিল?

বনমালী। তা একটু লেগেছিল। টেবিলের ওপর রুমাল ছিল। তাড়াতাড়িতে তাতে হাত মুছে পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলুম। এই সেই রুমাল। কুমারবাহাদুরের নাম লেখা আছে।

পকেট থেকে একটা রক্তমাখা রুমাল বার ক'রে গিরিজাকে দিলেন

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের পকেট থেকে একতাড়া নোট পড়ে গিয়েছিল, লক্ষ্য করেছিলেন?

বনমালী। প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য এত ব্যস্ত ছিলুম যে ও সব লক্ষ্য করতে পারি নি।

গিরিজা। তা হ'লে আপনি তাতে হাত দেন নি?

বনমালী। যা দেখলুম না তাতে হাত দেব কি ক'রে বুঝতে পারছি না।

কার্ত্তিক। আচ্ছা, ভিজে ফুটপাথে পড়ে যেতে পারেন তো?

বনমালী। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

কার্ত্তিক। রবার সোল জুতো জলে পিছলে যায় না?

বনমালী। কি বলছেন আপনি?

কার্ত্তিক। দেখি আপনার জুতোর তলা।

বনমালী। আপনি ক্ষেপে গেলেন নাকি?

পা উঁচু ক'রে দেখালেন

কার্ত্তিক। তাই তো! রবার সোল তো নয়।

বনমালী। আমি তো তা বলি নি।

কার্ত্তিক। কিন্তু কার্পেটের ওপর রবার সোল জুতোর ছাপ রয়েছে।

বনমালী। তার আমি কি করতে পারি বলুন?

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—দামোদরবাবুকে ডেকে দিন তো—কে? আপনিই দামোদরবাবু। হ্যাঁ দেখুন, এই তলায় কোন ঘর খালি আছে?—বাইশ নম্বর, খোলা আছে? আচ্ছা, ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) রতনলাল—বনমালী বাবু, আপনাকে কিছুক্ষণ ঐঘরে অপেক্ষা করতে হবে।

রতনলাল এলেন

রতন, এঁকে বাইশ নম্বর ঘরে বসিয়ে রেখে এস। আর দরজার বাইরে একজন পুলিশ মোতায়েন ক'রে দেবে যেন কেউ ঘরে না ঢোকে। বুঝলে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (বনমালীর প্রতি) আসুন।

রতনলাল ও বনমালী চলে গেলেন

কার্ত্তিক। জুতোর কথাটা স্যর কি রকম কায়দা ক'রে জিজ্ঞেস করলুম, দেখলেন?

গিরিজা। ভদ্রলোক তোমায় পাগল মনে করেছেন। ও তো এমনিই দেখা যায় রবার সোল কি না।

কার্ত্তিক। বনমালীর জবানবন্দী কি সত্য বলে মনে হয়?

গিরিজা। তাই তো মনে হচ্ছে। আমাদের ক্লু'র সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে।

রতনলাল এলেন

কি রতন? বনমালীবাবুকে বসিয়ে দিয়ে এসেছ তো?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরিকিষণকে পাহারায় রেখে এসেছি। এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

গিরিজা। কে? কি নাম?

রতন। ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ নন্দী।

গিরিজা। তাঁকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।

রতনলাল চলে গেলেন

কার্ত্তিক। ভদ্রলোক আসতে অনেক সময় নিয়েছেন।

ত্রিদিবেন্দ্র এলেন

গিরিজা। আসুন। আপনাকে কষ্ট দিলুম—

ত্রিদিবেন্দ্র। না, না, কষ্ট আর কি। আমি একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে দেরী হ'ল।

গিরিজা। বসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র। না, আর বসব না। আমার একটু তাড়া আছে। তারপর, ব্যাপারটা কি?

গিরিজা। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চেনেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। না। আগ্রহও নেই। কেন, কি হয়েছে?

গিরিজা। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। হত্যা! কি ভয়ানক কথা!

গিরিজা। আপনি তাঁকে চিনতেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে হঠাৎ আমার কাছে খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

গিরিজা। হয়ত' কোথাও কিছু ভুল হয়েছে।

নেপথ্যে দু'জন কথা কইছে। ঘরের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে

অনাথ। (নেপথ্যে) আমায় ভেতরে যেতে দিন। দরকারী কথা আছে।

রতন। (নেপথ্যে) ওঁরা এখন ব্যস্ত।

গিরিজা। কে গোলমাল করছে রতন?

রতনলাল এলেন

রতন। আজ্ঞে অনাথ বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভয়ানক দরকারী কথা।

গিরিজা। আচ্ছা, তাকে পাঠিয়ে দাও।

রতন চলে গেলেন ও অনাথ এলেন

অনাথ। আপনি নিশিকান্তবাবুর খোঁজ করছিলেন? উনিই নিশিকান্তবাবু।

ত্রিদিবেন্দ্রের দিকে দেখালেন

গিরিজা। তুমি ভুল করছ'। ইনি জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ নন্দী।

অনাথ। জমিদার হতে পারেন, কিন্তু ইনিই নিশিবাবু।

ত্রিদিবেন্দ্র। পাগল।

ত্রিদিবেন্দ্র। পাগল হতে যাব কেন? আপনাকেই আমি সেদিন ওঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলুম—"আপনি কে?" আপনি নিজের মুখেই বলেছিলেন—"আমার নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়। কাল আসব বলে ঘরটা একবার দেখতে এসেছিলুম।"

ত্রিদিবেন্দ্র। কি যা-তা বলছ হে?

অনাথ। আজকে নীচে আপনি যখন লিফ্‌টে উঠছেন, আমি বংশীর সঙ্গে গল্প করছিলুম। আপনাকে দেখে আমি নমস্কার করলুম। আপনিও মাথা নেড়ে লিফ্‌টে চড়ে ওপরে চলে এলেন। আমিও এঁদের খবর দিতে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে আসতে যতটুকু দেরী।

ত্রিদিবেন্দ্র। মিথ্যা কথা।

অনাথ। কি! আমি মিথ্যে কথা বলছি? এসব লুকোচুরি কিসের—

গিরিজা। অনাথ, চুপ কর। তা হ'লে স্বীকার করছেন যে আপনিই নিশিকান্ত নামে পাশের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। (অনাথকে দেখিয়ে) ওর সামনে ছাড়া কথা কি চলতে পারে না?

গিরিজা। নিশ্চয়ই পারে। অনাথ, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। দরকার হ'লে ডেকে পাঠাব।

অনাথ চলে গেলেন

আপনি নাম ভাড়িয়ে এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন কেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার দরকার ছিল।

গিরিজা। কি দরকার জানতে পারি কি?

ত্রিদিবেন্দ্র। মানুষের প্রাইভেট জীবন নিয়ে টানাটানি করা উচিত নয়।

গিরিজা। আমিও করতুম না, যদি না আপনার চালচলন এত মিস্টীরিয়াস হ'ত।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার পাওনাদার অনেক, অথচ সমস্ত টাকা ব্যবসায় আটকে রয়েছে। তাই কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবার মতলবে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছিলুম।

গিরিজা। যদি তাই আপনার মতলব ছিল, তবে এমন ঘর নিলেন কেন—যার পাশের ঘরে পরিচিত লোক থাকেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। এখানে আমার পরিচিত লোক কোথায়?

গিরিজা। কেন? কুমারবাহাদুর—

ত্রিদিবেন্দ্র। (উত্তেজিত হয়ে) আমি বারবার বলছি, তাঁকে চিনি না তবুও আপনি একই কথা বলে যাচ্ছেন। আপনি কি বলতে চান যে আমি মিথ্যা কথা কই?

গিরিজা। সব সময় ক'ন কি-না জানি না, তবে এখন যে বলছেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অপরিচিত লোককে কেউ বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ করে না।

ত্রিদিবেন্দ্র। তার মানে?

গিরিজা। আপনি কুমারবাহাদুরকে ২২শে মে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। একেবারে বাজে কথা।

গিরিজা। প্রমাণ আমাদের কাছেই আছে। কার্ত্তিক চিঠিটা পড় তো।

কার্ত্তিক। (চিঠি বার ক'রে পাঠ) "—নং চৌরঙ্গী টেরেস, থার্ড মে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২২শে মে রাত্রি আটটার সময় আমার বাড়ী আপনার ডিনারের যে নিমন্ত্রণ ছিল তাহা ক্যানসেল করা হ'ল।"

গিরিজা। চিঠির কাগজও আপনার। ওপরে মনোগ্রাম করা রয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। (দেখে ভীত হয়ে) এ কি রকম ক'রে হ'ল। আমি এ চিঠি ডিক্টেট করেছি তিন তারিখে, আর আজ আঠারোই। এতদিন কোথায় ছিল?

গিরিজা। আজ কুমারবাহাদুরের নামে সকালের ডাকের অন্য সব চিঠি-পত্তরের সঙ্গে এটাও ছিল। তা হ'লে আপনি তাঁকে চিনতেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। (চমকে) না।

গিরিজা। কিন্তু এখুনি যে নিজের মুখেই স্বীকার করলেন যে আপনি তাঁকে চিঠি লিখে বারণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণও আপনিই করেছিলেন, সুতরাং পরিচয়ও ছিল।

ত্রিদিবেন্দ্র। এখন দেখছি অস্বীকার করা বৃথা। আমি তাঁকে চিনতুম বটে, কিন্তু দু' চক্ষে দেখতে পারতুম না। অথচ তিনি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে মিশতেন। সেদিনকার নিমন্ত্রণটা তিনি অনেকটা জোর ক'রে আদায় করেছিলেন বলা যায়। পাঁচজনের সামনে বলতে আর আপত্তি করিনি। বাড়ী গিয়েই তাই চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ ক্যানসেল করেছিলুম। আমার সেক্রেটারী চিঠিটা কোথায় ফেলে—

গিরিজা। বুঝেছি। সেইজন্য আপনি তার সঙ্গে আলাপ ছিল সেটা অস্বীকার করছিলেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। আমি যখন এইখানে ঘর ভাড়া নিই তখন জানতুম না যে উনি পাশের ঘরে থাকেন।

গিরিজা। সেক্রেটারীকে চিঠি ডিক্টেট করবার পর কুমারবাহাদুরের ঠিকানাটাও নিশ্চয়ই ব'লে দিয়েছিলেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। তা বলেছিলুম বই কি।

গিরিজা। তবু আপনি বলতে চান যে কুমারবাহাদুর এখানে থাকেন জানতেন না ?

ত্রিদিবেন্দ্র। (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) আপনার এভাবে প্রশ্ন করার ভঙ্গী আমি পছন্দ করি না।

গিরিজা। তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আপনি সাধারণত রাত্রি ছাড়া এখানে আসতেন না।

ত্রিদিবেন্দ্র। না।

গিরিজা। শেষ কবে এসেছিলেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। দু-তিন রাত্রি আগে।

গিরিজা। কাল রাত্রে তবে এখানে আসেন নি ?

ত্রিদিবেন্দ্র। না।

গিরিজা। আপনার জুতোর তলা রবারের দেখছি।

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। কেন ?

গিরিজা। বেশ স্টাইল। কাদের তৈরি দেখি। পা-টা একটু উঁচু করবেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। কি আবোল-তাবোল বকছেন। নিন, দেখুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা উঁচু করলেন। গিরিজা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন

গিরিজা। ধন্যবাদ। XXX মার্কা। ঠিক অবিকল এই জুতোর ছাপ ঐ ঘরে কার্পেটের ওপর আছে। ঘরের কাজ রোজ সকাল-সন্ধ্যা করা হয়। সুতরাং ঐ দাগ কাল সন্ধ্যার পরের।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ঘরে যদি আমি এসেই থাকি—

গিরিজা। (উঠে একটা চেয়ার সরিয়ে) এই দাগের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। আপনি এ ঘরেও এসেছিলেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। (একটু ভেবে) শরীরটা খারাপ লাগতে ভাবলুম একটু ব্র্যাণ্ডি খাই। মাঝের দরজায় খটখট করতে এ ঘরের ভদ্রলোক নিজের দিকের ছিট্‌কিনি খুলে দিলেন। আমার দিকেরটা খুলে দরজা খুলতেই—

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন!

ত্রিদিবেন্দ্র। নিশ্চয়ই। তাঁকে দেখব আশা তা করি নি—

গিরিজা। একটু অপ্রস্তুতও নিশ্চয়ই হলেন। নিমন্ত্রণ ক্যানসেল ক'রে আবার তাঁরই কাছে—

ত্রিদিবেন্দ্র। বিলক্ষণ অপ্রস্তুতে পড়লুম।

গিরিজা। কিন্তু দরজা খোলবার আগে তো আপনি জানতেন না যে কুমারবাহাদুর এঘরে—

ত্রিদিবেন্দ্র। সে তো বটেই। জানলে কি আর তাঁকে—

গিরিজা। অথচ ঠিকানাটা আপনি নিজেই সেক্রেটারীকে ডিক্টেট করেছিলেন—

ত্রিদিবেন্দ্র। (মুস্কিলে পড়ে) আপনি লোককে ঠিক-ভাবে গুছিয়ে কথা বলতে দেন না।

গিরিজা। না। ভেবে চিন্তে মিথ্যা কথা গুছিয়ে বলতে দিই না। আপনি কাল এঘরে রাত্রে এসেছিলেন। ব্র্যাণ্ডি অথবা অন্য কোন কারণে—

ত্রিদিবেন্দ্র। ব্র্যাণ্ডির জন্য।

গিরিজা। আপনি এই হত্যা সম্বন্ধে কি জানেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। কিচ্ছু না।

গিরিজা। আপনার জুতোয় "টো"য়ের কাছটায় সামান্য একটু রক্ত লেগে রয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। (দেখে ভীতভাবে) তাই তো!

গিরিজা। এইবার বলবেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার কিছু বলার নেই।

গিরিজা। (পকেট থেকে কার্ট্রিজ কেস বার ক'রে) এটা আপনার ঘরে কি ক'রে গিছল বোঝাতে পারেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। (নার্ভাস হয়ে) আমার ঘরে পেয়েছিলেন ?

গিরিজা। হ্যাঁ।

ত্রিদিবেন্দ্র। এতক্ষণ একথা বললেই পারতেন। অস্বীকার করবার চেষ্টা করতুম না।

গিরিজা। আপনি তবে এই হত্যা সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার দ্বারাই তিনি হ'ত হয়েছেন। তবে ইচ্ছাকৃত নয়, হঠাৎ।

গিরিজা। হত্যা করেছেন! স্বীকারোক্তি দেবেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ দেব।

গিরিজা। আপনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছেন, আমরা বাধ্য করিনি। আর দরকার হ'লে আপনার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহার করতে পারি।

ত্রিদিবেন্দ্র। জানি, তবুও যা বলবার বলব।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এঁর বক্তব্য আলাদা কাগজে লিখে নাও।

ত্রিদিবেন্দ্র বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ভাইঝি বাসন্তী একটু বেশী মাত্রায় মডার্ন হয়ে পড়েছিল। আমি দেশে জমিদারী দেখাশুনা করতুম। দাদা রেলে একটা বড় চাকরি করতেন। বেশীর

ভাগ সময়ই টুরে থাকতেন। বাসন্তী এলাহাবাদে হোস্টেলে থেকে পড়ত। সেইখানেই কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার আলাপ হয়। হঠাৎ একদিন দাদার চিঠিতে জানলুম যে কুমারবাহাদুর বাসন্তীকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। দাদা সেই শোকে মারা গেলেন। আমি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম। সন্ধান নিয়ে জানলুম সে কলকাতার হোটেল "ক্যাসিনো"তে উঠেছে। আমিও অনুসরণ করলুম। প্রথমে বাড়াতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেব মনে করেছিলুম। পরে ভেবে দেখলুম তাতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা। তাই নিমন্ত্রণ বাতিল ক'রে দিলুম। তারপর নিশিকান্ত নামে তার পাশের ঘর ভাড়া নিলুম। দিনে আসতুম না, পাছে দেখে ফেলে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এসে সুযোগ সন্ধান করতুম। কাল ওর দরজায় ধাক্কা দিতে দেখি খোলা। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। মাঝের দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে নিঃশব্দে রিভলভার হাতে ওর ঘরে ঢুকলুম। গিয়েই এদিককার মাঝের দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিলুম। সে চেয়ারে বসে নেশায় ঢুলছিল। শব্দ শুনে আমার দিকে ফিরে চাইলে। রিভলবার দেখে নেশার ঘোর ছুটে গেল, ভীতভাবে আমায় জিজ্ঞেস করল—"আপনি কে?" আমি বললুম—"আমি বাসন্তীর কাকা। সে কোথায়?" সে উত্তর দিলে—"জানি না। অনেক দিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।" আমি বললুম—"আমাদের অপমানের আজ প্রতিশোধ নেব। তোমায় খুন করব।" সে ভয়ে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিছলুম, হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে আমার হাতে সজোরে ঘুঁষি মারলে। রিভলভারটা ছটকে বেরিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ থেকে রিভলভার বার ক'রে আমার দিকে লক্ষ্য করলে। প্রাণের ভয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ঝুটোপুটিতে টেবল ল্যাম্পটা পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সেই সময় হঠাৎ তার হাতের রিভলভারটা আপনিই ছুঁড়ে গেল। আমার হাতের মধ্যে সে নেতিয়ে পড়ল। আমার ঘর থেকে একটু একটু আলো আসছিল। দেখলুম গুলি তার মাথায় প্রবেশ করায় সে মরে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে রেখে দিয়ে নিজের ঘরে এসে মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। তারপর একটু দম নিয়ে নিঃশব্দে হোটেল থেকে সরে পড়লুম।

গিরিজা। তা হ'লে আর একটা রিভলভার থাকবার কথা। এ ঘরটা তো তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, কিন্তু—

ত্রিদিবেন্দ্র। হয় তো আমার ঘরে আছে। টেবিলের তলায় কিংবা—

কার্ত্তিক দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলেন। একটা রিভলভার হাতে বেরিয়ে এলেন। মাঝে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলেন

কার্ত্তিক। এই যে আর একটা রিভলভার ওঘরের টেবিলের তলা থেকে পাওয়া গেছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। ঐটাই আমার। বাঁটে নাম লেখা আছে।

কার্ত্তিক। (দেখে) তা আছে বটে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের পকেট থেকে একতাড়া নোট পড়ে যেতে দেখেছিলেন কি?

ত্রিদিবেন্দ্র। না, তা লক্ষ্য করিনি।

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—দামোদরবাবুকে ডেকে দিন। (ত্রিদিবেন্দ্রের প্রতি) আপনাকে এখন কিছুক্ষণ এইখানে থাকতে হবে। (ফোনে) কে? দামোদরবাবু? হ্যাঁ, শুনুন—আর কোন ঘর খালি আছে? দোতালায় ১৩ নম্বর—একটু ব্যবহার করতে পারি? আচ্ছা, ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) কার্ত্তিক, রতনকে একবার ডাক'।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ঐ গর্দ্দভ সেক্রেটারীর জন্যই ধরা পড়ে গেলুম। সে যদি ঠিক সময় চিঠি পাঠাতো, তা হ'লে এতদিনে কুমারবাহাদুর চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত।

গিরিজা। আমাদেরও বিলক্ষণ অসুবিধা হত।

কার্ত্তিক ও রতন এলেন

রতন, তুমি এঁকে সঙ্গে করে দোতলার ১৩ নম্বর ঘরে বসিয়ে রেখে এস। দরজায় একটা পুলিশ মোতায়েন ক'রে দিও। ত্রিদিবেন্দ্রবাবু, আপনি এর সঙ্গে যান।

রতন। আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, স্যর।

গিরিজা। ওঁকে আগে পৌঁছে এস।

ত্রিদিবেন্দ্র ও রতন চলে গেলেন

আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল। ইনিও তো স্বীকার ক'রে বসলেন।

টেলিফোনের ঘন্টি বাজল। কার্ত্তিক ধরলেন

কার্ত্তিক। হ্যালো—হ্যাঁ, হোটেল 'ক্যাসিনো' থেকে বলছি। আমি কার্ত্তিক। আপিস থেকে—আচ্ছা। গুলি ব্রেণ ভেদ ক'রে গেছে?—তক্ষুণি মারা গেছেন।—রিভলভার পরীক্ষা করা হয়েছে? গুলিটা ঐ রিভলভার থেকেই ছোঁড়া —হ্যাঁ। সাইলেন্সার ফিট করা ছিল—ঠিক হয়েছে, তাই কেউ শব্দ শোনে নি। ওঃ, এখানকার লাইসেন্স নয়। নাম ধাম পরে পাওয়া যাবে। নোট আর অ্যাশট্রের আঙ্গুলের ছাপ এক নয়?—রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বলবেন—আচ্ছা।

ফোন রেখে দিলেন

সব শুনলেন তো?

গিরিজা। বংশীকে তবে বাদ দেওয়া যেতে পারে। একটু আগে আমরা তো ওকেই দোষী মনে করেছিলুম।

রতন এলেন

এই যে রতন, কি বলবে বলছিলে না?

রতন। আজ্ঞে, কিছুক্ষণ আগে যে টেলিফোন ক্লার্ক রাত্রে ডিউটিতে থাকে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বললে —কাল রাতে কুমারবাহাদুর লাইন চেয়েছিলেন।

গিরিজা। তিনিই যে চেয়েছিলেন তা সে কি করে বুঝলে?

রতন। ঘরের নম্বরে আর গলার আওয়াজে। তিনি প্রায়ই টেলিফোন ব্যবহার করতেন। তাই তাঁর গলার আওয়াজ তারা চিনত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লাইন চেয়ে তিনি রিসিভার রেখে দিয়েছিলেন।

কার্ত্তিক। ক'টার সময়?

কার্ত্তিক নোট বই দেখতে লাগলেন

রতন। রাত দু'টো।

কার্ত্তিক। কি ক'রে জানলে?

রতন। খাতায় ওরা লোকের নাম আর সময় টুকে রাখে।

গিরিজা। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। বাইরেই থেক।

রতন চলে গেলেন

কার্ত্তিক। কি রকম বুঝছেন স্যর?

গিরিজা। আর কিছুক্ষণ এ রকম চললে পাগল হয়ে যাব।

কার্ত্তিক। হোটেলের লোকেরা মিথ্যে কথা বলছে। একজনের সঙ্গে আর একজনের কথা মিলছে না। এই ধরুন, বংশী আর গণেশবাবুর কথা।

গিরিজা। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে হাজির করি! রতন!

রতন এলেন

বংশী আর গণেশবাবুকে এক্ষুণি আসতে বল।

রতন চলে গেলেন

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) সাড়ে বারোটার সময় টেবল্ ল্যাম্প ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, অথচ একটার সময় বনমালীবাবু এসে ল্যাম্পকে জ্বলন্ত অবস্থায় সুস্থ শরীরে দেখতে পেলেন—

গিরিজা। কিছুই বুঝতে পারছি না।

কার্ত্তিক। কুমারবাহাদুর কিন্তু বেশ রসিক লোক। একবার সাড়ে বারোটায় মরলেন, আবার দেড়টার সময় ঝুটোপুটি করে মরলেন। তারপর দু'টোর সময় টেলিফোন করতে গেলেন এবং তাতেও মত বদলালেন। কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারলেন না। তার ওপর আবার বনমালীবাবুর পকেট থেকে কুমারবাহাদুরের রক্তমাখা রুমাল আর ত্রিদিবেন্দ্রবাবুর জুতায় রক্ত—আর ঘর থেকে খালি কার্ট্রিজ কেস পাওয়া গেল।

গিরিজা। এ দেখছি সব ভুতুড়ে কাণ্ড।

দরজায় খটখট ধ্বনি

কে। কার্ত্তিক দেখ ত।

কার্ত্তিক। (দরজা খুলে দেখে) আসুন গণেশবাবু, ভেতরে আসুন।

গণেশ এলেন

গণেশ। আবার হামিকে কি জন্য বুলায়েছেন?

গিরিজা। কাল রাত্রে লিফ্‌ট কাজ করছিল না বলে আপনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিলেন—না?

গণেশ। এ কথা তো আগেই বলেছে।

গিরিজা। কিন্তু লিফ্‌টম্যান বলছে লিফ্‌ট কাজ করছিল। তারপর আপনি ওপরে এসে দেখলেন লিফ্‌ট্ খালি—কেমন?

গণেশ। হাঁ, তাতে কোন আদমী ছিলে না।

গিরিজা। কিন্তু সে বলছে যে লিফ্‌ট্ ছেড়ে সে একদণ্ড কোথাও যায়নি।

গণেশ। তার হামি কি করতে পারে?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ রায়   বাল্মিকি   ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
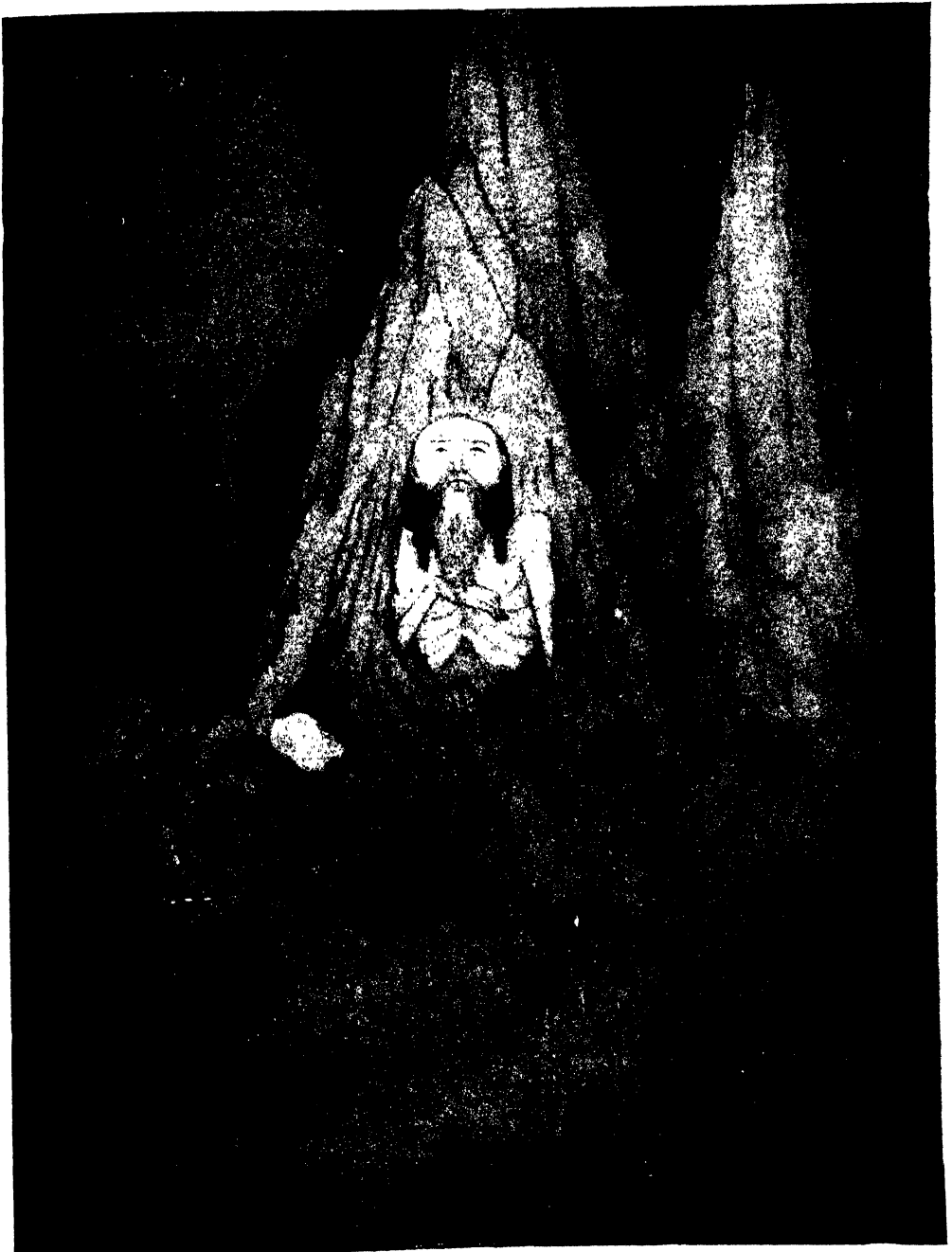
গিরিজা। কোন্‌টা সত্যি?

গণেশ। হামি জানে না। লেকিন মিথ্যে কথা বোলবার জন্য ঝুটমুট এতনা সিঁড়ি উঠিবার হামি হাসি দেখে না।

গিরিজা। লিফ্‌ট্‌ম্যানও এখুনি এল’ বলে।

গণেশ। হামাকে আগে বুলালেন কেন? কত কাজের লুকসান—

রতন এলেন

রতন। বংশী এসেছে।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

রতন চলে গেলেন ও বংশী এলেন

বংশী, কাল গণেশবাবুকে লিফ্‌টে ওপরে এনেছিলে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। উনি কিন্তু তা অস্বীকার করছেন।

বংশী চুপ করে রইল

তোমার কি বলবার আছে বল।

তবুও চুপ করে রইল

এই ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে। মিথ্যে কথা বললে বিপদে পড়তে হবে।

বংশী। আমার হয়ত’ ভুল হয়েছে। উনি যদি রাত্রে বাড়ী না ফিরে থাকেন—

গণেশ। হুঁ। এইবার হামি রাত্রে বাড়ী ফেরে না বলছে। সব ঝুট আছে—

গিরিজা। তুমি সব সময়েই লিফ্‌টে ছিলে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। একদণ্ডও লিফ্‌ট ছেড়ে যাইনি।

গিরিজা। গণেশবাবু, আপনি কি বলছেন?

গণেশ। হামি বলছে, কাল রাত্রে অনেকবার ঘণ্টি বাজিয়ে লিফ্‌ট্‌ নামলে না দেখে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ওপরে এসেছে। এসে দেখছে যে লিফ্‌টে কোন আদমী নেই।

গিরিজা। বংশী, সত্যি বল। হত্যা সম্বন্ধে কি জান?

বংশী। (ভীতভাবে) আজ্ঞে, কিছু না। আমি এ সবের কিছুর মধ্যে নেই। (একটু থেমে) আমি হুজুর কাল লিফ্‌টে ছিলুম না।

গিরিজা। তুমি ছিলে না! তবে কে ছিল?

বংশী। অনাথ।

গিরিজা। অনাথ কাল ছুটিতে ছিল না?

বংশী। শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে বলে আবার কাজে লেগেছিল। বলেছে শনিবারে ছুটি নেবে। অবশ্য কর্ত্তা জানেন না।

গণেশ। যো কোই ছিল হামি হেঁটে সিঁড়ি উঠেছে। এবার হামি যাচ্ছে। হামার অনেক কাজ পড়ে আছে—

গিরিজা। আপনি এবার যেতে পারেন। ধন্যবাদ।

গণেশ চলে গেলেন

কার্ত্তিক। (নোট বইয়ে কাটাকুটি করে) এতক্ষণ এ কথা বল’নি কেন।

বংশী। চাকরির ভয়ে।

গিরিজা। যত সব মিথ্যা বলে সব পণ্ডশ্রম ক’রে দিলে। যাও এখান থেকে। অনাথকে পাঠিয়ে দাও।

বংশী। সে নিজের বাসায় গেছে—

গিরিজা। যেখান থেকে হোক তাকে ধরে আন। তোমার জন্যই যা-কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। যাও—

বংশী চলে গেলেন

কার্ত্তিক। সব বুঝি ভেস্তে যায়।

গিরিজা। আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

কার্ত্তিক। এই সময় আর এক কাপ চা খেলে ধাতস্থ হওয়া যেতে পারে।

গিরিজা। হুঁ। রতন!

রতন এলেন

নীচে থেকে এখুনি আসছি। দরজা থেকে নড়ো না।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার্ত্তিক। ঘরে চাবিও দিয়ে যেতে হবে।

গিরিজা। নিশ্চয়ই।

সকলে চলে গেলেন

ক্রমশঃ

বনবাস

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

দিনকতক বাহিরে যাইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষার খাতাগুলাও দেখা হইবে, শরীরটাকে কতকটা চাঙ্গা করিয়া লওয়া হইবে। স্থান নির্ব্বাচন করাই মুস্কিল। যেখানেই অজ্ঞাতবাস করি না, "স্যার, আমার নম্বরটা স্যারের" দল সেখানেই হানা দেয়। জগদীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিরাজমান কি-না সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহারা অমনিপ্রেজেন্ট ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। এক সহকর্ম্মী কহিলেন, তাঁহার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় এককালে রহমতপুরে একখানি সুন্দর বাঙলো নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দু'একবার গিয়াছিলেনও, শেষকালে রামঃ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাঙলোখানি পড়িয়া আছে। জলবায়ু উত্তম, স্থানও নির্জ্জন। দু'তিন ক্রোশের মধ্যে বসতি নাই, মানুষের মুখও দেখা যায় না, গরু বাছুরও বিরল। ষ্টেশন হইতে তিন মাইল মাঠের মধ্য দিয়া পথ। মাইল চারেক দূরে একটি গ্রামে সপ্তাহে একদিন হাট বসে, খাদ্যদ্রব্যাদি সেই হাটে সংগ্রহ না করিলে একাদশীর ব্যবস্থা প্রশস্ত। আমি এই রকম স্থানেরই সন্ধান করিতেছিলাম। বাঁচা গেল—বলিয়া যাত্রা করিলাম। ছোট ষ্টেশন, ফ্ল্যাগ ষ্টেশন বলিয়াই মনে হইল। শ্লো প্যাসেঞ্জার ছাড়া অন্য গাড়ী থামে না; ষ্টেশনে মাষ্টার, পোর্টার, ঘণ্টি-মারো, সিগন্যালম্যান যা-কিছু সব একজন। তিন মাইল হাঁটিয়া বাঙলোয় আসিয়া উঠিলাম। স্থানটি বিহারের অন্তর্গত হইলেও মার্চ্চমাসের শেষেও খুব গরম নয়। হাঁ, নির্জ্জন যাকে বলে—এতখানি পথ আসা গেল, একটি জনমানবের মূর্ত্তি দেখিলাম না।

সেদিন হাটবার, চাকরেরা হল্লা করিয়া হাট করিতে গেল, বাসায় একলাই রহিলাম। বনবাস বলা যায় না, কেননা বন বড় নাই, তবে প্রান্তর-বাস নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙলোর বামদিকে রশি পাঁচেক দূরে একটি মসজেদ, তাহার নীচে একটি পুকুর; আর সামনে খানিকটা তফাতে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। অতীতকালেও বোধ করি হিন্দু মুসলমানের সমস্যাটা একদিন জটিল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সামঞ্জস্য-বিধান জন্য উভয় পক্ষকেই ঐ ভাবে শান্ত করা হইয়া থাকিবে। মসজেদের পুকুরটা ছোট কিন্তু পরিষ্কার, জল যেন কাচ, তর তর করিতেছে। বসিয়া বসিয়া সেইটাই দেখিতাম। আর কি দেখিব, ছাই? কোনদিকে যে কিছু নাই!

মসজেদটায় মাঝে মাঝে অনেক লোকসমাগম হইত। কোথা হইতে আসে কে-জানে। আজান শুনিবামাত্র পিল্ পিল্ করিয়া লোক আসিত। পুকুরে নামিয়া হাত পা ধুইত; মসজেদের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ও বসিয়া উপাসনা করিত।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, এত বড় দিগন্তব্যাপী প্রান্তরটা—একটাও গাছ নাই কেন? এ অঞ্চলে মহুয়া গাছ ত প্রসিদ্ধ, তাহাও যদি একটা থাকিত তবে খানিকটা সবুজও চোখে পড়িত, তা'ও না। ঘাস, তা'ও নয়। যদি বা কোনখানে খানিকটা ঘাস দেখা যায়, সেগুলার রূপ ও রঙ এমনই যে ঘাস মনে না হইয়া কাঁকরই মনে হয়। অজ্ঞাতবাসের পক্ষে উত্তম স্থান সন্দেহ নাই। তবে মনে হইতেছে এতখানি উত্তম না হইয়া কিঞ্চিৎ অধম হইলেই ভাল হইত।

মাঠে মাঠে সকাল বিকাল একটু ঘুরি—কিন্তু ভাল লাগে না। মাঠ হইলে ভাল লাগিত, দুদশটা গরু চরিতে দেখা যাইত, দু'টা ড়হর জনারের ক্ষেত্র দেখিতাম, কিন্তু এ যে তা'ও না। সহকর্ম্মীর শ্বশুর মহাশয়কে ধন্যবাদ দিব কিম্বা নিন্দা করিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। লক্ষ্মণ যদি সীতাদেবীকে এই রকম স্থানে বনবাসে দিয়া যাইতেন, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি দেবী একটি দিনও বাঁচিতে পারিতেন না। লব কুশের হাতে বীণ্ দিয়া রামায়ণ গান গাওয়াইবার সাধও—না ফুটিতে ফুল ঝরিত মুকুল হইত না। আমাদের নাকি ছেলে-ঠেঙ্গান কড়া জান, তাই এই ধাপ-ধাড়া প্রান্তরবাসেও অক্ষুণ্ণ অখণ্ড রহিয়া গেলাম।

সেদিন দূরে বেড়াইতে না গিয়া, সেই মন্দিরটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যা হয় নাই, তবে খুব বেশী দেরীও নাই; আলো আকাশ ছাড়িয়া যায় নাই, যাইবার জন্য

প্রস্তুত বটে! বিদায়কালে লালসা-করুণ চোখে পৃথিবীটা দেখিয়া লইতেছে। ওদিকের মসজেদটায় নমাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটা খুবই কাছে, মাঠ পার হইয়া গেলে হয়ত তিন চার মিনিটও লাগে না, রাস্তা ঘুরিয়া গেলে অনেকটা পথ। মন্দিরের ভিতরটায় অন্ধকার, সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া বিগ্রহটি কি তাহাই ঠাহর করিবার চেষ্টা করিতেছি, শুকনো খেজুর গাছ সদৃশ একটি মেয়ে ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—তুমি বামুন?

প্রশ্নটা এত অকস্মাৎ, আর অকস্মাৎ বলিয়া এত অভদ্র যে জবাবটা মুখে আসিয়াও আসিল না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে বোধ করি বুঝিয়া লইল, আমি নিম্নজাতীয় লোকই হইব; বলিল—বামুন নয়, তবে আর কি হবে!—তাহার কথাগুলা নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

এবার কথা কহিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, বামুন হ'লে কি হ'ত?

মেয়েটি যেন রণচণ্ডী। ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কি আবার হবে! বাবার মাথায় দু'টো ফুল ফেলে দিতে। সারাদিন বাবার মাথায় আজ জল পড়লো না।

আমি যে দেখলুম, তুমি পূজো ক'রে প্রণাম করে উঠলে!

মেয়েটি উগ্রস্বরে বলিল, পূজো করলুম না আমার মুণ্ডু করলুম! মাথা করলুম। আমি শুধু ফুল বিল্বিপত্তর আর নৈবিদ্যিটা নামিয়ে রেখে বললুম—বাবা মহাদেব, আমাদের অপরাধ নিয়ো না বাবা। আমি এই সব রেখে যাচ্ছি, তুমি আপনি চান করো, আপনি খাও।

আমি বলিলাম, ঐ ত পূজো হলো। ওর নামই পূজো।

মেয়েটা এইবারে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দূর! মন্তর না বললে বুঝি পূজো হয়! তুমি আমারই নত মুখ্যু। বামুন হ'লে জানতে, মন্তর না পড়লে ঠাকুরদের পূজো হয় না।

হয়ত তাহার কথাই ঠিক। বহুবিধ জটিল শব্দ সমন্বয়ে বহুল অং বং ব্যতিরেকে ঠাকুরদের হয়ত ক্ষুধাও হয় না, আহারে রুচির উদ্রেকও হয় না—তাই আজও এমন মন্ত্র রচিত হয় নাই যাহাতে অং বং না আছে। দেবতারা দেবভাষা ছাড়া অন্য ভাষাও বোধ করি জানেন না, তাই বিবাহে শ্রাদ্ধে দেবভাষা উচ্চারণ করিতে যাহাদের কণ্ঠতালু আরবের মরুভূমি হইয়া যায়, তাহাদিগকে দিয়াও মটর কড়াই গন্ধ পিষাইয়া লইবার সনাতন ব্যবস্থা আজও অব্যাহত।

মেয়েটি কিছুক্ষণ ম্লানমুখে মন্দিরের বিগ্রহের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি আর কি করবো ঠাকুর, বাবা আসতে পারলে না; নিশ্চয়ই কাজে আটকে পড়েছে, তুমি ত জানতেই পারছ ঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না। বলিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিল; শিকলটা তুলিয়া দিয়া আমাকে বলিল, তুমি বুঝি ঐ বাড়ীটায় থাকো? রোজ এই দিকে তুমিই হাঁ করে চেয়ে বসে থাকো, না?

কথাগুলা এমন রসকসহীন এবং বলার ভঙ্গিটাও এমন কদর্য্য যে ঠাস্ করিয়া চড় বসাইয়া দিতে ইচ্ছা করে।

সে আবার বলিল, কি দেখো বল ত?

রাগ ভুলিয়া, একটু রসিকতা করিলাম। বলিলাম, আর কি দেখবো, তোমাকেই দেখি!

মেয়েটা যে এমন কদর্য্য অর্থ করিবে তাহা জানিলে ও পথেই ঘেঁসিতাম না! বলিল কি-না, ঘরে বুঝি তোমার মা মেয়ে নেই! মর মিন্সে!

কিন্তু আমি যে অসদভিপ্রায়ে ঐ কথা বলি নাই সেই কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিব, সে কিন্তু সে সময়টুকুও দিল না। গায়ের আঁচলটা টানিয়া, চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি ডাকিলাম, শোন, শোন খুকী—

মেয়েটা আরও জোরে জোরে চলিতে চলিতে বলিল, তোর মা খুকি, তোর বোন্ খুকি, তোর সাতপুরুষ খুকী!—অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাগিব কি, হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলাম। হাঁ, পাড়াকুঁদুলী বটে! মা, বোন, মেয়ে ইহারা যে পুরুষ-জাতীয় জীব নয় এবং সাতপুরুষের তালিকায় তাহাদের স্থান থাকিতে পারে না, কোঁদলের সময় সেটুকু তারতম্য করিবার দরকারও দেখিল না। বংশের আগত বিগত ও অনাগত নারীমাত্রকেই এককথায় পুরুষ বানাইয়া দিয়া কেমন হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। বাহাদুরী আছে বটে!

পরদিন প্রাতঃভ্রমণ করিয়া আসিয়া বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিলাম। চাকর পড়িবার বই, অভিধান, খাতা-পেন্সিল, চুরুট-দান রাখিয়া গেল। একটা চুরুট ধরাইয়া মন্দিরটার পানে চাহিয়া রহিলাম। চাহিয়া থাকাও মুস্কিল, কেবল হাসি আসে। অজীর্ণ রোগীর পেটের ভিতরটা গুলাইয়া

উঠিয়া শুড় শুড় করিয়া উপরের দিকে কি-যেন উঠিতে চায়, আমার হাসিটাও তেমনই। যত মনে করি আর কত হাসিব, ততই হাসি আসে। আর আসিলে থামাইতে পারি না। বই খুলিলাম, কিন্তু পড়িব কি ছাই, হাসি আসে আর অন্যমনস্ক করিয়া দেয়। এমনই হাসিতে হাসিতে বইএর পাতা হইতে চোখ তুলিবামাত্র দেখি, মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সেই মেয়েটি দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত করিয়া আমাকে কদলী ভক্ষণের নির্দ্দেশ দিতেছে। তা'ও একবার দুইবার নয়, বোধ করি মিনিট দুই তিনের মধ্যে সে আমাকে ঝুড়িখানেক মর্ত্তমান রম্ভা ভোজন করাইল। ফলে যা হইল, তাহা ভীষণ। এতক্ষণ যে হাসিটা পেটের ভিতরে ও দু'টি বন্ধ ওষ্ঠাধরে নিবদ্ধ ছিল, তাহাই এক্ষণে সশব্দে উৎকট হইয়া বাহিরিয়া পড়িল। আমি যত হাসি, সে তত কলা আগাইয়া দেয়। হাসির শব্দটা যে এত জোর হইয়াছিল, তাহা বুঝি নাই। ঠাকুর, চাকর, মায় দরোয়ান আসিয়া উঁকি দিতেছে দেখিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু 'তা সে হবে কেন'! কলার কাঁদি তখনও অকৃপণ করে ও অকাতরে বিতরিত হইতেছে। আমি মুখে রুমাল গুঁজিয়া ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িলাম। মেয়েটার কলার কাঁদি বোধ হয় নিঃশেষ হইয়াছিল। করিল কি জানেন? একবার দাঁত খিঁচাইয়া, দীর্ঘ জিব বাহির করিয়া, আবার দাঁত খিঁচাইয়া, দুপ্ দুপ্ করিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া গেল।

ঘড়িতে দেখিলাম, ১২টা বাজে। স্নানাহার করিতে হয়। কিন্তু অতগুলি কলার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলে সুস্থির হওয়াও যায় না। চাকরকে ডাকিয়া বলিলাম, স্নানের জল ঠিক কর, আমি আসছি।

মন্দিরের সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া মেয়েটি এদিকে চাহিয়া আমাকে দেখিবামাত্র—ও বাবা, দেখো না—বলিয়াই হুড় মড় করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। আমি যে মা কালীর লক্ লকে জিহ্বাখানি কাটিতেই আসিয়াছি বুদ্ধিমতী তাহা ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু আমার যে ভাব না করিলেই নয়। কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন দরজা খুলিল না, তখন যেন চলিয়া যাইতেছি এই ভাবে শব্দ করিয়া বাঁ দিকে সরিয়া গেলাম। মেয়েটাও বুঝিল, আমি চলিয়া গিয়াছি, তবে সে নাকি অনেকগুলা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে, একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। দরজাটা একটুখানি খুলিয়া, মুখ বাড়াইয়া উঁকি মারিয়াই—ওগো বাবা গো—বলিয়া ঝপাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এবার খিল আঁটিবার শব্দটুকুও পাওয়া গেল। সুতরাং আজ আর বৃথা চেষ্টা—ভাবিয়া চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়—কাকে চান ম'শয় আপনি?—ফিরিয়া দেখি, মেয়েটার বাবাই হইবেন, চেহারা একই রকম বটে! বলিলাম, চাই নে কাকেও, মন্দিরে ঠাকুর দেখতে—

কোথায় থাকা হয়? আপনারা? এই পটলি হারামজাদি, দরজা বন্ধ ক'রে কি করছিস্? দরজা খোল্। হ্যাঁ, কোথায় থাকেন বললেন?

আমি কিছুই বলি নাই, এখনও বলিলাম না। দরজা খুলিয়া গেল। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে পাশে সরিয়া গেল।

এই হারামজাদি, পা ধোবার জল দে না, বলিয়া ব্রাহ্মণ হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর অনেকটা মোলায়েম করিয়া বলিলেন, বাবার পূজো দেবেন?

পূজা দিতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু উদ্দেশ্য যে তাহাই এমন কথাও বলিলাম না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পটলি একটা কালো ছাতাধরা ঘটি আনিয়া সিঁড়ির উপর ঠক করিয়া নামাইয়া রাখিল। ব্রাহ্মণ পদপ্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। পটলি ভালমানুষটির মত দাঁড়াইয়া রহিল, একটু আগেও যে-আমাকে বাগান উজাড় করিয়া সাদরযত্নে অনেকগুলো কলা খাওয়াইয়াছে, সেই-আমার পানে একটি-বার ফিরিয়াও চাহিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্দিরে ঢুকিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজো দেবেন?

বলিলাম, আজ থাক্।

ব্রাহ্মণ চটিয়া গেলেন বুঝিলাম, কারণ একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ গর গর করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমিও ফিরিলাম। যাইতে যাইতে এইটুকু শুনিলাম, কে রে লোকটা? উত্তর হইল—ঐ বাড়ীটায় থাকে। পটলি নালিশ দায়ের করে কি-না জানিয়া লইবার জন্য এক মিনিট দাঁড়াইতে হইল। না, পটলি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সে জানিত, আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে দশগুণ ফিরাইয়া বলিবার মালমসলা সেই আমাকে অগ্রিম উপহার দিয়া রাখিয়াছে, আমি সেই উৎসৃষ্ট কলার কাঁদির সদ্ব্যবহার করিব। ব্রাহ্মণের হাতের

ঘণ্টা নড়িতে লাগিল, কাল ঠাকুরের উপবাস গিয়াছে আজ ভালই পারণ করিবেন ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

সেই একটিবেলা! ঠাকুর দিনান্তে ঐ একবারই খান। কারণ সন্ধ্যাবেলা পটলির বাবাকেও দেখিলাম না, পটলিকেও দেখিলাম না। ইহাদের ঠাকুরটি ভাল, অতিশয় নিরীহ এবং অল্পেই সন্তুষ্ট, সাধে কি আর আশুতোষ নাম! ওদিকের মসজেদটায় নমাজ হইতেছিল, প্রতিদিন বোধ করি প্রতি প্রহরেই হয়! ভোরে, প্রায় রাত থাকিতে আজানের বিচিত্র মধুর ধ্বনি শুনি; আবার দিবাবসানেও নিত্য সেই সুর কাণে বাজে। জানি-না একই লোক আজান্ দেয় কি-না, যেই দিক্, কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট, তেমনই উচ্চ। সুগায়কেরা কণ্ঠ সাধনা করিয়া থাকে শুনিয়াছি; ইহারাও তাহাই করিয়াছে সন্দেহ নাই। বিহারের পল্লীগ্রাম, কিন্তু মুরগীর ডাকে কোনদিন ঘুম ভাঙে নাই, ঐ আজানই আমার নিদ্রাভঙ্গ করিত। ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিতে যা বুঝায় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর কখনও হয় নাই। তবে ভোরের বেলা বিছানায় আড়মোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এই কথাটাই ভাবিতাম—এই যে নিরলস নিষ্ঠা, অখণ্ড ঐকান্তিকতা, অন্যে এমনটি দেখি না কেন? কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের ভোগারতি দিনে-রেতে পঁচিশবার হয়, হোক্—চিরদিন হোক্; কিন্তু সে যাহারা করে, যাহারা দেখে, সে শুধু তাহাদেরই—কাশীর বাবা বিশ্বনাথ বিশ্বব্যাপী, সে ভক্তের মনে, তিনি ত সর্ব্বত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া নাই! কাশী গিয়া, বৈদ্যনাথে গিয়া, তারকেশ্বরে গিয়া, চন্দ্রনাথ কেদারে গিয়া হত্যা দিবার মাথা খুঁড়িবার লোকের অভাব নাই, তা'ও জানি। কিন্তু আমি এখানে নিত্য যে দৃশ্য দেখিতেছি, যে করুণ-গম্ভীর প্রার্থনা নিয়ত শুনিতেছি, তাহার সঙ্গে মিল কোথায় আছে কিছুতেই খুঁজিয়া পাই না কেন? দূরে কাছে বস্তী ত বড় কথা, একখানি কুটীর পর্য্যন্ত দেখি না, অথচ আজানের আহ্বানে এতো লোক জড়ো হয় কোথা হইতে? কই, ঐ মন্দিরে ত মহাদেব রহিয়াছেন, কে আসে! যাক্, ধর্ম্মপ্রচার করাও আমার উদ্দেশ্য নয়, ধর্ম্মের গ্লানি করিবার জন্যও লেখনী ধারণ করি নাই। বড্ড কাছাকাছি—প্রায় পাশাপাশি জায়গায় যে দুইটা দৃশ্য নিয়ত চোখে পড়িতেছে, কিছুমাত্র সাদৃশ্য অথবা সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই কথাগুলি স্বতোৎসারিত হইয়া পড়িল।

পরীক্ষার খাতাগুলো ফেরত দিবার দিন সন্নিকটবর্ত্তী, কাল সারারাত খাতা দেখিয়াছি। ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিতে অনেক বেলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিয়া পড়িল। রাত্রে না ঘুমানোর ফল। দিবাভাগে আহার করিব না বলিয়া দিলাম। এক পেয়ালা চা ও পরে এক গ্লাস পাতিলেবুর সরবত খাইয়া বারান্দার ইজিচেয়ারটায় পড়িয়া রহিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বোধ হয়, হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু চাহিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখি, আমার স্নেহময়ী কদলীদাত্রী বাবার মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। বাবার বরাতে আহার তখনও জুটে নাই, বুঝা গেল।

পটলি আমাকে আসিতে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইল তরজা-গানটা মোহড়া দিয়া লইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, আমি কাছে আসিতেই একগাল হাসিয়া কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত মাড়ি বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—তবেরে মিথ্যেবাদী! তুমি ত বামুন। সেদিন যে বড় বললে বামুন নয়।

বলিতে পারিতাম যে এতবড় মিথ্যাটা শুধু সেদিন নয়, কোন দিনই বলি নাই; কিন্তু কিছুই বলিলাম না, শুধু হাসিলাম। আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে জামার বোতামগুলা দিই নাই—বোধ করি কদলীর লোভ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দুর্নিবার—আমার ব্রাহ্মণত্বের পতাকা দোদুল্যমান, তাহা দেখা যাইতেছিল।

পটলি বলিল, মহাদেবের পূজোটা ক'রে দাও না। বাবা সদরে গেছে মামলা করতে, বলেছিল ১২টার মধ্যে আসবে। তা দুটো বেজে গেল, এখনও এল না। বলিয়া সে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল।

আমি যখন বাসা হইতে বাহির হই, তখনই দেখিয়াছিলাম, ২টা বাজিয়া মিনিট দুই তিন হইয়াছে। পটলি সূর্য্যের পানে চাহিয়াই নির্ভুল সময় বলিয়া দিল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যদিও জানিতাম, এককালে সুইস্ ঘড়ীর নামও যখন কেহ শুনে নাই সূর্য্যঘড়ির চলনই ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিল। পটলি আবার বলিল, বাবা মহাদেব রোজ রোজ উপুসী থাকেন, সে কি ভাল? লক্ষ্মীটি, দাওনা দু'টো ফুল ফেলে—তুমি মন্তর জান ত! বলিয়াই একটু হাসিল; আবার বলিল, বামুন যখন, নিশ্চয়ই জান মন্তর।

বলিলাম, আমি প্রায় তোমারই মত বিদ্বান।

পটলি হাসিয়া বলিল, মিথ্যে কথা। না করবার শুধু ফন্দী।

কিন্তু আমি কথাটা মিথ্যা বলি নাই, পূজা-পাঠে আমি যে কোনদিন পটলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। শিবপূজার "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" পর্য্যন্তই আমার দৌড়। তবে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, বাসায় পঞ্জিকা আছে। আজকালকার পঞ্জিকায় গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়, সব মন্ত্রও আছে, শিবপূজার মন্ত্র থাকিবে না? বলিলাম, মন্তর ঠিক মনে নেই পটলি—

আমার নাম জানে রে! বলিয়া পটলি আবার সেই সিমলা-শিলঙবিস্তৃত মাড়ী বাহির করিয়া হাসিল।

হাত গুণতে জানি।

মাইরি? দেখনা আমার হাতটা! না, এখন নয়, আগে বাবার মাথায় জলটি দাও—

তবে দাঁড়াও, মন্তরের বইটা আনি।

বই কোথায়? বাসায়?

হ্যাঁ। যাব আর আসবো।

পটলি কিন্তু আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না; বলিল, তাই ব'লে পালাবে! ওরে ধূর্ত্তু। তা হচ্ছে না, তুমি থাক, আমি চেয়ে আনছি বই।

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, পালাব না, এখুনি আনছি।

পঞ্জিকায় মন্ত্র পাওয়া গেল। মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাই, পটলি গালে আঙুল রাখিয়া বলিল, হ্যাঁ গা, তুমি কি রকম বামুন গা? রাস্তার পায়ে বাবাকে ছোঁবে? দাঁড়াও, পা ধোও।—বলিয়া সেই বিবর্ণ ঘটিটি আনিয়া দিল।

বাবার মাথায় জল ঢালিলাম, কয়েকটি ফুলও দিলাম। দু'একটি পড়িয়া গেল, দু'তিনটি থাকিয়া গেল।

শাঁক বাজাইয়া পূজা শেষ করিয়া মুখ ফিরাইতে দেখি, পটলি ঠিক দরজার সামনে হাত দু'টি জোড় করিয়া বসিয়া আছে; দু'টি চোখে তাহার সহস্র ধারা। এ বস্তু জীবনে দেখি নাই; এমনটা যে সম্ভব হইতে পারে, ভাবিও নাই। চোখের জলে তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, আমি যে নিঃশব্দে তাহার পানে চাহিয়া আছি সে তাহা জানিতেও পারিল না। জানিলে বোধ হয় লজ্জা পাইত।

ঠিক তাই! আমি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, শতছিন্ন আসন, কুশগুলির খস্ খস্ শব্দ হইবামাত্র পটলি চকিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, আবার তখনি বসিয়া পড়িয়া মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করাটা, বোধ হয়, ছল। চোখের জল গোপন করিবার জন্যই ব্যগ্রতা।

আমি নিঃশব্দে পঞ্জিকাহস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পটলি একবার ওদিকে সরিয়া গেল, একটু পরেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ দু'টা তাহার সেই গড়ের মত কাপড় দিয়া খুব জোরে মুছিয়াছে, সেটা বেশ বুঝা গেল; ঘর্ষণের চোটে তাহার সেই প্রায়-মসীকৃষ্ণবর্ণ বেগুনের রঙ হইয়া উঠিয়াছে; চোখের পাতায় যে রোমগুলি, তাহাদেরই ফাঁকে ফাঁকে জলের সূক্ষ্মবিন্দুগুলি তখনও ছিল, তাহাও দেখা গেল।

বাহিরে আসিয়া পটলি বলিল, যেদিন বাবার আসতে দেরী হবে, তোমায় ডেকে আনবো কেমন? তুমি বেশ পুজো কর; খুব ভাল মন্তর পড়লে। বাবা কি যে বলে, কি যে করে কিচ্ছু বোঝা যায় না। আর এক মিনিটে সেরে দেয়।বাবা মহাদেব তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।

রঙ্গ করিয়া বলিলাম, কিসে বুঝলে?

ও আমি বুঝতে পারি। মহাদেব আমার সঙ্গে কথা কয়। খুব খুসী হয়েছেন।

আর তুমি? তুমি খুসী হয়েছ?

হিঁঃ, খুব—বলিয়া পটলি দাঁত ও মাড়ী দুইই দেখাইল। তাহার চোখের পাতাদু'টাও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বলিলাম, আর কলা দেখাবে না ত?

পটলি একটু দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, আমার পানে অমন হাঁ করে চেয়ে ছিলে কেন? তাই ত—

তোমায় দেখতে ভাল লাগে, তাই ত চেয়ে থাকি।

পটলি পূর্ব্বমূর্ত্তি ধরিবার উপক্রম করিতেছিল, বলিল, কেন, ভাল লাগে কেন? আমি কি সঙ?—বলিয়াই সে মন্দিরের ভিতরে ঢুকিতেছিল, আবার বলিল, যাই বাড়ী যাই।

তোমরা পাঠিকারাণীরা, যে কোন কদর্থ করিতে বাসনা কর করিতে পার, আমি কবুল করিতেছি, পটলির সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইবার বাসনা আমার এতটুকু ছিল না; বলিলাম, এখনি বাড়ী গিয়ে কি করবে, বসোনা, একটু গল্প করি।

পটলির সোজা জবাব—ওঃ, কি আমার মাসীমার কুটুম্ব এলেন গো। তিনপোর বেলায় আমি ওঁর সঙ্গে বসে গল্প করি, আর ক্ষিধেয় আমার পেট চুঁই চুঁই করুক। ভারি কথা বললেন!

এত বেলা পর্য্যন্ত খাওনি?

ঠাকুরপূজো না হ'লে কেউ খায় নাকি? তুমি কি ভাত খেয়েদেয়ে বাবার পুজো করলে নাকি? ওমা, কেমন বামুন তুমি!

না, ভাত খাইনি।

তাই বল!—বলিয়া পটলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন বাঁচিল। বলিল, এখন খাওগে না।

আজ আর খাব না। তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কতদূর?

তা' এক ক্রোশের বেশী।

মনটা দুঃখে ভরিয়া গেল। এই রৌদ্রে একক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেলা ৪টার সময় এই কচি মেয়েটা দু'টা ভাত খাইতে পাইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের বাড়ীতে আর কে আছে পটল?

পটলি ঝঙ্কার দিয়া বলিল, মিন্সের আবার সোহাগ হচ্ছে, পটল! পটল নয় গো ঠাকুর, পটল নয়, পটলি! পটল যে পুরুষ মানুষের নাম, ঘটে এটুকু বিদ্যেও নেই বুঝি?

না, ঘট একেবারে খালি। কে আছে বললে না?

কে আবার থাকবে, আমি আর বাবা।

তোমার মা?

নেই, ওবছর মরে গেছে।

এখন বাড়ী গিয়ে রাঁধতে হবে ত?

না। সকালে রেঁধে রেখেছি।

কি রেঁধেছ?

কেন, শুনে তোমার কি হবে? খাবে? চল, ভাত দোব, সিম সেদ্ধ দোব, মুশুরির ডাল দোব। যাবে? তুমি ভাত খাওনি কেন?

প্রশ্ন করিয়া উত্তর শুনিবার ধৈর্য্য পটলমণির নাই; পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, তোমার বউ কোথা?

মারা গেছে।

আর বিয়ে করনি?

না।

' কেন করো নি?

একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ চুণ করিয়া বলিলাম, মনের মত ক'নে পাইনি পটল। তুমি যদি রাজী থাক ত বলো—

পটলি চোখ পাকাইয়া হাতের ঘটিটা তুলিয়া বলিল, দেখেছ এই ঘটি, মাথায় মারলে—

মাথা ভেঙ্গে যাবে, কেমন?

হ্যাঁ। একেবারে হিলু বেরিয়ে যাবে।—বলিয়া দুপ দুপ করিয়া মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া নৈবেদ্যের আলোচাল কয়টি (আর কিছু থাকে না) আঁচলে বাঁধিয়া মন্দির বন্ধ করিয়া পথে নামিয়া পড়িল; আমার প্রতি দৃকপাতও করিল না। আমি কিন্তু সঙ্গ ছাড়িলাম না। কয়েক পা গিয়া পটলি থমকিয়া দাঁড়াইল, তুমি 'পেছনে পেছনে' (বলা বাহুল্য, সে অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল) কোথায় আসছ?

বলিলাম—কেন, এই যে বললে ভাত দেবে, ডিম সেদ্ধ দেবে—

পটলি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি দোব?

ডিম সেদ্ধ, পাঁঠার কালিয়া—

চোখমুখ ঘুরাইয়া পটলসুন্দরী বলিল—আহা, ন্যাকরা দেখে আর বাঁচি নে! যাও, বাড়ী যাও।

দু'চারবার মুখ ঝামটা খাওয়ার পর সন্ধি হইয়া গেল। যে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা গেল, প্রোফেসরীর পক্ষে সেগুলা অপ্রয়োজনীয় হইলেও বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য নয়। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে—তাহা পটলি জানে না—দেব সেবার উদ্দেশে অথবা সেবায়েতের উদ্দেশ্যে দশ বিঘা জমি লাখেরাজ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে। একজন সাঁওতাল-ঘাটোয়াল দশ বিঘার এক বিঘা ভোগা মারিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া পটলির বাবাকে প্রায়ই সদরে মামলা করিতে যাইতে হইতেছে। পটলিদের বড় কষ্ট। একখানি বই কাপড় নাই, এইটি পরিয়া স্নান করে, গায়েই শুকায়; কাপড়খানিও শতচ্ছিন্ন, শত সেলাই, বুঝি সেলাইয়েরও আর যায়গা নাই। তাহার উঠানের বেড়ার গায়ে ক'টা সিম গাছ হইয়াছে, সেইগুলিই তরকারী; নুন কেনে, কিন্তু তেল কেনে না, অত পয়সা নাই। পটলি এই বলিয়া উপসংহার করিল, পেটে দু'টো গেলেই হোল; তুমি কি বল, তাই না?

আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল; পটলি পাছে দেখিয়া ফেলে ও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় গালির ছড়া সুরু করিয়া দেয়, তাই অন্য দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম—পটলি, আমি যদি একজোড়া নতুন শাড়ী দিই, তুমি নেবে?

পটলি বিনাদ্বিধায় বলিল, হিঁঃ, কেন নোব না? তবে এমনি এমনি নোব না, তুমি মন্দিরে বাবাকে উচ্ছুগ্যু ক'রে দিলে নোব।

এইটুকু এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটার দেবতায় ভক্তি দেখিয়া মনটা ভারী প্রসন্ন হইল। কোন কথা বলিবার আগেই পটলি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর মাটীতে বার কতক মাথা ঠুকিয়া এক-কপাল ধূলা লইয়া দাঁড়াইতে, আমি বলিলাম—ওকি পটুলি, অত ঘটা ক'রে মাথা ঠোকা হোল কার কাছে? আমার কাছে নাকি?

পটলি মুখ গম্ভীর করিয়া, জিব কাটিয়া বলিল—ছিঃ, বলতে নেই!—বলিতে বলিতে তাহার মুখটা হাসিতে ভরিয়া গেল। আবার বলিল, উঃ, বাবা মহাদেব কি জাগ্রত ঠাকুর দেখ্‌লে! তাহার মুখখানি ভক্তির আলোকে যেন উজ্জল হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুই ত দেখলুম না। কিন্তু হঠাৎ ও কথা মনে হোল কেন বল ত পটুলি?

পটলি বলিল, শুনবে কেন? তবে শোন, বলি। কাল রাত্রে বাবাকে মনে মনে বলছিলুম, বাবা কাপড়খানি যে একেবারে শতকুটি হয়ে গেছে বাবা, আর যে পরা যায় না! বাবা তাইতেই আজ তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে বলে দিয়েছেন, কাপড় দিতে।—হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা তোমায় স্বপ্ন দিয়েছেন না গো? —পটলির করুণ চোখ দু'টিতে যেন জল আসিয়া পড়িতেছিল।

আমি হাসিলাম, কিন্তু হাঁ অথবা না কিছুই বলিলাম না। তাহার অগাধ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিতে কষ্ট হইতেছিল। পটলি বকিতে বকিতে চলিল—বাবাকে উচ্ছুগ্যু না ক'রে আমি কিছু খাই নে, পরি নে। আঁচলে বাঁধা চাল ক'টা দেখাইয়া বলিল, কালকে এই ক'টা রাঁধবো। আজ আর গাছে সিম ছিল না, বাবাকে দিতে পারি নি, তাই কাল আর সিম সেদ্ধ করবো না, শুধু ভাতই রাঁধবো। নুন আর ভাত।

অশ্রু সম্বরণ করা ক্রমেই অসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু ভয়ও ছিল। আমার প্রাস্তর-প্রিয়তমার যে মেজাজ্—বাপ্! মাঠের শেষে একটা গ্রাম দেখা যাইতেছিল, মুখটা ঘুরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিলাম।

পটলি বলিল, সত্যি তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?

এই ত যাচ্ছি, দেখছ না?

রোদে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

না। তোমার কষ্ট হয়?

আমার! বলিতেই সে কি হাসি। পটলি যেন লুটাইয়া মাঠের সেই আলের উপর শুইয়া পড়ে! অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল, যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে এমন হাসি। তারপর বোধ হয় পেটে খিল ধরিয়া গেল, পটলি হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, আমি যে ঠাকুর, ছ' বছর বয়েস থেকে এই কুড়ি বছর বয়েস পর্য্যন্ত রোজ—রোজ—রোজ আসছি, আর যাচ্ছি। রোদ্দুর, বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুৎ, শিল কিচ্ছু মানিনে! বুঝলে ঠাকুর।

তোমার বয়স কত বললে? কুড়ি?

হ্যাঁ, কুড়িই ত! এই ভাদ্দর মাসে একুশ হবে। কেন?

বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও বলিলাম, তোমার বিয়ে হয় নি সে ত বুঝতেই পারছি। তোমার বাবা বিয়ে দেবে না?

পটলির স্পষ্ট কথা। বলিল, দিলেই বা করছে কে? আর বিয়েতে টাকা লাগে না বুঝি!

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলাম—যদি কেউ টাকা না নিয়ে বিয়ে করে?

কার মরণ নেই এই স্যাওড়াতলার পেত্নীকে বিয়ে করতে যাবে!

কথাটা মিথ্যা নয়, অতিরঞ্জিত একটুও নয়! পটলি যদি কাছা দিয়া কাপড় পরিত, আর গায়ে একটা গেঞ্জি দিত, কাহার সাধ্য বলে যে সে স্ত্রীজাতীয়া এবং যৌবনটা পার করিয়া আরও অনেকখানিদূর আগাইয়া গিয়াছে। বিধাতা যেন বাঁকুড়া দেশের রাখাল-ছোড়ান্ গড়িতে গড়িতে রাগ করিয়া মাঝখানেই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, যা মরগে যা! কিন্তু নারীই যখন গড়িয়াছেন, তখন উহার যোগ্য পুরুষ গড়েন নাই কি? কুম্ভকার হাঁড়ী গড়িয়াই কর্ত্তব্যের শেষ করে না, সরাও গড়ে।

আবার বলিলাম—ধরো, তেমন লোক যদিই থাকে—যদি কেউ টাকা না নিয়ে তোমায় বিয়ে করে ?

পটলি আমার পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া, বোধ করি বা বুঝিতে চেষ্টা করিল যে আমি রহস্য করিতেছি কি-না। তারপরই হাসিয়া ফেলিল ; বলিল—তুমি করবে নাকি ?

আমি মনের ভিতরে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। এ কথা শোনাও বরাতে ছিল! হা হরি! বলিলাম—না, আমি নয়। তবে অন্য সম্বন্ধ করতে পারি, যদি তুমি বল।

বাবাকে বলো, বলিয়া পটলি বাঁধের ধারে একখানা মাটির ঘর দেখাইয়া বলিল, ঐ আমাদের বাড়ী। হ্যাঁগা, সত্যি তোমার খাওয়া হয় নি ?

আজ খাই নি, পটলি, সত্যি।

পটলি মুখখানি করুণ করিয়া কণ্ঠস্বরে মিনতি ভরিয়া বলিল—দুটি ভাত খাবে আমাদের ঘরে? শুকনো কড়কড়ে হয়ে গেছে, তা কি করবো বলো, সেই কোন্ সকালে রেঁধে মন্দিরে গেছি। বল না, খাবে দু'টি ?

তাহার এই অভুক্ত সঙ্গিটির জন্য তাহার কাটখোট্টা হৃদয়ের অভ্যন্তরটা আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনে করিতেই আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম, কাল রাত্রের খাওয়াটা হজম হয় নি বলেই আজ খাই নি। একেবারে রাত্রে খাব।

বলিতে বলিতে আমরা তাহাদের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই আমার সিম্ গাছ—পটলি দেখাইল।—তুমি সিম্ খাও ?—খাই শুনিয়াই বলিল, আজ খাবার মত হয় নি, কাল তোমার জন্যে চাট্টি নিয়ে যাব।

দাঁড়াও, তোমায় একটা বসবার যায়গা দিই, বলিয়া পটলি দরজার তিন পয়সানে তালাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কে জানে আসন-ফাসন আছে কি-না! নেই বোধ হয়। ওমা, একি কাণ্ড ?

আসনের কোন দরকার নাই বলিবার পূর্ব্বেই, পটলি একখানা ছেঁড়া কুশাসন হাতে বাহির হইয়া আসিল। মন্দিরে একখানি ছিল, ইহারই জোড়া বোধ হয়। আসনটা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলিল, বাবা মহাদেব আজ আর বরাতে ভাত মাপান্ নি দেখছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন ?

পোড়ার দশা আমার মনের! জানলা বন্ধ করি নি, বেরাল ঢুকে চেটে পুটে খেয়ে রেখেছে। বেশ হয়েছে, যেমন উঠতে বসতে ভুল, তেমনই হয়েছে। মরণ দশা! বলিয়া পটলি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার আঁচলের কোণে বাঁধা চাল ক'টি দেখাইয়া বলিলাম—দু'টি ভাত চড়িয়ে দাও-না, চাল ত রয়েছে।

পটলি বলিল, তুমি ত বেশ বললে ঠাকুর, কাল তখন কি হবে ?

কালকের কথা কাল হবে, আজ ত—

তা হয় না গো ঠাকুর ; হয় না, মাপা চাল, এদিক ওদিক হবার জো নেই।

তাই ব'লে উপোস ক'রে থাকবে।

অমন কতদিন থাকি। পটলি হাসিল।

কাছে দোকান টোকান আছে ?

তা আছে, কেন ?

কিছু কিনে নিয়ে এস--

পয়সা—

পকেটে ব্যাগ ছিল, বাহির করিতে করিতে বলিলাম—যাও, কিছু কিনে এনে খাও।

পটলি হাসিল ; বড় করুণ হাসি, বলিল—তোমার ও পয়সা ত নোব না। বাবার মাথায় না চড়ালে ত আমি কিচ্ছু নিই নে। তুমি দুঃখু করো না, উপোস করা আমার খুব সওয়া আছে ; প্রায়ই করতে হয়। বাবাও করে, আমিও করি।

পটুলি পয়সা লইল না। তাহার জেদের কাছে আমাকে হার মানিতে হইল। তবে আমার পীড়াপীড়িতে এইটুকু অনুগ্রহ পটলমণি করিলেন যে আঁচলের চাল ক'টির অর্দ্ধেক লইয়া ভাত বসাইয়া দিলেন। আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে তাহার বাবা মহাদেবের জন্য চাল ও অন্যান্য সামগ্রী আমি যেখান হইতেই পারি রাত্রের মধ্যেই সংগ্রহ করাইয়া রাখিব, তাহার মাপ জোপ করা চালে টান পড়িবে না, তাহার পিতৃদেবের নিকট গালি খাইতেও তাহাকে হইবে না।

উনানে ভাত বসাইয়া দিয়া, পটুলি আমার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসিল—ঠাকুর, তুমি হাত দেখতে জানো, দেখো ত আমার হাতটা ?

কি দেখতে হবে পটুলি, কবে বিয়ে হবে, এই ত ?

তোমার মুণ্ডু।—কিন্তু গালভরা হাসি।

তবে কি দেখবো?

কবে আমার মরণ হবে, তাই!

রাগ করিয়া বলিলাম, ওসব আমি দেখি নে।

পটলি বলিল, তুমি হাত দেখতে জান না-ছাই জান! বলিতে বলিতেই তাহার মুখ চিন্তাযুক্ত হইল, কহিল—জানে বোধ হয়, নইলে আমার নাম জানলে কি করে!

না পটলি, আমি হাত দেখতে জানি নে। যদি বলো, তোমার নাম জানলুম কি করে? মনে নেই সেই যেদিন আমাকে কাঁদি কাঁদি কলা খাইয়েছিলে, তোমার বাবা এসে ডাকলেন, পটলি হারামজাদি দরজা বন্ধ করেছিস্ কেন?

ও, তাই—বলিয়া পটলি উনানে কাঠ ঠেলিয়া দিতে উঠিয়া গেল। উনানটা নিবিয়া আসিতেছিল।

আমার বাসার পাচকের নাম নীলমণি চক্রবর্ত্তী, সে বাঁকুড়া জেলার লোক। বার বার তিনবার ছুটী লইয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিল, প্রতি বারই আশা ভঙ্গে শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল। চেহারাটা ভাল নয় তাহা বরাবর দেখিয়াছি, আজ ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া দেখিলাম, পটলির কাউণ্টার-ফয়েল! চেক বই বা লটারির টিকিটের যে অংশটা পরহস্তে চলিয়া যায়, সেই অংশটায় এবং কিছু রঙ চঙ বাহার টাহার থাকে, কাউণ্টার-ফয়েল একেবারে নীরস, বিবর্ণ! তাহাকেই পটলির যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া নীলমণিকে ডাকিলাম।

বিয়ে করবে? একটি বামুনের মেয়ে আছে।

নীলমণি মনিবকে ঘটকালি করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; বোধহয় কিছু লজ্জাও হইয়াছিল। জবাব দিল না, মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি প্রশ্নগুলা পুনরায় করিলাম। নীলমণি এইবারে দেওয়ালের চূণ-বালিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে কহিল, আজ্ঞে, মেয়েটি দেখতে কেমন? কি ঘর, মেল্—

বলিলাম, নীলমণি, মেল ত পাঞ্জাব মেল, ডিল্লী মেল, বোম্বাই মেল—সে সব নিয়ে কি করবে তুমি! বামুনের মেয়ে, বছর কুড়ি বয়স, স্বভাব চরিত্র ভাল (বলিলাম না যে একটু ঝগড়াটে!) সংসারের কাজ কর্ম্ম জানে। বল ত—

নীলমণি প্রলুব্ধ হইয়াছিল, বলিল—পণটন দেবে ত?

আমার রাগ হইল, বলিলাম—কর ত রাঁধুনী বামুনগিরি, ঐ ত বৃষকাষ্ঠ চেহারা, কি দেখে পণ দেবে তোমাকে?

কেন আজ্ঞা, আমরা কুলীন—

কুল নিয়ে ধুয়ে খাও গে, যাও। তিন তিনবার ত গেলে বিয়ে করতে, ক'টা বিয়ে করেছ—শুনি? যাও।

যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে গেল না। দেওয়ালে নাক ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই রহিল।

আমি রাগতভাবে চাহিতেই নীলমণি বলিল, আজ্ঞে কিছুই দেবে না? ঘরখরচটাও দেবে না?

হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। সাধ্যমত গাম্ভীর্য্য ফিরাইয়া আনিয়া বলিলাম—আচ্ছা, দেখবো'খন কথা কয়ে।

বেলা অনেক হইয়াছিল। বারান্দায় আসিতেই দেখি পটলি এই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিবা-মাত্র হাত নাড়িয়া ডাকিতে লাগিল। তারপর আঁচলটা তুলিয়া দেখাইল। বুঝিলাম পটলমণি আমার জন্য সিম্ আনিয়াছে। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

আজ আর কিছুমাত্র আপত্তি করিল না—ইঙ্গিতে 'আসছি' বলিয়া মন্দিরের দোর বন্ধ করিয়া আমার বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল—দূর পথে নয়, মাঠটুকু অতিক্রম করিয়া আসিল। আমি গেট ঘুরিয়া আসিতে বলিলাম।

পটলি বলিল, সিম এনেছি—বলিয়া আঁচল খুলিয়া দেখাইল।

আমি ডাকিলাম, নীলমণি।

নীলমণি আসিলে বলিলাম, সিমগুলো নিয়ে যাও, রাঁধ গে।

পটলি সিম কয়টি—বেশী নয়, গুটি পাঁচ ছয়—ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল, তুমি রাঁধ বুঝি? সিম ছেঁচকি করতে জান? সেদ্ধ ক'রে নিয়ে তেলে একটা লঙ্কা, গোটা কতক সর্ষে দিয়ে—

নীলমণির পক্ষে এই ঔদ্ধত্য অসহ্য ও অমার্জ্জনীয়, তিক্ত-কটুকণ্ঠে কহিল—থাম্ থাম্, জানি জানি!

পটলি বলিল, জানলেই ভাল।

নীলমণি চলিয়া গেলে বলিল—বাবা কাল রাতে আসে নি, আজ এখনও ত এলো না, কে জানে কখন্ আসবে! দেবে, বাবার মাথায় ফুল ক'টা দিয়ে?

তা চল দিই গে—সে প্রস্থানোদ্যত হইলে বলিলাম—পটলি, তুমি এই কাপড় জোড়াটা নিয়ে চলো, আমি আসছি। —কাল রাত্রেই বাজার হইতে লালপাড় শাড়ী জোড়া

আনাইয়া রাখিয়াছিলাম। পটলির হাতে দিলাম। তাহার মুখে কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিল, খুব ভাল কাপড়। অনেক দাম, না?

উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া বলিলাম—তুমি নিয়ে যাও, মহাদেবের মাথায় চড়িয়ে দোব, তারপর—

এ ত বাবার মাথায় চড়ানো হবে না।

কেন?

বা রে! না কেচে বুঝি ঠাকুরকে দিতে আছে! তুমি কি রকম বামুন গো?

মনে মনে বলিলাম—বোধ করি কুলিন, নীলমণিরই জুড়িদার! বলিলাম, তাইত!

পটলি বলিল, আজ কাচিয়ে শুকিয়ে রেখে দাও না, কাল তখন বাবার মাথায় ছুঁইয়ে আমায় দিও।

পটলির মত দরিদ্র দুঃখীও অনাচারের আশঙ্কায় এতখানি লোভ অবহেলে সম্বরণ করিল দেখিয়া শ্রদ্ধা না হইয়া পারে না।

পটলি বলিল, তুমি শীগগির ক'রে এসো। বুঝলে?

বিকালে নীলমণিকে ডাকিয়া বলিলাম, মেয়ে ত দেখলে? পছন্দ হয়েছে?

কই আজ্ঞা, বলিয়া নীলমণি হাঁ করিয়া চাহিল।

সেই যে সিম্ দিয়ে গেল ওবেলা।

নীলমণি বলিল, ঐ আজ্ঞা। ওকে ত রোজ দেখি ঐ মন্দিরে আসে। ও, আজ্ঞা, হিজলী!

হিজলী কি আবার, বলিতে বলিতে থামিয়া গেলাম। নীলমণি যাহা বলিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়া হাসি চাপা দায় হইয়া পড়িল! তবু বলিলাম, হিজলী কি? নোনা হিজলী, মেদিনীপুর জেলা—যেখানে রাজবন্দীদের জন্য গারদ আছে—

আজ্ঞে না, ওটা নপুংস।

তোমার মুণ্ডুপুংশ! ওকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে। এক শ' টাকা পণ পাবে।

নীলমণি গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া আবার বলিলাম, না-হয় আরও গোটা পঁচিশ টাকা বেশী পাবে, যাও। এই মাসেই বিয়ে করতে হবে।

নীলমণি তবুও রাজী নয়, মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম। সে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, বলিলাম, আমার এই হুকুম, যাও। তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়? আমার কাছে কাজ করতে হলে আমার হুকুম তামিল করতে হবে, না পার, অন্যত্র কাজের চেষ্টা করগে যাও, তোমায় আমি জবাব দিলাম। যাও আমার সুমুখ থেকে। প্যাচার মতো মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

কি করে! নীলমণি চলিয়া গেল। যে হাসিটা এতক্ষণ বহু কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, আর পারিব কেন? হাসিতে হাসিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলাম। আমার বাড়ীর ঠাকুর চাকর কেহ তাড়াইয়া দিলেও যায় না। কারণ আছে। কাজ কম; বকুনি ঝকুনি নাই; খাওয়া দাওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা; তাহারাই কর্ত্তা, তাহারাই গিন্নী; সারা ভাঁড়ার ঘরটাই তাহাদের। বাজারের হিসাব মিলাইতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয় না; মাসের শেষভাগে তেল কম, ঘি কম, ময়দা কম করিয়া বাড়ী মাথায় করিবার লোকও কেহ নাই, সুতরাং চাকর বাকরদের একাদশে বৃহস্পতি। নীলমণিটা আছে দশএগারো বছর।

বেটা গো-বেচারীর মত থাকে, সাত চড়ে কথা বলে না, যেন ভিজা বিড়ালটি। কিন্তু ধুকড়ীর ভিতর এমন খাসা চাল তাহা ত জানিতাম না! আমি বাড়ী নাই, বেড়াইতে গিয়াছি, এখনও ফিরি নাই ভাবিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে চাকরদের বৈঠকে নীলমণি খুব আসর জমাইতেছিল, ভালই ত, স'শ টাকা পণ ত পেয়ে গেলুম। তারপর হিজলীর ঘাড়ে ঢোলক দিয়ে যাদের বাড়ীতে ছেলেপুলে হবে নাচিয়ে পয়সা রোজগার করলেই হবে। চাকরদের মধ্যে কেহ বোধ হয় হিজলীর নৃত্যের অভিজ্ঞতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল; শুনিলাম নীলমণি বলিতেছে, শিখিয়ে নোব রে, শিখিয়ে নোব। ভারী ত গান—"নন্দরাণীর কোলে নন্দদুলাল দোলে।" সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড়।

মনে হইল, নীলমণি নাচের পা'টাও উহাদের দেখাইয়া দিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, বাগানে অন্ধকারে আর থাকা নয় ভাবিয়া গলাখাঁকারি দিয়া গোবরাকে ডাকিলাম। সব ভালমানুষ! গোবরা বলিল, আজ্ঞে, আলো জ্বালছি।

রাত্রে খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিহে কি ঠিক করলে? নীলমণি প্রথমটা জবাব দিলনা। কড়া করিয়া প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলাম।

নীলমণি বলিল, আজ্ঞা, আপনি যখন হুকুম করছেন—কথাটা সে শেষ করিল না; দরকারও ছিল না।

বলিলাম, বেশ, বেশ।

নীলমণি আমতা-আমতা করিয়া বলিল, তবে, আজ্ঞা—সে থামিল।

আবার কি আজ্ঞা করছেন?

নীলমণি নতমুখে মুচকি হাসিয়া বলিল, পণটা দেড়শ হয় না?

বলিলাম, তা হয় ত হতে পারে। কিন্তু বিয়ে করে দেশে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে যত্ন টত্ন করবে ত? না—

'না' টা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না।

নীলমণি জিব কাটিয়া বলিল, সে কি কথা, আজ্ঞা!

হিজলী-নৃত্যের কথাটা আমি 'শুনি নাই', অন্ততঃ আমি শুনি এমন ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। কাজেই সে কথা বলিতে পারা গেল না। তবু যতখানি বলা যায়, বলিলাম।

যদি শুনি মেয়েটার যত্ন আত্যি হচ্ছে না, জান ত, কলকাতার পুলিশ. ম্যাজিষ্ট্রেট সব আমার ছাত্র, ধরে তোমায় পুলি-পোলাও চালান করে দোব। মনে থাকে যেন!

মনে থাকিবে, মুখভাবে ইহাই জানাইয়া দিয়া নীলমণি প্রস্থান করিল। গভীর রাত্রে ঘরে মানুষের পদশব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কে রে?

আজ্ঞা, আমি নীলমণি।

কি চাও?

আজ্ঞা, একটা কথা—

কি কথা, চট্ করে বলে ফেলো।

তবু বলে না দেখিয়া জোর একটা ধমক দিলাম।

আজ্ঞা, পণটা দু'শ হয় না?

আমি মহা গরম হইয়া বলিলাম, না হয় না! একি ছাগল ভেড়া কেনাবেচা হচ্ছে নাকি? যাও, তোমায় বিয়ে করতে হবে না, আমি অন্য লোক দেখছি।

নীলমণি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আজ্ঞা, না, সে কথা ত বলছি না—বলিতে বলিতে সে চলিয়া যাইতেছিল, বলিলাম, আচ্ছা দেখি, দু'শ টাকাই দেওয়াব।

অন্ধকারেও নীলমণির দন্তশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পুনরায় বলিলাম, আর সেই কথাটা মনে আছে ত? পটলির যদি একটু অযত্ন হয়—

নীলমণি হাতে পায়ে পড়ার মত গলার স্বর করিয়া বলিয়া উঠিল, সে কি হুজুর আজ্ঞা, আপনার হুকুম, মাঠাকরুণ ক'রে রাখবো। তেমন বামুন আমরা নই আজ্ঞা!

আচ্ছা যাও। নীলমণি চলিয়া গেল।

বেটা কে গো! বলে কি-না মা-ঠাকরুণ করে রাখবো!

কাপড়জোড়া দিয়া নীলমণিকে মন্দিরে পাঠাইয়া দিলাম। বলিয়া দিলাম, আমি দাড়ীটা কামাইয়া পরে আসিতেছি। মহাদেবের মন্দির—শৈলেশ্বর মহাদেব একই কথা—পূর্ব্বরাগ অনুরাগ একটু হয় ত হোক্ না! দোষ কি? জগৎসিংহটি ভাল, তিলোত্তমার ত কথাই নাই। আমি বিমলা, পরে আসিলেও চলিবে। একালের নিয়মে না আসিলেও চলিতে পারে। কাজটা অগ্রসর হউক-না!

কিন্তু কিছুই হয় নাই। নীলমণি রাস্তায় গোবর না-কি মাড়াইয়া গিয়াছিল, সিঁড়িতে পা দিবামাত্র পটলি তাহাকে ঝাঁটা গঙ্গাজল দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। আমার সঙ্গে পথে দেখা, তাহার অন্ধকার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম—সেকালের জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার সঙ্গে একালের অনেক তফাৎ!

পটলি তখনও সোপানগুলি মার্জ্জনা করিতেছিল, বলিল, তোমার ঘাটের মড়া পথ থেকে ঠাকুর কি যে মাড়িয়ে এলো, মরণ, চোখ দু'টো আছে কি করতে! ঠাকুরকে তখনও দেখা যাইতেছিল, পটলি এক একবার তাহাকে দেখে—আর জোরে জোরে ঝাঁটা ঘসে।

পটলি আমাকে পা ধুইবার জল দিল, পা ধুইতে ধুইতে বলিলাম, তোমার বাবা কালও আসেন নি বুঝি?

পটলির মেজাজটা আজ চড়াপর্দ্দায় বাঁধা ছিল, বলিল, না। মরেছে বোধ হয়। তিন তিনটে দিন তুই যে সদরে বসে রইলি ঠাকুরকে উপোসী রেখে, এক বিঘে জমির জন্যে, সেই এক বিঘেই থাকবে নাকি? ঠাকুর বুঝি কিছু দেখছেন না? বুঝছেন না? কোন্ আক্কেলে তুই রইলি বল্ দিকিন্!

বুঝিলাম সুর বড় চড়া, বাঙনিষ্পত্তি করিলাম না। পূজায় বসিলাম। শেষ করিয়া কাপড় জোড়াটা শিবলিঙ্গের অধোদেশে স্পর্শ করাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পটলির হাতে দিলাম। পটলি একগাল হাসিয়া নতজানু হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিল। আমায় বলিল, একবার বাইরে এসো ত! বাহিরে আসিলে পটলী যে-ভাবে ঠাকুর প্রণাম করিয়াছিল, সেইভাবে আমাকেও প্রণাম করিল। পায়ের ধূলা লইয়া

জিবে ঠেকাইল। উঠিয়া সকৃতজ্ঞ হাসিমুখে কহিল, আমার চারবছরের খোরাক হলো, বলিয়া কাপড়জোড়াটা দেখাইল।

তাহার আনন্দের পরিমাপটা বুঝাইতে পারি, ভাষার সে সমৃদ্ধি আমার নাই; তবে অনুভূতিতে সাধ্যাসাধ্যের কোন কথাই নাকি নাই—তাই সেটা হৃদয় দিয়াই অনুভব করিলাম। বলিলাম, পটল, তোমার সঙ্গে কথা আছে, একটু বসো দিকি।

পটলি বলিল, আবার পটল। বলিছি না পটল পুরুষ মানষের নাম! বলিয়া সে চাপটালি খাইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা পটলি, আর ভুল হবে না। মন দিয়ে শোন—

বল-না, আমি শুনছি ত!

তোমার বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ বুধবার, শুক্রবারে ভাল দিন আছে, সেইদিন—

পটলি হাসিয়া বলিল, দিনও ঠিক হয়েছে?

বলিলাম, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়েছে।

পণ লাগবে?

তা কিছু লাগবে বৈ কি!

পটলি গরম হইয়া বলিল, কি তোমায় বুদ্ধি! কে দেবে পণ? বাবা পারবে না। গলাটা একটু নরম করিয়া বলিল, কত টাকা পণ?

শ'দুই।

পটলি চোখ দু'টা কাণের গোড়া পর্য্যন্ত বিস্ফারিত করিয়া বলিল, দু'শ টাকা! দু—শো টা—আ—কা!

হ্যাঁ গো, দু—শো টাকা। তা' তোমার বাবাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না। সে হয়ে যাবে'খন। বুঝলে?

পটলি মাথাটাকে বার দুই উপর নীচ করিয়া নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, তুমি দেবে বুঝি!

তা দিলামই বা!

পটলি খুব খুসী হইল। একমিনিট চুপ করিয়া—লজ্জায় নয়, সেটা তাহার ধাতসহ নয়, তা জানি—বলিল, তারা আমায় কি দেবে?

তুমি কি চাও বলো।

পটলি একটু ভাবিয়া বলিল, আমাকে একটি নথ দিতে বলো না।

তা বলবো। কিন্তু নথ তোমাকে মানাবে না। ভারিক্কে, মোটা আর গোলগাল মুখের ওপর নথ বেশ মানায়। তুমি যে ছেলেমানুষ!

ছেলেমানুষ, না, হাতি!—এই সেই চিরদিনের পটলি।

তারচেয়ে সোণার মাকড়ি কিম্বা চুড়ী—

পটলির মুখ হাসিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; বলিল, মাকড়ী ত খুব ভালো। মাকড়ী পরার আমার ভারি ইচ্ছে। তবে মাকড়ী একটা হলে ত হবে না, দু'টো দু'কাণে চাই ত! তাতে খরচ অনেক হবে, তাই নথের কথা বলছিলুম। নথ একটাই ত হয়।

পটলির গণিতশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপত্তি, আমাদের কলেজে প্রোফেসরী করিতে পারে! হাসিয়া বলিলাম, দুটো মাকড়ীই হবে।

এইবার পটলি কাজের কথা পাড়িল, বলিল—পাত্তর কোথায় থাকে? মন্তর টন্তর জানে ত?

বিয়ের মন্তরের কথা বলছো ত? সে ত পুরুতে পড়াবে, পটলি।

পটলি হাসিয়া বলিল, সেই মন্তর আমি বলছি বুঝি?

বলিলাম, পাত্তরটিকে তুমি দেখেছ পটলি।

পটলি ঘাড়ি বাহির করিয়া বলিল, কবে গো?

নীলমণি, আমার ঠাকুর। দেখনি।

ওমা, ওযে গরু!—বলিয়া পটলি হাসিয়াই গড়াইয়া পড়িল।

বলিলাম, হলোই বা গরু! তুমি পাঁচন বাড়ী হাতে হেট্ হেট্ করে চালাতে পারবে না?

পটলি বোধ করি মনশ্চক্ষুতে সেই 'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে' দৃশ্যটা দেখিয়া লইল; বোধ করি বেমানান্ বা অসঙ্গত মনে হইল না। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম, বর অপছন্দ হয় নাই। অপছন্দ হইবেই বা কেন! এ পিঠ আর ওপিঠ বৈ ত নয়। পটলির বাবা মহাদেব যেন রাজ-যোটক করিয়াই দু'টিকে তৈরী করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহ'লে পশু'ই ঠিক?

পটলি বলিল, বেশ লোক তুমি। দাঁড়াও বাবা আসুক, তাকে বলো।

তুমি বলো-না।

পটলি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—দুর মিন্সে, আমার বিয়ের কথা আমি বুঝি বাপকে বলতে পারি? আমার লজ্জা করে না বুঝি!

হরি! হরি! পটলিরও তবে লজ্জা আছে।

পটলি বলিল, আচ্ছা, তুমি ত সেদিন বললে তুমি শীগগির চলে যাবে।

তা যাব। দিন পাঁচেক পরেই যেতে হবে। কলেজ খোলবার সময় হলো।

তোমার ঠাকুরকে বুঝি রেখে যাবে? সেখানে অন্য ঠাকুর রাখবে?

বলিলাম, তা কেন? ও বিয়ে ক'রে তোমায় নিয়ে ওর বাড়ী যাবে; দিনকতক থেকে আবার আমার কাছে কাজ করতে আসবে। আবার কিছুদিন পরে ছুটী নিয়ে আবার দেশে যাবে।

পটলি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল, ও এখানে থাকবে না?

না।

পটলি বলিল, তাহ'লে বিয়ে হবে না ত।

আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, হবে না কেন?

আমি বুঝি মন্দির ছেড়ে বাবা বিশ্বনাথকে ছেড়ে যাব ভেবেছ! তা আমি যাব না, মরে গেলেও না।—বলিতে বলিতে পটলির চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল; পটলি নূতন জোড়া কাপড়ের একটা জায়গা তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—বাবা বিশ্বনাথকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না,কোথায়ও না।

আমি বলিলাম, তোমার বাবা আছেন, পটলি—

পটলি যেন লাফাইয়া উঠিল; বলিল, থাকলই বা বাবা! আমি বলে বিশ্বেশ্বরের দাসী—

বেশ ত, মাঝে মাঝে আসবে।

পটলি বলিল, না, না, না, সে হবে না, কিছুতে হবে না। আমি বাবার মন্দির ছেড়ে এক পা যাব না, মেরে ফেললেও যাবো না, কেটে ফেললেও যাবো না।

আচ্ছা তোমার বাবা আসুন—

পটলি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া আমার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি বাবাকে একথা বলো না, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না।

পটলি এক মিনিট ধরিয়া আমার মুখের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল; তারপর কাকুতি করিয়া বলিল, বাবা ত এমনই দিনরাত 'বিদেয় ক'রে দোব,' 'দূর ক'রে দোব', 'তোকে তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করবো' করে, তার ওপর তোমার মুখে ঐ কথা শুনলে তখ্খুনি বিদেয় করবে তবে ছাড়বে।

বলিলাম, তোমার বাবা তোমায় দিন রাত দূর-ছাই ক'রে কেন বলো ত?

পটলি আমার গলার স্বরে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল কি-না কে জানে, মাথাটা নীচু করিয়া বলিল—ওর ঐ রোগ। মা'কেও অমনি করতো। মা-সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানি, ড্যাং ড্যাং ক'রে কেমন চলে গেলো। একদিন ভুগলো না, কাউকে কষ্ট দিলে না, ডাক্তার ডাকতে হোল না, যেন পাকা আমটি, পাকলো আর টুপ ক'রে মাটীতে পড়ে গেল।

আমি নীরবে শুনিতেছিলাম, পটলি এবার করুণ রস ছাড়িয়া বীর রসের অবতারণা করিয়া বলিল, রাগ করি কি সাধে! যার দৌলতে পেটে খাচ্ছি, কোমরে পরছি সেই বাবাকেই ও দিনের মধ্যে দশবার গো-ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসতে চায়! ভোলানাথ না হয়ে আর কোনও ঠাকুর হোলে কবে মন্দির ছেড়ে চলে যেতো। নিজে মালি মামলা ক'রে আজ হেথা, কাল হোথা ক'রে বেড়াবে, বাবার পুজো হয় না, আমি বলতে গেলেই আমায় বিদেয় করে, বাবাকেও —বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া পটলি মহাদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিল। আমি কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। কিই বা বলিব? কেই বা বলিতে পারে?

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বলো, বলবে না! নইলে তোমার পায়ে আমি মাথা মুড় খুঁড়ে মরবো।—বলিয়াই সে পায়ের কাছে শানের উপর মাথা ঠুকিতে সুরু করিয়া দিল।

শশব্যস্তে বলিলাম—আচ্ছা, বলবো না, তুমি ওঠ।

পটলি উঠিতে উঠিতে বলিল, ভগবানের রোয়াকে দাঁড়িয়ে বললে, মনে থাকে যেন!

এ কথাটা ভাবি নাই। ভাবিয়াছিলাম, এখন ত মাথা ছেঁচা থামাই, তারপর দেখা যাইবে। কিন্তু—মনটা দমিয়া গেল; বলিলাম, পটলি, বিবাহ মানুষমাত্রেরই ধর্ম্ম, তা জান।

পটলি এতখানি ধর্ম্মজ্ঞ তাহা জানিতাম না। বলিল, ঢের মানুষ আছে, ধর্ম্ম তারা করুক গে।

মেয়েটার জন্য সত্যই বড় দুঃখ হয়। বোধ করি পটলিকে

ভালবাসিতে সুরু করিয়াছিলাম। আবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলাম। বলিলাম, পটলি ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তুমি স্ত্রীলোক, আজ তোমার বাবা আছেন—সংসারে কিছুই আটকাচ্ছে না, কিন্তু তিনি বুড়ো হয়েছেন, কতদিন আর বাঁচবেন বলো! তখন তুমি একলা, অসহায় স্ত্রীলোক—

পটলি হাসিয়া রাগিয়া ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া বলিল, বাবার বাবা রয়েছেন না! তুমি ত ভারি মুখ্যু! বলিয়া সে মন্দিরের ভিতরে চাহিল। বিগ্রহ তাহাকে আশ্বাস দিল না, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু সে পরম নিশ্চিন্তমনে বলিল, বাবা থাকতে ভয় কি! সরো, মন্দির বন্ধ ক'রে বাড়ী যাই।

পটলি আবার নত হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিল; চাল ক'টি, সিম ক'খানি আঁচলে বাঁধিল, নতুন কাপড় জোড়া বগলে চাপিয়া দরজা বন্ধ করিয়া হাসিমুখে বলিল, সিম খেয়েছিলে? কাল আবার চাট্টি আনবো।—বলিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকের মসজেদটার পানে চাহিয়া দেখি, বড় সমারোহ! আজ শুক্রবার—জুম্মা।

তারপর যে ক'টা দিন ছিলাম, দেখিতাম পিতাপুত্রীতে আসিয়া পূজা করিয়া মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়, ব্যতিক্রম হয় না। পটলি আসিবার সময় ও যাইবার কালে আমার বাসাটার দিকে চায় বটে। কিন্তু আমি বুঝি সে চাহনিতে আগ্রহের আভাষমাত্র নাই। বরং খানিকটা যেন ভয়ে ভয়েই এই বাড়ীটার পানে চাহিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে এই ভাব!

নীলমণি ক'দিন যা রান্না রাঁধিল, সে আর কি বলিব! যাহারা ছেলে ঠেঙ্গায়, তাহাদের হাতে আর জোর থাকে না, তাই নীলমণির পিঠ ও কাণ অক্ষত ও অখণ্ডই থাকিতে পারিয়াছিল। বেচারার দুঃখটাও ত বুঝি, তাই আলুনী ঝোলে লবণ সংযোগ করিয়া, জলের গ্লাস হইতে দুধটা দুধের বাটীতে নিজেই ঢালিয়া লইয়া সে ক'টা দিন চালাইয়া দিয়া যেদিন "রহমৎপুর" ছাড়িলাম, সেই নির্জ্জন মন্দির ও সেই বহুজনসেবিত মসজেদ তেমনই দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে আমাদের বিদায় দিল। যেদিন আসিয়াছিলাম, সেদিনও উহারাই এমনই নীরবে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

নীলমণির দুঃখটা বুঝিয়াছিলাম। শুধু অনুমান নয়, স্বকর্ণেই কিছু কিছু শ্রবণও করিয়াছিলাম। আমাকে বলে নাই বটে, তবে এই সকল মূল্যবান কথা গোপনও থাকে না। নীলমণি চাকরমহলে প্রকাশ করিয়াছিল, না-হয় সে-দেশেই থাকতুম। বাবুরও শরীরটা ভাল হচ্ছিল, ওঁরই বা ফিরে আসবার দরকারটা কি ছিল? একলা ত মানুষ, কি দরকার চাকরী করবার, বাবুর যা আছে, তা'তেই সচ্ছন্দে চলে যেতো। চাকররা নীলমণিকে সমর্থন করে নাই; তাহারা বলে, আরে নীলমণি সে-যে বনবাস!

নীলমণি ইহার কি উত্তর দিয়াছিল শুনিবেন? রামায়ণ মহাভারত উজাড় করিয়া এমন সব অকাট্য দৃষ্টান্ত দিয়াছিল যে কাহারও মুখ দিয়া কতকগুলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া রা শব্দটি বাহির হয় নাই। মোদ্দা কথাটি এই যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীকে লইয়া বনবাসেই থাকিতেন; চাকর গোবরা যখন তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে—দেবর লক্ষ্মণের পার্টটা সেই প্লে করিত!

পথিক

এস্, শাম্‌সুল্ হুদা

পথিক তুমি যাবে অনেক দূরে
নীলের ছাওয়া ওই সে তোমার ঘর,
পথ তোমারে ডাকে করুণ সুরে
সাম্‌নে জাগে ধূসর বালুচর।

ক্লান্ত চরণ চালিয়ে নিয়ে শুধু
সাম্‌নে চল, এগিয়ে চলার সুখে,
থাক্ না পথে ভীষণ মরুর ধূ-ধূ
নাই যদি কেউ কাঁদে তোমার দুখে।

মনে পড়ে বে'র হয়েছ কবে
এ-দুনিয়ার পান্থশালার দ্বারে?

যা গিয়াছে, গেছেই যদি তবে
আর ফেরা যে তোমার সাজে না রে।

দিনের আলো নিভায় যদি রাতি
একলা তোমার চলার পথে হায়;
কেউ-বা যদি নাহি দেখায় বাতি—
নাইবা ডাকে 'শ্রান্ত ওরে আয়।'

সাহস ভরে চল কোন মতে
আঁধার করে বিজন পথের সাথী;
শুকতারাটি গগন-সীমা হ'তে
ওই যে তোমায় দেখায় আশার বাতি!

প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী বি-এ, বি-টি

বাঙ্গালা দেশে বয়স্ক-নিরক্ষরের সংখ্যা হিসাব করিয়া লাভ নাই। যে দেশের পাঁচ কোটী লোকের মধ্যে শতকরা ৮ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে সে দেশের অগণ্য নিরক্ষর জনসাধারণের হিসাব অঙ্ক কষিয়া বাহির না করিলেও এমন বিশেষ কিছু আসিয়া যায়না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ইহাদের কথা বড় বেশী ভাবিনা, ভাবিয়া দেখিনা এই বিরাট বিপুল মূক জনসাধারণ জাতীয় উন্নতিকে কি ভাবে ব্যাহত করিতেছে, জগদ্দল পাথরের মত জাতির বুকে কি ভাবে চাপিয়া পড়িয়া আছে।

হয়ত বাঙ্গালা দেশের তথা ভারতবর্ষের ইহাই নিয়ম। এই সনাতন দেশে শিক্ষার ধারাই ত সনাতন নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে বোধ হয় কোন কালেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল না। শ্রেণী বিশেষের মাত্র শিক্ষায় অধিকার ছিল। মনুসংহিতায় ইহার কিছু কিছু আভাষ আছে এবং অনধিকারীরা যদি বেদ পড়ে অথবা শিক্ষার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদের জন্য যে শাস্তির বিধান ছিল সে শাস্তির রূপ বর্ত্তমান যুগের পিনাল কোড কল্পনাও করিতে পারে নাই। কাণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত অনধিকারীর অনধিকার চর্চ্চার জন্য—তাহার পশ্চাদ্দেশে তপ্ত লোহার শলা বিদ্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ছিল। বৌদ্ধ যুগে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তান্ত্রিকতার বীভৎসতার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ডুবিয়া গেল, জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহত হইল। তাহার পর অনেকদিন চলিয়া গেল, কত রাজা গেল, রাজত্ব গেল, জনসাধারণের শিক্ষার কথা আর উঠিল না।

ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইল। সাধারণের শিক্ষার কথাও উঠিল। কিন্তু অলস নিষ্ক্রিয় জাতির সনাতন মন তাহাতে সায় দিলনা। তাহার ফল হইল এই—যাহারা নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইল তাহাদের সঙ্গে অশিক্ষিতদের বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। এই কৃত্রিম বিচ্ছেদের কুফল, সমাজের দিক দিয়া, অর্থনীতির দিক দিয়া এবং রাজনীতির দিক দিয়া আমরা এখন বেশ বুঝিতেছি। ফরাসী-বিপ্লবের কিংবা রুষিয়ার নববিধানের মূলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের এই কৃত্রিম বিভাগ মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল।

আমাদের দেশে নানা দিক দিয়া পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শ্রেণীগত বৃত্তি লোপ পাইয়াছে, কুটীরশিল্প আর নাই। বর্ত্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ, গতির যুগ। এই যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে, এই গতির সঙ্গে জনসাধারণ আর যোগ রাখিতে পারিতেছে না, তাই নানা সমস্যা ও বিরোধ দিনের 'পর দিন দেখা দিতেছে। শাসন ক্রমশঃ গণতান্ত্রিক হইতেছে, লোকের ভোটাধিকার ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে—অথচ জনসাধারণ এই নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আপনাদিগকে ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেনা। ইহার প্রধান কারণ নিরক্ষরতা, ভোটাধিকারের সঙ্গে শিক্ষার একটা গভীর যোগ আছে। নিরক্ষরদের প্রজার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নাই। ইহার ফলে জাতির সর্ব্ববিধ দুর্গতিরও শেষ নাই।

সুখের বিষয় দেশের লোক এখন নিরক্ষরদের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টও এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা করিতেছেন।

ইহা ভালই। সমস্যার আলোচনারও সুফল আছে—ইহাতে সমাধানের পথ কতকটা সুগম হয়।

বয়স্কদের শিক্ষার কথা উঠিলেই মনে একটা বিচিত্রভাব আসে—নিরক্ষর যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ছাত্রহিসাবে লোভনীয় নহে, ইহাদের জনতাও অশোভন। কিন্তু লোভন ও শোভন লইয়াই কথা নহে, ভাবিতে হইবে প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য।

প্রয়োজনের কথা আগেই বলিয়াছি।

ডেনমার্কে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে। এখানে সাধারণভাবে লেখা পড়া শিখান হয়, স্বাস্থ্য ও কৃষির সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা হয় এবং বয়স্কদিগকে তাহাদের পৌরদায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। এইখানেই শিক্ষার শেষ নহে। কাজের অবসরে কি ভাবে সকলকে গ্রামের সঙ্গে জড়িত করিয়া রাখিতে হইবে, কি ভাবে নিজেদের পল্লীকে সুন্দর ও শোভন করিতে হইবে, সমাজের সংহতি দৃঢ় করিতে হইবে, শ্রমের মর্য্যাদা বাড়াইয়া আর্থিক সমস্যা দূর করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি ভগবানে বিশ্বাস রাখিতে হইবে—তাহাও শিক্ষা দেওয়া হয়।

ডেনমার্কের মত স্বাধীন দেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে হয়ত এদেশে তাহা সম্ভবপর হইবেনা। কিন্তু আদর্শ অনুসরণ করিতে দোষ নাই।

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। শুধু বয়স্কদের লেখা-পড়া শিখানোই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। লেখা-পড়া শিখানোর সঙ্গে সঙ্গে এই সব ছাত্রকে মোটামুটীভাবে শিক্ষা দিতে হইবে—পল্লী, স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, আয়ব্যয়ের নীতি, কি ভাবে কৃষির উন্নতি করা যায়, কি ভাবে জমিতে সার দেওয়া উচিত, গবাদি পশুর পালন ও রক্ষণ—লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষিসম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণ ও উন্নতি, কৃষিজাত দ্রব্যের সহজ বিক্রয় ব্যবস্থা, গ্রামের রাজস্ব নীতি, মহাজনের ধার দিবার পদ্ধতি ও সমবায় নীতি। সমাজের দিক হইতে ইহাদিগকে সজ্ঞান করিয়া তুলিতে হইবে—নিজের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক, গ্রামের আপদে বিপদে উৎসবে ব্যসনে পরস্পরের

দারিদ্র, ঋণদান সমিতি অথবা সমবায় সমিতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক। ইহা ছাড়া এই সব ছাত্রদিগকে জানিতে হইবে, গ্রামের যানবাহনের কথা, নদীর কথা, পোষ্টাফিসের কার্য্যপদ্ধতি, যাতায়াতের রাস্তার কথা। সামাজিক দিক দিয়া তাহাদের আরও জানিতে হইবে সামাজিক দোষত্রুটি—অল্প বয়সের বিবাহের কুফল, জাতিভেদপ্রথার দোষ, স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা ও উচ্চনীচ ভেদাভেদের বিষময় ফল।

মোটের উপর ইহাদের শিক্ষা হইবে আনন্দের ভিতর দিয়া। বাঙ্গালী জাতির জীবনে আজকাল আনন্দের স্থান নাই—বয়স্কের শিক্ষার মধ্য দিয়া এই আনন্দকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে কি ভাবে আনন্দে অবসর সময় কাটানো যায়—গানে, গল্পে, কথাবার্ত্তায় কি ভাবে জীবনকে ভোগ করা যায়। যদি এই আনন্দের মাধুর্য্য বয়স্কদের শিক্ষার মধ্যে বহাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই ইহাদের শিক্ষা হইবে সার্থক এবং শিক্ষার আনন্দ তাহাদের কর্ম্মজীবনকে মধুময় ও সুন্দর করিয়া তুলিবে।

কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার গোড়ার কথা ভুলিলে চলিবে না। নিরক্ষরতা দূর করাই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমেই কথা উঠিতে পারে—যে বয়সে এই সব ছাত্র বিদ্যালয়ে আসিবে, তাহারা সত্যই কিছু শিখিতে পারিবে কি না? অর্থাৎ তাহাদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা আছে কি না? হয়ত এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল যাহাই হউক একথা স্বীকার্য্য যে মানুষের মন নামক পদার্থ টা জীবন্ত; ইহার গ্রহণ করিবার শক্তি অফুরন্ত, বাহিরের সংঘাতে ইহা চির-চঞ্চল। হয়ত অল্পবয়স্ক বালকগণের মনের দ্রুতগতি বয়স্কদের নাই, কিন্তু বয়স্কদের মনের শিক্ষাগ্রহণের শক্তি আছে ইহা বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

আমি আগেই বলিয়াছি, বয়স্করা সাধারণ ছাত্র নহে—ইহারা অসাধারণ। সুতরাং ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থাও নূতন রকম হওয়া উচিত। সময় যত কম লাগে ততই ভাল, এক বৎসরের মধ্যেই পাঠ্য-তালিকা শেষ করা বিধেয়।

ক, খ কিংবা অ, আ হইতে বয়স্কদের শিক্ষা আরম্ভ করিলে চলিবে না। বর্ণশিক্ষার মধ্যে কোন আনন্দ নাই, শব্দশিক্ষার মধ্যে আনন্দ আছে। যদি সেই বর্ণের সঙ্গে চিত্র থাকে তবে ত সোনায় সোহাগা। এই বয়স্কদের শিক্ষাক্ষেত্রে চিত্র অথবা চার্টের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। বোর্ডে চিল লিখিয়া যদি চিলের চিত্রটি আঁকিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে শব্দ ও চিত্রের একটা অদৃশ্য যোগাযোগ ঘটিয়া যায় এবং শব্দটী মনে না থাকিলেও চিত্র দেখিয়া তাহা সহজেই মনে পড়ে। এইভাবে সাধারণ ও প্রচলিত শব্দ পড়া শিখানো চলিতে পারে এবং আবশ্যক মত শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণজ্ঞান দেওয়াও সম্ভব হয়। বুদ্ধিমান শিক্ষক বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বিচিত্র কবিতাও রচনা করিতে পারেন এবং ছাত্রগণ ঐ কবিতা দ্বারা শব্দগুলি সহজেই মনে রাখিতে পারে।

সহরে দোকানে দোকানে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন, রাস্তায় রাস্তায় রাস্তার নাম লেখা—সহরের ছেলেরা ইহা হইতে নিজের অজ্ঞাতেই কতকটা শব্দজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া লয়। বয়স্কদের শিক্ষাগৃহে যদি সহজ এবং অতি সাধারণ প্রবাদ বাক্য, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহজ সরল কথা, সরল নীতিকথা প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের মত বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে তাহা হইলে ইহা দ্বারা অতি সুকৌশলে পড়া শিখানো যায়। বিভিন্ন লেখাগুলি ক্রমাগত কয়েকদিন শিক্ষার্থীকে পড়িয়া দেওয়া হইল। তার পর শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে বলিবেন—অমুক লেখাটি কোথায় দেখাও দেখি। ইহার ফল হইবে এই—স্বতঃই শিক্ষার্থীর মন উহাতে আকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের মনে পড়ার জন্য একটা একান্ত আগ্রহ সৃষ্টি হইবে।

মোট কথা এই বয়স্ক শিক্ষার্থীদের এমন একটা মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যে যেন তাহারা এই শিক্ষা ব্যাপারটাকে খুব সহজ বলিয়া মানিয়া লয়। বাহিরের কৃত্রিম যন্ত্র সাহায্যে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বড় বেশী-দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। ইহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। যন্ত্রগুলি হইবে গৌণ এবং ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার্থীর মনে শিখিবার আগ্রহ জন্মাইতে হইবে।

বয়স্কদের পড়িতে শিখাইতে যতটা বেগ পাইতে হইবে, লেখা শিখাইতে ততটা পরিশ্রম হইবে না। ইহার প্রধান কারণ ইহাদের হাতের আঙ্গুলের গতি সংযত। ছোট ছেলেদের আঙ্গুলের মত অস্থির নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই কারিকর, তাঁতী, অঙ্কনপটু ইত্যাদি থাকিবে। সুতরাং যদি তাহাদের মনের মধ্যে শব্দের ছবিটা থাকে তাহা হইলে অতি সহজেই কলমের ডগায় তাহার চিত্ররূপ ফুটিয়া উঠিবে।

এই ত গেল শিক্ষার কথা। কিন্তু শিক্ষক কাহারা হইবেন? আমি অর্থসমস্যার কথা মোটেই তুলিতেছি না। এক একটি স্কুল চালাইতে হইলে যে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন তাহা নহে। বোধ হয় বাৎসরিক ১০০৲ টাকা হইলেই একটি স্কুল চলিয়া যাইতে পারে। আরও কম খরচে হয়। বিনা খরচেও হয়। চীনদেশে হইতেছে, রুষিয়ায় হইতেছে, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অবসর সময়ে জাতীয়তার দিক হইতে এই জন-কল্যাণের কাজ করিতেছে। আমাদের দেশে আমাদের ছাত্ররা হয়ত এই সব কাজ এক দিন করিবে, হয়ত একটু বিলম্ব আছে। এখন এ কার্য্যের ভার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে, সামান্য কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। প্রথম প্রথম তাহারা একটু বেগ পাইবেন, একটু বেশী পরিশ্রম হইবে—তিন মাস পরেই এই পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। কারণ বয়স্কছাত্রেরাই তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ সাহায্য করিবে। ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়কে সাহায্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে—আত্মনির্ভর হইবে, তাহাদের নিজের উপর বিশ্বাস আসিবে। শিক্ষার্থীরা যদি প্রত্যেকে মাসিক এক পয়সা কিংবা দু' পয়সা করিয়া দেয় তাহা হইলেই শিক্ষক মহাশয়ের পারিশ্রমিক পাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে না। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ইচ্ছা করিলেও কিছু সাহায্য করিতে পারে এবং সাহায্য করা উচিত।

বিদ্যালয় গৃহ সম্বন্ধে ভাবিবার আবশ্যক নাই। স্থানীয় ক্লাবঘর, লাইব্রেরী, মন্দির বা মসজিদের উঠান, আখড়া—নিতান্ত পক্ষে পাঠশালা-গৃহই হইবে শিক্ষা মন্দির। সাধারণতঃ কাজকর্ম্মের অবসরে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে এবং নাচ গান আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে, বিড়ি, সিগারেট ও হুঁকার ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় পাঠদান কার্য্য চলিবে। বয়স্কদের শিক্ষাদানকালে শিক্ষক মহাশয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহাকে সমান ভাবে মিশিয়া যাইতে হইবে।

এখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। এক বৎসর পরে বয়স্করা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবে। চর্চ্চার অভাবে হয়ত তাহারা তাহাদের অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যাইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রতি ইউনিয়নে ছোট-খাট সাধারণ গোছের গ্রন্থাগার থাকা উচিত এবং যাহাতে এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সঙ্গে এই বয়স্কদের যোগ থাকে তাহার ব্যবস্থা না করিলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইবে। গ্রামের বড়লোকদের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ড অতি সহজেই এই গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে পারিবে ও পরিচালন করিতে পারে।

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বয়স্কদের শিক্ষাসমস্যার সমাধানের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। ইউনিয়ন বোর্ড ভিন্ন পল্লী উন্নয়ন সমিতি, সমবায় সমিতি এবং স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহও বয়স্কদের শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

এই শিক্ষা সমস্যার আর একটা দিক আছে, যাহা সহজেই লোকের চোখ এড়াইয়া যায়। বয়স্কদের শিক্ষার প্রতি কি ভাবে তাহাদের আগ্রহ জন্মাইতে হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু তাহারা খুব সহজে বিদ্যালয়ে যাইবেনা। এ জন্য কিছু কিছু প্রচার কার্য্য অবশ্য আবশ্যক; তবে শুধু প্রচারেই কিছু হইবে না। অন্য ভাবে চাপ দিতে হইবে। যদি সমবায় সমিতি নিয়ম করে টিপসহি দেওয়া লোককে ঋণ দেওয়া হইবে না, ঋণ দান সমিতির সভ্য করা হইবে না; ইউনিয়ন বোর্ড যদি বলে নিরক্ষর চৌকিদার দফাদার পিয়ন প্রভৃতি কর্ম্মে গ্রহণ করা হইবে না, যাহাদের চাকর ও মুনিষ রাখিবার সঙ্গতি আছে তাহারা যদি নিরক্ষর লোক কর্ম্মে নিযুক্ত না করে—তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই নিরক্ষর বয়স্করা শিক্ষার প্রতি একটু আগ্রহশীল হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও নানা উপায় আছে, তাহা অনেকেই জানেন, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যদি এই বয়স্কদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিতে পারা যায়, তবে দেশের শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে না; যেখানে গাঢ় অন্ধকার যোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে দুই একটী প্রদীপের শিখা সেখানে কত আলো যোগাইবে? দশের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, জাতির উন্নতির জন্য, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকলকেএই আন্দোলনে মনে-প্রাণে যোগ দিতে হইবে।

যাত্রী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

অসীম তিমির যাত্রি,
আমরা পথের যাত্রী।
যেতে হবে দূরে বহু দূরে
গিরি নদী বন ঘুরে ঘুরে,
অন্ধকার দাঁড়াইয়া দুয়ার সম্মুখে।
মৌন অধোমুখে।

তৃষ্ণাতুর এই দুটি অন্ধকার চোখে নাই আলোকের লেশ;
তমসা অশেষ,
ঘনাইছে হিয়ায় হিয়ায়।
শিহরায়
মরু মরীচিকা ওই চারিদিক থেকে,
সর্ব্ব অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন এঁকে।

ওগো আর কত দূর!
যে কান্নার সুর
ঝরে পড়ে দিগন্তের অন্তরাল হতে,
মেঘে ঢাকা অন্ধকার পথে।
আকাশ ভূধর তাই করিছে ক্রন্দন,
ছিঁড়িতে বন্ধন।
দিকে দিকে উঠিতেছে ধ্বনি—আর কতদূর?
যাত্রী আমি চলিতে হইবে পথ দূর—বহু দূর।

রাজবল্লভের গয়ায় ভূমিদান ও তৎকালীন দলিল-পত্র

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভের নামের সহিত পরিচিত আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে কয়েকখানি প্রামাণিক গ্রন্থও আছে। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস-'এর প্রথম সংস্করণে (১৩১৬ সাল) আমি রাজবল্লভের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমার লিখিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডও মুদ্রিত হইতেছে। তাহাতে রাজবল্লভ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে প্রসঙ্গত তাঁহার একটি দান সম্পর্কিত দলিলপত্র লইয়া আলোচনা করিব। উহা হইতে সেকালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের জমিদারগণের বিচারপদ্ধতি, সেকালের দলিল-দস্তাবেজ ও বাঙ্গালাভাষার আদর্শ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে।

মহারাজা রাজবল্লভ গয়াতে পিতৃকার্য্য করিতে গিয়া শম্ভুনাথ কোঠি গয়ালীকে বিষ্ণুপ্রতি উৎসর্গ করিয়া মূল্যবান্ ভূসম্পত্তি দান করেন। উত্তর বিক্রমপুরের মান্দ্রাগ্রাম সেই সম্পত্তির অন্তর্ভূ'ত থাকায় ঐ গ্রাম গয়ালি-মান্দ্রা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজবল্লভ গয়ার পাণ্ডাঠাকুরকে ৯২৩/ বিঘা ভূমি দান করেন'। ঐ দান ১১৬৫ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়—ঠিক্ পলাশি যুদ্ধের এক 'বৎসর পর। তদবধি গয়ালি পাণ্ডাঠাকুর ও তাঁহার বংশধরেরা তদীয় যজমান রাজবল্লভের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ভোগদখল করিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে গয়া হইতে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া তাঁহারা সম্পত্তি রক্ষার ভার বা তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে তদ্বির করিবার ও আদায়-ওয়াসিলের ভার একজন তহসীলদারের উপর সমর্পণ করেন।

আমরা শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তির বরাবরে
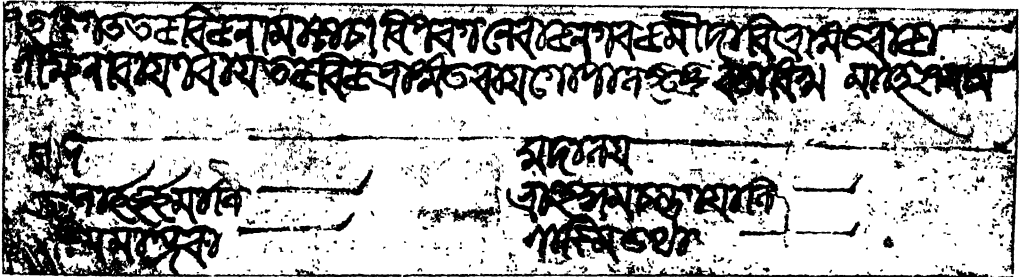
১১৯০ সালের দলিলের প্রথমাংশ
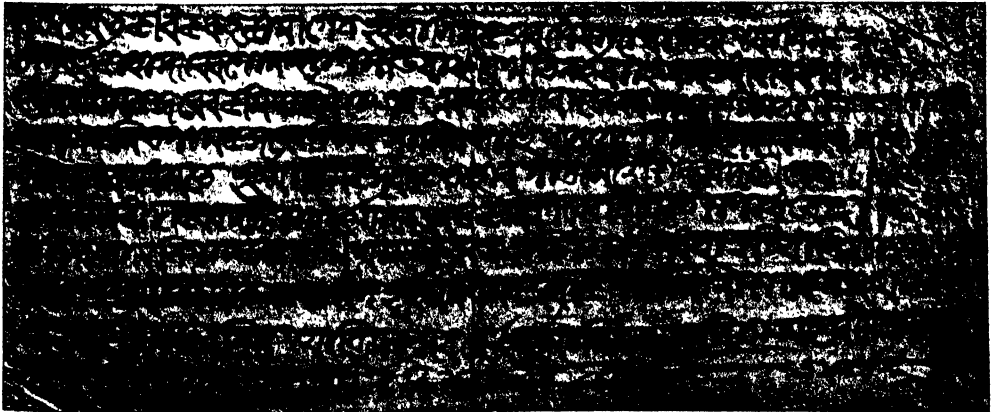
১১৯০ সালের দলিলের শেষাংশ

ঐরূপ দুইখানি তহসীলদার নিয়োগপত্র পাইতেছি। উহার একখানার তারিখ ১২৩৯—২২ বৈশাখ। আর একখানার ১২৩···পরের অঙ্কটির স্থান পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই অঙ্কটি বুঝা গেল না, সম্ভবত ১২৩৮ হইবে। তারিখ ২৫ চৈত্র। এই দলিল দুইখানি ১০৮ বৎসরের পুরানো। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শম্ভুনাথ কোঠি গয়ালির বংশধরগণের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ার দরুণই 'ব্রহ্মত্র'প্রাপ্ত ভূমির অংশীদারগণ স্বতন্ত্রভাবে শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাসকে তহসীলদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এথানে দলিল দুইখানির পাঠ প্রদান করিলাম। মহারাজা রাজবল্লভ ১১৬৫ সালে শম্ভুনাথ কোঠি গয়ালিকে বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ব্রহ্মত্র দান করেন। আর শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাসকে তহসীলদার নিযুক্ত করিলেন তাহার পরবর্ত্তী বংশধরেরা ১২৩৯ সালে অর্থাৎ ৭৪ বৎসর পরে।

১২৩৯ সালের ২২শে বৈশাখের দলিলখানির ও ১২৩··· ২৫শে চৈত্র তারিখের দলিলের পাঠ নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

শ্রীসিবশঙ্কর বিশ্বাষ ষু চরিতেষু আগে—

আমার ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত তালুক পরগণে রাজনগর—ঢাকা নুরপুর কিসমত মান্দরা দত্ত মহারাজা রাজবল্লভ বনামে সম্ভুনাথ গয়ালি উপর লিখা জাএ উক্ত কিসমত মজকুরের তহশীলদারি কর্ম্মে তুমি নিযুক্ত আছ এই কিসমতের থাজনা উষুল তহশীল করিয়া মবলগ ৪৮১৲ চাইরশ একাশী টাকা আমার সরকারে আদাএ করিবা এহার পর জাহা বিক্রী সুত্র তাহা তুমি পাইবা আমার দাবী নাহী তোমার পাটারী মাহিআনা জমী তিনকানী আর নগদ ৩৬৲ ছত্রীশ টাকা পাইবা আর বাজে জমা রাজধুতি গয়রহ জাহা হত্র তাহার অর্দ্দেক সরকারে দাথিল করিবা অর্দ্দেক তুমি নিবা ইতি সন ১৩২৯—তারিথ—২২ বৈশাথ।

এই দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন—শ্রীমতী দুর্গাগয়ালিন দেব্যা জওজে মৃত হুকুমচাঁদ কুঠি গয়ালি ঠাকুর সাং গয়াধাম মহল্লা নাওয়াগারি। নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে দলিলের উপরে ডান দিকে।

দ্বিতীয়থানির অনুলিপি এইরূপ:

শ্রীসিবশঙ্কর বিশ্বাষ মোহরের ষুচরিতেষু আগে—

আমার ব্রহ্মত্র জমি পরগণে রা···র (রাজনগর) 'রা'-র পরের অক্ষর তিনটি ছিন্ন। চাকলে নুরপুর কিসমত মান্দরা বনামে শম্ভুনাথ গয়ালী ঠাকুর লিথা জাত্র এই কিসমত মজকুরে তোমাকে উশুল তহশীল কারণ চাকর মকরর আছ তুমি হামেশা গ্রাম মজকুরে হাজীর থাকিবা—জথন জে কার্য্যকর্ম হয় তাহা করিবা এবং থাজানা গয়রহ ওশুল তহশীল করিয়া থাজানা আমার নিকট হুণ্ডী করিয়া পাঠাইবা হাওলাদারি পাট্টা আমার বিনা এতলায় কেহকে দিবা না—তোমার মাহীনা বৎসর ময়···থোরাক ৪২৲ বেয়াল্লীষ টাকা সীক্কা পাইবা এবং পাটোয়ারি মাহিনায় জে জমি আছে তাহা ভোগ করিয়া মামলী থরচ জে২ আছে করিবা গরহাজীর থাকীয়া কর্ম্মের লোকসান কর মাহীনা বাজেয়াপ্ত বাজে দফা জেতক হয় তাহার অর্দ্দেক তুমি পাইবা অর্দ্দেক সরকারে দাথিল করিবা ইতি সন ১২৩·· (ছিন্নাংশ) তারিথ—২৫শে চৈত্র। এইথানিও শ্রীমতী দুর্গা গয়ালীন স্বাক্ষরিত এবং জমি তিনকানী উল্লিথিত আছে। বোধ হয় বিভিন্ন অংশ অনুযায়ী তহশীলদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

এই দুইথানিই শিবশঙ্কর বিশ্বাসকে গয়ালী-মান্দ্রার কর্ম্মচারী নিয়োগ পত্র।

মহারাজা রাজবল্লভ ১১৭০ বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার জমিদারি পরবর্ত্তী বংশধরগণ মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইংরেজী ১৭৯২ এবং বাঙ্গালা ১১৯৮ সালের একথানি বাটোয়ারা বাজে জমা পত্রে গয়ালীদিগের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমির বিষয় মহারাজা রাজবল্লভের পাঁচ পুত্রের নামোল্লেথ দেথিতে পাওয়া যায়। তাহার আংশিক প্রতিলিপি এথানে

থোলশা নকল একোয়ান বাটোয়ারা বাজে জমী পরগণে রাজনগর গএরহ সরকার ফথেয়াবাদ ও গয়রহ জমীদার শ্রীরাজা লক্ষীনারায়ণ রায় বাটোয়ারা আমীন শ্রীযুত মেঃ তামসেন সাহেব সন ১৭৯২ সতরশত বিয়ানব্বই ইঙ্গরেজী মতাবেক সন ১১৯৮ এগারশত আটানব্বৈ বাঙ্গলা

১২১ ফর্দ্দের পোস্তে—হিঃ রায় গোপালকৃষ্ণ চাকলে নুরপুর আসামী—জমি—ভিটি—নাল—মজগুনি—ভিটি—নাল—নাগায়ত সন ১১৯৬ ভিটী—নাল—উৎসর্গ—ভিটি—নাল—বাস্তপূজা—ভিটি নাল—

কি :—মান্দরা জমি ২।৶৵ ভিটি ২।৮। মজকুর্নি ২।৶৩৵ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮।……

হিং রাজা গঙ্গাদাস

৮৬ ফর্দ্দের পোস্তে

জমি ২।৶৩৵০ ভিটি ৵১৫॥ নাল, ২।৮। মজকুর্নি ২।৶৩৵০ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮।

হিং কেবলরাম বাবু

১৯ ফর্দ্দের পোস্তে

জমি ২।৶৩॥ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮ মজকুর্নি ২।৶৩॥ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮

হিঃ রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুর—

৪৫ ফর্দ্দের পোস্তে—জমি ২।৶৩॥ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮। মজকুনি ২।৶॥ ভিটি ৵১৫॥ নাল ২।৮…

হিঃ রায় রাধামোহন

১৫৭ ফর্দ্দের রোখে জমি ২।৶৩৵ ভিটি ৵১৫৵ নাল ২।৮ মজকুর্নি ২।৶৵ ভিটি ৵১৫৵ নাল ২।৮

১২৶১৮ ॥৵১৭৵ ১১।৶৵ ১২৶১৮৵ ॥৵১৭৵ ১১।৶॥

শ্রীকেবলরাম সেনগোপ্তস্য, শ্রীরাধামোহন সেনগোপ্তস্য বং শ্রীনিলমণি সেনগোপ্তস্য, শ্রীরামগোপাল সেনগোপ্তস্য বং শ্রীপীতাম্বর সেনগোপ্তস্য, শ্রীরাজা গঙ্গাদাস সেন বং শ্রীকালীশঙ্কর সেন, শ্রীরাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুর বং শ্রীরাজকৃষ্ণ সেন।

অতঃপর আমরা নং ৫৩ সন ১৮৫৯।৬০ তারিখের একটি মোকদ্দমার কাগজপত্র হইতে এই গয়ালী-মান্দ্রা গ্রামের ব্রহ্মত্র জমি সম্পর্কে যে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় উহাতে রাজার পঞ্চম পুত্র গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক একটি বিচারের মীমাংসার দলিল (ফয়সালা) দাখিল হয়। সেই দলিলটিতে রাজা গোপালকৃষ্ণের স্বাক্ষর রহিয়াছে। সেই দলিলখানির অংশ আমরা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

মহারাজা রাজবল্লভ সলরজঙ্গ বাহাদুরের সাত পুত্র ছিলেন।

মহারাজা রাজবল্লভ সলরজঙ্গ

(১) দেওয়ান রামদাস (২) রাজা কৃষ্ণদাস (৩) রাজা গঙ্গাদাস (১) রায় রতনকৃষ্ণ (৫) রায় গোপালকৃষ্ণ (৬) রায় রাধামোহন (৭) কেবলবাবু।

মহারাজা রাজবল্লভের প্রথম পুত্র দেওয়ান রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের দত্তকগণ জমিদারীর অংশ না পাইয়া ভরণপোষণার্থ প্রত্যেকে মাসিক ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়েন।

মহারাজা রাজবল্লভের পুত্রগণের পরিচয় দেওয়ায় এইক্ষণে গয়ালী-মান্দ্রার বিষয়টি পাঠকগণের বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

যে মোকদ্দমার দরুণ রায় গোপালকৃষ্ণ স্বাক্ষরিত ফয়সালা-খানি দাখিল হইয়াছিল, এখানে সেই দলিলখানির অনুলিপি প্রদান করিলাম।

বোরকারি কাচারি ডিপুটি কালেক্টারি জেলা ঢাকা মোকাম ঢাকা—শ্রীযুত বাবু রামকুমার বসু ডিপুটি কালেক্টর সন ১৮৬০ সন ইংরেজী—১৯ জানওয়ারি মোতাবেক সন ১২৬৬ সন ৭ মাস—

সরকার বাহাদুর—বাদী

প্রাণনাথ কুটী গয়ালী সাংনাওয়াগাড়ি পরগণে গয়া জিলে বেহার—প্রতিবাদী

পরগণে রাজনগর কি : মান্দরা মধ্যগত ৯২৩৴ বিঘা—নিষ্কর ভূমি তদন্তের মকদ্দমা…

অদ্য এই মকদ্দমা প্রতিবাদীর মোক্তার মহেষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও গোলোকচন্দ্র সেনের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া নথির কাগজাৎ…বিদিত হইল জে থাকবস্তের শ্রীযুত সুপ্রেটেণ্ট সাহেব বাহাদুর…তারিখের রোরকারি দ্বারা উক্ত নিষ্কর ভূমির নকসা এই…কালেক্টারিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে মহারাজা রাজবল্লভের দত্ত্যা উক্ত কিসমতের নিষ্কর ভূমি তাহার জমিদারি সংক্রান্ত বিধায় তস্য ৫ পাচ পুত্রের মধ্যে মেঃ তামশান সাহেব কর্ত্তিক ৫ পাচ অংশে বণ্টক হইয়া তাহা গবর্ণরমেণ্ট পর্য্যন্ত মঞ্জুর হইয়াছে.ঐ নিষ্কর ত্রস্ত হইয়া তজবিজ হওনান্তর রেহাই পাওা প্রকাষ নাই এ প্রযুক্ত ঐ নিষ্করের সিদ্দাণীদ্দের বিচার কালেক্টার হইতে আমলে

আনা জায় তদানুসারে শ্রীযুত কালেক্টার সাহেব বাহাদুর ১৫ আগষ্ট তারিখে এই আদেষ এই মকদ্দমার কাগজাত অত্র কাচারিতে অর্পণ করিয়াছেন জে এ পক্ষ ঐ নিষ্কর ভূমির উচিত তদন্ত আমলে আনিয়া রায় সম্বলিত কাগজাত··· নিয়া শ্রীযুতের হুজুরে প্রবল করে সেমতে প্রমাণ তলবে প্রতিবাদীর নামে এত্তলানামা জারি করাতে প্রতিবাদী গত সেপ্তাম্বর মাসের ১৩ তারিখে ১ এক কেতা দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে জে উক্ত ভূমি পরগণে রাজনগরের সামিল ঐ পরগণে রাজনগরের পূর্ব্ব মালিক রাজা রাজবল্লভ সেনগুপ্ত ১১৬৫ সনে উক্ত কিসমতের ভূমি প্রতিবাদীর পূর্ব্ব পুরুস মৃত শম্ভুনাথ কুটী গয়ালীকে বিষ্ণু প্রতি দান বিক্রির সত্য বলে নিষ্কর দিয়া সনদ দওাতে তদবধি ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহারা দখিলকার আছে পরে ১১৯৮ সনে মেঃ তামসেন সাহেব কর্ত্তিক ঐ পরগণে রাজনগর ঐ রাজা রাজবল্লভের ৫ পাচ পুত্রের স্থলে ৫ পাচ অংশে বাটওয়ারা হইয়া উক্ত কিসমত বাটওয়ারা কাগজে প্রতি হিস্যাতে ২।৶৩৫ করা জমী নিষ্কর লিখা জায় ও ১১৯২ সনে কানাই বেলদার নামক এক বেক্তী ঐ কিসমতের জমী বেলাদার জায়গীর উল্লেখে মকদ্দমা উপস্থিত করাতে হাকিমের বিচারে ঐ জমি প্রতিবাদীর পূর্ব্ব পুরুষের প্রাপ্ত নিষ্কর সাব্যস্ত হইয়াছে অত্র স্থলে ঐ জমী সরকারে বাজেআপ্তের অযুগ্য ও আপন এজ্জাহারের প্রমাণ জৈষ্ঠ ১১৯২ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠের লিখিত ফএছলা ১ কেতা ও ১১৯৮ সালের মেঃ তামশেন সাহেবের কর্ত্তিক খোলাষা বাটাওারার নকল ও ৫ কেতা ও ১১৯০ সালের ৩রা ফাল্গুনের লিখিত রায় গোপাল-কৃষ্ণ সেনগুপ্ত সালীশের দস্তখতী ফএছলা ১ এক কেতা একুনে ৭ সাত কেতা দস্তাবেজ ও রাজবল্লভ সেনগুপ্তের দস্তা ১১৬৫ সালের ২৬ ফাল্গুনের লিখিত সনদ ১ কেতা দাখিল করিয়াছে ইতি—

জেহেতুক প্রতিবাদীর দাখিলী রাজবল্লভ সেনগুপ্তের দস্তা ১১৬৫ সালের ২৬ ফাল্গুনের সনদে লিখিত আছে জে ঐ কিসমত মান্দরা ঐ রাজা রাজবল্লভের জমিদারি তপে মুরনগর সামিল ঐ কিসমতের সদর জমা ঐ রাজা রাজবল্লভ তাহার জমীদারি সামিল রাখিয়া ঐ কিসমত সমুদয় ৺বিষ্ণু প্রীতে শম্ভুনাথ কুটি গয়ালিকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন ও কালেক্টরীর মহাফেজের দাখিলী গত নবাম্বর মাসের ১৯ তারিখের কৈফিয়ত ও প্রীতিবাদীর দাখিলী মেঃ তামসেন সাহেবের কর্ত্তিক খোলাসা একোওান বাটাওারা দিষ্টে পষ্ট প্রকাষ যে ঐ কিসমত মান্দরা রাজা রাজবল্লভের স্বকর জমিদারি পরগণে রাজনগরের অন্তঃপাতী এবং তাহার সদর জমা ঐ রাজা রাজবল্লভের ৫ পাচ পুত্রের ৫ পাচ অংশে বাটওারা হইয়া জে ঐ ৫ পাচ হিস্যার সদর জমা প্রথক ২ হইয়াছে ঐ ৫ পাচ মহালের সামিলই সরকার দাখিল হইতেছে কেননা জমি ঐ কিসমত ঐ ৫ পাঁচ হিস্যার স্বকর মহালের সামিল না হইবেক তবে কখনও ঐ কিসমত ঐ ৫ পাচ হিস্যায় বাটওারার সামিল হইত না। তাহা ঐ বাটওয়ারা হইতে বর্জ্জীত থাকিত অত্রাবস্থায় জখন ঐ কিসমতের জমা উক্ত ৫ পাচ হিস্যা সামিল সরকারে দাখিল হইতেছে এবং প্রতিবাদীর দাখিলী পূর্ব্ব উক্ত সনদে ঐ কিসমত ঐ স্বকর মহালের সামিল ব্রহ্মত্ত প্রাপ্ত লিখিত আছে তখন আর উক্ত নিষ্কর ভূমিতে সরকার বাহাদুর পুনরায় কর বসাইতে পারেন না এতাবতা এ পক্ষের বিবেচনাতে উক্ত নিষ্কর ভূমি সরকারের দাবি হইতে ছারান পাবার যুগ্য জানিয়া—

হুকুম হইল জে—

এই মকদ্দমা এই কাচারির বাকী খাত হইতে খারিজ করত উচিত হুকুম প্রদান কারণ কাগজাত শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের হুজুরে পাঠান জায় ইতি—

ম শ্রীরাজকিশোর সেন একটিন সেরেস্তাদার নং ১২১২২

হুকুম হইল জে মোতফরকাতে নম্বর দিয়া পেষ হয় সন ১৮৬০ সন তারিখ ২৫ জানওারি—অত্য পেষ হইয়া হুকুম হইল জে জমী খালাষ দেওা জায় ও নম্বর খারিজ হএ সন ১৮৬০ সন তারিখ ২৭ ফেব্রওারি—

এই নকল রোয়কারি ১৮৬০ সন ১০ মাই (মে) সন ১২৬৭ সালের ২৯ বৈশাখ প্রাণনাথ কুটির মোক্তার গোলোকচন্দ্র সেনের হাওলা করা গেল ইতি—

এই হুকুমনামার নকল হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে মহারাজা রাজবল্লভ ১১৬৫ সালের ২৬শে ফাল্গুন এক সনদ দ্বারা কিসমত মান্দরা রাজা রাজবল্লভের জমিদারি সামিল বিষ্ণু প্রীতিতে শম্ভুনাথ কুটি গয়ালীকে দান করিয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ—২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ঘটে। আর রাজা রাজবল্লভ শম্ভুনাথ কুটি গয়ালীকে সনদ দান করেন—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে—*

যুদ্ধের নয়মাস পর। আমরা রাজবল্লভ প্রদত্ত সনদখানি দেখিতে পাই নাই। কোথায় কাহার নিকট ঐ সনদখানি আছে অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। ঐখানির অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন গয়ালি পাণ্ডাদের গৃহেই রহিয়াছে। কিন্তু এই মোকদ্দমার কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে সনদখানি আদালতে দাখিল হইয়াছিল।—সেই সনদখানার সন্ধান কেহ দিতে পারিলে উপকৃত হইব।

খোলাষা বাটাওয়ারারে প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় গয়ালীপক্ষের দাখিলী নিষ্কর ভূমির প্রমাণপক্ষে রায় গোপালকৃষ্ণ সেনগুপ্তের সালিশের নিজ দস্তখতী ফয়ছালাখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ফয়ছালাখানার কাগজখানি অযত্নে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, রায় গোপালকৃষ্ণের স্বাক্ষরটিরও কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ফয়ছালাখানার তারিখ ১১৯০ সালের ৩রা ফাল্গুন। ইংরেজী—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরের। এই দলিলের তিনটি অংশ। প্রথম অংশ—বাদীর অভিযোগ। দ্বিতীয় অংশে—প্রতিবাদীর উত্তর এবং সর্ব্বশেষে রায় গোপালকৃষ্ণ সেনগুপ্তের মীমাংসা বা হুকুম-নামা। এই ফয়ছালাখানার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

হকিগত তজবিজনামা কাচারি পরগণে রাজনগর জমিদারি শ্রীযুত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় তজবিজ শ্রীযুত রায় গোপালকৃষ্ণ সেনগুপ্ত বতারিখ মাহে ২৭ মাঘ

মুদ্দাই	মুদালয়
কানাই ভুইমালি	শ্রীহুকুমচন্দ্র গয়ালি
সাকিম মান্দরা	সাকিম তথা

… কানাই ভুইমালি মজকুর মোচলকা লিথীয়া দিল যে মুদালয় শ্রীহুকুমচন্দ্র গয়ালি … রতরপ লোক দিয়া মুদ্দে ভুইমালি মজকুরের একথান পাতাম নৌকা জবরদস্তি (করিয়া) নিয়াছেন আর মদ্দে মজকুরের জায়গীরের জমির ধান্য কাটাইয়া নিয়াছেন ও জায়গীরের ভিটাতে কাপাষ রোয়াইয়াছেন ও মদ্দে মজকুরের খানে বাড়ির আমলে জোর জবরদস্তী আমল করেন ও বাড়ি চড়াও করিয়া লুটিয়া নিয়াছেন এ সকল দফা প্রমাণ করিবেক জদি প্রমাণ করিতে না পারে তবে গুনাগার—

…(মদ্দা) লয় গয়ালি মজকুর মোচলকার উত্তর মোচলকা লিখিয়া দিল মদ্দে ভুইমালি মজকুরকে মোচলকা লিখিয়া দিয়াছে এমত নহে মৌজে মান্দরা মদালয় মজকুরের বি (ত্ত ?) তাহার আমলি গাছের আমলি পাড়িতে কয়েকজন লোক পাঠাইয়াছীল সেই লোককে মদ্দে ভুইমালি মজকুর মাইরপিট করিতেছিল সেই সোর শুনিয়া মদালয় গয়ালি মা ‥ (ন্দরা) গ্রামের সিকদারকে পাঠাইয়াছিল তাহার সঙ্গে খাজানা হ ছিল তাহা বেম…মাইরপিট জখমি লবেজান করিয়া খাজানা লুটিয়া নিয়া নৌকা ফেলাইয়া গিয়াছিল মদ্দে মজকুরের পাতাম নৌকা জবরদস্তী করিয়া নেয় নাই এবং মদ্দালয় গয়ালি মজকুরের আপন বির্ত্তির জমির ধান্য কাটাইয়া নিয়াছে মদ্দে ভুইমালি মজকুরের জায়গীরের জমির ধান্য কাটাইয়া নেএ নহে আপন বির্ত্তির ভিটাতে কাপাস রোয়াএ নহে মদালয় গয়ালি মজকুরের আপন বির্ত্তির ভিটায় আমলি গাছ আমল করে মদ্দে ভুইমালি মজকুরের খানে বাড়ির আমলি গাছ জবরদস্তি আমল করে নহে। আর মদ্দে মজকুরের বাড়ি চড়াও করিয়া লুটিয়া নেএ নহে জদি মদ্দে ভুইমালি মজকুর এ সকল দফা প্রমাণ করিতে পারে তবে মদালয় মজকুর গুনাগার।

এহাতে মদ্দে ভুইমালি মজকুরের ঠাই প্রমাণ সাক্ষী তলব হইল পরে মদ্দে মজকুর প্রমাণ সহি লিখিয়া দিল মদালয় গয়ালি মজকুর সাক্ষী সহি করিল এবং মদ্দে ভুইমালি মজকুর এক ফারখতি জাহির করিল মদালয় গয়ালি মজকুর সেই ফারখতি ওদল করিল পরে ফারখতিতে ইসাদ জে জে ছিল তাহার ঘরেই মদালয় গয়ালি মজকুর সহী করিল এ সকল সাক্ষিরা আপন আপন জবানি লিখিয়া দিল তাহাতে (শ্রীদেব ?) নৌকার সাক্ষি শ্রীআনন্দিরাম শর্ম্মা জবানি লিখিয়া দিল……

মাহে আশ্বিন বেলা প্রহর আড়াইকের কালে শ্রীআরাধন ভুইমালি ও শ্রীকানাই ভুইমালি ও শ্রীবদাই ভুইমালি এহারা শর্ম্মা মজকুরের বাড়ীর পাচ বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগাইয়া বাড়িতে উঠিয়া কহিল দেখ আমার ঘরে লড়াইয়া আসিছে পরে শ্রীযুত গয়ালির লোক আসিয়া কহিল আমার ঘরে ক্ষুন করিয়া আসিছে একথা কহিয়া গয়ালির লোকে ভুইমালির নৌকার উপর চড়িয়া নৌকা বাহিয়া গেল আর

জমির সাক্ষি শ্রীদয়ারাম মিত্র জবানি লিখিয়া দিল খালের পুব পথের উত্তর এককোঠা আর এই কোঠার পুবে এক কোঠা আর এই কোঠার দক্ষিনে পুবে লাগ তিন কোঠা একুনে পাচ কোঠা জমি মুরপুর তপা কাএম থাকিতে মিত্র মজকুর কড়া জোত করিয়াছিল খাজনা তপা মজকুরের এতমামদায় শ্রীরাম হালদার ও কানাই কর এহার ঘরে ঠাই দিয়াছে মহারাজা মুরপুর তপা খরিদ করিলেন পরে মহারাজার এতমামদারে তাহার ঠাই হতে জমি ছাড়াইয়া নিল পরে এহার এক কোঠা জমি রাম হালদার জোত করিয়াছিল তাহার ঠাই হতে সেই কোঠা শ্রীদয়ারাম ভুইমালি ও শ্রীজয়সিংহ ভুইমালি এহারা নিয়া চাস করিয়া জিরাত ধান্ত বুনিয়াছিল মহারাজা মান্দরা গ্রাম গয়ালিরে উৎসর্গ দিলেন পর গয়ালির গোমস্তা হরি তহবিলদার জিরাত কাটাইয়া নিয়া জমি আমল করিল আর বাড়ি লুটের সাক্ষি শ্রীগোপিনাথ পাল জবানি লিখিয়া দিল বাড়ি লুটের ব্রিত্তান্ত জানেনা আর আমলি গাছের প্রমান মদ্দেও মদালয় উভয় সম্মত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ চাঠাতিকে আমিন লইয়া সরে জমিনে জাইয়া হক সফির লোক লইয়া তহকিক করিল মদালয় গয়ালি মজকুরের বির্ত্তির ভিটাতে আমলি গাচ সেই গাচ (গাছ) গয়ালি মজকুর আমল করে আর ফারখতির সাক্ষি শ্রীতিতারাম শর্ম্মা ও সেক তিতাই ও হেসামদ্দিখা এহারা জবানি লিখিয়া দিল এহাতে সেক তিতাই ও হেসামদ্দিখা এই দুইজন জবানি লিখিয়া দিল তাহারা এ ফারখতির ব্রত্তান্ত (বৃত্তান্ত) কিছু জানে না তিতারাম শর্ম্মা জবানি লিখিয়া দিল মহারাজা মান্দ্রা গ্রাম গয়ালিরে উৎসর্গ দিয়াছেন তাহাতে এই গ্রাম গয়ালি ঠাকুরের ঠাই হরি তহবিলদার ইজারা লইয়া তাহার জানিবে পাচু সিকদারকে গ্রামের এতমামদারি দিল তাহার তরপ মুহুরির শর্ম্মা মজকুর ছিল পর সন ১১৭০ সনে হালইওদাএ উহারা বর তরপ হইল গ্রাম গঙ্গেষ চক্রবর্ত্তি ইজারা লইল পর জয়সিংহ ভুইমালি পেয়াদা আনিয়া পাচু সিকদারকেও শর্ম্মা মজকুরকে পাকড়াও করিয়া কহিল তোমার ঘরে তাকানিব নও বা আমার জমির ফারখতি দেও ইহাতে শর্ম্মা মজকুর সিকদাঁর মজকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিল গ্রাম আমার ঘরে আমল নায়াহ জদি পেয়াদাএ পাকড়িয়া ঢাকা নেএ তবে পেয়াদার রোজ খোরাক কথা হইতে দিব চল আমরা ফারখতি দিয়া খালাস হইয়া জাই পরে শর্ম্মা মজকুর কহিল আমার ঘরে চিঠার জমি কি প্রকার ফারখতি দিব সিকদার মজকুর কহিল যে প্রকার ভুইমালি মজকুর কহে সেই প্রকার লিখিয়া দেও পরে শর্ম্মা মজকুর চিঠার জমি মনাকসা বুনিয়া ফারখতি লিখিল পাচু সিকদার ফারখতিতে দস্তখত করিয়া দিল ফারখতি পাইয়া ওহার ঘরে ছাড়িয়া দিয়া ভুইমালি মজকুর পেয়াদা লইয়া গেল।

অতয়েব তজবিজ কহ (রুহ ?) জানা গেল ভুইমালি মজকুর পেয়াদা আনিয়া গয়ালি মজকুরের তগিবই বারাদারের গোমস্তা পাকড়িয়া ফারখতি লইয়াছে এমত ধারার ফারখতি ভুইমালি মজকুরের জমি না পৌচে এবং মুরপুর তপা দস্তরের সাবেক চিঠা তহকিক করা গেল এসকল জমি তপা মজকুরের চিঠার সামিল আছে অতএব চিঠা তহকিক এবং তাহার সাক্ষিরদ্বয়ের জবানি মতে ভুইমালি মজকুরকে তাহার পাতাম নৌকা জবরদস্তি নেওয়া ও জায়গিরের জমির ধান্য জবরদস্তি কাটাইয়া নেওনেও জায়গিরের ভিটাতে কাপাষ রোহানওয়ানে বাড়ির আমলি গাচ জবরদস্তী আমল করনও বাড়ি চড়াও করিয়া লুটিয়া নিয়াছে এসকল দফার প্রমাণ করিতে না পারিল ভুইমালি মজকুর জে পাতাম নৌকা ফেলাইয়া গিয়াছিল সেই নৌকার রসিদ গয়ালি মজকুরকে ভুইমালি মজকুর দিয়া তাহার নৌকা মায় সরঞ্জাম বুঝিয়া লইয়া গেল ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৩ ফাল্গুন।

আমরা রাজা বা রায় গোপালকৃষ্ণের এই ফয়ছালাখানা পাঠকগণকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে বলি। প্রথমত ভাষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, দলিলখানি তৎকাল প্রচলিত আরব্য ও পারস্য ভাষার বহু শব্দ সম্বলিত হইলেও বক্তব্য বিষয় বেশ সুস্পষ্টভাবে সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

মুদ্দাই, মুদালয়, মজকুর, মোচলকা, মজকুর, জায়গীর, জবানী, আমল, জবরদস্তী, দফা, গুণাগার, মৌজে, আমলি গাছ (তেঁতুল গাছ), খানে, ফারখতি, ইসাদ, ইসাদি, জাহির, সহী, তপা, জোত, এতমামদার, গোমস্তা, তহবিলদার, মনাকষা, লবেজান, ফয়ছালা ইত্যাদি। মুদ্দাই অর্থে বাদী বা plaintiff, মুদালয় বা মুদালেহে—প্রতিবাদী defendant, মজকুর, উল্লিখিত cited above, মোচলকা,

মুচলেকা—আদালতের আদেশ প্রতিপালনের অঙ্গীকৃতি, জায়গীর—রাজসরকার হইতে প্রদত্ত নিষ্কর জমি free grant of land, জবানী—মৌখিক উক্তি verbal, জবরদস্তী-বলপ্রয়োগ high-handedness, দফা—পরিচ্ছেদ item, গুণাগার—দণ্ড penalty, মৌজে—মৌজা গ্রাম village, নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীভুক্ত স্থান, থানা থানে গৃহ, ফারখতি, ফারখত-ছাড়পত্র, acquittance, release ইসাদ—সাক্ষ্য, ইসাদী সাক্ষী, জাহির—প্রকাশ করা reveal, সহী—স্বাক্ষর signature, তপা, ৩প্পা—কয়েকটি মৌজার জোত—প্রজার কৃষিসত্ব যুক্ত জমি, holding, এতমামদার—রক্ষণাবেক্ষণকারী, গোমস্তা,—জমিদারের কর্ম্মচারী, তহবিলদার—ধনাধ্যক্ষ treasurer, মনাকষা যে জমির বিষয় চিঠাতে উল্লিখিত আছে, অথচ প্রজার অধিকারভুক্ত নহে, ফয়ছালা, ফয়সলা—রায়, বিচার নিষ্পত্তি, লবেজান—ওষ্ঠাগত প্রাণ।

এই দলিল কয়খানিতে যে যে আরবী ও পারসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এখানে তাহার অর্থ লিখিয়া দিলাম, ইহা দ্বারা পাঠকগণ অতি সহজেই দলিলের বা ফয়সলার বিষয় পড়িয়া সেকালের জমিদারের বিচারপদ্ধতির আদর্শ বুঝিতে পারিবেন।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বিক্রমপুরে কার্পাস বুনা হইত। ফয়সালার দুই স্থানে "জায়গীরের ভিটাতে কাপায রোয়াইয়াছেন" উল্লিখিত আছে।

বাটোয়ারা পত্রে মেসাস তামসেনের নাম আছে। ইঁহার নাম জর্জ টমসন্ (Mr. George Thomson)। এই বাটোয়ারা সম্পর্কে একটু বলিতেছি।

মহারাজা রাজবল্লভ মুলফৎগঞ্জ (Mulfatgunj) থানার অন্তর্গত রাজনগরের অধিবাসী ছিলেন। বাকরগঞ্জের অন্তর্গত বুজারউমেদপুর পরগণা রাজবল্লভ ঢাকায় আগা বাকরের (Aga Bakar) মৃত্যুর পর স্বাধিকারভুক্ত করেন। বাঙ্গালা ১১৬৭ সনে ইংরেজী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ পরগণার জরিপ হইয়া জমা বৃদ্ধি করা হয়। রাজা রাজবল্লভের জীবনের ইতিহাসের সহিত ঢাকা ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের ইতিহাসেরও সংশ্রব রহিয়াছে। তবে তাঁহার সহিত ঢাকা ও ফরিদপুরের ইতিহাসেরই ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রহিযাছে, বাকরগঞ্জের সহিত ততটা নাই।

রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস মুঙ্গেরে কিরূপ শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর রায় বা রাজা গোপালকৃষ্ণ (রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র) সমুদয় জমিদারীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় গোপালকৃষ্ণ ১১৯৪ সনের ২৪শে আষাঢ় ইংরেজী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই প্রাণত্যাগ করেন। যে ফয়সলার বিষয় লইয়া আমরা আলোচনা করিলাম, রায় গোপালকৃষ্ণ তাঁহার মৃত্যুর চারিবৎসর পূর্ব্বে উহা করিযাছিলেন। রায় গোপালকৃষ্ণের তিন পুত্র ছিলেন, যথা :
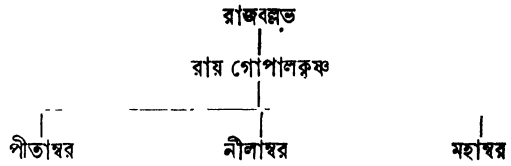
পীতাম্বরের সহিত রাজবল্লভের অন্যান্য পৌত্রগণের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি লইয়া নানা গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হইতে থাকে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার কালেক্টার তদানীন্তন এসিস্ট্যাণ্ট কালেক্টার মিঃ জর্জ্জ টমসন (Assistant to the Collector of Dacca) সাহেবকে বৈষয়িক গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া সম্পত্তি বাটোয়ারা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া আপোষ নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ান রামদাসের পৌত্র কালীকিঙ্কর ১১৮৯ বাংলা সন ইংরেজী ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকার দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করেন এবং তাঁহার আবেদনও মঞ্জুর হইয়াছিল। ১১৯৪ বাংলা সনের বৈশাখ মাসে ও ইংরেজী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সেই আদেশই বহাল থাকিলে, ঢাকার কালেক্টার মিঃ ডে (Mr. Day)—বুজার উমেদপুর, রাজনগর, কার্ত্তিকপুর, সুজাবাদ পরগণা প্রভৃতি বাটোয়ারা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারের তত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে, পীতাম্বর সেনের চক্রান্তেই অনেককাল পর্য্যন্ত আপোষ নিষ্পত্তিতে সম্পত্তি বাটোয়ারা হয় নাই। অবশেষে মিঃ টমসন সাহেব সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রবন্ধোক্ত বাটোয়ারা জমির খোলশা নকলে যে মেসাস তামসেন সাহেবের উল্লেখ আছে, তিনিই এই Mr. George Thomson, assistant to the Collector of Dacca. আর ১২৩৯ সালে শ্রীমতী দুর্গা গয়ালীন শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাসকে যে নিয়োগপত্র দিয়াছেন, এই শিবশঙ্কর বিশ্বাস, গয়ালী-মান্দ্রার নিকটবর্ত্তী পল্লী হারিয়া-মুন্সিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশীয় বিশ্বাস পরিবারের একজন পূর্ব্বপুরুষ। হারিয়ামুন্সিয়া বিশ্বাস পরিবারের অনেকেই গয়ালি ঠাকুরদের তহসীলদারের কাজ করিয়াছেন।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

চন্দ্রকান্ত—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

রূপসী চন্দ্রা মাধবী রাতে
উছল হ'ল মলয় বাতে।
কি যেন মোহে আকুলি' তাহে
রূপালি মায়া রাঙাতে চাহে,
গোপন দিঠি
হানিয়া মিঠি
অলস স্নিগ্ধ নয়ন-পাতে ॥

১ ২´ ৩ ০
II {ন্‌রা -সন্‌া ধ্‌প্‌া ধ্‌ন্‌া | রগা -া -া গা | (রগা -পা ধন্ধা গা | গপা -পরা সা -া) } I
রূ০ ০০ প০ সী০ চ ন্‌ ০ দ্রা মা০ ০ ধ০ বী রা ০ তে ০

৩ ০ ১ ২´
সন্‌া -ধ্‌ন্‌া ধ্‌া প্‌া | প্‌সা -ন্‌া -রা -গা | রন্‌া -রা সা -া | রগা -পধা ধনা -া |
উ০ ০০ ছ ল হ' ০ ০ ০ ০ ০ ল ০ ম০ ০০ ল ০

৩ ০
ধন্ধা -গরা রপা -া | পরা -গা -রা সা II
য়০ ০০ ০ ০ বা ০ ০ তে

১ ২´ ৩ ০
II {গপা -ধনা ধা পা | পর্সা -া -া র্সা | ধনা -র্রগা র্রা র্সনা | নর্সা -া -া র্সা I
কি০ ০০ যে ন মো০ ০ ০ হে আ০ ০০ কু লি'০ তা ০ ০ হে

১	২´	৩	•
র্সনা -ধনা ধা পা	পনা -া -া না	গপা -ধনা ধা হ্মগা	গপা -া -া পা } I
রূ ০ ০ ০ পা লি	মা ০ ০ য়া	রা ০ ০ ০ ঙা তে ০	চা ০ ০ হে

১	২´	৩	ঃ
গধা ধগা গপা পরা	রগা -া -া -া	রনা্ রা গা রা	সা -া -া -া I
গো প ন দি	ঠিঁ ০ ০ ০	হা নি য়া মি	ঠিঁ ০ ০ ০

১	২´	৩	০
ধনা্ -রগা পা হ্মগা	গপা -া -া পা	নধা হ্মগা পহ্মা -গরা	রা -গা -রা সা II II
অ ০ ০ ০ ল স ০	স্নি ০ গ্ ধ	ন ০ য় ০ ন ০ ০ ০	পা ০ ০ তে

দ্রষ্টব্য ঃ—চন্দ্রকান্ত কল্যাণ মেলের একটী অপ্রচলিত রাগ। স্থূলতঃ ইহা খাড়ব-সম্পূর্ণ, যেহেতু আরোহে মধ্যম (কড়ি) লাগে না ও অবরোহে সাতটা পর্দ্দাই লাগে। কিন্তু অবরোহ সম্পূর্ণ হইলেও, পঞ্চম ব্যবহারের বৈচিত্র্যটুকু চোখে না পড়িয়া যায় না। প্রায়ই দেখা যায় যে 'না ধা পা হ্মা গা' স্বর-বিন্যাসের পঞ্চম-সারল্য ইহাতে থাকে না, বরং 'না ধা হ্মা গা পা' বা 'না ধা হ্মা গা রা পা'ই রাগ-বাচক বলিয়া মনে হয়। ফলে, ইংরাজী সুরের কিছু আভাসও থাকিয়া যায় (অবশ্য, এ কথা কল্যাণ মেলের একাধিক রাগ সম্বন্ধেই সাধারণ ভাবে বলা চলে)।

রাগটীর আকৃতি থেকে আরও বোঝা যায় যে ইহা শুদ্ধ কল্যাণের প্রচুর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, যদিও আরোহে নিখাদের প্রাবল্য ও অবরোহে পঞ্চমের নূতনত্ব কিছু রাগ-বৈশিষ্ট্য না আনিয়া পারে না। কিন্তু 'জোরদার' [illegible] হেতু, আবার ইমনেরও কিছু ছায়া আসিয়া যায়।

ইহার বাদী 'গ' ও সম্বাদী 'ন' এবং রাগ-রূপ প্রায়ই মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে নিবদ্ধ বলিয়া স্বর-গতি ধীর।

—সুরদাতা।

কবি

শ্রীসুবোধ রায়

যেই কথাটি বল্‌তে গিয়ে
　　বল্‌তে নারি বারে বারে,
চিত্ত যেথায় স্তব্ধ গভীর
　　অর্থশালী শব্দহারে;
বুকের শোণিত, চোখের জলে,
গভীরভাবে, হাসির ছলে,
জীবন-পটে রঙে রূপে
　　ফুটিয়ে তোলে সেই সে ছবি
যেই কুশলী নিপুণ হাতে—
　　সেই তো সাধক—সেই তো কবি।

দেওয়া নেওয়া, বেচা-কেনা
　　চল্‌ছে যেন হাটের মেলা,
হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি
　　বে-দরদী প্রাণের খেলা।
সেথায় যে জন আপন ভুলে
বিকায় নিজে বিনি মুলে,
জীবন-যাগে সবার ভাগে
　　দেয় যে নিত্য প্রেমের হবি;
নীরস ধরায় সরস করে
　　সেই দরদী, সেই তো কবি।

গান্ধার-শিল্পে কয়েকটি জাতক কাহিনীর চিত্র

শ্রীগুরুদাস সরকার

অনুসন্ধানী পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জন্মান্তরবাদ অতিপ্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের একস্থলে মৃত্যুর পর জীবাত্মা বারি ও বৃক্ষাদিতে পরিণত হয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণখণ্ডেও জন্মান্তরের আভাস পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুনর্জন্মের যে উল্লেখ আছে তাহা অতি সুস্পষ্ট। উপনিষদগ্রন্থের মধ্যে এই দুইখানিই প্রাচীনতম।

উপনিষদের যুগ বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন ৮০ বৎসর বয়সে, আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ৪৭৮ হইতে ৪৮৩ অব্দের মধ্যে। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির রচনা কাল যে খৃঃ-পূঃ ৫৫০ অব্দের পরে ঠেলিয়া লওয়া চলে না তাহা ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরাও স্বীকার করেন। বুদ্ধ তাঁহার অভ্যুদয়কালীন প্রচলিত ধর্ম্মমত হইতে, উহার অঙ্গীভূত এই কর্ম্ম ও জন্মান্তরমূলক দৃঢ়বদ্ধ মতবাদ নিজ ধর্ম্মে স্থান দিতেন না যদি উহা লোকসমাজে শাশ্বত সত্যরূপে না স্থান পাইত। আমি বা আমার নিজের কেহ কর্ম্মদোষে মনুষ্যেতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারি এই বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিলে অহিংসার ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সুতরাং জন্মান্তরবাদের সহিত কর্ম্মফলবাদ ও অহিংসাবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই যে সকল উপদেশমূলক জনপ্রিয় কাহিনী এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোথাও বা মানব, কোথাও বা মানবেতর জীব, কোথাও বা যক্ষ রক্ষ কিন্নর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ; সেইগুলিই কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বুদ্ধের পূর্ব্বজীবনের কোনও না কোন কাল্পনিক ঘটনা সমাবেশে জাতক-কাহিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীনকালের আচার-ব্যবহার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি-নিয়মাদি সম্বন্ধে জাতক-কাহিনী হইতে অশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। বভেরু জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাবীলনের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষ-জাত বিহঙ্গম ময়ূর তদ্দেশে ভারতবর্ষ হইতেই আনীত হইয়াছিল। অপর একটি জাতক-কাহিনীর গল্পাংশ আরব্য উপন্যাসের একটি সুপরিচিত আখ্যায়িকার সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। প্রবাদপরম্পরায় লব্ধ এই সুবিশাল একত্রগ্রথিত কথা-সংগ্রহের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ, স্বর্গত রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের বঙ্গানুবাদের কৃপায় বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে।

কলিকাতা যাদুঘরে তত্রস্থ গান্ধার-গৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছয়খানি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত তিনটি জাতক-কাহিনীর চিত্র—একটি কাচের আবরণ-বিশিষ্ট আধারে রক্ষিত হইয়াছে। ১নং ফলক পেশোয়ার জেলার জামালগড়িতে এবং ২নং হইতে ৫নং ফলক লোরিয়াল তাঙ্গাই নামক স্থানে প্রাপ্ত। ৬নং ফলকের প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত। নিম্নে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের রচিত পরিচিতি অবলম্বনে এই চিত্রগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ১নং হইতে ৪নং ফলকে দীপঙ্কর জাতকের চিত্র, ৫নং ফলকে চন্দ্র-কিন্নর জাতকের চিত্র এবং ৬নং-এ ঋষ্যশৃঙ্গ জাতকের চিত্র। দীপঙ্কর জাতকের কাহিনী এইরূপ। সুমতি নামক একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যুবককে বাসব নামে এক রাজা যজ্ঞান্তে পাঁচটি দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; স্বর্ণময় দণ্ড ও জলাধার পাত্র, স্বর্ণ ও রত্নখচিত শয্যা, পাঁচশত কার্ষাপণ (১) মুদ্রা ও একটি সালঙ্কারা কন্যা। ব্রহ্মচর্য্যের ওজুহাতে কন্যাটির প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। প্রত্যাখ্যাতা কন্যা তাহার দেহের অলঙ্কারগুলি কোনও উদ্যানপাল মালাকরকে দান করিয়া দেবসেবায় নিযুক্ত হ'ন। দীপঙ্কর বুদ্ধ যেদিন দীপাবতী নগরীতে আগমন করিবেন—স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-কুমারও সেই দিন দীপাবতীতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। দেশের রাজা দীপঙ্করের পূজার জন্য নগরে যেখানে যত পুষ্প ছিল তাহা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কেবল সাতটি কমল যাহা দৈবপ্রভাবে সেই মালীর সরোবরে ফুটিয়াছিল তাহাই লইতে পারেন নাই। যে কন্যার নিকট মালী বহুমূল্য রত্নাভরণ লাভ করিয়াছে তাহার মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে সে এই পুষ্প কয়টি লইতে দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কন্যা পূর্ব্বাহ্নেই পদ্ম কয়টি তুলিয়া একটি কলস মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারও উদ্দেশ্য যে তিনি এই পদ্মসপ্তকে দীপঙ্করের পূজা করিবেন। ব্রহ্মচারী যখন পুষ্প না পাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন তখন কুমারী তাহার কলসটি লইয়া দীপঙ্করের দর্শনাশায় গমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ নিকটবর্ত্তী হইতেই পদ্মকয়টি আপনা হইতেই কলস হইতে বাহির হইয়া আসে। ব্রাহ্মণ মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিতে চাহিলে কন্যাটি তাহাতে অস্বীকৃতা হয়েন। অবশেষে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় তাঁহাকেই জন্মজন্মান্তরের পত্নীরূপে পাইবেন, মনে মনে এই অভীষ্ট পোষণ করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তিনি কুমারীর নিকট হইতে পাঁচটি পদ্ম গ্রহণ করেন। অপর দুইটি কন্যা নিজেই বুদ্ধকে অর্পণ করিবেন বলিয়া রাখিয়া দেন। জনতা ভেদ করিয়া দীপঙ্করের সমাপবর্ত্তী হওয়া তাঁহাদের উভয়ের পক্ষেই একরূপ

---

(১) মানবধর্ম্মশাস্ত্র মতে ৮০ রতি ওজন তাম্রে এক কার্ষাপণ হইত। বুদ্ধঘোষ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় কার্ষাপণের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং বৌদ্ধযুগে কাহাপণ (কার্ষাপণ) যে মুদ্রাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। (প্রাচীন মুদ্রা: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দী সংস্করণ, পৃঃ ৫ ও ৮

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের কৃপায় হঠাৎ সেই সময়ে বারিবর্ষণ হওয়ায় জনতা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন দুইজনে বুদ্ধের নিকটে পঁহুছিয়া তাঁহার দেহ লক্ষ্য করিয়া পুষ্প কয়টি নিক্ষেপ করেন ; কিন্তু উহা কোনটিই মাটিতে না পড়িয়া—দীপঙ্করের শিরোদেশস্থ প্রভামণ্ডল সংলগ্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিজের কেশ দ্বারা দীপঙ্করের পদদ্বয় মুছাইয়া দেন। সেই সময়ে দীপঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধ শাক্যমুনিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। চিত্রে দেখিতে পাই যে, দীপঙ্করের নিকট বজ্রপাণি দাঁড়াইয়া আছেন।

৫নং প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ চন্দ্র-কিন্নর জাতকের আখ্যানাংশ সংক্ষিপ্ততর। বোধিসত্ত্ব তাঁহার এক পূর্ব্বজন্মে হিমালয়ের কোন প্রদেশে কিন্নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল চন্দ্র এবং তাঁহার পত্নীর নাম চন্দ্রা। একদিন উভয়ে তাঁহাদের পর্ব্বত-গৃহ ত্যাগ করিয়া বনবিহারার্থ বাহিরে আগমন করেন। চন্দ্র বীণাবাদন করিতে থাকেন এবং চন্দ্রা নৃত্যগীতে নিবিষ্ট হন। তৎকালীন কাশী-নরেশ সেই সময়ে সশস্ত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। চন্দ্রার রূপলাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাঁহাকে স্ত্রীরূপে পাইবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহার স্বামীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। শরে বিদ্ধ হইয়াই চন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ভূতলে পড়িয়া যান। কিন্নরীর কাতর প্রার্থনায় শক্র (ইন্দ্র) দয়া করিয়া তাঁহার স্বামীকে বাঁচাইয়া দেন। খোদিত চিত্রে দেখিতে পাই, চন্দ্র বীণা বাজাইতেছেন এবং তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রা নৃত্য করিতেছেন। নিকটস্থ পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক হইতে ধনুর্ধারী এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়িতেছে। ডাহিন দিকের ফলকে চন্দ্র মাটিতে পড়িয়া আছেন, তাঁহার বীণা চিত্রের সম্মুখ-ভাগে ভূপৃষ্ঠে পতিত ; চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর মাথার নিকট বসিয়া কাতর-ভাবে ক্রন্দন করিতেছে এবং পিছন হইতে একজন—অনুমান হয় এই পুরুষটিই বারাণসীর অধীশ্বর—তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

৬নং চিত্র অলম্বুষা জাতকের কাহিনী হইতে গৃহীত। ভারহুতের প্রস্তর বেষ্টনীতেও ঠিক এইরূপ চিত্র খোদিত দেখা যায়। সে চিত্রের নিম্নে "ঋষ্যশৃঙ্গ জাতক" এইরূপই লিখা আছে। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্বজন্মে এক ঋষি হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শৌচাদির জন্য যে স্থানটি নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই স্থানের মৃত্তিকা একটি মৃগী জিহ্বার দ্বারা চাটিয়া লওয়ায় তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। সে যে শিশুটিকে প্রসব করে সেই শিশুই ঋষ্যশৃঙ্গ। তাহার মস্তক শৃঙ্গ-শোভিত ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করিবার জন্য রাজসভায় আনীত হইয়াছিলেন—রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে। রামায়ণের আখ্যায়িকা ও বৌদ্ধকাহিনীতে এইটুকু মিল দেখা যায় যে, ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রম হইতে ভুলাইয়া আনিয়াছিল কোনও স্ত্রীলোক। শেষোক্ত বর্ণনামতে সেই তরুণী অপর কেহ নহে, রাজকন্যা স্বয়ং, ইঁহারই সহিত পরে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ আজন্ম ঋষির আশ্রমে পালিত ; তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। রমণী জাতির সহিত পূর্ব্বে তাঁহার কোনও পরিচয় হয় নাই, তাই তিনি স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বুঝিতেন না। মোদক এক প্রকার সুমিষ্ট ফল বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মহাকবির কল্পনামাধুর্য্যে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান কবিতায় কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের "পতিতা" পাঠ করিলে বুঝা যায়।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি জাতক-কাহিনী ব্যতীত আরও চারিটি (ষড়্দন্ত-জাতক, শ্যাম জাতক, বেস্‌সান্তর জাতক ও শিবি জাতক) যে গান্ধার-ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এ স্থলে এ কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রিয়া ও আমি

কাজি আফসার-উদ্‌দিন আহমদ

আজিকে শোনাবো দু-টি গান অতি সংগোপনে
ধীরে অতি ধীরে
দেবে কী উত্তর তার ? চমকিয়া যাবে অকারণে
ক্ষিপ্ত পদভরে ?
নহিলে দোলায়ে গ্রীবা - তুলি দু-টি রোষ তীক্ষ্ণ আঁখি
নিয়ে দৃপ্ত হাসি
সয়ে যাবে এলোচুলে : আমারে কী রাখিবে না ঢাকি ?
ওগো চঞ্চলা উর্বশি !
চরণের তালে তালে রেখে যাবে বিপ্লবের ঝড়
হেরিবে না চাহি ?
এমন বরিষা রাতে আমারে ভাবিলে তুমি পর !
আমি যাবো বাহি—

আমার তরণী নিয়ে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গদল মাঝে
বিপদ বহুল ;
তোমার সে-ক্রূর হাসি সর্পিল চাহনি শত কাজে
করিবে গো ভুল ?
তুমি কী সুন্দর হাসি' ভালোবেসে কাঁপায়ে নয়ন
সরু দু-টি করে
টানিয়া লইবে মোরে ওগো প্রিয়া, পাতিবে শয়ন
তুংগ বক্ষপরে ?
তোমার বসনপ্রান্তে রাখি মুখ দুটি আঁখি তুলি',
তনুর আভায়,
আমার প্রশস্তি-গীতি, জ্বালিবে কী প্রেমের দীপালি
সবুজ শোভায় ?

জঙ্গম

বনফুল

তৃতীয় অধ্যায়

১

একটি সঙ্কীর্ণ গলি-পথে বাইকটি ঠেলিয়া ভন্টু চলিয়াছিল। বাইকের পিছনের চাকাটায় গোলমাল হইয়াছে, হাওয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র সারাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পকেটশূন্য। একেবারে শূন্য নয়, একটি অর্দ্ধভুক্ত কাঁচা পেয়ারা আছে। সকালে আপিস যাইবার মুখে মৃন্ময়ের বাসায় সে কিছু টাকার চেষ্টায় গিয়াছিল। মৃন্ময় চিন্ময় কেহই বাড়িতে ছিল না, ছিল হাসি। পেয়ারা কিনিয়া সে গোয়াভা জেলি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছিল। হাসির নিকট হইতে টাকা চাওয়া যায় না, কিন্তু পেয়ারা চাওয়া যায়। গোটা দুই ডাঁশা পেয়ারা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাগ্যিস করিয়াছিল, তাই আপিসের পর কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছে। এখন চলিয়াছে নিবারণবাবুর নিকট, ধারের চেষ্টায়। অবিলম্বে কিছু টাকার প্রয়োজন। এক—আধ টাকা নয় সাড়ে পাঁচশত টাকা। করালিচরণ দ্রাবিড় যাইবে বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যেমন করিয়া হোক টাকাটা তাহাকে দিতেই হবে। কি কুক্ষণেই যে সে করালিচরণের টাকায় হাত দিয়াছিল। এ টাকা না পাইলেও তাহার সংসার নিশ্চয়ই চলিয়া যাইত। খুচখুচ করিয়া টাকাগুলি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন মহামুস্কিল! হঠাৎ সাড়ে পাচশত টাকা জোগাড় করা কি সহজ? বৌদিদির অলঙ্কারগুলিও নাই। দাদা তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বেই সাবাড় করিয়াছিলেন, তাহার বি. এস-সি. পরীক্ষার ফি জমা দিবার সময় রুলি জোড়া গিয়াছিল, ফনতির অসুখের সময় হারটা গিয়াছে। নিরাভরণা বৌদিদি শাঁখা লোহা ও সিঁদুরের সহায়তায় সধবার ঠাট কোনরকমে বজায় রাখিয়াছেন। বিড়ুডিকার এ বিষয়ে মুখে অবশ্য কখনও কিছু বলেন না, কিন্তু না বলিলেও ভন্টু সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও বা কি করিবে, গহনা গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তো তাহার নাই। বরং মনে হইতেছে বৌদিদির গহনাগুলি এ সময়ে থাকিলে কাজে লাগিত। তিন দিন হইতে সে করালিচরণকে এড়াইয়া চলিতেছে, টাকা না লইয়া তাহার সহিত দেখা করা অসম্ভব। শঙ্করের বহুদিন হইতে দেখা নাই। সেদিন হস্টেলে গিয়া সে যাহা শুনিল তাহা অবিশ্বাস্য। শঙ্কর নাকি লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে। হস্টেলের দারোয়ানটা বলিল। দারোয়ানের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ভন্টু নয়। সে আরও খোঁজ করিয়া জানিল—ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কালদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না! ইদানীং সে যে বড় একটা ধরা ছোঁয়া দিত না তাহার কারণ এতদিনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে ওরিজিন্যাল অর্থাৎ দশরথের মুখেও সে অতিশয় চমকপ্রদ একটি সংবাদ শুনিয়াছে। আধুনিক ছোকরাদের গালাগালি প্রসঙ্গে তাহাদের হ্যাংলামির উদাহরণ-স্বরূপ ওরিজিন্যাল শঙ্কর নামক একটি যুবকের উল্লেখ করিলেন। সে নাকি লুকাইয়া ওরিজিন্যালের রক্ষিতার নিকট যাতায়াত করে! কলেজের দুই-একজন প্রাক্তন সহপাঠীর নিকটও ভন্টু শঙ্করের সম্বন্ধে নানাকথা শুনিয়াছিল এবং সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে "চাম্‌ গ্যানঢ্ঞ" ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে। এখন যদি ছোকরার একবার নাগাল পাওয়া যাইত বড় ভাল হইত। আর যাই হোক, রাসকেলটার মাথা বড় সাফ—কাব্যিরোগেই উহাকে খাইয়াছে!

মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজি পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়ের বিষয়টি বাঁধা দিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি নাকি কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত কোন নির্জ্জনস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভন্টুর মনে হইল বাবাজির বিষয়টা হস্তগত করিয়া লইলে মন্দ হইত না। এ সময়ে অন্তত তাহা কাজে লাগিতে পারিত। বাবাজি তো দিতেই চাহিয়াছিলেন।

অন্ধকার গলি। গলির দুইপাশে ঘেঁষাঘেঁষি খোলার

ঘর। কোন ঘরে কলহের, কোন ঘরে বেগুনভাজার, কোন ঘরে হারমোনিয়মের, কোন ঘরে শিশুর ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে। ভন্টুর কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য নাই। বাইকটি ঠেলিতে ঠেলিতে নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি কথাই সে কেবল ভাবিতেছে—হঠাৎ এতটাকার কথা নিবারণবাবুর কাছে পাড়িবে কি করিয়া!

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র লীলায় বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র বিধানে জীবনধারার বিচিত্র বিকাশ। এই বৈচিত্র্যকে আমরা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করি না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে বিস্মিত হই। বস্তুত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতনে অপ্রত্যাশিত বলিয়া কিছু নাই। কোন কিছুকে আমরা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি আমাদের কল্পনার দৈন্যবশত। আমাদের আরও একটা অভ্যাস—আমরা নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যাশা করি এবং নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধার প্রতিকূল কিছু ঘটিলেই তাহাকে অপ্রত্যাশিত আখ্যা দিয়া বিস্মিত অথবা মর্ম্মাহত হই, ভুলিয়া যাই যে বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রাণধর্ম্ম। প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় প্রত্যাশিত, ঈষৎ প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত সর্ব্বপ্রকার ঘটনাই ঘটে। আমরা ইহা জানি, বিচারের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করি—কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এতদনুসারে চলি না। ব্যবহারিক জীবনে আমরা আশা করি যে আমাদের সংস্কার, সুবিধা এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু ঘটিবে। কিন্তু তাহা ঘটে না, কাহারও জীবনে ঘটে না, নিবারণবাবুর জীবনেও ঘটিল না। নিজের মেয়েকে কেহ মন্দ ভাবে না, নিজের বন্ধুর চরিত্র বিশ্বাস করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সুবিধা-জনক স্বাভাবিক ধারণার আরামদায়ক আবেষ্টনীতে মন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও আমরা ঘুমাই। সুতরাং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত রকমে চমকিত হইতে হয়। সকালে উঠিয়া দেখি চোরে সিঁধ কাটিয়াছে। অথবা ঘরে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিবারণবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাস্টার আসমিকে লইয়া সরিয়াছে।

২

ছোট স্টেশনটি এতক্ষণ নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত ছিল। রাত্রি বারোটার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহা সজীব হইয়া উঠিল। একটা গাড়ি আসিবে। স্টেশনের বাহিরে গভীর অন্ধকার ঝিল্লীস্বরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে কেবল মাঠ। একটি সরু রাস্তা স্টেশন হইতে মাঠের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। স্টেশনের নিকট রেলোয়ের দুই-একটি কোয়ার্টার ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নাই। আশেপাশে কেবল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। ··· ট্রেন আসিল, দুই মিনিট থামিল এবং চলিয়া গেল। ট্রেন হইতে জন কয়েক যাত্রী নামিলেন, চিন্ময়ও নামিল। নির্দ্দেশমত এই স্টেশনেই তাহার নামিবার কথা। অন্য যাত্রীদের সহিত চিন্ময়ও স্টেশনের বাহিরে সরু রাস্তাটার উপর আসিয়া হাজির হইল। অন্য যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। চিন্ময় একা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলের আসিবার কথা, কিন্তু কই, কেহই তো আসে নাই। এই অন্ধকারে পথ চেনাও মুস্কিল। চিন্ময় অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

"আপনি কি জাফরাণপুর যাবেন?"

কোমল বালককণ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করিল।

"আপনি কে?"

"আমি আপনাকে নেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।"

"তাই নাকি, আচ্ছা এদিকে এস।"

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্ত্তি নিকটে সরিয়া আসিল।

"আলোর কাছে চল দেখি তুমি কে।"

স্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্টেশনের আলোকে চিন্ময় চিনিতে পারিল। কলিকাতায় তাহাদের দলপতি দূর হইতে একদিন এই বালকটিকেই চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

চিন্ময় প্রশ্ন করিল, "কতদিন পূর্ব্বে তুমি কোলকাতা গিয়েছিলে?"

"ওমাসের পঁচিশে।"

তারিখটাও মিলিয়া গেল।

"চল তা হ'লে যাওয়া যাক।"

আবার তাহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক প্রশ্ন করিল—"আপনার নাম কি ?"

"বাইশ নম্বর।"

"চলুন।"

তরুণকান্তি পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোর। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চিন্ময় অন্ধকার মাঠে নামিয়া পড়িল। সমস্ত সন্ধ্যাটা গুমোট করিয়াছিল, এখন বেশ ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার! চিন্ময় সহসা লক্ষ্য করিল ছেলেটি তাহার পাশে পাশে নয় আগে আগে চলিয়াছে।

"তুমি আগে আগে যাচ্ছ কেন ?"

"আমি আগেই থাকি—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।"

"কেন বল তো"

বালক কোন উত্তর দিল না। সে কিন্তু চিন্ময়ের সহিত চলিতে পারিতেছিল না, চিন্ময় তাহাকে বারম্বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। তখন সে ছুটিয়া আবার খানিকটা আগাইয়া যাইতেছিল। চিন্ময়কে সে কিছুতেই আগাইয়া যাইতে দিবে না।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, "অমন ছুটে ছুটে এগিয়ে যাবার দরকারটা কি ? একসঙ্গে পাশাপাশি যাই চল না।"

"না, আমি এগিয়ে থাকব।"

"কেন ?"

"এমনি"

চিন্ময় যে কার্য্যে চলিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা মানা। এই কিশোর তাহাকে জাফরাণপুর অবধি পৌছাইয়া দিবে। সেখান হইতে অন্য উপায়ে কর্ম্মস্থলে পৌছিতে হইবে। উভয়ে নীরবে মাঠ পার হইতে লাগিল। উভয়েই বেশ দ্রুতপদে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গী আগাইয়া থাকিবার জন্য প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিন্ময় পুনরায় প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

"অত ছুটে চলবার দরকার কি ?"

"আসুন না আপনি"

"তুমি পাশাপাশি না চললে আমি যাব না"

"আসুন না"

"তুমি কেন এগিয়ে থাকতে চাও না বললে আমি যাব না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ছেলেটি অবশেষে বলিল—"এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে। আমার টর্চ আনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।"

"তাতে কি হয়েছে !"

"আপনাকে যদি সাপে কামড়ে দেয় ? আমার উপর ভার আছে আপনাকে জাফরাণপুরে নিরাপদে পৌছে দেবার। আপনি আসুন।"

"তোমাকে যদি সাপে কামড়ায় ?"

"আমার চেয়ে আপনার প্রাণের দাম ঢের বেশী। আসুন।"

৩

শঙ্কর বিবাগী হইয়া যায় নাই।

পিতার পত্র পাইবার পরদিনই সে হস্টেল ছাড়িয়া দিল, জিনিসপত্র ও বই বিক্রয় করিয়া খুচরা ধারগুলা শোধ করিয়া ফেলিল এবং উদভ্রান্তচিত্তে অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। পকেটে সাড়ে বারো আনা পয়সা মাত্র সম্বল। বিরাট কলিকাতা নগরীতে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। শঙ্কর সহসা অনুভব করিল কলিকাতায় ধনীর স্থান আছে দরিদ্রের স্থান আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের স্থানাভাব। ধনীর প্রাসাদ আছে, দরিদ্রের ফুটপাথ আছে কিন্তু মধ্যবিত্তের, চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্রতাজ্ঞানবিশিষ্ট মধ্যবিত্তেরই মুস্কিল। এখানে বিনা পরিচয়ে অথবা বিনা পয়সায় ভদ্রভাবে কোন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। শঙ্করের যাহারা পরিচিত তাহারা এত বেশী পরিচিত যে শঙ্কর অসঙ্কোচে তাহাদের নিকট যাইতে পারে না। কোন্ লজ্জায় সে শৈলর বাড়ি যাইবে! যাহাকে সে চিরকাল অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে তাহার নিকট যাইবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে! এই একই কারণে ভন্টুর নিকট যাওয়াও অসম্ভব। তাছাড়া ভন্টুদের অবস্থা সে ভাল করিয়াই জানে। তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। শিরিষবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, থাকিলেও শঙ্কর এমন দীনবেশে শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিত না। প্রফেসার গুপ্তের শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে একটা টিউশনির বন্দোবস্ত

করিয়া ফেলিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রফেসার গুপ্ত কি অবিলম্বে একটা টিউশনির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন? যখন প্রয়োজন ছিল না তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন তাহাকে একটা টিউশনি তিনি জোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এখনও কি পারিবেন? শিয়ালদহের সামনে একটা মুসলমানী দোকানে ঢুকিয়া শস্তায় কিছু রুটিমাংস কিনিয়া শঙ্কর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। স্টেশনের ঘড়িটাতে দেখিল আড়াইটা বাজিয়াছে। রবিবার, প্রফেসার গুপ্ত হয় তো বাড়িতেই আছেন। তাঁহার বাড়ির দিকেই শঙ্কর অগ্রসর হইল। কোনক্রমে দশ-পনেরো টাকার মতো একটা টিউশনিও যদি জুটিয়া যায়। পথ চলিতে চলিতে মায়ের কথা তাহার মনে পড়িল। বাবা যে তাহার খরচ বন্ধ করিয়াছেন মা কি তাহা জানেন? খুব সম্ভবত জানেন না। বাবা মায়ের দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে পারতপক্ষে বিচলিত করিতে চাহিবেন না। সে যে বিবাহ করিয়াছে সে কথাও কি মা জানেন না। কিম্বা হয় তো সব জানেন, বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। জানুন আর না-ই জানুন শঙ্কর নিজে তাঁহাকে কখনও জানাইবে না। মাকে নিজের অবস্থার কথা জানানোর সরল অর্থ বক্রপথে পিতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যাওয়া। তাহা সে মরিয়া গেলেও করিবে না। সহসা অমিয়ার কথা তাহার মনে হইল। সে শিরিষবাবুর সঙ্গেই তাঁহার নূতন কর্ম্মস্থল দিনাজপুরে গিয়াছে। অমিয়ার শিশুর মতো সরল মুখখানা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। নিতান্ত সরল! শঙ্করকে পাইয়া যেন বর্তিয়া গিয়াছে! এমন স্বামী যেন কাহারও নাই, হইতে পারে না। এতটা সরলতা কিন্তু শঙ্করের ভাল লাগে নাই। শঙ্করের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশু প্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তিক সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালবাসার কি বোঝে ও! শঙ্কর যেন নূতন রকম একটা দামী পুতুল এবং তাহারই একান্ত নিজস্ব এই আনন্দেই অমিয়া বিভোর। শঙ্করের মনের নিগূঢ় আকুতির বিচিত্র পিপাসার কোন খবর রাখা উহার পক্ষে সম্ভবই নয়। ও যদি কুটিল হইত, অপাঙ্গের বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়া ভ্রুভঙ্গী সহকারে ব্যাহত করিতে পারিত তাহা হইলে শঙ্করের ভাল লাগিত। এ অতিশয় সরল, অত্যন্ত সহজ। বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সঙ্কোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোন জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।

প্রফেসর গুপ্তের বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর যাহা দেখিল তাহা অপ্রত্যাশিত। প্রফেসার গুপ্ত ও মিষ্টিদিদি দক্ষিণ দিকের নির্জ্জন বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। বাড়িতে বালক ভৃত্যটি ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না।

শঙ্করকে দেখিয়া মিষ্টিদিদিই হাস্যমুখে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। "এ কি শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে, বসুন।"

নির্ব্বিকারভাবে মিষ্টিদিদি কথাগুলি বলিলেন। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

"মুখখানা বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যে, বসুন না।"

শঙ্কর উপবেশন করিল।

প্রফেসর গুপ্ত বালক ভৃত্যটিকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা ফরমাস করিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের কাব্য আলোচনা হচ্ছিল। কিং লিয়ারের গনেরিল আর রেগানকে কেমন লাগে তোমার?"

শঙ্করের কিং লিয়ার পড়া ছিল না, তবু বলিল, "ভালই লাগে।"

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "ভালো লাগে আপনার? আপনার রুচি বদলেছে তা হ'লে বলুন। আগে তো ঝাঁজওলা জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না আপনি!"

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "ওর রুচির খবর রাখেন না কি আপনি?"

"সামান্য একটু পরিচয় নিয়েছিলুম একদিন। একদিন একটু ঝাঁজালো সস্ চাখিয়েছিলুম, খেতে পারলেন না। কম ঝাঁজালো মিষ্টি আরও খাবার ছিল, সেগুলো পর্য্যন্ত খেতে পারলেন না, উঠে যেতে হ'ল ওঁকে!"

"তাই নাকি? আমার তো ধারণা ছিল শঙ্কর খুব ঝালের ভক্ত!"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল কি না তাহা সে নিজে দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি হাসিমুখে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তারপর, আছেন কেমন বলুন, অনেকদিন আপনার কোন খবর পাই নি। পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?"

"পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি"

"ওমা সে কি, এটা আপনার এগজামিনের বছর না?"

প্রফেসার গুপ্তের চক্ষু দুটিও প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন, হঠাৎ হল কি!"

"বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন, তাঁর অমতে বিনাপণে বিয়ে করেছি বলে!"

মিষ্টিদিদি মুখে একটা বিস্মিত সহানুভূতির ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দুটি হইতে একটা চাপা হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "হঠাৎ তাঁর অমতে বিয়ে করতে গেলে কেন?"

"একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের উপর অনুকম্পা হ'ল—"

মিষ্টিদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম বুঝি আর কিছু—"

শঙ্কর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আপনি ভাববেন বই কি!"

এই কথায় মিষ্টিদিদি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে শঙ্করের ব্যঙ্গোক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারিল না। চায়ের পেয়ালার বাকী চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া মিষ্টিদিদি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি এবার চলি তা হ'লে। আপনি একটা লোকের চেষ্টায় থাকবেন কিন্তু, আমরা আমাদের সমিতির থেকে রোজ আট আনা ক'রে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশী দেওয়ার ক্ষমতা নেই সমিতির। অত শস্তায় কোন ট্রেন্‌ড্‌ নার্স পাওয়া যাবে না মানি, ট্রেন্‌ড্‌ নার্সের দরকারও নেই, পাহারা দেবার মতো একজন লোক পেলেই হ'ল। বেঘোরে খাট থেকে পড়ে টড়ে না যান ভদ্রলোক। ওষুধ খাওয়াবারও হাঙ্গামা নেই। ওষুধ দিচ্ছেন আমাদের প্রকাশবাবু, হোমিওপ্যাথি, পনেরো দিন অন্তর এক ফোঁটা—" বলিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "আচ্ছা, চেষ্টায় থাকব—অত সস্তায় কোন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত—"

"ওর চেয়ে বেশী দেবার ক্ষমতা আমাদের সমিতির নেই। অত দেবারও ক্ষমতা নেই, মিসেস স্যানিয়লের বোন চুনচুনের স্বামী বলেই আমাদের যা ইন্‌টারেস্ট। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা জোগাড় করেছি আমরা—"

"টি. বি. বলে সন্দেহ করছেন—সেইটেই হয়েছে আরও মুস্কিল কি না—"

"ডাক্তাররা তাই বলছে, আমরা কি করব বলুন—"

একটু হাসিয়া মিষ্টিদিদি আবার বলিলেন, "কি ক'রে চুনচুন যে ওই রোগা কুচ্ছিত লোকটার 'লাভে' পড়লো তাই ভেবে অবাক লাগে আমার—"

প্রফেসার গুপ্ত মিষ্টিদিদির মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখে মৃদু একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদিও হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, "মনে রাখবেন কথাটা। মিসেস স্যানিয়াল আমার ওপর ভার দিয়েছেন, আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না যেন। শঙ্করবাবুকেও বলুন না ব্যাপারটা খুলে, উনিও হয়তো কোন লোকের সন্ধান দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় ঘোরেন তো, পুরুষ মানুষ হ'লেও চলবে—" তাহার পর হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, "উঃ বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমার। এবার চলি আমি—"

মিষ্টিদিদি চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?"

"মিসেস মিত্রের একজন বান্ধবীর বোন—চুনচুন কিছুদিন আগে যতীন হাজরা বলে একটি লোককে লুকিয়ে বিয়ে করে। যতীন হাজরার তিনকুলে কেউ নেই, প্রেসে না কোথায় একটা কাজ করত, কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। এখন সেই যতীন হাজরার হয়েছে টি. বি.—নার্স করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনকে কিছুতে সেখানে যেতে দেবে না। ওদের সমিতি থেকেই তাঁর চিকিৎসার খরচ চলছে, তার থাকবার জন্যে একটা ঘরও ভাড়া ক'রে দিয়েছেন ওঁরা,

এখন সেবা করবার একজন লোক চাই। রোজ আট আনা ক'রে পাবে সে। আছে এমন লোক তোমার সন্ধানে ?"

"আমিই করতে পারি।"

"তুমি!"

"আপত্তি কি, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা টিউশনির চেষ্টায়। যতদিন সেটা না জুটছে ততদিন এই করা যাক—"

"সত্যি সত্যি তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে না কি! ব্যাপারটা কি খুলে বল তো।"

"ওই তো বললাম, বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন।" প্রফেসার গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বেশ তো টিউশনি ক'রেই পড়াশোনা কর। পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল—"

"ডিগ্রী লাভ করার কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। বর্ত্তমান যুগে টাকাটাই আসল, সময় নষ্ট না ক'রে টাকা রোজগারের চেষ্টাতেই লেগে যাওয়া উচিত।"

"কিন্তু টাকা রোজগারের পথে বাঙালীর ছেলের ডিগ্রীটাই আসল সম্বল। ওটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়—"

"ডিগ্রী সম্বল বলেই বাঙালীর ছেলের এত দুর্দ্দশা—

"তা হ'লে কি বলতে চাও লেখাপড়া করাটা অনর্থক ?"

"যারা লেখাপড়ার জন্যেই লেখাপড়া করতে চায় তারা তা করুক এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপযুক্ত হোক। আমি ভেবে দেখেছি আমার দ্বারা ও সম্ভব নয়।"

"তার মানে ?"

"বিদ্যার্থী হবার মত মনের জোর নেই আমার। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযুক্ত নয়।"

"তুমি যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি।"

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। বালক ভৃত্যটি এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। শঙ্কর নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

"তুমি টিউশনি ক'রেই টাকা রোজগার করবে ঠিক করেছ ? ব্যবসা হিসেবে ওটা তো খুব প্রশস্ত পথ নয়।"

"যতদিন অন্য কোন একটা উপার্জ্জনের পথ না পাই ততদিন টিউশনি ক'রেই চালাব, তাছাড়া উপায় কি। আপনি আপাতত যাহোক কিছু একটা জোগাড় করে দিন আমাকে—"

"একটি আই. এস-সি. ছেলেকে কোচ্ করতে পারবে ?"

"পারব।"

"কত মাইনে চাও ?"

"আপনি যা ঠিক ক'রে দেবেন।"

"গোটা চল্লিশ হ'লে চলবে ?"

"চলবে।"

"দুবেলা পড়াতে হবে কিন্তু।"

"তাই পড়াব।"

"আচ্ছা বলব তাদের তা হ'লে। একটি জুনিয়র প্রফেসারের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন, দরে বনছে না, সে ভদ্রলোক ষাট টাকা চান। তুমি চল্লিশ টাকায় রাজি তো ?"

"হ্যাঁ। কবে থেকে পড়াতে হবে ?"

"আসচে মাস থেকে।"

"ততদিন তা হ'লে এই টি. বি. রোগীটার সেবা করা যাক্।"

"ও সবের মধ্যে আবার গিয়ে কি করবে। রোগটা ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক।"

"তা হোক, তবু আমি যাব।"

"আচ্ছা পাগল তো! তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক বেশী, বিয়ে করেছ।"

শঙ্কর উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "তোমার সেই বান্ধবীটির খবর শুনেছ ?"

"কোন বান্ধবীটির ?"

"বেলা মল্লিক।"

"না, অনেকদিন কোন খবর জানি না।"

"সে এক বুড়ো সায়েবের সঙ্গে জুটেছে।"

"তার মানে ?"

"একদিন বেলা সিনেমার সেকেণ্ড শো থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার বাড়ির ঠিক সামনে একটা বুড়ো সায়েব অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। চতুর্দ্দিকে জনপ্রাণী কেউ

নেই। বেলা জনার্দ্দনকে ডেকে ধরাধরি ক'রে অজ্ঞান সায়েবকে ঘরে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, একজন ডাক্তার ডাকলে এবং সেবা শুশ্রূষা ক'রে সায়েবকে চাঙ্গা ক'রে তুললে।"

"সায়েবটা নিশ্চয় মাতাল।"

"না, তার স্ট্রোক হয়েছিল। অর্দ্ধেক শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।"

"তারপর?"

"সায়েবের জ্ঞান হবার পর জানা গেল সায়েব খাঁটি বিলিতি সায়েব, এখানে একটা সায়েবি দোকানে বড় চাকরি করে, কিছুদিন পরে রিটায়ার করে দেশে ফেরার কথা, এমন সময় এই বিপদ।"

"বেলার বাসার সামনে এল কি ক'রে।"

"সায়েব নাকি এক ট্যাক্সিতে ছিল, ট্যাক্সিতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। যতদূর মনে হচ্ছে ওই ট্যাক্সিওলাই বেগতিক দেখে ওই নির্জ্জন গলিতে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। অজ্ঞান সায়েব নিয়ে সে আর ঝামেলায় ঢুকতে চায় নি"

"তারপর? এ যে রীতিমত রোম্যাণ্টিক ব্যাপার!"

"Truth is stranger than fiction."

"তারপর কি হল?"

"তারপর যোগাযোগও দেখ অদ্ভুত, সাহেবের তিন-কুলে কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে একটি পিয়ানো। বেলাও নাকি মিস্টার বোসের বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।"

শঙ্কর বলিল, "হ্যাঁ, শৈলর পিয়ানোটা ও বাজাতো শুনেছি—"

"ফলে, বেলা এখন রোজ সন্ধেবেলায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত সায়েবকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। সায়েবের 'কার' এসে ওকে নিয়ে যায় দিয়ে যায়।"

"মাইনে নিশ্চয় পায় এর জন্যে।"

"সেটা ঠিক জানি না আমি। তবে সায়েব জাত কারো কাছে অমনি কিছু নেয় না। নিশ্চয়ই কিছু দিচ্ছে।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

প্রফেসার গুপ্তও বাতায়ন-পথে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল।

"মানতুরা কি এখানে নেই না কি, কারো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।"

"না, ওরা অপর একটা বাড়িতে আছে। মানতুর বিয়ে—"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ।"

প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"মিসেস মিত্রকে আপনি কি একটা চিঠি দেবেন? না, আমিই মুখে গিয়ে বলব—"

"তুমি ওই যক্ষ্মারোগীর সেবা না ক'রে ছাড়বে না?"

"না।"

"তবে আর চিঠি লেখবার দরকার কি, নিজেই গিয়ে বল—"

"তবু একটা লিখে দিন।"

স্মিত হাস্য করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, "তা হ'লে প্যাডখানা আর কলমটা নিয়ে এস ওই টেবিলটা থেকে।"

শঙ্কর আনিয়া দিল।

প্রফেসার গুপ্ত লিখিলেন—

> মিসেস মিত্র, অন্যলোক খোঁজার দরকার নেই। শঙ্করই সেবা করতে রাজি হয়েছে। এত শস্তায় এত ভাল লোক পাওয়া যেত না। কালকের এন্‌গেজমেণ্টের কথা মনে আছে তো? ইতি
>
> গুপ্ত

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত আসন্ন এনগেজমেণ্টটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—ইভার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রায় দুইমাস হইল বেচারা চিঠি লিখিয়াছে। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া তিনি ইভাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখিয়া তখনই সেটা পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্যমনস্ক-ভাবে 'কুমারসম্ভব'খানা লইয়া উল্‌টাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই শ্লোকটিতে আটকাইয়া গেল—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা
বিজিত্য নেত্র প্রতিঘাতিনীং
প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥

শুচিস্মিতা কৃশোদরী তপস্যারতা উমা গ্রীষ্মকালে অনন্য-দৃষ্টিতে সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছেন! তুষারশীতল হিমালয়ের কন্যা উমা—যে হিমালয়ে

'ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥

সেই হিমালয়ের সুকুমারী কন্যা উমা শ্মশানবিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অগ্নিপরিবেষ্টিতা হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রফেসার গুপ্তের সহসা মনে হইল এই দুরূহ তপশ্চরণ আজকাল আর কেহ করে না। শিবই আজকাল নানা উপহার লইয়া উমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইতেছে! ক্রমশঃ

ব্যাধনৃত্য

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

রিনিঝিনি নিক্কণে
ঝংকৃত তনুলতা—
ভাবলীলায়িত লাস্যে,

মৃদু বায়ু হিল্লোলে
চঞ্চল বল্লরী
পুলকি ঝলকে কলহাস্যে।

আজি নর্ত্তনে অন্বিত কোন্ গান!
সুররস ঝরণায়
ঝর ঝরে নির্ঝরি
মুগধিল অন্তর কোন্ তান!

মঞ্জীর কলরোলে
মৃদুল মাদল বোলে
বেয়াকুল মন করে আন্‌চান।

ঐ বুঝি উড়ে যায়
মারি এক পাকশাট,
শালগাছে চঞ্চল ময়না;

কপট চাহনি হানি
মুনকী[1] লখায়ে বলে—
'হুঁসিয়ার!' আর যেন যায় না।

কাঁটাভরা বেত বনে
সর্ সর্ শব্দে,
কি যেন কি ছুটে চলে চমকি!
নিঃশ্বাস রুধি বুকে
সামলায় লখিয়াকে
সাপে তোরে কেটেছিল আর কি!

"ধুৎতোর শয়তান!
চুপ কর—পাতি কান,
নইলে এ বনে পাখী পাবি নে।"
ফিন্‌কি হাসির ছলে,
লখাই কাতরে বলে—
"তোরে দেখে ভুলে যাই, পারিনে।"

বেয়াদব চুপ কর,
ঐ দেখ্ কবুতর
নীড় মাঝে করে কেলি-কসরত।
লক্ষ্য করিয়া থির,
বক্ষে হানিল তীর
ছট্‌ফটি পড়ে ঝোপে পারাবত।

বুকফাটা শেষ ডাক
নীড়হারা পায়রার,
খণ্ডিত বিচ্ছেদ বেদনায়;
ক্রন্দিত নর্ত্তনে
বুক ভেদি বনানীর
শোকবারি বাহিরায় ঝরণায়।

---

(১) মুনকী—ব্যাধরমণী

বাইবেলে ব্রজলীলা

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল্

"নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুসুম শেজে
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজপাশে।"
"চরণে চরণে একাকারে, কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে,
এক তনু ধরি যদি টানে দুই তনু আসে তার সনে।"

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে, এই লীলা আদি, মধ্য ও অন্ত—তিন ভাগে বিভক্ত। আদিলীলা—বৃন্দাবন বা ব্রজলীলা। মধ্যলীলা—মথুরালীলা। অন্ত্যলীলা—দ্বারকালীলা।

বৃন্দাবন বা ব্রজলীলা আবার সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত, যথা:—ব্রজবালকদিগের সঙ্গে সখ্যলীলা; মাতা যশোদা, পিতা নন্দ ও মাতাপিতৃ-স্থানীয় গোপ-গোপীর সঙ্গে বাৎসল্য লীলা এবং ব্রজ-বধূদিগের সহিত মধুরলীলা, এই শেষোক্ত লীলাই বৈষ্ণব ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। এই লীলা-কথামৃত দান ও গান করিয়া বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে:—

"তব কথামৃতং তপ্ত-জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃনন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।" ভাঃ ১০-৩১-৯

অনুবাদ:— তব কথামৃত কবি কুলে স্তুত
শ্রবণ মঙ্গল তপত-প্রাণ।
কলুষ নাশন, সুদাতা সেজন
যে করে বিস্তারে ভুবনে দান॥

এই শ্লোকরত্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিল।

কৃষ্ণলীলা শুধু পুরাণে সীমাবদ্ধ নহে, প্রাচীন গোস্বামীপাদগণ এই পবিত্রলীলা অবলম্বনে বহুপাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যথা:—ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি; বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিগণ:—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মনোহর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাত্রা, কীর্ত্তন, থিয়েটার, কবিগান, কথকথা প্রভৃতিতে এই লীলা সর্ব্বদা অভিনীত হইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ববঙ্গে ছাতপেটা, ধানকাটা, নৌকা-দৌড়, বিবাহ ইত্যাদিতে গীত গ্রাম্যগীত সকল এই লীলা অবলম্বনেই রচিত। মোটকথা "কানু বিনা গীত নাই।" সুতরাং এই লীলার বিষয়বস্তু এ দেশে সুবিদিত, অধিক বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই লীলা-রসাস্বাদ করিবার যোগ্যতা ও অধিকার অনেকেরই নাই।[১] যাঁহারা এই সুপবিত্র লীলাকে প্রিয় ভক্তের সহিত ভগবানের লীলা, প্রকৃতির সহিত পুরুষের লীলা, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হেতু জীবাত্মার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে করেন সেই সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি এই লীলা-কথামৃত কিঞ্চিৎ পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। আর যাহারা ইহাকে পার্থিব নায়ক-নায়িকার কুৎসিত কামক্রীড়া মনে করিয়া কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পর্য্যায়ে ফেলিয়া উপহাস বিদ্রূপের লাগি যাত্রায় সং দিবার উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়রসের পরকিয়াভিনয় উল্লেখ করে তাহারা নিশ্চয় নিজের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনে, সুতরাং করুণার পাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই বলা হয় মধুর লীলা কীর্ত্তন শুনিবার বা আলোচনা করিবার অধিকার সকলের নাই। ইহাতে হয়ত অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন কিন্তু কথাটা ঠিকই; ইহাতেই সুপবিত্র বৈষ্ণব সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া নেড়া-নেড়ীর সৃষ্টি করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই লীলার নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চন ও কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া থাকেন। বড় বড় মণীষীদিগের মধ্যেও একাধিক ব্যক্তি এই লীলা বিশেষত রাস-লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সমালোচনা সমালোচকের মনের ভাবের উপর অনেকটা নির্ভর করে। পূর্ব্ব হইতে কোন একটা সংস্কার লইয়া বিচার করিতে বসিলে বিচারনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; বিশেষত: পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা আমাদের মতবাদ প্রায়ই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের দেশের ঐরূপ শিক্ষিত লোকের এই শোচনীয় অবস্থার সুযোগ লইয়া খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য এই লীলা অতি কুৎসিত বলিয়া নিন্দাবাদ এবং কৃষ্ণচরিত্রে অকথ্য দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তাঁহারা যে বাইবেলকে অপৌরুষেয় ও ঈশ্বরাদেশে প্রচারিত অতি পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া প্রগাঢ় ভক্তিভাবে গ্রহণ করেন সেই পবিত্র পুস্তকেও মধুর ব্রজলীলার অনুরূপ লীলা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে আমরা "গীতা ও বাইবেল" প্রবন্ধে বাইবেলের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি, এখানে আর উহার পুনরুক্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। (ভারতবর্ষ, ১৩৪৬, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলে (Old Testament) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দাউদের গীত (Pslams of Damd) ও সোলেমান গীত (Solomon's Song) নামক দুইটি বিষয় সন্নিবেশিত আছে এবং উহা ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজে অতি ভক্তিভাবে গৃহীত এবং বাইবেলের অন্যান্য অংশের ন্যায় তুল্যরূপে সমাদৃত।

ঈশা দাউদের-বংশধর। দাউদ ও তৎপুত্র সুলেমান বাদশা ঈশ্বরের অতি অনুগৃহীত ভক্ত ও ভবিষ্যৎবক্তা (Prophets)। সুলেমান ঈশ্বরের এতই

---

১ "বহিরঙ্গ সনে করে নামসংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ-সনে করে রস আস্বাদন।"—চৈ, চ,

প্রিয় ছিলেন যে, একদিন স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ঈশ্বর সুলেমানকে বর দিতে চাহিলেন, সুলেমান ধনদৌলত প্রভৃতির বর না লইয়া দিব্যজ্ঞান লাভের বর চাহিলেন। ভগবান (Jihova) ইহাতে অতিশয় তুষ্ট হইয়া ঐ বরই তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং এই জ্ঞানপ্রাপ্তির পরীক্ষা পরের দিনই হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে বাইবেলে একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে, এখানে উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আখ্যায়িকাটি এইরূপ :—

এক বাড়ীতে দুইটি স্ত্রীলোক বাস করে, সে বাড়ীতে আর কেহ থাকে না। উভয়েই সন্তান-সম্ভাবিতা। বড় একটি পুত্র প্রসব করিল। কয়েক দিন পরে ছোটরও এক পুত্র জন্মিল। কিছুদিন পরে ছোটর পুত্রটি একদিন রাত্রে হঠাৎ মারা গেল। ছোট ঐ মৃত পুত্রটি নিদ্রিতা বড় স্ত্রীর পার্শ্বে রাখিয়া তাহার জীবিত পুত্রটি লইয়া আসিল। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া বড় দেখিল ছেলেটি মৃত এবং সে তাহার ছেলেও নয়। তখন সে ছোটর ঘরে গিয়া দেখে তাহার পুত্র ছোটর নিকট রহিয়াছে। সে ঐ পুত্র তাহার বলিয়া দাবী করিলে ছোট উহা অস্বীকার করে, অগত্যা তাহাকে বিচারার্থ রাজদরবারে যাইতে হয়। বাদশা সুলেমান জীবিত পুত্রসহ উভয়কে তলব করিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। উহারা প্রত্যেকে ঐ পুত্র তাহার বলিয়া দাবী করিল। কোন প্রমাণ নাই। তখন বাদশা একখানি তলোয়ার আনাইয়া বলিলেন—যখন কোন প্রমাণ নাই তখন ঐ পুত্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া প্রত্যেককে অর্দ্ধেক করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। ছোট ইহাতে তুষ্ট হইল ; কিন্তু বড় কাঁদিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার আমি ছেলের অংশ চাহি না, ছেলে আমার বেঁচে থাক, কখন না কখন দেখতে পাব।" ইহাতে বাদশা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পুত্র বড়কে দিবার আদেশ দিলেন এবং ছোটকে তিরস্কারপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিলেন। এই বিচারে বাদশা সুলেমানের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল।

এই সুলেমান বাদশাই বহু ব্যয়ে জেরুজিলাম নগরে মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। আমাদের কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় ইহা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মহাতীর্থস্থান। দাউদ ও তৎপুত্র সুলেমান বাদশা ইহুদী ও খৃষ্টান সকলেরই বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত। মুসলিম জগতেরও ইহাঁরা অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। হজরত মহম্মদ স্বয়ং ইহাঁদিগকে নবী (Prophets) বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। এ-হেন সুলেমান গীতাতেই আমরা ব্রজলীলার অনুরূপ লীলা দেখিতে পাই। ইহা আট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। দাউদের গীতের (pslams of David) পঞ্চচত্বারিংশত্তম স্তোত্রে ইহার সূত্রপাত, পরে বাদশা সুলেমান বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করেন, ইহা ঈশ্বরাদেশে রচিত। শ্রীভগবানের পরম ভক্ত বা ভক্তমণ্ডলীর (Church) সহিত ভগবানের * এই নিত্যলীলা। এই লীলার নায়ক ভগবান ও নায়িকা ভক্তমণ্ডলী, উভয়ের মধ্যে বর-বধূর মিলন। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানেও নায়ক শ্যামসুন্দর, ("black but comely")। সেখানে গোপাল এখানে মেষপাল, সেখানে ব্রজবালাগণ এখানে ইহুদী বালাগণ, সেখানে গোচারণ এখানে মেষচারণ, সেখানে রাজনন্দিনী এখানেও রাজ-নন্দিনী, সেখানে নিকুঞ্জ মিলন, এখানে উদ্যান মিলন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুরই অঙ্গহানি দৃষ্ট হয় না।

যাঁহারা আমাদের সুপবিত্র স্বর্গীয় বৃন্দাবন লীলার অনর্থক নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য এই লীলার কোন কোন স্থান, অনুবাদ ও স্থানে স্থানে তুলনামূলক ভাগবতের শ্লোক ও বৈষ্ণব পদাবলী সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) I am black, but comely.
O ye, daughters of Jarusalem. 1—5
Look not upon me, because I am black. 1—6

অনুবাদ :— বটে আমি কালো, দেখিতে তো ভাল
ইহুদী বালিকাগণ,
কালো বলে তাই করো না আমায়
অবজ্ঞা এ নিবেদন।
"এমন কালিয়া চাঁদে কে আনিল দেশে
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক রইল শেষে।"—ইত্যাদি
—চণ্ডীদাস

(২) Tell me, o thou whom my
Soul loveth, where thou feedest,
Where thou makest to rest thy
flock at noon. 1—7

অনুবাদ :— পরাণের প্রিয় তুমি যে আমার
বল হে আমারে সত্য।
কোথায় চরাও পশুপাল তব
বিশ্রাম কর নিত্য।

এই ত তোমার আলোক ধেনু
কোথায় বসে বাজাও বেণু!
চরাও মহাগগন তলে? —রবীন্দ্রনাথ

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতিনঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি। ভাঃ ১০।৩১।১১

ব্রজ ছাড়ি যবে চল গোচারণে
নলিনসুন্দর পদে তোমার
শিলা তৃণাঙ্কুর বাজিছে ভাবিয়া
হৃদয়ে বেদনা বাড়ে সবার।

(৩) Thy cheeks are comely with rows of jewels,
Thy neck with chains of gold. 1—10

কবে নীরব হাস্যমুখে আসবে তুমি বরের সাজে
জীবন-বধূ হবে তোমার নিত্য-অনুগতা—
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা। —রবীন্দ্রনাথ—

গণ্ডে তোমার মাণিক্যের ছটা
কিবা সুশোভন অতি,
হেম-হারে যেরা কণ্ঠ শোভিত
ধরিয়া তাহার দ্যুতি।
মণিময় মকর মনোহর কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডমুদারম্।
—জয়দেব, ২।৭

কাঞ্চন মণিগণ যেন নিরমাওল
রমণী মণ্ডলী মাঝ।
মাঝ হি মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামর নটবর রাজ। —গোবিন্দদাস

(৪) He shall be all night betwixt my breasts. 1—13

সারা নিশি সে যে থাকিবে শয়ানে
কুচ যুগ মাঝে মোর।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ভঃ, ১০।৩১।১৯

(তোমার) কোমল কমল পদ রাখি মোরা ধীরে
ভয়েতে কর্কশ কুচে পাছে তায় লাগে।
কঙ্করে বাজে না তাকি বনে বিচরণে
এই চিন্তা প্রাণনাথ সদা প্রাণে জাগে॥

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া
চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্। জয়দেব ২।১৩
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল! ১।১৭

(৫) Behold thou art fair, my beloved ;
behold thou art fair, thou hast dove's eyes. 1-15

দেখ দেখ কত সুন্দর তুমি
কপোতনয়না প্রেয়সী মোর।
চন্দ্রবদনী ধনী মৃগনয়নী
রূপে গুণে অনুপমা রমণী মণি,
—রঘুনাথ দাস

(৬) Behold thou art fair, my beloved.
Yea pleasant, also our bed is green. 1—16

কি সুন্দর তুমি কিবা মনোহর
আনন্দদায়িনী প্রিয়ে,
সবুজ বিছান শয্যা মোদের
অভুক্ত রয়েছে চেয়ে।

(৭) His left hand is under my head,
And his right hand doth embrace me. 2—6

রইব বাঁধা বাহু ডোরে। —রবীন্দ্রনাথ

(সে যে) বাম বাহু রাখি শিতানে আমার
বামেতর ভুজে বাঁধয়ে মোরে।
সেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়,
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়। —রবীন্দ্রনাথ

"নাগরের বাহু করিয়া শিতান
বিধান বসন ভূষা।" —দাস জগন্নাথ

"ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেন কাঞ্চন মণি জোড়।"
"নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।" —গোবিন্দদাস

"ভুজে ভুজে বান্ধি উরে উরছান্দে
হিয়ার উপরে হিয়া।"
পিঙ্গল বরণ বসনখানিতে
মুখানি আমার মোছে,
শিতান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥ —চণ্ডীদাস

(৮) My beloved is like a roe or a young hart ;
behold, he standeth behind our wall,
he looketh forth at the window, showing
himself through the lattice. 2—9

প্রাণের হরিণ পিয়া যে আমার
(দেখ) দাঁড়ায়ে গৃহের বাহিরে,
বাতায়ন-পথে দেখে চেয়ে চেয়ে
দেখা দিতে আসে আমারে।

ওলো সই, কিবা জ্বালা হল কালা কানুর পিরীতে,
প্রাণ কাঁদে আঁখি ঝুরে কিনা হ'ল চিতে।
থাইতে সোয়াস্তি নাই নিদ গেও দূরে,
দিবা নিশি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥ —চণ্ডীদাস

My beloved spoke and said unto me,
rise up, my love, my fair one and come away. 2-11
For lo, the winter is past, the
rain is over and gone. 2—11
The flowers appear on the earth :
the time of the singing of birds is come,
and the voice of the turtle is heard in our land. 2-12

বারেক আসিয়া মোর বাতায়ন-পথে চেয়েছিলে। —রবীন্দ্রনাথ
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে। —রবীন্দ্রনাথ

অনুবাদ :—

প্রিয়তম মোরে কহিল ডাকিয়া
উঠ উঠ প্রিয়ে এস বাহিরিয়া।
শিশির গিয়াছে ঝরিয়া শেষ ;
ফুলে ফুলে দেখ ছেয়েছে দেশ,

এখনই শুনিবে পাখীর গান
ঐ যে কপোত ধরেছে তান।

"দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ,
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস।
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর
দাড়িম্বে বসিয়া কীর * বোলয়ে মধুর॥"—শশিশেখর

(১০) My beloved is mine and I am his,
he feedeth among the lilies 2—16.

আমি সে পিয়ার পিয়া সে আমার
কমলের মধু করে সে পান।

(১১) Until the day break and the shado s
flee away, turn my beloved. 2—I

এখনও রজনী আছে গুণমণি,
আঁধার ছাড়েনি বিশ্ব,
ফিরে এস নাথ, না হ'তে প্রভাত
করো না আমারে নিঃস্ব।
"এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিষে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
এক তনু হয়ে মোরা রজনী গোঁয়াই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হইলে কাতর হিয়ায়,
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ বাহিরায়।
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ,
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ।"

(১২) By night on my bed I sought him
whom my soul loveth, I sought him.
but I found him not, 3—I

শয্যার 'পরে প্রাণেশে আমার
খুঁজিলাম কত নিশিতে,
খুঁজিয়া না পাই কি করি উপায়
না পাই তাঁহারে দেখিতে।

(১৩) I will rise now and go about the city;
in the streets and in the broad ways,
I will seek him whom my soul loveth :
I sought him but I found him not 3—2

উঠিব এখনি যাইব নগরে—
ঘাটে মাঠে বাটে খুঁজিব পিয়ারে;
খুঁজিলাম কত গিয়া দ্বারে দ্বারে
কোথাও না পাই তাহারে।

শুকপাখী

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিকুৎরুন্মত্তকবদ্বাবনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি—
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥"
—ভাঃ, ১০।৩০।৪

মিলি সবে উচ্চ তানে গাহি তাঁর গান
পাগলিনী প্রায় তাঁরা খোঁজে বনে বনে,
অন্তরে বাহিরে যিনি সর্ব্বভূতে স্থিত
জিজ্ঞাসে বারতা তাঁর যত তরুগণে।

"গেরুয়া বসন, বিভূতিভূষণ, শঙ্খের কুণ্ডল পরি,
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি।
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে,
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়ে।
—জ্ঞানদাস

(১৪) The watchmen that go about the city
found me ; to whom I said, saw you whom
my soul loveth. 3—3.

প্রহরী যাহারা আছিল নগরে
দেখিতে পাইল আমারে,
শুধাইনু আমি দেখেছে কি তারা
নগরে আমারে পিয়ারে।
কহ ত কহ ত সখি,
বোলত বোলত রে
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
পিয়া বিনু সগরি নৈরাশ রে॥ —বিদ্যাপতি

ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে,
গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুঁড়ব পুরী, প্রতি প্রতক্ষে,
যাঁহা দরশন পাওয়ে।
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং করু গমনা,
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা।
মথুরাবাসিনী এক রমণী
দূতী তাকর পুছে।
নন্দাত্মজ কৃষ্ণ খ্যাত কাহার
ভবনে আছে।
শুনি কহে ধনি, তাহে নাহি চিনি
সো কাহে হিঁয়া আয়ব।
মোরা জানি বসু-দেবকী-সুত
রামানুজ খ্যাত
কংশঘাতী মাধব।

সোই সোই কোই কোই,
দরশনে মম আসা।
যদুনন্দন কহে যাও যাও
ঐ যে উচ্চ বাসা॥

(১৫) Thy two breasts are like two young roes that are twins which feed among the liles, —4-5.

কি সুন্দর তব উচ্চ কুচ দুটি
জমজ হরিণ শিশুর মত,
পদ্মের বনে হরষিত মনে
পদ্মের মধু পানেতে রত।

"কুচ যুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে,
ধীরে ধীরে যায় থমকিয়া চায়
থন না চাহে লোকলাজে
—চণ্ডীদাস

(১৬) Until the day break and the shadows flee away I will get me in the mountain of myrrh and to the hill of frankincense.—4-6

যাবৎ রজনী আছে আঁধার জড়ান ধরা
বিহরিব শৈল মাঝে স্বর্গীয় সুষমা ভরা।
কুচ যুগ চারু ধরাধর জানি,
হৃদি পৈঠব জনি পহুছিল পাণি।
—বিদ্যাপতি

(১৭) Thou art all fair my love There is no spot in thee. —4-7

কি সুন্দর তুমি প্রেয়সী আমার
নাহিতো তোমাতে কলুষ লেশ।

(১৮) Thou hast ravished my heart with one of thine eyes with one chain of thy neck.—4-9.

(তুমি) নয়ানের বাণে কণ্ঠভূষণে
বধিয়াছ মোরে পরাণে।

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেহ শুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥"—ভাঃ, ১০।৩১।২

শরতের ফুল্ল সুজাত সরোজ
শোভা চুরি করা নয়ন বাণে
নহে কি সে বধ হে সুরতনাথ
বিনামূলে দাসী বধিছ প্রাণে।"

দারুণ কতক বিলোকন মোর।
কালহোই কিয়ে উপজল মোর॥
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসরেল কাম॥ —বিদ্যাপতি

(১৯) I sleep, but my heart waketh, It is the voice of my beloved that knocketh, saying, open my love for my head is filled with dew, my locks with the drops of night. —5-2.

ঘুমাইলে আমি জেগে থাকে হিয়া
প্রিয়তম ডাকে দুয়ারে,
(বলে) নিশির শিশিরে ভিজিয়াছে শির
খুলে দাও দ্বার আমারে।
"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।" —চণ্ডীদাস

(২০) I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself and was gone. I sought him but I could not find him. I called him but he gave me no answer. —5-6.

খুলিলাম দ্বার পিয়ার লাগিয়া
দেখিতে না পাই আর
(আমি) কত খুঁজিলাম কত ডাকিলাম
সাড়া ত দিলে না তায়।

(২১) My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels * were moved for him. —5-8.

বক্ষে তাদের মোচড় দিত —রবীন্দ্রনাথ
প্রিয়তম মোর দুয়ারের ফাঁকে
প্রবেশ করা'ল হস্ত।
পুলকে অঙ্গ সিহরিল মোর
হইয়া পড়িনু ব্যস্ত

(২২) Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women ? Whith is thy beloved turned aside, that we may seek him with thee ? 6-1

মোর জীবনের রাখাল ওগো
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,

---

* The heart pity, tenderness the emotions being supposed to be seated in the bowels.
—B. & Shakespers Chambers.

ছুঁতে পারি বসনখানি

একটুকু হাত বাড়ালে। —রবীন্দ্রনাথ

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরাণ বন্ধু হে আমার। —রবীন্দ্রনাথ

কহলো সুন্দরী দয়িত তোমার

গেল কোথা, কোন গলিতে,

খুঁজিব কোথায় বল না তাহারে

আমরা তোমার সহিতে।

(২৩) Turn away thine eyes from me for they have overcome me. 5-6

ফিরাও ফিরাও আঁখি চেও না আমার পানে

মোহিত করেছ মোরে মোহের মদিরা দানে।

দুইটি মোহন নয়নের বাণ

দেখিতে পরাণে হানে,

পশিয়া মরমে, ঘুচায়ে ধরমে

পরাণ সহিতে টানে। —চণ্ডীদাস

বঙ্কিমে নয়নে চিত হরি নিল মোর। —বিদ্যাপতি

(২৪) How be utiful are thy feet with shoes, O prince's daughter, the joints of thy thighs are like jewels the work of the hands of a cunning workman. 7-1

নরেশ নন্দিনী কি সুন্দর তব

* পাদুকা পরাণ পা দুখানি ;

কোন কারিকরে গড়া উরুজোড়া

যেন রে খচিত রতনমণি।

"পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,

টুটব বিরহক ওর।

চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক

দহই সব অঙ্গ মোর ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি, সে যে যুবতী

চিত থির নাহি হোয়।

সে যে রমণী সরম গুণমণি

পুন কি মিলব মোয় ॥" —বিদ্যাপতি

চরণ যুগল জিনিয়া কমল

আলতা-রঞ্জিত তায়। —চণ্ডীদাস

(২৫) Come my beloved, let us go forth into the field, let us lodge in the village 7-33.

এস প্রিয়ে মোর চল যাই মাঠে,

পল্লী ভবনে করিগে বাস।

(২৬) Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it : If a man would give all the substance of his house for love it would utterly be condemned, 8-7

পিরীতি অনল নিবাইতে জল,

কোথাও নাহিক মিলে।

প্রাবনে না যায়, তুচ্ছ মনে হয়

সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিলে ॥

"পিরীতি, পিরীতি, পিরীতি অনল

দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল !

বিষম অনল নিবাইল নহে *

হিয়ায় রহল শেল ॥

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি

পিরীতি না কহে কথা।

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে

পিরীতি মিলয়ে তথা ॥"

আমরা আরও দুই-একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই পার্থিব বর-কন্যার মিলন-লীলা যে কেবল প্রাচীন বিধানে (Old Testament) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, নব বিধানেও (New Testament) ইহার পরিষ্কার উল্লেখ আছে, যথা:—জনের শিষ্যগণ আসিয়া ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা সর্ব্বদা উপবাস করি, তোমার শিষ্যেরা সেরূপ করে না কেন?" ইহার উত্তরে ঈশা বলিলেন, "Can the children of the bride chamber mourn, as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them and then shall they fast." —Math., IX-15

বর যে পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে আছেন সে পর্য্যন্ত বরের ঘরের লোকেরা কি শোক করিতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসিবে যেদিন বরকে তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইবে এবং তখন তাহারা উপবাস করিবে। দেখা যায় ঈশা এখানে নিজেকেই বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর এক স্থানে (মথি ২৫ অধ্যায়) যীশু বর আসবে ব'লে দশটি কুমারী প্রদীপ লইয়া দেখিতে গিয়াছেন। অধিক রাত্রি হওয়ায় তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল, অনেক রাত্রে বর আসিতেছে বর আসিতেছে শব্দ শুনিয়া পাঁচটি বোকা মেয়ে দেখে—তাহাদের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গেও তেল নাই, তখন তাহারা বুদ্ধিমতী অপর পাঁচ জনের নিকট তেল ধার চাহিলে তাহারা বলিল যে-তেল আছে তাহাতে তাহাদের কোনরূপে চলিতে পারে, ধার দেওয়া চলে না। তখন তাহারা বাজারে তেল কিনিতে গেল। ইত্যবসরে বর আসিয়া পড়ায় বুদ্ধিমতী কুমারী পাঁচ জন বরের সঙ্গে বরের ঘরে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইয়া গেল, আর পাঁচটি বাজার হইতে ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। সেই সকল ভাগ্যবতী যাহারা বরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারাই বরকে লইয়া বিমল মিলনানন্দ উপভোগ করিল।

* দেশ কাল পাত্র ভেদে আলতার স্থান পাদুকা পাইয়াছে।

* নিবিল না।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই লীলা ব্যাপারটি কেমন কেমন লাগে বটে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই নর-নারায়ণ মিলনের মধ্যে কোন অসৎ বা অশ্লীল ভাব থাকিতেই পারে না। ইহা স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত অপার্থিব বস্তু। ভোগ্য বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়জ যে ভোগ তাহা দুঃখের আকর এবং তাহার আদি ও অন্ত আছে সুতরাং অসীম অনন্ত ব্রহ্মানন্দের সহিত তুলনা হইতে পারে এমন ভোগ বা বস্তু এখানে কোথায়, তবে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া মাত্র। এই লীলা যে কেবল এদেশের প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্তগণেরই সতত ধ্যানের বস্তু এবং ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তাহা নহে, মধ্যযুগীয় প্রকৃত খৃষ্টানগণও এই লীলা উপাসনা করিয়া গিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বৈষ্ণব মহাজনগণের স্থায় তাঁহাদেরও পদাবলী দৃষ্ট হয়, যথা :—

Upon my flowery breast
Wholly for him and save
Himself for none
Where did I give sweet rest
To my beloved one.

—St. John of the Cross

উরস উপরে কুসুমশয্যা
(শুধু) রচিয়া তাঁহারি তরে,
প্রদানিনু সুখে বিশ্রাম সেথা
প্রাণেশে পাইয়া ঘরে।

উভয় দেশের মহাজনগণই যে একই আধ্যাত্মিক ভাবধারা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন তাহা ইহার দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে উক্ত মহাপুরুষের একটি গানের সহিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদের তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"Upon an obscure night
fevered with love's anxiety
(Oh ! hapless happy plight.)
I went, none seeing me;
By night secure from sight.
And by a secret stair disguisedly."

—St. Johan of the Cross

নব অনুরাগিণী রাধা,
কছু নহি মানয়ে বাধা।
একলি কয়ল পয়াণ,
পন্থ বিপথ নহি মান।

* * *

যামিনী ঘন আন্ধিয়ারা,
মনমথে হেরি উজিয়ারা।
বিঘিনি বিথারিত বাট,
প্রেমক আয়ুধে কাট। —বিদ্যাপতি

ইঁহারা কেহ কাহারও দ্বারা প্রভাবিত নহেন ইহা নিশ্চয়। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একইরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইয়াছে, ইহাতে ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়ের ভোগের কোন কথা নাই, যেহেতু উহা নশ্বর।

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।

—গীতা, ৫।২২

ইন্দ্রিয়জ ভোগ যাহা দুঃখের আকর তাহা,
আদি অন্ত আছে যার কুন্তীর নন্দন
তাই তাতে রত নয় পণ্ডিত যে জন।

এখন উভয় গ্রন্থের লীলার উপরে উদ্ধৃত স্থানগুলি বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উহা মূলত একই—কামগন্ধশূন্য ভগবত প্রেমের খেলা, নশ্বর ভৌতিক দেহের সহিত দেহের মিলন নহে, আত্মার সহিত আত্মার মিলন, জীবের সহিত ভগবানের লীলা। শ্রীভগবান জীবকে আত্মসাৎ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। জীবকে ধরা দিতে তাঁহার আগ্রহ না থাকিলে জীবের কি সাধ্য তাঁহাকে ধরিতে বা তাঁহার সহিত মিলিতে পারে। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"ছোট দু'টি ভুজ পাশে সে যদি না নিজে আসে,
অনন্ত মহান্ সে যে—মিছে আশা তারে ধরা ;
(তবে) মিছে আশা তার সাথে নীরব নিথর রাতে—
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে প্রেম বিনিময় করা।"

আমিই শুধু ঢুলছি হেথা

আব্দুর রহমান

সরাইখানা শূন্য ক'রে
বন্ধুরা সব গেছে ঘরে।
আমিই শুধু ঢুলছি হেথা
শূন্য সোরাই বক্ষে ধ'রে।

শীতের রাতে সুপ্ত পুরী,
শিশির বুকে পড়ছে ঝুরি ;
শামাদানে মোমের বাতি
বৃথাই যেন জাগ্‌ছে রাতি—

দুষ্টু সাকী হাসছে দূরে
কী যেন এক করুণ সুরে।

জীবনটাকে ভাবছি একা
(যেন) সাহারাতে সরল রেখা
আঁকা বাঁকা নাইক' কোথা
যতদূর ওর যাচ্ছে দেখা। *

---

* ওমর খৈয়াম অনুসরণে

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর বাড়ীর প্রশস্ত উঠানে একখানি মোড়ার উপর বসিয়া একটি অতি ধারালো কাটারি লইয়া একখানি সুপারির বৈঠা চাঁচিয়া তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় সেখানে শ্রীমন্ত সারা মুখে দুষ্ট বাঁকা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া প্রবেশ করিল। সুন্দর মুখ তুলিয়া চাহিতেই শ্রীমন্ত ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, দেখে এলাম, দেখবার মতই বটে!

সুন্দর বিব্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আঃ, চুপ কর্। তোর যদি একটুও কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে!

এমন সময় সুন্দরের মা পূর্ণলক্ষ্মী ঘরের দাওয়া হইতে একখানি মোড়া লইয়া উঠানে তাহাদের কাছে নামিয়া আসিয়া মোড়াটি শ্রীমন্তর কাছে মাটিতে পাতিয়া দিয়া বলিল, বোস্‌রে শ্রীমন্ত, দাঁড়িয়ে থাকবি কেন। সুন্দরের যেমন—লোকে এলে বসতে দিয়ে তবে ত তার সঙ্গে কথা বলে বাপু, তা না—যে এল সে দাঁড়িয়েই থাকুক্। নিজের মোড়াটাওত ওকে ছেড়ে দিতে পারতিস্।

—হুঁ, তা পারতাম মা—সুন্দর এইখানে একবার থামিয়া বলিল, কিন্তু ও যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এসেচে!

পূর্ণলক্ষ্মী চমৎকার একটু হাসিয়া বলিল, তোমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে ত লোকের চোখে নিদ্রে নেই। শ্রীমন্তকে আমি চিনি—সে যাবে তোমার সর্ব্বনাশ করতে! শোন দিকিনি ছেলের কথা!

তুমি তবে চেনো ওকে ছাই, ও একটি বিচ্ছু, ও না পারে এমন কাজই দুনিয়ায় নেই।—বলিয়া সুন্দর ভ্রূভঙ্গী করিল।

শ্রীমন্ত এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল—না জ্যেঠাইমা, ওর কেন আমি সর্ব্বনাশ করতে যাব শুনি? বরং সর্ব্বনাশ যাতে না হ'তে পারে তাই দেখব। তা কি ও স্বীকার করবে! আর একথা ও বলেচে তোমাকে শুধু ভয় দেখাবার জন্যেই জ্যেঠাইমা।

—সে কি আর আমি বুঝি না শ্রীমন্ত।—বলিয়া পূর্ণলক্ষ্মী আপনার কাজে চলিয়া যাইতেছিল, আবার সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁরে শ্রীমন্ত, দুধ-কলা দিয়ে মুড়ি দেব, খাবি চারটি? কাঞ্চনপুরের তাল-পাটালি আছে ঘরে। সেদিনও দিতে চাইলাম, খেয়ে যাবার তোদের সময় হ'ল না।

—তা ছাড়বে না যখন দাও।—বলিয়া শ্রীমন্ত সুন্দরের দিকে ফিরিয়া বলিল, ও আবার কিছু ভাবলে কি-না কে জানে। কিন্তু ভাল ক'রেই এবার দেখে এসেচি—এমন কি বাঁ দিককার তিলটা পর্য্যন্ত।

সুন্দর কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, বলিস্ কি! তা দেখতে গেলি, খাবার-দাবার খাইয়ে তবে ছাড়লে ত?

—তা আর না! আমি তখন পালাবার পথ খুঁজচি। বলে কি-না আবার আদর-আপ্যায়ন। পালিয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সুন্দর ইতিমধ্যে আবার বৈঠাটির দিকে নজর দিয়াছিল। কাজেই শ্রীমন্তর কথার আর কোনও উত্তর দিল না, বা নূতন কোন কথাও আর তুলিল না। শ্রীমন্ত ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল, তবে তুই বৈঠাই চাঁছ, আমি পালাই।

বলিয়া শ্রীমন্ত উঠিতে যাইতেছিল, সুন্দর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, বাঃ, পালাবি কি রকম? আমি ত কোন কথাই তোর শুনিনি এখনও। সব হুবহু আমাকে বলবি তবে ত তোকে ছাড়ব। পালালেই হ'ল যেন! মা কখন আবার ঝট্ ক'রে এসে পড়েন সেই ভয়েই ত তোকে বলতে দিচ্ছি না।

শ্রীমন্ত ভান রাখিয়া আবার চাপিয়া বসিল।

সুন্দর তখন বলিল, ভাল কথা, আজ নূপুরগঞ্জের হাটবার ত, যাবি একবার হাটে?

—কেন, তোর কি কাজ আছে কিছু? বাড়ীর জন্যে কিছু সওদা করতে হবে নাকি?

—না, এম্‌নিই একবার যাব ভাবচি। অনেক দিন যাইনি, গেলে মন্দ হয় না। সন্ধ্যের সময় ফেরবার পথে বকফুলী পার হ'য়ে নৌকো বেয়ে আসতে চমৎকার লাগবে।

—তা ত চমৎকার লাগবে! কিন্তু সত্যি কি সেই কারণেই শুধু নূপুরগঞ্জের হাটে যাবি?

—হুঁ, তা, তা একরকম শুধু শুধুই বই কি!

শ্রীমন্ত সুন্দরের কথা শুনিয়া কেন জানি একটু হাসিল। তারপরে বলিল, কার জন্যে কিনবি সে ত আমার জানাই আছে, কিন্তু কি কিনবি আগে জানতে পাই না কি?

সুন্দর তখন জোর দিয়া বলিল, সত্যি কিছু কিনব না, কাউকে কিছু দেবও না, একটু ঘুরে আসবার জন্যেই শুধু যাব।

—বেশ, তবে তাই। তা যাওয়া যাবে। আর—সে জন্যেই কি বৈঠা তৈরী হচ্ছে নাকি?—বলিয়া শ্রীমন্ত মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সুন্দরের মা একটি বাটিতে করিয়া দুধ-কলা-মুড়ি-পাটালি ও এক গ্লাশ জল লইয়া আসিয়া উপস্থিত। শ্রীমন্ত হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

পূর্ণলক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই সুন্দর বলিল, দেখতে যাওয়ার জলপানি, ঘুষ বল্‌তেও পারিস্। কিন্তু মনে থাকে যেন। তা যে-কোন এক পক্ষ থেকে আপ্যায়িত হ'লেই হ'ল।

শ্রীমন্ত অমনি বলিল, ও তাই নাকি? তবে ত জ্যেঠাইমাকে ডেকে আমার শুনিয়ে যাওয়া উচিত—কেমন দেখলাম।

—থাক্, আর বাহাদুরিতে কাজ নেই!—বলিয়া সুন্দর আবার বৈঠার প্রতি মন দিল।

শ্রীমন্ত দুধ-কলা-মুড়ি ও পাটালি একত্রে মাখিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে সত্যিই যাবি তুই আজ নূপুরগঞ্জের হাটে?

সুন্দর বলিল, নিশ্চয়।

শ্রীমন্ত বলিল, তবে এক কাজ করিস্, আমাদের ঘাটে নৌকো লাগিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যাস্।

তা যাব'খন।—বলিয়া সুন্দর নিজের মনে মনেই কেন জানি একটু হাসিল।

শ্রীমন্ত কিন্তু তাহা লক্ষ্য করে নাই।

বকফুলী নদীর ওপারটারই নাম নূপুরগঞ্জ। এই নূপুরগঞ্জের ঘাটেই স্টীমার ভিড়িয়া থাকে। আর স্টীমার-ঘাটা হইতে সামান্য কিছু পশ্চিমে প্রায় নদীর তীরেই নূপুরগঞ্জের হাট। সপ্তাহে একদিন মাত্র এখানে হাট জমে, কিন্তু মস্ত বড় হাট জমে; আর কত দূর দেশ হইতে যে বেপারীর দল মালপত্র বোঝাই দিয়া দুই মাল্লাই, তিন মাল্লাই, চার মাল্লাই, এমন কি ততোধিক বিরাট ঘাসি নাও লইয়া আসে তাহা সত্যই ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। হাটের দিনে নূপুরগঞ্জে জন-সমাগম আর বকফুলীর উত্তর পাড়ে নৌকার সমাগম একটা দেখিবার বস্তু। বকফুলীতেও নৌকা চলাচলের আর বিরাম থাকে না, বকফুলীতে সে যেন নৌকা-উৎসব সুরু হইয়া যায়। এই হাটের দিনে বকফুলী দিয়া চলাচল করিতে স্টীমার ও মোটর-বোটগুলির খুব অসুবিধা যে হয় তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

নূপুরগঞ্জের হাটের লাগাও পশ্চিমে একটা কাটা খাল আছে, বকফুলী হইতে তাহা কিছুদূর পর্য্যন্ত গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ হইয়া গেছে। এই কাটা খাল পূর্ব্বাহ্ণেই নৌকায় নৌকায় একেবারে ছাইয়া যায়, তিল-ধারণের আর স্থান থাকে না। এই খাল হইতে নৌকা বাহির করিয়া আনা শেষে এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটা নাগাদ সুন্দর শ্রীমন্তদের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগাইল এবং বাড়ীর চাকর গঙ্গাকে নৌকায় রাখিয়া শ্রীমন্তকে ডাকিয়া আনিতে পাড়ে উঠিয়া গেল। শ্রীমন্ত সুন্দরের ডাকের জন্য একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই ছিল। উভয়ে আসিয়া নৌকায় উঠিল, দুইজনে দুইটি বৈঠা তুলিয়া লইল, শ্রীমন্ত গিয়া পিছু গলুইয়ে হাল ধরিয়া বসিল। আর গঙ্গা সুন্দরের আদেশ মত মাঝখানে পাটাতনের ওপর নিশ্চুপ বসিয়া রহিল।

খালে নৌকা কিছুদূর অগ্রসর হইতেই শ্রীমন্ত মৃদু হাসিয়া সুন্দরকে বলিল, এখন সত্যি ক'রে বল্ ত—পাখীর জন্যে কি কি কিনবি ঠিক করেচিস্?

সুন্দরও সলজ্জ একটু হাসিয়া উত্তর দিল, পাখীর জন্যে কিনতে হ'লে তো কিনতে হয় একটা দাঁড় আর কিছু ছোলা।

শ্রীমন্ত বলিল, রাখ্ তোর ফাজলামি সুন্দর, আমি যেন তোর মনের কথা কিছুই আর ধরতে পারিনি। এখন যা বলি তাই শোন্, মাধবী-কঙ্কনের জোলারা ত হাটে তাঁতের শাড়ী নিয়ে আসে নানা রঙ্-বেরঙের—তারই একটা পছন্দ ক'রে কিনে নেব'খন, চমৎকার মানাবে!

হুঁ, তা মানাবে জানি, কিন্তু দেবে কে শুনি? আবার শেষে কি বহুপুরুষের শত্রুতায় নতুন ক'রে রঙ্ চড়াব নাকি?—বলিয়া সুন্দর হাসিল।

—তা কেন, শত্রুতা চিরদিনের মত শেষ ক'রে দিবি, যাতে আর শত চেষ্টায়ও কারও নতুন রঙ্ না চড়ে।—বলিয়া শ্রীমন্ত পাণ্টা হাসি হাসিতে লাগিল।

এমন করিয়া ঠারে ও ইসারায় হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া তাহারা বকফুলীতে আসিয়া পড়িল। বকফুলীতে স্রোতের টান ভীষণ—গঙ্গাও কাজে কাজেই আর একখানি বৈঠা তুলিয়া লইল। স্রোতের টানের সঙ্গে যুদ্ধে মাতিয়া ওঠায় রঙ্গ-কথা তাহাদের আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিল।

গঙ্গাকে নৌকায় রাখিয়া উভয়ে তাহারা নূপুরগঞ্জের হাটে উঠিয়া গেল। হাটে পা দিয়াই সুন্দর বলিল, হাটে এসেচি কেন জানিস্ শ্রীমন্ত? তোরা কেউ হাজার ভেবেও তা ঠিক করতে পারবি না। কিন্তু যদি তা না পাই, সব দিন তো হাটে তা ওঠে না।

শ্রীমন্ত বলিল, কি এমন অপরূপ জিনিষ তা শুনি আগে?

সুন্দর বলিল, হাস্‌বি না বল্—একটা টিয়াপাখী কিনব ব'লে এসেচি।

—টিয়াপাখী? সত্যি?—শ্রীমন্তর যেন তাহা বিশ্বাসই হইতেছিল না।

সুন্দর বলিল, সত্যি। আর এত সত্যি যে, এর চেয়ে বড় কিছু সত্যি হয় না, হ'তে পারে না।

শ্রীমন্তের সহসা কেন জানি সুন্দরের মতলবটা অতি অভিনব, চমৎকার ও কৌতুকপ্রদ বলিয়া মনে হইল। সে আনন্দে তাই সুন্দরের একটা হাত ধরিয়া তাহাকে অতি কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, মাঝে মাঝে ত হাটে উঠতে দেখেছি, আজ যেমন ক'রে হোক্ একটা খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু। টিয়া ভারী জব্দ হ'য়ে যাবে তা হ'লে। এ কিন্তু আজ পাওয়াই চাই।

—তবে যে আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছিল না?—বলিয়া সুন্দর হাসিতে লাগিল।

শ্রীমন্ত বলিল, তখন কি আর সব দিক ভেবে দেখেছিলাম যে হবে। সত্যি, চমৎকার হয় কিন্তু তা হ'লে! ভারি মজা হয়! চমৎকার!

শিখাপুচ্ছের কমল গোঁসাইয়ের মেয়ে নবদুর্গা আবার শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে আজ অপরাহ্নে। ফিরিয়া আসার অনতিবিলম্বেই সে টিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, সঙ্গে তাহার আসিল অমিয় সরকেলের দ্বিতীয়া কন্যা বাব্‌লি।

নবদুর্গার সাড়া পাইয়া টিয়া আনন্দে উঠানে নামিয়া আসিল এবং নবদুর্গা ও বাব্‌লিকে লইয়া গিয়া পশ্চিমের বড় ঘরটার দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল।

টিয়া কিছুক্ষণের জন্য নবদুর্গার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। নবদুর্গাকে সত্যই বড় চমৎকার দেখাইতেছিল। নবদুর্গার মুখে কেমন একটি পরিপূর্ণ কৌতুক-উল্লাস, সারা অঙ্গে কেমন জানি ঢল নামিয়াছে, চোখ দুইটিতে আনন্দ যেন উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে, কপালে সিঁদুর যেন আশাতীত মানাইয়াছে, হাতের বালা ও চুড়ি কয়গাছি যেন সোহাগে ঝল্‌মল্ করিতেছে, কানের স্বর্ণদুল দুইটি থাকিয়া থাকিয়া ঝিল্‌মিল্ করিরা উঠিতেছে, গলার 'পরে মপ্ চেন্‌টি যেন ভরা নদীতে চাঁদের রেখাটির মত দেখাইতেছে। নবদুর্গার ভাব-ভঙ্গী কথা-বার্ত্তা চাল-চলনে আসিয়া গিয়াছিল একটা সলজ্জ সোহাগের জড়িমা। এই কয়দিনেই কিন্তু নবদুর্গা নূতন জীবনের আভাস অঙ্গে জড়াইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল। নবদুর্গাকে টিয়ার আজ ভারি ভাল লাগিতেছিল।

নবদুর্গা পূর্ব্বের চাইতে একটু মোটাও যেন হইয়াছে। টিয়া তাই ঠাট্টা করিয়া প্রথম বলিল—মাসখানেকও স্বর্ণকমলে থাকিস্‌নি বোধ করি, আর এরই মধ্যে কি মোটাই হ'য়ে এসেচিস্ দুর্গা, আমাদের অবাক ক'রে ছাড়লি তুই।

বাব্‌লি বলিল, আর বছরখানেক সেখানে কাটলে তো তুই দেখতে হবি একটা সাজা হাতীর মত। বাবা! বাবা! এখনই যা দেখতে হয়েচিস্!

নবদুর্গা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপরে বলিল, যাঃ, তোদের আবার যত বাড়াবাড়ি কথা! তা একটু মোটা হয়েচি বই কি!

টিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, একটু নয়, বেশ মোটা হয়েচিস্। তারপরে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জায়েরা তোর কেমন হ'ল তাই বল্?

নবদুর্গা বেশ একটু সময় লইয়া ভিতরে ভিতরে

কৌতুকোচ্ছল হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিল, শ্বশুর-শাশুড়ী আমার চমৎকার লোক, সবচেয়ে চমৎকার আমার মেজো ননদ—নাম তার কনকচাঁপা—সবাই ডাকে কনকদিদি, আমার চেয়ে বছর তিন-চারের বড় হবেন হয় তো, কিন্তু সে তার চেহারা দেখে ধরবার জো-টি নেই, বিয়ে হয়েচে তার চন্দনতুলের জমিদারদের ছেলের সঙ্গে। চব্বিশ ঘণ্টা মুখে তার হাসিটি যেন লেগেই রয়েচে, আর সময় নেই অসময় নেই কাজ না থাকলেই তার কেবল তাস পেটা—সঙ্গে ক'রে নিজেই তাই চন্দনতুল থেকে তিন জোড়া 'গ্রেট মোগল' তাস নিয়ে এসেছিলো। বাপ্‌রে বাপ্, তার জ্বালায় রাত্রে কি ঘুমোবার জো ছিল। এক একদিন রাত দু'টো-তিনটেও বাজিয়ে দিয়েচি তাস পিটে! আর তাসের আড্ডাটি জমতো আমাদেরই ঘরে।

বাব্‌লি এইখানে কথা কহিল, বলিল—তোদের তো তা হ'লে খুব কষ্টে কাটত রাত।

নবদুর্গা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া প্রতিবাদ করিতেই যেন বাব্‌লির গা টিপিয়া দিয়া বলিল, কষ্টে কাটলে আর মোটা হলাম কেমন ক'রে রে?

টিয়া হাসিয়া বলিল, ব্যস্, এই তো চমৎকার কথা বলতে শিখেচিস্ দুর্গা! তা হ'লে তোর মাস্টারটি ভালই পেয়েচিস্ বল্, শিক্ষা তোর ভালই হচ্ছে তবে?

—হুঁ, তা হচ্ছে বই কি!—বলিয়া নবদুর্গা কৌতুক আর চাপিতে না পারিয়াই যেন টিয়ার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল।

টিয়া ও বাব্‌লি নবদুর্গার ভাব দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে চাহিল। টিয়া নবদুর্গাকে দুই হাত দিয়া সাম্‌লাইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিল,—

ভাবে গদ গদ রাই,
(ও তারে) কি পোড়া কথা বা শুধাই! ...

মনোহরের মুখের শোনা কথা বলিয়া ফেলিয়া টিয়া খুব খুশী হইতে পারিল না, কিন্তু নবদুর্গা ও বাব্‌লি একেবারে উচ্ছ্বলিত আবেগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে পর টিয়াই আবার বলিল, অত বাজে ব'কে মরচিস্ কেন দুর্গা? সরাসরি আমাদের সরোজবাবুর কথা কিছু শুনিয়ে দিলেই তো আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

বাব্‌লি অমনি বলিল, সত্যি, তার কথা তো একবারও বললি না দুর্গা। প্রথম তোদের কি কথা-বার্ত্তা হ'ল, কেমন ক'রে লজ্জা ভেঙ্গে প্রথম কথা কইলি—সেই সব বল্, তা না যত বাজে কথা।

নবদুর্গা এইবার একটু বিপদেই পড়িল। সেই কথা বলিতেই তো আসা, কিন্তু কেমন করিয়া যে সুরু করা যায় তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না; আর বলিতে চাহিলেই কি সে সব এত সহজে বলা যায় নাকি, আর গুছাইয়া বলিতে পারাও কি সহজ! নবদুর্গা কাজে কাজেই কেমন যেন একটু লজ্জায় কাতর হইয়া পড়িল। তারপরে বলিল, বিশেষ তেমন আর কি যে বলব ছাই!

টিয়া মুহূর্ত্তে নবদুর্গার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, দেখি তোর মুখ আমরা ভাল ক'রে—বিশেষ কিছু কিনা তা আমরাই ব'লে দিতে পারব।

তবে তো তোরা জানিস্ সবই।—বলিয়া নবদুর্গা মৃদু একটু হাসিল।

টিয়া বলিল, কেন, আমরা কি সর্ব্বজ্ঞ, না আমরা স্বামীর ঘর করতে গেছি কখনও? সরোজবাবু লোকটি কেমন তাই বল্ না, না, তা বলতেও লজ্জা করে? বাবা! বাবা! আর সাধতে পারি না!

নবদুর্গা সোহাগে গলিয়া গিয়া বলিল, তা লোক বেশ ভালই।

বাব্‌লি নবদুর্গাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিল, থাক্, খুব হয়েচে, তোর আর বলতে হবে না কিছু।

টিয়া বলিল, ভারি যে তোর দেমাক লো দুর্গা! যা, আর সাধতে পারি না!

তখন দুর্গা একটা ঢোক্ গিলিয়া যেন আড়ষ্টকণ্ঠে বলিতে লাগিল, প্রথম কথাই ও বললে কি জানিস্? বললে, শুধু দুর্গাতে মানাচ্ছিল না বুঝি, তাই নবদুর্গা নাম রাখা হ'ল? উত্তরে বললাম, শুধু নবদুর্গাতেও আর মানাচ্ছিল না, কাজেই না তোমার খোঁজ হ'ল।

—ব-ল্-লি!—বাব্‌লি এমনভাবে নবদুর্গার কথার পিঠে কথা কহিল যে মনে হইল, নবদুর্গার উত্তরটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

নবদুর্গা বলিল, হুঁ, সত্যিই বললাম বই কি। আর ও

জন্ম—১২৪৭ সাল, ৩রা পৌষ　　উমেশ দত্ত　　মৃত্যু—১৩১৪ সাল, ৪ঠা আষাঢ়

এমন ঠাঁই যে কথা আপনিই জুগিয়ে যায়, বিশ্বাস না করবার এতে আছে কি ?

বাব্‌লি সৌৎসুক্যে বলিল, তারপর ?

নবদুর্গা বাব্‌লির 'তারপর' বলার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। টিয়াও সে হাসিতে যোগ দিল।

তারপর নবদুর্গা একাই কত কথা যে বলিয়া চলিল, তাহার আর যেন শেষ নাই। এমন কি, একদিন যে তাহার মেজো ননদ কনকচাঁপার চোখে তাহাদের সামান্য একটা দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও বলিতে সে ভুল করিল না। কথা বলিতে বলিতে নবদুর্গার মুখ-চোখ ঈষৎ রাঙিয়া উঠিয়াছিল, ললাটে ও কপোলে মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছিল।

কথায় কথায় বেলা গড়াইয়া গেল। ঠিক হইল, তিনজনে একত্রে আবার বহুদিন পরে রায়েদের দীঘিতে গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া জল আনিতে যাইবে।

টিয়া একটি পিতলের কলসী, একখানি গামোছা ও একখানি শাড়ী সঙ্গে লইয়া তাহাদের সঙ্গে প্রথম সরকেল-বাড়ী এবং সেখান হইতে নবদুর্গাদের বাড়ী গেল। নবদুর্গা প্রস্তুত হইয়া আসিলে তাহার মা ডাকিয়া বলিয়া দিল, বর্ষার জল বাপু, একটু তাড়াতাড়ি যেন গা ডুবিয়ে উঠে আসা হয়।

নানা গাছের নীচ দিয়া সরু একফালি চির-ছায়ায়-ঘেরা গ্রাম্য পথ—নির্জ্জন ও অভিমানিনী প্রিয়ার মত থমথমে—অসমতল ও আঁকাবাঁকা, সেই পথ ধরিয়াই হাসি-গুঞ্জনে তাহারা রায়েদের দীঘির পানে আগাইয়া চলিল।

নবদুর্গার কাঁধে আজ গামোছার পরিবর্ত্তে একখানি লাল বর্ডার দেওয়া দামী তোয়ালে—এখনও তাহাতে যেন সুবাসিত তৈলের একটা সুমিষ্ট ঘ্রাণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছে, নবদুর্গার সারা অঙ্গে কেমন যেন একটি ঘুমন্ত সুবাস।

নানাকথার মধ্যে পথ চলিতে চলিতে দীঘির প্রায় কাছে আসিয়া বাব্‌লিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া টিয়ার প্রায় গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া নবদুর্গা বলিল—হাঁরে টিয়া, আসল কথাই তোকে আমি জিগ্যেস্ করতে ভুলে গেচি। সত্যি কথা বলবি তো ?

টিয়া অত্যন্ত সহজভাবেই বলিল—কেন বলব না, নিশ্চয় বলবো।

—হ্যাঁ রে, রায়েদের দীঘিতে আজকাল বিকেলে নাকি তুই গা-ধোওয়া বন্ধ করেচিস্? খালের জলই নাকি তোর মন ভুলিয়েচে শুনতে পাই ? এ কি সত্যি ?

টিয়া সহজভাবেই বলিল—হুঁ, তা সত্যি বই কি ! খালের জলও তো নতুন জল—বেশ পরিষ্কার। আবার পচতে সুরু করলেই দীঘিতে গা ধোবো। কেন, একথা হঠাৎ ?

নবদুর্গা কোনও উত্তর না দিয়া বাব্‌লির গায়ের উপর আসিয়া যেন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

—আ মরণ তোমার !—বলিয়া বাব্‌লি সরিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে নবদুর্গার হাসির মাত্রা যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে হাসি থামাইয়া নবদুর্গা বলিল—একথা হঠাৎ কেন ? হঠাৎই শুনলাম যে, তাই হঠাৎ বলা।

বাব্‌লি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

টিয়া কিন্তু ইহাতেও অপ্রতিভ হইল না, বলিল—হঠাৎ শুনলেও সত্যি কথাই শুনেচিস্ দুর্গা।

নবদুর্গা বাব্‌লির দিকে চাহিয়া কোনও রকমে হাসি চাপিয়া বলিল, তা মিথ্যে হবে কেন—সে তো আর তোর শত্রু নয়।

—ও, শত্রু নয় বুঝি।—বলিয়া টিয়া চুপ করিল, আর সে এবিষয়ে কোনও কথা কহিবে না এমনই ভাবে।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য উমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

শত বর্ষ অতীত হইল, বাঙ্গালার এক নিভৃত গ্রামে উমেশচন্দ্র দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভের সুযোগের অভাব সত্ত্বেও, তিনি প্রশংসনীয় স্বাবলম্বন, অবিচলিত অধ্যবসায় এবং গভীর বিদ্যানুরাগের বলে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া অধ্যাপনাদ্বারা দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর কলেজের—সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালাবধি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহার অধ্যক্ষতা করিয়া উহাকে গৌরবের সমুচ্চ শিখরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখন তিনি স্বগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন এবং অন্তঃপুরিকাগণের মানসিক উন্নতি সাধনার্থ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল "বামাবোধিনী" নাম্নী সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদিত ও প্রচারিত করিয়া এবং বঙ্গমহিলাগণকে উহাতে লিখিতে উৎসাহিত করিয়া এতদ্দেশীয় নারীগণের মানসিক উন্নতি সাধন ও মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। মূক ও বধিরগণের জন্য বিদ্যালয় তাঁহারই যত্নে সর্ব্বপ্রথম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, পরোপকারী, সাধু, অহমিকাশূন্য, সরল, মিষ্টভাষী, মধুরস্বভাব ব্যক্তি অতি বিরল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কবি কামিনী রায় যথার্থই বলিয়াছেন,

> "অধ্যয়ন, অধ্যাপন, নহে রে দুষ্কর,
> দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।"

উমেশচন্দ্রের চরিত্রে হিন্দুশাস্ত্রের মহত্তম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট শাখায় বহুদিন নেতৃত্ব করিবার নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আজ 'ভারতবর্ষ' সসম্ভ্রমে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছে।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর দিবসে (১২৪৭ বঙ্গাব্দে ৩রা পৌষ) কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথিতে চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতা হরমোহন দত্ত মজিলপুরের দত্ত জমিদারগণের অধীনে তহশীলদারের কার্য্য করিতেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। ১২৫৭ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণ তিনি তিন পুত্র (অভয়চরণ, উমেশচন্দ্র ও দীননাথ) এবং দুই কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শোকে তাঁহার জননী উন্মাদিনী হন। উমেশচন্দ্রের জননী সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার উন্মাদিনী শ্বশ্রূমাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানগণ এবং পরিবারের আশ্রিত আত্মীয়গণকে লইয়া অকূল পাথারে পতিত হন। কিন্তু অনন্যসাধারণ পরিশ্রমশীলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে তিনি সংসারের গুরুভার বহন করিয়াও পুত্রগণকে 'মানুষ' করিতে পারিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অল্পবয়সেই জমিদারগণের অধীনে স্বল্প বেতনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অত্যধিক সাংসারিক চিন্তায় অভয়চরণের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তাঁহাকে বাতুলালয়ে প্রেরণ করিতে হয়। পুত্রবিরহে সর্ব্বমঙ্গলা অত্যন্ত শোকবিহ্বলা ও রোগগ্রস্তা হইয়া পড়েন এবং অভয়চরণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবার অল্পকাল মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন (১২৭৪ সাল ২২শে চৈত্র)।

বাল্যকালে উমেশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার নানা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। আজ এ পাঠশালায়, কাল ঐ পাঠশালায় এইরূপে নানাস্থানে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। গ্রামের কোনও পাঠশালা অধিক দিন চলিত না। মুক্তারাম পণ্ডিতের পাঠশালায় একটী পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি বিদ্যোৎসাহী ব্রজনাথ দত্তের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। ইঁহার পুত্র শিবকৃষ্ণের সহিত উমেশচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শিবকৃষ্ণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং গ্রামে শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং লুক্রিশিয়ার উপাখ্যান বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম মজিলপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের

বার্ত্তা লইয়া যান। ইঁহারই সাহায্যে উমেশচন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থাবলী এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি পাঠের সুযোগ পান এবং উহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। উমেশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ মজিলপুরে একটী "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" স্থাপিত করেন; উহাতে তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। উমেশচন্দ্র সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং কেবল সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; উহার কতকগুলি 'সঙ্গীত রত্নাবলী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি ইতিহাস পাঠ করিতেও খুব ভালবাসিতেন এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রোমরাজ্যের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। উহা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মজিলপুরে কিছুদিন একটী ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। উমেশচন্দ্র উহাতে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উহা উঠিয়া যায়। অতঃপর শিবকৃষ্ণ দত্তের চেষ্টায় তিনি ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন ইনষ্টিটিউসনে প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং সেই বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন।

অতঃপর উমেশচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৬০-১ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পর তাঁহাকে বৃত্তির অভাবে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পীড়ার জন্য সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার নিজেরও মস্তকের ও চক্ষুর পীড়া হইয়াছিল। ইহাও কলেজ ত্যাগের অন্যতম কারণ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি জয়নগরে ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি, শিবকৃষ্ণ দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ইঁহারা একটী বালিকা বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা 'বঙ্গহিতৈষিণী' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন, শিবকৃষ্ণ উহার সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র উহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহারা একটী হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে যত্নবান হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্য ইঁহারা হিন্দু জমিদারবাবুদের নিকট বহু নির্য্যাতন লাভ করেন এবং অবশেষে উমেশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া জয়নগরের শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে হয়।

অতঃপর উমেশচন্দ্র কলিকাতায় পুনরাগমন করেন এবং কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমীর শিক্ষক হন। এই বিদ্যালয় পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আর-এল-দত্ত, বিহারী ভাদুড়ী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত উমেশচন্দ্র প্রায়ই মিলিত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই সকল আলোচনার ফলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কল্পে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়। উমেশচন্দ্র প্রথমাবধি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মহিলা লেখিকাগণ প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উমেশচন্দ্রের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এ পরীক্ষা দেন ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুদিন হিন্দু স্কুল, বেথুন স্কুল, দক্ষিণ বড়ু স্কুল ও নিবোধই মধ্য বাঙ্গালা-ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র রাজপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক সুপণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বিদ্যালয়ের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোন কারণে উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বয়ং "হরিনাভি ইংরেজী-সংস্কৃত বিদ্যালয়" স্থাপন করেন এবং উমেশচন্দ্রকে উহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে উমেশচন্দ্র শিক্ষকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

হরিনাভিতে অবস্থানকালে উমেশচন্দ্র কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ছাত্রগণ উমেশচন্দ্রকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত এবং অনেকে তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিত। এইজন্য উমেশচন্দ্র

ও তাঁহার বন্ধুগণ যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিতেন; কিন্তু উমেশচন্দ্র যেমন কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন, তেমনি বজ্রাপেক্ষা কঠোর ছিলেন। যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহার সাধনার জন্ত তিনি সকল প্রকার দুঃখ, কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। উমেশচন্দ্র নূতন সমাজে যোগদান করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইহার পর হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেশবচন্দ্রের দলকে তদীয় সোমপ্রকাশ পত্রে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। হরিনাভি-নিবাসী রক্ষণশীল হিন্দুগণের প্রবল আন্দোলনে উমেশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত বিদ্যালয়টীর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইল। অবশেষে উমেশচন্দ্র হরিনাভি স্কুল হইতে বিদায় লইলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে উমেশচন্দ্র কোন্নগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১লা মে প্রাতঃস্মরণীয় শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র কয়েক বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তিনি শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজেও নিয়মিতভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম যুবকগণ "সঙ্গত-সভা" নামক একটি সভায় মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই সকল ধর্ম্মালোচনা "ধর্ম্মসাধন" নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। উমেশচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বোধ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পত্রিকা প্রচলিত ছিল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র যখন তৎপ্রবর্ত্তিত নিয়ম ভঙ্গ করত অভিনব পদ্ধতিতে স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্তার সহিত কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু নরপতির বিবাহের আয়োজন করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্য সভায় কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যের পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবচন্দ্র দেব, রামকুমার বিদ্যারত্ন, উমেশচন্দ্র দত্ত ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তীকে পর্য্যায়ক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করিতে নিযুক্ত করেন। ইহার অনতিকাল পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামক নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনন্দমোহন বসু উহার প্রথম সভাপতি, শিবচন্দ্র দেব উহার প্রথম সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র দত্ত উহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইহার পর আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিদ্যাশিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভিনব প্রণালীতে একটী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী এই বিদ্যালয় সিটি স্কুল নামে স্থাপিত হয় এবং আদর্শ শিক্ষক, আদর্শচরিত্র উমেশচন্দ্র উহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং উমেশচন্দ্র উহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উহাতে আইন শ্রেণী খোলা হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং উহাতে বি-এ (পাশ ও অনার্স) এবং এম-এ পড়াইবার ব্যবস্থা হয়। আনন্দমোহন বসু, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কলেজে পড়াইতেন। এই বিদ্যালয় উমেশচন্দ্রের অধ্যক্ষতা-কালে গৌরবের সমুন্নত শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার ছাত্রগণ—জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেন নাই, চরিত্রগুণে জাতীয় গৌরব-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাদি বিষয়ে আনন্দমোহনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে কেবল অধ্যক্ষের কার্য্যই করিতে হয় নাই, কলেজের জন্ত অর্থসংগ্রহও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্র বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য ছিলেন।

দুর্গামোহন দাশ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতির সহযোগে উমেশচন্দ্র বালিকাদের জন্ত বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। উহা পরে বেথুন বিদ্যালয়ের সহিত

সংযুক্ত হইলেও উমেশচন্দ্র উহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বকালে তিনি উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পুনরায় ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বকালে উমেশচন্দ্র উহার সম্পাদক মনোনীত হন। ১৮৯১ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সমাজে প্রদত্ত তাঁহার উপদেশগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত।

উমেশচন্দ্র জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মহাপুরুষগণের পূজা করিতে ভালবাসিতেন। ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিপূজা তিনি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিয়মিত ভাবে স্মৃতিপূজার তিনিই প্রবর্ত্তন করেন এবং সিটিকলেজে নিয়মিতভাবে এই সকল স্মৃতিসভা আহ্বান করিতেন। অনেকে হয়ত বিস্মৃত হইয়াছেন যে, মাইকেলের সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ প্রধানত উমেশচন্দ্রের চেষ্টাতেই রচিত হয়। এতৎসম্বন্ধে মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"অর্থাভাবে মধুসূদনের মৃতদেহ নিতান্ত হীনভাবে সমাহিত হইয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধির উপর কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত না হওয়ায় তাহা ক্রমে লুপ্ত ও অগোচর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা বঙ্গদেশকে সে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অনুরাগী, বামাবোধিনী সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের উদ্যোগে এবং যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীরও মধ্য-বাঙ্গালা-সম্মিলনীর চেষ্টায় তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। * * ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সাধারণের সমক্ষে সেই সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

অন্ধ, মূক, বধির প্রভৃতি উমেশচন্দ্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত ছিল না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ সিংহ এবং মোহিনীমোহন মজুমদারের সহযোগিতায় কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় (The Calcutta Deaf & Dumb School) প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বৎসর মে মাসে দুইটী ছাত্র লইয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিটি কলেজের একটী গৃহে তখন উহা বসিত। উমেশচন্দ্র প্রথমাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া উক্ত বিদ্যালয় এক্ষণে নিজগৃহে একটী স্মৃতিশিলা স্থাপিত করিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে :—

In Memory of

Umes Chandra Dutt.

One of the Founders and a Trustee of the Calcutta Deaf & Dumb School, of which he acted as Honourary Secretary from its inception in May 1893 until the day of his death, 19th June 1907.

This tablet has been erected in recognition of the great services rendered by the late Secretary to the cause of Deaf & Dumb education and to this institution in particular.

উমেশচন্দ্রের পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে (আনুমানিক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের ভগিনী কৈলাসকামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখভোগের পর তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে উমেশচন্দ্রের এক কন্যাও পরলোকগমন করেন। এই দুইটী শোক উমেশচন্দ্রকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুন (৪ঠা আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ) বুধবার রাত্রি ১০॥টার সময় তিনি চারি পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ১৯শে জুলাই বঙ্গমহিলাগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটী সভা আহূত করেন। মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসু এই সভার প্রধান উদ্যোগকর্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার গৃহেই সভার অধিবেশন হয়। এই সভা "উমেশচন্দ্র দত্ত ধনভাণ্ডার" নামক একটী ফণ্ড স্থাপন করিয়া সংগৃহীত অর্থের আয় হইতে দুঃস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে সংকল্প করেন। বামাবোধিনী পত্রিকা সুপরিচালিত করিবার জন্যও মহিলাগণ একটী সমিতি নিযুক্ত করেন।

উমেশচন্দ্র সুরাপান নিবারণের জন্যও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মেট্রোপলিটান টেম্পারেন্স এণ্ড পিউরিটি সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই সভাও উক্ত বৎসর ১০ই আগষ্ট একটী শোকসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

"মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত যিনি এই সভার মূল পত্তন হইতে যাবজ্জীবন ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবন পবিত্রতা ও সংযমশীলতায় লোক-পাবন দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেই সাধুপুরুষের পরলোকগমন জন্য এই সভা হৃদয়ের গভীরতম শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন।"

সিটি কলেজেও তাঁহার একটী চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে, বাঙ্গালার সামাজিক উন্নতির ইতিহাসে এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, শিক্ষার অকৃত্রিম সুহৃদ, সমাজসংস্কারে অক্লান্তকর্ম্মী এবং ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রচেতা পুরোহিত উমেশচন্দ্র দত্তের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

জ্বলে প্রেমের উজল শত বাতি

শ্রীঅনুরাধা দেবী

তোমায় ভালোবাসি,
একথা কি বল্‌তে হবে নিতুই কানে কানে ?
বুঝে নিও চোখের ভাষা ওগো,
ক্ষণকালের নীরব অনুমানে।
তোমার সাথে এই যে জানাজানি,
দেহ মনের নিবিড় পরিচয় ;
এ কি প্রিয় একটি জীবনের ?
জাগরণের স্বপ্ন এ তো নয় !
অজানা কোন্ স্রোতের পারাবারে
পারাপারের খেয়ায় দুটি হিয়া
সঙ্গহারা চলাপথের শেষে
মিতালি চায় গোপন আঁখি দিয়া ;
পলকে সেই পলকহারা ক্ষণে
দুজনারে দুজনারই চাওয়া,
সেই কি প্রিয় প্রথম পরিচয় !
সেই কি ওগো প্রথম কাছে পাওয়া ?
একলা যখন চুপটি ক'রে ভাবি
ব'সে ওগো নিরালা ওই ছাদে,
দূর আকাশে জলের কণা ভাসে,
বন্দিনী দেয় একাদশীর চাঁদে,
তখন আমার নিথর দেহ মনে
'এই কথাটিই নিত্য জাগে যেন—
তোমার প্রেমে সিক্ত শিকর-কণা
আমায় ঘিরে চাঁদের শোভা হেন
রচেছে এক কল্পলোকের মায়া
দূর অকাশের স্বপন পারাবার,
তোমার সাথে আমার পরিচয়
নিত্য কালের গ্রন্থি অনিবার।
ওষ্ঠে আমার তোমার দেহ কাঁপে,
ভৃঙ্গ তুমি কমল-কলি 'পরে ;
মর্ম্মে আমার কাঁদে চকোর হিয়া,
তৃষ্ণা তুমি তুষ্টি তোমার ঝরে।
ভালোবাসার জানি না কোন্ রূপ,
বুকের মাঝে কোন্খানে তার বাসা !
মনে মনে খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি
তোমায় ঘিরে আমার সকল আশা
অজানা এক তৃপ্তি-লোভাতুর
রাত্রিদিনের রচে স্বপনলোক ;
মনে হয় ও-হিয়ার পরশ লভি'
এ তনুমন সফল আমার হোক।
সন্ধ্যাতারা ঘুমিয়ে পড়ে যবে,
আকাশ পারে ঘনিয়ে আসে রাতি,
নিরালা মোর দেবালয়ের কোণে
জ্বলে প্রেমের উজল শত বাতি।

ভূতের গল্প

প্র-না-বি

আজ একটা ভূতের গল্প বলিব—একেবারে নিছক সত্য ঘটনা। আমি নিজে দেখিয়াছি কি না, জানিতে চাও? নিজে না দেখিলেও এক রকম দেখাই; পাড়ার ঘটনা, বন্ধু-বান্ধব দেখিয়াছে; ঘটনার ঠিক পরেই তারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই দেখা ছাড়া আর কি?

আমাদের পাড়াতে একটা বাড়ীকে লোকে ভূতের বাড়ী বলিত। ছেলেবয়সে বাড়ীটাতে ভাড়াটে থাকিতে দেখিয়াছি; কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনিলাম বাড়ীটাতে নাকি ভূতের উৎপাত হইয়াছে। ভাড়াটে আসে না, আসিলেও থাকিতে পারে না; ভূতের উৎপাতে দু-চার দিন পরেই উঠিয়া যায়। শেষে আর ভাড়াটে জোটে না; 'টু লেট' লেখা কাঠের তক্তা সারা বছর মাদুলীর মত বাড়ীর গায়ে বাতাসে দুলিতে থাকে। প্রকাণ্ড বাড়ী—এই সস্তার বাজারেও আশী টাকা ভাড়া নিশ্চয় হইত।

বাড়ীটাতে নাকি ব্রহ্মদৈত্য থাকে। উৎপাত আর কিছু নয়, মাঝ রাতে হাওয়া নাই, বাতাস নাই, হঠাৎ দরজা জানলা সব একসঙ্গে খুলিয়া গেল। উঠিয়া দরজা-জানলা দিয়া শোও, আবার খুলিয়া যাইবে। গরমের রাতে দরজা-জানলা খুলিয়া ঘুমাও, হঠাৎ সব বন্ধ হইবার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইবে।

মাঝ রাতে বিদ্যুতের আলোগুলা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিম্বা হয়তো সব আলো একসঙ্গে নিভিয়া গেল। বেশি রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া শুনিতে পাইবে ছাদের উপরে কে যেন খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; গ্রহণে বা ঐ জাতীয় কোন যোগ উপলক্ষে অনেকে গভীর রাত্রে ছাদের উপরে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি শুনিয়াছে—স্বর ঈষৎ অনুনাসিক। লোকে প্রথমে মনে করিত ব্যাপার আর কিছু নয়—দুষ্টলোকের উপদ্রব; পাড়ার ছেলেরা পাহারা বসাইল, পুলিশে পাহারা দিল, কিন্তু এ সব উপদ্রব কমিল না।

তখন বাড়ীর মালিক রিষড়ার বিখ্যাত ভূতের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল; সে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘর বন্ধ করিয়া কি করিল জানি না; বাহির হইয়া আসিলে জানা গেল চোর-বাটপাড় কিছু নয়, ব্রহ্মদৈত্য ভর করিয়াছে। কথাটা দেখিতে দেখিতে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বাড়ীতে ভাড়াটে আসা বন্ধ হইল, আর ব্রহ্মদৈত্য পরম সুখে সেখানে কাল যাপন করিতে লাগিল। এসব আমাদের অল্প বয়সের কথা; তারপরে সেই ভূতের বাড়ীর অস্তিত্ব সকলে একরকম ভুলিযাই গিয়াছিল; হঠাৎ কি করিয়া এই বাড়ীর প্রসঙ্গ উঠিল, সেই কথাই আজ বলিব।

২

হঠাৎ একদিন মুঙ্গের হইতে রাম-দা আসিয়া উপস্থিত। রাম-দা'র পরিচয় কি দিব ভাবিতেছি; আমরা পাড়াশুদ্ধ সকলে তাঁকে মুঙ্গেরের রাম-দা বলিয়া জানিতাম, পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। এত বড় বিরাট পুরুষ আমি কখনো দেখি নাই—যেন রামায়ণ-মহাভারতের একটা বীরপুরুষ পথ ভুলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

এহেন রাম-দা'র জীবনে দুটি আসক্তি ছিল, তিনি ভূতে বিশ্বাস করিতেন। ভূত দেখিবার আশায় তিনি যে কত শ্মশানে, কত পোড়ো বাড়ীতে, কত অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুরিযাছেন তার হিসাব নাই। আর কবিতা পড়িবার জন্য নূতন বই সংগ্রহ করিতে তিনি যে কত লাইব্রেরি, কত দোকান, কত কবির বাড়ী ঘুরিয়াছেন, তারও হিসাব অপরে জানে না। রাম-দা ইংরেজী ভাল জানিতেন না, বাংলা কবিতাই বেশি পড়িতেন।

রাম-দা আমার বাসায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—ওহে সাহিত্যিক, (আমি একজন সাহিত্যিকের পাশের বাড়ীতে থাকিতাম বলিয়া তিনি আমাকে সাহিত্যিক বলিতেন) নূতন কবিতার বই কিছু দাও। তাঁর জন্যে আমি আগেই এক বোঝা বাংলা কবিতার বই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বিরাট কাব্য-গন্ধমাদনটিকে অনায়াসে কুক্ষীগত করিয়া যখন তিনি উঠিতেছেন, শুধাইলাম—রাম-দা, ভূতের দেখা মিলল?

পুঁথির বোঝাটা ধপ্ করিয়া তক্তপোষের উপরে ফেলিয়া বলিলেন—যা নেই তার দেখা মিলবে কি ক'রে ?—এই বলিয়া নিজের আধুনিকতম ভৌতিক এড্ভেঞ্চারের কাহিনী বিবৃত করিলেন। গল্প শেষ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—না হে, ও জিনিষ নেই।

আমার পাশেই রমেশ বসিয়াছিল, সে একরকম পুরাতাত্বিক, অর্থাৎ পুরানো বাড়ীর দালাল ; সে বলিল—রাম-দা, এ পাড়ায় একটা ভূতের বাড়ী আছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—সেই ঘোষেদের তেতালা বাড়ীটার কথা বলছি হে।

পূর্ব্বোক্ত পুরাতন ভূতের বাড়ীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম—হাঁ, ওটাতে ভূতের উপদ্রব আছে শুনেছি।

রাম-দা'র মুখ উজ্জ্বল হইয়াউঠিল—ভূত আছে এ বিশ্বাসে নয়, একটা এড্ভেঞ্চার জুটিল এই আশায়।

তিনি বলিলেন—চল হে যাওয়া যাক্।

আমাদের মধ্যে যতীন ডিটেক্‌টিভ, কারণ রহস্য-পিরামিড সিরিজের ১৫২-খানা বই পড়িয়া ফেলিয়াছে ; সে বলিল—রাম-দা, রাত ছাড়া তো সুবিধে হবে না।

রাম-দা বলিলেন—যা দিনেও নেই, তা রাতেও নেই। বেশ রাতেই যাবো। বাড়ী-ওলাকে ব'লে রাতটা সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

রমেশ বাড়ী-ওলার অনুমতি আনিতে গেল, আর যতীন টর্চ-বাতি, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। তারা রাম-দা'র সঙ্গে ঐ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে।

রাম-দা বলিলেন—রাতটা জাগতে হবে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিইগে।

তারপরে বলিলেন—যাক্ ভালই হ'ল—রাতটা যখন জাগতে হবে, নূতন কবিতার বইগুলো পড়ে ফেলা যাবে। কি বল ?

বলিলাম—ভালই হবে।

রাম-দা রাত্রির ঘুম আগাম ঘুমাইয়া লইবার জন্য বাসায় রওনা হইলেন।

৩

রাত্রে আহারান্তে রাম-দা দলবল লইয়া ঘোষেদের ভূতের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। দোতালার হলঘরটি আগেই পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে শতরঞ্চি বিছাইয়া সকলে শুইয়া পড়িল। পোড়ো বাড়ীতে আর বিদ্যুতের আলো কে রাখে ? গোটা দুই হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতে থাকিল ; বিপদের জন্য গোটা কয়েক টর্চবাতি আনা হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার মধ্যে বার কয়েক চা হইলেও ঘুমে চোখের পাতা ভার হইয়া আসিতেছিল।

রমেশ বলিল—রাম-দা, ঘুম পাচ্ছে যে !

যতীন বলিল—রাম-দা, কবিতাই যখন পড়ছ, উচ্চ স্বরে পড়ো, আমরাও শুনি।

রাম-দা বাংলা কবিতার বোঝা সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; তিনি এতক্ষণ একমনে পড়িতেছিলেন, এবারে মুখ তুলিয়া বলিলেন—এসব কি তোমাদের ভাল লাগবে ?

—বল কি ? আসন্ন ভূতের ভয়ের সম্মুখে বাংলা কবিতা মনোরম লাগবে না, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা আমার নেই।

রাম-দা স্বগতভাবে বলিলেন—যা বল, আজকালকার কবিরা খাসা লিখছে হে।

—পড়ুন, রাম-দা, পড়ুন। কবিতা শোনবার এমন পরিপূর্ণ অবসর দুর্লভ।

—ভূত, না ছাই। এই দেখ না রাত একটা।—একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রাম-দা এই কথাগুলি বলিলেন। তারপরে সকলের আগ্রহাতিশয্যে পড়িতে লাগিলেন—শোন তবে, এই দেখ, ঈগল পাখীর উপরে কি সুন্দর কবিতা !

"অধৈর্য্যের তপস্যার নৈরাজ্য বিলাসে
তপশ্চর মহীয়ান্ !
দুন্দুভি, দামামা !
হোরা, অঙ্ক, দ্রাঘিমা, লঘিমা,
ঈডিপাস্ বিষম কম্‌প্লেকস্।"

চমৎকার ! চমৎকার !—রাম-দা নিজেই উৎসাহ দিতে লাগিলেন।—এইবারে দেখ—ঈগল আর সাপে যুদ্ধ হচ্ছে !

"পীগম্যালিয়ন রম্ভা আর
সুন্দরী মেনকা।
মৈনাক কৈ নাক দন্ত
ফুৎকার চীৎকার।

অন্ধ হ'ল রজ্জ তব।

মার্ক্‌স্‌ কই আলো ?

লেনিন লণ্ঠন জ্বালো।

মধ্যবিত্ত হাসি আর অশ্রু আভিজাত্য।

তাজমহলের গম্বুজ,

দা-ভিঞ্চির তুলি,

হুইটম্যানের দাড়ি,

"পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"

··· ··· — — ? ? ··· ! ! — —

মিলিয়নের মিলেনিয়াম।

সাপ আর ঈগল।"

—কি হে, ঘুমোলে নাকি ?

রমেশ বলিল—কি যে বল রাম-দা। এমন কবিতা শুনলে স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, আর আমরা ঘুমোব ?

রাম-দা বলিলেন—ওয়াণ্ডারফুল !

যতীন অতিসঙ্কোচে বলিল—অর্থ বোঝা কঠিন।

—কিছু কঠিন নয়। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করলেই বুঝতে পারবে।—এই বলিয়া রাম-দা সেই সরল ও সরস কবিতা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ হলের দরজা-জানলা খুলিয়া গেল। সকলে লাফাইয়া উঠিল, ব্যাপার কি ? বাতাস নাই, ঝড় নাই, জানলা খুলিল কেমন করিয়া ? কবিতা পাঠে বাধা পাইয়া রাম-দা বিরক্ত হইলেন ; উঠিয়া দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া আবার কবিতা পাঠ আরম্ভ করিলেন—চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আধুনিক বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ কবিতাটি।

"কীটদষ্ট চক্রবাক্‌

উন্মোচিত, হে বাচাল,

জনতা সঙ্ঘাতে তব অসূর্য্যমাতে।

পোস্ট-কার্ড আর খাম

বেড়েছে তার দাম।

বেশি দিন নয় আর

আসছে লাল দানব

ওই শোনা যায় হুঙ্কার

ইনক্লাব ফৈজাবাদ !

স্বেচ্ছাচারী ট্রাম

ক্রতুকৃতমের শেষ

আকাশে চাঁদ, আর এরোপ্লেন

বোমা আর শিলাবৃষ্টি

অজবন্ধু মাতরিশ্বা

ট্রয়, দিল্লী, ব্যাবিলন।"

আবার সশব্দে দরজা-জানলা খুলিয়া গেল। ব্যাপার কি ?

এমন সময়ে সকলে দেখিল অতি বিরাট ও অতি কুৎসিত এক পুরুষ ঘরে ঢুকিতেছে। পায়ে তার খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, খাটো একখানা কাপড় পরণে, কাঁধে গামছা। রমেশ ও যতীন রাম-দা'র পিছনে গিয়া লুকাইল।

রাম-দা শুধাইলেন—মশায় কে ?

কিন্তু সেই পুরুষ তার উত্তর না দিয়া অত্যন্ত করুণভাবে বলিল—আপনারা আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, ছেড়ে দিন। —লোকটার স্বর ঈষৎ অনুনাসিক।

রাম-দা শুধাইলেন—আপনি কে ?

—আজ্ঞে আমি এই বাড়ীতে থাকি।

রাম-দা বলিলেন—এতক্ষণ দেখিনি কেন ?

—আজ্ঞে পাশের বেল গাছটার উপরে বসে' হাওয়া খাচ্ছিলাম।

রাম-দা—আপনি কি ?

—আজ্ঞে হাঁ, আপনারা যাকে ব্রহ্মদৈত্য বলেন আমি সেই।

রমেশ ও যতীন গোঁ গোঁ করিয়া মূর্চ্ছা গেল।

রাম-দা বলিলেন—আপনি যেখানে খুশী বসে' হাওয়া খান, কিন্তু এখানে কেন ?

—আজ্ঞে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না।

রাম-দা বলিলেন—কষ্ট দিলাম কোথায় ?

সে বলিল—ওই যে ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়ছিলেন, ওতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

রাম-দা বলিলেন—ভূতের মন্ত্র কোথায় পেলেন ? এ তো কবিতা, আধুনিক কবিতা !

সে বলিল—আজ্ঞে ভূতের মন্ত্র তো কবিতাতেই লেখা হয়।

তারপরে সে বইয়ের গাদা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে

লাগিল। বলিল—সর্ব্বনাশ। ভূতের মন্ত্রের এতগুলো বই ছাপা হয়েছে! আমি হচ্ছি নবাব আলীবর্দ্দীর সময়ের ভূত। তখনকার দিনে সেরা ভূতের ওঝা ছিল লালগোলার হোসেন মিঞা। সে আর কটা মন্ত্র জানতো?

রাম-দা বলিলেন—এ যে ভূতের মন্ত্র তা কে বল্‌ল?

লোকটা বলিল—আমি নিজে ভূত, আমি বলছি। আপনার প্রত্যেকটি শ্লোক তপ্ত লোহার মত আমার গায়ে বিঁধছিল। কিছুকাল আগে এই বাড়ীর মালিক রিষড়ে থেকে ওঝা এনেছিল। সুবা বাংলার শ্রেষ্ঠ ওঝা। সে-ও আমাকে তাড়াতে পারেনি। কিন্তু আপনি আমাকে হার মানিয়েছেন। এবারে অনুমতি করুন, আমি বাড়ী ছেড়ে পালাই।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—নাঃ, বাড়ীটা বেশ ছিল। একদিকে বেল গাছ, একদিকে তাল গাছ, হাওয়া খাবার কি সুবিধেই না ছিল।

আবার একটু থামিয়া বলিল—ধন্য আপনার শিক্ষা! এই সব মন্তর আবার যখন ছাপা হয়েছে, বাংলা দেশে আর আমাদের বাস করা চল্‌ল না দেখছি। বাঙালী ভূত বাংলার বাইরে গেলে কি আর আজকাল জায়গা মিলবে? ছাতু ভূত, মেড়ো ভূত, বেহারী ভূত, পাঞ্জাবী ভূত—সবাই বলবে, "বঙ্গালী ভূঁত বংলামে যাও।" তা তাদের তাড়া খাই, সেও ভাল; না হয় পাগড়ী পরে' বাঙালীকে গাল দিয়ে রাষ্ট্রভাষা শিখে নিয়ে জাত ভাঁড়াবো, কিন্তু আপনার মন্তর অসহ্য।

এই বলিয়া সে গলায় গামছা দিয়া রাম-দা'র পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল।

অনেক চেষ্টার পরে যতীন ও রমেশের মূর্চ্ছা ভাঙিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ঘটনা নানা লোকে নানাভাবে বলিতে লাগিল। কেহ বলিল—রাম-দা লড়াই করিয়া ব্রহ্মদৈত্য তাড়াইয়াছেন; কেহ বলিল—শর্ষে পড়া দিয়া; আবার কেহ বা বলিল—মন্তর পড়িয়া। আসল রহস্য কেহই জানিল না, তবে সকলেই দেখিল যে বাড়ীটাতে আর কোন উৎপাত নাই।

রাম-দা এখন নামজাদা ভূতের ওঝা; তিনি ভিজিট লইয়া ভূত তাড়ান; মানুষকে ভূতে পাইলে ভূত ছাড়ান; খান দুই বাড়ীও কলিকাতায় করিয়াছেন। রাম-দা'র কবিতা-পাঠ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সার্থক হইয়াছে। তাঁর ঠিকানা চাই? ঠিকানা দেওয়া বাহুল্য মাত্র—তাঁর পরিচয় আজ কে না জানে?

ভাষাতীত

কাব্যরঞ্জন শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

সখি, কেমনে কহিব কেমন সে মুখখানি?—
যদি না পারি বলিতে বুঝে নিস অনুমানি'!
শুধু দিয়া মানবের ভাষা—
তারে ফোটাতে যে বৃথা আশা;—
ওগো সে মাধুরী কভু ফোটাতে পারে কি বাণী?

বল্‌ কি ফল কেবল চাঁদের উপমা দিয়া?
চাঁদ হ'য়ে যেত ম্লান সে বয়ান নিরখিয়া!
যদি শশীতে সে শোভা পাই—
আজ গগনের পানে ধাই;
দিই কাটায়ে জীবন চন্দ্র-কিরণ পিয়া!

সখি, ফুলের মাঝারে সে মাধুরী কোথা বল্‌?—
আমি দেখেছি খুঁজিয়া বসন্ত-বনতল!
যার পঙ্কজ ফোটে পায়—
আর জোছনা লুটায় গায়,
তার বদনের তুল্‌ হয় কি কুসুমদল?

আহা কেমনে কহিব—কেমন সে মুখ তার?
মোরে শুধালে জাগে যে মরমের হাহাকার।
কভু দুধের স্বাদ হায়,
শুধু জলে কিগো বুঝা যায়?
দিয়া বস্তুর রূপ—কেমনে ফুটাই যা শুধু কল্পনার!

মজলিস

নাটিকা

(দ্বিতীয় বৈঠক)

ভাস্কর

মজলিস বসিয়াছে। বিবেকরক্ষা এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পূর্ববৎ (ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৪৭)। আজকার বিবেকরক্ষী ও ডঃ নন্দী।

ডঃ নন্দী। আজ প্রথমেই একটা কথা আমায় বল্‌তে হচ্ছে। সেদিন আমাদের আলোচনা বড্‌ড নীচে নেমে গিয়েছিল। আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, আমরা একটা উচ্চ প্লেনের অধিবাসী। আমাদের চিন্তা আমাদের আলোচনা যেন কখনই অমন নিম্নভূমিতে নেমে না আসে।

ডঃ দে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের সকলেরই এবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

ডঃ বোস। এই সাবধানতার আবশ্যকতাটাই আমার কাছে লুডিক্রাস্ মনে হচ্ছে। আমাদের কালচার্ড মনগুলো তো উঁচুতেই থাকে। নেমে আসাটা একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট্।

ডঃ মুখার্জি। অ্যাক্‌সিডেন্টটা যেন ঘন ঘন না হয়! এবিষয়ে আমাদের দায়িত্বটা কত বড়, তা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। গীতায় আছে, যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, আমরা হচ্ছি সমাজের ইণ্টেলেক্‌চুয়াল পাইলটস্। আমরা যা ভাব্‌ব, যা বল্‌ব, অপর লোকে, অর্থাৎ অ-ডক্টর অ-বিলেতফেরত লোকরাও তাই ভাব্‌বে, তাই করবে। আমরা যেন আমাদের এই মহান্ দায়িত্ব ভুলে না যাই।

ডঃ নন্দী। আজকার আলোচনাটা আরম্ভ করা যায় কি দিয়ে?

ডঃ মিটার। আরম্ভটা ব্রহ্ম দিয়েই হোক। আলোটা তো একশ'তেই আছে।

ডঃ বোস। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় কোন অসুবিধে নেই। কারণ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সুতরাং যে-কোন বিষয়ে আলোচনা করলেই সেটা ব্রহ্ম বিষয়েই হবে। ব্রহ্মের বাইরে তো কিছু নেই!

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ নাচিয়া) তাই যদি হয়, তবে এসব বিবেকরক্ষা, আলোর খেলা, এসবের কি দরকার?

ডঃ দে। দরকার আসলে কিছু নেই। তবে কি-না আমাদের মজলিসের বিশেষত্ব, সুতরাং—

ডঃ ঘোষ। ওটা বজায় রাখ্‌তেই হবে।

ডঃ মুখার্জি। এই যে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, একথাটার তাৎপর্য সত্যই খুব গভীর।

ডঃ দে। নিশ্চয়ই। আমরা যা-কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় যা-কিছু আছে, সবই মূলত এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে বিলীন; এটা মনে, জ্ঞানে, ধ্যানে আয়ত্ত করা এক মহাকঠিন ব্যাপার। মানুষের মন অতটা তীক্ষ্ণ, অতটা গভীর, অতটা স্বচ্ছ, অতটা নির্মল, অতটা পবিত্র যে হতে পারে, সেটা কল্পনা করাও কঠিন।

ডঃ নন্দী। সেই জন্যই তো আমরা শুনি, ইতিহাসে পড়ি, এই অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌বার জন্য শঙ্করাদি কত মহাপুরুষ জীবনপাত ক'রে গেছেন। কৃতকার্য কতদূর হয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে বিচার করা যেমন কঠিন, তেমনি অসম্ভব।

ডঃ ব্যানার্জি। এ যুগের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, আমাদের চিন্তাধারা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা অবলম্বন ক'রে চল্‌তে চায়। এপথে কিন্তু বেশি দূর এগোনো যায় না। সেই জন্যই বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির প্রতি অনেক আধুনিক পণ্ডিতের একটা উপেক্ষার ভাব দেখা যায়। এই কারণেই দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বা অন্য কোনপ্রকার দার্শনিক মতবাদই বর্তমান যুগের যুক্তিবাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না।

ডঃ মুখার্জি। এসব দার্শনিক বাদের মধ্যে কি যুক্তি নেই? দার্শনিকরাও তো যুক্তির সাহায্যেই তাঁদের মতবাদ সমর্থন করেন।

ডঃ ব্যানার্জি। কিন্তু দার্শনিক যুক্তির ধারা, আর আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারা ঠিক একপ্রকার নয়। দুটোর ফিল্‌ড্‌ই আলাদা। একটা মনোজগতের এবং তারও উপরের ব্যাপার, আর একটা ল্যাবরেটরির ব্যাপার। এ দুটো ধারার সামঞ্জস্য সহজ নয়।

ডঃ বোস। সামঞ্জস্য নাই বা হ'ল। যদি সত্যিই মানুষের মন কোনদিন একটা সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তির ধারা মেনে চল্‌তে সমর্থ হয়, তখন সামঞ্জস্য আপনিই হবে। নতুবা ধরে বেঁধে, টিকি আর ইলেক্‌ট্রিসিটির মত, একটা ছেলে-ভুলোনো যুক্তির ছড়া বেঁধে মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ আর র‍্যাশন্যালিজ্‌মের আধ-সিদ্ধ খিচুড়ি না পাকানোই ভাল।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। ড্যাম্‌ ইয়োর মিষ্টিসিজ্‌ম্‌। ওসব ইয়ে আজকালকার দিনে শিকেয় তুলেই রাখা উচিত। যা চোখে দেখা যায় না, যা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, যা লেবরেটরিতে পরীক্ষা করা যায় না, এক কথায় যা—এক, দুই, তিন, চার ক'রে গোনা যায় না, এযুগে তার কোন মূল্যই নেই।

ডঃ বোস। অন্তত এ মজলিসের সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে সবাই যে পিওর র‍্যাশনালিস্ট, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই।

ডঃ চক্রবর্তী। বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

ডঃ বোস। মানে?

ডঃ চক্রবর্তী। আমার ধারণা, আমরা সকলেই বাইরে র‍্যাশান্যাল, ঘরে মিষ্টিক।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। অফ্‌ কোর্স নট্‌! তাই যদি হয়, আমি প্রস্তাব আন্‌বো, আমাদের মজলিসে মিস্টিকতা চল্‌বে না।

ডঃ বোস। আবার প্রস্তাব? সেবারের সে প্রস্তাবের কথা মনে আছে তো?

ডঃ দে। কোন্‌ প্রস্তাব? আমি তো জানিনে কিছু!

ডঃ বোস। আপনি তখনো মজলিসে আসেন নি। একবার আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, যে আমাদের মজলিসে চাকরি, মাইনে, ট্রান্সফার, প্রমোশন আর টেল-বেয়ারিং, এ কয়টা আইটেম বাঁদ দিতে হবে। প্রস্তাবটা ইউন্যানিমাস্‌লি পাশ হয়ে গেল! তারপর দুমাসের মধ্যে আমাদের সভ্য-সংখ্যা ১৪২ থেকে নেমে ৩৭-এ এসে দাঁড়াল।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। তা হোক্‌ গে। র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ই যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং নৈতিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌ হয়, তা হলে তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকারের জন্যই প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।

ডঃ দে। আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস চ্যাটার্জি। আমাদের প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ঠিক রাখ্‌তে হবে বৈকি।

মিসেস ভৌমিকের প্রবেশ

ডঃ নন্দী। এই যে মিসেস্‌ ভৌমিক, নমস্কার!

মিসেস্‌ ভৌমিক। নমস্কার! নমস্কার! সবাইকেই নমস্কার! একটু দেরী হয়ে গেছে, না? কি করি, এক দালাল এসে যা এক রাবিশ গাড়ী গতিয়ে দিয়ে গেছে! পঞ্চাশ মাইলের বেশি স্পীডই হয় না।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। (সোৎসাহে) আপনি গাড়ী বদ্‌লেছেন বুঝি? কত টাকায় কিন্‌লেন, ইফ্‌ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড্‌?

মিসেস্‌ ভৌমিক। কিনেছি ন'শ টাকায়, তবে মজলিসের বাইরের লোকের কাছে বলি, উনত্রিশ শ'।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। কেন বলুন তো?

মিসেস্‌ ভৌমিক। আমার পোজিশনের লোকের ন'শ টাকার গাড়ীতে বেড়ানটা—বোঝেনই তো! তাছাড়া সত্য কথা বল্‌তে কালচারে বাধে।

ডঃ মিটার। যাক্‌ গে। আজ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—র‍্যাশানালিজম্‌। মিসেস্‌ ভৌমিকের এ বিষয়ে বক্তব্য কি?

মিসেস্‌ ভৌমিক। আই অ্যাম্‌ আউট এ্যাণ্ড্‌ আউট এ র‍্যাশানালিস্ট, এতে আপনাদের কারো কোন সন্দেহ আছে নাকি?

ডঃ বোস। সন্দেহ একেবারেই নেই।

মিসেস্‌ ভৌমিক। রাওলপিণ্ডিতে এতদিন ছিলুম, আমার র‍্যাশানাল মোড্‌ অফ্‌ লিভিং দেখে সবাই অবাক্‌ হত। কোন রকম বস্তা-পচা সেন্টিমেন্ট কোনদিন আমার কাছে অ্যাপীল করে নি।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। তাই তো চাই আমরা। বাংলা দেশটা কেমন যেন মিয়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেখ্‌তে হবে, যাতে সারা বাংলা আবার চাঙা হয়ে উঠ্‌তে পারে।

ডঃ নন্দী। আমাদের ডঃ পুরকায়স্থ এবার ট্রায়াম্ফ্‌ অফ্‌ র‍্যাশানালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে যে বইখানা লিখেছেন, আমাদের

উচিত সেখানা খুব প্রচার করা। মিস্ চ্যাটার্জি নিশ্চয়ই বইখানা পড়েছেন।

মিস্ চ্যাটার্জি। পড়িনি এখনও। তবে রিভিয়ু দেখেছি, শিগ্‌গিরই পড়্‌বার ইচ্ছা আছে।

ডঃ নন্দী। হ্যাঁ, আপনারা সকলেই পড়্‌বেন আশা করি। বইখানা সত্যই যুগোপযোগী হয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্যের প্রবেশ

ডঃ নন্দী। এই যে ডঃ ভট্টাচার্য, আসুন, নমস্কার।

ডঃ ভট্টাচার্য। নমস্কার, গুড্‌ ইভনিং টু এভ্‌রিবডি।

ডঃ মিটার। আগেই আমরা আপনাকে কন্‌গ্রাচুলেশন্স জানাচ্ছি। আপনার অ্যামস্টার্‌ডাম রিভিয়ুয়ের সেই পেপারটা—থিওরি অ্যাণ্ড প্রাক্‌টিস্ অফ্‌ লুনার একলিপ্‌স্—খুব ভাল হয়েছে।

মিস্ চ্যাটার্জি। তাই নাকি! আমি তো দেখিনি এখনো।

ডঃ নন্দী। পরে দেখ্‌বেন—একটা চমৎকার র‍্যাশ-ন্যালিস্টিক আউট্‌লুক।

মিস্ চ্যাটার্জি। নিশ্চয়ই পড়্‌ব। ডঃ ভট্টাচার্য, একখানা বই কিন্তু আমি চাই।

ডঃ ভট্টাচার্য। বেশ তো!

ডঃ মুখার্জি। মিস্ চ্যাটার্জি, আপনার পড়া হলে বইখানা আমাকে দেবেন কিন্তু।

ডঃ মিত্র। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে দেবেন।

ডঃ বোস। আপনাদের সবার পড়া হয়ে গেলে আমি যেন একবার পাই!

ডঃ নন্দী। আচ্ছা, আজ ডঃ বটব্যাল তো এলেন না!

ডঃ দে। বটব্যাল তো পাগল হয়ে গেছেন। বোধ হয় রাঁচীতে আছেন।

ডঃ মিটার। সে কি! কালও তো তাঁর সঙ্গে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। সে রকম কোন লক্ষণ ত—

ডঃ দে। শুধু দেখে ঠিক বোঝা যায় না।

ডঃ চক্রবর্ত্তী। কেন, পরশুদিন তো তার সঙ্গে জুট-ফোরকাস্ট্‌ নিয়ে দু'ঘণ্টা আলোচনা হ'ল। কোন রকম ইল্‌লজিক্যাল—

ডঃ দে। শুধু কথা বললে বোঝা যায় না।

ডঃ ভট্টাচার্য। আমি তো গত সামারে দুমাস দেরাদুনে ওঁর বাসায় ছিলাম। একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বেড়ান, একসঙ্গে শীকারে যাওয়া—সবই তো ক'রেছি। কই, কোনরকম ইডিওসিন্‌ক্রেসিও তো আছে বলে মনে হ'ল না!

ডঃ দে। এগ্‌জ্যাক্টি্‌লি! ওঁর পাগলামির আসল লক্ষণই এই যে 'কেউ জান্‌তে পারে না'।

মিস্ চ্যাটার্জি। ডঃ দে, এটা আপনার 'উইশ্‌ফুল থট্‌' নয় তো!

মিসেস ভৌমিক। কিম্বা একটা সাইকলজিক্যাল নেসেসিটি!

ডঃ দে। কি যে বলেন আপনারা!

ডঃ সিংহ। কিংবা একটা এক্‌সপেরিমেণ্ট ইন্ অটোসাজেস্‌শন! দশজনে মিলে বল্‌তে বল্‌তে যদি সত্যিই—

ডঃ দে। আপনারা ভারি ইয়ে—

ডঃ সিংহ। আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। আমাদের সাইকলজি-শাস্ত্রে ওটা কিন্তু একটা খুব প্রচলিত থিওরি—অনেক এক্‌সপেরিমেণ্টের নজির আছে। তাছাড়া, ডঃ বটব্যাল এরকম এক্‌সপেরিমেণ্টের পক্ষে খুব কন্‌ভিনিয়েণ্ট্‌ সাবজেক্ট—একটু শাই, একটু সেণ্টিমেণ্টাল, একটু সেন্‌সিটিভ্‌—

ডঃ নন্দী। দেখুন, আমাদের কথার মধ্যে বড় বেশি ইংরেজি কথা ঢুকে যাচ্ছে।

ডঃ সিংহ। সরি। আচ্ছা, এখন থেকে একটু সাবধান হওয়া যাবে।

ডঃ চক্রবর্তী! তাছাড়া, আমাদের আলোচনাগুলো বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজকের আসল বিষয়টা কিন্তু র‍্যাশানালিজ্‌ম্।

মিসেস ভৌমিক। দেখুন একটু আনন্দ, একটু বিশ্রাম, একটু আড্‌ডা—এর জন্যই এখানে আসা। এখানেও যদি লজিক আর ইউটিলিটির নিক্তিতে ওজন ক'রে কথা বল্‌তে হয়, তাহ'লে তো ভারি মুস্কিল।

ডঃ নন্দী। না, অতটা অবশ্য নয়। তবে আমাদের মজলিসের বিশেষত্ব, মানে একটা হায়আর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল লেভেল—সেটা থেকে বেশি না নামলেই হ'ল।

ডঃ দে। আপনারা যাই বলুন, সত্যিই ডঃ বটব্যাল—

ডঃ মুখার্জি। আবার বটব্যাল! অন্য কথা পাড়ুন।

মিসেস্ ভৌমিক। দেখুন, মজলিসটা মোটেই যেন জম্‌ছে না।

ডঃ চক্রবর্তী। কেন বলুন তো?

মিসেস্ ভৌমিক। আপনারা তো দেখ্‌ছি মোটে আটাশ জন। এত অল্প লোকে কি আড্‌ডা জমে? আমাদের রাওলপিণ্ডিতে তো কোরামই হয় পঞ্চাশ জনে।

ডঃ চক্রবর্তী। এটা বাংলাদেশ কি না। এখানে সবই একটু ছোট-ছোট। আপনাদের রাওলপিণ্ডিতে সবই একটা গ্র্যাণ্ড স্কেলে হয়। এই নিন্, একটা সিগারেট খান।

মিসেস্ ভৌমিক। (সিগারেট ধরাইয়া) থ্যাঙ্ক্‌স্।

ডঃ করের প্রবেশ

ডঃ বোস। এই যে ডঃ কর, এত দেরী যে!

ডঃ কর। আর বলেন কেন, একটা নারী সমিতিতে গিয়ে পড়েছিলাম, বেরুতে দেরী হয়ে গেল।

মিসেস্ ভৌমিক। আপনি নারী সমিতিতে গেলেন কি হিসেবে?

ডঃ কর। আমার স্ত্রীর স্বামী-হিসেবে। সেখানে আজ দুটো খুব উচ্চাঙ্গের প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

ডঃ মুখার্জি। ইউ মীন, খুব র‍্যাশন্যাল প্রস্তাব।

ডঃ কর। হ্যাঁ। একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে, নারীরা এখন থেকে ঠিক পুরুষদের নৈতিক আচরণ হুবহু নকল করবে। আমি একটা সংশোধন প্রস্তাব করেছিলাম, 'আমাদের সমাজে পুরুষেরা নারীর প্রতি যে সকল অবিচার করে, তার প্রতিবিধানকল্পে আইন এবং সামাজিক ব্যবস্থার যথোচিত পরিবর্তন করা হোক।' আমার প্রস্তাব শুনেই তো সবাই ভীষণ চটে গেলেন। এযুগে নারীর প্রতি পুরুষের বিচার-অবিচারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আদিম কালে যখন নারীকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে নরের দরকার হ'তো, তখন এসব যুক্তি চল্‌তো। এখন থানা রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, পেনাল কোড রয়েছে—সুতরাং বিচার-অবিচারের কর্তা তো আর স্বামীরা নয়! একথার উত্তরে আমি বললুম, 'তাহলে আমি আর একটা সংশোধন প্রস্তাব কর্‌বো, অনুমতি দিন।' সভানেত্রী বললেন, আমাকে আর কোন সংশোধন প্রস্তাব কর্‌বার অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি বললুম, 'আপনাদের প্রস্তাবের অর্থটা কি এই যে, পুরুষেরা যেমন সিগারেট খায়, লেমনেড খায়, ক্লাবে সারারাত আড্‌ডা দেয়, তেমনি মেয়েরাও—?' সভানেত্রী বল্‌লেন, 'ওসব ডিটেল্‌স্ পরে ঠিক করা যাবে। এতবড় সভায় ওসব খুটিনাটি আলোচনা করা চলে না।' আমি চুপ ক'রে রইলুম। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল।

ডঃ বোস। ভেরি ইণ্টারেস্টিং! আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রস্তাবটা কি?

ডঃ কর। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, 'সন্তান-সন্ততির মধ্যে বৈধ এবং অবৈধ বলে কোন প্রভেদ থাক্‌বে না।' আমি বললুম, 'একটা সংশোধন প্রস্তাব আন্‌তে পারি কি?' সভানেত্রী বল্‌লেন, 'হাঁ, একটা সংশোধন প্রস্তাবের অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু তার বেশি নয়।' আমি বললুম, 'আমি প্রস্তাব করি যে সমাজ থেকে বিবাহ-ব্যাপারটা তুলে দেওয়া হোক।' শুনে সবাই ভয়ানক খাপ্পা!

মিসেস্ ভৌমিক। কেন বলুন তো?

ডঃ কর। আমার পাশে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা বল্‌লেন, 'এ আমরা কিছুতেই সমর্থন কর্‌বো না। এ প্রস্তাব পাশ হ'লে আমরা জয়ঢাক ঘাড়ে কর্‌বার লোক কোথায় পাব?' আমাকে প্রস্তাব প্রত্যাহার কর্‌তে হ'ল। মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

ডঃ বোস। এ প্রস্তাবটার ইম্‌প্লিকেশনটা কি, তা একবার আপনারা ভেবে দেখেছেন!

ডঃ নন্দী। ভেবেই দেখুন, এখানে আর আলোচনায় কাজ নেই, আলো নিভে যাবে।

মিসেস্ ভৌমিক। না, না, আলো নিভিয়ে দেবেন না। আপনারা যাই বলুন, আমার তো মনে হয় ভারতীয় সভ্যতার কিংবা মানব-সভ্যতার জন্ম থেকে এ পর্যন্ত নারীর নিজের মুখে এমন র‍্যাশন্যাল প্রস্তাব এ পর্যন্ত শোনা যায় নি।

ডঃ বোস। মানে, ব্যাক্ টু নেচার!

মিসেস্ ভৌমিক। বাট্ র‍্যাশন্যালি অ্যাণ্ড্ লজিক্যালি।

ডঃ মুখার্জি। এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এরকম আইডিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাটা অত্যন্ত অন্যায়।

ডঃ নন্দী। আমারও তাই মত। আমার মনে হয়, প্রথম বিলাতী সভ্যতার ধাক্কায় যেমন বাঙালী পুরুষগুলোর মাথা ঠিক ছিল না, এখন তেমনি উচ্চশিক্ষা এবং নারী-প্রগতির একটা আচমকা ধাক্কা এসে আমাদের ছেলেমেয়েদের

মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার ভেদরেখা এরা মান্‌তে চায় না।

মিসেস ভৌমিক। (তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া)। ঐ-য্-যাঃ—

ডঃ নন্দী। কি হ'ল?

ডঃ বোস। ছারপোকা বুঝি?

ডঃ চক্রবর্তী। আপনার হ্যাণ্ড্ব্যাগ হারিয়েছে বুঝি?

মিসেস্ ভৌমিক। না, না, ওসব কিছু না। আজ পাঞ্জাব মেলে উনি রাওলপিণ্ডি যাচ্ছেন, স্টেশনে সী-অফ্ করতে যাবার কথা ছিল—স্রেফ্ ভুলে গেছি। (হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া) এখনও বোধ হয় সময় আছে। আচ্ছা, আজ আসি। নিষ্ক্রান্ত

ডঃ কর। আজ তো ডঃ দাসের একটা কবিতা পড়ার কথা ছিল। কই, পড়লেন না তো!

মিস্ চ্যাটার্জি। থাক্, ওঁর আর কবিতা পড়ে কাজ নেই। আমার একটুও ভাল লাগে না।

ডঃ নন্দী। কেন বলুন তো?

মিস্ চ্যাটার্জি। উনি বড্ড শিগগির শেষ ক'রে ফেলেন।

মিসেস নন্দী। যা বলেছ, একটু ভাব না জম্‌লে কি কবিতা ভাল লাগে?

ডঃ ভট্টাচার্য। এক্স্‌কিউজ মি, দেখুন আমাকে আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে।

ডঃ মুখার্জি। কেন বলুন তো?

ডঃ ভট্টাচার্য। আজ আটটা সাতান্ন মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ। তার আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে হবে। হাঁড়ি-কুড়িগুলো সব ফেলে দিতে হবে তো ···

মিস চ্যাটার্জি। আপনিও এসব মানেন নাকি? আপনিই না অ্যাস্ট্রনমিতে গবেষণা করেছেন?

ডঃ ভট্টাচার্য। মানে, কথাটা কি জানেন, সবই কি আর আজকালকার সায়েন্স দিয়ে বোঝা যায়? দেয়ার্ আর্ মোর থিঙ্স্ ইন হেভ্ন্ অ্যাণ্ড্ আর্থ, হরেসিও, ছান্ আর্ ড্রেম্ট্ অফ্ ইন্ ইওর ফিলজফি—বুঝলেন কি না।

ডঃ বোস। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে, ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশনালিজ্ম্ আর কি!

ডঃ ভট্টাচার্য। তা ঠাট্টা করতে হয় করুন। আমি তো আর বিজ্ঞানে রিসার্চ ক'রে নাস্তিক হ'য়ে যাইনি।

ডঃ বোস। গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার সঙ্গে নাস্তিকতা বা আস্তিকতার সম্বন্ধটা ঠিক বোঝা গেল না।

ডঃ ভট্টাচার্য। সবাই সব জিনিষ বোঝে না, ডঃ বোস।

ডঃ বোস। আজ্ঞে না।

ডঃ ভট্টাচার্য। আচ্ছা আসি তা হ'লে। নমস্কার! নিষ্ক্রান্ত

ডঃ মিটার। দেখুন, আমাকে আজ একটু শিগ্‌গিরই যেতে হবে।

ডঃ নন্দী। আপনারও কি গ্রহণ-সমস্যা নাকি?

ডঃ মিটার। আজ্ঞে না। আমার প্রয়োজনটা আরো আর্জেণ্ট।

মিস চ্যাটার্জি। ব্যাপার কি?

ডঃ মিটার। (পেণ্ট্‌লেনের পকেট হইতে একটি দুই-ড্রাম হোমিওপ্যাথিক ঔষধের খালি শিশি বাহির করিয়া) এই দেখুন, আমাকে একবার যেতে হবে ঠনঠনের কালীবাড়ী। মা-কালীর চরণামৃত একটু নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হবে আমার ভাইঝিকে—

ডঃ দাস। কি আশ্চর্য! আপনি আবার ওসব—

ডঃ মিটার। আজ্ঞে, মানে—আমি ওসব মানিনে। তবে মেয়েদের ব্যাপার কি না, মানে—তাছাড়া কিসে কি হয় বলা তো যায় না। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ—

ডঃ বোস। তা তো বটেই!

ডঃ মিটার। আচ্ছা, আজ উঠি। নমস্কার! নিষ্ক্রান্ত

ডঃ সিংহ। দেখুন, আমাকেও একটু আগেই যেতে হচ্ছে।

ডঃ কর। কেন, আপনার আবার কি হ'ল।

ডঃ সিংহ। ভাবছিলুম, একবার থিয়েটারে যাব। প্রায় দুবছর থিয়েটার দেখিনি।

ডঃ পালিত। থিয়েটার! দেখুন কিছু মনে করবেন না, মনে হয়, এ মজলিসের সভ্যদের এসব মিডীভ্যাল আমোদ-চর্চায় যোগ দেওয়া মানায় না। এ দেশের থিয়েটারের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল এবং কাল্‌চারাল লেভেল বড় নীচু।

ডঃ সিংহ। আমি অবশ্য অতটা সিরিয়াস্‌লি ভেবে দেখিনি। একটু সময় কাটানো—দু-চারটে গান-টান শোনা—দু-একটা হাসি-রসিকতা—মন্দ কি! চলুন না, আপনিও।

ডঃ পালিত। আমি? কি যে বলেন! আমি ও

ধরণের আমোদ একেবারেই পছন্দ করি নে। তাছাড়া, আজ আমার একটা খুব দরকারী এনগেজমেণ্ট আছে। শুধু আজ নয়, এ সপ্তাহের সবগুলি সন্ধ্যাই এক রকম বুক্‌ড্‌!

ডঃ সিংহ। কি এত এনগেজমেণ্ট আপনার?

ডঃ পালিত। আজ মিসেস্ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দাম নাচ, কাল মিঃ ভূঁইয়ার বাড়ীতে মায়েদের এবং মেয়েদের সাঁওতালী নাচ, পরশু ডঃ বাড়রীর বাড়ীতে মিকস্‌ড ব্রীজ, তারপর দিন খিচুড়ী-ক্লাবের প্রীতি-ভোজ, তারপর দিন কাজিন-ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব, তারপর দিন—

ডঃ সিংহ। থাক্, আর বলতে হবে না। আপনার থিয়েটার-বিরাগের কারণ বোঝা গেল।

ডঃ পালিত। আপনাদের মন অত্যন্ত—। থাক্‌গে, আচ্ছা আজ আসি তাহলে। নমস্কার! নিষ্ক্রান্ত

ডঃ দাস। আমাকেও এবার উঠতে হ'ল।

ডঃ নন্দী। এখনই?

ডঃ দাস। হ্যাঁ।

ডঃ নন্দী। কোথায় যাবেন এখন?

ডঃ দাস। যাব ফারপোতে। কয়েকটি ফিরিঙ্গী মেয়ে আসবেন, তাঁদের সঙ্গে একটা সময় ঠিক করতে হবে। ওকি? আলো কমে গেল কেন?

ডঃ নন্দী। অন্ এ পয়েণ্ট অব অর্ডার! এ মজলিসে ওসব আলোচনা চল্‌বে না।

ডঃ দাস। সাট্ আপ্ প্লিজ। এই রকম নীচ আর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে আপনি মজলিসের বিবেক রক্ষা কর্‌বেন? শিগগির আলো বাড়িয়ে দিন।

ডঃ নন্দী। তা দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ওই কথাগুলোর একটা র‍্যাশন্যাল এবং কালচারাল ইন্‌টারপ্রিটেশন চাই।

ডঃ দাস। তা দিচ্ছি। ওঁয়ারা আমার ভাগ্নের বিয়ের বরযাত্রী। কবে কখন কোথা থেকে রওয়ানা হয়ে কোথায় যাবেন তাই ঠিক করবার জন্য ফারপোয় যাচ্ছি! ওঁয়ারা তো আর আমাদের পাড়ায় বেশি যাতায়াত করেন না! আচ্ছা, আসি তা হ'লে। নমস্কার! গুড্ নাইট্ টু এভ্‌রি বডি। নিষ্ক্রান্ত

ডঃ ঘোষ। এক্‌স্‌কিউজ্ মি, আমিও এবার উঠব।

মিস্ ঘোষ। কেন? এত সকালেই যে! মিসেসের হুকুম বুঝি?

ডঃ ঘোষ। না না, ওসব কিছু না। আমাকে একবার যেতে হবে হ্যারিসন রোডে। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর মোড়ে একটা পশ্চিমা সাধুর কাছে অম্বলের অসুখের মাদুলী পাওয়া যায়। দিনের বেলায় যেতে লজ্জা করে। ভাবছি, বাড়ী ফিরবার পথে নিয়ে যাব।

মিস্ ঘোষ। আপনি আবার মাদুলীও বিশ্বাস করেন নাকি?

ডঃ ঘোষ। বিশ্বাস আমি করিনে। তবে মেয়েদের ব্যাপার—মন জুগিয়ে চলাই ভাল। তাছাড়া কিসের কি গুণ, বলা তো যায় না। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ—

ডঃ বোস। ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশান্যালিজম্!

ডঃ ঘোষ। অমন ঠাট্টা সবাই করে। আবার অবস্থার ফেরে পড়ে মত বদ্‌লাতেও দেরি হয় না।

ডঃ বোস। তা তো বটেই—বিশেষত আল্ট্রা-র‍্যাডিক্যালদের।

ডঃ ঘোষ। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। বেশি দেরি হ'লে আবার সে ব্যাটাকে পাওয়া যাবে না। গুড নাইট্। নিষ্ক্রান্ত

ডঃ ব্যানার্জি। আমিও ভাবছি, এখন উঠলে হয়।

ডঃ নন্দী। আপনিও?

ডঃ ব্যানার্জি। হ্যাঁ। আমাকে একবার যেতে হবে এক পণ্ডিতের কাছে—একখানা কোষ্ঠীর সম্বন্ধে খোঁজ করতে।

ডঃ মুখার্জি। কোষ্ঠী?

ডঃ ব্যানার্জি। হ্যাঁ, একখানা ঠিকুজী দিয়েছি, তাই থেকে কোষ্ঠী তৈরি কর্‌তে হবে। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাইপোর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সবই ঠিক, কিন্তু কোষ্ঠীটা নিয়ে একটু গোলযোগ বেধেছে।

ডঃ মুখার্জি। আজকালকার দিনে ওসব আবার আছে না কি? বিশেষত আপনার মত একজন আধুনিক র‍্যাশান্যাল র‍্যাডিক্যাল লোকের পক্ষে—

ডঃ ব্যানার্জি। মানে, আসল কথাটা কি জানেন, আমরা মুখে বা মিটিং-এ যতটা র‍্যাশন্যাল, মনে তা নই। তাছাড়া এই যে আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র—এটা যে একেবারে ভুয়ো—তাই বা বলি কি করে?

ডঃ বোস। মানে, র‍্যাশন্যালিজম্‌টা একটা ধাপ্পা!

ডঃ ব্যানার্জি। অতটা মান্‌তে আমি রাজি নই।

ডঃ বোস। সেটা আরো খারাপ! মানে, সুবিধে বুঝে মানি। আমি তো দেখেছি, যখন দরে বনিবনাও না হয়, তখন কোষ্ঠীর তলব পড়ে। আবার যখন দরদস্তুরটা বেশ সুবিধে মত হয়ে যায়, তখন জ্যোতিষীকে পাঁচ সিকে দিলেই আবার রাজযোটক হতেও দেরি লাগে না।

ডঃ ব্যানার্জি। আপনার সব বিষয়েই একটা সিনিক্যাল এবং স্যাটিরিক্যাল ভাব; এটা কিন্তু আমার পছন্দ হয় না।

ডঃ বোস। বেশ, ব'লব না। ঠিকুজি-কোষ্ঠী বা যা-খুশী দেখে আপনার ভাইপোর বিয়ে দিন। আন্তরিক আশীর্বাদ রইল।

ডঃ ব্যানার্জি। থ্যাঙ্কস্‌। আমারও অনুরোধ রইল, আপনি ওসব জিনিষকে অত বাজে মনে কর্‌বেন না। আমাদের বর্তমান যুগের লেবরেটরির বাইরে যে আর কোন সত্য নেই, তা আমি বিশ্বাস করি না। দেয়ার আর মোর থিংস্‌ ইন হেভেন্‌ অ্যাণ্ড আর্থ—

ডঃ বোস। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমাদের আলট্রা-র‍্যাডিক্যালদের অনেকের মুখেই তো ওই কথাই শুনলুম।

ডঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা, আজ উঠি। কোষ্ঠীটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত পাকা দেখাটা হয়ে উঠছে না। আচ্ছা, নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

ডঃ রুদ্র। আই অ্যাম্‌ অ্যাফ্রেড, আই শুড্‌ লীভ নাউ!

ডঃ নন্দী। আপনারও কি ঠিকুজী-সমস্যা নাকি?

ডঃ রুদ্র। আজ্ঞে না। আমাকে এখুনি একবার যেতে হবে বাগবাজারে। আমার এক ভাগ্নে একটা বামুনের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায়। যেমন ক'রে হোক, তাকে নিরস্ত করতে হবে।

ডঃ বোস। কেন? যদি মেয়ের পক্ষের মত থাকে, তবে আপনি কেন বারণ কর্‌বেন?

ডঃ রুদ্র। দেখুন, র‍্যাশন্যালই হই আর র‍্যাডিক্যালই হই, আমাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্‌তে দিতে পারিনে।

ডঃ বোস। আমার মনে হয়, এসব ব্যাপারে পারিবারিক মর্যাদার আদর্শটা পরিবর্তন করবার সময় এসেছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও যদি এই সঙ্কীর্ণ কুলিনীয়ানা না যায়, তা হলে কেমন ক'রে আমরা আশা কর্‌ব যে আমরা সবাই সবাইকে একজাতিভুক্ত মনে কর্‌ব?

ডঃ রুদ্র। বুঝি তো সবই, কিন্তু দেখুন কিছু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা আর কাজে করা, এদুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক।

ডঃ বোস। অশিক্ষিত, আন্‌কালচার্ড লোকের কাছে এ তফাৎ যত বেশি, আমাদের মত র‍্যাশন্যাল লোকদের কাছে অত বেশি হওয়া উচিত নয়।

ডঃ রুদ্র। তা ঠিক। তবে কি জানেন, পুরুষপরম্পরা থেকে পাওয়া পারিবারিক ট্রাডিশন—

ডঃ বোস। একেই বলে ট্রায়াম্ফ্‌ অফ্‌ র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌!

ডঃ রুদ্র। ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, আমি বামুন-কায়েতের বিয়েতে কিছুতেই মত দেবো না।

ডঃ বোস। নিশ্চয়ই না।

ডঃ রুদ্র। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। দেখি কতদূর ব্যাপারটা গড়িয়েছে। তাই বুঝে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আচ্ছা, নমস্কার! নিষ্ক্রান্ত

ডঃ পুরকায়স্থ। আমাকে কিন্তু একটু এক্স্‌কিউজ করতে হবে।

ডঃ বোস। আপনার এখন কি কাজ? কোন গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে যাবেন না কি?

ডঃ পুরকায়স্থ। না না, ওসব বুজরুকিতে আমার বিশ্বাস নেই।

মিস্‌ চ্যাটার্জি। তবু ভাল, অন্তত একজন র‍্যাশন্যাল লোক এখানে আছেন, যিনি এসব বুজরুকি বিশ্বাস করেন না।

ডঃ নন্দী। বুজরুকি আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। যে সব ব্যাপার আমাদের মধ্যে কারো কারো কাছে বুজরুকি বলে মনে হয়, হয়তো তার মধ্যে খানিকটা সত্যও থাক্‌তে পারে।

ডঃ মুখার্জি। সত্য আছে কি-না—সেটা ভাল ক'রে না জেনে শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি আর বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে যা-তা করা আর যা-তা মানা—এটা তো র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ নয়!

ডঃ বোস। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাত-দেখা, এসবেরও অনেক র‍্যাশন্যাল ব্যাখ্যা আছে হয় তো!

ডঃ মুখার্জি। তা হ'লে তো জগতে সব [illegible] অযৌক্তিক

বলে কিছুই থাকতে পারে না। সব কিছুরই একটা র‍্যাশন্যাল ব্যাখ্যা খাড়া করা যায়।

ডঃ বোস। তা যায় বলেই তো সবাই নিজেকে র‍্যাশন্যাল মনে করে; আর সেই জন্যই সব রকম অন্ধ সংস্কার আমাদের পেয়ে বসে।

ডঃ সিংহ। কিন্তু আমাদের মজলিসের সভ্যেরা তো সে লেভেলের লোক নন। এঁদের মন কখনো ওসব অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ হ'তে পারে না।

ডঃ বোস। তবে কি না, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভ্‌ন্ অ্যাণ্ড্ আর্থ—

ডঃ পুরকায়স্থ। তা হ'লে আমি উঠি এবার।

মিসেস্ নন্দী। আচ্ছা আসুন! আপনার স্ত্রী তো সবে আজ নাসিক থেকে এসেছেন। বিয়ের পর এই বোধ হয় আপনাদের প্রথম দেখা।

মিস্ চ্যাটার্জি। তাই নাকি? কি আশ্চর্য! আর আজ আপনি এখনো মজলিসে বসে আছেন? ও, আপনিই তো 'ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্' লিখেছেন, তাই আপনার অত সেন্টিমেণ্টালিটি নেই। কি বলেন?

ডঃ পুরকায়স্থ। হ্যাঁ, তা কতকটা বটে। তবে আমি এখন উঠ্‌ছি একটু অন্য প্রয়োজনে। অবশ্য প্রচার করবার মত কিছু নয়, তবে কি না বিটুইন্ আওয়ারসেলভ্‌স্—

মিসেস নন্দী। হ্যাঁ, তা বেশ তো—বলুন না। আমরা তো আর—

ডঃ পুরকায়স্থ। না না, তা তো বটেই। আপনারা তো আর—। মানে, আজ আমার বাড়ীতে গুরুদেব আস্‌বেন।

ডঃ বোস। এই রাত্রে!

ডঃ পুরকায়স্থ। আমার জীবনের একটা প্রধান ব্রত এই যে, কোন কিছু নিজে গ্রহণ করবার আগে গুরুদেবকে নিবেদন করি। যখন বাজারে প্রথম আম ওঠে, প্রথমে গুরুদেবকে অর্পণ ক'রে পরে আমি খাই। যখন শীতের দিনে সোয়েটার পরি, তখন আগে গুরুদেবকে একটি সোয়েটার পরিয়ে তবে সেটা আমি পরি। এমনি সব বিষয়েই—

ডঃ বোস। অ্যানাদার ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্!

ডঃ পুরকায়স্থ। আপনাদের হয়তো এ জিনিষটা তেমন অ্যাপীল করছে না। কিন্তু, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভ্‌ন্ অ্যাণ্ড্ আর্থ—

ডঃ বোস। যে আজ্ঞে!

ডঃ পুরকায়স্থ। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

মজলিসস্থ সকলেই কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডঃ নন্দী বলিলেন, আজ মজলিসটা এখানেই শেষ হোক্। সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বর্ষশেষে লহ নমস্কার

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ওগো রুদ্র,
হে বহ্নিদেবতা!
বর্ষশেষে লহ মোর মধ্যাহ্নের শত
নমস্কার;
প্রদীপ্ত ভাস্বর!
বিজয় ডমরু তব
বাজাইয়া গুরুগুরু তালে—অনিবার
শুনাও বিশ্বের দ্বারে
বিশ্বাতীত অমর সঙ্গীত,
যার কল-কল্লোল উল্লাসে
জাগিয়া উঠিবে নব মন্দাকিনী ধারা,
অমৃতের ছন্দোময়ী লীলা অশরীরী,
স্পর্শে তারি মৃত্যুক্লিষ্ট প্রাণ
মুক্তি-স্নানে হবে আত্মহারা।
পশ্চাতের স্মৃতি
পশ্চাতে পড়িয়া থাক,
মুছে যাক্ অতীতের অবসন্ন গ্লানি;
কালের কঙ্কাল হ'তে
ওগো মহাকাল
এনে দাও নূতনের অর্ঘ্যপাত্রখানি।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

মধ্যপ্রাচী

অধীর উৎকণ্ঠা ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া পূর্ণ একটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাচী ও প্রতীচী উভয় রণক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার ইতালীয় ঘাঁটি তোব্রুকের পতনের পর বৃটিশ-বাহিনী দার্না অধিকার করে। তাহার পর সাইরিন বন্দর অধিকার করিয়া বৃটিশ-বাহিনী অগ্রসর হইলে ইতালীয় সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে লিবিয়ায় মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর সর্ব্বশেষ ঘাঁটি বেন্ঘাজী বন্দরের পতন হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় এই বন্দরটির গুরুত্বই ছিল সর্ব্বাধিক। ইতালী হইতে সকল রণসম্ভার জাহাজে করিয়া প্রথমে এই বন্দরে প্রেরণ করা হইত। এখান হইতে সেইসকল রণোপকরণ অন্যান্য ঘাঁটিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইত। সুতরাং উত্তর ইতালীতে এই বন্দরটিকেই সমস্ত শক্তির কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। কাজেই বেন্ঘাজীর পতন হওয়ায় ইতালীর ক্ষতি হইয়াছে যথেষ্ট।

তবে জেনারেল ওয়েভালের সাফল্যের কারণ হ'ল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যুগপৎ সহযোগিতা। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্য যখনই কোন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে নৌ ও বিমান বাহিনী সেই সময়ে বোমাবর্ষণ করিয়া স্থলসৈন্যের অগ্রগমনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। অপর পক্ষে আফ্রিকাস্থিত ইতালীয় সৈন্যগণ প্রয়োজনমত নূতন সৈন্যদলের সাহায্য লাভ করিতে পারে নাই। ফলে আত্মরক্ষা অসম্ভব বুঝিবামাত্র ইতালীয়গণ বৃথা সৈন্যক্ষয় নিবারণার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, অথবা ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। এই কারণেই আফ্রিকায় বৃটিশের হস্তে লক্ষাধিক ইতালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও ইতালীয় সৈন্যগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। হাবসী সৈন্যদের কথা গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের শিক্ষাদানে ও সম্রাট হাইলে সেলাসীর নেতৃত্বে একদল রণদক্ষ হাবসী বাহিনী গঠিত হইয়াছে। এরিত্রিয়ায় বৃটিশবাহিনী ইতালীয়দের নিকট হইতে আগোরদাৎ ও বারেন্তু অধিকার করিয়া লইয়াছে। আবিসিনিয়ায় গোণ্ডার রোড ধরিয়া বৃটিশ বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে সীমান্ত হইতে ৪৫ মাইল অভ্যন্তরে একটি শত্রুঘাঁটি বৃটিশের অধিকৃত। সংক্ষেপে আফ্রিকার সকল রণক্ষেত্রেই ইতালীয় সৈন্য বৃটিশ-বাহিনীর হস্তে পর্য্যুদস্ত। লিবিয়ার দশম ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল টেলেরা বেনঘাজীতে আহত ও বন্দী হইয়া মারা গিয়াছেন। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জেনারেল বায়গানজলি বেনঘাজীতে বন্দী হইয়াছেন। বেনঘাজী দখলের ফলে সাইরেনিকায় ইতালীর ত্রিশ বৎসরের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইতালীর সহিত আবিসিনিয়ার যোগাযোগও আজ বিচ্ছিন্ন। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ইতালীর হস্তচ্যুত করা বৃটিশের উন্নত রণকৌশল ও সাফল্যের পরিচায়ক।

তবরুক আক্রমণের পথে বৃটিশ সৈন্যগণ কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়া যাইতেছে

আফ্রিকায় বৃটিশের এই বিজয়ে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রকৃতপক্ষে লিবিয়া হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের সমগ্র দক্ষিণাংশ বৃটিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল বলা যায়। ইতালীর দ্বারা প্রস্তুত পথ ঘাট ব্যবহারের সুবিধাও বৃটিশ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবে। কিন্তু এই জয় সামরিক হিসাবে যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহাতে অত্যধিক উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। মিঃ চার্চিলও একথা বিস্মৃত হন নাই। আসলে এই জয়ে বৃটেনের লাভ কতটুকু? যে মুসোলিনীকে তাঁহারা মরুভূমি-যুদ্ধের অক্ষ টাঁট্টা

করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই মরুভূমিই তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে মাত্র। জার্মানীর দ্রুত আক্রমণ-পদ্ধতির অনুকরণে বৃটিশ সৈন্যদল আফ্রিকায় 'ব্লিজ ক্রিগ' আক্রমণের একটা পরীক্ষা দিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত গুরুত্ব এখানে নয়। মিঃ চার্চ্চিল একথা ভাল করিয়া জানেন বলিয়াই তাঁহার বক্তৃতায় সংযমের অভাব হয় নাই। বৃটেনের প্রকৃত শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে আত্মরক্ষায় নিরত বৃটেন যখন এইরূপ প্রতি আক্রমণ চালাইতে সক্ষম হইবে, তখনই বৃটেন প্রকৃত বিজয়ের গৌরব অনুভব করিতে পারিবে।

গ্রীসের বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধের অবস্থা আফ্রিকার তুলনায় উন্নততর বলা যাইতে পারে। গত একমাসে গ্রীস বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করিতে পারে নাই। একমাত্র তেপেলিনিতে গ্রীক-বাহিনী কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গ্রীকদিগের বিজয় সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ পরিবেশিত হইতেছে বটে, তবে সে সকল স্থানের গুরুত্বও কিছু নাই, বিজয়ও আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। আল্‌বানিয়ায় ইতালীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতালী পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়াও খবর আসিতেছে। তাহা হইলেও গ্রীক-বাহিনী যে সাফল্য লাভ করিতেছে ইহা নিঃসন্দেহ।

উভয় রণক্ষেত্রেই ইতালীর এই শোচনীয় পরাজয় জার্মানীকে বিচলিত করিয়াছে। হিটলার যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ধীর ও সুচিন্তিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ইহা নিঃসন্দেহ। কাইজারের ভুলেই যে গতযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হইয়াছে, ইহা হিটলারের অজানা নয়। সেই জন্যই তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে একসঙ্গে একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইতে অনিচ্ছুক। কাজেই সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের দিকে মনোনিবেশ করিবার অভিপ্রায়ে হিটলার মধ্যপ্রাচীর সম্পূর্ণভার ইতালীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর অকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই জার্মানীকে আজ এইদিকে মনোনিবেশ করিতে হইতেছে। জার্মানী যে সিসিলি অধিকার করিয়াছে, একথা গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জার্মানী কর্ত্তৃক সিসিলি দ্বীপ অধিকারের গুরুত্ব যথেষ্ট। সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যে অবস্থিত প্যান্টেরিলিয়া দ্বীপটি ইতালীর। এই উভয় দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রাংশ দিয়া জাহাজের গমনাগমনের পথ। সুতরাং ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে হইলে সিসিলিকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার প্রয়োজন ও উপযোগিতা যথেষ্ট। গ্রীস অভিমুখে চালিত বৃটিশ জাহাজগুলিকে ঐ পথেই বাধা প্রদান করার সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত ইতালীর সহিত আফ্রিকার যোগাযোগ সাধন করিতে হইলেও ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের নৌশক্তিকে হীনবল করা প্রয়োজন।

বৃটিশের নৌশক্তি যে অজেয় একথা হিটলার ভাল করিয়াই জানেন। সেইজন্যই ফ্রান্সের নৌবহর হস্তগত করিবার চেষ্টা জার্মানীর পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই লাভাল-পেতাঁ ঘটিত সমস্যার সুসমাধানের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, জার্মানী বোধ হয় ফ্রান্সের সহিত এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে চায়। এড্‌মিরাল দার্‌লাঁ অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসী-নৌবহর আত্মসমর্পণ করিবে না। আবার সংবাদে প্রকাশ যে, হিটলার নাকি ভিসি সরকারকে জানাইয়াছেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই জার্মান-ফরাসী সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে হইবে। মার্শাল পেতাঁ স্বরাষ্ট্র-সচিব ও সর্ব্বোচ্চ পরিষদের সদস্যরূপে মঃ লাভালকে ফরাসী মন্ত্রিসভায় গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মঃ লাভাল কর্ত্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মার্শাল পেতাঁকে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের নিমিত্ত মঃ লাভালের পরবর্ত্তী পররাষ্ট্রসচিব মঃ ফ্লাদাঁ পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। জার্মানীর দাবীর ফলেই নাকি মঃ ফ্লাদাঁকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার স্থানে এড্‌মিরাল দার্‌লাঁ পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ফ্রাঙ্কো-ইতালীর সীমান্ত পথে মার্শাল পেতাঁ ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মধ্যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে। মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎকল্পে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইতালী আসিয়াছিলেন। ইতালী নাকি যুদ্ধ বিরতির ইচ্ছা করিতেছে ও বৃটিশের সহিত নাকি সে পৃথকভাবে সন্ধি করিতে চায় বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

মুসোলিনীর পরাজয়ে অনেকের মনে উল্লিখিত সন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিলেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার আছে। ইতালী উভয় রণক্ষেত্রেই যুদ্ধে সুবিধা করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে স্বীয় জয়লাভের নিমিত্ত নিজ নৌবহর যুদ্ধার্থ ব্যবহার করে নাই। ইতালীর নৌবহরের অজেয় শক্তি সম্বন্ধে মুসোলিনী বহুপূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার না করা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরের তৎপরতায় যখন ইতালী-আফ্রিকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম, 'এক্সিস' শক্তির অন্যতম সহযোগীকে সাহায্যের জন্য জার্মানী যখন সিসিলি দ্বীপে ঘাঁটি সংস্থাপন করিল, তখনও ইতালীর নৌবহর রণক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিল কেন? বৃটিশ নৌবহরের শক্তিকে জার্মানী উপেক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই ইতালীর রণপোত-গুলিকে পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না দেওয়ার বাসনা ও মুসোলিনীর সহিত তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা কি জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব? সম্প্রতি ফ্রাঙ্কো-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে। জিব্রাল্টার সম্বন্ধেও সেই সময়ে কোন ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে কি না কে বলিবে? ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরকে দুর্ব্বল করার প্রয়োজন কেন এবং তদুদ্দেশ্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব, সে সম্পর্কে পৌষের 'ভারতবর্ষ'-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বল্কান ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বল্কানে জার্মানীর ব্যাপক সমরায়োজন চলিতেছে। গত জানুয়ারীর শেষ দিকে রুমানিয়ায় আয়রণ-গার্ডের বিপজ্জনক বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু জেনারেল এন্তনেস্কু সৈন্যবিভাগের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করিতে

সক্ষম হওয়ায় উহা ব্যর্থ হয়। কয়েক ডিভিসন জার্মান সৈন্য যে রুমানিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে এ সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই সৈন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে নাই। কারণ রুমানিয়া প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর প্রভুত্বাধীন হইলেও উহা এখনও একটি স্বতন্ত্র দেশরূপে থাকায় অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মানীর হস্তক্ষেপ করা বিপদজনক। কাজেই বিদ্রোহের সময় জার্মান-বাহিনী কয়েকটি সরকারী ভবন অধিকার করা ব্যতীত অধিক কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই। জেনারেল এন্তনেস্কুর প্রাণনাশের আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই। রুমানিয়ার বৃটিশ রাজদূত স্যর রেজিন্যাল্ড হোর পদত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বৃটিশ সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে রুমানিয়াকে শত্রু-অধিকৃত দেশ বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি কনষ্টাঞ্জা বন্দরে পঞ্চাশ হাজার জার্মান সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। কনষ্টাঞ্জা বন্দর হইতে উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় পনের মাইল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসাগরের তীর জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া

ডানার পতন—একটি দুর্গের উপর আক্রমণ—দুর্গ দখলের জন্য সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে

ঘোষণা করা হইয়াছে। রুজলা হইতে মিডিয়ম পর্য্যন্ত এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সাঙ্কেতিক আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সমগ্র রুমানিয়ায় নিষ্প্রদীপের কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাত্রে রাস্তায় ধূমপান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। রেলপথ ও অস্ত্রের কারখানা সকল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে গৃহীত। রুমানিয়া সরকার যে-কোন মুহূর্ত্তে বৃটিশ বিমান আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

রুমানিয়াকে জার্মানীর একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার পশ্চাতে আছে বল্কানে জার্মান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়। বুলগেরিয়ায় জার্মান সৈন্য প্রবেশের সংবাদ গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার সহিতও জার্মানী সহযোগিতা লাভে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কয়েকটি স্থান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে যুগোস্লাভিয়াকে গ্রীসের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে। বুলগেরিয়া অবশ্য তাহার রাজ্যে বৈদেশিক সৈন্যের আগমনের প্রতিবাদ করিয়াছে। এরূপ সংবাদ ও প্রচার করা হইতেছে যে, বল্কানে শান্তি রক্ষায় রুশিয়া আগ্রহান্বিত। প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মঃ সবোলিভ বার্লিনে সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইবার পথে সোফিয়ায় আসিয়াছিলেন। অনেক রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে তিনি রাজা বরিস্‌কে জানাইয়া ছিলেন। সোভিয়েট বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং সে স্বীয় রাজ্যে বিদেশী সৈন্য চালনার অনুমতি প্রদান করিলে সোভিয়েটেরও ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার থাকিবে এবং বল্কান অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করিলে রাইখের নিকট সোভিয়েটের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। কিন্তু এ সংবাদের কোন মূল্য না থাকাই সম্ভব। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ বল্কান অঞ্চলের ব্যাপারে, জার্মানী রুশিয়ার সহিত পূর্ব্ব হইতে কথাবার্ত্তা না চালাইয়া স্বেচ্ছামত কোন কার্য্য করিবে ইহা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু গোল বাধিয়াছে তুরস্ককে লইয়া। বুলগেরিয়ায় সৈন্য প্রবেশ করিলে তুরস্কে নিরাপত্তা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা প্রতি পদে। অথচ এই সময়ে তুরস্ক হঠাৎ বুলগেরিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি করিয়া বসিল। এই চুক্তির সর্ত্তও অভিনব। পররাষ্ট্র আক্রমণ হইতে বিরত থাকার কথা চুক্তির মধ্যে আছে বটে, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক কিরূপ থাকিবে সে বিষয়ে চুক্তিতে কোন উল্লেখ নাই। তবে জার্মানী যে বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নয়, একথা স্পষ্ট। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্রীসের উপর জার্মান বিমান টহল দিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ এককথায় ইতালীর বিরুদ্ধে গ্রীসকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মানী "স্নায়ু-যুদ্ধ" আরম্ভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

তবে ইতালীর দৌর্ব্বল্যহেতু মধ্য প্রাচীতে জার্মানীকে মনোনিবেশ করিতে হইলেও বৃটেনই তাহার প্রধান লক্ষ্য। আগতপ্রায় বসন্ত ও গ্রীষ্মে হিটলার যে প্রবলভাবে বৃটেন আক্রমণ করিবে, অধিকাংশ রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের ইহাই ধারণা। মিঃ আমেরি, মিঃ ইডেন, কর্ণেল মুর প্রভৃতি সকলেই বৃটেন শীঘ্রই আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। মিঃ চার্চিলও তাহার বক্তৃতায় সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ডুঙ্কারকের অবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমানে বৃটেনের প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায়

জানাইয়াছেন যে, সৈন্যের প্রয়োজন বৃটেনের নাই। বৃটেনের প্রয়োজন যুদ্ধসামগ্রী ও উপকরণের। এতদ্ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিঃ উইলকি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া বৃটেনকে যে অনতিবিলম্বে এবং যথাসাধ্য সাহায্য করা প্রয়োজন একথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নৌসচিব কর্নেল নক্সের মত বৃটেনকে নূতন কোন ডেষ্ট্রয়ার দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মিঃ রুজভেল্টের কথা হইতে বোধ হয় যে, বৃটেন ভবিষ্যতে আরও কিছু পাইতে পারে। কর্নেল নক্সের ঘোষণার পরেও বৃটেনকে ৪৩খানি ডেষ্ট্রয়ার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সেগুলি যে কর্নেল নক্সের বিবৃতির মধ্যে পড়ে না, একথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও ৪০খানি ডেষ্ট্রয়ার শীঘ্রই বৃটেনের পাইবার আশা আছে। মিঃ চার্চ্চিল আরও বলিয়াছেন যে, সমুদ্র ও বিমান উভয় স্থানেই আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে বৃটেনে অভিযান চালানো দুঃসাধ্য। হিটলারও যে একথা বোঝেন না তাহা নহে। সেই জন্যই বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণ চলিতে থাকিলেও জার্মানীর সামুদ্রিক তৎপরতা কিছুমাত্র কমে নাই। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হিটলারের সহকারী রুডল্‌ফ্‌ হেস বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সাবমেরিণ যুদ্ধ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বসন্তকালেই আরম্ভ হইবে। জার্মান সাবমেরিণের বিরুদ্ধে বৃটিশ জাহাজ যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না একথা কর্নেল নক্সই বিবৃত করিয়াছেন। মিঃ উইলকি এমন কথাও বলিয়াছেন যে আমেরিকা হইতে ডেষ্ট্রয়ার পাওয়া সত্ত্বেও বৃটেন সম্মুখ ও পশ্চাতে দুইখানি 'কনভয়' জাহাজ রাখিয়া ৪০।৫০খানি বাণিজ্যপোত লইয়া যাতায়াত করিতেছে। গত ১৪ই জুলাই হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাড়ে ছয় মাসে বৃটেনের ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টন বাণিজ্য জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। আর ঐ সময়ের মধ্যে জার্মানীর জাহাজ গিয়াছে ১৩ লক্ষ ৩০হাজার টন এবং ইতালীর গিয়াছে ৬লক্ষ ২৩ হাজার টন। ফ্রান্সের পশ্চিম সমুদ্রোপকূলের ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতে পারায় বৃটেনের বাণিজ্য জাহাজ ক্ষতি করিবার সুবিধা জার্মানী পাইয়াছে যথেষ্ট। তবে আয়র্লণ্ড মধ্যপথে পড়ায় জার্মানীকে কিঞ্চিৎ বাধা স্বীকার করিতে হইতেছে। যে সকল জাহাজ উত্তরের পথে আয়র্লণ্ডের উপর দিয়া আসে সেগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা জার্মানীর পক্ষে কষ্টকর। বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন ক্ষুদ্র শক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। বসন্তের প্রারম্ভে জার্মানীর সামুদ্রিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাইলে আয়র্লণ্ডের দ্বীপগুলি জার্মানীর পক্ষে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা চলিতে পারে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ ডি ভ্যালেরা এক রেডিও বক্তৃতায় যুদ্ধের গতির অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করিয়া ডাবলিন হইতে শিশু ও নারী স্থানান্তরকরণের কথা বলিয়াছেন। সন্তোষজনক ফলের অভাব হইলে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের আভাষও তিনি দিয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই ডাবলিন ও কিংষ্টন্ বন্দরের অধিবাসীদের মধ্যে আড়াই লক্ষ লোক স্থানত্যাগের জন্য নাম লিখাইয়াছে। আগামী বসন্তে বৃটেনে বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে জার্মানীর সামুদ্রিক তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা রাজকীয় বিমান বাহিনীর কার্য্যতৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা রাজকীয় বিমানবাহিনীর কার্য্যতৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৃটেনও যুদ্ধারম্ভকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানে যথেষ্ট অধিক শক্তিশালী হইয়াছে।

বৃটেনকে "অস্ত্র-শস্ত্র ইজারা দেওয়া বা ধার দেওয়া" সংক্রান্ত যে বিলটি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসে পাশ করাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদে তাহা গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে যে সংশোধন প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল, তাহা বিস্তর ভোটাধিক্যে (২০৬-১৪৫) অগ্রাহ্য হইয়া যায়। প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি গৃহীত হইবার সপ্তাহ কাল মধ্যেই সেনেট কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত বিল লইয়া বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। বিলটি গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বিলটি পাশ হইলে বৃটেন কিভাবে লাভবান হইবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যায় হইয়া যাওয়ায় এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচী

থাই-ইন্দোচীনের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিবার মুখে হঠাৎ চাপা পড়িয়াছে। জাপানের মধ্যস্থতায় থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হইয়াছে। প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য এই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হইয়াছিল। পরে আরও দুই সপ্তাহ সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহে ঘোষণার মেয়াদ শেষ হইবে।

এদিকে জাপানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চীন-জাপানে যুদ্ধ চলিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে হংকং-চীন সীমান্তের শাটাউকোং ও শাউইয়ুং নামক দুইটি স্থান জাপসৈন্য দখল করিয়াছে। তামশুই ও শাইউচুং অধিকার করায় কৌলুন ও ক্যাণ্টনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। শাইউচুং ও কৌলুনের মধ্যে জলপথের সংযোগও বন্ধ। কয়েক স্থানে চীনা বাহিনীও জাপানের অগ্রগতিতে বাধা প্রদানে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু চীনের যুদ্ধকে টানিয়া লইয়া চলিবার আগ্রহ আর জাপানের নাই। কিছুদিন আগে প্রিন্স কনোয়ে জানাইয়াছিলেন যে চীন-জাপান যুদ্ধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনিই দায়ী। আবার জাপান নানকিং-এর ওয়াঙ্চিঙ্-ওয়েইর গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিলেও জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুকা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা চুংকিং গবর্ণমেণ্টকেও অস্বীকার করিতে চাহেন না। এই দুই উক্তির যোগসূত্র ও অন্তর্নিহিত অর্থ সুস্পষ্ট। প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহাকে যে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া জাপান আজ চীনের সহিত একটা মিটমাট করিতে ইচ্ছুক।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, ইতালীর দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া জার্মানী জাপানকে যুদ্ধে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে। আগামী বসন্তে যখন বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালিত হইবে সেই সময়ে জাপান যাহাতে ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় আক্রমণ করে, হিটলার তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। রুশিয়ার সহিত একটা আপোষ করিয়া ফেলিবার জন্যও জাপান জার্মানী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছে। মস্কোতে পুনরায় রুশ-জাপান বাণিজ্য আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সমুদ্র-পথেও জাপান বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণাভিমুখে আক্রমণোদ্দেশ্যে জাপান হাইনান দ্বীপে ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরকারী পত্রিকা সেণ্ট্রাল ডেলি নিউজের সংবাদে প্রকাশ যে, হাইনান ব্যতীত সিসাওন্সালী দ্বীপপুঞ্জ, ক্যাণ্টন, ফরাসী ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানে জাপান সৈন্যসমাবেশ করিয়াছে। উহারা নাকি সাইগন ও কামরা উপসাগর দখলের জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই অগ্রগতির কারণের জন্য বৃটেনও আমেরিকাকে দোষী করা হইয়াছে। 'নিচিনিচি সিম্বুন' পত্রিকায় ঘোষিত হইয়াছে যে বৃটেন ও আমেরিকা চুংকিং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিবার নীতি অবলম্বন করিবার পর হইতেই জাপান দ্রুত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপান নৌ বিভাগীয় বিমান পোতের অবিরাম বোমা বর্ষণের ফলে ব্রহ্ম রাজপথ প্রায় বিধ্বস্ত। মেকং নদীর উপরস্থ কুংকুয়ো সেতু ধ্বংস করা হইয়াছে। আশেপাশে ২৫০-খানারও অধিক লরি আটক পড়িয়াছে।

ডার্না আক্রমণের দৃশ্য—কামান হইতে ডার্নার উপর বোমা ফেলা হইতেছে

এদিকে বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক দ্রুতগতিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সিঙ্গাপুর প্রণালীর পূর্ব্বদিকস্থ প্রবেশ-পথে মাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বিমানবহরের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে, বহু অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে। আমেরিকা হইতে আড়াই শত বিমান আসিয়া দলে যোগ দিয়াছে।

তবে জাপানের এই অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিবার কথা আছে। মিঃ চার্চ্চিল অবশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শত্রু ভারতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহার পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু জাপান বেশ ভাল ভাবেই জানে যে, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করার অর্থ বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। চীন-যুদ্ধ হইতে সরিয়া আসা তাহার পক্ষে দুষ্কর। কারণ সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গ চীনকে সাহায্য দ্বারা জাপানকে চীনে নিযুক্ত রাখিতে সচেষ্ট। যদিও বা সে সরিয়া আসে এবং জার্মানীর ন্যায় রুশিয়ার সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে রণনীতি, অর্থ-নীতি, সাম্রাজ্যনীতি প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই তাহাকে ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং লাভালাভের প্রশ্ন তাহার বিশেষরূপে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তর্কের খাতিরে ধরা গেল, যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়, যদি যুদ্ধে জাপান কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে জার্মানী, রুশিয়া প্রভৃতির সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের আশা তাহার বিলীন হইবে। কাজেই সকল অবস্থা হিসাব করিয়া দেখিলে জাপানের ক্ষতির মাত্রাই অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং জার্মানীর চাপে পড়িয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও জাপান বিশেষ সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরে নৌবহর সজ্জিত করিয়া এবং হুমকি দেখাইয়া সে একটা "স্নায়ু-যুদ্ধ" করিতে থাকিবে বলিয়াই বোধ হয়। ফলে বৃটিশ শক্তিকেও এদিকে খানিকটা ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এবং বসন্তকালীন আক্রমণে হিটলার সেই সামান্য সুযোগটুকু গ্রহণের চেষ্টা ব্যতীত অধিক কিছু লাভে সমর্থ হইবে না।

মাইকেল মধুসূদন

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

একে একে গাহি গান বঙ্গের কাননে
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-আদি কবিদল
চলি যবে গেলা স্বর্গপুরে—মুগ্ধপ্রাণ
বিহঙ্গম গাহি গান কান্তার প্লাবিয়া,
আত্মহারা হয় যথা দূর-দূরান্তরে—
তখন কহগো দেবি, অমৃতভাষিণি,
বরি কারে বরপুত্রপদে, পাঠাইলে
অবশেষে এ বঙ্গ-অঙ্গনে ? কহ মাতঃ,
কার কণ্ঠে কোন্ সুর দিয়া, কোন্ ছন্দে,
কোন্ ভাবে, কি আনন্দে বঙ্গে বিপুর্ণিলা ?
বঙ্গে তুমি চিরকৃপাময়ী, তোমার প্রসাদে,
কবিশূন্য হয় নাই বঙ্গ-সিংহাসন।

*

স্বপনে ভ্রমিনু আমি কবিতা-কাননে।
বিরহি-বৈষ্ণব-হৃদে জাগিয়া বেহাগ
থেমে গেল গাহিয়া গাহিয়া। সেই সুর
যতদূরে, তত মৃদু, তত সুমধুর
বিমোহিত করিল হৃদয়। অকস্মাৎ
বজ্রকণ্ঠে উঠিল গর্জিয়া, বজ্রগর্ভ
নবজলধরবর্ণ মেঘনাদ-কবি।
ক্ষণে মুহুর্মুহু ক্ষণপ্রভা-প্রভা জিনি
বীরাঙ্গনাগণ বিমোহিয়া মনঃপ্রাণ
দীপিলা অম্বরে। পবিবরতিল স্বপ্ন।
ভাতিল গগনে তূর্ণ পূর্ণ শশধর
সে কিরণ উদ্ভাসিয়া ব্রজের নগরে
রচিল অপূর্ব মায়া (ইন্দ্রজাল হেন)
স্নেহে, সখ্যে, দাস্যে, প্রেমে পবিত্র সুন্দর।
ত্রিযামা মধ্যম যামে সহসা ধ্বনিল
গভীর, হৃদয়স্পর্শী — ব্রজবধূটির
বিরহের করুণ সঙ্গীত। কোথা গেল
ঘন-গরজন ? সত্যই স্বপন ইহা।

*

নমি তব পদাম্বুজে বৈষ্ণব-খৃস্টান,
মহাকবি মাইকেল শ্রীমধুসূদন !
প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের পুণ্য-যোগবীজ
প্রথম স্থাপিলে তুমি। তুমি গাহিয়াছ
প্রতীচ্যের ছন্দে রচি প্রাচ্যের সঙ্গীত।
পাশ্চাত্য-সুবেশধারী কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ
যোগমগ্ন কাষ্ঠাসনে পুরাণ-চিন্তায়
সৃজিলা কজ্জলবর্ণ অক্ষয় অক্ষরে
জানকীর তপ্ত অশ্রুধারা। সনেটে বন্দিলে
কাশীরাম-কৃত্তিবাসে—পয়ারের কবি।
পাশ্চাত্যের অবয়ব, প্রাচ্যের হৃদয়
এক করি গঠিলে যে কীর্ত্তি সুমন্দির
কৌশলে স্থাপিতে তব প্রাণ-দেবতায়—
হে বৈষ্ণব, তুমি তার প্রথম সেবক,
হে খৃস্টান, তুমি তার আদি
পুরোহিত।

রূপ-সমুদ্র

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সাগরের জলে জেগেছে জোয়ার, রেগে যত ঢেউ উঠিছে ফুলে
বেগে ছুটে তারা ভেঙ্গে লুটে সারা রাঙ্গা দুটি তব চরণমূলে।
তুমি দেখিতেছ ক্ষুব্ধ সাগর, আমি অনিমিখ মুগ্ধ আঁখি—
তব দেহতটে যে জোয়ার লোটে, সেই দিক পানে চাহিয়া থাকি।

* *

ধ্বসে বালু-বেলা, ঢেউয়ের উপরে ঢেউ এসে পড়ে ক্রমান্বয়ে—
তব দেহ-বেলা-নিলয়ে তেমনি বাঁধ-ভাঙ্গা রূপে জোয়ার বহে !
ধ্বসে বসনের ভঙ্গুর বাধা, রূপ-তরঙ্গ উছলি' ওঠে
আভরণ তারে আবরণ দিবে ? সরমে ভূষণ চরণে লোটে।
কাঁকন কাঁদিছে বালুর শয়নে, মেখলা ফেলিছে আঁখির লোর—
লবণ সলিলে সিনান করিয়া মুকুতার মালা কাঁদে অঝোর।
কাঞ্চী, কেয়ূর, সিঁথির ময়ূর, মণি, মরকত, পদ্মরাগ—
কনক, প্রবাল, চুনী ও পান্না, গোমেদ, হীরার মন্দভাগ !
ও বারিধি ঢুঁড়ে কুবেরের পুরে মিলে যে অতুল বস্তু-নিচয়
এই বসুধার ধন-ভাণ্ডার তার কাছে হায় কিছুই নয় !

* *

রত্নধা হ'তে রত্নেশ্বরী, কমলার মত সুলক্ষণা—
বারি-মন্থনে দ্বিতীয়া লক্ষ্মী, ঊর্দ্মি নেহারী অন্যমনা !
এখনো অঙ্গে নীলতরঙ্গ, বীচি-বিভঙ্গে লীলায়মান।
গগন-সুরভী চুম্বন-লোভী মুক্ত পবন প্রবহমান !
এখনো তোমার জাগর-অরুণ ডাগর আঁখিতে সাগর-লীন
বাড়ব-বহ্নি জ্বলিছে তন্বী, তরল বিজলী তন্দ্রাহীন !
পূর্ণিমা চাঁদ আননের ছাঁদ—চূর্ণ অলক চুমিছে সুখে !
শীকর-কণায় যেন সুধাকর লভে সমাদর বারিধি বুকে।

* *

উদাস চাহনি ভেসেছে সুদূরে—নহে ত শুধু এ নীলের মায়া—
তুমি তিলে তিলে গড়িয়া উঠিলে ;—তিলোত্তমাটি লভিলে কায়া !
যেখানে যেটুকু সুষমা ধরে তা দিল যে বিধাতা অধীর হাতে
শেষে বর-তনু সাজালো অতনু আপনি সে কোন্ চাঁদিনী রাতে।
মধুমুখী দেব-সখিরা তখন সুধার ভাণ্ড হরিয়া আনে
চন্দন বনে লুকায়ে গোপনে তুবিল তোমারে অমিয়া-স্নানে !
না হ'লে অমন কমনীয় তনু, রমণীয় রূপ কোথায় পেলে ?
অমরাবতীর দেব-আরতির হেম-দীপ-শিখা মরতে এলে !
নর-অমরার মিলন-মেলার প্রসাদী পুষ্প এনেছ বহি'
ও রূপ-নিলয়ে পশিব কি লয়ে ? অহরহ তাই বিরহ সহি !
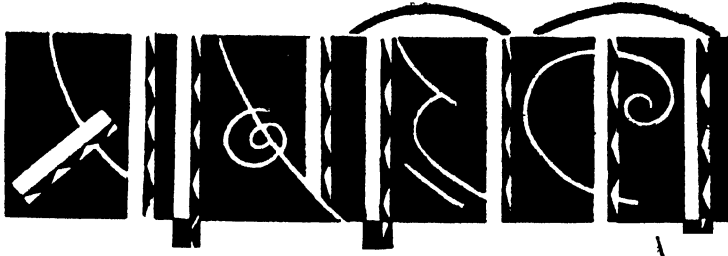
এলাহাবাদে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

সম্প্রতি এলাহাবাদ হিমি হলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার পণ্ডিত অমরনাথ ঝা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন যে উহা একটি সার্ব্বজনীন ভাষা এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের নিকট অনেক বিষয় ঋণী। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন যে বাঙ্গালীরা যদি সত্যসত্যই ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদিগকে অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে। আদান প্রদানেই ভাষার সমৃদ্ধি সাধিত হয়; সুতরাং যে ব্যক্তি অপরের ভাষা জানে না সে নিজের ভাষাও জানিতে পারে না। বাঙ্গালার বাহিরে এই ধরণের সম্মিলনের সার্থকতা অনেক বেশী ইহা বলাই বাহুল্য।

মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৭ই ও ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার ২৮শ বার্ষিক অধিবেশন মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরগৃহে প্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের মধ্যে আলোচনা হয় এবং মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত উভয়ের আলোচনার সম্পর্কে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন উপলক্ষে একটি শিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মেদিনীপুরের শিল্প সম্ভাবনার বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন; পরে 'মানুষের জয়যাত্রা' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সংযোগে আর একটি বক্তৃতায় তিনি আদিমানব হইতে বর্ত্তমান সভ্যতার পরিণতি ও বর্ত্তমান যুদ্ধ পর্য্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা দেন। আমরা মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের এই বার্ষিক উৎসবের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বীরভূমে সাহিত্য সম্মেলন—

বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে গত ১১ই ফাল্গুন বীরভূম জেলা-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন এবং ১২ই ফাল্গুন চণ্ডীদাস সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জেলা সাহিত্য সম্মিলনে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মূল-সভাপতির, শ্রীযুত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যশাখার সভাপতির ও শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ইতিহাসশাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন চণ্ডীদাস সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্থানীয় সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় প্রতি বৎসরই বীরভূমে জেলা সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া থাকে। এবার চণ্ডীদাস সাহিত্য সম্মিলনে স্থির হইয়াছে, চণ্ডীদাস স্মৃতি-পূজা কমিটী চণ্ডীদাসের ভিটা ও বিশালাক্ষী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ খনন করাইয়া অভ্যন্তরস্থিত সম্পদের সন্ধান ও উদ্ধার করিবেন। সম্মিলনে রায় বাহাদুর শ্রীযুত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব—

গত ২৭শে মাঘ রবিবার নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণলেখক মহাকবি কৃত্তিবাসের বার্ষিক স্মরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। গত প্রায় ২০ বৎসর

কাল তথায় ঐ উৎসব সম্পন্ন হইতেছে এবং গত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতার বহু লোক ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গমন করিয়া থাকেন। যাহাতে ঐ সময়ে তথায় একটি মেলা হয়, সেজন্যও উদ্যোগ আয়োজনের কথা হইতেছে বটে কিন্তু এখনও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এবার ভারতবর্ষসম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ রামায়ণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতি, রাণাঘাট সাহিত্য সংসদ প্রভৃতির যত্নেই উৎসবটি দিন দিন জনপ্রিয় ও বড় হইয়া উঠিতেছে।

আচার্য্য জয়ন্তী প্রদর্শনী—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের ৮০ বৎসর বয়স হওয়ায় যে জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হইতেছে তৎসম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়াম হইতে একটি 'কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। সে জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর বি-সি-গুহকে সভাপতি করিয়া একটি প্রদর্শনী বোর্ডও গঠন করা হইয়াছে। আচার্য্য রায় সারা জীবন ধরিয়া যে কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল শিল্পের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ তাঁহার জয়ন্তী উৎসবে সেই শিল্পের ইতিহাস, বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের কথা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করাই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত্নের ও চেষ্টার অভাব হইবে না।

ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়ব্যয়ের যে হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৯৪০-৪১ সালে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অধিক হইবে। কাজেই ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশলাইএর উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া দেড় কোটি টাকা, নকল রেশম ও রেশমী সুতার উপর শুল্ক বাড়াইয়া ৩৫ লক্ষ টাকা ও টায়ার টিউবের শুল্ক বাড়াইয়া ৩৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবেন। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত লাভ-কর বাড়াইয়া এবং আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর কেন্দ্রীয় সারচার্জ বাড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। কিন্তু তাহাতেই কুলাইবে না—কাজেই বাকী টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিবেন। যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। কাজেই এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের এইরূপ অসাধারণ ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহা সত্বেও যাহাতে সাধারণ প্রজার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অবহিত থাকা উচিত।

পুরীধামে দোলযাত্রা—

এ বৎসর দোলযাত্রার দিন সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় পুরীধামে সমুদ্র স্নানের জন্য বহু হিন্দু যাত্রী সমবেত হইবেন। একসঙ্গে জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা দর্শন ও গ্রহণে সমুদ্র-স্নানের সুযোগ সহজে মিলে না। পুরী যাত্রীদের জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলও নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

কমলা নেহরু হাসপাতাল—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী এলাহাবাদে কমলা নেহরু প্রসূতি হাসপাতালের উদ্বোধন করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালের সহধর্ম্মিণী কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা এই হাসপাতাল খোলা হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অসুস্থ শরীর লইয়াও ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

প্রবর্ত্তক জুট মিলের উদ্বোধন—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ২৪পরগণার বেলঘরিয়া গ্রামে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক গঠিত প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ

মহতাব বাহাদুর উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে সেদিন কয়েক শত গণ্যমান্য লোক বেলঘরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। প্রবর্ত্তক সংঘের বহুমুখী কার্য্য-পদ্ধতির কথা এখন বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত। তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাই সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের এই পাটকলও বাঙ্গালা দেশের সুনাম বৃদ্ধি করিবে।

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট—

এবার বাঙ্গালা সরকারের অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র নূতনত্ব ত নাই, উপরন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারেও আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে ; ফলে এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশবাসীর উপর নূতন কর বসাইবার কথা জানানো হইয়াছে। গতবারে যখন বাজেট পেশ করা হয় সেই সময় ১৯৩৯-৪০ সালের রাজস্বের খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষের দিকে আয়ের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে ২৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়ায় এবং ব্যয় ৪৫ লক্ষ কমিয়া যাওয়ায় এই বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতির বদলে ৬০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা বাঁচিযাছে এবং ১০ লক্ষ টাকা জেলাবোর্ড ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা রহিয়াছে। কাজেই এই বৎসর বাঙ্গালা সরকারের আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া মাত্র ৮ লক্ষ টাকা বাঁচিয়াছে বলা যায়। ১৯৪০-৪১ সালে রাজস্বের হিসাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং মূলধন খাতে আয়ের তুলনায় ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া গত বৎসর বাজেট পেশ করিবার সময় বলা হইয়াছিল। কিন্তু গত নয়-দশ মাসের হিসাব অনুযায়ী অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। তবে মূলধন খাতে এ বৎসর ৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। অবশ্য এই ৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, চলতি বৎসরে রাজস্ব খাতে ঘাটতি এবং মূলধন খাতে উদ্বৃত্ত—এই দুই মিলিয়া সরকারের তহবিলে ২৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। আগামী বৎসর সরকারের রাজস্বের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। ঐ বৎসর রাজস্বের খাতে সরকারের মোট আয় ১৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। মূলধন খাতেও ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। কাজেই উভয় দফায় মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে সরকারের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে ঘাটতি বাবদ যদি ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা চলিয়া যায় তাহা হইলে আগামী বৎসরের শেষে সরকারের হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। যাহাদিগকে বৎসরে রাজস্ব ও মূলধন—এই দুই খাতে সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয় তাহাদের পক্ষে হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ করা একরূপ অসম্ভব। মন্ত্রী মহাশয় এই অবস্থার প্রতীকার কল্পে প্রস্তাবিত বিক্রয় করের দিকে তাকাইয়াছেন। বিলটি কি ভাবে গৃহীত হইবে এবং তাহাতে কত টাকা সরকারের ব্যয় হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে মন্ত্রী মহাশয় আশা করেন যে, এক এই বিলের দৌলতেই আগামী বৎসরের ঘাটতি পূরণ করিয়া জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য সরকারের পক্ষে অধিকতর অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, বিক্রয় করই দেশের উপর সর্ব্বশেষ ট্যাক্স নহে এবং অবিলম্বেই নূতন কর ধার্য্য করা হইবে। অথচ যে যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ঘাটতি মিটাইবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডল ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপাইয়া চলিয়াছেন তাহাও যে শীঘ্র মিটিবার নহে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের কীর্ত্তিকাহিনী—

বিহারের বাঙ্গালী সমিতির পক্ষ হইতে বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের অতীত ও বর্ত্তমান কীর্ত্তিকাহিনীর বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। এই তথ্যসংগ্রহের মূলসূত্র হইবে—প্রবাসী বাঙ্গালীরা প্রবাসের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কতটুকু করিয়াছেন তাহার পরিচয় প্রদর্শন। এইগুলি পরে যথাযথভাবে সম্পাদনা করিয়া ধারাবাহিকভাবে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত

হইবে। বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা ইহাতে সন্নিবেশ করিবার সংকল্প আছে। এই সঙ্কলন-প্রচেষ্টা মুখ্যত বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধীয় হইলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী সমাজের আলেখ্য সংগ্রহেও সমিতি সচেষ্ট থাকিবেন। এইরূপ বিবরণী গৃহীত হইলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আরব্ধ 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতি' সঙ্কলনও সহজতর হইবে—এজন্য আশা করা যায় যে এই প্রচেষ্টায় সকলেরই সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। তথ্যাদি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার (সম্পাদক, বেহার হেরাল্ড ও প্রভাতী), "পাটলিপুত্র" কদমকুয়া, পাটনা—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য মক্তব—

সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, গত ১৯৩৮ সালের পর হইতে মক্তবের হিন্দু ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৩২ হাজার ১ শত ৪৯ জন হিন্দু ছাত্র মক্তবে পড়াশুনা করিত। ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৭৪ হাজার ৫ শত ৬ জন হইয়াছে। রঙ্গপুর জেলায় ১৯৩৮ সালে মক্তবে-পড়া হিন্দু-ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯ শত ৬০ জন, কিন্তু ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া ১৫ হাজার ৬ শত ৯০ জন হইয়াছে। বলাবাহুল্য এতগুলি হিন্দু ছাত্র স্বেচ্ছায় মক্তবে পড়িতে যায় নাই, অন্য স্কুলের ব্যবস্থা নাই বলিয়াই মক্তবের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। পাকে চক্রে বাঙ্গালার সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতিকেই মুসলমানভাবাপন্ন করিবার নীতি বাঙ্গালার মন্ত্রীরা যে গ্রহণ করিয়াছেন—এবারকার বাজেটে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতের দিকেই হিন্দুদের তাকাইয়া থাকিতে হইবে, বর্ত্তমান মন্ত্রীদের হাতে ইহা অপেক্ষা অন্য ব্যবস্থা আশা করা যায় না।

বার্ষিক ব্রতাচারী সম্মেলন—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতার নিকটস্থ বেহালায় ব্রতাচারী গ্রামে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী কাসিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে ব্রতাচারী আন্দোলনের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব ও ব্রতাচারী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সকলকে ঐ দিন ব্রতাচারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার বক্তৃতায় গ্রামোন্নতি কার্য্যে ব্রতাচারীদের কর্ত্তব্যের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক প্রদর্শনী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি স্থায়ী ভৌগোলিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ প্রদর্শনীতে প্রয়োজনীয় মানচিত্র, চার্ট, ছবি প্রভৃতি দেখান হইয়াছে। গত ৩০ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা ছিল না—এখন সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। সে জন্য সকল প্রকার আসবাবপত্র একত্র করিয়া এই প্রদর্শনী খোলা হইল। ম্যাট্রিকুলেসন, আই-এ ও বি-এ তে এখন ভূগোল পড়ান হয় এবং ভূগোল শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষারও পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিকের শোচনীয় মৃত্যু—

কানাডার পৃথিবীবিখ্যাত চিকিৎসক স্যর ফ্রেডারিক ব্যান্টিং বিমান দুর্ঘটনায় সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র পঞ্চাশ বৎসর। ১৯২২ সালে তিনি বহুমূত্র রোগের 'ইন্সুলিন' নামে একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। ১৯২৩ সালে তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য তিনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই সব মানব-হিতৈষীর অকালমৃত্যু জগতের ক্ষতির কারণ।

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়—

আমরা জানিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক হুগলী তেলিনীপাড়া নিবাসী ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার তেলিনীপাড়াস্থ ভবনে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুবার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের প্রধান

অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন—কিন্তু ১১ বৎসর ঐ কাজ করার পর ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ঐ পদে তাঁহার দাবী উপেক্ষা করায় তিনি পদত্যাগ

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডের ডি-ও, লণ্ডনের ডি ও-এম-এস, এডিনবরার এফ-আর-সি-এস এবং বাঙ্গালার এফ-এস-এম-এফ উপাধিধারী ছিলেন। তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজেরও চক্ষুচিকিৎসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সদস্য ছিলেন এবং ফাইনাল এম-বি পরীক্ষার ও বেঙ্গল ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্‌টীর পরীক্ষক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কায়রো সহরে যে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক চক্ষুচিকিৎসক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সুশীলবাবু ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাইয়া জুরিচ, ভিয়েনা ও উটরেক্টের চক্ষুচিকিৎসা কেন্দ্রগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে অন্ধতা নিবারণের জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং অন্ধতা নিবারণ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। চিকিৎসা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা স্থানের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র—

রাজসাহীর প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র ব্লাড প্রেসার রোগে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরেন্দ্রমোহন প্রথম যৌবনেই কংগ্রেস ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ একনিষ্ঠভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। একাধিকবার তিনি কারাবরণও করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অশেষ ক্ষতি হইল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কার, সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিদাস মুখোপাধ্যায়—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ভোরে (শনিবার রাত্রি শেষ) ২৪পরগণা কামারহাটী নিবাসী হরিদাস মুখোপাধ্যায়

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। হরিদাসবাবু বহু বৎসর

কামারহাটী মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, কিছুকাল উহার চেয়ারম্যান ও বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি সর্ব্বদা নানা জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি কামারহাটী ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় নূতন টাঁকশাল—

আলীপুর অঞ্চলে শীঘ্রই একটি টাঁকশাল তৈয়ারি হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশে মুদ্রার চাহিদা অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার জন্য বর্ত্তমানে বোম্বাই ও কলিকাতায় টাঁকশালে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় টাঁকশাল সম্প্রসারণের এই ব্যবস্থা হইতেছে। নূতন টাঁকশালটির নির্ম্মাণে ৬২ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে। প্রথমে এই নূতন টাঁকশালে কেবলমাত্র রৌপ্য মুদ্রাই প্রস্তত হইবে। স্বাভাবিকভাবে কাজ চলিলে দিনে ৬ লক্ষ করিয়া মুদ্রা প্রস্তত হইতে পারিবে এবং পূর্ণোদ্যমে অতিরিক্ত সময় কাজ চালাইলে দিনে প্রায় ১২ লক্ষ মুদ্রা তৈয়ারি করা চলিবে। স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিলেই কলিকাতার পুরানো টাঁকশালটি বন্ধ করিয়া নবনির্ম্মিত বাড়ীতে টাঁকশাল তুলিয়া লইয়া গিয়া নিকেলের ও ব্রোঞ্জের মুদ্রা তৈয়ারির ব্যবস্থা করা হইবে। সরকার অনুমান করেন যে বর্ত্তমান টাঁকশালটি যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে যে পরিমাণ জমি আছে তাহা বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

পরলোকে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু—

বিগত স্বদেশী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও প্রবীণ সাংবাদিক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু গত ২৮শে মাঘ অকালে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও বাগ্মিতার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছিল। সেই সময় যে নয়জন জননেতাকে সরকার তিন আইনে আটক করেন শচীন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদের একজন ও সর্ব্বকনিষ্ঠ। পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিন্ন হয় এবং তিনি উদারনৈতিক মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল অসীম। দীর্ঘকাল তিনি 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' নামক মাসিক পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা তাঁহার পত্নী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু ও অন্যান্য পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা সরকারের অমিতব্যয়িতা—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ যখন সিভিলিয়ানী শাসনের অধীন ছিল তখন দেশের রাজস্ব লইয়া দেশের সিভিলিয়ানগণ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে যে নূতন শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি-স্থানীয় মন্ত্রিমণ্ডলের উপর প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৮৫ ভাগ তাঁহাদের ইচ্ছামত ব্যয় করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ফলে দেশবাসী স্বতই মনে করিয়াছিল যে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে দেশের শাসকরূপে মন্ত্রীরা যথাসম্ভব কম পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন এবং দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থের অন্তত শতকরা ৮৫ ভাগের প্রত্যেকটি পয়সা দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যয়িত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন-সাধারণের আশা-ভরসা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। মন্ত্রীরা নিজেরা কোন স্বার্থত্যাগে রাজী ত হনই নাই, উপরন্তু দেশ-বাসীর প্রদত্ত অর্থের যাহাতে সদ্ব্যয় হয় সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, নূতন শাসনতন্ত্রে শাসনকার্য্যের ব্যয় এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ইতিমধ্যেই দেশবাসীর উপর নূতন কর বসিয়াছে এবং আরও যে অনেক কর বসিবে তাহার লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেশবাসীর মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হইতে সিভিলিয়ানী শাসন অনেক ভাল ছিল। অথচ ইহার জন্য ইংরেজকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে না; কেন না দেশ এখন শাসন করিতেছে আসলে দেশবাসীরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা। তাঁহারা যদি হঠাৎ রাজশক্তি পাইয়া অমিতব্যয়ী হন—তাহার জন্য দোষ দিতে হইলে দেশবাসীর নির্ব্বাচনকেই দিতে হয়। বাঙ্গালা সরকারের বাজেট আলোচনা করিতে গেলে এই কথাই মনে হয়। বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রীরা যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন ঠিক

তাহার আগের বৎসর (১৯৩৬-৩৭) রাজস্বের হিসাবে বাঙ্গালার আয় ছিল ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। মন্ত্রীদের আমলে রাজস্বের আয় অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে	১২ কোটি	১৪ লক্ষ		
১৯৩৭-৩৮ „	১৩ „			
১৯৩৮-৩৯ „	১২ „	৭৬ „		
১৯৩৯-৪০ „	১৪ „	৩১ „		
১৯৪০-৪১ „	১৩ „	৮২ „		

কাজেই দেখা যাইতেছে যে গত চার বৎসরে পূর্ব্ব-শাসনের তুলনায় মন্ত্রীদের হাতে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আমদানি হইয়াছে। তাহা ছাড়া সিভিলিয়ানী আমলে ঋণের সুদ বাবদ বৎসরে গড়ে ১৮ লক্ষ টাকা দিতে হইত, বর্ত্তমানে সেই সুদও মকুব করা হইয়াছে; এই দিক দিয়াও ৪ বৎসরে ৭২ লক্ষ খরচ বাঁচিয়াছে। ইহা ছাড়া সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য সরকার বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন; কিন্তু মন্ত্রীদের আমলে তাহাও ব্যয়িত হয় বলিয়া শুনি নাই। ফলে এই চারি বৎসরে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ভার কমিয়াছে। মোট ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থলাভ হইয়াছে। এত বেশী টাকা পাইয়াও তাঁহারা বাঙ্গালার দুঃখ এতটুকু কমাইতে পারিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই; বরং অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া রোগ-শোক-অভাব অনাটন-ঋণভার পীড়িত জনগণকে আরও অতিরিক্ত ট্যাক্সের ভারে প্রপীড়িত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয়—

রেলওয়ে বোর্ডের গত ১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় সমস্ত খরচ বাদ মোট ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং এই টাকাটা ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সরকারী রেলপথগুলির মোট আয় হইয়াছে ৯৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। সাধারণ কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও ব্যয়ের হার আগের বৎসরের শতকরা ৫৩.১ স্থলে আলোচ্য বৎসর ইহা শতকরা ৫২.০০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। যাত্রীদের ভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ আগের বৎসরের ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া গিয়া ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। মালের ভাড়া বাবদ আয় ৭০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এত আয় সত্ত্বেও ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখের এতটুকু লাঘব করার দিকে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের কিছুমাত্র প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়।

বাজিতপুরে হিন্দু সম্মেলন—

সম্প্রতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর সেবাশ্রমে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বিরাট হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী যোগদান করিয়াছিল। তথায় হিন্দু জনসাধারণকে বর্ত্তমান আদমসুমারী কার্য্যে হিন্দুর সংখ্যা

বাজিতপুর হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি
শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যথাযথ লিপিবদ্ধ যাহাতে হয় তাহাতে সহায়তা করিতে অনুরোধ, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে জোর সংগঠন কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মা নিবারণ সম্মেলন—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা কলেজ-স্কোয়ার মহাবোধী সোসাইটী হলে কবিরাজ শ্রীযুত যদুনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মা নিবারণ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এক বক্তৃতায় এদেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যে সত্বর যক্ষ্মারোগীর উপকার হইতে পারে সে বিষয়টি সভাপতি মহাশয়ও সকলকে বুঝাইয়া দেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও যে

কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

দেশে যক্ষ্মা রোগের বিস্তৃতি দেখিয়া তাহা নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই।

জাপ-ভারত বাণিজ্য—

জাপান হইতে ইদানীং ভারতে আমদানির পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় এবং সেই তুলনায় জাপান ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয় না করায় তাহার প্রতীকারের জন্য ভারত সরকার এদেশে জাপানী মালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিবেন বলিয়া একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে জাপান হইতে ভারতে ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানি হয় এবং ভারত হইতে জাপানে ৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি হয়। কাজেই গত বৎসর জাপান এ দেশে যত টাকার পণ্য বিক্রয় করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার কম পণ্য এদেশ হইতে ক্রয় করে। এবার এই নয় মাসে জাপান হইতে ভারতে আমদানির পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা এবং ভারত হইতে জাপানে রপ্তানির পরিমাণ ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই এবার জাপান ভারতে যত টাকার পণ্য বেচিয়াছে তাহার তুলনায় ৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার কম পণ্য ক্রয় করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারাই হোক বা মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়াই হোক, জাপান হইতে ভারতে আমদানির পরিমাণ কমানো আবশ্যক। ইহার ফলে আর যাহাই হোক, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে অনেকটা রক্ষা পাইবে।

ডাক ও তার বিভাগের কার্য্যবিবরণ—

ভারত সরকারের তার ও ডাক বিভাগের গত বর্ষের (১৯৩৯-৪০) কার্য্যবিবরণে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনে ভারতে মোট এক লক্ষ আটান্ন হাজার মাইল ব্যাপী ডাক চলাচল হয়। আগের বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল এক হাজার মাইল কম। বিমান-ডাক চলাচল এই হিসাবে ধরা হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ডাকটিকিট বিক্রয় হইয়াছে। আগের বৎসরের তুলনায় ইহা ৩২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা অধিক। সার্ভিস স্ট্যাম্প বিক্রয়ের পরিমাণ আগের বৎসরের অপেক্ষা ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বাড়িয়া এ বৎসরে তাহা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত শহর ও পল্লী অঞ্চলে মোট ২৪ হাজার ৭৪১টি ডাকঘর ছিল। আগের বৎসরে ঐ সময় ইহার সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ৩০৫টি। শহর ও পল্লী অঞ্চলে চিঠির বাক্সের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৪৭৪টি। আগের বৎসরে ছিল ৫২ হাজার ৮৫১টি। গত ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত ভারতে ১১১৬টি ডাকঘর পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হইতেছিল। এই সালে আরও ৪১৯টি নূতন ডাকঘর খোলা হয়। এই ১৫৩৫টি নূতন ডাকঘরের মধ্যে শহর অঞ্চলে ২০টি এবং পল্লী অঞ্চলে ৪৭২টি স্থায়ী ডাকঘর বলিয়া গণ্য হয়। ৭৯টি ডাকঘর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ৯৬৪টি পরীক্ষামূলকভাবেই বজায় রাখা হয়। এ বৎসরে ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার চিঠিপত্রাদি ডেট-লেটার আপিসে প্রেরিত হয়; আগের বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৫৭ লক্ষ ৩৩ হাজার।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটের আন্তকলেজীয় ১৬ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব—স্কটিশচার্চ কলেজের নিতাই বসাক (ছবির নীচের দিকে বামদিক হইতে দ্বিতীয়) প্রথম কে-সি-শীল (নীচে বামদিকে প্রথম) দ্বিতীয় ও ডি-মেক্সিস (নীচে দক্ষিণদিকে) তৃতীয় হইয়াছেন

ডক্টর রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা—মধ্যে মালা গলায় বিচারপতি পাল, তাঁহার দক্ষিণে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও বামে বিচারপতি রূপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
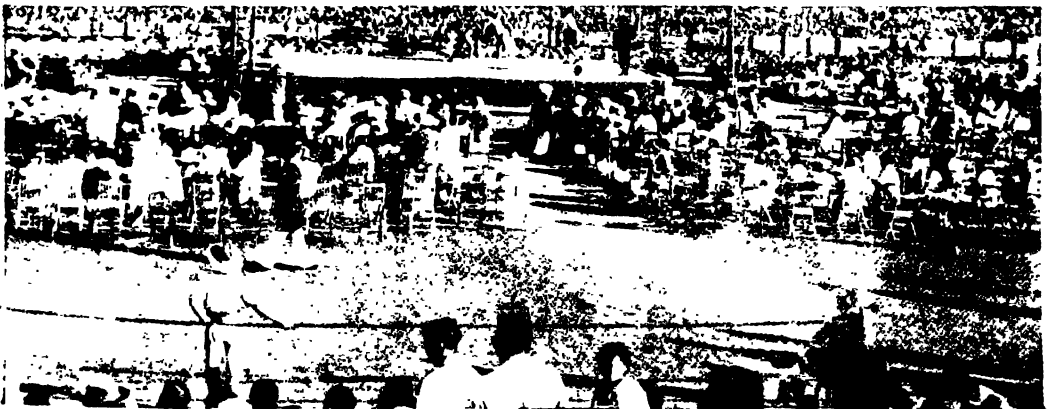
গড়েরমাঠে ক্যালকাটা ফুটবল গ্রাউণ্ডে কুস্তী কার্নিভালের দৃশ্য

এলাহাবাদে নিখিলভারত ফটো প্রতিযোগিতা

প্রথম—এন, সি, চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয়—দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

তৃতীয়—শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ

চতুর্থ—শ্রীমতী ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-প্রচেষ্টা ও মূলধন সমস্যা—

বাঙ্গালায় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচা মাল, শিল্প-জাত দ্রব্যের চাহিদা, শিল্প কারখানায় কাজ করিবার

চট্টগ্রামে নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দারুমূর্তি

উপযোগী শ্রমিক—কিছুরই অভাব নাই। এই সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে এখানে শিল্পের বিশেষ প্রসার হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ—মূলধনসংগ্রহের সমস্যা। যাঁহাদের হাতে টাকা আছে তাঁহারা সেই টাকা শিল্প ব্যবসায়ে খাটানো অপেক্ষা কোম্পানীর কাগজ বা ব্যাঙ্কের সুদের উপরই নির্ভর করেন বেশী। ফলে টাকার অভাবে এদেশে নূতন কোন শিল্প ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে না। শুধু তাহাই নহে, যাঁহারা ইতিমধ্যেই শিল্প কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা আরও অতিরিক্ত মূলধনের সুবিধা না থাকায় তাহার প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতি সাধন করিতে পারিতেছেন না। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উপযুক্তসংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন দরকার। আমাদের বিশ্বাস, কেরাণী বাঙ্গালীর অপেক্ষা বিত্তশালী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর দৃষ্টি এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে অধিক নিয়োজিত হইয়া দেশের মহোপকার সাধন করিবে।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা—

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে যুদ্ধের জন্য জাহাজ-গুলিকে সরকারী প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। তাই ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউলের আমদানির পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইয়া চাউলের মূল্য বাড়িতে পারে। হইয়াছেও তাহাই। তবে এ অবস্থাটা সাময়িক বলিয়াই সরকারের ধারণা; কাজেই কিছুকালের মধ্যেই ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানি সম্ভবপর হইবে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডেই যুদ্ধের বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে এবং তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে চাউলের আমদানি অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে ব্যবসায়ীরা যে এই সুযোগে চাউলের দাম বাড়াইয়া দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া দরকার; বাঙ্গালা সরকার পণ্যদ্রব্য-মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি এই বিষয়ে কি করিতেছেন?

ফাঁকিবাজির চরম—

কিছু দিন আগে পাট কেনা-বেচা সম্পর্কে দিল্লীতে বাঙ্গালা সরকার ও চটকল সমিতির যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা যে পাটচাষীর সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ফাঁকিবাজী, তাহা দিন দিনই স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। ঐ চুক্তির সর্ত্ত ছিল, গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক মাসে চটকলগুলি ১৫ লক্ষ বেল এবং ইহার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এক মাসে ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। তবে যদি চটকলগুলি এই পরিমাণ পাট কিনিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা সরকার

চট্টগ্রামে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রয়োজনানুরূপ পাট কিনিয়া কৃষকের পক্ষে উক্ত পরিমাণ পাট-বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিবেন; উক্ত চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী

চটকলগুলি গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ বেলের বদলে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৪৫ বেল পাট ক্রয় করে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার ঐ তারিখের মধ্যে বাকি ১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৫৫ বেল পাট কিনিয়া ১৫ লক্ষ বেল পূরণ করিয়া দেন নাই। ইহার পরবর্ত্তী একমাস শেষ হইল; যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই এক মাসে—অর্থাৎ—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত চটকলগুলি ১০ লক্ষ বেলের পরিবর্ত্তে মাত্র পাঁচ-ছয় লক্ষ বেলের বেশী পাট কেনেন নাই। কাজেই
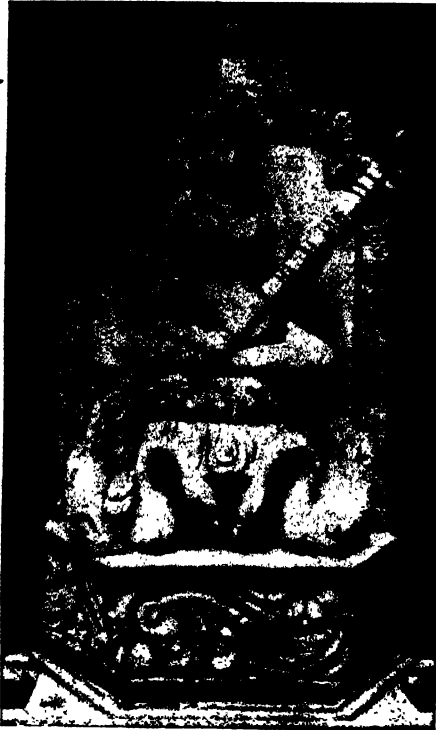
কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সরস্বতী মূর্ত্তি—স্কুলের মডেলিং ক্লাসের ছাত্র কেশবলাল ভৌমিক নির্ম্মিত

চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী এই সময়ে বাঙ্গালা সরকারের চার-পাঁচ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু প্রথম মাসের ন্যায় দ্বিতীয় মাসেও বাঙ্গালা সরকার এক তোলা পাটও কেনেন নাই। সরকারের যখন পাট কেনার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই তখন দিল্লীতে এই ধরণের একটা চুক্তি করিয়া কৃষককে স্তোক দিলেন কেন? এই চুক্তির পর দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা মফঃস্বলে কৃষকদের অল্প দামে পাট বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া বেড়াইয়াছেন। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী দুই পক্ষই কৃষকদের নিরাশ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহার ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দর প্রতি বেলে ৫টাকা কমিয়া গিয়াছে এবং মফঃস্বলেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। মন্ত্রীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কৃষককে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল তাহা পূরণ করিবে কে?

তাঁতশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা—

ভারতের তাঁতশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য যে কমিটি কিছুদিন আগে গঠিত হইয়াছে, শোনা গেল তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সন্তোষের মহারাজকুমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী পরিকল্পিত দক্ষিণ কলিকাতার সুবৃহৎ স্বর্ণ সরস্বতী—পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান

ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁতিদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁত শিল্প একেবারে সমূলে নষ্ট হয় নাই। এখনও ভারতের বস্ত্রের মোট চাহিদার প্রায় এক চতুর্থাংশ গ্রাম্য তাঁতিরাই সরবরাহ করিয়া থাকে। তাঁতিদের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা ঘটায় কাপড়ের কলগুলি। বেশীর ভাগ কাপড়ের কল সুতাও কেনে এবং সুতার দাম ইহারা এমনভাবে বাঁধিয়া রাখে—যাহাতে তাঁতের কাপড়ের দর কলের কাপড়ের দর অপেক্ষা খুব বেশী নীচে নামিতে না পারে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষও সুতা চালান দেওয়ার সময় তাঁতিদের সুবিধা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। এইসব কারণে দরিদ্র ঋণভারগ্রস্ত মূলধন-

হান তাঁতিকে তাঁত শিল্প যে কত কষ্টে বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এই কমিটির রিপোর্টের জন্ম সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাঙ্গালায় শিশুমৃত্যু—

গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গালায় মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৯২৩টি শিশু জন্মিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭৪ জন জন্মিবার একমাস কাল মধ্যে, ৮১ হাজার ৬৪০ জন জন্মিবার ছয়মাস মধ্যে ও ৪৪ হাজার ৮০৯ জন ছয়মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে হাজার-করা ১৭৬২ জন শিশু ঐভাবে জন্মিবার পর প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া হাজার করা ১৮৪.৭ জন দাঁড়াইয়াছে।

রাজা জানকীনাথ রায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ঢাকা ভাগ্যকুলের রাজা জানকীনাথ রায় সম্প্রতি ৯৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং গত ৮০ বৎসর কাল নানাপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ৺শ্রীনাথ রায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর ৺সীতানাথ রায়ের সহিত একযোগে লবণ, চাউল ও পাটের ব্যবসা করিয়া তাঁহারা প্রথমে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবেঙ্গল রিভার ষ্টিম সার্ভিস লিমিটেড বাঙ্গালীর জাহাজের ব্যবসার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ নামে পাটের কল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্প্রতি ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কও তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতার জন্ম রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতির সহিত রায়েরা যে 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স' প্রতিষ্ঠা
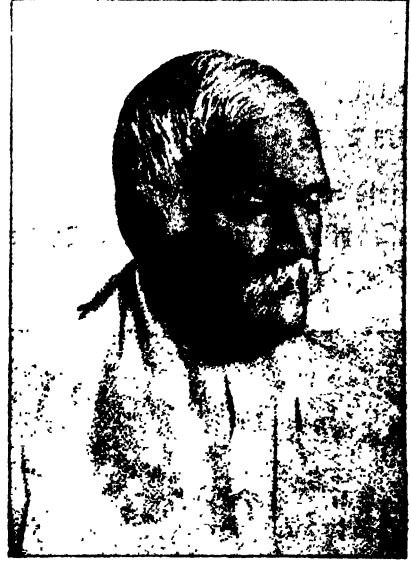
রাজা জানকীনাথ রায়

করিয়াছিলেন, আজ তাহা দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। রাজা জানকীনাথের তিন পুত্রের মধ্যে দুইজন যোগেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রণজি ট্রফি সেমিফাইনাল ঃ

মহারাষ্ট্র ঃ—৭৯৮

উত্তর ভারত ঃ—৪৪২

মহারাষ্ট্র ৩৫৬ রানে জয়ী হ'য়েছে।

রণজি ট্রফি সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্র উত্তর ভারতের কাছে বিপুল রানে জয়ী হ'য়েছে। শুধু সেমিফাইনালেই নয় এবারের রণজি ট্রফির প্রতি ম্যাচেই মহারাষ্ট্রের বিপুল রানসংখ্যা অপর পক্ষের খেলাকে ম্লান ক'রেছে এবং প্রতিবারই ভারতের ক্রিকেটে নূতন নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন প্রদেশ ব্যাটিংয়ে প্রতি ম্যাচে এরূপ ক্রমোন্নতি দেখাতে পারেনি আর পারবে ব'লে মনেও হয় না। অথচ টীমে একটিও টেষ্ট খেলোয়াড় নেই। দলের একমাত্র প্রবীণ খেলোয়াড় দেওধর ৫০ বৎসর বয়সেও এখনো তরুণের মতই শক্তি রাখেন। তাঁর অধিনায়কত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। অন্ততঃ পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান এঁদের টীমে আছেন যাঁরা প্রত্যেকেই অল-ইণ্ডিয়া টীমে স্থান পাবার যোগ্য। একটি

ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট লীগ বিজয়ী বিদ্যাসাগর কলেজ টীম ফটো—জে কে সান্যাল

প্রদেশের পক্ষে এটি যে কত বড় গৌরবের কথা তা সকল ক্রীড়ামোদীই জানেন।

উত্তর ভারতের সঙ্গে খেলায় মহারাষ্ট্র টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে এবং ৭৯৮ রান ক'রে সকলে আউট

প্রফেসার দেওধর

হয়। প্রথম দিনের খেলায় মহারাষ্ট্র ৪ উইকেটে ২৭৭ রান তোলে। তরুণ খেলোয়াড় ভাজেকার ১২০ রান করে নট আউট থাকেন। শত রান ক'রতে তাঁর সময় লেগেছিলো ২৪৫ মিনিট। তিনি উইকেটের চতুর্দ্দিকে খুব চমৎকার ভাবে পিটিয়ে খেলেছেন। তাঁর ফুট-ওয়ার্ক বেশ ভাল। খেলায় 'চার' ছিলো ১৫টা। মহারাষ্ট্রের ওপনিং প্রতিবারই বেশ ভাল হয়। এবারও প্রথম উইকেট পড়েছে ১৫৮ রানে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভাজেকার আর কোন রান না ক'রেই আউট হ'য়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন দেওধর খেলায় যোগদান করে, তাঁরা অভাব বুঝতে দেন নি। লাঞ্চের সময় মহারাষ্ট্রের ৫ উইকেটে ৩৮৯ রান হ'য়েছে। দেওধর নট আউট আছে ৫২ ক'রে। তিনি স্লিপে একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। ক্যাচটা অবশ্য বেশ শক্ত ছিলো।

লাঞ্চের পর খেলা সুরু হল রানও বেশ দ্রুত উঠছে; ২০৪ মিনিট খেলে দেওধর তাঁর নিজস্ব শত রান পূর্ণ ক'রলেন। তেরোটা বাউণ্ডারী ক'রেছেন। বেশীর ভাগই হুক ও ড্রাইভ ক'রে। চায়ের সময় ৬ উইকেটে ৫২৫ রান হ'য়েছে।

৬০১ রানের মাথায় গোখলে তাঁর নিজস্ব ৭৫ রান ক'রে আউট হ'লেন। দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৬১২ রান উঠলো। দেওধর ও যাদব যথাক্রমে ১৬৪ ও ৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় মহারাষ্ট্র সব উইকেট হারিয়ে ৭৯৮ রান তুললে। ভারতবর্ষের রণজি ট্রফির তথা প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইহাই সর্ব্বোচ্চ রান। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বোম্বায়ের বিরুদ্ধে ৬৭৫ রান ক'রে রেকর্ড ক'রে ছিলো। দেওধর মাত্র চার রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরী ক'রতে পেলেন না।

ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট লীগের ফাইনালে পরাজিত প্রেসিডেন্সি কলেজ টীম   ফটো—সরকার ষ্টুডিও

তিনি সাড়ে ছঘণ্টা খেলে উক্ত রান সংখ্যা তুলেছেন। বাউণ্ডারী ছিলো ২৫টা। এছাড়া যাদব 'নাইটম্যান গিয়ে ১১৫ রান ক'রে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মাত্র চারজন খেলোয়াড় ছাড়া মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের রান সংখ্যা ৬০এর উপর, ফলে তাঁদের পাচটি জুটি শতাধিক রান ক'রেছেন। দেওধর পর পর তিনটি ঐরূপ জুটির সহযোগিতা ক'রেছিলেন। ব্যাটিংএর এত চমৎকার রেকর্ড সচরাচর দেখা যায় না। রান এত বেশী উঠলেও উত্তর ভারতের ফিল্ডিং বেশ উচ্চ শ্রেণীর হ'য়েছে।

উত্তর ভারতের ৪ উইকেটে ১৪৪ রান হবার পর সেদিনের মত খেলা শেষ হ'ল। রামপ্রকাশ ও সরীফ যথাক্রমে ৬৯ ও ৬৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

কুচবিহার কাপ বিজয়ী কাষ্টমস দল ফটো—জে কে সান্যাল

শেষ দিনের খেলা উত্তর ভারতের ৪৪২ রানে ইনিংস শেষ হ'ল। সরীফ ১১৮ রান ক'রে আউট হ'য়েছেন। সময় লেগেছিলো ৩১৩ মিনিট আর বাউণ্ডারী ছিলো ১২টা। মহারাষ্ট্র বিপুল রানে জয়ী হ'লেও এই ম্যাচে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী দাবী ক'রতে পারেন বিজিত ক্যাপ্টেন রামপ্রকাশ। তাঁর টীমের রান সংখ্যা যখন মাত্র ৩০ তখন তিনি খেলায় যোগদান ক'রেছিলেন আর যখন খেলা শেষ হ'ল তখন পর্য্যন্ত তিনি নট আউট ২০৯। একমাত্র সরীফ ছাড়া দলের আর কোন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে তিনি সহযোগিতা পাননি। সরীফের সহযোগিতায় ৫ম উইকেটে রান উঠেছিলো ২১৭। রামপ্রকাশ নির্ভীকভাবে উইকেটের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে পিটিয়ে খেলে গেছেন। কোন বোলারই তাঁর ভীতি উৎপাদন ক'রতে পারেননি। তাঁর খেলা অধিনায়কের মতই হ'য়েছে। সরবাতে ৬৯ রানে চারটে উইকেট পেয়েছেন।

কুচবিহার কাপের ফাইনালে পরাজিত ট্রপিক্যাল স্কুল ফটো—জে কে সান্যাল

মাদ্রাজ ঃ—২৭১ ও ১৫৮

ইউ পি ঃ—২৫৫ ও ১৪৯

মাদ্রাজ মাত্র ২৫ রানে জয়ী হয়েছে।

রণজি ট্রফির অপরদিকের সেমি ফাইনালে মাদ্রাজ ইউ পি কে মাত্র ২৫ রানে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে। মাদ্রাজ প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৭১ রান করে। গোপালম ১০১ রান ক'রে নট আউট রইলেন আর রামসিং মাত্র

গোপালম

৯ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলেন না। এই দুজন খেলোয়াড় না থাকলে মাদ্রাজের অবস্থা খুবই খারাপ হ'ত। ৮ উইকেটে যখন ২০০ রান হ'য়েছে তখন গোপালমের রান সংখ্যা মাত্র ৪৬। বাকী ৭১ রানের ভেতর ৫৫ রান তিনিই ক'রেছেন। আফতাব ৯৬ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েছেন।

ইউ পির প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়েছে ২৫৫ রানে। ক্যাপ্টেন পালিয়া একাই ১১০ ক'রেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আউট হননি। তিনি আড়াই ঘণ্টার উপর ব্যাট ক'রেছিলেন চার ছিলো ৬টা। এছাড়া গুরুদাচরের ৪৪ রানও উল্লেখযোগ্য। রঙ্গচারী ৭৫ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েছেন।

আলেকজাণ্ডারের বলে মাদ্রাজের কোন ব্যাটসম্যানই দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে পারেন নি। তাঁর বল অদ্ভুত রকম ভাল হ'য়েছিলো। ২১ ওভার বল দিয়ে মাত্র ২৯ রানে তিনি ৭টা উইকেট পেয়েছেন। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'য়েছে ১৫৮ রানে। এত কম রানে তাদের নামিয়ে দিয়েও ইউ পি চতুর্থ ইনিংসের মাঠে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। তাদেরও ইনিংস শেষ হ'য়েছে খুব অল্প রানে। মাত্র ১৪৯। ইউ পি আর একটু ধীরভাবে খেললে হয় তো জিততে পারতো। ভেঙ্কটে সন ও রঙ্গচারী উভয়ে যথাক্রমে ২৩ ও ৩১ রানে ৩টে ক'রে উইকেট পেয়েছেন।

মাদ্রাজ ফাইনাল খেলবে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না। তবে মাদ্রাজের বোলিং ভাল এবং সেই সুবিধাতেই যদি তারা কিছু ক'রতে পারে। আরও একটি সুবিধা অবশ্য মাদ্রাজ পাচ্ছে। তাঁরা নিজেদের মাঠে খেলবে। এই সুবিধাটি মোটেই কম নয়।

রণজি ট্রফি ঃ

পশ্চিম ভারত ষ্টেট ঃ—৪৫৯

মহারাষ্ট্র ঃ—৪৬০ (৩ উইকেট)

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকার ফলে জয়ী হ'য়েছে।

রণজিট্রফির ওয়েষ্ট জোন ফাইনালে মহারাষ্ট্র পশ্চিম ভারত ষ্টেট টীমকে অদ্ভুতভাবে পরাজিত ক'রেছে। পশ্চিমভারত ষ্টেট প্রথমে ব্যাট ক'রে ৩৪৪ তোলে। সর্ব্বোচ্চ রান করেন সৈয়দ আমেদ নট আউট ৮০। মানভাদারের নবাবের ৬২ এবং আকবর খাঁর ৫৭ রানও উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এতবেশী রান তোলার ফলে পশ্চিমভারত ষ্টেটের সমর্থকরা তাঁদের জয়লাভ সম্বন্ধে বোধ হয় নিশ্চিত ছিলেন। নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও মহারাষ্ট্র যে সহজে জয়লাভ ক'রতে পারবে নিশ্চয় একথা ভাবতেও পারেন নি। মহারাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত ক'রেছে। চতুর্থ উইকেটে ৩৪২ রান উঠবার পরও কোন ব্যাটসম্যান আউট হন নি। সোহনী ক'রেছেন ২১৪ আর হাজারে ১৬৪। সোহনী বোম্বাই ও গুজরাটের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী ক'রেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন খেলোয়াড় পরপর তিনবার শতাধিক রান ক'রতে পারেনি।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় যাঁরা ডবল সেঞ্চুরী করেন ঃ

৩১৬—ভি এস হাজারী (মহারাষ্ট্র)

১৯৩৯-৪০ সালে পুণাতে বরোদার বিরুদ্ধে।

২৪৬—প্রেফেসার দেওধর (মহারাষ্ট্র)

১৯৪০-৪১ সালে পুণাতে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে।

* ২২২—ক্যাপটেন ওয়াজীর আলী (দক্ষিণ পঞ্জাব)

১৯৩৮-৩৯ সালে কলকাতায় বাঙ্গলা প্রদেশের বিরুদ্ধে।

* ২১৮—এস ডবলউ সোহনী (মহারাষ্ট্র)

১৯৪০-৪১ সালে পুণাতে পশ্চিম ভারত ষ্টেটের বিরুদ্ধে।

* ২০৯—রামপ্রকাশ (উত্তর ভারত) ১৯৪০-৪১ সালে পুণাতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

২০৩—জে নওমল (সিন্ধু) ১৯৩৮-৩৯ সালে নওনগরে নওনগরের বিরুদ্ধে।

২০২—রঙ্গনেকার (বোম্বাই) ১৯৪০-৪১ সালে পুণাতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

* তারকা চিহ্নগুলি নট্ আউট রান নির্দ্দেশ করে।

ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস

ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসের ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (সিনিয়ার) এ হায়েস (খড়্গপুর)—২৫

ইণ্টারমিডিয়েট—জিতেন দাস (ফরিদপুর)—১৬ পয়েণ্টস

জুনিয়ার—নিতাই ঘোষ (হুগলী) ২৪ পয়েণ্ট

স্কুল চ্যাম্পিয়নসীপ : (১) বি এন আর ইণ্ডিয়ান এইচ ই স্কুল (খড়্গপুর) ৮১ পয়েণ্টস (২) ঈশ্বরগঞ্জ হাই স্কুল (ময়মনসিং) ২৪ পয়েণ্টস

এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ : (১) খড়্গপুর ১০৫ পয়েণ্টস (২) কলিকাতা ৬২ পয়েণ্টস

অল রাউণ্ড একটিভিটিস : কলিকাতা—১৬ পয়েণ্টস

ঢাকায় ক্রিকেট ম্যাচ ঃ

বেঙ্গল জিমখানা ঃ—৩৪১ ও ২১৪

বেঙ্গল গভর্ণরের দল ঃ—৪১৮

ওয়ার ফণ্ডে সাহায্যের জন্য ঢাকায় বেঙ্গল জিমখানার সঙ্গে বেঙ্গল গভর্ণরের একাদশের একটি ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা হয়। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'য়েছে। গভর্ণরের টীমের ক্যাপ্টেন ছিলেন মেজর নাইডু, এছাড়া এস ব্যানার্জ্জি, মানকাদ নওমল ও নাজির আলির মত অল-ইণ্ডিয়া খেলোয়াড় ও উক্ত দলে খেলেছিলেন। বাকী ক'লকাতা ও ঢাকার কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় দিয়ে অপর

মেজর নাইডু

দলটি গঠিত হ'য়েছিলো। বেঙ্গল জিমখানার পক্ষে নির্ম্মল, পি ডি দত্ত ও এ দেব মনোনীত হ'য়েছিলেন কিন্তু খেলতে

বেঙ্গল এথলেটিক স্পোর্টসের ১৫০০ মিটার সাইকেল রেস বিজয়িনী কুমারী শোভা গাঙ্গুলী ফটো—সরকার ষ্টুডি

পারেননি। তাতে টীম একটু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। পি দত্তের স্থান এস দত্ত বেশ ভাল খেলেছেন। ১২ জন ক'

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগীদের বার্ষিক খেলা উৎসবে সভাপতি সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (মধ্যস্থলে) ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায (বামে)

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের রোগীদের খেলার একটি দৃশ্য—(বাম হইতে দ্বিতীয়) সুশীল সেন প্রথম হইয়াছেন

কলিকাতা বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার রোডে ব্রতাচারী গ্রামে ব্রতচারীদের বার্ষিক উৎসব—সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা বক্তৃতা করিতেছেন ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুসদয় দত্ত পার্শ্বে বসিয়া আছেন

যশোহরে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে উৎসব—(বামদিক হইতে চতুর্থ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান উপবিষ্ট

বোম্বায়ে বেঙ্গল ক্লাবের খেলা উৎসবে সমবেত প্রবাসী বাঙ্গালীবৃন্দ—বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন

এলাহাবাদে কমলা নেহেরু প্রসূতি হাসপাতাল—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত

খেলোয়াড় নিয়ে যখন টীম গঠিত তখন এস দত্তের মত খেলোয়াড়ের এমনিতেই স্থান পাওয়া উচিত ছিলো। বিশেষত এই ম্যাচের কিছুদিন আগে দত্ত জ্যাকসনকাপে যেভাবে খেলা দেখিয়েছেন।

বেঙ্গল জিমখানার ক্যাপ্টেন কে বসু টসে জিতে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। দিনের শেষে সব উইকেট হারিয়ে রান সংখ্যা উঠলো ৩২৯। দলের সর্ব্বোচ্য রান ক'রেছেন কার্ত্তিক নিজে। তিনি নিখুঁত ও চমৎকার ভাবে উইকেটের চারিদিকে পিটিয়ে খেলে দেখিয়েছেন যে, মেজর নাইডু, এস ব্যানার্জ্জি, মানকাদ, নওমল ও নাজির আলির মত অল-ইণ্ডিয়া খেলোয়াড় নিখুঁতভাবে বল ফেললেও রান তোলা মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি এইরকম নির্ভীকভাবে খেলার জন্যই দলের অন্যান্য তরুণ খেলোয়াড়রাও বেশী সহজে রান তুলতে সক্ষম হ'য়েছেন। এস দত্ত, রামচন্দ্র ও টি ভট্টাচার্য্যের যথাক্রমে ৪৭ (নট আউট), ৩৯ ও ৩২ রান উল্লেখযোগ্য। জব্বর হতাশ ক'রেছেন। বেঙ্গল জিমখানার রান সংখ্যা বেশ সম্মানজনক। মানকাদ ৯৯ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছেন।

ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদনের বালিকাগণ কর্ত্তৃক পিরামিড দৃশ্য　　ফটো—কাঞ্চন মুখার্জ্জি

বেঙ্গল গভর্ণরের টীমের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪১৮ রানে। সূচনা খুব ভাল হ'য়েছে। ওপনিং ব্যাটস এস ব্যানার্জ্জি ও মানকদ আউট হ'য়েছেন যথাক্রমে ৭৬ ও ৬৪ ক'রে। এবং এর পরই কিন্তু ভাঙ্গন সুরু হয়। শেষে নাইডু নিজে এসে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন। নাইডুর ব্যাটিং সকলকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। অনেকদিন পরে নাইডু আবার এত চমৎকার খেললেন, বোলারদের সকলকেই সমানভাবে পিটিয়েছেন। জে এন ব্যানার্জ্জি এক ওভারে রান দিয়েছেন ২৪। ৩টে ৬ আর একটা চার ছিলো। শতরান পূর্ণ হবার পর তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে অত্যন্ত সহজভাবে বোলারদের পিটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ১৫৬ রান ক'রতে সময় লেগেছিলো ১৭০ মিনিট, ঐ রানের মাথায় তিনি এস দত্তের বলে রামচন্দ্রের হাতে ধরা দেন। তাঁর খেলায় 'চার' ছিলো তেরোটা আর 'ছয়' নটা। কমল ৯০ রানে ছটা উইকেট পেযে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে বেঙ্গল জিমখানা দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলে এবং ২১৪ রানে ইনিংস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খেলাও শেষ হ'ল। এবার দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রলেন এ দাস ৫০।

এছাড়া গাঙ্গুলী, কে বোস ও কে ভট্টাচার্য্য ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নওমলের বোলিং খুব কার্য্যকরী হ'য়েছিলো। তিনি ৭৭ রানে ৯টা উইকেট পেয়েছেন। সময়াভাবে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'ল।

জ্যাকসন কাপ ফাইনাল ঃ

কালীঘাট ঃ—১৫৮ ও ৩৫০

ই বি আর ম্যানসন ঃ—২৮৬ ও ১৫৫

কালীঘাট ৬৭ রানে ই বি আর ম্যানসন ইনষ্টিটিউটকে পরাজিত ক'রে ঢাকার বিখ্যাত জ্যাকসন কাপ বিজয়ী

হ'য়েছে। ই বি আর ম্যানসন গতবার উক্ত কাপ বিজয়ী হ'য়েছিলো। কালীঘাট টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে এবং তাদের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৫৮ রানে। কল্যাণ বসু একাই ৮২ রান করেন। টি ভট্টাচার্য্য ৩৮ রানে ৪টে উইকেট পান।

ই বি আর প্রথম ইনিংসে ২৮৬ রান তোলে, জব্বর ১১৯ রান করেন; চার ছিলো ১১টা আর একটা ছয়। এছাড়া জে ব্যানার্জ্জি, দিলীপ সোম ও টি ভট্টাচার্য্যের যথাক্রমে ৪৬, ৪৭ ও ৩৫ রানও উল্লেখযোগ্য। এস দত্ত ১২৩ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছেন।

কালীঘাট ১২৮ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করে এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৩৫০ রান তোলে। পি ডি দত্ত খুব নির্ভীকভাবে খেলে ১০৯ রান করেন তাঁর খেলায় বাউণ্ডারী ছিলো ১৭টা। দত্ত একজন ফাষ্টবোলার হ'লেও তাঁর ব্যাটিংয়ের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে বিশেষতঃ এবছর অনেকদিন আগেই সহস্রাধিক রান পূর্ণ ক'রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কল্যাণ বসু দ্বিতীয় ইনিংসেও বেশ ভাল খেলে ৬৩ রান ক'রেছেন।

২২৩ রান তুলতে পারলেই জয় হবে। ই বি আর ব্যাটিং সুরু ক'র্‌লো কিন্তু চতুর্থ ইনিংসের উইকেটে একমাত্র দিলীপ সোম ছাড়া আর কোন ব্যাটস্‌ম্যানই সুবিধা ক'রতে পারলেন না। ই বি আরের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল মাত্র ১৫৫ রানে। রামচন্দ্র ও এস দত্ত উভয়ে ৫টা ক'রে উইকেট পেলেন যথাক্রমে ২৮ ও ৬৭ রানে।

মহিলাদের আন্তঃ কলেজ স্পোর্টস ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ষষ্ঠ বার্ষিক আন্তঃ কলেজ স্পোর্টস শেষ হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের মেয়েরা যে শরীর গঠনের জন্য খেলাধূলায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন তার কিছুটা পরিচয় মেয়েদের বিভিন্ন স্পোর্টসের মধ্যে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ক্রমশই অবনতির দিকে অগ্রসর হয়েছে; জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট অবস্থায় ছাত্রদের অটুট স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের যেমন প্রয়োজন মেয়েদেরও তেমনি। বর্ত্তমান সভ্যতার ক্রমবিস্তারে আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা অনেকখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে। এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সেই পরিবর্ত্তনের বিবর্ত্তে পড়ে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য হারাতে বসেছি। বর্ত্তমান শিক্ষাধারার ভারে আজ দুর্ব্বল স্বাস্থ্য নিয়ে জগতের সকল জাতির কাছে আমরা ক্রমশই নানা দিক থেকে পিছনে পড়ছি। পল্লীজীবনে মেয়ে পুরুষ যতখানি উন্মুক্ত আলোবাতাসের অধিকারী হয় নগরবাসী ততখানি সুযোগ পায় না। স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে

মহিলাদের ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়িনী ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটের ছাত্রিগণ ফটো—বি বি মৈত্র

এই দুইয়ের যে অধিক প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকলেও আমরা সহরে থেকে এদের ভোগ করতে পারি না।

স্কুল কলেজের ছাত্রীরা ছাত্রদের মতই ক্রমশই ক্ষীণজীবী হয়ে পড়ছে। সুখের বিষয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষাদানের অবসরে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা পালনের ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে বলে আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের Students welfare Committee নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা কাগজে দেখে আসছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করলে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারে বহু সৎকার্য্য করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা বড় কর্ত্তব্য রয়েছে এটা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু অপরের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর নির্ভর ক'রে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে না থাকেন। স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে শরীরধারণকারীরও একটা কর্ত্তব্য আছে—সে কর্ত্তব্য অবহেলার নয়, আমরা সেই কর্ত্তব্যে ব্রতী হতেই তাদের অনুরোধ করি; আর আমাদের বিশ্বাস বহুজনের সাধনা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিষ্ঠানই নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

বর্ত্তমান বৎসরের বার্ষিক খেলাধুলায় স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্রী একা ৩৬ পয়েণ্ট লাভ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন ৭৩ পয়েণ্ট পেয়ে কলেজ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, সকলের মধ্যে বেশ উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঞ্জাব লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পাঞ্জাব লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপে এস এল আর সোহানী পুরুষদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মহিলাদের ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের রীলে রেস বিজয়িনী বেথুন কলেজের ছাত্রিগণ ফটো—তারক দাস

ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে সোহানী ৬-২, ৬-৩ গেমে নরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস মাসি ৬-২, ৬-২ গেমে মিসেস হাউলালকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলস ফাইনালে সোহানী ও সোনী ৬-১, ৬-১, ৬-৩ গেমে সভারা ও সফিকে পরাস্ত করেছেন।

মহিলাদের ডবলস ফাইনালে মিসেস মাসি ও মিসেস স্পেনসার ৬-৩, ৬-২ গেমে মিসেস কোশেন ও কারেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে সোহানী ও মিসেস মাসি ৬-৪, ৬-০ গেমে সোনী ও কারেকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলসে কৃষ্ণপ্রসাদ ও ব্রুক এড্‌য়ার্ডস ৬-৪, ৬-২ গেমে স্লীম ও ঘুলারকে পরাস্ত করেছেন।

প্রাদেশিক স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল স্পোর্টসের অষ্টাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। আই এ ক্যাম্পের এস কে সিংহ ৪৮ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন। টীম চ্যাম্পিয়ান-

টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়ী অরুণ গুহ

সীপ পেয়েছে আই এ ক্যাম্প ১৩৩ পয়েণ্ট পেয়ে। মহিলাদের বিভাগে মিস বি বিক ৩১ পয়েণ্টে ব্যক্তিগত

এস কে সিংহ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল স্পোর্টসের ৫০০০ মিটার ওয়াকিংএ নূতন রেকর্ড করেছেন ফটো—বি বি মৈত্র

চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব ১৩৭ পয়েণ্টে মহিলাদের টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়।

৫০০০ মিটার ওয়াকিং রেস এস কে সিংহ ২৫ মিঃ ৫৬-৩/৫ সেকেণ্ডে শেষ ক'রে ভারতীয় ২৭ মি ১৮ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। কিন্তু অলিম্পিকের কর্ম্মকর্ত্তারা এই

মহিলাদের ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টসের ব্যালেন্স রেস। কুমারী করুণা গুহ (ভিক্টোরিয়া) প্রথম হ'ন ফটো—তারক দাস

রেকর্ডকে সরকারী ভাবে ভারতীয় রেকর্ড বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের ধারণা সময় নিরূপণ ব্যাপারে

আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগের স্পোর্টসে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়িনী কুমারী তপতী ভট্টাচার্য্য

ফটো—পান্না সেন

কোনরূপ ত্রুটী আছে। উপস্থিত দর্শক এবং খেলোয়াড়রা অলিম্পিক কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের এ বিচারে একমত হ'তে পারেন নি। ৪০০ মিটার দৌড় ৫১ সেকেণ্ডে শেষ করে এম ফেরোন বাঙ্গলার নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তাঁর বয়স মাত্র ১৯, এই অল্প বয়সেই আলোচ্য প্রতিযোগিতায়

দশ সের ভার বহনসহ দশ মাইল ওয়াকিং রেস বিজয়ী রবিন সরকার

একাধিক অনুষ্ঠানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্য লাভ ক'রে বর্ত্তমানে একজন শ্রেষ্ঠ এথেলেটসের সম্মান অর্জ্জন করেছেন।

ইণ্টার কলেজ ১৬ মাইল সাইকেল চালনা ঃ

ইণ্টার কলেজ ১৬ মাইল সাইকেল চালনায় প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ, আশুতোষ, সেণ্টজেভিয়ার্স, সিটি ও সেণ্টপলস

মিস বি বিক

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল স্পোর্টসের মহিলাদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন ফটো—কাঞ্চন মুখার্জ্জি

কলেজ থেকে মোট ছ'জন ছাত্র যোগদান করে। স্কটিসের ছাত্র নিতাইচাঁদ বসাক ৫১ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম হয়েছেন।

খেলাধূলায় বিশিষ্ট ব্যক্তির দান ঃ

আন্নামলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সালার স্যার এস আর এম আন্নামলাই চেটিয়ার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসের ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য ১,৫০০ টাকা দান

করেছেন। ঐ টাকা থেকে প্রতিবৎসর প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে একটি শীল্ড দান করবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর উক্ত শীল্ড বিজয়ের সম্মান প্রথম অর্জ্জন করেছে।

জয়পুরের (উড়িষ্যা) মহারাজা বিশ্বরমা দেও বর্ম্মা ২,০০০ টাকা মূল্যের একটি শীল্ড দিয়েছেন। উক্ত শীল্ডটি ইণ্টার ভারসিটি টেনিস টুর্ণামেণ্টের বিজয়ী দলকে উপহার দেওয়া হবে। এ বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এই শীল্ডটি লাভ করেছেন।

বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ঃ

ওলিভ ক্রেন্স—দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম খেলোয়াড়

হেলেন জ্যাকব—আমেরিকার দুই নম্বর খেলোয়াড়

এনিটা লিজানা (চিলি)
কোন সেটে পরাজিত না হয়ে ইউ এস এ সিঙ্গলস বিজয়িনী হন

এস স্পার্কলিং জার্ম্মাণি : ফ্রান্স ও জার্ম্মাণ টাইটলস বিজয়িনী

এস হেনরোত্তি
১৩৩৭ সালের ইউএস এ কর্ভার-কোর্ট বিজয়িনী

এলিস মার্কেল
আমেরিকার একনম্বর খেলোয়াড়

নানসি ওয়ানি
অষ্ট্রেলিয়ার ডবলস বিজয়িনী

মিসেস সারহা ফেবিয়ান
ইউ এস এ ডবলস বিজয়িনী

জো লুই'র সম্মান ঃ

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টি যোদ্ধা জো লুই, গস্ ডোরাজিওকে নক্ আউটে পরাস্ত ক'রে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশবার তাঁর পৃথিবীব্যাপী সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

গানবোটের সাফল্য ঃ

পেশাদার বক্সিং টুর্ণামেণ্টে ওরিয়াণ্ট চ্যাম্পিয়ান গান-বোট জ্যাক সহজেই অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ান ডানকান ছট্টারটনকে পরাজিত করেন। দশ রাউণ্ড লড়াইয়ের পর গানবোট পয়েণ্টে জয়ী হ'ন।

ইণ্টার ভারসিটি হকি ঃ

ইণ্টার ভারসিটি হকি খেলার ফাইনালে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলা চার বার খেলানর পরও গোলশূন্য 'ড্র' হওয়ায় অমীমাংসীত ভাবে খেলাটি শেষ করতে হয়েছে।

উত্তর ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডেনমার্কের ২নং খেলোয়াড় এফ বেকিভোণ্ড ৭-৫, ৬-২ গেমে সি বার্কারকে (বাঙ্গালোর) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে এফ বেকিভোণ্ড ও জে টিউ ৬-৪ ৬-১ গেমে আর পণ্ডিত ও এন ভি লিমায়িকে পরাস্ত করেছেন।

মিক্সড ডবলসে এম কে হাজী ও এম সি বক্জী ৬-৩, ৬-১ গেমে মিস এস উডব্রীজ ও এ আজীমকে পরাজিত করেন।

ইণ্টার কলেজিয়েট গেমস ঃ

টেবল টেনিস ঃ

ইণ্টার কলেজ টেবল টেনিসের ফাইনালে কলিকাতা ল' কলেজ, কারমাইকেল কলেজকে পরাজিত ক'রে এবার নিয়ে পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের সম্মান পেয়েছে। ল' কলেজের অধিনায়ক হিসাবে কমল ব্যানার্জিকে টেবল টেনিসের ট্রফি প্রদান করা হয়।

মহিলাদের ক্যারাম খেলার ফাইনালে আশুতোষ কলেজের অনিলা সেন বিজয়িনী হয়েছেন।

টেবল টেনিসের (মহিলাদের) ফাইনালে বিজয়িনী হয়েছেন আশুতোষ কলেজের নির্ম্মলা পুরী।

আই এফ এ ঃ

আই এফ এ-র বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের জন্য বিভিন্ন পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এইচ আর নর্টন

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—মিঃ বি সি ঘোষ, বার-এট ল'

জয়েণ্ট সেক্রেটারী—মিঃ এম দত্ত রায় ও জে পেস্টনী

কোষাধ্যক্ষ—পি এন ঘোষ

সাহিত্য সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত "কংসনদীর তীরে"—১৸৹

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "সবিনয় নিবেদন"—২৲

বারোয়ারী উপন্যাস "বান্ধবী"—১৸৹

কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মিস্ত্রীর মেয়ে"—১।৹

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "দীপান্বিতা"—৸৵৹

জিতেন্দ্রলাল মৈত্র প্রণীত "মেঘনগরের অন্ধকারা"—১৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আলো ছায়ার খেলা"—২৲

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রণীত "নির্ম্মোক"—২৸৹

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "নববোধন"—১৲

পশুপতি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দুই-নৌকা"—২৲

নিরুপমা দেবী প্রণীত "অনুকর্ষ"—২৲

গৌর সী প্রণীত নাটক "ঘূর্ণি"—১৲

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "রত্নদীপ"—১।৹

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "মেমসাহেব"—৸৹

রাধারমণ দাস প্রণীত "নীল সাগরের রক্ত-লীলা"—৸৹

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "দেড়শ খোকার কাণ্ড"—১৲

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "প্রভু জগবন্ধু"—১৲

শ্রীমতী সরলা দেবী বিলিখিত "শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রিপূজা"—৸৹

নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গীত-রাজিকা"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন মল্লিক

চিত্র দর্শন। ঊষা-অনিরুদ্ধ।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বৈশাখ—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

উপন্যাস ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাব ও আদর্শগত পার্থক্য কোথায়—বাঙ্গালার এই শ্রেষ্ঠ দুই মনীষীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে, দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, জীবনকে দেখিবার ও বুঝিবার বিশিষ্ট প্রণালীর মধ্যে প্রভেদ কোন্ স্থানে এবং ইঁহাদের উপন্যাসের মধ্য দিয়া এই পার্থক্য কোন্ পথে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আমরা দেখিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্য দিয়া যেভাবে দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহাকে আমরা আমাদের দেশের এবং জাতির একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং সংস্কারক বলিয়া মনে করিতে পারি।

স্বজাতিকে বড় করিতে হইলে, মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে, জাতির মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য-মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকলই তিনি তাঁহার উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নিছক উদ্দেশ্যমূলক হইয়া উঠিয়া একটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম এবং মনগড়া মানবসমাজ এবং মানব-জীবনের অবাস্তব কাহিনী মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মানব-জীবনের সত্যকার ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। এ সকলকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তিনি মানব-জীবনকে একটি সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শচরিত্রগুলি অনেকস্থলে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা কোথাও অতিমানব হইয়া উঠে নাই।

তাহারা আমাদেরই রাজ-সংস্করণ। আমাদের অপেক্ষা তাহারা বড় মানবত্বের শ্রেষ্ঠতায়, অতিমানবত্বের লোকোত্তরত্বে নয়। তাঁহার সত্যানন্দ, মাধবাচার্য্য, ভবানীপাঠক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ চরিত্রের দিক হইতে যত বড়ই হউন না কেন, আমাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহারা নিবিড়ভাবে জড়িত। আমাদের জীবনকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা কোন তুরীয় সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন নাই।

বঙ্কিমের উপন্যাস স্থানে স্থানে মানব-জীবনের সাধারণ সুর ছাড়াইয়া খুব উঁচু পর্দ্দায় বাজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্র সঙ্গীতকে ছাড়াইয়া অনাহত ধ্বনির শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতির কবি, দেশের কবি। আমাদের মধ্যে যেখানেই তিনি গলদ দেখিয়াছেন, ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি দেখিয়াছেন, সেইখানেই তার সংশোধনের পথ দেখাইবার জন্য সুদৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু জাতিকে বড় করিতে গিয়া ধর্ম্মকে তিনি কোনদিন উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার ভারতবর্ষীয় মন সে পথে তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই।

তিনি ধর্ম্মকে মানিয়াছেন সত্য, কিন্তু জাতি-নিরপেক্ষ, দেশ-নিরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ অশরীরী, তুরীয় ধর্ম্মকে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নাই। তাই ধর্ম্মের সহিত জাতির, ধর্ম্মচেতনার সহিত দেশাত্মবোধের একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মচেতনাকে জাতি-চেতনা ও স্বদেশ-চেতনার সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার ধর্ম্মচেতনা যেমন একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়া শরীরী হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার জাতি-চেতনা ও স্বদেশ-চেতনা একটা বৃহত্তর ও মহত্তর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের সহিত কোন কিছুরই রফা করিতে চান নাই। তিনি ধর্ম্মকে চিরদিন ছাড়িয়া রাখিয়াছেন, আলগা রাখিয়াছেন, মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছেন। ফলে ধর্ম্ম তাঁহার উপন্যাসে দেশ-নিরপেক্ষ, জাতি-নিরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ একটি অশরীরী তত্ত্ব হইয়া দেখা দিয়াছে এবং এই অশরীরী নির্লিপ্ত, অন্তর্ম্মুখী ধর্ম্মচেতনার আওতায় পড়িয়া দেশ-চেতনা ও জাতি-চেতনা কোন স্পষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই। এইখানেই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের ভাবগত পার্থক্য।

তাঁহার প্রথম-প্রকাশিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' হইতেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারা ছাড়িয়া এক নূতন পথে চলিতে সুরু করিয়াছেন।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হই, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। রবীন্দ্রনাথ যখন 'বৌঠাকুরাণীর হাট' লেখেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত অল্প বয়সেই তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তা-প্রণালী স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা তাঁহার একটা খামখেয়াল বা সাময়িক ধারণা মাত্র নয়, কেন না তাঁহার অল্পবয়সের এই চিন্তাধারা এবং ভাবধারার ক্রমবিবর্ত্তনই আমরা তাঁহার পরিণত বয়সের উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখিতে পাই।

'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা লেখকের যে চিন্তা ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হই, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাবধারা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহাই এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' হইতেই সুরু করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেক উপন্যাসেই দেশপ্রেম এবং জাতি-চেতনাকে চরম উচ্চাসন দিয়াছেন। এই সকল উপন্যাসে তিনি দেশপ্রেমিক মহাপুরুষদের সাধনা ও আত্মত্যাগের কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ আমরা কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত চিত্র দেখিতে পাই। সেখানে রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধের সহিত ধর্ম্মচেতনার একটা শোচনীয়, মর্ম্মান্তিক বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার চিন্তাধারা বঙ্কিমের ঠিক বিপরীত পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। ইহার কারণ খুবই সুস্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও জাতির সহিত ধর্ম্মকে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মকে অব্যাহত রাখিয়া দেশ ও জাতিকে তাহারই অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে বিন্দুবৎ

নিরীক্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। ফলে দেশ ও জাতি তাঁহার নিকট নিতান্তই নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই দেশভক্তিকে লইয়া মাতামাতি রবীন্দ্রনাথের ধাতে কোনদিন সহে নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ তিনি দেশপ্রেমিকের এমন উৎকট চিত্র আঁকিলেন, যাহার পানে চাহিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষটা অতিরিক্ত তীব্র এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'গোরা' নামক উপন্যাসে কটাক্ষপাতের তীব্রতা কমিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আরও বাড়িয়াছে। গোরার দেশপ্রেমের মধ্যে পাপ বা দুর্নীতির কোন স্থান নাই, একথা স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতে রবীন্দ্রনাথ কার্পণ্য করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম যে সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক এবং বিশ্বপ্রেমের পরিপন্থী, একথা বলিয়া তাহার দুর্ব্বলতার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে তিনি ছাড়েন নাই। গোরা পাপ করে নাই বটে, কিন্তু সে ভুল করিয়াছে, একথা রবীন্দ্রনাথ বার বার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহার পর 'ঘরে বাইরে'-র সন্দীপের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের যে কদর্য্য রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেমন জঘন্য, তেমনি ভীতিপ্রদ। ইহার পর 'চারঅধ্যায়'-এর মধ্যে তিনি দেশপ্রীতি অপেক্ষা মানুষের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অনেক বড় উচ্চাসন দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, জোর করিয়া মানুষের মনে দেশপ্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাহার ফল কোনদিনই শুভ হইতে পারে না, দেশের দিক হইতেও নয়, ব্যক্তিবিশেষের দিক হইতেও নয়।

আসল কথা, দেশপ্রেমের মাতামাতি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। দেশপ্রেম জিনিসটা রবীন্দ্রনাথের নিকট যে পরিমাণে সঙ্কীর্ণ এবং স্থূল বলিয়া মনে হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র আজ বাঁচিয়া থাকিলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম তাঁহার নিকট হয়ত ঠিক সেই পরিমাণেই ফাঁকা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইত। আসল কথা, বাঙ্গালার এই দুইজন অনন্যসাধারণ প্রতিভার মনের গঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

শুধু দেশাত্মবোধ সম্পর্কেই নয়, মানুষের অন্যান্য আদর্শ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমের ভাবগত বা চিন্তাগত মিল নাই। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ দেশকে এবং জাতিকে স্বতন্ত্র করিয়া বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, ঠিক সেই কারণেই তাঁহার মন দেশের প্রচলিত ধর্ম্মকে, সমাজকে, নীতিকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। এইগুলি তাঁহার নিকট ছোট বলিয়া, সঙ্কীর্ণ বলিয়া, সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছে। তাই 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ দেশপ্রেমের কদর্য্যরূপ দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরবর্ত্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি'-তে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গ্লানি এবং সঙ্কীর্ণতার প্রতিও তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও যে দেশের এবং সমাজের সকল ব্যবস্থাকেই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাখিতে চাহিয়াছেন, তাহা নয়। তিনি অবস্থানুসারে, প্রয়োজনানুসারে সমাজ ও ধর্ম্মের পুরাতন ব্যবস্থাগুলির সংস্কার চাহিয়াছেন। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন এবং সংস্কারের মূলে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। তিনি চিন্তার দ্বারা, বিচারের দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শের পানে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, পুরাতনকে বর্ত্তমান কালের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতন করিয়া লইতে হয়। তাই তিনি দেশের ও জাতির পুরাতন ধর্ম্ম, সমাজ ও নৈতিক আদর্শকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদের যুগোপযোগী নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে-পথে যান নাই। তিনি জাতি বা দেশের মুখের পানে চাহিয়া তাহাদের চিরকালের জিনিস-গুলিকে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সংশোধিত করিতে চান নাই;—তিনি যুগ ও কাল-নিরপেক্ষ, সমাজ ও জাতি-নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্যের বিরাট অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে দেশ ও জাতির সংস্কার এবং ধ্যানধারণাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের মন হইতে স্বদেশ প্রেম মুছিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে'দিক দিয়াই গেলেন না। তিনি বিশ্বপ্রেমের অখণ্ডানুভূতির দ্বারা দেশপ্রেমের খণ্ড এবং স্পষ্ট অনুভূতিগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতে লাগিয়া গেলেন।

সমাজের দিক হইতেও তিনি ঐ একই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ (শেষের দিকে) সমাজকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থীরূপে দেখিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিতেন, মানুষ সমাজকে মানিয়া চলিবে (অবশ্য সে সমাজ যদি আদর্শ সমাজ হয়)—আর রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, প্রত্যেক ব্যক্তি এতই একক, এতই স্বতন্ত্র যে, কোন আদর্শ সমাজই তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তাকে অবাধ মুক্তি দিতে পারে না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত ঐ একই জাতীয়। তিনি সাম্প্রদায়িক বা আনুষ্ঠানিক কোন ধর্ম্মেই আস্থাবান নন।

তাঁহার ধর্ম্ম কোন দেশ বা জাতির ধর্ম্ম নয়—তাহা একটি উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব মাত্র। বিরাটের সহিত মানব-মনের একটা ধ্যানগত ঐক্যের ভিতর দিয়াই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মচেতনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই 'রাজর্ষির' গোবিন্দমাণিক্যকে আমরা মন্দির অপেক্ষা উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহার ভাগবত চেতনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে দেখি। তাই পরেশবাবুর ভাগবত উপলব্ধির পীঠস্থান ব্রাহ্মমন্দির অপেক্ষা বৃক্ষমূলেই অধিক স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ সকল দিক হইতেই নিজেকে দেশ ও জাতিনিরপেক্ষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র সকল দিক হইতে নিজেকে দেশের ও জাতির ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত জড়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে ধর্ম্ম ও দেশাত্মবোধের সামঞ্জস্যের অভিমুখে। তাই 'মৃণালিনী' ও 'রাজসিংহে' বর্ণিত দেশপ্রেম 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামে' আসিয়া ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া একটা বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর রবীন্দ্রনাথের দেশ ও জাতিনিরপেক্ষ মনোভাব চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে—'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা' এবং 'চার অধ্যায়'-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবাধ মুক্তির ক্ষেত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্র একটা আদর্শ সমাজ, আদর্শ ধর্ম্ম, আদর্শ জাতি গড়িতে চাহিয়াছেন এবং সেই সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতির সহিত মানুষকে খাপ খাওয়াইয়া তাহাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখিতে চাহিয়াছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবাধ মুক্তির ক্ষেত্রে, যেখানে সে একক, যেখানে সে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শ মানবগুলি দেশ ও জাতির স্বার্থ এবং ধ্যানধারণার সহিত নিজেদের নিবিড়ভাবে জড়িত করিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া উঠিয়াছেন। দেশের চিন্তা, জাতির চিন্তা এই সকল আদর্শ চরিত্রকে চিরদিন সচল এবং কর্ম্মব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। জাতি ও দেশপ্রীতি তাঁহাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে কোনদিন অন্তর্মুখী ভাবুকতায় পরিণত হইতে না দিয়া বহির্মুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টায় রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আদর্শ চরিত্রের প্রাদুর্ভাবে কর্ম্ম ও ঘটনা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে আদর্শচরিত্রের যতই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ততই তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে ঘটনা ও কর্ম্মপ্রবাহ মন্দগতি হইয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিবর্ত্তন কর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্টতর কর্ম্মে; আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিবর্ত্তন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মহীন ভাবুকতায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম'-এ ধর্ম্ম ও আদর্শের কথা যতই থাকুক না কেন, কর্ম্মের দিক হইতে, ঘটনাবৈচিত্র্যের দিক হইতে উপন্যাসগুলি আরও সজাগ এবং সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলির মধ্যে যতই আদর্শ চরিত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, উপন্যাসগুলি ততই কর্ম্ম ও ঘটনাশূন্য হইয়া কর্ম্মহীন তত্ত্বকথা অথবা ঘটনাহীন, ভাবময়, উচ্ছ্বাসময় কবিত্ব ও ভাবুকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইহা খুবই স্বাভাবিক। মানব-মন যেখানে একক, সেখানে হয় তাহা কবিত্বের উচ্ছ্বাসের দ্বারা ভারমুক্ত হইয়া শূন্যে উঠিতে থাকে, আর না হয় তত্ত্বজ্ঞানের গভীর নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। হয় তাহা শূন্যে উঠে, আর না হয় পাতালে প্রবেশ করে; মাটির পৃথিবীতে হাঁটিয়া চলার পালা তাহার বন্ধ হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাস কয়টির প্রধান চরিত্রগুলি ঠিক এই কারণেই হয় অতিরিক্ত মাত্রায় তত্ত্বাশ্রয়ী—আর না হয়, অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাসবহুল ও সঙ্গীতময় হইয়া উঠিয়াছে। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন' এবং 'চার অধ্যায়ে' প্রত্যক্ষ মানবজীবন অপেক্ষা মানব-জীবনের গভীর তত্ত্ব অথবা মানবাত্মার কবিত্বময় সঙ্গীতের কথাই আমরা বেশি করিয়া শুনিতে পাই।

গণনীয় নন্দকিশোর

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

অদম্য জ্ঞানপিপাসার প্রেরণায় নয়, ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্নসংগ্রহের জন্যই নন্দকিশোর লেখাপড়া শিখিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সে-সুযোগ সহজে মিলিবার নয় ইহাও তেম্‌নি সত্য। কিন্তু নন্দকিশোরের ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্নসংগ্রহের উদ্যম অংশত সফল হইল মণীন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে ···

মণীন্দ্রবাবু নন্দকিশোরকে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা তাঁর একান্ত প্রয়োজন—অনুগ্রহ বিতরণের আকাঙ্ক্ষা তার মূলে আদৌ নাই; কিন্তু এত লোক ঐটুকুর জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া আসিলেও তাহাকেই নিযুক্ত করা অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি! তিনি অধিকতর গুণবান্ অপর কাহারো উপর ছেলের শিক্ষার ভার দিলেই পারিতেন—সেখানে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা, জবাবদিহির প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু তা না দিয়া দিলেন তিনি নন্দকিশোরকে—যার "কলেজ কেরিয়ার" ধর্ত্তব্যই নয়। নন্দকিশোর এই অপার সুখময় প্রভূত অনুগ্রহ সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করিল ···

"কাজ পাইয়া" অর্থাৎ অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থীগণকে পরাস্ত করিয়া, নন্দকিশোরের যতই পুলক হউক, শুনিলে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে যে মণীন্দ্র তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তার গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া নয়, তার চেহারা দেখিয়া। গুণের ওজন বিচারের তুলাদণ্ডে চাপাইলে নন্দ গিয়া ঠেকিত একেবারে মাটিতে—কিন্তু তার চেহারাটা ভালো—আর সব বাদ দিয়া মণীন্দ্র তার চেহারাটাই পছন্দ করিলেন ···

মেয়েলি ছাঁদের সুকোমল আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুষ্ট চেহারা নন্দর—বড় বড় শান্ত চোখ; চোখ দেখিলেই মনে হয়, সরল বিশ্বাসে পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করিয়া এ সুখী হইয়াছে—মনে গ্লানি কি কপটতা নাই। গোঁফ অতি সামান্যই উঠিয়াছে—একটু বেশি বয়সেই উঠিয়াছে; কিন্তু মুখ পাকিয়া ওঠে নাই, আর দাড়ি কর্কশ ঘোরতর কালো হইয়া কালো কুৎসিত হইয়া ওঠে নাই; ললাট রেখাহীন মসৃণ—গণ্ডস্থলও তাই অর্থাৎ ব্রণ কলঙ্ক একটিও সেখানে নাই; মণীন্দ্র আরো লক্ষ্য করিলেন, আঙুল আর করতল দিব্য নরম—আঙুলের গিঁঠগুলি রূঢ় পৌরুষে প্রকট হইয়া নাই। ভুরুও ভাল, চোখও ভাল, কিন্তু ঐ দুটি শোভার আধার আবার যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন—তাদের সমন্বয়ে একটা সৌকুমার্য্যের উদয় হয় নাই, এমন অনেক দেখা যায়; কিন্তু নন্দকিশোরের তা হইয়াছে—ভুরু আর চোখ যেন ভাবোন্মেষের চিরস্থির আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর একাকার হইয়া গভীর সুন্দর স্বচ্ছ একটি প্রেম-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে ··· দেখিলেই মনে হয়, এ আপন হইয়া যাইতে বিলম্ব করে না—প্রীতির আদান প্রদানে এ প্রশ্ন কি সন্দেহ করিতে জানে না। তার উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে নন্দকিশোরের ঠোঁট দুখানিও রমণীসুলভ সরস ও লাবণ্যযুক্ত।

ঐসব লক্ষ্য করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে পছন্দ না করিয়া পরিলেন না—

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিয়ে করেছ?

নন্দ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল—অত্যন্ত মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বিবাহ সে করিয়াছে।

—করেছ। বলিয়া নির্নিমিষচক্ষে মণীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ধ্যান করিলেন, বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষের নিত্যসম্বন্ধটি।

তারপর বলিলেন—তোমার বয়স কত?

—তেইশ।

—ছেলেপিলে হয়েছে?

—আজ্ঞে না।

শুনিয়া মণীন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্নিমিষ চক্ষে কি যেন ধ্যান করিলেন আরো গাঢ়তরভাবে—তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, যেন ধ্যেয় সামগ্রীটি তাঁর মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে

সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট আর অধিকতর উপভোগ্য' হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে ···

বলিলেন—বেশ। কিশোর আর কিশোরী। বলিয়া এবার আর ধ্যান করিলেন না, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া প্রসন্ন বদনে একটু হাসিলেন'।

নন্দকিশোর এ-সব অর্থাৎ লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ লায়েক লায়েক লোককে বিদায় করিয়া দিয়া তাহাকে নিযুক্ত করিবার কারণ কিছুই জানে না—সে কেবল ধন্য এবং কৃতজ্ঞ হইল ···

পরম কৃতজ্ঞতা বশে সে তাঁদের সব আদেশই শিরোধার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণে—আর বাজারের ভিতর চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াও—পালন করে। বাড়ীর চাকরটাও সেই সুযোগে নন্দর উপর মাঝে মাঝে একহাত কৌশল খাটায়—তাহার জবানি গৃহিণী আদেশ করিতেছেন বলিয়া নন্দকে দিয়া সে চাকরের কাজ করাইয়া লয়!

নন্দকিশোরের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, আর আছে ছোটভাই বিষ্টু, আর স্ত্রী মমতাময়ী। কিন্তু তাঁদের জন্য ভাবনা যে খুবই দুস্তর আর নৈরাশ্যজনক হইয়া আছে তা নয়—তবে নগদ খরচের জন্য তাঁদের নগদ টাকার দরকার আছে; তা ছাড়া আজকার দিনই ত চরম দিন নহে—অনন্ত প্রয়োজন আর সুখ দুঃখের দিন আছে সম্মুখে—তখন চোখে অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করিতে না হয় তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নন্দকিশোর তাই মণীন্দ্রবাবুর ছেলেকে পড়াইতে আসিয়াছে··· ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়ায়, সঙ্গে লইয়া বাহিরে বেড়ায়, মনের পক্ষে হিতকর আর বুদ্ধির পক্ষে পুষ্টিকর গল্প উপদেশ শুনায়, আনন্দ আর উৎসাহ দেয় এবং করে নিজের আসল যে কাজ তাই—ভালো চাকরির সন্ধান করে।

মণীন্দ্রবাবু কয়েকদিন আড়চোখে নন্দকিশোরের শিক্ষাদানের কৌশল, কথাবার্ত্তা, রুচি, সহবৎ, অভ্যাস প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন—ছেলেও পাঠগ্রহণে মনোযোগী হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর এই ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছেন এবং মণীন্দ্র সম্প্রতি অর্থাৎ বছর দেড়েক হইল, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।

রাস্তার লোকেও জানে যে, মণীন্দ্রবাবুর টাকার অভাব নাই—কাজে হুঁশ আর মনে উদারতারও অভাব নাই; তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, নন্দকিশোরকে মাসিক আটটি টাকা তিনি যথাসময়ে, না চাহিতেই, দেন, আর "খাওয়াদাওয়া" করিতে দেন অন্তঃপুরেই; আগে অবশ্য অনুমতি দেন নাই, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলস্য ইত্যাদি হিতোপদেশটি তাঁর অজানা নয়; কিন্তু নন্দকিশোরের কুলশীল অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় বেশিদিন অজ্ঞাত রহিল না—নন্দকিশোর ঠাকুরের ডাকে তখন অন্তঃপুরে অর্থাৎ রন্ধনালয়ে গিয়া আহার করিতে লাগিল।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে—এই গৃহের গৃহিণীকে—নন্দ দেখিয়াছে, খুব সুন্দরী তিনি। অন্তঃপুরে কি সাম্‌নাসাম্‌নি দেখে নাই, দেখিয়াছে অন্তঃপুরের বাহিরে—যখন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাহির হন্, আর ফিরিয়া আসেন, অর্থাৎ অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায়; কৃত্রিমতা আর একটা অভিনয়ের ভঙ্গীর ভিতর দূর হইতে তাঁহাকে নন্দ দেখিয়াছে।

খুবই সুন্দরী তিনি—

আধুনিকতম বেশ আর সপ্রতিভ গতিভঙ্গী এবং দুনিয়াকে নিতান্ত অবহেলা করিয়া তাঁর দৃষ্টিচালনা নন্দ দেখিয়াছে; আর মনে মনে কত যে বিস্মিত হইয়াছে আর প্রশংসাও করিয়াছে তাহার লেখাজোখা নাই; কিন্তু মণীন্দ্রবাবুকে ঈর্ষা করিবার কি তাঁর স্ত্রীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মতো ইতর মন তার নয়—দৃশ্য হিসাবে অনিন্দনীয় আর আনন্দপ্রদ, এ-বিষয়ে এই মাত্র তার চেতনা, সজ্ঞান অনুভূতি···

ঐ সঙ্গে তার খুবই মনে পড়ে স্ত্রী মমতার কথা—নাম তার মমতাময়ী এবং সত্যই সে মমতাময়ী।

এঁর তুলনায় মমতার রূপ প্রণিধানযোগ্যই নয়, তর্কের অবসর না দিয়া তা বলা চলে না; কিন্তু পার্থক্যও আকাশ পাতাল।··· নন্দ জানে, রূপ ত প্রসাধন আর মার্জ্জন সাপেক্ষ কৃত্রিম বস্তু নয়—দেহলগ্ন বাহিরের বস্তু তা নয়। সে দেখিয়াছে ইঁহার বাহিরের রূপ; কিন্তু উদ্ভিন্ন উন্মুখ অন্তরের দ্যুতিতে দীপ্ত হইয়া প্রেমের যে রূপটি দেহে বিকশিত হয় তাঁর সে-রূপটি নন্দ দেখে নাই—কল্পনাও করে না, সে দুষ্ট বুদ্ধি

তার নাই। ইঁহাকে যখনই সে দেখে তখনই দেখে ইঁহার রূপের অর্থাৎ রূপসজ্জার, বিলাসবিভঙ্গ—এমন একটা চঞ্চল মূর্ত্তি—যার স্বাদ নাই ; কিন্তু মমতার রূপ প্রসাধনপটুতা আর বেশরচনার কঠোর অন্তরাল হইতে উগ্র লীলায়িত হইয়া তার সম্মুখে নাই—

মমতা অতি সহজ, খুব স্বাভাবিক ; আর তার মন অজানা আধারে লুক্কাইত নহে বলিয়াই তাহাকেই ভাবিতে নন্দর সব চাইতে ভাল লাগে—মনে হয়, এমন মধুর একাত্মতার অনুভূতি দেওয়া পৃথিবীর মধ্যে কেবল মমতার দ্বারাই সম্ভব ···

নন্দকিশোরের আরো মনে হয়, ইনি হয়ত খুবই শিক্ষিতা, "কলেজ কেরিয়ার" হয় ত তারই সমান ; হয় ত খুবই বাক্‌পটু, খুবই প্রেমময়ী, খুবই আদরিণী ইত্যাদি ; এবং ইঁহার পদক্ষেপ যেমন ক্ষিপ্র অর্থাৎ অশান্ত, মুখের কথাও হয় ত অত্যন্ত স্পষ্ট ঋজুতম আকারে তেমনি ক্ষিপ্রবেগে নির্গত হইতে থাকে ···

ভাবিয়া নন্দর মনে হয়, ভারি জটিল ; আর তার ভয় হয়—

কিন্তু তার অদৃষ্ট ভাল, মমতার তা নয়—মমতার মুখের কথা চমৎকার অস্পষ্ট, আর চমৎকার মৃদু ; তার এই অস্পষ্টতা আর মৃদুতা এমন মুগ্ধকর যে, ভুলিতে পারা যায় না—ভাবিতে গেলে স্নেহে মন উদ্বেল হইয়া ওঠে। তবু সে রসিকা—নিজের ধরণে সে বেশ রসিকা—হাসায় সে খুব, কিন্তু যেন অজ্ঞাতসারে ; তার চোখের চেহারা কি ঠোঁটের ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে না যে সে মনে মনে তৈরী হইয়া আছে ; কিন্তু কথার জবাব দেয় এমন স্থিরভাবে, আর হাসির কথার সঙ্গে তার শান্ত মুখের এমন অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, তাকে ভারি নিরীহ, ভারি নির্দ্দোষ আর ভারি ভদ্র সরল মনে হয়।··· চোখে তার আবেগ নাই, চঞ্চলতা নাই, বিলাস নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, অথচ আলস্যও নাই, নির্ব্বুদ্ধিতাও নাই—আছে কেবল কোমল একটা ভাষা, অসীম মাধুর্য্য আর নির্ভরতা, আর চোখের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার অপূর্ব্ব মধুর অসংগতি ···

আর ভারি ভীরু সে—

স্বামীর আদর গ্রহণ করিতে করিতে সে-ও আদর করে —দু'হাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া অধিকতর নিকট-বর্ত্তিনী হইতে হইতে—স্বামীর আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ সে সরিয়া যায় ···

নন্দ বলে, ও কি, অমন ক'রে ত্যাগ ক'রে গেলে যে!

মমতা বলে, তুমি যদি রাগ করো!

—রাগ করবো কেন! এ সুখের কথা না রাগের কথা!

—যদি অন্যায় মনে করো!

মমতার মুখের এমনি টুক্‌টাক্ কথাগুলি নন্দর ভারি মিষ্টি লাগে, আর তার ভারি হাসি পায় ···

বলে, অন্যায়ের জ্ঞান তোমার কিছুই নেই।

মমতা তখন হাসিয়া বলে, বাঁচলাম।

কিন্তু তার আচরণ কেহ অন্যায় কিংবা তাহাকে কেহ প্রগল্‌ভ মনে করিবে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সত্যই সাবধান—স্বামীকে সঙ্গ আর আনন্দদানেও তার বাড়াবাড়ি কোথাও নাই।

তবু সে মাঝে মাঝে ইয়ারকি দেয়—

বলে, অমন ক'রে তাকিয়ে আছ যে?

নন্দ বলে, একটু ইয়ারকি দেব ভাবছি।

—উঁ হুঁ, ভয় পেয়েছ।

নন্দ বুঝিতে পারে না যে মমতা ইয়ারকি সুরু করিয়াছে ···

বলে, তার মানে?

—সেদিন রান্নাঘরে একটা বেরাল কেবলি ছোঁক ছোঁক করছিল, 'হেই' বলে' ধমক দিতেই সেটা খানিক পিছিয়ে ঠিক্ তোমার মতো ক'রে তাকিয়ে থাক্‌ল···

নন্দর মুখে হাসি দেখা দেয় ; বলে—তারপর?

—আবার 'হেই' করতেই দিল পিট্‌টান। আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি যে পালাবে!

নন্দ তখন হাসিয়া উল্লাসে আকুল হইয়া যায়—আগাইয়া গিয়া তাহাকে ধরে—দু'হাতের চাপের ভিতর তাহাকে জড়ো করিয়া লয়—চোখ বন্ধ করিয়া তার নিজের আর মমতার রক্তের উত্তপ্ত নাচন অনুভব করে।

•

মমতা চিঠি লেখে—

নন্দকিশোরও লেখে ; নন্দকিশোর চিঠিতে চুম্বন জানায়, কিন্তু মমতা তা জানায় না। নন্দ মনে মনে খুঁত খুঁত

করিয়া একবার অপরিসীম তৃষ্ণা জ্ঞাপন করিয়া ঐ বস্তুটি ভিক্ষা চাহিয়া আর অনেক মিনতি ও কাতরোক্তি করিয়া এক পত্র ডাকে দিল—

'পুনশ্চ' দিয়া লিখিল: "চাই কিন্তু · "

কিন্তু মমতা লিখিল: যদি হঠাৎ কেউ তোমার চিঠি দেখে ফেলে তবে সে মনে কর্‌বে কি! তোমরা লিখতে পারো; কিন্তু মেয়েরা কথাটা লিখলে কেমন যেন অন্যায় আর 'অভদ্দর' মনে হয়।

ঐ অন্যায় আর অভদ্দর শব্দটা ব্যবহার না করার কারণ দেখাইয়া মমতা অনেক কথাই লিখিতে পারিত—লিখিতে পারিত যে হাতে-কলমে সত্যিকার জিনিসই যখন চাওয়ামাত্র দিয়ে থাকি তখন পত্রের মারফৎ নিরবয়ব বস্তুর দরকার কি? তার জন্যে এত লোলুপতা কেন? এসে নিয়ে যাও, একবার নয়, দু'বার নয়, অগুণতি, যত ইচ্ছে তত ···

কিন্তু তা সে লেখে নাই।

নন্দকিশোর বিবাহিত মণীন্দ্র তা জানেন; নন্দ বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলেই তিনি আগে মুচকি হাসেন; তারপর বলেন, "বাড়ী যাবে? যাও, কিন্তু দু'রাত্রির বেশি নয়··"

দিনের কথা না বলিয়া মণীন্দ্র বলেন রাত্রির কথা—কোন্ দিকে ইঙ্গিত করেন তা' নন্দ পরিষ্কার বোঝে···

তারপরই মণীন্দ্র বলেন, অত শীগগির চলে' আস্‌তে মন চাইবে না, না? বৌটিকে এখানে নিয়ে এলেও ত পারো!

মনে হইতে পারে, বধূটিকে এতদিনেও তাঁহার গৃহে লইয়া না আসায় মণীন্দ্র মৃদু অনুযোগ করিলেন এবং এই নিমন্ত্রণে এই অমায়িক ভদ্রলোকটির নিষ্পাপ হৃদ্যতা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

নন্দকিশোর মনে করিল তাই এবং সুখী হইল—

বলিল—মাকে একা থাকতে হয়, আর—

মণীন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন—এদিকে তুমি যে একা থাকো। বয়স কত তোমার?

—তেইশ।

—তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পরও একা থাকা কত কষ্ট তা যারা থাকে তারাই জানে। নিয়ে এসো—আনন্দে থাকা যাবে। বলিয়া মণীন্দ্র যেন জরুরী একটা তাগিদই দিলেন।

তাঁর আনন্দ কিরূপ, কোথায় এবং কেন অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কি না—তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—

ইতস্তত করিয়া বলে, যাবো?

—যাও, কিন্তু···

—আজ্ঞে, পরশুই চলে' আস্‌ব।

—দু'রাত্রি পাবে?

নন্দ জবাব দেয় না—

মণীন্দ্র বলেন, দিনে গাড়ী কখন্?

—তিনটেয়।

—তা হ'লে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক-বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন ···নন্দ এতক্ষণে টের পায়, একটা ইন্দ্রিয়লালসা যেন মণীন্দ্রের কথায়, সুরে, মুখে, চোখে সঞ্চিত হইয়া আছে।

মমতা বলিল—আস্‌তে দিলে?

—হ্যাঁ।

—লোকটি ত ভালো।

—হ্যাঁ, দয়া আছে। তেইশ বছরের যুবক স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাক্‌তে যে কষ্ট পায় তা তিনি জানেন, বলিয়া নন্দ হাসিল।

—তিনি যে জানেন তা তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

—বল্‌লেনই পষ্ট। দরদ দেখালেন খুব; বল্‌লেন, বৌকে নিয়ে এসো এখানে—তেইশ বছর বয়সে বৌ-ছাড়া হ'য়ে থাকা যে কত কষ্ট তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে।

মমতা অবাক্ হইয়া বলিল—তোমার সঙ্গে ঐসব কথা হয় না কি?

—হ'ল এবার, মানে, তিনিই বল্‌লেন।

—বয়স কত তাঁর?

—প্রায় চল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ।

—তা-ই নাকি! দ্বিতীয়াকে দেখেছ?

—হুঁ।

—কেমন?

—খুব সুন্দরী।

মমতার মুখ হঠাৎ ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল, ওখানকার

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি সুন্দরী বলিয়া নয়, আর তিনি বৃদ্ধের ভার্য্যা এবং স্বামী অনাত্মীয় যুবক এবং সেই গৃহবাসী বলিয়াও নয়, অন্য কারণে; তার মনে হইল, ভদ্রসন্তান আর গৃহ-শিক্ষক হিসাবে গৃহশিক্ষকের যে-মর্য্যাদা অবশ্য প্রাপ্য সে-মর্য্যাদা স্বামীকে দেওয়া হয় নাই, আর ভদ্র ব্যক্তি এবং বয়সের পার্থক্য হিসাবে যে সংযম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা মানুষের উচিত তাহা রক্ষিত হয় নাই—হয় নাই জঘন্য কারণে; পরস্ত্রী সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন আলোচনায় রত হইয়া তিনি সেই শিষ্ট রীতি লঙ্ঘন এবং আত্মসম্মান বিস্মৃত হইয়াছেন—তিনি এই নির্লজ্জতা আর আত্মসংযমের অভাব দেখাইয়া অমার্জ্জনীয় অন্যায় করিয়াছেন ··· বলিল—তুমি ওখানে আর থেকো না।

—কেন?

—ভদ্রলোক লোক ভা৷ নয়।

নন্দ তা বুঝিয়াছে—

এবং মমতাও তা' বুঝিয়াছে দেখিয়া নন্দ ভারি বিস্মিত আর পুলকিত হইয়া গেল ·· বলিল—আমার অনিষ্ট তিনি কিছু করতে পারবেন না। তুমি যাবে সেখানে?

—দশ বচ্ছর তোমার দেখা না পেলেও নয়।

শুনিয়া নন্দকিশোর উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া মমতাকে আরো ভালবাসিল।

নন্দর পারিবারিক অস্তিত্বকে মণীন্দ্র আদৌ ভুলিতে পারিতেছেন না বলিলে সবটা বলা হয় না—আরো নিবিড়তা তিনি চান্ ···

দু'দিন বাদেই নন্দ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া মণীন্দ্র পরম বিস্মিত হইয়া গেলেন; বলিলেন—কথা ঠিক রেখেছ দেখ্ ছি! তোমার দিব্যি, আমি ভেবেছিলাম, একটি দিন তুমি চুরি করবেই; তুমি না করো তোমাকে দিয়ে করাবে একজন।

কে তাহাকে আসিতে দিবে না, দিন চুরি করাইবে, তাহা নন্দ বুঝিল এবং একটু হাসিয়া মাসিক আট টাকা বেতনদাতা আর রোজ দু'বেলাকার অন্নদাতার মান রাখিল; প্রায় অর্থহীনভাবে বলিল --আজ্ঞে, না।

মণীন্দ্র বলিলেন—তোমার এই বয়সে আমি এ-বিষয়ে খুব হাভেতে' হ্যাংলা ছিলাম। কিন্তু বৌকে আন্‌লে না যে? বলিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, সখীর মতো দু'জনে থাক্‌তো ভালো—একা থাকে ত সর্ব্বদাই।

কথাটা সংস্কৃত এবং মন্দ শুনাইল না; নন্দ তৎক্ষণাৎ মিথ্যা উক্তি সাজাইয়া তুলিল, বলিল—মা বল্‌লেন, বিষ্টুর পরীক্ষেটা হ'য়ে যাক্ তা'পর না-হয় যাবে।

—তোমার বোনের বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? বলিয়া মণীন্দ্র পুনরায় ভারি লিপ্ত হইয়া উঠিলেন—নন্দর মেয়েলি ছাঁদের স্বচ্ছ মসৃণ সুগঠিত মুখের দিকে তিনি স্থিরচক্ষে তাকাইয়া রহিলে —কি তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন তা' তিনিই জানেন; বোধ হয় ইহাই যে, নন্দর ভগিনীর স্বাস্থ্য নিবিড়, মন প্রফুল্ল, মুখ সহাস্য এবং রূপৈশ্বর্য্য অপরিসীম হওয়াই সম্ভব ···

নন্দ বলিল, বোন্ আমার নেই।

নন্দর বোনের ঝঞ্ঝাট নাই দেখিয়া মণীন্দ্র যেন সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিয়া গেলেন বলিলেন, যাক্, বেঁচেছ। ··· কিন্তু আর ছুটি শীগ্ গির পাবে না বলে' দিচ্ছি।

বলিয়া তিনি নন্দকে শাসাইয়া রাখিলেন এবং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন—স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া তিনি যেন একটা দুর্ম্মূল্য আর পবিত্র কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

মণীন্দ্রের ছেলে রাখাল জড়বুদ্ধি ছেলে—পাঠ্য বিষয় তার মস্তিষ্কে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঢুকাইতে হয়।

চাকর বলরাম আহ্লাদে' গোছের—কথা বলিবার সময় দাঁত বাহির করিয়া কেবলই গা দোলায়; আর, ঠাকুর হরেরাম গোবেচারী, যা বলো তাতেই রাজি।

ছেলে কেমন পড়ছে, মাস্টার? জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলের পড়িবার অর্থাৎ নন্দর থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মণীন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করেন।

নন্দ বলে, বুঝ্ তে কিছু দেরী হয়, কিন্তু আগ্রহ আছে।

—তোমারও কিন্তু বুঝ্ তে দেরী হয়, আর আগ্রহও নাই। · তোমার কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে না ত?

—আজ্ঞে না।

—ঘরটাকে আর একটু সাজানো দরকার; ছেলেমানুষ তুমি; কিন্তু বুড়োর ধরণ তোমার; তোমার সখ কিছু নেই। তুমি জানো না বোধ হয়, বুড়ো মানুষ আমি

একেবারেই পছন্দ করিনে—বুড়োমানুষের দিকে চাইলেই আমার বুকে যেন ঠাণ্ডা লাগে···

মনিবের তুষ্টিসম্পাদন করিতে নন্দ একটু হাস্য করিল।

—হাস্‌লে তুমি—বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগার কথায়। কিন্তু দেখ, আমার বাড়ীতে যারা আছে সবাই যুবক।

নন্দ তা স্বীকার করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন বলো ত ?

—তা ত জানিনে।

—জানো না।···আর, সবাই বিবাহিত ; ঠাকুর, চাকর আর তুমিও। বিয়ে ক'রে দায়িত্ববোধ বেড়েছে বলে' কাজ ভালো পাব এ আমার উদ্দেশ্য নয়।

কি তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে—তিনি তা প্রকাশ করিবেন এই আশায়—নন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল···

উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, উদ্দেশ্যকে জোরালো এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে মণীন্দ্র একটু হাসিলেন—খুব নিপুণ আর উচ্চস্তরের আত্মগরিমার হাসি—

বলিলেন—ঘরে যুবতী স্ত্রী যার আছে সে সুখী নয় কি ? সুখী। আমি তার সুখের অংশ গ্রহণ করি।

নন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল : কেমন ক'রে ?

—মনে মনে ছাড়া আর কেমন ক'রে! একেবারে বালক। বলিয়া মণীন্দ্র এমন একটা ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া গেলেন যেন নন্দর সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ পাওয়া যাইতেছে না।

নন্দকিশোর ভাবিয়া পাইল না, মনে মনে কেমন করিয়া তা সম্ভব হয় !

পরীক্ষায় রাখাল জীবনে এই প্রথম সকল বিষয়ে পাশ করায় মণীন্দ্র হরষিত হইয়া নন্দকিশোরের বেতন দু'টাকা বাড়াইয়া দশ টাকা করিয়া দিলেন—

মুখ উজ্জ্বল করিয়া জানিতে চাহিলেন—খুশী ত ?

নন্দ খুশী বই কি—বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু মণীন্দ্র তখন একটা সুচিন্তিত অভিলাষবশত খুব খোশমেজাজে আছেন ; বলিলেন, তুমি ত খুশী এখানে ; ওখানে তোমার বউকেও আমি খুশী করতে চাই। তাকে একখানা নীলাম্বরি কিনে' দিও। দিও, বুঝ্‌লে ?

মণীন্দ্রের এই ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া নন্দ অবাক্ হইয়া গেল—ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেও তার মন উঠিল না—তার এই অবিচলতা প্রতিবাদের মতো দেখাইতেছে বুঝিয়াও সে অবিচলিতই রহিল···

তার স্ত্রী নীলাম্বরি পরিধান করিলে এই মানুষটির ইচ্ছার সার্থকতা কিসে ! নন্দর মনে হইল, লোকটি অদ্ভুত এবং ইঁহার আচরণ যেন হৃদ্‌কম্পজনক—অস্বচ্ছ একটা সন্দেহের মধ্যেই তার মনে হইল, এখানে থাকা নিরাপদ নয়—বুদ্ধি বিপথে চালিত এবং আত্মা অধোগামী হইতেছে। নারীপ্রসঙ্গে এমন নির্লজ্জ দুর্নিবার লোলুপতা সে কল্পনা করিতে পারিল না, এমনই তা অভদ্র···

কিন্তু মণীন্দ্র তখনও সেখানে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিতেছেন, নীলাম্বরি পরিহিতা রমণী অভিসারে যাত্রা করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু নন্দকে শীঘ্রই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইল মণীন্দ্রের অরূপ রসের উপদ্রবে নয়, অন্য কারণে।

সেদিন বৈকালে বলরামকে সে ডাকিয়া পাইল না—সে বাড়ীতে নাই ; ঠাকুর এখনও আসে নাই ; রাখালকে তার জনৈক বন্ধু ডাকিয়া লইয়া কোথায় গেছে ঠিক নাই···

বাবু আছেন "ওপরে"—

এদিকে টেলিগ্রাফ-পিওন আসিয়া টেলিগ্রাম লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তার বিলম্ব করিবার উপায় নাই—আর, 'কাম সার্প্‌' ছাড়া আর-কোনো সংবাদই তারে আসে না—সুতরাং নন্দ সিদ্ধান্ত করিল যে পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাবু বলিয়া চীৎকার করাও অসম্ভব—লজ্জা করে ; অতএব এমন সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপারে উপরে গিয়া সংবাদ দিতে বা সাক্ষাৎ করিতে বাধাটা কি ! বাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না নিশ্চয়ই···

গবেষণাপূর্ব্বক এবং কর্ত্তব্যপালনে মানুষের যে-সাহস থাকা দরকার সেই সাহস তাহারও আছে—ইহাই মনে করিয়া নন্দ, বাবু যে উর্দ্ধলোক রহিয়াছেন সেই উর্দ্ধলোকের অর্থাৎ দ্বিতলের অভিমুখে রওনা হইল··· হাতে টেলিগ্রামের লেফাফা এবং রসিদের কাগজখণ্ড···

সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় নিষ্পাপ মন, দুরভিসন্ধির অভাব এবং কর্ত্তব্যপালনের সৎসাহস সত্ত্বেও তার বুক

একটু একটু কাঁপিতে লাগিল, যেন অদৃষ্টের উপর শুভাশুভের ভার দিয়া অপরিচিত আর সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে সে চলিয়াছে—এত কষ্ট করিয়া সে সিঁড়ি ভাঙিতেছে ক্রূর নিয়তির বশে—যেমন খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাং গিয়া লাফাইয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে।

মমতা শুনিলে স্বামীর ভীরুতায় হাসিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ-উদ্যম নন্দর পক্ষে এমনই ভয়ঙ্কর।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখেই প্রশস্ত চৌকোণ বারান্দা—দু'দিকে, বাঁয়ে এবং সম্মুখে প্যাসেজ—প্রত্যেক ঘরে প্রবেশের দরজা ঐ প্যাসেজে··· কিন্তু নন্দ দেখিল, সবগুলি ঘরেরই দরজা বন্ধ। মাত্র একটি ঘরের দরজা খোলা আছে বলিয়া তার মনে হইল—সম্মুখের প্যাসেজ দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে দক্ষিণে সেই দরজা পাওয়া যাইবে—এবং ঘরের ভিতরটা দেখা যাইবে—

কিন্তু ঐ ঘরেই বাবু আছেন কি না কে জানে!··· পরক্ষণেই তার ত্রাস জন্মিল গৃহিণী যদি হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন! তখন চক্ষের পলক না ফেলিতেই অবস্থাটা কি দাঁড়াইবে! মানুষের সে-অবস্থা ভাবিতেই পারা যায় না···অপরাধ হাল্‌কা করিয়া আনিতে নন্দ ডাকিল, বাবু?

মণীন্দ্রকে নন্দ কোনো সম্পর্ক ধরিয়া কি কিছু বলিয়াই ডাকে না—ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাবু বলিয়া ডাকিল—কিন্তু আহ্বান তার ভয়ে সঙ্কোচে এত মৃদু যে, আহ্বানে ফলোদয় হইল না—বাবুর সাড়া আসিল না—

কিন্তু আসিল মধুর একটি গন্ধ—দামী সাবানের উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ ···

টেলিগ্রাম-পিওন কঠোর স্বরে বলিয়া দিয়াছে, বাবু, জল্‌দি কর্‌না ···

নন্দ আর-দু'পা অগ্রসর হইয়া গেল—অনুমান করিল, সাবানের ঘ্রাণ আসিতেছে ঐ খোলা-দরজা দিয়া; বাবু ঐ ঘরে বসিয়াই অভিজাত সাবান-সহযোগে বৈকালিক ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতেছেন ···

তারপর সে আরো বুক বাঁধিল ইহাই মনে করিয়া যে, যদি দুর্ভাগ্যবশত গৃহিণীর সম্মুখে সে পড়িয়া যায় তবে সে কি কাতরস্বরে বলিবে, মা, এই টেলিগ্রাম এসেছে—অত্যন্ত জরুরী বলেই আমি নিয়ে এসেছি—নীচেয় আর কেউ নেই। আমাকে ক্ষমা করুন।

স্বয়ং বাবুর হাতেই টেলিগ্রাম পৌছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রায়-নিঃসন্দেহ হইয়া নন্দ খোলা-দরজা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল···এবং দরজার সম্মুখে পৌছিয়াই পরমুহূর্ত্তে হাতের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল···হুঁশ রহিল না, এখন সে কোথায়, আলো না অন্ধকার, সিঁড়িতে পা দিয়া, না গড়াইয়া নামিতেছে, আর কোথায় সে চলিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে ফলগর্ভ এত বড় দৈবযোগ ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

কিন্তু আসিল সে ঠিক পথেই—পৌছিল সে নিজের ঘরেই এবং ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল নিজের চেয়ারটিতেই—

তখন ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে—মাথার ভিতর কেমন করিতেছে—সেই কেমন-করাটা অসাড়তা না যন্ত্রণা না ঘূর্ণন—তাহা উপলব্ধ হইতেছে না এবং মস্তিষ্কের সেই অবর্ণনীয় অবস্থার দরুণ তার চিন্তাশক্তি এবং নিজেকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্বিৎ লোপ পাইয়া গেছে···

টেলিগ্রাম-পিওনের প্রশ্ন তার কানে গেল না।

তারপর জন্মিল দুঃসহ প্রবল ত্রাস—

মা'র খাইয়া বিদায় লইতে হইবে—মারিবে জুতা না বেত!

নন্দর চক্ষু দেয়ালের দিকে নিষ্পলক হইয়া রহিল··· ক্রোধে আগুন হইয়া তার শাস্তিদাতার ক্ষিপ্র অবতরণের বিলম্ব আর কত!

যাহা দেখিবার নয় নন্দকিশোর দৈবাৎ তাহাই দেখিয়াছে সন্দেহ নাই—মূঢ়তার বশে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সে করিয়াছে—অসাধুতার নয়, মূঢ়তার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে ···

বাবু ঐ ঘরেই আছেন, কেবল উৎকৃষ্ট সাবানের গন্ধ পাইয়া তাহা অনুমান করা বুদ্ধির চূড়ান্ত জড়তা, অথবা যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে সেই নিয়তির ক্রীড়া ছাড়া আর কি!

সে জানিত না যে···

কিন্তু অপরাধ চিরকালই অপরাধ, আর না-জানিয়া অপরাধ করিলে সর্ব্বদাই তার ক্ষমা আছে এবং ফলভোগ

করিতে হয় না ' এমনও নয়, যথা আগুনে আঙুল পড়িলে আঙুল পুড়িবেই, আগুনে আঙুল দৈবাৎই পড়ুক, কি জানিয়া শুনিয়াই দাও।

ছি ছি—

ঐ শব্দ দু'টি নন্দকিশোর, আতঙ্কে অভিভূত হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল ···

সর্ব্বনেশে সেই টেলিগ্রামকে মনে হইয়াছিল দুঃসংবাদের বাহক, কারো শেষ মুহূর্ত্তের ডাক; সে-ই করিল এই সর্ব্বনাশ! আর, মাটি করিয়াছে সাবানের সেই গন্ধ—

সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়াই ত সে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মনে করিয়াছিল, বাবু খেউরি করিতেছেন; কিন্তু দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল, অন্য লোক—"একেবারে যাচ্ছে তাই ব্যাপার"।

প্রভুপত্নী, তরুণী রমণী, মাত্র একখানি তোয়ালে কটি-তট হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে পৃষ্ঠদেশ আবৃত—ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর—দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন্ ফিরিয়া এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ···

এক-পলকে নন্দ তাহা দেখিল—না-দেখা অসম্ভব; নন্দ আরো দেখিল যে, তাহারও প্রতিবিম্ব পড়িল সেই পাপ দর্পণেই, প্রভুপত্নীর বহু পশ্চাতে ···

আর সে দাঁড়ায় নাই; আর কিছু সে দেখে নাই; তারপর কিছু ঘটিল কি না তাহা সে জানে না; কিন্তু পরিণামে কি ঘটিতে পারে অর্থাৎ ফলভোগ কিরূপ হইবে, তাহা সে জানে···

সে পলাইবে না কি! থাক্ বাক্স বিছানা মাহিনা—মানরক্ষা সর্ব্বাগ্রে ··

কিন্তু মানরক্ষার্থে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ মিনিট্ পাঁচ-ছয় পরেই মণীন্দ্রের পদশব্দ আসিল সিঁড়ি হইতে—অপমানিত প্রভু মৃত্যু বিভীষিকার মতো অনিবার্য্য রুদ্র মূর্ত্তিতে অবতরণ করিতেছেন ··· নন্দর মনে হইল, তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন: "কই সে ব্যাটা?" ·· নন্দ ছিটকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কোণের দিকে সরিয়া গেল— তখনই সরিয়া আসিল বৃহদাকার টেলিগ্রাম-পিওনের পশ্চাতে···

মণীন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন—চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন—নন্দকিশোরের কম্পমান্ প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল · ক্রোধে যে ব্যক্তি একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়, সে-ই হয় আরো ক্ষমাহীন—

কিন্তু মণীন্দ্র তারস্বরে তাহাকে খুঁজিলেন না; সহজ লোক যেমন সহজভাবে কথা কয় তেম্নি সহজভাবে তিনি বলিলেন—এই নাও। একটু দেরী হ'ল। বলিয়া পিওনের হাতে রসিদ দিলেন।

পিওন চলিয়া গেল—

তৎক্ষণাৎ দেখা দিল ভারি একটা মুশকিল—নন্দর বুক ভাঙিয়া আসিল, দেখিল, তাহার আর ওঁর মাঝখানে অন্তরাল আর নাই ···

নন্দ ঢোক্ গিলিল—

মণীন্দ্র কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে, তুমি ছিলে কোথায়? টেলিগ্রাম বুঝি তুমি দিয়ে এসেছ ওপরে!

স্বীকার করিতে গিয়া নন্দর শুষ্ক কণ্ঠ এবং শুষ্ক জিহ্বা আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল—ঠোঁটের ফাঁক দিয়া শব্দের স্থানে খানিক বায়ু বাহির হইল কেবল।

মণীন্দ্র বলিলেন, রাখাল কি বলরাম ছিল না এখানে?

নন্দ আগে দিল একটু গলা-খাঁকারি—তারপর উহাতে বাক্‌শক্তি একটু কার্য্যকরী হইল, সে বলিল, না···

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে হিল্-উঁচু জুতার খট্‌খট্ দ্রুত শব্দ উঠিল—গৃহিণী আসিতেছেন···

তাহার সম্মুখেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বামীর কাছে করিবেন এবং প্রতিকার চাহিবেন এমন তেজে আর এমন ক্রুদ্ধ হইয়া যে···

কিন্তু কিছুই ঘটিল না—

স্বামীর জন্য তিনি দাঁড়াইলেন না পর্য্যন্ত—একাই অগ্রসর হইয়া গেলেন রোজ যেমন যান্—মণীন্দ্র তার অনুগমন করিলেন; বলিয়া গেলেন, তুমি বুঝি বেড়াও না মাস্টার?

নন্দকিশোর তখন গিয়া চেয়ারে বসিল—একেবারে গা ছাড়িয়া দিয়া অবিলম্বেই একটি নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল এবং সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার জ্বালা যন্ত্রণা উৎকণ্ঠা ভয় প্রভৃতি সমুদয় গ্লানি বহিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, ওঝার

ফুৎকারে বিষের মতো··· তারপর ক্রমে সে খুশী হইয়া উঠিল : এম্‌নি ক্ষমাই ত মানুষকে করা উচিত ; অজানত দৈবাৎ যে-অপরাধ ঘটিয়া যায়, যথার্থ ভদ্রলোক নিজেরই মনে তার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করে—বাহিরের শাস্তি কখনো অতিরিক্ত, কখনো অত্যাচার।

যে-ব্যাপার সংক্ষোভে তুমুল এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতি-জনক হইয়া উঠিতে পারিত তাহা ক্ষমাময় উদার নির্লিপ্ততার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে শেষ হইয়া গেছে। অন্য দিক্ দিয়া তাহার আর গুরুত্ব রহিল না—কেবল রহিল নিষ্কৃতি দানের দরুণ ওঁদের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা, আর অতুল আনন্দ···

পরদিন দ্বিপ্রহরে মণীন্দ্র আহারান্তে তাঁর কাজে বাহির হইয়া গেলেন।

নন্দকিশোর খাইতে বসিয়াছে—

ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—ডালটা কেমন হয়েছে, বাবু ?

নন্দ বলিল—ভালো হয়েছে।

—ঝোলটা ?

—ঝোলটাও ভালো হয়েছে।

—কিন্তু বাবু ত কিছু বল্‌লেন না !

মণীন্দ্র রোজ তারিফ বা নিন্দা করেন।

নন্দ তাহাকে সান্ত্বনা দিল ; বলিল—ভুলে গেছেন হয় ত। বলিয়াই নন্দ অনুভব করিল, ঘরের ভিতর মানুষের ছায়া পড়িল—ছায়া ভৌতিক নয়, কারণ পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর শুনা গেল : ঠাকুর, বলরাম কোথায় ?

শুনিয়াই নন্দকিশোর অধোমুখ শশব্যস্ত ত্রস্ত এবং মনে মনে পলায়নোদ্যত হইয়া উঠিল—মুখে ভাতের গ্রাস তোলার চাঞ্চল্য বন্ধ হইয়া গেল—এবং দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন গৃহিণী···

ঠাকুর বলিল—তাকে আমি একটু বাজারে পাঠিয়েছি মা, এক পয়সার পান আন্‌তে।

ঠাকুর বড্ড পান খায় এবং একটি করিয়া পয়সা সে রোজ পান-খরচা পায়।

কিন্তু গৃহিণী তখন মাস্টারবাবুকে লক্ষ্য করিতেছেন—বলিলেন—ঠাকুর এ-বাবুকে গাদার মাছ দিয়েছ যে ?

ঠাকুর হাত কচ্‌লাইতে লাগিল—

গৃহিণী ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, পেটির মাছ দেবে।··· খান্ আপ্‌নি ; খাওয়া বন্ধ করলেন কেন ?

ঠাকুরকে যেমন তাহাকেও তেম্‌নি আদেশই তিনি করিলেন ; নন্দকিশোরের মনে হইল, আদেশ মান্য করিতে সে বাধ্য। লজ্জায় চোখ মুখ লাল করিয়া আর ছোট ছোট গ্রাস মুখে পুরিয়া নন্দ আদেশ মান্য করিতে লাগিল···

গৃহিণী পুনরায় আদেশ করিলেন—ঠাকুর, দু'পয়সার মিছ্‌রি নিয়ে এস ত শীগ্‌গির। আমি এঁর খাওয়ার কাছে দাঁড়াচ্ছি।

নন্দকিশোরের মনে হইল, গৃহকর্ত্রীর এ-আচরণ খুবই অনুকম্পাময়, খুবই শিষ্ট, খুবই দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

ঠাকুর পয়সা লইয়া মিছরি আনিতে গেল—

একা পড়িয়াই নন্দকিশোরের বুক আবার বেজায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল—গৃহকর্ত্রীর অনুকম্পা, শিষ্টতা এবং দায়িত্ববোধ যতই স্নিগ্ধ আর শান্তিদায়ক হউক, স্নিগ্ধতা আর শান্তির সেই আবহাওয়া টিকিতে পারিল না—অপরাধের স্মৃতি সজীব আর কর্ত্রীর উপস্থিতি সেই মুহূর্তেই নিদারুণ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিল···

সে এতক্ষণে যেন তার একটা ভুল বুঝিতে পারিল : নিজেরই হাতে ধথেচ্ছ আর অবিসম্বাদিত শাসনক্ষমতা থাকিতে ইনি ঘটনার যথাযথ এবং আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া স্বামীর কাছে অকারণে লজ্জা পাইতে যাইবেন কেন ! পাপীকে দণ্ড দিবার হক তাঁর আছে—তাই দিতে তিনি আসিয়াছেন···

কিন্তু সব তার আগাগোড়া ভুয়ো, ভুল, আর ভুসোর মত কালো আর হাল্‌কা। নন্দ যাঁহাকে চণ্ডিকা, শাসনকর্ত্রী আর দণ্ডদাত্রী মনে করিয়া ভয়ে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেছে আর অনর্গল ঘামিতেছে, তিনি তখন তার অবনত মুখের দিকে তরল চক্ষে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন···

হাসিটুকু নন্দ দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্বর শুনিল : দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী বলিলেন—কাল হঠাৎ অমন ক'রে এসে দাঁড়ানো আপনার উচিত হয়নি।

খুঁজিলে ভৎর্সনার বিষ ঐ কথার ভিতর পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষমা ভিক্ষার সুযোগ পাইয়া নন্দর কথা ফুটিল, বলিল,

আজ্ঞে সেজন্যে আমি অপরাধী আর অনুতপ্ত—আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াও নন্দ তীব্রতম তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ··· কিন্তু তার কাতরতাকে অবিশ্বাস কেহ করিতে পারিবে না।

—আমি তখন কেবল গা ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আয়নার ভিতর আপনাকে দেখলাম—আপনার ছায়া পড়ল' ···

নন্দ তা জানে—

উনি বলিলেন, কিন্তু অমন ক'রে ছুটে পালিয়ে গেলেন ভয়ে, লজ্জায় না ঘৃণায় ?

ইহার কি উত্তর আছে! নন্দ কথা কহিল না, উঠিবার উপক্রম করিল ···

—ভয় পাবার কি ছিল! ঘৃণাই বা করবেন কেন! লজ্জা পেয়েছিলেন বুঝি! ও কি, খাওয়া শেষ না করেই উঠছেন যে? আমি তবে যাই এখান থেকে ···

চলিয়া গেলেন না—বোধ হয় মিছ্‌রি না লইয়া তিনি যাইবেন না। নন্দ উঠিল না, খাইতে লাগিল ···

—আপনার বিয়ে হয়েছে ?

নন্দ ধীরে ধীরে মাথা কা'ত করিয়া জানাইল, তার বিবাহ হইয়াছে।

তবে ত বোঝেনই সব। কিন্তু আর কখনো যদি ওপরে আসেন তবে খবর দিয়ে আস্‌বেন ?

উপরে আসিতে নিষেধ তিনি করিলেন না।

নন্দ বলিল, আজ্ঞে।

—তা-ই করবেন। আর একটা কাজ করবেন, আমার হুকুম ···

বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন—

আদেশ গ্রহণ করিতে মনে মনে মাথা পাতিয়া নন্দ হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল; সম্মুখবর্ত্তিনীর মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়িল—তাঁহাকে না দেখিয়া সে পারিল না এবং দেখিল যে, রূপ অজস্র—এত যে, আর এমন বিভ্রম ঘটানো তার উজ্জ্বলতা যে, দৃষ্টি রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখিতে ভুলিয়া গিয়া রূপের দিকেই নির্নিমেষ হইয়া থাকিতে চায় ···

তবু সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইল—

কর্ত্রী বলিলেন—আমার হুকুম মানবেন ত ?

নন্দ যেমন করিয়া বিবাহের কথা স্বীকার করিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করিয়া হুকুম মানিতেও সে তেমনি রাজি হইল—

কিন্তু সেটা যে এমন হাসির কথা হইবে তা কে জানিত! কর্ত্রী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—পালাবেন না, আমাকে যেমন দেখেছেন তেম্‌নি দেখা আমার ভালো লাগে—আপনাকে আরো ··· আপনি নির্ব্বোধ, তা-ই দিশে পান্‌ না—পালান্‌।

বলিয়া তিনি থামিলেন।

নন্দ সাষ্টাঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল যে, তিনি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর হাসিতেছেন ··

পরক্ষণেই তাঁর কাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ উঠিল—তিনি প্রস্থান করিলেন।

তারপর নন্দ কি করিল, কেমন করিয়া করিল; উঠিল, না বসিয়াই রহিল; খাওয়া শেষ করিল কি না: কোথা দিয়া সময় যাইতেছে; কেমন করিয়া আর কোন্‌ পথে আসিয়া সে তার তক্তপোষে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল, তাহা সে জানে না ···

খানিক্‌ অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার পর সময়ের শুশ্রূষায় ক্রমে তার চোখে দৃষ্টি, বুকে নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কে চিন্তার চৈতন্য এবং তার হাত পা নাড়িবার সামর্থ্য ফিরিল ··

নন্দ যেন বহুদিন পরে রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।

সেইদিনই বাক্স বিছানা আর কুড়ি দিনের বেতন ফেলিয়া সে চলিয়া আসিল—

মাকে বলিল, তাড়িয়ে দিলে।

মমতাকে বলিল, পালিয়ে এলাম। বলিয়া তার মুখ-চুম্বন করিল।

গোবিন্দদাসে শ্রীরাধার অভিসার

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী

গোবিন্দদাসের "রাধা" গাইলেন,

—"এ সখি, বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥"—

শ্যামের সাথে এমনি করে' নিজেকে-হারিয়ে-ফেলা মিলনে যদি মিলিত হওয়া যায়, তবে জীবন-মৃত্যু, বিরহ-মিলন সব যে সিন্ধুলীনা তটিনীর মত এক হয়ে যাবে—জীবনের সাথে মৃত্যুর—মিলনের সাথে বিরহের রইবে না কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিরোধিতা! সব কিছু সেখানে বিলীন হয়ে গড়ে' তুলবে বিচ্ছেদ-বিধুরতার অতীত এক মহামিলন। সে মিলন চিরন্তন—বিচ্ছেদবিহীন—মৃত্যুঞ্জয়ী!

যে প্রেমে এই মিলন—সেই প্রেমের সাধনাই রাধার জীবনের লক্ষ্য —তার প্রাণের আরাধনা। কিন্তু কেমন করে' সে এই সাধনাকে সফল করে' তুলবে? এই সাধনার পথ যে কভু গহন জটিল,

"কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল,
কভু সঙ্কট ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম।"

হ্যাঁ! রাধা তা জানে—তাই—

—"দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি' ॥—

তাই নব-অনুরাগিণী রাধার সাধনা সুরু হয়েছে তারই মন্দির মাঝে! "বিঘিনি বিথারল বাটে" তাকে চলতে হবে বিনিদ্র রজনী যাপন করে'। কণ্টক-শংকিল বারি-পংকিল পথে তার অভিসার।—তারই জন্যে রাধা গোপন সাধনায় মগ্ন হয়েছে—আপন মন্দিরে—

"কণ্টক গাড়ি' কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি' করি' পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি'।"—

এমনি করে' সে কণ্টকপথে চলবার সাধনা করছে নীরবে—মঞ্জীর-গুঞ্জন, চরণধ্বনি সব সন্তর্পণে শুদ্ধ করে'। যে অভিসারের উদ্দেশে সে যাত্রা করবে—তাতে কি কোন বাহ্যিক আড়ম্বর, কোন কোলাহল থাকতে পারে!……সেখানে যে সব কিছুকে শুদ্ধ হ'তে হবে—নিষ্কম্প-প্রদীপশিখা হয়ে চিত্ত শুধু অভীপ্সিতের তরে জ্বলবে! সমাহিত সাধনার নিবিড় তন্ময়তার মাঝে মিলিয়ে যাবে বাহিরের সকল কলগুঞ্জরণ! সাধক প্রেমিক যখন অন্তর-দেবতার অন্বেষণে আকুল হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে বহিরাড়ম্বর হয় শুধুই বিঘ্ন। সে তার প্রেমের পূজার অর্ঘ্য রচনা করে তার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে—অতি সংগোপনে। বাহিরের দিক থেকে সে নিজেকে করে' তোলে রিক্ত—কিন্তু অন্তর তার ভরে' ওঠে ঐশ্বর্য্যে। রাধার সাধনায় তাই নাই কোন আড়ম্বর, নাই কোন অনুষ্ঠান।—"অন্তরে ঐশ্বর্য্য তার অন্তরে অমৃত।"—নিন্দা-অপবাদের ভয় তার নেই—ঘর সংসারের বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে নি—দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব তার গেছে ভেঙ্গে।—

এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ
কানু-অনুরাগ- ভুজঙ্গে গরাসল
কুল-দাদুরি মতি-মন্দ।"—

সে জানে কি তার সাধনা। সে তার হৃদয়-দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার হৃদয়-মন্দিরে—সেখানে সে চিরজাগ্রত করে' রেখেছে তার প্রেম-প্রহরীকে—

—হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি'!—

নিন্দা-তিরস্কার, গুরুজন-গঞ্জনা? কীই বা বিক্ষোভ তারা আনবে, আর—কেমন করেই বা আনবে? সে সব কথা যে তার কানেই যায় না—সে সব কথা শুনলে সে যে "ঝাঁপি রহত দুহু কান।" গুরুজন বচনে রাধা "বধির সম মানই"—আর, "পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই।" এই নিন্দা-উপহাসের ভীতিই না চলার পথের সুমুখে বিস্তার করে' দেয় মসীমাখা কালো ছায়া—অন্তর্জগৎকে ঢেকে দেয় সংশয়ের তমসায়! কিন্তু এ অন্ধকার তারই কাছে—বাহিরের আঁখি যে রেখেছে খুলে—বাহিরের পানে যে রয়েছে চেয়ে। তাই বহির্মুখী চক্ষু দু'টিকে বন্ধ করে' অন্তর-আঁখির অনিমেষ দৃষ্টি মেলে রাধা চলেছে সাধনার পথে "তিমির পয়ানক আশে", যেন অন্ধকার সৃষ্টি না করতে পারে তার চলার পথে কোন বাধা। এই তো অভিসার! রাধা তা জানে—তাই, "কর যুগে নয়ন" আবরিত করে' সেই পথে চলবার সাধনাই সে করছে। তার শ্রবণকে সে যেমন করে' বধির করেছে—নয়নকে সে তেমনি করেই আবরিত করবে—'বাহির-দুয়ারে' সে এমনি করেই 'কপাট' দেবে! কিন্তু পথ যে বড়ই দুস্তর—"চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট!"—আশাকে আহত করে', সাধনার প্রত্যয়কে ধূলিসাৎ করে', অন্তরে নৈরাশ্যের অন্ধকার সৃষ্টি করার মত প্রত্যবায় যে পথে প্রচুর! এ পথের যাত্রী যারা—সংসার কেবলই চায় তাদের অন্তর-জগতে প্রবেশ করতে আপনার মুখে-মধু-বিষে-ভরা ভোগ সামগ্রী নিয়ে, ঠিক যেমন করে' সাপ চায় অন্ধকারে তার বিষদন্তে বিভ্রান্ত পথচারীকে অতর্কিতে আঘাত করতে। তাই সে—

—মণিকঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে।—

সাংসারিক বৈভব হাসিমুখে উৎসর্জন করে' রাধা তার অন্তরতমের নিকট হতে যে চিরন্তন বাণীর সন্ধান পাবে—সেই হবে তার পরম মন্ত্র—তারই বলে সে রুদ্ধ করে' দেবে সংসারের দংশনোদ্যত বিষমুখ!

এত উদ্যোগ—এত প্রচেষ্টা! রাধা কি তবে এ অভিসারে যাত্রা করবেই? তবে যে অনেক দুঃখ অনেক দৈন্য তাকে সইতে হবে! নিজের দেহ-মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ার খুলে তাকে যাত্রা করতে হবে দেহকে দূরে সরিয়ে! একে তো পথ অতি 'শঙ্কিল, পঙ্কিল'—আবার "তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল!" এরা সবাই যে তাকে কত বিব্রত করে' তুলবে! কীই বা আছে তার যা তাকে রক্ষা করবে! কীই বা তার আশ্রয়—কীই বা তার সহায়! শুধু আছে তার একখানি 'নীল-নিচোল', কিন্তু "বারি কি বারই নীল-নিচোল?" বাহিরের বাধাকে সে না হয় অতিক্রম করলো—দেহের ব্যথাকে সে না হয় উপেক্ষা করলো।—কিন্তু "হরি রহ মানস-সুরধুনি-পার"—হরি রয়েছে যে মানস-গঙ্গার পরপারে! এই মনকে পার হতে হবে গোকুলচন্দ্রের সাথে মিলিত হতে। কামনা বাসনা—অহংএর যারা অনুচর—তারা সবাই উতল হয়ে মনকে করে' তুলতে চায় ঝড়ের রাত্রির বজ্রনাদবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরংগসংকুল নদীর মত। এরই মধ্য দিয়ে "সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার?" এই সদা-বিক্ষুব্ধ মানস-গঙ্গাকে জয় করতে হবে—তাকে তরণ করে' যেতে হবে শ্যামের মহামিলন ক্ষেত্রে। সুমুখে এই বিপদসংকুল তটিনী—তার ওপর আবার "ঘন ঘন ঝন ঝন বজ্রনিপাত।"—

—ইথে যব, সুন্দরি, তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি' উপেখবি দেহ॥—

কিন্তু এই সতর্কতার বাণী কার তরে? রাধা তো কোন বাধাই মানবে না,—

—নব অনুরাগিণী রাধা
কছু নাহি মানয়ে বাধা।—

ঘনতমসাচ্ছন্ন ঘোর রজনী? না—আঁধারের ভয় তার নেই—রাধার প্রাণে যে প্রেমের আলো জ্বলছে তারি ছটায় কেটে যাবে সকল আঁধার—

—যামিনি ঘন আঁধিয়ার
মনমথ হিয়ে উজিয়ার।—

ঝঞ্ঝা-বিলোড়িত মানস-তটিনী?—না ও ভয়ও সে করে না,

—নিজ-মরিযাদ- সিন্ধু-সঞে পঙরলু
তাহে কি তটিনী অগাধা?—

আত্ম-অভিমানরূপ সিন্ধুকে সে তরণ করে' এসেছে—'মানস-সুরধুনি' তার কাছে আর দুর্লংঘ্য নয়! কামনা-বাসনার বাধা? সে তো অতি তুচ্ছ! রাধা এসেছে তার "অহং"এর লৌহপিঞ্জর হতে মুক্ত হয়ে—'আমিত্বে'র গণ্ডী অতিক্রম করে'। এখন কি আর কামনা-বাসনার মোহ কিংবা দেহের দুঃখ তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের এ শুভ অভিসারে কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারে? প্রেমের দেবতার 'কোটি কুসুম-শর' যাকে অবিরত বিদ্ধ করছে—তার কাছে বৃষ্টিধারা! প্রেমের অগ্নি যার অন্তরকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে—তার কাছে বজ্রের অনল! না, না, সে ভয় তার আর নেই! দেহকে ঘিরে যে সব কামনা বাসনা আশা আকাংক্ষা বিরাজ করে, তাদের সবাইকে সে পশ্চাতে ফেলে এসেছে—তাদের উদ্দীপক 'অহং'কে সে পরিপূর্ণরূপে রোধ করেছে।—দেহের বাধা তার কাছে কোন বাধাই নয়। সে যাবেই—সে যাবে তারই কাছে যার তরে তার অন্তর-প্রদীপখানি সদা উর্ধ্বশিখা হয়ে জ্বলছে—যার তরে মানসগঙ্গার সংকট-আবর্ত মাঝে সে ছুটে চলেছে নির্ভীক পরাণে।—সে যাবে তারই কাছে "যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ।" মানবে না সে কোন মানা। নদ নদী পর্বত সিন্ধুর কলরোল অশনিসম্পাত সব তুচ্ছ করে'—দেহের গর্জন আমিত্বের ভ্রূকুটি সব উপেক্ষা করে' সে যাবে তার প্রেমাস্পদের কাছে। ভয়?……ভয় কোথায়!

—ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি'
পন্থ দেখাওব মোর।—

বিঘ্ন?……

—বিঘিনি বিথারল বাট
প্রেমক-আয়ুধে কাট।—

প্রেমের আয়ুধ তার পথের বাধা সব কাটিয়ে দিয়ে এমনি করে' তাকে সর্বজয়ী করে' পৌঁছে দেবে শ্যামের সমীপে। পথের সম্বল?—পথের সম্বল তার ঐ নীল নিচোল। শুধু নীল নিচোল? হ্যাঁ—কিন্তু সে কি সামান্য! লোকে হয় তো ভাবে তাই। হয়তো ভাবে—মানুষের বিশ্বাসের মতই সে চঞ্চল—দুঃখের দমকা হাওয়ায় সে উড়ে যেতে চাইবেই। মানুষের বিশ্বাসটুকু যে চঞ্চল অঞ্চলের মত সদাই দোলায়মান। দুর্দৈবের অভিঘাতে অতিস্থির বিশ্বাসও তো উদ্বেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রাধার বিশ্বাস!—সে যে তার ঐ নীল নিচোলখানির মতই তার প্রাণের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে একেবারে স্থির ধ্রুব অচঞ্চল হয়ে! ঝড় ঝঞ্ঝা আঘাত অভিঘাত কিছুই পারবে না তাকে দোলাতে। দুঃখ নিন্দা নিরুৎসাহ পারবে না তাকে লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট করতে! সে ছুটে যাবে তার শ্যামের পানে এমনি অবিচলিত বিশ্বাসভরে। এই ধ্রুব বিশ্বাসের বলেই সে সার্থক করে তুলবে তার সাধনাকে। সংসার কি করে' তার দুর্জয় অন্তরকে রোধ করবে? সে যে তার প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে। তার প্রিয়তম যে তারই আশাপথ চেয়ে বসে আছে,

—যৈছে হৃদয় করি' পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।—

সজল নয়নে তার প্রাণপ্রিয় যে তারই প্রতীক্ষা করছে!…একথা যেমনি তার মনে পড়ে অমনি সারাটি হৃদয় ব্যথায় ভরে' যায়—তার প্রেম

ছলছল নয়ন দুটি বেয়ে নেমে আসে বারিধারা। তার বিরহ-বিধুর কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হতে চায়,

—বিরহ তাপে তব
অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ বাট পর
অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।—

সে তার প্রিয়তমের সাথে এমনি নিরবচ্ছিন্ন মিলনে মিলে থাকতে চায় যেন নিমেষের তরেও কোন ব্যবধান না ঘটে। ধরণীর ধূলি হয়ে সে সেই পথে ছড়িয়ে থাকবে "যাঁহা পহু অরুণচরণে চলি' যাত।" সে সেই সরোবরের সলিল হয়ে থাকবে যেখানে তার শ্যাম "নিতি নিতি নাহ।" সে চায় নিখিল প্রকৃতির মাঝে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে যেখানে তার জলধর শ্যাম নিত্য বিরাজমান। তার প্রেম তাকে বিশ্বের সাথে মিলিয়ে দিতে চায়—বিশ্বের শ্যামলিমার মাঝে তার প্রিয়তমকে প্রকাশ করে'। আপন প্রাণের স্পন্দন বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনের মাঝে উপলব্ধি করা—এই তো ভূমার প্রেম! এই প্রেম এমনি করে' যার হৃদয়ে জেগেছে—যাকে এমনি করে' আত্মহারা করে তুলেছে, তার মিলন-অভিসারে কি কোন বাধা অগ্রসর হতে পারে? তার অভীপ্সিত অভিসারে যাত্রা সে করবেই। প্রেমের কবি গোবিন্দদাস তাই আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে—পুলক-কম্পিত কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌লেন :—

"বিরহ মরণ নিরদন্দ
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ।"

রিক্ত পথিক! হতাশ হ'লে কি ঝড়ে?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাত্রি গভীর—আঁধারের মাঝে আলোকের স্মৃতি ভোলা,
রিক্ত পথিক! হতাশ হ'লে কি ঝড়ে?
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তোমার বিষাদে জটিল হোলো,
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে।
বসুধার বুকে নিদ্রাবিভোল জীবন-প্রভাতখানি,
জাগিতে চাহে না শুনিয়া আর্ত্তরব।
চলার চেতনা শেষ হয়ে আসে, থেমেছে কণ্ঠে বাণী,
সমুখে গলিত শব।

অশথ বটের শাখা-প্রশাখায় শুকায়ে গিয়াছে লতা,
কৃষ্ণচূড়ার ঝরে গেছে মঞ্জরী।
আজিকার গানে আজিকার সুরে তুলিয়া দুঃখ ব্যথা
ভেসেছে স্বপ্নতরী।
কাঁদিছে পথিক, কানপেতে শোনো সঘন অন্ধকারে
দুঃখ করিয়া কি হবে বন্ধু—বলো?
পাবে না সেদিন যে গেছে চলিয়া কুসুম-গন্ধভারে,
ধীরে ধীরে পথ চলো।

কত শুভদিন এসেছিল হেথা আলোর মেখলা পরে'
চন্দনমাখা ত্রিদিবের মালা গলে।
পাতার কুটীর পরমানন্দে গেছে চুম্বন ক'রে
উদার আকাশতলে।
এসেছিল কত ছন্দবলাকা ভাব ভারতীর গানে
মধুমিলনের মুখর মঞ্জু সাঁঝে।
রূপালী গগনে প্রথম তারকা দেখেছিনু এইখানে,
এই বনানীর কাছে।

বনকুন্তলে লক্ষ জোনাকা শোভিত সঙ্গোপনে
নাহন করিয়া হৃদয়ের নির্ঝরে,
কুহু ও কেকায় দুলিত বিটপী লতাপল্লব সনে
আবেশ আবেগ ভরে।
কত উৎসব হয়ে গেছে হেথা শ্যামল কানন ছায়ে
প্রাণের কুসুম বসিত প্রেমের জপে।
নৈশ ন রা নৃত্য করিত মন্দ মধুর বায়ে
ষড়ঋতু কলরবে।

রিক্ত পথিক! আজিকে সে সব ভুলিতে পারি না আর,
তোমার আমার দুর্যোগপথে বিপুল অন্ধকার।

সাধনার ফল

শ্রীআশালতা সিংহ

১

নমিতাদের স্কুলে যিনি নূতন হেড্‌মিস্ট্রেস্ হইয়া আসিয়াছেন, বয়স তাঁহার বেশি নয়; খুব বেশি হয় তো জোর কুড়ি কিংবা একুশ হইবে। কিন্তু বুদ্ধিতে বিদ্যায় ব্যক্তিত্বে মেয়েদের প্রিয় রেবাদি অতি আপন হইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন ম্যাট্রিকের খবর বাহির হইয়াছে। স্কুলে খবর আসিয়াছে আগে। নমিতার রেবাদি মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া গাড়ী-ভাড়া করিয়া একেবারে নমিতাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড বড় বাড়ী এবং ততোধিক বৃহৎ সংসার। সামনের হাতায় কয়েকটি ছেলে মার্ব্বেল খেলিতেছিল। খেলা থামাইয়া একজন কহিল, ওরে গাড়ীতে ক'রে কোথা থেকে মেয়েছেলেরা বেড়াতে এসেছেন। ভিতরে পিসীমাকে খবর দিয়ে আসি।

আর একজন বলিল, খবর দিয়ে আর কি হবে, একেবারে সঙ্গে ক'রে ভিতরে নিয়ে যা না।

হেডমিস্ট্রেস্ মিস রেবা রায় এমনই একটি ছোট ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেন।

তখন সকাল বেলা। আটটা কি সাড়ে আটটা হয় তো বাজিয়াছে। গৃহস্থের অন্তঃপুরে কাজকর্ম্মের একটা সন্ধিক্ষণ। সকলেরই ব্যস্ততার আর সীমাপরিসীমা নাই। ছেলেদের স্কুল-কলেজ আছে, বাবুদের কাছারি-আফিস আছে। কাহারও দশটা, কাহারও সাড়ে দশটায় ভাত চাই। মেয়েরা তরকারির ঝুড়ি, রান্নার জোগাড় লইয়া ব্যস্ত। নমিতা পিসীমার নির্দ্দেশমত কাচাকাপড় পরিয়া শুদ্ধ হইয়া আচারের হাঁড়ি রোদে দিতেছিল, হঠাৎ রেবাদিকে দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। দুই হাতে আচারের তেল হলুদ লাগিয়া রহিয়াছে, পরণের কাপড়টায় কালির দাগ। এবাড়ীর গৃহিণী বিধবা পিসীমা ন'হাতি থাট তসরের ধুতি পরিয়া মালা করিতে করিতে কাজ কর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতেছেন। ন'বৌদির কোলের মেয়ে ক্ষেন্তিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বার্লির বাটি হাতে তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছে। এই দৃশ্য ও এই পরিবেশের মাঝে রেবাদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই মুহূর্ত্তে যদি কোন উপায়ে মিস্ রায়ের চোখের সুমুখ হইতে সে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে ভগবানের কাছে আর কিছুই চাহিত না। কিন্তু ততক্ষণে মিস্ রেবা রায় তথায় আসিয়া আনন্দ-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে কহিলেন, ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বার হয়েচে, স্কুলে খবর এসেচে। নমিতা তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ হয়েচ, আর পঁচিশ টাকা ক'রে স্কলারশীপ পেয়েচ। আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ ইউ। তোমার জন্যে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হ'ল। খবরটা তোমাকে তাড়াতাড়ি দিতে ছুটে এলুম।

নমিতা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল, পিসীমা ওদিক হইতে ভীষণ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, তোর রকমটা কি বল্ দেখি লা নমিতা! কাগে মুখ দিচ্চে না হাঁড়িগুলোতে। দেখতে পাচ্চিস না? লোকে কথায় বলে আচার, বিনা আচারে এসব জিনিষ দুদিনে পচে গোবর হয়ে উঠবে না। আসুক আজ বরেন বাড়ীতে। তোমার রাতদিন পড়া আর পড়া আমি বার করচি। একটি কাজ যদি পাবার জো আছে এতবড় ধাড়ি মেয়েকে দিয়ে—বলিয়া তিনি রেবার দিকে অপাঙ্গে একবার ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষে চাহিয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ঘন ঘন হরিনামের মালা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে নমিতার রাঙাবৌদির রুচি মার্জ্জিত এবং এখনও ছেলেপুলে হয় নাই বলিয়া ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

নমিতা তাহার রেবাদিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই ঘরে একটি চেয়ারে বসাইল এবং ইঙ্গিতে রাঙাবৌদিকে একটুখানি চা-জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিল। ঘরের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে মাকালীর একটি পট টাঙানো ছিল, সেইদিকে চাহিয়া মিস্ রেবা বলিলেন—আশ্চর্য্য নমিতা তুমি, এই বাড়ীতে এই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও তুমি এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি! এ যেন কল্পনাতে আনতেও বাধে।

নমিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার বড়দা আর মেজদার কথা শুনি, তাঁরা নাকি সব বিষয়ে য়ুনিভার্সিটিতে রেকর্ড মার্ক পেয়েছিলেন। রাঙাদা সেই স্কুল থেকে এম-এ পর্য্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হয়েচেন। ছোটদা প্রফেসারি করচেন, কর্ত্তৃপক্ষ শীগ্‌গীর স্টাডি লিভ্ দিয়ে নিজেদের খরচে তাঁকে বিলেত পাঠাচ্চেন। শিক্ষাবিভাগে এর মধ্যে তাঁর সুনাম হয়েচে খুব।

রেবা বাঁ চোখ একটুখানি কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আশ্চর্য্য তো। বাইরে থেকে দেখলে লোকে মনে করবে, একটা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার। আর তোমার ঐ পিসীমা, উনি তো রীতিমত ভীতির ব্যাপার। আমি তো প্রথমটায় ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, এসেই বিপদ।

এমন সময় পিসীমার কাংস্যকণ্ঠ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, ও রাঙাবৌ, একবার দেখে এস দিকি মা, নমিতা আবার কোথায় গেল। ওই খ্রীস্টানীকে ছুঁয়ে সেই কাপড়ে আবার সৃষ্টি একাকার করছে নাকি মা। এই ম্লেচ্ছর সংসারে আর আমার থাকা চলবে না দেখচি! আসুক আজ রমেন বাড়ী, আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিক। একটা মিনিটও আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। রমেন আবার বলে বিলাত যাব।

রাঙাবৌ মিনতির সুরে বলিতেছে, আপনার পায়ে পড়ি পিসীমা, চুপ করুন। অত জোরে চেঁচাবেন না। উনি তো সামনেই আমার ঘরে বসে রয়েচেন, সমস্তই শুনতে পাবেন যে। তা ছাড়া, উনি খ্রীস্টানই বা হতে যাবেন কেন; শুনলে অবাক হবেন, উনি আমাদেরই জাত। এই বয়সে বি-এ, বি-টি পাশ করেছেন। কত শিক্ষিতা। আজকাল কত ভদ্রঘরের মেয়ে চুপচাপ বাড়ীতে বসে কবে বিয়ে হবে সেই অপেক্ষায় না থেকে নিজেরা কাজ ক'রে উপার্জ্জন করচেন। এ তো আর কিছু মন্দ কাজ নয়। নমিতা যে ওর রেবাদির মহাভক্ত, ওর কাছেই সব শুনেচি কি-না।

পিসীমা উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, নাও আর মেলাই বাজে বোকো না মা। খুব ভালো কাজ। তোমাদের মাথায় রমনা এই সব ঢুকিয়েচে। বাবু নিজে বেলাত যাবেন, তাই বসে বসে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে বিবি বানানো হচ্ছে।

রাঙাবৌদির ঘরের খোলা জানালা-পথে সমস্ত কথাবার্ত্তাই শোনা যাইতেছিল। ক্ষোভে দুঃখে নমিতা উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। রেবা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর তো আমি থাকতে পারিনে নমিতা, স্কুলের বেলা হচ্ছে। তোমার পিসীমাকে বুঝিয়ে বোলো যে, তোমার পাশের খবরে ভারি আনন্দই হয়েছিল তাই খবরটা দিতে এতদূর এসেছিলুম। এছাড়া আমার অন্য অভিসন্ধি ছিলো না। বুঝিয়ে দিলে হয় তো বা তিনি অবিশ্বাস না-ও করতে পারেন।

নমিতা অনুনয় করিয়া কহিল, ওঁর অমনি কথা। আমরা তো অষ্টপ্রহর ঐ শুনচি। আপনি চলে যাবেন না রেবাদি। রাঙাবৌদি আপনার জন্যে একটু চা আর খাবার তৈরী করছেন। না খেয়ে গেলে তাঁর ভারি দুঃখ হবে।

রেবা গম্ভীর হইয়া কহিল—না, সে হয় না নমিতা। তুমি বুদ্ধিমতী, সমস্তই তো বুঝতে পারচ। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অশান্তি ঘটাতে চাও কেন? তোমাদের বাড়ীর যে সব পাত্রে আমাকে খেতে দেবে, খ্রীস্টান বলে সেগুলো হয় তো ফেলা যাবে, তোমার পিসীমা ...

দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি সুশ্রী যুবা ঘরে ঢুকিল। নমস্কার করিয়া রেবার দিকে চাহিয়া বলিল, মাপ করবেন। আপনারা দরকার হলে তো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাই আমি দুটো কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলুম না। পাশের ঘরে বসেছিলুম, আপনাদের কথাবার্ত্তা কানে গেল। আচ্ছা, এত অল্পেতেই চটে উঠেচেন কেন বলতে পারেন? কিন্তু কথা শুনিবে কি তাহার দিকে চাহিয়া রেবার চোখ আর কিছুতেই ফিরিতে চাহিল না। কী দীপ্ত আভা সারা মুখে। প্রশস্ত ললাটে যেন বুদ্ধির আলো জ্বলিতেছে। দৃপ্ত তেজ এবং অত্যন্ত কমনীয়তার সমন্বয়ে সে মুখ অপূর্ব্ব।

রমেন তখন বলিয়া চলিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস তো পড়েচেন, দেখেচেন ভারতের সাধনার ধারাটা কোন্ দিকে। কত বিরুদ্ধ মত, কত বিরুদ্ধ সংঘাত, কত বিভিন্ন জাতিকে সে নিজের কোলে টেনে এনে সমন্বয়ে আনতে চেয়েছে। হিন্দু পরিবার সেই সাধনারই ছোট সংস্করণ। একথাটা যদি বুঝতেন, তাহ'লে আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, আজ কখনই রাগ করতে পারতেন না। আমাদের এই বাড়ীতেই দেখুন না—পিসীমা আছেন; নমিতা আছে,

রাঙাবৌদি আছেন, আবার আমিও আছি। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মত, স্বতন্ত্র আদর্শ, তবু কাউকে বাদ দেবার উপায় নেই। পিসীমা আছেন তাঁর বড়ি, আচার, জপেরমালা, হাঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে, নমিতা যাবে বেথুনে আই-এ পড়তে। তার মনটা ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কুঁড়ির বাইরে উধাও হয়েচে। আমিও শীগ্‌গীর স্টাডি লিভ্‌ নিয়ে বিলেত যাচ্ছি। প্রত্যেকেই কত আলাদা বলুন তো! তবু প্রত্যেকেরই এবাড়ীতে অক্ষুণ্ণ অধিকার আছে। একটা সমন্বয়ের সাধনা বুঝলেন না?

পিছন হইতে কে মিষ্টকণ্ঠে কহিল, খুব বুঝেচেন। কিন্তু ঠাকুরপো, এখন তোমার বক্তৃতা একটু থামাও ভাই, উনি চা খাবেন।

নমিতার রাঙাবৌদি চায়ের ট্রে ও জলখাবার লইয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

রাঙাবৌদি মিষ্ট হাসিয়া কহিলেন, এটি আমার ছোট দেওর, শ্রীযুক্ত রমেনবাবু। কিন্তু প্রফেসারি করতে করতে এঁর ভারি একটি কু-অভ্যাস হয়েচে যখন তখন বক্তৃতা দেওয়া। সাধারণ ভাষায় কথা বলতে যেন ভুলেই গেছেন। … ও কি ছোটঠাকুরপো, রাগ করলে নাকি? রমেন ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কহিল, না। কিন্তু আমার ঘরেও শীগ্‌গীর এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিও। দেখো যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় না।

তাহার কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ফেলিল। নমিতা আশ্বস্ত হইয়া দেখিল—তাহার রেবাদির আর রাগ নাই।

প্রস্থানোদ্যত রমেনের দিকে চাহিয়া রেবা কহিল, দেখুন, আপনাদের বাড়ীর এই সব বাসনে চা খেলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমন্বয়ের সাধনা সেগুলো বাঁচাতে পারবে কি? আমার ভয় হয়, আপনার পিসীমার ক্রোধানলেপুড়ে সেগুলো নষ্ট না হয়ে যায়।

রমেন সগর্ব্বে কহিল, ভারতবর্ষের সাধনা কত অসাধ্য সাধন করেচে জানেন? এ আর তার কাছে কি! নমিতার কাছে শুনেচি, আর আজ নিজেও দেখলাম, আপনি তো আমাদেরই মত, আমাদের চেয়ে কোথাও আলাদা নয়। কিসের সঙ্কোচ আপনার?

রমেন চলিয়া গেলেও তাহার শেষের কথাগুলি রেবার দুই কান ভরিয়া বাজিতে লাগিল এবং ফিরিবার পথে অপমানের সমস্ত জ্বালা নিভাইয়া দিয়া তাহার সমস্ত মন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসে কেন যে ডুবিয়া রহিল তাহা কিছুতেই সে ঠাহর করিতে পারিল না। আসিবার সময় ঠাট্টা করিয়া নমিতার রাঙাবৌদি বলিয়াছিলেন, আপনার মত কারো সঙ্গে যদি ঠাকুরপোর বিয়ে হয় তবেই আশা আছে; নয় তো আমাদের মত মূর্খের কাছে অবিশ্রান্ত বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে সে যেমন বক্তৃতা দিতে শিখেচে চিরদিনই তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

একলা গাড়ীর গদিতে ঠেস দিয়া সেই কথাটা মনে হইতেই সে লজ্জায় অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিল।

২

সেদিন সকালের ডাকে রেবার নামে একখানা চিঠি আসিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল কাকা লিখিয়াছেন।

"মা, একটা সুখবর আছে, আমিও সামনের মাস হইতে —পুরে বদলি হইয়াছি। তুমি যদি বোর্ডিং ছাড়িয়া আমার বাড়ীতে এস, তবেই জানিব তুমি যে শহরে চাকরি করিতেছ তথায় বদলি হওয়া আমার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হইয়াছে। আর একটা কথা মা বলি বলি করিয়াও তোমাকে বলা হয় নাই। অনেকেই মনে করে এবং কেহ কেহ প্রকাশ্যেও বলিতেছে, তোমার বাবা নাই বলিয়া আমি তোমার বিবাহের অযথা দেরী করিতেছি। কিন্তু লোকের কথায় কিছু আসে যায় না; এ বিষয়ে তোমার মত কি যথার্থরূপে জানিবার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া অবধি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"

রেবার মনের মধ্যে কিছুদিন হইতেই একটা পরিবর্ত্তন কাজ করিতেছিল, চিঠিখানা পড়া শেষ হইয়া গেলে মুড়িয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া জানালার বাহিরে চাহিল। বিবাহের কথায় এতদিন সে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, নেহাৎ যদি কল্পনায় কখনও সে কথা উঠিয়াছে তাহা হইলে নিরালা নিভৃত স্থানে কোন সিভিলিয়ান বা বড় চাকুরের বাড়ীর অজস্র আরাম এবং স্বাধীনতার ছবিটাই মনে জাগিয়াছে। কিন্তু এখন সর্ব্বদাই মনে যে দৃশ্য ভাসিয়া ওঠে তাহার স্বরূপ টের পাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। নমিতাদের বাড়ীর সেই অদ্ভুত গোঁড়ামি, সেই অসহ্য রুচি ও অসম্ভব কোলাহল, আর সে সমস্ত ছাপাইয়া একটি দৃপ্ত উজ্জ্বল আশ্চর্য্য সুন্দর মুখ।

কয়েক দিন আগে গঙ্গার ধারের চরটায় বেড়াইতে গিয়া দূরে রমেনকে পায়চারি করিতে দেখিয়াছে কিন্তু একটা ভদ্রতার নমস্কার মাত্র সারিয়া রেবা একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। নিজের মনকে যাচাই না করিয়া আর মুখোমুখি গল্প করিবার ভরসা তাহার হয় না।

৩

সন্ধ্যার বিশ্রব্ধ অবকাশে বোর্ডিংয়ের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সভা বসিয়াছিল। মিস্ বেলা শুহ একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, নাঃ, আর ভালো লাগে না। রোজ রোজ সেই থাড়াবড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া। তার উপর ফিফ্‌থ্ ক্লাস আর নাইন্‌থ্ ক্লাসের মেয়েরা এমন নির্জীব, এমন ডাল্ (dull), রোজ রোজ ওদের অঙ্ক কষাতে পারিনে, সে এক শাস্তি।

শিপ্রা মল্লিক বলিলেন, শাস্তিটা আর কার কম, চল না একদিন সবাই মিলে ওপারে পিক্‌নিক্ ক'রে আসা যাক। খানিকটা সময় ভালো কাটবে এই একটানা রুটিনের মধ্যে।

অরুণা রায় কহিল, মন্দ প্ল্যান নয়, গেলেও হয়। তোমরা সব বন্দোবস্ত কর না। কিন্তু রেবাদি, সেদিন আপনি যে ব্লাউজটা পরেছিলেন, কাইণ্ডলি সেটা আমাকে একবার লেণ্ড্ করতে হবে। ভারি চমৎকার প্যাটার্ন, তুলে নেব ভাবচি।

সুনীতি উচ্ছ্বাসভরে কহিল, নাও নাও, এখন তোমার প্যাটার্ন রাখ, কি চমৎকার সিনারি হয়েছে দেখ। গাছের আড়াল দিয়ে চাঁদ উঠচে, গ্লোরিয়াস !

বেলা অস্ফুট গদগদ কণ্ঠে কহিল, মাই গড্, হাউ লাভ্‌লি !

রেবাও বসিয়াছিল, এতদিন সে ইহাদেরই সঙ্গে গল্প করিয়া অবসর এবং চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মনে হইতেছিল, জীবনের সমস্ত গুরুদায়িত্ব ও বাস্তবতাবর্জ্জিত হইয়া পাঁচ বছরের ছেলে যেমন খেলনা হাতে উচ্ছ্বাসভরে চেঁচায়, অনর্থক বকে, অকারণে হাসে, ইহারাও যেন তেমনই করিতেছে। সত্যকার জীবনের সহিত ইহার কোথাও কোন যোগ নাই।

সুনীতি কহিল, শুনলুম রেবাদি, আপনি নাকি সেদিন সকালে নমিতাদের বাড়ী গেছলেন! কেমন লাগলো? ঐ জিনিষটি কিন্তু বাপু আমার আদৌ বরদাস্ত হয় না। ম্যাট্রিক ক্লাসের উষাঙ্গিনী অনেক জেদাজেদি করায় একদিন তাদের বাড়ী গিয়েছিলুম। বাবা, সে কি গোলমাল, একপাল ছেলের চ্যাঁ ভ্যাঁ, বিরক্তিকর একেবারে। সেই থেকে আর কখনো কারো বাড়ী যাইনে বেড়াতে। ইচ্ছে হ'লে গঙ্গার ধারে বা খোলা মাঠে বেড়ালেই হ'ল। তাতে শরীর ও মনের উন্নতি হয়।

রেবা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, কেন, ছেলেপুলের একটু কান্নার উপর এত বিরাগ কেন? এরপর নিজের যখন হবে তখন গঙ্গার ধারে গিয়ে কেমন ক'রে বসে থাকবে শুনি?

জবাব শুনিয়া সুনীতি, বেলা, অরুণা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল তাহারা, এই সেই রেবাদি! যাহার নিখুঁত আভিজাত্য এবং ওজন-করা কথা এতদিন তাহাদের সপ্রশংস শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের এতদিনকার উপাস্য দেবতার সম্বন্ধে তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আসন্ন হইয়া উঠিল।

৪

প্রায় মাসখানেক হইল রেবার কাকা আসিয়াছেন এবং তাঁহার কাছেই রেবা উঠিয়া আসিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহার কাকাকে চা দিতে বাহিরের ঘরের দিকে আসিতে আসিতে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া স্পষ্ট চোখে পড়িল, রমেন বসিয়া তাহার কাকার সহিত গল্প করিতেছে।

ভিতরে ঢুকিয়া শান্তভাবে সে নমস্কার করিল।

রমেন হাসিয়া কহিল, আমাদের বাড়ীতে একদিন গিয়ে যা অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন আর যেতে সাহস হয় না বোধ হয়, না?

রেবা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়াও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ঠিকই অনুমান করেচেন। কিন্তু আপনার সাহসের তো কিছু অভাব দেখচিনে। ধরুন, আজ যদি সেই অভ্যর্থনার শোধ নিই।

রমেন কহিল, তা হ'লে হয় তো আপনার মনের ক্ষোভ খানিকটা কমে। কিন্তু উজ্জ্বল বাতির আলোয় রেবা স্পষ্ট দেখিল, রমেনের হাসি হাসি মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া

গেছে। কি একটা অত্যন্ত আশা করিয়া সে যেন হতাশ হইয়াছে।

রেবা অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, ও কথাটা আমি তামাসা ক'রে বললুম মাত্র।

রমেন মৃদুস্বরে বলিল, আপনি কি মনে করেন তামাসা আমি বুঝতে পারিনে, বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়!

রেবা কহিল, তা খানিকটা মনে করি বই-কি। আমার মতে আপনি দুনিয়ার মধ্যে এক ভারতবর্ষের ইতিহাসই সম্যকরূপে বোঝেন। আর কিছু বড় একটা বোঝেন না।

রমেন অন্য দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি যে খুব বেশি বোঝেন তাও আমি মনে করিনে। যে মানুষ অল্পেতেই রেগে যায় সে ধীরভাবে বুঝবে কি?

রেবা কহিল, বেশ, ঝগড়া এখন থাক। যাই, আমি আপনার চা নিয়ে আসি।

রেবার কাকাবাবু ডাকিয়া কহিলেন, অমনি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে এস রেবা। রমেনের সঙ্গে ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে রোজই যে আমার দেখা হয়। বড় ভালো, বড় জ্ঞানী ছেলেটি।

রমেন একটু হাসিয়া রেবার দিকে চাহিয়া কহিল, যান, এবার অতিথি সৎকারের আয়োজন করুনগে। কি আর করবেন বলুন—গুরুজনের আদেশ।

মাসখানেক পরে একদিন রেবার কাকা তাহাকে ডাকাইয়া ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, তোমার একটা মত না নিয়ে তো আমি হাঁ না কিছুই বলতে পারিনে মা। রমেনের বড়দাদা তোমার সঙ্গে রমেনের বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন। বেশি দেরী করবার সময় নেই। রমেন সামনের মাসে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে।

বহু চেষ্টা করিয়াও না শব্দটা রেবা কিছুতেই মুখে আনিতে পারিল না।

বিবাহের পর রমেন বলিল, আমি তো চলে যাব, কিন্তু সে সময়টা তুমি থাকবে কোথায়? কাকার বাড়ীতে? সেই ব্যবস্থাই ভালো। রেবার চোখেমুখে কৌতুকহাস্য উচ্ছল হইয়া উঠিল, কহিল, কেন সে ব্যবস্থা ভালো কেন? আমার নিজের বাড়ী কি নেই যে কাকার বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা হবে।

রমেন তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, সত্যি তাই কি মনে কর? এইটুকু যদি সম্বল পাই তা হ'লে একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যায়। কিন্তু পিসীমা…

রেবা বাধা দিয়া কহিল, সে আমি জানি। পিসীমা একটু আচার বিচার মেনে চলেন বলেই যে নিজের বাড়ী ছেড়ে আমায় থাকতে হবে তার কোন মানে আছে কি?—তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, তা ছাড়া, এই ঘরটি ছেড়ে এখন বোধ হয় আর একটা রাত্রিও আমি অন্যত্র থাকতে পারিনে। আমি যখন তোমার জীবনে ছিলাম না, তখনও তুমি এই ঘরে তোমার কত চিন্তা কত আশা ও আদর্শ নিয়ে দিন কাটিয়েছ। এর চারিদিকেই তো তুমি।

রমেন কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া রেবা হাসিয়া কহিল, দোহাই তোমার, আর এক দফা যেন ভারতবর্ষের ইতিহাস আর তার সাধনার পালা শোনাতে বোসো না। তোমার ঐ স্কুল মাস্টারি আমার ধাতে সইবে না। মাস্টারি জিনিষটার উপরই বিতৃষ্ণা ঘটেচে। অনেক করেচি কি-না, সেই জন্যেই বোধ হয়।

রমেন কহিল, না, ভারতবর্ষের সাধনার কথা আর বলার প্রয়োজন হবে না। কারণ সেই সাধনার ফল তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি সামনেই।

গভীর অরণ্যে একটি রাত্রি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এম-বি-ই

সন্ধ্যা আগত প্রায়। জনমানবহীন মেঠো পথ। গরুর গাড়ী চলিয়া চলিয়া দুই ধারে ফুটখানেক করিয়া গভীর হইয়া গিয়াছে। গাড়ী চলিলে রেলের লাইনের মত সোজাই চালাইতে হয়, মোড় ফিরাইবার উপায় নাই। পাড় ওঠার মত স্থানটি ঘাসে আচ্ছাদিত থাকিলেও মাঝে মাঝে এখনও পাথরের কুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সময় ইহা রাজপথ ছিল। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার হস্তান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে এমন একটি গোষ্ঠীর নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে যাঁহাদের নিকট বৎসারান্তে কয়েক ঝুড়ি মাটীর বেশী প্রত্যাশা করিবার উপায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ত্তাদের নেকনজর যে এদিকে আকর্ষিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ নূতন ফেলা মাটি মাঝে মাঝে ঢিপির আকার ধারণ করিয়াছে। লেভেল করা হয় নাই— হইবেও না। সকলে জানে উপযুক্ত সময় গরুর গাড়ীর চাকাই এই সামান্য ত্রুটি ঠিক করিয়া লইবে। উদ্দেশ্য সাধু হইলেও কীর্ত্তিটি কর্ত্তাদের হৃদয়হীনতার পরিচায়ক হইয়া আছে। প্রমাণ আমার নাসিকা এবং টাকযুক্ত মাথা। ইতিমধ্যে যে কয়বার হেঁচকা খাইয়াছি, তাহাতেই উক্ত অঙ্গের স্থানে স্থান বিশেষ স্ফীত ও চিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে এবং যে কয়টি হেঁচকা বাকী আছে, তাহাতে যে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে সন্দেহ করি না। শুক্‌না বাঁখারির ছাউনির সহিত সজোরে সংঘর্ষিত হইলে মানুষের চামড়া আর কত সহ্য করিতে পারে।

সরকারী কাজ। গভীর অরণ্যে মন্দিরের ছবি পরীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলাম। গাড়োয়ান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাম্পে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তারযোগে উপরওলা তাড়া দেওয়ায় সকলেই না খাইয়া ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়াছিলাম। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়াছে, তাহার উপর রাত্রেও যদি অভুক্ত থাকিতে হয় তাহা হইলে সময়মত রিপোর্ট লেখা আর সম্ভব হইবে না। গো-যানে নাসিকার সামান্য বিকৃতি মারাত্মক নয়, কারণ আমার তাহাতে সৌন্দর্য্যহানির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু রিপোর্টের বিলম্ব হইলে কর্ণ ও প্রাণ পর্য্যন্ত দলিত হইতে পারে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, কিন্তু আহার সম্বন্ধে আমার শুচিবাই ছিল। পাশাপাশি দুইটি গ্রামের মাঝে একটিমাত্র পুষ্করিণী;—তাহাতেই স্থানীয় লোকেরা অবগাহন স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় কাচা, থালা ধোয়া এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে মনকে দৃঢ় করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমরা চলিয়াছি। ঈশান কোণে তখন বিক্ষিপ্ত ধূসরবর্ণ মেঘের টুক্‌রা ক্রমান্বয়ে ঘোরতর কৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। ঝড় ও বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি ঠাণ্ডা বাতাসে। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় শুক্‌না থাড়াই ঘাসগুলি দুলিয়া উঠিতেছে। রাস্তার দুই ধারে পানের বরোজ। মাঝে মাঝে থাড়াই ঘাস, নারিকেল, খেজুর ও বট গাছ। গন্তব্য স্থানে পৌছিতে তখন আট মাইল পথ বাকী। পথের মাঝে দুই মাইল প্রস্থ ত্রিশ মাইল দীর্ঘ জঙ্গল। তাহার পর হিন্দুপুরের মাঠ। মাঠ উত্তীর্ণ হইলে গ্রাম। কোন প্রকারে জঙ্গলটা পার হইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মেঠো পথ, বাদলা হাওয়া, চাকায় ক্যাঁচর ক্যাঁচর খট্ শব্দ, ঝিল্লি পোকা এবং ভেকের ডাকে যে ঐক্যতান সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কেমন একটা রসোদ্দীপক প্রভাব ছিল। অজানা প্রিয়া এবং ছোট্ট একটি নিরিবিলি ঘর যে মনে মনে গড়িয়া তুলি নাই বলিতে পারি না। ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমি একজন ডিসিপ্লিনড্ সরকারী অফিসার। সরকারী কর্ত্তব্য সাধনই আমার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রিয়ার স্থান সেখানে নাই। চমক ভাঙ্গিল হঠাৎ গাড়ীটা একদিকে কাৎ হইয়া যাওয়ায়। ধাক্কা সাম্‌লাইয়া নাসিকার গঠনের পরিবর্ত্তন হস্তের দ্বারা অনুভব করিতেছিলাম—বহু দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। চারপাশে তাকাইয়া দেখিলাম গোধূলির শেষ দীপ্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। অদূরে বনানী গভীর হইয়া আসিয়াছে এবং তাহার গাঢ় ছায়ার ঘোরতর

অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই গর্ভে আমাদের রাস্তাটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সামনেই ভাঙ্গা পোল। তাহার জন্ম-ইতিহাস জানিতে হইলে সুদূর অতীত অনুসন্ধান করিতে হয়। খিলানগুলিতে বালির চিহ্ন মাত্র নাই, ইটগুলিও গলিয়া গিয়াছে।. মাঝে মাঝে ভীতিপ্রদ ফাটল সরীসৃপের আবাস স্থান হইয়া আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়—পোলটি এখুনি বুঝি ধসিয়া পড়িবে। পোলের তলায় নালাটিও ভয়াবহ। ফাটলের প্রতিবিম্ব নানারূপ ধরিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাড়োয়ান অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া গরু দুইটাকে টিপি অতিক্রম করাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জেদী জন্তু দুইটা—কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কান খাড়া করিয়া পাশের খাড়াই ঘাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। আতঙ্কের কারণ অদৃশ্য হইলেও বলদ দুইটার কাছে তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।

আমারও কান খাড়া করা ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকিতে ছিল না। গত বৎসরই ত ঠিক এই ঘটনার পরমুহূর্ত্তে বাঘের মুখ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। খানসামাটা ঠিক সময় দেখাইয়া না দিলে এবং তৎক্ষণাৎ রাইফেলে ট্রিগার না টিপিলে আজ আমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিত। পাঁচ-ছয় হাত তফাতে নয় ফিট ব্যাঘ্রের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। টিপ করিবার পর্য্যন্ত সময় ও সাহস ছিল না। চোখ কান বুজিয়া ঘোঁড়া টিপিয়াছিলাম মাত্র। ৪২৫ বোর্ হইতে নির্গত ঘূর্ণায়মান গুলি বাঘকে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া পিছনের গাছে প্রায় তিন ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছিল। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনার যোগাযোগ ভাবিতেই অজানা প্রিয়া ও গোপন ঘর উধাও হইয়া গেল। অভ্যাস মত বসিবার স্থানটি হাতড়াইতে লাগিলাম—রাইফেল নাই। মোটা কোটের পকেট খুঁজিলাম—রিভলবার নাই। হেড আপিসের তাড়ায় দুইটি অস্ত্রই সঙ্গে লইতে ভুলিয়াছি। ড্রইংরুমে তর্ক উঠিলে সব সময় চার্ব্বাককে সমর্থন করিতাম। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিরাকারে বিশ্বাস তো দূরের কথা, শিব, দুর্গা, কালী সব কয়টি দেবদেবীর আরাধনা একযোগে সুরু করিয়া দিলাম। হৃদয় ঘোরতরভাবে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রাহি মধুসূদন ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা অন্তরে নাই। ভয় যে পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবারও উপায় নাই। হাজার হোক্ লোকে ভাবে আমি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, আমার অধীনে ···

ভাবিলাম, গাড়োয়ানটার গা ঘেঁষিয়া বসি। হোক্ না সে গাড়োয়ান, তবু মানুষ তো। বিপদের সময় মানুষ মানুষকেই সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু গোলামির জাত্যাভিমান আমার বাহ্যিক প্রকাশকে ভিন্নমুখী করিয়া দিল। আমি গদিয়ান চালে তাহাকে দ্রুত গাড়ী চালাইতে হুকুম করিলাম। সুদূর পল্লীগ্রামের নিরীহ গাড়োয়ান বন্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীকে বেশী ভয় করে। বিশেষ করিয়া আমার মত একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে। উঠিতে বসিতে জমকালো পরিচ্ছদভূষিত আরদালীকে সে সামরিক প্রথায় সেলাম ঠুকিতে দেখিয়াছে। কখন কিসে আমি বিগ্‌ড়াইয়া যাইব ঠিক নাই। সে চাবুক ও পদাঘাত করিয়া জন্তু দুইটাকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু গাড়ী চলিল না। চলিবে কেমন করিয়া—বলদ নড়িলে তবে তো গাড়ী চলে?—জন্তু দুইটা সেই যে কান খাড়া করিয়াছে তাহা আর নামাইবার নাম নাই। ইচ্ছা হইতেছিল চাবুকটা কাড়িয়া লইয়া কানের উপর বসাইয়া দি। কান নীচু দিকে ঝুলিলে অন্তত ভয় কিছু কমিতে পারে।

হঠাৎ দেখিলাম বলদের দ্রষ্টব্য স্থানটি নড়িয়া উঠিল। উঁচু ঘাস উপরের দিকে দুলিতেছে। ইহাতে ধানের উপর ঢেউ খেলার কবিতা নাই। খাঁটি ধাবমান জানোয়ারের একটি নির্দ্দিষ্ট গতি—তাহারই দোলা উপরে সঙ্কেত করিতেছে। গরু দুইটা ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হঠাৎ তারস্বরে গান ধরিল;—তামাকের সরঞ্জামের টিনের বাক্সটা লইয়া মরিয়া হইয়া তবলা বাজাইবার অনুকরণে পিটিতে আরম্ভ করিল। তাল নাই, সুর নাই—তথাপি সঙ্গতের সহিত তাহা সঙ্গীত বলিয়া মানিয়া লইলাম। পদমর্য্যাদা তখন ভুলিয়াছি, ত্রাসে জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছে। আমিও গাড়োয়ানের ভাবায় বিকট চীৎকার করিয়া গান ধরিলাম। কোন্ সুর গাহিয়াছিলাম মনে নাই, তবে তাহা কোন রাগ-রাগিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে। অনুপ্রাণিত হইয়া গাড়োয়ানের পিঠে যে প্রচণ্ড দুইটি সম্ ঠুকিয়াছিলাম তাহা মারাত্মক অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিনা লাইসেন্সে যে বে-আইনী করিয়াছিলাম তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। ভয় আমাকে গ্রাস করিয়াছিল। অন্তরে

যে বিভীষিকা দেখিতেছিলাম তাহারই প্রকাশ হইয়াছিল গাড়োয়ানের পিঠে সমের দ্বারা।

উৎকট সম—গাড়োয়ানের গান—বলদের লাঙ্গুলমর্দ্দনের মাঝে কখন গাড়ীটা ঢিপি পার হইয়া আবার সমতল মাটির উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা নালাটার একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। আর কয়েক হাত অগ্রসর হইলেই পোলের উপর গাড়ীটি উঠিবে, এমন সময় বাম দিকের খিলানের তলায় দেখিলাম একটি জন্তু ঢুকিয়া পড়িল। সম্পূর্ণ দেহ আবৃত হইল না। ছুট্ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, আর একটি জন্তু বাঘের মত লাফ দিয়া বলদটাকে তাড়া করিয়াছে। সমস্ত শরীর ক্ষণিকের জন্ত হিম হইয়া আসিল। কেন বলিতে পারি না খিলানের তলায় নিজের অজ্ঞাতে চোখ চলিয়া গেল। সেখানে লুক্কায়িত জন্তুর লেজ অদৃশ্ত হইয়াছে। হঠাৎ মনে আসিল আগুনই এখন প্রাণ বাঁচাইতে পারে। গাড়োয়ান-টাকে ঝাঁকুনি দিলাম, কিন্তু সে কেমন জড়ভরতের মত হইয়া গিয়াছে। অগত্যা নিজেই আমার বসিবার স্থান হইতে খানিকটা খড় লইয়া মশালের আকারে বাঁধিল
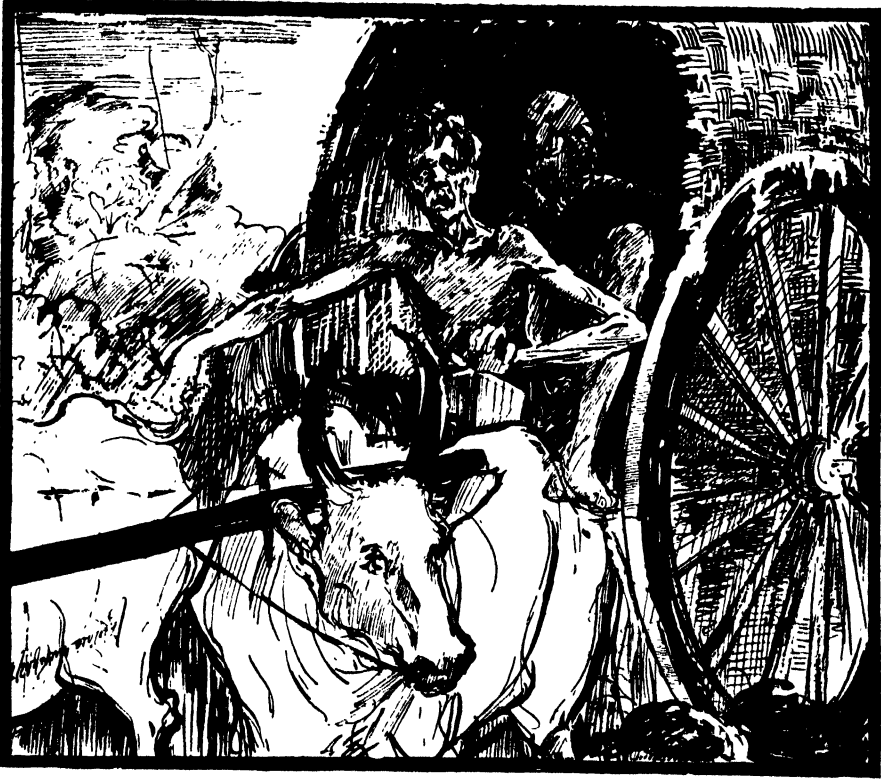
আমিও গাড়োয়ানের তাবায় গান ধরিয়া দিলাম

লেজ ও পিছন অংশ বাহিরে থাকিয়া গেল। লেজটি কুকুরের নয়, শৃগালের নয়, আকার তাহার মোটা বোড়া সাপের মত, দুলিতেছে। অকস্মাৎ বাম দিকের বলদটা বিকটভাবে ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ করিতে করিতে এমন ভাবেই মাথা ঝাড়া দিল যে জোত খুলিয়া গাড়ীটা কাৎ হইয়া পড়িল। গাড়োয়ানের হাত হইতে দড়ি তখন স্খলিত হইয়াছে। বলদটি বন্ধনমুক্ত হইয়া সামনের রাস্তা ধরিয়া করিলাম। দিয়াশলাই খুঁজিতে গিয়া দেখি কোনখানে তাহার অস্তিত্ব নাই। বসিবার স্থানটি তচ্‌নচ্ করিয়া ফেলিলাম। কোন জায়গায় দিয়াশলাই খুঁজিয়া পাইলাম না। মৃত্যুর বিভীষিকা তখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র আর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত পৃথিবীর বুকে আমার স্থান। তাহার পর একটি থাবায় প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে আসিল, তাহাদের সংস্থানের কথা

ভাবিলাম। তাহার পরই মনে হইল সবই মায়া। কে কাহার! যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। আমি ত উপলক্ষ মাত্র। এই অল্প সময়ের ভিতরেই কেমন একটা ঝিমান ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। কাঠ পিঁপড়ার কামড় খাইয়া বেদনার স্থানে হাত দিতেই অনুভব করিলাম দিয়াশলাইটি আমার মুঠার মধ্যেই রহিয়াছে। তবে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে! উত্তেজনা ও ভয়ে কখন তাহা সজোরে চাপিয়া ফেলিয়াছি! যাহা হউক, দুই-চারিটি সম্পূর্ণ কাঠি পাইতে বিলম্ব হইল না। মশাল জ্বালাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। গাড়োয়ানটাকে মশাল ধরিতে বলিলাম। কিন্তু তখন তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। এখন করি কি? তাহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গাছেও ওঠা যায় না। আবার ঝাঁকুনি দিলাম, কোন সাড়া নাই। এমন সময় অনতিদূরে যে দিকে বলদটা পলাইয়াছিল, সেই দিক হইতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ আসিল—চিতাবাঘের শিকার ধরার মত আওয়াজ। কাল বিলম্ব না করিয়া প্রজ্জলিত মশালটা ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী নারিকেল গাছটার দিকে ছুটিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পা দুইটা কে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যতই দ্রুত চলিবার চেষ্টা করি ততই গতি মন্থর হইয়া আসে। যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। তথাপি প্রাণের মায়ায় জোর করিয়া গাছটার দিকে আসিলাম। তলায় যে ঝোপ জমিয়াছে তাহাতে গাছের গোড়ায় যাওয়াও শক্ত। কোনপ্রকারে বাধা ঠেলিয়া ফিট দুই উঠিয়াছি, এমন সময় শুনিলাম ফোঁস শব্দ! একেবারে জাত সাপ ছোবল মারিয়াছে। লক্ষ্য আমার পায়ের দিকেই ছিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্ত্তে ছোবলটি মারিয়াছিল সেই সময়ই ভাগ্যগুণে আমার পা দুইটা দুই ফুট উপরে উঠিয়াছিল। ঘটনাটি স্মরণ করিতেও আজ শিহরণ আসে। প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া উপরে উঠাইতে লাগিলাম। ডগায় পৌঁছাইতে বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। দুই-চারিটি পাতার গোড়া জোর করিয়া একত্রিত করিয়া তাহার উপর বসিলাম এবং দুই হাতে অন্য পাতার গোড়া চাপিয়া ধরিলাম। গাছটি উঁচু না হইলেও বাঘ সম্বন্ধে নিরাপদ বলা চলে।

বুকের ভিতর স্পন্দন এমনভাবেই চলিয়াছিল যে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম—হয় তো বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া এখুনি বন্ধ হইয়া যাইবে। তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরিয়া উঠিতেছিল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।

মেঘলা জ্যোৎস্নায় দেখিলাম মশালটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ঝটিকার সহিত বারি পতনে আমি সিক্ত হইয়া গিয়াছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। দৃষ্টি তখন ঝাপ্‌সা আলোয় অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমেই মনে আসিল গাড়োয়ানটার কথা। তাহার বসিবার স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সে ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। বলদ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া। অনুমান করিলাম—ভয় বলদটাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার দৃষ্টি তখনও সন্দিগ্ধ স্থানের দিকে। তবে কি বিপদ কাটিয়া যায় নাই! পলাতক গরুটির পিছনে যে একটি বৃহৎ আকারের চিতাবাঘ ছুটিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ চিতাবাঘের শিকার ধরার পর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনিয়াছি। চিতা বড় না হইলে একটি পূর্ণাবয়ব বলদকে তাড়া করিত না। তাড়া করিবার পর ঘড় ঘড় শব্দের অর্থ ভুল হইবার নয়। বলদটা মরিয়াছে এবং সহজলভ্য শিকার ছাড়িয়া চিতা এদিকে আসে নাই। তবে কি আর একটি মাংসাশী ওৎ পাতিয়া আছে! অনুমান সত্য হইলে পলাইবার সময় আমাকে আক্রমণ করিল না কেন? ধাবমান শিকারকেই ব্যাঘ্রজাতীয় জন্তুরা আগে আক্রমণ করিয়া থাকে। সব কেমন গোল পাকাইয়া যাইতেছিল।

নালাটার দিকেই মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিলাম। ঝাপসা আলোয় যতটা দেখা যায় তাহাতে মনে হইল প্রায় গোটা বার বন্য বরাহ জল খাইতে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শুণ্ডাটি মাঝে মাঝে সচকিতভাবে বলদের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেছে। আবার নাসিকার অগ্রভাগের সাহায্যে মাটি খোঁচাইতেছে; পুনরায় খাড়াই ঘাসের দিকে তাকাইতেছে। হঠাৎ শুণ্ডাটি যুদ্ধং দেহির মত ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল, তাহার পরই সদলে যে দিক দিয়া আসিয়াছিল সেদিকে চলিয়া গেল। ইহার পর মুহূর্ত্তে হঠাৎ দ্বিতীয় গরুটাও দড়ি ছিঁড়িয়া নালার দিকে বেগে ছুট দিল। গাড়ীটার অবলম্বন না থাকায় সামনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া পড়িল, গাড়োয়ানও গড়াইতে গড়াইতে

মাটিতে পড়িয়া গেল। অদ্ভুত দৃশ্য! একটি জীবন্ত মানুষকে কুমড়ার মত গড়াইতে দেখিলাম। যে-কোন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য দানব বাহির হইয়া আসিতে পারে এবং আসিলেই গাড়োয়ানকে অক্লেশে লইয়া যাইবে, আমি কিছুই করিতে পারিব না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অবর্ণনীয় আতঙ্কের মধ্য দিয়া কাটিতে লাগিল। ...

রাত গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদুরীর কোলাহলে কোন জন্তুর পদশব্দ শুনিবার উপায় নাই। মনে মনে হাসিলাম। কিছুকাল আগে এই দাদুরীর ডাকই ডানা ঝাপটাও খাইলাম। তাহাদের কিচির মিচির শুনিয়া কতকটা অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। রাত্র পলে পলে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ঝড় ও বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। আকাশের মেঘাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাওয়ায় শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোয় নিকটবর্ত্তী সব কিছুই প্রায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। গাড়োয়ান বেচারার পায়ের দিকের খানিকটা অংশ বৃষ্টির জলে ডুবিয়া গিয়াছে। একটা হাত মুচ্‌ড়াইয়া আছে। মুখটা বোধ হয় মাটির দিকে। ঘন কাদায় নাক পড়িলে দম বন্ধ হইয়া মারা পড়িবে। চাকাটা উহার উপর পড়ে নাই

এমন সময় দেখিলাম গাড়ীর ছাউনির উপর সেই বিরাট অজগর

আমার মনকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। একদৃষ্টিতে গাড়োয়ানটার দিকে তাকাইয়া আছি। ভাবিতেছিলাম—যদি লোকটার জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখন কি করিব। করিবার আছে কি—ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিলাম না। এমন সময় একটি বিরাট বাদুড় আসিয়া পাশের বট গাছটায় আশ্রয় লইল। তাহার পর আর একটা; দেখিতে দেখিতে অসংখ্য বাদুড়ের ভিড় লাগিয়া গেল; দুই-একটার তো! পোলের নালার স্রোতের কল্ কল্ মৃদু শব্দ শুনিতে পাইতেছি। মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টির পর রহস্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একটা সন্দেহজনক শব্দ শুনিলাম—বাঘের আওয়াজের মত—অতি নিকটে। ফাঁপা স্থানে রক্ষিত বড় পীলে মোড়া ঘষার শব্দের সহিত ইহার মিল নাই। নিশ্চিত হইলাম—শব্দটি চিতার নয়, অভিজাত কুলোদ্ভব দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল তাহার

অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। তাহার পর রাস্তার পাশের ঘাস নড়িয়া উঠিল। ঘাসের দোলা ক্রমান্বয়ে আরও নিকটে আসিল। আবার গুরু গম্ভীর সঙ্কেত—যেন এখনি বজ্র নিনাদে সমস্ত বনানীর নিস্তব্ধতা আলোড়িত হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইল না—ঘাস নাড়া থামিয়া গেল। এক দৃষ্টিতে সম্মোহিতের মত গাড়োয়ান ও খাড়াই ঘাসের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনের অবস্থা তখন কি রকম হইয়াছিল প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরে একটা কম্পন অনুভব করিতেছিলাম। যদি শিথিলতাবশত নীচে পড়িয়া যাই তাহা হইলে আমাকেও—। আর ভাবিতে পারিলাম না। কিন্তু গাড়ীর ছাউনির উপর, ওটা কি—জাহাজ বাঁধিবার বিরাটাকার দড়ির মত, ওটা নড়ে না যে! ডগাটা ফুটখানেকের উপর মাথা খাড়া করিয়াছে। আবার নীচু হইল। পরমুহূর্ত্তে মড় মড় করিয়া ছাউনীর পিছন দিকটা মুচড়াইয়া গেল—ঠিক যে ভাবে দিয়াশলাইটা আমার হাতে নিষ্পেষিত হইয়াছিল। নিশ্চয় উহা মরাল, দৈত্যের আকার লইয়া আসিয়াছে। গাড়ির গোটা ছাউনিটির পরিধি যে জীবদেহের দ্বারা আবেষ্টন করিতে পারে তাহার পূর্ণশরীর কত বড় হইবে অনুমান করিতে পারিলাম না। ক্রমান্বয়ে বিশাল সরীসৃপ ছাউনির পিছন দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। দেহ তার সম্পূর্ণ মাটীতে পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গাড়ীটা প্রায় সোজা হইয়া আসিল। সরীসৃপ দেহের অনেকটা অংশ মাটির তলায় ঝুলাইয়া দিয়াছে। গাড়ীটা তখন দাঁড়ি পাল্লার মত উঠিতেছে ও নামিতেছে। সমস্ত দেহটা মাটীর সংস্পর্শে আসিতেই গাড়ীটা আবার সামনের দিকে সশব্দে পড়িয়া গেল। মনে হইল বলদ জুতিবার জায়গাটা গাড়োয়ানের পায়ের উপরই আঘাত করিয়াছে। অজগরের কুণ্ডলায়িত দেহ ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হইতে লাগিল; তাহার পর গাড়ীর ছাউনির উপর যেভাবে মাথা তুলিতেছিল ঠিক সেইভাবে পুনরায় মাঝে মাথা দুলাইয়া খুঁজিতে লাগিল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে। হঠাৎ বিকট গর্জ্জনে কাণে প্রায় তালা লাগিয়া গেল। মনে হইল সহস্র বজ্রাঘাৎ একই সঙ্গে আকাশ ফাটাইয়া ধরিত্রীর বুকে পড়িয়াছে।··· পৃথিবী চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া গেল। *তাহার পর আবার গর্জ্জন! অনুভব করিলাম—আমার হস্তের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। প্রাণপণ শক্তিতে পাতাগুলি আরও ভাল করিয়া ধরিলাম। এইটুকু শক্তিকেই আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পরক্ষণেই দেখিলাম মহাপরাক্রমশালী অরণ্যের অধিপতি শার্দ্দুল খাড়াই ঘাস সজোরে সরাইয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কি বিরাট দেহ! পূর্ণবয়স্ক বাংলার গরুর মত, কিন্তু পিছনকার পা-টা ভাঙ্গা। সোজা চলিবার উপায় নাই;—হেঁচড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং মাঝে মাঝে ত্রস্তভাবে ফিরিয়া তাকাইতেছে। মানুষ তাহার সামনে পড়িয়া আছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। আততায়ীর নিশ্চিত আক্রমণ তাহার গতি সংযত করিয়াছে। ইতিমধ্যে বাঘ গাড়ীর চাকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন একটু নিশ্চিন্ত ভাব। একবার ঘুরিয়া মানুষটি দেখিল, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া মাটী শুঁকিতে আরম্ভ করিল। শত্রু সেখানে নাই। বুভুক্ষের আহার রাজভোগের মত সামনে রক্ষিত। বাঘ গাড়োয়ানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। গাড়ীর ছাউনি তখন মাথার উপর মৃদুভাবে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস নাই অথচ ছাউনি দুলিতেছে কেন? অনুমান করিলাম হয়তো বাঘের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া থাকিবে। বাঘের লাঙ্গুলের তখন উত্থান-পতন চলিয়াছে; লম্ফ প্রদানের পূর্ব্ব সঙ্কেত। বাস্তবিকই বাঘটা লাফাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লম্ফ হইল না। সর্ব্বদেহে একটা ঝাঁকুনি দেখিলাম মাত্র। যখন সে উঠিয়া গাড়োয়ানের দিকে অগ্রসর হইবে ঠিক করিয়াছে, এমন সময় লক্ষ্য করিলাম গাড়ীর ছাউনির উপর সেই বিরাট অজগর। মুখটা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দুলাইতেছে। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের ভিতরে সমস্ত দেহটাকে বাঘের উপর ফেলিয়া দিল এবং সার্কাসে ঘোড়ার খেলার লম্বা চাবুকে যেভাবে ঢেউ খেলিয়া থাকে ঠিক সেই ভাবে অজগর দৈত্যের বিরাট দেহ বাঘের পিঠে ঢেউ খেলিতে লাগিল। এই সময় যে কয়টি গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম তাহার বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না। একটি পাক পুরাপুরি দিবার আগেই চকিতে বাঘ নিজেকে মুক্ত করিয়া সামনের পা দিয়া থাবা মারিল। তৎক্ষণাৎ বারুদ বিস্ফুরিত হাউই বাজির মত সম্মুখের দেহের খানিকটা অংশ সোজা প্রায় উড়াইয়া সাপ বাঘের মুখে ছোবল মারিল। চোখের উপর ছোবল মারে নাই তো? হইতেও পারে। বাঘ যেন বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রণে ভঙ্গ দিয়া আবার ঘাসের দিকে অগ্রসর হইল। অরণ্যের আদি প্রবৃত্তি ফেলিয়া

উঠিয়াছে। যুদ্ধে একজন আর একজনকে সম্পূর্ণ বিনাশ না করিয়া থামিবে না। সরীসৃপ বাঘের পিছু লইল। বাঘ তখন খাড়াই ঘাসের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

আমি গাছের উপর স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছি। ইহার পরের ঘটনা কি হইবে অনুমান করা শক্ত। গাড়োয়ানের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, কারণ যুদ্ধের পর একজন—যে কেহ আসিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে। নানা চিন্তা মনে আসিতেছিল; এমন সময় রাস্তা হইতে একটু দূরে ঘাসের আড়ালে অকস্মাৎ বাঘের উপর্য্যুপরি গর্জ্জন সুরু হইল, যেন সৃষ্টি এখনি ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেখান হইতে শব্দ আসিতেছিল তাহার অনেকখানি পরিধি লইয়া ঘাসগুলি দারুণ ভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে বাঘের চীৎকার গোঙানিতে পরিবর্ত্তিত হইল; যে শব্দ আসিতেছিল তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘাসের আলোড়ন নাই। অনেকক্ষণ বাদে একটা দমবন্ধ হওয়ার মত আওয়াজ কানে আসিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বাবস্থায় আছি।

একটির পর একটি করিয়া কতগুলি প্রহর কাটিয়া গিয়াছে জানিবার উপায় ছিল না। হাতে পায়ে খিল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। একটু নড়িয়া বসিবার সাহস নাই। নিস্তব্ধতা যেন গুরুভার কঠিন বস্তুর মত আমার মনের উপর ভর করিয়াছে।

প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা দূরে পাখার কাকলিতে শুনিতে পাইতেছি। দিকভ্রম হইয়াছে। কোন দিক পূর্ব্ব, কোন দিক পশ্চিম স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আস্তে আস্তে আকাশ ফরসা হইয়া আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নবজাত অরুণকিরণ গাছের ডাল পালার পাশ কাটাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়োয়ানটার কথা মনে আসিতেই স্মরণীয় ঘটনাস্থানটি লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম বেচারা ঠিক সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। মাথার নিকটে খানিকটা স্থান জমাট রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

শিহরিয়া উঠিলাম! তবে কি বাঘ লোকটিকে থাবা মারিয়াছিল? কই, যতদূর মনে পড়ে বাঘকে তো অত নিকটে আসিতে দেখি নাই। হইতেও পারে। মনের অবস্থা তখন এমন ছিল না, যাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা চলে। একটু নড়িয়া বসিবার ইচ্ছা আসিল। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। হাতে খিল ধরিয়াছে। মুঠা দুইটা কে যেন রজ্জু দ্বারা পাতার গোছার সহিত দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে। নিরুপায় হইয়াই পথিকের আসার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সকাল হইয়া গিয়াছে। অনতিবিলম্বে দেখিলাম সদলবলে জঙ্গলীর দল শুক্না কাঠ কুড়াইবার জন্য আমার দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইতে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে ডাক দিলাম। সকলে আমার নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু গাড়োয়ানের অবস্থা দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। গত রাত্রের বাঘের গর্জ্জন নিশ্চয় তাহারা শুনিয়াছিল। গাড়োয়ানকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, অনুমান করিল বাঘ নিকটেই আছে। তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ও অভিজ্ঞব্যক্তি ইতিমধ্যে বাঘের থাবা আবিষ্কার করিতে গিয়া অজগরের অস্তিত্বও জানিয়া ফেলিয়াছে। খবরটি সকলের গোচর হইতেই একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহার পরই একত্রিত হইয়া কাঠে কাঠে ঠুকিয়া বিকট খটাখট্ শব্দ আরম্ভ করিয়া দিল। বুড়াই যে দলপতি—বুঝিলাম। সে সাপের গতি ও বাঘের থাবা লক্ষ্য করিয়া গত রাত্রের ভয়াবহ স্থানটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিছনে দলের লোক তখন চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। বেশীদূর যাইতে হইল না। তাহাদের ভিতর অনেকের মাথা দেখিতে পাইতেছিলাম। একটি স্থানে আসিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে নীচু হইয়া কি দেখিতেছে। বুঝিলাম, অনুসন্ধানের ফল শুভ। তাহার পর বেশীক্ষণ সময় কাটে নাই। দেখিলাম—দশ-বার জন মিলিয়া বহুকষ্টে রাত্রের অজগরকে লইয়া আসিতেছে। বিশাল শক্তির মৃতরূপ। মাথার অস্তিত্ব যেটুকু আছে তাহাতে জীবিত অবস্থায় কি ছিল জানিবার উপায় নাই। একটা চোখ একেবারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অজগরের মৃত দেহটা গাড়ীর নিকটে আনিতে গাড়োয়ানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম—লোকটা যেন পাশমুড়ি দিবার চেষ্টা করিতেছে। দিনের বেলা এবং অতগুলি লোক উপস্থিত না থাকিলে আমি কি করিতাম বলিতে পারি না। নিশ্চিন্ত হইলাম, লোকটা মরে নাই। মরিলে রিপোর্টের ভিতর এতবড় ঘটনাটা বাদ দিতে পারিতাম

না। লোকটাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। I have the honour to submit-এর গোলামি মন্ত্রে চার পাতা লেখার কর্ত্তব্য হইতে সে আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

সদর আপিসে গদিয়ানি পোষাক পরিয়া আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ডাক আসিল। তহসিলদার লিখিয়াছেন, মানুষ-খেকো বাঘ মারার জন্য কালেকটার জঙ্গলীদের পুরস্কৃত করিয়াছেন এবং বাঘের আসল ধ্বংসকারী অজগর নিজে মরিয়া জঙ্গলীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিল। শেষের দিকে গাড়োয়ানের বলদ দুইটার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—যেন গরীব সম্বন্ধে আমার উদার মনে কলঙ্কের ছাপ না পড়ে। কলঙ্কের বোঝা যথেষ্ট আছে, উপরি ফাউ বহন করিবার ইচ্ছা ছিল না। পরের ডাকেই বখ্‌শিস্ সহ শার্দ্দূলভুক্ত ও পলাতক বলদের দাম মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

বলিয়া রাখা ভাল, টি-এ বিলে এই বাড়্‌তি খরচের অঙ্ক সরকারকে লিখিতে ভুলি নাই।

কে তুমি ?

শ্রীমানকুমারী বসু

(১)

সে যে ছিল বড় আপনার
তাই প্রাণে ওঠে হাহাকার।
আজিও সুনীলাকাশে রবি আসে শশী আসে
ছয় ঋতু আসে বার বার
সে-ই শুধু আসে না ক' আর।

(২)

আসিয়াছে বসন্ত আবার
বনে বনে ফুল ফোটে
মলয় বাতাস ছোটে প্রকৃতির তেমনি বাহার
মুঞ্জরিত তরুশাখে তেমনি কোকিল ডাকে
সুললিত মধুর ঝঙ্কার।
শুনি সেই কুহু কুহু
প্রাণে আসে উহু উহু
মনে পড়ে মুখখানি তার
সে-ই শুধু আসে না ক' আর।

(৩)

গণিয়া গণিয়া দিন
আমার ফুরাল দিন
দেখিব না মুখখানি তার।
এ জীবনে অহরহ
কি যে ব্যথা দুর্ব্বিসহ
বলিতে পারি না তা যে আর
সেই মুখ দেখিব না আর।

(৪)

এ কি দশা হয়েছে আমার
ভাবিতে পারি না তা আর।
নয়নে নাহিকো দৃষ্টি
তমময় বিশ্বসৃষ্টি
বক্ষ গেছে হয়ে চুরমার।
তবু অলক্ষিতে থাকি কে দিতেছে স্নেহমাখি
ভগ্ন বক্ষে শকতি সঞ্চার।

দেখা নাই কথা নাই,
তবু যেন কাছে পাই ;
কে মুছাও তপ্ত অশ্রুধার
হেন দিনে "কে তুমি" আমার।

একই

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

মণিকা কি ধরণের মেয়ে সেকথা এককথায় ব'লে বুঝানো বড় কঠিন—সে শিক্ষিতা সুন্দরী এবং অত্যন্ত আধুনিক ধরণের ত বটেই—কিন্তু সেইটাই তার সব নয়।

রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তকী কলকাতায় এসে একদিন বাঙালী মেয়ের বেশকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন, কিন্তু যে সব বাঙালীমেয়ে তাদের সেই জাতীয় রুচিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়ে মাদ্রাজী ধরণের বেশভূষা করা সুরু করেছে মণিকা তাদের দলেও বটে—অর্থাৎ নতুনের মোহে সে তার নিজস্বটুকু অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে।

আমার সঙ্গে তার যে পরিচয় হয়েছিল সেটাও আশ্চর্য্য-রকমের। আমরা উভয়েই পোস্ট গ্রাজুয়েটেই তখন পড়ি। মণিকা ও আমার ইকনমিক্স ছিল, কিন্তু তার বেশভূষা দেখে চিরদিন মাদ্রাজী বলেই ভুল ক'রে এসেছি। অকস্মাৎ সিঁড়ির মাঝে একদিন সে আমাকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় ?

স্পষ্ট বাংলাভাষা শুনে অবাক হয়েছিলাম, তাই বললুম —আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি অবাক্ হ'য়ে গেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ।

– কেন, আমি আলাপ করছি দেখে ?

—না।

—তবে ?

—আপনার বাংলা শুনে।

—তার মানে ?

—আপনি বহুদিন বাংলায় আছেন ?

—তার মানে ? আমি বাঙালী, তা বাংলা ছাড়া যাবো কোথায় ?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—ও, আমি ভুল ক'রেছি ক্ষমা করবেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি মাদ্রাজবাসী।

মণিকা খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললে—আপনি ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছিলেন না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু প্রদেশ সম্বন্ধে এবং মানুষের চেহারা সম্বন্ধে আপনি অনার্স-এরই উপযুক্ত নয়।

আমি হাতজোড় করে বললাম—আমি ভুল করেছিলাম।

--আপনি ত লেখেনও।

—হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—প্রফেসর গোস্বামী সেদিন বল্‌ছিলেন আপনার কথা।

—ও তাই।

মণিকা আমার হাতের বইখানার পানে চেয়ে ছিল, হঠাৎ অশোভন প্রশ্ন করলে—আপনি অত সিগারেট খান কেন ?

—অত ?

—হ্যাঁ, এই আঙুল দু'টোর অমন রং হ'ল কেন তা নইলে ?

—সামান্য খেলেও হয়।

—না, আমার দাদার হাতেও অমনি দেখেছি, সে ত রোজ তিরিশটা সিগারেট খায়। যাক্, আপনাদের বাড়ী কোথায় ?

—গড়পার।

—আপনি কুস্তি করতে পারেন ?

—না।

—আমার ধারণা ছিল, যাদের বাড়ী গড়পার তারা সব কুস্তিগীর। আমাদের বাড়ী বালীগঞ্জ—হিন্দুস্থান পার্কে—আট নম্বর। আমাদের ওখানে যাবেন ? আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করলে সুবিধে হ'তে পারে—মোট কথা, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে আপনি খুব পড়াশুনো ক'রে যে নোটগুলো করবেন, আমি তা বিনাক্লেশে সংগ্রহ করতে চাই।

আমি হেসে জবাব দিলাম—বহুক্লেশেও আমি তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, শনিবার বিকেলে আপনার চা'র নেমন্তন্ন রইল।

•

আজ হ'লে মণিকার নিমন্ত্রণকে কি মনে করতাম তা বলা কঠিন, কিন্তু সেই উচ্ছ্বসিত যৌবনে সুন্দরী তরুণীর এই

নিমন্ত্রণকে আমি আরও অনেকের মতই ভাগ্য বলে মনে করেছিলাম এবং শনিবার দিন বেশটাকে যথাসম্ভব ভদ্রস্থ ক'রে নির্দিষ্ট সময়ে যে উপস্থিত হয়েছিলাম একথা বলাই বাহুল্য।

বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে বসেছিলাম—চাকর-দারোয়ান কাউকেই পাই নাই। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে প্রশ্ন করলেন—কা'কে চাই?

—মিস্ মণিকাকে।

—আপনি?

—আপনি দয়া ক'রে তাকে বলুন, আমার নাম সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ও আচ্ছা।

একটু পরেই মণিকা এসে বললে—ও এসেছেন! আসুন, আমরা পড়বার ঘরে গিয়ে বসি।

পাশের ঘরে আলমারি-বোঝাই হরেক রকমের কেতাব। আমি ভয়ে ভয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। মণিকা তার দাদা, মা, বোন—সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—আগামী বারে ফার্ষ্ট্ প্রেস ওর বাঁধা—আমরা এক সঙ্গেই পড়বো।

সকলেই এই ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন এবং আমাদের দু'জনকে পড়বার সুযোগ দিয়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন। মণিকা বললে—একটু চা খাবেন বলেছিলাম, সেটা বলে আসি।

মণিকা বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে এসে বললে—আচ্ছা, এত ত পড়ছেন, কি করবেন? আই. সি. এস.-এর জন্যে চেষ্টা করবেন?

পুরু চশমা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললাম—এ জীবনে ও রাজসিক চাকরি করার সৌভাগ্য হবে না, তবে একটা প্রফেসরী পেলেই খুশী, কিন্তু—

মণিকা উৎসাহ দিয়ে বললে—তা নিশ্চয়ই হবে।

চাকর চা ও অন্যান্য খাবার দিয়ে গেল। মণিকা প্লেটটা ঠেলে দিয়ে, চা ঢেলে বসে নিজে এক চুমুক খেয়ে নিয়ে বললে—মিষ্টি আর লাগবে?

—না।

—ওহো, আপনি ত সিগারেট খান, কি সিগারেট?

—হ'লেই হ'ল, এ বিষয়ে আমি সর্ব্বভুক—

মণিকা চাকরকে সিগারেট আন্‌তে আদেশ দিয়ে বললে—আজ প্রথম পরিচয়েই পড়ার কথা বলা চলে না, আজ গল্পই করা যাক্। আচ্ছা, বাংলা সিনেমা আপনার কেমন লাগে?

আমি বললাম—বাংলা সাহিত্যে যেমন উচ্চাঙ্গের বস্তু পাওয়া যায় ছবিতে তার এক-শতাংশও পাওয়া যায় না—সেগুলো আমাদের অর্থাৎ বাংলার রুচিজ্ঞানের তুলনায় নিম্নস্তরের।

—আমার ত মনে হয়, এ কতকগুলো ন্যাকামিছাড়া আর কিছুই নয়, অবশ্য বিদেশী ফিল্মও ন্যাকামিই—কিন্তু তার প্রকাশটা একটু ভদ্রস্থ।

—বাংলা ছবিতে দেখেছেন, কেমন অকারণ রসিকতা, নাচ এবং গান লাগিয়ে দেওয়া হয়—

—আচ্ছা, চলুন আজ একটা ফিল্ম দেখে আসি, যাবেন? এখনও তিন কোয়ার্টার সময় রয়েছে।

—আপত্তি নেই, চলুন—

—আচ্ছা, আপনি এই মাসিকখানা পড়ুন, আমি ততক্ষণে কাপড় ছেড়ে আসি—

মণিকা ট্রামে উঠে আমার পাশে ব'সে বললে—সিগারেট আপনি খুব খেতে পারেন, ওতে আমার কোন অসুবিধেই হয় না।

সিগারেটেই টান দিলাম, হঠাৎ মণিকা ব'লে উঠল—আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভেবেছেন?

—এখনও ভাবি নি, তবে ভাবতে ইচ্ছে আছে—

—তা নয়, কি ইম্‌প্রেসন হয়েছে?

আমি চিন্তা ক'রে জবাব দিলাম—আমার জীবনে দু-দশজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়নি যে অন্যের সঙ্গে তুলনা ক'রতে পারি; উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা কেবল আপনি—তাই এ সম্বন্ধে আপনাকে আমি আধুনিক মেয়েদের প্রতীক বলে ধ'রে নিয়েছি।

—সকল আধুনিক মেয়েই কি এক রকমের হয়? হ'তে পারে?

—না হওয়াই সম্ভব।

—তবে আমার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি দেখেছেন?

—একটি জিনিষ দেখেছি যে, বাঙালী মেয়ের মত অত্যন্ত

লজ্জা ও আড়ষ্টতা আপনার পা দু'টোকে অচল করতে পারেনি।

মণিকা সম্ভবত এটাকে একটা প্রশংসা মনে ক'রে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ পরে বললে—মেয়েরা যে পুরুষের মতই, একথা কি আপনি অস্বীকার করেন ?

—নিশ্চয়ই করি, নারী পুরুষের মত হ'লে তাদেরও ত দাড়ি কামাতে হ'ত।

মণিকা রসিকতাটাকে তারিফ ক'রে হেসে উঠল।

ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, একটি বাঙালীমেয়ে তার নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের দ্বারা তার অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে বশীভূত করেছিল।

মণিকা আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললে—এটা কি স্বাভাবিক বলে মনে হয় ?

—কি ?

—মেয়েটির পক্ষে এই ত্যাগ, সহনশীলতা ?

—অন্যদেশে না হ'লেও আমাদের দেশে এ খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশ সীতার কাছ থেকে এটা শিখেছে—

—মনস্তত্ত্ব হিসাবে এটা ভুল—

—না, সভ্যতা মানুষকে জানোয়ার থেকে বর্ত্তমান অবস্থায় এনে দিয়েছে; আর হিন্দুসভ্যতা তার পারিবারিক জীবনে দিয়েছে এই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণ। বিদেশী ছবিতে এটা দেখলে অস্বাভাবিক বলতুম নিশ্চয়ই, কারণ তাদের সভ্যতার ধারা অন্যরূপ।

—কিন্তু আমি হ'লে কবে বিদ্রোহ করতুম।

—অন্য অনেকেই করতো, কিন্তু তাতে সে লাভবান হ'তে পারতো না নিশ্চয়ই। বিদেশ হ'লে সে অন্যকে বিবাহ করতো, আবার তাকে এমনি ক'রে বিদ্রোহ করতে হ'ত। ঘর খুঁজতে খুঁজতে তাকে জীবন কাটাতে হ'ত—কিন্তু ঘরে সে মাথা গুঁজতে পারতো না।

মণিকা চিন্তা ক'রে বললে—আপনার মাঝে সংস্কার রয়েছে প্রচুর—

বললাম—হ'তে পারে, তবে এটা আমি বিচার ক'রে দেখেই বলেছি, কারণ মেয়েদের এবং পুরুষের শারীরিক ধর্ম্ম এক নয় বলেই তাদের বিভিন্নরূপ ব্যবস্থাও দরকার। আর্থিক জগতে তারা স্বাধীন হ'লেও গৃহ ও সন্তান তাদেরই প্রয়োজন।

—সেই জন্যে পুরুষের দাসত্ব তার অবশ্য করণীয় ?

—টাকার জন্যে যদি দাসত্ব মানুষে করতে পারে, তবে গৃহ ও সন্তানের জন্যে দাসত্ব—যদি তাই হয়—কেন করবে না—আনন্দে করবে।

মণিকা হঠাৎ নমস্কার জানিয়ে বললে—কবে আসবেন ?

—যেদিন বলবেন।

—যেদিন খুশী, আমি কদাচিৎ বেরুই।

'আপনি'র গণ্ডী পার হ'য়ে আমি আর মণিকা কিছুদিনের মধ্যে 'তুমি'র গণ্ডীতে এসে পৌঁছলাম। ভালবাসায় নয়, বন্ধুত্বের নৈকট্যে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে। এর মাঝে কতদিন, কত সময়, মণিকাকে আমার গৃহে বধূরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মনে মনে দেখেছি, মনে মনে আনন্দ ও অব্যক্ত একটা সুখাবেশ অনুভব করেছি। এই যদি ভালবাসা হয়, আমি মণিকাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে বলবার সুযোগ কোন দিনই আমি পাইনি— তার প্রয়োজনও আমার হয়নি।

পরীক্ষার পরেও মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতে গিয়েছি। একদিন চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলাম—এখন কি করবে ভাবছ ?

—সেইটাই ত সমস্যা।

—বিয়ে ক'রে ঘরকন্না করবে ?

—করতে পারি।

—আচ্ছা কি রকম ছেলেকে তুমি বিয়ে করবে বল ত ? তোমার বাবা যেমন ছেলে এনে দেবেন ?

—না, যার সঙ্গে পরিচয় নেই তাকে বিয়ে করবো কি ক'রে ? তবে কি পেলে সুখী হই তা বলা কঠিন, কারণ এখনও সেটা ভেবে দেখিনি। আচ্ছা, তুমি কি করবে ?

—প্রথমে চাকরি সংগ্রহ করতে হবে, তারপর বিবাহ—

—কি রকম মেয়ে বিয়ে ক'রবে ?

—যে আমার সুখে সুখী হতে পারবে, দুঃখে দুঃখিত হ'তে পারবে। আমার অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করবে ...

—যে ভালবাসবে সে-ই ত তা হতে পারবে।

—অর্থাৎ যে আমাকে স্বামী ব'লেই ভালবাসবে, আমার

চাকরি, অর্থ, সৌন্দর্য্য, গুণ প্রভৃতি দেখে ভালবাস্‌বে না। এমন দিন যদি আসে যে চাকরি, অর্থ, সৌন্দর্য্য কিছুই না থাকে, তবে সে তবুও আমাকেই ভালবাসবে এবং আমার অক্ষমতাকে ঢেকে রাখবে।

মণিকা খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বল্‌লে—তবে তোমার আর বিয়ে করা হবে না।

আমিও হেসে বললাম—যদি না-ই হয় তবে কি করবো?

—তুমি একজনকে ভালবেসে বিয়ে ক'রে ফেল, যা হয় হবে।

—বরাত ঠুকে?

—হ্যাঁ, তাই।

—তুমিও তাই করবে?

—আমি ত তোমার মত চাই না, আমি পরিচয় ক'রে দেখবো যদি পছন্দ হয়—ক'রবো।

—যদি পছন্দ ভুল হয়?

—ফিরে আস্‌বো, নিজে ত অক্ষম নয়। না পোষায়, বিদায় নেব।

—ধর, আমার মত পরিচিতকে কি বিয়ে করতে পার?

আমার মুখখানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে মণিকা বললে, —তার মানে?

—আমার কথা বলছি না, আমার মত ছেলের কথা বলছি—

মণিকা মুখভঙ্গি ক'রে বললে—তুমি বড্ডো পড়, তোমাকে বিয়ে করা যায় না। তারপরে ধর, তোমাকে ত আমি ভালবাসতে পারবো না, তোমার অর্থ—যা নেই তাকে, সৌন্দর্য্য যা নেই তাকে, ভালবাস্‌তে ত পারবো না। আর তুমিও আমাকে বিয়ে ক'রে পড়বে সমস্যায়—

—সমস্যাটা কি?

—তোমার অক্ষমতাকে ত মার্জ্জনা করতে পারবো না। বাধা দেব, পতি পরম গুরু মনে ক'রে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে শিবপূজা করতে পারবো না।

আমি হেসে বললাম—এটা সমস্যাই—সন্দেহ নেই। তবে তুমি সুখী হবে কি না তা ত বল্‌লে না। আমি কি হব আমি জানি।

মণিকা ভ্রূভঙ্গি ক'রে আবার বললে—আমি? সুখী হ'তে পারতুম—কিন্তু তুমি বড্ডো বেঁটে, বড্ডো রোগা আর ভয়ানক বাজে কথা বলো।

আমি হেসে বললাম—অর্থাৎ, আমি যদি বাঁশের মত লম্বা, হাতীর মত মোটা ও পেচকের মত গম্ভীর হ'তে পারতুম তা হ'লে তুমি বিয়ে করলেও করতে পারতে—

মণিকা কাণের দুল দুলিয়ে মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

মণিকাকে আর একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—ধর, তুমি যাকে ভালবাস্‌লে সে যদি তোমাকে ভাল না বাস্‌তে পারে?

মণিকা ওষ্ঠটা উল্টিয়ে জবাব দিলে—ব'য়ে গেল। এ ত খুবই স্বাভাবিক, আর একজনকে ভালবাস্‌বো—

—সেও যদি তাই করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে?

—তবে, আবার আর একজনকে ভালবাস্‌বো—সেও যদি অমন হয় তবে বিয়ে করবো না।

—বিয়েই করবে না?

—না—তুমি ডন-বৈঠক দিয়ে কুস্তিগীর হ'লেও তোমাকে বিয়ে করছি না; আমি ত আর সীতার মত নই যে দুঃখ হ'লে কেবল কাঁদবই, ঝগড়া করতে পারবো না।

আমি সভয়ে বললাম—ঝগড়া করবে? তবে ত তোমাকে বিয়ে কেউ করবে না।

মণিকা অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বললে—আমার বিয়েই হবে না?

—না।

আমরা উভয়েই প্রগল্‌ভের মত হেসে ওঠ্‌লাম।

মণিকার আন্দাজ মত আমি ফার্স্ট'ই হয়েছিলাম, মণিকা সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার পরে সেও জানতো যে ফার্স্ট ক্লাস তার হবে না। পরীক্ষার খবর জানাতে যেদিন তার ওখানে গেলাম সেদিন অনেক মিষ্টিপূর্ণ একখানা প্লেট ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—এটা আমার পাশের খাওয়া নয়, তোমার ফার্স্ট হওয়ার খাওয়া। আমার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হয়েছে, দেখলে ত?

বললাম—দেখলাম ত, কিন্তু সবগুলো ফলে গেলে ত মুস্কিল।

—আর কোন্‌টা?

—ওই তুমি যে বলেছিলে আমার বিয়ে হবে না।

মণিকা হেসে বললে—ভয় নেই, হবে এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যে কথা বললেই কাঁদবে, তোমার সর্দ্দি লাগলেই তারকেশ্বরে হত্যা দেবে।

আমি হৃষ্টমনে বললাম—যাহোক্, হবে তা হ'লে ?

মণিকা ঠাট্টার সুরে বল্‌লে—হবে মশাই হবে, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা ত !

মণিকা অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে—আমি ফার্স্ট হ'লে তুমি দুঃখিত হ'তে ?

বললাম—হুঁ, তুমি ফার্স্ট হলে বলে নয়, আমি হ'তে পারিনি ব'লে—কারণ তা হলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই থাক্‌তো না।

—মোটেই সম্ভাবনা থাক্‌তো না কেন ?

—মেয়েলোক ফার্স্ট হয়েছে, আমি তার নীচে একথা শুন্‌লে কি আর কেউ চাকরি দেয়।

মণিকা কৃত্রিম ক্রোধে বললে—ওই ত তোমাদের দোষ, মেয়েরা কি ফার্স্ট হ'তে পারে না ?

—পারে, বহুবার পেরেছে।

—তবে ?

—যারা সেকেণ্ড হয়েছে তারা চাকরি পেয়েছে শুনিনি।

মণিকা হেসে বললে—তবে ত বড় অন্যায় হয়েছে, তোমাদের এই সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি নে। কেন, আমরা মানুষ নয় ?

—না, মেয়েমানুষ।

মণিকা পরাজিত হ'য়ে বললে—আমি যদি তোমায় বিয়ে করতাম তবে তোমাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে দেখাতুম মেয়েমানুষ কি চিজ।

—তুমি কেন। যে ছিচ্‌-কাঁদুনে মেয়ের কথা বললে সেও পারবে আশা করি। কারণ পুরুষেই ভালবাসে, মেয়েদের ত সে বালাই নেই। যে ভালবাসে তারই বিপদ—

—ফার্স্ট প্লেসের মত ওটাও তোমাদের একচেটে ?

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললাম—হুঁ—দেখ্‌তেই পারছো।

—তার মানে, তুমি আমাকে ভালবেসেছে ?

—আমি বেঁটে, রোগা, আমি কি তোমায় ভালবাসতে পারি ? তুমি শিক্ষিতা সুন্দরী, তার উপর বড়লোকের মেয়ে।

—বড়লোকের মেয়েরা বুঝি বেঁটে রোগা লোককে ভালবাসে না ?

—বাসে ?

—বাস্‌তে পারে, তবে আমি ভালবাসিনি।

—তুমি ভালবাসবে একটি আট ফুট লম্বা পাঁচ ফুট চওড়া ও বাইশ মণ ওজনের লোক্‌কে।

মণিকা হেসে উঠে ব'ললে—পারলে না বল্‌তে, আমি ভালবাসবো এমন লোককে যে ষ্টীমারের সঙ্গে গাধাবোটের মত নির্ব্বিকার চিত্তে চল্‌বে।

আমি হাত উঁচু ক'রে বললাম—স্বস্তি ! স্বস্তি !

প্রফেসারী পেয়েছিলাম—

একদিন রাত্রে আহারাদির পর বৌদি এসে ডাক্‌লেন—তোমার দাদা ডাক্‌ছে, ঠাকুরপো।

বুঝলাম একটা গুরুতর কিছু নইলে এমন সময় ডাক পড়া সম্ভব নয়। চাকরি করলেও শ্রদ্ধায় ভয়ে তখনও দাদার সঙ্গে কথা কইবার সাহস হয় না। ভয়ে ভয়ে দাদার বিছানায় বসলাম। দাদা গড়গড়ার নলটা রেখে বললে—শোন্।

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

দাদা বললে—আমি একটি ভাল মেয়ে ঠিক করেছি, আমারই এক বন্ধুর বোন। সর্ব্বসুলক্ষণা এইবার ম্যাট্রিক দেবে ...

দাদা ক'নের সর্ব্ববিধ বর্ণনা দিয়ে পরিশেষে বললে, ইচ্ছে হ'লে তুমি দেখে আস্‌তে পার। টাকা পয়সা ত দেবে মন্দ নয়। ফাল্গুন মাসেই দিন একরকম ঠিক করেছি। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, একবার জিজ্ঞেসা করা দরকার, আমার কথায় অমত তুমি কর্‌বে না জানি, তা তোমার মতামত তোমার বৌদিকে ব'লো—

—কিন্তু।

দাদা আমার মুখের পানে চেয়ে বললে—কিন্তু মানে বিয়ে করবে না, আজীবন কুমার থেকে পড়াশুনো করবে এই ত বল্‌তে চাও ? তা তাই ক'রো, এই কেবল মন্ত্র কটা প'ড়ে আমাকে একটা বৌমা এনে দাও, আর কিছু তোমাকে করতে হবে না। তোমার কোন সম্পর্ক নেই আর তার সঙ্গে—

দাদা বৌদি একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো, আমি লজ্জিত হ'য়ে চ'লে এলাম।

মণিকার কথাই ভাবছিলাম—তাকে পেলে আমি আনন্দিত হতাম সন্দেহ নেই কিন্তু মণিকা হয়ত আমার চেয়েও অনেক বেশী আশা করেছে—আমাদের এই দরিদ্র

গৃহস্থালীর মাঝে সে হয়ত তৃপ্তি পাবে না, তার মত মেয়ে হয়ত এ গৃহকে কল্পনাও করে নাই। তাকে বহুদিন পরোক্ষে প্রশ্ন করেছি, তার উত্তর যা সে দিয়েছে তার অর্থ সুপরিষ্কার—আমার সন্দেহের অবকাশও নেই।

শুনলাম পাশের ঘরে দাদা ও বৌদিতে তর্ক হচ্ছে—

দাদা বললে—গলার হার দিয়ে মুখ দেখব—ওই যে বড় বড় লকেট থাকে—

বৌদি বললে—না, আর্মলেট দিয়ে।

—আর্মলেট্—আর্মলেট মানুষে পরে?

—মেয়েমানুষে পরে।

—আমি হারই দেব।

—দাও গিয়ে, আমি আমার চুড়ি ভেঙ্গে আর্মলেট দেবই।

দাদা বললে—আমার সেই সোনার মেডেল ভেঙ্গে আমি এত্তো বড়ো লকেট দেব। চুড়ি ভাঙ্লে বাণীর টাকা পাবে কোথায়?

বৌদি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললে—দুল বেচবো। ভারী টাকার ভয় দেখাচ্ছো!

অকস্মাৎ বৌদি এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে—ঘুমুলে ঠাকুরপো?

—না। কেন?

—তা হ'লে ফাল্গুনেই দিন ঠিক হোক?

অগত্যা জবাব দিলাম—আমাকে কিছু না জানিয়েই যখন এতদূর করেছ তখন বিয়েটাও তোমরাই করলে পারতে!

বৌদি হেসে বললে—মেয়ে দেখাবো, ভয় নেই, ভয় নেই।

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বৌদি চলে গেলেন।

ফাল্গুনের প্রথমে দাদা কতকগুলো ছাপানো কার্ড দিয়ে বললে—তোমার বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন ক'রো, তা ত আর আমি পারবো না।

বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে মণিকার সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত হলাম। মণিকা বললে—বেশ, এতদিন আসনি কেন? পড়াশুনো নিয়ে এতদিন ত ছিলাম বেশ, এখন দিন ত কাটে না আর। তা তোমারও যেমন—

—কলেজে তিনঘণ্টা পড়াতে হয়, পড়তে হয়, জানো?

—অতএব খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো সব বন্ধ; চাকরি এক তুমিই করলে যাহোক্।

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম—আমি আসিনি ব'লে আর যেই অভিযোগ করুক, অন্তত তুমি করবে না বলেই আমার বিশ্বাস ছিল—

—ভালকথা, এর মাঝে এক কাণ্ড হয়েছে। এক বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার এসেছিলেন আমার পাণি প্রার্থনা করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন—আমি যদি ব্রিফলেস্ ব্যারিস্টারিই সারাজীবন রয়ে যাই, আপনি কি তখন আমার দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করবেন? আমি উত্তর ক'রলাম, দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ আমি করি না তবে পছন্দও করি না। যদি ব্রীফ্‌লেসই থাকবেন তবে বিয়ে করতে চান কেন? ভদ্রলোক ভয়ে প্রস্থান করেছেন।

—বটে! তুমি অসম্ভব বীরত্ব করেছ সন্দেহ নেই।

মণিকা চটে উঠে বল্‌লে—বীরত্বটা কি দেখলে? স্পষ্ট কথা বলেছি মাত্র।

আমি বক্তব্য প্রকাশ করবো মনে ক'রে বল্‌লাম—আমারও অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছে—

মণিকা বাধা দিয়ে বললে—অত্যন্ত বেঁটে ও রোগা বলে মেয়েপক্ষ পছন্দ করেনি ত? বেশ করেছে—

মাথা নেড়ে বললাম—তা নয়, ব্যাপার সাংঘাতিক—

বিবাহের খামে ভরা নিমন্ত্রণপত্রটা তার হাতে দিয়ে বললাম—এবংবিধ ব্যাপার।

মণিকা পাংশুমুখে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খামখানা খুলে চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে বললে—তার মানে?

—চিঠির ভাষাটা কি দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে?

মণিকা বিস্ময়-কম্পিত-কণ্ঠে বললে—তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো তা আমার কাছে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলে না?

—তার মানে?

—তুমি কি এতদিন আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছ!

—আমি কিছুই করিনি, তোমার কথা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল।

মণিকার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছিল, যথাসাধ্য চেষ্টায় তাকে দমন ক'রে সে বললে—আমার মনের কথা তোমার ত না জানা ছিল এমন নয়, তবুও তার মর্য্যাদা দাওনি, বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছ।

আমি ব্যথিত হয়েছিলাম; ব'ললাম—আমি আজ যা

জানবার সুযোগ পেলাম আর পনের দিন আগে তা জান্‌তে পারি নি এ আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু এখন আমি উপায়-হীন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি, তুমি নিজের সঙ্গেই নিজে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তুমি আত্মবঞ্চনা করেছ—

মণিকা নিম্নকণ্ঠে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ, নিজের মাঝে তুমি নিজেকে চিন্‌তে পারনি। আমার দরিদ্রগৃহে তোমার স্থান বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নয়।

মণিকা বিরক্তির সঙ্গে বললে—ভগবানের দোহাই রেখে দাও, আমার প্রগলভতার মূল্য কি আমার চেয়েও বেশী!

—তা নয় মণিকা। তুমি ফুলের মত—তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, আদর ক'রে সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করা যায়, তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলে এবং সে আনন্দ সত্যই আমার জীবনের স্মরণীয় গৌরব—কিন্তু তোমাকে গৃহে স্থান দিতে আমি সত্যই ভয় পেয়েছি, তোমাকে না হ'লেও তোমার নতুনত্বের মোহকে আমি ভয় করি।

মণিকা নমিতনেত্রের সজলদৃষ্টি নীরবে আমার মুখের উপর ন্যস্ত ক'রে রইল মাত্র।

আমি আবার বললাম—আজিকার বেদনা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হয়ে থাক। আশা করি, ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি নিজেকে নিজে প্রতারণা করবে না।

মণিকা ক্লান্ত বিষাদার্দ্র কণ্ঠে বললে—তোমার উপদেশ পেয়ে কৃতার্থ হলাম সন্দেহ নেই, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তার প্রয়োজন হবে না।

আমি খোলা জানালার ভিতর দিয়ে অকারণেই দূর দিগন্তের একফালি কালি-কালো মেঘের পানে চেয়েছিলাম। অস্তায়মান সূর্য্যের সোনালী রৌদ্র মেঘের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে—

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি, মণিকা পিছন ফিরে সঙ্গোপনে একফোঁটা অশ্রু হাতের তালুতে মুছে ফেলে আবার ধীর শান্ত-ভাবে আমার পানে তাকালো।

আমি আগ্রহের সঙ্গে ব'ললাম—আমায় ক্ষমা ক'রো মণিকা।

মণিকা হাস্‌তে চেষ্টা ক'রে বললে—ক্ষমা করেছি। তুমি বিয়ে ক'রে বৌ কেমন হ'ল গল্প করতে আস্‌বে ত আর একবার ?

—তাতে তুমি সুখী হবে ?

—নিশ্চয়ই।

—তবে আস্‌বো।

ফুলশয্যার দিনে মণিকা এসে দু'টো ফুলের মালা উপহার দিয়ে অনাড়ম্বরেই বৌ দেখে গিয়েছিল। আর আমার স্ত্রী সেই রাত্রে প্রথম প্রশ্নই করেছিল—যে মেয়েটি ফুল দিল সে কে ?

আমি বলেছিলাম—সহপাঠিনী।

স্ত্রী অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্ন করছিল—মাত্র ?

ছবি

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার বি-এ

তুষারের শিরে স্বর্ণতপন
কনকপ্রদীপ জ্বালে ;
বলাকার পাঁতি ঢেউ তুলে যায়
আষাঢ় গগন-ভালে।
নদীর কৃষ্ণ জলের উপর
শ্বেততরঙ্গ হাসে ;

অস্তকিরণ সন্ধ্যাদেবীর
নিবিড় চুলেতে ভাসে।
চিত্রনিচয় তুলিকা চালনে
আঁকে না কো কোন মায়া,
অন্তরতটে ফেলে এরা শুধু
কোন্ মানবের ছায়া !

রেফুজি-সংসর্গের স্মৃতি

শ্রীচিন্তামণি কর

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। রাস্তার উপর জমাট বরফ একটুও কমেনি। মাঝে মাঝে দু-একদিন পাখীর পালকের মত ঝুর ঝুর ক'রে তুষারপাতও হয়ে যায়। কাফের মধ্যে বসে টেবিলে খালি কাপ্‌টার দিকে চেয়ে দার্শনিক কিছু চিন্তা করবার চেষ্টা করছি, কারণ পকেটে হাত দিলে কেবল মাত্র পকেটটিই সাদরে করমর্দ্দন ক'রে জানায়—ওর বেশী আর কিছু দেবার তার ক্ষমতা নেই। বিরস, উদ্বেগপূর্ণ মনে ভাবছিলাম অর্থাভাবে শেষে কি বিদেশে না খেয়েই মরব। তখনই মনে হ'ল, আমি ত তবু খাচ্ছি—কিন্তু সেদিনের দেখা স্প্যানিস্ রেফুজি ছেলে-মেয়েরা কয়েক টুকরো শুখনো রুটির জন্যে কত কাড়াকাড়ি মারামারি করলে। ওদের পেট চালাতে

এন্‌কারণার চিঠি

পারীর রঙ্গমঞ্চে নেচে অর্থোপার্জ্জন করতে দেখেছি। লোকে নাচ দেখে বাহবা দিয়েছে, ফুলের তোড়া দিয়েছে, কিন্তু তারা কেমন থাকে, খেতে পায় কি না, জানতে কারো কৌতূহল হয়নি।

এমিল জোলার "নানা" উপন্যাসে জুভিসি স্থানটির নাম দেখেছিলাম। ঘটনাচক্রে সেই জুভিসিতে গিয়ে পড়েছিলাম। জুভিসির রেলস্টেসন থেকে দুই মাইল দূরে দ্রাভেই-এর প্যাভিয়ঁল্লো গ্রামটিতে চাষীদের বাস। পারী থেকে কল্পবেই যেতে বাসেও এখানে নামা যায়। বই পড়ে কল্পনার মত সুন্দর না হলেও প্যাভিয়ঁল্লোর বেশ একটা মোহ আছে। একবার গেলে দুবার যেতে মনকে তাগিদ দেয়। এই গ্রামে চাষীদের ফসল রাখার একটি খালি বারাকে প্রায় তিরিশটি রেফুজি মেয়ে-পুরুষে কোন মতে মাথা রক্ষা করছে। এরা পাড়ার লোকের সহানুভূতি যে পায় না তা নয়, কিন্তু তা অবাধ নয়, কারণ তাতে পুলিসের হুকুমকে অগ্রাহ্য করতে হয়। এদের অপরাধ—এরা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নরমেধযজ্ঞের বাইরে-পড়া আহুতি। রবিবারটা প্রায়ই রেফুজিদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটাতাম। এক রবিবারে প্যাভিয়ঁল্লোতে পৌঁছে দেখি যে, যতটুকু পেরেছে কালো কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ ক'রে মাথায় হাতে বেঁধে গোলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে শব্দ নেই, কোন ভাবলক্ষণও তাদের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না, নিস্পন্দ স্থির, তারা যেন কোন মায়াবীর যাদুতে পাথর হয়ে গেছে। সকলের মাঝে কালো কাপড় ঢাকা একটি ছোট কফিন্। একটি মেয়ে কফিনের একপ্রান্তে মাথা রেখে নিরালম্বভাবে বসে আছে, আর তার একখানি হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধে বিকৃত ভগ্নাঙ্গ একটি স্প্যানিস যুবক। তাদের চোখে পলক পড়ছিল না—যেন মমির উপর আঁকা চোখ। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে মারা গেছে?" লোকটি বেশ একটু তিক্ত স্বরে বললে, "মারিয়ার ছেলেটি।" বছর দুইয়েকের ছেলে। সাতদিন আগে দেখে গেছি প্রত্যেকের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুল টেনে নাক ধরে ব্যতিব্যস্ত করছে। সব কিছু সজীবের চেয়েও তাকে যেন বেশী সজীব দেখাত, আর আজ তার অসাড় দেহপিণ্ড হাজারবার কারো কোলে ছুঁড়ে দিলেও কিছু বলবে না, খল খল হেসে উঠবে না। বড় মর্ম্মাহত হলাম। জিজ্ঞাসা করা অবান্তর, তবু বললাম, "কি হয়েছিল তার? এই ত সাতদিন আগে তাকে দেখেছিলাম বেশ ভাল ছিল।" লোকটি তেমনি নির্লিপ্ত তিক্ত স্বরে বলল, "হবে আবার কি, আমরা রেফ্যুজি, এই দারুণ শীতে মাথায় আচ্ছাদন নেই, গায়ে শীতনিবারক বস্ত্র নেই, পেটে এক-কণাও খাদ্য নেই, মরাটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, বেঁচে আছি ভাবতেও দ্বিধা হয়। ঐ ছেলেটিকে বেশী ভাগ্যবান

বলব, কারণ ওর সহ্য ক্ষমতা আমাদের মত নয়, মৃত্যু ওকে সহানুভূতি দেখিয়ে আজ শান্তি দিয়েছে।" শুনে স্তম্ভিত হলাম! পকেটে সামান্য যা-কিছু ছিল তাদের দিয়ে বললাম, আমার ক্ষমতা অতি সামান্য, তোমাদের অভাবের বিরাট বিভীষিকাকে একটুও প্রশমন করতে পারি না, একমাত্র হৃদয়ের সহানুভূতি দিতে পারি যা তোমাদের এই দৈন্য দশায় কোন কাজে লাগবে না।

এইবার কফিনটি নিয়ে যাবে। মায়ের স্নেহবন্ধন ছিন্ন ক'রে কফিন নিতে সকলেই ভয় করছিল। গৃহযুদ্ধ তাদের শান্তিময় আশ্রয়ে আগুন জালিয়ে সর্ব্বস্বহীন ক'রে জগতের নিষ্ঠুরতার মাঝে ছেড়ে দিলেও তাদের মনের মমতার কোমল তন্ত্রীটি তখনও ছেঁড়েনি। মেয়েটির স্বামী মাঝে মাঝে তার মাথায় হাত বুলিয়ে অস্ফুটভাবে বলছিল, "শান্ত হও মারিয়া।" মেয়েটি নিজেই কফিনটি ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল,তারপর হঠাৎ আমার দিকে এসে অনুযোগের সুরে বললে, "তিন দিন আগে এলে না কেন কর? তুমি বলছ সামান্য, কিন্তু ঐ সামান্য দান পেলে আমার ছেলেকে মরার আগে একটু দুধ খেতে দিতে পারতাম। বাছা আমার মরে যাবার আগে খেয়েছে শুধু জল—ময়লা জল!"

এরপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখবার মত সাহস আমার রইল না, পালিয়ে গেলাম।

এর পর প্রায় দুসপ্তাহ প্যাভিয়ঁন্নোতে যাবার আমার সাহস হয়নি। পরের রবিবার গ্রামটিতে যাবার মোহ আমাকে ফের পেয়ে বসল। প্রায় ১১টা হবে, পৌছে দূর থেকে দেখি ব্যারাকটির চারিধারে যেন নানা রঙের অতিকায় প্রজাপতির মেলা। ব্যারাকে উপস্থিত হয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। কোন কম্যুনিস্ট পার্টির অধিবেশন উৎসবে নাচ দেখাতে তাদের আমন্ত্রণ এসেছে, তাই তাদের জাতীয় পোষাক রঙ-বেরঙের ঘাঘরা-ওড়না সব পরিষ্কার ক'রে বাইরে শুখাতে দিয়েছে। আমায় ধরে বসল, তাদের সঙ্গে যেতে হবে। দুটি লরীর উপর চারখানি বেঞ্চ সাজিয়ে তার উপর বসে আমরা সবাই যাত্রা করলাম। যেতে হ'বে ভিল্ জুইভ্ গ্রামে, প্রায় ৬১ কিলোমিটার দূর। রাস্তায় ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল। আমরা প্রায় সাড়ে চারটেয় পৌছানর পর বহুলোক এসে আমাদের দলটিকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে গেল। পারীতে সাঁ মার্তাঁ'র রঙ্গমঞ্চে নাচগান শুনিয়ে 'জুনেস্ হ্যাস্পান্ (স্পেনের কিশোরদল) প্রায় সারা ফ্রান্সের শহরে, গ্রামে, পল্লীতে বিখ্যাত হয়েছিল। কিছু পরেই মুক্ত প্রাঙ্গণে ছেলে-মেয়েরা কখন দৃপ্ত কখন করুণ অর্কেষ্ট্রার সুরের সঙ্গে তাদের জাতীয় জীবন, সহজ সরল পল্লীপ্রাণ, ঘরোয়া সংগ্রামের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ফুটিয়ে তুলল তাদের নাচে গানে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পেপিতা ও এন্কারনা নাচ দেখিয়ে সকলের প্রশংসা লাভ করলে। পাকিতা মেয়েটি গ্রাম্য চাষীর মেয়ে। নাচ কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে শেখার সৌভাগ্য হয়নি। গ্রাম্যনৃত্যে সহজ সরলভাবে সে দেখাল শিশুর

নৃত্যরতা এন্কারণা

ঘুমপাড়ানো গানে রতা মায়ের ছবি। ছেলেদের মধ্যে মোজেস্ মারিয়ানো আন্খেল দেখাল কর্ম্মাবসানে সুখী চাষীর সরল উল্লাস। এমন প্রাণঢালা নাচগানে ভুলে যেতে হয় এদের আসল অবস্থাকে। কে বলে এরা নিঃস্ব, সর্ব্বহারা! অলিম্পিয়ার দেবশিশুরা যেন মর্ত্তে নেমে এসেছে। ব্যারাকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। সে রাতে পারী ফিরে যাবার কোন উপায় ছিল না, কারণ শেষ ট্রেন এবং বাস অনেক আগেই চলে গেছে। গ্রামের একটি রেস্তরাঁতে নৈশাহার সেরে যখন ব্যারাকে ফিরলাম তখন রেফুজিরা তাদের

[illegible] রুটি এবং স্যুপ খাচ্ছিল। আমার সামনে একটি বছর বারোর মেয়ে বসে ছিল, তার নাম ললিতা। স্পেনের মেয়েদের নামগুলি প্রায় আমাদের দেশের মেয়েদের নামের মত শোনায়। ললিতা স্পেনে খুব সাধারণ এবং আদরের নাম। মেয়েটির আপন বলতে কেউ নেই। শুনলাম তার বাপ কাকা রিপাব্‌লিকান্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লড়াইয়ে ট্রেঞ্চে মারা গেছে। তার একটিমাত্র ভাইকে ফ্রাঙ্কোর দল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বন্দী করে এবং পরে বিচারের অভিনয়
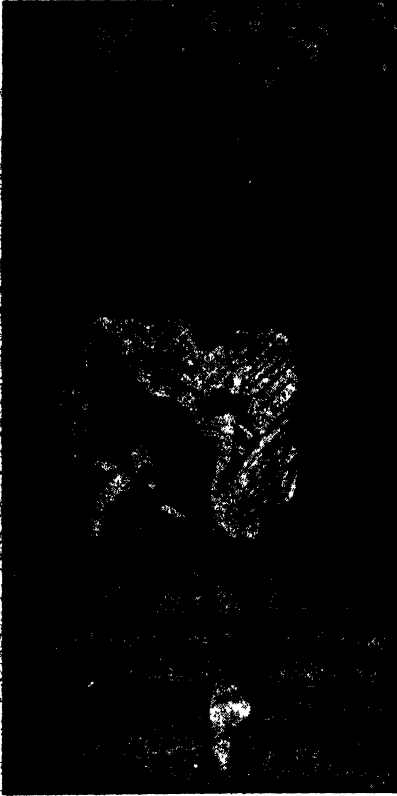
আধুনিক নৃত্যরতা পেপিতা

শেষ হ'লে গুলি ক'রে মারে। গভীর রাতে কেবল বৃদ্ধ আর শিশুরা ঘুমোচ্ছে। সক্ষম নারীরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে ট্রেঞ্চে চলে গেছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশুদের ঘুম গভীর শান্তিপূর্ণ ছিল না, আসন্ন বিপদের আতঙ্কে তারা মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। যে-কোন মুহূর্ত্তে তাদের ঘুম চিরনিদ্রায় পরিণত হ'তে পারে। এমনি এক রাতে বার্সিলোনা শহরের পথ, বাড়ী, মাটী, শিশুদের বুক কাঁপিয়ে সাইরেন্ বেজে উঠল। আকাশে এয়ারোপ্লেনের গুরু গর্জ্জন শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তে বিরাট কান-ফাটা বিস্ফোরণ শব্দ। করুণ কণ্ঠের অন্তিম চীৎকার বম্‌ফাটার শব্দ-প্রতিধ্বনির যেন শেষ রেশ। অন্ধকারে এয়ারোপ্লেনগুলিকে এক ঝাঁক শবলোলুপ শকুনের মত দেখাচ্ছিল। মেসিনগানের কড় কড় শব্দ যেন ধ্বংসোন্মত্ত প্রেতের পৈশাচিক হাসি। চাপা ভয়ার্ত্ত চীৎকার ক'রে লোকজন রাস্তায় ছুটাছুটি করছে। কে একজন ডাকল, "ললিতার মা, তোমার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে এখুনি বাইরে এস, পালাতে হবে।" বড় মেয়েটি কিছুতেই বাইরে এল না। সে বলল "বাইরে মাথায় বম্ পড়ার বেশী সম্ভাবনা, আমি ঘরেই থাকব।" ভাববার সময় ছিল না, বৃদ্ধা ও ললিতাকে একজন বাইরে টেনে নিল। একটা আগুনের চমক ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ—তারপর কি হ'ল মা-মেয়ে জানতে পারেনি। যখন তারা চোখ মেলে চাইলে তখন ভোর হয়েছে। কয়েকটি মেয়ে ও পুরুষ তাদের চারিপাশে বিরস বিবর্ণ মুখে বসে ছিল, আহত কেউ বা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। বৃদ্ধা চীৎকার ক'রে উঠল, "আমার বড় মেয়ে কোথায়! এ কি! এ মাঠের মাঝে আমরা কি ক'রে এলাম?" সহ্যের অতীত হলেও বৃদ্ধাকে শুনতে হ'ল, যেখানে তার মেয়ে শুয়েছিল, তারা জ্ঞান হারাবার পর সেখানে বাড়ীর ভাঙা স্তূপ আর কয়েকটি গর্ত্তে রক্ত জড়ান মাংসের দু-এক টুকরো পড়েছিল মাত্র। প্রাণভয়ে পালাবার সময় আর সকলে তাকে আর ললিতাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এদের যেতে হবে বহু দূর ফরাসী সীমান্তে, এই আশায় যদি ফরাসীরা আশ্রয় দেয়। এদের পিছনের টান ছিল না। আপন বলতে সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। এরা কারো পক্ষে নয়, বিপক্ষে নয়; তবু এদেরই হারাতে হয়েছে সব কিছু। রাষ্ট্র-নায়করা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে নির্ম্মমভাবে এই নিরীহদের করেছেন বলি। সীমান্তে এসে রাস্তায় কি একটা পায়ে ফুটায় ললিতার মা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। মাত্র তিনদিন জ্বর ভোগ করার পর বৃদ্ধা ফ্রান্সের চেয়ে আরো নিরাপদ স্থানে চলে গেল—যেখানে ফ্রাঙ্কো নেই, স্পেনের গৃহযুদ্ধ নেই, হতাহত নেই, হাহাকার নেই। তারপর আরো বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ললিতা এসে পড়েছে এই জুনেস্ ক্যাসপান্-এর মাঝে।

নানা কথার ফাঁকে বললাম, "ললিতা আমাদের দেশেও

অতি সাধারণ নাম। তা ছাড়া, ললিতাকে যদি আমাদের দেশের পোষাক পরিয়ে কোন ভারতীয়কে বলা যায়—আমাদের দেশের মেয়ে, তাতে কেউ অবিশ্বাস করবে না।" তারা বললে, "কর, ওকে তোমার বোন ক'রে নাও না।" বললাম "তা ত আছেই, আবার নতুন ক'রে সম্পর্ক করবার দরকার কি?" ওরা বলল, "তা নয় হে, আমাদের দেশে যে-কোন মেয়ে বা ছেলেকে ভাই বা বোন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তুমি তাতে রাজী আছ?" বললাম, "হ্যাঁ।" কিন্তু ব্যাপারটি প্রথমে ভাল বুঝিনি। তারা সকলেই পান-পাত্রগুলি পরস্পরে ঠেকিয়ে বললে, "আজ থেকে কর আর ললিতা ভাই-বোন।" পাত্রে অবশ্য জল ছাড়া অন্য পানীয় ছিল না—পাবে কোথায়! তারপর ললিতা সকলের করমর্দ্দন ক'রে ধন্যবাদ জানালে, আমাকেও অনুরূপ করতে হ'ল। কথাচ্ছলে বললাম, "ললিতা, দেশে ত তোমার কেউ নেই, আমাদের দেশে যাবে?" সে বলল, "না, এয়ারমানে কর, তোমাকে আমরা খুব ভালবাসি, কিন্তু আমি ফিরে যেতে চাই স্পেনে। আমার কেউ নেই সত্যি, কিন্তু স্পেনের মাটিতে আমার জন্ম, তার সঙ্গে আমার সংযোগ কেউ ছিন্ন করতে পারবে না। সে আমার সবচেয়ে আপন, আমি তার কোলেই আশ্রয় পেতে চাই।" বয়সে অনেক ছোট হ'লেও সেদিন থেকে ললিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। আমরা বহুদিনের পরাধীনতার মোহে নিজের দেশকে কতখানি ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, তা বোধ হয় ভুলে গেছি।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেছে। এই কয়েকটা মাস দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে এরা কোনমতে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জুনেস্ ত্যাস্পানের আগে যেমন আদর ছিল, নিমন্ত্রণ ছিল, এখন আর তা নেই। ইউরোপে এই ক'মাসে অশান্তির আগুন দাবানলের মত একদেশ থেকে আর একদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্স নিজের ঘরের দরজায় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখছে। কয়েকটা বিদেশী রেফ্যুজির কে খোঁজ নেয়, কার এত মাথা ব্যথা। কয়েকজন রেফ্যুজি চেষ্টা ক'রে রাশিয়া বা স্পেনে চলে গেছে। যে ক'জন পড়ে আছে, তারাও ভাবছে অন্যত্র যাবার কথা। ফ্রান্স এখন আর নিরাপদ আশ্রয় নয়। তারা এক যুদ্ধস্থল থেকে আর এক বৃহত্তর যুদ্ধস্থলের সামনে এসে পড়েছে।

এঁদের দলে এক অতি-বৃদ্ধ দম্পতি ছিল। স্বামীর বয়েস ছিয়াত্তর, স্ত্রীর বয়স বাহাত্তর। বৃদ্ধ তার স্ত্রী, মেয়ে, জামাই ও একটিমাত্র নাতনী লাকিতার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। তার জামাই ছিল রোখো রিপাব্লিকান্ সৈন্যদলের একজন অফিসার, যুদ্ধের চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে

মাতৃস্নেহ নৃত্যে লাকিতা

পরিস্ফুট। যুদ্ধের পূর্ব্বে এরা ছিল বার্সিলোনার এক গ্রামের সরল চাষী পরিবার। বিদেশে বড় কষ্ট পায় দেখে একদিন বৃদ্ধকে বললাম, তোমরা স্পেনে চলে যাও না, এখন ত যুদ্ধ থেমে গেছে। বৃদ্ধ বললে, "যাব ত, কিন্তু স্পেনে প্রবেশের হুকুম পাব কি করে।" বললাম, "ওঃ, তোমার

জামাই যে আবার রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত, কাজেই তোমায় ফ্রাঙ্কোর দল পেলে মেরে ফেলবে।" কিন্তু বৃদ্ধ নিশ্চয় ক'রে জানাল রোখোর জন্য তাকে ফ্রাঙ্কোর দল দোষী করবে না। সেলিয়র রোখোকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বৃদ্ধ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত ছিল কি-না; কিন্তু প্রতিবারই সে গভীরভাবে বলত—"না।" অনেক চেষ্টা ক'রে অনুমতি-পত্র পেয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধা স্পেনে চলে গেল। দিন দশেক পরে প্যাভিয়ঁয়োতে গিয়ে দেখি সকলের মুখ অন্ধকার হয়ে আছে, যেন ঝড় আসবার পূর্ব্বে প্রকৃতির থমথমে ভাব। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায়, লাকিতা

লালিতা

একটি টেলিগ্রাম এনে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল, "তোমার শ্বশুর ও শাশুড়ীকে সীমান্তে যথাবিহিত সম্মানে গুলি করা হয়েছে।" প্রেরক ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের এক অফিসার। লোকটি অতি ভদ্র বলতে হবে, না হ'লে খোঁজ ক'রে জামাইকে সুখবরটি পাঠাত না। কি বলব, সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই নেই। এদের দুঃখের জীবনে এ ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু আমার মনে বিঁধতে লাগল, আমি অকারণ তাদের মৃত্যুর নিমিত্ত হলাম। শুধু সেলিয়র রোখোকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাদের মারল কেন, তারা ত কোন অপরাধ করেনি বা কোন রাজনৈতিক সংস্রবও তাদের ছিল না।" সে বলল, "তারা লেবার ফেডারেশনের সেক্রেটারী ছিল।" অত্যন্ত বিচলিত ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, "রোখো, তুমি জেনে শুনে তাদের মৃত্যুর দরজায় পাঠিয়ে আমায় নিমিত্ত করলে?" রোখো উত্তর দিল, "তারা এখানেও না খেয়ে মরত?" ভেবেছিলাম তাদের বয়েস দেখে ছেড়ে দেবে, কিন্তু শূয়োরেরা কি পাষণ্ড! শান্তি এইটুকু যে তাদের রক্ত নিজের দেশের মাটীকে ভিজিয়েছে। বিদেশী মাটীতে কবর দিলে তাদের মরা হাড়গুলোও হয়ত আমাদের অভিশাপ দিত।

এর কিছু দিন পরে একদিন গল্পে মত্ত হওয়ায় ঘড়ির দিকে খেয়াল ছিল না। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখি—ট্রেন ও বাস সে রাতে আর পাওয়া যাবে না। রোখো বলল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত আমার ওখানে আজকের রাতটা কাটাতে পার।" সে থাকে ব্যারাক থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এক কারখানার ছোট একটি শেড্-এ। তার স্ত্রী ও মেয়ে আগেই শেডের দিকে রওনা হয়েছে। রোখো বললে, "চল হে, যেতে হবে অনেকখানি।" চাষের জমির মাঝ দিয়ে পথ। কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঝড়ের বেগে কে একজন বিপরীত দিক থেকে আমাদের অতিক্রম ক'রে গেল। রোখো চীৎকার ক'রে ডাকল, "লাকিতা, কোথা যাস্?" উত্তর এল সক্রন্দনে, "মরতে।" আমি ত অবাক! রোখো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল, বললাম, "মেয়েটি এই অন্ধকারে গেল কোথায় দেখ শিগ্‌গির।" মেয়েটি অদূরবর্ত্তী একটি দীঘির পাড় থেকে জলের দিকে ছুটে নেমে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে তাকে ফিরিয়ে আনা গেল। তখনও সে কাঁদছিল আর বলছিল, "আমার জীবনে শান্তি নেই, আমি মরব।" স্তেনর রোখো নতমুখে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে সবটাই হেঁয়ালী লাগছিল। একটু রুষ্টভাবেই বললাম, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে অভিনয় না ক'রে বলই না কি হয়েছে?" লাকিতা রুক্ষভাবে জবাব দিল, "ওই যে লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, ও আমার নিজের বাবা নয়। আমার বাবা আমার দু'বছর বয়েসের সময় মারা গেছে। রোখো তার এক বছর পরে আমার মাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু তখন আমাকে ওরা চায়নি। বারো বছর মা আমার কোন খোঁজ করেনি,

আমি ছিলাম আমার দিদিমা ও দাদামশাই-এর কাছে। ওদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় আজ এক বছর হ'ল রোখো তার মেয়ে হিসেবে আমায় দত্তক নিয়েছে। হয়ত রোখো আমায় নিজের মেয়ের মত ভালবাসে, কিন্তু হায় রে আমার ভাগ্য! আমার মা মনে করে আমার প্রতি রোখোর ভালবাসাটা মোটেই বাৎসল্য নয়। মাকে দেখিয়ে রোখো আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, মা'র ব্যবহার না বলাই ভাল। আমার আজ কেউ আপন নেই যার কাছে দাঁড়াতে পারি। আমার একমাত্র অবলম্বন দিদিমা, দাদা-মশাইকে তোমরাই চক্রান্ত ক'রে মেরেছ। তোমরা তাদের দেশে যেতে উত্তেজিত না করলে বা পাথেয় জোগাড় ক'রে না দিলে তারা মরত না। আমার জীবনকে বিষময় করবার জন্য তোমরাই দায়ী।" আমি ত চুপ, রোখোও নীরব রইল, একটি কথারও জবাব দিল না। নিজেদের ঘরোয়া কথা ঝোঁকের মাথায় ব'লে লাকিতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তখনকার মত ব্যাপারটা মানিয়ে নিলেও বাধ্য না হ'লে সে রাতে রোখোর বাড়ী যেতাম কি-না সন্দেহ। অস্বস্তিকর মনস্তাপ সমস্ত রাত আমাকে খোঁচা দিয়েছিল। ভাবছিলাম, রাজনৈতিক কারণে ঘটা অশান্তি ও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে কোন্‌টা তীব্রতর। এর পর প্যাভিয়ঁরোর মোহ আর আমাকে টান্‌তে পারে নি।

যে যুদ্ধাতঙ্ককে ফ্রান্স এতদিন দূরে ঠেলে রেখেছিল উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে বিরাট আকারে তা ফ্রান্সের সীমান্তে হুমকি দিচ্ছিল। হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ডের দাবী তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। দালাদিয়ের সমানে হুমকি দিলেও তার মধ্যে ভয় ও উদ্বেগের মিশ্রণ ছিল। রাত-দিন যখন-তখন সাইরেন বেজে লোকজনের স্নায়ুগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছিল। ঘরবাড়ী, স্মারকস্তম্ভ, মূর্ত্তি, শিল্পসম্পদ বালির বস্তা দিয়ে ঢেকে, আলো নিভিয়ে ফ্রান্স আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়েছে। আমার প্রফেসার জিওভানেল্লি দূরগ্রামে চলে গেলেন। তাঁর এবং গ্রঁাদ শমিয়ের-এর স্টুডিয়ো বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে বসে ভাবছি এখানে থাকব, না দেশে ফিরে যাব। হোটেলের পরিচারিকা এসে খবর দিল—নীচে দু'টি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নেমে দেখি এন্‌কার্‌না আর তার মা মাদাম মারিয়া দাঁড়িয়ে। অভিবাদন-কুশলসংবাদাদির পালা শেষ হ'লে মারিয়া বললেন, "কর, আমরা বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।" কি বিপদ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—তাঁর স্বামী অনেক খুঁজে অতি কষ্টে ঠিকানা যোগাড় ক'রে

সকন্যা মাদাম মারিয়া

বার্সিলোনা থেকে চিঠি দিয়েছেন স্পেনে ফিরবার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু নবনিযুক্ত কন্সাল কিছুতেই প্রবেশের হুকুম দিচ্ছে না। যে কাণ্ড করে শেষে হুকুম ও পাথেয় মিলল তা সবিস্তারে লিখলে একটি মহাকাব্য হয়ে যেত। মারিয়া বললেন "কর, আমরা চলে যাব, আর হয়ত দেখা হবে না; কিন্তু তোমাকে আমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে হবে।" শুনে বললাম, "পাগল হলে নাকি! তোমরা একেবারে নিঃস্ব, আহার্য্য পাথেয়—এমন কি পরণের উপযুক্ত কাপড়টুকুও যার নেই কি চাইব তাহাদের কাছে। একে উপকার করা হ'ল মনে ক'রে প্রতিদান নিলে নিজের কাছে এবং নিজের দেশের কাছে লজ্জিত হব। এতটুকু উপকার আমাদের দেশে লোকে লোকের প্রতি ক'রে থাকে। পরাধীন হ'লেও আমাদের দেশে হৃদয় একেবারে মরে যায় নি। যদি একান্তই কিছু ভালবেসে দিতে চাও ত দেশে গিয়ে পাঠিয়ো।" তারা বলল, "দেশে ফিরে আমাদের দুর্গতি আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না। দেশে খাবার কই, অর্থই বা কোথায়! ব্যবসা, বাণিজ্য, চাষ—সবই ত বন্ধ। সত্যিই

আমরা তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। তুমি আমাদের কিছু কাজ দাও যা ক'রে আমরা তৃপ্ত হব।" তাদের কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। শেষে বললাম, "প্রতিদান হিসাবে নয়, তোমাদের সঙ্গে জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছে, তার স্মৃতি-হিসাবে তোমাদের একটি প্রতিকৃতি এঁকে নিই।" যাবার দিন মারিয়া এন্‌কারনাকে স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখে জানাতে অনুরোধ করেছিলাম। লিখে জানান সম্ভব হয় নি। কিন্তু এনকারনা একটি ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে জানিয়েছিল স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা কি। ছবিতে ছিল ভূলুণ্ঠিতা শোকাবনতা একটি নারীর প্রস্তরমূর্ত্তি। লিখে বোধ হয় সে এত পরিষ্কার ক'রে জানাতে পারত না তাদের দেশের হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থাকে।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে যুদ্ধ বেধে গেছে। পরিচিত সকলেই চলে গেছে। আমি পড়ে দিন গুণছি পাথেয়ের আশায়। অধ্যাপক জিওভানেল্লি বহুবার অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকতে। এই সহানুভূতির জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু ফিরবার বহু কারণ আমাকে তাগিদ দিয়ে ভাবিয়ে তুলল। একদিন আমার

রেফুজি ছেলেরা ও আমি

জিনিষগুলি জিওভানেল্লির কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, "জানি না ভাগ্যে কি আছে; বহুদিন আমার সংবাদ না পেলে অনুগ্রহ ক'রে এগুলি আমার দেশের ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দেন।" তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে খালি সুটকেশ হাতে কয়েক মিনিট রাস্তা চলতেই পাশের একটি পার্ক থেকে প্রচণ্ড শব্দে বিমান ধ্বংসী কামান গর্জ্জে উঠল। এক মুহূর্ত্তে রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেল। কি করব ভাবতে পারছি না, হতবম্ব হয়ে গেছি। যে লোকের কামান দেখা দূরের কথা, এত কাছে বিস্ফোরণে তার মস্তিষ্ক বিকল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। একটি পুলিস ছুটে এসে কানের কাছে বাঁশী বাজিয়ে এক ধাক্কায় আমায় ফুটপাথের এক প্রান্তে ঠেলে দিল। সামনের বাড়ীর দরজায় লেখা ছিল "আব্রি" (আশ্রয়)। ঢুকে পড়লাম। "কাভ"-এ (ভূগর্ভস্থ ঘর) নেমে দেখি কয়েকটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তাদের শিশুগুলি কোলে ক'রে বসে আছে। আতঙ্কে তারা যে যে অবস্থায় ছিল ছুটে আশ্রয়ে এসেছে, কাপড় পরবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পায়নি। তাদের বিস্রস্ত চুল, চোখের ভয়-বিস্ফারিত দৃষ্টি যুদ্ধের বীভৎসতাকে আমার সামনে প্রকট ক'রে তুলল। তারা শিশুগুলিকে নিজেদের কুক্ষিতে দৃঢ়ালিঙ্গনে চেপে ধরেছিল। নিজেদের শরীর দিয়ে ঢেকে সন্তানকে আরো নিরাপদ করবার আপ্রাণ প্রয়াসে মনে হচ্ছিল তারা আশ্রয়েও নিরাপদ অনুভব করছে না। সকলের চোখ দিয়ে অশ্রু অবিরলধারে পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে কাতরোক্তি যেন তাদের বুক চিরে বেরুচ্ছিল, "হায় আমাদের এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!" কারো স্বামী, ভাই বা বাপ যুদ্ধে চলে গেছে। অনেকের আত্মীয়স্বজন বিগত মহাযুদ্ধ-বৈতরণীর পার থেকে ফিরে এসেছে। এরা কেউই হয় ত তখন ভাবেনি আবার তাদের ফিরে যেতে হবে যুদ্ধ-দেবতার খর্পর রুধিরে ভরে দিতে। পুরুষ যুবক হয়ে, এদের মাঝে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হ'ল, উপরে উঠে এলাম। সব সময় প্রাণের ভয়ই যে বড় হয়ে ওঠে না, সেদিন তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তার প্রভাব অতি কাপুরুষকেও কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম। আমাদের দেশে ভীরু বলে নিন্দিত শ্রমিক চাষীরাও আত্মদান ক'রে তার প্রমাণ দেখিয়েছে।

পাথেয় মিলেছে। ফিরবার জন্য জাহাজও পাওয়া গেছে। কিন্তু আনন্দ কি দুঃখ হচ্ছে তা বুঝলাম না। অন্তত আনন্দের উল্লাস বা দুঃখের তীব্রতা কোনটাই অনুভব

করিনি। স্টেসনে উপস্থিত হয়ে দেখি, ছিন্ন মলিন পোষাকে বিষণ্ণ মুখে কয়েকজন রেফ্যুজি প্রেতের মত দাঁড়িয়ে। ঘণ্টা বাজল, রেলের কর্ম্মচারীরা "আঁ ভোয়াতুর সিল্‌ভূপ্লে" (যাত্রীরা অনুগ্রহ ক'রে গাড়ীতে উঠুন) ব'লে চীৎকার করতে লাগল। তারা একে একে আমার হাত চেপে ধ'রে বিদায় জানাল। মুখে কিছু বলবার ভাষা আমাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ সামান্য চাপেই অনুভব করেছিলাম অন্তরের অকৃত্রিম বিচ্ছেদ বেদনাকে। আর কোন দিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না জানি না। বহুদূরের বিদেশী ভালবাসার বোঝা বড় ভারী। গাড়ী ছাড়বার জন্য বাঁশী বাজল। রুমাল বা হাত নেড়ে বিদায়ের অভিনয়কে দীর্ঘ করার ইচ্ছে হয় নি। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে তাদের মুখের ভাব দেখবার মত সাহসও ছিল না। সামনের জানালার পর্দ্দাটা কাঁচের উপর টেনে দিলাম। ইউরোপের সামান্য কয়েকমাসের বাস্তব ছবিকে চোখের সামনে থেকে মুছে দিতে পেরেছি কি-না অন্তরই সে প্রশ্নের জবাব দেবে।

সতী প্রয়াণে

মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

তুমি চলে গেলে সতী,
শান্তিময় স্বর্গলোকে—
মোরা রনু দূরে—

হেথা কেন থাকিবে গো ?
যখন যাইতে পার
স্বরগের পুরে ?

মাতৃরূপে দেখেছিনু
তোমারে গো ওগো সতী
কিবা কব আর

করুণায় ভরা আঁখি
কে বলিবে দেখে নাই
এপারের পার ?

যদি সবই জেনেছিলে
কেন তবে চলে গেলে
সব কিছু ফেলে ?

জীবন-সঙ্গীরে তব
তব রাজ্য, তব সব
তব মেয়ে-ছেলে।

অন্তরাল হতে তুমি
একবার দেখ নিজে
নিচেকার ছায়া।

দুঃখ পাবে জানি তাহা
মন তব কবে আহা!
এতো নহে মায়া।

প্রসন্ন কালিকা মাতা
প্রসন্না তোমার প্রতি
সত্য ইহা, মিথ্যা কভু নয়।

সতী গেল স্বর্গপুরে
সঙ্গীতের সুরে সুরে
সুরহীনা সে কি কভু রয় ?

সাক্ষী

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্-সি

কলিকাতা থেকে মোটরে আমি দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রামগড় কংগ্রেসে ভিজিটার হ'য়ে গিয়েছিলাম। অধিবেশনের দিন প্রাতে আকাশে মেঘের ঘটা দেখে বৃষ্টি আরম্ভ হবার আগেই আমরা মজহরপুরী ত্যাগ করেছিলাম। ফেরবার পথে রাজরপ্পার ৺ছিন্নমস্তার প্রাচীন প্রস্তর মন্দির দেখে যাবার আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। সঙ্গী বন্ধুদ্বয় সময়াভাবে রাজরপ্পা যেতে রাজী হলেন না। আমি তাঁদের রাঁচি রোড স্টেশনে তুলে দিয়ে নিজে মোটরে রাজরপ্পা অভিমুখে ড্রাইভার সহ রওয়ানা হলাম। চিতরপুরের মিশন হাসপাতালে বিহারের সাব-ডেপুটি ৺দুলালহরি ঘোষের স্মৃতি-ফলকও দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল। সেখানকার হাসপাতালের ডাক্তার মুখার্জ্জির নামে একজন বন্ধু একটি চিঠি দিয়েছিলেন। ডাক্তার মুখার্জ্জি উক্ত বন্ধুর আত্মীয়। পথে চিতরপুর থেকে একটা গাইড্ সঙ্গে নেবো ঠিক ছিল। ছোটনাগপুরের ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে—উঁচু পাথরের রাস্তা। এক এক স্থানে এমন বেঁক আছে যে সামান্য বেতাল হ'লে মোটর আরোহী সহ ষাট ফিট পর্য্যন্ত নীচে গিয়ে পড়তে পারে। এই অঞ্চলের জঙ্গল কংসরাজার কয়েদখানা রূপে ব্যবহৃত হ'ত—এরূপ প্রবাদ আছে। ছোট ছোট নদীর ওপর বড় বড় পুল বাঁধা আছে। নদীগুলি গ্রীষ্মকালে কেবল বালুগর্ভ—কিন্তু বর্ষাকালে ভীষণা খরস্রোতার আকার ধারণ করে। চিতরপুরে যখন পৌছলাম, ডাক্তার নিকটস্থ লারী নামক গ্রামে রোগী দেখ্‌তে গেছ্‌লেন। 'মেমসাহেব'ও সঙ্গে গেছ্‌লেন। লারী গ্রামে অনেক বাঙ্গালীর বাস আছে। ডাক্তারের ছোট বাংলোর সংলগ্ন আর একটি ছোট বাংলো আছে। সেটি ভিজিটার্স্ রেস্ট্ হাউস্ রূপে ব্যবহৃত হয়। আমি ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে সেই রেস্ট্ হাউসে আশ্রয় নিলাম। ইচ্ছা ছিল, পরদিন প্রত্যূষে একজন গাইড্ সঙ্গে নিয়ে রাজরপ্পা রওয়ানা হব। ড্রাইভার আমার মোটর নিয়ে মাইলখানেক দূরে এক গ্যারেজে বিশ্রাম করতে গেল। দ্বিপ্রহরে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে দেখ্‌লাম—আকাশে মেঘের ছুটাছুটি লেগে গেছে—পশ্চিম আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি এসে পড়ল। অল্পক্ষণ মধ্যেই রাস্তাঘাট প্রবল বৃষ্টিতে ভ'রে গেল। বাংলোর নিকটস্থ 'গাঙ্গীজমী' নামক নালাটি এক পার্ব্বত্য খরস্রোতে পরিণত হ'ল। ডাক্তারের বাংলোর দিকে মুখ ক'রে আমি নিজের ঘরে বসেছিলাম। ডাক্তারের 'বয়' একটি পাঁচবৎসরের বালিকাকে তার পিতামাতার ফের্‌বার্ আর দেরী নেই—এইরকম বোঝাচ্ছিল। ভীষণ বর্ষায় তার পিতামাতার জন্য মেয়েটি একটু ব্যাকুল হয়েছে—বোঝা গেল। মেয়েটিকে খাওয়াতে সে চেষ্টা করছিল—কিন্তু সে কিছুতেই খেতে রাজী ছিল না। হঠাৎ মেয়েটি জোর ক'রে 'বয়ে'র হাত ছাড়াতে গিয়ে সিমেণ্টের মেঝের ওপর প'ড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ চীৎকার ক'রে সে কেঁদে উঠ্‌ল। কান্নার সুরের মধ্যে বেদনা অপেক্ষা পিতামাতার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির অভিমানের অভিব্যক্তি আমার কাণে বেশী লাগ্‌ল। বৃষ্টির মধ্যে ছুটে চ'লে এসে আমি তাকে কোলে নিলাম। অপরিচিতের কোলে উঠে সঙ্কোচে ও বিস্ময়ে সে কান্না বন্ধ করল, কিন্তু ফোঁপাতে লাগ্‌ল। তার গা ঢেকে আমি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে আর্নিকা মাদার টিঞ্চারের পটি তার বেদনার স্থানে দিয়ে আর্ণিকা ৬ ক্রম তাকে খাইয়ে দিলাম এবং তার হাতে রামগড়ের মেলায় কেনা দুটো পুতুল, বিস্কুট, লেবেনচুষ প্রভৃতি ঘুষ দিয়ে তাকে শান্ত করলাম। সে খুশী হ'য়ে আমার দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। নাম জিজ্ঞেস করায় সে বলল—তার নাম সুধীরা, তার মা তাকে সুধী ব'লে ডাকেন। আমার মনটা কেমন ছ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌ল। আমার নিজের নাম সুধীর। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করার পর সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল—তাকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। রাত্রি আটটা নাগাদ আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়ার পর সপত্নীক ডাক্তার তাঁর মোটরে ফির্‌লেন। মোটর থেকে নেমেই মেমসাহেব মেয়ের শোবার ঘরে মেয়েকে দেখ্‌তে গেলেন। বয় তখন ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যার ঘটনা সব বললে।

মেমসাহেব বেশ পরিবর্ত্তন না ক'রেই আমার বাংলোয় প্রায় ছুটে এলেন। আমি ইঙ্গিতে নিদ্রিতা সুধীরাকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে উঠ্‌লেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম—ঘরের আলো মুখে পড়ায় চিন্‌তে পারলাম, ডাক্তার মুখার্জ্জির জায়া ওরফে 'মেমসাহেব' আমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সহপাঠিনী বীথিকা ব্যানার্জ্জি। বীথিকা বারান্দায় পৌছে সুধীরাকে জাগিয়ে তার মুখে চুমু দিয়ে তার অভিমান ভাঙ্গালো। এদিকে ডাক্তার 'বয়ে'র কৈফিয়ৎ শুন্‌তে শুন্‌তে ক্লান্তদেহে হঠাৎ ধৈর্য্য হারিয়ে তাকে এমন পদাঘাত করলেন যে, সে বেচারা ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে দূরে ছিট্‌কে পড়ল। ভয়ে সে আধমরা হ'য়েই ছিল। পড়বার আগে তার মুখ থেকে মাত্র একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরোল।

ডাক্তার রাগে গর্ গর্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাপড় চোপড় ছাড়্‌তে উঠ্‌লেন। আমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে, আমার বারান্দায় উঠে এলেন। প্রথমে মেয়েকে ফার্স্ট্‌-এড্‌ দেওয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর আমার আগমন-উদ্দেশ্য, বন্ধুর পরিচয় প্রভৃতি জেনে আমাকে বললেন—পার্ব্বত্য ভেড়া নদী এত বৃষ্টিতে ভীষণ আকার ধারণ করেছে। তার ওপর কোনও পুল নেই। সে নদী হেঁটে পার হ'য়ে রাজরপ্পায় মার মন্দিরে যেতে হয়। যদি আর বৃষ্টি না হয়, তবে চার-পাঁচ দিন অন্তত না অপেক্ষা করলে সে নদী হেঁটে পার হওয়া যাবে না। দামোদর ও ভেড়া নদীর সঙ্গমস্থলে জঙ্গলের মধ্যে মা'র মন্দির অবস্থিত। সেখানে বাঘের অত্যাচারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। মনটা এসব শুনে বড় খারাপ হ'য়ে গেল। নিকটে খরস্রোতা গাঙ্গী-জমার গর্জ্জন বাংলো থেকে শোনা যাচ্ছিল। কন্যার ক্রন্দন শুনে ডাক্তার নমস্কার ক'রে নিজের বাংলোর বারান্দায় উঠ্‌লেন।

টিফিন বাস্কেটে খাবার ছিল—তাই খেয়ে নিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়েছিলাম। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার বিরাজ করছিল। ভাবছিলাম মানুষ কত রকম ভাবে, আর অদৃষ্টের অদৃশ্য সঙ্কেতে বাস্তবে তার কত ওলট-পালট হ'য়ে যায়। এই বীথিকার সঙ্গে আমার বিবাহ একরকম পাকাপাকি স্থির হ'য়েই ছিল। পরস্পরের পরস্পরকে কত ভাল লাগ্‌ত। আমি বিলাতে থাক্‌তে প্রতি মেলে উভয়ের চিঠি লেখালেখি ছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সব কি রকম বদলে গেল। 'ভাইভা ভোসি'তে আমি কিছু কম নম্বর পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় আমার স্থান নীচে হ'য়ে গেল। আই. সি. এস্‌ হ'তে পারলাম না। খবর বেরোবার পর বীথিকার চিঠি আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। তার বাবা 'ফর্ম্যালি' দুঃখ ক'রে চিঠি লেখেন, আরও লেখেন—তোমার প্রতি আমার অনেক আশা ছিল—যা হোক, বীথিকে আর আট্‌কে রাখা সম্ভব নয়, আগামী মাসে ডাক্তার মুখার্জ্জির সঙ্গে তার ইত্যাদি। বীথিকার বাবার সে চিঠি পেয়ে আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রবাসে একমাত্র মাতৃসমা ল্যাণ্ডলেডীর স্নেহচর্য্যায় অতি কষ্টে সে ধাক্কা সাম্‌লাতে পেরেছিলাম। আমার বাবা লিখ্‌লেন দ্বিতীয় বার সিভিল সার্ভিস্‌ পরীক্ষার জন্য লণ্ডনে থেকে প্রস্তুত হ'তে। কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে আমি আর মনে জোর পেলাম না। ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিয়ে পাশ ক'রে কলকাতা ফির্‌লাম। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। বাবা মারা গেছেন। সংসারে এখন আমি একলা—সম্পূর্ণ একলা। তাই খেয়ালগুলো কিছু উদ্দাম। রাজরপ্পা যাব ব'লে ক'লকাতা থে.ক বেরিয়েছি—এতদূর এসে ফিরে যাব কি না ভাবছি—চোখ বুজে—আপন মনে। হঠাৎ মাথার কাছে 'সুধী' 'সুধী' ডাক শুন্‌লাম। এই নামে বীথি আমাকে ডাক্‌ত। মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছি, আর স্বপ্ন দেখ্‌ছি। সেই ডাক আবার শুন্‌লাম। চোখ মেলে দেখি, বীথি মাথার কাছে চেয়ারে গা দিয়ে আমাকে ডাক্‌ছে। আমি উঠে তাকে একটা চেয়ারে ব'স্‌তে দিলাম। সে আমার হাত ধ'রে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে—কি হবে সুধী, বয়টা যে ম'রে গেল! আমি চমকে উঠলাম। বীথি আমার হাত দুটি ধ'রে তার ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, কি ছেলেমানুষী ক'রো, ডাক্তার মুখার্জ্জি এখনই দেখতে পেলে কি মনে করবেন! সে জানালো—ডাক্তার প্রচুর বিয়ার পান ক'রে অচেতন হয়ে আছে; এমনই ভাবে তার দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিন কাটছে। মেয়েটি যদি তাদের মধ্যে না আস্‌ত, তাহ'লে সে এতদিন নিশ্চয় বিষ

খেয়ে মরত। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং স্থির হ'তে বললাম। আমার সহানুভূতি পেয়ে সে বালিকার মত আমার কোলে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সে ব'লে যেতে লাগল—আমার দিক থেকে তুমি যে রকম ব্যবহার পেয়েছ, তথাপি তুমি আমার ওপর এত অনুকম্পা দেখাচ্ছ। আমার মা'র ইচ্ছা ছিল না তোমার সঙ্গে এন্‌গেজ্‌-মেণ্ট্‌ ভাঙ্গা। কিন্তু বাবা কিছুতেই সে সময় ডাক্তারকে হাতছাড়া করতে রাজী হ'লেন না। আমার শেষ চিঠির উত্তর তোমার কাছে পাবার আশায় কত অছিলায়, কত কষ্টে আমি বিয়ে আটকে রেখেছিলাম, তা কেবল আমি জানি। সে চিঠির যখন কোন উত্তর পেলাম না, তখন আমার সব জোর চ'লে গেল। পরে জেনেছিলাম, আমার লেখা সে চিঠি তোমার কাছে যেতে দেওয়া হয় নেই।

বীথিকার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে বললাম, বয়টার মৃতদেহের কি ব্যবস্থা হবে? বীথিকা ব'ললে, নেশার ঘোরে ডাক্তার একবার বলেছিল, গাঙ্গীজমীর স্রোতের মুখে ফেলিয়ে দাওগে। জলে ডুবে মরেছে ব'লে দেবো। আমি ভাবলাম, ডাক্তার হ'য়ে যদি মুখার্জ্জির এই মত হয়, তা হ'লে তার নেশা খুব হয়েছে। কারণ এ হ'ল মৃতদেহে বিষ গিলিয়ে বা ফুঁড়ে দিয়ে বিষ খেয়ে মরেছে বলবার চেষ্টার মত। রিগর মর্টিস আরম্ভ হবার পর ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন আশা করার ন্যায় মেডিকাল জুরিস্‌প্রুডেন্সের অভিজ্ঞতা কোনও ডাক্তারের সজ্ঞানে হ'তে পারে না।

বীথিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার ঘরে পাঠালাম। আমার মনটা খুব খারাপ হ'য়ে গেল। বারান্দায় লঘু পদক্ষেপে পায়চারি করছি। রাত প্রায় এগারটা। ডাক্তার মুখার্জ্জি ভয়ার্ত্তভাবে আমার কাছে এলেন। আমি বিস্মিত হ'য়ে মুখের দিকে চাইতে তিনি বললেন, সন্ধ্যায় একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়ে গেল, আপনি ব্যারিস্টার, বলুন ত'—ইণ্টেন্‌শান্‌ টু কিল্‌ না থাকলে এতে কন্‌ভিক্‌শান্‌ হ'তে পারে? আমি বললাম, 'মার্ডার চার্জ্জে না হ'লেও গ্রিভাস্‌ হার্টের চার্জ্জে ৩২৬ ধারায় হ'তে পারে। 'ইণ্টেন্‌শান্‌' ছেড়ে আপনি 'প্রভোকেশান্‌', 'সেল্‌ফ্‌-ডিফেন্স্‌', 'য়্যালিবি' প্রভৃতির 'ডিফেন্স্‌' দিলে কিছু সুবিধা হ'তে পারে। ডাক্তার বললেন, তার ত 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট্‌ উইট্‌নেস্‌' চাই। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। সাম্‌নে চেয়ে দেখি বীথিকা আমার ঘরের দিকে উন্মুখ হ'য়ে নিজের বাংলোর বারান্দা থেকে চেয়ে আছে। আমি হঠাৎ ব'লে ফেল্‌লাম, আপনি 'য়্যালিবি ডিফেন্স্‌' দেবেন, আমি সাক্ষী দেবো। ডাক্তার আমার পায়ে হাত দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, ভগবান আমাকে বাঁচাবার জন্য আজ আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি এখানে থাকুন, নদীর জল একটু কম হোক, আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে রাজরপ্পা যাব। মিশনের চাকরদের ডাকাডাকি করে 'বয়'টার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা হ'ল। তারা জান্‌ল বৈকালে ডাক্তার সাহেবের অনুপস্থিতিতে 'বয়ে'র বুকে একটা ব্যথা ওঠে। সে কথা আমাকে বলে সে শুয়েছিল। তার পর তাকে আর দেখা যায় নাই। ডাক্তার ফিরে এসে পরীক্ষা ক'রে দেখেন সে হার্টফেল হ'য়ে মারা গেছে। পরদিন প্রাতে মিশনের একজন ধর্ম্মযাজক আমার উক্ত মর্ম্মে একটা স্টেট্‌মেণ্ট্‌ লিখে নিলেন। আমি নির্ব্বিকার-চিত্তে 'স্টেট্‌মেণ্টে' সই ক'রে দিলাম। ধর্ম্মযাজক ব'ললেন, ডাক্তার মুখার্জ্জি তাঁদের মধ্যে খুব 'পপুলার ফিগার্‌'। ওঁর চিকিৎসায় সকলের খুব রোগ সারে। তিন বৎসর বিলাতে ডাক্তার মুখার্জ্জির অধ্যয়নের সুখ্যাতি ক'রে এবং আমার করমর্দ্দন ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।

ডাক্তার মুখার্জ্জি তারপর আমাকে পেয়ে বসলেন—বীথিকার সঙ্গে আলাপ ক'রতে ব'ললেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে ৺দুলালহরিবাবুর দান আলমারী, যন্ত্র ও স্মৃতিফলক দেখে এলাম। ডাক্তার মুখার্জ্জি হাস্‌পাতালের কাজ সেরে যখন বাংলোয় ফির্‌লেন, তখন দেখ্‌লেন বীথিকার সঙ্গে আমার আলাপ বেশ জমে গেছে। তিনি আমাকে বললেন—বীথিকা অতি সহজেই সকলের সঙ্গে আলাপ করতে পারে—এটা তার মস্ত গুণ। বীথিকা আমার 'প্ল্যান্‌ অফ্‌ লাইফ্‌' সম্বন্ধে সব জেনে নিয়েছিল। আমি যখন তাকে বললাম, পরজন্মে যদি বিয়ে করা ভাগ্যে থাকে, তবে হবে—এ জন্মে হ ল না—তখন তার মেয়েকে আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে সে খুব গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমার তখন মনে হ'ল—পোস্ট্‌গ্র্যাজুয়েট্‌ ক্লাসে আমরা কাল পর্য্যন্ত পড়েছি। মাঝের সব ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।

বীথিকা আমাকে নিজে রেঁধে খাওয়াল। চার দিন পরে আমাদের রাজরপ্পা যাবার দিন স্থির হ'ল। দুপুরে

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | বুলবুল | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
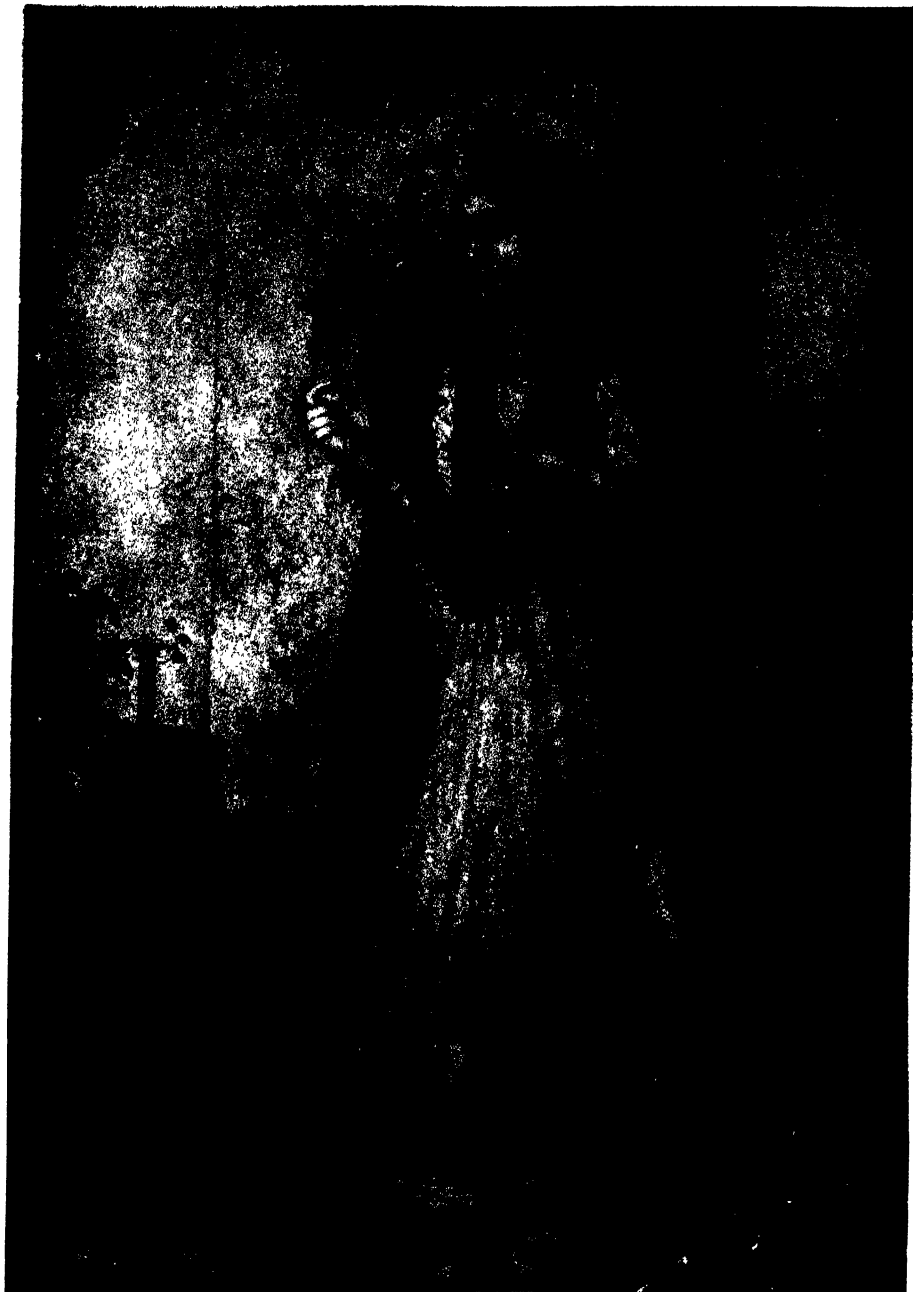
নিজের ঘরে একটু ঘুমোলাম। একটা সুখস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে শুন্‌লাম, ডাক্তার ও 'মেম্‌সাহেব' নিকটস্থ পোনা গ্রামে মোটরে বেড়াতে গেছেন। একটু পরে তাঁরা যখন ফির্‌লেন, আমি ততক্ষণ নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে মোটরে তুলে ফেলেছি। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন—আমি বললাম চার-পাঁচ দিন ব'সে থাকার ছুটি নেই! আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, তাই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। বীথিকা সুধীরাকে আমার কোলে তুলে দিল। তাকে কয়েকটা চুমু বখ্‌শিস্ দিয়ে ডাক্তারের কোলে তুলে দিলাম। ওঁরা বারান্দায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে au revoir ব'লে বিদায় জানালেন। আমি মোটরে উঠে বসলাম, ড্রাইভার স্টার্ট্ দিয়ে দিল। গান্ধীজমীর উঁচু পুলের ওপর গাড়ী যখন উঠ্‌ল—একটা বেঁক পার হ'য়ে—ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বীথিকা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—সুধীরাকে কোলে নিয়ে। রাজরপ্পা দর্শন কপালে নেই, বুঝ্‌লাম।

ভারতচন্দ্র

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

রূপনগরীতে রসের পসরা
বেসাতি করিতে গিয়া,
কবি-সদাগর রায়গুণাকর
ফিরিলে কলঙ্ক নিয়া॥ ১ ॥

ভাষার নগরে ভাবের পসরা
বেসাতি করিতে গিয়া,
কথাথে কাটিয়া হৃদয়ের গাঁটি
ফিরিলে সুযশ নিয়া॥ ২ ॥

যে কলঙ্কে কলঙ্কিলে লেখনী তোমার,
বৃথা কাল নিল তাহা মুছিবার ভার।
অশ্লীল বলিয়া লোকে মনে বাসে রাগ,
সহজে ছাড়ে না তোমা যদি পায় বাগ।
আদিরসগতপ্রাণ সুরত-রসিক
যেইজন, সেই পারে বুঝিতে সঠিক।
শুনিতে কামনা বাড়ে বিদগধ-চিতে,
মন্দমতি তব দোষ অক্ষম কহিতে।
দোষকে করিয়া গুণ লয় যারা মনে
দুষ্ট বলি তব কাব্য তাহারা না গণে।
পড়িতে পড়িতে মন ভুলি কোন্ ছলে,
মজিতে মজিতে ডুবে যায় রসাতলে!
হে ভারত, কবিদলে হয়ে সমাসীন,
লোকচক্ষে সর্ব্বজনে করিয়াছ হীন।

রচিলে যে রসকাব্য রায়গুণাকর,
শব্দে, ছন্দে, অলঙ্কারে সর্ব্বগুণাকর।
ভাষারে পরালে তুমি নানা অলঙ্কার,
বধূরূপা-মাতৃ-অঙ্গে-দিব্য-অলঙ্কার।
বিদগ্ধজনের মুখে শুনি এইরূপ,
রূপ গুণ বিচারিতে আগে চাই রূপ।
কাঁচা-সোনা দিয়ে গড়ি উপমার হার,
যতনে মাতার কণ্ঠে দিলে উপহার।
রূপাতে রচিলে তুমি রূপকের মল,
জননী চরণে তাহা করে ঝল্‌মল্।
স্বভাবোক্তি, কাকু, শ্লেষ, বক্রোক্তি যমক,
মণি-সম মাঝে মাঝে বাড়ায় জমক।
সাবধানে ধরি দেখি বিচারের তুল,
ভাষাতে অপরে নহে ভারতের তুল।

কলঙ্ক=অপবাদ, কালি। রাগ=ক্রোধ, অনুরাগ। আদিরস= কামরস, আদি=ঈশ্বর। সুরত=উত্তম কার্য্যে রত, অশ্লীল কার্য্যে ।। বিদগধ=বি-দগ্ধ (পোড়া), বিদগ্ধ=বিদ্বান। গুণ=গুণন, (multiply), গুণ=(qualification)।

গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম-এ

বাঙ্গালা দেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপিচাঁদের নাম তেমন সুপরিচিত নয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাঙ্গালা দেশের উত্তরাংশে গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে যে সব গ্রাম্য গাথা এবং গান প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী বিষয়ক কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র বা তাঁহার মাতার জীবনকাহিনী সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করা এই সকল পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। সম্পাদকগণ ভাষা সাহিত্য এবং ধর্মের তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতের এবং তত্ত্বান্বেষী বিদ্যার্থীর সাহায্যকল্পেই এই সকল পুস্তক প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন।

গ্রিয়ার্সন সাহেবের সংকলিত "মাণিকচন্দ্রের গান", নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত "ময়নামতীর গান", নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপিচান্দের গীত", শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত "গোবিন্দচন্দ্র গীত"—গোপীচাঁদের আখ্যান প্রসঙ্গে এই পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বটতলা বা বঙ্গবাসী সংস্করণ পুস্তকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায় এ সমস্ত বইয়ের দ্বারা সে কাজ পাওয়া অসম্ভব, পাওয়ার আশা করাও উচিত নয়। আজ ফুল্লরা কালকেতু, বেহুলা লখিন্দর, লহনা খুল্লনা, শ্রীমন্ত ধনপতি বাঙ্গালীর কাছে যে ধরণের পুস্তকের সাহায্যে ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছে ময়নামতী বা গোপিচাঁদের আখ্যান সম্বন্ধে সে রকম পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। প্রাদেশিক ভাষার রূপ অব্যাহত রাখিবার জন্ম সুপণ্ডিত সম্পাদকগণ পুঁথির লেখা যেমন আছে তেমনই ছাপেন। তত্ত্বসন্ধের কাছে তাহার মূল্য আছে, কিন্তু যে গল্প চায় তাহার কাছে সে ভাষার মূল্য কি?

আজ বঙ্গের এক উত্তরাংশ ব্যতীত অন্য কোথাও গোবিন্দচন্দ্রের নাম শোনা যায় না; কিন্তু বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই বাঙ্গালী রাজার নামে গান ও কাহিনী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গোপিচাঁদের আখ্যানগুলি কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। গোপিচাঁদ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোনোটির মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নাই। বস্তুতঃ আখ্যানকারগণ সাল তারিখ মিলাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসেন নাই। চমৎকার গল্প শুনাইয়া শ্রোতা ও পাঠকের মনোরঞ্জন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। দু-দশ জায়গায় সত্যের অপলাপ হইবে না—এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা গল্প রচনা করেন নাই।

প্রকাশিত যে কয়টি গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে এগুলিও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আখ্যান ও কিংবদন্তীরই অসংস্কৃত সংস্করণ; ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইলেও মৌখিক উপন্যাসের সহিত ইহাদের প্রকৃতিগত মিল আছে। ইহারাও গল্প মাত্র, ইতিহাস নহে।

তবে এই সমস্ত গল্পের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। চরিত্রের নামে, স্থানের নামে এমন কি কাহিনীর নানা অংশেও ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু সঙ্গতি দেখা যায়। মূল কাহিনীতে মিল তো আছেই।

প্রকাশিত সব কয়টি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কাহিনীটি সংকলন করা হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের ইতিহাস সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ উপাধ্যায়গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে কাহিনীটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক এই কামনা করি। বাঙ্গালা দেশের যাত্রা, থিয়েটার এবং সিনেমায় খাঁটি বাঙ্গালার কাহিনীগুলি বরাবর সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল—এমন কি পূর্ববঙ্গের ছড়াগুলিও নাট্যরূপ পাইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে নাট্যসম্ভাবনা অল্প নয়। এবিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রায় নয় শত বৎসর পূর্বে মেহারকুল অঞ্চলে তিলকচন্দ্র নামক এক প্রজারঞ্জক ও পুণ্যশীল নরপতি রাজত্ব

করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম ময়নামতী এবং কনিষ্ঠার নাম সিন্দুরমতী। তখন বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন মাণিক্যচন্দ্র। এই মাণিক্যচন্দ্র বা মাণিকচাঁদের সহিত রাজকন্যা ময়নার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহকালে বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া ময়না পিতামাতাকে ছাড়িয়া এক সঙ্গে অনেক দিন শ্বশুরালয়ে থাকিতে পারিতেন না, মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেন।

সেইকালে গোরক্ষনাথ নামক এক সিদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হয়। তিলকচন্দ্রের রাজবাটীতে এই যোগীর যাতায়াত ছিল, সেখানে তিনি বালিকা ময়নামতীকে প্রায়ই দেখিতেন। ময়নাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি মনস্থ করিলেন, ইঁহাকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অনন্তর বালিকার সম্মুখে গোরক্ষনাথ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ময়নামতী সানন্দে তাঁহার নিকটে দীক্ষা লইতে সম্মত হইলেন। দীক্ষা দানের জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সে সকল সম্পন্ন হইলে মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যোগিবর ময়নামতীকে দ্বাদশ বৎসরের আহার্য মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র ময়না পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা পাতিলে অন্ন রন্ধন করিলেন এবং সোনার থালে সেই অন্ন বাড়িয়া ঘৃত, 'আউটা দুগ্ধ' এবং 'চম্পা কলা' সহযোগে তাহা গুরুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তখন—

"অন্ন লইয়া গোরক্ষনাথ মনে মনে ঘুণে।
সতী কি অসতী কন্যা বুঝিব কেমনে।"

সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

"বার সূর্য্যের তাপ সিদ্ধা তলপ করিল।
যতেক সূর্যের তাপ মৈনার গায়ে দিল॥"

এক সূর্যের তেজই মানুষ সহ্য করিতে পারে না কিন্তু দ্বাদশ সূর্যের তেজ ময়নামতী অবলীলাক্রমে সহ্য করিলেন। গোরক্ষনাথ বুঝিলেন এই কন্যার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ময়নার হস্তের অন্ন গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না দেখিয়া গোরক্ষ যোগী আহারে বসিলেন এবং ময়নামতী ভক্তি সহকারে গুরুর মস্তকে আরাজিছত্র ধরিয়া রহিলেন।

"তা দেখিয়া গোর্খনাথ মনে মনে গুণে।
এমন সুন্দরী যাইবে যমের ভবনে॥"

না, যেমন করিয়াই হউক ইহার মৃত্যু রহিত করিতে হইবে। এই মহীয়সী রমণীকে অমর করিয়া মেহেরকুলে একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া গোরক্ষনাথ সেই দিন হইতেই শিষ্যার শিক্ষা দীক্ষায় মনোযোগ দিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর অধ্যবসায়ের ফলে ময়নামতী অচিরকাল মধ্যেই মন্ত্রে তন্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। গুরুর আশীর্বাদে জরা-মৃত্যু-ব্যাধি তাঁহার করতলগত হইল। স্বয়ং যমরাজ খত লিখিয়া দিলেন। তাঁহার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, জলে ডুবিবে না, অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না। অধিক কি

"গুরু বোলে দিনে মৈলে মৈনামতী আই।
সূর্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতী আই।
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই॥"

মূর্খ স্বামীর ভাগ্যে বিদুষী পত্নী জুটিলে গৃহধর্ম্ম পালন করা অনায়াসসাধ্য হয় না, সংসার পথ দুর্গম হইয়া পড়ে; মাণিকচন্দ্রেরও তাহাই হইল। স্ত্রীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। বাহিরে যতই পৌরুষ দেখান না কেন, মনে মনে তিনি স্ত্রীকে সর্বদাই ভয় করিয়া চলিতেন। এই হেয়তাবোধগ্রন্থি রাজা মাণিকচন্দ্রকে অষ্টপ্রহর পীড়িত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপারে রাজা স্ত্রীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন ময়না ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে মাণিক্যচন্দ্রের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি স্বামীকে বিরলে ডাকিয়া মহাজ্ঞান শিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাজ্ঞান সাধন ব্যতীত বিধাতার নির্দিষ্ট পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে সেই গুপ্ত মন্ত্র দান করিতে অভিলাষী হইলেন।

কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে মাণিক্যচন্দ্রের পৌরুষে বাধিল। পুরুষ হইয়া নারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে রাজ্যের লোক তাঁহাকে উপহাস করিবে, লজ্জায় লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। স্ত্রীলোক পুরুষের, বিশেষতঃ স্বামীর গুরু হয় এমন কথা তো

কেহ কোথাও শুনে নাই, কোন শাস্ত্রেও এরূপ বিধান দেখা যায় না। তিনি বীরের ন্যায় উত্তর করিলেন—

"জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্বলোকে কএ।
আমি হব নারীর সেবক মরণের ভয়ে॥"

অকালে মরি মরিব তথাপি স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। এই পৌরুষদর্পীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবার নয়—ইহা বুঝিতে পারিয়া ময়না অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন মহাজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যু দেবতার আক্রমণ রোধ করিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কাহারও নাই।

দৈব অলঙ্ঘনীয়, তাহা না হইলে রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন কেন? ময়নামতী বারংবার ইহাই ভাবেন। হায় হায় শক্তি থাকিতেও পতির প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইল? একবারে নিরাশ না হইয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেন, যদি রাজার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু রাজার সেই উত্তর—প্রাণের জন্য কাতর হইয়া পত্নীর নিকটে জ্ঞান লইব না। স্ত্রীর শিষ্য হইয়া প্রাণলাভ করা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক গুণে শ্রেয়। বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ময়নামতী মধ্যে মধ্যে রাজাকে উপদেশ দিতে ছাড়েন না; অবশেষে রাজা ময়নার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আর কয়েকটি বিবাহ করিলেন এবং প্রথমা পত্নীর সাহচর্য যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

নূতন বধূগণের মধ্যে দেবপুরের পাঁচটি সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ইঁহাদের প্রতিই রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল।

নবীনা সপত্নীগুলি স্বামীর প্রেম পাইলেও সংসারের কর্তৃত্বভার জ্যেষ্ঠার হাতেই রহিয়া গেল। দেবপুরিকাগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, সুতরাং কোন্দল বাধিল। তাঁহারা কর্তা এবং কর্তৃত্ব উভয়কেই চান, একটি লইয়া সুখী হইবেন কেন? রাজা কলহের মীমাংসা করিতে গিয়া নবতনীদেরই পক্ষ লইলেন এবং প্রথমা পত্নীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ফেরুসা নামক নগরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজবধূ ময়না সেখানে গিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া অনাথিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। একদিকে সুসজ্জিত প্রাসাদে বহুপত্নী-পরিবৃত হইয়া

"মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।"

আর অন্য দিকে

"মএনামতী চরকা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর॥"

মাণিকচাঁদের রাজত্বে নির্ধন বলিয়া কেহ ছিল না। দেশে সোনারূপার ছড়াছড়ি। কৃষকের পুত্র যে, সেও সোনার ভাটা লইয়া নির্ভয়ে খেলা করে। যে কাঠ-পাতা বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়, হাতী না চড়িয়া সেও বেড়াইতে বাহির হয় না। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও খাসা তাজী ঘোড়ায় চড়ে। চাটাই বিছাইয়া হীরা মণি মাণিক্য শুকাইতে দেয়। প্রত্যেকের বাড়িতেই বড় বড় পুষ্করিণী, কেহ অপরের পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

ঋণ কাহাকে বলে দেশে কেহ জানে না। গৃহস্থের মেয়েরা সোনার কলসীতে জল আনে এবং সোনার পাছড়া পরিধান করে। দাসী পর্যন্ত পাটের কাপড় পরিতে ঘৃণা বোধ করে। মাণিকচাঁদের রাজত্বকে লোকে রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করে বটে, কিন্তু এত সুখ এত ঐশ্বর্য বোধ হয় রামচন্দ্রের রাজত্বেও ছিল না। কিন্তু এহেন রাজত্বেও দুঃখ দারিদ্র্য দেখা দিল। ময়নামতীর ফেরুসাগমনের পর হইতেই মাণিকচন্দ্র পীড়িত হইলেন, রাজকর্মচারিগণ সুযোগ পাইয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় দেওয়ান কর বৃদ্ধি করিয়া দিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে প্রজারা আর কর দিতে পারে না। কৃষক লাঙ্গল ও বলদ বিক্রয় করে, ফকির দরবেশকে ঝোলা কাঁথা বেচিতে হয়, সাধু সদাগর নৌকা বেচিয়া রাজার কর দেয়। এমন কি

"খাজনার তাপত বেচে দুধের ছাওয়াল।"

রোগশয্যায় শুইয়া মাণিকচাঁদ সবই শুনিতেছেন। কিন্তু তিনি করিবেন কি? শয্যা হইতে উঠিবার পর্যন্ত তাঁহার সামর্থ্য নাই। প্রজাদের জন্য চিন্তা করিয়া করিয়া তাঁহার রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়নামতীর জন্যও যে হৃদয়ের এক কোণে একটু বেদনা ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে? দূর দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য কত ধন্বন্তরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা মত নানা রকমের ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ওদিকে স্বর্গে বসিয়া শমন রাজা চিত্র-

গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাণিকচন্দ্রের আর কত বাকি? চিত্রগুপ্ত দপ্তর দেখিয়া উত্তর দিলেন—ছয়মাস।

একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে ছয়মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। মাণিকচন্দ্রের জীবন প্রদীপও প্রায় নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। বিধাতৃদেবের আজ্ঞা পাইয়া গোদা নামক যমদূত 'চামের দড়ি' এবং লোহার 'ডাঙ্গ' সহ উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। রাজা বুঝিতে পারিলেন—আর বিলম্ব নাই সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকালে সকলের সঙ্গেই দেখা হইল। রাজা আশা করিয়াছিলেন, ময়নামতীও দেখা করিতে আসিবেন কিন্তু তিনিই কেবল আসিলেন না। ময়নামতী নারী হইলেও সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। অতিশয় দুঃখের কারণ ঘটিলেও তিনি বিহ্বল হইতেন না এবং পরম আনন্দের সময়েও শান্ত ও সংযত থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সেখানে গিয়া অন্যান্য সপত্নীর সহিত নিষ্ফল রোদন করিয়া কোন লাভ নাই। মৃতসঞ্জীবনী ত্যাগ করিয়া হলাহল সেবন করিতে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর, তাহার নিকটে গিয়া অশ্রুবিসর্জন করা কি একান্ত নিরর্থক নয়?

মৃত্যু রোধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল এবং সে শক্তি তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োগ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মাণিকচাঁদ তাহা গ্রহণ করেন নাই, এখন কেবলমাত্র চক্ষুজল সম্বল করিয়া মুমূর্ষু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে কেন? মরণসাগরের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আজ মাণিকচাঁদের মনে অন্য চিন্তা নাই। অতিদূরে যাহার অবস্থান কেমন করিয়া সে-ই যেন আজ আপনার জন হইয়া উঠিল। পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় লইবার পূর্বে তিনি একবার ময়নাকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজবাক্য লইয়া বার্তাবহ ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কুটীরে আসিয়া অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল—

"ছয়মাসের কহিলা রাজা মহলের ভিতর।
দেখা করিবারে চায় রাজরাজেশ্বর॥"

সংবাদ শুনিয়াই ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন এবং মুহূর্তমধ্যে রাজার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বেঙ্গাপাত্রের সহিত রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিতেই

"যখন ধর্ম্মী রাজা ময়নাকে দেখিল।
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে লাগিল॥"

যিনি একদিন দর্পভরে বলিয়াছিলেন—জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সেই বীরই আজ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইলেন।

ময়না প্রবোধ বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—মহারাজ, চিন্তা করিও না, আমি থাকিতে থাকিতে মৃত্যু তোমার কি করিতে পারে? আমার একটি মাত্র বাক্য রক্ষা কর, শমন রাজার কোন অধিকার তোমার উপরে থাকিবে না।

"কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর।
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর॥"

এখনও সময় আছে, মহাজ্ঞান গ্রহণ করিয়া অক্ষয় যৌবন এবং অনন্ত জীবন লাভ কর। গর্বান্ধ হইয়া মহামূল্য প্রাণ বৃথা নষ্ট করিয়া লাভ কি?

মহাজ্ঞানের প্রস্তাবে রাজার সুপ্ত চৈতন্য আবার জাগরিত হইল। মনের সকল দুর্বলতা নিমেষমধ্যে দূর হইয়া গেল। অকম্পিত কণ্ঠে রাজা উত্তর করিলেন—প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজা মাণিক্যচন্দ্র স্ত্রীর জ্ঞান গ্রহণ করিবে না। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হইলেও মাণিক্যচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা অটল।

ময়না বুঝিলেন—বিধাতার এইরূপই ইচ্ছা, তাহা না হইলে আসন্ন মৃত্যু দেখিয়াও রাজার মতি পরিবর্তিত হইল না কেন?

মহাজ্ঞান গ্রহণ করিতে রাজা কোনরূপে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া ময়নামতী স্বীয় শক্তির দ্বারা স্বামীর মৃত্যু রোধ করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। রাজার শয়নকক্ষে চারিটা রক্ষাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, প্রদীপগুলি দিবারাত্র জ্বলিতে থাকিল। তাহার পর—

"চাইর কলসী জল থুইলে বিরলে ভরিয়া।
যেই রোগের যেই দাওয়া আনিল ধরিয়া॥"

ঔষধপত্র প্রস্তুত হইলে ময়নামতী গুরুস্মরণ করিয়া স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিতেই দেখিলেন কৃষ্ণদেহ ভীষণ আকৃতি এক পুরুষ পাশ এবং দণ্ড ধারণ করিয়া রাজার শিয়রে দণ্ডায়মান। ময়নার কিছু অজ্ঞাত ছিল না, এই বিরাটকায় পুরুষটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন—ইনি শমনের প্রেরিত জনৈক দূত এবং মাণিকচন্দ্রের প্রাণ লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ইঁহার এস্থানে পদার্পণ। তথাপি প্রশ্ন

করিলেন—হে নবাগত, ইতিপূর্বে রাজগৃহে তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। তোমার পরিচয় কি? কোথা হইতে তোমার আগমন? কেনই বা তুমি শিরোদেশে দাঁড়াইয়া আছ? গোদা যম আত্মপরিচয় দিয়া উত্তর করিল—বিধাতার আদেশে তোমার স্বামীর প্রাণপুরুষকে লইয়া যাইবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ময়না অনুনয় বিনয় করিয়া যমদূতের নিকট স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। যমদূত উত্তর করিল—আমি আজ্ঞাবহ মাত্র, প্রাণ ভিক্ষা দিবার আমার তো কোন অধিকার নাই। কিন্তু ময়না তাহার কথায় কান না দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ময়নার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি টাকন লাভ করিয়া গোদা যম সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিল।

প্রথম দিন আসিয়াছিল একজন, দ্বিতীয় দিন আসিল দুইজন, তৃতীয় দিনে সংখ্যা আরও বাড়িল। এই ভাবে গোদা যম সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রতিদিনই মাণিকচাঁদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ময়নামতীও প্রতিদিন ধন রত্ন দিয়া যমকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে যমদূতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনুষ্য জীবন পর্যন্ত দান করিতে হইল। স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ময়না নিজের ভ্রাতাকে যমদূতের হাতে সমর্পণ করিলেন। ভেট পাইলে যমদূত একদিনের জন্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া যায় আবার পরদিনই বহু অনুচর সহ দেখা দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলিলে রাজ-ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল, হস্তিশালার সব হস্তী, অশ্বশালার সব অশ্ব শেষ হইল। যমদূতের হাতে অর্পিত হইবার ভয়ে দাস-দাসী আত্মীয়-স্বজন বাড়ি ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এবার ময়না প্রমাদ গণিলেন। এখন কেমন করিয়া যমকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন তাহা ভাবিয়া রাণীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

শেষে স্থির করিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তথাপি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। যদি স্বামীর মত পরিবর্তন করিতে পারি। এই সংকল্প করিয়া ময়না স্বামীর চরণে ধরিয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—প্রিয়তম, এখনও আমার কথা রাখ। মানুষের জীবন অবহেলার বস্তু নয়। সামান্য জিদের বশবর্তী হইয়া তাহা ত্যাগ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এবার যমদূত আসিলে আর বোধ হয় তাহাকে বাধা দিতে পারিব না। মহারাজ, আর প্রত্যাখ্যান করিও না। স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সহস্রবার উপেক্ষা করিতে পার—তাহাতে আমি দুঃখ করিব না, কিন্তু মহাজ্ঞান তো তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। পণ্ডিতগণ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন তুলিয়া লইবার পরামর্শ দেন। নারীকে ঘৃণা করিলেও নারীর মন্ত্রকে অবজ্ঞা না করিয়া গ্রহণ কর। এস প্রস্তুত হও

"আমার শরীরের অমর জ্ঞান তোমাকে শিখাই।
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি করি যমের দায় এড়াই।"

কিন্তু রাজা হিমালয়ের ন্যায় অচল। তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলেন

"এমনি যদি আমার প্রাণ যায় ছাড়িয়া।
তবুত মাইয়ার জ্ঞান না নিব শিখিয়া॥"

ময়নামতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

পরদিবস সাজসজ্জা করিয়া গোদাযম বহু অনুচর সহ যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আজ তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইবে না, কোন ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করিবে না, কোন বাধা বিপত্তি মানিবে না—যেমন করিয়াই হউক মাণিকচাঁদের প্রাণ শমনরাজের দরবারে উপস্থিত করিবেই করিবে।

ময়নামতী প্রস্তুত ছিলেন, তিনিও স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যথারীতি অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গোদা বিচলিত হইল না, আজ সে রাজার প্রাণ লইবেই, তখন ময়নামতী নানাবিধ উপঢৌকন আনিলেন, গোদাযম তাহাও প্রত্যাখ্যান করিল। রাজমহিষী তখন অনন্যোপায় হইয়া

"মহামন্ত্র গিয়ান লইল হৃদয়ে জপিয়া।
চণ্ডী কালীরূপ হইল কায়া বদলিয়া॥"

রুদ্রচণ্ডীর মূর্তি ধরিয়া হাতে তৈল পাটের খাঁড়া লইয়া ময়না যমদূত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখিয়া গোদার সাহস অন্তর্হিত হইল, ভয়ে পলায়ন করিয়া সে সরাসরি মহাদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—

"মহাদেব অইত ময়না গিয়ানে ডাঙ্গর।
কেমন করি আইনবেন রাজাকে যমপুরীর ভিতর॥"

মহাদেব বুঝিলেন ময়নামতী পতিপার্শ্বে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে রাজার প্রাণ বাঁধিয়া লইয়া আসে। সুতরাং মাণিকচাঁদের মৃত্যু ঘটাইতে হইলে সর্বাগ্রে ময়নাকে স্থানান্তরিত করা দরকার। ইহা ভাবিয়া মহাদেব সব যমদূতকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিলেন। আদেশ পাইয়া 'বাওথুকরা যম' বায়ুরূপে রাজার শয্যাগৃহে গিয়া চারিটি প্রদীপ নিবাইয়া চার কলসী গঙ্গাজল ঢালিয়া ফেলিল। 'ভাড়ুয়া যম' বিড়ালরূপ ধরিয়া ময়নার সংগৃহীত ঔষধগুলি ভক্ষণ করিল।

'নলুয়া' যম ব্রহ্মনলদ্বারা শ্বেত কুয়ার জল শুষিয়া লইল। 'হুতাশন' নামধারী যম সুযোগ দেখিয়া ঠিক এই সময় রাজার কণ্ঠে মরণ তৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিল। তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া রাজা জল চাহিতেই দাসীরা জল আনিবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু 'বুদ্ধি যম' রাজাকে বুদ্ধি দিল—ময়নার হাতে ভিন্ন জল খাইও না। অমনি রাজা বলিয়া উঠিলেন—

"এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্গে শুতিয়া॥"

অগত্যা জল আনিবার জন্য সোনার ঝারি লইয়া ময়নাকেই যাইতে হইল। গিয়া দেখেন রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে বিন্দুমাত্র জল নাই, শ্বেতকুয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শুষ্ক; সুতরাং বাধ্য হইয়া ময়না গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। যমদূতগণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, রাজপথে পা দিতেই তাহারা সকলে মিলিয়া রাজার হাত পা বাঁধিয়া বার মোকামে বার ডাঙ্গ বসাইয়া দিল। আর গোদা

"রাজার জিউ নিল লাংটিত বান্ধিয়া।
সোনার ভমরা হৈল যম কায়া বদলাইয়া॥
যে মাটিতে জল ভরে ময়না হেট মুণ্ড হৈয়া।
মাথার উপর দিয়া জিউ নিগ্যাল বান্ধিয়া॥"

ময়না নীচের দিকে মুখ করিয়া জল ভরিতেছেন গোদা যম ভ্রমরের রূপ ধরিয়া যে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু সে গঙ্গাদেবীর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ভ্রমররূপী গোদাকে দেখিয়াই গঙ্গা বুঝিতে পারিলেন যে মাণিকচাঁদের প্রাণ লইয়া সে পলাইতেছে। তখন গঙ্গা ময়নাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"ওগো মা, যার জন্যে জল ভরো তুমি হেট মুণ্ড হৈয়া
সে তোর দুলাল স্বামী গেল পার হৈয়া॥"

ইহা শুনিয়াই ময়না চমকিত হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শীর্ষের সিন্দুর এবং হস্তের শঙ্খ মলিন হইয়া আসিল। জল আনিবার জন্য কেন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম—এই বলিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। হায় হায় মুহূর্তের ভুলে স্বামীকে চিরজীবনের মত হারাইলাম। পথে বাহির হইবার পূর্বে কেন ভাবিয়া দেখি নাই যে রাজার মরণ পিপাসা আর কিছু নয়, যমেরই ছলনা মাত্র? এই ভাবে পতিশোকে কাতর হইয়া ময়না কিছুক্ষণ রোদন করিলেন কিন্তু অগৌণেই তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, মনে মনে ভাবিলেন—এ আমি কি করিতেছি? শোকে অভিভূত হইয়া অনর্থক কালক্ষেপ করিতেছি কেন? যতক্ষণ নিজের প্রাণ আছে ততক্ষণ পতির প্রাণের আশা বিসর্জন দিব না। স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করিব। এতদিন ধরিয়া কি সাধনা করিলাম আজ তাহার পরীক্ষা হইবে। এই বলিয়া ময়না যমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নদী। সে নদী প্রস্থে এত বড় যে একবার খেয়া দিতে হইলে অন্তত একবৎসর সময় লাগে। নৌকা করিয়া যাইবারও উপায় নাই। এমন স্রোত যে এক খণ্ড তৃণ পড়িলে শতখণ্ড হইয়া যায় তাহার উপর

"এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চূড়া"

মহাজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে এই সকল বাধা অতি তুচ্ছ। গুরু স্মরণ করিয়া এবং ধর্মদেবের নাম লইয়া ময়নামতী অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া গেলেন। মন্ত্রপ্রভাবে পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রাণী যখন যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার সকলে ভয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল। গোদা যম নিশ্চিন্ত-মনে অন্তঃপুরে বসিয়াছিল, ময়নার আগমন-সংবাদ পাইয়া

"হাতে মাথে গোদাযম কাঁপিয়া উঠিল।"

বিপদ আসন্ন দেখিয়া গোদা প্রাণ ভয়ে একটা খড়ের স্তূপের

অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। ময়না জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়া সর্পরূপ ধারণ করিলেন।

> "চ্যাদা বোড়া হইয়া ময়না এক ঝম্প দিল।
> চটকি যাইয়া গোদা যমের ঘাড়েতে বসিল॥"

গোদা উপায়ান্তর না দেখিয়া মূষিকরূপ ধারণ করিয়া গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। কিন্তু ময়নার হাতে নিস্তার নাই, তিনিও বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিলেন। গোদাযম যেরূপই গ্রহণ করে, ময়না তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্ষকের আকৃতি ধারণ করেন। অবশেষে গোদার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া ময়না তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সে কি শাস্তি! হাত পা চর্ম রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া তাহার মুখে ঘোড়ার লাগাম পরাইয়া

> "এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
> লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে লাগিল॥"

প্রহারে জর্জরিত হইয়া গোদাযম উচ্চৈস্বরে রোদন আরম্ভ করিল কিন্তু ময়নার হাত হইতে পরিত্রাণ করিবে কে? গোদার চীৎকারে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার নিকটে আসিল না; তখন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া নানা প্রবোধবাক্যে ময়নাকে শান্ত করিয়া বলিলেন যে, রাজার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাওয়ায় দেবতাগণের আদেশেই গোদাযম তাঁহার প্রাণপুরুষকে আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই এবং বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কর্মে বাধা দেওয়া তাঁহার মত জ্ঞানসম্পন্না নারীর পক্ষে সঙ্গত নয়। তাঁহার পরামর্শে গোদাযমকে দণ্ড না দিয়া ময়নামতী বরং তাহাকে মুক্তি দিন। তাহা হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন।

ময়না বুঝিলেন বিধাতৃনির্দেশ অন্যথা করা অসম্ভব। সুতরাং মহাদেবের উপদেশ অনুযায়ী গোদাকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবতাগণও সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ করিয়া ময়নাকে বিদায় দিলেন।

ময়নামতী যখন রাজবাটী ফিরিয়া আসিলেন তখন মাণিকচন্দ্রের পত্নীগণ এবং জ্ঞাতিবর্গ শোকে মুহ্যমান হইয়া মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। তখনও পর্যন্ত সৎকারের কোন উদ্যোগ আয়োজন হয় নাই। ময়না আসিয়াই লোকজন ডাকাইয়া শব তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কীর্তনিয়াগণ নামগান করিতে লাগিল, হরিধ্বনি সহকারে মাণিকচাঁদের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইল। ময়নার অনুরোধে গঙ্গাদেবী মাঝদরিয়ায় বালুচর করিয়া দিলেন। সে বালুচরে চিতাশয্যা প্রস্তুত হইলে মাণিকচন্দ্রকে তদুপরি শায়িত করাইয়া সাধ্বী ময়না স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। জ্ঞাতিগণ চিতার চতুষ্পার্শ্বে চন্দন কাঠ স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া তাহার উপর ঘৃত তৈল প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থসমূহ ঢালিয়া দিয়া দূরে সরিয়া আসিল। ময়নামতী তখন সকলের নিকটে শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া চিতা জ্বলিল, মর্ত্যের ধূম স্বর্গে পৌঁছিল। এই হুতাশনের তাণ্ডবলীলা দেখিতে দেখিতে লোকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

কবিতা

শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মময় দিবসের তীব্র কোলাহলে
উন্মত্ত ব্যস্ততা লয়ে লোক দলে দলে
চলে শুধু স্বার্থে স্বার্থে বাধায়ে সংঘাত—
নীচতা, বঞ্চনা, ঈর্ষা আসে অকস্মাৎ
দুর্দম, দুঃসহ বেগে। সৃষ্টি অকরুণ—
মোদের দুঃখেরে নিত্য করিছে দ্বিগুণ
আনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, উলঙ্গ তিক্ততা,
ব্যথা মৌন ধরা বুকে অসহ রিক্ততা।
তবু ত বেসেছি ভাল এ ধরার ধূলি:
স্নেহ, প্রেম, প্রীতি স্পর্শে যখন অঙ্গুলি
সযত্নে মুছিয়া লয় কণ্ঠের ক্রন্দন
ভুলি ব্যথা, প্রাণে জাগে প্রাণের স্পন্দন।
দিনান্তের ক্লান্তি শেষে শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া
ধরায় রচেছে স্বর্গ কবিতার মায়া।

কথা—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্থর—শ্রীনিতাই ঘটক

স্বরলিপি—কুমারী বিজলী ধর

শ্যামা-সঙ্গীত—দাদ্‌রা

মা মেয়েতে খেলব পুতুল আয় মা আমার খেলা ঘরে।
(আমি) মা হ'য়ে মা শিখিয়ে দেব পুতুল খেলে কেমন ক'রে॥
কাঙাল অবোধ করবি যা'রে
বুকের কাছে রাখিস্ তা'রে (মা)।
আথর :— [নইলে কে তা'র দুখ্ ভোলাবে ?
(যারে) রত্ন মাণিক দিবি না মা উচিত সে তার মাকে পাবে।]
(আবার) কেউ বা ভীষণ দামাল হবে, কেউ থাকবে গৃহকোণে প'ড়ে॥
মৃত্যু সেথায় থাকবে না মা, থাকবে লুকোচুরি খেলা
রাত্রি বেলায় কাঁদিয়ে যাবে আসবে ফিরে সকাল বেলা।
কাঁদিয়ে খোকায় ভয় দেখিয়ে
ভয় ভোলাবি আদর দিয়ে (মা)
আথর :— [বেশী তা'রে কাঁদাস্ না মা—মা ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে]
(সে) খেলে যখন শ্রান্ত হবে ঘুম পাড়াবি বক্ষে ধ'রে॥

\+ ০ + ০
II {গা -া রসা | সগা গা -া I গমা -ধপা মা | গা রসা -া I
মা ০ মে য়ে তে ০ খে০ ল্ ব পু তু ল্

II ·
I গা -মা পা | র্সা ধণা পা I গা পা মা | গা (-রগা -সরা) } I গা মা I
আ য়্ মা ০ আ মার্ খে লা ঘ রে ০০ ০০ আ মি

[-া]
I { ধা -া ধা | র্সণা ধা -া I ধা ধর্সা র্সণা | ধা পা (-গমা) } I
মা ০ হ য়ে মা ০ শি খি০ য়ে দে ব ০০

I গা গা -মা | পধা মপা -র্সা I ণা পধা -মপা | মা গা -সরা II
পু তু ল্ খে০ লে০ ০ কে ম০ ০ন্ ক রে ০০

-া -া II { া া পক্ষা | ধপা মগা মা I পা -না নর্সা | না নর্সা -া I
০ ০ ০ ০ কা০ ঙাল্ অ বোধ ক র্ বি০ যা রে০ ০

I -া -া র্সা | র্সর্রা র্রা র্রা I র্সা র্সর্গা -র্রর্গা | র্সা না -পধা I
০ ০ বু কের্ কা ছে রা খি০ ০স্ তা রে ০০

I ধা র্সা -া | -া -া -া } I মা -গা মা | পা পধা -র্সণধা I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে কে তা০ ০র্

I পা -পধা মা | গা মা -গা I রা -া -া | -া পা পা I
দু ০খ্ ভো লা বে ০ ০ ০ ০ ০ যা রে

I পা -ধা ধা | ধা ধা -া I ধা ণা ধা | ণধা -পমা -গা I
র ত্ ন মা নি ক্ দি বি না মা০ ০০ ০

I গমা রগা -মা | পা পধা -র্সণধা I পধা -মপধা পমা | গা মা গরা I
উ০ চি০ ত্ সে তা০ ০র্ মা০ ০০০ কে পা বে ০০

I -া -া -া | -া মা পা I পা না না | না না -র্সা I
০ ০ ০ ০ আ বার্ কে উ বা ভী ষ ণ্

I ধনা পধা -নর্সা | না নর্সা -া I -া -া -া | -া র্সনা -র্সা I
দা০ মা০ ০ল্ হ বে০ ০ ০ ০ ০ ০ কে০ উ

I পা -না র্সর্রা | -র্সর্রা ণা ণধা I পধা মপধা পমা | গমা -রগা -সরা II
থা ক্ বে০ ০০ গৃ হ কো০ ণে০০ প ড়ে০ ০০ ০০

-া -া II সা -রা রা | রা রগা -মপা I মা -গা গরা | রা রা -া I

০ ০ মৃ ০ ত্যু সে থা০ ০য়্ থা ক্ বে০ না মা ০

I রা -গা মা | -পা পা পধা I মপা পধা মপা | মগা রা -া I

থা ক্ বে ০ লু কো· চু০ রি০ খে লা০ ~ ০

I গা -পা ধা | সণা ধা -া I ধা ধা ণা | ধা ণধা -পা I

রা ০ ত্রি বে লা য়্ কাঁ দি য়ে যা বে০ ০

I পা -ধা পধা | -ণর্সা ণা ধা I পধা মা -গমা | রগা গপা -া I

আ স্ বে০ ০০ ফি রে স০ কা ০ল্ বে০ লা ০

I { মা পা পনা | না না -ধা I না -া র্সা | ধনা র্সা -া I

কাঁ দি য়ে০ খো কা য়্ ভ য়্ দে খি য়ে ০

I র্সা -র্রা র্রা | র্রা র্রর্গা -র্রর্সা I র্সা র্সর্গা -র্রর্গা | র্সা না -পধা I

ভ য় ভো লা বি০ ০ আ দ০ ০র দি য়ে ০০

I ধর্সা -া -া | -া -া -া } I মা গা -পমা | পা পধা -র্সণধা I

মা ০ ০ ০ ০ ০ বে শী ০ তা রে০ ০০

I পধা পমা -া | গা মগা রা I মপা -াধ ধা | ধা ধা -া I

কাঁ০ দা স্ না মা০ ০ মা ০ ছে ড়ে সে ০

I ধা ধা ণা | ধা ণধা -পমা I মা রগা -মা | পা পধা -র্সণধা I

পা লি য়ে যা বে০ ০০ বে শী ০ তা রে০ ০০

I পধা পমা -া | গা মগা রা I -া -া -া | -া মা -পা I

কাঁ০ দা স্ না মা০ ০ ০ ০ ০ ০ সে ০

I পা পনা -া | না না -ধা I না -নর্সা র্সা | না র্সা -া I

খে লে০ ০ য খ ন্ শ্রা ০ন্ ত হ বে ০

I পা -না র্সর্রা | র্সর্রা র্রণা -ধপা I পধা -মপধা পা | মা গা -সরা II II

ঘু ম্ পা০ ড়া০ বি ০০ ব০ ০০০ক্ষে ধ রে ০০

অন্ধের বৌ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহের একবছর পরে ধীরাজ অন্ধ হইয়া গেল। চোখের একটা অসুখ আছে, বড় বিপজ্জনক অসুখ, চোখের ভিতরের চাপ যাতে বাড়িয়া যায়। অবস্থাবিশেষে একদিনের মধ্যেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আগের দিনটা ছিল বিবাহের বার্ষিক তিথি। রাত্রিটা দু'জনে জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। সারারাত কয়েক মিনিটের জন্যও চোখ না বুজিয়া প্রতিদিন সকালে একেবারে সূর্য্যের মুখ না দেখিলেও রাত জাগাটা তাদের অবশ্য বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের প্রথম বছরে রাত দু'টোর আগে ফিসফিসানি শেষ হওয়াটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।

চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, ধীরাজ একটু ঝাপসা দেখিতেছিল। বাহির হইতেও চোখ দুটিকে তার বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের বার্ষিক তিথিকে যথাযোগ্য সম্মান করার উৎসাহে ওসব সামান্য বিষয়কে তারা গ্রাহ্যও করে নাই। সুনয়না বলিয়াছিল, 'তাই বলে আজ রাতে ঘুমোতে পাবে না। কাল সারাদিন ঘুমিও, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমারও তো চোখ জ্বালা করছে।'

'তবে একটু সেইরকম নাচ দেখাও?'

'চোখ বোজো?'

পরদিন বিকালের দিকে ডাক্তার ডাকা হইল। তারপর তাড়াহুড়া ছুটাছুটি করিয়া করা হইল অনেক কিছুই। কিন্তু তখন বড় বেশী দেরী হইয়া গিয়াছে। ভোরে সুনয়নার হাত ধরিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া নূতন সূর্য্যকেও ধীরাজ যখন ঝাপসা দেখিতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেও হয় তো কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তখন কে ভাবিয়াছিল টকটকে লাল চোখ, চোখের যন্ত্রণা, ঝাপসা দেখা, চোখের মধ্যে আলোর ঝলক মারা এসব ধীরাজের একেবারে অন্ধ হইয়া যাওয়ার ভূমিকা! ওসব তারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া রাতজাগার সাধারণ ও স্বাভাবিক লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

বিশেষজ্ঞ অনেক রকম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু অপারেশন করিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, আর কিছুই করিবার নাই।

পরদিন সকালে জগতের আলোর উৎস যথাসময়ে আকাশে দেখা দিল কিন্তু ধীরাজ সেটা টেরও পাইল না। তার চোখের আলো চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে।

চোখের ডাক্তার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, রাত জাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়। রাত না জাগিলেই অবশ্য ভাল ছিল, কিন্তু তাতেও যে ধীরাজের চোখ বাঁচিত তাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? এ বড় সাংঘাতিক অসুখ, কত লোকের চোখ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন কি সহজে এসব যুক্তি মানিতে চায়? সুনয়নার কেবলি মনে হয়, ওভাবে জোর করিয়া স্বামীকে রাত না জাগাইলে চোখের অসুখটা কখনও এত তাড়াতাড়ি এরকম বাড়িয়া যাইত না। অন্তত রোগের লক্ষণগুলিকে রাত জাগার ফল ভাবিয়া নিশ্চয় তারা অবহেলা করিত না, সকালবেলাই চোখের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। সুনয়না এসব কথা ভাবে আর চোখের জলে সকালবেলার আলো এমন ঝাপসা দেখায় যেন সেও আধাআধি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে স্বামীর বিকৃত মুখখানা দেখিতে দেখিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, 'ওগো, আমার জন্যেই আমাদের এ সর্ব্বনাশ ঘটল।'

ধীরাজ মরার মত বলিল, 'তোমার কি দোষ?'

সুনয়না সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'কার দোষ তবে? কে তোমার টকটকে লাল চোখ দেখেও তোমায় ঘুমোতে দেয় নি? সকালে কে তোমায় বলেছে, একটু ঘুমোলেই সব সেরে যাবে? আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি—স্বামীর চোখখাগী হতভাগী আমি, আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব—নিজের চোখ উপড়ে ফেলব। যদি না উপড়ে ফেলি, মা কালীর দিব্যি করে বলছি—'

'চুপ, ওসব বলতে নেই।'

ধীরাজ ব্যস্ত হইয়া স্থনয়নার একখানা হাত হাতড়াইয়া খুঁজিতে আরম্ভ করায় স্থনয়না হঠাৎ শিহরিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরাজের কাকা অন্ধ, প্রথম এবাড়ীতে আসিয়া তাকে প্রণাম করার পর এমনিভাবে আন্দাজে তার গায়ে মাথায় শীর্ণ হাত বুলাইয়া কাকা তাকে অভ্যর্থনা আর আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন।

'কি খুঁজছ? কি খুঁজছ তুমি?'

'তোমার হাত কই?'

'এই যে—'

তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ধীরাজ সান্ত্বনার সুরে বলিতে লাগিল, 'ওসব কথা মনেও এনো না। তোমার চোখ গেলে আমি বাঁচব কি ক'রে? এখন থেকে তোমার চোখ দিয়েই তো আমি দেখব? তুমি আমার সেবা করবে, কাজ ক'রে দেবে, বইটই পড়ে শোনাবে—'

স্থনয়নার হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরাজ তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকে। স্থনয়নার মাথাটা হঠাৎ এমন জোরে তার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে যেন সে তার বুকেই মাথা কুটিয়া মরিতে চায়। যে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সান্ত্বনা আর সাহস পাওয়ার বদলে সে নিজেই অপরজনকে বুঝাইয়া আদর করিয়া শান্ত করিতেছে, এটা দু'জনের কারও কাছে খাপছাড়া মনে হইল না। ভালবাসার এই অন্ধ ব্যাকুলতার মত দুর্ভাগ্যের ভাল ওষুধ জগতে আর কি আছে?

ধীরাজ বেশী ব্যাকুল হয় নাই। কতকটা বজ্রাহত মানুষের মত সে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখে বেশী কথা নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া নাই, কি পাপে তার এমন শাস্তি জুটিল ঈশ্বরের কাছে সে কৈফিয়ৎ দাবী করা নাই, লোভী শিশুর মত সকলের সহানুভূতি গিলিবার অধীর আগ্রহও নাই। এখনও সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই, চিরদিনের জন্য সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনের তলে এখনও তার একটা যুক্তিহীন অন্ধ আশা জাগিয়া আছে, হয় তো সব ঠিক হইয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই স্থনয়নাকে সে বলিয়াছে, 'তা ছাড়া কি জান, কিছুদিন পরে হয় তো একটু একটু দেখতে পাব। ভাল দেখতে পাব না বটে, চশমা টশমা নিয়ে হয় তো ধোঁয়াটে ঝাপসা মত কাছের জিনিষ শুধু দেখতে পাব, তবু দেখতে পাব তো! খুব বড় একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।'

ধীরাজের মধ্যে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন আশ্রয় করিয়াছে স্থনয়নাকে—আর সমস্তক্ষণ কাবু করিয়া রাখিয়াছে তাকে; ধীরাজের আফসোস আর হা-হুতাশ যেন মুক্তি পাইতেছে তার মুখে।

পরপর দু'টি রাত্রি সে ঘুমায় নাই। একটি রাত্রি জাগিয়াছে স্বামীর সোহাগ ভোগ করিয়া, আর একটি রাত্রি জাগিয়াছে অন্ধ স্বামীর স্ত্রী হইয়া জীবন কাটানোর বীভৎস অসুবিধাগুলির কথা কল্পনা করিয়া। সারারাত সে আলো নিভায় নাই। প্রথম রাত্রে তারা আলো নিভায় নাই, দুজনে দু'জনকে দেখিবে বলিয়া। পরের রাত্রে সে আলো নিভায় নাই, অন্ধকারের ভয়ে। হাসপাতাল হইতে ধীরাজ বাড়ী ফিরিয়াছিল রাত্রি প্রায় এগারটার সময়, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ ধীরাজ। একবাটি দুধ চুমুক দিয়া খাইয়াই সে শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া পড়িতে তাকে সাহায্য করিয়াছিল বাড়ীর প্রায় সকলে, মা বাবা ভাই বোন পিসী খুড়ী ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নে ভাগ্নীর দল। বাড়ীর ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু আসে নাই ধীরাজের সেই অন্ধ কাকা। ধীরাজের মায়ার মৃদু কান্নার শব্দ শুনিতে শুনিতে তখন স্থনয়নার কানের মধ্যে হঠাৎ ভাঙ্গা কাঁসির বেতালা আওয়াজের মত কি যেন ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানা পাক খাইয়া খাইয়া হইয়া গিয়াছিল অন্ধকার।

মূর্চ্ছা নয়, মূর্চ্ছা গেলে স্থনয়না পড়িয়া যাইত, জ্ঞান থাকিত না। একটু টলিতে থাকিলেও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে প্রায় মিনিটখানেক চোখ দিয়াই যেন সেই গাঢ় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কানের মধ্যে তখন ভাঙ্গা কাঁসির ঝমঝমানির শব্দ থামিয়া গিয়াছে। বাহিরেও কোন শব্দ নাই। সেই স্তব্ধতাকেও স্থনয়নার মনে হইয়াছিল সাময়িক অন্ধকারের অঙ্গ।

তারপর সেই নিবিড় কালো অন্ধকার পরিণত হইয়াছিল গাঢ় কুয়াশায় এবং ক্রমে ক্রমে কুয়াশাও কাটিয়া গিয়াছিল। সকলের কথার গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ স্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়া

উঠিয়াছিল। কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে তখন সুনয়নার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতেছে। সে আতঙ্ক ধীরাজের চোখের জন্য নয়—চোখ যে তার নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুনয়না আগেই সে খবর পাইয়াছিল। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কানের কাছে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হইলে কিছুক্ষণের জন্য মানুষ যেমন বেহিসাবী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া যায়, কি জন্য আতঙ্ক তাও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিবার পরেও সুনয়না অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইরকম একটা আতঙ্ক অনুভব করিয়াছিল।

তাকে চমক দিয়া বাস্তবে টানিয়া আনিয়াছিল ঘর খালি হওয়ার পর ধীরাজের অস্ফুট প্রশ্ন: 'আলো নিভালে না?'

এ প্রশ্ন সুনয়না অনেকবার শুনিয়াছে। শোয়ার আগে আলো নিভাইতে তার প্রায়ই খেয়াল থাকে না, ধীরাজ মনে পড়াইয়া দেয়। এই পরিচিত সাধারণ প্রশ্নটি শুনিয়া আকস্মিক উত্তেজনায় তার দম যেন আটকাইয়া আসিয়াছিল। ধীরাজ কি তবে ঘরের আলো দেখিতে পাইতেছে!

'তুমি আলো দেখতে পাচ্ছ?'

ধীরাজ সাড়া দেয় নাই। তখন সুনয়না বুঝিতে পারিয়াছিল, ঘুমের ঘোরে অভ্যাসবশে ধীরাজ ওকথা বলিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালানো থাক্ বা নিভানো হোক, ধীরাজের কাছে সব সমান।

বুকের অস্বাভাবিক টিপটিপানি কমিয়া তখন স্বাভাবিক কান্না বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধীরাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভয়ে প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতেও পারে নাই।

তারপর কখনও সন্তর্পণে বিছানায় উঠিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া আবার নামিয়া আসিয়া, কখনও একদৃষ্টিতে ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দেখিয়া, কখনও জানালার শিক ধরিয়া পাশের বাড়ীর উঠানে আবছা চাঁদের আলোয় চেনা জিনিষগুলিকে নূতন করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিয়া—আর সমস্তক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া সে রাত কাটাইয়াছে। ঘরের আলো নিভানোর কথা একবারও আর মনে পড়ে নাই।

বেলা বাড়িলে কয়েকজন প্রতিবেশী দেখা করিতে এবং দুঃখ জানাইতে আসিলেন। আগে সুনয়না ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, আজ সে উদ্ধতভাবে বিছানার কাছ হইতে শুধু একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। এই সামান্য ব্যাপারে তার এমন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল যে বলিবার নয়। সমবেদনার গাম্ভীর্য্যে বিকৃত সকলের মুখ দেখিয়া আর অর্থহীন ভদ্রতার মিঠা মিঠা কথা শুনিয়া গায়ে যেন তার আগুন ধরিয়া যাইতে লাগিল। একজন অকালবৃদ্ধ সবজান্তা ভদ্রলোক যখন অদ্ভুত একটা আফসোসের শব্দ করিয়া বলিলেন যে এলোপ্যাথি না করিয়া হোমিওপ্যাথি করিলে হয় তো উপকার হইত, তখন বাঘিনীর মত তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাটা দমন করা কাল রাত্রে কান্না চাপিয়া রাখার চেয়েও সুনয়নার কঠিন মনে হইতে লাগিল।

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল—তার গলার আওয়াজে তারই মনের কথা কে যেন উচ্চারণ করিতেছে: 'আপনারা এখন আসুন, উনি একটু বিশ্রাম করবেন।'

সকলে আহত বিস্ময়ে তার এলোমেলো চুল, ক্লিষ্ট মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকায়। ধীরাজ ভদ্রতার খাতিরে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিনয়ের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিতেছিল, তার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়।

সকলের আগে কথা বলেন অকালবৃদ্ধ ভদ্রলোকটি: 'চলো হে চলো, আপিসের বেলা হ'ল।'

ধীরাজের ছোট ভাই বিরাজ সকলকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বলিল, 'তুমি সকলকে তাড়িয়ে দিলে বৌদি!'

ধীরাজ ভৎর্সনার সুরে বলিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

সুনয়না উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল দিয়া নিজের কপালটা ঘষিতে থাকে, কথা বলে না। বিরাজ বছর তিনেক ডাক্তারি পড়িতেছে, সুনয়নার মূর্ত্তি দেখিয়া এতক্ষণে তার খেয়াল হয়, হয় তো তার অসুখ করিয়াছে।

'তোমার অসুখ করেছে নাকি বৌদি?'

সুনয়না মাথা নাড়িয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই বিরাজ গিয়া খবর দিল, 'দাদা ডাকছে বৌদি।'

ঘরে ফিরিয়া গিয়া ধীরাজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ডান হাতে সে নিজের চুলগুলি সজোরে মুঠা করিয়া ধরিয়া আছে।

সুনয়না সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে ?'

ধীরাজ অস্বাভাবিক চাপা গলায় বলিল, 'তোমার অসুখ করেছে তো? আমি টেরও পাইনি! বিরাজ না বললে জানতেও পারতাম না। এবার থেকে তোমার অসুখ করবে, আর আমি না জেনে তোমায় খাটিয়ে মারব, বকব—'

সুনয়না চুপ। কি বলিবে সে, তার কি বলিবার আছে? জীবন আর এখন জীবন নয়, নিছক নাটক। লাগসই অভিনয় করিতে সে তো কোনদিন শেখে নাই।

ধীরাজ হঠাৎ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল 'ঠকাও, ঠকাও, তুমিও আমায় ঠকাও। চোখে তো দেখতে পাই না, যা ইচ্ছা তাই বলে কচি ছেলের মত ভুলাও আমাকে।' বলিয়া ধীরাজ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আগের মত শান্তভাবে ধীরাজ কথাগুলি বলিলে সুনয়না হয় তো তার পাশে বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদাকাটা আরম্ভ করিয়া দিত। স্বামীর ব্যাকুলতা আর কান্না দেখিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া স্বামীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া কয়েকঘণ্টা আগে ধীরাজ যেভাবে তার মাথায় হাত বুলাইয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল তেমনিভাবে এখন তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'ওরকম কোরো না। পাগল হয়েছ, তোমায় ঠকাব? ঠাকুরপোর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? ভাবনায় চিন্তায় রাত জেগে মুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছে, ওম্‌নি ঠাকুরপো ধরে নিল আমার অসুখ হয়েছে। অসুখ হ'লে তোমায় বলব না?'

'কিন্তু বিরাজ যে বলল তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউনের উপক্রম হয়েছে?'

'ঠাকুরপো তো মস্ত ডাক্তার!'

এমন সময় আসিলেন পিসীমা। সুনয়নার দিকে কেউ নজর দিতেছে না বলিয়া বিরাজ বোধ করি বাড়ীর সকলকে একটু খোঁচাইয়া দিয়াছিল; ঘরে ঢুকিয়াই পিসীমা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তুমি কি আরম্ভ ক'রে দিয়েছ বৌমা? কাল থেকে উপোস দিচ্ছ, এয়োস্ত্রী মানুষ—'

পিসীমার পিছনে পিছনে কাকীমাও আসিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'আহা, থাক্ থাক্। এসো বৌমা, একটু কিছু খেয়ে নেবে এসো।'

কাকীমা একটু গম্ভীর চুপচাপ মানুষ, কারও সঙ্গে বেশী মেলামেশা করেন না। এতদিন মানুষটাকে দেখিলেই সুনয়নার বড় মায়া হইত, মনে হইত, আহা দশ-বার বছর বেচারী অন্ধ স্বামীকে লইয়া ঘর করিতেছে। আজ কাকীমার শান্ত কোমল মুখখানা দেখিয়া তার গভীর বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল; আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলি শুনিয়া মনে হতে লাগিল, সুযোগ পাইয়া তাকে যেন কাকীমা ব্যঙ্গ করিতেছেন। পিসীমার মৃদু ভৎর্সনার প্রতিবাদ করিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন, আহা থাক থাক, ওকে আপনি বকবেন না, ও এখন আমার দলের।

একটু আগে সুনয়না হয় তো নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মত গুরুজন দু'জনকে অপমান করিয়া বসিত। কিন্তু ধীরাজের আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্তভাব তার সমস্ত সঙ্গত ও অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের বাহির হওয়ার পথ তখনও বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে নীরবে কাকীমার সঙ্গে চলিয়া গেল।

একবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াই ধীরাজের ধৈর্য্য আর সংযম যেন নষ্ট হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন টের পাইয়াছে তার চারিদিকে যে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে সেটা রাত্রির সাময়িক অন্ধকার নয়, ভাগ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কখনও দুঃখে সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কখনও অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। মা একবার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া ছেলের অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, চোখে আঁচল দিয়া পলাইয়া গেলেন। বাড়ীর সকলে আসিয়া নানাভাবে তাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাতে সে যেন আরও অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সব কথার জবাবে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল, অন্ধ হয়ে বেঁচে থেকে কি হবে, এর চেয়ে মরাই ভাল।

ধৈর্য্য আর সংযম দেখা দিল সুনয়নার মধ্যে। মনের সমস্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে সে যেন জোর করিয়া মনের জেলে পুরিয়া ফেলিল, বাহিরে আর তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দু'জনের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তারা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পরের মানসিক অবস্থাকে অদলবদল করিয়া লইয়াছে। ধীরাজ যতক্ষণ শান্ত ছিল ততক্ষণ পাগলামী করিয়াছে

সুনয়না, এবার ধীরাজকে পাগল হওয়ার সুযোগ দিয়া সুনয়না আত্মসম্বরণ করিয়াছে।

কারও বলার অপেক্ষা না রাখিয়া স্নান করিয়া সুনয়না দু'টি ভাত খাইল। গুরুজনদের কাছে প্রয়োজনীয় লজ্জা বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। নীরবে সকলের স্নেহাত্মক সমবেদনার উচ্ছ্বাসভরা অসহ্য কথা শুনিয়া গেল। আর প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিল, ভিতরের বন্দী ব্যাকুলতা আর উচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে।

বিকালে থাকিতে না পারিয়া সে পলাইয়া গেল ছাতে। সেখানে অনায়াসে নিজের মনে পাগলের মত যত ইচ্ছা কাঁদাকাটা করিয়া আর গুড়া শ্যাওলার ধূলাতে গড়াগড়ি দিয়া ভিতরে আটকানো প্রচণ্ড আবেগকে সে কতকটা হাল্কা করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু নির্জ্জনে হিস্টিরিয়াকে প্রশ্রয় দিতে মেয়েদের ভাল লাগে না। মানুষের সামনে যে অন্ধ উচ্ছ্বাস বাহিরে আসিবার জন্য দুরন্তপনা আরম্ভ করে, নির্জ্জনে সেটা রূপান্তরিত হয় উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনায়। কিছুদূরে পুরানো একটা বাড়ীর পিছনে সূর্য্য আড়াল হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ঝলসানো চোখে চারিদিক আবছা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুনয়নার রীতিমত তৃপ্তি বোধ হয়। এই কি তার শাস্তির সূচনা? স্বামীকে সে অন্ধ করিয়াছে, তাই সেও অন্ধ হইয়া যাইতেছে? তাই ভাল, চোখ উপড়াইয়া ফেলার চেয়ে ধীরাজ যেমন ঝাপসা দেখিতে আরম্ভ করিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তারও সেভাবে অন্ধ হওয়াই ভাল। রাতের পর রাত জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিয়া ধীরাজের চোখ সে নষ্ট করিয়াছে, তার চোখে জল দেখার ভয়ে নিজের চোখের কথা ধীরাজ ভাবে নাই, আজ ধীরাজ একা সেই রাত জাগার ফল ভোগ করিবে কেন?

চারিদিক আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুনয়না গভীর হতাশা বোধ করে। কাল রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য যেমন অন্ধকার দেখিয়াছিল নিজের জগতে স্থায়ী ভাবে সেই রকম অন্ধকার টানিয়া আনিবার জন্য মন তার ছটফট করিতে থাকে। চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইবে সে জানে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া সেজন্য অপেক্ষা করা তার যেন অসম্ভব মনে হয়। সূর্য্যও বাড়ীটার আড়ালে চলিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের দিকে যতক্ষণ পারে তাকাইয়া আবার যে একটু সময়ের জন্যও ঝাপসা দেখিবে তারও উপায় নাই।

সূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসে, কিন্তু অন্ধকার কই? আকাশে তারা ফুটিয়াছে, চাঁদ উঠিয়াই আছে, নীচে ঘরে ঘরে রাস্তায় ঘাটে হাজার হাজার আলো জ্বলিয়াছে। এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড পাতলা অন্ধকার আর ছায়া লুকাইয়া আছে, আলোময় জগতে অস্তিত্বের লজ্জা রাখিবার ঠাঁই আনাচে কানাচে ছাড়া খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বিরাজ আসিল। বৌদির জন্য বেচারীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই।

'এখানে কি করছ বৌদি?'

'দাঁড়িয়ে আছি।'

'চলো নীচে যাই।'

সুনয়না মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তুমি বুঝি ভাবছ ঠাকুরপো, ছাত থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ব?

খুব সম্ভব ওরকম কিছুই বিরাজ ভাবিতেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি অস্বীকার করিয়া বলিল, না না, কি যে বল তুমি! 'দাদা ডাকছে।'

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ধীরাজের জন্য নয়, যারা ঘরে আসা যাওয়া করিতেছে তাদের জন্য। ঘরে পা দিয়াই সুনয়নার মনে হইল, আলো যেন অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বালব্‌টা সূর্য্যের মত তীব্র জ্যোতিতে চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। পরক্ষণে কালরাত্রির মত কানের মধ্যে ঝমঝমানি আরম্ভ হইয়া চারিদিক চটচটে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, ঝমঝমানি থামিয়া পৃথিবী ডুবিয়া গেল স্তব্ধতায়।

মিনিট খানেক পরে সে স্বামীকে দেখিতে পাইল, তার কথাও শুনিতে পাইল।

'কে এল? তুমি নাকি?—'

সুনয়না আগে আলোটা নিভাইয়া দিয়া বিছানার কাছে গেল। আলো তার সহ্য হইতেছিল না। ধীরাজের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টামাত্র না করিয়া মোটা চাদর মুড়ি দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

'কি হয়েছে? শুয়ে পড়লে যে?'

'শরীরটা খারাপ লাগছে।'

তেমনিভাবে চাদর মুড়ি দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুনয়না নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। ঘরে মানুষের আসা যাওয়া চলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে স্যুইচ্ টেপার শব্দে সে টের পাইতে লাগিল, আলো জ্বলিতেছে নিভিতেছে। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া কেউ তাকে ডাকিল না। এক সময় ধীরাজের খাবার আসিল, কাকীমা নিজে কাছে বসিয়া তাকে খাইতে সাহায্য করিলেন। বিরাজের হাত ধরিয়া সে বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিল। চুরুটের গন্ধে সুনয়না বুঝিতে পারিল, বিছানায় ওঠার বদলে সে আরাম কেদারায় বসিয়া চুরুট ধরাইয়াছে।

কাকীমা আস্তে আস্তে তাকে ঠেলিয়া বলিলেন, 'খাবে এসো বৌমা।'

তখনও সুনয়না মুখ তুলিয়া চাহিল না।—'কিছু খাব না। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।'

'একটু গরম দুধ খাও তবে? বিকেলে চা-ও তো খাওনি।'

'কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে ধীরাজ তাকে ডাকিল, কিন্তু সে সাড়া দিল না। আরাম কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরাজ ঘরে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে টের পাইয়া তার ইচ্ছা হইতে লাগিল, উঠিয়া গিয়া স্বামীকে বিছানায় শুইতে সাহায্য করে। কিন্তু আজ একদিন সাহায্য করিয়া আর কি হইবে? আজ-কালের মধ্যে সেও তো অন্ধ হইয়া যাইবে!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরজা দিয়া ধীরাজ শুইয়া পড়িল। ধীরাজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বুঝিবার পর সুনয়না অনুভব করিতে লাগিল, ইতিপূর্ব্বে দু'বার চোখে অন্ধকার দেখিবার সময় যে দম আটকানো স্তব্ধতা চারিদিকে নামিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেইরকম স্তব্ধতা তাকে ঘিরিয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। দামী ক্লকটার ঘণ্টা বাজার গম্ভীর আওয়াজ পর্য্যন্ত যেন অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। বমির মত কি যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল—কেবল বুক ভাঙ্গিয়া নয়—মাথাটা পর্য্যন্ত যেন চুরমার করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

রাত বারোটা বাজিবার পর সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরে গিয়া বমি করিয়া আসিলে ভাল লাগিবে ভাবিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘর অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলিবার সময় দু'বার মিনিট খানেকের জন্ম যেমন গাঢ় চটচটে অন্ধকার দেখিয়াছিল, তার চেয়েও ঘন অন্ধকার। আন্দাজে স্যুইচের কাছে গিয়া স্যুইচে হাত দিয়া সে স্তব্ধভাবে খানিকক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

স্যুইচ নামানোই ছিল।

ধীরাজ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়াছে, আলো নিভায় নাই। এই অন্ধকার ঘরে এখনো আলো জ্বলিতেছে। সে তবে সত্যই অন্ধ হইয়া গিয়াছে?

যে স্পেশালিস্ট ধীরাজের চোখ পরীক্ষা করিয়াছিলেন পরদিন তিনিই নানাভাবে সুনয়নার চোখও পরীক্ষা করিলেন। তারপর বিব্রতভাবে আরও একজন বড় চোখের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। কিন্তু অনেক রকম পরীক্ষা আর পরামর্শের পরও দুজনে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সুনয়নার চোখ কেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্পেশালিস্ট মত প্রকাশ করিলেন: এটা অপ্‌টিক্ নার্ভের অসুখ। কদাচিৎ মানুষের এ অসুখ হয়।

পথ-হারা

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

যেদিন প্রথম বাহির হইনু পথে
সেদিন রজনী ছিল দুর্য্যোগে ভরা,
পরিচিত যারা রহিল পিছনে পড়ে
বাহিরে এলেম শুনিয়া তোমার সাড়া।

সেইদিন হ'তে কত নিশান্ত ধরি'
সম্মুখপানে চলেছি নিরুদ্দেশ,
পদতলে কাঁটা ফুটিয়াছে কতবারই,
কত বন্ধুর পথ হ'য়ে গেছে শেষ।

কত বসন্ত কত উৎসব রাতি
একে একে হ'ল নীরবে বাহিত সব,
যাহা কিছু ছিল বিলায়ে দিলেম সাথী,
এবার থামিবে জীবনের কলরব:

তবু পুরাতনে কেন মনে পড়ে বারে,
গাল বেয়ে কেন ঝরে অশ্রুর ধারা,
একেলা পাগল রাতের অন্ধকারে
আর কত দিন চলিব পন্থ-হারা!

প্রহেলিকা

নাটক

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য

গিরিজা। অনাথ এখনও এল না!

কার্ত্তিক। আমি বংশীকে জিজ্ঞেস করেছি। সে বললে, অনাথ এক্ষুণি আসছে। বাড়ী গিয়ে শুয়েছিল। জ্বর বেড়েছে। দরজায় খট খট ধ্বনি

গিরিজা। কে? অনাথ?

অনাথ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেমানান বড় একটা ইউনিফর্ম্ম পরে অনাথ ঢুকল

কার্ত্তিক। এ পোষাক তো তোমার নয়? তোমারটা কোথায়?

অনাথ। খুঁজে পাচ্ছি না।

গিরিজা। মিথ্যা কথা বলে এতক্ষণ আমার সময় নষ্ট করছিলে কেন? কাল তো তুমিই লিফ্‌টে ছিলে।

অনাথ চুপ ক'রে রইল

কথার উত্তর দাও। ছিলে কি না?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। হঠাৎ ডিউটি বদল করেছিলে কেন?

অনাথ। বেহালার ডগ রেসের হঠাৎ একটা খুব ভাল টিপ পেয়েছি। তাই কাল কাজ করেছি, শনিবারে ছুটি নেব বলে।

গিরিজা। বংশী তো সমস্ত মিথ্যা কথা বলেছে। এখন তুমি সত্যিকারের কি ঘটেছিল বল। কোন রকম আওয়াজ কি ঝগড়া কিছু শুনেছিলে?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। কাল রাত্রে মিস্ রায় কখন ফিরেছিলেন?

অনাথ। জানি না। লিফ্‌ট ব্যবহার করেন নি।

গিরিজা। কার্ত্তিক তোমার রেকর্ড দেখ।

কার্ত্তিক। (নোটবই দেখে) ঠিক আছে। মিস্ রায় কাল ঘর থেকে বার হন নি।

গিরিজা। মালিনী দেবী কখন ফিরেছিলেন?

অনাথ। জানিনা। তিনিও লিফ্‌ট ব্যবহার করেন নি।

গিরিজা। তিনি যে বললেন, লিফ্‌টে ওপরে এসেছেন—

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) এই রাত বারোটার সময়।

অনাথ। আমি বলতে পারছি না। লিফ্‌টে উঠলে আমার নিশ্চয়ই মনে থাকত।

গিরিজা। আচ্ছা। তাঁকে ডেকে দিয়ে তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর। বাড়ী যেও না, তোমায় এখুনি দরকার হতে পারে। অনাথের প্রস্থান

ভারী আশ্চর্য্য তো!

কার্ত্তিক। কি?

গিরিজা। এই লোকটাকে যত দেখছি, ততই মনে হচ্ছে কোথাও যেন দেখেছি।

কার্ত্তিক। মনে করতে পারলে সুবিধা হত।

গিরিজা। বহুদিন আগেকার কথা। তবে মনে পড়বেই।

কার্ত্তিক। মালিনী দেবীর কাছ থেকে কি সাহায্য পাওয়া যাবে?

গিরিজা। কে মিথ্যা বলছে? অনাথ না মালিনী দেবী? কেন বলছে? খট খট ধ্বনি

কার্ত্তিক। ভেতরে আসুন।

মালিনী দেবীর প্রবেশ

মালিনী। (হেসে) এখনও সেই একই কাজ চলছে?

গিরিজা। হুঁ। আপনি আগে যা সব বলেছেন তার দু-একটা কথা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

মালিনী। তা যাবেই। আমি থাকলে আরও বেশী গুলিয়ে যেতে পারে।

গিরিজা। আপনি কাল-রাত বারোটার সময় লিফ্‌টে উপরে উঠেছিলেন, ঠিক তো?

মালিনী। তাই ত মনে হচ্ছে।

গিরিজা। লিফ্‌টে কে ছিল? অনাথ না বংশী?

মালিনী। লিফ্‌টম্যানদের সঙ্গে আমার নাম জানবার মত বন্ধুত্ব এখনও হয় নি।

গিরিজা। তাদের চেহারা তো মনে আছে?

মালিনী। বিশেষ না।

গিরিজা। একজন রোগা আর একজন মোটা। কে লিফ্‌টে ছিল ?

মালিনী। যে রোগা সে-ই বোধ হয়।

গিরিজা। সে কাল লিফ্‌টে ছিল না।

মালিনী। তবে সেই মোটা লোকটা।

গিরিজা। সে বলছে আপনি কাল রাত্রে লিফ্‌ট্‌ মোটে ব্যবহারই করেন নি।

মালিনী। তা কি ক'রে হতে পারে ?

গিরিজা। তাকে ডাকব ?

মালিনী। না, ডাকবার দরকার নেই।

গিরিজা। দেখুন মালিনী দেবী, এই ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে। আপনি সত্য কথা না বললে বিপদে পড়তে হবে।

মালিনী। (ভীতভাবে) আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি কাল এখানে— *থামলেন*

গিরিজা। বলুন, থামবেন না।

মালিনী। আমি কাল রাত্রে এখানে ছিলুমই না।

গিরিজা। একথা এতক্ষণ বলেন নি কেন ?

মালিনী। আপনাদের ভয়ে। আপনারা যে রকম ব্যস্তবাগীশ লোক, হয় ত এর একটা ভুল মানে ক'রে বসবেন।

গিরিজা। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন ?

মালিনী। শুটিং ঠিক শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় আমার ভয়ানক পেট কামড়াতে লাগল। দুপুর বেলা স্টুডিওতে চিংড়ি মাছ, মাংস ইত্যাদি অনেক খাওয়া হয়েছিল। ডিরেক্টর রঙীনবাবু বললেন—"হোটেলে গিয়ে কষ্ট পাবে। কেই বা দেখবে। তার চেয়ে আমার ওখানে চল।" তাই তাঁর সঙ্গে গেলুম। কি একটা ওষুধ দিলেন, খেলুম। অনেকটা আরামও পেলুম। তখন রাত অনেক হয়ে গিছল, তাই তিনি বললেন—"আজ এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে পৌঁছে দেব।" আমিও আর দ্বিরুক্তি করলুম না।

গিরিজা। হুঁ।

মালিনী। আপনি আবার তাঁকে যেন টেলিফোন ক'রে বসবেন না। আমি যা বলছি সবই সত্য।

গিরিজা। তাই মনে হচ্ছে, তবুও একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।

মালিনী। বেশ। দশটার পর যখন স্টুডিওতে যাবেন, তখন জিজ্ঞেস করবেন। বাড়ীতে ফোন করবেন না। আজ সকাল আটটার গাড়ীতে ওঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে ফেরবার কথা। তিনি যদি এসে শোনেন—

কার্ত্তিক। (হেসে) ওঃ! তবে করব না।

গিরিজা। আপনার শরীর কি প্রায়ই খারাপ হয় ?

মালিনী। নতুন ডিরেক্টর এলে দু-চার বার শরীর খারাপ হয় বই কি।

গিরিজা। আচ্ছা ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন।

মালিনী। (যেতে যেতে) বাড়ীতে ফোন করবেন না যেন। ওঁর স্ত্রী আবার উল্টো মানে করতে পারেন। সে এক বিপদ! *হেসে প্রস্থান*

কার্ত্তিক। ভদ্রমহিলাকে অনর্থক লজ্জায় ফেলা হ'ল।

গিরিজা। কি করব ? ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলছিলেন। তবে এক রকম ভালই হয়েছে। এই আমার বন্ধু মৃগাঙ্কের স্ত্রী। এরই জন্য সে আর বিয়ে করেনি। বলে—"মতি গতি ফিরলে সে ঠিক ফিরে আসবে।" এই কথা জানালে তার উপকার হ'তে পারে। হুঁ, অনাথকে ডাক।

দরজা খুলে কার্ত্তিক বাহিরে গেলেন ও অনাথকে নিয়ে ঢুকলেন

গিরিজা। অনাথ, কাল রাত্রে কোনও সময় লিফ্‌ট ছেড়ে তুমি কোথাও গিছলে ?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। একবারও না।

অনাথ। না।

গিরিজা। মনে করে দেখ। এক মিনিটের জন্যও যাওনি কি ?

অনাথ। তা হুজুর একবার গিছলুম। কিন্তু মাত্র মিনিট দু'য়েকের জন্য।

গিরিজা। লিফ্‌ট্‌ তখন কোন্‌ তলায় ছিল ?

অনাথ। একেবারে নীচের তলায়।

গিরিজা। অন্য কোন তলায় লিফ্‌ট্‌ দাঁড় করিয়ে তুমি কোথাও যাওনি ?

অনাথ। না হুজুর।

গিরিজা। কার্ত্তিক, গণেশবাবুকে নিয়ে এস।

কার্ত্তিক। (যেতে যেতে) তিনি এবার আমায় কামড়ে দেবেন। *প্রস্থান*

গিরিজা। এখনও ঠিক ক'রে বল।

অনাথ। ঠিকই বলছি হুজুর।

গিরিজা। তোমার পোষাক কাল কোথায় ছিল? এটা তো তোমার নয়।

অনাথ। কাল রাতে তো আমি পরেছিলুম। তারপর যাবার সময় আমাদের নীচেকার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে গিছলুম। আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

গিরিজা। কতদিন এখানে কাজ করছ?

অনাথ। বেশী দিন না। মাস দেড়েক হবে।

গণেশ ও কার্ত্তিকের প্রবেশ

গণেশ। যদি কুমারবাহাদুরকে হামি হত্তিয়া করেছি বললে শাস্তি পেতে পারে তো তাই স্বীকার করবে।

গিরিজা। না, না। দয়া ক'রে আপনি আবার স্বীকার ক'রে বসবেন না। কাল রাত্রে হোটেলে ফেরবার পর আপনি কি দেখলেন, আর একবার বলুন তো।

গণেশ। বার বার ঘণ্টী বাজায়ে লিফ্‌ট নামলে না দেখে হামি হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যখন এসেছে, তখন এই তলায়ে লিফ্‌ট্ দাঁড়িয়ে ছিলে লেকিন তাতে কোন আদমী ছিলে না। এক কাম করিয়ে। একঠো কাগজে এই সব লিখে দেন হামি দসখৎ করে দেবে। ফের বার বার আসতে হোবে না।

গিরিজা। অনাথ, গণেশবাবু কি বললেন শুনলে?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। গণেশবাবু আপনি ক'টার সময় ফিরেছিলেন?

গণেশ। অনেকবার তো বলেছে। এগারো হোবে।

গিরিজা। ধন্যবাদ! আপনি এবার যেতে পারেন।

গণেশের প্রস্থান

অনাথ, এইবার সত্য কথা বল। কোথায় গিছলে? পরোপকার করতে?

অনাথ। কি বলছেন?

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে শুইয়ে দিতে?

অনাথ। (চমকে) আপনি কি ক'রে জানলেন?

গিরিজা। যেরকম ক'রেই হোক, জেনেছি। এখন আমার কথার উত্তর দাও।

অনাথ। আজ্ঞে না। কাল তার ঘরে যাইনি। ছুটি নিয়েছিলুম কি না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়—

একটা লিফ্‌ট্‌ম্যানের পোষাক নিয়ে দামোদরের প্রবেশ

দামোদর। দেখুন, আমি এই—(অনাথকে দেখে) এখনও এই পোষাক! হোটেলটা দেখছি তোমরা পাঁচজনে মিলে—

গিরিজা। আপনার কথাটা কি খুব দরকারী দামোদরবাবু?

দামোদর। আপনাদের দরকারে লাগতে পারে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। কার্ত্তিক গিয়ে ধরলেন

কার্ত্তিক। (ফোনে) হ্যালো—আমি কার্ত্তিক। বলুন, আচ্ছা, ধরে আছি, ডেকে আনুন।

গিরিজা। বলুন দামোদরবাবু, কি বলবেন?

দামোদর। অনাথকে বড় পোষাক পরে থাকতে দেখে আমি ওদের নীচেকার ঘরে খোঁজ করেছিলুম। কেউ তক্তাপোষের তলায় এই পোষাকটা পুঁটলীর মত ক'রে ফেলে রেখেছিল। বার করে খুলে দেখি রক্তের দাগ। এই দেখুন। খুলে দেখালেন

গিরিজা। (পরীক্ষা ক'রে) রক্তের দাগই তো মনে হচ্ছে। কাঁধের ব্যাজটাও ছেঁড়া রয়েছে।

কার্ত্তিক। (ফোনে) হ্যাঁ, বলুন। নোটের উপরে যে আঙ্গুলের ছাপ ছিল—হ্যাঁ, রেকর্ডে পাওয়া গেছে—কার? বৃন্দাবন দাস, আচ্ছা—ছবি খুঁজে পেলে পাঠিয়ে দেবেন। ডাকাত ছিল—ওঃ। আচ্ছা— ফোন রেখে দিলেন

গিরিজা। আর ছবি পাঠাবার দরকার নেই। (অনাথকে দেখিয়ে) সামনেই বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনাথ দরজার দিকে যাচ্ছে দেখে গিরিজা চেঁচিয়ে উঠলেন

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক'। পালাবার চেষ্টা বৃথা।

অনাথ। সত্যি বলছি হুজুর— কেঁদে ফেললে

গিরিজা। চুপ কর।

দামোদর। আপনি কি বলতে চান অনাথ জেল-ফেরত আসামী?

গিরিজা। হ্যাঁ। প্রায় পনেরো বছর আগে এক ডাকাতী কেসে ধরা পড়ে। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড পায়। আট বছর পরে "জেলে ভাল ব্যবহারের" জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার পর সাত বছর এর কোন সন্ধান পুলিশ পায় নি।

দামোদর। (উত্তেজিতভাবে) আমার এ হোটেল আর টিকবে না। এরাই পাঁচ জনে মিলে উঠিয়ে দেবে দেখছি। প্রস্থান

গিরিজা। এইবার তোমার কি বলবার আছে বল'।

অনাথ চুপ ক'রে রইল

তোমার রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ নোটের তাড়ায় পাওয়া গেছে। তুমি রাত্রে কুমারবাহাদুরের ঘরে নিশ্চয়ই এসেছিলে।

অনাথ। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) হুজুর ইচ্ছে ক'রে নয়—হঠাৎ— চুপ করল

গিরিজা। হঠাৎ কি? বল, চুপ ক'রে থেকো না।

অনাথ। আমি কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছি।

গিরিজা। অ্যাঁ!

কার্ত্তিক। কি বলছ! তুমি হত্যা করেছ?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ।

গিরিজা। কি কি ঘটেছিল সমস্ত খুলে বল'।

কার্ত্তিক। ওকে আগে সাবধান ক'রে দিন।

গিরিজা। মনে থাকে যেন তুমি স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিচ্ছ, আমরা বাধ্য করি নি। আর দরকার হ'লে তোমার বিরুদ্ধে আমরা তা ব্যবহার করতে পারি।

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এর বক্তব্য একটা আলাদা কাগজে লিখে নাও।

অনাথ বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

অনাথ। রোজ রাত্রে কুমারবাহাদুরকে আমি এসে শুইয়ে দিতুম। তিনি তখন মাতাল অবস্থায় থাকতেন। কোন রকম হুঁশ থাকত না। আমিও তাঁর জামা খুলে টাঙ্গিয়ে রাখবার সময় দু-চার টাকা সরিয়ে নিতুম। তিনি কোন দিন টের পেতেন না। কালও তাঁকে শুইয়ে দেবার পর জামা খুলে রাখতে গিয়ে দেখি পকেটে একতাড়া নোট। রোজকার মত কিছু নিতে ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে তাড়া শুদ্ধ নিয়ে যেই যাব, অমনি কুমার-বাহাদুর উঠে বসে ডাকলেন—"অনাথ!" আমি থমকে দাঁড়াতে, তিনি উঠে এসে দেরাজ থেকে রিভলভার বার ক'রে আমার দিকে উঁচিয়ে বললেন—"অনাথ, আমি তোমায় বিশ্বাস করতুম। তুমি রোজ আমার পকেট থেকে চুরি কর। ভাব আমি বুঝি জানতে পারি না। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।" আমি ভীত হয়ে বললুম—"আমায় পুলিশে দেবেন না।" তিনি বললেন—"না, তোমায় আমি খুন করব।" বুঝলুম তাঁর নেশার ঘোর তখনও কাটেনি। আমি প্রাণভয়ে তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লুম। ঝুটোপাটি করতে করতে তাঁর হাতের রিভলভারটা কি রকম ক'রে আপনি ছুঁড়ে গেল। তিনি আমার হাতের মধ্যে নেতিয়ে পড়লেন। নিশ্বাস পড়ছে না দেখে বুঝলুম মারা গেছেন। আমার হাতে জামায় রক্ত মাখামাখি। নোটগুলো পায়ের কাছেই পড়েছিল, তুলে নিয়েও আসছিলুম, কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে সেইখানেই ফেলে রেখে চলে এলুম। আসবার সময় ধাক্কা লেগে টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

কার্ত্তিক। তখন রাত ক'টা?

অনাথ। বারোটা। নোটগুলোর জন্যই ধরা পড়লুম। নিয়ে গেলেই ভাল হ'ত।

কার্ত্তিক। দামোদরবাবুকে আর একটা ঘরের কথা জিজ্ঞেস করব?

গিরিজা। না, এবার মারতে আসবেন। রতন!

রতনের প্রবেশ

নিশিকান্তবাবুর ফ্ল্যাটটা খালি আছে। একে ঐ পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে এস। বাইরে একজন পুলিশ মোতায়েন ক'রে দিও। অনাথ, কোন রকম গণ্ডগোল করার চেষ্টা কোরো না। রতন ও অনাথের প্রস্থান

কার্ত্তিক। এ ব্যাপার মন্দ নয়। একই টেব্‌ল্ ল্যাম্প একবার বারোটায় ভাঙ্গল, আবার সাড়ে বারোটায় ভাঙ্গল—তারপর একটার সময় জোড়া লেগে জ্বলতে লাগল। একই লোক বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা, তিন তিন বার ঝুটোপাটি করে মারা গেলেন, তারপর দু'টোর সময় বেঁচে উঠে টেলিফোন করতে গেলেন, শেষে সে মতও বদলে ফেললেন।

গিরিজা। এ রকম কেস তো কখনও দেখি নি। আমার তো ভয় হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।

কার্ত্তিক। এক কাজ করলে হয়।

গিরিজা। কি বল তো।

কার্ত্তিক। ওদের দিয়েই প্রকৃত আসামী খুঁজে বার করা যাক্।

গিরিজা। তুমিও কি খেপে গেলে নাকি ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে না। ওরা সকলেই মনে করছে তার দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই জবানবন্দী দিয়েছে। যদি জানতে পারে যে সে ছাড়া আরও দু'জন দোষ স্বীকার করেছে তাহলে প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

গিরিজা। ঠিক বলেছ। ওদের তিনজনকে এই কথা জানিয়ে দিয়ে একসঙ্গে এইখানে হাজির করি। দেখি ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়।

কার্ত্তিক। আমার বিশ্বাস তাতে কাজ কিছু এগোবে।

গিরিজা। দেখ তো রতন ফিরে এসেছে কি না।

কার্ত্তিক। (দরজার কাছে গিয়ে) রতন, একবার ভিতরে এস।

রতনের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, তুমি গিয়ে অনাথকে এই ঘরে নিয়ে এস। কার্ত্তিক, তুমি বনমালীবাবুকে আনবে, আর আমি ত্রিদিবেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আর শোন, এই ঘরে একটা মাইক্রোফোন ফিট ক'রে ওপাশের ঘরে কনেক্‌শন দেবে। বুঝলে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। জেল ভ্যান এসেছে ?

রতন। এখনও আসে নি। ফোন করে দেব ?

গিরিজা। আর একটু অপেক্ষা করে দেখ।

তিন জনের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

একই দৃশ্য

ও অনাথের প্রবেশ

রতন। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন বলে।

অনাথ। আবার অপেক্ষা কেন ? একেবারে থানায় নিয়ে গেলেই—

রতন। চুপ কর।

কার্ত্তিক ও বনমালীর প্রবেশ

কার্ত্তিক। বনমালীবাবু, আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। বেশীক্ষণ লাগবে না।

রতন ও কার্ত্তিকের প্রস্থান

বনমালী। এখানে বসে থেকে আবার কি হবে ?

অনাথ। সেই কথা তো আমিও জানতে চাইছি।

ত্রিদিবেন্দ্র ও গিরিজার প্রবেশ

গিরিজা। বসুন। বনমালীবাবু, আপনিও বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

বনমালী। বসছি।

ত্রিদিবেন্দ্র ও বনমালী বসলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু আমাকে এখানে আনবার উদ্দেশ্য কি ?

গিরিজা। আমি আপনাদের তিনজনকে—

কার্ত্তিকের প্রবেশ

কার্ত্তিক। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—

গিরিজা। পরে হবে। আগে এঁদের—

কার্ত্তিক। কথাটা আগে শুনুন। খুব দরকারী।

গিরিজা। বেশ, বল।

কার্ত্তিক। এখানে বলা চলবে না। বাহিরে চলুন।

গিরিজা। কি এমন কথা! দেখুন, আমি এক্ষুণি আসছি। আপনারা বসুন।

কার্ত্তিক ও গিরিজার প্রস্থান। কিছুক্ষণ তিন জনে চুপ করে রইলেন। পরে চাপা কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। সব ঠিক হয়েছে ?

বনমালী। হ্যাঁ। যেমন ব'লে দিয়েছিলেন। আপনার ?

ত্রিদিবেন্দ্র। নিখুঁত হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

অনাথ। খুব সহজেই কাজ হাসিল হয়েছে, কিন্তু—

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু আবার কিসের ?

অনাথ। সে দিন রবিবারে আমরা যখন পরামর্শ করলুম—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ, কেউ শুনতে পাবে।

বনমালী। না, কেউ এখানে নেই।

অনাথ। কি কথা ছিল আপনার মনে আছে ?

ত্রিদিবেন্দ্র। লটারীতে যার নাম উঠবে সে-ই হত্যা

করবে। কিন্তু যে-ই হত্যা করুক না কেন, তুমি সব ক্লু গুলো আমার কথা মত সাজিয়ে রেখে দেবে।

অনাথ। তাই তো করেছি, তবে—

বনমালী। তবে আবার কি?

অনাথ। আমি দাগ-কাটা লটারীর কাগজ তুলেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে। অথচ—

ত্রিদিবেন্দ্র। কি বলছ? কে দাগ-কাটা কাগজ তুলেছিল তাই আমি এখন অবধি জানতুম না। আমি তুলিনি—

অনাথ। আপনি না হত্যা করে থাকলে উনি করেছেন?

বনমালী। না, না। আমি দাগ-কাটা কাগজ তুলি নি। তাই ভেবেছিলুম হয় তুমি, না হয় উনি তুলেছেন।

অনাথ। তবে এ কি ক'রে হ'ল?

ত্রিদিবেন্দ্র। কি হ'ল?

অনাথ। আপনারা ঠিক বলছেন যে হত্যা করেন নি?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমি করি নি।

বনমালী। আমিও না।

অনাথ। তবে কে করেছে?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমরা দু'জনে যখন করি নি, তখন তুমিই করেছ। দাগ-কাটা কাগজ তো তুমিই তুলেছিলে?

অনাথ। তা তুলেছিলুম। কিন্তু এসে দেখি কুমার-বাহাদুর মৃত অবস্থায় এই খানটায় পড়ে আছেন। শরীরের অর্দ্ধেকটা টেবিলের তলায়। মাথার মধ্যে দিয়ে গুলী চলে গেছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। তা কি করে হ'বে!

অনাথ। আমি ভাবলুম আপনারা কেউ হঠাৎ এসে পড়ে সুবিধা বুঝে কাজ শেষ ক'রে রেখে গেছেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমি এ সবের কিছুই জানি না।

বনমালী। আমিও না।

অনাথ। আমি ভাবলুম চিহ্নগুলো রেখে যাবার ভার আমার ওপর দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তাই—

বনমালী। তাই তো! যে হত্যা আমরা কেউ করি নি, চিহ্নগুলো রেখে আসার দরুণ মিছিমিছি তাতে জড়িয়ে পড়লুম!

অনাথ। তার আমি কি জানি। যা যা আমায় করতে ব'লে দিয়েছিলেন সবই সেই মত করলুম। কুমারবাহাদুরকে তুলে চেয়ারে বসালুম, টেবিলের ওপর নোটের তাড়া রাখলুম, আপনার ঘরের টেবিলের তলায় আপনার রিভলভারটা রেখে দিলুম, রক্তমাখা লেখা কাগজটা টেবিলে রাখতে ভুলে গিছলুম। যখন মনে পড়ল তখন এসে দেখি ঘরে লোক রয়েছে, তাই বাইরে বেঞ্চের তলায় তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলুম, পাছে আমায় কেউ দেখে ফেলে—

ত্রিদিবেন্দ্র। তবে কি আত্মহত্যা করলে?

অনাথ। মনে হয় না, কারণ তাঁর রিভলভারটা কাছাকাছি কোথাও খুঁজে পাইনি। অনেক কষ্টে খালি কেস খুঁজে আপনার দরজার পাশে রেখে দিলুম। লেখা কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে আলোটা ভেঙে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

ত্রিদিবেন্দ্র। তা হ'লে আর কেউ এসে তাকে খুন করেছে।

বনমালী। কিন্তু কে করলে?

অনাথ। যদি আমরা কেউ না ক'রে থাকি, তবে তো অনর্থক অনেক বিপদে—

গিরিজা। (নেপথ্যে) হ্যাঁ, তা ঠিক—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ, ওরা আসছে।

গিরিজা ও কার্ত্তিকের প্রবেশ

গিরিজা। আপনারা একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র, বনমালী ও অনাথকে মাঝের দরজা খুলে ওঘরে পৌঁছে দিয়ে এসে কার্ত্তিক দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন

সব শুনলে তো। এরা কেউই হত্যাকারী নয়।

কার্ত্তিক। ত্রিদিবেন্দ্রবাবুই এ ষড়যন্ত্রের নেতা। তাঁর কথা মত—

নীহার। (নেপথ্যে) আমায় ভেতরে যেতে দিন। বিশেষ দরকার আছে—

গিরিজা। মিস্ রায়ের গলা মনে হচ্ছে। যাও, নিয়ে এস।

কার্ত্তিক। (দরজা খুলে) আসুন মিস্ রায়, ভেতরে আসুন।

মিস্ রায়ের প্রবেশ

নীহার। আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।

গিরিজা। বলুন।

নীহার। আপনারা জমিদার ত্রিদিবেন্দ্র নন্দীকে ধরে এনেছেন কেন ?

গিরিজা। কর্ত্তব্যের খাতিরে।

নীহার। তিনি কি এই হত্যার জন্য দায়ী ?

গিরিজা। হ্যাঁ। দোষ স্বীকারও করেছেন।

নীহার। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি হত্যা করেন নি।

গিরিজা। আপনি কি ক'রে জানলেন যে তিনি—

নীহার। কারণ—কারণ আমি হত্যা করেছি।

গিরিজা। আপনি! কি বলছেন ?

নীহার। ঠিকই বলছি। তিনি কেন যে স্বীকার করলেন বুঝতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে কাকা মিথ্যা কথা বলেছেন।

গিরিজা। কাকা! কার কাকা ? আপনার কাকাকে তো আমরা—

নীহার। তাঁকে আপনি যখন এ ঘরে আনছিলেন তখন আমি দেখেছি।

গিরিজা। জমিদার ত্রিদিবেন্দ্র নন্দী আপনার কাকা ?

নীহার। হ্যাঁ। আমিই এই খুন করেছি, কাকা নয়।

গিরিজা। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আপনি যা বলেছেন—

নীহার। কাকার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে ?

গিরিজা। না।

নীহার। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) দয়া করে একটিবার—

গিরিজা। আচ্ছা। (উঠে গিয়ে মাঝের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে) ত্রিদিবেন্দ্রবাবু, একবার এ ঘরে আসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র এ ঘরে এলেন। গিরিজা দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। (চমকে) কে ? বাসন্তী !

নীহার। কাকা !

ত্রিদিবেন্দ্র। তুমি এখানে কি করছ ?

নীহার। কাকা, আমি যা করেছি তার জন্য দুঃখিত নই, মোটেই দুঃখিত নই—

ত্রিদিবেন্দ্র। কি করেছ ?

গিরিজা। মিস্ রায় বলছেন যে তিনি কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছেন।

নীহার। হ্যাঁ কাকা।

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেলেন। বুঝলেন যে নীহার সত্য কথা বলছেন। তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন

কিন্তু কি পাগলের মত বকছ ? অসম্ভব যত সব মিথ্যা কথা—গিরিজাবাবু—

গিরিজা। সত্য কথাটা কে বলছে ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আপনি নিশ্চয়ই এ সব যা-তা বিশ্বাস করছেন না।

নীহার। এ যা-তা নয়, একেবারে সত্য কথা। আমাকে বাঁচাবার জন্য—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ কর। ছেলেমানুষীরও একটা সময় আছে। আমি বলছি যে আমিই—

নীহার। কিন্তু তুমি নও কাকা, আমি করেছি—

গিরিজা। দয়া ক'রে আপনারা চুপ করুন। তর্ক করবেন না। আমি পাগল হয়ে যাব। (নীহারের প্রতি) আপনার কি বলবার আছে বলুন। মনে রাখবেন আপনি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করছেন, আমরা বাধ্য করি নি। আর দরকার হ'লে আপনার স্বীকারোক্তি আমরা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি। বলুন। কার্ত্তিক, একটা আলাদা কাগজে ওঁর বক্তব্য টুকে নাও।

নীহার বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

নীহার। আমি যখন এলাহাবাদে হস্টেলে থেকে পড়তুম তখন কুমারবাহাদুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বিবাহ করবেন অঙ্গীকার করায় আমি তাঁর সঙ্গে চলে যাই। কিছুদিন আমায় খুব আদর যত্ন করেন। কিন্তু বিবাহ করতে বললেই গোলমাল করতেন। ক্রমে আমার প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন। মাতাল হয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে বাড়ী আসতেন। আপত্তি করলে মার-ধর করতেন। শেষে একদিন হঠাৎ আমায় ফেলে কোথায় সরে পড়লেন, আর ফিরলেন না। আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলুম। চ্যারিটেবল হাসপাতালে একটি মৃত সন্তান হয়। সেই থেকে আমি তাঁর খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। তিনি কলকাতায় হোটেল "ক্যাসিনো"তে রয়েছেন খবর পেয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। ঠিক করলুম তাঁর সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়া করব। এখানে এসে মিস্ নীহারবালা রায় নামে পরিচয় দিয়ে এই তলায় একটা ঘর ভাড়া করলুম। দিনে

অসুখের অজুহাতে ঘর থেকে বেরোতুম না, পাছে আমায় দেখে ফেলেন। কাল রাত্রে প্রায় দেড়টার সময় ওঁর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি—খোলা আছে। ভেতরে ঢুকে দেখলুম নেশায় চুর হয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা শুদ্ধ টের পান নি। ঘৃণায় বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল। নাড়া দিতে তিনি চোখ খুলে আমাকে দেখে চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসীভারটা তুলে লাইন চাইলেন। আমি হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে রেখে দিয়ে বললুম—"তুমি আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছ। আমি আজ সমাজের যে স্তরে নেমে গেছি তার থেকে ফেরা অসম্ভব।" তিনি রেগে কতকগুলো অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে দেরাজ থেকে রিভলভার বার ক'রে আমার দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। আমি কাড়তে গেলুম। ঝুটোপটির মধ্যে তাঁর হাতের রিভলভারটা কি রকম ক'রে ছুঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন। পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, নিশ্বাস পড়ছে না। তিনি মারা গেছেন।

গিরিজা। আপনি ঠিক বলছেন যে তিনি আপনার পায়ের কাছে পড়েছিলেন ?

নীহার। হ্যাঁ। এই জায়গাটায়, অর্দ্ধেকটা টেবিলের তলায়। ঝুঁকে দেখলুম তিনি—

গিরিজা। মৃত।

নীহার। হ্যাঁ।

গিরিজা। সকলেই বলছেন যে ঝুটোপটি করতে করতে হঠাৎ মারা গেলেন। কিন্তু আমরা এসে তাঁকে চেয়ারে বসা দেখলুম।

নীহার। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হবে ?

গিরিজা। এই ঘটনায় অনেক অসম্ভব জিনিষও সম্ভব হয়ে পড়ছে। (ত্রিদিবেন্দ্রের প্রতি) মিস্ রায় যে কলকাতায় আছেন তা আপনি জানতেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। না—মানে—আমি—

গিরিজা। (নীহারের প্রতি) অথচ আপনি বলছেন যে আপনাকে বাঁচাবার জন্য উনি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে দোষ নিচ্ছেন।

নীহার। ঠিক বুঝতে পারছি না। হয় ত—

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, ওর কোন কথা—

গিরিজা। (নীহারের প্রতি) আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আপনি যখন ঢুকতে যাচ্ছেন সেই সময় দেখলেন আপনার কাকা কুমারবাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আপনি ঘরে ঢুকে দেখলেন যে কুমারবাহাদুরকে গুলী ক'রে মারা হয়েছে। তখনই বুঝতে পারলেন এ আপনার কাকার কাজ। ভেবেছিলেন হয় ত তিনি ধরা পড়বেন না। কিন্তু ওঁকে আমরা ধরে ফেলেছি দেখে আপনি ওঁকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কতকগুলো—

ত্রিদিবেন্দ্র। (আগ্রহ সহকারে) ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মনে হয়।

নীহার। না, না, তা নয়। আমি যা বলেছি সব সত্য।

গিরিজা। প্রমাণ কি ?

নীহার। কাল রাত্রে ঝুটো-পাটির সময় তার ন'খে আমার কাঁধের খানিকটা খিমচে গিছল। এই দেখুন।

কাঁধের কাছ থেকে সাড়ীটা সরালেন। খিমচে যাওয়ার দাগ স্পষ্ট দেখা গেল

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) কুমারবাহাদুরের ডান হাতের ন'খে রক্ত ও মাংস লেগেছিল।

নীহার। এবার বিশ্বাস হ'ল ?

কার্ত্তিক। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

গিরিজা। এইবার ওদেরও ডাকি।

গিরিজা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ত্রিদিবেন্দ্র তাড়াতাড়ি মাঝের দরজার কাছে গেলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। না, না, ওদের আর ডাকবেন না।

নীহার। কাদের ? ও ঘরে কে আছেন ?

গিরিজা। আরও দুজন লোক যারা স্বীকার করেছে যে তারাই কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছে।

গিরিজা দরজার কাছে গেলেন

নীহার। কি আশ্চর্য্য !

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, আমার একটা অনুরোধ—

গিরিজা। কি ?

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তীকে এখান থেকে নিয়ে যাই। ওকে আর এদের সঙ্গে জড়াবেন না।

গিরিজা। বিলক্ষণ জড়িয়ে পড়েছেন। আর এখন উপায় নেই। সরুন।

ত্রিদিবেন্দ্র সরে এলেন। গিরিজা মাঝের দরজাটা খুললেন

গিরিজা। আপনারাও এ ঘরে আসুন।

এ ঘরে প্রথমে অনাথ ও পরে বনমালী ঢুকলেন। ত্রিদিবেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বনমালী ও বাসন্তী উভয়ে উভয়কে দেখে চমকে উঠলেন

বনমালী। বাসন্তী!

নীহার। অ্যাঁ—তুমি!

নীহার অজ্ঞান হয়ে মেজেয় পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বনমালী ছুটে গিয়ে ধরলেন। ত্রিদিবেন্দ্রও এগিয়ে গেলেন। দু'জনে মিলে নীহারকে আস্তে আস্তে কৌচে শুইয়ে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তী, বাসন্তী—

গিরিজা। (ব্যস্ত হয়ে) কি হ'ল?

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তী অজ্ঞান হয়ে গেছে। গিরিজাবাবু, আমি আগেই বলেছিলুম—

গিরিজা। আমি কি ক'রে জানব যে এমন হবে?

বনমালী। (হঠাৎ চীৎকার ক'রে) বাসন্তী—বাসন্তী—কাকাবাবু, বাসন্তী আর নেই।

ত্রিদিবেন্দ্র। নেই! কি বলছ বনমালী। (নাড়ী দেখে) তাই তো। গিরিজাবাবু, আমার ভাইঝি মারা গেছে।

গিরিজা। মারা গেছে! হার্ট ফেল করেছে?

ত্রিদিবেন্দ্র। তাই মনে হচ্ছে। শকটা বড্ড বেশী লেগেছে, সামলাতে পারে নি। নিজের মনের দ্বন্দ্বেই ও মৃতপ্রায় হয়েছিল। মরেছে, ভালই হয়েছে। সমাজে তো ওর স্থান ছিল না। ও যে মেয়ে। সংসারের সমুদ্র-মন্থনে পুরুষ নিঃশেষে অমৃত পান ক'রে মেয়েদের জন্য শুধু গরল রেখে দেয়।

গিরিজা। (ফোনে) লাইন প্লীজ।

ত্রিদিবেন্দ্র। কাকে ফোন করছেন?

গিরিজা। ডাক্তারকে। (ফোনে) ইজ দ্যাট এক্সচেঞ্জ? গিভ্ মী পি-কে-০০৫. ইয়েস প্লীজ।

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু তিনি এসে এইভাবে বাসন্তীকে দেখলে—

গিরিজা। মাই ডিউটি। (ফোনে) হ্যালো—কনেক্ট মী টু ডক্টর দে।

ত্রিদিবেন্দ্র। জানাজানি হয়ে পড়বে—

গিরিজা। নিরুপায়। (ফোনে) কে? ডক্টর দে? হ্যাঁ, আমি গিরিজা। এক্ষুণি হোটেল "ক্যাসিনো"তে আসুন। একজন মহিলা মারা গেছেন। বোধ হয় হার্ট ফেল্ ক'রে। হ্যাঁ—এসে আমার নাম করলেই নিয়ে আসবে। আচ্ছা—যত তাড়াতাড়ি পারেন। ধন্যবাদ। ফোন রেখে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। শেষে মেয়েটা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়্ল।

বাসন্তীর বুকে মাথা রেখে বনমালী কাঁদছেন

অনাথ। দাদাবাবু, কাঁদবেন না। উঠুন।

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে পরিষ্কার ক'রে বলি। আপনাদের করুণা কিংবা দয়া চাইছি না। তবুও বলছি, না হ'লে দম ফেটে মারা যাব। আপনি ব্যাপারটা বোধ হয় কিছুই ধরতে পারছেন না।

গিরিজা। না। সমস্তই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আপনার কাহিনী জবানবন্দী-হিসেবে লিখে নিতে পারি?

ত্রিদিবেন্দ্র। নিশ্চয়ই। বাসন্তী যখন মারাই গেল, আর আমাদের বলতে আপত্তি নেই। তবে একটা অনুরোধ, ওর নামটা না জড়িয়ে যদি তদন্ত করতে পারেন—

গিরিজা। ঘটনাটা সমস্ত না শুনলে বলতে পারছি না। বলুন। কার্ত্তিক, লিখে নাও।

ত্রিদিবেন্দ্র বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। বনমালীর সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে হবে ঠিক ছিল। হঠাৎ কুমারবাহাদুর বাসন্তীকে নিয়ে সরে পড়ে। অনাথ এক সময় চুরী ডাকাতি করে সংসার চালাতো। জেলেও গিছল। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরে দেখলে—তার বাপ মা সব মরে গেছে। সেই সময় বনমালীর কাছে সে চাকরি নেয়। অনাথের একবার অসুখের সময় বনমালী প্রাণপাত ক'রে ওকে বাঁচায়। সেই থেকে বনমালীকে অনাথ দেবতার মত ভক্তি করে। বাসন্তী চলে যেতে বনমালীর মনে খুব ঘা লেগেছিল। দাদা মারা যাবার পর আমরা কুমারবাহাদুর আর বাসন্তীর খোঁজ ক'রে বেড়াই। শেষে কলকাতায় হোটেল "ক্যাসিনো"তে ওর সন্ধান পেয়ে আমরাও কলকাতায় এসে হাজির হই। ঠিক করলুম ওকে খুন করতে হবে। কে করবে? একটা দাগ-কাটা আর দু'টো শাদা কাগজ নিয়ে লটারী করা

হ'ল। যে দাগ-কাটা কাগজ তুলবে সে-ই খুন করবে, কিন্তু কে তুলেছে তা কাউকে বলতে পারবে না। নিখুঁত খুন প্রায় অসম্ভব বলে আমি অনাথকে এমন সব ক্লু রেখে দিতে বলেছিলুম যাতে আমাদের তিনজনের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। ওদের জবানবন্দীও আমি মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলুম। সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সে আমাদের কাউকেই দোষী প্রমাণ করা যাবে না, কারণ প্রত্যেকের জবানবন্দীতে গরমিল আছে। কিন্তু—

গিরিজা। কিন্তু সব প্ল্যান উল্টে গেল। অনাথ দাগ-কাটা কাগজ তুলেছিল, কিন্তু এসে দেখলে তার আগে কেউ খুন ক'রে গেছে।

অনাথ। (চমকে) আপনি কি ক'রে জানলেন ?

গিরিজা। ঐ যে মাইক্রোফোন ফিট করা রয়েছে। ও ঘর থেকে সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। জবানবন্দীতে অনেক গলদ রয়েছে, সেটা আগেই লক্ষ্য করেছি। কোন সলিউশন পাচ্ছিলুম না বলেই আপনাদের একত্র করে আমরা চলে গিছলুম—

বনমালী। এখন পেয়েছেন ?

গিরিজা। হ্যাঁ।

বনমালী। কে ?

গিরিজা। উনি। বাসন্তীকে দেখালেন

ত্রিদিবেন্দ্র। কোন ভুল হচ্ছে না তো ?

গিরিজা। না। কেবলমাত্র ওঁর জবানবন্দীই সমস্ত ক্লুগুলোর সঙ্গে মিলেছে। আপনাদের স্বীকারোক্তি আর ক্লু সাজানোর মধ্যে কনটিনিউইটি নেই।

বনমালী। গিরিজাবাবু, সবই তো শুনলেন। বলুন, বাসন্তীর নাম বাঁচিয়ে রিপোর্ট দিতে পারবেন কি-না ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমাদের ফীলিংস্ বুঝতে পারছেন তো।

গিরিজা। পারছি। কার্ত্তিক, জেল ভ্যান এসেছে কি-না দেখ। কার্ত্তিকের প্রস্থান

আপনাদের চালান আমায় করতেই হবে। খুন না করলেও চেষ্টা যে করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বরোপিত ক্লু এবং জবানবন্দীতে আপনারা দোষী। তবে আপনাদের প্ল্যান অনুসারে হয় তো কনভিকৃশন হবে না।

বনমালী। কিন্তু বাসন্তীর—

কার্ত্তিক ও ডাক্তার দে'র প্রবেশ

কার্ত্তিক। জেল ভ্যান এসেছে।

গিরিজা। বেশ। ডাক্তার দে, এঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। ডাক্তার দে বাসন্তীকে পরীক্ষা করলেন

ডাক্তার। ডেথ্ বাই হার্ট ফেলিওর। অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে। থানায় লাশ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

গিরিজা। উনি এই তলায় একটা ঘরে থাকতেন। ওঁর নাম মিস্ নীহার রায়। হার্টটা খারাপই ছিল। একটু আগে অজ্ঞান হয়ে গিছলেন। আমার কাজ সকলকে জেরা করা। হঠাৎ কথা কইতে কইতে পড়ে যান। তারপর আমাদের সন্দেহ হ'তে আপনাকে খবর দিই।

ডাক্তার। ডেড্ বডি মর্গে পাঠিয়ে দিন, ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তার দে'র প্রস্থান

ত্রিদিবেন্দ্র। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব।

গিরিজা। জানাতে হবে না।

নীহারের জবানবন্দীর কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন

ত্রিদিবেন্দ্র। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এঁদের নিয়ে যাও।

কার্ত্তিক। আপনার অ্যাভারেজটা—

গিরিজা। চুলোয় যাক্।

গিরিজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(ফোনে) লাইন প্লীজ। ইজ দ্যাট এক্সচেঞ্জ। গিভ্ মী পি, কে, 005. ইয়েস। হ্যালো—থানা ? আমি গিরিজা। হোটেল "ক্যাসিনো"তে একটা অ্যাম্বুলেন্স কার পাঠিয়ে দাও। ডেড্ বডি নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ—এখানকার কাজ এক রকম মিটেছে। থ্যাঙ্ক ইউ। রিসীভারটা রাখলেন

হন্তদন্ত হয়ে দামোদরবাবুর প্রবেশ

দামোদর। আবার এক ফ্যাঁসাদ হয়েছে। সুশীলা খাবার নিয়ে গিয়ে ফিরে এল, মিস্ রায়কে পাওয়া যাচ্ছে না।

কৌচটা গিরিজার পিছনে আড়ালে ছিল। বাসন্তীর মৃতদেহ দামোদর দেখতে পান নি। গিরিজা সরে এসে দেখালেন

গিরিজা। ঐ যে মিস্ রায়।

দামোদর। অ্যাঁ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন ?

গিরিজা। আর জ্ঞান হবে না। মারা গেছেন।

দামোদর। কি ভয়ানক! না, আর টিকতে দিলে না। এরা পাঁচজনে মিলে হোটেলটা উঠিয়ে দিলে দেখছি। বেগে প্রস্থান

গিরিজা বাসন্তীর মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা ঢেকে দিলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ল

বনফুল

৪

অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রাজমহলের ভবেশবাবু ছাড়া পাইয়াছেন, মুকুজ্যে মশায়ের এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। কোন একটা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে না পারিলে তিনি কেমন যেন স্বস্তি পান না। একটা কিছু জুটিয়াও যায়। মুকুজ্যে মশায় হরেরামবাবুর নিকটে গিয়াছিলেন। মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হরেরামবাবু পোষ্টমাস্টারি করেন। নিতান্ত নিরীহ লোক, কাহারও সাতে পাচে থাকেন না। থাকিবার অবসরই নাই। সকাল হইতে সুরু করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত আপিসের কাজকর্ম্ম শেষ করিতেই কাটিয়া যায়। নিড়বিড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভালোমানুষ। মুকুজ্যে মশাই কিন্তু হরেরামবাবুকে বড় ভালবাসেন এবং বছরে অন্তত একবার আসিয়া হরেরামবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। এবারে আসিয়া কিন্তু কিছু অধিকদিন থাকিতে হইল। পাকেচক্রে অবস্থা একটু জটিল হইয়া উঠিল।

হরেরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোম্বল তাঁহাকে মুস্কিলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভোম্বলের বয়স দশ এগারো বছর মাত্র। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঘ-বকরি খেলায় সে মুকুজ্যে মশাইকে বারবার তিনবার হারাইয়া দিয়াছে। মুকুজ্যে মশাই বাজি রাখিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মুকুজ্যে মশাই বাজি রাখিয়াছিলেন যে ভোম্বল যদি তাঁহাকে তিনবার উপর্য্যুপরি হারাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে ভোম্বল যাহা খাইতে চাহিবে মুকুজ্যে মশাই তাহাই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবেন। বিজেতা ভোম্বল মাংস খাইতে চাহিয়াছে। মুরারিপুর যদি শহর হইত অথবা হরেরামবাবু যদি একটু কম নিষ্ঠাবান হইতেন তাহা হইলে মুকুজ্যে মশায়ের পক্ষে এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা অসম্ভব হইত না। মুরারিপুরে কশাইয়ের দোকান নাই, হরেরামবাবু বৃথা মাংস পছন্দ করেন না। মুকুজ্যে মশাই অনুরোধ করিলে হরেরামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো রাজি হইতেন; কিন্তু কাহারও প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত করা মুকুজ্যে মশায়ের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা লইয়া সুখে আছে—থাকুক, ইহাই তাঁহার মত। সুতরাং হরেরামবাবুকে এ অনুরোধ তিনি করিলেন না। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যাহা করিলেন তাহা প্রিন্সিপ্‌ল্ সঙ্গত হইলেও হরেরামবাবুর পক্ষে আরও সাংঘাতিক হইল। হরেরামবাবুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "হরেরাম আসচে অমাবস্যাতে এসো কালীপুজো করা যাক্—"

মণিঅর্ডার-রেজেষ্ট্রি-ভিপি-ইনশিওর-বিক্ষুব্ধ হরেরাম প্রথমে কথাটা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিলেন না।

"কি বলছেন?"

"আগামী অমাবস্যাতে এসো কালীপুজো করা যাক!"

"কালীপুজো!"

হরেরাম আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি সমস্তদিন আপিস লইয়া ব্যস্ত থাকেন; ভোম্বলের সহিত মুকুজ্যে মশায়ের বাজির কোন খবরই তিনি রাখেন না। বস্তুত ভোম্বল এবং মুকুজ্যে মশাই ছাড়া আর কেহই এ খবর জানে না। বিস্মিতনেত্রে হরেরাম চাহিয়া রহিলেন।

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন—"শাক্তবংশের ছেলে তুমি, কালীপুজো করবে তাতে হয়েছে কি। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। একটি কালীমূর্ত্তি আর একটি ভাল দেখে কালো পাঁঠা জোগাড় করতে হবে।"

মুকুজ্যে মশায়ের সহিত হরেরামের অনেকদিনের পরিচয়। তিনি মুকুজ্যে মশায়ের মুখভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে আপত্তি করা বৃথা। মুকুজ্যে যাহা ধরেন তাহা না করিয়া ছাড়েন না। তাছাড়া দেবীপূজায় আপত্তি তুলিতে তাঁহার ধর্ম্মভীরু মন ভীত হইল।

বলিলেন, "অমাবস্যার আর কদিন বাকী—"

"দশ দিন"

"এর মধ্যে কি সব হয়ে উঠবে?"

"এর মধ্যে ছোটখাটো মূর্ত্তি একটা হবে না? খোঁজ কর, গ্রামে নিশ্চয় গড়তে পারে কেউ—"

মাথা চুলকাইয়া হরেরাম বলিলেন—"দেখি, বংশীকে বলে'। আমি কিছুই জানি না—"

বংশী পিওন।

বংশীর সহায়তায় সাতআটদিনের মধ্যে ছোট একটি প্রতিমা এবং নধর একটি পাঁঠা জোগাড় হইয়া গেল। ভোম্বল উল্লসিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠাবান পিতার সন্তান হইলে কি হয়, মাংসের প্রতি তাহার খুব লোভ। মাংস খাইতে পায় না বলিয়া লোভটা আরও বেশী। তাহার ভারী আনন্দ হইল। পিতামাতার জ্ঞাতসারে সে অবশ্য বেশী হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহস করিল না। বাঘ-বকরি খেলার তুচ্ছ বাজির জন্য মুকুজ্যে মশাই এতকাণ্ড করিতেছেন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হরেরামবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইবেন। নিরীহ হরেরাম চটিয়া গেলে মারধোর অথবা হাঁকডাক করেন না, নীরবে উপবাস করিতে থাকেন। সুতরাং সহসা কেহ তাঁহাকে চটাইতে চাহে না। মুকুজ্যে মশাই বাঘ-বকরি প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিতই করিলেন না। ভোম্বলও ভালমানুষের মতো চুপ করিয়া রহিল।

বংশীর আনুকূল্যে মুকুজ্যে মশাই কালীপূজার আয়োজন যখন শেষ করিয়া আনিয়াছেন এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকম একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এক চিঠি আসিয়া হাজির! তাহার সারমর্ম্ম—মুরারিপুরের কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী অভিযোগ করিয়াছেন যে মুরারিপুর পোস্টাফিসে নাকি কালীপূজা করা হইতেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহা হইলে এতদ্বারা হরেরামবাবুকে পোস্টাফিসে কালীপূজা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কোন গভর্ণমেণ্ট আপিসে এরূপ পূজাদি করা নিয়মবিরুদ্ধ।

ভোম্বল অত্যন্ত দমিয়া গেল। সঙ্কল্পিত এবং আয়োজিত দেবীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরামবাবুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। দমিলেন না মুকুজ্যে মশাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওর জন্তে আর ভাবনা কি, ওই সামনের মাঠটায় একটা চালা তুলে ফেলে সেইখানেই পূজো করা যাবে। পোস্টাফিসে পূজো নাই বা করলাম আমরা। কি বল ভোম্বল—"

ভোম্বল ভালমানুষের মতো একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিকটে উপবিষ্ট বংশীকে সম্বোধন করিয়া মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "তুমি দু'চারটে জনমজুর ডাকাও, বুঝলে বংশী—একটা ছোটখাটো চালা তুলতে আর কতক্ষণ যাবে। গ্রীষ্মকালে মাঠের মাঝখানে বরং ভালই হবে। ও জমিটা তো রামকিষুণের—সে বোধহয় আপত্তি করবে না। তাকেও তুমি একবার জিগ্যেস করে এসো—"

বংশী রামকিষুণের অনুমতি লইবার জন্য চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে রামকিষুণের আপত্তি তো নাই-ই—সে বরং খুশীই হইয়াছে। সাধুবাবা ওখানে কালীমায়ির পূজা করিবেন ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আরও যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় সে করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুজ্যে মশাই বংশীকে চালা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং খড় বাঁশ প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পূজার যাবতীয় খরচ মুকুজ্যে মশাই-ই বহন করিতেছেন, হরেরামের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি হরেরামের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে রাজি হন নাই।

আয়োজিত কালীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরাম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এখন কর্ত্তৃপক্ষের অমতে কালীপূজা করিতে আবার তিনি মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। যদিও পোস্টাফিসে করা হইতেছে না, একেবারে পোস্টাফিসের সীমানার বাহিরেই হইবে; তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের অমতেই তো হইবে! চাকরির যা বাজার, কোথা হইতে কি হইয়া যায় কে বলিতে পারে। অথচ নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান হইয়া আয়োজিত পূজা না করাটাও—! একদিকে মা কালী অন্যদিকে পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, নিরীহ নিষ্ঠাবান হরেরাম মর্ম্মান্তিক দোটানায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুকুজ্যে মশাই মা কালীর পক্ষে, নিরুপায় হরেরামকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

মুকুজ্যে মশাই মহা উৎসাহে জনমজুর লইয়া রামকিষুণের মাঠে চালাঘর তুলিতে লাগিয়া গেলেন। ভোম্বল মুকুজ্যে-মশায়ের নিকট হইতে ফর্দ্দ ও টাকা লইয়া ভাল ঘি গরম-মশলা প্রভৃতির সন্ধানে বাজারের নানা দোকানে ঘুরিতে

লাগিল। মুকুজ্যে মশাই এতরকম মশলার ফিরিস্তি দিলেন যে মুরারিপুরে সবগুলি মেলাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। সির্কা এবং জাফরাণ এ দুইটি দ্রব্য তো কোথাও মিলিল না।

বেলা তিনটা নাগাদ চালা খাড়া হইয়া গেল। চালার ব্যাপার শেষ করিয়া মুকুজ্যে মশাই মাংসের ব্যাপারে মন দিলেন। মুকুজ্যে মশাই ঠিক করিয়াছেন—রাত্রে পূজা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংসটা রাঁধিয়া ফেলিবেন। তিনি নিজেই রাঁধিবেন। ভোম্বল এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী গোল গাল করিয়া নৈনিতাল আলু ছাড়াইতেছে। আলু ছাড়ানো হইয়া গেলে আলুগুলির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ভাজা মশলা পুরিতে হইবে। মুকুজ্যে মশাই নানারকম মশলা ভাজিয়া গুঁড়া করাইতেছেন। অনেক কষ্টে জিওলপুর গ্রামের দৌলতরাম মাড়োয়ারির নিকট জাফরাণ পাওয়া গিয়াছে। সির্কা পাওয়া যায় নাই। মুকুজ্যে মশাই টক দই দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কালীপূজার আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গো-শকটে আরোহণ করিয়া স্বয়ং পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় হাজির হইলেন। তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্টেশন হইতে মুরারিপুরে আসিতে হইলে গো-শকট ছাড়া অন্য কোন যান নাই, সুতরাং মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে গো-শকটেই আসিতে হইয়াছে। প্রকাশ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বলিলেন—তিনি মুরারিপুর পোস্টাফিস ভিজিট করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলমান সেই হেতু সকলে অনুমান করিতে লাগিল যে তাঁহার কালীপূজা-সম্পর্কিত আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। চাকুরিজীবী নিরীহ হরেরাম বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। মুকুজ্যে মশাই ছিদ্রিত আলুগুলিতে মশলা পুরিতে পুরিতে একটু হাসিলেন এবং হরেরামকে বলিলেন, "তুমি তোমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সামলাও গিয়ে, এখানে আসবার দরকারই নেই তোমার। আমরা সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি—"

হরেরাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামলাইতে লাগিলেন। মুকুজ্যে মশাই ভোম্বলদের মার্চেণ্ট অব্ ভেনিসের গল্প বলিতে বলিতে মাংস রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কালীপ্রতিমা আসিয়া চালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন, গ্রামের পুরোহিত মহাশয় পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি থমথম করিতেছে। চালাঘরের পাশেই একটি তোলা উনুনে মুকুজ্যে-মশাই মাংস রান্না করিতেছেন, সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। নিকটেই ভোম্বল ও তাহার তিন-চারজন সঙ্গী গুটি সুটি হইয়া বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয়ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। জমির মালিক রামকিষুণ ও তাহার সম্বন্ধী খুবলালও সোৎসাহে জাগিয়া বসিয়া আছে। যদিও রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাহারও চোখে ঘুম নাই। মুকুজ্যে মশাই খুব জমাইয়া একটি ভূতের গল্প সুরু করিয়াছেন।

আগামী কল্য বেলা দশটার আগে ট্রেণ নাই। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে পোস্টাফিসেই রাত্রিবাস করিতে হইতেছে। তিনি কালীপূজা সম্পর্কে হরেরামবাবুর কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া আপিসের কাগজপত্র নাকি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ভোম্বল মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি নাকি খাতাপত্র দেখিয়াছেন। পোস্টাফিসের বাহিরের ঘরটাতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলভী সাহেব তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিপাটিরূপে আহার করাইয়াছেন। বংশী বলিল—এই উপলক্ষে মৌলভীগৃহে মুর্গিও নাকি নিহত হইয়াছে। এখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় পোস্টাফিসের বাহিরের ঘরটাতে নিদ্রিত।......মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ভূতের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—এমন সময় পোস্টাফিসের বাহিরের ঘর হইতে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

সাপ—সাপ!

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "বংশী তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে একটু

এগিয়ে দেখ—"। শুধু বংশী নয় খুবলাল, রামকিষুণ, পুরোহিত, ভোম্বল সকলেই আগাইয়া গেল। সত্যই সাপ বাহির হইয়াছে। বিরাট এক কেউটে পোস্টাফিসের কোণে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। সাপটাকে মারা গেল না, কোথায় যে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল বোঝা গেল না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পোস্টাফিসে শুইতে চাহিলেন না। শশব্যস্ত হরেরাম তাঁহাকে কোথায় শুইতে দিবেন চিন্তায় পড়িলেন। রামাকিষুণ বলিল, মৌলভী সাহেবের বাড়িতে খবর পাঠানো হউক। তাহাই হইল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী সাহেবের বাহিরের ঘরটাতে শুইতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চোখ বুজিলেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় সর্পটা হিংস্র ফণা উদ্যত করিয়া তর্জ্জন করিতেছে। অতি প্রত্যুষেই তিনি মুরারিপুর ত্যাগ করিলেন। রামকিষুণ প্রথমে ব্যাপারটা ভালভাবে প্রণিধান করে নাই; কিন্তু পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভক্তিভরে মুকুজ্যে মশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সাধুবাবাটি তো সহজ লোক নহেন! এত বড় অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সে যেন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড কেউটে আসিয়া হাজির হইয়া গেল! ম্লেচ্ছ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পলাইতে পথ পাইল না! রামকিষুণের এতাদৃশ ভক্তিবাহুল্যে মুকুজ্যে মশাই কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—লোকটা মাদুলি অথবা মন্ত্র চাহিয়া না বসে! এই জাতীয় অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার জীবনে অনিবার্য্যভাবে জুটিয়া গিয়াছে, আর সংখ্যা বাড়াইতে তিনি চান না। রামকিষুণ মাদুলি কিম্বা মন্ত্র চাহিল না; কিন্তু অনুরোধ করিল আরও দুই চারিদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। তাহার কন্যার 'গাওনা' অর্থাৎ দ্বিরাগমন আর কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। সে সময় পর্য্যন্ত যদি সাধুবাবা 'কিরপা' করিয়া থাকিয়া যান, বড় ভাল হয়। তাঁহার আশীর্ব্বাদ নবদম্পতীর জীবনের অমূল্য সম্পদ হইবে।

মুকুজ্যে মশাই মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ভোম্বল মাংস খাইয়া খুশি হইয়াছে, কালীপূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন, হরেরামবাবুর কাজকর্ম্মে কোনরূপ গাফিলতি ধরা পড়ে নাই; সুতরাং নিশ্চিন্তচিত্তে মুকুজ্যে মশাই এবার যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন—হঠাৎ রামকিষুণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সরলপ্রকৃতির লোকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার বাধিতেছিল, অথচ মুরারিপুরে আর তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। একস্থানে বেশী দিন থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। হয় তো শেষ পর্য্যন্ত তিনি রামকিষুণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিনই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। জরুরি পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রামকিষুণও আর আপত্তি করিল না। পত্রখানি হাসির। হাসিকে তিনি মুরারিপুরের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধারণত তিনি কাহাকেও ঠিকানা দিয়া আসিতে চান না। কিন্তু হাসি নূতন লিখিতে শিখিয়াছে, মুকুজ্যে মশাইকে চিঠি লিখিবে বলিয়া জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে ঠিকানা আদায় করিয়া লইয়াছিল। হাসির চিঠি পাইয়া মুকুজ্যে মশাই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হাসি লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বড় বিপদে পড়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। ঠাকুরপো তার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি বলে একদিন সন্ধ্যের সময় চলে যায়। সেই থেকে ঠাকুরপো আর ফেরে নি। এখন শুনছি সে নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তার কাছে বোমা আর রিভলভার পাওয়া গেছে। ঠাকুরপো এখন হাজতে। আজ শুনছি ওঁরও নাকি চাকরি থাকবে না। উনি যখন মজঃফরপুর গিয়েছিলেন তখন ওঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে মিস্টার ঘোষ বলে কে এক মুখপোড়া নাকি কাজ করে—চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। আমার চিঠির ভেতর সে কি দেখতে পেয়েছে জানি না, কিন্তু তা নিয়ে নাকি ওঁর চাকরি যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি শিগগির চলে আসুন। আমি বাবাকেও চিঠি লিখলুম। ইতি—হাসি

পুনশ্চ।

দেখেছেন আমার মাথায় একেবারে ঠিক নেই।

তাড়াতাড়িতে আপনাকে প্রণাম দিতেই ভুলে গেছি। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি—হাসি

মুকুজ্যে মশাই সেইদিনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

নীরব গভীর রাত্রি।

মরণোন্মুখ যতীন হাজরার শয়ন শিয়রে শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের এককোণে টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতেছে। আপেল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি দুই চারিটি ফলও টেবিলে সাজানো আছে। মিষ্টিদিদি এগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন কিন্তু যতীনবাবু একটিও স্পর্শ করেন নাই। যতীনবাবু লোকটি অদ্ভুত-প্রকৃতির। আর কিছু নয়, অদ্ভুত রকম নীরব। শঙ্করের সহিত এ পর্য্যন্ত একটিও কথা হয় নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, অতিশয় ক্লান্তিব্যঞ্জক কোটরগত চক্ষু দুইটি বুজিয়া সর্ব্বক্ষণই চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন। নীরবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কাছে এমন আত্মসমর্পণ শঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। শঙ্কর যতীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্য করে তাঁহার গলার দুই পাশের শিরা দুইটা অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সন্ধ্যার পর কাসিটা বাড়িয়া ওঠে। প্রয়োজন হইলে নিজেই উঠিয়া বাথরুমে যান, একটি বালক-ভৃত্য খাবার আনিয়া দুইবেলা তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়; প্রকাশবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া আসেন, প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরেই অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা যতীনবাবু বলেন, প্রকাশবাবু চলিয়া গেলে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। শঙ্কর যে দিবারাত্রি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে তাহা তিনি মোটে লক্ষ্যই করিতে চান না। শঙ্কর পাড়ার একটা শস্তা হিন্দু হোটেলে আহারাদি সমাধা করিয়া আসে (নিজের গরম ওভার-কোটটা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে) এবং নির্ব্বাক হইয়া এই ক্ষয়া রোগীর মরণ শিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকে।

হয়তো থাকিত না, কিন্তু চুনচুনের জন্য থাকিতে হয়। সকলের বারণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রে চুনচুন লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে আসে। গভীর রাত্রে শঙ্কর কপাট খুলিয়া দেয়, চুনচুন চোরের মত আসিয়া প্রবেশ করে। চুনচুন প্রবেশ করিলে শঙ্কর বাহিরে চলিয়া যায়। চুনচুন বেশীক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ থাকে শঙ্কর ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুন খুব রোগা, খুব কালো, কিন্তু চোখ দুটি তাহার সুন্দর। চোখ দুটি বড় নয় কিন্তু অপরূপ। চুনচুনের সমস্ত অন্তরের ছবি যেন ওই কালো চোখ দুটি। গভীর রাত্রে এই গোপন অভিসার শঙ্করের মনকে উতলা করিয়া তোলে। প্রেমাস্পদকে গোপনে বিবাহ করিয়া চুনচুন গোপনেই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হিতৈষিণী দিদি এবং দিদির বান্ধবীর দল চুনচুনকে কিছুতেই তাহার স্বামীর সংশ্রবে আসিতে দিবে না, এমন কি মৃত্যুকালেও নয়! ছোঁয়াচে রোগের ওজুহাতে এ যেন প্রতিশোধ লওয়া! আজ যদি মিসেস্ স্যানিয়ালের ওই রোগ হয়—চুনমুনকে কি তিনি কাছে যাইতে দিবেন না? কিন্তু এসব লইয়া দিদির সহিত তর্ক করিবার কল্পনা করাও চুনচুনের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় মার্জ্জিতরুচি মৃদুপ্রকৃতির মেয়ে। শঙ্করের মনে হয় অতিশয় নিগূঢ় প্রকৃতির। তাহা না হইলে গোপনে বিবাহ করিতে পারিত না, গভীর রাত্রে একা স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিত না। শঙ্করের মনে হয় চুনচুন সমাজের সহিত ইতরের মতো কলহ করিতে চায় না, কিন্তু নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চায়। প্রকাশ্যভাবে চলিবার যদি বাধা থাকে, বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সে অকারণে শক্তিক্ষয় করে না—গোপনতার আশ্রয় লয়। নিদ্রিত যতীনবাবুর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কর চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুনকে ঘিরিয়া তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক হইয়া না উঠিলে শঙ্কর এই নীরব মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মাথার শিয়রে এমনভাবে হয় তো দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারিত না। পাশের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। আর একটু পরেই চুনচুন আসিবে। দ্বারে মৃদু করাঘাতটির প্রত্যাশায় শঙ্কর সজাগ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল শঙ্করের খেয়াল ছিল না। সে টেবিলের একধারে বসিয়া 'অ্যানা ক্যারেনিনা' পড়িতে-

ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল যতীনবাবু একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল।

"শুনুন—"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁহার বিছানার কাছে উঠিয়া গেল। যতীনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার একটি উপকার করবেন দয়া করে—"

"কি বলুন—"

যতীন হাজরা কয়েক মুহূর্ত্ত শঙ্করের মুখের পানে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?"

"নিশ্চয়"

যতীনবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "দেখুন আমি বুঝতে পেরেছি আমি আর বাঁচব না। আমার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে আসছে—"

আবার চুপ করিলেন।

শঙ্কর নীরবে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যতীনবাবু বলিলেন, "মারা যাব সেজন্য দুঃখ নেই, আমার সবচেয়ে দুঃখ যে মরেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে আমার মৃত্যুর পরও অশান্তি ভোগ করার জন্য আমার মনটা বোধ হয় বেঁচে থাকবে—"

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

যতীনবাবু বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আপনি তাকে বলবেন যে অনুতাপে আমার বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ক'দিন খালি তার কথাই ভাবছি, আর কোন কিছু ভাববার শক্তিও নেই আমার—"

"আপনি কার কথা বলছেন?"

"আমার স্ত্রীর—"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, "চুনচুনের নয়, আমার প্রথম স্ত্রীর। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম; সে নিরপরাধ জেনেও তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ত্যাগ করে এসেছিলাম। সে এখনও বেঁচে আছে। আপনি একবার দয়া করে' যাবেন তার কাছে? তাকে বলবেন যে আমি—"

যতীনবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বলবেন আমার পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত করে জ্বলে পুড়ে অনুতাপ করতে করতে আমি মরেছি। আপনি কাল একবার দয়া করে যাবেন তার কাছে। গিয়ে বলবেন যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তারই কথা ভেবেছি, মনে মনে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছি—"

শঙ্কর বলিল, "চুনচুন, মানে মিসেস্ হাজরা কি একথা কিছুই জানেন না?"

"না। লুকিয়ে বিয়ে করেছি ওকে, সে অনেক ইতিহাস—বলবার এখন সময় নেই।"

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যায়, অতি সহজেই ভুলে যায়। আপনি ওকে যেন ওসব কথা বলবেন না, বৃথা কষ্ট পাবে। একি—একি—এখনি সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—আপনি—তার—"

সব শেষ হইয়া গেল।

প্রথম স্ত্রীর ঠিকানাটা আর শঙ্করকে বলা হইল না। নির্ব্বাক শঙ্কর পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

প্রথম দিন ভন্টু কথাটা পাড়িতে পারে নাই। ওইরূপ নিদারুণ সংবাদ শোনার পর টাকার কথা পাড়া সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে জিনিস্টা সহজ হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আজ না পাড়িয়া উপায় নাই। কাল রাত্রে করালীচরণ স্বয়ং না কি টাকার তাগাদায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে সে বাড়িতে ছিল না। বউদিদি বলিলেন যে সে বাড়িতে নাই' শুনিয়াও করালী নড়িতে চাহে নাই। ভন্টুর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে—ভন্টু যেন অতি অবশ্য অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। দ্রাবিড়ী লদকা-লদকির নেশায় চাম গ্যানচজ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে তাহাতে রিক্তহস্তে তাহার সহিত দেখা করিলে রক্তসিক্ত হইয়া ফিরিতে হইবে। সুতরাং অশোভন হইলেও নিবারণ-বাবুকে আজ না খজলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে! মুখবন্ধটা কি প্রকারে করা যায়। ভন্টু ভাবিতে ভাবিতে

অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কথাগুলি গুছাইয়া মনে মনে মহড়া দিয়া লইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঠিক কথাগুলি কিছুতেই মনে আসে না। কার্য্যক্ষেত্রে যথাসময়ে যাহোক করিয়া ব্যাপারটা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। হইলও তাই। ভনুটু গিয়া দেখিল নিবারণবাবু ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভনুটুকে দেখিলে পূর্ব্বে যেরূপ সোচ্ছ্বাসে সম্বর্দ্ধনা করিতেন এখন তাহার কিছুই করিলেন না। ক্লান্তকণ্ঠে কেবল বলিলেন—"আসুন"

ভনুটু উপবেশন করিল। ভনুটু কবি নয়—তবু তাহার মনে একটা উপমার উদয় হইল। লোকটা যেন নিবিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভনুটু বলিল, "কোন খবর টবর পেলেন ?"

"কিছু না। পুলিশে খবর দিয়েছি আমি—"

ভনুটু নীরব রহিল।

সহসা নিবারণবাবু উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "এর জন্যে যত টাকা লাগে খরচ করব আমি। ও ব্যাটাকে আমি দেখে নেব যেমন করে হোক—"

ভনুটু তথাপি নীরব।

"আসমিকে জানতেন তো, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মেয়ে সে; স্কাউণ্ড্রেলটা নিশ্চয়ই কোনরকম ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। বুঝছেন না আপনি—"

ভনুটু সুযোগ পাইল, হাসিয়া বলিল—"খুব বুঝছি। আসমির কতই বা বয়েস, দারজি হলেও বা কথা ছিল।"

"দারজিও ওসব কিছু বোঝে না, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম। এই রাস্কেলটা জুটেই না এই হাল হল !"

ভনুটু একটু হাসিয়া বলিল, "সে কি আর আমি জানি না! এতদিন আপনার বাড়িতে আসছি যাচ্ছি—আপনার মেয়েদের গলার স্বরটি পর্য্যন্ত শুনতে পাইনি কোনদিন—"

"ওই যে বললাম আপনাকে—আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম—"

নিবারণবাবুর গুষ্টির ধারা কি রকম তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভনুটু আসে নাই, সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। আসল কথাটা কোন ফাঁকে পাড়িবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নিবারণবাবু বলিলেন—"পুলিশের পাল্লায় পড়লে টিট্ হবেন বাছাধন—"

ভনুটু বলিল, "পুলিশের হাঙ্গামা করলে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়। কাগজে হয় তো এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, আপনাকে আবার দারজির বিয়ে দিতে হবে তো !"

"হলেই বা, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না বলতে চান ?"

ভনুটু নিবারণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিল, "আপনার মতো সরল ধর্ম্মভীরু লোক দুনিয়ায় খুব বেশী নেই নিবারণবাবু—"

নিবারণবাবু কোন উত্তর দিলেন না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। ভনুটুও আর কোন কথা বলিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল লোকটি অতিশয় ভালোমানুষ এবং ভালোমানুষি জিনিসটা নির্ব্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

সহসা নিবারণবাবু ভনুটুর দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দারজির জন্যে দিন না একটা পাত্র জুটিয়ে ভনুটুবাবু, মেয়েটা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়—ভারি কষ্ট হয় আমার। টাকা আমি খরচ করব। তিন হাজার নগদ, গয়না, দানপত্র—যথাসাধ্য দেব আমি। ভদ্রবংশের ছেলে দিন একটি জোগাড় করে, গরীব হলেও ক্ষতি নেই, ওদের ভরণপোষণের যাহোক একটা বন্দোবস্ত আমি করে যেতে পারব। আমার ওই মেয়েরা ছাড়া আর কে আছে বলুন! তাও তো আসমিটা—"

নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিদ্যুৎচমকের মতো ভনুটুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দুই এক মিনিট সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল এবং তাহার পর বলিল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা প্রস্তাব করি—"

"কি বলুন—"

"আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন ?"

নিবারণবাবু সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ফারিতচক্ষে ভনুটুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন, "আমার ওই কুচ্ছিত মেয়েটাকে নেবেন আপনি ?

ভনুটু বলিল, "দেখুন আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি আমার অবস্থা ভাল করেই

জানেন। দু'কুড়ি সাতের খেলা কোনক্রমে খেলে যাচ্ছি—তা-ও চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। যা মাইনে পাই তাতে কুলোয় না। দাদার চেঞ্জের খরচ, সংসারের খরচ—সব আমাকে ওই মাইনে থেকে চালাতে হয়। চারদিকে ধার হয়ে গেছে। আপনি যদি কিছু টাকাকড়ি দেন, ধারটারগুলো শোধ করে একটু ঝাড়া হাত পা হতে পারি। টাকার জন্যেই আমার বিয়ে করা। এক জায়গায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা ধার আছে, দু একদিনের মধ্যে দিতে না পারলে অপমানিত হতে হবে। আমি আপনার কাছেই টাকাটা চাইব ভাবছিলাম, আপনার এই অবস্থা দেখে কেবল চাইতে পারছিলাম না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হল—আপনি স্বজাতি, পালটি ঘর, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আপনারও কন্যাদায় উদ্ধার হয়, আমিও একটু ঝাড়া হাত পা হই। বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। চিঠিও আসছে নানা জায়গা থেকে—"

নিবারণবাবু বলিলেন, "আপনি দারজিকে দেখেছেন ভাল করে?"

"যা দেখেছি তাই যথেষ্ট—"

"আপনার বাবা রাজি হবেন তো?"

"চেষ্টা কোরব—"

নিবারণবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি চেক বহি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। "কত টাকা চাই বললেন আপনার?"

"সাড়ে পাঁচ শো"

নিবারণবাবু তৎক্ষণাৎ চেক লিখিয়া দিলেন।

"কথা তাহলে পাকা তো!"

"একদম পাকা—"

এই বলিয়া ভনুটু হেঁট হইয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইল। এবার আর নিবারণবাবু আপত্তি করিলেন না।

ক্রমশঃ

গৃহদীপ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে গৃহে গৃহে আজি এই
আঁধার সন্ধ্যায়,
বিশ্বভরা অন্ধকার যেমন তেমনি থাকে
নাহি ঘুচে তায়।
বিশ্বভরা অন্ধকারে দীপের জীবন সে ত
জোনাকির মত।
বিরাট বিশ্বের সনে সূর্য্যচন্দ্রমারি যোগ
তাহাই শাশ্বত।
শত শত নিভে যদি দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝাবাতে
কিবা আসে যায়?
নিভিছে জ্বলিছে কত কে রাখে হিসাব তার,
কে তাহা খতায়?
নিভে যদি কোন দীপ আলোর সম্বলটুকু
লুপ্ত তবে কার?
যে গৃহটি আলো করে হাহাকার উঠে তায়,
সে গৃহ আঁধার।
রাষ্ট্র বল' দেশ বল' সমাজ সংসার বল'
কারো মোরা নই,
কারো চিরদিনকার' আঁধার ঘুচাতে পারি
সে শকতি কই?
আমরা গৃহের রবি ক্ষীণপ্রাণ দীপ, তবু
গৃহ করি আলো,
বিনা বায়ে কম্পমান কখনো স্তিমিত হই
কখনো জোরালো।
গৃহই মোদের সব, প্রাণরসে করি তার
তিমির হরণ,
নিভি যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর
হয় না পূরণ।

খাদ্য ও পরিপাক সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীকালিদাস মিত্র

গত ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ (৮৩৫-৮৩৯ পৃঃ) প্রকাশিত "খাদ্য ও পরিপাক" প্রবন্ধের আলোচনা যখন লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই সামান্য ব্যাপারে আবার কালির আঁচড় টানার প্রয়োজন হবে। মূল প্রবন্ধে (খাদ্য ও পরিপাক—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি-টী-এম্ ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৪৬, ৬৯-৭৪ পৃঃ) কতকগুলি অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক উক্তি নজরে পড়ায় সেগুলির প্রতিবাদ করি। প্রতিবাদ করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে বর্ত্তমান কালে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে বাংলা ভাষায় সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ'এর মত সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকার পাঠকপাঠিকারা যাহাতে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। হয়ত মূল প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনা, যিনি খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চর্চ্চা করিতেছেন, এমন কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে মতামতের জন্য পাঠালে আলোচনার 'উত্তর' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, ৮৩৬-৮৩৯ পৃঃ) লেখার প্রয়োজন হোত না। বাংলা দেশে কোন কোন কেন্দ্রে এ সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে তাহার উল্লেখও আলোচনার মধ্যে ছিল।

যখন শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় অকাট্য (?) নজীর পুঁথিপত্র থেকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন তখন ব্যাপারটা জনহিতার্থে বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন। খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে এ ব্যাপারে 'বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার' হলে তার যথাযুক্ত প্রতিবাদ করাটা অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে পড়ে। একথা বোধহয় সকলে স্বীকার কর্ব্বেন যে নজীরগুলি বিজ্ঞানসম্মত হতে হলে এমন বৈজ্ঞানিকের লেখা থেকে হওয়া চাই যাঁর খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'উত্তরে' তিনজন গ্রন্থকর্ত্তার নাম উল্লেখ করেছেন। এবারে দেখা যাক্ তাঁহাদের খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কিরূপ।

(১) কর্ণেল চোপ্‌রা; ইনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ভেষজতত্ত্ববিদ্। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে ইঁহার মৌলিক গবেষণা প্রত্যেক ভারতবাসীর শ্লাঘার বিষয়। তাঁহার প্রণীত Therapeutics সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থে খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে পরিশিষ্ট হিসাবে।

(২) ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ব্রাইস; ইনি 'বিখ্যাত স্বাস্থ্য তত্ত্ববিদ্' কিনা জানিনা। তবে ইনি Ideal Health বলে একখানা পুস্তক (দাম আন্দাজ ৩৲০) প্রণয়ন করেছেন সম্প্রতি, তাছাড়া ইনি Dietatics, Modern theories of Diet সম্বন্ধে আরও ২।১খানা কেতাব লিখেছেন। তবে খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন বলে জানা নেই।

(৩) কুনুর পুষ্টি প্রয়োগশালার অধ্যক্ষ ডাক্তার এক্রয়েড। খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে এঁর মৌলিক গবেষণা আছে, কয়েকখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন এবং তজ্জন্য যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ডাঃ এক্রয়েড সম্পাদিত "হেল্‌থ বুলেটিন নং ২৩" একখানা উচ্চাঙ্গের নজীর—যদি না তাঁহার লেখার কদর্থ বা বিপরীত অর্থ করা হয়ে থাকে। হাঁ—এইবেলা একটা সামান্য প্রতিবাদ করে রাখি কলিকাতায় পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য। বইখানার জন্য ডাঃ ভট্টাচার্য্যের নির্দ্দেশমত চার আনা পয়সা খরচ কর্ত্তে হবে না, এ অমূল্য গ্রন্থখানি কেবলমাত্র দুই আনা দামে পাওয়া যাবে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ ভারত সরকারের বুক ডিপোতে। কয়েক মাস আগেও সেখান থেকে পাওয়া গেছে। আমার মত 'বৈজ্ঞানিক না হয়েও' (ডাঃ ভট্টাচার্য্যের ভাষায়) যাঁরা খাদ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ জানিতে চাহেন তাঁরা এই পুস্তিকা পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

এইবার বাদানুবাদের বিষয়ীভূত উক্তিগুলির আলোচনা করা যাউক, ডাঃ ভট্টাচার্য্যের লিখিত উত্তরের পর্য্যায়ানুক্রমে।

(১) উত্তর লেখক (৮৩৬ পৃঃ ২য় কঃ ও ৮৩৭ পৃঃ ১ম কঃ) মহাশয় প্রায় এক কলমব্যাপী বাক্য বিন্যাস দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে খাদ্যের কাজ 'শরীরের ক্ষয়পূরণ করা নহে, ক্ষয় নিবারণ করা এবং খাদ্যের সংজ্ঞার মধ্যে শরীর গঠনের উল্লেখ থাকিলে সে সংজ্ঞা নাকি দোষাত্মক হবে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে এরূপ 'ন্যায়ের' তর্কের অবসান কোনও দিন হবে না। তাছাড়া এ বাদানুবাদে মূলপ্রবন্ধ লেখক (ডাঃ ভট্টাচার্য্য) বা সমালোচক (এ রচনার দীন লেখক) যে কোনও পক্ষই জয়ী হোন না কেন, ফলে তাঁহার যুক্তিগত আত্মশ্লাঘা ছাড়া পাঠকপাঠিকাবর্গের খাদ্য নির্ব্বাচনে সহায়তা কর্ব্বে না। কাজেই আমার বক্তব্যের (৮৩৫ পৃঃ ২য় কঃ) বাহিরে আর কিছু বলিতে চাহিনা।

(২) লেখক মহাশয় তাঁহার ২নং পর্য্যায়ে (৮৩৭ পৃঃ ১ম কঃ হইতে ৮৩৮ পৃঃ ১ম কঃ) এক পৃষ্ঠাব্যাপী ওজঃস্বিনী ভাষায় যে দীর্ঘ উত্তরটী দিয়াছেন তাহা অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে মূলপ্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যে তিনটী উক্তি করিয়াছি (যথাক্রমে ক, খ এবং গ) তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমার উক্তিগুলি হচ্ছে (ক) 'সবচেয়ে সেরা প্রোটিন হচ্ছে মাংস—তা সে যে কোনও জন্তুরই হউক' এবং 'রীতিমত প্রোটিন বলতে মাছ মাংসগুলাকেই বুঝায়' এই উক্তি দুইটীর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। পৌষ্টিক হিসাবে দুধের প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ। (খ) 'নানা রকম জন্তুর মধ্যে মুরগীর মাংস ও ছাগলের মাংস সবচেয়ে ভাল' এরূপ উক্তির হেতু বোঝা দুষ্কর। কারণ এদেশে নানাবিধ মাংসের পৌষ্টিকতা (পুষ্টিকরতা?) সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না। 'ডাল, বরবটী, পেস্তা, বাদামের' মধ্যে প্রোটিনের অংশ কম এরূপ উক্তি দুষ্পাচ্য।' এইবার আমার উক্তিগুলির (মূলপ্রবন্ধের প্রতিবাদে) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখা যাউক—যথাযথ নজীর দিয়ে।

(ক) লেখক মহাশয় যখন নিজেকে ট্রপিকাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিয়াছেন তখন তাঁর পক্ষে জানাই সম্ভব যে ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুলের কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে প্রাচ্যের চিকিৎসকবৃন্দের (Far Eastern Association of Tropical medicine) এক বৈঠক হয়। সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সেই অধিবেশনে ভারতের বিখ্যাত খাদ্যতত্ববিদ্ জেনারেল স্যর রবার্ট ম্যাক্‌কারিসন্ একটী প্রবন্ধে ভারতের বিভিন্ন জাতির খাদ্যের পৌষ্টিকতা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার বিবরণ (Trans 7th Cong. F. E. A. T. M. (3) p. 322-23) * দেন। পরীক্ষা করা হয়েছিল জীব শরীরের উপর এবং ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 'শিখ' জাতির খাদ্য শরীরগঠনশীল গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি পাঠানের খাদ্যে মাংসাধিক্য থাকলেও শরীরগঠন হিসাবে তাহার স্থান দুগ্ধবহুল শিখ ভোজ্যের নিম্নে।

লীগ্ অফ্ নেশন্‌সের একটী স্বাস্থ্য বিভাগ (Health Section, League of Nations) আছে; তাহাতে সর্ব্বদেশের (অবশ্য বর্ত্তমান ব্যাপক যুদ্ধ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বের কথা বলা হচ্ছে) শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হয়ে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি (public health problems) সমাধানের জন্য আলোচনা করেন বা করিতেন। এই বিভাগ হইতে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (প্রথমে ত্রৈমাসিকী পরে দ্বিমাসিকী)। সেই পত্রিকার (Quart. Bull. Health, Organis. L. o. N. V. 3. p 458, 1936) একটি সংখ্যায় প্রায় ৩॥০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে প্রোটিন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনামূলক সমালোচনা (e.g. minimum protein content of diet which permits of growth, weight increment in gramme per gramme, biological value, protein retention etc.) দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে যে জান্তব প্রোটিনগুলির মধ্যে দুগ্ধের প্রোটিনের স্থান সুউচ্চে। এখানে ইংরেজিতে লিখিত ফরাসী বৈজ্ঞানিকপ্রবরের উক্তিটুকু তুলে দেবার লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারলুম না। "although they differ inter se the animal proteins (milk, egg, meat, viscera) display an unquestioned and marked superiority over all proteins of vegetable origin. Among the former, those of milk occupy a wholly privileged position and are utilised in high proportion by the growing organism."

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুবিখ্যাত পুষ্টিতত্ববিদ্ প্রোফেসর শরমন্ তাঁহার একখানি বহুল প্রচলিত পুস্তকে (Sherman H.C.—Chemistry of Food and Nutrition. Macmillan Co, Newyork 1937. p, 232.) বিভিন্ন প্রোটিনের তুলনামূলক সমালোচনায় বলেছেন যে দুগ্ধের প্রোটিন মাংসের প্রোটিনের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ (measurably superior) একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে। যাঁরা বিশদভাবে প্রমাণ প্রমেয় চাহেন তাঁরা এই পুস্তকখানিতে সব খবর পাবেন। বিশ্ববিখ্যাত পুষ্টিতত্ববিদ্ জন্‌হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাইটামিনের শ্রেণীবিভাগের আবিষ্কারক ঋষি ম্যাক্‌কলাম (Mc Collum E. V. et al. The newer knowledge of Nutrition. Macmillan & Co. 1939 p 130) তাঁহার পুস্তকে জান্তব প্রোটিনের তুলনামূলক গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন মাংসের চেয়ে দুগ্ধ ও ডিম্বের প্রোটিন শ্রেষ্ঠ। এই পুস্তকখানির পরিশিষ্টে অনেকগুলি জান্তব প্রোটিনের Biological value এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে তাহার খবরও দেওয়া আছে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। খাদ্যতত্ববিদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমানে মাংসকে নহে—বরঞ্চ ডিম্বের প্রোটিনকে দুগ্ধের উপরে স্থান দিতে চাহেন। এ বিষয়ে এখনও বিশেষভাবে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

এরপরেই মূল প্রবন্ধলেখক উপদেশ দিয়াছেন যে মাংসের প্রতি আমার এতটা বিদ্বেষ থাকা উচিত নহে। তিনি হয়ত বিশ্বাস কর্ব্বেন না যে আমি জ্ঞানপাপী অর্থাৎ দুগ্ধের চেয়ে মাংসটাই আমার ভোজ্য হিসাবে প্রিয়। কিন্তু আমি যাই হই না কেন, তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না; কারণ বৈজ্ঞানিক হিসাবে যাঁরা দুধের জয় ঘোষণা করেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভোজ্য হিসাবে চতুষ্পদ জীবের মধ্যে কোনওটাকেই বাদ দেন না, যাঁরা প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জাতির কল্যাণ কামনায় নিয়োগ কর্ত্তে চাহেন তাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা প্রেমটা প্রচারকার্য্যে স্থান পায় না এবং প্রয়োজন হলেই নিজের ভুলটা স্বীকার কর্ত্তে তাঁরা কার্পণ্য করেন না। শ্রদ্ধেয় লেখকমহাশয় দেশবাসীকে মাংস ভোজনে সচেতন করার ঝোঁকে 'ভারতে খাদ্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গবেষণাকারীর' উক্তির (৩৩৭ পৃঃ ২য় কঃ) উল্লেখ করিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা পড়ে মনে হয় যেন গ্রন্থকর্ত্তা (ডাঃ এ ক্রয়েড) animal protein অর্থে 'মাংসের' ইঙ্গিত করেছেন। মূল নজীর বা হেল্‌থ বুলেটিন খুলে দেখা যায় এ ক্রয়েড সাহেব ঐ নজীরোক্ত ভাষণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলেছেন যে দুগ্ধই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জান্তব প্রোটিন (animal protein)—তা সে দুগ্ধ গরুরই হোক বা ঐজাতীয় যে কোনও জন্তুরই হউক, ক্রমবর্দ্ধমান বালক বালিকাদের পক্ষে। একথা বলা বাহুল্য যে প্রোটিনের প্রধান কার্য্য হচ্ছে শরীর গঠন; কাজেই প্রোটিন সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনাকালীন কষ্টিপাথর হচ্ছে বর্দ্ধমান (বর্দ্ধনশীল?) জীব দেহ।

এইবার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত অভিমত ছাড়িয়া দিয়া দুইটি বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মতবাদের উল্লেখ কর্ব্ব। একটা হচ্ছে লীগ্ অফ্ নেশন্সের পুষ্টিতত্ব কমিটীর রিপোর্ট। তাঁরা বলেন (L. O. N. loc. cit-p 408) "milk should form a conspicious element of the diet at all ages," অর্থাৎ মানুষের জন্ম

* শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভট্টাচার্য্য ও পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের পক্ষে নজীরের সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথেষ্ট। পরবর্ত্তী নজীরগুলিও এইভাবে দেওয়া যাবে।

হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব বয়সেই দৈনিক খাদ্যাবলীর মধ্যে দুগ্ধের প্রাধান্য যেন সর্ব্বদাই ফুটে উঠে। দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় সেখানকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ে এক কমিটি গঠন করেন—সেই কমিটির রিপোর্ট (Ministry of Health. Advisory Committee on Nutrition. First Report H. M. stationery office. London)। রিপোর্টের ৩৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "A food which contains all the mateiials essential for growth and maintains of life in a form, ready for utilisation of the body is obivously of high value. Milk alone is the the food which nearly fulfils this condition" অর্থাৎ যে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শরীর গঠন ও জীবনধারণের উপযোগী সারীভূত পদার্থগুলি এমন ভাবে বিরাজমান যে তাহা খাইবামাত্রই জীব শরীরের কাজে লেগে যায় সেরূপ খাদ্যের মূল্য খুবই বেশী এবং দুগ্ধই একমাত্র ভোজ্য যাহাতে উপরিউক্ত গুণগুলি সম্যক্‌ভাবে এক সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে।

আমার আলোচনার মধ্যে কোথাও বলি নাই যে মাংস খাওয়া খারাপ; আমি কেবল এই কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে বাঙ্গালী জাতিকে ব্যাপকভাবে মাংসভুক্ করাইয়া যাহারা দেশের কল্যাণ কামনা করেন (৩৭ পৃঃ ১ম কঃ পুরোভাগে) তাঁদের বিপক্ষে বলার কিছু নেই; তবে তাঁরা যদি প্রচার করেন যে মাংসের প্রোটিন দুগ্ধের প্রোটিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে সে উক্তি বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দির (Imperial Council of Agricultural Research) যে যে প্রদেশে দুগ্ধের প্রচলন আছে সেখানে সেখানে গড়পড়তা জন পিছু দুধের বরাদ্দ কত তাহার এক নিকাশ দেন—এ বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে। রিপোর্ট পড়ে দেখা যায় যে তাহাতে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশের নাম আছে কিন্তু বাংলা দেশের নাম নাই। সত্য কথা বলিতে কি, খাদ্যসম্পদে দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ হলেও বাংলাদেশে তাহার প্রচলন বড়ই কম। তাই বাঙ্গালীর শরীরের গঠন এবং বাংলার জনস্বাস্থ্য ভারতের অনেক প্রদেশের চেয়ে নিকৃষ্ট।

এইবার (খ) বিষয়ীভূত উক্তিটির পর্য্যালোচনা করা যাক্। ছাগলের মাংস ও মুরগীর মাংসের তুলনামূলক গবেষণা এদেশে হয় নাই। পুষ্টিকরতা বা পৌষ্টিকতা ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে হয় nutritive value। আমি সেই কথাই উল্লেখ করিয়াছিলাম। লেখক মহাশয় যদি এই প্রসঙ্গে Biological value সম্বন্ধে নজীর দেখাতেন তাঁহার 'উত্তরে' তাহলে ব্যাপারটা সহজে মীমাংসা হোত। তাহা না করে তিনি মুরগী ও ছাগলের মাংসে প্রোটিনের অংশ বেশী এই কথা দেখিয়েছেন। তিনি 'তুলনামূলক পৌষ্টিকতা' এবং 'প্রোটিন শতকরা কতটা আছে' এই দুই উক্তির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ তাহা জানেন বেশ ভাল করে (সে কথা পরে দেখাইয়াছি); কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁথিপত্রের সাক্ষী তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে বুঝতে পেরে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মাংসের Biological value সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কোথায় কাজ হয়েছে তা জানেন কি না এ সাদা কথাটা এড়িয়ে গেছেন।

(গ) আমি মূল প্রবন্ধের উল্লেখ করে লিখিয়াছিলাম যে 'ডাল, বরবটী, পেস্তা বাদামের মধ্যে প্রোটিনের অংশ কম এ উক্তি দুষ্পাচ্য; এক্ষেত্রে প্রতিবাদটা ছিল প্রোটিনের অংশ নিয়ে তুলনামূলক ভাবে; তাহাদের পৌষ্টিকতা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু তাহলে কি হয়; আমি যে 'আসলে প্রোটিন সম্বন্ধে গোড়ার কথাটা হজম করিতে' পারি নাই এই অজুহাতে নেহাৎ অবান্তর হলেও Biological value সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে (বক্তৃতায়?) ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই বাদানুবাদে বিশেষভাবে উপভোগ্য হচ্ছে 'আলোচনার' 'উত্তরে' ডাঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তর্কের প্রণালী। যেখানে পৌষ্টিকতা নিয়ে তর্ক (যেমন ছাগ ও মুরগীর মাংসের শ্রেষ্ঠত্ব) সেখানে শতকরা প্রোটিনের অংশ কত তাহার আলোচনা; আর যেখানে প্রোটিনের অংশ কত তাহা নিয়ে তর্ক (যেমন ডাল, বরবটী ইত্যাদি) সেখানে অহৈতুকী ভাষণ পৌষ্টিকতা নিয়ে। বিজ্ঞানের আলোচনায় (প্রতিপক্ষ চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক না হলেও) 'সুবিধাবাদ'কে দূরে রাখিলে তবেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।

আমি মূল প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলুম যে পুষ্টিবিজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে এমন দ্রুত তালে চলেছে যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে এর চর্চা না করিলেই তাল কাটিয়া যাবার সম্ভাবনা। ডাঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'উত্তর' থেকেই একটা উদাহরণ দেই। তিনি লিখেছেন (৮৩৮ পৃঃ ১ম কঃ ১ম পংক্তি) 'এ পর্য্যন্ত ১৮ রকমের য়্যামিনো-য়্যাসিড চেনা গেছে'। যদি 'এ পর্য্যন্ত' কথাটার অর্থ ১৯৩৫ সাল না হয়ে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পার হয়ে যাবার পরে হয় তাহলে তাঁর উক্তিটা ভুল। ১৯৩৯ সালে অন্ততঃ ২২টা এ্যামাইনো-এ্যাসিডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে নির্ভুল ভাবে এবং আরও ৭।৮টার অস্তিত্ব 'বিবেচ্য' অবস্থায় পড়ে আছে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকবৃন্দের বিচারালয়ে। এর পর নজীর দিলে পাঠক-পাঠিকাবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় যথেষ্ট তাই বিরত রহিলাম। তবে যদি শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভট্টাচার্য্য বা রসায়ন শাস্ত্রামোদী কোনও পাঠক (বা পাঠিকা) আমার উক্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানিতে চাহেন তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করার চেষ্টা কোর্ব্বো সম্পাদক মহাশয়ের মারফৎ। কর্ণেল মকাইএর নামের বানান ও উচ্চারণ নিয়ে লেখক মহাশয় ইঙ্গিতে (৮৩৮ পৃঃ ১মকঃ মধ্যভাগে) প্রতিবাদ করেছেন। বাননটা কিন্তু Macay নহে Mccay। ঠিক উচ্চারণ কি হবে তাহা জানি না। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মুখে "ম্যাক্‌কে" উচ্চারণটা বেশী শুনেছি আবার কেউ কেউ বলতেন "মকাই"। ইংরাজদের মুখে শুনেছি অনেকটা যেন "ম্যাক্-কাই"।

(ঙ) ঘিয়ে স্বল্প পরিমাণ ভাইটামিন বর্ত্তমান থাকে যাহা উদ্ভিজ্জ তৈলে নাই (অবশ্য Redpalm oil বাদে) একথা ডাঃ ভট্টাচার্য্য স্বীকার করতে চাহেন না। 'হেল্‌থ বুলেটিন ২৩ নং' আমায় পড়ে দেখতে বলেছেন। তাঁর আদেশ অনুসারে হেল্‌থ বুলেটিন পুস্তিকাখানি খুলিয়া দেখিলাম যে ৫ম পৃষ্ঠায় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা আছে—সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ তেলে 'ক্যার্-অটীন" বা ভাইটামিনএ থাকে না। ভাইটামিন

'সি'এর কথা উঠেই না কারণ 'সি' ভাইটামিন হচ্ছে একটা এ্যাসিড (Ascorbic Acid) এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে তাহা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে না। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নজীর হিসাবে তাঁর প্রতিপক্ষের যুক্তির খণ্ডন করতে বা পাঠকবর্গের গোচর কর্ত্তে কেহ যে পারেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তাই সভয়ে অনুমান কর্ত্তে হয় যে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় হয়ত কেতাবখানা ভাল করে পড়ে দেখবার অবকাশ পান নাই বা গোটা সরিষার দানার (তেলের নহে) বিশ্লেষণ ঐ পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় দেখে এবং তলায় লেখা ছোট ছোট অক্ষরে নোটটী না পড়ে এই ভুলটী করে বসেছেন।

(৪) এইবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভাইটামিন কয়টা বা কয়রকমের আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখক মহাশয় মূল প্রবন্ধে মোট ছয়টার নাম করেন এবং একথাও বলেন যে এই ছয়টার অভাবে ছয়রকমের রোগ হয়। আমি এই উক্তিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলি যে ইহা অসম্পূর্ণ। লেখক মহাশয় 'উত্তর' প্রসঙ্গে কর্ণেল চোপরার সুবৃহৎ এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থের নজির দিয়ে বলেছেন যে ঐ কেতাবের নির্দ্দেশ মত তিনি এই ছয়টার উল্লেখ করেছেন। বেশ ভাল কথা; কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া উচিত নহে যে পুস্তক ছাপা হয়েছে ১৯৩৬ সালে এবং বাদানুবাদ চলেছে ১৯৪০ সালে। কেতাব ছাপা হওয়ার পরে (Nicotinic acid) নিক্-অটিনিক-এসিড ভাইটামিন পর্য্যায় ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় isolate করা হয়েছে। শুধু তাহাই নহে Nicotinic acid দ্বারা রোগের চিকিৎসাও হচ্ছে। আর সবগুলা ছেড়ে দিলেও 'কে' ও 'পি' ভাইটামিন সম্বন্ধে গত দুবৎসরে অনেক কথা জানা গেছে। ছয় রকম রোগের কথারও প্রতিবাদ করিয়াছিলাম; তাহার উল্লেখ উত্তরে নাই দেখিয়া সুখী হইয়াছি। কারণ 'জের'টা এত লম্বা হয়ে চলেছে যে ভাইটামিন সম্বন্ধে প্রমাণ প্রমেয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকার জন্য মুলতুবী রাখাই ভাল।

সমালোচনার এ দীর্ঘ জের টানার জন্য মূলপ্রবন্ধ লেখক ডাঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সম্পাদক মহাশয় ও পাঠক পাঠিকাবর্গের মধ্যে যাঁরা ধৈর্য্য সহকারে এতদূর পড়ার অবকাশ পেয়েছেন তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি ভাষাজ্ঞান বড় কম, তাই অক্ষমতাবশতঃ ইংরাজি উক্তিগুলির ভাল অনুবাদ করিতে পারি নাই। আমি জানি যে জনসাধারণের জন্য লিখিত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটীর (details) স্থান নাই। কিন্তু মূলপ্রবন্ধলেখক শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভট্টাচার্য্য প্রবল প্রতিপক্ষ, নজীরের উপর তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই অত নজীরের উল্লেখ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি। তাঁর মত মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত থাকলে হয়ত বক্তব্য বিষয়গুলি আরও সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে বোঝাতে পারতুম তজ্জন্য যথেষ্ট ধিক্কার দিচ্ছি নিজেকে। *

* এ বিষয়ে কোন আলোচনা আর প্রকাশ করা হইবে না। ভাঃ সঃ

রঙে রাঙায়ে তোল—

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কিসের পরশনে
ফাগুন বনে বনে
লেগেছে উৎসব
বল না গো—

প্রকৃতি যেন আজ
করেছে নব সাজ
করিতে সবাকায়
ছলনা গো!

হেথা কি পুনরায়
আসিবে শ্যামরায়
শঙ্খ-চক্র-গদা
পদ্ম নিয়া,

তারি-ই আয়োজন
জানায়ে সমীরণ
মাতায়ে তুলিয়াছে
লাখো হিয়া?

'এস হে নটবর'
জুড়িয়া শতকর
অজুত হিয়া ডাকে
বারে বারে;

এস হে মনোরম
নিদয়া নিরুপম
রঙে রাঙায়ে তোল—
আজ তারে।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

নয়

এ কাজ দুইটায় পাতুর আপত্তি ছিল না। কারণ কাজ দুইটাতেই নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়ন-বোর্ডে যে-কোন ঘোষণার সঙ্গে তাহাকে ঢোল-সহরৎ করিতে হয়, তাহার জন্য সে ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পায়। বোর্ড হইতে ইউনিয়নের মজুর শ্রেণীর উপরেও ট্যাক্স ধার্য্য আছে, একদিনের মজুরী। মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট আছে ছয় আনা। পাতুকে মজুর খাটিতে হয় না, সে ঢোল দিয়া খালাস পায়। অবশ্য বোর্ড-বাজেটে প্রতিবার ঢোল-সহরতের জন্য ছয় পয়সা মজুরী ধার্য্য আছে। প্রতিবারই পাতু ভাউচারের পিছনে বুড়া আঙুলের টিপছাপ দেয়। ঢোলসহরতও তাহাকে বৎসরে আটবার দশবার করিতে হয়, বৎসরের শেষে সেক্রেটারী দুগাই মিশ্র তাহার নামে ছয় আনার একখানা রসিদ কাটিয়া ভূপাল চৌকীদার মারফৎ পাঠাইয়া দেয়। খরচ পড়ে পনের আনা, জমা হয় ছয় আনা, কিন্তু সে সংবাদ দুগাই ছাড়া কেহ জানে না; প্রেসিডেন্টবাবু টিপ দেখিয়া ভাউচারে সই করেন; পাতুরও তাহাতেই আনন্দ--ঢোল বাজাইয়া ট্যাক্স হইতে নিষ্কৃতিই তাহার পরম লাভ।

গ্রামের সামাজিক ঘোষণা হইলেও—নবান্নের ঢোল দিতেও তাহার আপত্তি নাই। নবান্নের ঢোল দেওয়ার জন্য বিদায়টা তাহার প্রায় নগদ-বিদায়। প্রতি গৃহস্থ হইতে সে একথালা প্রসাদ পাইবে। পরিমাণে কম দিলেও সমস্ত গ্রাম কুড়াইয়া যে ভাত-তরকারী জমে—তাহা দুই তিন দিন খাইয়াও শেষে গরুর মুখে ধরিয়া দিতে হয়। তিন দিনের পর আর খাওয়া চলে না।

ভূপাল চৌকীদার, ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর দেওয়া একখানা নোটিশ হাতে করিয়া চলিয়াছিল, আগে-আগে ডুগ-ডুগ শব্দে নাগোরা ধরণের একটা চর্ম্মবাদ্য বাজাইয়া চলিতেছিল পাতু।

"এক সপ্তাহের মধ্যে আষাঢ়-আশ্বিন দুই কিস্তির বাকী ট্যাক্স আদায় না দিলে—জরিমানা সমেত—দেড়গুণ ট্যাক্স অস্থাবর ক্রোক করিয়া আদায় করা হইবে।"

জগন ডাক্তার একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

—কি? কি? কি করা হবে?

ভূপাল সভয়ে হাতের নোটিশখানি আগাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে এই দেখেন কেনে!

জগন কঠিন দৃষ্টিতে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল—সরকারী উর্দ্দি গায়ে দিযে মাথা নোয়াতেও ভুলে গেলি যে!

অপ্রস্তুত হইয়া ভূপাল তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ের ধূলা মুখে লইয়া বলিল—আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই ভোলে! আপনকারাই আমাদের মা-বাপ!

পাতু বলিল—নিশ্চয়!

জগন নোটিশখানি দেখিয়া একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এয়ার্কি নাকি! এ সব কি পৈত্রিক জমিদারী পেয়েছে সব! লোকের মাঠের ধান এখনও মাঠে রইল, বাবুরা একেবারে অস্থাবরের নোটিশ বার ক'রে দিলেন! মানুষকে উৎখাত ক'রে ট্যাক্স আদায় করতে ব'লেছে গবর্ণমেণ্ট? আজই দরখাস্ত করব আমি!

ভূপাল হাতযোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমরা চাকর, আমাদিগে যেমন ব'লেছে তেমনি—।

—তোদের দোষ কি? তোরা কি করবি? তোরা ঢোল দিয়ে যা!

পাতু ঢোলটায় গোটা কয়েক কাঠির আঘাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে ডাক্তোর বাবু, 'লবান্ন' হবে বাইশে তারিখ।

—নবান্ন? বাইশে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর সব লোককে বল গিয়ে। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নবান্ন করব—আমার যেদিন খুসী।

পাতু আর কোন উত্তর না দিয়া পথে অগ্রসর হইল,

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যেন কুণ্ডু　　মাছধরা　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
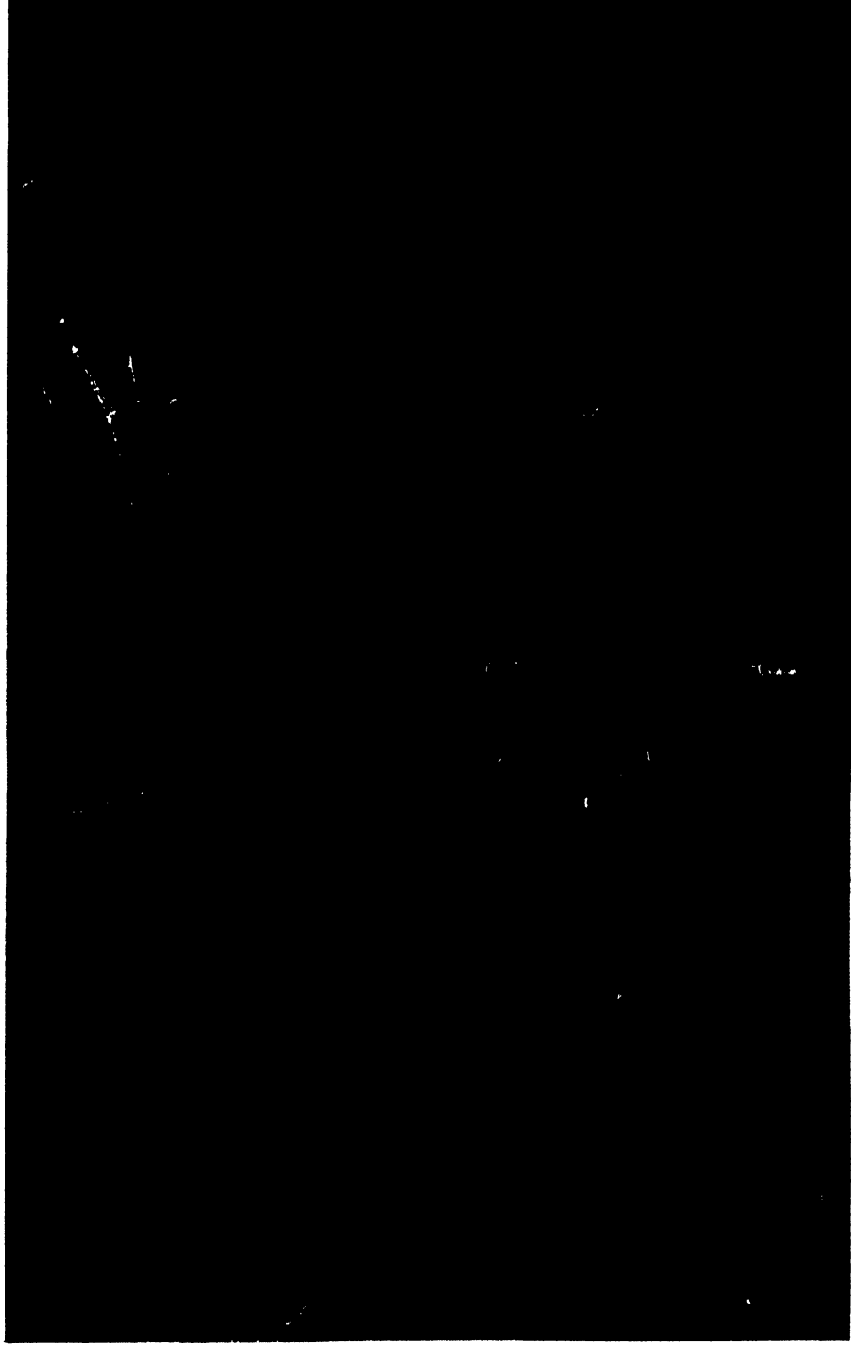
ডাক্তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে থমথমে মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এই পেতো—শোন !

—আজ্ঞে ! পাতু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—কাল যে দরখাস্ততে টিপ-সই দিতে এলি না বড় ! খুব বড়লোক হয়েছিস, না ? সহরে গিয়ে বাড়ী করবি, এ গাঁয়েই আর থাকবি না, শুনছি !

বিরক্তিতে পাতুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া দরখাস্তখানা বাহির করিয়া আনিয়া সস্নেহ শাসনের সুরে বলিল—দে, টিপছাপ দে ! তোর জন্যেই আমি ছাড়ি নাই দরখাস্ত।

পাতু এবার বিনা আপত্তিতেই টিপছাপ দিল। কাল যে সে আসে নাই, সমস্ত দিনটাই গ্রামত্যাগের সংকল্প লইয়া জংসন সহর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে- সে সমস্তই সাময়িক একটা উত্তেজনার প্রেরণায়; আজ যে সে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে ডাক্তারের কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল—সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য। নতুবা সাহায্য বা ভিক্ষা লইতে তাহার আপত্তি নাই, গভীর কৃতজ্ঞতার সহিতই সে টিপছাপ দিল। টিপছাপ দিয়া বুড়া আঙুলের কালি মাথায় মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিল- ডাক্তারবাবুর মতন গরীবগুনোর উপকার কেউ করে না। ডাক্তারের জুতার ধূলা আঙুলের ডগায় লইয়া সে মুখে ও মাথায় বুলাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূপাল চৌকীদারও লইল।

ডাক্তার ইহারই মধ্যে কিছু যেন চিন্তা করিতেছিল, চিন্তা শেষে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দাঁড়া ! আরও একটা কাগজে টিপছাপ দিয়ে যা।

—আজ্ঞে ? পাতু সভয়ে প্রশ্ন করিল। অর্থাৎ আবার টিপছাপ কেন ? টিপছাপকে ইহাদের বড় ভয়।

—এই ট্যাক্স-আদায়ের জন্যে একটা দরখাস্ত দোব। তোদের ঘর পুড়ে গিয়েছে, চাষীদের ধান এখনও মাঠে, এই সময় অস্থাবরের নোটিশ ! এ কি মগের মুলুক না কি ?

এবার ভয়ে পাতুর মুখ শুকাইয়া গেল, ইউনিয়ন-বোর্ডের হাকিমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত ! সে ভূপাল চৌকীদারের দিকে চাহিল—ভূপালও ভয়ে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার তাগিদ দিয়া বলিল—দে, টিপছাপ দে !

—আজ্ঞে না মশায়। উ আমি দিতে পারব না ! পাতু এবার হন হন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে ভূপাল পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভূপাল ভাবিতেছিল—খবরটা আবার 'পেসিডেন' বাবুকে গিয়া দিতে হইবে। না হইলে সন্দেহ আসিবে—ভূপালেরও ইহার সহিত যোগসাজস আছে।

ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাতু ও ভূপালের পিছনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরই সে ফাটিয়া পড়িল—হারামজাদার জাত, তোদের উপকার যে করে সে গাধা ! বলিয়াই সে দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

—ছিঁড়ো না, ডাক্তার ছিঁড়ো না। বাধা দিল পাঠশালার পণ্ডিত দেবদাস ঘোষ। সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিল। এ-সব ব্যাপারে তাহারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে এবং এ-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই ডাক্তারের সহিত তাহার সদ্ভাব নাই। কিন্তু আজ ডাক্তারের কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। সত্যই তো, ইউনিয়ন-বোর্ড কাহারও পৈত্রিক জমিদারী লাখেরাজ নয়। দশজনের সুবিধা-অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—এমনভাবে অস্থাবরের নোটিশ বাহির করিবার অধিকার প্রেসিডেন্টের নিশ্চয় নাই !

ডাক্তার দেবদাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছিঁড়তে বারণ করছ ? ওই বেটাদের উপকার করতে বলছ ? দেখলে তো সব !

দেবদাস বলিল—তা' দেখলাম। ওদের ওপর রাগ ক'রে কি ক'রবে বল ! দাও তোমার ট্যাক্সের দরখাস্ত, আমি সই করছি, আর দশজনার সইও করিয়ে দিচ্ছি !

ডাক্তার একটা বিড়ি ও দেশলাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিল —বস। তারপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মিনু, দু কাপ চা !

মিনু ডাক্তারের মেয়ে।

ডাক্তার আবার আরম্ভ করিল—লোকে ভাবে কি জান দেবনাথ ? ভাবে—এ সবের মধ্যে আমার বুঝি কোন স্বার্থ আছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার হলে বাঁচবে সবাই, কিন্তু রাজা হয়ে যাব আমি !

দেবদাস বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা ডাক্তারের হাতে দিয়া একটু হাসিয়া বলিল—তা' স্বার্থ একটু আছে বই কি ডাক্তার,

স্বার্থ? ডাক্তার রুক্ষ অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেবদাসের দিকে চাহিল।

পণ্ডিত হাতের বিড়িটার আগুনের দিকে চাহিয়া—চক্ষুলজ্জাকে অতিক্রম করিয়া বলিল—স্বার্থ আছে বৈ কি! দশজনের কাছে গণ্যমান্য হবে তুমি, দুদিন বাদে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হতে পার; স্বার্থ রয়েছে বৈ কি!

ডাক্তারের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—বলিল, ওটা যদি স্বার্থ হয়, তবে তো সাধু-সন্ন্যাসীর ভগবানের তপস্যা করার মধ্যেও স্বার্থ আছে। বুদ্ধদেবও স্বার্থপর!

এবার পণ্ডিত চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আমি হ'তে চাই, আলবৎ হ'তে চাই। সে হ'তে চাই দশজনের সেবা করবার জন্যে। পরলোক-ফরলোক জপতপ ও-সবে আমার বিশ্বাস নাই। ওই ছিরু পাল—চুরী করবে—ব্যাভিচার করবে—আর ঘরে ব'সে জপতপ করবে—কালীপূজো করবে ঘটা করে, ও রকম ধর্ম্মের মাথায় মারি আমি পাঁচ ঝাড়ু।

অতঃপর ডাক্তার আরম্ভ করিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। "জীবন ধন্য করিতে কে না চায় এ সংসারে? কেহ জপ তপ করিয়া ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন ধন্য করিতে চায়। কেহ মানুষের সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায় ইত্যাদি—ইত্যাদি।" বক্তৃতার উত্তরে বক্তৃতা দেবদাসও দিতে পারিত, সেও অনেক ভাল-ভাল কথা জানে। কিন্তু আজ সে কোন বক্তৃতা দিল না, কেবল বলিল—দশজনের ভাল করতে চাও—গাঁয়ের মঙ্গল করতে চাও, খুব ভাল কথা ডাক্তার। কিন্তু গাঁয়ের লোককে 'হেণ্টা-কেণ্টা' কেন কর তুমি? আজ বললে—গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না তুমি! ক'দিন আগে দু দুটো মজলিস হ'ল গাঁয়ে—তুমি ত' গেলেই না, উল্টে অনিরুদ্ধ কামারকে তুমি উস্কে দিলে।

—কখনও না। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে আমি উস্কে দিই নাই। অনিরুদ্ধের জমির ধান কেটে নিলে—আমি তাকে ছিরের নামে ডাইরী করতে বলেছি। এই পর্য্যন্ত!

—বেশ কথা! মজলিসে গেলে না কেন?

—মজলিস? যে মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতব্বর—সেখানে আমি যাই না।

—ভাল। নবান্ন করবে না কেন তুমি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে?

এবার ডাক্তার কাবু হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—করব না এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই।

দেবদাসও এবার খুসী হইয়া বলিল—হ্যাঁ। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ।' যা ক'রবে দশজনাতে এক হয়ে কর। দেখ না, তিনদিনে সব ঢিট হয়ে যাবে। অনে কামার, গিরে ছুতোর, তারা নাপিত, পেতো মুচি—মায় তোমার ছিরেকেও নাকে কানে খত-ইয়ে তবে ছাড়ব।

ডাক্তার বলিল—বেশ! কোনও আপত্তি নাই আমার। তবে এক হতে হ'লে সব কাজেই হ'তে হবে। গাঁয়ের গরজের সময় জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত; আর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটের সময় কঙ্কনার বাবুরা কিম্বা ছিরে পাল—

বাধা দিয়া দেবদাস বলিল—খেপেছ তুমি? এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাঁড়াব। কই লেখ তুমি দরখাস্ত।

* * *

দেবদাস ও জগন ডাক্তার দু'জনে মিলিত উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দরখাস্ত পাঠানো হইয়া গিয়াছে। নবান্নের দিনে দু'জনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে; ভাসান গানের দলকে এখানে 'বেহুলার দল' বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে। চাঁদা করিয়া চাল তুলিয়া উহাদের মদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাতেই দলের লোকের মহা আনন্দ। এই ভাসান গানের ব্যবস্থার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য আছে; নবান্নের দিনে ছিরু পাল, বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়ীতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প স্বল্প সংকীর্ত্তন গান-ও হয়। তামাক-লোভী গ্রামের লোক যাহাতে ছিরুর বাড়ী না যায়—জগন ডাক্তার এবং দেবদাস তাহারই জন্য এ ব্যবস্থা করিয়াছে। গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় জগন ও দেবদাসের এটি প্রথম ব্যবস্থা বা ভূমিকা।

চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিছু বেশী, সত্যকারের সার্ব্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান পাকিয়া উঠিয়াছে; এইবার সেই ধান কাটিয়া ঘরে তোলা

হইবে। কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গেছে। এইবার লঘু ধানের চালে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের আজ ভোগ দেওয়া হইবে; ঘরে ঘরে আজ লক্ষ্মীপূজা হইবে। ছেলেমেয়েরা সকাল বেলাতেই স্নান করিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীত বেশ পড়িয়াছে, তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরের জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া খোঁড়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়া শিব এবং ভাঙা কালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলী, আদাকুচি, মূলা-কুচি সাজাইয়া মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। যাহাদের বাড়ীতে কুমারী মেয়ে নাই তাহাদের প্রবীণারা সামগ্রী লইয়া আসিতেছে। গ্রামের পুরোহিত—খোঁড়া চক্রবর্ত্তী বসিয়া সামগ্রীগুলি লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দিতেছে। মধ্যে মধ্যে ধমক দিতেছে ওই ছেলেগুলিকে—

এ্যাই—এ্যাই! এ্যাই ছেলে! এ তো ভারী বদ! যাসনা কাছে, চাট ছোঁড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে! অর্থাৎ ওই ঘোড়াটা। ঘোড়াটা পিছনের পা ছুঁড়িলে প্লীহা ফাটাইয়া দিবে! খোঁড়া চক্রবর্ত্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যজমান সাধিয়া ফেরে। ফিরিবার সময় ঘোড়ার উপর থাকে সে—তাহার মাথায় থাকে চাল-কলা ইত্যাদির বোঝা। ঘোড়া খুব শিক্ষিত, চক্রবর্ত্তী লাগাম না ধরিয়া দুই হাতে বোঝা ধরিয়া অনায়াসে চলে, অবশ্য ইচ্ছা করিলেই চক্রবর্ত্তী মাটিতে পা নামাইয়া দিতে পারে। মাটি হইতে মাত্র ফুটখানেক উপরে তাহার পা দুইটা ঝুলিতে ঝুলিতে যায়। ছেলেগুলি দূর হইতে ঢেলা ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে ক্রমাগত মারিতেছিল। পুরোহিত ভয়ানক চটিয়া উঠিল। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইল না। একটি বিধবা প্রৌঢ়া ভোগের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল—সেই পুরোহিতের উপায় করিয়া দিল—সে বলিল—এ্যাঁ—তোরা সব ঘোড়া ছুঁলি? বলি ওরে—ও মেলেচ্ছোর দল! যা সব আবার চান করগে যা।

পুরোহিত বলিল—দেখ বাছা দেখ, বজ্জাত ছেলেদের কাণ্ড দেখ। চাট ছোঁড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে। তখন নাম-দোষ হবে আমার।

বিধবা কিন্তু একথাটা মানিল না, সে বলিল—ও-কথা আর বল না ঠাকুর। ছাগলের মত ঘোড়া নাকি পিলে ফাটিয়ে দেবে! ওই ছাগলের মত ঘোড়া—তার ওপর আচার-বিচের কিছু নাই। সামনের দুটো পায়ে বেঁধে ছেড়ে দাও, রাজ্যের আস্তাকুড়, পাতা, ময়লা মাড়িয়ে চরে' বেড়ায়। সে-দিন আমাদের গাঁয়ে এসে নতুন পুকুরের পাড়ে—মা-গো:, মনে করলেও বমি আসে—চান করতে হয়—সেইখানে দেখি ঘাস খাচ্ছে। আর তুমি ওই ঘোড়াতে চেপে এসে দেবতার পুজো কর?

পুরোহিত বলিল—গঙ্গাজল দি, মোড়ল পিসী, রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরলে গঙ্গাজল দিয়ে তবে ওকে ঘরে বাঁধি!

—মিছে কথা!

—ঈশ্বরের দিব্যি! এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি। গঙ্গাজল না দিলে কিছুতেই ঘরে ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে চিঁহি চিঁহি ক'রে চেঁচাবে!

মোড়ল পিসী কি বলিতে গিয়া শশব্যস্ত হইয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কে লো? হন হন ক'রে আসছে দেখ! পিছন দিক হইতে কোন আগন্তুকের দীর্ঘ ছায়ার মাথাটা তাহার পায়ের উপর পড়িতেই মোড়ল পিসী সংস্পর্শের ভয়ে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

একটি বধূ; দীর্ঘাঙ্গী—অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ; সে উত্তর করিল না, নীরবে ভোগের সামগ্রীর পাত্রখানি পুরোহিতের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

—অ! কামার বউ! আমি বলি কে-না-কে!

এই মুহূর্ত্তেই জগন ও পণ্ডিত আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল। দেবদাস বিনা ভূমিকায় বলিল—ঠাকুর, কামারের পূজো গাঁয়ের সামিলে আপনি করবেন না; সে হ'তে আমরা দোব না!

জগন ও দেবদাস এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করিয়া নিকটেই কোথাও ছিল, পদ্মকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারাও আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—সে আবার কি রকম? গাঁ-সামিলে পূজো না-হলে, কি ক'রে পূজো হবে?

—সে আমরা জানি না, কর্ম্মকার বুঝে করবে! সে যখন গাঁয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, তখন আমরাই বা তাকে গাঁয়ের সামিলে ক্রিয়া-কর্ম্মে নোব কেন?

পদ্ম তেমনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, একটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বলিল—আমি কি করব মা!

দেবদাস পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—পূজো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বলগে কর্ম্মকারকে, পূজো দিতে দিলে না গাঁয়ের লোকে।

পদ্ম এবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কিন্তু পূজার পাত্র তুলিয়া লইল না, সেটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

পুরোহিত বিব্রত হইয়া বলিল—ওগো বাছা, পূজোর থালটা; ও বাছা কামার-বউ!

জগন এবার বলিল—থাক না। কামার তো আসবেই। যা হোক একটা মীমাংসা আজ হবেই। জগন ডাক্তারের গোপনতম অন্তরে কর্ম্মকারের উপর একটু সহানুভূতি এখনও আছে।

পুরোহিত ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না। উপস্থিত একবাড়ীর আতপ দুধ মণ্ডা প্রভৃতি পূজোর সামগ্রী বাদ পড়িতেছে—সেই চিন্তাটাই তাহার বড়। তাহার ভ্রূ-কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল—বলি হ্যাঁহে ডাক্তার—ও পণ্ডিত—

পণ্ডিত বাধা দিয়া দৃঢ় আদেশের ভঙ্গিতে তাহাকেই বলিল—গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত এদের পূজোও হবে না ঠাকুর। বলে রাখছি আপনাকে। আমরা অবিশ্যি একজন না একজন থাকব—তবে যদি না থাকি—সেই জন্যে আগে থেকে বলে রাখছি আপনাকে।

ঠিক এই সময়েই ছিরু পাল আসিয়া ডাকিল—ঠাকুর! ছিরুর পরণে আজ গরদের কাপড়, গায়ে একখানি রেশমী চাদর; ভাবে ভঙ্গিতে ছিরু পাল আজ একটি স্বতন্ত্র মানুষ; প্রথম দৃষ্টিতেই সেটা যেন বেশ বুঝা যায়।

পুরোহিত চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যাই বাবা। আর আধ ঘণ্টা। ও পণ্ডিত, ও ডাক্তার, কই হে সব আসছে না কেন?

গম্ভীরভাবে জগন ডাক্তার বলিল—এত তাড়াতাড়ি করলে তো হবে না ঠাকুর! আসছে সব, একে একে আসছে। একঘর যজমানের জন্য দশজনকে ব্যতিব্যস্ত করতে গেলে তো চলবে না!

ছিরু বলিল—বেশ—বেশ! দশের কাজ সেরেই আসুন ঠাকুর! আমি একবার তাগাদা দিয়ে গেলাম। তারপর ছিরু তাহার প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখখানাকে যথাসাধ্য কোমল এবং বিনীত করিয়া বলিল—ডাক্তার, একবার যাবেন গো দয়া ক'রে। দেবু খুড়ো—দেখে শুনে দিয়ো বাবা—

কথা তাহার শেষ হইল না, অনিরুদ্ধের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকারে চণ্ডীমণ্ডপটা যেন অতর্কিতে চমকিয়া উঠিল।

—কে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা; কোন নবাব বাদশা আমার পূজো বন্ধ ক'রেছে শুনি? অনিরুদ্ধের সে মূর্ত্তি যেন রুদ্র মূর্ত্তি!

চক্রবর্ত্তী হতভম্ভ হইয়া গেল, দেবদাস সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জগন ডাক্তার বিজ্ঞ সান্ত্বনা দাতার মত একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিল, ছিরুপাল কিন্তু আজ অচঞ্চল স্থির ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—থাম, থাম, চীৎকার করিস না অনিরুদ্ধ—

চকিতে ব্যঙ্গভরা ঘৃণিত দৃষ্টিতে একবার ডাক্তারের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ মন্দিরের দাওয়া হইতে পদ্মের পরিত্যক্ত পূজার পাত্রটা তুলিয়া লইল। পাত্রটা সে দুই হাতে তুলিয়া যেন দেবতাকে দেখাইয়া বলিল—হে বাবা শিব, হে মা কালী—খাও বাবা, খাও মা; খাও! আর বিচার ক'র, তোমরা বিচার ক'র! বলিয়াই সে পাত্রটা লইয়া যেমন হনহন করিয়া আসিয়াছিল—তেমনি হনহন করিয়াই চলিয়া গেল।

ডাক্তার ও দেবুর চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধকে ধরিয়া নির্য্যাতন করিবার কোন উপায় ছিল না।

পুরোহিত চক্রবর্ত্তী এবার অনিরুদ্ধের উপরেই মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল—বেটা কম্মকারের ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি! শূদ্র হয়ে—দেবতাকে ভোগ দেখিয়ে বলে কিনা—খাও বাবা, খাও মা!

ছিরু কিন্তু আজ অবিচলিত ধৈর্য্যে—স্থির প্রশান্ত ভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। আজ সে কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, পৃথিবীর ন্যায়অন্যায় কিছুরই সহিত আজ তাহার সংশ্রব নাই। আজিকার ছিরু স্বতন্ত্র—এই ছিরু যে কেমন করিয়া ব্যাভিচারী পাষণ্ড ছিরুর প্রচণ্ড ভার ঠেলিয়া দেবপূজাকে উপলক্ষ করিয়া মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আসে—সে অতি বিচিত্র সংঘটন; কিন্তু সে আসে। পাষণ্ড ছিরুর অন্যায় বা পাপে কোন ভয় নাই, দেবসেবক ছিরুরও সে পাপ খণ্ডনের জন্য ব্যগ্রতা নাই; আছে কেবল পরমলোক প্রাপ্তির জন্য একটি নিষ্ঠাভরা তপস্যা এবং অকপট বিশ্বাস। দিন ও রাত্রির মত পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা কখনও হয় না কিন্তু কোন বিরোধও নাই। তবে ছিরুর দিনগুলি শীতের দিন—সংক্ষিপ্ততম তাহার আয়ু।

দশ

প্রচণ্ড রাগের উপরেই অনিরুদ্ধ হন হন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পূজা-ভোগের সামগ্রীর পাত্রটা ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া বলিল—ওই নে; পূজো ভোগ দিয়ে দিয়েছি আমি।

পদ্ম চুপ করিয়া ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, একটি বিষণ্ণ উদাসীনতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন হইতেই পদ্ম যেন কেমন হইয়াছে। দেহ যেন ক্লান্ত, মন যেন অহরহ ভারাক্রান্ত। অনিরুদ্ধ এটা লক্ষ্য করিয়াছে; কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করে নাই, মানুষের রক্ত-মাংসের দেহ তো! পাথরের তো নয় যে ভালো মন্দ কিছু থাকিবে না। আজ কিন্তু ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধের এটা বরদাস্ত হইল না, জ্বলন্ত আগুনের মত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিরুত্তর পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল—বলি, তোর হ'ল কি?

শান্ত স্বরে পদ্ম জবাব দিল—কি হবে! কিছু হয় নাই!

দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তবে? তবে যে বিরহিণী রাধার মত বসে রয়েছিস, চালের কাঠের দিকে চেয়ে?

পদ্ম যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তে তাহার ডাগর চোখ দুটি ক্রোধে রক্তাভ এবং উগ্রভঙ্গিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—স্থির দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। অনিরুদ্ধের মনে হইল—দুই টুকরা লোহা যেন কামার-শালার জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুনের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিতেছে; পদ্মের দেহখানা পর্য্যন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অসহনীয় উত্তাপ ছড়াইতেছে বলিয়া তাহার বোধ হইল। এ মূর্ত্তি পদ্মের নতুন। সে ভয় পাইয়া গেল; পদ্ম এইবার কি বলিবে—সেই আশঙ্কায় তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্ম কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, তাহার ক্রোধ, পাত্রে-আবদ্ধ জ্বলন্ত ধাতুর মতই দৃষ্টি এবং দেহভঙ্গির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পূজা-ভোগের পাত্রটা লইয়া লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকিল।

সসঙ্কোচে অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করিল—লক্ষ্মী পেতেছিস? লক্ষ্মী?

সংক্ষিপ্ততম উত্তর আসিল—হুঁ!

—কই শাঁখ বাজালি না? শাঁখ?

পদ্ম শাঁখটা আনিয়া অনিরুদ্ধের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

অপ্রতিভের মত হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আমি শাঁখ বাজাতে পারি? জিজ্ঞেস করছি বলি—শাঁখ বাজিয়েছিস তো?

উত্তর না দিয়া শাঁখটা তুলিয়া পদ্ম আবার তাহাতে একটা ফুঁ দিল।

—শহরের দু'জনাকে নেমন্তন্ন করেছি। আর গিরীশকে বলেছি। সেও আসবে!

পদ্ম এবারও কোন উত্তর দিল না, শাঁখটার মুখে জল দিয়া ধুইয়া সেটাকে লক্ষ্মীর ঘরে যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ আবার অধীর হইয়া উঠিতেছিল, পদ্মের এই শান্ত বিষণ্ণ নির্লিপ্ততার রহস্য এতই গভীর যে—তাহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। বারকয়েক অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া হয় আকাশকে—নয় আপনার ঘরদুয়ারকে লক্ষ্য করিয়াই যেন বলিল—এ কি বিপদ বল দেখি বাপু! মুনি কথাও কয় না, ভিক্ষেও নেয় না। অসুখ-বিসুখ কিছু হয় তো—দেখতে পাই, মুখে যদি বলে—তবে বুঝতে পারি—

এবার বাধা দিয়া পদ্ম যেন কত ক্লান্ত আর্ত্ত স্বরে কহিল—ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি চেঁচিও না, থাম!

অনিরুদ্ধও কাতরস্বরে প্রশ্ন করিল—তোর হ'ল কি তাই বল ?

—কিছু হয় নি বাপু, তুমি থাম, একটু বাইরে যাও ! আমাকে কাজ-কর্ম্ম করতে দাও !

অনিরুদ্ধ আবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে ক্রোধভরে বাড়ীর বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমিই হয়েছি তোর চু-চক্ষের বিষ ! বুঝলি ! বলিয়াই সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

পদ্মের চোক্ষে জল আসিল। মনে হইল—তাহার অপেক্ষা দুঃখী এ সংসারে কেহ আর নাই। এত করিয়াও এই কথাটা তাহাকে শুনিতে হইল ? ওই ছিরু পালের স্ত্রীর ভাগ্যের নিন্দা করে লোকে—কিন্তু পদ্মের ভাগ্য আরও মন্দ। ছিরু পাল স্ত্রীকে প্রহার করে কিন্তু অবিশ্বাস কখনও করে না ! এই তো আজই দেখা হইয়াছিল—স্নানের সময়, বেণে-পুকুরের ঘাটে। ওই কাঠির মত শীর্ণ দেহে এক কাঁখে ঘড়া অন্য কাঁখে সেই পঙ্গুপ্রায় ছেলেটাকে লইয়া চলিয়া গেল--কিন্তু এক বিন্দু দুঃখের ছাপ তো তাহার মুখে সে দেখে নাই ! ডগ-ডগে লালপেড়ে মটকার শাড়ী পরিয়া আপন সৌভাগ্যে যেন ডগমগ করিতেছে ছিরুর স্ত্রী ! পদ্ম একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে রান্নাশালায় আসিয়া উনানে আগুন দিল। নবান্নের সকল আয়োজনই তাহার হইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী পাতা হইয়াছে, চাল দিয়া নবান্নের আয়োজন থরে থরে সে সাজাইয়া রাখিয়াছে, ঘরের মেঝে হইতে উনান পর্য্যন্ত নিকাইয়া আল্পনার বিচিত্র চিত্রে ভরিয়া দিয়াছে, বাকী এখন কেবল রান্না। উনান জ্বালিয়া সে কোটা তরকারীর পাত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রাখিল, উনানের উপর কড়াখানা চাপাইয়া দিয়া—তেল আনিবার জন্য উঠিল। কিন্তু যাইবার কি জো আছে। ঘরের চালের উপর কাকগুলা সারি দিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। পাঁচবছরের একটা ছেলে থাকিলেও—তাহাকে লাঠি হাতে বসাইয়া রাখিলে চলিত। বাহিরে অনিরুদ্ধের সাড়া-শব্দও পাওয়া যাইতেছে না। পদ্ম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিজেই কাকগুলাকে তাড়াইতে আরম্ভ করিল—হু—স, ধা—! হু-স্ ! কিন্তু এমন হতভাগা পাজী জাত কি আর আছে ? তাড়া দিলে লাফ দিয়া এপাশ হইতে ওপাশে সরিয়া যায় ; বড় জোর খানিকটা উড়িয়া আবার যথাস্থানে আসিয়া বসে।

—কম্মকার ! কম্মকার গো ! ওগো—ও—কম্মকার !

কে ডাকিতেছে ! পদ্ম মৃদুস্বরেই সাড়া দিয়া প্রশ্ন করিল—কে গো !

—আমি ভূপাল থানদার ! কম্মকারকে ডেকে দাও। ইউনান বোডের অস্থাবর আছে। সেকেটারীবাবু ডাকছে—চণ্ডীমণ্ডপে !

পদ্ম শিহরিয়া উঠিল। অস্থাবর ! অস্থাবর কাহাকে বলে পদ্ম তাহা জানে। জমিদারের গমস্তার সঙ্গে অনিরুদ্ধ একবার ঝগড়া করিয়াছিল ; সেই আক্রোশে গমস্তা খাজনার জন্য নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকের পরোয়ানা আনিয়াছিল। ধানের মরাই ভাঙিয়া ধান তছনচ করিয়া—ঘরের বাসন কাঁসা-বাহির করিয়া সে কি কাণ্ড ! সেই সময়েই অনিরুদ্ধ ছিরুর কাছে দশটাকা ধার করিয়াছিল। ছিরু কিন্তু তখন চাহিবামাত্র দিয়াছিল। ওই গুণটি ছিরুর আছে, বিপদে হাত পাতিলে ছিরু কখনও ফিরাইয়া দেয় না।

ভূপালের অনেক কাজ—গোটা গ্রামের লোকের অস্থাবর আসিয়াছে, প্রত্যেক লোকটিকে ডাকিতে হইবে—সে আবার হাঁকিয়া বলিল—পাঠিয়ে দিয়ো চণ্ডীমণ্ডপে।

পদ্ম এবার একটু অগ্রসর হইয়া সদর দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল—থানদার গিরীশছুতোরের বাড়ী তো তুমি যাবে—ওইখানে—

ভূপাল বলিল—দেখা পাই তো বলব ! বলিতে বলিতেই সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পদ্ম ফিরিয়া দেখিল দশবারোটা কাক আসিয়া রান্নাশালায় নামিয়া পড়িয়াছে। সে ছুটিয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা হইল—জিনিষপত্র সমস্ত তছনচ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। এমন কপাল ! ছি ! ছি ! এমন কপাল ! তাহাকে সাহায্য করিতে একটা পাঁচবছরের শিশু পর্য্যন্ত নাই ! ছি !

* * * *

চণ্ডীমণ্ডপে ততক্ষণে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই আসিয়া জড়ো হইয়াছে। আটচালার মাঝখানে ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী দুগাই মিশ্র বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। সঙ্গে

একখানা বাঁধানো খাতা, একগাদা পরোয়ানা, একখানা রসিদ বই। তাহার হাপহাতা কামিজের বুক পকেটে ক্লিপ আঁটা একটা পেন্সিল—একটা ফাউন্টেন পেন। সে চালকাঠের দিকে চাহিয়া—নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বিড়ি টানিতেছে। সমবেত সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আজ এই মাঙ্গলিক পর্ব্বের দিন, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পাতা হইয়াছে। এখন কেমন করিয়া ঘর হইতে কড়ি বাহির করা যায়! আর কড়ি অর্থাৎ টাকাই বা কোথায়? এখনও হৈমন্তী ধান মাঠে। আউশ যে কয়টি হইয়াছিল তাহা বেচিয়া আলু বসাইবার খরচ চালানো হইয়াছে; কিছু মুনিষ মাহিন্দারকে দেওয়া হইয়াছে; কিছু নিজেদের জন্য আছে। এই নবান্নের খরচের জন্যও সে ধানও কিছু বিক্রী করা হইয়াছে। নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও দিব বলিলেই বা আসিবে কোথা হইতে। বুকের ভিতর উদ্বেগ লইয়া শুষ্কমুখে সকলে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল। বকিতেছিল—জগন ডাক্তার। ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় এবং অত্যাচার সে অনর্গল বর্ণনা করিয়া চলিয়াছিল।

মিশ্র বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া একসময় প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গো মোড়লরা, তা হ'লে—রসিদ লিখি?

প্রৌঢ় হরিশ বলিল—আজ যে নবান্ন মিশ্রি, লক্ষ্মীপাতা হয়েছে। আজ তো টাকা দিতে নাই বাপু!

মিশ্র বলিল—সে তো বুঝছি, কিন্তু সরকারী কাজে তো আমাবস্যে, পুর্ণিমে, লক্ষ্মীপুজো—সরস্বতী পূজোর বিধেন নাই বাপু। সরস্বতী পূজোর দিনেও কালী-কলম নিয়ে আমাদিগে কাজ করতে হয়—

জগন বাধা দিয়া বলিল—ওহে বাপু, আমরা সময় চেয়ে দরখাস্ত করেছি—

—কই, কোন দরখাস্ত তো পাই নাই আমরা!

—তোমরা? তোমরা কে হে? আমরা দরখাস্ত করেছি, এস-ডি-ওর কাছে।

সবিনয়ে মিশ্র বলিল—এস-ডি-ও তো আমাদের কাছে কোন খবর কি হুকুম পাঠান নি বাপু! আমরা কি ক'রে জানব? বোর্ডে যদি দরখাস্ত করতে তা' হ'লে অবশ্য একশোবার বলতে পারতে। বিবেচনা করতে বাধ্য ছিলেন প্রেসিডেণ্ট!

দেবদাস শুম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে এবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—তা' হ'লে সেইটাই হ'ল আসল কথা। প্রেসিডেণ্টের কাছে দরখাস্ত না ক'রে এস-ডি-ওর কাছে দরখাস্ত করাটাই হ'ল কারণ! তাই বেছে-বেছে নবান্নের দিনে অস্থাবরের ব্যবস্থা, না—কি গো মিশ্রি মশায়?

দুগাই মিশ্র তীর্য্যক দৃষ্টিতে দেবদাসের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বের মত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তাই যদি ভাব, তবে তাইই হ'ল!

জগন বলিয়া উঠিল—আপনারা শুনুন গো সব, শুনে রাখুন!

পণ্ডিত বলিল—এনকোয়েরী হ'লে বলতে হবে আপনাদিগে।

—আসছে বার ভোট দেবার সময় মনে করবেন কথাটা! কথাটা বলিয়া জগন বিদ্রোহীর মত উদ্ধত ভঙ্গিতে চারিদিকে একবার দেখিয়া লইল।

দুগাই মিশ্র কথাটা বলিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু কথাটা সত্য। দরখাস্তের সংবাদ ভুপাল জানাইয়াছিল, তাই বাছিয়া বাছিয়া আজিকার দিনেই অস্থাবরের ব্যবস্থা প্রেসিডেণ্ট করিয়াছেন। বিনীত আত্মসমর্পণের বিনিময়ে মার্জ্জনা করিতেও প্রস্তুত আছেন। সে কথাটা দুগাই জানে। কিন্তু সে বার্ত্তা প্রকাশের পূর্ব্বে সে নিজের প্রাপ্যটা আদায় অথবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চায়। নিজের অপ্রতিভ ভাবটা গোপন করিবার জন্য এবার সে অত্যন্ত কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিল—বলিল—তা হ'লে আমার আর দোষ দেবেন না কেউ। কর্ত্তব্য কাজ আমাকে করতে হবেই। ভুপাল! সে বেটা আবার কোথা গেল?

মিশ্রের সঙ্গে চৌকীদার ছিল আরও কয়েকজন, তাহাদেরই একজন বলিল—হুজুর। সে এখনও ডাক দিয়ে ফেরে নাই।

—হুঁ! তামাক খেতে জমে গিয়েছে কোথাও আর কি! বেটা—

ঠিক এই সময়েই ভুপাল ফিরিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কালীপুরের অধিবাসী, তাহাদের সকলের পিছনে বৃদ্ধ দ্বারকাচৌধুরী।

মিশ্র একটু সম্ভ্রম করিয়া চৌধুরীকে সম্ভাষণ করিল—আসুন চৌধুরী আসুন।

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—প্রণাম! সম্ভাষণ আগেই জানিয়েছে আপনার ভুপাল।

কথাটার খোঁচায় দুগাই একটু অপ্রস্তুত হইল। চৌধুরীকে সে একটু সম্ভ্রম করিয়াই চলে। প্রাচীন অভিজাত্যের দাবীতে এবং চৌধুরীর অনুদ্ধত মিষ্ট ব্যবহারে সম্ভ্রম অবশ্য সকলেই করে; কিন্তু দুগাইয়ের বেলায় অতিরিক্ত কারণ কিছু আছে। একখানা নূতন ঘর তৈয়ারী করিতে মিশ্র সেবার তালগাছের জন্য বৃদ্ধকে ধরিয়াছিল; দ্বারকা চৌধুরী বিনামূল্যে পাঁচটা তালগাছ দুগাইকে দিয়াছিল। মিশ্রের প্রার্থনা ছিল দুইটা গাছ। সময়টা ছিল বৈশাখ মাস—বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। চৌধুরী দুগাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ততক্ষণাৎ দুইটা গাছ দিতে প্রতিশ্রুত হইল—এবং অনুরোধ করিল—মিশ্রমশাই, স্নান করুন, তারপর আহার করে বিশ্রাম করে—ও বেলায় যাবেন।

মিশ্রের কিন্তু সময় ছিল না; তাহার পূর্ব্ব-রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় জল হইয়া গেছে—দেয়ালের খানিকটা ক্ষতিও হইয়াছে, সেইদিনই তালগাছের ব্যবস্থা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সে বাহির হইয়াছে—সে বলিয়াছিল—আজ মাফ করুন চৌধুরী মশায় অন্যদিন বরং হবে। আজ আমাকে মেলানপুর যেতে হবে। আরও তিনটে তালগাছ আমার চাই। আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি বাড়ীথেকে—

তাহার মুখের দিকে—এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চৌধুরী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা বৈশাখ মাসে কি অপূর্ণ থাকে মিশ্র মশায়; পূর্ণ হতেই হবে। সে হবে। নিন এখন স্নান করুন, আহার করুন, বৈকালে তালগাছ দেখুন—দেখে বাড়ী ফিরবেন। পাঁচটা গাছই আমার কাছেই আপনি পাবেন!

এই কারণেই মিশ্র আজ অপ্রস্তত হইল—অন্যজন হইলে সে উত্তর একটা দিত, বেশ যুতসই উত্তরই দিত। অপ্রস্তুত হইয়া সে বলিল—পেটের দায় চৌধুরী মশায়—আর আমার অদৃষ্ট; নইলে এই চাকরী কি মানুষে—করে! চাকরে আর কুকুরে কি সমান। প্রেসিডেণ্টের হুকুম—

বাধা দিয়া চৌধুরী বলিল—হুকুম তামিল করুন দেখি এখন; রসিদ কাটুন! আমার, নিশিমুখুজ্জের—

—হ্যাঁ গো. চৌধুরী মশায়—আজ যে নবান্ন—লক্ষ্মীর দিন! প্রৌঢ় হরিশের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—লক্ষ্মী কি আছেন পাল মশায়—যে লক্ষ্মীর দিন! লক্ষ্মীছাড়ার আবার লক্ষ্মী! চৌধুরী দশ-বারোজন গ্রামবাসীর নাম করিয়া বলিল—এদের রসিদগুলো কেটে ফেলুন। একটু হাত চালিয়ে কাজ করুন।

—এঁদের সবারই আপনি দেবেন? চৌধুরীকে জানিয়াও মিশ্র একটু বিস্মিত হইল।

—হ্যাঁ।

—মহাশয় লোক কি আর সাধে বলে লোকে? এমন লোক যে গাঁয়ে থাকে—সে গাঁয়ের লোকে বাস ক'রে পাহাড়ের আড়ালে! কত বড় বংশ! দুগাই মিশ্র উচ্ছ্বসিত হইয়াই কথাটা বলিল।

—না-গো না! ওঁরা সব আমাকেই দিলেন—দেবার জন্যে।

—আর না গো! মিশ্র বলিল—আমরাও মানুষ চৌধুরী মশায়—। বুঝি সব। দশ-বিশ খানা গ্রাম নিয়ে আমার কারবার, কই কাউকে তো এমন দেখলাম না। রসিদ লিখতে লিখতেই মিশ্র বলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। জগন ও দেবদাস ঘোষ পর্য্যন্ত স্তব্ধ! দুগাই মিশ্র রসিদ লিখিয়া টাকা লইয়া—রসিদগুলি কাটিয়া চৌধুরীর হাতে দিল—চৌধুরী চলিয়া গেল।

মিশ্র বলিল—এই ত বাপু, চৌধুরী টাকা দিলেন—নবান্ন-লক্ষ্মী তো ওঁর বাড়াতেও আছে!

ছিরু পাল আগাইয়া আসিল—ডাকিল—হরিশ কাকা! ছোটকাকা একবার শুনুন! ছিরু অত্যন্ত গম্ভীর—চোখে বিচিত্র দৃষ্টি।

হরিশ ও ভবেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল! ছিরুর কথাটা তাহাদের বিশ্বাস হইতেছে না। ছিরু বলিল—আমি ট্যাক্সের টাকাটা দিয়ে দি, অবিশ্যি যে যে রাজী হবে, আমাকে আপনারা পরে দেবেন। কি বলেন? ছোটকাকা – তুমি বাপু একটা কাগজে কার কত ট্যাক্স লিখে রাখ, পরে আবার গোল না হয়! মিশ্র মশায়—আপনিও একবার শুনুন! আজ এ বেলাটা আমার বাড়ীতেই থাকতে হবে আপনাকে। আমি ট্যাক্স সব দিয়ে দিচ্ছি। টাকাটা আমি জংসনে কলওয়ালার গদীতে আনতে পাঠাচ্ছি।

লক্ষ্মীর-দিন, ঘরে থেকে তো টাকা দিতে নাই! আপনার সম্মান আমি করব গো!

দুগাই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—বেশ তো! বেশ তো!

ছিরুর এই মহানুভবতায় গ্রামের লোক মুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিপদে আপদে ছিরু অবশ্য টাকা ধার বরাবরই দিয়া থাকে। হ্যাণ্ডনোট অথবা জিনিষবন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে কখনই সে আপত্তি করে না, শত্রুকেও না। কিন্তু আজিকার আচরণ অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত।

প্রেরণটা অবশ্য—চৌধুরীর কাছ হইতে আসিয়াছে। ওই চৌধুরীকে সে ঘৃণা করে, হিংসা করে! এই দুইখানা গ্রামের মধ্যে ছিরুই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী; চৌধুরী সে হিসাবে সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু কোন প্রাচীন-কালে তাহাদের সমৃদ্ধি ছিল বলিয়া বর্ত্তমানে তাহার সমৃদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া চৌধুরীকে লোকে সম্মান করে--এটা ছিরুর সহ্য হয় না। তা ছাড়াও চৌধুরীর ওই মিষ্ট মিষ্ট কথা যেন ছিরুর গায়ে বিষ ছড়াইয়া দেয়। সে কিছুতেই এমন করিয়া কথা বলিতে পারে না। মহত্বের প্রতিযোগিতায় ছিরু আজ অকস্মাৎ এমন করিয়া ফেলিল; আলোকচ্ছটার প্রতিচ্ছটার মতই তাহার এ আচরণের মধ্যে আলোকের পবিত্রতা-দীপ্তি-উত্তাপ সবই আছে। ছিরুর মুখের মধ্যে আত্মপ্রসাদ আছে—আত্মম্ভরিতাও হয়তো আছে; কিন্তু সে আত্মম্ভরিতা উগ্র নয় রূঢ় নয় মানুষকে আঘাত করে না। দেবু ছিরুর কাছে আসিয়া বলিল—আমার টাকাটাও দিয়ে দিস বাবা! এই তো চাই রে!

ছিরু বলিল—নিশ্চয়! যেয়ো কিন্তু খুড়ো, অন্নপূর্ণা পূজোর সব দেখে শুনে দিয়ো।

—নিশ্চয়! সন্ধ্যেতে ভাসানর গান আজ তোর ওখানেই হবে!

--বেশ! বেশ! কাছে-পিঠে যাত্রার দল নাই খুড়ো—তা হ'লে না হয় কাল—; ছিরু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িল। জগন ঘোষ ডাক্তার দম্ভভ'রেই বলিতেছিল—আমি হাত-ও কারুর কাছে পাতব না, ট্যাক্সও দেব না আজ লক্ষ্মীর দিনে! কর তুমি আমার অস্থাবর! সে স্যাণ্ডালটা পায়ে দিয়া ফটফট করিয়া চলিয়া গেল। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন উঠিয়া গেল। সে অনিরুদ্ধ!

অনিরুদ্ধ বাড়ী আসিয়া বিনা ভূমিকায় পদ্মকে বলিল—সেই নোটখানা দে তো!

পদ্ম ঘড়া হইতে ঘটিতে জল ঢালিতেছিল, তাহার হাত নিশ্চল হইয়া গেল—সেই নতভঙ্গিতেই সে শুধু মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। দৃষ্টিতে তাহার বিস্ময়--বিরক্তি যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে!

—সেই ছিরুর বউয়ের দরুণ টাকা! অনিরুদ্ধ টাকাটার কথা পদ্মকে স্মরণ করাইয়া দিল!

পদ্মের দৃষ্টির অর্থ কিন্তু তাহা নয়; তাহার দৃষ্টির অর্থ—লক্ষ্মীর দিন—একি লক্ষ্মী ছাড়ার আচরণ!

—বলি, দিবি? না—হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে বার করতে হবে?

এতক্ষণে পদ্ম একটি কথা বলিল—লক্ষ্মীর দিন—

—নিকুচি ক'রেছে তোর লক্ষ্মীর!--দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল, সে যেন বর্ব্বর পশু হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্ম ঘড়া ও ঘটিটা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়ের আঁচলে হাত মুছিয়া ঘরের ভিতর হইতে নোটখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ নোটখানা আনিয়া দুগাইয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। দুগাই তখন দু'খানা চেয়ার লইয়া ব্যস্ত। জগন ডাক্তারের চেয়ার ক্রোক করা হইয়াছে। জগন গম্ভীর-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে ডাক্তারখানার দাওয়ায়।

* * * *

সন্ধ্যায় অনিরুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু, ঘোষ মশায়!

ডাক্তার বাড়ীর ভিতর গ্রামোফোন লইয়া বসিয়াছিল। ছিরুর বাড়ী ভাসান গান হইতেছে, ডাক্তার ঘরে গ্রামোফোন জুড়িয়াছে। এক মক্কেলের গ্রামোফোন, আজই সেটাকে আনা হইয়াছে! অনিরুদ্ধ সাড়া না পাইয়া বাড়ীর ভিতরেই ঢুকিয়া পড়িল। ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কে?

—আমি অনিরুদ্ধ। একবার আসুন। আমাদের বউ কি রকম করছে। দাঁত লেগেছে। গোঁ-গোঁ করছে।

ডাক্তার আজ অনিরুদ্ধের উপর বিশেষ তুষ্ট ছিল—

অনিরুদ্ধ ছিরুর কাছে টাকা লয় নাই! হাসিয়া জগন বলিল—নবান্নে খেয়ে দেয়ে অম্বল হয়েছে—আর কি! চল!

—আজ্ঞে না; আজ দাঁতে কুটো কাটে নাই। রাগ করে কিছুই খায় নাই।

ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার উঠিয়া পড়িল।

বিসর্পিল গতি গ্রাম্যপথখানি গাছের ছায়া ও জ্যোৎস্নার আলোয় অজগরের মত বিচিত্রিত। জনহীন স্তব্ধ। ছিরুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে ভাসানের গানের সুর এবং শ্রোতাদের কলরব উঠিতেছে। আলোর ছটা দেখা যাইতেছে। ছিরুর বাড়ীর পাশ দিয়াই পথ। ডাক্তার সহসা জনহীন অন্ধকার চণ্ডীমণ্ডপটার ভিতর দিয়া মোড় ফিরিয়া বলিল—এই দিক দিয়ে আয়। চট্ ক'রে হবে।

চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিয়া গেলে চট করিয়া যাওয়া যায়, ছিরুর বাড়ীর সান্নিধ্যও এড়াইয়া চলা চলে। কিন্তু রাত্রে কেহ দেবস্থান দিয়া যায় না। ডাক্তার মোড় ফিরিতে অনিরুদ্ধও তাহার অনুসরণ করিল—তাহার আর দ্বিধা হইল না।

জনহীন—অন্ধকার চণ্ডীমণ্ডপ! কেবল অতীত ইতিহাস-লেখার মত আল্পনার সাদা রেখাচিত্রগুলি অন্ধকারের মধ্যে ঝলমল করিতেছে। ক্রমশঃ

রূপবতী

জসীম্ উদ্‌দীন

কে আসিলে তুমি ওগো রূপবতি! জবাকুসুমের দ্যুতি
তোমার সোনার অধর ঘেরিয়া করিছে রূপের স্তুতি।
তরল বিজলী-তরঙ্গে দুলি খেলিছে তোমারে লয়ে।
সন্ধ্যার মেঘ জড়াইছে গায়ে রাঙা অনুরাগ হয়ে।

মেরু কুহেলীর তুষারভবনে লক্ষ বরষ ভরি,
রঙিণ স্বপনে ঘুমায়েছ কি গো অনন্ত বিভাবরি?
শিয়রে তোমার অনন্ত রাতি জ্বালাইয়া কোটি তারা
অনন্ত চোখে করিয়াছে ধ্যান হইয়া আত্ম-হারা।
মহাকাল সেথা স্তব্ধ হইয়া অনন্ত যুগ ধরি
শত বরণের আঁকিয়াছে রেখা তোমার অঙ্গ ভরি।
নয়নে তোমার ভরিয়াছে আনি আকাশের নীল মায়া
আর আঁকিয়াছে সুদূর ধুসর বনানীর শ্যাম-ছায়া।
কুন্তলে তব মেরু কুহেলীর অনন্ত আঁধিয়ার
জড়ায়ে জড়ায়ে আঁকিয়াছে বসি মহারহস্য তার।
তারাগুলি সেথা তোমার বেণীর মণিমাণিক্য হয়ে
জ্বলেছে নিবেছে অনন্ত কাল তব রূপকথা কয়ে।
নিখিল নরের মমতা-কুসুম একটি একটি ছিঁড়ে
তব কণ্ঠের মন্দার হার গ'ড়ে দিয়েছিল ধীরে।
বরণে তোমার বহ্নি জ্বালিয়া ত্রিলোক কামনানলে
স্থবির সেকাল কল্পের শেষে উঠেছিল জ্বলে জ্বলে।

ওগো রূপবতি! আজি এলে তুমি ভাঙিয়া মেরুর ঘুম
সোনার অঙ্গে মাখিয়া এসেছ কুহেলীর নিজ্ঝুম।
আমি কি তোমার রূপের দেবতা, বাঁকায়ে কুসুম-তীর
লক্ষ বছর স্তবের মন্ত্রে ভেদিয়াছি তব নীড়।
আমার কামনা লক্ষ বছর জ্বলিয়া কি হোমানলে
আজি ফুটিয়াছে মন্ত্র-সিদ্ধ বাসনার শতদলে।

এ মন-মানস কোটি মরালীর ডানার আঘাত লয়ে
শত তরঙ্গে হ'য়ে বিতাড়িত দিকে দিগন্তে ব'য়ে:
আজি কি তাহার প্রসারিত বুকে হয়েছে এমন স্থান,
তুমি এসে হেথা ওগো অপ্সরি, করিবে কেলির স্নান!

আকাশ বাতাস কাঁপে থর থর মুরছে দিগঙ্গনা,
গ্রহতারাগুলি দুলিয়া শূন্যে পড়িতেছে বন্দনা।
ওগো রূপবতি, সম্বর তব সম্বর রূপজাল,
নতুবা এখনি কোটিধরা লয়ে ভেঙে যাবে মহাকাল।
ও বাহু-বাঁকান বিদ্যুৎ ধনু—আমি হীন মৃগ তার
ও রূপবহ্নি হবে না তৃপ্ত আমি যদি দহি আর।
এ নয়নে আছে কতটুকু তৃষা, কোটি গ্রহতারা ছাড়ি
উদিয়াছে যার বহ্নির শিখা কোটি মহাকাশ ফাড়ি—
এ নয়নে আছে কত প্রসারতা, সে রূপ জ্যোতিরে লয়ে
ছড়ায়ে পড়িব যুগ হ'তে যুগে স্তবের কুসুম হয়ে।

ওগো রূপবতি, তবু সাধ জাগে, গ্রহতারা ধরা ভরা
ঋতুর চক্রে শত খণ্ডিত মাটির বসুন্ধরা;
তৃণে আর ফলে কুসুমগন্ধে বিহগকাকলী লয়ে
এই বুক যেন প্রসারিত হ'ল সুদূর দিক্‌বলয়ে
যেন দিগন্ত ভরিয়া আসিল সুদূর প্রসারি ঘুম
তব অঙ্গের মাধুরীর মত মোহভরা নিজ্ঝুম।
তবু সাধ জাগে ওগো রূপবতি, কোটি কোটি যুগ ভরি,
ও সতী-অঙ্গ স্কন্ধে করিয়া চলি গ্রহপথ ধরি।
গ্রহ হ'তে গ্রহে কালে মহাকালে চলি আর শুধু চলি,
তোমার সোনার অঙ্গ হইতে খসিয়া রূপের কলি;
দেশে আর দেশে গড়িয়া উঠিবে দেবীর পীঠস্থান
যুগে যুগে সেথা পূজারীরা আসি রচিবে রূপের গান।

চণ্ডীদাস-নান্নুর

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

"নান্নুরের মাঠে পাতের কুটীর
নিরজন স্থান অতি।
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস নিতি
ভজন করয়ে তথি ॥"

নান্নুর বাঙ্গালার অন্যতম সারস্বত-তীর্থ। নান্নুর বাঙ্গালীর আদি মহাকবির বাণী-সাধনার পুণ্য-পীঠ। যখন বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস-সমস্যা লইয়া কোন গণ্ডগোল ছিল না, সে দিন—প্রায় ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১৮৭৩ খ্রীঃ) লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুলীপুর থানার অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।" এখন থানার নামও নান্নুর, গ্রামের নাম চণ্ডীদাস-নান্নুর।

উপরের উদ্ধৃত পদে এবং আরো একটী পদে—

"নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে বাসুলী বৈসে যথা।
বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ যে পাইবে কোথা।"

যেমন মাঠের উল্লেখ পাইতেছি, তেমনই দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত "ভক্তি-রত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর "গীত-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে চণ্ডীদাস বন্দনার পদে পাইতেছি—

"নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে
বাসুলী প্রসন্ন হইয়া।
রাই কানু দুঁহু নওল চরিত
কহল নিকটে গিয়া।"

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্ত-বিলাসে পাইতেছি—

"নিত্যের আদেশে বাসুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে ॥"

মালদহের ঐতিহাসিক স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় "গৌড়ের ইতিহাস" ১ম খণ্ডের একস্থলে লিখিয়াছেন, "বীরভূমে নলবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।" স্থানীয় বিবরণ হইতে জানা যায়, নান্নুর এই নলবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। নান্নুরে আজিও নলরাজার ভিটা,

বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাস-নান্নুরে চণ্ডীদাস স্মৃতিপূজা সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত চণ্ডীদাস সাধারণ পাঠাগার ও বিদ্যামন্দির (চণ্ডীদাস মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)

রাজবাড়ীর তেলগড্যা, ঘিগড্যা প্রভৃতি ছোট ছোট পুষ্করিণীর বিলুপ্তাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান নান্নুর ও সাকুলীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এই ধ্বংসস্তূপ বেড়িয়াই প্রাচীন নান্নুর অবস্থিত ছিল। বীরভূমের নলহাটী, সন্ধিগড় প্রভৃতি স্থানেও নলবংশীয় রাজগণের স্মৃতি-বিজড়িত ধ্বংসাবশেষ এক প্রবাদ বর্ত্তমান আছে।

নান্নুরের নলবংশীয় শেষ রাজার নাম সাতরায় বা সত্য রায়। গোপভূমের রাজধানী অমরার গড়ের রাজা মহেন্দ্র রায়ের সেনাপতি কীর্ণাহার বা কর্ণহার এই সত্য রায়কে পরাজিত করিয়া নান্নুর অধিকার করেন এবং রাজভবন ধ্বংস করিয়া নিজ নামে কীর্ণাহার বা কর্ণহার গ্রাম প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি প্রাচীন নান্নুরের অধিবাসীগণ ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি—নান্নুরের এক ক্রোশ উত্তরে প্রাচীন কীর্ণাহার গ্রাম। এই স্থানের কীর্ণাহার বা কর্ণহার-বংশীয় শেষ রাজার নাম কিঙ্কিন, চণ্ডীদাস ইঁহারই সভাকবি ছিলেন। কীলগির খাঁ নামক একজন পাঠান-বংশীয় যোদ্ধা এই কিঙ্কিন রাজাকে নিহত করিয়া কীর্ণাহার ও নান্নুর অঞ্চল অধিকার করেন। কীর্ণাহারে কিঙ্কিনের রাজবাটী ও দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, কীলগির খাঁই চণ্ডীদাসের হত্যার আদেশ দেন, এদিকে কীর্ণাহারের একস্থানে সংকীর্ত্তন সময়ে নাটমন্দির পতনে চণ্ডীদাস সমাধিস্থ হন।

নান্নুরে রামী রজকিনী সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। রামীর পিত্রালয় ছিল তেহাই গ্রামে। রামী যে পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিত সেই "দেবখাত পুষ্করিণী" ও
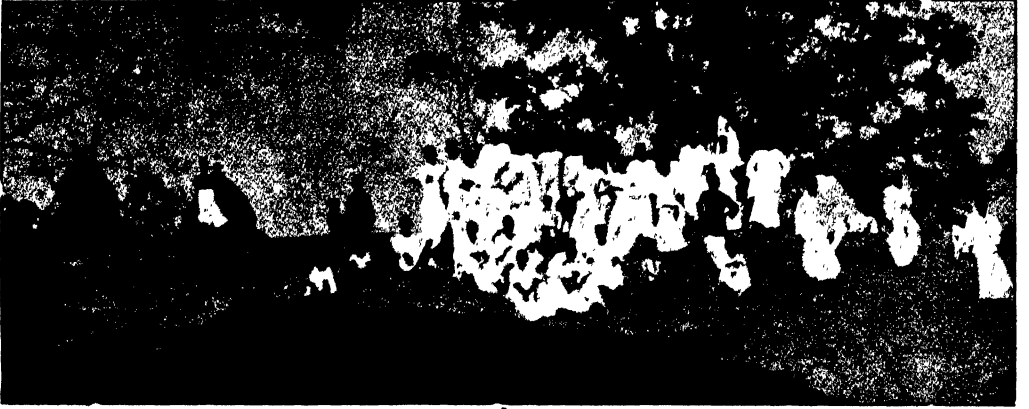
চণ্ডীদাসের ভিটা ও বিশালাক্ষী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ

সরিয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করিলে বর্ত্তমান নান্নুরের প্রতিষ্ঠা হয়। নান্নুরের চণ্ডীদাসের ভিটা নামে পরিচিত স্তূপটী যে বাসলী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই স্তূপের নিকটেই মাঠের শিব বা হাটতলার বুড়ো শিবের মন্দির ছিল। এই স্থানেই যে চণ্ডীদাসের কুটীর ছিল, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত একখানি সহজ সাধনের পুঁথিতে তাহার উল্লেখ আছে—

নান্নুর গ্রামের ঈশান কোণেতে।
তথা হইতে একপোয়া নিকট সাক্ষাতে॥

চণ্ডীদাসের কুটীর। বর্ত্তমান চণ্ডীদাসের ভিটা প্রাচীন নান্নুরের ঈশান কোণেই অবস্থিত।

"রামীর কাপড়-কাচা পাটা" (একখানি প্রস্তরীভূত কাষ্ঠ) আজিও নান্নুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চণ্ডীদাসের উপাস্যা দেবী "বাগীশ্বরী", "বাসলী" বা "বিশালাক্ষী" নান্নুরে আজিও পূজা পাইতেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—"ঐ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্যা দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী, অপভাষায় ইহাকে বাসুলী বলে।" এই মূর্ত্তির দুই হাতে বীণা, একহাতে পুস্তক ও অন্যহাতে জপমালা। অগ্নিপুরাণে এইরূপ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে—"পুস্তাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী"। বাগীশ্বরী—

তান্ত্রিক, বৈদিক, শাক্ত, সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্যা। এই দেবীর সঙ্গে সাধনার এক গূঢ়রহস্য জড়িত আছে। তান্ত্রিক হোমের এই মন্ত্রটী সেই সাধনার ইঙ্গিত।

"বাগীশ্বরীমৃতু স্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাং॥"

এই সাধনায় হোমকুণ্ড, ঘৃত, বহ্নি-স্থাপন, পুষ্প, ইন্ধন প্রভৃতি সমস্ত শব্দগুলিই এই রহস্যময় সাধনার গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক পারিভাষিক শব্দ। কবি চণ্ডীদাসের সহজসাধন বা ঐরূপ কোন সাধনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে এই বাগীশ্বরীরই উপাসক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই কারণ নাই। বাগীশ্বরীই অপভ্রংশে বাসলী হইয়াছেন। ইঁহার প্রণামে ইহাকে বিশালাক্ষীও বলা হইয়াছে।

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে॥

নান্নুরের জমিদারবংশীয় শ্রীমান্ অনাদিকিঙ্কর রায় প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী কর্ম্মী নান্নুরে চণ্ডীদাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে "চণ্ডীদাস পাঠাগার" ও "চণ্ডীদাস উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি নান্নুরে যে বীরভূম-জেলা-সাহিত্য-সম্মেলন ও চণ্ডীদাস-সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গেল, এই সম্মেলনে চণ্ডীদাসের ভিটা খননের উদ্দেশে স্থানীয় প্রতিষ্ঠা-ভাজন যুবক খানসাহেব মৌলভী সৈয়দ আবদুল মজিদকে লইয়া একটী শক্তিশালী কমিটী গঠিত হইয়াছে। স্তূপটী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্ট এই স্তূপ খননের অনুমতি দিবেন এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। বাঙ্গালায় এই ধরণের স্তূপ খননের বেসরকারী প্রচেষ্টা এই প্রথম। সুতরাং এদিকে বাঙ্গালার বিদ্যানুরাগী বিত্তশালী সম্প্রদায় ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর প্রথম মহাকবি। সুতরাং তাঁহার মর্য্যাদানুরূপ স্মৃতিরক্ষায়ও সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

চণ্ডীদাস যে বাঙ্গালার আদি কবি এবং মহাকবি, সে বিষয় বিতর্কের অতীত। শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্বযুগের যে দুইজন মহাকবির নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারি, তাঁহার একজন বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, অন্যজন মিথিলার বিদ্যাপতি দুইজন কবিই এক গোষ্ঠীভুক্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব

দেবখাত পুষ্করিণী চণ্ডীদাস-নান্নুর। এই পুকুরে চণ্ডীদাস মাছ ধরিতেন ও রামী কাপড় কাচিত। সম্মুখে রামীর কাপড় কাচিবার পাটা

সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, অথচ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; দুইজনই মহাপণ্ডিত ও মহাকবি। দুইজনই রাজসভার কবি। সংক্ষেপে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়—

বিদ্যাপতি ছিলেন একজন সিদ্ধ-স্থপতি। মানবের পরমাশ্রয় প্রেমের প্রাসাদসৌধ নির্ম্মাণেই ছিল তাঁহার আনন্দ। এইরূপে তিনি এমন এক গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা বিগ্রহেরই বাসোপযোগী মন্দির; সাধারণ নরনারীর উপাসনার স্থল। যাহা ধরণীর ধূলামাটীতে থাকিয়াও উর্দ্ধদিকে শীর্ষোত্তোলন করিয়া বৈকুণ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে। বিদ্যাপতি ধন্য হইলেন, তাঁহার রচিত মন্দির সেই অনাদি-অব্যয় চির-প্রেমময়ের পাদস্পর্শে ধন্য হইল। বিদ্যাপতির মানব-প্রেমের বাস্তবানুভূতি অপ্রাকৃত প্রেমের দিব্যানুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

চণ্ডীদাস ছিলেন আজন্ম-সিদ্ধ ভাস্কর। নরনারীর প্রেমের মূর্ত্তিনির্ম্মাণই তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক শুভ মুহূর্ত্তে বিস্মিত চণ্ডীদাস অনুভব করিলেন, তাঁহার নির্ম্মিত মৃন্ময় নরনারী না জানি কখন চিন্ময়-যুগলবিগ্রহে রূপান্তরিত হইয়াছে। মর্ত্তের মানব অমৃতের বার্ত্তা বহন করিয়া

আনিয়াছে। নির্ম্মাতা চণ্ডীদাস কখন স্রষ্টা চণ্ডীদাসে পরিণত হইয়াছেন। তাই চণ্ডীদাসের কবিতা মানুষের ভাষায় কথা কহিতে গিয়া সেই শাশ্বত প্রেম-কল্পলোকের অমৃত বাণীই উচ্চারণ করিয়াছে।

যাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠ করিবেন, তাঁহারাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বলিয়াছেন—

যে কানু লাগিয়া মো আননা চাহিলোঁ বড়াই
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পরিহাসে আমা উপেখিয়া রোষে
আন লঞা বঞে বৃন্দাবনে॥

বাশুলীদেবী—চণ্ডীদাস-নানুর—ধ্বংসস্তূপ হইতে ইহা পাওয়া গিয়াছে

বড়াই গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর শুখাইল লো
মুঁই নারী বড় অভাগিনী॥

প্রেমের এই যে সুধাবিষের জ্বালা, আনন্দের এই যে অসহনীয় বেদনা, দহে ঝাঁপ দিতে গেলেও দহ শুকাইয়া যায়, প্রেমের অকূল-পাথারে কুল শীল লজ্জা ধৈর্য্যের সঙ্গে কূল (তীর) ও কোথায় মিলাইয়া যায়—চণ্ডীদাস পদাবলীর পরতে পরতে এই সুর। বাঙ্গালার নিত্য-নীল-গগনাঙ্গনে এই প্রেম-করুণ-কণ্ঠ পাপিয়ার সেই সুর, সেই অমৃত-মদির সঙ্গীত আজিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি আনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

বাঙ্গালায় এই গান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি-বিরচিত রত্নমন্দিরে চণ্ডীদাসের প্রেমের হেম-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। বাঙ্গালা ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রেমসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ক্ষণবসন্ত

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পেয়েছিনু নির্জ্জনতা শান্তিভরা নিভৃত আঙনে;
তবুও মনের কথা প্রিয়তমে র'য়ে গেল মনে।
অখণ্ড সময় ছিল, অবসর ছিল সীমাহীন,
হাতে কাজ ছিল না কো, তবু হায় কল্পনা রঙীণ
হ'ল না দিবসগুলি, সুমধুর হ'ল না রজনী;
সুন্দর সুযোগ যত, তুলিল না কোনো প্রতিধ্বনি!

তবু কি পিপাসা নেই? মিথ্যা কথা বলিব কি ক'রে?
আশা জাগে, চূর্ণ হয় রাত্রিদিন মনেরি ভিতরে।

শুধু ব্যর্থতার গ্লানি ক্ষয় আনে ক্ষণবসন্তের;
আকাশের তৃষ্ণা জাগে আন্দোলনে নীচে অরণ্যের;
সূর্য্য ওঠে, অস্ত যায়, তারাগুলি করে ঝলমল,
তবুও দেয় না ধরা কাননের শ্যামল অঞ্চল।

জীবনের যাত্রাপথে কত স্বপ্ন ভেঙেছে এমনি,
তুমি জানো আমি জানি বৃথা হ'ল কত নিবেদনই!
হাহাকারে ভরা বুকে কেন জাগে রোমাঞ্চ নবীন?
কেন এ নির্জ্জনবাস—বেদনায় পূর্ণ রাত্রিদিন?

বলিব যা ভেবেছিনু তোমারে টানিয়া প্রিয়ে কাছে,
কিছুই হ'ল না বলা। শুভলগ্ন চলিয়া গিয়াছে।

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

রায়েদের দীঘির শাণ-বাঁধানো ঘাট মেয়েদের কলকণ্ঠের কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিল। নব-পরিণীতা নবদুর্গাকে ঘিরিয়া যত রঙ্গ-পরিহাস বাদানুবাদ সুরু হইয়া গেল। একে একে সেখানে পাড়ার আরও অনেক মেয়ে ও বধূরা আসিয়া জুটিল এবং দীঘির কাকচক্ষু—অধুনা বর্ষার ঘা খাইয়া একটু ঘোলাটে-হইয়া-ওঠা জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কত রঙ্গ-পরিহাসের কথাই না জুড়িয়া দিল। সবারই লক্ষ্যবস্তু নবদুর্গা, কাজেই নবদুর্গা সবার মাঝে পড়িয়া যেন হাঁপ লইতে লাগিল। কিন্তু নবদুর্গার এসব ভালই লাগিতেছিল; সে যে আবার কোন দিন সবার দৃষ্টি এমন একান্ত করিয়া আকৃষ্ট করিতে পারিবে তাহা ভাবিতে পারে নাই। টিয়া ও বাব্‌লির কাছে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি তাহাকে করিতে হইল। রায়েদের ছোট তরফের ছোটবাবুর ছোট মেয়ে রেণি—সেটি আবার ফাজিল কম না, সে একসময় নবদুর্গাকে অপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্য সহসা নবদুর্গার গণ্ডের একস্থানে একটি আঙুলের ডগা সকৌতুকে স্পর্শ করাইয়া বলিয়া উঠিল, হাঁরে দুগ্‌গি, এ দাগটা তোর তো আগে ছিল না।

নবদুর্গার মুখ-চোখ একেই পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ রাঙিয়া ছিল, তাহাতে রেণির কথা যেন আরও রঙ্‌ চড়াইয়া দিল।

নবদুর্গা কোনক্রমে রেণির কথার উত্তরে বলিল, তা অত কি আগে লক্ষ্য করেচি, আর নতুন হওয়াও খুব বিচিত্র না। তা তুই যখন বলচিস্‌ তখন হয় তো সত্যিই ছিল না।

সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ইহাতে নবদুর্গা বেশী অপ্রতিভ হইল, না রেণি, তাহা বিচার্য্য বটে!

রায়েদের দীঘির ঘাটে কল-কৌতুক যখন বন্ধ হইল তখন সন্ধ্যা সুনিবিড় হইয়া ঘনাইয়া নামিয়াছে। টিয়া, নবদুর্গা ও বাব্‌লি ত্রস্তে কাপড় ছাড়িয়া কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। টিয়া অন্ধকার-ঘনানো পথ দিয়া নীরবে চলিতে চলিতে ভাবিতেছিল, আজ না জানি কপালে তাহার কত গাল-মন্দই লেখা আছে। ছোটমা এতক্ষণে নিশ্চয় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া টিয়াকে বিদ্ধ করিবার মত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। টিয়া পথে সাথীদের বিদায় দিয়া যখন গৃহে ফিরিল, পা তখন আর তাহার যেন গৃহের দিকে চলিতেছিল না।

টিয়া উঠানে পা দিতেই নিশি সজ্জন প্রথম কহিল, এত দেরি হ'লো যে তোর দীঘির ঘাট থেকে ফিরতে?

টিয়া চকিতে উঠান ও ঘরের দাওয়াগুলির দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ছোটমা রূপসীকে দেখিতে না পাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দিল; আজ নবদুর্গা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে কি না—সেই তারই জন্যে এত দেরী হ'য়ে গেল। তুমি আজ নূপুরগঞ্জের হাটে গিচলে বুঝি? এই ফিরে আসচো?

না, ফিরেচি আমি অনেকক্ষণ। ফিরে দেখি একটা লোকও ঘরে নেই যে এই জিনিষগুলো ঘরে তুলে নেবে। শেষে আমাকেই একটা একটা ক'রে ঘরে তুলতে হ'চ্ছে—এ যেন এক লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী হয়েচে।—বলিয়া নিশি সজ্জন উঠানে জড়ো করা অবশিষ্ট কয়েকটি ঝুনা নারিকেল তুলিতে যাইতেছিল, টিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাজে বাধা দিয়া বলিল—যাক্‌ বাবা, আমি যখন এসেই পড়েচি তখন আর তোমাকে কষ্ট ক'রে ওগুলো তুলতে হবে না।

নিশি সজ্জন কার্য্য হইতে বিরত হইল। তারপরে টিয়ার আর একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া আস্তে করিয়া বলিল, তোর ছোটমা'র কি জ্বর হয়েচে নাকি টিয়া?

কই, আমি তো জানি না।—বলিয়া টিয়া রান্নাঘরের দিকে জলের কলসী লইয়া চলিয়া যাইতেছিল - নিশি সজ্জন আবার কি মনে করিয়া যেন বলিল, ভাল কথা টিয়া, আজ নূপুরগঞ্জের হাটে মনোহরের সঙ্গে দেখা হ'লো। সে বললে, বকফুলীর ওপারে ধবলীর কুণ্ডুদের বাড়ী তারা পালা গাইতে এসেচে। কাল সময় পেলে সে এসে দেখা ক'রে যাবে'খন।

টিয়া কথাটা শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র খুশী হইতে না পারিয়া নিজের কাজেই চলিয়া গেল। কারণ, ছোটমা'র

যখন জ্বর তখন সাতদিন সাতরাত্রি তো সে আর কোন কাজেই হাত দিবে না, আর সুস্থ থাকিলেই বা কি—টিয়াকেই গৃহের প্রায় সমস্ত কাজ করিতে হয়। উনন তখনও ধরে নাই—রাত্রের রান্না তো পড়িয়াই আছে।

টিয়া জলের কলসী রান্নাঘরে নামাইয়া রাখিয়া উঠানের নারিকেলগুলি যথাস্থানে—অর্থাৎ উত্তরের ঘরের 'কারে' তুলিয়া রাখিয়া উনন ধরাইতে গেল। উনন ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়া ছোটমা'র শয্যার পাশে গিয়া বসিতেই রূপসী যেন খেপিয়া উঠিল। অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রূপসী বলিল, আমি বলে কি-না জ্বরের তাড়সে ম'রে যাচ্ছি, আর এই সোমত্ত মেয়ের কি-না রাত দশটা বাজিয়ে দীঘির ঘাট থেকে আড্ডা ভেঙ্গে ফেরা হ'লো!

টিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ঘাটে যাওয়ার আগেও তোমাকে ভাল দেখে গেলাম—কই, তাড়াতাড়ি ফেরার কথাও কিছু ব'লে দিলে না। আমি তো আর গুণতে জানি না যে—

অ, গুণতে জানো না বুঝি!—বলিয়া রূপসী অতি কঠিন শ্লেষ করিল; তারপরে বলিল, কিন্তু গুণতে জানো ব'লেই তো পেত্যয় লাগে, নইলে এ ক'দিন তো খালের ঘাটেই গা ধু'তে যাওয়া হচ্ছিল, আজ আবার দীঘির ঘাটে যাওয়া হ'লো কেন? দত্ত-বাড়ীর ছেলে আজ নূপুরগঞ্জের হাটে গেচে, ফিরতে তার রাত হবে—সে সব তো গুণতে পারো দেখচি।

টিয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—রাগে, না দুঃখে সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। দত্ত-বাড়ীর সুন্দর যে আজ হাটে গেছে তাহা তো তাহার জানা ছিল না, আর ছোটমা'ই বা সে-খবর জানিল কেমন করিয়া? তবে একটা কথা তাহার মনে হইল, হইতে পারে তাহার পিতার সহিত সুন্দরের হাটে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কথায় কথায় সে হয় তো ছোটমা'র কাছে সেকথা বলিয়াছে। কিন্তু সে একবারও ভাবিতে পারিল না যে, রূপসী অপরাহ্নে খালের ঘাটে গিয়াছিল নিজের কাজে এবং সুন্দর ও গঙ্গাকে সে নৌকায় উঠিতে দেখিয়াছিল, আর নৌকা ছাড়ার কালে সুন্দরের মা পূর্ণলক্ষ্মীকে পাড়ে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিতেও শুনিয়াছিল, নূপুরগঞ্জের হাটে যাচ্ছিস্ যা, কিন্তু ফিরতে যেন রাত বেশী হয় না। তাড়াতাড়ি ক'রে ফিরিস্ কিন্তু সুন্দর।

সে যাহাই হউক, রূপসীর এই কঠিন ইঙ্গিতে—আর ইঙ্গিতই বা বলি কেমন করিয়া, ইহাতো স্পষ্ট করিয়াই বলা, টিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তবু টিয়া নিজেকে অতিকষ্টে সংযত রাখিয়া বলিল—নবদুর্গা আর বাব্‌লি এসেছিল ব'লেই রায়েদের দীঘিতে গেলাম গা ধু'তে, নইলে খালের ঘাটেই যেতাম।

রূপসী সপাঙ্গে একবার টিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং আর কোনও কথা বলার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না।

টিয়া কিছুক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আবার বলিল, তোমার জন্যে কি পথ্যি হবে জানতে পেলে পরে ছোটমা—

রূপসী সহসা শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, পথ্যি হবে মানে? আমাকে পথ্যি করাবার জন্যে এত কিসের গরজ তোদের শুনি? আমার হয়েছেটা কি? দুপুরে আজ ঘুমুতে পারিনি তো তোদের তিনজনার দাওয়ায় ব'সে গজর্ গজর্ করাতেই, আর তারই ফলে সন্ধ্যে হ'তে-না-হ'তেই ধরেচে মাথা। আমাকে পথ্যি করাতে পারলেই যেন তোদের সবার মনের সাধ মেটে?—

বলিয়া রূপসী অদ্ভুত একপ্রকার মুখভঙ্গী করিল—যেন নিজের অদৃষ্টকেই সে ক্ষোভে মুখ ভেংচাইল।

টিয়ার বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। ছোটমা'র প্রকৃতি আজিও সে সম্যক্ চিনিয়া উঠিতে পারে নাই, কখন যে কোন্ বিচিত্র পথে তাহার মনের ধারা বহিতে থাকে তাহা সে যেন নিজেও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অপরের তো কথাই নাই।

টিয়া আর একটা কথাও না বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। মানুষের চরিত্র যে কত বিচিত্র ও হীন হইতে পারে তাহা যেন সে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল।

ওপারের ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া টিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাওয়ার মত এমন কিছু কাণ্ড আর সুন্দর করে নাই। দত্ত-বাড়ীর ঘাটে বাঁধা নৌকার গোলুইয়ের উপর বসিয়া সুন্দর একটা পিতলের দাঁড়ে শিকল দিয়া বাঁধা টিয়াপাখীটিকে খালের

জলে স্নান করাইতেছিল। টিয়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া নিজেদের ঘাটে দাঁড়াইয়া মুখে কাপড় তুলিয়া দিয়া সলজ্জ চাপা হাসি হাসিতে লাগিল। সুন্দরের সেদিকে সহজেই দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু দৃষ্টি যে পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে না দেওয়ার ভান করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তবে পাখীটিকে স্নান করানোর ঘটা কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গেল।

টিয়া ঘাটে আসিয়াছিল সামান্য গোটা দুই বাসন লইয়া, তাড়াতাড়ি সেগুলিকে মাজিয়া ধুইয়া লইয়া সে উঠিয়া যাইতেছিল এমন সময় পাখীটার অস্বাভাবিক চীৎকারে আবার সে ফিরিয়া চাহিল। টিয়া ফিরিয়া চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা উপভোগ্য হইলেও করুণ। পাখীটি সুন্দরের বাঁ-হাতের একটা আঙুল যেন আক্রোশে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর সুন্দর সেই আঙুলটা ছাড়াইয়া লওয়ার জন্য যেন প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। টিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল; কাজেই সুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, পাখীটাকে জলে ডুবিয়ে ধরো—শীগ্‌গির, নইলে কি ছাড়ানো সহজ!

সুন্দর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দাঁড়-সমেত পাখীটিকে জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিল এবং কেমন একপ্রকার লজ্জায় সে না হাসিয়াও থাকিতে পারিল না। টিয়ার বুদ্ধি কাজে লাগিল। পাখীটি আত্মরক্ষার্থ সুন্দরের আঙুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। সুন্দর পরমুহূর্ত্তেই আবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দাঁড়-সমেত পাখীটিকে নৌকার উপরে তুলিল। টিয়া তখন রহস্য-কৌতুকে মুখ চাপিয়া হাসিতেছিল। সুন্দর তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিল, তা শত্তুরের সর্ব্বনাশ হ'তে দেখলে কেই বা না খুশী হয়।

হুঁ, তা খুশী তো হয়েচি। আর কেনই বা খুশী হবো না শুনি? আমাকে যারা ঠাট্টা করবে—তা সে শত্রুই হোক, আর মিত্রই হোক্—তাদের দুঃখে আমি খুশী হবোই, একশোবার হবো।—বলিয়া বিজয়গর্ব্বে টিয়া মাটিতে পা ফেলিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া গেল।

বাতাবী লেবু গাছটার কাছ বরাবর আসিতেই তাহার নজরে পড়িল মনোহর—সে ঘাটের দিকেই আসিতেছে। টিয়া আর মুহূর্ত্তমাত্রও সেখানে দাঁড়াইল না, বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া চলিল। মাথা সে নীচু করিয়াই অগ্রসর হইতেছিল। মনোহরের অতি নিকটে আসিয়াও সে মাথা তুলিয়া চাহিল না, মনোহর ইহাতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—সকালবেলা আমার মুখ দেখাও কি পাপ নাকি টিয়াপাখী? একেবারে মাথা গুঁজে যে চলেছো? এমন কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে শুনি?

টিয়া থমকিয়া পথের মাঝেই দাঁড়াইয়া গেল।

মনোহর টিয়াকে নীরব দেখিয়া আবার বলিল—আমি যে আজ আসবো তা নিশ্চয় জানতে? কাল নূপুরগঞ্জের হাটে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁকে সে কথা তো ব'লে দিয়েছিলাম, বলেন নি বুঝি কিছুই?

টিয়া বলিল—হুঁ, তা বলেচেন বই কি! ধবলীর কুণ্ডুদের বাড়ী পালা খাটতে এসেছিলে বুঝি?

মনোহর ভারি খুশী হইল। টিয়া তো তবে তাহার সকল খবরই রাখে। কাজেই মনোহর বলিল, কাল রাত্তিরে যাত্রা গেয়ে রাত থাকতেই রওনা হ'য়ে পড়েছি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আরও আগে এসে পৌছুতে পারতাম, কিন্তু বকফুলী পার হওয়ার জন্যে সুবিধে মত নৌকা পাওয়া গেল না, শেষে তিন আনা পয়সা খরচ ক'রেই পার হ'তে হ'লো; আর একটু দেরী করলে অবশ্য তাও লাগতো না। তা তিন আনা পয়সা এমন কিছু বেশীও আর না।

টিয়া এইবার একটু রূঢ় হইয়া কহিল—কেন, তিন আনার পয়সাই বা থামোকা খরচ করতে গেলে কেন?

মনোহরও ইহাতে রূঢ় না হইয়া পারিল না, বলিল—আমার পয়সা আমি খরচ করবো তাতে কার কি বলার আছে? বেশ করেচি।

টিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসিয়াই টিয়া পথ ছাড়িয়া ঘাসের জমির উপর দিয়া মনোহরকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। মনোহর অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা আমার শুনে যাও টিয়া।

মনোহরের ভারী কণ্ঠ টিয়াকে চম্‌কাইয়া দিল, সে দাঁড়াইয়া গেল। মনোহর দুই পা অগ্রসর হইয়া টিয়ার মুখের প্রতি গভীর দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, এই যে আমার আসা-যাওয়া এ তোমার একেবারেই পছন্দ হয় না—তাই না কি টিয়া? আমাকে তুমি দেখতে পারো না, না? কিন্তু আমি এমন কি অন্যায় করেচি শুনতে পাই না কি?

টিয়া ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল—না, তুমি কেন আবার অন্যায় করতে যাবে শুনি? আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আমার ব্যবহারে কেউ খুশী হয় না। নইলে, এত খেটেও তো ছোটমা'র মন যোগাতে পারি না।

মনোহর সুযোগ পাইয়া বলিল, সে আমি জানি। আর দিদি তো চিরকালই এম্‌নি—তার মন জোগাতে পারে এমন মানুষ বোধ করি পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। বাবার মত ভালমানুষই দিদিকে সহ্য করতে পারতেন না, তা অন্যের তো কথাই নেই। দিদির বিয়ের পরে বাবা তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—যাক্, এতদিনে পাপ বিদেয় হ'লো। দিদির গুণের আর ঘাট নেই। সত্যি কথা বলতে কি টিয়া, দিদির সঙ্গে দেখা করতে আমি শিখীপুচ্ছে আসি না কোনদিনই··· তা তোমার যদি পছন্দ না হয় তো আর সত্যিই আসবো না।

টিয়া লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—আসবে না কেন, নিশ্চয় আসবে। তোমার আসা-যাওয়া যে আমি পছন্দ করিনে এ খবর কি তোমার কাছে বাতাসে পৌঁছেচে?

বলিয়া হাসিয়া ফেলিয়া টিয়া ত্রস্তে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। মনোহর খুশী হইয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল ভাল করিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া আসিতে।

টিয়া সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মনোহরকে খুশী করিতে গিয়া কত বড় বিপদ যে সেই সঙ্গে ডাকিয়া আনিল তাহা বুঝিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। টিয়া মনোহরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। মনোহর কিন্তু টিয়াকে রান্নাঘরে স্বস্তিতে রান্নার কাজে ব্যাপৃত থাকিতে দিল না, অবিলম্বে ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দাঁড়াইয়া দুই-একটা অবান্তর কথা তুলিল এবং পরমুহূর্ত্তেই রান্নাঘরের বেড়ার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা পীঁড়িগুলির মধ্য হইতে একখানি পীঁড়ি মেঝেয় পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, এককালে শিখীপুচ্ছের রায়েদের বাড়ীতে নাকি খুব যাত্রা-গান হ'তো শুনেচি, আর সেকথা মিথ্যেও নয়, কারণ অধিকারী ম'শায়ের মুখেই সেকথা আমার শোনা। এখন কই, সে সব আর হয় না। হ'লে পরে বেশ হ'তো কিন্তু টিয়া, তা হ'লে আমি তোমাকে আমাদের দলের যাত্রা শোনাতে পারতাম। তা'হলে বুঝতে পারতে যে আমি বড়-একটা সামান্য লোক নই। আজকাল দলের মধ্যে য়্যাক্টিং-এ আমি সেকেণ্ড্ যাচ্ছি, শালুকখালির কেশব চৌধুরীকে কিছুতেই আর এঁটে ওঠা গেল না, ও-লোকটা যেন একটা বর্ন্-য়্যাক্টর, আর কি খাসা গলাখানা! তেম্‌নি আবার তাঁর চেহারা! সভার মধ্যে এসে যখন—'সখে বাসুদেব!' ব'লে দাঁড়ায়—তখন সাধ্য আছে কি কোন লোকের যে কাণ না খাঁড়া ক'রে থাকে! হ্যাঁ, ও-লোকটার কাছে হার স্বীকার ক'রেও আনন্দ আছে। হ্যাঁ, য়্যাক্টর যদি বলি তো—কেশবদা' আমাদের একজন য়্যাক্টর্ বটে!

কেশব চৌধুরীর অভিনয় যত চমৎকারই হউক্ না কেন, টিয়া মনোহরের কথায় কোন চমৎকারিত্ব খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু মনোহরকে সেখান হইতে কি উপায়ে যে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিদায় লইতে বলা যায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার ভয় হইতেছিল ছোটমা'র জন্য, কেন না এখানে আসিয়া এমন কিছু কঠিন কথাই হয় তো বলিয়া ফেলিল যে, তাহারই চোট্ সাম্‌লাইয়া উঠিতে টিয়ার সারাদিন কাটিয়া যাইবে। কারণ, রূপসীর এবম্বিধ হঠকারিতা ও বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্টতার বহু প্রমাণই সে এ যাবৎ পাইয়াছে।

টিয়া তাই বলিয়া ফেলিল—এখন তুমি উঠে গিয়ে ছোটমা'র ঘরে একটু ব'সো। আমার কাজ-কম্‌মো সারা হ'লে পর তোমার কাছে তোমাদের যাত্রার গল্প শুনবো'খন। কাজের সময় গল্প করছি দেখলে ছোটমা হয় তো চটবেন আবার!

মনোহর ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং দিদির বুদ্ধিবৃত্তির একটু নিন্দা করার সুযোগ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল—হ্যাঁ, দিদি আবার চটবেন, আর তা আবার নাকি লোককে গ্রাহ্য ক'রেও চলতে হবে! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী! দিদি তো অষ্টপ্রহর চ'টেই আছেন, একটা লোককেও যদি দুনিয়ায় দেখতে পারলেন। অমন স্বার্থপর আর কাণ্ডজ্ঞানহীন যে মানুষ আবার হয় কেমন ক'রে—তা তো আমি ভেবে পাই না।

টিয়া মনোহরকে তাড়াতাড়ি থামাইবার জন্য বলিল—তুমিও তো খুব লোক যা-হোক্ মনোহরমামা। তাঁরই বাড়ীতে ব'সে তাঁরই নিন্দে করছো।

নিন্দে আবার কি রকম? যা সত্যি তাই তো আমি বলচি।—বলিয়া মনোহর একটু হাসিতে চেষ্টা পাইল। যাক্ এখন সে সব কথা, আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারো টিয়া, কাল সারারাত জেগে পালা গেয়ে গলাটা আমার কেমন একটু ড্যামেজ হয়েচে, চা না হ'লে আর চলছে না যে।

চা? চা'র কোন আয়োজনই তো এ বাড়ীতে নেই। আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি বাব্লিদের বাড়ী থেকে চারটি চা চেয়ে-চিন্তে পাই কোন রকমে। তা হ'লেই এক খাওয়াতে পারবো, নইলে হবে না।—বলিয়া টিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাব্লিদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার মুখে বলিয়া গেল, তুমি ততক্ষণ ছোটমা'র ঘরে গিয়ে গল্প করো, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি তোমাকে চা ক'রে খাওয়াতে পারি কি না।

টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোহরও রান্নাঘর হইতে বাহির হইল।

বাব্লিদের বাড়ী হইতে টিয়া চা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মনোহরকে চা দিলে পর মনোহর বলিল, থ্যাঙ্কিউ!

কথাটা ইংরেজি হইলেও এবং মনোহরের উচ্চারণে যথেষ্ট ত্রুটি থাকিলেও টিয়া অর্থগ্রহণে সক্ষম হইল, আর রূপসীর সম্মুখে তাহা হওয়ায়ই নিজেকে কেমন যেন বিপন্ন মনে করিল। মানুষ যে কতদূর বিরক্তিকর হইতে পারে তাহা মনোহরকে না দেখিলে টিয়া কোনদিনই অনুভব করিতে পারিত না। কি প্রয়োজন ছিল তাহার এই বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগের, আর কথা বলারই বা তাহার হইয়াছিল কি; সে তো নীরবে গ্রহণ করিলেই টিয়া নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতে পারিত। টিয়ার কেমন যেন ইহাতে লজ্জা করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে ছোটমা'র কাছে এই কথারই ধার যে কত শুনিতে হইবে তাহা সে এখনই ধারণা করিতে পারিল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন টিয়ার মহা অস্বস্তিতে কাটিল।

অপরাহ্নে নবদুর্গা একবার দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কাজ থাকায় সেও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারে নাই। নবদুর্গা যখন উঠানের একপাশে টিয়াকে ডাকিয়া লইয়া কথা কহিল তখন মনোহর উত্তরের ঘরের দাওয়ায় একটু গড়াইয়া লইতেছিল, আর রূপসী তাহারই পাশে বসিয়া কি যেন সব অবান্তর কথা-বার্ত্তা বলিয়া চলিয়াছিল।

নবদুর্গা চলিয়া গেলে পর টিয়া কাজ করিতে চলিয়া গেল। ঘরের কাজ সারিয়া রায়েদের দীঘি হইতে দুই কলস জল আনিয়া রান্নাঘরে রাখিয়া একখানি শাড়ী ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া খালের ঘাটে সে গা ধুইতে গেল। বেলা তখন একেবারেই পড়িয়া গেছে, সন্ধ্যার গাঢ়তম বেদনা ঘনাইয়া আসার আর যেন বিলম্ব নাই।

ওপারের ঘাটে কোন নৌকা ছিল না—ইহা যেন সুন্দরের বাড়ী না থাকার নিশানা। টিয়া নিশ্চিন্তমনে খালের জলে নামিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গামছা দিয়া গা মাজিল, তারপরে ঘাটের গাবের খাটিয়াটার উপর উঠিয়া বসিয়া জলে পা ঝুলাইয়া রাখিয়া মুখে জল লইয়া কুলি করিতে করিতে সকালে-দেখা সুন্দরের কাণ্ডটার কথাই সে ভাবিতেছিল। সুন্দর তাহাকে জব্দ করিবার জন্য খামোকা একটা টিয়াপাখী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। টিয়াপাখীটি যে সুন্দরের আঙুল কাম্ড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ভারি জব্দ করিয়া ছাড়িয়াছে তাহা মনে করিয়া টিয়া মনে মনে হাসিল। কে জানে, সুন্দরের আঙুলে আবার কিছু হয় নাই তো! সুন্দরের আঙুলের জন্য টিয়ার কেন জানি ভাবনা ধরিল। আবার একথাও সে ভাবিল, বেশ হইয়াছে, যেমন তাহাকে জব্দ করিতে যাওয়া সুন্দরের! এইবার নিজেই সে জব্দ হইয়া গেছে!

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া নামিতেই টিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া গা মুছিয়া কাপড় পাল্টাইল এবং ভিজা কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া লইল। তারপরে সহজ গতিতে উপরে উঠিয়া আসিল। উপরে উঠিয়াই সে চম্‌কাইয়া গেল। মনোহর নীরবে বাতাবী লেবু গাছটার একটি ডাল ধরিয়া পথের পরেই দাঁড়াইয়া আছে। কে জানে—এমন সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। টিয়ার সারা দেহে তখন ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ শিহরণ খেলিতেছিল, কাজেই একটা কথাও সে বলিতে পারিল না। আর যত রূঢ় করিয়া প্রথম বাক্যটি প্রয়োগ করা এক্ষেত্রে প্রয়োজন বলিয়া সে মনে করিতেছিল, ঠিক ততখানি রূঢ়তার সন্ধান নিজের মধ্যে সে পাইল না। ফলে তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতেই হইল।

মনোহর বিকৃত একটু হাসিয়া বলিল—আমাকে তুমি যত খারাপ ভাবচো টিয়া, তত খারাপ আমি সত্যিই নই। আজ আমি সেই কথাই শুনতে এসেচি, তোমাকে বলতে হবে—

কেন তুমি আমাকে দেখতে পারো না। সমস্ত দিনে সেকথা জিগ্যেস্ করবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি, তাই তোমার খোঁজে এখানে আসতে আমি বাধ্য হয়েচি। কাল ভোরেই আবার আমাকে চ'লে যেতে হবে। তার আগে আমি শুনতে চাই, কেন তুমি আমাকে দেখতে পারো না?

টিয়া তখনও চুপ করিয়া রহিল।

মনোহর আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—কি, বলবে না টিয়া? দিদির জন্ত কি আমিও তোমার চোখে চিরদিন বিষ হ'য়ে থাকবো?

টিয়া তথাপি নীরব রহিল।

মনোহর আবার বলিল, আমি যাত্রার দলের ছেলে হ'তে পারি টিয়া, কিন্তু এই যে এতদিন আসি-যাই কখনও কি কোন খারাপ ব্যবহার করেচি তোমাদের কারও সঙ্গে? তবে তুমি আমাকে কেন দেখতে পারবে না? আমাকে যে কত কষ্ট স্বীকার ক'রে দল ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় শিখীপুচ্ছে, তা বললে কি তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে? আর আসি তো সে শুধু তুমি এখানে আছ ব'লেই, নইলে দিদির জন্তে ভারি আমার মাথা ব্যথা! ওর মুখ দেখাও আমি পাপ মনে করি টিয়া। আর এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তুমি যদি এ না চাও তো আমি চাই না এখানে এসে তোমাকে এভাবে বিরক্ত করতে। তুমি যদি আসতে বারণ করো তো সত্যি আর কখনও আমি আসবো না।

টিয়া মনোহরের কণ্ঠের আর্দ্রতায় কেমন একটু বিচলিত হইয়া বলিল—সে কি কথা, তুমি আসবে না কেন, নিশ্চয় আসবে। তুমি তো আর আমার শত্রু নও যে তোমাকে আমি দেখতে পারি না। আর আমি কেন তোমাকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ ক'রে দেব শুনি? তা যদি কেউ পারে তো ছোটমা'ই একমাত্র পারেন। চাই কি আমাকেও একদিন প্রয়োজন হ'লে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

মনোহর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই বলিল—সে আমি ভাল ক'রেই জানি টিয়া। আর সেই কারণেই দিদিকে আমি আরও সহ্য করতে পারি না। তোমার মত মেয়েকেও যে ভালবাসতে পারেনি সে যে কত বড় পাষণ্ড তা আমি বহুপূর্ব্বেই ঠিক ক'রে ফেলেছি।

মনোহর টিয়ার আরও নিকট হইয়া দাঁড়াইল, টিয়া মনোহরের এতখানি ঘনিষ্ঠতায় নিজেকে বিশেষ বিব্রত মনে করিল। কিন্তু মনোহরকে আপনার সামান্ত রূঢ়তার দ্বারাও আজ আর কিছুতেই যে সে আঘাত দিতে পারিবে না তাহা সে সহজেই বুঝিল। নিজের কাছে নিজেকে আজ তাহার ভারি দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। তাই সে সেখান হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাতেই যেন বলিল—ওদিকে আবার সন্ধ্যে উত্রে গেল, তুলসীতলায় সন্ধ্যে-পিদিম দেওয়া হ'লো না, ছোটমা'র একবার সেদিকে খেয়াল হ'লেই হয়—আমার আর রক্ষে থাকবে না। আর ভাল কথা, এবেলা চা খাবে কি, তা'হলে না হয় ক'রে দি একটু জল ফুটিয়ে।

মনোহর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—চা' তো আমার দু'বেলা খাওয়াই অভ্যেস্, কিন্তু বলি না পাছে তোমার আবার কষ্ট হয় টিয়া। আর তোমাদের এখানে যে চায়ের কোন ব্যবস্থাই নেই কিনা। না থাক্, আমার জন্তে আর তোমার অনর্থক কষ্ট ক'রে লাভ নেই।

না, না, কষ্ট আবার কি!—বলিয়া টিয়া মনোহরের পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, মনোহর কি মনে করিয়া টিয়ার পিছন হইতে টিয়ার কাঁধে ঝুলানো গামছাটার প্রান্তভাগ ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল—আপত্তি না থাকলে গাম্‌ছাটা তোমার নিলাম টিয়া, ঘাট থেকে একটু ঘুরে আসি।

টিয়া একটু চম্‌কাইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—না, আপত্তি আবার কিসের! কিন্তু ঘাট থেকে একটু চট্ ক'রে ফিরো, আমি সন্ধ্যে-পিদিম দিয়েই কিন্তু বাঁশপাতা ধরিয়ে তোমার চায়ের জল চাপিয়ে দেব।

মনোহর টিয়ার গাম্‌ছাটা নিজের কাঁধে ফেলিয়া বলিল, দেরী হবে না নিশ্চয়ই। বাঃ, তোমার গাম্‌ছাটায় তো ভারি চমৎকার মিঠে গন্ধ টিয়া! সুগন্ধি তেল মেখেছিলে নিশ্চয়?

টিয়া লজ্জায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আমি কি মেখেছি ছাই, নবদুর্গা জোর ক'রে মাথায় ঢেলে দিলে তাই। আমার আবার অত সখ থাকলেই তো হয়েছিল!

মনোহর অমনি বলিল—বাঃ, সখ তোমার থাকবে নাই বা কেন? এখন সখ থাকবে নাতো—থাকবে আবার কবে শুনি? এবার যেদিন আসবো—তোমার জন্তে একশিশি

সুগন্ধি তেল কিনে আনবো। 'চম্পল্'-এর নাম শুনেচো নিশ্চয়—তাই একশিশি নিয়ে আসবো।

টিয়া আর সেখানে দাঁড়াইল না, মনোহরও ঘাটে নামিয়া গেল।

মনোহরের বেশীদিন কোথাও থাকিবার উপায় নাই। কাজেই তাহাকে পরদিন ভোরেই চলিয়া যাইতে হইল। এবার সে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়াই গেল।

মনোহর চলিয়া গেলে টিয়া একটা নিবিড় স্বস্তিঘন নিঃশ্বাস ফেলিয়া পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসনের পাঁজা লইয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু বেশীদূর আর তাহাকে স্বচ্ছন্দ সহজগতিতে অগ্রসর হইতে হইল না। বাগানের পথে পা দিয়াই গতি তাহার কেমন বিব্রত ও সলাজ হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তেই গতি তাহার একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে পথের মাঝেই তাই দাঁড়াইয়া গেল—নীরব, নিথর, নিস্পন্দ।

সুন্দরের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু সুন্দর পথের পাশের কাঁঠাল গাছটার নীচে সত্যই দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে কি যে তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা টিয়া সত্যই ভাবিয়া পাইল না। সুন্দরকে এত কাছে পাওয়া টিয়ার পক্ষে অতি বড় ভাগ্যের কথা, কিন্তু ভাগ্য যদি বা আজ সুপ্রসন্ন হইল তো টিয়া এত ভয় পাইতেছে কেন? সুন্দরকে এত নিকটে দেখিয়া টিয়ার ভয় পাওয়ার কথা না, কিন্তু বুক তাহার কেমন যেন দুর্ব্বলতায় কাঁপিয়া উঠিল। টিয়ার মুখ-চোখ পাংশু হইয়া আসিল। সুন্দর কি তবে পূর্ব্বপুরুষের শত্রুতা একেবারেই ভুলিয়া গেল? দুইবাড়ীর রক্তে যে সে-অতীতের শত্রুতার বিষ এখনও জড়ানো আছে তাহা কি তাহার একেবারেই খেয়াল নাই? সামান্য সংঘর্ষে যে আবার কলঙ্কিনীর খালে বিষাক্ত রক্ত নাচিয়া উঠিতে পারে, তাহা কি সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই?

কিন্তু টিয়া কেন জানি ইহাতে খুশী না হইয়াও পারিল না। টিয়া কি কোনদিন আবার ভাবিতে পারিয়াছে যে, সে সুন্দরকে সমস্ত অতীত নিশ্চিহ্ন করিয়া ভুলাইয়া দিয়া এপারে টানিয়া আনিতে পারিবে। যে জীবনে কখনও এপারে ভুলেও পা ছোঁয়ায় নাই, সে তো আজ টিয়ার মায়াতেই এপারে পা বাড়াইয়াছে। গর্ব্বোল্লাসে টিয়া একেবারে নিস্তরঙ্গ হইয়া গেল।

সুন্দর টিয়াকে দেখিয়া ম্লান একটু হাসিল এবং লজ্জা-কাতরকণ্ঠেই বলিল, টিয়ার মায়াতেই আমাকে এপারে আস্তে হ'লো, আমাকে একেবারে দৌড় করিয়ে মারলে। শেষ পর্য্যন্ত উড়ে এসে বসেচে তোমাদের এই কাঁঠালগাছের শিক-ডালে।

টিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিচলিত হইল, তারপরেই নিজেকে সে সাম্লাইয়া লইয়া বলিল—টিয়াপাখীটা উড়ে এসেছে বুঝি? বা, দাঁড়ের শেকল কেটে পালালো কেমন ক'রে?

সুন্দর বলিল, পায়ে ওর পাছে লাগে তাই শেকলের আংটাটা একটু আল্‌গা ক'রে রেখেছিলাম, ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে খুলেই পালিয়েছে বোধ করি। কি মুস্কিলেই যে পড়া গেছে।

টিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বলিল—বনের পাখী তো পালাবেই। মিছে ওর পেছনে ছোটা, আর ও কি ধরা দেবে নাকি! এবার আর একটা টিয়া এনে পোষো, টিয়ার মায়াতেই যখন পড়েছো।

হ্যাঁ, মায়া না!—বলিয়া সুন্দর ঊর্দ্ধে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলিতেই দেখিল, টিয়াপাখীটি সহসা সেখান হইতে অন্যত্র উড়িয়া চলিল। এবার আর সজ্জন-বাড়ীর বাগানের কোন গাছেই বসিল না, বহুদূরে উড়িয়া গেল। সুন্দর হতাশ হইয়া বলিল, এপারে আমাকে এনে তবে ছাড়লে, কিন্তু ধরাও তো দেবার মতলব কিছু দেখি না। লজ্জা-অপমানই বোধ হয় ভাগ্যের লেখা!

টিয়া সুন্দরের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—সত্যিই তো, উড়ে পালালো যে! পালিয়েছে, বেশ হয়েছে, আমি খুশীই হয়েছি, যেমন আমাকে খামোকা জব্দ করার জন্য টিয়া কেনা। নুপুরগঞ্জের হাট থেকে টিয়া কিনে এনে যেমন আমাকে জব্দ করতে চাওয়া, বেশ হয়েচে, আমি ধম্মো দেখেছি।...আহা! সত্যিই যে উড়ে গেল! বেশ ছিল কিন্তু দেখতে পাখীটা। বনপলাশীর ভৈরব দত্তের ছেলের না হ'য়ে যদি আর কারও ও-পাখী হ'তো তো আমি প্রথম দিনই ঠিক চেয়ে বসতাম। আমার বেশ লেগেছিল সত্যি তোমার ঐ পাখীটা।

সুন্দর এতক্ষণে দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—এটা যে শিখীপুচ্ছের নিশি সজ্জনের মেয়ের মত কথা হয়েচে তা'তে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা তোমার মনের কথা হ'লোনা টিয়া।

টিয়া বলিল—না, মনের কথা হ'লো না, আমার মন জানো আবার কি! আমার মন যেন তোমার দুয়োরে

বাঁধা রেখেছি, তুমি তার সব খবর জানো! কিন্তু আমার মনের খবর না রেখে, বাবার মনের খবর রাখলে নিজের ভাল হ'তো। বাবা যদি একবার দেখতেন যে ভৈরব দত্তের ছেলে তাঁর ভিটের মাটিতে পা ঠেকিয়েচে—তা হলে এতক্ষণে মহাপ্রলয় হ'য়ে যেত। তোমার টিয়া এখানে আছে ব'লে নিশ্চয়ই তাঁর হাত থেকে পার পেতে না।

সুন্দর হাসির মাত্রা সামান্য আর একটু চড়াইয়া বলিল—তা পার না পেতে পারতাম, কিন্তু সত্যি কথাই বলা হ'তো তো।

টিয়া সুন্দর করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। কারণ, ইহার পরে আর কি যে কথা বলিয়া সুন্দরকে সেখানে আরও কিছুক্ষণের জন্য আটকাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের আলাপের পথটা অধিকতর প্রশস্ত এবং সহজ নির্ব্বাধায় চলমান করিয়া তোলা যায় তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখনও সে সুন্দরের সঙ্গে আলাপে নিজেকে ঠিক বাধামুক্ত মনে করিতে পারিতেছিল না। আজিকার এই ক্ষণিকের কৌতুক-পরিহাস-বিজড়িত আলাপের পরেও ভবিষ্যতে হয় তো সামান্য কথার আদান-প্রদানেও উভয়ের মধ্যে আসিয়া যাইবে পূর্ব্বেকার অনালাপী দিবসের কঠিন জড়তা। সেই ভয়েই আরও সে ভাষা বন্ধ করিয়া প্রাণের সমস্ত আনন্দ ও অভ্যর্থনা ঐকান্তিকভাবে হাসির ভিতর ঢালিয়া দিয়া সুন্দরকে নিকটতম করিয়া তোলার প্রয়াস পাইল।

কিন্তু টিয়ার পিছনে দাঁড়াইয়া সেই সঙ্গেই প্রায় যে হাসিয়া উঠিল সে টিয়ার অদৃষ্ট নয়—টিয়ার ছোটমা—রূপসী। আর হাসি তাহার মনে মনে হইলেও কথা ছিল, একেবারে চরম।

সুন্দর পূর্ব্বেই চম্‌কাইয়াছিল অদূরে রূপসীর আবির্ভাবে এবং টিয়াও চম্‌কাইল রূপসীর হাসি শুনিয়া। সে হাসি শুনিয়া টিয়ার হাত হইতে বাসনের পাঁজা খসিয়া পড়িলেই হয়তো তাহার মনোভাবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া হইত; কিন্তু পড়িতে সে দেয় নাই, যেহেতু সুন্দরের কাছে নিজেকে সে অতখানি দুর্ব্বল বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুতেই রাজী হইতে পারে নাই।

রূপসী হাসিয়া থামিলেই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি দোষে দুষ্ট যে তাহার স্বভাব সে-স্বভাবের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া হয় না বলিয়াই যেন সে বলিয়া ফেলিল—অ, তাই না বলি, রাত থাকতে উঠে মেয়ের খালের ঘাটে যাওয়ার আর আলিস্যি নেই। মরণ আর কি! শত্তুরের সঙ্গে চলেছে তবে গোপনে মিতালি! হা, হা, হা!

টিয়া মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—শত্তুর-পুরীতে যার বাস সে মিতালি করতে মিত্র পাবে কোথায় শুনি। আমার খুশী, আমি করবো শত্তুরের সঙ্গেই মিতালি। কিন্তু শত্তুরের সাম্‌নে বেহায়াপনা করতে তোমার লজ্জা করে না সজ্জন-বাড়ীর বউ হ'য়ে?

রূপসী আনন্দে সত্যই মাত্রা হারাইয়াছিল এবং সজ্জন-বাড়ীর বউয়ের মাথায় দত্ত-বাড়ীর ছেলের সাম্‌নে ঘোম্‌টা না থাকাটা যে অপরাধের তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। টিয়া তাহা তাহার স্মরণে আনিয়া দিতেই সে টিয়াকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলিয়া গেল—ই—স্‌!

আর চলিয়া যাওয়ার কালে মাথায় ঘোম্‌টাটি তুলিয়া দিয়াই রূপসী চলিয়া গেল।

সুন্দর এতক্ষণ যেন প্রস্তরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল; সহসা সম্বিত ফিরিয়া পাওয়ার মত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াই যেন বলিল—এপারে টিয়া ধরতে এসে তোমার বহু-গঞ্জনার কারণ হ'য়ে রইলাম টিয়া। এ নিয়ে তোমাকে বহু কথাই হয়তো শুনতে হবে ভবিষ্যতে।

টিয়া রূপসীর আবির্ভাবে যত না বিব্রত হইয়াছিল ততোধিক বিব্রত হইল সুন্দরের অনুতাপ-মিশ্রিত কণ্ঠের করুণ আর্দ্রতায়। কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লাইতে চেষ্টা পাইয়া বলিল—গঞ্জনা যার অদৃষ্টের লেখা তার কারণ হ'তে হয় না দুনিয়ার কাউকে। আর তুমি যদি সত্যিই আমার গঞ্জনার কারণ হ'য়ে ওঠো তো—সে-গঞ্জনা আমি সইতে পারবো অনায়াসেই, তা'তে আমার থাকবে তবু সান্ত্বনা। সে যাই হোক্, সজ্জন-বাড়ীর সীমানার মধ্যে আর তো তোমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না, কারণ বহু পুরুষের ঘুমন্ত শত্রুতা আবার আমাকে ছুঁয়ে জাগতেই বা কতক্ষণ!

সুন্দর বলিল—তা যদি জাগেই টিয়া তো জাগুক্, এ ছাই-চাপা আগুনের চেয়ে সে ঢের ভাল।

টিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ভাল বুঝি! তবে জাগুক্, সজ্জন-বংশের রক্তের পরিচয় দিতে আমিও তখন পিছ্‌পাও হবো না জেনো।

সুন্দরও হাসিয়া বলিল, পিছ্‌পাও হবে কেন, আর হ'তেই বা আমি বলবো কেন; একেবারে গিয়ে দত্তবাড়ীর ঘাটেই কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে উঠো, সজ্জনবাড়ীর লক্ষ্মীকে সাদরে বনপলাশীর দত্তরা সেদিন ঘরে তুলে নেবে। ক্রমশঃ

ডায়াবিটিস্ বা বহুমূত্র

ডাক্তার শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি

বহুমূত্র রোগের আর একটি নাম মধুমেহ। এ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রে এই রোগটিকে ডায়াবিটিস্ মেলাইটাস্ বলে। এই প্রবন্ধে বহুমূত্র বা ডায়াবিটিস্ সম্বন্ধে কিছু বলব—কারণ এই অসুখ আমাদের দেশে যথেষ্ট থাক্‌লেও এর বিষয় যতখানি সাধারণের জানার প্রয়োজন, তার কিছুই সাধারণে জানে না। পাশ্চাত্যদেশে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ডায়াবিটিস্ সম্বন্ধে সাধারণের জন্য সহজ, সরল ও সুপাঠ্য বই লিখেছেন—যা পড়ে রোগীরা নিজেই নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন শাস্ত্রমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। সেরকম বই আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও লিখিত হয়নি।

এইরকম বই লেখার বিশেষ প্রয়োজন আছে; কারণ না লিখলে পড়বেই বা কি করে সাধারণ লোক—বুঝবেই বা কি করে যে তাদের অসুখটা কি—গুরুত্ব কত এবং কেমন করে তারা সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে পারে কতক-গুলি মাত্র নিয়ম পালন করে। বহু লোক এই অসুখে প্রাণ হারাচ্ছে অকালে এবং অকারণে—অথচ তাদের অনেকেই বেঁচে থাকতে পারতো বহু বৎসর—পঙ্গু হয়ে নয়—সংসারের এবং সমাজের প্রয়োজনীয় হয়ে।

আমার ব্যবসায়-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—যে অজ্ঞতাই অধিকাংশক্ষেত্রে এই সব অকালমৃত্যুর কারণ। অদৃষ্টবাদিতাও আমাদের দেশে অনেক অযথা বিপদ ঘটায়, কিন্তু এর মূলেও সেই অজ্ঞতা। এ ছাড়া নিয়মানুবর্তিতা (discipline) আমাদের ধাতে সয় না—বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে জীবন-যাপন করবার মত সংযম আমাদের অধিকাংশ লোকের নেই। নিয়ম মান্‌তে হলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে—মন বিদ্রোহী হয়—নিয়ম-কানুন মেনে সে চল্‌তে চায় না।

এই নিয়মানুবর্তিতা-বিরোধী মনকে বিশেষভাবে পথ-ভ্রষ্ট করে পুরাতন রোগীর দল। বলে—"ডাক্তারের কথা ছেড়ে দাও। এই তো আমি দশ বৎসর অসুখ সত্ত্বেও বেঁচে আছি-তাদের কথা না শুনে। খাও-দাও বেপরওয়া হয়ে—মৃত্যু যেদিন হবার সেদিন হবেই—তোমার ডাক্তারে তা ঠেকাতে পারবে না।" নূতন রোগীর কাণে তা সুধা-বৃষ্টি করে—নিয়মের বাঁধন মুহূর্ত্তে কেটে সে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে। তারপর? সেও সেই ভাগ্য। দুর্ভাগা না হলে সে শুনে কেন ও উপদেশ, বিচার না করে? কিন্তু বিচার করবেই বা সে কেমন ক'রে? বিচার করতে হলে তার যে জানা দরকার—অসুখটা কি—এতে প্রাণের ভয় হতে পারে কি কি কারণে—সে কারণগুলি কি করলে না ঘটে বা ঘটলে কেমন ক'রে প্রশমিত করা যায়। সে জ্ঞান তার নেই—তাই সে অজ্ঞের সাহায্য নিয়ে সর্ব্বনাশের পথের পথিক হয়।

এই প্রবন্ধে তাই ডায়াবিটিসের কথা বল্‌বো—সাধারণের সুবিধার জন্যে যতখানি সম্ভব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে।

ডায়াবিটিস্ রোগটি কি ?

প্রত্যেক রোগীই জানে যে এই রোগে প্রস্রাবে চিনি বা গ্লুকোজ (glucose) থাকে। বারবার প্রভূত পরিমাণে প্রস্রাব হয়। তেষ্টা যথেষ্ট থাকে। যতই জল খাওয়া যায় ততই প্রস্রাব বাড়ে। রাত্রে একাধিকবার উঠ্‌তে হয়।

সুস্থলোকের প্রস্রাবে চিনি থাকে না। দিনে ৪।৬ বারের বেশী প্রস্রাব সাধারণত হয় না। রাত্রে কদাচিৎ উঠ্‌তে হয়। তেষ্টাও এমন কিছু অস্বাভাবিক থাকে না।

ডায়াবিটিসের (বহুমূত্র রোগীর) প্রস্রাবে এই চিনি বা গ্লুকোজ কেন আসে? এবিষয় জান্‌তে হলে কার্‌বো-হাইড্রেট মেটাবলিজিম (carbohydrate metabolism) সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ভাত, রুটি, আলু চিনি প্রভৃতি খাদ্যকে কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্য বলা হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে এই খাদ্যের স্বাভাবিক পরিণতি বা ব্যবহারকে মেটাবলিজিম্ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন—একটা জ্বলন্ত উনানে কয়লা দিলে কি হওয়া স্বাভাবিক? ধোঁয়া—আঁচ—ছাই। এটাই হচ্ছে কয়লার স্বাভাবিক পরিণতি উনানের শরীরের মধ্যে বা উনানের খাদ্য কয়লার মেটাবলিজিম—উনোন মহাশয়ের শরীরের মধ্যে। বুঝলেন? ডায়াবিটিস্ অসুখে এই কার্‌বো-হাইড্রেট মেটাবলিজিম-এর বা কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্যের শরীর-অভ্যন্তরের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে।

ভাত, রুটি প্রভৃতি কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্য আমরা যখন খাই তখন মুখ থেকেই তার পরিপাক বা digestion-এর কাজ সুরু হয় এবং শেষ হয় সরলান্ত্রের (small intestine) ভিতরে। এই পরিপাক একটি রাসায়নিক ক্রিয়া—যার দ্বারা সমস্ত কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্য গ্লুকোজ বা আঙুরের চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। মজার কথা নয়? খেলাম ভাত—পেলাম আঙুরের চিনি; তাজ্জব ব্যাপার! আঙুরের চিনি বলার মানে হচ্ছে যে—এই চিনির রাসায়নিক formula বা কাঠামো আর ভাত বা রুটির চিনির কাঠামো এক। প্রস্রাবে চিনি (sugar) বলতে বৈজ্ঞানিকেরা এই কাঠামোর চিনিই (glucose) ভেবে থাকেন। গ্লুকোজ বা আঙুরের চিনি যদি খাওয়া যায় তাকে আর পরিপাক করবার দরকার হয় না, কারণ কারবো-হাইড্রেট পরিপাকের শেষ বস্তুই যে গ্লুকোজ। তাহলে এটা নিশ্চয় বোঝা গেল যে, কার্‌বো-হাইড্রেট্ খাদ্য পেটের মধ্যে পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই যে গ্লুকোজে

পরিণতি এটাকে হজম বা digestion বলা হয়—এটা মেটাবলিজিম নয়। মেটাবলিজিম্-এর কথা এই বার বলব।

উপরে যে গ্লুকোজের কথা বললুম—সেই গ্লুকোজ অন্ত্র থেকে (intestine) রক্তে শোষিত বা absorbed হল এবং প্রথমে লিভার বা যকৃতের ভিতর দিয়ে গিয়ে সাধারণ রক্ত-স্রোতে ছড়িয়ে পড়লো। লিভারের ভিতর দিয়ে গ্লুকোজ গেল কেন? এ কি গ্লুকোজের মর্জ্জি? না, তা নয়। এই পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে যাবার তার যো নেই—তাই। লিভার বড়ই সঞ্চয়ী—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে। যেই অনেকখানি গ্লুকোজ পেলে অমনি প্রাণপণে তাকে নিয়ে যতখানি পারে গ্লাইকোজেন (glycogen=starch জাতীয় এক প্রকার বস্তু) তৈরী করে নিজের ভাঁড়ারে তুলে রাখ্‌লে। বাকী গ্লুকোজ—যা লিভার থেকে বেরিয়ে গেল—তা থেকে শরীরের মাংসপেশীরাও সাধ্যমত গ্লাইকোজেন তৈরী করে নিয়ে নিজেদের ভাঁড়ারে রেখে দিলে। গ্লুকোজের পরিশেষ যা রইলো—তা সাধারণ রক্ত-স্রোতে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো শরীরের আপাতত প্রয়োজন যোগান দিতে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। ১,০০০৲ টাকার একটি নোট (starch, ভাত বা কার্‌বো-হাইড্রেট) ব্যাঙ্ক (পরিপাক-যন্ত্র) থেকে ভাঙিয়ে টাকা (গ্লুকোজ) করে গিন্নীর (লিভার) হাতে দেওয়া হল। গিন্নী দেখ্‌লেন—এত কাঁচা টাকার তো দরকার নেই এখন। তাই তিনি তাঁর বিবেচনা মত সে টাকার অনেকটা দশ-টাকার নোট, (glycogen),—যা সহজেই সর্ব্বত্র ভাঙানো যায়—গাঁথিয়ে বাক্সে চাবি দিয়ে তুলে রাখ্‌লেন। কিন্তু গৃহিণী কৃপণ নন—যে টাকা দিলেন সরকারকে (muscles) তা সংসারের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী। সরকার হিসেবী ভালো লোক। সে আবার তা থেকে দশ টাকার কতকগুলো নোট গাঁথালো—ক-একটা টাকা মাত্র দৈনন্দিন প্রয়োজন মত খরচা করতে লাগলো। এ টাকা কটি যেমন ফুরুতে লাগ্‌লো—তবিল থেকে দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে টাকা করে নেওয়া চল্‌তে লাগলো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড় নোট ভেঙে—টাকা—টাকা জুড়ে ছোট নোট আবার ছোট নোট ভেঙে টাকা। এ টাকা কিন্তু ক্রমশই খরচা হয়ে যাচ্ছে—তাই নোটের পর নোট ভাঙাতে হচ্ছে—নইলে দিন চলবে না। তেমনি কার্‌বো-হাইড্রেট্ ভেঙে গ্লুকোজ—গ্লুকোজ জুড়ে গ্লাইকোজেন—গ্লাইকোজেন ভেঙে আবার গ্লুকোজ। গ্লুকোজ কিন্তু ফুরিয়ে আসে—তখন গ্লুকোজ যোগান দাও ভাঁড়ারের গ্লাইকোজেন থেকে। ওদিকে ভাঁড়ার খালি হয়ে আসবার ভয়ে কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্য থেকে গ্লুকোজ তৈরী করে ভাঁড়ারে পাঠাও—গিন্নী গ্লাইকোজেন গেঁথে ভাঁড়ারে জমান—নইলে তাঁর ভাঁড়ার শীঘ্রই বাড়ন্ত হয়ে উঠ্‌বে। এই যে শোষিত বা absorbed গ্লুকোজের শরীরের মধ্যে ব্যবহার বা পরিণতি—একেই কার্‌বো-হাইড্রেট্ মেটাবলিজ্‌ম্ বলা হয়।

আগে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা বেশ বোঝা গেল যে, রক্তস্রোতে সকল সময়ই খানিকটা গ্লুকোজ বা চিনি আছে। এই চিনিকেই ব্লাড্-সুগার (blood-sugar) বলা হয়। অনেক সময় শুনি, লোকে বলে, যে তাদের blood-sugar নেই। এটা অসম্ভব কথা—কারণ blood-sugar না থাক্‌লে মানুষ এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পারে না। তবে এই blood-sugar-এর পরিমাণ সব সময়ে এক নয়। আহারের পরে তা বাড়ে কিন্তু অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা আবার কমে আসে। সবচেয়ে কম blood-sugar পাওয়া যায় অনশনে থাক্‌লে। অর্থাৎ এই blood-sugar-এর হার বা value নির্ভর করে—কতখানি গ্লুকোজ শরীর পাচ্ছে—কতখানি তার গ্লাইকোজেন হয়ে জমা থাকচে—আর কতখানিই বা তার ব্যবহার হচ্ছে—তার উপর।

সাধারণত সুস্থ অবস্থায়—Blood-sugar ০·০৮-০·১%-এর কম হয় না বা ০·১৮%-এর বেশী হয় না। Blood-sugar percentage বল্‌তে আমরা কি বুঝি? শতকরা হার? গোলমাল লাগে বুঝতে—নয়? ধরা যাক্, blood-sugar যদি ০·১%হয়—তা হলে কি বুঝ্‌বো? বুঝবো যে ১০০ সি·সি রক্তে ০·১ গ্র্যাম চিনি আছে। ১০০ সি·সি মানে হচ্ছে ৩⅓ আউন্স—কারণ ৩০ সি·সিতে ১ আউন্স হয়। ০·১ গ্র্যাম মানে হচ্ছে ১/১০×১৫=১½ গ্রেন, কারণ ১৫ গ্রেনে ১ গ্র্যাম হয়। তাহলে ০·১%sugar মানে হল—৩⅓ আউন্স রক্তে ১½ গ্রেন গ্লুকোজ বা আউন্স-পিছু ½ গ্রেন গ্লুকোজেরও কম। একটা ধারণা হলো তো? কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এইভাবে হিসেব না করে গ্র্যাম বা মিলিগ্র্যাম (১/১০০০ গ্র্যাম) ও সি·সিতেই হিসেব রাখেন। ০·১%কে ০·১ গ্র্যাম% বা ১০০ মিলিগ্র্যাম% বলা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত blood-sugar ০·১৮%-এর বেশী না হয়—ততক্ষণ প্রস্রাবে চিনি আসে না। কিন্তু যদি কোন প্রকারে ০·১৮%-এর চেয়ে বেশী blood-sugar করা যায়—তাহলে সুস্থ লোকেরও প্রস্রাবে চিনি এসে পড়ে। দেখা গেছে যে একজন সুস্থ লোক যদি একসঙ্গে ১৫০-২০০ গ্র্যাম গ্লুকোজ খায়—তার প্রস্রাবে চিনি আসে না। এতে এই প্রমাণ হচ্ছে যে এতখানি গ্লুকোজ একসঙ্গে খেলেও শরীরের ভিতরে এত শীঘ্র ও এত পরিমাণে গ্লাইকোজেন তৈরী করে ফেলা হয় যাতে করে blood-sugar ০·১৮%-এর বেশী বাড়্‌তে পারে না। এর বেশী যদি বাড়তো তাহলে উদ্বৃত্ত চিনি প্রস্রাবে উপ্‌ছে পড়তো। এই ০·১৮% (বা ১৮০ মিলিগ্র্যাম%) কিড্‌নি থে্‌স্‌হোল্ড (kidney thresh-hold) বলা হয়। এই থে্‌স্‌হোল্ডকে মূত্রগ্রন্থীর (kidney-র) রক্ষণশীল সীমা—বা বাঁধ বা হার বলা যেতে পারে। যতক্ষণ এই রক্ষণ-শীল সীমা বা বাঁধ blood-sugar না টপ্‌কাচ্ছে ততক্ষণ চিনি প্রস্রাবে উপছে পড়তে পারে না। এইখানে বলা ভালো যে, কিড্‌নি থে্‌স্‌হোল্ড কারো বা ০·১৬%-এ, কারো বা ০·১৮%-এ। সেই জন্যে ০·১৭% (১৭০ মিলিগ্র্যাম%)-কেই কিড্‌নি থে্‌স্‌হোল্ড বলে কোন কোন চিকিৎসক ধরে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন সুস্থ লোকের blood-sugar রক্ষণশীল সীমার বেশী হয় না? বেশী হতে মানা করে কে—কে ঠেকায়? সেই কথাই বল্‌বো।

ইনসুলিন

আমাদের পেটের ভিতর একটি গ্রন্থি (gland) আছে—তার নাম প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas)। এই প্যান্‌ক্রিয়াসের কাজ দুরকমের।

একরকম কাজ—খাদ্য হজম করানো—হজমী রস তৈরী করে অন্ত্রের মধ্যে নল দিয়ে ঢেলে দিয়ে। অন্য কাজটি হচ্ছে কার্‌বো-হাইড্রেট্ মেটাবলিজম্ চালানো—অর্থাৎ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরী করানো ও গ্লুকোজ-এর ব্যবহার মাংসপেশীর মধ্যে চালানো। এই দ্বিতীয় কাজটি চালাচ্ছে প্যানক্রিয়াসের আর একটি রস—তার নাম ইন্‌সুলিন (Insulin)। ইন্‌সুলিন কোন নল দিয়ে আসে না—একেবারে রক্তে মিশে যায়। ইন্‌সুলিন তৈরী হয় প্যানক্রিয়াসের শরীরের মধ্যের কতকগুলি বিশেষধরণের সেল-সংগ্রহ (cell group) হতে—যাদের islets of Langerhans বা ল্যাংগারহ্যানের দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। ল্যাংগারহ্যান একজন বৈজ্ঞানিকের নাম। ইনিই এই সেল-সংগ্রহগুলি প্রথম অবিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন। সুস্থ লোক যদি অনেকটা গ্লুকোজ খায় তৎক্ষণাৎ এই সব দ্বীপপুঞ্জ হতে উপযুক্ত পরিমাণ ইন্‌সুলিন বেরিয়ে সেই গ্লুকোজের সদ্ব্যবহার করে। তাই সুস্থ লোকের blood-sugar মূত্রগ্রন্থির রক্ষণশীল সীমা (০'১৮% বা ১৮০ মিলিগ্র্যাম%) ডিঙিয়ে যেতে পারে না। Blood-sugar এই সীমা ছাড়াবার আগেই অধিকাংশ গ্লুকোজকেই গ্লাইকোজেন তৈরী করে দেয় ইন্‌সুলিন।

মানুষের শরীর একটা জটিল মেসিন

মানুষের শরীরের সঙ্গে ষ্টীম্ এন্‌জিনের বেশ একটা তুলনা করা যেতে পারে। ষ্টীম্ এন্‌জিন্ চালু রাখতে হলে তাতে জল, কয়লা, আগুন তেল প্রভৃতি জিনিষ সরবরাহ করতে হয়—খারাপ হলে মেরামত করতে হয়। মানুষ এন্‌জিনেরও এসব দরকার—তবে প্রভেদ হচ্ছে লোহার এন্‌জিন্ বন্ধ করে মেরামত করা চলে—মানুষ এন্‌জিন্‌কে বন্ধ করা চলে না—চালু অবস্থাতেই তার মেরামতি চালাতে হয়। অধিকাংশ মেরামত সে আপনি করে নেয়—কিন্তু কখনো কখনো এন্‌জিনিয়ারের সাহায্য লাগে।

লোহার এন্‌জিন্ আর মাংসের এন্‌জিন্—দুটোকেই চালাতে হলে চালকশক্তির (energyর) দরকার। সেই চালকশক্তি বা energy পাওয়া যায় দাহ্য বস্তু (fuel) থেকে। লোহার এন্‌জিনের দাহ্য বস্তু কয়লা এবং দাহিকাবস্তু আগুন। মানুষ এনজিনের দাহ্য বস্তু গ্লুকোজ এবং দাহিকাবস্তু ইন্‌সুলিন। সুতরাং দেখা গেল উভয় এন্‌জিনেরই চালু অবস্থায় তাদের ভিতর একটা দাহ (combustion) সর্ব্বদাই চল্‌ছে। আর চল্‌ছে বলেই গায়ে হাত দিলে আমরা একটা উত্তাপ বোধ করতে পারি। মানুষ মরে গেলে সে উত্তাপ আর থাকে না—কল থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দাহও থেমে যায়।

কিন্তু মানুষ এনজিন লোহার এনজিনের তুলনায় অত্যন্ত জটিল। গ্লুকোজ মানুষ এন্‌জিনের কয়লা বটে কিন্তু গ্লুকোজ ছাড়াও ফ্যাট্, (চর্ব্বি) এবং প্রোটিন (মাংস) উভয়ই দাহ্যবস্তুর মত অল্প-বিস্তর ব্যবহার হয়। সব চেয়ে বেশী পোড়ে গ্লুকোজ, সবচেয়ে কম পোড়ে প্রোটিন এবং মাঝামাঝি পোড়ে ফ্যাট্। ফ্যাট্ বা চর্ব্বিদাহ নির্ভর করে গ্লুকোজ-এর দাহর উপর—অর্থাৎ গ্লুকোজ যদি বেশ দাউ-দাউ করে পোড়ে—তাহলে আঁচ খুব ভালো হয়—আর সেই আঁচে ফ্যাট্ বা চর্ব্বি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। কিন্তু যদি গ্লুকোজ-এর আঁচ ভালো না হয়—ঢিমে হয়—চর্ব্বি ভালো করে পুড়তে পারে না—আধপোড়া কতকগুলি বিশ্রী জিনিষ (ketone bodies) তৈরী হয়ে যায়। এর কথা পরে আবার বল্‌বো। তাছাড়া, শরীর ফ্যাট্ ও প্রোটিন থেকে প্রয়োজনমত গ্লুকোজ তৈরী করে নিতে পারে।

তাহলে সুস্থ শরীরে কার্‌বো-হাইড্রেট খাদ্যের পরিণতি আমরা দেখলাম। কার্‌বো-হাইড্রেট পরিপাক হয়ে গ্লুকোজ তৈরী হয়। রক্তে সেই গ্লুকোজ শোষিত হলে লিভার ও মাংসপেশীতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরী করে জমিয়ে রাখা হয়। প্রয়োজন মত গ্লাইকোজেন ভেঙে ভেঙে গ্লুকোজ করে নেওয়া হয়। শরীরের দাহ চলে প্রধানত গ্লুকোজ পুড়িয়ে। গ্লুকোজ পোড়াতে হলে ইন্‌সুলিনের আগুন দরকার। ইন্‌সুলিন শুধু গ্লুকোজ পুড়িয়ে এনার্জি যোগায় না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ জুড়ে গ্লাইকোজেন তৈরী করে—যা লিভার ও মাংস-পেশীতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য জমা থাকে। গ্লাইকোজেন কথাটির মানে হচ্ছে—গ্লুকোজের জন্মদাতা (glyco = glucose or চিনি gen = generator বা জন্মদাতা)

গ্লাইকোজেন তৈরী করতে ইন্‌সুলিন সক্ষম হলেও—গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ করবার ক্ষমতা ইন্‌সুলিনের নেই। এই কাজ করতে এড্রিনালিনের (adrenalin) প্রয়োজন। মন যদি সহসা ভাব-প্রবণ হয়ে পড়ে—সে ভাব যে রকমেরই হোক্—ভয়, আনন্দ, দুঃখ, রাগ প্রভৃতি— তৎক্ষণাৎ এড্রিনালিন বেশী পরিমাণে শরীরের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এই ভাবপ্রবণতার অব্যবহিত পরেই আছে কাজ—যেমন, রাগের পরেই চিৎকার বা মারামারি, আনন্দের পরেই আলিঙ্গন বা লম্ফন, ভয়ের পরেই পলায়ন ইত্যাদি। অর্থাৎ সহসা দেহের মাংসপেশীর কাজ বেড়ে যায় ভাবপ্রবণ হবার পরেই। সেই জন্য—সৃষ্টির এমন কৌশল যে, এই ভাবপ্রবণতা হলেই বেশী পরিমাণ এড্রিনালিন রক্তে এসে পড়ে। কি দরকার বেশী এড্রিনালিনের—কি জন্য আসে? বেশী করে গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরী করতে—গ্লুকোজের প্রয়োজন যে এখুনি বেড়ে যাবে, শরীরের কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই। আস্তে হাঁটতে যতখানি এনার্জি বা চালকশক্তির প্রয়োজন—দৌড়-দৌড় দিলে তার অপেক্ষা অনেক বেশী এনার্জি বা চালকশক্তির দরকার। সেই বেশী এনার্জি যোগান যায় কি করে? না—বেশী গ্লুকোজ পুড়িয়ে। তাই বেশী এড্রিনালিন এসে বেশী করে গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরী করে রক্তস্রোত দিয়ে মাংস পেশীতে পাঠিয়ে দিলে। ইন্‌সুলিন বেশী করে এলো, অনেক গ্লুকোজ পোড়াতে হবে কি-না। ভাবপ্রবণ ব্যক্তি হয়তো তখন মারামারি সুরু করে দিয়েছেন—ঁইয়া-ইয়া ঘুসি চালাচ্ছেন—আর ভেতরে সেই ঘুসি চালাবার এনার্জি যোগাচ্ছে এড্রিনালিন গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ যোগান দিয়ে—আর ইন্‌সুলিন সে যোগান-দেওয়া গ্লুকোজকে দাউ দাউ জ্বালিয়ে। এখানে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে

এড্রিনালিন ইন্‌সুলিনের বিরোধী। ইন্‌সুলিন গ্লাইকোজেন গড়ে, এড্রিনালিন গ্লাইকোজেন ভাঙে। ইন্‌সুলিন গ্লুকোজ পুড়িয়ে ব্লাড-সুগার কমায়, এড্রিনালিন গ্লাইকোজেন ভেঙে blood-sugar বাড়ায়। এ ছাড়া এক দেখা যাচ্ছে—যে বেশী blood-sugar হলে ইন্‌সুলিন বেশী তৈরী হয়—বা ল্যাংগারহান্‌স দ্বীপপুঞ্জ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এড্রিনালিন—এড্রিনাল গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড এর রস। এই গ্রন্থি দুটি। এক একটি মূত্র গ্রন্থি বা কিড্‌নির ঘাড়ে বসে আছে।

এই এড্রিনাল গ্রন্থি ছাড়া শরীরে আরো দুটি গ্রন্থি আছে—যার রস ইন্‌সুলিনের বিপক্ষে কাজ করে। একটি থাইরয়েড্ আর একটি পিটুইটারী। এরা উত্তেজিত হলে blood-sugar বেড়ে যায়।

ডায়াবিটিস্ রোগে কার্‌বো-হাইড্রেট্ মেটাবলিজম্

ডায়াবিটিস রোগে এই কার্‌বো-হাইড্রেট্ মেটাবলিজ্‌ম্-এর ব্যাঘাত ঘটে। সেই ব্যাঘাতের মুখ্য কারণ উপযুক্ত পরিমাণ ইন্‌সুলিনের অভাব—অর্থাৎ ইন্‌সুলিন প্রয়োজনের চেয়ে কম তৈরী হয়। আগেই বলেছি সে ল্যাংগারহান্‌সের দ্বীপপুঞ্জ হতে ইন্‌সুলিনের জন্ম। যদি কোন কারণে এই দ্বীপপুঞ্জগুলি ক্লান্ত বা অধম হয় তাহলে ইন্‌সুলিন তৈরী করবার ক্ষমতার হ্রাস হয়ে পড়ে।

যদি অতিরিক্ত কারবো-হাইড্রেট্ অনেকদিন ধরে খাওয়া হয় তাহলে কালক্রমে এই দ্বীপপুঞ্জগুলি হাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং হাঁপিয়ে পড়বার জন্যেই ইন্‌সুলিন উপযুক্ত পরিমাণ তৈরী করতে পারে না। কিন্তু এই হাঁপানো অবস্থাতেই তারা উপযুক্ত পরিমাণ ইন্‌সুলিন যোগান দিতে প্রাণপণ বৃথা চেষ্টা করে—কর্ত্তব্যপরায়ণ কি-না। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা যতই বেশী চেষ্টা করে ততই আরো বেশী হাঁপিয়ে পড়তে থাকে। শেষে কতকগুলি দ্বীপ ক্লান্ত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে—কতকগুলি হয়তো সত্যই মরে যায়।

অন্য কারণেও এই দ্বীপপুঞ্জ আহত হতে পারে—যেমন প্যানক্রিয়াসের chronic inflammation বা পুরাতন বা ধীর-গতি-শীল প্রদাহ। এই প্রদাহে ধীরে ধীরে দ্বীপপুঞ্জগুলি আক্রান্ত হয়—এবং ধীরে ধীরে মরতে থাকে। এখন যদি কারবো-হাইড্রেট্ খাদ্য সমান পরিমাণই খেয়ে যাওয়া যায়—তাহলে এই আক্রান্ত দ্বীপপুঞ্জ যথাসাধ্য ইন্‌সুলিন যোগাতে চেষ্টা করে, ফলে আরো অধম হয়ে পড়ে এবং আরো শীঘ্র মরতে থাকে।

ইন্‌সুলিন উৎপাদন যদি এই রকম ক্রমশই কমে যেতে থাকে তাহলে ইন্‌সুলিনের দুটি কাজেই ক্রমশ ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাণ গ্লাইকোজেন তৈরী হয় না—এবং স্বাভাবিক পরিমাণ গ্লুকোজও পোড়ে না। ফলে কি দাঁড়ায়?—রক্তে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী গ্লুকোজ জমতে থাকে—blood-sugar percentage বা ব্লাডসুগারের শতকরা হার স্বাভাবিকের চেয়ে ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে blood-sugar—কিড্‌নি থ্রেসহোল্ড বা রক্ষণশীল সীমা পার হয়ে যায়—ফলে প্রস্রাবে গ্লুকোজ বা চিনি উপ্‌চে পড়ে। বোঝা গেল, কেন ডায়াবিটিস-এ প্রস্রাবে চিনি আসে?

এখন এই চিনি বেরুতে অনেক জলের দরকার। ধরুন, একটি ছাঁকনি আছে যার জালির ফুটাগুলো ছোট ছোট। এই ছাঁকনিতে গুড় ঢেলে দিলে তো তা বেরুতে পারবে না—খানিকটা জল দিয়ে গুড় পাতলা করে দিলে বেরুবে। তেমনি খুব ঘন চিনি গোলা কিড্‌নি ছাঁকনি দিয়ে বেরুতে পারে না। তাই শরীরে যে জল আছে তাই টেনে নিয়ে চিনির-গোলা পাত্‌লা করে বের করে প্রস্রাবে। এদিকে শরীরের জল যত বেরিয়ে যেতে থাকে—ততই শরীর সে জল ফিরে পেতে চায়—ফলে বাড়ে তেষ্টা। তেষ্টা পেলেই খাওয়া হয় জল—শরীরের বেরিয়ে যাওয়া জল সরবরাহ করতে। আবার প্রস্রাবে সে জল বেরিয়ে আসে চিনি-গোলা হয়ে—আর প্রস্রাবের পরিমাণও সে জন্যে বেড়ে যায়। তাহলে বোঝা গেল—কেন ডায়াবিটিসে এত তেষ্টা পায় এবং কেনই বা এত ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়।

আগে বলেছি যে শরীরের চালকশক্তি বা এনার্জি যোগায় গ্লুকোজ ইন্‌সুলিন-এর আগুনে পুড়ে। এও বলেছি যে চর্ব্বি বা ফ্যাট্ গ্লুকোজ-এর আঁচে পোড়ে। কমতে কমতে এই আঁচ এমন কম-জোরী হয়ে যায়—যাতে চর্ব্বি সম্পূর্ণ পুড়তে পারে না—ফলে কতকগুলো আধ-পোড়া বিশ্রী এবং বিষাক্ত জিনিষ তৈরী হয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত জিনিষ রক্তে জমতে জমতে শেষে এত বেশী জমে উঠতে পারে যে, তার জন্য প্রাণহানি ঘটাও আশ্চর্য্য নয়। এই বিষাক্ত জিনিষগুলিকে কিটোন বডিস্ (ketone bodice) এবং তাদের বিষ-ক্রিয়াকে কিটোসিস্ (ketosis) বলা হয়। এই কিটোসিস্ই হচ্ছে ডায়াবিটিসের একটি ভয়াবহ উপসর্গের কারণ। সেই উপসর্গের নাম ডায়াবিটিক কোমা (diabetic coma) বা অচৈতন্য অবস্থা।

স্বাভাবিক প্রোটিন মেটাবলিজ্‌ম

প্রোটিন বলতে আমরা মাছ, মাংস বা ছানা-জাতীয় খাদ্য মনে করি। তবে প্রোটিন নিরামিষ খাদ্য থেকেও পাওয়া যায়, যেমন—ডাল।

কারবো-হাইড্রেট খাদ্যের (ভাত, রুটি প্রভৃতি) পরিপাক-ফল যেমন গ্লুকোজ প্রোটিনের পরিপাকফল, তেমনি এ্যামাইনো-এ্যাসিডস্ (Amino-acids)। এই এ্যামাইনো-এ্যাসিডস্-এর প্রধান কাজ শরীরের ক্ষতি-পূরণ ও বর্দ্ধন। প্রতিদিন আমাদের শরীরের প্রোটিন ক্ষয় হচ্ছে (tissue waste)। সেই ক্ষতি এই এ্যামাইনো-এ্যাসিড্‌স্ পূরণ করে নূতন টিস্যু তৈরী করে। যখন 'বাড়ে'র বয়স থাকে—তখন বেশী করে নূতন টিস্যু তৈরী করে শরীরকে বাড়ায় এই এ্যামাইনো-এ্যাসিডস্। শরীরের চালকশক্তি বা এনার্জি যোগান প্রোটিনের প্রধান কাজ নয়। সে কাজ প্রধানত কারবো-হাইড্রেট ও ফ্যাটের।

কিন্তু যত এ্যামাইনো-এ্যাসিড্‌স্ প্রোটিন থেকে আমরা পাই—বিশেষত বেশী প্রোটিন খাদ্য খেলে সবটাই তার এই ভাবে (ক্ষতিপূরণ ও বর্দ্ধন) ব্যবহার হয় না—অনেকটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই উদ্বৃত্ত এ্যামাইনো-এ্যাসিড্‌স্ থেকে নাইট্রোজেন (nitrogen) অংশ ভেঙে নিয়ে লিভার ইউরিয়া (urea) তৈরী করে। নাইট্রোজেনহীন অংশ থেকে আধাআধি (৫০-৫০) গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এ্যাসিড (fatty acid) তৈরী হয়। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন আর ফ্যাটি এ্যাসিড্‌স্ থেকে ফ্যাট (fat) তৈরী হয়ে জমা থাকে। ইউরিয়া (urea) প্রস্রাব দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

সাধারণত ডায়াবিটিসে প্রোটিন মেটাবলিজমের ব্যাঘাত ঘটে না। তবে অত্যন্ত গুরুতর ডায়াবিটিসে শরীরের প্রোটিন অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষয় হয় এবং এই প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে ব্লাড্-সুগার (blood-sugar) অত্যন্ত বাড়ায়। এক্ষেত্রে শরীরের দ্রুত ক্ষয় হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ফ্যাট্ মেটাবলিজ্‌ম্

ফ্যাট্ মেটাবলিজ্‌মের কথা কারবো-হাইড্রেট মেটাবলিজ্‌মের সঙ্গেই কিছু বলেছি। এখানে এই সম্বন্ধে আর একটু বল্‌বো। ফ্যাট (fat) দুটি জিনিষের সংযোগে তৈরী—একটি গ্লিসারিন (glycerine) আর একটি ফ্যাটি এ্যাসিড্ (fatty acid)। ফ্যাট (চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য) খেলে—পরিপাকের সময় এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্লিসারিণ (glycerin) আর ফ্যাটি এসিড (fatty acid) আলাদা হয়ে যায়। এই বিরহ অল্প সময়ের জন্যে, কারণ শোষিত (absorbed) হবার পর আবার তাদের মিলন ঘটে—আবার ফ্যাট তৈরী হয়। এই ফ্যাট শরীরের মধ্যে নানা স্থানে জমা থাকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্যাটে গ্লিসারিণ আছে। এই গ্লিসারিণ থেকে গ্লুকোজ তৈরী হতে পারে। ফ্যাট থেকে ১০% গ্লুকোজ, আর ৯০% ফ্যাটি এ্যাসিড পাওয়া যায়।

গ্লুকোজের আগুনে যখন ফ্যাট সম্পূর্ণ পোড়ে—তার শেষ ফল কার্ব্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) আর জল (H_2O)—গ্লুকোজ দাহের শেষ ফলও তাই। কিন্তু ফ্যাট যদি আধ-পোড়া হয় তাহলে রক্তে কিটোন বডিস্ জমে ওঠে। কিটোন বডিস্-এর (ketone bodies) নাম অক্সি-বিউটাইরিক এ্যাসিড, ডাই-এসেটিক এ্যাসিড আর এ্যাসিটোন (oxybutyric acid, di-acetic acid, Acetone) রক্তে জমে উঠলে প্রস্রাব দিয়ে কিটোন বডিস বেরুতে থাকে।

নীচে কারবো-হাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিপাক শোষণ ও মেটাবলিজম্ এক সঙ্গে দেখান গেল। অভিন্ন লাইন স্বাভাবিক পরিণতি দেখাচ্ছে। ছিন্ন লাইন ডায়াবিটিসে কি পরিবর্ত্তন হয় তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

(ক্রমশঃ)
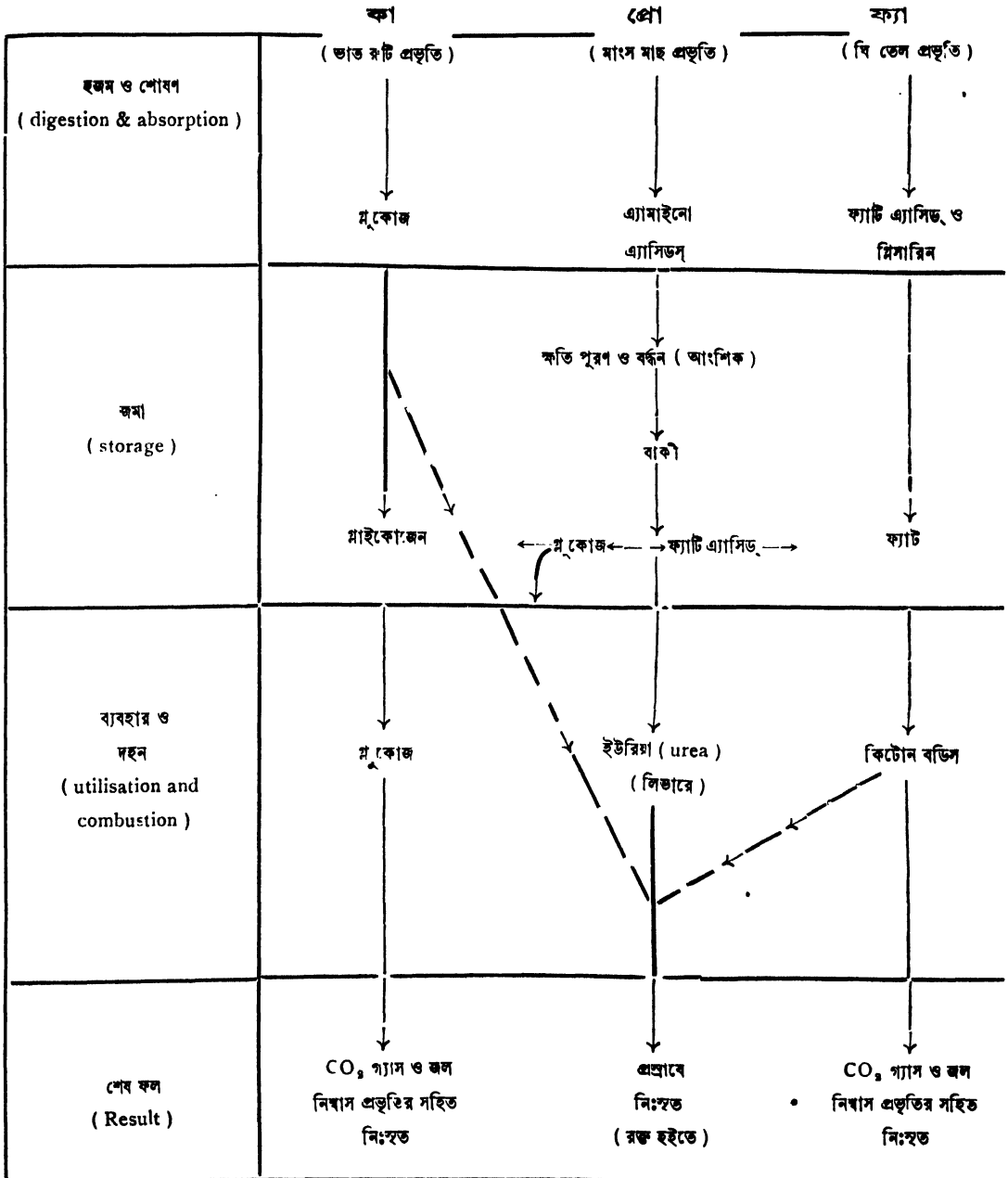
চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

মধ্য প্রাচী

লিবিয়ায় ইটালীর সর্ব্বশেষ ঘাঁটি বেনঘাজির পতনের পর ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী মগাদিশু অধিকার বৃটিশবাহিনীর উল্লেখযোগ্য বিজয়। ইটালীয় বাহিনীর এই শোচনীয় পরাজয়-প্রসঙ্গে মুসোলিনী বলিয়াছেন যে, যুদ্ধরত সৈন্যদলে নূতন সৈন্য প্রেরণের অক্ষমতাই পরাজয়ের প্রধান কারণ। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তির প্রভুত্ব যে দৃঢ়রূপে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইটালীর সহিত আফ্রিকার জলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেই নূতন ইটালীয় বাহিনী ও প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই।

এদিকে বেনঘাজির দক্ষিণে স্বাধীন ফরাসীবাহিনীর হস্তে ইটালীয় ঘাঁটি কুফ্রা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সন্নিকটস্থ কেরিয়ার বৃটিশসৈন্যের হস্তগত। কিসমাউ বন্দর অধিকারের সময় চারখানি ইটালীয় জাহাজ আত্মনিমজ্জন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মোট ২৮,০০০ টনের ছয়খানি ইটালীয় জাহাজ বৃটিশের হস্তগত হইয়াছে। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবেরা পুনরধিকার বৃটিশবাহিনীর পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ইটালীর এক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের নৌবাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে ইটালীয় সৈন্যগণ সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কেরেনের জিজিগা বৃটিশের অধিকারে আসিয়াছে। আদ্দিস আবাবা অভিমুখে একদল বৃটিশ সৈন্য সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধ বর্ত্তমানে কেরেনের চতুষ্পার্শে সীমাবদ্ধ।

গ্রীসের যুদ্ধেও ইটালীয়বাহিনী যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। নূতন ইটালীয় সৈন্যদলের আগমন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রাজকীয় বিমানবাহিনী ভেলোনা ও ডুরাজোয় প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করিতেছে। সম্প্রতি তেপেলিনি গ্রীক সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রণনীতির দিক হইতে গ্রীসের অবস্থা যে বর্ত্তমানে বিশেষ আশঙ্কাজনক ইহা নিঃসন্দেহ। তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির কথা গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই জার্মান সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। বুলগেরিয়া অধিকারের কারণ সম্বন্ধে জার্মানীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে বৃটিশ যে প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করিতে অগ্রসর, তাহা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যই জার্মানী এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

কিন্তু বুলগেরিয়া অধিকারের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট। গ্রীক-যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্যই জার্মানবাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীসের যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্যই জার্মানীর এই 'স্নায়ু-যুদ্ধের' আয়োজন। তবে উহা কার্য্যকরী না হইলে সে অস্ত্রধারণে বাধ্য হইবে। এই 'স্নায়ু-যুদ্ধে' সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যেই যুগোস্লাভিয়াকেও জার্মানীর নিজ প্রভুত্বাধীনে আনা প্রয়োজন। জার্মানসৈন্যের বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর সোভিয়েট সরকার বুলগেরিয়া সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বুলগেরিয়ার এই নীতি অবলম্বনের ফলে বলকান্ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, রণ-ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িবার আশঙ্কাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকেই ইহাকে জার্মানীর সহিত রুশিয়ার বিচ্ছেদের সূত্রপাত বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের গুরুত্ব কতখানি তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই প্রতিবাদের কোন স্থানে সোভিয়েট সরকার জার্মানীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, অথচ বল্কান্ অঞ্চলের এই যুদ্ধবিস্তৃতিতে জার্মাণীর দায়িত্ব যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত, সোভিয়েট সরকার প্রতিবাদ জানাইলেন তখনই, যখন জার্মানবাহিনী বুলগেরিয়ায় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বুলগেরিয়া অভিমুখে জার্মানবাহিনীর অভিযানের নিশ্চয়তার যে সংবাদ বিশ দিন পূর্ব্বে বৃটেনে পৌঁছিয়াছে, ঘরের পাশে সোভিয়েট সরকার যে সে সংবাদ বুলগেরিয়া অধিকারের পূর্ব্বে পায় নাই, ইহা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অধিকন্তু সোভিয়েট সরকারকে বল্কান্ অঞ্চলের কার্য্যপদ্ধতির বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত না জানাইয়া যে জার্মানী তথায় স্বীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্য্যকরী করিবে ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। যতদূর ধারণা করা যায়, বুলগেরিয়া সরকারের নীতির প্রতিবাদ করিয়া রুশিয়া নিজেকে দায়িত্ব-মুক্ত করিয়া রাখিল মাত্র।

তবে যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্ককে লইয়া বল্কান্ অঞ্চলের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লণ্ডনের কূটনৈতিক মহল বলেন যে, তুরস্কের উপর সরাসরি আক্রমণ চালাইয়া ইরাক ও ইরানের মধ্য দিয়া মোসুল তৈল খনির দিকে পথ করিয়া লওয়াই হিটলারের উদ্দেশ্য। কিন্তু বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর হিটলার যে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই করিতেছেন না, ইহা জার্মান সৈন্যের নিশ্চেষ্টতা হইতে বেশ বুঝা যায়। বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পরই হিটলার স্বয়ং তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ইনেনুকে ব্যক্তিগত পত্র পাঠাইয়াছেন। সম্প্রতি এই পত্রের উত্তরও পাঠান হইয়াছে। কিন্তু কি উত্তর প্রদান করা হইয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। যুগোস্লাভিয়ার সহিতও জার্মানীর কি আলোচনা চলিতেছে, কোন্ পক্ষের দাবী কিরূপ, এবং আপত্তির মূল কোথায় সে সব খবরও জানিবার উপায় নাই। বিভিন্ন আনুমানিক তথ্য হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, যুগোস্লাভিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে অসম্মত। আঙ্কারা রেডিও হইতে যুগোস্লাভিয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,

চক্রশক্তিতে যোগদানের অর্থ হইতেছে যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক মৃত্যু। দার্দানেলিস ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালীতে একটি সঙ্কীর্ণ খাল বাদ দিয়া তুরস্ক মাইন স্থাপন করিয়াছে। অন্তত ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে না জানাইয়া এবং তুরস্কের অনুমতিব্যতিরেকে উক্ত প্রণালী দিয়া জাহাজের গমনাগমন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এদিকে যুগোস্লাভিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিয়া সশস্ত্র বাধাপ্রদান করিলে তুরস্ক যে যুগোস্লাভিয়াকে সাহায্য করিবে এরূপ আভাষও প্রদত্ত হইয়াছে। যুগোস্লাভ নেতারা জার্মানীর দাবী সম্পর্কে নাকি 'হয় গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ কর' এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ডেইলি টেলিগ্রাফের আঙ্কারাস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সোভিয়েট সরকারের নির্দ্দেশেই যুগোস্লাভিয়া জার্মানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে ইতস্তত করিতেছে। এ সংবাদের সত্যতা কতখানি সে সম্বন্ধে সঠিক নিশ্চয়তা না থাকিলেও জার্মানী যে বল্‌কানে যথেচ্ছ বলপ্রয়োগে ইতস্তত করিতেছে ইহা অস্বীকার করা চলেনা। যুগোস্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে তুরস্ক হয়তো যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে ; ফলে বল্‌কানে আবার এক নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু হিটলার গত মহাযুদ্ধে কাইজারের ন্যায় ভুল করিতে প্রস্তুত নন। বৃটিশ শক্তির প্রাণকেন্দ্র বৃটেনে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ না করিয়া আরও বিভিন্নস্থানে নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক। এতদ্ব্যতীত বৃটেন যদি এই নবসৃষ্ট রণক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ করে তাহা হইলে যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিবে। তবে বৃটেন অন্যস্থান হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া এখানে ব্যাপৃত রাখিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু বল্‌কানে ইহা অপেক্ষা অধিক বিচার্য্য বিষয় রুশিয়া ও তাহার স্বার্থ এবং মনোভাব। তুরস্কের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ বল্‌কানে রুশিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া। কাজেই তুরস্ক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে তাহাকে রক্ষার জন্য সোভিয়েটের আগ্রহ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, জার্মানীর পক্ষেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও আশঙ্কিত হওয়া তেমনই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন বৃটেনের প্রধান সহায়, রুশিয়াও সেইরূপ জার্মানীর ভরসা স্থল। সুতরাং তাহার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া সোভিয়েট সরকারের বিরাগভাজন হওয়া জার্মানীর আদৌ অভিপ্রেত নয়। যুগোস্লাভ সরকার যদি স্বেচ্ছায় ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া জার্মানবাহিনীকে ভার্ডার উপত্যকাপথে গ্রীস অভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান না করেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা করিয়া জার্মানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেইজন্যই গ্রীস আক্রমণ আসন্ন হইলেও জার্মানী কূটনৈতিক চাল এখনও বন্ধ করে নাই এবং সফলকাম হইলে জার্মানী লাঠি না ভাঙ্গিয়া সাপ মারিতে সক্ষম হইবে। তবে তুরস্ক সম্বন্ধে জার্মানী বিশেষ অবহিত হইলেও যুগোস্লাভিয়া সম্বন্ধে হিটলার ততটা গ্রাহ্য করেন না। কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হইলে যুগোস্লাভিয়ার উপর শক্তিপ্রয়োগ অসম্ভব নাও হইতে পারে, এবং যুগোস্লাভিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনমনীয় দৃঢ়তা ও বাধা প্রদানের অভিলাষের মূল্য কতটুকু, গত এক বৎসরের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জার্মানীর সামুদ্রিক তৎপরতা ও বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিটলারের সহকারী রুডলফ্ হেস্ ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সাবমেরিন যুদ্ধ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা বসন্ত কালেই আরম্ভ হইবে। এ কথা 'ভারতবর্ষ-এর' গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। কর্নেল নক্স ও মিঃ উইলকির কথাও সেইসঙ্গে গত সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া বাহুল্যবোধে এখানে পুনরুল্লেখ করা হইল না। গত ২৫এ ফেব্রুয়ারী মিউনিকে হিটলার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মার্চ্চ ও এপ্রিলে আমরা ইউ-বোট লইয়া এরূপ সামুদ্রিক যুদ্ধ আরম্ভ করিব, যাহা আমাদের শত্রুর কল্পনাতীত। বস্তুত মার্চ্চের প্রথমেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ২রা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে শত্রুর আক্রমণে জাহাজ ডুবির পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে মোট ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৮ টনের ২৯ খানি জাহাজ সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২০খানি বৃটিশ জাহাজ, ৮খানি মিত্রপক্ষের ও একখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই তৃতীয়বার এত অধিক জাহাজ ডুবি হইল। ইহার পরবর্ত্তী সপ্তাহে মোট ৯৮ হাজার ৮ শত ৩২ টনের ২৫খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০খানি জাহাজ বৃটিশের, অপর ৫ খানি মিত্রশক্তির। গত ১৮ই মার্চ্চ ইঙ্গ-মার্কিন সম্প্রীতি-মূলক এক ভোজসভায় মিঃ চার্চ্চিল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই অত্যধিক পরিমাণে জাহাজ ডুবি ও বৃটিশ জাহাজের অরক্ষিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃটেনের সহিত অপর সকল দেশের সামুদ্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জার্মানীর এই বিরাট আয়োজন ও উদ্যমকে প্রবল ভাবে বাধা দেওয়া বৃটেনের পক্ষে আশু প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশ হইতে যে সকল সমরোপকরণ ও বিবিধ প্রয়োজনীয় মাল সকল জাহাজে প্রেরিত হইতেছে, সেই সকল জাহাজের নিরাপদে বৃটেনে পৌছানর উপর বৃটেনের জয়লাভ একরূপ নির্ভর করিতেছে বলিলেই চলে। আমরা গত দুইমাস হইতেই জার্মানীর এই অভিপ্রায়ের কথা বলিয়া আসিতেছি। শুধু সমরোপকরণ নহে, বৃটেনের প্রতি প্রযুক্ত জার্মানীর এই অর্থনৈতিক অবরোধ সফল হইলে বৃটেনে খাদ্য সমস্যাও জটিল হইয়া দেখা দিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষি মন্ত্রী মিঃ হাড্‌সন্ এক বক্তৃতায় খাদ্য-সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া যথাশক্তি পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়াছেন।

বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণের তীব্রতাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্লাইডস্, পোর্টস্‌মাউথ্, প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্নিপ্রজ্বালক বোমায় মলোটভ ব্রেড্ বাস্কেট্ প্রভৃতি প্রচণ্ডভাবে বর্ষিত হইতেছে। হতাহতের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর তৎপরতা ও কার্য্য-দক্ষতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গেল্‌সেনকির্চেন ও ডসেল ডর্ফে'র শিল্প-প্রধান এলাকা ও সামরিক লক্ষ্যস্থলের উপর এবং পশ্চিম জার্মানীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলে বৃটিশ বোমাবর্ষী বিমানসমূহ আক্রমণ চালাইয়া উক্ত অঞ্চল-সমূহের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। উপকূলরক্ষী বিমানসমূহ নরওয়ে হইতে ব্রেষ্ট পর্য্যন্ত শত্রু অধিকৃত উপকূল এলাকার বোমা বর্ষণ করায় বিভিন্ন স্থানের বিমান ঘাঁটি, ডক ও শত্রু জাহাজসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত।

এতদ্ব্যতীত কয়েকখানা ইটালীয় ও জার্মান জাহাজ আক্রমণের ফলে ডুবিয়াছে। ৫১,০০০ টনের জার্মান জাহাজ 'ব্রিমেন' অগ্নিদগ্ধ। ভারত মহাসাগরেও একখানি সশস্ত্র ইটালীয় জাহাজকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরপক্ষে বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্ত্তমানে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিঃ ডি, ভ্যালেরা এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিলেও রণনীতির দিক হইতে আয়র্লণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

বৃটেনকে অস্ত্রশস্ত্র ইজারা দেওয়া বা ধার দেওয়া "সংক্রান্ত বিলটি যে প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত হইয়া সেনেটে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব সহ তাহা সেনেটে ৬০-৩১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সামান্য সংশোধন থাকায় বিলটি পুনরায় প্রতিনিধি পরিষদে প্রেরিত হয়। ৩১৭-৭১ ভোটে বিলটি পাশ হইলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের স্বাক্ষরিত হইয়া উহা আইনে পরিণত হইয়াছে। উক্ত বিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণার্থে তিনি যে-কোন রাষ্ট্রকে সমরোপকরণ বিক্রয়, হস্তান্তর, ঋণ অথবা ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগের কাল ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেনেটে উহা এই মর্ম্মে সংশোধিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সমরোপকরণ আছে, উহা হইতে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের উপকরণ হস্তান্তর করা চলিবে না। এই বিলের বিধান কার্য্যকরী হইলে মাত্র সামরিক দিক হইতে নহে, কূটনীতির ক্ষেত্রেও বৃটেন যে কতদূর লাভবান হইবে সে বিষয়ে গত ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষ-এ' বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

বিলটি স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটেন ও গ্রীসে রণসম্ভারের প্রথম কিস্তি প্রেরণ অনুমোদন করিয়াছেন। রুজভেল্টের অনুরোধে প্রতিনিধি পরিষদের সাব কমিটিতে বৃটেনের জন্য সাত শত কোটি ডলার মঞ্জুর হইয়াছে। চীনকেও সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ৪০খানি বিমানপোত চীনে পৌঁছিয়াছে। গত ১৫ই মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বৃটেন, গ্রীস, চীন আমেরিকা হইতে জাহাজ, খাদ্য, সমরোপকরণ প্রভৃতি প্রয়োজনমত চাহিবামাত্রই পাইবে। প্রেসিডেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন: আমাদের দেশ গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার। বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আর 'নিরপেক্ষ দেশ' বলা চলে না। বস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নীতি ও নাৎসী ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় পার্থক্য খুব সামান্যই। এরূপ অবস্থায় যে-কোন সময়ে যে-কোন অছিলায় যুদ্ধে নামিয়া পড়া আমেরিকার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে।

গত এক মাসে সুদূর-প্রাচীর ঘটনাবলীরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাপানের মধ্যস্থতায় থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। থাইল্যাণ্ড এই সর্ত্তের ফলে যে ভূভাগ লাভ করিয়াছে, তথাকার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানকার অধিবাসীরা থাইবাসীদের ন্যায় ব্যবহার ও থাইবাসাদের প্রাপ্য সকল অধিকার পাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই মিটমাটের ফলে বৃহত্তর এশিয়ায় যে শান্তি স্থাপিত হইবে এবং জাপান ও থাইল্যাণ্ড এবং জাপান ও ইন্দোচীনের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর ও অধিকতর উন্নত হইবে এ বিষয়ে তিনটি দেশই নাকি একমত।

চীন-জাপান যুদ্ধের গতিও উল্লেখযোগ্য। জাপানে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জাপসৈন্য কোয়াংসী প্রদেশের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ হইতে সরিয়া আসিয়াছে। ইচাংএর পশ্চিমাঞ্চলে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ উপকূল-পথে সেচুয়েনের দিকে অগ্রগামী বিশ হাজার জাপসৈন্য চীনা বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কোয়াংচুর অন্তর্গত কোয়াংহাই শহর তাহাদের হস্তগত। আমেরিকাও বিমান পাঠাইয়া চীনকে সাহায্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সাহায্য করা হইবে বলিয়া রুজভেল্ট বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে ন্যাশনাল্ পিপ্‌ল্‌স্ কাউন্সিলে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে কোন যোগ থাকা কি অসম্ভব? গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ শ্বেতজাতি যেদিন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জাপানকে সুদূর প্রাচ্যে ব্যাপৃত রাখিতে হইলে চীনের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন সেইদিন হইতেই জাপানের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে চীনকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্বেত গণতন্ত্রের সুবিধার জন্য চীনকে যেমন জাপানের কুক্ষীগত হইতে না দেওয়া প্রয়োজন, তেমনই চীনে রুশিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাও অনভিপ্রেত। কাজেই চিয়াং-কাই-শেকের পুনরায় এই কম্যুনিষ্ট-বিরাগের মূলে যে সংশ্লিষ্ট জাতির কোন প্রভাব কার্য্য করিতেছে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে কি?

এদিকে রাইখ গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুকা থাই-ইন্দোচীন বিরোধ অবসানের পরেই মস্কো, বার্লিন ও রোমে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। মাঞ্চুকো সীমান্ত ও রেলপথ এবং সাখালিন অঞ্চলে মৎস্যসংগ্রহ লইয়া জাপ-সোভিয়েট বিরোধের অবসান হওয়ায় জাপান ও সোভিয়েটের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। চীনের যুদ্ধ হইতে জাপান যদি সরিয়া আসিতে না পারে, তাহা হইলেও উক্ত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে মনোনিবেশ করিতে পারে। হাইনান্, ক্যাণ্টন্, ফরাসী-ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানে জাপান সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। এতদঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সিঙ্গাপুরে যে আঘাত করা প্রয়োজন একথা জাপান জানে। থাইল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, জাপানীরা স্থলপথে সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ড তাহাদের দখল করা প্রয়োজন। থাইল্যাণ্ড জাপানের প্রভাবাধীন অঞ্চল। সামরিক দিক হইতে ইন্দোচীনেরও বিশেষ গুরুত্ব আছে। ব্রহ্মদেশের লোভনীয় চাউল এবং তৈল অধিকার করিতে হইলে ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া স্থলপথে ব্রহ্মদেশে পৌঁছান যাইতে পারে। চুংকিং সরকার সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা নাকি ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া জাপান অভিযোগ করিয়াছে। চুংকিং সরকার অবশ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে জাপানের কোন দুরভিসন্ধি কাজ করিতেছে কি না বলা দুরূহ। তবে ইয়োরোপের যুদ্ধ যে জাপানের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে "সুবর্ণ সুযোগ" এ কথা জাপান গোপন রাখে নাই। জাপান যদি এই "সুবর্ণ সুযোগে" কিছু করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে তাহার সামুদ্রিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান বিশেষ বিস্ময়কর হইবে না। কারণ সিঙ্গাপুরের এই বৃটিশ ঘাঁটিকে অক্ষত রাখিয়া উক্ত অঞ্চলে জাপানের পক্ষে অধিকার ও প্রভাব বিস্তার অসম্ভব। সুতরাং হিটলারকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা অথবা স্বীয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির অভিলাষ যাহাই থাকুক না কেন, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে জাপানের পক্ষে সজ্বর্ষ এড়াইয়া চলা আদৌ ফলপ্রদ হইবে না।
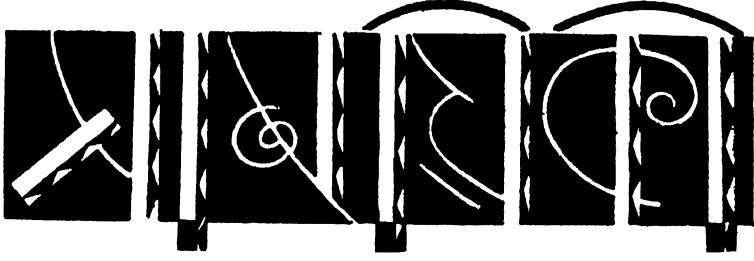
বঙ্গভাষা প্রচারের অভিযান—

দুই বৎসর পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রদেশবাসী বাঙ্গালী সমাজে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জনসাধারণকে বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সমিতির বার্ষিক উৎসব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকারের সহযোগিতা করা উচিত। এই কার্য্যের জন্য যেমন প্রচুর অর্থ আবশ্যক, সেই সঙ্গে প্রচুর নিষ্ঠাবান কর্ম্মীরও প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান পরিচালক সমিতি আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিলে সমিতির উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায়ই থাকিবে না। এই সভা যে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতেই এই সমিতির উপযোগিতা কত বেশী তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে—

(ক) বঙ্গের বাহিরে বেতার কেন্দ্রসমূহের অনুষ্ঠান লিপিতে বঙ্গ-ভাষায়ও অনুষ্ঠান তালিকা প্রবর্ত্তনের জন্য ভারত সরকারের বেতার বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে এই সমিতি অনুরোধ করিতেছে।

(খ) ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এডুকেশনের পরামর্শ কমিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটির প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই কমিটিতে কোন বাঙ্গালী সদস্যের স্থান না দেওয়ায় এই সমিতি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী সুধীগণ কার্য্য করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কার্য্যে যথেষ্ট অগ্রসরও হইয়াছেন। সেই নিমিত্ত এই সমিতি ভারত সরকারের নিকট উপরোক্ত বোর্ডে বাঙ্গালী সদস্য গ্রহণের দাবী করিতেছেন।

স্যর সেকেন্দরের ঘোষণা—

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সরকার অসমর্থ হওয়ায় সরকারের নিন্দা করিয়া উত্থাপিত একটি ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী স্যর সেকেন্দর হায়াৎ খান ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি খাঁটি কথা উচ্চারণ করিয়াছেন; কথাটি খাঁটি হইলেও তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা মানিয়া চলিবেন কি না জানি না। না মানিলেও কথাটা সত্য এবং ভারতের মুক্তির পক্ষে, শান্তির পক্ষে, অগ্রগতির পক্ষে তাহা অপরিহার্য্য। তিনি বলেন,

"পাঞ্জাবে পরিপূর্ণ মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠাই যদি পাকিস্থানের অর্থ হয় তাহা হইলে ঐরূপ পাকিস্থানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি স্বাধীন পাঞ্জাবের আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করেন, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায়গুলি স্বায়ত্তশাসন অধিকার ভোগ করিবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে পাঞ্জাব মন্ত্রিসভা লীগপন্থী মন্ত্রিসভা নহে, ইহা সম্পূর্ণভাবে পাঞ্জাবীদের মন্ত্রিসভা।"

ইহার উত্তরে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী কি বলেন তাহা জানিবার কৌতূহল আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

বাঙ্গালার মন্ত্রীদের খেয়াল—

বাঙ্গালার মন্ত্রীদের ভ্রমণব্যয় যে দিনদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রীদের ভ্রমণব্যয় ও বারবরদারী মঞ্জুরীর সময় মৌলবী জালালুদ্দীন হাসেমী এক ছাঁটাই প্রস্তাব পেশ করিয়া তাহা দেশবাসীর দৃষ্টি-গোচর করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাহাতে অনেক রহস্যই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। হাসেমী সাহেব অভিযোগ করিয়াছেন—

(ক) জনৈক মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আজমীর শরীফ গিয়া থাকিলেও সরকারী তহবিল হইতে তাহার টাকা আদায় করা হইয়াছে; (খ) মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগদান করিতে যখন কোন মন্ত্রী বাঙ্গালার বাহিরে বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন তখনও তাহার ব্যয় সরকারী তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে; (গ) মন্ত্রীরা যখন নিজ নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন তখনও ভ্রমণ-ব্যয় এবং নির্দ্দিষ্ট দৈনিক ভাতা আদায় করিয়াছেন, (ঘ) দলের উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য তাঁহারা যখন কোন উপনির্বাচনে নিজ দলের প্রার্থীকে সমর্থন করিতে কোথাও গিয়াছেন, তখনও তাহার আবশ্যকীয় ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতেই গৃহীত হইয়াছে; (৬) বাঙ্গালা সরকারের সেরেস্তা যখন দার্জিলিং-এ তখনও মন্ত্রীরা হামেশা নিজের প্রয়োজনে কলিকাতা বা অন্যত্র গমনাগমন করিয়াছেন এবং দৈনিক ভাতা আদায় করিয়াছেন।

হাসেমী সাহেবের অভিযোগ যে সত্য নহে অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দী তাহা অস্বীকার করেন নাই; পরন্তু দলের কাজও যে সরকারী কাজ তাহাই স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ক্ষমতার এইরূপ ব্যবহার যাঁহারা স্বজ্ঞানে করেন যতদিন তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা থাকিবে ততদিন তাঁহারা তাহার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন—তাহাতে দেশের নিরন্ন জনসাধারণ না খাইয়াই মরুক, আর খাইতে না পাইয়া আত্মহত্যাই করুক, তাহাতে তাঁহাদের কিছু যায় আসে না।

স্যর সি-ভি-রামনের নুতন সম্মান—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেল্‌ফিয়ার ফ্র্যাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন মহাশয়কে ফ্র্যাঙ্কলিন পদক দিয়া সম্মানিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই পদক অধ্যাপক আইনস্টাইন, ডঃ মিলিকান, ডঃ কম্পটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ লাভ করিয়াছেন। স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের এই সম্মানে উক্ত প্রতিষ্ঠানও যেমন যোগ্যতার সমাদর করিয়া ধন্য হইলেন, আমরাও তেমনই তাঁহার সম্মানে গৌরববোধ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৎসরের সমাবর্ত্তন উৎসব সম্প্রতি সারকুলার রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর বাঙ্গালার লাট স্যর জন্ হার্বার্ট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় একটি বিষয়ে আমরা—আজিকার বাঙ্গালীরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। আজিকার দিনে প্রাদেশিকতা একশ্রেণীর শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এত মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহারা মনে করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা বাঙ্গালাকে অবজ্ঞা করে। এই প্রকার একটা ক্ষোভ একটা জাতিকে নিয়ত পীড়া দিলে কিংবা হতাশা জাতির মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে সেই জাতির জয়-যাত্রা ব্যাহত হয়। এই অবহেলার জন্য বাঙ্গালী জাতির যে মর্ম্মপীড়া তাহা যে বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা বহু মণীষীই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। স্যর তেজবাহাদুরও তাহাই বলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তি আতিথেয়তার প্রতিদানে শুধু স্তোকবাক্য বলিয়া মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। প্রথম যৌবনে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর আগে তাঁহার ছাত্র জীবনে বাঙ্গালা হইতে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ গিয়া তাঁহাদের তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিত। সামাজিক জীবনে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের বাণী, রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন, আনন্দমোহন ও কালীচরণের উদাত্ত আহ্বান তাঁহাদের চিত্ত আকুল করিয়া তুলিত। যুক্তপ্রদেশের মানসিক চিন্তার ধারা যে শুধু বাঙ্গালার দ্বারাই গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাই নহে, উহা সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালার দ্বারাই আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আজও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলে বহু বাঙ্গালী শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন। স্যর তেজবাহাদুর মনে করেন যে, নানা জাতি ও নানা ভাষার বিচিত্র লীলা-নিকেতন এই ভারতে মহামানবের এক নবমিলন-মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে, সকল সংঘাতের অন্তরালেই এক অখণ্ড ভারত গড়িয়া উঠিতেছে। সকলের অলক্ষ্যে যে অখণ্ড ভারত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকেই মূর্ত্ত করিয়া তোলা, প্রস্ফুটিত করিয়া তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। স্যর তেজবাহাদুর সকল বৈষম্যের মধ্যে যে সাম্যকে দেখিয়াছেন, সকল দ্বন্দ্বাতীত যে অখণ্ড ভারতকে দেখিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে বিনাশ করিয়া সেই ভারত দেখা দিবে কবে?

বাল্যবিবাহ ও হায়দ্রাবাদ—

আধুনিক সভ্য সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দেওয়ার একটা চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে এবং কোন দেশে সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে; কোন কোন দেশের নরনারী চিরাগত সংস্কারকে কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। হায়দ্রাবাদ পরিষদে নিজাম সরকারের রাজ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য যে আইনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। নিজাম

লাহোরে হিন্দু সম্মেলন—সভাপতিপদে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সঙ্গে ভাই পরমানন্দ, রাজা নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি

ভারতীয় বণিকসমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক সভা—সভাপতি অমৃতলাল ওঝা, সঙ্গে ঘনশ্যামদাস বিরলা, সার লালা শ্রীরাম প্রভৃতি

দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট সমিতি—সভাপতি জে-পি-আগারওয়ালা—সঙ্গে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

খিদিরপুরে বঙ্গীয় গোরক্ষা সমিতির সভা—প্রধান অতিথি ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

তিস্তা নদীর উপর নির্মিত নূতন পুল—ইহা দার্জ্জিলিং জেলার সহিত ডুয়ার্সের সংযোগ করিয়াছে

হুগলী শ্রীরামপুরে শিবশঙ্কর জিউ প্রদর্শনীর উদ্বোধন—মহকুমা হাকিম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন

রাজ্যের সনাতনপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ করায় সরকার পক্ষ ও মুসলমান পক্ষ নাকি প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহাদের যুক্তি এই যে,

ভিকটোরিয়া কলেজের ছাত্রীবৃন্দ (কনভোকেসন উৎসবে) ফটো—ডি, রতন এণ্ড কোং

প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে হিন্দু প্রজারা মনে করিবে যে তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত সংস্কারকে অমর্য্যাদা দেওয়া হইল। ভাল কথা, কিন্তু মজা এই যে—সমাজ সংস্কারের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন আইন (তা সে আইন দেশের ও দশের যত অকল্যাণই করুক না) জারি করিতে তাঁহারা জনমতের দিকে কখনও ত তাকাইয়া নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকেন না। তবে ?

পরলোকে স্যর মোহাম্মদ শাহ সুলেমান—

ভারতের ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি স্যর মোহাম্মদ শাহ সুলেমানের মৃত্যুতে যে শুধু একজন বিশিষ্ট ভারতীয় আইনজ্ঞের অভাব হইল তাহাই নহে, একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরও অভাব হইল। স্যর মোহাম্মদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি, পরে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সঙ্গে সঙ্গে গণিতশাস্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহার নাম সভ্যসমাজে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতির পদে আসীন হইয়া তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ব্যবহারাজীবদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহার অকালবিয়োগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হইল; কেন না, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ছিলেন। আমরা স্যর মোহাম্মদের শোকসন্তপ্ত পরিজন ও গুণগ্রাহীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়—

বঙ্গীয় অন্ধত্ব নিবারণী সমিতি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসাশালার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত সিরাজগঞ্জ (পাবনা), কুমিল্লা, ঘাটাল (মেদিনীপুর) জলপাইগুড়ি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণের পক্ষে ইহার চাহিদা থাকিলে এবং প্রয়োজনানুরূপ স্থানীয় চাঁদা পাওয়া গেলে ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবস্থা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস আছে, এই সমিতির কার্য্যে জনসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্যের অভাব কখনও হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক—

১৯৪০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করায়

প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বসুকে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা অমিয়কুমারের জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

প্রধান মন্ত্রী ও আদমসুমারি—

কিছুদিন হইতেই আদমসুমারি উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক প্রতিদিন অন্তত একখানি করিয়া ইস্তাহার জারি করিতেছিলেন। এই সকল ইস্তাহারের কটূক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বিভিন্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের অভিমত সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী আদমসুমারি উপলক্ষ করিয়া একটি ইস্তাহারে বলেন, 'ইহা ছাড়া আর অন্য কিছুই ঘটা সম্ভব নহে—যখন ব্যবহারাজীবী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, লেকচারার, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বহুজাতি ও উপজাতি তাহাদের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য মিথ্যা বলিতে এবং মিথ্যা বিবৃতি দিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।' তাঁহার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জন্য সম্প্রতি স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ব্বদলের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কতখানি শালীনতা, শিষ্টাচার এবং আত্মসম্মানশূন্য হইলে ব্যক্তি-তাহাই ভাবিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। সভাপতি স্যর নৃপেন্দ্রনাথ প্রধান মন্ত্রীর এই স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিবার জন্য বাঙ্গলার লাট স্যর জন হার্বার্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি অবিলম্বে এই ব্যক্তিকে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর গদি হইতে অপসরণ করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সাহায্য করুন।

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব—

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব—এ দুইটি প্রদেশই মুসলমানপ্রধান এবং মোসলেম লীগের পাণ্ডারাই মন্ত্রীমণ্ডলী—তথা দেশের শাসন চালাইতেছেন কিন্তু তবু এই দুই প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর চালচলনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের মন্ত্রীরা বে-হিসাবী অর্থব্যয় করিয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, দেশশাসনের জন্য তাঁহাদের করভারনিপীড়িত জনগণের উপর দিন দিনই ট্যাক্সের মাত্রা চড়াইতেছেন। তাহাতেও হালে পানি পায় না বলিয়া বেহালায় কুকুর দৌড়ের জুয়াখেলায় উৎসাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপর পক্ষে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর সেকেন্দর পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচারের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরস্পরের প্রতি

বেথুন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ (কনভোকেসন উৎসবে) ফটো—ডি, রতন এণ্ড কোং

নির্ব্বিচারে সাধারণভাবে একটা সমগ্র সম্প্রদায়কে লোক এই প্রকার অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিতে পারে

সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির পরিচায়ক ইতিবৃত্তসমূহ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতার ব্যবস্থা

করা হইবে, যে সকল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা মৈত্রী প্রচারে সহায়তা করিবে তাহাদিগকে সাহায্য করা

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূবিজ্ঞানের ছাত্রবৃন্দ
(কনভোকেসন উৎসবে)

হইবে, সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষগণের জন্মদিবস ও অন্যান্য কয়েকটি উৎসব যৌথভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে। পাঞ্জাবে যখন এই ব্যবস্থা, বাঙ্গালার মন্ত্রীরা তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার জন্য প্রতিদিন ইস্তাহার জারি করিতেছেন।

নিখিল-ভারত শিল্প সম্মিলন—

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে স্যর এম্ বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত শিল্প সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনে ভারতের ছোট ও মাঝারি শিল্পের মূলধন সংগ্রহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুবিধা দানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় শিল্পগুলি যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে সেজন্য আরও কড়াকড়িভাবে সংরক্ষণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও দাবী জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতে বিদেশী মূলধনের অবাধ আমদানি এবং বিদেশীয়গণ দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে দিয়াশলাই, সাবান, বৈদ্যুতিক ব্যাটারি, সিগারেট, রং ইত্যাদি দেশীয় শিল্পে যে অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সম্মিলন সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রস্তাবে দেশের মধ্যে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ চলাচল সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ এবং রেল ভাড়ার পরিবর্ত্তনের দাবী করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার্য্য কতিপয় বিদেশী জিনিষের আমদানি সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সরকারকে অবহিত হইতে হইবে যে কেবলমাত্র যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; পরন্তু যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর ভারত যাহাতে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে সরকারের পক্ষে সেজন্য চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করা
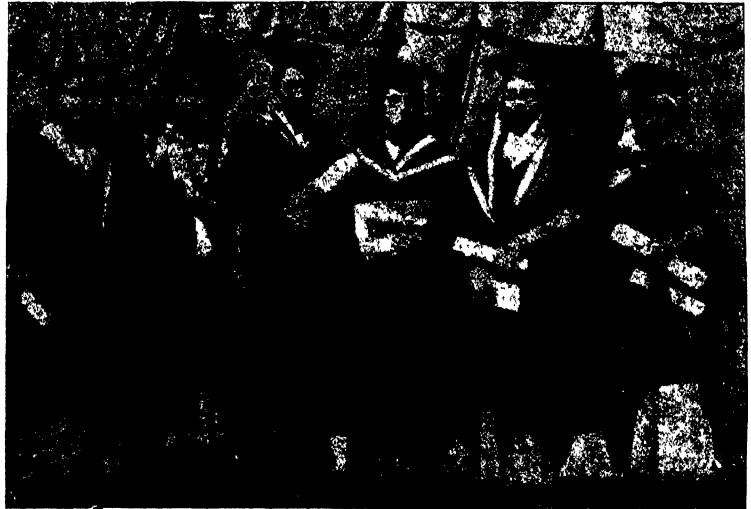
বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রীবৃন্দ (কনভোকেসন উৎসবে)

কর্ত্তব্য। পরিশেষে তিনি ভারতীয় শিল্পপতিগণকে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

কনভোকেসন উৎসবে বাঙ্গালার গভর্ণর (চ্যান্সেলার) ও সার এম আজিজুল হক (ভাইস-চ্যান্সেলার)

ইতিহাস রচনার উপকরণ—

সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ার আশুতোষ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদিগের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে বলেন, 'ইতিহাসের মালমশলাকে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সুষ্ঠু রূপ দিবার যুগ আসিয়াছে। নূতন যুগের ধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়াছে এবং সেই কম্পনের সাড়া আমাদের দেশের হৃদয়েও পড়িয়াছে। যুদ্ধ জাতীয় সংস্কৃতির নিম্প্রদীপ মহড়া-স্বরূপ। জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এই যুদ্ধ। এই আলোড়নের মধ্য হইতেই ইতিহাস রচনার জটিল উপকরণ সঞ্চিত হইবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ঐতিহাসিক সমিতির এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতিমূলক উদ্যম জাতীয় ইতিহাসের পাতায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিক্রয় কর বিল—

দরিদ্র, করভারপীড়িত বাঙ্গালার অধিবাসীদের স্কন্ধে একটির পর একটি করিয়া নূতন কর চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালা সরকার ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহেন যে, শাসন করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই; কেন না, বেহিসাবী ব্যয় না করিলে বাঙ্গালার রাজস্বে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য পরিচালনা অবশ্যই হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে অত হিসাব করিয়া চলিবার কোন আগ্রহ ত

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রবৃন্দ (কনভোকেসন উৎসবে)

নাইই, বরং ঘাটতি মিটাইবার জন্য তাঁহারা একটা পর একটা ট্যাক্স বসাইয়া দেশের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিতেছেন।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয় কর বিল গৃহীত হওয়ায় আমাদের উক্ত অভিমত যে সত্য তাহাই প্রমাণিত হইল। কংগ্রেস, কৃষকপ্রজা ও তপশীলী দলের সমবেত তীব্র প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রিসভার সমর্থক কোয়ালিশন দল শ্বেতাঙ্গ দলের সহায়তায় বিলটি ভোটে পাশ করিয়া লইয়াছে। করের হার টাকায় এক পয়সা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। বৎসরে আমদানি ও প্রস্তুত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যূন দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা খুচরা বিক্রয় হইলে এই কর দিতে হইবে। সরকারের এই সব স্বেচ্ছাচার দেশকে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিতেছে তাহা চিন্তা করিবার সময় কি দেশবাসীর এখনও আসে নাই ?

বর্দ্ধমানে রবিবাসর—

গত ২৫শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে বর্দ্ধমানে রবিবাসরের অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় বাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং সুকবি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় 'কাব্যে অনুবাদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানবাসীরা রবিবাসরের সদস্যগণকে স্থানীয় টাউন হলে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রবিবাসরের বহু সদস্য ঐ দিন বর্দ্ধমানে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানে রবিবাসর

পরলোকে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন—

ভারতীয় সিভিলিয়ানরা যে এদেশে কেবল শাসন করিতেই আসে এবং প্রসঙ্গত প্রচুর ধনার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়, আমাদের মধ্যে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই-একজন এমন লোকেরও সন্ধান পাওয়া যায় যাঁহারা এ দেশকে ও দেশবাসীকে প্রকৃত ভালবাসিয়াছেন। স্যর জর্জ গ্রিয়ার্স ন ইঁহাদের অন্যতম। ইনি ১৮৫১ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন কাউন্টিতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৮৭৩ সালে ভারতীয় সিভিল সার্বিসে যোগদান করেন। তিনি কর্ম্মজীবনে বাঙ্গলা ও বিহার প্রদেশে নানা পদে আসীন ছিলেন। ১৯০৩ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতীয় ভাষার আলোচনায় মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ডাবলিন, ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানিত ডি. লিট. (সাহিত্যাচার্য্য) উপাধি লাভ করেন। পাঁচ বৎসর ভারতীয় লিঙ্গুইস্টিক সার্ভের কর্ত্তৃত্বভার পরিচালনা করেন। কিছুদিনের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন এবং ভারতের প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় সবগুলি ভাষাতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের অভাব আমরা অনুভব করিতেছি।

উপাধি বিতরণ—

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষ্যে মোট ৫ হাজার ৩৩৪জন ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রি পান। ইঁহাদের মধ্যে এম্. এ. ৫৪৯, এম্. এস্-সি ১১১, বি. এ. ২৭৩৬, বি. এস্-সি ৭১৮, বি. কম্ ২৯৯, বি. টি. ২১৬, বি. এল্. (জুন) ২২৮ (ডিসেম্বর) ১২৬, এম্. বি.

(এপ্রিল) ১১০ (নবেম্বর) ৯২, বি. টি ৪৫, ডি. পি. এল্. ৩২ ও এম্. এল্. ২জন। ইহা ছাড়া পি.-এইচ্. ডি. উপাধি পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডি. এস্-সি উপাধি পাইয়াছেন ডাঃ নীলরতন সরকার, মনোহর রায়, সুধীরকুমার বসু ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এম্. ডি. পাইয়াছেন ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ডাঃ কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুশীল দত্ত। সকলকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন—

পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় গত ৭ই চৈত্র কাশীলাভ করিয়াছেন। ১২৬০ সালের ২৯শে পৌষ হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি খ্যাতনামা পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়স হইতে

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন

সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ১৩ বৎসর বয়সেই গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করেন। দারিদ্র্যের জন্য তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ তেমন পান নাই—কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের পর ২০।২১ বৎসর বয়সে তাঁহাকে চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার রচিত 'সরল কাদম্বরী', 'প্রবেশিকা দর্পণ' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার যশ ও অর্থের কারণ হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। তাঁহার 'ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি' হিন্দুকে তাঁহাদের ক্রিয়ার নূতন পথ দেখাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে পুনরায় ঐ পদে দুই বৎসরের জন্য রাখিবার প্রস্তাব কর্পোরেশন-সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার কোন অজ্ঞাত কারণে এই পুনর্নিয়োগে সম্মতি দিতে অসম্মত হন। অথচ ১লা এপ্রিলের মধ্যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে কাহাকেও নিয়োগ না করিলে কর্পোরেশনে অচল অবস্থা আসিয়া পড়ে, তখন অগত্যা সরকার নানাদিক বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে ১৫ মাসের জন্য পুনর্নিয়োগের আদেশ প্রদান করেন। তিনি কর্পোরেশনের মুখ চাহিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমস্যাটার আপাতত যেভাবে সমাধান হইল তাহাতে আমরা তাঁহার সাধুবাদ করিতেছি।

বীমা কোম্পানীর সাফল্য—

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল বীমা কোম্পানী বাঙ্গালীর পরিচালনাধীনে থাকিয়া উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছেন, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহারা চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে (কলিকাতা) নিজস্ব প্রসাদোপম অট্টালিকায় অফিস স্থানান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পত্তির পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং লাইফ ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ টাকার অধিক জমিয়াছে। এত অল্প দিনের মধ্যে বীমা কোম্পানীর পক্ষে এরূপ কার্য্য করা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমরা কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায়কে এজন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

ঈশ্বর গুপ্ত স্মৃতি-উৎসব—

গত ৯ই মার্চ্চ ই, বি, রেলের কাঁচরাপাড়া স্টেশনের অনতিদূরে কাঞ্চনপল্লী গ্রামে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের জন্মভিটাতে কবির স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানটি নদীয়া জেলার অন্তর্গত, রাণাঘাট সাহিত্য-সংসদের সদস্যগণ ঐ উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন প্রভৃতি বহু লোক উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দে মহাশয় সেদিন কাঞ্চনপল্লীতে নিজ বাটীতে গিয়া সকলকে আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। আমরা যে ক্রমে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির স্মৃতি-পূজা করিতেছি, ইহা জাতির পক্ষে জীবনের লক্ষণ সন্দেহ নাই।

সাংবাদিকের পরলোকগমন—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক কেশবচন্দ্র সেন মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বহুদিন যাবৎ তিনি সাংবাদিকতার কাজে বহু সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দারিদ্র্যের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া তিনি তাঁহার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পান নাই। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় ও সাংবাদিকতায় বিশেষ মুগ্ধ ছিলাম। নারীচরিত্র বাদ দিয়া তিনি ছেলেদের জন্য খানকয়েক নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শিল্পের উন্নতিতে সরকারী সাহায্য—

যুক্তপ্রদেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প বা ব্যবসায়ের বিস্তৃতির জন্য সরকারী তহবিল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যক মত দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং সমবায় সমিতি ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলিকে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণদানের ব্যবস্থা হইবে। আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা বেশী টাকাও দেওয়া যাইবে। প্রদত্ত ঋণের জন্য শতকরা একটাকা হারে সুদ আদায় করা হইবে। উপযুক্ত কিস্তিতে সাত বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্র যাহাতে প্রসারিত হয় এবং দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যাহাতে অধিক মাত্রায় শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে, সেইজন্যই সরকার এই কার্য্যক্রম গ্রহণে আগ্রহশীল হইয়াছেন। বাঙলার সরকার কিন্তু এই ধরণের কোন পরিকল্পনা ভাবিতেই পারেন নাই। তাঁহাদের নীতি—লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন। তাই নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া নিরন্ন বাঙালীকে উপবাসী রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন।

মণিকুমার মুখোপাধ্যায়—

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মণিকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৩০শে জানুয়ারী কাশীধামে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালের

মণিকুমার মুখোপাধ্যায়

১লা মার্চ্চ আগড়পাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি নিজের যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রণজি ট্রফি ফাইনাল ঃ

মাদ্রাজ ঃ—১৪৫ ও ৩৪৭

মহারাষ্ট্র ঃ—২৮৪ ও ২১০ (৪ উইকেট)

মহারাষ্ট্র ৬ উইকেটে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে পর পর দু'বার রণজি ট্রফি বিজয়ী হ'লো। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই অনুরূপভাবে উক্ত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ ক'রেছিলো। মহারাষ্ট্রের এই জয়লাভে আমরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা যেরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতি ম্যাচ জয়লাভ ক'রেছেন তাতে ভারতের প্রত্যেক নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদী মাত্রেই তাঁদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন না ক'রে পারবেন না। ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্র ভারতের সকল প্রদেশের চেয়ে শক্তিশালী। ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন প্রাদেশিক টীমে এতগুলি শক্তিশালী ব্যাটস্‌ম্যানের সমন্বয় খেলোয়াড়। একমাত্র প্রবীণ খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন দেওধর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তরুণের চেয়েও বেশী উৎসাহী ও শক্তিশালী। ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ মহারাষ্ট্রের এই তরুণ খেলোয়াড়বৃন্দের উপর অনেকখানি নির্ভর কচ্ছে। এখনও যদি টেষ্ট টীম গঠন করা হয় তাহ'লে মহারাষ্ট্র থেকেই সবচেয়ে বেশী ব্যাটস্‌ম্যান তাতে স্থান পাবেন। এবারের রণজি প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র ৬ ইনিংস খেলে ৪৭ উইকেটে ২৯৪৫ রান ক'রেছে। অর্থাৎ প্রতি ইনিংসের এভারেজ রান ৪৯১ এবং প্রতি উইকেটের প্রায় ৬২'৭। একা সোহানীই ৬৫৫ রান ক'রেছেন। হাজারী ৫৬৫ এবং ক্যাপ্টেন দেওধরের ৫০৮ রানও উল্লেখযোগ্য। হাজারীর এভারেজ সোহনীর চেয়ে বেশী হ'লেও সোহানীর ব্যাটিংয়ের কৃতিত্ব হাজারের চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বেশী।

এস সোহানী

প্রফেসর দেওধর

সি টি সারবাতে

দেখা যায়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবে ব'লেও মনে হয় না। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দলের সকলেই উদীয়মান সোহনীর এভারেজ ১৩১, হাজারীর ১৪১'২ এবং দেওধরের ৮৪'৬। সারবাতে যদিও ২৪টা উইকেট পেয়েছেন তাঁকে তবু
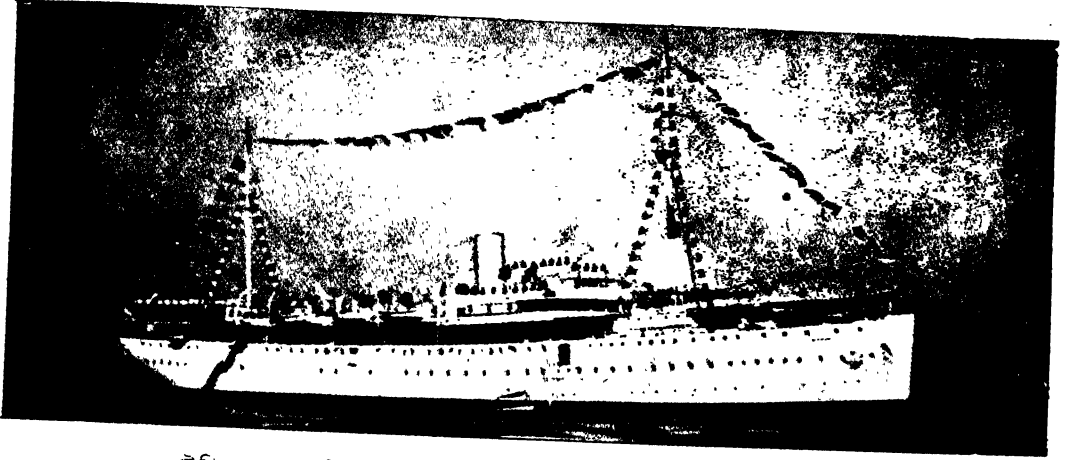
ট্রেনিং জাহাজ "ডফরিণ"—ইহাতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে জাহাজ-চালান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

যুদ্ধে যে সকল ভারতীয় বন্দী হইয়াছে, তাহাদের জন্য লণ্ডনস্থ ভারতীয় মহিলারা খাদ্য পাঠাইতেছেন
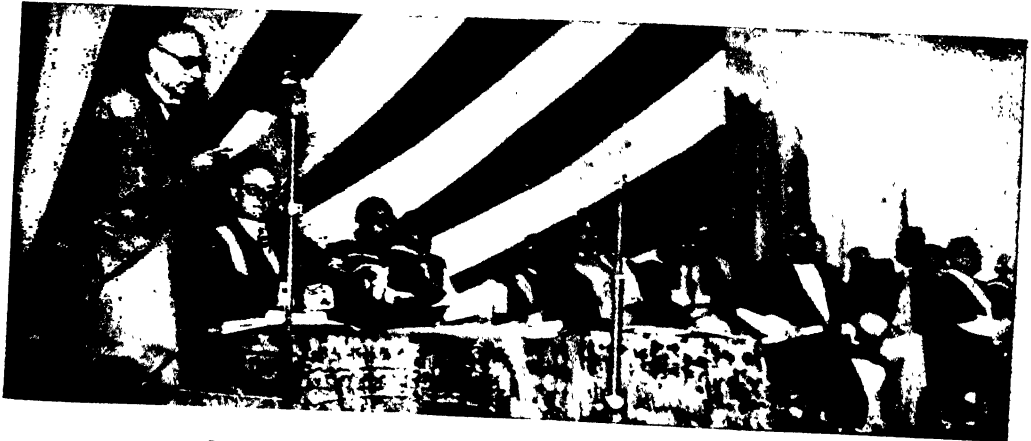
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সার তেজবাহাদুর সাপ্রু বক্তৃতা করিতেছেন

চট্টগ্রামের রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের বাটীর দুই শত বৎসরের পুরাতন তৈল চিত্র—সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মহাপ্রভু—
রাণাঘাট শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রমের শ্রীযুত বঙ্কিমকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত

২৪ পরগণা পানিহাটীতে গঙ্গাতীরে মহারাজ চন্দ্রকেতু নির্ম্মিত ৭ শত বৎসরের প্রাচীন ঘাট ও তদুপরি
বটবৃক্ষ—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই ঘাটে নামিয়াছিলেন

খুব উচ্চ শ্রেণীর বোলার আমরা ব'লতে পারি না অন্ততঃ ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্রের যে রকম রেকর্ড সেই তুলনায় বোলিং কিছুই নয় ব'ললেও চলে। ফিল্ডিংয়ে মহারাষ্ট্রের স্থান অত্যন্ত নিম্নে।

আমরা আগের মাসেই আভাস দিয়েছিলাম যে মাদ্রাজের উইকেট ভাল নয়। একাধিকবার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে; এবারও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে ছাড়ে নি। তবে প্রথমে সেটা হ'য়েছে মাদ্রাজের উপরেই। তারা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে যায়। আরম্ভ খুবই খারাপ হ'য়েছে। ৪ রানে দুটো ভাল ভাল উইকেট পড়ে গেল। এরপর সাময়িকভাবে দুএকজন খেলোয়াড় খেলার গতি একটু ফেরাতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি। শেষদিকের বরং কয়েকজন খেলোয়াড় পিটিয়ে খেলে একটু রান তুলেছেন। দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছেন ভেঙ্কটেসন ৩১। ইনিংস শেষ হ'য়েছে মাত্র ১৪৫ রানে। যাদব ২৩ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছেন, সারবাতে ৩৬ রানে ৩টে। মাদ্রাজের ব্যাটিং অবশ্য ভাল নয় তাই ব'লে এত কম রানে তারা নেবে যাবে তা ভাবা যায়নি। দেওধর ব'লেছেন যে মাদ্রাজের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের সাধারণ ফুট-ওয়ার্কেরও একান্ত অভাব দেখা গেছে।

ভি এস হাজারী

মহারাষ্ট্রের ব্যাটিংও ভাল হয়নি। সোহনী এই প্রথম অকৃতকার্য্য হ'য়েছেন। দিনের শেষে ৬টা ভাল ভাল উইকেট হারিয়ে রান সংখ্যা উঠেছে মাত্র ১১৩। অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। একমাত্র ভরসা হাজারী। তিনি ২১ রান ক'রে নট আউট আছেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা সুরু হ'য়েছে; হাজারী খুব ধীরভাবে খেলছেন। সারবাতে ৩৩ রান ক'রে অপ্রত্যাশিত-ভাবে আউট হ'য়ে গেলেন। হাজারী ১০৮ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান ক'রলেন। দ্রুত রান তোলার দিকে তাঁর মোটেই ঝোঁক ছিল না। টীমের সমস্তই এখন তাঁর উপর নির্ভর কচ্ছে। পরবর্ত্তী ৫০ রান তুলতে কিন্তু তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ৪৫ মিনিট। বোলারদের মোটেই গ্রাহ্য করেননি। প্রথম দিনের খেলার শেষে যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হ'লেও কিছু আশ্চর্য্যের ছিল না। হাজারী স্বীয় দলকে পতনের হাত থেকে যেভাবে রক্ষা ক'রেছেন তাতে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

১৩৯ রানে পিছিয়ে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলে। এবার তাদের সূচনা ভালই হ'য়েছে। প্রথম উইকেট পড়লো ৭৮ রানে। মাদ্রাজের ক্যাপ্টেন জনষ্টোন নিজস্ব ৪৯ রানের মাথায় আউট হ'য়েছেন। মাদ্রাজ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছে। দিনের শেষে তাদের ২ উইকেট হারিয়ে রান উঠেছে ১০৭।

মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ৩৪৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাদের ব্যাটস্‌ম্যানদের দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। রামসিং স্বীয় দলের সম্মান রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন। তরুণ খেলোয়াড় নেলারের প্রচেষ্টাও উল্লেখ-যোগ্য। তাঁরা যথাক্রমে ৭১ ও ৫৪ রান ক'রে আউট হ'ন। দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছেন রামসিং; চার ছিলো দশটা।

ইণ্টার কলেজ ক্যারাম প্রতিযোগিতায় আশুতোষ কলেজের ছাত্রিগণ ফটো: বি বি মৈত্র

তাঁর হুক, ড্রাইভ ও কাট্ বেশ দর্শনীয়। সারবাতে ৬টা উইকেট পেয়েছেন ৮৩ রানে। ২০৯ রান ক'রলেই মহারাষ্ট্র জয়লাভ ক'রতে পারবে। সোহনী ও ভাজেকার খেলা সুরু ক'রলেন। দিনের শেষে কেউ আউট না হ'য়ে রানসংখ্যা তুললেন ৫২।

শেষদিনের খেলায় দর্শক সমাগম বেশী হয়নি। বোধ হয় মহারাষ্ট্রের নিশ্চিত জয়লাভের কথা চিন্তা ক'রে। প্রয়োজনীয় রান তুলতে মহারাষ্ট্র মাত্র চারটি উইকেট হারালে। সোহনী সেঞ্চুরী ক'রেছেন। দেওধর আউট হ'য়েছেন ৩২ রান ক'রে। রণজি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের খেলায় প্রতি ইনিংসে তাদের কোন না কোন খেলোয়াড় শতাধিক রান ক'রেছেন। আশা করি আগামী বারের রণজি প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র তাদের এবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে এবং আরো উন্নততর খেলা দেখিয়ে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল ক'রবে।

মাদ্রাজ

প্রথম ইনিংস

সি পি জনষ্টোন···কট সোহনী · ব পটবর্দ্ধন		৪
ভি এন মাধব রাও ··কট গোখলে···ব সোহনী		১২
এ জি রামসিং ··কট নাইডু···ব পটবর্দ্ধন		০
আর নেলার···ব যাদব		১৯
সি রামস্বামী···ব যাদব		১৪
এম জে গোপালন···কট গোখলে · ব যাদব		১
জি পার্থসারথি···ব সারবাতে		১১
জে এ জি সি ল'···কট এবং ব···সারবাতে		৩
এন জে ভেঙ্কটেসন·· কট হাজারী···ব সারবাতে		৩১
বি এস কৃষ্ণ রাও···	নট্ আউট	২৯
সি আর রঙ্গচারী···ব যাদব		৪
	অতিরিক্ত···	১৩
	মোট···	১৪৫

মহারাষ্ট্র

প্রথম ইনিংস

আর ভি ভাজেকার···ব রঙ্গচারী		২৭
এস ডবলউ সোহনী···কট জনষ্টোন···ব রঙ্গচারী		১১
আর বি নিম্বলকার···এল-বি···ব রামসিংহ		৫
ডি বি দেওধর···এল-বি···ব রঙ্গচারী		১১
ভি এস হাজারী···কট জনষ্টোন···ব রঙ্গচারী		১৩৭
এম এম নাইডু···কট জনষ্টোন···ব কৃষ্ণরাও		০
কে এম যাদব···কট জনষ্টোন···ব রামসিং		১৫
সি টি সারবাতে···ব ভেঙ্কটেসন		৩৩
গোখলে···কট রামস্বামী···ব রঙ্গচারী		১৪
সিদ্ধে···	নট্ আউট	[illegible]
পটবর্দ্ধন···[illegible] এবং ব ভেঙ্কটেসন		[illegible]
	অতিরিক্ত···	৯
	মোট···	২৮৪

মাদ্রাজ

দ্বিতীয় ইনিংস

সি পি জনষ্টোন···কট গোখলে···ব সারবাতে		৪৯
জে ল'···কট নাইডু···ব সারবাতে		৩৩
মাধব রাও···	রান আউট	৩৪
রাম সিং···কট ভাজেকার··ব যাদব		৭১
নেলার···কট সোহনী···ব সারবাতে		৫৪
সি রামস্বামী···কট এবং ব হাজারী		১
পার্থ সারথী···	নট আউট	১৮
গোপালন···কট দেওধর···ব সারবাতে		৪৩
ভেঙ্কটেসন···কট নাইডু···ব সারবাতে		১০
কৃষ্ণ রাও···ব হাজারী		২
সি আর রঙ্গচারী···ব সারবাতে		০
	অতিরিক্ত···	৩২
	মোট···	৩৪৭

মহারাষ্ট্র

দ্বিতীয় ইনিংস

আর ভি ভাজেকার···ব রামসিং		১৬
এস সোহনী···কট জনষ্টোন···ব রামসিং		১০৪
আর নিম্বলকার···কট ল'···ব রঙ্গচারী		২১
ডি দেওধর···এল-বি ··ব রামসিং		৩২
ভি হাজারী···	নট আউট	৬
কে যাদব···	নট আউট	২
	অতিরিক্ত···	১৯
	মোট (৪ উইকেট)···	২১০

রণজি ট্রফিতে শতাধিক রান ঃ

মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড় ঃ

প্রফেসর দেওধর	২৪৬	বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে
প্রফেসর দেওধর	১৯৬	উত্তর ভারতের "
ভি এস হাজারী	*১৬৪	পশ্চিম "
ভি এস হাজারী	১৩৭	মাদ্রাজের "
ভি এস হাজারী	১১৭	গুজরাটের "
এস ডবলউ সোহনী	২১৮*	
এস ডবলউ সোহনী	১৩৪	গুজরাটের "
এস ডবলউ সোহনী	১২০	বোম্বাইয়ের "
এস ডবলউ সোহনী	১০৪	মাদ্রাজের "
আর ভাজেকার	১২০	উত্তর ভারতের "
কে এম যাদব	১১৫	উত্তর ভারতের "

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল

১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই
১৯৩৬-৩৭	নওনগর	১৯৩৭-৩৮	সিন্ধু
১৯৩৮-৩৯	বাঙ্গলা	১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র

ক্রিকেট লীগ ঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল জিমখানার এক সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছে যে, আগামী শীতকাল থেকে জিমখানার তত্ত্বাবধানে ক্রিকেট লীগ খেলা সুরু হবে। বিভিন্ন ক্রিকেট দলের বার্ষিক ক্রিকেট খেলার তালিকা প্রস্তুত ক'রতে যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য জিমখানা থেকে লীগ তালিকা জুলাই মাসের মধ্যেই প্রতিযোগী টীমকে প্রেরণ করা হবে। জিমখানা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত সকল দলকেই লীগে যোগদান করবার জন্য আহ্বান ক'রবেন। অবশ্য হাওড়ার জন্য স্বতন্ত্র এক লীগ খেলার ব্যবস্থা করা হবে আর তাতে কেবল হাওড়ার সঙ্গে দেড় দিন ব্যাপী খেলার তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য অনুরোধ করবেন।

বেঙ্গল জিমখানার এই প্রচেষ্টা খুবই ভাল এবং এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হ'লে স্থানীয় ক্রিকেটের যথেষ্ট উন্নতি হবে ব'লে মনে হয়। কেবলমাত্র প্রীতি-সম্মেলনে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাল হয় না। যদিও কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতা কয়েক বছর থেকে চলছে তবু নক্-আউট টুর্ণামেন্ট হওয়ার ফলে একটি টীম একটি ম্যাচ ভাল না খেলতে পারলে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। তাছাড়া এত বড় দেশের পক্ষে ঐ একটিমাত্র প্রতিযোগিতা যথেষ্ট নয়। লীগে প্রত্যেক টীম প্রত্যেকের সঙ্গে খেলবার

এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগিগণসহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ

দলসমূহ যোগদান করবে। বাঙ্গলার অন্য সকল জেলাতেও যাতে ক্রিকেট খেলার অনুরূপ ব্যবস্থা হয় জিমখানা সেখানকার পরিচালকদের এ বিষয়ে অনুরোধ করেছেন। কলকাতায় প্রথম বৎসর লীগ খেলা হবে ২০টি দল নিয়ে। এই ২০টি দলকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হবে আর প্রতি বিভাগের প্রথম পাঁচটি দলকে প্রথম শ্রেণীর দল ব'লে গণ্য করা হবে। লীগের প্রত্যেক ম্যাচ দেড় দিন ক'রে খেলা হবে। জিমখানার অন্তর্ভুক্ত কলেজ টীমগুলি উক্ত লীগে যোগদান ক'রতে পারবে না। তবে জিমখানা থেকে স্থানীয় প্রত্যেক বিশিষ্ট টীমকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ পাবে এবং প্রত্যেক খেলাতেই একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাবে। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, খেলা দেড় দিনব্যাপী হবে কিন্তু কোন পক্ষ কতক্ষণ খেলতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। আমাদের মনে হয় লাঙ্কাশায়ার লীগের অনুকরণে সমস্ত সময়টিকে সমান দুভাগে ভাগ ক'রে উভয় দলকে ব্যাট করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তার ভেতর যারা বেশী রান খুলতে পারবে তারাই জিতবে। এরকম না হ'লে অধিকাংশ ম্যাচ ড্র হবার সম্ভাবনা। যারা প্রথম ব্যাট করবে তাদের ইনিংস শেষ হ'তে যদি পুরো একদিন বা তার চেয়েও বেশী

সময় লাগে এবং অপর পক্ষের সকলে আউট হবার আগেই যদি সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় তাহ'লে জয় পরাজয় নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু উভয় পক্ষকে যদি ব্যাট

ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন স্পোর্টসের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়িনী কুমারী নিভা সেন

করবার সময় সমান ভাবে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয় তাহ'লে ঐ সময়ের ভেতর যে দল বেশী রান তুলতে পারবে সেই বিজয়ী হবে। এই রান তুলবার জন্য উইকেট কম বা বেশী হারানোর উপর জয় পরাজয় কিছুই নির্ভর ক'রবে না। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তাতে ছাত্রদের খেলার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা মোটেই ভাল খেলা দেখাতে পাচ্ছেন না অথচ বোম্বাই, পাঞ্জাব, আলীগড় বা বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা তাঁদের প্রদেশের হ'য়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হ'য়ে খেলে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন ক'চ্ছেন। সব দেশেই দেখা যায় উদীয়মান খেলোয়াড়রা আসে বেশীর ভাগ ছাত্রদের থেকে, এখানকার ছাত্রদের খেলার যেটুকু উন্নতি তা কেবল ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকে কোন রকম দৃষ্টি নেই। ছেলেরা নিজের নিজের ক্লাব থেকে খেলা শিখবে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু টীম মনোনয়নের সময় কয়েকটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলাবেন। এইখানেই যেন তাঁদের দায়িত্ব শেষ হ'য়ে গেল। সম্মেলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টীমের সঙ্গে শক্তিশালী ক্লাবগুলির বার্ষিক ক্রিকেট খেলার তালিকা প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্য উপরোক্ত নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার প্রথম প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত আই ঘোষকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হকি লীগ ঃ

হকি লীগ খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। পুলিশ যে চ্যাম্পিয়ান হবে তা সুনিশ্চিত। পুলিশ এবার একটা খেলাতেও হারেনি অবশ্য তাদের এখনও একটা খেলা বাকী আছে লিলুয়ার সঙ্গে। লীগের প্রায় সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকারী লিলুয়ার কাছে তারা নিঃসন্দেহে জিতবে। অবশ্য লিলুয়ার কাছে হেরে গেলেও চ্যাম্পিয়ানসীপের পথে তা মোটেও বাধা সৃষ্টি করবে না। কারণ লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রেঞ্জার্স অনেক পয়েণ্ট পিছিয়ে আছে। রেঞ্জার্স যদি সবক'টা জেতে এবং পুলিশ তাদের শেষ খেলায় হেরে যায় তাহ'লেও পুলিশই চ্যাম্পিয়ান হবে। পুলিশ

ইণ্টার কলেজ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় আশুতোষ কলেজের ছাত্রিগণ ফটো : বি বি মৈত্র

ইতিপূর্ব্বে কখনও লীগচ্যাম্পিয়ান হয়নি। এবার তারা ১৫টা ম্যাচ খেলে জিতেছে ১৩টা আর ড্র ক'রেছে কাষ্টমস

ও মেসারার্সের সঙ্গে, হারেনি একটাও। গোল দিয়েছে ৩৪টা আর গোল খেয়েছে ১২টা। পোর্টকমিশনার্স ও রেঞ্জার্সের কাছে তাদের জয়লাভ কৃতিত্বপূর্ণ। পোর্টকমিশনার্স গোড়ার দিকে বেশ ভাল খেলছিলো আর আশা করা গিছলো তারা হয়ত লীগচ্যাম্পিয়ান হ'তে পারবে কিন্তু শেষরক্ষা ক'রতে পারলে না। এবারের লীগে তারাই সবচেয়ে কম গোল খেয়েছে মাত্র ৮টা। এবার সেণ্টজেভেরিয়ান্সদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়; তারা ১৪টা খেলে মাত্র ১ পয়েণ্ট পেয়েছে অর্থাৎ একটি ড্র ক'রে বাকী সবক'টা হেরেছে। তারা গোল দিয়েছে ৪টে আর খেয়েছে ৩৪টা দ্বিতীয় বিভাগের লীগে কালীঘাট অদ্ভুত খেলছে। প্রথম বিভাগের অনেক টীমের চেয়ে ভাল। তবে এবার কোন লাভ নেই; ওঠা নামা বন্ধ।

ফুটবল ঃ

হকির মত ফুটবলেও এবার ওঠা নামা স্থগিত রইলো। আই এফ এর এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা স্থির হ'য়েছে। আই এফ এর ভবিষ্যৎ গঠন সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদের পর এ বৎসরের মত ও প্রসঙ্গ স্থগিত রাখা হয়। ক্যালকাটা ক্লাব আই এফএর সভ্যদের অনুগ্রহে এবারও প্রথম বিভাগেই রয়ে গেল। তিন বৎসর ধরে ক্যালকাটা লীগে শেষ স্থান অধিকার ক'রে আসছে।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
১৩৪৫ সাল	২২	৪	৭	১১	৯	২৩	১৫
১৩৪৬ সাল	২৪	৩	৮	১৩	২৩	৪০	১৪
১৩৪৭ সাল	২৪	৩	৮	১৩	১৮	৩৪	১৪

এর পর এ বছর ওঠা নামা বন্ধ কাজে কাজেই এবারও শেষ স্থান অধিকার ক'রলে নামবে না। আর এবারও যে তারা তাদের গত তিন বছরের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। ক্যালকাটা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেই ভাল হ'ত যে, তারা ভবিষ্যতে যতবারই শেষ স্থান অধিকার করুক দ্বিতীয় বিভাগে নামবে না। আত্মসম্মান সম্পন্ন কোন টীম পর পর তিনবার শেষ স্থানে থেকে এবং এ রকম নিকৃষ্ট খেলা দেখিয়ে প্রথম বিভাগে থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না। এতে প্রথম বিভাগের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নষ্ট হ'য়ে যায়।

এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী এবং বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তাগণ ফটো: তারক দাস

আগামী ফুটবল খেলা ঃ

কলকাতার ফুটবল মরসুমের এখনও দেরী আছে। তবে ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক

এবং ভবিষ্যতের সম্মানের লোভে বিভিন্ন ক্লাবের ২০৬ জন ফুটবল খেলোয়াড় অন্যত্র ফুটবল খেলবার জন্য ছাড়পত্রে আবেদন করেছেন। ইউরোপের নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়দের একটা আকর্ষণ আছে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁরা বড় বড় ফুটবল ক্লাবে প্রকাশ্যভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ওদেশে ক্রীড়াজগতে সখের খেলোয়াড়দের যেমন সম্মান আছে তেমনি পেশাদার খেলোয়াড়দেরও সম্মান কোন অংশে কম নেই। খেলার উৎকর্ষসাধনে পেশাদার খেলোয়াড়দের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেটা উপেক্ষার নয়। একদিকে যেমন সখের তরুণ খেলোয়াড়দের দেশের জনসাধারণের মধ্যে সম্ভব নয়। অন্নচিন্তার সঙ্গে মনের আনন্দের একটা বড় সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে আজ সেই অন্নচিন্তাই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু চাকুরীর বাজারে খেলাধূলার মূল্য আর কতখানি! এ অবস্থা দেখে আমাদের দেশের ভবিষ্যত খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার আকর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাবে। চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনে খেলাধূলা আজ আর খুব বেশী খেলোয়াড়কে আকর্ষণ করে না। আমাদের দেশে পেশাদার খেলোয়াড়ের চলন নেই, খেলোয়াড়দের পেশাদার শ্রেণীভুক্ত করবে এমন কোন প্রতিষ্ঠানও নেই আর ব্যবস্থাও

৫০নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত "মল্লিক টেনিস ক্লাবের" ১৯৪০ সালের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ। ডবলসে বিজয়ী—শ্রীমান্ প্রণব ঘোষ ও অনিল সেন ফটো : ডি রতন এণ্ড কোং

উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাধীনে রেখে উন্নত ক্রীড়া কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ক্লাবগুলি ক্রীড়ামোদিদের প্রথম শ্রেণীর খেলা দেখাবার জন্যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খেলোয়াড়দের পেশাদার দলভুক্ত করেন। খেলাধূলা নিতান্তই সখের এবং অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনই ইহার যথেষ্ট এ সংস্কার আমাদের মন থেকে দূর না হলে খেলাধূলার একটা ব্যাপক জাগরণ নেই। ভূয়া আত্মসম্মানে আমরা গৌরব অনুভব করি এবং বর্ণচোরা আধা পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট প্রশ্রয় এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন। অপর কোন সভ্য দেশের কাছে এই শ্রেণীর আদর্শের কোন মূল্য নেই। কুস্তিবীর এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়দের চাকুরী দিয়ে খেলাধূলায় উৎসাহ দান করার বনিয়াদী খেয়াল দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকদিন থেকে রয়েছে। আমাদের

দেশের যে সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নতির জন্ম আগ্রহশীল তাদের প্রধান কর্ত্তব্য খেলোয়াড়দের অন্নচিন্তার সমস্যা দূর করা। এ বৃহৎ ব্যাপারে তাদের ছাড়াও অপর অনেকের যে কর্ত্তব্য আছে তা আমরা ভাল ভাবেই জানি। তবে যে পরিমাণ কর্ত্তব্য তাদের আছে সে কর্ত্তব্যে তারা যে একেবারেই উদাসীন রয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত। আজ পেশাদার-খেলোয়াড় দলে যোগদান করা খেলোয়াড়দের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়েছে। সেটা কেবল মাত্র আর্থিক ব্যাপারে নয় খেলার উৎকর্ষলাভের দিক দিয়েও। পৃথক সমাজ হলেও সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য সমভাবেই ক্রীড়ামোদিদের চিত্তবিনোদন করবে যদি শিক্ষাদানের কার্পণ্য আমরা না করি। খেলোয়াড়দের সখের এবং পেশাদার এই দুই দলে বিভক্ত করলে বর্ণচোরাদের প্রভাব হ্রাস পাবে, প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াচাতুর্য্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। এবিষয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মকর্ত্তাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন—আশা করি তাঁরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে সচেতন হবেন।

বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের ক্লাব পরিবর্ত্তন—

এরিয়ান্স ক্লাবের এ ভৌমিক ও কে প্রসাদ, কালীঘাট ক্লাবের এস জোসেফ ও ধীরাজ দাস, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের গোলরক্ষক ডি সেন এবং মহারাণা ক্লাবের ব্যাক এস সি দাস মোহন বাগান ক্লাবে যোগদান করেছেন! এরিয়ান্স ক্লাবে এসেছেন অনেকগুলি উদীয়মান খেলোয়াড়। কালীঘাট ক্লাবে মোহন বাগানের ব্যাক পি চক্রবর্ত্তী ও মহারাণা ক্লাবের গোলরক্ষক বি বল এবৎসর খেলবেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে গোলরক্ষক কে দত্ত, কালীঘাটের আপ্পারাও ও রামালু যোগ দিয়েছেন। ভবানীপুর ক্লাবে গেছেন মহামেডান স্পোটিং ক্লাবের সুজাতালী এবং কালীঘাটের কাইজার।

মহামেডান স্পোটিং ক্লাবের নামজাদা একজন ব্যতীত সকলেই রয়ে গেছেন। তার উপর ক্লাবের শক্তি বাড়ান হয়েছে ই বি আর দলের ওসমান ও ইষ্টবেঙ্গলের সাজাহানকে নিয়ে। জানা গেছে এবৎসর নাকি বিশিষ্ট খেলোয়াড় ওসমান নিয়মিত খেলবেন।

খেলোয়াড়দের ক্লাব পরিবর্ত্তনের ফলে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহামেডানস্পোটিং দলের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীঘাট ক্লাবের বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা ভিন্ন ভিন্ন ক্লাবে যোগদান করায় তাদের দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে। যদিও দু'একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় দলে এসেছেন। তবে বহুদিন যাবৎ নামজাদা খেলোয়াড় আমদানী করেও তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ

নিখিল ভারত ভারোত্তলন প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্ত্তন ক'রে এশিয়াটিক ভারোত্তলন নাম দেওয়া হয়েছে। নামের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিচালকমণ্ডলী এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি যোগদানের ব্যবস্থা করতেন অথবা সত্যসত্যই যদি এশিয়ার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থান থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করতেন তাহলে এরূপ নামের যেমন একটা গুরুত্ব বজায় থাকত তেমনি পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকত।

আমরা জানিনা তাঁরা অদূর ভবিষ্যতের কোন ভরসা পেয়েছেন কি না! পেয়ে থাকলেও পূর্ব্বাহ্নেই নামের আমূল পরিবর্ত্তনে ক্রীড়ামোদিদের চোখে চমক লাগানো ছাড়া প্রতিযোগিতার এত বড় নামের আর কিছু গুরুত্ব আছে বলে ত আমাদের মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন এবারের প্রতিযোগিতাটিকে সমগ্র ভারতবর্ষের একটি প্রতিনিধিমূলক
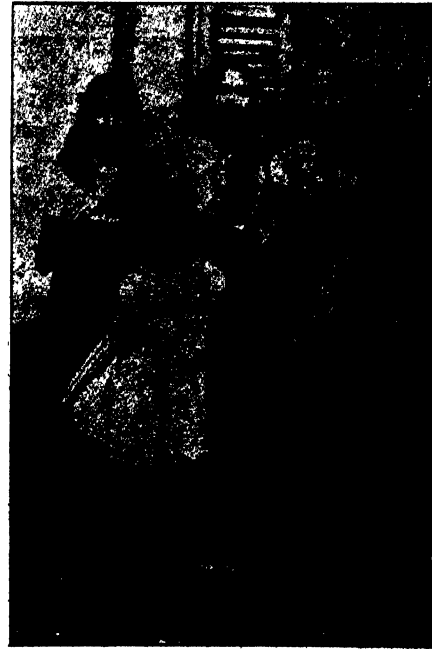
ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির এথলেটিক স্পোর্টসের টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়ী সাউথ এণ্ড পার্ক ইনঃ দল ফটো: পান্না সেন

হিসাবে তাঁরা গৌরবান্বিত করতেও পারেননি। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে বাঙালী ভারোত্তলনকারিগণ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ সাফল্যে আমরা সাময়িক আনন্দ প্রকাশের সুযোগ হারাব না—কিন্তু এটাই আমাদের সবথেকে বড় নয়। ভারোত্তলনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল উপযুক্ত ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের অভাবে আমাদের দেশে এখনও ব্যায়ামবীরদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। অর্থের প্রয়োজনকে স্বীকার করলেও ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানগুলির যে একান্ত উৎসাহ এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার অভাব রয়েছে একথা

অস্বীকার করবার নয়। অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরটাই আমরা সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় বস্তু করে তুলি। এরূপ প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য-গঠনের ভার নিয়েছে—তাদের সংখ্যাধিক্যই আমাদের চিন্তার কারণ। বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম ক্লাবের উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে, আশা করি ক্লাবের পরিচালক-মণ্ডলী এবিষয়ে সচেতন থাকবেন।

মিস্ একা (স্কটিশ কলেজ) ইণ্টার কলেজ মহিলাদের স্পোর্টসে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান-সীপ বিজয়িনী

প্রতিযেগিতার ফলাফল :

ব্যাণ্টম ওয়েট : ১ম—জি মল্লিক। দুইহাতে মিলিটারীপ্রেস, স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৪৮৪½ পাউণ্ড।

ফেদার ওয়েট : ১ম—বিজয়কৃষ্ণ বসু। দুইহাতে মিলিটারীপ্রেস, স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৪৭৭ পাউণ্ড।

লাইট ওয়েট : ১ম—এ গফুর। দুইহাতে মিলিটারী-প্রেস, স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৪৮২ পাউণ্ড।

মিডল ওয়েট : ১ম—এ কে সেন। দুইহাতে মিলিটারী-প্রেস, স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৫৫৫ পাউণ্ড।

লাইট হেভী ওয়েট : ১ম—সুবল ঘোষ। দুইহাতে মিলিটারী স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৫০০ পাউণ্ড।

হেভী ওয়েট : ১ম—পি জি উইলিশ। দুইহাতে মিলিটারী, স্ন্যাচ, ক্লিন ও জার্ক—মোট ৫৫৫ পাউণ্ড।

বালিকাদের ইণ্টার-স্কুল চ্যাম্পিয়ানসীপ :

সিনিয়ার :—কমলা হাই স্কুল—৪৮ পয়েণ্টস

জুনিয়ার :—প্রেসিডেন্সি স্কুল—৩৮ „

ইণ্টারমিডিয়াট লেক স্কুল— ৪৩ „

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : কুমারী উমা বসু (ব্রাহ্ম স্কুল)—৩৬

ইণ্টারমিডিয়াট :—কুমারী নমিতা পাল (পেয়ারীচরণ গার্লস স্কুল)—২৪

জুনিয়ার :—কুমারী ডলি সেন (মডেল একাডেমি)—২৪

ভ্রমসংশোধন : গতমাসের খেলাধূলায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রুফ দেখার দরুণ কিছু কিছু ভুল রয়ে গেছে। ৫৪০ পৃষ্ঠার একটি ব্লকের নীচে টেবল টেনিস…'অরুণ গুহ' ছাপা হয়েছে। ঐ স্থানে 'অরুণ ঘোষ' হবে। ৫৩৫ পৃষ্ঠায় গোপালম-এর স্থানে গোপলন এবং ৫৩৬ পৃষ্ঠায় ডানদিকের কলমের দ্বিতীয় লাইনের 'অপর' কথাটি 'কয়েকজন'-এর পূর্ব্বে বসবে অর্থাৎ কথাটি 'অপর কয়েকজন' হবে।

সাহিত্য সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক "তিন শূন্য"—২৲
শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "১৯৩০ সাল"—২॥০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ধোঁয়া"—২৲
রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রেম ও পৃথিবী"—২॥০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীক "গল্পদাদুর বৈঠক"—৸০
সরোজনাথ ঘোষ প্রণীত "কুয়ো ডেভিস" বা কোথা যাও—২৲
ঐ দ্বিতীয়—২৲ ঐ ৩য়—২৲
মতিলাল দাস প্রণীত "বন্ধন ও মুক্তি"—২৲
শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মেয়েদের মন"—১॥০
বীরেন দাশ এম, এ প্রণীত "ষ্টালিন"—১৲
শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বৈষ্ণব কবিতার রস"—১।০
রাধারমণ দাস প্রণীত "ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত"—৸০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্রোপন্যাস "পথ বেঁধে দিল"—১॥০
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "ভুল"—১৲
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সমুদ্র"—১৲
বাণী দাস প্রণীত "প্রাথমিক বেহালা শিক্ষা"—১॥০
শৈলেন রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত "সুরের মালা"—১৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত "ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প"—১॥০
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "কুহকিনী"—১৲
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বেণীগির ফুলবাড়ী"—২৲
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মিস্ মায়া বোর্ডিং হাউস"—২৲
শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত "যোগ সাধনার ভিত্তি"—১॥০
মণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত "লুপ্ত রাজপুরীর রহস্য"—৷৵০
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র রায় প্রণীত "কৃষ্ণ-গায়িকা"—৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র ধর

মমতাজের মৃত্যু

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভাগবত-জীবন

(শ্রীঅরবিন্দের Life Divine গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদের মূল কথা)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)

Life Divine গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের আরম্ভে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে মানব বহু বহু যুগ পূর্ব্বেই সন্ধান পাইয়াছিল—জরা মৃত্যু শোক তাপ সুখ দুঃখের অতীত এক দিব্য জীবনের, দিব্য লোকের। শুধু যে সন্ধান পাইয়াছিল তাহা নহে, সেই ঊর্দ্ধতম লোকে যে সে উঠিতে পারে—এরূপ প্রতীতিও তাহার জন্মিয়াছিল। সেই অর্দ্ধপরিণত আদিম মানব আর নাই, আজ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত, সে প্রকৃতির সহিত অহরহ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আজ দাসী-বাঁদীর মত তাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, মনোরাজ্যেও তাহার শক্তি অপ্রতিহত, তাহার দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারিত। সে পরিবার গোষ্ঠী জাতি প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘটনে কৃতকার্য্য হইয়া মহাজাতি সংঘটনে মনোনিবেশ করিয়াছে, জগৎব্যাপী এক অখণ্ড সম্মিলিত রাষ্ট্রেরও স্বপ্ন সে আজ দেখিতেছে। এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ মানবের বহুসহস্রবৎসরব্যাপী সংগঠন প্রচেষ্টা, একটীর পর একটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কেন মানুষ সমগ্র নরজগতের মঙ্গলের জন্য এক হইতে পারে নাই, গলদ কোথায় এবং কেন?

জড়বস্তু হইতে যুগযুগান্তব্যাপী ক্রমিক পরিণতির ফলে যেরূপ পূর্ণদেহ পূর্ণমস্তিষ্ক মানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনই আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া সেই বুদ্ধিজীবী পূর্ণমানবের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি চলিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত সময়টা মানুষ যে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহার আদিমতম দিব্য আস্পৃহাকে (aspiration) ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাও ঠিক নয়। বরং যুগে যুগে নানারূপে সে বিশ্বাতীত

পরম সত্যের সন্নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছে। কখন তাহার ঐহিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক হইয়াছে, কখনও বা সে দুই বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি ঊর্দ্ধগমনের এই যে মানুষের নানামুখী প্রচেষ্টা, ইহা এপর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। কেন, তাহা শ্রীঅরবিন্দ এই পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন।

মানবজাতির সংস্কৃতির অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও উৎকর্ষের উপর—the individual is indeed the key of the Evolutionary movement. কারণ, ব্যক্তিগত মানবচেতনা অন্তর্মুখী হইবে, তাহার মধ্যে পরম সত্যের আলোক অবতরণ করিবে, তবে না সমগ্র জাতির মধ্যে ভাগবত-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে!

অতএব প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, অচেতন বা অবচেতন জড়জগতের আবেষ্টনে যে আমাদের মত একটা সচেতন সত্তার অবস্থান—তাহার অর্থ কি, তাহার পশ্চাতে কি সত্য নিহিত রহিয়াছে? এই অবস্থান, এই অস্তিত্ব কি জড়শক্তির খেলা মাত্র বা বিশ্বকর্ম্মার খেয়াল মাত্র?

If there is a Being that is becoming, a Reality of existence that is unrolling itself in Time, what that Being, that Reality secretly is, is what we have to become, so to become is our life's significance.

যদি ইহা সত্য হয় যে এক অখণ্ড অনন্ত সৎ দেশকালের মধ্যে বহুরূপে ব্যক্ত হইতেছেন, তাহা হইলে সেই অখণ্ড সতের যাহা যথার্থ স্বরূপ, সেই স্বরূপ আমাদিগকেও লাভ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের ইহজীবনের তাৎপর্য্য। এক সতের বহুরূপে প্রকট হওয়ার পশ্চাতে যে সত্য, তাহাই আমাদের জীবনের অর্থ। সেই অর্থের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট আমাদের নিয়তি। এই যে নিয়তি, ইহা আমাদের বর্ত্তমান সত্তাতে বীজরূপে অন্তর্নিহিত, যদিচ আমরা তাহা উপলব্ধি করি না। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, Our destiny is something that already exists in us as a necessity and a potentiality.

দেশকালাতীত বস্তুর দেশকালের সীমার মধ্যে যে পরিণতি ঘটিতেছে, তাহার মূলে দুইটী তত্ত্ব, চেতনা ও প্রাণশক্তি। এই দুই তত্ত্বকে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন key-words to what is being worked out in Time. এই তত্ত্ব দুটীকে বাদ দিলে জড়জগতের কোন অর্থ থাকে না, বিশ্ব হইয়া যায় একটা আকস্মিক ব্যাপার বা নিশ্চেতন জড়শক্তির ক্রীড়া।

তবে আজ আমাদের চেতনা ও প্রাণ যাহা, তাহাই শেষ কথা নয়। কেন না—তাহারা ত অপরিণত, তাহাদের ক্রমোত্তরণ চলিতেছে। মানবের মন, মানবের চেতনা অপূর্ণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন। এই চেতনার আরও অপূর্ণ রূপ পূর্ব্বে ছিল, পূর্ণপরিণত রূপ ভবিষ্যতে আসিবে—self luminous, জ্যোতিষ্মান। আমাদের যে চেতনা তাহা মূল নিশ্চেতন অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এখনও অজ্ঞান-আচ্ছন্ন। এই অবস্থা হইতে স্বতঃ-ভাস্বর দিব্যমানসে ক্রমোত্তরণ আমরা বুঝিতে পারিব—যদি আমরা উপলব্ধি করি যে মূল অজ্ঞানের মধ্যেও এই দিব্যমানস প্রচ্ছন্ন প্রসুপ্ত-রূপে নিহিত ছিল।

পূর্ণ-পরিণত বিজ্ঞান স্বভাবতই আত্মজ্ঞ, স্বতঃ-ভাস্বর। কেন না তাহা চরম সত্যের, পরমাত্মনের চেতনা, যাহা আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ও ধীরে ধীরে প্রকট হইতেছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, For that evidently must be the consciousness of the Reality, the Being, the Spirit, that is secret in us and slowly manifesting here.

চেতনা যদি হয় সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য—তবে প্রাণ তাহার বাহ্যিক কার্য্যকরী শক্তি। Life is the exterior and dynamic sign. কিন্তু যেমন আমাদের মন অপরিণত ও অপূর্ণ, আমাদের প্রাণও তাহাই। মানবের জীবন imperfect বা অসম্পূর্ণ, কেন না তাহার মন সতের চেতনার নিম্নতর প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও তাহার অবাপ্তব্য অনবাপ্ত রহিল, কারণ যে তত্ত্বের বিশ্বে অবতরণ ঘটিয়াছে তাহা মন নয়—আত্মা এবং শ্রীঅরবিন্দের কথায়, mind is not the native dynamism of consciousness of the spirit. আত্মার চেতনা কাজ করে মন দিয়া নয়, দিব্যমানস দিয়া। এই দিব্যমানস বা Gnosis-এর আবাহনই দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

All spiritual life is in its principle a growth into divine living. দিব্যমানসের জাগরণ

মানেই দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত। মন ও দিব্যমানসের মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। বাঁধাধরা কোন সীমা নাই। মনে প্রাণে দিব্য আলোকের সঞ্চার আরম্ভ হইলেই they put on or reflect something of the divinity, মনপ্রাণ ধীরে ধীরে দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ সমস্ত সত্তা জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। কিন্তু পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য মনপ্রাণ দেহকে দিব্য আলোকে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে হইবে, নবীন ভাস্বর রূপ দিতে হইবে। আবার শুধু ব্যক্তিগত পূর্ণতা আসিলেও হইল না। বিজ্ঞানময় মানবের সমষ্টি ও সমাজ গঠন করিয়া সৃষ্টির ক্রমোত্তরণকে সার্থক করিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, a collective life of gnostic beings established as a highest power and form of the becoming of the spirit in the earth nature. আমাদের অন্তরে এমন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে যাহা বাহিরের রূপের উপর নির্ভর করিতেছে না। অন্তরের জ্যোতি অবশ্য কতকটা বাহিরের কার্য্যে প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু এরূপ হইলেও ব্যক্তিগত মুক্তি বা পরিণতি সাধিত হইল, আবেষ্টন অপরিবর্ত্তিত রহিল। ইহাকে total consummation বা পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ এই পূর্ণতম অভিব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন—a greater dynamic change in earth nature itself, a spiritual change of the whole principle and instrumentation of life and action, the appearance of a new order of beings and a new earth life, জড়প্রকৃতির জড়তা পরিহার, প্রাণশক্তি ও তাহার ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক রূপপরিগ্রহ, নবমানবের আবির্ভাব ও জগতে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল চরম পরিবর্ত্তন। ইহার পূর্ব্বের খণ্ড খণ্ড পরিবর্ত্তনগুলিকে এই চরমে উঠিবার ধাপ বলা যাইতে পারে। এই চরম অভিব্যক্তিকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন a gnostic way of dynamic living—জড়তা মাত্রের সম্পর্কহীন বিজ্ঞানময় জীবন ধারা।

বিজ্ঞানময় জীবন সক্রিয় বটে। কিন্তু তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, এই জীবনের ভিত্তি স্বভাবতঃ সর্ব্বদা অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। এই অন্তর্মুখী ভাব, আধ্যাত্মিক মূল, spiritual origination ব্যতিরেকে দিব্যজীবন সম্ভব নয়। আমাদের বর্ত্তমান বহির্মুখী জীবনে মনে হয় যেন বিশ্ব আমাদের স্রষ্টা, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাগবত-জীবনে আমরাই আপনার তথা বিশ্বের স্রষ্টা। সৃষ্টির এই মর্ম্ম উপলব্ধি হইলে সহজেই বোঝা যায় যে, inner life অন্তর্জীবনই বড় জিনিস, বাকী যাহা—তাহা এই অন্তর্জীবনের প্রকাশ ও পরিণাম মাত্র। আমাদের পরিণতি লাভের প্রচেষ্টায় এই ব্যাপার স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাহিরের প্রকৃতি জড় মূক অন্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন; তাহারই মাঝে আমাদের বাস, অথচ আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে অন্তরে কি একটা শক্তি আমাদিগকে আবেষ্টন অতিক্রম করিয়া পূর্ণতার পানে লইয়া চলিয়াছে!

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, Thus to look into ourselves, enter into ourselves and live within is the first necessity for transformation of nature and for the divine life.

আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ভাগবত-জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন—অন্তর পানে দৃষ্টি, অন্তরে প্রবেশ ও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বাস। সাধারণ বহির্মুখী চেতনার পক্ষে এ কাজ দুরূহ। কিন্তু গত্যন্তরও নাই। জড়বাদী বলেন যে দৃশ্যমান বাহিরের জগৎই একমাত্র নিরাপদ স্থান, চেতনাকে বহির্মুখী রাখাই ভাল, ভিতরে যাওয়া মানেই ত তমসাচ্ছন্ন শূন্যতাতে প্রবেশ, সমতা হারান, নিরানন্দ নির্জীব মনোভাব! তাঁহার মতে প্রাকৃতিক জগৎই একমাত্র সত্য, তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভিতরের যেটুকু দেখা যায় তাহাই ভাল। এ রকম মন অন্তর্মুখী হইবে কেমন করিয়া!

তেমনই ক্ষুদ্রচেতা মানুষেরও গোলযোগ আছে। তাহার মন অন্তরের পানে ফিরাইলে সে দেখিবে—আপন প্রাণ, আপন মন—Life-ego, mind-ego—আধ্যাত্মিক সত্তা তাহার নজরে পড়িবে না। যে মন নিয়ত বাহিরে বাস করিয়াছে, তাহার দশাই এই। তাহার অন্তর সম্বন্ধে ধারণা বাহিরের অভিজ্ঞতার উপরই গঠিত। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, It has a constructed internal experience which depends on the outside world for the materials of its being.

কিন্তু যাহার সত্তার মধ্যে অন্তরে বাসের—a more

inner living-এর—ক্ষমতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ভিতরে অন্ধকারও দেখিবে না, শূন্যতাও দেখিবে না। সে পাইবে, শ্রীঅরবিন্দের কথায়, an enlargement, a rush of new experience, a greater vision, a richer delight, a big more real and various than what he has experienced outside. অর্থাৎ চেতনার বিস্তার, নব নব অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্মতর দৃষ্টি, পূর্ণতর আনন্দ, সত্যতর বৈচিত্র্যময় জীবন।

ভিতরে যে নীরবতা ও শূন্যতা আছে তাহাতে ক্ষুদ্র চিত্ত ভয় পাইতে পারে, কিন্তু সে নীরবতা আত্মাপুরুষের নীরবতা, তাহা আনিয়া দেয় গভীরতর জ্ঞানশক্তি ও আনন্দ। সে শূন্যতা শূন্যতা নয়, কেন না আধার দেবলোকের অমৃতে পূর্ণ হইবে বলিয়া তাহার মধ্যের সমস্ত আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষায়, Silence is the silence of the spirit which is the condition of a greater knowledge power and bliss, the emptiness is the emptying of the cup of our natural being, a liberation of it from its turbid contents—so that it may be filled with the wine of God.

এই যে অন্তরের মধ্যে বাস, ইহার অর্থ বন্ধন নয়, মুক্তি—সৎ হইতে অসতে প্রবেশ নয়, বৃহত্তর মহত্তর সত্তাতে প্রবেশ, যথার্থ বিশ্বজনীনতার পানে প্রথম পদক্ষেপ। বহির্মুখী চেষ্টা দ্বারা বিশ্বচেতনার সহিত এক হওয়া যায় না। যাহা মনে হয় নিরহঙ্কার, তাহা অনেক সময়ে অহঙ্কারেরই সূক্ষ্মতর রূপ মাত্র। বহির্মুখী মানুষ আপনার সত্তা, আপনার কল্পনা অপরের উপর চাপাইতে যায়। পরের কাজ যাহা করিতে যায় তাহা আংশিক অস্থায়ী, তাহার প্রেরণা অপূর্ণ। কেন না হৃদয় মনের যোগ আছে বটে, কিন্তু অভিন্নতা নাই। আপন পরের ভেদ ঘোচে নাই। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, our being does not embrace the being of others as ourselves. আধ্যাত্মিক চেতনা আসিলে, আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। কারণ তখন প্রেরণা আসে অন্তরের অনুভূতি হইতে, অন্তরের একত্ববোধ হইতে, তখন পরও যাহা আপনিও তাহা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, it bases its action in the collective life upon an inner experience and inclusion of others in our own being, an inner sense of reality and oneness.

দিব্যজীবনে বিজ্ঞানময় মানব অপরের মন প্রাণ দেহকে আপনারই বলিয়া জানিবে। সে কাজ করিবে বাহিরের দরদ ভালবাসার প্রেরণাতে নয়, অন্তরের একত্ব-বোধের ফলে, সবার হৃদয়ে যে ব্রহ্ম বিরাজমান তাহার জন্য—for the Divine in others and the Divine in all.

The gnostic being finds himself not only in his own fulfilment which is the fulfilment of the Divine Being and Will in him, but in the fulfilment of others.

বিজ্ঞানময় মানব কাজ করে শুধু তাহার আপন হৃদিস্থিত নারায়ণের তুষ্টির জন্য নয়, সকলের তুষ্টির জন্য, সকলের সার্থকতার জন্য। আসল কথা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সে নিজের জন্য কি করিতে পারে! সে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিতেছে, ব্রহ্মের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে বুঝিতেছে। তাহার কাজ মানে তাহার অন্তরস্থ দিব্যজ্যোতি ও দিব্যইচ্ছাশক্তিরই কাজ। This universality in action is the law of his Divine living—এই বিশ্বজনীন ভাবই তাহার ভাগবত-জীবনের বিধি।

ভাগবত-জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহা হইলে তিনটী বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম—ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি অন্তরে, বাহিরে। দ্বিতীয়—ব্যক্তি ও তাহার আবেষ্টনের মধ্যে পূর্ণ-সঙ্গতি। তৃতীয়—নবীন জগৎ ও সেই জগতে পূর্ণতম সমবেত জীবন।

প্রথমটী আসিলেই দ্বিতীয়টী আসিবে। পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি সহজেই তাহার আবেষ্টনের সহিত সঙ্গতি আনিতে পারিবে। কিন্তু জগতে দিব্যজীবন আনিতে হইলে নবীন সমাজ, new common life-এর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নবীন সমাজ মানে কি? আজ আমাদের যে সমস্ত সমাজ গোষ্ঠী জাতি রাষ্ট্রাদি আছে তাহা নয়। এ সকলকে শ্রী শ্রীঅরবিন্দ physical collectivity বাহ্যিক সমবায় বলিয়াছেন। ইহাদের মূলে রহিয়াছে—এক আকাঙ্ক্ষা, এক সংস্কৃতি, একপ্রকার জীবন ধারা ইত্যাদি।

বিজ্ঞানময় মানবের সমাজ এরূপ বাহ্যিক ব্যাপার হইবে না। সেখানে ঝগড়াঝাঁটি, বে-বনতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে

না, মিটমাট জোড়াতালিরও কোন প্রয়োজন হইবে না। তাহা হইলে সে সমাজের বন্ধন কি হইবে? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন—All will be united by the evolution of the Truth-consciousness in them. * * * They will feel themselves to be embodiments of a single self, souls of a single Reality. অর্থাৎ ঋতচিতের জাগরণে তাহারা এক হইবে। তাহারা অনুভব করিবে যে তাহারা বহু দেহে একই আত্মার প্রকাশ, একই চরম সত্যের বহু রূপ। সে সমাজে শৃঙ্খলা থাকিবে, বিধিবিধান থাকিবে, কিন্তু সব আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবজাত। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, The whole formation of the common existence would be a self building of the spiritual forces that must work themselves out spontaneously in such a life. বিজ্ঞানময় জীবের সমাজ গঠিত হইবে তাহারই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের দ্বারা, সমাজের জীবনধারা কার্য্যধারা হইবে স্বতস্ফূর্ত্ত। অথচ much anisation বা standardisation তাহার লক্ষণ হইবে না—যন্ত্রবৎ হইবে না সে সমাজ, বৈচিত্র্য থাকিবে বিস্তর, সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে না। অন্তরের অনুভূতি, অন্তরের দিব্যজ্ঞান, অন্তরের প্রেরণা থাকিবে এক, কিন্তু তাহার প্রকাশ হইবে নানারূপী, বিচিত্র। তথাপি সে সমাজে কোন বিরোধ বা বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে না। ঘটিতে পারিবে না। কারণ অন্তরে যে একই সত্য সদাজাগ্রত! শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, a diversity of our Truth of knowledge and one Truth of life would be correlation and not an opposition. ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ধাক্কাধাক্কি ধ্বস্তাধ্বস্তি সেখানকার দিব্যশান্তি নষ্ট করিবে না। সবটা হইবে একই সত্যের একই আত্মনের বিচিত্র বিকাশ, খাঁটি সোনা, অহমিকার খাদ তাহাতে থাকিবে না। শ্রীরবিন্দের কথায়, no ego insistence on personal idea and no push and clamour of personal will and interest. বিশ্বজনীন ভাবের সাথে থাকিবে একটা ব্যক্তিগত নমনীয়তা, অন্তরের একত্বের সাথে থাকিবে বাহিরের বৈচিত্র্য। বাহিরের রূপের অন্তরের সত্যের উপর কোন প্রভাব থাকিবে না। বিজ্ঞানে জাগ্রত gnostic মানবের তার আবেষ্টনের সঙ্গে অসঙ্গতি কিছুতেই হইবে না, যাহাই কেন তাহার স্থান হউক না gnostic সমষ্টির মধ্যে। প্রয়োজনমত সে নেতাও হইবে নীতও হইবে, নিয়ন্তাও হইবে নিয়ন্ত্রিতও হইবে, সে জানিবে কখন কি করা চাই সমষ্টির জন্য, সবই তাহাকে সমান আনন্দ দিবে। একত্ববোধ ও সঙ্গতি দিব্যজীবনের বিধান ও লক্ষণ inescapable law.

এই ভাবে মানুষ মনোময় জগৎ হইতে বিজ্ঞানময় জগতে উন্নীত হইবে। অবিদ্যা অজ্ঞান হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানে উঠিবে। উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী, কেন না সেই উন্নততর স্বভাব, super nature, তাহারই আপন স্বভাব, যদিচ তাহার বর্ত্তমান চেতনার অগোচর। অজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া আমরা যে জীবনধারা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি তাহাতে জীবনের পূর্ণতা আসিতে পারে না। যাহা গড়িয়া তুলি তাহাতে ভাল, সুন্দর যে একেবারে নাই তাহা নহে, কিন্তু বেশী রহিয়াছে মন্দ ও অসুন্দর। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, a constructive half rightness mixed with much that is wrong and unlovely and unhappy. ফলে আমাদের গঠিত সংস্থাগুলিও তাহাদের কার্য্যধারা স্থায়ী হয় না, কিছুকাল কাজ করিয়া ধ্বংসপথে যায়। Imperfect, we cannot construct perfection—আমরা নিজেরা অপূর্ণ, পূর্ণ জিনিষ গড়িব কেমন করিয়া! সংঘটনগুলি বাহিরে কার্য্যকরী দেখাইতে পারে, কিন্তু টিকে না।

আমাদের প্রকৃতি, আমাদের চেতনা, এরূপ যে আমরা পরস্পরকে চিনি না, জানি না, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন—rooted in divided ego. নানা সমষ্টির মধ্যে আংশিক সঙ্গতি হয়ত আমরা আনিতে পারি, একটা সামাজিক সংহতিও সাধিত করি, কিন্তু মোটের উপর আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমাগত বিকৃত হইয়া যায় পূর্ণ দরদের অভাবে, পূর্ণ বোঝাপড়ার অভাবে, ভুল বোঝার দরুণ, অসন্তোষের দরুণ, বিরোধবিবাদের দরুণ—by imperfect sympathy, imperfect understanding, gross misunderstandings, strife, discord, unhappiness। এ ছাড়া আর কি হইবে যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্তরে একত্বের অনুভব না আসে! আমরা যাহা গড়িয়া তুলি, তাহা জোড়াতালি-গোছের একতা—constructed unity—ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমবায়, আইনকানুনের চাপেই সে একতা বজায় থাকে। আত্মজ্ঞা-

ও অন্তরের একত্ববোধকে ভিত্তি করিয়া আমাদের প্রকৃতিকে তাহার সীমা অতিক্রম করিতেই হইবে, তবে না আমাদের জীবন হইবে সমঞ্জস ও সুন্দর! যদি তাহা না হয়, যদি আমাদের প্রকৃতি যাহা আছে তাহাই থাকে, তাহা হইলে জীবনের পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব, স্থায়ী সুখও মানুষের অদৃষ্টে নাই। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া ইহলোকে যেটুকু সুখ পাওয়া যায় তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যথার্থ সুখ ও পূর্ণ জীবন লাভ করিবার জন্য কোন উর্দ্ধতর লোকে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। নতুবা কোন নির্গুণ নিরঞ্জন সত্তার মধ্যে লীন হইয়া নিষ্ক্রিয় সুখশান্তির চেষ্টা দেখিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ বার বার বলিয়াছেন যে জগতের অভিব্যক্তির পর্য্যবসান হয় নাই, নিশ্চেতন জড় হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির যে উর্দ্ধগতি চলিয়া আসিয়াছে তাহা বর্ত্তমান অপূর্ণসত্তা মানব পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইবে কেন? সুপ্ত কদাচিৎ জাগ্রত হইবেই, it is our spiritual destiny to manifest and become that super nature—for it is the nature of our true self, our still occult, because unevolved whole being—ইহাই মানবের নিয়তি; মানবের যথার্থ পূর্ণ সত্তার যে প্রকৃতি, সেই পরাপ্রকৃতিকে মানবের উপলব্ধি করিতেই হইবে। আমাদের চাই পূর্ণ চেতনাতে জাগ্রত আধ্যাত্মিক জীবন। এই জাগরণের অবশ্যম্ভাবী ফল আত্মজ্ঞান, পূর্ণ পরিণত জীবন, চিরন্তন সুখ ও পরম আনন্দ। ক্রমবিবর্ত্তনের পথে এই জাগরণও আসিতে বাধ্য।* (ক্রমশঃ)

* প্রবন্ধে মূল গ্রন্থ হইতে ইংরেজী বাক্য এখানে সেখানে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক সেগুলি বাদ দিয়া পড়িবেন, অর্থবোধের কোন গোলযোগ হইবে না। তর্জমা সর্ব্বত্র দিয়াছি। যাঁহারা ইংরেজী বোঝেন তাঁহারা সবটাই পড়িবেন, শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষা ও লিখনভঙ্গীর পরিচয় পাইবেন।

প্রিয় বান্ধবী শিপ্রা

শ্রীলতিকা ঘোষ

প্রিয় বান্ধবী শিপ্রা, আজিকে নিশীথ রাতে—
ঘুম নাই মোর করুণ সজল নয়ন পাতে।
জ্যোছনায় ভরা ধরণী বিভল
চাঁদ তারে চুমে করি নানা ছল
কবি জানে শুধু কিসে কানাকানি সেথায় চলে—
নিশানাথ ওগো নিশিগন্ধারে কি, কথা বলে!
পূবালি হাওয়ায় নিভে গেল দীপ সোহাগ ভরে—
শিখা আর বায়ু কোলাকুলি করে ক্ষণেক তরে।
স্নিগ্ধ সোনালি আলো লেগে গায়
তাহাদের প্রেম ধরা পড়ে যায়
প্রদীপ লভিল মরণ-মলয় ছুটিয়া চলে—
মধুপের সখী চম্পক রাণী দেখে তা ছলে!

দীঘির কৃষ্ণ জলের বুকেতে পদ্ম-ফুল—
গুন্ গুন্ করে মৌমাছির দল পুলকাকুল।
সেথায় প্রেমের গুঞ্জনধ্বনি
নিশানাথ শোনে আর আমি শুনি
আকাশে বাতাসে আঁধারে আলোকে একই খেলা—
লুকোচুরি আর কানাকানি চলে রাতের বেলা!
রাতের পূর্ব-তোরণে দাঁড়াল প্রভাত রবি—
সকলের সাথে প্রণাম করিল মুগ্ধ কবি।
ওগো সখি শোন কল্পনা নয়
প্রকৃতির প্রেম প্রাণময় হয়
আড়ি পেতে তাই দেখিলাম সব—বুঝিলে মিতা—
জাগিয়া যেজন রহিল নিশীথে—তোমারি নীতা।

ভদ্র ভিখারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সদ্য সিনেমা ভাঙ্গিয়াছে। বাহিরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। এ-বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করিলে যাহাদের চলে না, বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারা পথে বাহির হইয়াছে; বাকী লোক সিনেমার লাউঞ্জে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে গিয়া উঠিবে, উপায় নাই! ভিজিয়া একশা হইতে হইবে!

পথে রিক্শ-ওয়ালা ঘণ্টা বাজাইয়া আহ্বান-সঙ্কেত জানায়; ফিটন-গাড়ীর আপাদ-মস্তক-মুড়ি-দেওয়া কোচম্যান বার-বার ফিটন লইয়া সিনেমার সামনের পথে ঘোরা-ফেরা করে; ট্যাক্সিওয়ালা থাকিয়া-থাকিয়া হর্ণ বাজায়। কেহ সে-সব ডাকে সাড়া দেয় না—লাউঞ্জে দাঁড়াইয়া আছে! ছবি দেখিয়া সদ্য যে তৃপ্তি-সুখ, তাহার উপর এ যেন অস্বস্তির কাঁটা!

পথে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। জীর্ণ-মলিন বেশ··· ভিজিয়া চেহারা এমন হইয়াছে যে তাহার পানে চাহিলে বুকখানা কেমন করিয়া ওঠে! বেচারীর দু'চোখে যেমন বেদনা, তেমনি আকুল মিনতি! লাউঞ্জের বাহিরে আসিয়া সকলের মুখের পানে তাকায়—কি যেন চায়! মুখে কিন্তু স্বর ফোটে না!

হাত পাতিয়া যদি কিছু চাহিত, এই সব অলস-সৌখীনের মধ্যে হয়তো কেহ কিছু দিত! কিন্তু সে চাহিল না! সকলের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, চাহিলে কেন এরা দিবে? আমার কিছু নাই, তাহার দায় সম্পূর্ণ আমার! অপরের কি রহিয়া গিয়াছে! সহরে আমার মতো অভাবগ্রস্তের সংখ্যা গণিয়া শেষ করা যায় না! যাহাদের আছে, কতজনকে তাহারা দিবে? কত দিবে?

এই কথাই সে ভাবিতেছিল। আরো ভাবিতেছিল, এই বৃষ্টিতে এত লোক ছবি দেখিতে আসিয়াছে···ছবি দেখিয়া বৃষ্টিতে ফিরিতে পারে নাই···দাঁড়াইয়া আইস-ক্রীম খাইতেছে, চকোলেট খাইতেছে, সিগারেট টানিতেছে! এ-সব না খাইলে মানুষের বাধে না·· আটকায় না! এ-সবে যে-পয়সা অপব্যয় করে সে-পয়সায় আমাদের মতো কতজন দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়! কিন্তু আমরা মুখে অন্ন দিতে পারি না বলিয়া সৌখীন-বিলাসীরা কেন ছাড়িবে তাহাদের বিলাস-লীলা?

বৃষ্টির বেগ একটু কমিল···

ভিড়ের মধ্য হইতে সুকুমার সহসা বাহিরে আসিল··· চারিদিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল প্রকাণ্ড মোটর। সামনে বসিয়া উর্দ্দী-পরা ড্রাইভার। সুকুমার চাহিল লাউঞ্জে এক সজ্জিতা তরুণীর পানে; কহিল—এসো···

তরুণী আসিল · এবং সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির পাশ দিয়া দুজনে মোটরে চাপিয়া বসিল। মোটর চলিল পশ্চিম দিকে।

তরুণীর নাম অতসী। অতসী সুকুমারের দিদি। তাহার বিবাহ হইয়াছে সহরের মস্ত ধনী-ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ-বরণের সঙ্গে।

গাড়ীতে উঠিতে গিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির চোখে যে-দৃষ্টি অতসী লক্ষ্য করিল, সে-দৃষ্টিতে গভীর হতাশা—তেমনি আবার অনেকখানি প্রত্যাশা! সে-দৃষ্টি তার মনে বিঁধিল···মনটা খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল।

গাড়ীর পিছন-দিককার কাঁচ দিয়া দেখিল, লোকটি তেমনি দাঁড়াইয়া আছে···যেন পাথরের মূর্ত্তি!

কি মনে হইল, অতসী কহিল—গাড়ী রাখো ড্রাইভার···

ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। অতসী কহিল—দেখেছিস রে সুকু, সিনেমার সামনে একজন লোক···গো-বেচারীর মতো চেহারা···

সুকুমার বলিল—দেখেছি। বেকার ভদ্রলোক··· বাঙ্গালী···

অতসী বলিল—এই জলে ঠায় ভিজছে!. · বোধ হয় কিছু চায়···

ড্রাইভারকে কহিল—একবার যাও তো ড্রাইভার, ঐ গরীব লোকটিকে ডেকে আনো।

এই জলে নামিতে হইবে··· ড্রাইভার বিরক্ত হইল। কিন্তু সে বিরক্তি-প্রকাশের উপায় নাই। চাকরি করে· বড়-লোক মনিব! সে তাকে ডাকিতে গেল।

ভিখারী আসিল।

অতসী কহিল-তোর কাছে খুচরো টাকা আছে সুকু?···দুটো?

সুকুমার পার্শ খুলিল, বলিল—না। খুচরো আছে পাঁচ-সিকে···বাকী নোট্!

—পাঁচ টাকার নোট্ আছে?

—আছে।

—দে একখানা।

সুকুমার দিল পাঁচ টাকার নোট্। নোট্ লইয়া অতসী ভিখারীকে ডাকিল। ভিখারী গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

অতসী কহিল—এই নাও···

ভিখারী হাত পাতিয়া লইল। পাঁচ টাকার নোট্! তাহার দু'চোখ জ্বলিয়া উঠিল! ভাবিয়াছিল, দু'চারিটা পয়সা মিলিবে···না হয় বড়-জোর একটা সিকি! তার বদলে পাঁচ-পাঁচ টাকার নোট্! সে অতসীর পানে চাহিল।

অতসী তার পানেই চাহিয়াছিল···মমতার দৃষ্টি!

ভিখারী কহিল—যদি একটা চাকরি আমাকে ছান্··· আমি খুব খাটতে পারি।···আমি ভিক্ষা চাই না···চাইতে পারি না। ভিক্ষা মানুষ ক'দিন চাইবে? লোকে ভিক্ষা দেবেই বা ক'দিন···তার চেয়ে দু'বেলা দু'মুঠো বাঁধা অন্ন আর থাকবার একটু আশ্রয়!···পথে পথে আর ঘুরতে পারছি না।

বেচারীর কয়লার মতো কালো চোখ· সে-চোখে গভীর হতাশা···অতসী বুঝিল, ভিক্ষায় এ-লোকটার রুচি নাই! অতসীর মনে চিরকালের যে-নারী বসিয়া আছে··· এই বিলাস-ভূষণ প্রমোদ-হাসির অন্তরালে···সে-নারীর মন মমতায় গলিয়া গেল।

অতসী কহিল—কাজ করবে?

অতসী চাহিল সুকুমারের পানে। সুকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া আছে···উদাসীন নির্বিকার···ভ্রূযুগ কুঞ্চিত।

সুকুমার কোনো কথা কহিল না।

অতসী চাহিল ভিখারীর পানে, কহিল—কিন্তু উপস্থিত তেমন কাজ তো নেই।···তা আচ্ছা, পারবে বাগানের কাজ করতে?

ভিখারী কহিল—যে-কাজ বলবেন, আমি করবো।

অতসী বলিল—বেশ, তাহলে এসো আমার সঙ্গে। গাড়ীতে উঠে বসো···

ভিখারী তখনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল···ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া কঠিন ভঙ্গীতে ভিখারীর পানে চাহিল। তার এই পরিষ্কার উর্দ্দী···সে-উর্দ্দী ঘেঁষিয়া ময়লা-ভিজা-টুকনি-পরা এই ভিখারী··

নিরুপায়! পরের ঘরে সে চাকরি করে এবং এখানে মনিব-গৃহিণীর এ ব্যবস্থা···

পাঁচ টাকার নোটখানা অতসীর দিকে ধরিয়া ভিখারী বলিল—এটা রেখে দিন। আশ্রয় আর অন্নের সংস্থান হলো, নোট নিয়ে আমি করবো কি?

অতসী বলিল—রেখে দাও। ভিক্ষা নয়···তোমার মাহিনার দরুণ কিছু আগাম···

ভিখারীর দু'চোখে···সে যে কি···দেখিয়া অতসীর মন ভরিয়া গেল!

গাড়ী চলিল।

মৃদুকণ্ঠে সুকুমার বলিল—জামাইবাবু কি বলবেন বলো তো? এই দামী গাড়ীতে তুমি ওকে তুললে!

হাসিয়া অতসী বলিল—এ-সব ছোট জিনিষ তিনি চোখ তুলে দেখেন না কখনো!

সুকুমার বলিল—কি কাজ ও করবে, শুনি? থাকবে কোথায়?

অতসী বলিল—মালীর লোক চলে গেছে। সে একটা লোক চায়—সেই কাজ এ করবে। আর থাকবে মালীর ঘরের সামনে যে পাকা দালান, সেই দালানে। ক্যাম্প-খাট পড়ে আছে বাড়ীতে···তাতে শোবে'খন। না হলে ভদ্রলোক···বাঙালী ভদ্রলোক···মালীর মতো থাকতে পারবে না তো! বোধ হয় লেখাপড়া জানে···কথাগুলো বেশ ভদ্র···না?

এ-কথা ভিখারীর কানে গেল না। গাড়ীতে বসিয়া

বদ্ধ কাঁচের মধ্য দিয়া সে বাহিরে পথের পানে চাহিয়াছিল··· আলো-আঁধারের অস্পষ্ট ঝাপ্‌টা চোখের উপর দিয়া জ্বলিয়া-নিবিয়া সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে···অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

অতসী বসিয়া ভাবিতেছিল, স্বামী বিদ্যুৎবরণের কথা! এই যে অতসী আজ মমতা-বশে এক পথের ভিখারীকে আশ্রয় দিতেছে, ইহা লইয়া এতটুকু মাথা ঘামাইবেন না! সংসারের কোনো-কিছুতে কোনোদিন তাঁহাকে পাওয়া যায় না। না চান কারো পানে সদয় দৃষ্টিতে···না করেন কাকেও রূঢ় ভর্ৎসনা··কোনোদিন নয়! মুখে হাসির রেখাটুকু সব সময়ে লাগিয়া আছে। হাসির সে-রেখায় কাহারো মনে ছোট একটি দীপও জ্বলে না! তাঁর সে-হাসি এমন নির্জ্জীব যে সে-হাসিতে দুনিয়ায় না হয় কোনো লাভ···এবং সে-হাসি নিবিয়া গেলে দুনিয়ার কোথাও এতটুকু ছায়া ঘনায় না! তাহার এই নিজের জীবনে···স্বামীর কাছ হইতে সে কি পাইয়াছে? বিলাস-ভূষণ মান-মর্য্যাদা, সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য···এ-সবের কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই! কিন্তু···

স্বামী বিদ্যুৎবরণ বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজ···বিদ্যা লইয়া স্বামী প্রাচীন কাব্যের বিচার করিতেছেন, আর বুদ্ধি লইয়া বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছেন। এ বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে দুনিয়ার প্রাণের সংযোগ কোথাও নাই! অতসী দেখে, স্বামী যেন তুঙ্গ গিরি-পর্ব্বত! সে-গিরির মহিমা-গৌরবে মন মাতিয়া আছে···কিন্তু ও-গিরির বুকে আশ্রয় পাইবে কি, গিরির নাগালই পায় না!

অতসী বিদুষী। একালের পাশ-করা। এ-বয়সে স্বামীর কাছ হইতে নারীর যা পাইবার কথা, অর্থাৎ নারী যা চায়, মনের পিপাসা মিটাইতে···বিদ্যুৎবরণের কাছে সে তাহার কিছুই পায় নাই! স্বামীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদের আর-পাঁচটা আসবাবের মতো সে একটা উপকরণ মাত্র! দামী মোটর-গাড়ী, সৌখীন বাড়ী-ঘর, দামী সোফা-কৌচ-আলমারি-খাট-পালঙ-রেফ্রিজারেটরের গর্ব্বে স্বামী যেমন গৌরব বোধ করেন, রূপসী বিদুষী স্ত্রীও তাঁহার তেমনি গর্ব্বের সামগ্রী এবং এই গর্ব্ব-গৌরবের আশ্রয়ে সমাজে-সংসারে অতসী রত্ন-আসন পাতিয়া বাস করিতেছে!

নিজের নিঃসঙ্গতার বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া অতসী কতবার ভাবিয়াছে, এমন করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারেনা!··· তবু সে এখানে এই বিদ্যুৎবরণের গৃহে তাঁহার আসবাব হইয়া পড়িয়া আছে! এখান হইতে নড়িতে পারে না! সমাজে এত মান, এমন সম্ভ্রম···এ শুধু স্বামীর জন্য! কাজেই স্বামীর উপর তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই! ভালোবাসা···

সে-কথা অতসী আর ভাবে না। ভাবিতে গেলে মাথা ঝিম্‌-ঝিম্ করে···চোখের সামনে হইতে পৃথিবী যেন বলের মতো গড়াইতে গড়াইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারা···ফুলের গন্ধ··দক্ষিণ বাতাস ···অতসীর মনকে বার-বার দোলা দেয়···নিজের অজ্ঞাতে তন্দ্রালস-ভরে অতসী আসিয়া দাঁড়ায় স্বামীর পাশে··· স্বামী মোটা-মোটা বইয়ে দুর্গ রচিয়া সে-দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন! সে-দুর্গে অতসী গিয়া হানা দেয়, স্বামী দু'হাতে ঠেলিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলে—কাজের সময় বিরক্ত করো না অতসী···এখন যাও···

সারা মন অশ্রুর তরঙ্গে উদ্বেল করিয়া অতসী সরিয়া আসে। স্বামীর কাজের সময় কোনোদিন আর শেষ হইল না! স্বামীর এক-নিমেষ অবসর নাই অতসীর পানে ফিরিয়া চাহিবেন! নিশ্বাসের বাষ্পে মন ভরিয়া ওঠে! অতসীর মনে হয় বুকখানা বুঝি এ-নিশ্বাসের চাপে ফাটিয়া চূর্ণ হইবে!

প্রাণ চূর্ণ হয় না! মনকে অতসী তাই দু'পায়ে চাপিয়া মাড়াইয়া জীবনের পথে চলিয়াছে! মানুষ কি সব পায়··· যা চায়? এ-জন্মে অতসী যা পাইয়াছে, তার বেশী পাইবার ভাগ্য সে করে নাই! যা পায় নাই, তার জন্য দুঃখ করিয়া কি ফল? কাজেই অতসী এদিকে আর ফিরিয়া তাকায় না!···

•

গাড়ী আসিয়া গৃহে পৌঁছিল।

পর্চের সামনে ছিল বিদ্যুৎবরণ। ভিখারীকে দেখিয়া বিদ্যুৎবরণের চোখে একরাশ বিস্ময়! অতসী লক্ষ্য করিল। বলিল—এ লোকটিকে পথে পেলুম। তোমার মালীর লোক ছুটী নিয়ে দেশে গেছে···তার জায়গায় কাজ করবে।

তাহার পর অতসী চাহিল ড্রাইভারের দিকে, বলিল—একে মালীর কাছে নিয়ে যাও···আজ থেকে বাহাল হলো।

একে যেন তার বিছানা-পত্র ছায়। ওর জন্ম শুকনো জামা-কাপড় আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি বিশুর হাত দিয়ে।

বিশু খানশামা।

রাত প্রায় দশটা। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া অতসী ··একা। ভিখারীর কথা ভাবিতেছিল। এ-জলে নিরাশ্রয় কোথায় পড়িয়া থাকিত···এখানে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়াছে!

সুকুমারের একখানা পুরানো ধুতি, স্বামী বিদ্যুৎবরণের হাত-কাটা একটা পুরানো সার্ট পাঠাইয়া দিয়াছে···বিশু ক্যাম্প-খাট দিয়া আসিয়াছে···মালীর সেই লোকের বিছানা আছে মালীর কাছে···বলিয়া দিয়াছে—উহাকে দিতে!

মনে তৃপ্তির সীমা নাই! সে তৃপ্তিতে মন ভরিয়া আছে। অলস-বিলাসে সারাক্ষণ ডুবিয়া থাকে, আজ মস্ত একটা কাজ করিয়াছে···নিরাশ্রয়কে আশ্রয়-দান!

ভাবিতেছিল, ঘরে সে এমন আরামে বাস করে—আর বাহিরে উহার মতো কত নিরাশ্রয়···কত নিরন্ন হাহাকার করিতেছে···মাথায় ছাদের একটু আবরণ মেলে না! দারিদ্র্যের সে রুদ্র-রূপ স্মরণ করিয়া অতসী শিহরিয়া উঠিল!

পরের দিন।

নিত্যকার জীবন-ধারায় দেহ-মন ভাসিয়া চলিয়াছে। সকালে ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির কথা মনে পড়িল। ভাবিল, একবার গিয়া দেখিয়া আসে, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া অতসীর পায়ে লুটাইয়া সে কি বলে···

অতসী ডাকিল—সুকু···

সুকু পাশের ঘরে শেভ্ করিতেছিল, বলিল—কেন?

অতসী আসিল। কহিল—তোর মনে একটু দয়া-মায়া নেই রে? লোকটাকে কাল পথ থেকে নিয়ে এলি, তা তার একটু খোঁজ-খবর নে···

সুকুমার কহিল—হুঁঃ···মস্ত মানী কুটুম্ব-লোক · সকালে উঠেই যাবো তার তত্ত্ব নিতে!

কথাটা অতসীর ভালো লাগিল না। সে বলিল—না হয় গরীব! মানুষ তো! ভদ্রলোক! অবস্থা একদিন ভালোই ছিল হয়তো!

অতসী চলিয়া গেল। সুকুমার বুঝিল, দিদি রাগ করিয়াছে।

কাজ চুকিলে নিঃশব্দে সুকু আসিল বাগানে। লোকটি গাছের গোড়া হইতে আগাছা সাফ করিতেছে। সুকুমার বলিল—রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল?

সে বলিল—হ্যাঁ।

সহজ স্বর—সে স্বরে বিগলিত ভাব নাই।

সুকুমার বলিল—দিদি তোমায় আশ্রয় দেছে···তোমার কুলুজী কেউ জানে না···বেইমানী করো না যেন!

সে জবাব দিল না···মুখ তুলিয়া সুকুমারের পানে চাহিলও না।

সুকুমার বলিল—মন দিয়ে যদি কাজ করো, তাহলে চাকরি এখানে পাকা হবে বুঝলে?

এবারো সে না তুলিল মুখ, না দিল জবাব!

সুকুমার কহিল—তোমার বাড়ী কোথায়? কে আছে? আগে কোথাও চাকরি-বাকরি করেছো?

লোকটির গ্রাহ্য নাই! জবাব দিল না···নিজের মনে আগাছা উপড়াইতে লাগিল।

সুকুমারের রাগ হইল। ভাবিল, লোকটার কৃতজ্ঞতার লেশ নাই! পথে পড়িয়াছিলি কুকুরের মতো···মাথায় করিয়া আনিয়া তোকে দিলাম আশ্রয়···কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া থাকিবি! না, গ্রাহ্য নাই! যেন নবাব-বাহাদুর!

রাগে জ্বলিয়া সে চলিয়া আসিল।

আগাছা সাফ করিয়া মালীর নির্দ্দেশে লোকটা এক জায়গায় কোদাল ধরিয়া মাটী কোপাইতেছে, অতসী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

মুখে তৃপ্তির হাসি, অতসী কহিল—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না?

মুখ তুলিয়া সে বলিল—না।

অতসী বলিল—বিছানা পেয়েছিলে?

—পেয়েছিলুম।

অতসী বলিল—বালিস-টালিস আছে তো ঠিক!

লোকটা বলিল—আমি দেখিনি।

—ছাখোনি!···কিসে শুলে?

—খাটে।

—বিছানা?

—অন্য লোকের শোয়া-বিছানায় আমি শুতে পারি না।

কথাটায় অতসীর মনে যেন ছ্যাঁকা লাগিল! এমন কথা চাকরের মুখে শুনিবে, ইহা ছিল কল্পনাতীত! বামুন-চাকর আসে যায়···সরকারী বিছানা পায় চিরদিন। সে-বিছানা লইয়া এমন সুরে এ পর্য্যন্ত কেহ প্রতিবাদ তোলে নাই! বুঝিল, লোকটা কথা কহিতে জানে না!···কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কহিতে হয়···বোধ হয়, তেমন ঘরে কখনো কাজ করে নাই!

অতসী বলিল—কিন্তু সব মালী ঐ বিছানাতেই শোয়। তোমার জন্যে নতুন বিছানা তৈরী হতে পারে না তো···

মৃদু হাস্যে সে বলিল—আজ্ঞে না, তা আমি বলিনি···

ঐ কথা···তার পর এই হাসি ··এ যেন বিদ্রূপ!

অতসীর রাগ হইল। একটু আগে সুকু বলিয়াছে, লোকটা দারুণ অসভ্য···কোনো-পুরুষে লোকের বাড়ী চাকরি করে নাই···একেবারে অধম ভিখারী!···তাই বটে!

অতসী বলিল—এখানে যদি কাজ করতে চাও, মানুষ হতে হবে। কার সঙ্গে কি করে' কথা কইতে হয়, শিখতে হবে।···এ-বাড়ীতে তুমি চাকরি করছো···তুমি চাকর··· মনে রেখো।

সে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, চাকর। আমি তা জানি। কাজ করছি তো!

অতসী চলিয়া আসিতেছিল···কি মনে হইল, দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—তোমার নাম?

লোকটা বলিল—নাম নিয়ে কি হবে? আমার কাজ নিয়ে কথা।

মুখের উপর কথা! এমন কথা! অতসীর রাগ হইল··· বলিল—মানুষের একটা নাম থাকে। তোমাকে ডাকতে হলে বাবু-মশাই বলে' তো লোকে ডাকবে না···কি তোমার নাম?

সে বলিল—ও···আমাকে কান্তি বলে ডাকবেন!

অতসী দাঁড়াইল না; চলিয়া আসিল।

বিরক্তি লাগিল···রাগ হইল। পথে পড়িয়াছিল নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল···ডাকিয়া ঘরে আনিয়া ঠাঁই দিলাম, তার জন্য···এ যেন কী! বাড়ীতে আরো পাঁচজন লোক আছে·· দাস-দাসী ড্রাইভার-মালী···তাদের সঙ্গে অতসী কথা কহিতে যায় না! কোনো কথা কহিলে সম্ভ্রমে তারা নত হয়·· সে কথা কি করিয়া শোনে···কতখানি বিনয়-নম্র হইয়া সে কথার জবাব দেয়···

না, ইহাকে রাখা চলিবে না···অন্য দাস-দাসীদের স্বভাব বিগড়াইয়া দিবে···

তবু কান্তিকে বিদায় দেওয়া গেল না।

রাগ পড়িলে মনে হইল, কি এমন অপরাধ করিয়াছে? পরের ব্যবহার-করা বিছানায় শুইতে ঘৃণা হয়! অতসীরও হয়·· অপরের তোয়ালে-গামছা সে ব্যবহার করিতে পারে না! সে তোয়ালে-গামছা আপন-জনের হইলেও না! ও যদি মালীর বিছানা ব্যবহার করিতে না পারে! না পারিবার কথা! ভদ্রলোক·· নিশ্চয় একদিন ও···নহিলে ভিক্ষা চাহিতে পারে না?

মনে মনে কান্তিকে তখনি মার্জ্জনা করিল এবং কান্তি এ গৃহে রহিয়া গেল।

মালীর ঘরের সামনে ঢাকা-দালান···সেখানে সে থাকে। খাওয়ার সময় ঠাকুর ডাকিয়া পাঠায়, আসিয়া খাইয়া যায়। বাসন মাজিতে পারে না···বলে, কলাপাতা কাটিয়া আনিব, সেই পাতায় ভাত দিয়ো! মন দিয়া কাজ করে· মালী যা বলে, করে। মাটী কাটে···আগাছা সাফ করে ··মাটীতে চারা বসায়···গাছে জল দেয়। কাজে আলস্য নাই এক তিল! তারপর কাজ চুকিলে চুপচাপ বাগানে বসিয়া থাকে। কি ভাবে···কাহারো সঙ্গে মেশে না। অতসী কত দিন এ-সব লক্ষ্য করিয়াছে।

বিশু আসিয়া বলে—আশ্চর্য্য মানুষ মা! এ্যাদ্দিন আছে ···আমাদের সঙ্গে বসে একদিন দুটো কথা কইলে না! আমরা কথা কইতে গেলে সরে চলে যায়! যেন নবাব-পুত্তুর!

ঠাকুর বলে—কলাপাতা সামনে নিয়ে বসে···যা দি, চুপ করে খায়। কোনোদিন বলে না, আর-দুটি ভাত দাও, কি একটু ডাল দাও!···পাগল, না, কি ও মা?

অতসী ভাবে, সত্য·· আশ্চর্য্য লোক!

তারপর ঐ যে চুপচাপ বসিয়া থাকা! ও কি ভাবে?

এখানে আজ আশ্রয় পাইয়াছে···ভিখারীর সে· কদর্য্যতার ছোপ্ আর নাই। উবিয়া গিয়াছে! চেহারা যা হইয়াছে··:···মালীর কাজে কান্তিকে মানায় না!

বিরল-অবসরে কান্তির কথা অতসীর মনে চাপিয়া বসে।

সেদিন অতসী বাগানে আসিল। বাগানে মগুমী ফুল ফুটিয়াছে। কান্তি কাছেই কাজ করিতেছিল···কোন গাছে কলম বাঁধিতেছিল।

অতসী কহিল—লোকজনের সঙ্গে মেশো না কেন তুমি? একসঙ্গে কাজকর্ম্ম করো সকলে·· এক মনিব··· পরস্পরে মিশবে—পরস্পরে পরস্পরের সুখ-দুঃখ বুঝবে···ওরা কত বলে সেজন্ত!

মৃদু হাসিয়া কান্তি বলিল—ওদের সঙ্গে কি কথা কইবো? ওরা হলো আলাদা ক্লাশের লোক···

আলাদা ক্লাশ্!

অতসী কান্তির পানে চাহিল। তার দু'চোখে বিস্ময়!

অতসী কহিল—তা যদি বলো, তাহলে আমারো তো তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়!

কান্তি বলিল—আপনি আমার সঙ্গে কথা কন্···তার মানে, আপনি মনিব, আমি চাকর। আপনার দয়া হয়, দরকার হয়, তাই আপনি কথা কন।···যাঁরা উঁচু কোঠায় থাকেন, তাঁরা যখন নীচু কোঠার পানে তাকান্·· ভাবেন, দয়া করছেন!···যারা খুব বড়, আর যারা খুব ছোট···তারাই সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, কথা কইতে পারে···কোথাও বাধে না!

কথাগুলা অতসী মন দিয়া শুনিল। নূতন কথা! এ কথা শুনিয়া সে বলিল—কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা কইতে তোমার কেন বাধবে? ওরা যা, তুমিও তাই।

কান্তি এ'কথার জবাব দিল না·· পাশে ছিল একটা শিউলি ফুলের গাছ·· দাঁড়াইয়া সে-গাছের পাতা ছিঁড়িতে লাগিল।

অতসীর মুখে কথা নাই···নিঃশব্দে সে প্রস্থান করিল।

সারা মনে দারুণ অস্বস্তি! মনে হইতেছিল, কান্তি যে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচিয়া তার মধ্যে এমন নির্ব্বিকারচিত্তে বাস করে, ও দুর্গে কি এমন শক্তি সে সঞ্চিত রাখিয়াছে! কেন সে গ্রাহ্য করে না? অতসী বাগানে গেলে মালী যেখানে যে ভালো ফুলটি ফুটিয়াছে, আনিয়া সসম্ভ্রমে তার হাতে উপহার দেয়! ঐ মগুমী ফুলের রাশ···কান্তির একবার মনে হইল না যে ও'ফুল আনিয়া···

ফুল আনিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অতসী কথা কহিলে কান্তি সে-কথার জবাব দেয় কতখানি তাচ্ছিল্য-ভরে···যেন কথা কহিয়া অতসীকে সে কৃতার্থ করিয়া দিবে!

এ লোকটাকে কি করিয়া বুঝাইয়া দিবে, অতসীর অনুগ্রহে শুধু আশ্রয় মিলিয়াছে? অতসী যদি আজ তাহাকে আবার তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে···

অতসী আসিল বিদ্যুৎবরণের কাছে। পাঁচখানা বই খুলিয়া বসিয়া বিদ্যুৎবরণ খাতার পাতায় কি সব লিখিতেছে।

অতসী ডাকিল—ওগো··

বই হইতে মুখ না তুলিয়া বিদ্যুৎবরণ কহিল—কেন?

—তোমার ঐ নতুন মালী। ও ভারী অকৃতজ্ঞ · ভারী বেইমান···

বিদ্যুৎবরণ বলিল—হুঁ···

অতসীর পানে নিমেষের জন্ত তাকাইল না···উঠিয়া আলমারি হইতে আর একখানা মোটা বই আনিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

রাগে অতসী কাঠ! বলিল—মানুষ কথা কইতে এসেছে, তা গ্রাহ্য নেই!

বিদ্যুৎবরণ বলিল—বুঝছো না ভারী interesting··· ঐ চণ্ডীদাস · এমন নজীর পেয়েছি, যার জোরে প্রমাণ করে দেবো তিনি শুধু বৈষ্ণব পদাবলী লেখেননি···একশো খানি শ্যামা-সঙ্গীত লিখে গেছেন। Internal evidence যা পাচ্ছি···

নিশ্বাস ফেলিয়া অতসী চলিয়া আসিল।

সোজা সুকুর ঘরে আসিল। সুকু একখানা বিলাতী সিনেমা-পত্রিকা দেখিতেছে ·

অতসী বলিল—সিনেমায় যাবি?

সুকুমার লাফাইয়া উঠিল, কহিল—কোন্‌টায় যেতে চাও?

—টিভোলীতে।

—যাবো। ওখানে খুব ভালো ছবি আছে! নর্ম্মার ছবি।

তাই হয়। অতসী ভাবে, ভাগ্যে সুকু এখানে আছে ·· নহিলে কি করিয়া তার দিন কাটিত।

এ-বয়সে স্বামী মুখের পানে চাহিতে জানে না! প্রাচীন কবিদের কাব্যে কি পাইয়া তাহাতে মশগুল থাকেন! অতসীর দেহে-মনে যে কাব্য আছে, তার পাশে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি!

এক-একবার মনে হয়, কোথাও চলিয়া যাই! কাছে আছে বলিয়া স্বামী তার দাম বুঝিল না···দূরে গেলে বুঝিতে পারিবে! কিন্তু কোথায় যাইবে?

ইহার চেয়ে যদি গরীবের ঘরে গরীব-স্বামী···সে যত্ন করিত, আদর করিত···

পরক্ষণে শিহরিয়া উঠিল। তাহা হইলে এ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ···বিলাস-ভূষণ · দাস-দাসী···বাড়ী-গাড়ী···মান-সম্ভ্রম···

পূর্ণিমার রাত। নিজেকে ভাঙ্গিয়া নিংড়াইয়া তার সমস্ত জ্যোৎস্নাটুকু পৃথিবীর বুকে নিঃশেষে যেন ঝরাইয়া দিয়াছে!

সিনেমা দেখিয়া অতসী বাড়ী ফিরিল।

সিনেমায় তরুণ-মনের প্রমোদ-বাসরের যে-ছবি সদ্য দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার রেশে মন ভরিয়া আছে···

দোতলার বড় বারান্দায় আসিয়া দেখে বিদ্যুৎবরণ কাগজ লইয়া কি সব লিখিতেছে···

অতসী বলিল—শুনছো?

বিদ্যুৎবরণ জবাব দিল না···নিবিষ্ট মনে লিখিতে লাগিল।

অতসী বলিল—চমৎকার জ্যোৎস্না! লেখা রেখে চলো না মোটরে চড়ে' দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি। গঙ্গার ধারে কি লেকের দিকে। বড্ড ইচ্ছা করছে বেড়াতে যেতে···

বিদ্যুৎবরণ এবার চাহিল অতসীর দিকে···কহিল—হুঁ···

অতসী কহিল—তোমার চণ্ডীদাসের পদাবলীর চেয়ে ঢের ভালো লাগবে গঙ্গার ধার···এই জ্যোৎস্না···পাশে আমি···

অতসীর পানে বিদ্যুৎবরণ চাহিয়া রহিল···অবিচল দৃষ্টি। ···সে-দৃষ্টি এ মাটীর পৃথিবীতে নাই···অতসী বুঝিল, সে দৃষ্টি অলীক-কল্পলোকে!

অতসী বলিল—আমার কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি?

বিদ্যুৎবরণ বলিল—এ-পদটা শোনো দিকিনি

> সখি, মরম কহিনু তোরে॥
> আড়-নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
> বিকল করিল মোরে॥

এমন-কথা কোনো দেশের আর কোনো কবি লিখতে পেরেছেন?···আমার এ-প্রবন্ধে আমি তাই লিখছি···

অতসীর মনে আগুন জ্বলিল। সে আগুনের স্পর্শ লাগিয়া আকাশের চাঁদ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল।

অতসী বলিল—চুপ করো।···তুমি যখন এ-সব কথা বলো, তখন আমার কি মনে হয়, জানো?···মনে হয়, তুমি মানুষ নও···পাথরের পুতুল!···কবিতা নিয়ে মশগুল্ হয়ে আছো···আর আমি তোমার স্ত্রী···আমার এই বয়স·· তোমার চণ্ডীদাসের রাধার চেয়ে কুশ্রী-কুরূপ নই!···আমি যদি তোমার ঐ চণ্ডীদাসের রাধার মতো কৃষ্ণপ্রেমে উধাও হয়ে যমুনা-তীরে চলে যেতুম?···জানো, তা পারবো না···

স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল···অতসীর কথা শেষ হইল না। অতসী সেখান হইতে চলিয়া আসিল···

ঘরে গেল না···নীচে গেল না···গেল একেবারে তিন-তলার বড় ছাদে।···ছাদের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল···দু' চোখে বন্যা নামিল!

যখন ঘুম ভাঙ্গিল·· অনেক রাত্রি। সারা গৃহ নিস্তব্ধ নিঝুম। আকাশে সেই চাঁদ···সে-চাঁদে সেই জ্যোৎস্না-ধারা···

অতসী উঠিল···উঠিয়া আল্‌শের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বাগানে জ্যোৎস্নার লহর। গাছে-পাতায় ফুলে-ফলে যেন গলা-রূপা ঢালিয়া দিয়াছে! ঐ মালীর ঘর···সে ঘরের সামনে ঢাকা বারান্দার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে কান্তি।

ঘুমায় নাই! কি ভাবিতেছে! এত কি ভাবে?

হয়তো অতীত দিনের কথা···হয়তো ঘরে একদিন ছিল তরুণী স্ত্রী · হয়তো কাজের মাতনে তার পানে ফিরিয়া চাহে নাই···হয়তো অতসীর মতো বেদনা সহিয়া সহিয়া একদিন সেই স্ত্রী···! সে-স্ত্রী যতদিন পাশে ছিল, তার পানে হয়তো চাহিয়া দেখে নাই! আজ সে পাশে নাই, হয়তো তাই তার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া আছে! সে-ব্যথায় আকুল বলিয়া হয়তো কাহারো সঙ্গে মেশেনা···তাই হয়তো কাহারো সঙ্গে কথা কয় না···

কিম্বা হয়তো, তরুণী স্ত্রী ওর পানে ফিরিয়া তাকায় না··· হয়তো মনের দুঃখ স্ত্রীকে বলিতে গিয়াছে বহুবার, হয়তো স্ত্রী সে-কথায় কান দেয় নাই!

তাই যদি, তো কি-সুখে ও বাঁচিতে চায়? পথ ছাড়িয়া ঘরে আশ্রয় খোঁজে?

মন বলিল, কান্তির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে চলো, কি তুমি এত ভাবো কান্তি?

কে যেন অতসীকে তার অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছিল! বলিতেছিল, চাকর নয়···মনিব নয়···মানুষ···দুজনেই ব্যথী···

অতসী ছাদ হইতে নামিল। সামনে বারান্দা · পাশে ঘর···সে-ঘরে শয্যা ··শয্যায় বিদ্যুৎবরণ ঘুমাইতেছে।··· অতসী ভাবিল, আশ্চর্য্য মানুষ! অতসী রাগ করিয়া কোথায় গেল ··কি করিল···বাঁচিল, না মরিল, খোঁজ নাই? বিছানায় অতসী নাই নিশ্চয় দেখিয়াছে···একবার খবর লইল না? হায়রে, কি সুখে অতসী বাঁচিয়া আছে? কিসের আশায়? কিসের লোভে? ··

একটা নিশ্বাস! অতসী দাঁড়াইল না · নিঃশব্দে বাগানে আসিল। কান্তি যেখানে বসিয়াছিল, একেবারে সেইখানে··· কান্তির সামনে! ডাকিল—কান্তি···

কান্তি চমকিয়া অতসীর পানে চাহিল, কহিল—আপনি!

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা কইতে এলুম। ঘুম হচ্ছিল না ··বারান্দা থেকে দেখলুম, তুমি জেগে আছো···

কান্তি কথা কহিল না···নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল অতসীর পানে।

অতসী বলিল—একলাটি থেকে কখনো তোমার মনে হয় না কান্তি, কারো সঙ্গে কথা কই?

কান্তি বলিল—আগে হতো···যখন লোকালয়ে বাস করতুম!

—লোকালয়ে বাস করতে! তার মানে?

—তার মানে, যখন মানুষ ছিলুম। কারো যখন কেউ কোথাও থাকে না—কিছু থাকে না, তখন তার মনে হয়, সে যেন লোকালয়-ছাড়া সে যেন লোকালয়ের বাইরে বাস করছে!

এ-কথায় কতখানি ব্যথা, অতসী বুঝিল। তাহার নিজেরো থাকিয়া-থাকিয়া এমনি মনে হয়!···অতসী বলিল— কিন্তু এখন তো তুমি লোকালয়েই বাস করছো কান্তি! কাজকর্ম্ম করছো!

—কাজ-কর্ম্ম করছি···একে বাস করা বলে না।···কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন।···ক্যাম্প খাটখানা আনি···

—না, না, দাঁড়িয়ে বেশ আছি।···

তারপর একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া অতসী বলিল—তুমি বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য হচ্ছো যে আমি মনিব, এই রাত্রে তোমাকে ডেকে তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছি···

কান্তি বলিল—আশ্চর্য্য হই নি! আশ্চর্য্য হয়েছিলুম সেদিন, যেদিন ঐ বর্ষায় আমাকে গাড়ীতে তুলে এই বাড়ীতে নিয়ে এলেন! জানা নেই, শোনা নেই···তাছাড়া এ-বয়সে দুনিয়ায় আমি এত কিছু দেখেছি-শুনেছি যে কোনো কিছুতে আর আশ্চর্য্য হই না! তা ছাড়া মানুষ যখন ব্যথা পায়, ছোট-বড়র ভেদ তখন সে ভুলে যায়··· সব মানুষকে তখন সমান দেখে। আপনি বোধ হয় তেমনি-কিছু ব্যথা পেয়েছেন, তাই···

অতসী কাঁপিয়া উঠিল! কম্পিত স্বরে কহিল—আমার আবার কিসের ব্যথা?

কান্তি হাসিল···মৃদু হাসি। কহিল—আমি বুঝি। ·· এ-ব্যথা খুব আপন-জনের কাছেই পেয়েছেন—এমনি ব্যথাতেই মানুষের চেতনা থাকে না···সব কেমন একাকার হয়ে যায়।···আমি জানি!

অতসীর বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল···সেই সঙ্গে এ-কথায় ব্যথার ঘনান্ধকারে যেন একটু আলোর রশ্মি···

অতসীর মনে হইল,তাহার সব যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে! যে গোপন-ব্যথার কথা কেহ জানে না, লোকালয়-ছাড়া এ লোকটির কাছে সে-ব্যথা যেন গোপন নাই···প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! এ-চিন্তায় অস্বস্তির সঙ্গে কেমন একটু সান্ত্বনা···.

অতসী ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিশ্বাস ফেলিয়া অতসী বলিল, —তুমি সত্যি কথাই বলেছো কান্তি। আমার সাজগোজ অলঙ্কার-ঐশ্বর্য্য দেখে কেউ বুঝতে পারে না, আমার দুঃখ আছে কি না। তাই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে তুমি আমার কি-বা জানো···কতটুকুন্ আমাকে দেখেছো, অথচ তুমি ··

কান্তি বলিল—আমি জানি। বড়-ঘরে জাঁকজমক ঐশ্বর্য্য যেমন বড়, ব্যথাও সেখানে তেমনি বড়। গরীবকে এ-সব বড় দুঃখ পেতে হয় না···তাদের দুঃখ ছোটখাট সে দুঃখ ঘোচে। কিন্তু বড় ঘরের দুঃখ ঘুচোবার সামর্থ্য কারো নেই···ঘুচোবার উপায়ও নেই!

কে এ? এত কথা কি করিয়া জানিল? যে-কথা কাহারো জানিবার নয়···সেই ব্যথার কথা এ-লোকটি···

তারপর কথায় কথায় সমবেদনার ঘায়ে মনের কপাট কখন খুলিয়া গেল···প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ভুলিয়া স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান ভুলিয়া একান্ত-বিশ্বস্ত-সাথীর মতো কান্তির কাছে অতসী খুলিয়া বলিল তার এতদিনকার পুঞ্জিত বঞ্চনা-ব্যর্থতার কাহিনী। বলিল, স্বামী বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঐশ্বর্য্যবান, অথচ —এই বয়স আর রূপ লইয়া অতসী স্বামীর মনে এতদিনেও একটু রেখাপাত করিতে পারিল না! স্বামী তাঁহার বই আর কাগজপত্র লইয়া বিভোর হইয়া আছেন! কি তাহাতে পান্···অতসী যাচিয়া আদর চাহিয়া প্রত্যাখ্যানের বাণে আহত হইয়া ফিরিয়া আসে! বারে-বারে ফিরিয়া আসিয়াছে! অভিমানে-অপমানে কাতর হইয়া কতবার ভাবিয়াছে, কোথাও চলিয়া যাইবে···! যাইতে পারে না। মনে হয়, এই ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম সম্পদ-ভূষণ, এ সব চির-দিনের জন্ত খোয়াইয়া বসিবে···চলিয়া গেলে সমাজে কলঙ্ক রটিবে·· কোনোদিন আর সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না!

কান্তি বলিল—সমাজ! হাজার জাঁতায় মানুষকে পিষছে···পিষে থেঁতো করে' পাত্ করে' ফেলছে! · একটি জাঁতা ঐ বিয়ের মন্তর···সে-জাঁতায় পিষে আপনি থেঁতো হচ্ছেন। আর এক জাঁতা অভাব! এ জাঁতায় আমি পিষে চুর হচ্ছি!···নাহলে কি না ছিল আমার?···লেখাপড়া শিখেছিলুম···বিয়ে করে' ছিলুম। স্ত্রী···আপনার পাশে দাঁড়ালে তাকে বেমানান্ দেখাতো না। ছেলেমেয়ে··· সংসার···কিন্তু এই অভাবের জাঁতায় কি হয়ে গেল!··· ছনিয়ার উপর রাগ হয়। যে-শক্তি আছে, পারিনা সে শক্তিতে এ অভাব মোচন করতে? পারি। কিন্তু ভয় হয়। আইনের ভয়···পুলিশের ভয়!···তবু আমার এ দুঃখ···আপনার দুঃখের কাছে কিছুই নয়! আমার এ অভাব ভিক্ষা পেলে ঘোচে! হাত পেতে অন্ন-বস্ত্র ভিক্ষা করা চলে···কিন্তু ভালোবাসা ভিক্ষা করা চলে না! ভিক্ষায় মানুষ সব-কিছু পায়, পায় না শুধু ভালোবাসা!

মন দিয়া অতসী শুনিল কান্তির প্রত্যেকটি কথা। এত কথা কান্তি কি করিয়া জানিল?···এত-বড় সত্য কথা··· ভিক্ষায় সব পাওয়া যায়···পাওয়া যায় না শুধু ভালোবাসা!

মাথার উপর চাঁদের আলো নিমেষের জন্ত যেন মলিন-ম্লান···একখানা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল।

অতসীর মনে হইতেছিল, কান্তি যেন শাপগ্রস্ত কোনো রাজপুত্র···যেন কোন্ মুনির শাপে এখানে ভৃত্যগিরি করিতেছে!···

সত্যই তাই? ··

কান্তির মুখের পানে সে চাহিয়া রহিল···অবিচল দৃষ্টি!

সহসা মাথা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। চাঁদকে সে মেঘখানা যেন বন্দী করিয়াছে! চারিদিকে যেন অন্ধকারের ছায়া নামিতেছে···এ ছায়া ঘন···আরো ঘন···মেঘ যেন তার বিরাট দেহ প্রসারিত করিয়া জ্যোৎস্নার শেষ রশ্মিটুকুকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল···আকাশ-পৃথিবী অন্ধকারে ভরিয়া গেল। ··

তারপর আবার যখন আলো ফুটিল, চোখ মেলিয়া অতসী দেখে, সে শুইয়া আছে···কান্তির কোলে মাথা! কান্তি তার মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া দিতেছে!

কান্তির হাতের স্পর্শ···অতসীর দেহ-মন অশুচি-বিষে রী-রী করিয়া উঠিল।

ধড়মড়িয়া সে উঠিয়া বসিল। দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া কান্তির পানে চাহিল, ডাকিল—কান্তি···

রূঢ় স্বর।

কান্তি কহিল—আজ্ঞে···

—তুমি ভুলে গেছ তুমি চাকর···আমি তোমার মনিব!···

কান্তি বলিল—আপনিও সে-কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দুজনেই ব্যথা পেয়েছি কি না! ব্যথায় মানুষ ছোট-বড়র ভেদ ভুলে যায়।

অতসী কহিল—তোমার আস্পর্দ্ধা বড় বেশী···

অতসীর দেহে-মনে আগুনের জ্বালা···কান্তির ঐ হাত··· মনে হইতেছিল, মুখ আর মাথা যেন পুড়িয়া যাইতেছে!

অতসী দ্রুত-পায়ে গৃহে ফিরিল।···মুখ-হাত ধুইয়া ফেলিল···খোঁপা খুলিয়া মাথায় জল ঢালিল···

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা আটটা। মাথা ভারী হইয়া আছে···সমস্ত দেহে-মনে দারুণ অবসাদ। রাত্রির কথা মনে পড়িল। দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে?···না···

অতসী উঠিয়া বাহিরে আসিল।

সব কথা মনে পড়িল। স্বপ্ন নয়। রাত্রে বাগানে গিয়াছিল···ঐ মালীকে ডাকিয়া যে-সব কথা বলিয়াছে··· তারপর মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল···আর ঐ মালীটা···

অতসী বাগানের দিকে চাহিল···

কোদাল লইয়া কান্তি মাটী কোপাইতেছে···

অতসী গেল স্নানের ঘরে। গায়ে-মাথায় অজস্র জল ঢালিয়া স্নান করিল। দু'বার তিনবার পাঁচবার সাতবার সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিল। গায়ে-মাথায় আবার জল ঢালিল। তারপর ফর্শা তোয়ালে দিয়া গা-মাথা মুছিয়া ফর্শা শাড়ী-সেমিজ পরিল। পরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কপালে সযত্নে আঁকিল সিঁদুরের টিপ···চিরুণীর ডগায় সিঁদুর লাগাইয়া সে-সিঁদুরে সিঁথিতে রেখা টানিল···

তারপর বাগানে আসিল···কান্তির সামনে। ডাকিল—কান্তি···

কোদাল রাখিয়া কান্তি চাহিল অতসীর পানে। কাল রাত্রিকার সে মোহিনী-মূর্ত্তি নয়—এ যেন বিজয়িনী রাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তি!

অতসী বলিল—তোমার মাইনে নিয়ে এখান থেকে তুমি চলে যাবে ··এখনি···বুঝলে! এখানে তোমার চাকরি করা চলবে না।···দু'মাসের মাইনে পাবে। না হয় তিন মাসেরই। সরকার মশাইকে বলে দেবো, তোমাকে পঁচিশ টাকা দেবেন। টাকা নিয়ে আজই তুমি চলে যাবে।

কান্তি কহিল—যাবো। কিন্তু টাকা আমি চাই না···

—টাকা চাও না?···অতসীর স্বরে বিস্ময়!

কান্তি বলিল—না!

অতসীর মনে অস্বস্তি! অতসী বলিল—তাহলে যে কদিনের মাইনে পাওনা হয়েছে, তাই নিয়ে যেয়ো।

—যাবো।···

—হ্যাঁ, যাবে।···

অতসী চলিয়া আসিতেছিল···কান্তি আসিয়া সামনে দাঁড়াইল···

অতসী কহিল—কি চাও?

লোহার একটা মাথার-কাঁটা লইয়া কান্তি বলিল—এটা কাল রাত্রে ফেলে গিয়েছিলেন। আজ সকালে দেখতে পেয়ে আমি কুড়িয়ে রেখেছি···

অতসী বলিল—ও আমি চাই না। ফেলে দাওগে।

কান্তি হাসিল···বলিল—আমি যদি এটা রেখে দি?

অতসী কোনো কথা কহিল না·· গৃহ-মুখে যাত্রা করিল।

কান্তি কহিল—আর-একটা কথা···

—বলো···

—আজ না গিয়ে যদি কাল যাই?

অতসী ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কহিল—কেন?

—মানে, একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো। এতদিন ঘরে বাস করে' চট্ করে' পথে দাঁড়াতে পারবো না হয়তো। তাই···

—বেশ। কিন্তু কাল নিশ্চয় চলে যাবে।

—যাবো।···

গৃহে ফিরিয়া অতসী আসিল একেবারে বিদ্যুৎবরণের কাছে···বিদ্যুৎবরণ খবরের কাগজ পড়িতেছে।

অতসী তার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, বলিল—ওগো তোমার দুটি পায়ে মিনতি জানাচ্ছি···এখানে একদণ্ড আমার মন টিঁকছে না। পাঁচ দিনের জন্য···না হয় দুদিনের জন্য অন্ততঃ আমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলো। না হলে সত্যি বলছি, আমি পাগল হয়ে যাবো···আমি মরে যাবো···

অতসীর হাত ধরিয়া বিদ্যুৎবরণ তাকে তুলিল। অতসীর দু'চোখে শ্রাবণের ধারা! অতসীকে এমন সে কখনো দেখে নাই!

বিদ্যুৎবরণ ডাকিল—অতসী···

অতসী বলিল—চলো···চলো···যেখানে হোক···আজই ···একটু দয়া করো···কখনো আমার পানে চেয়ে দেখোনি ···আমাকে কোথাও নিয়ে চলো···যেখানে তোমার খুশী···

চণ্ডীদাসের রজকিনী রামীর ব্যথা বিদ্যুৎবরণের মনে তখনো আঁটিয়াছিল! বিদ্যুৎবরণ বলিল—একদিন কেন্দুবিল্ব যাবো ভাবছিলুম। সেখানে চণ্ডীদাসের ভিটে আছে··· বাশুলিদেবীর মন্দির···

অতসী বলিল—চলো গো সেইখানেই চলো। আজই খেয়েদেয়ে। আমি দেখবো কেন্দুবিল্ব···তোমার তীর্থ···

বিদ্যুৎবরণ বলিল—হুঁ···বেশ!

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধভাব!

বিদ্যুৎবরণ ডাকিল—মুকু···

পাশের ঘর হইতে সুকুমার জবাব দিল—জামাইবাবু…

বিদ্যুৎবরণ বলিল—লগেজ বাঁধো। তুমি, আমি আর তোমার দিদি…To Kenduvilwa…আজই খাওয়া-দাওয়া সেরে…বুঝলে…

একসপ্তাহ পরে ফেরা হইল…আবার এই বাড়ী… তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

ঘরে আসিয়া গহনা তুলিতে গিয়া অতসী দেখে, আলমারির কল ভাঙ্গা…

আলমারি খুলিয়া ড্রয়ার টানিল। দেখে, সর্ব্বনাশ! দামী নেকলেশ আর ব্রেশলেটের কেশ-দুটা খালি…সাত-আটটা আংটির কেশও। ড্রয়ারের মধ্যে পড়িয়া আছে মাথার একটা কাঁটা…লোহার কাঁটা!

এ কাঁটা এখানে আসিল কি করিয়া? অতসী রাখে নাই…কখনো রাখে না!…

পরক্ষণে দেহে রোমাঞ্চ-রেখা! এ কাঁটা…কান্তি মালী রাখিয়াছিল…কান্তি!

কোথায় সে?

শুনিল, যেদিন তারা চলিয়া যায়, তার পরের দিনেই কান্তি চলিয়া গিয়াছে!

এ তার কাজ! ভুল নাই! শুধু বেইমান নয়…চোর! টেলিফোনের বই খুলিয়া অতসী নম্বর দেখিল, থানা…

কিন্তু…

থানা-পুলিশে খপর দিলে তারা যদি কান্তিকে ধরিয়া আনে? ধরা পড়িলে কান্তি যদি বলে, ঐ মাথার কাঁটা… কি করিয়া সে পাইয়াছে…কার মাথার কাঁটা…সেই সঙ্গে সে-রাত্রের সে-কাহিনী যদি সে বলিয়া বসে? সে-কথায় স্বামী যদি সন্দেহ করেন?…

অতসী শিহরিয়া উঠিল।

তার কথা কে বিশ্বাস করিবে? ব্যথার ভারে চেতনা হারাইয়া সে-রাত্রে অতসীর বাগানে যাওয়া…তার মধ্যে দোষের কিছু ছিল না…

কিন্তু কেহ বুঝিবে না…স্বামী-সংসার…সমাজ…কেহ না!…

এ চুরির কথা বলা চলে না… কাহাকেও না।…কিন্তু সে চুরি করিল কেন?…টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, বলিল, টাকা চাহে না!…

শয়তান!

সুকু আসিয়া ডাকিল—দিদি…

অতসী চমকিয়া উঠিল। কহিল—কেন রে?

সুকু বলিল—তোমার ঐ পুষ্যিপুত্তুর…ঐ কান্তি ব্যাটা…

অতসীর বুকে মেঘ ডাকিল…কম্পিত-স্বরে অতসী বলিল —কি করেছে সে?

উত্তরে কি শুনিবে…অতসী কাঁটা হইয়া রহিল!

সুকু বলিল—বিশু বলছিল আমার দুটো কোট, দু'খানা ধুতি, আর একজোড়া পাম্পশু-জুতো নিয়ে ভেগেছে। মালীর কাছ থেকে দশটাকা ধার নিয়ে গেছে যাবার সময়। বলে' গেছে, মা-ঠাকরুণ ফিরলে মাইনের টাকা চেয়ে শোধ দেবে।…আমি বলি, থানায় খবর দি…

আবার থানা?

অতসী বলিল—না, না…সামান্য জিনিষ নিয়ে আর থানা-পুলিশ করে না। বাড়ীতে পুলিশ আসবে…একটা হৈ-হৈ ব্যাপার…

সুকু হাসিয়া বলিল—জানি, তোমার মায়া আছে ব্যাটার উপর! কিন্তু আমি ভাবছি, ব্যাটা তোফা ছিল এখানে তোমার পুষ্যিপুত্তুর হয়ে…এ দুর্ম্মতি হঠাৎ হলো তার…

অতসী জবাব দিল না।

বিশু আসিল…তার ঘাড়ে স্যুটকেশ্। বলিল— স্যুটকেশ আজ তো আর খুলবেন না, মা?

—না। চ, কোথায় রাখবি, আমি দেখিয়ে দি…

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অতসী গেল বিশুর সঙ্গে; বলিল—তুই নেয়ে নে সুকু…যদি চান্ করতে চাস্…তারপর আমি ঢুকবো বাথ-রুমে…দেরী করিস্ নে।

হরিমিশ্রের কারিকা

ডক্‌টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএইচ্‌-ডি (ভাইস্‌ চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৩৪৬ সনের ভারতবর্ষে "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য" নামে আমি পাঁচটি প্রবন্ধ লিখি। কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধে অন্যান্য প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থের সঙ্গে "হরিমিশ্রের কারিকা" সম্বন্ধে আলোচনা করি। পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থখানিকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত বলিয়া অনুমান করেন এবং কুলগ্রন্থের মধ্যে "সর্ব্বপ্রাচীন ও মৌলিক" বলিয়া গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের একমাত্র পুঁথি তাঁহার নিকট ছিল এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বহুবিধ তথ্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে ১৩৪৬ সনের ভারতবর্ষের কার্ত্তিক মাসের প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করি :

"৺বসু মহাশয় হরিমিশ্রের কারিকা ও এড়ু মিশ্রের কারিকার পুঁথি পাইয়াছেন এবং এ দুইখানিই অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৺বসু মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আধুনিক কোন লেখক এই দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সাধারণের নিকট এই দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া ৺বসু মহাশয়ের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। তথাপি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আন্দোলন সত্ত্বেও ৺বসু মহাশয় তৎসংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ কাহারও সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই এবং ইহাদের কোন বিশিষ্ট বিবরণও প্রকাশ করেন নাই।

মরণকাল পর্য্যন্ত যক্ষের ধনের ন্যায় এই গ্রন্থ দুইখানি বসু মহাশয় কি কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সমুদয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বসু মহাশয় সংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহ জন্মে।" (৬৬১ পৃষ্ঠা)

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত সমুদয় কুলগ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়াছেন। এই কুলগ্রন্থগুলি ঢাকায় আনীত হইলে আমি পুঁথিশালার অধ্যক্ষ আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত হরিমিশ্রের কারিকাখানি অনুসন্ধান করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দেই। শ্রীমান সুবোধ অনেক অনুসন্ধানের পর একখানি পুরাণ অমৃতবাজার পত্রিকার মলাটযুক্ত প্রাচীন পুঁথির চারিখানা পাতা আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন। পুঁথির মধ্যে হরিমিশ্রের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রতি পাতার উপরের বাম কোণে ভিন্ন কালীতে এবং ভিন্ন হস্তাক্ষরে "হরিমিশ্র" এই কথাটি লিখিত আছে। পুঁথির মলাটে "৮৭" এই সংখ্যাটি এবং 'হরিমিশ্র' এই নামটি দেখিতে পাওয়া যায়। পুঁথির স্তূপের মধ্যে কয়েকখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় লিখিত পুঁথির তালিকা পাওয়া গিয়াছে। দুইখানি বাঙ্গালা তালিকায় ৮৭ সংখ্যায় হরিমিশ্রের কারিকার উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে এই মন্তব্য আছে যে, যে বাক্সে জমিদারী কাগজ-পত্র আছে সেই বাক্সেই এই পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী তালিকায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে কয়েকখানি "দুষ্প্রাপ্য পৃষ্ঠা" (a few rare leaves) মাত্র আছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু শেষজীবনে কুলগ্রন্থগুলি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি ইহার কতকগুলি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপ কয়টি তালিকা পুঁথিগুলির সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু ইহার কোন তালিকায়ই একাধিক 'হরিমিশ্র কারিকার' পুঁথির উল্লেখ নাই।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, যে খণ্ডিত পুঁথিখানির চারিটি পাতা মাত্র সযত্নে জমিদারীর প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের সঙ্গে একটি বাক্সে পৃথক রক্ষিত ছিল তাহাই ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত "হরিমিশ্রের কারিকা"।

কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় আমি আরও বিশেষভাবে ইহার পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম। আমার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমান সুবোধ ৺বসু মহাশয় হরিমিশ্রের কারিকা হইতে যে সমুদয় শ্লোক "বিশ্বকোষ" ও "বঙ্গের জাতীয়

ইতিহাস"-এ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়া ঐ সমুদয় শ্লোক আমাদের আলোচ্য খণ্ডিত পুঁথিখানিতে আছে কি-না তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমান বহু আয়াস ও পরিশ্রম পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া একটি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে আমি ইহার সবিস্তারে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ৺বসু মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাদির নানাস্থানে হরিমিশ্রের কারিকা হইতে যে ১৮টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যে ১৩টি এই পুঁথিতে আছে, অবশিষ্ট পাঁচটি শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীমান সুবোধ নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

১-২। এই দুইটি শ্লোক মহেশের নির্দ্দোষ কুল-পঞ্জিকায় আছে।

৩। এই শ্লোকটি ৺লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত সম্বন্ধ-নির্ণয়ের 'কুলরমা' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। সম্বন্ধনির্ণয়ে এই শ্লোকটি বাচস্পতিমিশ্রকৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বল্লাল চরিতেও এই শ্লোকটি আছে।

৫। এই শ্লোকোক্ত বিষয়টি আলোচ্য পুঁথিতে অন্য একটি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে।

এই সমুদয় আলোচনার ফলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, আমাদের আলোচ্য খণ্ডিত পুঁথিখানিই ৺বসু মহাশয় সংগৃহীত 'হরিমিশ্র কারিকা' গ্রন্থ—যাহা অর্দ্ধশতাব্দী কাল লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া দৈববিপাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, এই গ্রন্থখানিকে হরিমিশ্রের কারিকা বলিয়া গ্রহণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি-না। গ্রন্থখানির প্রথম ও শেষ অংশ নাই, মধ্যের চারিটি পাতা মাত্র আছে। ইহার কোন স্থানেই ইহা হরিমিশ্রের কারিকা বলিয়া উল্লিখিত নাই। সুতরাং ইহা যে হরিমিশ্রের কারিকা—৺নগেন্দ্রনাথ বসুর এই অনুমানের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতি পাতার বাম কোণে 'হরিমিশ্র' এই কথাটি লিখিত আছে, কিন্তু ইহার কালী ও অক্ষর মূল পুঁথির কালী ও অক্ষর হইতে বিভিন্ন—সুতরাং ইহার উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। যাঁহারা পুরাতন পুঁথির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, এই প্রকার গ্রন্থের নামোল্লেখের প্রথা অতি আধুনিক কালের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পরে সম্ভবতঃ ইহাকে হরিমিশ্রের কারিকা মনে করিয়া অথবা ঐ নামে ইহাকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যেই যে কেহ ঐ শব্দটি লিখিয়া রাখিয়াছেন এই অনুমানই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান সুবোধ একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ৺বসু মহাশয় তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ও বিশ্বকোষে হরিমিশ্রের কারিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"কিন্তু সাগ্নিমহাত্যাপি বিপ্রাস্তৈর্বিকলা সভা।"

আলোচ্য পুঁথিখানিতে এই শ্লোক আছে কিন্তু ইহার 'ত্যাপি' অংশটি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কালী দিয়া এই শব্দাংশটি কাটা হইয়াছে তাহা মূল পুঁথিতে ব্যবহৃত কালী হইতে ভিন্ন; কিন্তু 'হরিমিশ্র' শব্দটি যে কালীতে লিখিত হইয়াছে তাহার অনুরূপ। এই পুঁথিখানিই যে ৺বসু মহাশয় হরিমিশ্রকারিকারূপে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ। ইহা হইতে আরও অনুমিত হয় যে, এই পুঁথিখানি যখন ৺বসু মহাশয়ের হস্তগত হয় তখন 'হরিমিশ্র' এই নামটি পুঁথিতে ছিল না। পরবর্ত্তী কালে পুঁথিখানি সংশোধিত হইয়াছে ও ঐ নামটি ইহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বসু মহাশয় এখন পরলোকগত ও যুক্তি-তর্কের অতীত। চূড়ান্ত প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য করা সমীচীন নহে।—অসম্ভব নহে যে কোন কারণে তিনি এই খণ্ডিত পুঁথিখানিকে হরিমিশ্রের কারিকা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহার প্রতি পাতার বাম কোণে 'হরিমিশ্র' শব্দটি যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিশ্বাসের মূলে কি যুক্তি-প্রমাণ ছিল তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পুঁথিখানি সাধারণের গোচরীভূত না করায় স্বতঃই সন্দেহ জন্মে যে, তাঁহার যুক্তিপ্রমাণের মূল বিশেষ দৃঢ় ছিল না। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মত ও বিশ্বাস যাহাই থাকুক একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আলোচ্য পুঁথিখানিকে "হরিমিশ্রের কারিকা" বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং তথাকথিত হরিমিশ্রের কারিকার উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সমুদয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক আলোচনায় 'হরিমিশ্রের কারিকা' হইতে উদ্ধৃত কোন শ্লোক প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থখানিকে "সর্ব্বপ্রাচীন ও মৌলিক"রূপে গ্রহণ করিয়া যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু পাঠক মাত্রেই তাহা বিচার করিবেন।

শ্বেত ময়ূর

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় একরাশ নূতন কাপড়ের বাণ্ডিল, একবাক্স সাবান, পুরা এক পাউণ্ড চা এবং আরও কতকগুলি জিনিস লইয়া অশোক বাড়ী ফিরিতেছিল। সমস্ত দিন অফিসের খাটুনির পর মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের কাপড়ের দোকানটায় বসিয়া প্রায় একঘণ্টা চীৎকার করিবার পর এখন সে রীতিমত অবসন্ন বোধ করিতেছিল। তবুও আজ তাহার পায়ের গতি অসম্ভব দ্রুত এবং মুখচোখের ক্লান্তির রেখাগুলিও কিছু অপরিস্ফুট।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া অশোক কড়া নাড়িল। কিন্তু কড়া নড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। কারণ খণ্ড-বিখণ্ড এই ভাড়াটে বাড়ীর যে অংশটায় তাহার বাস সেটা অনেকখানি ভিতরের দিকে। সেখান হইতে এতদূরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বিভার বেশ একটু সময় লাগে। কড়া যখন নড়িয়া ওঠে তখন হয় ত সে তরকারিতে মশলার ভাগ লইয়া উৎকলদেশীয় নিরীহ জীবটির সহিত বকাবকি করিতেছে—কিম্বা ছোট ছেলেটিকে কোলে এবং বড়টিকে পাশে বসাইয়া পান সাজিতে বসিয়াছে। এই সব কাজ সারিয়া দরজা পর্য্যন্ত আসিতে পাঁচ-সাত মিনিট পর্য্যন্ত দেরী হইয়া যাওয়া মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নয়। কোন কোন দিন ছোট ছেলেটা হয় ত কোল হইতে নামিতেই চাহে না, কাঁদিয়া এবং চীৎকার করিয়া বাড়ীর অন্যান্য অংশের বাসিন্দাদের পর্য্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তোলে। সেদিন বিভা আসিতেই পারে না। উপর হইতে সাধ্যসাধনা করিয়া পুরী জিলার অধিবাসীটিকে দরজা খুলিতে পাঠাইয়া দেয়। পাচক ঠাকুরটির বয়স হইয়াছে; তারপর আফিমের চর্চ্চাও আছে একটু, নড়াচড়া করিতে হইলে সে রাগিয়া খুন হয়। বিড় বিড় করিতে করিতে কোন রকমে দরজাটা খুলিয়া দিয়া সে রান্নাঘরে ফিরিয়া আসে এবং পিঁড়িটার উপর বসিয়া পড়িয়া আবার ঝিমাইবার চেষ্টা করে।

সেদিন কিন্তু বিভাই দরজা খুলিয়া দিল। অশোক হাতের কাপড়ের বাণ্ডিলটা বিভার হাতে দিয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর বিভার খিলদেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া আসিল উপরে।

বিভা যখন উপরে পৌছিল অশোক তখন হাতের বাকী জিনিষগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া জামা খুলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

হাতপাখার হাওয়া করিতে করিতে বিভা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সব জিনিষপত্র কিনে আনলে যে?

অশোক বলিল, হঠাৎ অনেকগুলা টাকা পাওয়া গেল, তাই।

বিভা খুসী হইল কি না বোঝা গেল না।

অশোক এবার নিজেই ব্যাপারটা সবিস্তার বর্ণনা করিল। যুদ্ধের বাজারে কোম্পানি এবছর অনেক টাকা লাভ করিয়াছে—আর সেই লাভের ভগ্নাংশ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের খুসী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাদা কথায় তাহারা 'বোনাস' পাইয়াছে।

সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

একবছর খাটিয়া দুই মাসের বেতন ফাউ!

বিভা কিন্তু তবুও কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না।

অশোক মনে করিয়াছিল, বিভার চোখ দুইটি আজ অনেকদিন পরে ঠিক আগেকার মত কৌতুক আর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দুটি ছেলেই আজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ বিভাকে কাছে টানিয়া আনিলে আজ হয় ত সে রাগ করিবে না, এমনই কত কথা সে শুইয়া শুইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিভার মুখের দিকে চাহিয়া অশোক হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বিভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, এত জিনিষপত্র না কিনে, দেনার টাকা কিছু শোধ করলে বোধ হয় ভাল হ'ত!

মাঝে এক বছর অশোকের চাকরি ছিল না। সেই সময় বাড়ীভাড়া এবং আরও কতগুলি কারণে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা দেনা হইয়াছে। এই চাকরিটা পাইয়া অশোক মনে করিয়াছিল, দেনাটা অল্পে অল্পে সে শোধ করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু সংসারের নানা ছিদ্রপথ দিয়া অভাবের মূর্ত্তিটা ক্রমেই এমন ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছিল যে, নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইয়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দেনাটা যে আর বেশী দিন ফেলিয়া রাখা সম্ভবও নয়, এ কথাও অশোক মনে মনে ভাল করিয়া জানিত। কিন্তু কি উপায়ে যে সেটার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহা সে ঠিক করিতে পারে নাই।

আজ বিভার সামান্য এই কয়টি কথায়, সন্ধ্যা হইতে তাহার মনের মধ্যে যে মধুর ভাবলোক গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যেন চুরমার হইয়া গেল।

সে বলিল, দেনাটা শোধ করা যে দরকার সে কথা আমিই হয় ত সবচেয়ে বেশী বুঝি। কিন্তু ভদ্রভাবে বাঁচবার পক্ষে যে সব ছোটখাট বিলাসিতার প্রয়োজন আছে, সেগুলিকে অস্বীকার ক'রে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ বিভা, হিতোপদেশের বেত হাতে ক'রে তুমি মাস্টারি করতে এসো না।

বিভা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাহার বাপ মা ঘর দেখিয়া তাহার বিবাহ দেন নাই, বিবাহ দিয়াছিলেন কেবল বর দেখিয়া। অশোক সেই মাত্র এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে তাহার মত সুদর্শন তরুণ সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই বিভার আত্মীয়-স্বজন যদি শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু পৃথিবীতে একদল লোক আসে ভাগ্যের সঙ্গে কেবল লড়াই করিবার জন্য। সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং সমস্ত যোগ্যতা সত্ত্বেও টাকাকড়ির লেন-দেনের বাজারে তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। অশোককেও আমরা সেই দলে ফেলিতে পারি। সে ভাবিতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু তাহার একাংশও করিয়া উঠিতে পারে না। সংসারে দারিদ্র্যের মূর্ত্তিটাকে বিভাও যে ঠিক সহ্য করিতে পারে তাহাও নয়, তবুও সেটার সঙ্গে মানাইয়া চলিবার চেষ্টা তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে করিতে হয়। অশোকের বাপ মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন, সে হিসাবে বিভা তাহার সংসারের একচ্ছত্র অধীশ্বরী। মাঝে রান্নাবান্নার ভারটাও সে নিজের হাতেই তুলিয়া লইয়াছিল; কিন্তু নূতন চাকরিটা পাইয়া অশোক উৎকল-দেশীয় পাচকটিকে বাহাল করিয়াছে। ঠিকা ঝি আসিয়া দুইবেলা অন্য কাজগুলি করিয়া দিয়া যায়।

তাই বাহির হইতে অশোকের এই ছোট সংসারটিকে দেখিলে উহার ভিতরে ঘুণ ধরিয়াছে কি না সেটা বুঝিবার উপায় নাই। বর্ষার সন্ধ্যায় এখনও সে রজনীগন্ধার গুচ্ছ কিনিয়া আনে। শুইবার ঘরে বকের পালকের মত পরিষ্কার বিছানার পাশেই ছোট টেবিলের উপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধাগুলি বর্ষারাত্রিকে বিহ্বল করিয়া তোলে। গায়ে ঘাম অশোক সহ্য করিতে পারে না। তাই ফ্যানও একটা রাখিতে হইয়াছে।

ছেলে দুইটির অসম্ভব দৌরাত্ম্যে অশোকের মাঝে মাঝে মনে হয় এ সব ফেলিয়া শীঘ্রই একদিন সে কোথাও পালাইয়া যাইবে। ছেলে দুইটিকে সে যে ভালবাসে না, এমন কথা বলা চলে না। হাতে পয়সা থাকিলে তাহাদের সম্ভব অসম্ভব সকল রকম আবদারই সে মিটাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সাধারণত তাহার মনটা সর্ব্বদা নিজেকেই কেন্দ্র করিয়া ঘোরে বলিয়া এত নৈকট্যের মাঝখানেও সে যেন নির্লিপ্ত। রবিবারের বিকালে ফরসা কাপড় জামা পরিয়া যখন সে ক্লাবে ব্রীজ খেলিতে যায়, তখন ছোট ছেলেটা কোলে উঠিবার বায়না ধরিলে সে তাহাকে প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে বুকে তুলিয়া লইতে পারে না। বরং একটু রাগিয়া যায়। অশোকের এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়াটা সহ্য করিতে হয় বিভাকে। অশোক তাহাও জানে। সেই জন্যই কতবার একটা ছোকরা চাকর রাখিবার জন্য সে বিভাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছে।

একটা চাকর থাকিলে বিভা তবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারিবে। কিন্তু বিভা রাজী হয় নাই।

"পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, দুটি মাত্র ছেলে; তাদের জন্যে ঝি, চাকর, বামুন···এতগুলো লোকের দরকার কি ?"

একুশ বছর বয়সেই বিভা পুরাদস্তুর গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে !

সব কথাই যে বিভা ভালর জন্য বলে এটুকু বুঝিবার মত বয়স এবং বুদ্ধি অশোকের হইয়াছে। কিন্তু তাহার সাংসারিক অস্বচ্ছলতাকে কেহ কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতেছে, এই ভাবটা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকেই তাহাকে দেশের বাড়ীতে বউছেলেকে

রাখিয়া আসিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কলিকাতা হইতে তাহাদের দেশ খুব বেশী দূরে নয়, মাইল চল্লিশের মধ্যেই। কত লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। সপ্তাহান্তিক টিকিটের কৃপায় কত লোক শনিবার বাড়ী গিয়া প্রফুল্ল মনে সোমবার ঝিমাইতে ঝিমাইতে অফিসে ফিরিয়া আসে। ইহার যে-কোন একটা উপায় অবলম্বন করা অশোকের পক্ষে সকল দিক দিয়া ভাল। সংসার বাড়িতেছে। তাহার আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের জন্য সময়ের চাকা থামিয়া যায় নাই। সংসার আরও বাড়িবে, আজ যাহারা দুরন্তপনায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহারা একদিন বড় হইবে ; স্কুলে যাইবে, কলেজে যাইবে।

ভবিষ্যতের সমস্ত দিগন্তটাই অশোক চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পায় ; সেখানে ছায়া নাই, বিশ্রামের অবসর নাই। জীবনের সঙ্গে শুধু উদয়াস্ত ক্ষমাহীন সংগ্রাম।

এই ছবিটা চোখে পড়িলেই অশোক যেন ক্ষেপিয়া ওঠে। না, মাথা সে কিছুতেই নীচু করিবে না। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই পীঠের শিরদাঁড়া একদিন হয় ত বাঁকিয়া যাইবে, তবু পথের ধারে বসিয়া পড়িয়া ভাগ্যদেবতার পায়ের লাথি সে খাইবে না।

এই বিরাট ও বিচিত্র শহর যেন তাহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নয় বছর বয়সে যেদিন সে প্রথম হাওড়ার পুল পার হইতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিল, সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ইহার বিস্ময়ের শেষ খুঁজিয়া পাইল না। এই বিরাট নগর প্রতিদিন দিনে ও রাত্রিতে তার মনে মনে যে মহাকাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছে, চটকল অফিসের লেজার বুকে কিম্বা তাহার সংসার খরচের হিসাবে উহার কোন পরিচয় নাই।

অফিস হইতে ফিরিবার সময় এখনও কতদিন সে অকারণে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ; ইচ্ছা করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেরী করে। বাড়ীতে বিভা যে ততক্ষণ ছেলে দুইটির আবদার ও উপদ্রবে অস্থির হইয়া পড়িতেছে, একথা তাহার মনে থাকে না।

ডবল ডেকার বাসের উপরে চড়িয়া চৌরঙ্গী পার হইবার সময় মনে মনে সে যেন নিউ-ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ এভিনিউয়ে চলিয়া যায়। আর্মি এণ্ড নেভি হইতে সুরু করিয়া এধারের মোড় পর্য্যন্ত একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী, নূতন সৌরজগত। যেখানে শুধু সমারোহ, শুধু বর্ণচ্ছটা। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ক্রিশমাস সেল, গ্র্যাণ্ড রিডাক্‌শান সেল এবং আরও কত রকম সেল সুরু হইয়া গেছে। ফার্পোর সামনে শ্রেণীবদ্ধ ট্যাক্সির ভিড়—পন্টিয়াক হইতে মার্সেডিজ বেঞ্জ পর্য্যন্ত ! নিয়নসাইনের সরু সরু রেখাগুলিকে তাহার প্যারিস-বাসিনী তরুণীদের পেন্সিলে আঁকা ভুরু বলিয়া ভুল হয়। কার্জন পার্কটা যেন ট্রাফালগার স্কোয়ার, কিম্বা প্যালে স্থ কনকর্ড। অশোক মনে মনে হাওড়া স্টেশনের নাম দিয়াছে —গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাস ! তাহাকে পাগল বলিয়া ভুল হইতে পারে,কিন্তু তাহার মনের ভাবনা চিন্তাগুলা এই ধরণের অসম্ভব যত পথ ধরিয়াই যাতায়াত করে। কলিকাতাকে সে তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে অনুভব করে। কলিকাতা তাহার কাছে শহর নয়, কোন শহরের নাম নয়, অতীত নয়, ইতিহাস নয়, পুরাণ নয়, বিরাট বর্ত্তমান ! ট্রাম-বাস-মোটর-রিক্সা-সাইকেল-মোটর-বাইক আর লরীর ঘড়-ঘড় ঝড়-ঝড় ধ্বনিতে সেই কণ্ঠচঞ্চল বর্ত্তমানের জয়ধ্বনি। চারিদিকে কি প্রচণ্ড স্পীড, উন্মত্ত গতিশীলতা আর সে গতিশীলতা কি সংক্রামক ! কিছুতেই সে ইহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

অনেকদিন সে বাস হইতে নামিয়া পড়িয়া, যে মেয়ে দুইটি হয় ত সিনেমা হইতে বাহির হইয়া হাইহিলের শব্দে ফুটপাত মুখরিত করিয়া যাইতেছে, তাহাদের পিছনে পিছনে নিতান্ত অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

বর্ণোজ্জ্বল এই কলিকাতা হইতে সরিয়া আসিয়া তাহাকে অনেক কষ্টে পাঁচজনের অতি সাধারণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। কত অনুচ্চারিত বেদনায় সমস্ত মনটা তাহার সেই সময় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেকথা সাধারণকে বুঝাইবার নহে।

তিনদিন পরের কথা বলিতেছি।

রবিবারের সকাল। ঘুম ভাঙ্গিয়া অশোক দেখিল আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে। মেঘের সঙ্গে অশোকের মনের কোথায় যেন নিভৃত ঘনিষ্ঠতা আছে। মেঘময় আকাশ দেখিলে তাহার সমস্ত অশান্তি আপনিই স্নিগ্ধ হইয়া আসে।

বিছানা হইতে উঠিয়া অশোক মুখ ধুইয়া আসিল। জলযোগ এবং চা-পানের পালাটা চুকাইয়া ফেলিয়া

কামাইবার সরঞ্জামগুলি লইয়া সে পুরাণ ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসিল। কিন্তু মনটা তাহার এত বেশী খুসী হইয়া উঠিয়াছে যে কামাইবার সৌখীনতা সম্বন্ধেও সে কেমন একটা নিস্পৃহতা বোধ করিতেছে।

এমন সময় স্নান সারিয়া বিভা ঘরে ঢুকিল। এলোচুলের যে অংশটুকু শাড়ীর অবরোধ মানে নাই, সেখানে ছোট্ট একটি গিঁঠ দেওয়া। ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু অশোকের ভাল লাগিল।

বিভা টিপের কৌটা হইতে টিপ লইয়া কপালে পরিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অশোকের মনে হইল, বিভার যৌবনকে ইতিহাসের কোঠায় স্থান দিবার সময় হয় ত এখনও আসে নাই। গোধূলি আসন্ন হইলেও দিনের ম্রিয়মান আলো তখনও তরঙ্গহীন নদীর জলে ঝিকমিক করিতেছে।

অশোক বলিল, সন্ধ্যার পর তোমার সংসারের কাজগুলো একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিও। রাত্রিতে সিনেমায় যাব।

গলার স্বরে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় মিশাইয়া বিভা বলিল, রাত্তিরে ?

অশোক বলিল, রাত্রিতে কলকাতার শহরে বাঘভাল্লুক বা'র হয় না ; ভয় পাবার কি আছে ? ছেলে দুটো যাতে সকাল সকাল ঘুমোয় তার ব্যবস্থা ক'রো।

'ওদের রেখে যেতে হবে ?'

'নিশ্চয়ই হবে। কারণ আমরা কোন পৌরাণিক ছবি দেখতে যাব না, যাব 'নিউ এম্পায়ার' কিম্বা 'লাইট হাউস'-এ।'

'কিন্তু এরা থাকবে কার কাছে ?'

'বুড়ো ঠাকুর পাহারা দেবে।'

ছেলে দুইটি যদি সকাল সকাল ঘুমাইতে না চাহে সেই ভয়ে বিভা সমস্ত দিন তাহাদের ঘুমাইতে দিল না।

সন্ধ্যার পরেই তাহাদের আহারের পর্ব্বটা শেষ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা বোধ হয় বাতাসে কিসের একটা আভাস পাইয়াছে। আটটা বাজিতে চলিল, কিন্তু দুইজনেই বিছানায় শুইয়া দিব্যি প্যাট্‌প্যাট্‌ করিয়া তাকাইয়া আছে।

অশোক স্নানের জন্য নীচে নামিতে নামিতে বলিল, ঠিক পৌনে ন'টায় গাড়ী আসবে—আমি ট্যাক্সি ব'লে রেখেছি। প্রথমে আমরা যাব সোডা-ফাউণ্টেনে ; সেখান থেকে লাইটহাউস। সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরী হওয়া চাই।

বিভার ছোট্ট কপালটিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। ঘড়িতে আটটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকী !

অর্থাৎ তাহার হাতে পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশী সময় নাই। ছেলে দুইটি ঘুমাইয়া পড়িলে সে ইহার আগেই তৈরি হইতে পারে। কিন্তু ···

অশোক উপরে উঠিয়া আসিতে বিভা যেন আরও বিব্রত হইয়া পড়িল। দেখিল, ছেলেরা একবার করিয়া চোখ বুঁজিতেছে, তারপরেই চোখ খুলিয়া তাহাদের রহস্যজনক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

বাপ-মায়ের ভাবভঙ্গী সম্বন্ধে তাহারা আজ রীতিমত সন্দিহান ! তবুও ঘড়িতে এক সময়ে সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে সদর রাস্তায় ট্যাক্সি আসিয়া থামিবার শব্দও বিভা শুনিতে পাইল।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন, মিনিট সাতেক আগে ছেলে দুইটি সত্যিই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই মধ্যে বিভা পাশের ঘরে গিয়া নিজের কেশ ও বেশ যথাসম্ভব পরিপাটি করিয়া লইতেছিল।

অশোক সিল্কের পাঞ্জাবীটায় মাথা গলাইতে গলাইতে বলিল, জুতোটা পায়ে দিতে ভুলো না, খালি পায়ে ওখানে যাওয়া চলবে না।

বিভা ট্রাঙ্কের তলা হইতে গতবারের পূজার জুতাটা বাহির করিয়া পরিয়া লইল।

অনেক দিনের অব্যবহারে জুতোজোড়ার গায়ে একটু আধটু ছাতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু তখন আর পরিষ্কার করিবার সময় নাই।

নিউ ইয়র্ক সোডা ফাউণ্টেনে তিন টাকা চার আনার বিল চুকাইয়া দিবার পর আবার ট্যাক্সিতে চড়িয়া তাহারা যখন 'লাইট হাউস'-এ পৌছিল, তখন 'শো' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

'লাইটহাউস'-এর লবিতে দাঁড়াইয়া বিভার মনে হইল, সে কোন রূপকথার রাজবাড়ীতে পৌছিয়াছে। ডিনার ফেরৎ সায়েব-মেম তখনও আসিয়া টিকিট খরিদ

করিতেছিল। তাহাদের বিচিত্র পোষাক ও এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বিভার বুকের কাঁপুনি অসম্ভব দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে। টিকিট কিনিয়া অশোক বলিল, চলো।

বিভার কপালে আবার ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পাংশু মুখে সে অশোকের পিছনে পিছনে ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

অশোক যদি বিভার পিছনে পিছনে যাইত তাহা হইলে বিভার আলতা-পরা পায়ে মলিন স্যাণ্ডালের অসামঞ্জস্য দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইত।

যে ছবিখানা তাহারা দেখিতে গিয়াছিল, সেটির বিষয়-বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ দ্বীপের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। নাচ, গান, আর প্রণয়-নিবেদনের দৃশ্যে ছবিখানি ভরপুর।

ইণ্টারভ্যালের সময় অশোক বিভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দুইটি চোখ প্রেক্ষাগারের এ প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অশোক মনে মনে লজ্জিত বোধ করিল। বলিল: কেমন দেখ্‌চো।

বিভা জবাব দিতে পারিল না। তাহার চোখ দুইটি যখন আলোয়-উদ্ভাসিত প্রেক্ষাগারের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন মনে মনে সে—ছেলেরা উঠিয়া এতক্ষণে আবার কান্নাকাটি জুড়িয়াছে কি না তাহাই ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এ গল্প তাহার কাছে শুধু ছবি, কাহিনী নয়।

পাত্র-পাত্রীর একটা কথাও সে বুঝিতে পারে নাই।

ছবি শেষ হইবার পর বাহিরে আসিয়া তাহারা যখন আবার ট্যাক্সিতে উঠিল, তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া বর্ষা নামিয়াছে। বৃষ্টি সুরু হইয়াছে অনেক আগেই, ভিতরে বসিয়া তাহারা ইহার কিছুই টের পায় নাই। প্রকাণ্ড সিডানবডি ক্যাডিলাক গাড়ী; চলিবার সময় একটুকু শব্দ হয় না, দেখিতে দেখিতে সেটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

উইণ্ড স্ক্রীনটা সরাইয়া দিয়া বৃষ্টিভেজা মাঠের দিকে চাহিয়া অশোক বলিল, চমৎকার।

আজিকার অতি সাধারণ ছবির গল্পটা তাহার ভাল লাগে নাই। এতক্ষণে সে ক্ষোভটা তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

তাহার স্বপ্নের কলিকাতায় রাত্রি নামিয়াছে, আর সেই রাত্রিকে মুখর ও বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে বৃষ্টি! কি তুমুল কলরোল এই বৃষ্টির! মনে হইতেছে, মাঝ সমুদ্রে 'টাইফুন' উঠিয়াছে; তাহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে কে জানে! কোন রকমে উঠিয়া তাহারা ছোট্ট একটি নৌকায় আশ্রয় লইয়াছে—তাহারা দুইটি প্রাণী। এটা ট্যাক্সি নয়, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, তাহাদের 'ফ্যাণ্টম গণ্ডোলা!' কাচের হাওয়া-জানালাটা খোলা থাকায় ভিতরে বাতাস আসিতেছিল হু হু করিয়া—আর সেই সঙ্গে বৃষ্টির ছাট! বিভা আজ গন্ধ-তেল মাখিয়াছিল। ট্যাক্সির সীটে মাথা হেলাইয়া দিয়া অশোক চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, হাওয়াই দ্বীপ হইতে হাওয়ার বন্যা আসিতেছে আর সেই বাতাসে বহিয়া আসিতেছে আকুল, উগ্র, গন্ধ—পঁয়সেটা, না ইয়্যাসমিক, কিসের তা সে কি করিয়া বলিবে?

গন্ধের কখনও নাম দেওয়া যায়!

বিভা বলিল: ভিজে গেলাম যে! জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও।

অশোক বলিল, না, ওটা খোলা থাকবে। একটু প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস নাও; একটু অসভ্য হও, একটু বর্ব্বর—

বলিতে বলিতে বিভার এলো খোঁপাটা টানিয়া সে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

বিভা বিব্রত হইয়া ড্রাইভারের দিকে চাহিয়া বলিল, লোকটা কি ভাববে বল ত?

অশোক বলিল, ওরা এর চেয়ে অনেক রোম্যাণ্টিক দৃশ্য দেখেচে এই গাড়ীর ভিতরে; ওরা এত সহজে আশ্চর্য্য হবে না।

পীচ্‌-ঢালা রাস্তায় রীতিমত জল জমিয়াছে। আর সেই জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে গ্যাসের আলো।

ট্যাক্সির চাকা চলিয়াছে সেই জলের ভিতর দিয়া, দুই পাশে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে।

অশোক বলিল: এটা কলকাতার রাস্তা নয় বিভা; হয় দুধমতী নদী, কিম্বা মেঘনা কি পদ্মা! বানে আমাদের ঘর ভেসে গেছে। আমরা একটা ভেলায় চড়ে সভ্য সমাজের বাইরে ভেসে চলেছি। রাস্তার ওপারে ওই যে আলোটা দেখচো, ওটা লাইট হাউস!—সিনেমা নয়, সমুদ্রের ধারে জাহাজগুলোকে পথ দেখাবার আলো!

বিভা সস্নেহে অশোকের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, তুমি মস্ত একটা পাগল!

অশোক বলিল: পৃথিবীর লোক বড্ড বেশী হিসেবী হয়ে পড়েচে। সবাইকে অন্তত এক দিনের জন্য পাগল ক'রে দেওয়া দরকার!

অশোকের কল্পনার সেই দুধমতী নদী, মেঘনা বা পদ্মা পার হইয়া ট্যাক্সির চাকা যখন গলির প্রান্তে থামিল, ঘড়িতে তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। সমস্ত পাড়াটা চুপচাপ।

ড্রাইভারের হর্নের ঘন ঘন শব্দে চকিত হইয়া পাচক বনমালী পাণ্ডা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

উপরে ওঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না। নীচেই বনমালীর মুখে খবর পাওয়া গেল যে তাহারা চলিয়া যাইবার আধঘণ্টা পরেই ঘুম হইতে উঠিয়া ছেলেরা যে চীৎকার সুরু করিয়াছে, এখনও তাহার বিরাম নাই। সে দুধ এবং লজেঞ্জ আনিয়া তাহাদের শান্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সবই হইয়াছে ভস্মে ঘি ঢালা!

সরু গলিটা পার হইতেই তাহাদের চীৎকার বিভার কানে গেল। তাড়াতাড়ি সে উপরে উঠিয়া আসিল।

ঘরের মধ্যে সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

ছেলে দুইটি বিছানার উপর বসিয়া এ-উহার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছে আর চীৎকার করিতেছে। বনমালী যে দুধের বাটীটা আনিয়াছিল সেটা তাহারা উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। আর যে সব ছোটখাট অপরাধ করিয়াছে সেগুলি লিখিবার মত নয়।

বিভাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ছোট ছেলেটা আধ আধ জড়িত গলায় অভিযোগ করিল যে দাদা তাহার দুধ খাইয়া ফেলিয়াছে। কেন খাইয়া ফেলিয়াছে সেই প্রশ্নই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার করিতে লাগিল।

বিভা ভাল কাপড়টা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া রাখিবার অবসর পাইল না। সেই অবস্থাতেই ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে অশোক জামাটা খুলিয়া রাখিয়া সিগারেট ধরাইতেছিল। ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালাটা সে খুলিয়া দিয়াছে। বাতাসের ঝাপটায় তিন দিন আগে খরিদ-করা রজনীগন্ধাগুলি বিছানার পাশের টিপয়ের উপর ফুলদানিতে দুলিতেছে।

বৃষ্টি তখনও থামে নাই। ঝমঝম শব্দে এখনও চারিদিক মুখর হইয়া আছে। সেই মুখরতার মধ্যে পাশের ঘরে ছেলে দুইটির অকারণ একঘেয়ে বিলাপ তাহার কানে যাইতেছে না।

বৃষ্টিধ্বনিমুখরিত এই গভীর রাত্রিতে অশোকের মনের মধ্যে অদৃশ্য একটি ভাবমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। পরিচিত পারিপার্শ্বিকতার সহিত সে কোথাও নিজের এতটুকু যোগ খুঁজিয়া পাইতেছে না! এই সময় একবার যাদুঘরের ছাদে কিম্বা ভিক্টোরিয়া হাউসের উপরে দাঁড়াইয়া শহরটাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিলে হইত!

একঘণ্টা পরে।

অশোকের কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে সে পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ঘরের এলোমেলো অপরিচ্ছন্নতা তাহাকে এক মিনিটের মধ্যেই পীড়িত করিয়া তুলিল। তবু সে বিছানার দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হইল।

ভাবিয়াছিল, বিভা এখনও জাগিয়া আছে। তাহাকে এ ঘরে ডাকিয়া আনিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিবে। বিছানার কাছে গিয়া দেখিল বিভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ছেলে দুইটিকে শান্ত করিতে করিতেই এক সময় সে ডুবিয়া গিয়াছে ঘুমের অতল সমুদ্রে। সিনেমায় যে জামা-কাপড় পরিয়া গিয়াছিল সেগুলি খুলিয়া রাখিবার অবসরও তাহার হয় নাই।

ছোট ছেলেটি অপরিপুষ্ট দুই হাতে বিভার গলা জড়াইয়া ঘুমাইতেছে। বিভাকে ডাকিয়া আনিতে গেলে সেও উঠিয়া চীৎকার সুরু করিবে নিশ্চয়।

অশোক চোরের মত আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃষ্টির জল-তরঙ্গ তখনও থামে নাই। কিন্তু ট্যাক্সিতে আসিতে আসিতে যে মেয়েটি তাহার মনের আকাশে চুলের পেখম মেলিয়া ধরিয়াছিল, এ বাড়ীর ঘরে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ম্যাক্সিম গোর্কী

শ্রীঅমল সেন

গোর্কীকে বাঙ্গালা পাঠক-সমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর যা অদ্বিতীয় দান তা হচ্ছে বৈপ্লবিক চরিত্রসৃষ্টি; বিপ্লবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি এবং সঞ্চালিত করা—তারই একটু পরিচয় দেব আমরা।

গোর্কীর স্বলিখিত জীবনী কয়খণ্ড প'ড়ে তাঁর উপন্যাসগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর বিপ্লব-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। তাঁর সব বইয়ের ভিতরেই আমরা তাঁকে খুঁজে পাই। গোর্কী সর্ব্বত্র নিজের বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে দুনিয়ার সর্ব্বহারাদলের অকৃত্রিম ছবি এঁকেছেন। তাই গোর্কীর বই পড়লে শুধু যে গোর্কীর পরিচয় পাই তাই নয়—নিজেদেরও যেন আমরা ভাল ক'রে চিনি। গরীব আমরা, একদিকে দারিদ্র্য, অবিচার, অবজ্ঞা এবং অসাম্য, অন্যদিকে যুক্তি, জ্ঞান, বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের মধ্যে অহর্নিশি রক্ষা ক'রে চলেছি যারা শুধু ভগবান এবং পরকালের মুখ চেয়ে—তারাও যেন নিজের জীবনকে নতুন ক'রে পাঠ করতে শিখি; নতুন মন্ত্র আওড়াতে শিখি; নবীনতম ব্যাখ্যা নিয়ে জীবনের নব-অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চাই। এককথায়, গোর্কী আমাদের অশান্ত ক'রে তোলে।

তাঁর বহু বই। সবগুলির ইংরেজী অনুবাদও বেরিয়েছে কি-না সন্দেহ। তার মধ্য থেকে যে কয়খানিতে এই বিপ্লববাদ পরিপুষ্ট এবং পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে, তারই আলোচনা আমরা করব।

বলা বাহুল্য, 'মা' এই হিসাবে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। "মা" বই-এর দৌলতে ম্যাক্সিম গোর্কী আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সুপরিচিত; গোর্কীর চাইতে বড় সাহিত্যিকের হয় তো অভাব নেই—অভাব, তিনি যেমন ক'রে, যতখানি দরদ দিয়ে, আবেগ দিয়ে, উত্তেজনা দিয়ে মজুরদের এবং চাষীদের কথা বলেছেন, তেমনি ক'রে বলার লোকের। 'মা'কে তাই মজুর-চাষী তথা বিপ্লব আন্দোলনের অগ্নিবেদ বলা চলে।

এই অগ্নিমন্ত্র গোর্কীর জীবনে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছিল নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে।

গোর্কীর রচিত সাহিত্য এবং আত্মকাহিনীতে তাই আমরা এই অগ্নিবেদের ক্রমবিকাশ দেখতে পাই। গোর্কীর 'মা' বিশেষভাবে সব দেশে সমাদৃত হয়েছে।

কিন্তু আমরা সুরু করব তাঁর অন্যান্য বই দিয়ে। কারণ যে অশান্ত বিদ্রোহ 'মায়ের পাতায় পাতায় জাজ্বল্যমান, তারই পূর্ব্বসূচনা এইগুলিতে।

মাল্‌ভা

ভেসিলি এক গরীব চাষী; পাড়াগাঁয়ে তার অভাব কিছুতেই মেটাতে না পেরে দূরে এক বন্দরে চ'লে এসেছে, ভাগ্যান্বেষণে—একা। তার বউ এবং ছেলে বাড়ীতে—সে বন্দরে। ক্ষুধা তাকে স্ত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু নারীসঙ্গও মানুষের কাছে ক্ষুধার মতই অপরিহার্য্য। ভেসিলি বন্দরে এসে নারী মাল্‌ভাকে অবলম্বন করতে বাধ্য হ'ল। মাল্‌ভা সুন্দরী, স্বাধীনা ··· রুশ পতি-দেবতা স্ত্রী-দাসীকে যে যুগযুগান্ত ধ'রে নির্য্যাতন ক'রে এসেছেন, তারই উগ্র প্রতিবাদ।

এমন সময় গ্রাম থেকে জ্যাকফ এসে দেখল পিতার অবস্থা।

অনেক সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি বিশেষণে বিশেষিত ক'রে জীবনকে আমরা সহজ ক'রে নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি।

জীবন মূলত যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামই র'য়ে গেছে।

সুদূর অতীতে হয় তো এমন দিন ছিল, যখন মানুষের সম্মুখে বিস্তৃত ছিল অফুরন্ত ভাণ্ডার আর অফুরন্ত আনন্দ। তাকে খাবার জন্য ভাবতে হ'ত না, ঘুমোবার জন্য মাথা ঘামাতে হ'ত না।

কিন্তু ইতিহাস সেদিনকার সাক্ষ্য দেয় না। খাবার অফুরন্ত থাকলেও তা অনায়াসলভ্য কোন দিনই ছিল না ব'লে চিরকালই তাকে ভাবতে হয়েছে। বিশাল দুনিয়া প'ড়ে থাকতেও তাকে মাথা রাখার একটু ঠাঁইয়ের জন্য পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয়েছে। জীবন তার কাছে সংগ্রামই ছিল—ঠিক এখনকারই মতন।

শুধু কি খাবার নিয়ে, মাটি নিয়ে সংগ্রাম? এর চাইতেও বড় যুদ্ধ মানুষের মনে। প্রবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ।

দেহের মত মনও তার চির-ক্ষুধিত, চির-অশান্ত, চির-বিদ্রোহী।

সকলের সঙ্গে তার সংঘর্ষ এই নিয়ে—সকলের সঙ্গে তার সংগ্রাম। মাল্‌ভা এই সংগ্রাম-চঞ্চল জীবনের ছবি।

দরিদ্র এক কৃষক পাড়াগাঁ ছেড়ে বন্দরে এসেছে, বাধ্য হ'য়ে এসেছে। ভিক্তর হিউগোর সেই জাঁ ভালজাঁ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত পাড়া-গাঁয়ে এই অবস্থা। পরিশ্রম ক'রেও অন্ন জোটে না। অভাব কম, কিন্তু ততটুকু অভাবও মেটে না। 'মাল্‌ভা'র ভেসিলি বলছে ···

আমরা কৃষকেরা বেশী কিছুই চাই না। একখানি কুঁড়ে, এক টুকরো রুটি, আর পরবের দিনে এক-আধ গ্লাস মদ—বাস্, এ হ'লেই আমরা খুশী। কিন্তু এও আমরা পাই না। পেলে বাড়ী-ঘর ছেড়ে কি এখানে এসে প'ড়ে থাকতুম? গাঁয়ে ছিলুম আমি নিজের কর্ত্তা নিজে, সমস্তের সমান ··· কিন্তু এখানে? এখানে আমি চাকর! ···

এই চাকুরী জীবনের মর্ম্মকথা।

রুটির জন্ত তাকে পরের গোলামি ক'রতে হয়। তার স্বাধীনতা চ'লে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে যায় আর একটা অমূল্য বস্তু—তার চরিত্র।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—সব কয়টা তাকে সমানভাবে চালিত ক'রে। তাই সব কয়টার খোরাক তাকে যোগাতে হয়। তার খাদ্য চাই, তার শয্যা চাই—আর চাই নারী। ··· বন্দরে এসে ভেসিলি নারী মালভাকে অবলম্বন করেছে।

ছেলে জ্যাকফ এল পিতার সঙ্গে দেখা করতে। ভেসিলি তখন কুণ্ঠায় চঞ্চল হ'য়ে উঠল—ছি ছি, কি ভাব্‌ছে ছেলে! কিন্তু নিরুপায়! —সে যে সম্পূর্ণ নিরুপায়! এ যে প্রবৃত্তি—একে রোধ করা যায় না। তাই একা পেয়ে ছেলেকে সে বলছে ···

··· কি করব! প্রথম প্রথম তো ঠিকই ছিলুম! কিন্তু পারলুম না শেষ রক্ষা করতে। অভ্যাস কি-না ··· তা ছাড়া ··· মরণকেও এড়ানোর জো নেই, মেয়েমানুষকেও এড়ানোর জো নেই। ···

এই বন্দর-জীবনের করুণ ইতিহাস। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হতভাগ্য গোলামের দল এমনি ক'রে প্রবৃত্তির অদম্য তাড়নায় অমূল্য চরিত্র বিক্রয় করে। নারী এখানে রূপোপজীবিনী।

পাড়া-গাঁয়ে নারী কাজের দিক দিয়ে অপরিহার্য। আর এখানে নারী আনন্দ ··· নারী পাপ ···

মালভা এই বন্দরের নারী। সুন্দরী, তরুণী, চপলা, জীবনের স্রোতে উচ্ছ্বসিত তটিনীর মত। পাড়া-গাঁয়ের নারী-জীবনের কথা ভেবে সে শিউরে ওঠে।

··· নারীর জীবন সেখানে চোখের জল ছাড়া আর কিছুই নয়। ··· পাড়া-গাঁয়ের আমার মন চাক্ কি নাই চাক্, বিয়ে করতেই হবে। আর একবার বিয়ে হ'লেই নারী জন্মদাসী। সুতো কাট, তাঁত বোনো, গোপালন কর, আর সন্তান প্রসব কর। তার নিজের জন্ত বাকি কি রইল?—কিছুই না। শুধু পতি-দেবতার গালি ও প্রহার।

রুশ নরনারীর এই অভিশপ্ত জীবন গোর্কী নিজের চোখে দেখেছেন। একদিকে দারিদ্র্য, আর একদিকে অশিক্ষা—একদিকে অনশন, আর এক-দিকে অত্যাচার—এই ছিল রুশের ভাগ্যলিপি।

গোর্কী ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে মানুষ হয়েছেন। সেখানে দেখেছেন, তাঁর এক মামা মামীকে কিল চড় দিতে দিতেই মেরেছিলেন। দিদিমাও প্রায়ই দাদামশাইয়ের মার খেতেন।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই গোর্কীর বাল্যজীবন সুরু হয়। দরিদ্র রুশ, অবজ্ঞাত রুশ—তাকে তিনি তাই এমন অকৃত্রিমভাবে এবং এমন দরদ দিয়ে আঁকতে পেরেছেন।

মালভা তাই স্বতন্ত্রা—স্বাধীনা। উদ্দাম তার যৌবন, অবাধ তার গতি। আমরা যাকে পাপ ব'লে শিউরে উঠি, তা সে পাপ বলেই মনে করে না।

রুশ বর্ত্তমানে যেভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে, তারই যেন পূর্ব্বাভাষ এই মালভায়।

নরের চাই নারী—নারীর চাই নর।

নর নারীকে পাবেই—নারী নরকে পাবেই।

এই পাওয়া সুন্দর হয়, সহজ হয়, স্বাভাবিক হয়—যদি এই মিলনের মধ্যে কোন বন্ধন না থাকে।

নারী-ঘটিত ব্যাপারকে তারা একটা লজ্জার, একটা অপৌরুষের বস্তু ব'লে জাহির ক'রে প্রেমকে অসহজ ক'রে তুলেছেন। তাদের বিধান না মেনে ভালবাসলে হয় পাপ, হয় ব্যাভিচার। জীবনের সর্ব্বোত্তম আনন্দ তাই আজ সর্ব্ব-গর্হিত অবনতির সাজ প'রে বের হচ্ছে।

··· জীবন ··· জীবন ··· এই-ই সংসারের গতি। যা নিষিদ্ধ, চিরকাল তারই জন্তে মানুষের অতৃপ্ত বুভুক্ষা। জীবনের কথা মাঝে মাঝে ভাবি ··· ভেবে শঙ্কিত হই ···

এই প্রেম-সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সুর ফুটে উঠেছে মাল্‌ভায়।

—মানুষের অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর।

দুনিয়া আজ মানুষের ব্যথার ভারে আতুর। অনাহার, উপবাস, হাহাকার আজ পৃথিবীময়।

ভারতবর্ষও তেমন একটি দেশ। এর উপর চাকচিক্যময়, অভিজাত ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায়, আর বেশীর ভাগ লোক—কোটি কোটি নর-নারী অন্ধকারে পচ্‌ছে। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা সেখানে মানুষকে ক'রে রেখেছে পশুর মত হিংস্র, মানুষ সেখানে ভাল হ'তে চাইলেও ভাল হ'তে পারে না, মন্দ পথে চলতে বাধ্য হয়।

কেন এরা খেতেও পায় না?

কেন?

কেন এ ব্যথা? কেন এ অনাহার? কেন এ হাহাকার? এর জবাবে বলা হয়—একজন চাহিদার বেশী—অনেক বেশী নেয় ব'লেই বাকি যারা, তারা অভাবে ভোগে, অনাহারে মরে।

গোর্কীও তাই বলছেন মাল্‌ভায়—সিন্ধু-শকুন উড়ছে, মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করছে ···

··· কেন ওরা মারামারি করছে? জলে যে মাছ তাতে কি ওদের সকলেরই কুলোয় না? মানুষ—মানুষও তো এমনি চেষ্টা করছে পরস্পর পরস্পরকে জীবন হ'তে বঞ্চিত ক'রতে। ··· কেউ যদি পছন্দসই কিছু যোগাড় ক'রে নেয়, অন্তে তার টুঁটি টিপে তা ছিনিয়ে নেবে। কেন? জীবনে তো প্রত্যেকের জন্তই প্রচুর আছে। আমি যা পেয়েছি, তা কেন অন্তে কেড়ে নেবে? ···

কিন্তু মাল্‌ভা শুধুই বিদ্রোহের সুর নয়। নর-নারীর বিচিত্র মনস্তত্ত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এর পাতায় পাতায়।

সমুদ্রের বর্ণনা এর চমৎকার।

অনেকের মতে মাল্‌ভার এ বর্ণনা বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলন—স্পেনিশ লেখক ইবানেজের "ক্যাবিন" ছাড়া অন্ত কোন বইয়ে এমন বর্ণনা নেই।

বিরাট সমুদ্রের কল্পনা ক'রে গোর্কী মানুষের বিরাট জীবনের ছবি এঁকেছেন মালভায়।

অর্লফ-দম্পতি

মুচি অর্লফ দীনাতিদীন, কিন্তু এ তার বাইরের অবস্থা। তার মন কিন্তু উদ্দীপ্ত। সে সন্তোষের পক্ষপাতী নয়, সে অশান্ত, সে বুভুক্ষু, সে অতৃপ্ত, গ্রাস তার বৃহৎ, দাবী তার ষোল আনা ··· কিন্তু এক পাইও মেলে না। অন্তর্দ্বন্দ্বে পাগল হ'য়ে সে বউকে মারে, মদ খায়, মাতলামি করে, ছটফট করে, তারপর আবার জুতো সেলাইয়ে মন দেয়। ··· নামকা-ওয়াস্তে অতি-মাত্রায় অস্থির হ'য়ে সে খালি নাম করার সুযোগ খুঁজছে। অবশেষে এল সুযোগ। কলেরার এপিডেমিক পড়ল শহরে, হাসপাতাল সরগরম ··· হাসপাতালে গেলে সকলের নজরে পড়বে। সে ··· আনন্দে অর্লফ-দম্পতি সেই ছোঁয়াচে রোগের আড্ডায় কাজ নিল।

গোর্কীর মুচি-জীবনের অভিজ্ঞতা দিনের আলোর মত ফুটে আছে অর্লফ-দম্পতিতে।

মুচি ব'লে যাকে আমরা নিত্য নিয়ত তুচ্ছ ক'রে চ'লে যাই, যাকে মান দিতে চাই না, স্থান দিতে চাই না সমাজে—সেই মুচিও যে মানুষ, ঠিক আমাদেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, আমাদেরই মত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা-প্রবণ মানুষ—গোর্কী তাই দেখিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রী নিয়ে সংসার। সুখের নয়, গভীরতম দুঃখের। কি অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন অপরিসর তাদের বাসগৃহ—একটা ভূ-গহ্বরের মত; মৃত্যুর মত শীতল। এই অন্ধকারে তারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

অনেকের ধারণা—যা এই সেদিন পর্য্যন্তও চ'লে এসেছে—যে অন্ধকারের জীব যারা, তারা অন্ধকারেই অভ্যস্ত; তাদের জীবন-যাত্রা শোচনীয় হ'তে পারে, কিন্তু তারা তাদের ঐ জীবন-যাত্রা নিয়েই সন্তুষ্ট। কোন অভিযোগ তারা করে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রও এই নীচুদের নীচু ভাবতেই শেখায়। পাছে তারাও জাগতে চায়, তারাও উঠতে চায়, তারাও আলোকের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষেপে ওঠে, তাই শাস্ত্র খুব চমৎকার চমৎকার বুলির আমদানি করেছে। কর্ম্মফল—তুমি যেমন কাজ করছ, তেমনি ফল পাচ্ছ। অতএব অবস্থার অসন্তোষ প্রকাশ করলে তোমার শুধু অন্যায়ই হবে না, পাপও হবে। নীচু তারা, তারাও এ মানে, কারণ তারা যে ছোটকাল হ'তে শিখছে—শাস্ত্র অভ্রান্ত, শাস্ত্র অপৌরুষেয়। তারা ত জানে না যে, এ সব শাস্ত্র মানুষের তৈরি—আর সেই সব মানুষেরই তৈরি, যারা ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থের জন্য ইচ্ছা ক'রে মানুষে মানুষে এই অসাম্যের সৃষ্টি করেছে, নীচুকে নীচু রাখার আবশ্যকতাকে শাস্ত্রবাদের মুখোস পরিয়ে বের করেছে।

শাস্ত্র শুধু এখানেই থামেনি!

কর্ম্মফলের উপর আবার পরকাল, জন্মান্তর। রে দুঃখীর দল, তোরা কাঁদিসনি; ছোট এ জীবনটা দুঃখ স্বীকার ক'রেও ধর্ম্মপথে কাটিয়ে দে, তারপর অনন্ত সুখের জীবন তোদের সামনে। তোদের উপর অত্যাচার করছে কেউ? না রে, ও অত্যাচার নয়! আর যদিই বা অত্যাচার হয়, তোরা স'য়েই যা—অত্যাচারের শাস্তি দেবার তোরা কে? শাস্তি পাবে ওরা পরকালে—শাস্তি পাবে ওরা ভগবানের হাতে, শাস্তি পাবে ওরা পরজন্মে!

চমৎকার মানুষ-ভোলাবার মন্ত্র!

কিন্তু ভুল, ভুল মানুষের এ ধারণা,—শাস্ত্রের সত্যকে চেপে রাখার এ স্পর্দ্ধা। অন্ধকার তত দিনই সয়, যত দিন আলোকের সাড়া চোখে না লাগে। তাই অন্ধকারের জগতে আজ এই দুর্নিবার চাঞ্চল্য!

গোর্কীর অর্লফ এই চাঞ্চল্যের পূর্ণমূর্ত্তি। নিজের জীবন-যাত্রা নিয়ে সে সুখী নয়—আবদ্ধ বাষ্পের মত কেবলই সে এই ক্ষুদ্র পরিসর জীবনের মধ্যে ব'সে গর্জ্জাচ্ছে।

··· তারা গান করছে। তাদের আনন্দহীন জীবনের যত-কিছু শূন্যতা, যত-কিছু ধৈর্য্য, সব ঢেলে দিচ্ছে তারা সুরে সুরে। প্রাণের অর্দ্ধজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবস্রোত যেন আজ প্রকাশের পথ পাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। কখনও কখনও গ্রীস্কা গান গায়—ওগো! ভাবতেও পারি না—এই আমার জীবন! কি অভিশপ্ত জীবন! প্রাণে বেদনা, কি সুনিপুণ বেদনা! এই তিক্ত পুঞ্জীভূত ব্যথা, এই দুঃখ-দুর্দ্দশার ভার, সব আজ যেন তার অসহ্য। বউ অতশত বোঝে না। গান শুনে ঠাট্টা ক'রে বলে, এতই যদি বেদনা—তবে মরণ দেখে চেঁচাও কেন কুকুরের মত?

অর্লফ বউ-এর উপর রেগে ওঠে, কিন্তু বোঝাতে পারে না, প্রাণে তার ব্যথার চাইতেও বিপুল যে জিনিষটা আছে—সে জাগতে চায়, উঠতে চায়, মানুষের মত বাঁচতে চায় এবং মরলেও মরতে চায় এমনভাবে যাতে একটা নাম রেখে সে যেতে পারে। পৃথিবীতে অজ্ঞাত অখ্যাত জীবন সে চায় না। মরণের সঙ্গে সঙ্গে ধরার বুক হ'তে মুছে যেতে সে চায় না।

এক কথায়, সে চায় যত্ন—জীবনে এবং মরণে। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যায় না—অথচ চেপে রাখাও অসম্ভব। অর্লফের বুকে এই আকাঙ্ক্ষার অগ্নি-নাচন।

এই বদ্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার সমাহিত জীবন সে চায় না।

গ্রীস্কা বলছে, এ তো জীবন নয়—এ দস্তুরমত নরক। কিসের মন্ত্র যেন মুগ্ধ ক'রে রেখেছে আমাদের। কেন এ জীবন? কিসের জন্য এ জীবন? কাজ আর ক্লান্তি, ক্লান্তি আর কাজ ···

জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না! তাই শেখানো বুলি বলছে।

··· সব ভগবানের বিধান। তাঁরই বিধানে মায়ের পেটে জন্মেছি,—জীবন পেয়েছি। অভিযোগ করা নিরর্থক! ··· তারপর ব্যবসা শিখলুম। ··· কেন শিখলুম? দুনিয়ায় কি মুচির কমতি ছিল যে আমারও মুচির কাজ না শিখলে চলত না? ···

মুচি সে ইচ্ছে ক'রে হয়নি। দুনিয়ায় অন্যান্য সকল দুয়ারে বৃথাই করাঘাত ক'রে সে এই বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছিল। এও বুঝি ভগবানের বিধান! ··· মুচি হলুম। তারপর? লাভ কি হ'ল? ··· এইখানে এই গর্ত্তে ব'সে বুট সেলাই করছি। ··· করতে করতে

মরব। শহরে মড়ক কলেরার ··· আমাদের খুঁজে নেবেই। তারপর সবাই শুধু বলবে, গ্রীগরি অর্লফ ব'লে এক মুচি ছিল, সে কলেরায় মারা গেছে। কি লাভ হবে তাতে? কি লাভ আমার এ বাঁচায়? এ জুতো সেলাই ক'রে বাঁচায়? সেলাই ক'রে এ জীবনপাত করায়?

কোন লাভ নেই, দিনের আলোকের মত সে তা দেখতে পেল। শাস্ত্র তাকে পরকালের কথা কপচিয়ে শান্ত করতে পারল না—মুচির কাজ যে বড় কাজ, এ ছেঁদো যুক্তি তার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারল না।

··· আমরা এখানে প'ড়ে আছি কুকুর-বেরালের মত ডাকাডাকি ক'রে। হিংস্র জানোয়ারের মত ছিঁড়ে খাচ্ছি পরস্পরের মাংস। কেন, কেন এমন হ'ল? ··· এই বুঝি আমার ভাগ্য ···

কিন্তু বনে আগুন লাগে, কাঁচা পাতাও নিঃশেষে পুড়ে যায়। তার এ কাঁচা সান্ত্বনা ভাগ্যের দোহাইও পুড়ে গেল তীব্র অসন্তোষের আগুনে! তার পরই জাগতে লাগল নিরাশা—আলোকের অন্ধকার যেমন বেশী ক'রে জাগে।

সে ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলে।

বউ বলে, একটা ছেলেও যদি থাকত! তাকে নিয়ে জীবনে একটা আনন্দ গ'ড়ে উঠত।

হ'লেই তো পারত!

হবে কি ক'রে? তুমি আছ সব সময়ই কোমরে লাথি মারতে!

রাগের সময় কি অত জায়গা বাছাই ক'রে মারা যায়?—ব'লেই সে বোঝে—কিন্তু এটা আদৌ কৈফিয়তই নয়। বউকে কেন সে মারে? কেন? কেন?

বউয়ের উপর রেগে নয়—নিজের জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হ'য়ে, বিদ্রোহী হ'য়ে।

বউকে বলে, এটা ঠিক, আমি পশু নই! মেরে হাতের সুখ ক'রে নেওয়ার জন্য মারি না। মারি, যখন বুকে সেই কথাটা জাগে, যখন তাকে সামলাবার কোন পথই খুঁজে পাই না।

এ আমার অদৃষ্টলিপি। অনেকেই দেখি হেসেখেলে দিন কাটায়।

কিন্তু আমি পারি না ওরকমভাবে বাঁচতে। একটা চাঞ্চল্য বুকে নিয়ে আমি এসেছি দুনিয়ায় ··· স্বভাবও পেয়েছি তেমনি। ওদের জীবন সরল যষ্টির মত, আমার জীবন যেন স্প্রীং—একটু আঘাতেই নেচে ওঠে। রাস্তা দিয়ে চলি, দু'পাশে সুন্দর সুন্দর জিনিষের মেলা ··· কিন্তু ওর কিছুই আমার নয়। মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। ওরা এর কিছুই চায় না, আমি ভেবে কেঁপে উঠি। এও কি সম্ভব যে, ওদের এসব কোন জিনিষেরই দরকার নেই! কিন্তু আমি? আমি যে সব চাই। হাঁ—যত-কিছু সব চাই। ···

অল্প পেয়ে খুশী নয় অর্লফ। সে সব চায়, কিন্তু ব্যর্থ তার চাওয়া। সবহারা জীবনের বিষমভার তাকে দিনের পর দিন ব'য়ে বেড়াতে হচ্ছে।

কিন্তু আমি এইখানে ব'সে আছি, সকাল থেকে রাত অবধি কাজ ক'রে চলেছি, কিন্তু বৃথা—বৃথা—সব বৃথা। ··· জীবনধারণে কোনও আনন্দ নেই। ··· এই জীবন, এই গর্ত্ত—এ তো কারাগার, এ তো জীবন্ত সমাধি! বউ ভাবল ঘরটা বুঝি অর্লফের পছন্দ হয়নি।

বলল, তা অন্য কোন ঘরে চল না।

অর্লফ ব'লল, ওগো, তা নয়, তা নয়! শুধুই ঘর নয়। আমা[র] সমস্ত জীবনটাই গর্ত্তের মত!

এ ক্রন্দন শুধু একা অর্লফের নয়, গর্ত্তের অধিবাসী নিপীড়িত জনগ[ণের] চিরন্তন আর্ত্তনাদ এ।

কিন্তু বৃথা এ বিলাপ। কেউ এতে কান দেয় না।

যখন দয়া পেলে বেঁচে যায়, তখন দয়া পায় না।

দয়া পায় যখন মরে।

হাসপাতালের চমৎকার বিধি-ব্যবস্থা, অনবদ্য পরিষ্কার পরিচ্ছ[ন্নতা] দেখে অর্লফ এই কথাই বলছে।

··· এইখানে প'ড়ে আছি আমরা! কেউ আমাদের ডেকে জিজ্ঞে[স] করে না, আমরা কেমন আছি? কি করছি? সুখী না দুঃখী? খে[তে] পাই, না ভুগে মরি? কিন্তু যেই মরতে চলেছি, অমনি যত্নের অ[ন্ত] নেই, এমন কিছু নেই যা আমাদের জন্য না করা হয় তখন। ভাল [হ'ত] যদি তারা এসব করত—তাদের দুঃখ দূর করার জন্য যারা জীবিত।

অর্লফ ঠিক করল, এভাবে সে বাঁচবে না। শুধু কাজ আর ক্লা[ন্তি,] ক্লান্তি আর কাজ, আর মরণে ভয় পেয়ে মৃত্যু ··· না, এ সে চায় [না।] সে হাসপাতালে যাবে—কলেরা যেখানে হুঙ্কার করছে, সেখানে এগিয়ে যাবে মরণকে আলিঙ্গন করতে।

অর্লফ গেল, তার বউও গেল। হাসপাতালে রোগীর শুশ্রূ[ষা] করে। মৃত্যুর তাণ্ডবকে উপেক্ষা ক'রে জীবনকে উপভোগ ক'রতে চা[য়।] শূন্যতা বিদূরিত হ'য়ে জীবন যেন কানায় কানায় ভ'রে উঠছে।

একদিন তার বউ বলল, ঐ শুনছ ব্যাণ্ড বাজনা?

অর্লফ স্বপ্নোত্থিতের মত বলল, ব্যাণ্ড! ও কি ব্যাণ্ড শুনা[ও?] আমার বুকে কান দাও, বুঝবে কি এক সঙ্গীত-স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে আ[মার] অন্তরে অন্তরে। ··· এই সঙ্গীতই একমাত্র শোনার উপযোগী।

কোন্ সঙ্গীতের কথা বলছ?

কি সে সঙ্গীত, তা আমি নিজেই জানি না ঠিক ঠিক। বর্ণনার [ভাষা] খুঁজে পাই না, আর বললেও বুঝবে না। আমার আত্মা যেন [অ]জ্যোতির সাগরে ভাসছে। আমি যাত্রা করতে চাই দূরে ··· অনেক দূ[রে।] আমি কাজে লাগাতে চাই আমার সমস্ত শক্তি। আমার বুকের ভিত[রে] টের পাচ্ছি। এক শক্তির সমুদ্র টগবগ ক'রে ফুটছে।

এমনি ক'রে ব'য়ে চলে অর্লফের জীবন-স্রোত। গোর্কী পাশাপাশি [দু'টি] ছবি এঁকেছেন—দীনদরিদ্রের পাশেই কলেরার ছবি। দীনদরিদ্রে[র] জীবন যেন চিরন্তন কলেরা। তাঁর নায়ক অর্লফ তাই বলছেন। [এক] স্থানে ··· মানুষ যদি ভাল ক'রে চোখ খুলে দেখে তবে বুঝতে পা[রে] যে, মানুষের জীবন অনেক সময় কলেরার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক।

গোর্কী লিখেছেন তাঁর সমস্ত দরদ দিয়ে, তাঁর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বি[পুল] অভিজ্ঞতা দিয়ে। মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন নিরা[শার] হাহাকারের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে চলেছে।

মুচি অর্লফের সঙ্গে ফুটে ওঠে মানুষ অর্লফ, আর ফুটে ওঠেন [স্বয়ং] গোর্কী। তাঁর বাল্যজীবনের ব্যথা বেদনা এবং ব্যর্থ অভিলাসরাশি নিয়ে

বনফুল

৭

প্রথম চিঠি লেখার উৎসাহে কিছুদিন পূর্ব্বে হাসি চিন্ময়কে লুকাইয়া যে চিঠিখানি স্বামীকে লিখিয়াছিল তাহা যে মৃন্ময়ের সহকর্ম্মী মিস্টার ঘোষের হাতে পড়িয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিবে তাহা হাসির কল্পনাতীত ছিল। মৃন্ময়ও কল্পনা করে নাই যে হাসি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে। মৃন্ময় জানিত হাসি নিরক্ষর। হাসি যে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোজ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল এ খবর মৃন্ময়ের অজ্ঞাত ছিল। মৃন্ময়কে অবাক করিয়া দিবে বলিয়া হাসি ঘুণাক্ষরেও মৃন্ময়কে কিছু জানায় নাই। মজঃফরপুরের কাজ সারিয়া মৃন্ময় যখন কলিকাতায় চলিয়া আসেন তখন সেখানকার পোস্টাফিসে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে যদি কোন চিঠিপত্র আসে তাহা যেন কলিকাতায় তাঁহার অফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ধারণা ছিল যদি কোন চিঠি আসে তাহা অফিসেরই চিঠি হইবে। সুতরাং বাড়ির ঠিকানা দিয়া আসিবার কল্পনাও তাঁহার মাথায় আসে নাই।

হাসির চিঠি যখন মজঃফরপুর ঘুরিয়া কলিকাতার অফিসে আসিয়া পৌছিল তখনও মৃন্ময় অফিসে ছিলেন না। অফিসে ছিলেন মিস্টার ঘোষ, দৈবক্রমে চিঠিখানা তাঁহারই হাতে পড়িয়া গেল। দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি কোন দাবা-খেলোয়াড় ভাল একটা চাল হঠাৎ আবিষ্কার করিলে যেমন আনন্দিত হইয়া ওঠেন, মিস্টার ঘোষও ঠিক তেমনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এই তো বাজি মাৎ হইয়া গিয়াছে! ঠিক, এই হাতের লেখারই তো তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন! অসঙ্কোচে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কে এই হাসি! যেই হোক, মৃন্ময়বাবুর সহিত বেশ মাথামাখি আছে দেখা যাইতেছে। উত্তেজনায় আনন্দে মিস্টার ঘোষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধ-বিকশিত ক্রূর একটা হাসি নীরবে যেন বলিতে লাগিল —এইবার তো লোকটাকে কবলে পাওয়া গিয়াছে। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে, এতদিন বাছাধন ডুবিয়া ডুবিয়া জলপান করিতেছিলেন। মিস্টার ঘোষ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বাজিমাৎ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, এক ঢিলে দুইটি পক্ষীই নিহত হইয়াছে। সেদিন যে অ্যানার্কিস্ট ছোকরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার নিকট যে চিঠির টুক্‌রাটা পাওয়া গিয়াছে তাহার লেখা আর মৃন্ময়বাবুর এই হাসির লেখা তো হুবহু এক। লিপি-সমস্যার সমাধান এইবার সহজে হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, চাকুরি-জগতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের নিষ্কলঙ্ক চাকুরি-জীবনে বেশ মোটা একটা কলঙ্কও দাগিয়া দেওয়া যাইবে। চিন্ময় নামে যে ছোকরা ধরা পড়িয়াছে শোনা যাইতেছে সে নাকি মৃন্ময়বাবুরই সহোদর ভাই। এ হাসিটা মৃন্ময়ের কে হয়!

পরদিনই খোদ বড়সাহেব মৃন্ময়কে তলব করিলেন। মৃন্ময়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "চিন্ময় তোমার কে হয়?"

"ভাই।"

"হাসি তোমার কে হয়?"

"স্ত্রী।"

"ইহারা যে এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল তুমি জানিতে?"

"না।"

"সত্য কথা বল।"

"সত্য কথাই বলিতেছি।"

সাহেব ক্ষণকাল মৃন্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"আচ্ছা, যাও।"

মৃন্ময়ের শ্বশুর মহাশয় পুলিশের বড় চাকুরে। তাঁহারই খাতিরে এবং চেষ্টায় মৃন্ময় ও হাসি রেহাই পাইয়া গেল অর্থাৎ তাহাদের জেল হইল না। মৃন্ময়ের চাকরিটি কিন্তু গেল। মুকুজ্যে মশাই আসিয়া দেখিলেন—চাকুরিবিহীন মৃন্ময় অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে এবং হাসি তাহাকে এই

বলিয়া প্রবোধ দিতেছে যে, জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি। এই হতভাগা চাকরি গিয়াছে ভালই হইয়াছে। অন্য চাকরি একটা জুটিয়া যাইবেই। এত লোকের জুটিতেছে, মৃন্ময়েরই জুটিবে না?

মুকুজ্যে মশাই কলিকাতায় আসিয়া আর একটি সংবাদ পাইলেন। শিরিষবাবু লিখিতেছেন, "বেহাই মশাই নাকি শঙ্করের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছেন। শুনিতেছি তিনি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন। সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা ভয়ানক সংবাদ। আমি কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে আমিই কোনক্রমে তাহার পড়ার খরচ চালাইব, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। উত্তরে শঙ্কর লিখিয়াছে যে, সে চাকুরির চেষ্টা করিতেছে, আর পড়াশোনা করিবার তাহার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি একবার সুযোগ পান তাহার সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন সে যেন পড়া বন্ধ না করে। আমি যেমন করিয়া হোক তাহার খরচ চালাইব—"

এই দুইটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মুকুজ্যে মশাই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিনের মত খোরাক পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সক্রিয় হইয়া উঠিল।

৮

সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইতেছিল: "একটি শিক্ষিত বাঙালী পাত্রের জন্য বাঙালী পাত্রী চাই। পাত্রী যে-কোন জাতির হইলেই চলিবে, কিন্তু শিক্ষিতা পাত্রী অথবা গানবাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না। অক্ষর-পরিচয়হীনা বয়স্থা পাত্রীই প্রয়োজন। পণ লাগিবে না। পাত্র শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম।... নং পোষ্টবক্সে আবেদন করুন।"

এদেশে অশিক্ষিতা পাত্রীর অভাব নাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও ঘরে ঘরে বিরাজমান, তথাপি এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আশানুরূপ সংখ্যায় আবেদন আসিয়া জুটিল না। "পাত্রী যে-কোন জাতির হইলেই চলিবে" এই কথায় পুরাতন-পন্থীরা এবং "শিক্ষিতা অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না" এই কথায় আধুনিক-পন্থীরা ভড়কাইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিলেন লোকটার মাথায় ছিট অথবা কোন কুমতলব আছে। নিজে শিক্ষিত, জাত মানে না অথচ অক্ষর-পরিচয়হীনা বয়স্থা পাত্রী বিবাহ করিতে চায়—এ আবার কি রকম!

বেলার উপর চটিয়া প্রিয়নাথ মল্লিক অবশেষ বিবাহই করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক করিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিবেন না। কিছুতেই না। উহাদের মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞাপনের ধরণ দেখিয়া শিক্ষিতা অশিক্ষিত কোন মেয়েই জুটিল না। একেবারেই যে জোটে নাই তাহ নয়, কিন্তু যে দুই চারিজন আসিয়াছিলেন তাঁহারা বেলা গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া আর অগ্রসর হওয়া সুবিবেচনা কার্য্য মনে করেন নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই অগ্রস হইতেন তাহা হইলেই যে প্রিয়নাথ বিবাহ করিতেন তাহা সুনিশ্চিত বলা যায় না। তিনি হঠাৎ খেয়ালের বা বিজ্ঞাপনটি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল কি হইবে এমনভাবে বেলার পথ চাহিয়া। সে যদি না-ই আসিতে চা চুলায় যাক, আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইব। সত্যসত্য বিবাহের সুযোগ উপস্থিত হইলে হয় তো তিনি পিছাই যাইতেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া যখন কোন পাত্রীই পাও গেল না তখন ব্যাহত প্রিয়নাথ ক্ষোভে আক্রোশে মনে ম গুমরাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের উত্তাপ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কে করিয়া বেলাকে জব্দ করা যায়। যেমন করিয়া হোক তাহ দর্পটা চূর্ণ করিতে হইবে—ছলে বলে কৌশলে—যে করিয়া হোক।

৯

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ভিজিয়া ভিজিয়াই শঙ্কর হাঁটিয়া চলিয়াছে। তখ রাগে তাহার মাথার শিরাগুলো দপ দপ করিতেছি অপদার্থ লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়! হাঁদা জন্ম ছেলেটাকে টাকার জোরেই রাতারাতি বুদ্ধিমান ক' তুলিবে ভাবিয়াছে! অঙ্ক কিছু তো জানেই না, বুঝ দিলেও বুঝিতে পারে না, তাহাকে ফিজিক্স পড়া হইবে। তা-ও না হয় চেষ্টা করা যাইত কিন্তু উহ অর্থোত্তাপ অত্যন্ত বেশী, শঙ্করের পক্ষে অসহ্য। ঐ ছেলেটার পিছনে শঙ্কর যে এতটা করিয়া সময় নষ্ট করি

তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ছেলের বাবা এমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন যেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে বড় নয়। আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে বলিয়া বসিলেন, "ওহে মাস্টের, আজ আমাদের চণ্ডীবাবু বলছিলেন যে পড়াশোনা তেমন নাকি সুবিধে হচ্ছে না! ফিজিক্সের কি একটা কোশ্চেন করেছিলেন উনি, কিছুই বলতে পারলে না। চণ্ডীবাবু বলছিলেন আর কটা টাকা বেশী দিয়ে কলেজের একজন প্রফেসার রাখলেই ভাল হয়। কি বলেন আপনি, হবে আপনার দ্বারা পড়ানো—টাকার জন্যে আমি ভাবি না, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্‌পান্নো—প্রফেসারই না হয় রাখি একটা—"

শঙ্করের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল—"চণ্ডীবাবু কে?"

"একজন রিটায়ার্ড ইন্‌জিনিয়ার। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনিই কাল জীবুকে ডেকে দু-চারটে কোশ্চেন করলেন, ও তো কিছুই বলতে পারলে না, হাঁ করে রইল।"

শঙ্কর বলিয়া বসিল, "ও হাঁ ক'রেই থাকবে—ওর দ্বারা কিছু হবে না। ওর মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না সহজে—"

"ঢোকাতে জানলেই ঢোকে। জীবু বলছিল আপনি নাকি কেবল অঙ্কই কষান, ফিজিক্স কিছুই পড়ান না।"

"অঙ্ক না জানলে ফিজিক্স পড়া যায় না।"

এই কথা শুনিয়া গড়গড়ায় একটা টান দিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে এমন টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন যেন শঙ্কর হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব কিছু একটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

"দেখুন, কারো রুটি আমি সহজে মারতে চাই না, কিন্তু মন দিয়ে একটু পড়াবেন টড়াবেন—"

"আমি আর কাল থেকে আসব না, আপনি কলেজের প্রফেসারকেই বাহাল করুন।"

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল—ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন, "মাইনেটা তা হ'লে চুকিয়ে দি দাঁড়ান। ক'দিন কাজ করেছেন আপনি?"

"আমার ঠিক মনে নেই।"

"দাঁড়ান, আমার টোকা আছে।"

কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি আজ নিয়ে একুশ দিন কাজ করেছেন, মাসিক চল্লিশ টাকা হিসেবে আপনার আটাশ টাকা পাওনা—এই নিন। গুপ্ত মশায়কে বলবেন যে আমি আপনাকে ছাড়াইনি, আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন। আমার ছেলে ওই কলেজেই পড়ে, গুপ্ত মশায়ের কথায় প্রিন্সিপাল ওঠেন বসেন শুনেছি, তাঁকে আমি চটাতে চাই না। আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন এই কথাটা দয়া করে' জানিয়ে দেবেন তাঁকে।"

"আচ্ছা।"

হন হন করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল এইবার কি করিবে। মাত্র এই কটি টাকা, কলিকাতা শহরে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। যে মেসে সে উঠিয়াছে তাহার চার্জ মিটাইতেই তো কুড়িটা টাকা লাগিবে। নূতন কাজের সন্ধান করিলেই কি মিলিবে? তাহার উপর কয়দিন হইতে যে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে কোথাও বাহির হওয়াই মুশ্‌কিল। সমস্ত আকাশে চাপ চাপ মেঘ, দিবারাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল—আকাশ নির্ম্মেঘ হইলেই বা সে কি করিত, বৃষ্টির দোহাই দিয়া তবু কয়েকটা দিন অকর্ম্মণ্যতাটাকে সহ্য করা যাইতেছে। আকাশ একদিন না একদিন নির্ম্মেঘ হইবেই কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান কি তাহা হইলেই হইয়া যাইবে!

"শঙ্করবাবু নাকি!"

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, বেলা মল্লিক। অবাক হইয়া গেল। মাথায় ছাতা, পরনে ঘন নীল রঙের শাড়ি, বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হাই হীল জুতা, গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সমস্ত অবয়বে এমন একটা আভিজাত্যমণ্ডিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্কর চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা মল্লিকই পুনরায় কথা বলিলেন, "কোথায় চলেছেন?"

"মেসে।"

"আজকাল মেসে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল আপনি হস্টেলে থাকেন।"

"আপনি কিছুই শোনেন নি তা হ'লে?"

"না। শোনবার মত কিছু আছে নাকি?"

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, "শোনবার কিম্বা শোনাবার মত কিছু অবশ্য নয়—"

"ভনিতা ছাড়ুন, ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার কিছুই নয়, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উদরান্নের জন্য কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি—"

"পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ ?"

"খরচ জুটলো না।"

"তার মানে ?"

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া বলিল, "তার মানে ওই।"

"টাকার অভাবে আপনাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হ'ল একথা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আপনি যে গরীবের ছেলে নন, তা আমি জানি।"

"বাবা বড়লোক তো আমার কি !"

বেলা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন! তাহার পর বলিলেন, "আপনার এখন সময় আছে কি ?"

"প্রচুর, কেন ?"

"তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় ?"

"আমার বাসায়।"

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "কেন বলুন তো ?

"এমনি একটু গল্পসল্প করা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়ে গেছি।"

"চলুন।"

১০

ভন্টুর বৌদিদি বসিয়া বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। রবিবার, আপিসের তাড়া নাই। ভন্টু অদূরে একটি মোড়ার উপর বসিয়া নাকে, কানে, নাভি-বিবরে, পায়ের আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে তৈল-নিষেক করিয়া অতিশয় পরিপাটিরূপে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিল। এই একদিনে ভন্টু সাত দিনের মত তেল মাখিয়া লয়। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন তেল মাখিবার অবসর থাকে না। কোন ক্রমে মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া এবং নাকে-মুখে যাহোক কিছু গুঁজিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আপিসে ছুটিতে হয়। এই রবিবার দিনই বেচারা প্রাণ ভরিয়া স্নানাহার করে। বৌদিদিও রবিবার দিন আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া থাকেন।

ভন্টু সশব্দে নাসা-রন্ধ্রে খানিকটা তেল টানিয়া লইয়া বলিল, "বাকু কি ইটিং আপিস খুলেছেন ?"

"তোমার আসবার আগেই বাবা খেয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা ঠাকুর পো, তুমি ক'রছ কি, একেবারে আচার হয়ে গেলে যে—"

ভন্টু কিছু না বলিয়া আবার খানিকটা তৈল নাসারন্ধ্রে সশব্দে টানিয়া লইল।

বৌদিদি বলিলেন, "ওই জন্যেই তো জামাকাপড় তেল চিটচিটে হয়ে যায়। সাবান দিলেও পরিষ্কার হতে চায় না।"

"অয়েলিশ অ্যাফেয়ারে বড় সুখ !"

ভন্টু বাম তালুতে খানিকটা তৈল ঢালিয়া লইয়া গর্দ্দানায় ঘসিতে লাগিল।

বৌদিদি এক নজর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন ও বলিলেন, "তোমার আর কি, তোমাকে তো সাবান কাচতে হয় না, যাকে কাচতে হয় সে-ই বোঝে—"

ভন্টু গর্দ্দানায় তেল মালিশ করিতে করিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে বলিল "বড় সুখ—"

বৌদিদি আর কিছু না বলিয়া বড়ি দিতে লাগিলেন।

দুই-এক মিনিট নীরবতার পর ভন্টু বলিল, "আজ কি কি রান্না করেছ বৌদি ?"

"আলুর দম, পটল ভাজা, মাছের ঝাল, মাছের অম্বল, মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল—"

"বাকুকে ওই সমস্ত খেতে দিয়েছ না কি ?"

"তা দিয়েছি বই কি।"

"ধীরেন ডাক্তার বলছিল ওঁকে এখন ওসব গুরুপাক জিনিস খেতে না দেওয়াই ভাল। চোখের কোল ফুলেছে, কিডনী খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই—"

"ঘরে ভালমন্দ রান্না হলে ওঁকে না দিয়ে কি পারবার জো আছে—"

একটু থামিয়া বৌদিদি বলিলেন, "এমনিতেই তো পান থেকে চুণ খসলে তুলকালাম কাণ্ড। সেদিন রাত্রে পরোটায় সামান্য একটু ময়ান কম হয়েছিল, বললেন "এ পরোটা না পরেন্‌ঠা।"

ভনটুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আজকাল বাকু আর সে রকম করেন না, না বৌদি ?"

"কি রকম ?"

"রাগ হলে 'ক্ষুধা নেই' বলে মশারি টশারি ফেলে তার ভেতর বসে শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়তে সুরু করে দিতেন সেই যে—"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "না, অনেকদিন তো সেরকম করেন নি—"

ভনটু বাকুর ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বাকু স্লিপিং আপিস খুলেছেন বোধ হয়। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন।"

ভনটু উঠিয়া দাঁড়াইল। পেটে ও পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে বলিল, "আসল ব্যাপারের কতদূর কি সেট্‌ল্ করলে ? বাকুর কাছে পেড়েছিলে কথাটা ?"

"না, নিবারণবাবুর টাকা তুমি ফেরত দাও।"

"কেন, দারজি মেয়েটি তো মন্দ নয়। চমৎকার শেলাই ফোঁড়াই জানে—"

"রং কি রকম ?"

"কালো, কিন্তু কুৎসিত নয়। অনেকটা কচি নিমপাতার মতো, একটু লালচে আভা আছে।"

বৌদিদি হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "রঙের জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না, আমার রঙই বা কি এমন ফরসা; কিন্তু যে বাড়িতে অমন কেলেঙ্কারি ঘটেছে সে বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না টাকার জন্যে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।"

"টাকা তো গভীর গাড্ডায়—"

"গাড্ডায় মানে ?"

"করালীচরণকে দিয়ে এসেছি।"

"তোমাকে মানা করলুম, তবু তুমি দিয়ে এলে! ওকে দুদিন পরে দিলেই তো চলত। এইবার তো তোমার দাদা এসে কাজে জয়েন করবেন, দুজনে মিলে কিছুদিন পরেই না হয় শোধ করে দিতে টাকাটা—"

"কেতুরাজ করালীচরণকে তুমি চেনো না, তাই কলায়ের ডালের বড়ি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো বলতে পারলে। চিনলে সটান ঢোঁক গিলে যেতে. ও-কথা আর উচ্চারণ করতে না।"

দুই বগলে তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভনটু বলিল, "চাম লদ্ করালী দ্রাবিড়ে লদ্‌কা-লদ্‌কি করতে যাচ্ছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য!"

"তা হলে অন্য কোথাও থেকে টাকা জোগাড় ক'রে নিবারণবাবুকে দিয়ে দাও। ও বাড়ির মেয়ে ঘরে আনা চলবে না।"

পাশের ঘর হইতে গদাম্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

বৌদিদি ভনটুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কেউ ঘুমোয় নি, সব মটকা মেরে পড়ে আছে তোমার ভয়ে।"

ভনটু তেল মাখিতে মাখিতে আগাইয়া গেল ও জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল একটা পাশ বালিশ মাটিতে পড়িয়াছে। ছেলেরা সকলে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, সকলেরই চোখ মিটমিট করিতেছে।

"এই ফনতি, বালিশ ফেললে কে ?"

ফনতি ঘাড় ফিরাইয়া নাকি সুরে বলিল, "দাদা আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে খালি।"

"শনটু, বেত না খেলে পিঠ সুড়সুড় করছে, নয় ?"

শনটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিল না, চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

"পাশ বালিশটা তুলে চুপ ক'রে শুয়ে থাক সব। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনেছি তো পিঠের চাম তুলে ফেলব আমি সকলের—"

ফনতি পাশ বালিশটা তুলিয়া লইল এবং সকলে আর একবার নড়িয়া চড়িয়া শুইল।

বৌদিদি আবার তাগাদা দিলেন।

"তুমি এবার চান কর, আর কত বেলা করবে, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—"

"তুমি ভাত বাড় না, আমার চান করতে কতক্ষণ যাবে!"

"তোমাকে যেন চিনি না আমি। দাঁত মাজতেই তো একযুগ যাবে এখন—"

ভনটু মুখ বিকৃত করিয়া বৌদিদির মুখের পানে চাহিল।

আহারাদির পর ভনটু ছোট একটি হাত আয়না এবং ছোট একটি কাঁচি লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া গুম্ফসংস্কার

করিতেছিল। বৌদিদিও আহার সমাপন করিয়া ছেলেদের পাশেই একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তন্দ্রার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—স্বামী আসিয়াছেন, শরীর বেশ সারিয়া গিয়াছে, আর জ্বর হয় না, মুখের সে রুগ্ন ভাব আর নাই, গাল চিবুক বেশ ভারি হইয়াছে।

একটা মোটরের হর্নের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বাড়ির সামনে একটা মোটর আসিয়া থামিয়াছে। ভনটু আয়না ও কাঁচি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া সদর দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল কাহার মোটর তাহার বাসার সামনে আসিয়া থামিল। দরজা খুলিয়া ভনটু বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার আপিসের বড়বাবু! কেরাণীমহলের যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা স্বয়ং তিনিই আসিয়াছেন। ভনটুর আপিসের বড়বাবু বড়লোক। মোটা মাহিনা পান, তা ছাড়া ধনীর সন্তান। নিজের মোটর আছে। ভনটু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

বড়বাবু মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "ভালই হ'ল, তুমিও এখন বাড়িতে আছ। তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম—"

হঠাৎ বাকুর সহিত বড়বাবু কেন আলাপ করিতে আসিলেন তাহ। বিস্মিত ভনটু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও মুখে সোচ্ছ্বাসে আহ্বান করিল।

"আসুন, আসুন—"

তাহার পর একটু সঙ্কোচভরে বলিল, "বাবা কানে একটু কম শোনেন, একটু জোরে জোরে কথা বলতে হবে কিন্তু—"

"আচ্ছা।"

ভনটু বড়বাবুকে লইয়া বাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু যখন চলিয়া গেলেন তখন ভনটু আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে স্বপ্নাতীত আবুহোসেনী কাণ্ড! বড়বাবু নিজের মেয়ের সহিত ভনটুর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন! বউদিদি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

"এখন স' পাঁচ আনা পয়সা দাও দিকি—"

"কেন?"

"আমি মনে মনে হরির লুট মানসিক করেছিলাম যাতে ওই নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়—"

"পাগল! উইনটার ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল-গভর্ণরকে অগ্রাহ্য করা সোজা নাকি—"

"উইনটার-ক্যাপিটাল কি—"

"দার্জিলিঙ্‌"।

বৌদিদি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, ওখানে তোমার বিয়ে হতেই পারে না!"

"না, না ছি—অমন অসময়ে এককথায় করকরে সাড়ে পাঁচশোটি টাকা গুণে দিলে, তাছাড়া বৃশ্চিকরাশি, মকর লগ্ন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, নিবারণকে এমনভাবে ল্যাডারিং করা কি ঠিক হবে?"

ল্যাডারিং কথাটা ভনটু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিল।

বৌদিদি মানে বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তার মানে?"

"মানে, নিশ্চিন্ত নিবারণ গাছে উঠে মজাসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এখন মইটা সরিয়ে নিলে লোকে বলবে কি—"

"লোকে যা-ই বলুক, ওখানে বিয়ে হবে না। আজই তুমি তাঁকে বলে এসো—বাড়ির কারো মত হচ্ছে না। কারো মত হবেও না—ওকথা শুনলে বাকু, তোমার দাদা, কেউ রাজি হবেন না। সকলের অমতে তুমি বিয়ে করবে নাকি?"

"কিন্তু ফাইভ এণ্ড হাফ্‌ সেঞ্চুরির মহড়া সামলাব কি ক'রে! সেটা ভাবছ না কেন?"

"সে আবার কি?"

"বেশ খাসা আছ তুমি! সাড়ে পাঁচশো টাকাটা তো স'পাঁচ আনার সিন্নি দিলেই উবে যাবে না! আর আমাদের গুষ্টিসুদ্ধকে ছাতু করে ফেললেও পাঁচ টাকা বেরুবে কি-না সন্দেহ। তোমার গয়নাগুলি তো বহু পূর্ব্বেই বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে উপায় কি সেইটে বল, সিন্নি নিয়ে লদকালেই তো চলবে না।"

"পণ হিসেবে বড়বাবু নিশ্চয় কিছু দেবেন, তার থেকেই দিয়ে দিও নিবারণবাবুকে—"

"বড়বাবু কত দেবে তার ঠিক কি। যেরকম গোঁফ আর জুলপি, লোকটার কিছুই বিশ্বাস নেই।"

"বা, নিশ্চয়ই দিতে হবে—বাকুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না—"

"বাকু তোমাকে একহাটে কিনে আর একহাটে বেচে পারে! বাকুকে শেখাবে তুমি!"

বাকুও এই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য ভনটুকে খুঁজিতে ... করিতেছিলেন। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

"কই গো বড় বৌমা, এস না একবার এদিকে। ভন্টুর আপিসের বড়বাবুর প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। চা-ও চড়াও। চা খেতে খেতে বেশ জাঁকিয়ে বিবেচনা করা যাক। এস—"

বৌদিদি ভন্টুর দিকে চাহিয়া বাকুর পিছু পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন এবং তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া হাসি-মুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাকুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল—"বলে লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না—"

বৌদিদি চা চড়াইতে গেলেন।

ভন্টু পিছন হইতে তাঁহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল।

১১

অন্ধকার রাত্রি।

করালীচরণ বক্সীর ঘরে মোমবাতির ম্লান আলোকে অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। বোতলের মুখে গোঁজা যে মোমবাতিটি জ্বলিতেছে তাহারও আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, আর বেশীক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বেশীক্ষণ টিকিবার আর প্রয়োজনও নাই। বক্সী মহাশয়ের গোছানো শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। মোমবাতির স্বল্পালোকে বকসী মহাশয় নিবিষ্টচিত্তে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। সমস্ত মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ, চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দ্রাবিড়ে যাইবার মুখে এ কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল! পত্রের সহিত দলিল গোছের কি একটা কাগজ ছিল। পত্রটি এবং দলিলখানি আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িয়া করালীচরণ সেগুলিকে লম্বা খামের ভিতর পুরিয়া ফেলিলেন। দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়া তারপর যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ভন্টুবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরিলে যে বাঁচা যায়। ভন্টুকে তিনি কিছু মাল এবং টিকিট কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা দুই হইয়া গেল, এখনও ফিরিতেছে না কেন। অধীর করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল দ্বারপ্রান্তে ছায়ামূর্ত্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"কে?"

"আমি!"

ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসিল, মোড়ের সেই পানওয়ালীটা। একমুখ হাসিয়া মিসি-লাগানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া পানওয়ালী বলিল, "জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে, আজ সকাল থেকে দেখছি, কোথাও যাওয়া হবে নাকি ঠাকুরের?"

করালীচরণ কিছু না বলিয়া তাহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন, এই অযাত্রাটা ঠিক যাইবার সময় আসিয়া হাজির হইয়াছে!

"আমি যেখানেই যাই না, তোর তাতে কি! দূর হ তুই এখান থেকে—"

পানওয়ালী কিন্তু নড়িল না, স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। "আচ্ছা আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বল তো ঠাকুর! আমি তো তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কোন দিন করিনি—"

করালীচরণের চোখটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

তিনি গর্জ্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "তুই নড়বি কি-না বল্ ওখান থেকে—"

পানওয়ালী তথাপি নড়িল না।

"আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন তা না বললে আমি যাব না—"

"হারামজাদী ছোটলোক বেশ্যা, তোর মুখদর্শন করলে যে পাপ হয় তা তুই জানিস না? আবার কৈফিয়ৎ তলব করছেন!"

পানওয়ালীর মুখের হাসিটা সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য আর একটু হাসিয়া বলিল, "ওমা, এই জন্তেই এত রাগ! আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা আর কিছু! মুখ দেখলে পাপ হয় আর আমার কাছ থেকে সিগারেট পান নিলে বুঝি কিছু হয় না। ধন্যি শাস্তর তোমাদের!"

"দূর হ বলছি—"

করালীচরণ তাড়া করিয়া গেলেন। পানওয়ালী অন্ধকারে অন্তর্দ্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল। "উঃ বড্ড দেরি করলেন আপনি ভন্টুবাবু, সব জিনিসপত্তর পেয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

ভন্টু দুই বোতল মদ, ছোট একটি কাচের গ্লাস, পাঁচ

টিন সিগারেট, এক ডজন দেশলাই, দুই প্যাকেট মোমবাতি এবং টুকিটাকি আরও নানা রকম জিনিস টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

"টিকিট করেন নি ?"

"নিশ্চয়। এই যে, নিন না—"

ভন্টু ভিতরের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে টিকিট ও বাকি টাকা বাহির করিয়া দিল।

করালীচরণ আলমারির মাথায় দাঁড়কাকের খাঁচাটা দেখাইয়া বলিলেন, "আর ওটার ?"

"ওটার সম্বন্ধে নানা বখেড়া। খাঁচার মাপ জোক চাই, তাছাড়া অনেক খরচ—"

গভীর বিস্ময়ের সহিত করালীচরণ বলিলেন, "খরচ! খরচ বলে কি এতদিনের সঙ্গীটাকে এখানে ফেলে রেখে যাব নাকি! কে খেতে দেবে ওকে ?"

ভন্টু বলিল, "সে ভার না হয় আমি নিচ্ছি; আপনি বিদেশে যাচ্ছেন কোথায় ওই ঝামেলা নিয়ে ঘুরবেন! তার চেয়ে ওকে এখানে রেখে যান, আমিই দেখাশোনা করব বরং—"

"আপনি ঠিক দেখাশোনা করতে পারবেন তো ?"

"ঠিক পারব।"

"দেখুন—"

"বলছি ঠিক পারব ?"

"তা হ'লে গোটা বিশেক টাকা রেখে দিন আপনি। ওকে মাছ মাংস ছাতু দেবেন রোজ। আমও বেশ খায়। দেখবেন যেন কষ্ট না পায়, আপনি ভার নিচ্ছেন বলেই ভরসা ক'রে রেখে যাচ্ছি—"

"টাকার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করব এখন।"

"না, না, টাকাটা রাখুন, টাকাই হচ্ছে পেয়াদা, ওই তাগাদা দেবে আপনাকে। বাই নারায়ণ! বিনা টাকায় কিছু হবার জো আছে আজকাল—"

ভন্টুকে টাকা লইতে হইল।

"এবার চলুন স্টেশনে যাওয়া যাক তা হ'লে। ট্রেনের আর দেরি কত ?"

"ঘণ্টাখানেক আছে আর—"

"মাত্র ঘণ্টাখানেক? চলুন, চলুন আর দেরি নয়, ট্যাক্সি ডাকুন আপনি—"

ভন্টু ট্যাক্সি ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ পুনরায় লম্বা খামটা হইতে চিঠি ও দলিলটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্বগতোক্তি করিলেন—'বাই নারায়ণ' এবং পুনরায় সেগুলি খামে পুরিয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ভন্টু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে পানওয়ালী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভন্টু পানওয়ালীকে চিনিত। বাইক হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, "ভালই হ'ল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!"

"কেন বলুন তো ?"

"বক্সী মশায়ের ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করা যায় তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। উনি আমার ওপরই সব ভার দিয়ে গেলেন। তুমি পারবে দেখাশোনা করতে ?"

"কি করতে হবে বলুন—"

"এই ঝাঁট-পাট দেওয়া আর কি, বক্সী মশায়ের একটা কাগ আছে, সেটাকেও খেতে টেতে দিতে হবে। পারবে তুমি ?"

"পারব!"

"তা হ'লে এই টাকা একটা রাখ, মাছ মাংস ছাতু আম যা দরকার কিনে দিও।"

"টাকার দরকার নেই।"

"বকসী মশায় দিয়ে গেছেন যে—"

"আপনাকে দিয়ে গেছেন, আমাকে তো আর দেন নি! আপনি কেবল একটি উবগার করবেন—"

বিস্মিত ভন্টু বলিল, "কি?"

"ওঁকে জানাবেন না যে ওঁর ঘরের ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া ভন্টু বলিল, "কেন ?"

মিসি-মণ্ডিত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া পানওয়ালী উত্তর দিল, "আমি ওঁর চুচক্ষের বিষ ছিলুম।"

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

পানওয়ালী পুনরায় হাসিয়া বলিল, "দিন, চাবি দিন। ওঁকে জানাবেন না কিন্তু—"

"জানাব কি ক'রে, ওঁর ঠিকানাই জানি না।"

"আচ্ছা, উনি কোথায় গেলেন বলুন তো।"

"দ্রাবিড়ে।"

"সে আবার কোথা! সেখানে কেন?"

"পড়তে।"

"পড়ে পড়েই সারা হ'ল। দিবারাত্রি আর কোন কাজ নেই—"

পানওয়ালী মুচকি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, মানুষে এত পড়ে কেন বলুন তো। যত পড়ে ততই তো মাথা গোলমাল হয়ে যায় দেখছি—"

ভনটু সহসা অনুভব করিল, 'নাই' পাইয়া মাগি বোধ হয় লদকা-লদকিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে।

গম্ভীরভাবে বলিল, "লেখাপড়ার মর্ম্ম সবাই বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি—"

"ইনি খুব বিদ্বান না?"

লদকা-লদকি ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভনটু এ কথার আর জবাব দিল না।

বলিল, "চাবিটা রাখ তা হ'লে। কাগটাকে খেতে টেতে দিও। কাল আবার আসব আমি—"

সে বাইকে সওয়ার হইল।

চাবিটা হাতে করিয়া অন্ধকার গলিতে পানওয়ালী করালীচরণের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে একা দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রে ঘরটা খুলিতে তাহার সাহস হইল না।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

বৎসরের পুঞ্জীভূত ধূলিক্লিন্ন বেদনার দিনে
হে বৈশাখ তুমি এলে বসন্তের অন্তরাগ শেষে—
পরিপূর্ণ রুদ্র সুর ঝঙ্কারিছে মর্ম্মে মনোবীণে
ভয়াল ধূর্জ্জটি তুমি মর্ম্মে এলে মনোহর বেশে।

অফুরন্ত আনন্দের তুমি যেন নব অগ্রদূত
দিগন্ত ভোলানো তব পিঙ্গল সে ধূম্র জটাজাল—
ভুবনের খেলাঘরে হে ভীষণ সুন্দর অদ্ভুত
তোমার চলার ছন্দে নৃত্যরত হ'ল মহাকাল।

মরুভূর দাব-দাহে আজি মোর বিশুষ্ক জীবন
অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গ নিয়া এসো বন্ধু ছন্দে নটরাজ—
প্রেয়সীর স্মিতহাস্যে স'ব মাখি আনন্দ চন্দন
দহনের ব্যর্থতারে নির্ব্বিচারে দেখাইব লাজ।

'সুন্দর ধরণীতল',—আনন্দের এই বার্ত্তা নিয়া—
আমি কবি ধরণীরে জাগাইব প্রাণ সঞ্চারিয়া।

প্রেম

শ্রীগোপাল ভৌমিক

তোমার আমার মাঝে চুম্বক-প্রবাহ—
নিশিদিন চলমান, হে বান্ধবী তাই—
বাহির জগতে নাই হোক্ বা উদ্বাহ—
অন্তর-জগতে তুমি রয়েছ সদাই।

নির্ম্মম এ পৃথিবীর ডাকে, দূর হ'তে
দূরান্তরে অবিরাম স'রে স'রে যাও;
ভাব অচঞ্চল প্রেম নহে কোনমতে,
মানসিক বিবর্ত্তনে বুঝি ভয় পাও।

এক নিষ্ঠ এ প্রেম আমার, মিছে ভয়—
মিছে দ্বিধা ক'র না ক'র না অনুক্ষণ;
আমাদের এই প্রেম মিথ্যা কভু নয়—
ব্যর্থ নয় আণবিক এই আকর্ষণ!

তাই ত নির্ভয়ে তোমা যেতে দেই দূরে—
চুম্বক-আবেশে জানি আসিবেই ঘুরে।

বর্ণ, পণ—না ভবিতব্য ?

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কন্যার বিবাহসমস্যা ক্রমশই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া এবং আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটার সঙ্গে গৃহস্থের কন্যার বিবাহে যে সকল অন্তরায় দেখা দিয়াছিল, তাহার কোনটাই দূর হয় নাই, উপরন্তু কতকগুলি নূতন আপদ আসিয়া জুটিতেছে। বরপণ ছাড়া, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে শিক্ষিতা পাত্রী, নৃত্যগীত প্রচলনের সহিত গীতনৃত্যপটীয়সী পাত্রী এবং সিনেমা প্রচারের সহিত "তারকা"র সন্ধান এবং পশ্চাদ্ধাবন, আমাদের রুচির ক্রমোন্নতির বিকাশ দর্শাইয়া থাকে। কালের গতির সহিত পাত্রীর বিবাহকালের বয়সের হিসাব অনেক ধাপ পার হইয়াছে। এখন আবার স্থানে স্থানে স্বল্পবয়স্কা কন্যা (সর্দ্দা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া) শিক্ষা-প্রাপ্তা অথচ সাধারণ বিদ্যালয় বা কলেজে পড়ে নাই, "লেক" বা সিনেমায় যাওয়ার অভ্যাস নাই, এরূপ পাত্রীর কচিৎ খোঁজ পড়িতেছে !

এই সকলের উপর আরও এক আপদ ব্যাপকভাবে জুটিয়াছে ; গৌরাঙ্গী—মেম, ইহুদী, ইরাণী প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গী মহিলাকে যে পাত্রী বর্ণে হার মানাইতে পারে, তাহার খোঁজই চলিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এক বিচিত্রতা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই এই দাবীর পশ্চাতে আসল লক্ষ্য থাকে পণের পরিমাণ ; অছিলা, রং (সৌন্দর্য্য নয়) মাত্র। কোথাও কোথাও যে কেবল বর্ণের জন্যই বিবাহে সুবিধা হইতেছে না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা খুবই কম।

সম্প্রতি এই বর্ণের ব্যাপারে আমার এক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। একস্থানে পাত্রী দেখিতে আসিলেন পাত্রের পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পাত্রের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু। পাত্রীর প্রতি প্রশ্নের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া পাত্রীর পিতা মনে করিলেন যে পাত্রীকে চাক্ষুষ পছন্দ হইয়াছে, গুণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে পণের যে বিশাল সমুদ্র পড়িয়া আছে, তাহাতে এখনও আলোচনার দাঁড় পড়ে নাই, এই এক দারুণ সমস্যা।

পাত্রী "দেখা" হইল, পাত্রী বাঁচিল। গান বাজনা নৃত্য এবং কলা সমন্বিত আবৃত্তি জানে না বলিয়া তাহার প্রাক্‌টিক্যাল ডিমন্‌ষ্ট্রেশন দিতে হইল না এবং "বাস্তর" ও অবান্তর প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, প্রণাম করিয়া, অতি ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাত্রীর পিতা সসঙ্কোচে পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন দেখলেন ?"

ছোট্ট একটা উত্তর "মন্দ কি" বলিয়া বরকর্ত্তা সারিয়া লইলেন। "বাড়ীতে পরামর্শ ক'রে আপনাকে পরে জানাবো।"

"আর পরে কেন ? আপনি ত বরের বাপ, আপনারও ত একটা মতামত আছে। তা ছাড়া ছেলের দাদা—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে আছেন, আপনাদের কথার ত একটা দাম আছে ? আপনাদের মতামতটা জানিয়ে দিন, কেন আর দুশ্চিন্তায় রাখবেন ? যা বলবার ব'লে ফেলুন, মেয়ের বাপ আমি, নানারকম মতামত শোনার অভ্যাস আমার আছে।"

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

"আমার বড় বৌমা দেখতে ঠিক ইহুদীর মতন।"

"তা হবে" বলিয়া কনের বাপ বোকার মতন মনে করিলেন যে একটী যখন সুন্দরী বধূ হইয়াছে, অপরটী অত সুন্দরী না হইলেও বোধ হয় আপত্তি হইবে না।

"আমায় ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশাতে হবে ত ? তা না হ'লে এ ছেলে পরে আমায় দুষবে।"

"সামান্য ভুল করেছেন, যখন ইহুদীর মেয়ে দরকার, তখন এই পাড়ায় আসা একটু ভুল হয়ে গেছে ; তারা ত এ পাড়ায় বাস করে না।"

"আমার যে রকম দরকার আমি বলেছি, আমার খুব সুন্দরী মেয়ে চাই ; আপনার এ কথা বলবার অধিকার কি আছে ?"

"সে রকম মেয়ে কটা ঘরে আছে ? হয়ত কলকাতার মত শহরে পাঁচ ছ ঘর বিত্তশালী আছে, যারা কিছু চায় না, চায় কেবল রং ; কুল, গোত্র, সামাজিক পরিচয়, শীলতা, শালীনতা, সাংসারিক বিচারবুদ্ধি, এমন কি দেহের গড়ন, শ্রী—কিছুই চায় না, কেবল রং হ'লেই তাদের চলে। তারা একদল রংএর এ্যারিষ্টোক্র্যাট ; আর সব বিষয় বিচার করলে, আমাদের মতন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ, খুব সুবিধা পেলেও তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে নারাজ হবে।"

"অনেক কথাই বলছেন আপনি ; কিন্তু কি করব মশাই, আজকাল এই না হলে চলে না ; সবাই চায় রং, আমার ছেলেদের ত আবার তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আমায় ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করতে হবে।"

"তত দিনে আর এ সকল বালাই থাকবে না। মেয়ে পুরুষে আর বিবাহের ব্যাপার, ধনী বা মধ্যবিত্ত ঘরে থাকবে ব'লে মনে হয় না। অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা ত আছেই, তার ওপর আবার এই বাছাবাছির ফলে পাত্রপাত্রীর বয়স বেড়েই চলেছে ; সকলেই শুকদেব আর সতী হবে—এই আশা ক'রে বসে থাকলে চলবে না। চারিদিকে ভোগের খেলা চলছে ; কন্যার বাপ, মা, ভাই, অন্যান্য বোনের, আত্মীয় কুটুম্ব সকল স্থানেই যৌন জীবনের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, অবাধ মেলামেশার সুযোগ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ; সে ক্ষেত্রে, যুবতী যুবকে সাধু সচ্চরিত্র হ'য়ে ব'সে থাকবে না। আমাদের ছেলেপুলের ছেলেমেয়েদের বিবাহকালে 'কম্পানিয়ন-ম্যারেজ' চালু হ'য়ে যাবে। তখন রংএর বিচার করবার সময় হবে না, যৌবনের তরঙ্গ যার ঘাটে যখন টানবে, তরী সেই ঘাটেই ভেড়াতে হবে।"

"না, না, ও কথা কি বলছেন ? হিন্দুর ঘরে ওসকল ঘটনা চলতেই পারে

না। বেদের আমল থেকে যে আচার চলে আসছে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তাই আজও পালন করছে, এ কি একটা কম কথা? যাই হ'ক, কালের ধর্ম্মে একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়েছে। আপনার মেয়ে ত সকল দিকেই যোগ্য, কিন্তু আরও ফরসা চাই, আমার বাড়ীর তাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন একটু খুঁজলেই আমি সুন্দরী মেয়ে পাব; আরও অনেক পাত্রী দেখেছি যারা আপনার মেয়ের মত মেয়ে নিয়ে অনেক টাকা দেবার জন্য সাধাসাধি করছে; আমি কিন্তু মত করিনি।"

পাত্রীর পিতা বলিলেন "আমি ত ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। মেয়ের রং কটা করবার অনেক উপায় আছে। যখন থিয়েটার বায়োস্কোপে অত "সুন্দরী" ভারতের মত কালামাটিতেও একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, তখন শিশি বোতলে যে রং ভরা আছে তা বেশ বুঝতেই পারি। আপনাকে যে মেয়ে দেখানো হ'ল, এর গায়ে পাউডারের একটু গুঁড়োও পড়েনি, অন্য রং চঙের কথা ছেড়ে দিন। তার ওপর যাতে সকল দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে জিনিসের পরিচয় এখনও দিতে পারি নি। একটা ঘটনা বলি শুনুন—

পাত্রটী ভালভাবে ডাক্তারী পাশ করবার পর, পাত্রের মামা আর দাদা উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন সুন্দরী পাত্রী খুঁজতে। পাত্রী আর পছন্দ হয় না; কায়েতের ঘরের আঠারো থেকে চব্বিশ পর্য্যন্ত যত আইবুড়ো পাত্রী দেখা হ'লো, কোনটাই পছন্দ হয় না। এক ভদ্রলোক দেখলেন পাত্রপক্ষের ঐ "সুন্দরী" খোঁজার পশ্চাতে যেন দৃষ্টি আরও দূরে চলে গেছে। পাত্রদের বাড়ীঘর নেই, অন্তত কলকেতায় নেই। উঠ্‌তি অবস্থা, আভিজাত্য বজায় রাখতে গেলে যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, পাত্রপক্ষের তার অনেক কিছুরই অভাব আছে। তিনি একদিন ব'লে পাঠালেন—তাঁর এক সুন্দরী কন্যা আছে। পাত্র পক্ষ এসে দেখলেন—সুসজ্জিত প্রকাণ্ড এক কামরা, ধনীর ধন যত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, ঘরের মধ্যে তার কোনও ত্রুটি নেই। তারই একপাশে প্রকাণ্ড এক কালো আলমারি—আবলুষের হবে—আবলুষের পালিশ নিয়ে রূপবিস্তার ক'রে ব'সে আছে। পাত্রী এসে অত বড় ঘরের আর কোথাও না ব'সে একেবারে আলমারির সামনে বসলেন। মূল্যবান আভরণমণ্ডিতা কন্যা আলমারির ব্যাকগ্রাউণ্ডে "সুন্দরী" হ'য়ে উঠলেন। তা না হ'লে পাত্রীর রূপ বরপক্ষীয়দের মুখে বেশ প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছিল। বয়স্থা, শিক্ষিতা মহিলা—সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছেড়ে দিতে হ'ল। পাত্রী যখন উঠে যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে উঠে একটী নমস্কার মাত্র ক'রে—তখন পাত্রীর পিতা আলমারির হাতল ধ'রে টান মারলেন। আলমারি খুলে যাবার আগে, জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন দেখলেন?" উত্তর—"মন্দ কি!" আর কথা অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই আলমারি খুলে গেছে; তাতে দেখা গেল সেই আবলুষের আলমারির ভিতর স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে কারেন্সীর নূতন টাকা; তারা এক সঙ্গে ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল। কত হবে?—আন্দাজ করলেন পাত্র পক্ষ, দশ হাজারের কম নয়; আরও কিছু বেশী হ'তে পারে। পাত্রীর পিতা বলতে লাগলেন—ঐ গহনা, এই আলমারি, টাকা, ঘরের বহু আসবাবপত্র নাম ধ'রে ধ'রে ব'লে দিলেন, সুষমার বিবাহের জন্য ক'রে রেখেছেন।—আরও কত কি দেবেন, তারও একটা ফর্দ্দ মুখে মুখে দিলেন; ব'লে দিলেন তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ। বিশ্বাস করবেন না, মশাই—পাত্রীকে পুনরায় ডেকে এনে তখনই আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল। সেই বর এই সেদিন বিলাত থেকে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে এসেছে, কাগজে কাগজে ছবি বেরিয়েছে। সেই ক'নে সঙ্গে ছিলেন, তিনিও বিলাতী খেতাব প্রভৃতি নিয়ে এসেছেন, এখন "ভদ্রসমাজে" তিনি একজন মাতব্বর। কিন্তু সেই মামা হৃদ্‌রোগে মারা প'ড়েছেন শুনেছি। আর বড় ভাই, অতিকষ্টে যিনি সুন্দরী পাত্রী খুঁজে ভাইকে সুখী করতে চেয়েছিলেন, তিনি "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই আছেন। ভাই ভাদ্রবধূ সময় সময়, তাও সময় প্রায়ই হয় না—এক একবার খবর নেন।"

"টাকা নেওয়া হবে নাই বা কেন? আমার মেয়ের বের সময় কেউ ত আমাকে ছাড়ে না। তার ওপর মেয়ের বেতে খরচ করব—আবার ছেলের বেতেও ঘর থেকে খরচ করব! এ সকল রীতি চ'লে এসেছে তাই লোকে ইচ্ছে ক'রেই টাকা দিতে চায়; আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপনি চান বিনা ব্যয়ে একটা কালো মেয়ে গছাতে। তা হয় না, যেমন মেয়ে তার সঙ্গে তেমনিই পণ দিতে হয়। আমার উপযুক্ত ছেলে, লোকে এসে কত ধরপাকড় করছে, আমার যাচাই ক'রে নেবার ক্ষমতা আছে, আমি ছাড়ব কেন?"

"তা হ'লে তাই বলুন যে, টাকা পেলে আপনি যা হ'ক পাত্রী নিতে পারেন। তবে ইহুদী চাই বল্লে টাকা আসবে কোথা থেকে? যার ইহুদীর মত মেয়ে থাকবে সে আপনার ছেলের মত পাত্রে দেবে কেন? তাছাড়া কি জানেন, আগে মানতাম না, এখন দেখছি, জ্যাঠামশায় যা বলতেন ভবিতব্য একটা জিনিষ, যাকে না মেনে চলে না। আপনি 'ইহুদী' খুঁজছেন, ভবিতব্য থাকে ত কাফ্রী এসে জুটতেও পারে। তবে ধরে বসে থাকলে টাকা আসবে বলতে পারি।"

"ভবিতব্য মানতে হয় বটে, তবে আমি কেন চেষ্টা করব না, সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঐ ভবিতব্যের খেয়াল মেটাতে? পণ যা পাওয়া যায়, তা দেখব কন্যার বাপ স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন। পীড়াপীড়ি না করলেই হ'ল।"

"সব ঠিক হয় না। জ্যাঠামশায় যা বলতেন তার একটা দাম আছে; এক মহাতপা ঋষি বহুকাল তপস্যায় রত আছেন। একদিন তাঁর নগ্ন উরুর ওপর শীতলস্পর্শ কোমল একটা ছোট বস্তু পড়ল, তিনি মুদ্রিত নয়নেই সেটা বুঝতে পারলেন। মাথার ওপর গাছে তখন কতগুলো কাক চীৎকার করছে। তিনি মনে করলেন—বহির্জ্জগতের সঙ্গে যখন কোনও সম্পর্ক নেই তখন চোখ না খুলে ঘটনাটাকে উপেক্ষা করবেন। আবার মনে করলেন যদি কোনও জীবই হয়, তাঁর অবহেলায় সেটা হয়ত নষ্ট হ'তে পারে। চোখ খুলে দেখেন—একটী মূষিক শিশু, চক্ষু পর্য্যন্ত তার খোলেনি, মনে হ'ল কাকের মুখ থেকেই পড়েছে। বহু যত্নে সেটী পালন করলেন। কিন্তু যদিও তপযোগে তিনি তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন,

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

তবুও তাঁর সমস্যা হ'ল সেটাকে নিয়ে। ফিরে আসতে বিলম্ব হ'লে তিনি কাতর হ'য়ে পড়তেন, কোথায় কে হয়ত হনন ক'রেছে। তিনি স্থির করলেন তাহাকে বিবাহ দেবেন—সেটী একটী মূষিকী। মনে করলেন তাঁর পালিতা কন্যা, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাঁকেই কন্যা দান করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবকে স্মরণ করলেন। তপঃ প্রভাবে অমিততেজা ঋষির আহ্বান মরিচীমালী টের পেয়েই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে ঋষি সমস্ত বল্লেন এবং কন্যা গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। সূর্য্যদেব বিপদ গণলেন, ভাবলেন এক নেংটী ইঁদুর নিয়ে কি বিপদেই পড়বেন, ঋষিবাক্য অবহেলা করলে এ দিকে শাপগ্রস্ত হ'তে হবে। তিনি যখন বুঝলেন তাঁর বীর্য্যবত্তার জন্য তাঁকে এই বিবাহ করতে হবে, তখন তিনি ঋষিকে বুঝালেন, মেঘ যখন গগন আচ্ছন্ন করেন, তখন তাঁর কোনও তেজই থাকে না, একেবারে ম্লান হ'য়ে পড়তে হয়, দিনের পর দিন অদৃশ্য হ'য়ে থাকতে হয় বহু সময়। ঋষির অত ভাববার সময় নেই। তিনি কথাটা শুনেই সূর্য্যকে ছুটি দিয়ে পর্জ্জন্যদেবকে ডেকে দিতে বললেন। সূর্য্যদেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, পর্জ্জন্যদেব এসে সমস্ত কথা শুনলেন; তাঁর মনের অবস্থা সূর্য্যদেবের চিন্তার সমস্ত স্তরই ধাপে ধাপে পার হ'য়ে গেল। বুদ্ধিমানের মত প্রকাশ করলেন—পবনদেবের শক্তিতে তিনি বিপর্য্যস্ত এবং বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান বলিতে যা বুঝায় তিনি স্বয়ং তা নন; সুতরাং তিনি সকল রকমেই ঐ কন্যার অনুপযুক্ত পাত্র। প্রভঞ্জন এলেন, স্বন্ স্বন্ রবে দিগন্ত কম্পিত ক'রে। সকল বার্ত্তা শুনে, বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'লেন এক ফন্দিতে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর সকল শক্তি ব্যর্থ হয়েছে হিমাচলের কাছে চিরকাল। হিমালয়ের ডাক পড়ল, তিনি সব শুনে ভাবলেন কত কোটী ছুছুন্দর তাঁর দেহে অবস্থান করছেন, আর একটা বাড়লে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নেই। কিন্তু কে বাবা, ঋষির ইঁদুরের ঝামেলা নিতে যায়। বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বাইরের খোলসখানিমাত্র সম্বল ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ভিতরটা ফোঁপরা ক'রে ফেলেছে, তাঁর দেহের বলকে উপেক্ষা ক'রে দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছে, অজস্র ইন্দুরে। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে ইঁদুর শক্তিশালী হচ্ছেন, সূর্য্য, জলদ, পবনদেব, এমন কি হিমালয়ের চেয়ে। সাড়ম্বরে ঋষি-কন্যার বিবাহ হ'লো, মূষিকরাজের সঙ্গে। ঋষি ভাবলেন "ভবিতব্য"।

"সুতরাং আপনার ছেলের যেখানে সেখানে বের চেষ্টা করলেই যে হবে, তা ত বলা যায় না; আমারও মেয়ে পাঁচটা, চেষ্টা করতে হবে। ইহুদী-টিহুদী খুঁজবেন না, ছেলে ত ষাট টাকা মাইনের কেমিষ্ট, শতখানেক পর্য্যন্ত হবে শুনেছি। বাড়ীটা আপনাদের বড় বটে, কিন্তু তাতেও শুনছি পাত্র বা পাত্রের পিতার কোনও স্বত্ব নেই—সবটাই তার জ্যাঠামশায়ের। সুতরাং অত সুন্দরী নিয়ে এসে কি করবেন? গেরস্তর ঘরের স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়ে নিয়ে আসুন, রং দেখে দেবেন, কিন্তু পার্শী, ইহুদীতে আর কাজ নেই।"

পাত্রের পিতা আর ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; আমিও মনে করিতেছিলাম, কন্যার পিতা খুব বেশী ভাবে নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে বাড়ীতে পাইয়া আক্রমণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে পাত্রপক্ষের অপর দুইজন এবং কন্যাপক্ষের লোকদের কথায় কথায় নরম গরম নানা আলোচনা হইয়াছে; কাগজের মহার্ঘতার দিনে সে সকল এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না। কেবল শেষটা না জানাইলে আমার ত্রুটি থাকিয়া যায়, তাই পাত্রের পিতার উক্তিটা দিতে বাধ্য হইলাম—

"ভারি মেয়ে দেখিয়েছেন মশাই, তার আবার অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। দেখিয়ে দেব কি রকম বউ আনি, আর কত টাকা তারা স্বেচ্ছায় দেয়। আপনাকে নিমন্ত্রণ করব, যাবেন ত?"

পাত্রীর পিতার নিকট শুনিয়াছি, নিমন্ত্রণ হয় নাই, কিন্তু বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নববধূর সহিত ইহুদীর সাদৃশ্যমাত্র আছে কেশের বর্ণে, এমন কি, অক্ষি-তারকাতেও নয়; আর পাত্রীপক্ষ "স্বেচ্ছায়" চার হাজার টাকা দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীসুবোধ রায়

দেশের দুখে বুকের ব্যথা গোপন করার ছলে,
মুখে তোমার ফুট্‌ল মধুর হাসি,
হাসির গানের তলে তব ফল্গুধারা চলে,
বিষাদভরা উছল অশ্রুরাশি।
গানের রাজা, প্রাণের রাজা, দরদ ভরা কবি,
যেথায় লোকে হাল্কা হাসি হাসে,
সেথায় তুমি হাসির স্রোতে ভাসিয়ে ব্যথার ভেলা
ইন্দ্রধনু আঁকলে কাব্যাকাশে।
নূতন ছন্দে, মেঘমন্দ্রে, ধরলে নূতন তান,
জননী ও জন্মভূমির লাগি,
জন্মভীরু মেষের জীবন গড্ডালিকা ত্যজি
মানুষ হ'তে উঠ্‌ল সবাই জাগি'!
নাট্যশালার হাসিখেলার নৃত্য-গীতের মাঝে
হঠাৎ এ যে নূতন চমক লাগে।
প্রাচীন দিনের বীরকাহিনীর দুন্দুভি যে বাজে,
রক্তে যেন পুলক নাচন জাগে।
তোমায় আমি স্মরণ করি, বরণ করি কবি,
ভাবছি মনে আসবে সেদিন কবে?
যেদিন তোমার অশ্রু হাসি সকল ধন্য করি
তোমার প্রাণের স্বপ্ন সফল হ'বে।

কলঙ্কিনীর খাল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর দত্ত-বাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। এই উপরে ওঠার সামান্য পথটুকু এবং উপরে উঠিয়াও সে কতবার যে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিল তাহার আর হিসাব নাই; শেষে নিজের কাছেই নিজেকে ভারি তাহার লজ্জা পাইতে হইল, কাজেই আর সেখানে দাঁড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। লজ্জা-বোধের চকিত হাসি হাসিয়া সে বাগানের পথ ধরিয়া বাড়ীর দিকে যেন একটু দ্রুতই চলিয়া গেল।

টিয়া এপারের ঘাটে বসিয়া ওপারে সুন্দরের কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে খুশীর হাসিই হাসিল। দুই-একবার লজ্জায় সেও যে সুন্দরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় নাই—এমন না, কিন্তু সুন্দরকে যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে দেখা গেল ততদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া দিয়া সে দেখিল, তারপরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে কেমন যেন মন-মরা হইয়া পড়িল। অতি-নিকট ভবিষ্যতে বাড়ী ফিরিয়া যে কলুষিত রঙ্গমঞ্চে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহারই আশঙ্কা বোধ করি তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা সুনিবিড় অবসাদ ঘনাইয়া তুলিল।

টিয়ার বাসন মাজিয়া ঘাট হইতে ফিরিতে তাই আজ অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়ীর উঠানে যখন তাহার পা ঠেকিল তখন মনে হইল রূপসীর বিকৃত হাসির ঢেউ যেন মাটিতে আসিয়া ঠেকিতেছে এবং তাহারই দোলা যেন সে সে-মাটির স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত ক্ষণ-বিচ্ছুরিত হইয়া গেছে বলিয়া অনুভব করিল।

রূপসী তাহার ঘরের দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া সত্যই হাসিতেছিল। টিয়াকে বিব্রত করিতে পারার বাহাদুরিতেই যেন সে হাসিয়া খুন হইতেছিল। টিয়ার সে যে আপনার মা না হইলেও মাতৃস্থানীয়া তাহা তাহার খেয়ালই যেন ছিল না। টিয়া তাহার সখী-স্থানীয়া হইলে একমাত্র এ-হাসি মানাইতে পারিত; কিন্তু সামঞ্জস্য-বোধহীনতা রূপসীর জন্মগত সম্বল, সেখানে সে নির্ভুল এবং একেবারে অদ্বিতীয়া।

টিয়ার ক্ষণিকের জন্য একবার সে নির্লজ্জ হাসি শুনিয়া মনে হইয়াছিল, ও-মুখ পা দিয়া মাড়াইয়া দিয়া ও-হাসি বন্ধ করাই যেন উচিত, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এ-চিন্তার জন্যও অনুশোচনায় মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিল। তাহারপরেই নির্ম্মম নিয়তির বিরুদ্ধে নিজেকে স্থির রাখিবার সংকল্পে মন তাহার দৃঢ় হইয়া উঠিল। সে সুসংযত পাদবিক্ষেপে রান্নাঘরের দিকে বাসনের পাঁজা লইয়া এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন রূপসীকে সে দেখেও নাই, বা তাহার হাসি তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই মন তাহার কেন জানি আবার বিকল হইয়া গেল। আজ নিজের গর্ভধারিণী বর্ত্তমান না থাকার নৈরাশ্যই যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুষড়াইয়া দিল। আজ দুনিয়ায় তাহার এমন একজন নাই যাহার কাছে সে একটা আব্দার জানাইতে পারে, অন্যায় অপরাধের পরেও অভয় পাইতে পারে, সান্ত্বনা খুঁজিতে পারে। সেই একজনেরই অভাবে আজ সমস্ত দুনিয়া যেন তাহার সঙ্গে বৈরিতা সাধিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, আর সে যেন শত্রু-বেষ্টিত হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে নিরস্ত্র দাঁড়াইয়া অতর্কিত আঘাতের জন্য নিজেকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে। না, এ কণ্টকিত মৃত্যু-শঙ্কাপূর্ণ ভয়াবহ জীবন একেবারে অসহ্য।

টিয়া কাপড়ে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই ফুলিয়া ফুলিয়া আকুল হইয়া কান্নার মধ্যেও তাহার মায়ের মুখ আজ তাহার চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া রহিল। এমন করিয়া টিয়া মায়ের জন্য আর কখনই জীবনে কাঁদে নাই, অবশ্য এমন গভীরভাবে জীবনে তাঁহার প্রয়োজনও সে আর কখনও অনুভব করে নাই।

টিয়া অঝোরে কাঁদিয়াই চলিয়াছিল। কাঁদিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল।

তাহার পিঠের উপরে মানুষের হাত ঠেকিতেই সে সহসা চম্‌কাইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু মুখের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া লইতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল।

মনোহর একেবারে টিয়ার পাশেই উবু হইয়া বসিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়াছিল। বলিল, ছিঃ টিয়া, তুমি কাঁদচো?

টিয়া কোনরকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, হুঁ, কাঁদচি বই কি! আমি কাঁদব না তো কাঁদবে কে শুনি? দুনিয়ায় আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে? মা'র কথা মনে প'ড়ে গেলে আমি না কেঁদেও পারি না যে!

মনোহর সে-কথায় যেন কর্ণপাত না করিয়াই বলিল, আমাকে ফিরে আসতে দেখে তুমি অবাক হ'চ্ছ না টিয়া? কই, সে কথা তো একবারও জিগ্যেস্ করলে না?

টিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আমার মনের অবস্থা আজ ভাল না, তাই ভুল হ'য়ে গেচে। সত্যি, তুমি আবার ফিরেই বা এলে কেন?

—ফিরে এলাম—কেন? আমি নিজেই তা এখন ভেবে পাচ্ছি না।—বলিয়া মৃদু একটু হাসিয়া মনোহর আবার বলিল; তোমাকে সত্যিই ছেড়ে যেতে পারলাম না টিয়া। যাত্রার দল যে তোমার দু'চক্ষের বিষ সে আমি বেশ বুঝতে পেরেচি; না, আর কখনও যাত্রার দলে আমি ফিরে যাব না। তোমাদের শিখীপুচ্ছের বাজারখোলা পর্য্যন্ত গিয়েই মন আমার কেমন বিগড়ে গেল টিয়া। এবার ঠিক করেচি, নূপুরগঞ্জের হাটে একটা মনিহারি দোকান খুলব আমি, ব্যবসায় মন দেব। আর ভাল কথা, তোমার জন্যে তোমাদের শিখীপুচ্ছের বাজার থেকে একটা তেল কিনে এনেচি টিয়া। 'চম্পল্-'এর খোঁজ ক'রে না পেয়ে শেষে কমলালেবু রঙের একটা তেল নিয়ে এলাম, কেমন যে হবে তা কে জানে। কথা আমার রেখেচি, এই দেখো টিয়া।

বলিয়া মনোহর পকেট হইতে একটা কাগজে মোড়া তেলের শিশি বাহির করিয়া টিয়ার সম্মুখে ধরিল।

টিয়া সেদিকে চাহিয়া নিজে একটু সামান্য পিছাইয়া গিয়া বলিল, কি তোমার আক্কেল মনোহর মামা, আমি কি সুগন্ধি তেল ব্যাভার করি কখনও—যে তুমি পয়সা খরচ ক'রে আবার তা নিয়ে এলে?

মনোহর সহজভাবেই বলিল, বা রে বা, আমি দিলে তুমি তা ব্যাভার করবেই বা না কেন? আর, আমি তো তোমার পর নই টিয়া, আমি তোমাকে আমার অতি আপনজন ব'লেই মনে করি। তুমি এ তেল না নিলে আমি সত্যিই মনে বড় ব্যথা পাব।

টিয়া বিশেষ বিব্রতভাবে মনোহরের দান নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিল। মনোহরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে তাহার বাধিল।

টিয়ার এ সামান্য দান গ্রহণে মনোহর বেশ একটু সলজ্জ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি তাই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দিদিকে তার ঘরে দেখেও কথা না ক'য়ে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করলাম। দিদির আবার মেজাজ যে রকম—তাতে হয় তো তোমাকেই এর জন্যে আজে-বাজে দশকথা শুনিয়ে দেবে। যাই বাপু, তার সঙ্গে দেখাটা ক'রে ব'লে আসি যে ফিরে এলাম।

মনোহর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে টিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রান্নার জিনিষপত্র আনিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেল।

রূপসী মনোহরকে দেখিয়া খুশী হইতে পারিল না। কিন্তু একজন কথা কওয়ার মত লোক পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। নিশি সজ্জন সকালবেলা মনোহরের বিদায়ের পরেই যে কি কাজে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে কেহই জানে না, এখন পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আসে নাই, কখন যে আসিবে তাহারও কিছু ঠিক নাই। কাজেই সকালবেলা আজ ঘাটের পথে যে-দৃশ্যটি তাহার চোখে পড়িয়াছে তাহারই একটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা কাহারও কাছে দিতে না পারিয়া রূপসীর মন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মনোহরকে যে সেকথা বলিয়া খুব সুখ হইবে না সে তাহাও বুঝিল, যেহেতু টিয়ার প্রতি মনোহরের বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়াই সে জানে। তবু না বলিয়াও থাকিতে পারিল না।

কিন্তু রূপসী সুরু করিতেই মনোহর দিল বাধা। তাহার এই হঠাৎ ফিরিয়া আসার কারণ এবং উদ্দেশ্য সর্ব্বাগ্রে ব্যক্ত করা সে প্রয়োজন মনে করিল। রূপসী আবার জন্মাইল মনোহরের বাক্য সুরুর পূর্ব্বেই বাধা। শেষ পর্য্যন্ত রূপসীর বাসনাই জয়ী হইল। সে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা একটা উপাখ্যানের মত করিয়া বর্ণনা করিবার প্রবল লোভে বিকৃত এবং সত্যবর্জ্জিত একটা কিছু গড়িয়া তুলিল

সত্য, কিন্তু মনোহরকে সে বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিতে পারিল না।

মনোহর সমস্ত শুনিয়া বলিল, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, সুন্দর আবার এপারে এসে কাঁঠাল গাছের নীচে দাঁড়াবে। সাত পুরুষের শত্রুতা ভুলে এপারে আসা যেন চারটিখানি কথা।

—ও মা-গো! তবে কি আমি মেয়ের নামে একটা গপ্পো রচনা ক'রে বলচি নাকি? আমার যেন তা 'হলে নরকেও স্থান হয় না।—বলিয়া রূপসী এমন একটা ভঙ্গী করিল যে মনোহর রীতিমত শঙ্কাক্রান্ত হইয়া উঠিল, পাছে রূপসী আবার বসিয়া মরা কান্না সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু রূপসী তেমন কিছু করিল না দেখিয়া মনোহর আশ্বস্ত হইয়া বলিল, তা টিয়ার সঙ্গে শত্রুতা ভুলে এপারে আসাটা খুব বিচিত্র ব'লেও আমি মনে করি না দিদি। তোমার সতীনের মেয়েটি সত্যিই ভাল দিদি।

—অঃ, আমার মরণ!—বলিয়া রূপসী রাগে যেন দাপাইয়া দাপাইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। এমন কি, মনোহরের ডাকেও সে ফিরিয়া দাঁড়াইল না এবং মনোহরের বলার যাহা ছিল তাহাও আর বলা হইল না।

টিয়া রান্নাঘরের দরজায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল। কারণ, তাহাকে শুনাইয়াই কথাগুলা বলা হইয়াছিল। এতক্ষণে টিয়ার হাসি পাইল, দুঃখের মাঝেও তাহার হাসি পাইল, রূপসীর নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নীচতা মানুষকে না হাসাইয়াই যেন পারে না—এমনই টিয়ার মনে হইল।

রূপসী ঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনোহর কেমন যেন দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, মন তাহার বিষণ্ণ ভারাতুর হইয়া উঠিল। টিয়ার মন কি সত্যই তবে সুন্দর পাইয়াছে, সেখানে কি তাহার আর স্থান হওয়ার কোন আশাই নাই, তবে কি ফিরিয়া আসা তাহার একেবারে অর্থশূন্য হইয়া যাইবে? কিন্তু কেনই বা সে টিয়ার মন পায় না? টিয়া কেন সুন্দরকে তাহার অপেক্ষা যোগ্য বলিয়া মনে করে? এই সব সাধারণ প্রশ্নগুলিই সহসা মনোহরের মনে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সদুত্তর কিছু মিলিল না। আর কোন দিন মিলিবে বলিয়াও সে আশা করিতে পারিল না। শুধু মনে হইল, ফিরিয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু টিয়াকে যে সত্যই তাহার ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে, বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা যে পিছনে পড়িয়া যায়—তাই তো তাহাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। এখন সে-কারণে আবার তাহাকে অনুতাপও করিতে হইতেছে। নিজের জন্য আজ তাই তাহার দুঃখও হইল, অনুকম্পাও জাগিল।

নিশি সজ্জনের বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল, কিন্তু ঘটনা শুনিতে বিলম্ব হইল না। তাহার বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রূপসী বারান্দায় একটা বেতের মোড়া পাতিয়া তাহাকে বসিতে দিয়া নিজে একটা হাতপাখা লইয়া সম্মুখে বসিল। আজ জীবনে এই প্রথম যেন নিশি সজ্জন ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, রূপসীর হাব-ভাবে তেমনই কিছু মনে হয়। রূপসী এযাবৎকাল কখনও পাখা লইয়া নিশি সজ্জনের পাশে বসে নাই। নিশি সজ্জন রূপসীর এ নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া এমনই বিমুগ্ধ হইয়া গেল যে, এ ব্যাপারের অসঙ্গতিটুকু তাই তাহার চোখেও পড়িল না। কিন্তু ঘটনা যখন রূপসী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া উঠিল তখন নিশি সজ্জনের চোখে রূপসীর এই পাখার বাতাসের সহজ অর্থটা ধরা পড়িল, তাহার পূর্ব্বে ধরা পড়ে নাই।

নিশি সজ্জন সমস্ত শুনিয়া শুধু বলিল, এ সমস্তই সত্যি? বেশ, আবার সুরু হ'ল তা হ'লে, আবার কলঙ্কিনীর থাল লাল হ'য়ে উঠবে। আমার ডাঙায় পা দেবে দত্ত-বাড়ীর ছেলে, আর আমি মুখ বুজে তা সইব—অসম্ভব! টিয়া কোথায়? ··· টিয়া, অ টিয়া! তাকে খুন ক'রে তবে আজ আমার অন্য কাজ। সে আমার মেয়ে হ'য়ে কি-না আমার মান-সম্মান সমস্ত দেবে জলাঞ্জলি, এই হ'ল কি-না সজ্জন-বাড়ীর মেয়ের মত কাজ?

টিয়া নিশি সজ্জনের কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। সকলপ্রকার লাঞ্ছনার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। মনোহর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া টিয়াকে নিশি সজ্জনের দৃষ্টি হইতে একপ্রকার আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দিদির কথায় যেন কান দেবেন না জামাইবাবু, টিয়ার কথাই আগে শুনে নিন্। দিদির তো গুণের ঘাট নেই, প্রয়োজন হ'লে অপরের নামে হাজার কথা বানিয়ে বলতেও ওর জিবে আটকায় না।

টিয়া তাড়াতাড়ি অমনি বলিল, না মনোহর মামা, তুমি যা জান না তা নিয়ে কেন কথা কও। ছোটমা তো সত্যি কথাই সব বলেচেন। দত্ত-বাড়ীর ছেলে সুন্দর এপারে সত্যিই আজ এসেছিল। তার টিয়াপাখী উড়ে এসে বসেছিল আমাদের কাঁঠালগাছের ওপর, কাজেই সে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

রূপসী টিয়ার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মনোহরের দিকে চাহিয়া সম্মুখ-সমরে আহ্বানের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—কেমন, হ'ল তো এইবার! বানিয়ে বলা কথা, জিবে আমার আটকায় না! বলি, অত গরজ কারও জন্যে কারও ভাল না। আমাকে মিথ্যুক বানাতে গিয়ে পুড়ল তো মুখ নিজের? ওপরে ভগবান আছেন!

বলিয়া রূপসী মনের আনন্দে উপস্থিত সকলকে ভুলিয়া গিয়া এক অতি হাস্যকর ভঙ্গীতে অনুদ্দেশ্যে হাত যুক্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়া প্রণিপাত করিল।

নিশি সজ্জন এতক্ষণ ঘটনাটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ তাহার উত্তেজনার চরম সীমায় পৌছিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাহার বেশীক্ষণ কাটিল না। টিয়া সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া উপযুক্ত শাস্তির প্রতীক্ষাই করিতেছিল।

নিশি সজ্জন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে টিয়ার উপর যেন সগর্জ্জনে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, না, না··· এ আমাদের বিখ্যাত সজ্জন-পরিবারের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আমি বেঁচে থাকতে এসব হ'তে পারবে না, কিছুতেই না। হ'তে পারে তার টিয়া, কিন্তু সে কেন আমার সাতপুরুষের ভিটের মাটিতে পা ছোঁয়াবে। আমি বাড়ী থাকলে আজ তাকে খুন ক'রে তবে হ'ত অন্য কথা! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, তোর জন্যে মান-কান আমার সব ডুবল। বেরিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। নইলে, খুন ক'রে আমি আমার আফসোস মেটাবো।

মনোহরই আবার বাধা দিল। নিশি সজ্জনের বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় সে সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ আপনি করচেন কি জামাইবাবু? টিয়ার কি দোষ হয়েচে শুনি? সে কি কোমর বেঁধে যাবে নাকি দত্ত-বাড়ীর ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে, না তাই কখনও সম্ভব? কি যে করেন, মিছে ওকে আর কাঁদাবেন না। দিদির কথাতেই ওর যথেষ্ট হয়েচে। দেখচেন না—কি ভাবে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েচে।

টিয়া ইতিমধ্যেই চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়াছিল, কারণ পিতার এ রূঢ়তায় নিজেকে সে আর সামলাইতে পারে নাই।

নিশি সজ্জন আবার যথাস্থানে গিয়া বসিল এবং অনুপশাসিত উত্তেজনার বিক্ষোভে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, তবে সুরুই হোক্। আমিও দেখে নেবো।

কিন্তু সুরু যে হইবে না তাহা নিশি সজ্জন ভাল করিয়াই জানে। ভৈরব দত্ত লোকটা নিশি সজ্জনের মতে মহা কাপুরুষ, কিছুতেই সে কলঙ্কিনীর খালের দুই পারের দুই বাড়ীতে আবার কলঙ্কের সূত্রপাত হইতে দিবে না। কত বার তো নিশি সজ্জন চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগা সত্ত্বেও ভৈরব দত্ত নীরবে তাহা সহ্য করিয়া গেছে। কাজেই নিশি সজ্জনের উত্তেজনার মধ্যেও কেমন যেন একটা হতাশা প্রকাশ পায়, কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়।

আনন্দ-উল্লাস যখন মাত্রা ছাপাইয়া যায় তখন মানব-হৃদয়ে জাগে কেমন একপ্রকার অকরুণ শূন্যতা। সুন্দরের হৃদয়েও সেই শূন্যতা বিরাজ করিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিয়া সুন্দর মহা সমস্যায় পড়িল। কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে তাহার কেমন যেন বাধিতেছিল, মুখে না জানি তাহার মনের ছায়া পড়িয়াছে, না জানি লোকে তাহার মনের কথাটাই বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু এত বড় আনন্দ-ঘন দিনও তো জীবনে তাহার আর কখনও ইতিপূর্ব্বে আসে নাই, কাজেই আজ লোকের সম্মুখে না দাঁড়াইতে পারিলেও যে সে স্বস্তি অনুভব করিতেছে না। নূপুরগঞ্জের হাট হইতে টিয়াটা কিনিয়া আনা তাহার সার্থক হইয়াছে, টিয়াটা যে বন্ধন কাটাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাতেও তাহার এখন আর ক্ষোভ নাই; সে তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দরকে বিশেষভাবে লাভবান করিয়া গেছে। তাহারই দরুণ সে শুধু সজ্জন-বাড়ীর সীমানার মধ্যে পা বাড়াইয়াছিল, আর তাহারই ফলে নিশি সজ্জনের মেয়ে টিয়াকে কথার জাল ফাঁদিয়া ধরিবার একটা সুবর্ণ সুযোগও সে পাইয়াছিল। কিন্তু

বিশ্ব-ভুবনে যে এক অপূর্ব্ব কুহক সৃষ্টির আদি-অন্ত পর্য্যন্ত তাহার সাতরঙা মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া দিয়া বসিয়া আছে সেই মায়াজালে তাহারা ইতিপূর্ব্বেই উভয়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল; আজ হয় তো নড়িয়া চড়িয়া তাহারা সে-জাল আর একটু শক্ত করিয়া অঙ্গের সঙ্গে জড়াইল।

সুন্দর কেবলই টিয়ার কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। কত রকম যে তাহার অর্থ হইতে পারে, কত রকম যে তাহাতে ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহাই সে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না। একথা কাহারও কাছে ব্যক্ত না করিয়া তাহার যেন আর মুক্তি নাই। শ্রীমন্ত সহসা আসিয়া গেলে বেশ হইত। কিন্তু শ্রীমন্তর সঙ্গে বাড়ী বহিয়া গিয়া দেখা করিতেও তাহার আজ কেমন যেন বাধিতেছিল। শ্রীমন্ত হয় তো ইহা লইয়া কত অকারণ বিদ্রূপ করিবে, সুন্দর লজ্জায় পড়িয়া যাইবে। অথচ, সে-কারণে এক একবার তাহার লোভও জন্মিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে শ্রীমন্তদের বাড়ী গেল। সেখানে বসিয়া আজে-বাজে অনেক কথাই সে বলিল, কিন্তু যাহা বলিতে সে গিয়াছিল তাহা আর বলা হইল না। না বলিয়াই সে মুখে লাজ-কৌতুক জড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। তবে শ্রীমন্তকে সে রাজী করাইয়া আসিল যে, আজ রাত্রে উভয়ে নৌকা লইয়া হাজারখুনীর বিলে বেড়াইতে যাইবে। রাত্রের নিভৃত নিরালায় মনের কথা খুলিয়া বলিতে সুন্দর খুব সহজেই পারিবে। এই বন্দোবস্ত করিয়া সে কতকটা তবু স্বস্তি অনুভব করিল।

রাত্রে আহারাদির পর শ্রীমন্ত তাহাদের নৌকা লইয়া সুন্দরকে ডাকিতে আসিল। সুন্দর প্রস্তুত হইয়াই ছিল। শ্রীমন্তর সঙ্গে নৌকায় আসিয়া উঠিল।

নৌকা হাজারখুনীর বিলের দিকে ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নৌকা কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্রীমন্তই প্রথম কথা কহিল। বলিল, আর তো একমাসের মধ্যেই পূজো। দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল একেবারে!

সুন্দর আস্তে করিয়া প্রথম শুধু বলিল, হুঁ। তারপরে একটু সময় লইয়া গভীর চিন্তান্বিতের মত বলিল, এবার পূজোয় বিপদ আছে অনেক।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, সে কি, বিপদ আবার কিসের?

সুন্দর বলিল, সে অনেক কথা। এবার সত্যি আমার অদৃষ্টে বিপদ লেখা আছে। কিন্তু সে সব আমি গ্রাহ্যি করি না। আমিও মহেশ দত্তের নাতি—সজ্জনদের আমিও ক্ষমা করব না।

শ্রীমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, সে আবার কি!

সুন্দর একটু সময় লইয়া বলিল, দত্ত-বংশের রক্ত বইচে আমারও মধ্যে, শত্রুর সঙ্গে আমারও চুটিয়ে শত্রুতা। সজ্জন-বাড়ীর ঐ একরত্তি মেয়ের কথা শুনে গা আমার জ্ব'লে যাচ্ছে। কি ওর আস্পর্দ্ধা—আমাকে কি-না মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ করলে আজ! এবার আর মিষ্টি কথা না—সড়্‌কি-বল্লম নিয়েই বেরুতে হবে। দেখা যাক্ এবার, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

শ্রীমন্ত নীরবে সুন্দরের সব কথা শুনিয়া বিপুল বেগে হাসিয়া উঠিল। সুন্দর সে-হাসির বেগে চম্‌কাইল না, কিন্তু বলিতেও কিছু পারিল না।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপ-ঘনকণ্ঠে বলিল, এই গভীর প্রেম—আর এরই মধ্যে চ্যালেঞ্জ্ একেবারে! শেষ পর্য্যন্ত যাত্রার দলের সেই ছেলেটিরই বুঝি জয় হ'ল? তা তো হবেই—সে হ'ল গিয়ে গাইয়ে-বাজিয়ে চৌকস্ ছেলে, তোর সঙ্গে কি তার তুলনা হয়! বেশ, বেশ, এখন যুদ্ধং দেহি ছাড়া আর উপায় কি!

সুন্দর সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না রে না, আজ সকালে ভারি এক মজার ব্যাপার হ'য়ে গেচে। তাড়াতাড়ি একটু বেয়ে চল্, হাজারখুনীর বিলে গিয়েই তোকে সেকথা বলব, নইলে কে কোথায় আবার তা শুনে ফেলবে।

শ্রীমন্ত অমনি ঠোঁট কাটিয়া বলিল, হুঁ, মজার ব্যাপার বুঝি! তা আজকাল তো উঠতে বসতে তোর মজার ব্যাপার ঘটবে জানি।

—তা তো ঘটবেই।—বলিয়া সুন্দর খালের জলে বৈঠার ঘা মারিয়া শ্রীমন্তর গায়ে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত গায়ে জল লাগায় একটু চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এতদিনে সত্যিই তুই মরেচিস্ দেখতে পাচ্ছি। বেশ, বেশ, এইবার একটা শুভদিন দেখে—

সুন্দর বৈঠার ঘায়ে আরও খানিকটা জল শ্রীমন্তর গায়ে তুলিয়া দিয়া তাহাকে মাঝপথেই নীরব করিয়া ছাড়িল। শেষে বলিল, আর বলবি কখনও ?

এমনই সব হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়া নৌকা তাহাদের খাল ছাড়াইয়া সুবিস্তৃত হাজারখুনীর বিলে আসিয়া পড়িল। দিগন্ত জুড়িয়া জলরাশি—তাহারই 'পরে রাত্রির আঁধার যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়া কান পাতিয়া দিয়া প্রিয়তমের মত প্রেম-গুঞ্জরণ শুনিতেছে—প্রিয়ার কণ্ঠ যেন আবেশ-আবেষ্টনে জড়াইয়া আছে; আর জলরাশি গরবিণী প্রিয়ার মত অকুণ্ঠিতকণ্ঠের সুধা যেন ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে উল্লাস-স্তব্ধ প্রিয়তমের সতর্ক কর্ণকুহরে।

হাজারখুনীর বিলে পড়িয়াই সুন্দর সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়া সকালের ঘটনা বিবৃত করিতে সুরু করিল। বিনা বাধায় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া যখন একটা নিশ্বাস চাপিয়া গিয়া সে থামিল তখন শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া লইয়া বলিল, সা-বা-স্ !

এভাবে টানিয়া টানিয়া বলায় সুন্দর একটু বিচলিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না; কারণ শ্রীমন্ত তাহাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য যে বিদ্রূপ করে নাই তাহা সে সহজেই বুঝিল।

সুন্দর মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, তুই তো সাবাস্ ব'লেই খালাস, কিন্তু এর ফল যে কি সাংঘাতিক দাঁড়াবে সে জানি আমি। টিয়ার সৎ-মা যখন আমাকে সেখানে দেখে গেচে একবার তখন কলঙ্কিনীর খাল আবার রক্তে লাল না হ'য়েই পারে না। পুজোও এসে গেল—এইবার ভাসান নিয়েই হয় তো বাঁধে দু'বাড়ীতে।

থাক্, আর না বাঁধতে হ'লো !—বলিয়া শ্রীমন্ত চমৎকার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে একটু হাসিল, তারপরে বলিল—না, না, বাঁধতেই হবে—একটা সাঁকো, এপার-ওপার ক'রে।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া আর পারিল না। বলিল, হ্যাঁ, সাঁকো যদি বাঁধতেই হয় তো তোকে ডাকব সেদিন।

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এই রাত ক'রে হাজার-খুনীর বিলে যে আমাকে পিষতে ডেকে আনা হয়েচে সে তো ঐ সাঁকো বাঁধবার জন্তেই। ডাক তো আমার বহু আগে থেকেই পড়েচে, আর আমিও আমার যথাসাধ্য করচি।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথায় খুশী হইয়া গিয়া বলিল, খুব যে আজকাল কথা কইতে শিখেচিস্ দেখতে পাই !

—সত্যি নাকি ?—বলিয়া শ্রীমন্ত একটু হাসিল, তারপরে বলিল, সেটা হয়েচে তবে তোর সংসর্গ দোষে। তোর মত ভাল মানুষের মুখ দিয়েই যা সব কথা বেরুচ্ছে আজকাল, তা আমার আর না বেরুবেই বা কেন !

সুন্দর আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, খুব হয়েচে, এখন বাড়ী ফিরে যাই চ'।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, চল্, ফিরেই যাওয়া যাক্। আর তোর কাজ যখন শেষ হয়েচে তখন আর থেকেই বা লাভ কি !

সুন্দর অমনি বলিল, না রে না, রাত হ'য়ে গেচে অনেক।

শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হাজারখুনীর বিলে এই প্রথম আমাদের অনেক রাত হ'য়ে গেল সুন্দর! সত্যি, ফিরেই চ'।

—তবে আর তোর ফিরে কাজ নেই।—বলিয়া সুন্দর তাহার বৈঠাটি নৌকার পাটাতনের উপর তুলিয়া রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

শ্রীমন্ত চাপিয়া চাপিয়া হাসিয়া উঠিল। সুন্দর এতক্ষণে সত্যই বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীমন্তের উপর তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ জাগিল না; যেহেতু সুন্দর জানিত, শ্রীমন্ত একটু রঙ্গপ্রিয়। সুন্দর নিজেও তাই হাসিয়া ফেলিল।

পরদিন ভোরেই আবার মনোহরকে যাত্রার দলের উদ্দেশ্যে রওনা হইতে হইল। তাহার এমন সুকল্পিত ব্যবসা নিশি-সজ্জনের মনে ধরিলেও রূপসীর মনে ধরিল না। কথাটা ভাল সময়েই মনোহর জামাইবাবুর কানে তুলিয়াছিল, কিন্তু কাজে আসিল না, তাহার দিদিই বাধা দিল এবং নিদারুণ-ভাবেই বাধা দিল। নিশি সজ্জন শেষ পর্য্যন্ত তাই রাজী হইতে পারিল না। গত রাত্রে মনোহর জামাইবাবুর পাশে যখন আহারে বসিয়াছিল এবং টিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন রূপসীকে সেখানে অনুপস্থিত দেখিয়া সে কথাটা তুলিয়াছিল যে, শিখীপুচ্ছের বাজারখোলায় একখানি মনিহারি দোকান খুলিলে ব্যাপারটা খুব লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা নিশি সজ্জন অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারিল—লাভজনক যে তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কি

আছে। নিশি সজ্জন বে-হিসাবী লোক নয়, কাজেই মনোহরের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে কি-না সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে সে চিন্তা করিতে লাগিল। পরে ভাবিল, নিজে একটু তত্ত্বাবধান করিলেই দুর্ভাবনার কিছু আর থাকিবে না এবং সে মনোহরের প্রস্তাবে অবিলম্বেই রাজী হইয়া গেল।

কিন্তু রূপসীর স্বভাব তাহাদের ঠিক জানা ছিল না, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও কোন কথা শোনা অপেক্ষা নেপথ্যে থাকিয়া চুপিসাড়ে শুনিতে পারিলে সে বিশেষ খুশী হইয়া উঠিত। কাজেই সুযোগ পাইলেই সে চুপি দিয়া কথা শুনিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত। এক্ষেত্রেও সে চুপি দিতে ছাড়ে নাই। বেড়ার আড়ালে থাকিয়া সে শালা-ভগ্নীপতির শলা-পরামর্শ সকলই শুনিল। শুনিয়াই তাহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিয়া মনোহরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, কি, আবার বুঝি ব্যবসা ফাঁদবার মতলব হয়েচে? এবার বুঝি মনিহারি দোকান?

তারপরে নিশি সজ্জনের দিকে ফিরিয়া বলিল—আর রাজ্যে বামুন নেই—এইবার শালা-ভগ্নীপতিতে ব্যবসা সুরু হবে বুঝি? বেশ! কিন্তু ক'দিন সে-ব্যবসা টিকবে শুনি?

মনোহর কেমন একটু বিব্রত হইয়া মাথা নীচু করিল, আর নিশি সজ্জন মাথা তুলিয়া বলিল, সে তুমি নাই শুনলে, ব্যবসার তুমি বোঝ কি?

—বুঝি গো বুঝি, তোমার চেয়ে ঢের বেশী বুঝি!—বলিয়া রূপসী ভ্রূকুটি করিয়া বলিতে সুরু করিল, ব্যবসা করতে হয় কর, কিন্তু টাকা-পয়সা কখনও বিশ্বাস ক'রে যেন মনোহরের হাতে দিও না। সেবার—বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, বাবাকে ছেলে বোঝালে, যে তিনশো টাকা তাকে ব্যবসার জন্তে দিলে—মাসে তিনশো টাকা সে লাভ দেখিয়ে দেবে। বাবা ছিলেন ভালমানুষ, মনোহরের কথায় বিশ্বাস ক'রে দিলেন ওর হাতে তিনশো টাকা। ব্যস্, টাকা পেয়েই সেই যে গুণধর ভাই আমার উধাও হলেন, আর চার মাসের মধ্যে দেখাই নেই। ওকে বিশ্বাস ক'রে টাকা দিলেই ডুববে তুমি। আমার যা বলা উচিত তা আমি ব'লে দিলাম, এখন তোমার যা খুশী তাই তুমি করগে'।

বলিয়াই রূপসী সেখান হইতে দেমাক-দুর্ব্বিনীত পাদ-বিক্ষেপে অন্যত্র চলিয়া গেল।

মনোহর একটা কথা কহিয়াও ইহার আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেন না এ দুর্ঘটনা একদিন সত্যই ঘটিয়াছিল। নিশি সজ্জনেরও মন কেমন যেন বিগ্‌ড়াইয়া গেল, সে আর ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথাও কহিল না। উভয়ে নীরবে আহারাদি শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

রান্নাঘরে টিয়া সমস্ত জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিজের মনে মনেই বলিয়া উঠিল, বাবা, বাবা, কি মেয়েমানুষ, কারও যদি একটু ভাল দেখতে পারেন! এমন কি, নিজের ভাইয়েরও না।

কিন্তু টিয়া ইহাতে বরং খুশীই হইল। মনোহর যে শিখীপুচ্ছের বাজারে মনিহারি দোকান খুলিয়া এখানে কায়েম হইয়া বসিল না তাহাতে আনন্দ হইল তাহারই। মনোহরের প্রতি তাহার তেমন কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু মনোহরের উপস্থিতিতে সে কেমন জানি অস্বস্তি অনুভব করে। কাজেই সে চিরন্তন অস্বস্তির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া খুশীই হইল।

মনোহর ইহার পরে আর ব্যবসার কথা নিশি সজ্জনের কাছে তুলিতে পারে নাই, রূপসীর কথারও প্রতিবাদ কিছু করে নাই, টিয়ার সঙ্গেও দেখা করে নাই; যাত্রার দলেই আবার যোগ দিতে শিখীপুচ্ছ ছাড়িয়া ভোরের দিকেই চলিয়া গিয়াছে। রূপসী সত্যই তাহার দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিয়া টিয়ার চোখে তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ছাড়িয়াছে। ব্যবসা সে করিতে পারিল না—সে কারণে তাহার দুঃখ হইল না, কিন্তু টিয়া যে তাহাকে কত ছোট ভাবিল তাহাতেই সে যেমন ছোট হইয়া গেল তেমন দুঃখও আবার তাহার গভীরতর হইয়া দেখা দিল।

(ক্রমশঃ)

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে শিল্পপ্রদর্শনীর স্রষ্টা, অক্লান্তকর্ম্মী শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর উদ্যোগে এবং তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের চেষ্টায় মাদ্রাজ আর্ট-স্কুলের নবম বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হইয়া গেল। প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দেশবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই জন্য—যে তিনি তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রেরণার দ্বারা দাক্ষিণাত্যবাসীর মনে শিল্পবোধ এবং রসজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছেন।

শিল্পরসিক-হিসাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। প্রদর্শনী-গৃহে প্রবেশ করিতেই প্রথম দেবীপ্রসাদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভারতের তেজীয়ান্, নির্ভীক শিল্পী দেবীপ্রসাদের ব্যবহারে অহমিকার লেশ মাত্র দেখিলাম না। নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তিনি আমাকে সম্বোধন করিলেন। আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। দেবীপ্রসাদ তখন অফিসসংক্রান্ত কাজে ডুবিয়া আছেন। তাঁহাকে আর বিরক্ত করা অনুচিত মনে করিয়া চিত্রগৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম।

নরনারীর ভিড় কাটাইয়া সহজে চলিবার উপায় নাই। কোন মতে অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ মেয়েলী গলার আওয়াজ পাইয়া দাঁড়াইলাম। মুখ তুলিতে দেখি একজন অতি-আধুনিকা তম্বী তাঁহার সঙ্গীকে বলিতেছেন, "এই শিল্পীদের যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকিত! রাজকুমারীর ছবি আঁকিয়াছে দেখ। ছি—ছি—ছি—মুখটা কি বিশ্রী!" যে ছবিটি লইয়া আলোচনা চলিয়াছে, কৌতূহলী হইয়া সেটির দিকে তাকাইয়া দেখি একখানা অতিসুন্দর ছবি—রং, রস ও রচনার মাধুর্য্যে ছবিখানি যে-কোন সত্যকার শিল্পরসিককে আকৃষ্ট করিবে। ভাবিলাম, এই কেতা-দুরস্ত, ফ্যাশ্যনেব্‌ল্ বেরসিকাদের নিকট হইতে দূরে

প্রদর্শনীতে গভর্ণর পত্নী লেডী হোপ, তাঁহার কন্যা ও প্রিন্সিপাল শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (বাম হইতে দ্বিতীয়)

থাকাই ভাল। উহাদের নিকটে থাকিলে সুস্থ মানুষও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ব্যাধি ঢুকিলে আর ছাড়িতে চায় না। ক্রমশ মৃত্যুর পথে অগ্রসর
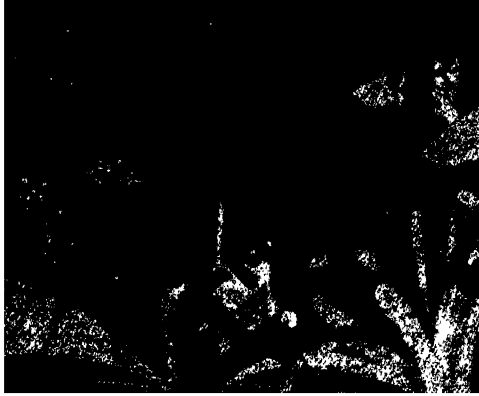
আনমোনা—শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জ্জী

করিয়া দেয়—দৈহিক মৃত্যু নয়, মনের মৃত্যু, রসবোধের অবসান! আমি রসের উপাসক। উপায়ান্তর না থাকায় সেথান হইতে সরিয়া পড়িলাম। ভালই হইল। যে ছবিটির নিকট আসিয়া পড়িলাম, তাহা একটি অতি উচ্চাঙ্গের ছবি। "ফেষ্টিভ্‌ প্যাণ্ডাল"—শিল্পী শ্রী পি. শ্রীনিবাসম্‌। ফ্র্যাঙ্ক ব্র্যাঙ্গুইন (Frank Branguyn) এবং চৌধুরী যেন মিলিতভাবে শিল্পীকে প্রেরণা জোগাইয়াছেন। রচনাচাতুর্য্য, বর্ণসমাবেশ এবং যথার্থ টোন্‌ভ্যালু—সমস্ত মিলিয়া এক কথায় ছবিটিকে অতি চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ এবং উৎসাহ পাইলে তরুণ শিল্পী ভবিষ্যতে যে শিল্পজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ছবির পার্শ্বেই শিল্পী কে-শ্রীনিবাসম্‌ অঙ্কিত "বেগারস্‌ ফেষ্টিভ্যাল।" শিল্পী রং-এর অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইয়া গঠনের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও ছবিটি ভাল বলিতে হইবে। শিল্পী রসিক।

কবিন্ গোপাল অঙ্কিত "নৌজীবী" পাশ্চাত্য প্রথায় অঙ্কিত জল-রং-এর একখানি নিখুঁত নমুনা। শিল্পী জল-রং-এর স্বচ্ছতা অতি সুন্দরভাবে বজায় রাখিয়াছেন। সমস্ত ছবিখানি ঝল মল্‌ করিতেছে। কোথাও একটুখানি মেটে মারিয়া যায় নাই। জলের বুকে গাছ, মানুষ এবং নৌকার প্রতিবিম্ব যেন "মায়া" সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

এদিক ছাড়িয়া একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল "লভার্স্‌" (lovers)—শিল্পী শ্রীদামোদর প্রসাদ। প্রেমিক প্রেমিকার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে। মুখাবয়ব তাহার বিষাদাচ্ছন্ন। উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী কামোন্মাদ হইয়া পুরুষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। যেন বলিতে চাহিতেছে—আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? ছবিটি মোটের উপর মন্দ নয়। শিল্পী কিন্তু টোন্‌ভ্যালুতে বিরাট গোল বাধাইয়াছেন। রৌপ্য অলঙ্কারগুলি যেন দর্শকের চোখের সামনে আসিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—আমরা অলঙ্কার—আগে আমাদের দেখ! ছবির আসল বিষয়বস্তু রৌপ্য-অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে এবং চাপে যেন নিষ্প্রভ হইয়া হাঁপাইতেছে। দেবীপ্রসাদের ছাত্রের নিকট এইরূপ মারাত্মক গলদ আশা করি নাই।

পাশ্চাত্য প্রথায় অঙ্কিত দৃশ্য-চিত্রের ভিতর কে. সি. এস্‌. পাণিকর এবং গোবিন্দরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ছবি পূর্ব্বেও অন্যান্য প্রদর্শনীতে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দও পাইয়াছি। উভয় শিল্পীই তাঁহাদের কাজে পূর্ব্বের একাগ্রতা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত পাণিকর "গ্রামের

'ডইংরুম আসবাবপত্র'—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পরিকল্পিত

হাট" ছবিখানিতে রং ও রচনায় অভিনবত্ব দেখাইয়া তাঁহার পূর্ব্বের স্ট্যাণ্ডার্ড খানিকটা বজায় রাখিয়াছেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছোট ছবির মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজমের অঙ্কিত "বর" ছবিখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিটি সুন্দর রেখা এবং টোন্ ভ্যালুর গুণে চিত্তাকর্ষক

পূর্ব্ব রাগ—শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জ্জী

হইয়াছে। কিন্তু ছবির নামকরণ আমার মতে ঠিক হয় নাই। ঐরূপ রূপবান্ বরের শ্বশ্রূ অথবা শ্যালক হইবার লোভ কাহারও প্রবল হইয়া উঠিবে কি না জানি না। যদি দুর্ঘটনাবশত হয়ই, তাহা হইলে বুঝিব—শ্বশ্রূ মারা পড়িয়াছে, শ্যালকটি বাঁচিয়াছে। আমরা তো বলিয়াই থাকি—'হতভাগা শালা।' ছবির চোখের ঢুলু ঢুলু ভাব এবং বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়া "নেশা ধরিয়াছে" নামকরণটাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত হইত বলিয়া মনে হয়। যাক্,

শীতের সন্ধ্যা—শিল্পী শ্রী কে-সি-এস্ পানিকর

ছবির বিচার যখন করিতে বসিয়াছি, তখন নামের বিচার লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করি না।

ইহার পর ডেকোরেটিভ্ চিত্রবিভাগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই বিভাগে সুশীল মুখার্জ্জির ছবিগুলি অন্যান্য শিল্পীর ছবিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। সহজলভ্য উজ্জ্বলতার সস্তা প্যাঁচ মারিয়া নয়, বর্ণসমাবেশ এবং রচনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে। শিল্পীর কম্পোজিশনের জ্ঞান অতি চমৎকার। নির্ভুল কম্পোজিশন্ ও যথাযথ টোন্-ভ্যালুর গুণে ডেকোরেটিভ্ ছবি যে কত সুন্দর হইয়া ওঠে, তাহা এই তরুণ শিল্পীর কাজ দেখিলে বোঝা যায়। "মায়াপুরী"—শিল্পী সুশীল মুখার্জ্জি। ছবিটি ঘিরিয়া কেমন একটা ভীতিপ্রদ থম্‌থমে ভাব, অথচ রোম্যান্সেরও অভাব নাই। সত্যই মায়াপুরী বটে। খুঁজিলেই বুঝি সোনার
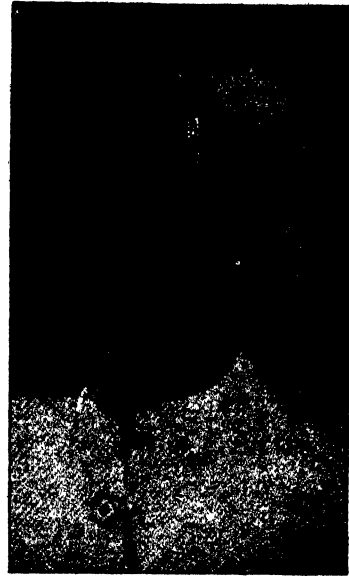
বর—শিল্পী শ্রীরাজম্

কাঠি, রূপার কাঠি এবং তৎসহ ঘুমন্ত রাজকন্যার দেখাও মিলিতে পারে। "কুটীরবাসিনী" উক্ত শিল্পীরই অঙ্কিত আর একখানি ছবি। রসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বাঙ্গালী-ধরণে শাড়ী-পরা একজন মহিলাকে দেখিয়া কে জানিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। একটি ছাত্রশিল্পীকে প্রশ্ন করিতেই জানিতে পারিলাম—উনি এই স্কুলেরই ছাত্রী শ্রীমতী আইরিশ্ খান্, বাঙ্গালী। সুদূর কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে শিল্প শিক্ষার্থিনী হইয়া আসিয়াছেন। মহিলাটিকে দেখিয়া আমার ভিতরের সমালোচক নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাঁহার ছবি

খুঁজিয়া বাহির করিলাম। শ্রীমতী খান্ অঙ্কিত "বধূ" ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের বধূর বয়সের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। গৌরীদানও হয়, আবার মরিবার

শেষ বিদায়—শিল্পী শ্রীদামোদর

দুইদিন পূর্ব্বেও বিবাহ হয়। বধূটি পুরাতন। তাহা হউক্। মোটমাট চলিয়া যায়। অন্তত গহনা পরান চলে।—"কুঙ্কুম ডেকোরেটার"—শিল্পী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছবিখানি মোটের উপর ভালই হইয়াছে। তবে শচীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের যে কাজ দেখিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে বলিব এই ছবিখানি তাঁহার স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখে নাই।—শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়িলেই অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পীরই যে এই দুর্দ্দশা হয় তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা জাতীয় কলঙ্ক, শিল্পীর নয়। কারণ শিল্পীকে বাঁচিতে হয় অর্থের বিনিময়ে রসকে সমাধিস্থ করিয়া। আমাদের দেশের এই শিল্পীদের কথা মনে করিয়া মন সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ চলিয়াছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলিতে দেখিলাম—একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তির নিকট আসিয়া পড়িয়াছি। রসগ্রাহী মন নূতন রসের সন্ধান পাইয়া সব কিছু ভুলিয়া গেল। "দি রোড্ মেকার"—ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির তেজিয়ান প্রকাশভঙ্গীতে শিল্পী নিজের গুরুর নাম বজায় রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আর্ট স্কুল এবং তাহাদের চিত্র ও মূর্ত্তির প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের ভাস্কর্য্য বিভাগ যে অন্যান্য আর্ট স্কুল অপেক্ষা কত বেশী উন্নত কৃষ্ণমূর্ত্তির এই মূর্ত্তিটি আমার সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করিল।

ইহার পরই শ্রীযুক্ত শা (বোম্বাই জে. জে. আর্টস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র) গঠিত "শিকারী" মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য। শিকারী অব্যর্থ সন্ধানে তাহার বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়া শিকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে। মূর্ত্তিটি একেবারে অভিনব না হইলেও মোটামুটি সুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ছবি এবং মূর্ত্তি দেখিয়া বেড়াইলাম। ছাত্র ও ছাত্রী শিল্পীদের কাজের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দও পাইলাম, কিন্তু একটা জিনিষের অভাব মনকে সর্ব্বক্ষণই পীড়া দিতে লাগিল। শিল্পী দেবীপ্রসাদ এইবারকার প্রদর্শনীতে একটিও ছবি কিংবা মূর্ত্তি দেন নাই। এই বিরাট অভাব পূর্ণ করা কি উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। বেশ একটু মনক্ষুণ্ণ হইয়াই মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ বাধা পাইয়া দাঁড়াইলাম।

প্রসাধন—শিল্পী শ্রীশচীন্দ্র মুখার্জ্জী

মনুষ্যদেহের সহিত ধাক্কা লাগিয়াছে। মুখ তুলিতে দেখি একজন খাঁটি মেমসাহেব।

ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। বেয়াদপি হইল না ত? আপনা হইতেই মুখ হইতে কথা বাহির হইল, "মাপ করবেন…… আমি…"

বার্দ্ধক্য—শিল্পী অমলরাজ

ভদ্রমহিলা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি অন্যমনস্ক ছিলে। লজ্জিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই।" তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মিস্টার রায় চৌধুরীর ছবি ও মূর্ত্তি কোথায় রাখা হইয়াছে আমাকে বলিতে পার?"…

এইবারকার প্রদর্শনীতে দেবীপ্রসাদের ছবি এবং মূর্ত্তি না দেওয়ার পিছনে কোন বিশেষ কারণ আছে কি-না জানি না। তবে ইহাতে বহু দর্শকই যে রীতিমত মনক্ষুণ্ন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিত্রগৃহ হইতে বাহির হইয়া কারুশিল্প-প্রদর্শনী-গৃহে প্রবেশ করিলাম। এইবার মাদ্রাজ স্কুলের কারুশিল্পের প্রত্যেকটি 'ডিজাইনেই' বেশ একটু বৈশিষ্ট্য দেখিলাম। কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম—ডিজাইনগুলি প্রায় সমস্তই দেবীপ্রসাদের।

এচিং বিভাগের নিকট আসিয়া চমৎকৃত হইলাম। এতদিন মনে যে অভিলাষ পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইল। দেবীপ্রসাদ এচিং করিয়াছেন। রং ও পাথর ছাড়িয়া শিল্পী মাত্র রেখা দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শুধু এচিং করেন নাই, এচিং করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহার রেখার জোরের সামনে ভারতীয় অন্য কোন শিল্পীর এচিং ক্ষুদ্র এবং সাধারণ মনে হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশের শিল্পীরা দুর্ব্বল হস্তের আঁকা-বাঁকা রেখাকে কি বলিয়া যে ছন্দপ্রধান বলিয়া চালান, তাহা ভাবিয়া মর্ম্মাহত হই। মনে পড়িল কোন বিখ্যাত বিদেশী সমালোচকের একটি কথা, "Delicacy of line comes from strength and strength alone." দেবীপ্রসাদের এচিং-এ শক্তিমান হস্তের টান রেখাগুলিকে লীলায়িত এবং সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

দেবীপ্রসাদের ছবি ও মূর্ত্তি না দেখায় মনে যে অভাব অনুভব করিতেছিলাম তাহা কতকটা পূরণ হইল। মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না। ভারতের শিল্পী কর্ম্মবীর দেবীপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হইয়া প্রতিবৎসর নূতন নূতন তেজীয়ান শিল্পী গড়িয়া ভারতীয় শিল্পের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনুন, আমাদের দেশকে আবার শিল্প-সভায়

দি রোড্ মেকার

উচ্চ আসন লাভ করিতে সাহায্য করুন, একান্তভাবে ইহা কামনা করি।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

এগারো

পদ্মের মূর্চ্ছা—ক্রমে মূর্চ্ছার ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গেল।

বন্ধ্যা পদ্মের সবল পরিপুষ্ট দেহখানি কয়েক মাসের মধ্যেই দুর্ব্বল শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে পদ্ম; এই শীর্ণতায় এখন তাহাকে অধিকতর দীর্ঘাঙ্গী বলিয়া মনে হয়; দুর্ব্বলতাও বড় বেশী চোখে পড়ে, চলিতে ফিরিতে দুর্ব্বলতাবশত সে যখন কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আত্মসম্বরণ করে, তখন মনে হয় দীর্ঘাঙ্গী পদ্ম যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বলিষ্ঠ ক্ষিপ্রচারিণী পদ্মের প্রতি পদক্ষেপে এখন ক্লান্তি ফুটিয়া ওঠে—ধীর মন্দগতিতে চলিতে চলিতেও তাহার পা যেন কাঁপে। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রখর হইয়া উঠিয়াছে দুর্ব্বল পাণ্ডুর মুখের মধ্যে পদ্মের ডাগর চোখ দুইটা অনিরুদ্ধের সখের শাণিত বগি-দাখানায় আঁকা পিতলের চোখ দুইটার মত ঝকমক করে; স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ শিহরিয়া ওঠে।

অনটনের দুঃখের উপর এই দারুণ দুশ্চিন্তায় অনিরুদ্ধ বোধ করি পাগল হইয়া যাইবে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন এই কয়মাসে সাধ্যমত কিছু করিতে সে বাকী রাখে নাই। জগন ডাক্তার, কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তার, জংশনের রেলের ডাক্তার—সকলকেই সে দেখাইয়াছে। ডাক্তারের পর কবিরাজ, কবিরাজও দেখানো হইয়াছে।

জগন বলিয়াছে—মৃগীরোগ।

হাসপাতালের ডাক্তার, রেলের ডাক্তার বলিয়াছে—এ একরকম মূর্চ্ছারোগ। বন্ধ্যা মেয়েদেরই নাকি এ রোগ বেশী হয়।

কবিরাজ বলিয়াছে—বায়ুরোগ।

পাড়া-পড়শীরা কিন্তু প্রায় সকলেই বলে—দেবরোষ! বাবা বুড়াশিব—মা ভাঙ্গাকালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই! নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয়! কিন্তু অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করে না। তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না। তাহার ধারণা দুষ্ট লোকে তুক করিয়া এমন করিয়াছে। ডাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব দেশে এখনও হয় নাই। ছিরুর বন্ধু চন্দ্র গড়াঞী এ বিদ্যায় ওস্তাদ। সে বাণ মারিয়া মানুষকে পাথরের মত পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। পদ্মের একটা কথা যে, তাহার মনে অহরহ জাগিতেছে।

প্রথম দিন প্রথম মূর্চ্ছা জগন ডাক্তার ভাঙাইয়া দেওয়ার পর—সেই রাত্রেই ভোরের দিকে পদ্ম ঘুমের ঘোরে একটা চীৎকার করিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নিষুতি রাত্রে অনিরুদ্ধ আর জগনকে ডাকিতে পারে নাই, আর সেই রাত্রে মূর্চ্ছিতা পদ্মকে ফেলিয়া তাহার যাওয়ারও উপায় ছিল না। কষ্টে কষ্টে পদ্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার বড় ভয় লাগছে গো!

—ভয়? ভয় কি? কিসের ভয়?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম—

—কি? কি স্বপ্ন দেখলি? অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলি কেনে?

—স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত একটা কাল কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরছে।

—সাপ?

—হ্যাঁ, সাপ! আর—

—আর?

—সাপটা ছেড়ে দিয়েছে—ওই মুখপোড়া—

—কে? মুখপোড়া কে?

—ওই শত্রু!—ছিরে মোড়ল। সাপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের সদর দুয়োরের চালাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পদ্ম আবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে আছে। পদ্মের অসুখের কথা

মনে হইলেই—ওই কথাটাই তাহার মনে পড়ে। ডাক্তারেরা যখন চিকিৎসা করিতেছিল, তখন মনে হইলেও কথাটাকে সে আমল দেয় নাই। কিন্তু দিন দিন ধারণাটা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। সে রোজার কথা ভাবিতেছে, অথবা কোন দেবস্থল!

তাহার এই ধারণার কথা বিশেষ কেহ জানে না, পদ্মকেও সে বলে নাই। বলিয়াছে কেবল—মিতা গিরীশ ছুতারকে। জংশনের দোকানে যখন তাহারা যায়, তখন অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। অনেক কল্পনাই দুজনে করে। সমস্ত গ্রামই এখন একদিক, তাহাদিগকে জব্দ করিবার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। ছিরু পালকে এখন নামে গ্রামের প্রধান খাড়া করিয়া দেবদাস ঘোষ বসিয়া বসিয়া কল টিপিতেছে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আরও কয়েক জন আছে—জগন ডাক্তার ও পাতু বায়েন। তারাচরণ নাপিতের সঙ্গে হাঙ্গামাটা মিটিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকেই মিটাইতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নাপিতের প্রয়োজন বড় বেশী। জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত প্রতিটি ক্রিয়ায় নাপিতকে চাইই। তারাচরণ এখন নগদ পয়সা লইয়াই কাজ করিতেছে, রেট অবশ্য বাজারের রেটের অর্দ্ধেক, কেবল দাড়ি-গোঁফ কামাইতে এক পয়সা, চুল কাটিতে দু'পয়সা, চুলকাটা এবং কামানো একসঙ্গে হইলে তিন পয়সা। অন্যদিকে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে নাপিতের প্রাপ্যও কমিয়া গিয়াছে। নগদ বিদায় ছাড়া—চাল কাপড় ইত্যাদি যে পাওনা নাপিতের ছিল, সেটার দাবী নাপিত পরিত্যাগ করিয়াছে। তারাচরণ নাপিত ঠিক কোন দিকেই নয়, অনেকটা নিরপেক্ষ ব্যক্তি। জগন—অথবা অনিরুদ্ধ বা গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলে চুপি চুপি সে গ্রামের লোকের সকল পরামর্শের কথাই বলিয়া যায়। আবার অনিরুদ্ধ জগন গিরীশের সংবাদ গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করিলে তাও কিছু কিছু বলে। এ স্বভাবটা তাহার নূতন নয়, চিরকালের; শুধু তাহারই বা কেন—এ স্বভাবটা তাহাদের জাতিগত। রাজ্যের সংবাদ তাহাদের নখদর্পণে। ধনী দরিদ্র সকলের ঘরেই তাহাদের যাওয়া-আসা নিয়মিত সপ্তাহে দুই দিন বা এক দিন আছেই; রামকে কামাইতে বসিয়া শ্যামের বাড়ীর গল্প করে, যদুর বাড়ীতে গিয়া গল্প করে রামের। তবে তারাচরণের আকর্ষণ অনিরুদ্ধ গিরীশ জগনদের দিকেই একটু বেশী। পাতুর সহিত সম্বন্ধ তাহার নাই। কিন্তু জগনকে দরকার অসুখ-বিসুখ, অনিরুদ্ধকে প্রয়োজন ক্ষুর নরুণের জন্য—এ ছাড়াও তারা-নাপিত জংশনে গিয়া ক্ষুর ভাঁড় লইয়া হাটের পাশেই একটা গাছতলায় বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচখানা গ্রামে তাহার যজমান আছে, তাহার মধ্যে তিনখানার কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। বাকী দুইখানার একখানি নিজের গ্রাম—অপরখানি মহুগ্রাম। মহুগ্রামের ঠাকুর মশায় বলেন মহাগ্রাম, এই ঠাকুর মহাশয় শিবশেখর ন্যায়তীর্থ জীবিত থাকিতে ও গ্রামের কাজ ছাড়া অসম্ভব। ন্যায়তীর্থ সাক্ষাৎ দেবতা। এই দুইখানা গ্রামে দুদিন বাদে—সপ্তাহের পাঁচদিন সে অনিরুদ্ধ গিরীশের সঙ্গে সকালে উঠিয়া জংশনে যায়। এই যাওয়া আসার জন্যও বটে এবং আরও একটা অকারণ গোপন সহানুভূতি তারাচরণ অনিরুদ্ধ গিরীশ এবং জগনের জন্য অনুভব করে—যাহার জন্য আকর্ষণ একটু ইহাদের দিকেই বেশী।

পদ্মের অসুখ সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা অনিরুদ্ধ গিরীশকে বলিলেও তারাকে বলে নাই। তারাচরণকে তাহারা জানে—সে যেমন তাহাদের সম্পূর্ণরূপে যোগ দেয় নাই, তেমনি তাহারাও তাহাকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু তারাচরণ অনেক সন্ধান রাখে, ভাল রোজা, জাগ্রত দেবতার অথবা প্রেত দানার স্থান, যেখানে ভর হয়—এ সবের সন্ধান তারা নাপিত দিতে পারে। অনিরুদ্ধ ভাবিতেছিল—তারা নাপিতকে কথাটা বলিবে কি না!

সেদিন মনের আবেগে অনিরুদ্ধ কথাটা তারাচরণের পরিবর্ত্তে বলিয়া ফেলিল জগন ডাক্তারকে। দ্বিপ্রহরে জংশনের কামারশালা হইতে ফিরিয়া অনিরুদ্ধ দেখিল, পদ্ম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কখন যে মূর্চ্ছা হইয়াছে—কে জানে! মুখে চোখে জল দিয়াও চেতনা হইল না। কামারশালায় তাতিয়া পুড়িয়া এতটা আসিয়া অনিরুদ্ধের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তিতে ক্রোধে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া—পদ্মের চুলের মুঠি ধরিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করিল। কি পদ্ম অসাড়। চুল ছাড়িয়া দিয়া তাহার-মুখের দিকে চাহি

থাকিতে থাকিতে অনিরুদ্ধের বুকের ভিতরটা কান্নার আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিল জগন ডাক্তারকে। জগনের তেজী ওষুধের ঝাঁঝে পদ্ম অচেতন অবস্থাতেই বারকয়েক মুখ সরাইয়া লইয়া—অবশেষে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল।

ডাক্তার বলিল—এই চেতন হয়েছে। কাঁদছিস কেন তুই?

অনিরুদ্ধের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছিল। সে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠেই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখুন দেখি ডাক্তার! আগুন তাতে পুড়ে এই এককোশ দেড়কোশ ওসে আমার ভোগান্তি দেখুন দেখি!

ডাক্তার বলিল—কি করবি বল? রোগের ওপর তো হাত নেই! এ তো আর কেউ ক'রে দেয় নাই।

অনিরুদ্ধ আজ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল—মানুষ। মানুষেই ক'রে দিয়েছে ডাক্তার; আর আমার এতটুকু সন্দেহ নাই। রোগ হ'লে এত ওষুধ এত পত্র—একটুকু বারণ শোনে না! এ মানুষের কীর্ত্তি।

জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে নাই, রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেকশন দিয়াও সে দেবতার চরণোদকের উপর ভরসা রাখে, সে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তা যে না হ'তে পারে, তা নয়। ডাইনী ডাকিনী দেশ থেকে একবারে যায় নাই। কিন্তু ডাক্তারে তো তা বিশ্বাস করে না। ওরা বলছে—

বাধা দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বলুক। এ কীর্ত্তি ওই হারামজাদা ছিরের। ক্রোধে ফুলিয়া সে এতখানি হইয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে জগন প্রশ্ন করিল—ছিরের?

—হ্যাঁ, ছিরের! ক্রুদ্ধ আবেগে অনিরুদ্ধ সেই স্বপ্নের কথাটা আনুপূর্ব্বিক ডাক্তারকে বলিয়া বলিল—ওই যে চন্দ্র গড়াঞী, ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু—ও শালা ডাকিনী বিদ্যে জানে। যোগী গঁড়ায়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ ক'রে বের ক'রে নিলে—দেখলেন তো! ওকে দিয়েই এই কীর্ত্তি করেছে ছিরে!

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল জগন, কিছুক্ষণ পর বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

ক্রোধে অনিরুদ্ধের ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না। পদ্ম এই কথা-বার্ত্তার মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল। অনিরুদ্ধের ধারণার কথাটা শুনিয়া সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেদিনের স্বপ্নটা আনুপূর্ব্বিক তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। সেই কালো সাপটা, দৈত্যের মত ছিরু পালের হাস্যবীভৎস মুখ, মনে পড়িয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তাহার বগি-দাখানার কথা। কোথায় সেখানা?

জগন আবার বলিল—তাই তুই দেখ্ অনিরুদ্ধ; রোজা-কি দানা হ'লেই ভাল হয়! তারপর সহসা বলিল—দেখ্, একটা কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দেখিস তুই এ ঠিক ফ'লে যাবে। নিজের বাণে বেটা নিজেই মরবে।

অনিরুদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে জগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জগন বলিল—সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস?

—কি?

—বংশ বৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়। তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে ম'রে—তোর ঘরে এসে জন্মাবে। তোর নাই, কিন্তু ও নিজে থেকে দিয়েছে।

জগনের এই বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া অনিরুদ্ধ বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত হইয়া গেল; চোখ দুইটা তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে জগনের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া জগন বিজ্ঞভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল-দেখিস, আমি ব'লে রাখলাম! এর পরে আমাকে বলিস।

পদ্মের মাথার ঘোমটা অল্প সরিয়া গিয়াছে, সেও স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল সম্মুখের দিকে। তাহার মনে পড়িয়া গেল—ছিরুর শীর্ণ গৌরবর্ণা স্ত্রীর কথা। তাহার চোখ মুখের মিনতি, তাহার সেই কথা—'আমার ছেলে দুটিকে যেন গাল দিয়ো না ভাই! তোমার পায়ে ধরতে এসেছি আমি!'

জগন ও অনিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জগন বলিল—চিকিৎসে অবিশ্যি এর তেমনি কিছু নাই। তবে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা থাকে, এমনি একটা

কিছু চলুক। আর তুই বাপু, একবার সাওগ্রামের শিবনাথতলাটাই না হয় ঘুরে আয়। শিবনাথতলার নাম ডাক তো খুব!

শিবনাথতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা শোকার্ত্তা মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার মৃত পুত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে, প্রেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। সেই অবসরে নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া রোগ দুঃখ অভাব অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন করে, প্রেতাত্মা সে সবের প্রতিকারের উপায় বলিয়া দেয়।

অনিরুদ্ধ বলিল—তাই দেখি।

—দেখি নয়, শিবনাথতলাতেই যা তুই। দেখ্ না কি বলে!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ একটু হাসিল—ম্লান হাসি। বলিল—এদিকে যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে ডাক্তারবাবু, এগিয়ে যাই কি ক'রে!

ডাক্তার অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল, অনিরুদ্ধ বলিল—আমার পুঁজি ফাঁক হয়ে গেল ঘোষমশাই, বর্ষাতে হয়তো ভাত জুটবে না। বাকুড়ির ধান মূলে-চুলে গিয়েছে, গাঁয়ের ধান লোকে দেয় নাই, আমিও চাইতে যাই নাই; তার ওপর মাগীর রোগে কি খরচটা গেল, তা তো আপনি সবই জানেন! শিবনাথের শুনেছি বেজায় খাঁই।

প্রেত-দেবতা শিবনাথ রোগ দুঃখের প্রতিকার করিয়া দেয়—কিন্তু বিনিময়ে তাহার মাকে মূল্য দিতে হয়। সেটা হাজির করিতে হয় প্রথমেই।

জগন বলিল—পাঁচ দশ টাকা হ'লে না হয় কোন রকমে দেখতাম অনিরুদ্ধ, কিন্তু বেশী হ'লে তো—

অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—ডাক্তারের অসমাপ্ত কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, তাতেই হবে ডাক্তারবাবু, তাতেই হবে; আরও কিছু আমি ধার-ধোর ক'রে চালিয়ে নোব। গিরীশের কাছে কিছু নোব, আর আপনার দুগ্‌গার কাছে—

ডাক্তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—দুগ্‌গা?

অনিরুদ্ধ এবার হাসিয়া ফেলিল, তারপর মাথা চুলকাইয়া একটু লজ্জিতভাবেই—পেতো মুচির বোন দুগ্‌গা।

চোখ দুইটা বড় করিয়া ডাক্তারও এবার হাসিল—ও! তারপর আবার প্রশ্ন করিল—ছুঁড়ির হাতে টাকাকড়ি আছে, নয়?

—আছে। শালা ছিরের অনেক টাকা ও নিয়েছে। তা ছাড়া কঙ্কণার বাবুদের কাছে ও বেশ পায়। পাঁচ টাকার কমে হাঁটেই না।

—ছিরের সঙ্গে নাকি এখন গোলমাল হয়েছে শুনলাম?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বাড়ী ঢুকতে দেয় না। আমার কাছে একখানা বগি-দা করিয়ে নিয়েছে; বলে—খ্যাপা কুকুরকে বিশ্বাস নাই। রাত্রে সেখানা হাতের কাছে নিয়ে ঘুমোয়।

—বলিস কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু, কেন বল দেখি?

ঠোঁট দুইটা টিপিয়া চোয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া অনিরুদ্ধ কেবল কয়েকবার ঘাড় নাড়িয়া দিল—অর্থাৎ সে কারণটা কোন ক্রমেই জানা যায় নাই।

ডাক্তারও এবার চুপ করিয়া রহিল, সেও মনে মনে কারণটা অনুমান করিবার জন্যই চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনিরুদ্ধও অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল—সে মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছে টাকাটার প্রতিশ্রুতির জন্য। গিরীশের এখন কাজের মরসুমের সময়, তাহার কাছে গোটা পাচেক খুব পাওয়া যাইবে, আর দুর্গার কাছে গোটা পাঁচেক। শুধু-হাতে দুর্গা একটি পয়সা কাহাকেও দেয় না, তবে ওই দা-খানা গড়ানো লইয়া অনিরুদ্ধের সহিত ইদানীং কিছুখানি হৃদ্যতা তাহার হইয়াছে।

আজকাল দুর্গা জংশনে প্রায় নিত্যই যায় দুধের যোগান দিতে, ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের কামারশালায় একটি বিড়ি খাইয়া আসে, সরস হাস্য পরিহাসে কথা-কাটাকাটি করে; অনিরুদ্ধও সকালে বিকালে জংশন যাওয়া-আসার পথে দুর্গার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যায়, দুর্গাও একটি করিয়া বিড়ি দেয়; বিড়ি টানিতে টানিতে দাঁড়াইয়াই দুই-চারিটা কথাবার্ত্তা হয়। দাখানাকে উপলক্ষ করিয়া হৃদ্যতাটুকু অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে একদিন

লোহা কিনিবার একটা গুরুতর প্রয়োজনে—টাকার অভাবে অনিরুদ্ধ বিব্রত হইয়া চিন্তিত মুখেই কামারশালায় বসিয়া ছিল, সেদিন দুর্গা আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—এমন ক'রে ব'সে কেন হে ?

দুর্গাকে বিড়ি দিয়া নিজেও একটা বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ কথায় কথায় সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছিল ; দুর্গা সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিল—চারদিন পরেই কিন্তু দিতে হবে ভাই।

অনিরুদ্ধ সে টাকাটা চারদিন পরেই দিয়াছিল। দুর্গা সেদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—সোনার চাঁদ খাতক আমার !

সেই কারণেই প্রত্যাশা আছে—দুর্গা কোন কিছু বন্ধক না লইয়াই হয় তো পাঁচটা টাকা দিবে। এখন জগনের প্রতিশ্রুতিটা পাইলেই হয়। সে গম্ভীর হইয়া পায়ের আঙুল দিয়া পথের উপর দাগ কাটিতেছিল। কিছুক্ষণ পর ঈষৎ দুলিতে দুলিতে বলিল—তা হ'লে হ্যাঁ গো ডাক্তারবাবু—

সচেতন হইয়া ডাক্তার বলিল—ছিরে তা হ'লে আর কারও সঙ্গে মজল না কি ?

অনিরুদ্ধ বলিল—দশটা টাকা হ'লেই আমার হবে।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া গেল।

—তা হ'লে কবে দেবেন ?

—আমাকে কিন্তু শীগগির দিতে হবে বাপু !

—নিশ্চয়! সে আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন। মাথায় ক'রে টাকা আমি দিয়ে আসব আপনার।

—হ্যাঁ। সেই কথা তুই ভাল ক'রে বুঝে দেখ্। এক মাসের মধ্যেই কিন্তু—

—নিশ্চয় ; আজ্ঞে নিশ্চয়। অনিরুদ্ধ মুখর হইয়া উঠিল। —আর কলের কাজটা যদি হয়ে যাচ্ছে আজ্ঞে—তবে—পনরো দিনের মধ্যে, পার হতে দোব না পনরো দিন—দেখবেন আপনি।

—কল ? কলে কি কাজ ?

—ফিটারের কাজ আজ্ঞে। সেদিন আগরওয়ালার মিলে কল খারাপ হয়েছিল, ইঞ্জিন আর চলে না। একটা বল্টু খারাপ হয়েছিল—সেটা আর কিছুতেই কেটে বার করতে পারে নাই ওদের মিস্ত্রী। আমি মশায় বার ক'রে দিয়েছিলাম। তাই আগরওয়ালা মশাই বলেছেন, কলে কাজ কর তুমি। অনিরুদ্ধের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার গম্ভীরভাবেই বলিল—আচ্ছা, তা হ'লে কাল যাস একসময়। আমি চলি এখন।

জগন চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল—পদ্ম তেমনিভাবেই বসিয়া আছে। তাহাকে আর কিছু বলিল না, কতকগুলা কাঠকুটা উনানের মুখে আনিয়া উনান ধরাইতে বসিল। রান্না করিতে হইবে। তাহার পর ছুটিতে হইবে জংশনে। রাজ্যের কাজ বাকী পড়িয়াছে !

পদ্ম কাহাকে ধমক দিতেছে—যা !

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কেহ কোথাও নাই, কাক কি কুকুর কি বিড়াল, তাও কোথাও নাই। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ?

পদ্মও উত্তরে প্রশ্ন করিল—কি ?

অনিরুদ্ধ একেবারে খেপিয়া গেল, বলিল—খেপেছিস না কি তুই ? কিছু কোথাও নাই, ধমক দিচ্ছিস কাকে ?

পদ্ম এবার লজ্জিত হইয়া পড়িল ; শুধু লজ্জিতই নয় একটু অধিক মাত্রায় সচেতন হইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া উনানশালে আসিয়া বলিল—সর ; আমি এইবার পারব। তুমি যাও চান ক'রে এস।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। আর সে পারিতেছে না।

তাহার অনুপস্থিতিতে যদি পদ্মের রোগ উঠিয়া পড়ে ! সে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল। পড়ে পড়ুক, সে আর পারে না !

পদ্ম রান্না চাপাইল। ভাতের সঙ্গে কতকগুলা আলু একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কতগুলি মসুরীর ডাল ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ স্নানে গিয়াছে। বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই। নির্জ্জন-নিঃসঙ্গ অবস্থায় আজ অহরহ মনে হইতেছে তাহার স্বপ্নের কথাগুলি, ডাক্তারের কথাগুলি। ছিরু পালের বড় ছেলেটা তাহার মাকে কি ভালই না বাসে !

ওই—ওই কি আসিবে ?

ধবক্ ধবক্ করিয়া তাহার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির শীর্ণ গৌরাঙ্গী মা পদ্মের

দিকে মিনতিভরা চোখে চাহিয়া আছে। পদ্ম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পাল-বধূর সন্তান গেলে আবার হইবে। আট নয়টি সন্তান তাহার হইয়াছে। আবার নাকি সে সন্তান-সম্ভবা!

পদ্ম অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছিরু পাল বীভৎস হাসি হাসিতেছে তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া! উনানে আগুন বেশ প্রখর শিখাতেই জ্বলিতেছিল, তবুও সে কাঠগুলাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—আঃ ছি—ছি!

তারপরই সে ডাকিল পোষা বিড়ালটাকে—মেনী, মেন্নী, আঃ—আঃ! পুষি!

ছেলে না হইলে ঘর, না—মেয়ের জীবন! একটি শিশু থাকিলে কত আবোল-তাবোল সে বকিত! গল্পে যে সেই বলে—পোড়াকপালী বলিয়া বন্ধ্যা রাজরাণীর ভিক্ষা সন্ন্যাসী লয় নাই, সে মিথ্যা কথা নয়। নিঃসন্তানীর মুখ দেখিতে নাই।

বারো

জগন ঘোষ কামাইতে বসিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিল তারা নাপিতকে।

কামাইতে বসিয়া তারাচরণ কথা কয় মৃদু স্বরে, গোপন-কথা-বলার বেশ একটি ভঙ্গি থাকে। জগন বলিল—তুই একটু সন্ধান নিতে পারিস তারা?

বাটি হইতে জল লইয়া দাড়িতে ঘষিতে ঘষিতে তারা বলিল—সে কি আর বলবে ছিরু পাল? তবে—

জগন ক্ষুরের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়াও যথাসাধ্য তীর্য্যক ভঙ্গিতে তারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তবে?

হাসিয়া তারা বলিল—রঙের মুখ হ'লে বলতে পারে।

—তোর সঙ্গে রঙ চলে নাকি?

তারাচরণ একটু লজ্জিত হইল। সোজা উত্তর না দিয়া আরও একটু হাসিয়া বলিল—এই দিন কয়েক সবুর করুন। রঙ-ফিষ্টি একদিন ভাল ক'রেই করবে ছিরু।

আড়ষ্টভাবেই হাসিয়া ডাক্তার বলিল—তুমি বেটা আছ বেশ। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, আঁশ নিরিমিষ সবেই আছ আলুর মত! আঃ—বেজায় কর-করে তোর ক্ষুর—তারা। জ্বলে গেল'!

ডাক্তারকে ছাড়িয়া শিলের উপর ক্ষুরটা টানিতে টানিতে তারাচরণ বলিল—হ্যাঁ, ক্ষুরে সান না দিলে আর চলছে না।

—কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? ফিষ্টি কিসের?

—জমিদারের গমস্তাগিরি নিচ্ছে ছিরু।

—গমস্তাগিরি? ডাক্তার চমকাইয়া উঠিল।

আঙুল দিয়া ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করিয়া তারাচরণ, ডাক্তারের মুখে আবার জল ঘষিতে ঘষিতে বলিল—হরু-ঠাকুর কলকাতা থেকে—নতুন একরকম ক্ষুর কিনে আনিয়েছে, সব খোলা—প্যাঁচ দিয়ে আঁটতে হয়—পাতলা এইটুকুন ইস্পাতের পাত-লাগানো থাকে, 'সেফ্‌টি' ক্ষুর না কি বলছে! চোখ বুঁজে কামানো হয়। নাপিতের ধার আর ধারবে না। মাথায় চুল রাখছে। সেই দিনের সেই রাগ, বুঝেছেন! তা টাকাও লেগেছে তেমনি—পাঁচ সাত টাকা খরচ প'ড়ে গিয়েছে। এর ওপর নাকি—ওই ইস্পাতের পাত—দু-তিন দিন অন্তর কিনতে হবে; তাও দাম ছপয়সা দু আনা!

—ছিরু পাল গমস্তাগিরি নিচ্ছে? ডাক্তার আবার প্রশ্ন করিল। হরুঠাকুরের প্রসঙ্গে তাহার মন আকৃষ্ট হইল না।

—হ্যাঁ। এই চোত কিস্তি থেকেই আদায় করবে। কথা পাকা হয়ে গিয়েছে।

—ও শালা গমস্তাগিরির জানে কি? চাষার ঘরের গাধা, আকাট মুখ্যু!

—লোক রেখে আদায় করবে। দেবু ঘোষ কাগজপত্র রাখবে।

ডাক্তার হাত দিয়া তারাচরণের ক্ষুরসুদ্ধ হাতখানা সরাইয়া দিয়া এবার উত্তেজিতভাবে হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—জমিদার ওই লোককে গমস্তাগিরি দিচ্ছে? আজ আমি পত্র লিখব—জমিদারকে।

জগনের চিবুকটা আবার করতলগত করিয়া ক্ষুর টানিতে টানিতে তারাচরণ সন্তর্পণে বার দুয়েক ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কিচ্ছু হবে না আজ্ঞে।

—কেন?

—জমিদার নিজে সেধে দিচ্ছে গমস্তাগিরি। আদায় হোক না হোক—ছিরুকে মহালের ডোলের টাকা পুরিয়ে দিতে হবে। বকেয়া আদায় হ'লে সুদ সমেত ছিরু নেবে।

ডাক্তার স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত গ্রামটাই ছি

জমিদারী হইয়া দাঁড়াইল যে! জমিদার নামে রহিল মাত্র, ছিরুর হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র মুনাফা-ভোগী হইয়া রহিল।

কামানো শেষ করিয়া শিলের উপর ক্ষুর সানাইতে সানাইতে তারা বলিল—একছত্র হ'ল এখন ছিরু। গাঁয়ের—

জগন ফাটিয়া পড়িল—তারাচরণকে বাধা দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—একছত্র! একছত্র কিসের রে? গবর্ণমেণ্টের গমস্তা হ'ল জমিদার, তার গমস্তা—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! খাজনা নেবে রসিদ দেবে, তার আবার একছত্র কিসের রে? একছত্র! ডাক্তার ক্রুদ্ধ সাপের মত নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিল।

তারাচরণ ডাক্তারকে ভাল করিয়াই জানে, সে আর একটিও কথা বলিল না। কোন কিছু বলিলেই এখন বিপদ। ডাক্তারকে সমর্থন করিলে এখনি হয়তো ডাক্তার নিজের কথারই প্রতিবাদ করিয়া গ্রামের লোকের আসন্ন সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা প্রমাণ করিতে বসিবে। সে ক্ষুর ভাঁড় গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—মৌ-গাঁয়ে যেতে হবে আজ্ঞে! ঠাকুরমশায়ের নাতি এসেছেন, চুল কাটবেন ব'লে পাঠিয়েছেন।

—ঠাকুরমশায়ের নাতি কলকাতায় পড়ে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এম-এ পড়ছেন।

—কলকাতা থেকে এসে এখানে চুল কাটবে? জগন বিস্মিত হইয়া গেল।

তারাচরণের মুখ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল, বলিল - কাপড়-চোপড় চুলকাটা—ইড্ডিং-ফিড্ডিং এ সবের দিকে তাঁর খেয়ালই নাই। খালি পড়া—পড়া—আর পড়া! বিদ্বান পণ্ডিতের বংশ, নিজে বিদ্বান। ছ টাকা দামের ক্ষুরও নাই, গরীবের ওপর রাগও নাই। ওঁদের বাড়ীতে তো আমি কখনও পয়সা চাই না, তা ঠাকুর মশায় বছরের শেষে ধানটি ঠিক ডেকে দেবেন। আর খোকাবাবু যখন চাই—নগদ পয়সা দেন।

জগন কেবল বলিল—হুঁ।

তারাচরণ রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

জগন ভুরু কুঁচকাইয়া ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছিরু পাল গমস্তাগিরি লইয়া যে গ্রামের সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই। ছিরুর সহিত যোগ দিয়াছে দেবদাস। লোকটার কূটবুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। এই তো সেদিন দিন কয়েকের জন্য তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া নবান্নের দিন মুহূর্ত্তের সুযোগে ছিরুর সহিত ভিড়িয়া গেল। সাক্ষাৎ শয়তান তাহাতে সন্দেহ নাই। খাজনা লইয়া রসিদ দিবে না, নিরক্ষরকে কম টাকার রসিদ দিবে। সুদের সুদ তস্য সুদ টানিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে। যাহাদের সহিত বিবাদ আছে, তাহাদের খাজনা না লইয়া বৎসর বৎসর নালিশ করিবে। তারাচরণ বলিয়া গেল--জমিদার ছিরুকে সাধিয়া গমস্তাগিরি দিতেছে! জমিদারকে অনুরোধ জানাইয়া কোন ফল নাই। জগন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মানুষের যখন লক্ষ্মী ছাড়ে, পতনের সময় হয়, তখন এমনি করিয়াই বুদ্ধিভ্রংশ যে হইতেই হইবে। নতুবা এ গ্রামের জমিদার-বংশটির ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাপালক বলিয়া খ্যাতি তো অনেক দিনের—তাহাদের এ দুর্ম্মতি হইবে কেন? প্রজারা পুরা খাজনা দিতে পারিতেছে না ইহা সত্য, বাজারও অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে ইহাও সত্য—কিন্তু সে কি প্রজার ইচ্ছাকৃত? ছয় টাকা জোড়া কাপড়, নুনের দর দ্বিগুণ, পাঁচ আনা সেরের তেলের দর বারো আনায় গিয়া ঠেকিয়াছে—এই বাজারে প্রজার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে না—তুমি কিসের জমিদার?

ডাক্তার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ আইনের যুগে অন্যায় করিয়া কাহারও পার নাই। লাটসাহেবের আইন-সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। সুতরাং ছিরু গমস্তা হিসাবে অন্যায় করিলে—এস-ডি-ওর কাছে দরখাস্ত করিলে—একা ছিরু নয়, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারও বাদ যাইবে না। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভাবী কালের যুদ্ধকে—একেবারে চোখের সম্মুখে রূপায়িত করিয়া ডাক্তার যুদ্ধোদ্যতের মতই দৃঢ় পদক্ষেপে পদচারণা আরম্ভ করিল।

ডাক্তারের কল্পনা আরও কতদূর অগ্রসর হইত কে জানে—কিন্তু ঠিক এই সময়েই, চণ্ডীমণ্ডপের পাশে রাস্তাটা যেখানে এই মুখেই মোড় ফিরিয়াছে, সেই মোড়ের মাথায় স্ত্রীলোকের ভয়ার্ত্ত বিলাপে চকিত হইয়া ডাক্তার সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। হরেন্দ্র ঘোষালের মা কাঁদিতেছে—সঙ্গে হরেন্দ্র বাঁ হাতে একটা ন্যাকড়া বাঁ-গালে চাপা দিয়া এই

দিকেই আসিতেছে। ইস! ন্যাকড়াটা রক্তে ভিজিয়া একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে! তাহারা আসিয়া তাহারই ডাক্তারখানার সম্মুখে থামিল। হরেন্দ্রের মা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো বাবা, সব্বনাশ হয়েছে গো; হরেন্দ আমার খুন হ'ল গো। এই দেখ গো!

হরেন্দ্রের কথা বলিবার শক্তি বোধ হয় ছিল না, সে বিনা বাক্যব্যয়ে—গালের ন্যাকড়াটা খুলিয়া ফেলিল। ডাক্তার দেখিল নখের আঁচড়ের মত সারি সারি গভীর ক্ষতচিহ্ন, একেবারে কানের পাশ হইতে ঠোঁটের পাশ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে; যেন শাণিত লোহার চিরুণি দিয়া কেহ আঁচড়াইয়া দিয়াছে। জগন শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এ-হে-হে! এ রকম কি ক'রে কাটল?

আড়ষ্ট মুখে হরেন্দ্র কি বলিল, বোঝা গেল না। হরেন্দ্রের মা হাউমাউ করিয়া—একটা সেফ্‌টী রেজার দেখাইয়া বলিল—এতেই বাবা, এতেই। একমুঠো টাকা দিয়ে—বাবা দু বিশ ধান বিক্রী ক'রে আনালে—বলে, চোখ বুজে কামানো যায়। যেমন বাবা গালে দিয়েছে—আর এমনি ক'রে কেটে নামিয়ে আনলে!

হরেন্দ্র আড়ষ্ট মুখে অস্পষ্ট ভাষায় এবার যাহা বলিল, জগন তাহা বুঝিল, হরেন্দ্র বলিল—প্রথম টানেই—একবারে ক্ষত বিক্ষত! আঃ!

জগন হাসিয়া বলিল—গালের ওপর সোজা বসিয়ে টেনেছ বুঝি? সোজা ক'রে তো বসায় না, একবারে কাত ক'রে লাগাতে হয়। এই দেখ, এমনি ক'রে। হরেন্দ্রের মায়ের হাত হইতে ক্ষুরটা লইয়া সে আপনার গালে বসাইয়া দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল—সত্যিই খুব ভাল জিনিস, অভ্যেস থাকলে সত্যিই চোখ বুজে কামানো যায়।

হরেন্দ্রের মা বলিল বামুনের ছেলে বাব', নাপিত তো নয় যে অভ্যেস থাকবে! এ গাঁয়ে সব অনাছিষ্টি বাবা নাপিতে নগদ পয়সা নইলে কামায় না, কামানের কাজ করে না, ছুতোরে বৃত্তি ছাড়লে! এ গাঁয়ের কি পিতুল আছে বাবা! মা লক্ষ্মী এ গাঁ ছেড়েছেন। তবে—ওরাই সব্বাগ্যে হা-ভাতে যাবেন, হা-ঘরে হবেন, ভিক্ষে ক'রে খাবেন। বামুনের ছেলের রক্তপাত!

হরেন্দ্র তখন তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাক্তার তাহার ক্ষতের উপর টিঞ্চার আয়োডিন বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

দিন কয়েক পর হরেন্দ্র আসিয়া ডাক্তারের ওখানে উঠিল।

ডাক্তার গভীর অভিনিবেশ সহকারে কি একটা লিখিতেছিল। হরেন্দ্র বলিল—What are you doing Doctor Ghosh? ভদ্রলোক দেখিলেই হরেন্দ্র ইংরেজীতে কথা বলে। ডাক্তার বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষে হরেন্দ্রের দিকে একবার চাহিল মাত্র, তারপর সে যেমন লিখিতেছিল—লিখিতেই থাকিল।

হরেন্দ্র বলিল—Brother, one thing—

—আঃ! কি?

—How to shave—মানে—। হরেন্দ্র বাহির করিল সেফ্‌টী রেজার, সেভিং ষ্টিক—বুরুশ ইত্যাদি কামাইবার সরঞ্জাম। আর একবার দেখিয়ে দাও।

—আজ নয়, কাল এস। আজ আর আমার সময় নাই।

—এত busy! What are you writing Doctor?

ডাক্তার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—তুমি তো ভারী অভদ্র হে! আমি কি লিখছি, কাকে লিখছি—সে কথা তোমাকে বলব কেন? যাও, এখন যাও।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সেফ্‌টী-রেজারে কামানোটা ডাক্তারের কাছে শিখিতেই হইবে। অন্যথায় সে বেশ একদফা চীৎকার করিত। সে কিছু না বলিয়াই উঠিয়া গেল। ডাক্তার তাহার পিছনের দিকে চাহিয়া বলিল—ইডিয়ট কোথাকার!

ডাক্তার একখানা বেনামী দরখাস্তের মুসাবিদা করিতেছে। দরখাস্ত একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট। ছিরু পালের নিখুঁত পরিচয় দিয়া জানাইতেছে যে, ওই ব্যক্তিকে জমিদার গমস্তা নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছে; ইহাতে নিরক্ষর সরল চাষী প্রজার সর্ব্বনাশ হইবে। এ-মতে প্রার্থনা যে, এই কার্য্য করিতে জমিদারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক। ডাক্তার আবার দরখাস্ত রচনায় মনোনিবেশ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার বাধা পড়িল।

পেনাম! ভূপাল থানদার আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার হাসিয়া বলিল—ওঃ, তোর যে সাজগোজের ভারী বাহার রে! এঁ্যা! গায়ে নতুন জামা—মাথায় সাদা পাগড়ি—। সত্যই ভূপালের পোষাকের আজ বাহার ছিল। গায়ে হাতকাটা খাকী কামিজ, মাথায় নূতন সাদা চাদরের পাগড়ি পরিয়া সে আসিয়াছে। ভূপাল সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—পাল মশায় নতুন গমস্তা হলেন কি না, উনিই বশকিস করলেন।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, শুধু বলিল—হুঁ।

—উনিই একবার পাঠালেন আপনার কাছে।

—তা হ'লে গমস্তাগিরি নেওয়া হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাক্তার অজগরের মত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার দরখাস্তটা টানিয়া লইল। ভূপাল আবার বলিল—উনিই একবার পাঠালেন আপনার কাছে।

গম্ভীর ভাবেই জগন বলিল—কেন?

ফিরিস্তি অনেক। চণ্ডীমণ্ডপের ছাওয়ানোর খড়, খাজনা, তারপরে সেটেলমেণ্টারের কথা, সরকারী সেটেলমেণ্টার আসছে কি না!

—হুঁ। ডাক্তার আবার দরখাস্তে মন দিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভূপাল আবার বলিল—তা হ'লে ডাক্তারবাবু—কি বলব?

—বল্ গিয়ে আমি যাব না।

ভূপাল বিব্রত হইল।

জগন এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল—যাও! নিকালো! নিকালো হামারা হিয়াসে! নিকালো!

(ক্রমশঃ)

শ্রদ্ধাঞ্জলি *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তুমি গেছ চলি আসিবে না ফিরে আর
জানি নিশ্চয়, তথাপি অমর স্মৃতি
এই দীপালোকে নয়নে আনে তোমার
সৌম্য শান্ত প্রেমময় প্রতিকৃতি।

কালের সাগর তোমারে করেছে গ্রাস।
জলধিশয়নে শেষশয্যার 'পরে
রয়েছ নিলীন, অঙ্গে জ্যোতির্বাস,
নাগ-পালঙ্কে ভাসিছ রত্নাকরে।

আজি পড়ে মনে—শুনেছিনু ছেলেবেলা
কিংবদন্তী—বাংলার এক গ্রামে
দীঘির সলিলে সাঁতারিয়া করে খেলা
চড়কের গাছ, ঘাটে এসে পুন থামে

বৎসরান্তে সংক্রান্তির দিনে।
পল্লীবাসীরা তাহারে টানিয়া তোলে
মাটিতে পুঁতিয়া চক্র প্রদক্ষিণে
ঘূর্ণ্যাবর্তে গাজনের গাছে ঝোলে।

উৎসবশেষে সে গাছের গুঁড়িটিরে
সলিলসমাধি দেয় পল্লীর বাসী,
সম্বৎসর থাকে সুগভীর নীরে
চৈত্রাবসানে আবার ওঠে সে ভাসি।

শ্রাদ্ধবাসরে আজি এ 'রবিবাসর'
স্থাণুসম তব প্রাংশু স্মৃতির শাখী,
করেছে প্রোথিত এই ভিত্তির পর,
মিলিত কণ্ঠে সাদরে তোমারে ডাকি।

স্মৃতি-উৎসবে তোমারে স্মরণ করি
হৃদয়ে হৃদয়ে হও তুমি সমাসীন,
শ্রদ্ধাঞ্জলি এনেছি দুহাত ভরি'
দাদা জলধর মোদেরে আশীষ দিন।

* স্বর্গত রায় বাহাদুর জলধর সেনের দ্বিতীয় মৃত্যু সাম্বৎসরিক উপলক্ষে।

কীর্তন ও সুরকারু

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অনেকের মুখেই এই ধরণের একটা অভিযোগ শোনা যায় যে, বাঙালীর কীর্তন নাকি শুধুই কথা বা কাব্য ওরফে ভক্তিজাতীয় বিকাশ—সঙ্গীত-রসিকরা ওর কাছ থেকে বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক আনন্দ পেতে পারেন না—কেন না সাঙ্গীতিক রস পরিবেষণ করা না কি কীর্তনের স্বধর্ম নয়। একথা অতি হসনীয়। কীর্তনের ভাব এত হৃদয়স্পর্শী হ'তে কথনোই পারত না—যদি ওর সুরকারু অমন অপরূপ হ'য়ে না উঠত। এ সম্বন্ধে আলাদা প্রবন্ধ অবতারণা করতে এ গৌরচন্দ্রিকা নয়ঃ এর উদ্দেশ্য হাতে কলমে সাধ্যমত কিছু ক'রে দেখানো। চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত গান কীর্তনের ঢঙে সুরৈশ্বর্যশালী ক'রেও কীর্তনের যে ভাব ও স্বধর্ম থাকে সেইটি দেখাতেই এ স্বরলিপি—আধুনিক সুরকৃতি ও আঁখর সহ।

বঁধু, কী আর কহিব আমি ?
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণ-নাথ হোয়ো তুমি।
(তুমি সকলি তো জানো—অন্তরযামী ! কী আর কহিব আমি ?)
ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আমার আর আছে ?
রাধা ব'লে কেহ শুধাইতে নাই—দাঁড়াব কাহার কাছে ?
(আমার কেহ নাই—বঁধু, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই—
বঁধু, তোমার চরণে পরম শরণে জনমে মরণে দিও ঠাঁই)
একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি।
(তুমি নয়নমণি—নয়নের নাথ, নয়নমণি—
নয়নের নাথ, আছ সাথে সাথ তোমারি আলোয় হেরি ধরণী)
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় বাঁধিয়া পরি।

(পরশমণি !—জীবনের তুমি পরশমণি
ধরার ধূলায় তব করুণায় তারকামুরলী ওঠে যে রণি'
জীবন ধরি—তুমি আছ ব'লে জীবন ধরি—
জীবনের জ্যোতি বিনা কোথা গতি আলোক বিহনে পরাণে মরি)

কীর্তনের আঁখর সম্বন্ধে আমার "সাঙ্গীতিকী" পুস্তকে বিশদ ক'রেই লিখেছি। গায়ক প্রতি গান শোনেন অন্তরে—কোন্ সুরে সেটা আঁখরই দেখায়। তাই আঁখর দেবার সময় গায়ক নিজেও হন কবি, কারণ আঁখর হ'ল গানের ইণ্টারপ্রিটেশন—ভাবের দিক দিয়ে, যেমন তান—সুরের দিক দিয়ে।

একতালা

০ ১ + ৩ ০
সা সা | সরা রমা মা | মপা পধা ধনা | পর্সা নর্সা নধা | ধপা ধপা পসা | সরা রমা মা |
বঁ ধু কী আ র ক হি ব আ - মি - বঁধু - কী আ র

১ + ৩ ০ ১ +
মপা পা পধা | পধা নর্সা নধা | ধপা -া -া | র্সা ণা ধা | ধা ণা ধণধপা | পা ধা ধণর্রর্সা |
ক হি ব আ - মি - - - জী ব নে ম র ণে জ ন মে

৩ ০ ১ + ৩
ধর্সা ণা ধণা | পা ধা পধর্সা | ণধপা মগরা গগা | মপা পধা ক্ষপা | -া ধা পসা |
জ ন মে প্রা ণ না - ০০থ হোয়ো তু মি - - বঁ ধু

০ ১ + ৩ ০
সরা রমা মা | মপা ধনা র্সা | না ধা পা | -া র্সা র্সা | র্রর্সনা সনধা ণধপা |
কী আ র ক হি ব আ - মি - তু মি স ক লি

১ + ৩ ০ ১
ধপমা পমগা গমপধা | সরা রমা মা | পা ধা না | পর্সা নর্সা নধা | পা র্সা র্সা |
তো জা নো কী আ র ক হি ব আ - মি - তু মি

+ ৩ ০ ১ +
নর্র্সা নর্সা নর্র্সনা | ধপধা গপগপা পধা | পধা ধর্সা র্সা | র্সা র্রা র্গর্রা | র্গর্রা র্রর্সা র্সা |
অন্- - ত র যা মী কী আ র ক হি ব আ - মি

৩ ০ ১ + ৩ ০
-া র্সা র্সসা | সরা রমা মা | মপা পধা পধনর্সা | না ধা পা | -া -া -া | মপা পা পা |
- বঁ ধু কী আ র ক হি ব আ - মি - - - ভা বি য়া

১　　　　+　　　　-
পা ধা পধপমা | মা ধা পা | মপধপা মপা গমা | মপা পা পা | পা পধা মপা |
দে খি নু　　এ তি ন　ভু - বনে　কে আ মা　র আ র

+　　　৩　　　০　　　১　　　+
গমা পধা নর্সা | ধনা -া নর্সা | নর্সা নর্সর্রা র্রা | র্রা র্ঋা র্গনা | নর্সা নর্সর্রা র্গর্মা |
আ - -　ছে - -　রা ধা　বো　লে কে হ　শু ধা　০ ই

৩　　　০　　　১　　　+　　　৩
র্গা র্মর্গর্রর্সা নর্সা | নর্রা র্সর্রা নর্সা | ধনা পধা গপা | গপধা নর্রর্সা না | -া পা পা |
তে না　০ ই　দাঁ ড়া ব　কা হা র　কা - ছে　- আ মার

০　　　১　　　+　　　৩　　　০　　　১
পধা ধনা না | -া র্সা র্সর্রর্সনা | না র্সা না | ধনর্সনা ধা পা | পধা ধনা না | -া না নর্সা |
কে হ না　ই বঁ ধু　তু মি ছা　ড়া　আ মার　কে হ না　ই বঁ ধু

+　　　৩　　　০　　　১　　　+
র্সর্রা র্রা র্রা | নর্সা নর্সর্রা র্গমা | র্গর্রা র্রর্গা র্গনা | র্রা র্সা নর্সা | ধনা পধা ধা |
তো মা র　চ র ণে　-　প র ম　শ র ণে　জ ন মে

৩　　　০　　　১　　　+　　　৩
হ্মপা হ্মপধা নর্সর্রা | র্ঋর্রর্গর্রা র্সা না | -া া র্সা | র্রর্সা র্সণা ণধা | ধা ধা ধণা |
মর ণে -　দি ও ঠাঁ　ই - -　এ কূ লে　ও কূ লে

০　　　১　　　+　　　৩　　　০
পধা পা ধা | ধা ধা ধণা | র্সর্রা র্সর্রর্সা ণধা | ধণর্সা ণর্সণা ধপা | পা ধা মপধর্সা |
দু কূ লে　গো কূ লে　- - -　- - -　আ প না

১　　　+　　　৩　　　০　　　১　　　+
ণধপা ণধপা মগমা | পধা হ্মপা -া | -া -া -া | ধা ধা ণা | পধা পা পধহ্মপা | ধা র্সা র্সা
- ব লি ০ ব　কা - -　- - য়　শী ত ল　ব লি য়া　শ র ণ

৩　　　০　　　১　　　+　　　৩
র্রার্রা র্সর্রা র্গর্মা | র্মর্গা র্রর্সা ধর্সা | র্গর্রা র্সর্রা র্সণা | র্সণা ধণা ধপা | া ধর্সা র্সা
লই নু -　শী - -　তল - ব　০ লি য়া -　- শর ণ

০　　　১　　　+　　　৩　　　০　　　১
া র্রর্গা র্রর্গা | র্সর্রা র্সা র্সা | র্সণা ধপা ধণা | পধা পা -া | পা পা পা | পপা হ্মপধনা র্সর্রর্গর্রা
- লই নু　ও দু টি　ক - মল　পা - য়　আঁ খি র　নি মি খে　-

+ ৩ ০ ১ +
র্সা র্সা র্সধর্সা | র্সা র্সা র্সর্রর্সা | র্সনা র্রা র্সা | নর্রর্সনা ধপা ধা | গা র্রা সা |
ষ দি না ছি দে খি ত বে যে প রা ণে ম - ণি

-া -া -া | র্সা র্রর্সা তালফের করিয়া গেয়। তাল— না র্রা র্সা র্সর্রা | নর্রা র্সনা ধপা ধা |
০ ০ ০ তু মি চতুর্মাত্রিক—ত্রিতালী বা কার্ফা ন - য় ন ম - ণি -

+ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সর্রা | র্সনা নর্রা র্সা র্সর্রা | নর্রা র্সনা ধপা ধা |
- ন য় নে র - না থ - ন য় ন ম - ণি -

+ ৩ ০ ১ +
। র্সা র্রা র্রা | র্রা -া র্রা র্রর্গা | র্রর্সা না র্রা র্গা | র্রনা র্রা র্সা র্সর্রা | র্সনা না না র্সা |
- ন য় নে র - না থ - আ ছ সা থে - সা থ - তো মা রি

৩ ০ ১ + ৩
নধা না ধপা ধা | । গা পা ধা | নধা পধা র্সা -া | র্রর্সা না না র্সা | নর্রা র্সনা ধপা ধা |
আ - লো য় - হে রি ধ র - ণী - - তো মা রি আ - লো য়

০ ১
। গা পা ধা | নধা পধা র্সা -া | এই অবধি আঁথর গাহিয়া একতালায় ফের "আঁখির নিমিখে···মরি"
- হে রি ধ র - ণী - গাহিয়া

একতালা

০ ১ + ৩ ০
র্সা র্রা র্সর্রা | র্সনা নর্রা নর্রর্গর্মা | র্গা র্রর্গা র্রনা | র্রা র্সা নর্সা | ধনা পধা -া |
চণ্ ডী দা স ক্ হে প র শ র ত ন গ লা য়

১ + ৩ ০ ১
হ্মপা হ্মপধা নর্সর্রা | র্সর্রর্সা না -া | -া না নর্সা | র্সা র্রা র্সর্রা | র্সনা নর্রা নর্রর্গর্মা |
বাঁ ধি য়া - প রি - - ক হে চণ্ ডী দা স তো মা০০য়

+ ৩ ০ ১ +
র্গা র্রর্গা র্রনা | র্রা র্সা নর্সা | ধনা পধা -া | হ্মপা হ্মপধা নর্সর্রা | র্সর্রর্সা না -া |
প র শ র ত ন গ লা য় বাঁ ধি য়া - প রি -

৩
-া -া -া | গাহিয়া শেষ আঁথর এই ভাবে গেয় :—
- - -

০ ১ + ৩ ০ ১
পা পা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | -া -া -া | র্সা র্সা না | ধর্সনা ধা পা |
প র শ ম ণি - - - - - - - জী ব নে র - তু মি
জী ব ন ধ রি - - - - - - - তু মি আ ছ - ব লি

+ ৩ ০ ১ + ৩
পা পা ধা | ধা পধনা র্স্না | ধনা -া -া | -া না র্সা | নর্সর্া র্রা র্রা | র্রা র্সর্সা নধা |
প র শ ম ণি - - - - - বঁ ধু জী ব ন ধূ লা ০য়
জী ব ন ধ রি - - - - - তু মি জী ব নে র জ্যো তি

০ + ৩ ০
ধনা পধা না | র্র্সা না র্সা | নর্সা ধনা পধা | হ্মপা গহ্মা পা | ধা না নর্সর্গর্রা |
ত ব ক রু ণা য় তা র কা মূ র লী ও ঠে যে
বি না কো থা গ তি আ লো ক বি হ নে প রা ণে

১ + ৩ ০ ১
র্সা না র্সা | ধা -া না | ধা না র্র্সা | না -া -া | -া -া -া |
র ণি - - - - - - - - - - - - -
ম রি - - - - - - - - - - - - -

চৈত্রশেষে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

অঞ্চলের স্বর্ণরেণু বিলাইয়া বসুন্ধরা
বসে আছে রিক্ত চৈত্রশেষে—
মাঠের ফসল কবে গোষ্ঠপথে ঘাটে এল
আঁটি আঁটি ধানে তরি ভরি';
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু হতাশ্বাসে ঘুরে ফেরে
খেপা কোন্ বৈরাগীর বেশে,
নীলাকাশে চিল দুটি বারম্বার ডাক ছাড়ে
তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকার করি'।

তেপান্তর মাঠখানি মরুসম জনহীন
শুষ্ক শূন্য রিক্ত বসুন্ধরা;
এ মাঠ ও মাঠ যেন শতেক যোজন দূর
সেতুহীন যেন তট দুটি;
কৃষকের অঙ্গনেতে বিলাইয়া বসুন্ধরা
বর্ষশেষ আনন্দ-পশরা
শূন্যমনা চেয়ে আছে অনন্তে মেলিয়া আঁখি—
দিগন্তে বসন পড়ে লুটি

গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অগ্নি নির্বাপিত হইলে দেখা গেল রাজার দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু অগ্নিদেব রাণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে দেখিল—এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তান কোলে লইয়া ময়নামতী অক্ষত দেহে চিতা মধ্যে বসিয়া আছেন। এই শিশুই ভবিষ্যতে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ নামে দুর্লভ যশ এবং অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন। ময়নামতীর ন্যায় মহীয়সী রমণীর পুত্র যে স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা বলে সকলের শ্রদ্ধা এবং পূজা পাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত খ্যাতির মূল তাঁহার সন্ন্যাস এবং সেই সন্ন্যাসের মূলে ছিলেন ময়নামতী। জিতেন্দ্রিয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চরণতলে হিন্দুগণ চিরকালই শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন। শুধু হিন্দুই বা বলি কেন, ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষগণ মানুষমাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র। একদিন বুদ্ধদেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগতের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়াছিলেন। এই সেদিনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পাপতাপদগ্ধ জীবগণের হৃদয়ে নামামৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের তুলনা যুক্তিযুক্ত হয় না। গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করেন আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য, আর বুদ্ধ ও চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য। কপিলাবস্তুর রাজনন্দন অগাধ ঐশ্বর্য্য, অতুল সুখ, পত্নীর প্রেম, মাতার স্নেহ সব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগে উৎসাহ কেহই দেয় নাই, বরং সংসারের মায়াপাশে আবদ্ধ করিবার জন্যই সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। আত্মশক্তির দ্বারা সকল বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তার সম্মুখে মারের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গেল। সে প্রলোভনের তুলনায় হীরা নটীর রূপ-যৌবন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। নবদ্বীপচন্দ্রের বৈরাগ্য গ্রহণও বুদ্ধদেবের মত বিশ্বহিতের জন্যই, স্বার্থের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। প্রেমময়ী স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা, সংসারের ভোগ-বিলাস তিনিও স্বতঃপ্রেরিত হইয়া উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মত ফেলিয়া গেলেন। দুরপনেয় বাধার দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতসমূহ তেজস্বী মহাপুরুষের পথরোধ করিতে পারিল না।

ইঁহাদের মাহাত্ম্যের সহিত তুলনা করিলে গোপীচাঁদের মহিমা অতিশয় ম্লান বলিয়া মনে হয়। তথাপি গোপীচাঁদের খ্যাতি একদিন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন, তাঁহার কালে এ দেশের লোকজন গোপীচাঁদের গান গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী শ্রুত হয় পূর্বে তাহা বলিয়াছি। গোপীচাঁদ কোন্ গুণে এত লোকের হৃদয় জয় করিলেন? কাহিনী পাঠ করিলে মনে হয় সংসারাসক্ত শত শত মানুষের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্যই নাই। ঐশ্বর্য্যের মোহ, যৌবনের আসক্তি, ভোগের আকাঙ্ক্ষা—অজগরের ন্যায় তাঁহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। ময়নামতীর ন্যায় তেজস্বিনী জননীর চেষ্টা ব্যতীত এই জটিল গ্রন্থির উচ্ছেদন সম্ভবপর হইত না। ময়নামতীকে বাদ দিলে গোবিন্দচন্দ্রের পৌরুষ নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়ে।

ময়নামতী যখন ধ্যানযোগে জানিলেন, গোবিন্দচন্দ্রের আয়ু অল্প তখন তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রগ্রহণ না করায় এই পুত্রের পিতাই ত একদিন অকালে প্রাণ হারাইলেন; আবার পুত্রও যদি পিতার ন্যায় ময়নামতীর বাক্য অবহেলা করে তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? কি ভাবে পুত্রকে স্বমতে আনয়ন করিবেন এই চিন্তাতেই তিনি মগ্ন হইয়া রহিলেন।

সপ্তমবর্ষীয় রাজকুমারের সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী পদুনার বিবাহ হইয়া গেল। শ্যালিকা অদুনাও যৌতুক স্বরূপ ভগ্নীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধন্য হইলেন। এতদ্ব্যতীত 'রতনমালা' এবং 'কাঞ্চাসোনাও' রাণী হইয়া বালক রাজার রাজপুরী আলোকিত করিলেন।

গোপীচাঁদ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বলিয়া ময়নামতী স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, বালিকা বধূ চারিটি লইয়া রাজকুমারের দিন ধূলাখেলায় কাটিতে লাগিল।

কৈশোরে পদার্পণ করিতেই গোবিন্দকে সিংহাসনে বসাইয়া ময়নামতী রাজ্যভার তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্ক এবং সস্নেহ দৃষ্টি রক্ষা-কবচের মত সর্বদাই তাঁহাকে সমূহ বিপদআপদের হস্ত হইতে দূরে রাখিয়া চলিত। রাজা হইয়াও রাজ্যের দুর্ভাবনা নাই। পরিপূর্ণ সুখ, অনাবিল শান্তি, অপরিমেয় আনন্দ—ইহার দ্বারাই হৃদয় পূর্ণ। গোপীচাঁদ ভাবিলেন, মানুষের জীবনপথ শুধু কুসুমাকীর্ণ। হায়, মাতা ভিন্ন তিনি যে কত অসহায় তাহা কল্পনা করিবার মত ক্ষমতাও তাঁহার নাই। এই ভাবে আরও দুই বৎসর অতীত হইলে গোপীচাঁদ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পা দিলেন। ময়নামতী হিসাব করিয়া দেখিলেন, পুত্রের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিশাল সাম্রাজ্য এবং যুবতী রমণীগণের আকর্ষণ হইতে মুক্ত না করিলে গোবিন্দের মৃত্যু অবধারিত—অথচ মোহাবিষ্ট রাজার স্বপ্নঘোর কাটাইবেন কেমন করিয়া? দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় কিছুদিন কাটিল। অবশেষে ময়না মনস্থ করিলেন গোপীচাঁদকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহা স্থির করিয়া একদিন ময়না গোবিন্দচন্দ্রের রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাকে সভামধ্যে দেখিয়া গোপীচাঁদ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। নৃপতির আদেশে সভা ভঙ্গ হইল। পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ বিদায় হইলেন। অনন্তর জননীকে স্বর্ণাসনে বসাইয়া নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপীচাঁদ করজোড়ে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবসর বুঝিয়া ময়নামতী একে একে সব বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন—প্রিয়তম পুত্র, তোমার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া বড় দুঃখে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছি। কিন্তু এখনও তাহার প্রতিকার সম্ভব। মৃত্যু জয় করিতে হইলে রাজ্য ধন ঐশ্বর্য সব বিসর্জন দিয়া রমণীগণকে দ্বাদশ বৎসরের মত ত্যাগ করিয়া হাড়িসিদ্ধার শরণাপন্ন হইতে হইবে। হাড়িসিদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রে পরম পারদর্শী এবং মহাজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে সেই যোগীবর কৃপা করিয়া তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

মাতার মুখে এই অভাবনীয় বাক্য শুনিয়া গোবিন্দ চমকিত হইলেন। তাহাও কি সম্ভব? এই সুখ সম্পদ এই অতুল বৈভব সব ত্যাগ করিয়া রমণীগণকে অনাথা করিয়া, ছিন্ন কন্থা এবং ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া বাইশ দণ্ডের অধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পথে পথে বেড়াইতে হইবে? ঊনশত নফর, অর্ধশত সামন্তরাজ, লক্ষাধিক সৈন্য এবং অগণিত নরনারী যাঁহার চরণে প্রণতি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়—সেই গোবিন্দচন্দ্রকে এক হীনকর্মা হাড়ির চরণ স্পর্শ করিয়া তাহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিতে হইবে? ইহা যে কল্পনারও অতীত। বিনামেঘে বজ্রপাত হইলেও গোপীচাঁদ এরূপ চমকিত হইতেন না। আকস্মিক উত্তেজনায় তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য বিচারশক্তি লোপ পাইল। তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রথম উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া গেলে রাজা ভাবিতে লাগিলেন—মাতার মুখে এ কি জঘন্য প্রস্তাব! নৃপতি মাণিক্যচন্দ্রের মহিষী স্বীয় পুত্রের প্রতি এই ঘৃণিত আদেশ দিলেন কেমন করিয়া? ময়নামতীর এই অসংগত আচরণের কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে কি?

গোবিন্দচন্দ্রের মনে সংশয় জাগিল। কিন্তু মাতার সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হইতে না হইতেই বিবেকের দংশনে তাঁহার চিন্তার গতি ঘুরিয়া গেল। তিনি করজোড়ে নিবেদন করিলেন—জননী, এখনও তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর। জাতিকুল ডুবাইয়া পিতৃপুরুষের নামে কলঙ্ক লেপন করিয়া নীচকুলোদ্ভব হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব পুত্রের অবাধ্যতা তোমার দুঃখের কারণ হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু আমার এইরূপ অধঃপতন দেখিলে স্বর্গলোকে থাকিয়া পিতৃপুরুষগণ অশ্রুবর্ষণ করিবেন। অশুচি বংশধরের পি[illegible] ও জল তাঁহারা আর গ্রহণ করিবেন না! আরও চিন্তা[illegible] কথা এই যে, কিসের আশায় জাতিকুল, মান সম্মান, ধনর[illegible] বিসর্জন দিয়া হাড়িকে গুরু করিব? কে সে? [illegible] তাহার পরিচয়! সে যে আমাকে মন্ত্রবলে মৃত্যুর হাত হই[illegible] রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহার প্রমাণ কি?

পুত্রের বাক্যে ময়নামতী ক্রুদ্ধ হইলেন না। তি[illegible]

জানিতেন—যুক্তির দ্বারা বশীভূত করিয়া পুত্রকে স্বমতে আনিতে না পারিলে তাহার প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। সেইজন্য মিষ্টবাক্যে গোবিন্দচন্দ্রকে বুঝাইতে লাগিলেন—হাড়িসিদ্ধা মহাশক্তিমান যোগী, মন্ত্রবলে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। স্বয়ং যমপুত্র 'মেঘনীল কুমর' তাঁহার মস্তকে চামর ব্যজন করেন। যমরাজ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য মাত্র। চন্দ্র এবং সূর্য তাঁহার দুই কর্ণের কুণ্ডলরূপে শোভমান। দেবী মহালক্ষ্মী এই সিদ্ধপুরুষের পাকশালার অধিষ্ঠাত্রী এবং সুবচনী তাঁহার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী। প্রভু গোরক্ষনাথের নিকটেই হাড়িপার দীক্ষা হয়, সেই সম্পর্কে হাড়িপা ময়নামতীর গুরুভাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না।

"তুমি বল হাড়ি হাড়ি লোকে বলে হাড়ি।
মায়ারূপে খাটি খায় চিনিতে না পারি॥'

ময়নামতীর মুখে হাড়িসিদ্ধার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মাতার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল—তাঁহাকে সন্ন্যাস অবলম্বন করাইবার জন্য ময়নামতীর এই যে প্রয়াস ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে। কোন্ মাতা স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একমাত্র সন্তানকে বনবাসে পাঠায়? ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীও নিজ প্রাণ দিয়া শাবকগণকে প্রতিপালন করে। গোবিন্দচন্দ্র স্থির করিলেন, কূটচক্রী জননীর বাক্য তিনি পালন করিবেন না। যে মাতা স্বীয় স্বার্থ ও জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া পুত্রকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চায় সে মাতার আদেশ লঙ্ঘনে কোন পাপ নাই। তাঁহার এরূপ ধারণা হইল যে পিতার অকালমৃত্যুও সম্ভবত হাড়িসিদ্ধা ও ময়নামতীর কোন মিলিত চক্রান্তের ফল।

এদিকে রমণীগণও নিশ্চিন্তমনে বসিয়া ছিলেন না। শাশুড়ীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য চারি সপত্নীর মধ্যে যুক্তি পরামর্শ চলিল। কিন্তু কি বুদ্ধি করিলে রাজার সন্ন্যাস গ্রহণ রহিত করা যায় তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে—

"অদুনার বলে, বৈন গো পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥"

আমার কথামত চলিলে বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইবে না। পরামর্শ অনুযায়ী

"অদুনাএ পিন্ধে কাপড় মেঘনীল শাড়ি।
সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥
পদুনাএ পিন্ধে কাপড় তলে বান্ধি নেত।
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দি বেত॥"

রতনমালা এবং কাঞ্চাসোনাও তসর এবং 'খিরবলি' বসনে দেহ সজ্জিত করিলেন। অনন্তর হাতে 'রামলক্ষ্মণ' নামক শঙ্খ পরিধান করিয়া এবং কস্তুরী অগুরু প্রভৃতি বিচিত্র প্রসাধনে অঙ্গ ভূষিত করিয়া চারি রাণী

"খঞ্জন গমনে জাএ রাজার গোচরে,
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে যৌবনের ভারে॥"

নিকুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চারি রমণী বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রাজাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চরিত্র সম্বন্ধে দুই-চারিটি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন :—

"তোমার মায়ের কথার নির্ণয় না জানি।
হেঁটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি॥"

বনবাসে প্রেরণ করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে এতগুলি রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিলেন কেন?

রাণীগণের যুক্তি অত্যন্ত সমীচীন বলিয়াই গোবিন্দচন্দ্রের মনে হইল। ময়নামতীর আজ্ঞায় পরিচালিত হইয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবেন না ইহা স্থির করিয়া গোপীচাঁদ রাণীদিগকে বলিলেন

"না যাইব না যাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর।
সুখে রাজ্য করিব থাকিয়া নিজ ঘর॥"

ইহা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

রাজার অঙ্গীকারে রাণীগণ আশ্বাস পাইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মাতার সান্নিধ্যে আসিলেই গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত দৃঢ়তা মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন। ময়নামতীর ন্যায় শক্তিময়ী রমণীর প্রভাব হইতে দুর্বলচেতা স্বামীটিকে কেমন করিয়া মুক্ত করিবেন এখন এই চিন্তাই তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দিবারাত্র যুক্তিতর্ক চলিল, কিন্তু

জটিল সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইল না। অবশেষে 'সাতকাইতের বুদ্ধি'ধারিণী অদুনাই এক সহজ পন্থা বাহির করিয়া তিন সপত্নীকে চমকিত করিয়া দিলেন। স্থির হইল নিমাই বাণিয়ার নিকট হইতে পঞ্চ তোলা বিষ ক্রয় করিয়া মিষ্টান্নের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ভেট দেওয়া যাইবে। নিমাই বাণিয়ার বিষ পঞ্চতোলা উদরস্থ হইলে আর ময়নামতীকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে হইবে না। তাহার পর আর কি? এখন কোন রকমে পথের কণ্টক একবার দূর করিতে পারিলে হয়।

যুক্তি করিয়া অদুনা, পদুনা, রতনমালা ও কাঞ্চাসোণা 'পঞ্চতোলার পঞ্চলাড়ু' প্রস্তুত করিয়া ময়নামতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং

"লাড়ুর বাটা সম্মুখে রাখি প্রণাম করিল।
যোড় হস্তে দাণ্ডাইয়া কহিতে লাগিল॥
এহি বর মাগি মোরা তোমার গোচর।
স্বামী দান দাও মোরা চলি যাই ঘর॥"

পুত্রবধূগণের অতিভক্তির কারণ অনুমান করিতে ময়নার মুহূর্তমাত্রও সময় লাগে নাই; কিন্তু কোন সন্দেহের ভাব প্রকাশ না করিয়া তিনি চারি বধূর সম্মুখেই মিষ্টান্ন কয়টি আহার করিলেন। রাণীগণ মহানন্দে পুরীমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া ময়নার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা-বাহুল্য মহাজ্ঞানের প্রভাবে ময়নামতী দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এই কৌশল ব্যর্থ হওয়াতে রাণীরা আর এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ময়নামতী যে জ্ঞানবলে ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া পুত্রকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিতেছেন সেই জ্ঞান কতদূর সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। ময়নামতী যদি পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতই মহাজ্ঞানের অধিকারী তবেই যেন গোবিন্দ-চন্দ্র তাঁহার আদেশ পালন করেন—অন্যথা নয়। গোপী-চাঁদেরও ইহা সংগত বলিয়া মনে হইল, সুতরাং তিনি মাতার মহাজ্ঞানের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করিলেন। ময়না বুঝিলেন এ বুদ্ধি গোপীচাঁদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হয় নাই; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পরীক্ষা তিনি সকলের নিকটেই দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিলেন—

"এক পরীক্ষার বদল শত পরীক্ষা দিমু।
তবু তোর রাজার বেটা বাড়ী ঘর ছাড়ামু॥"

সত্যই ভীষণ রকমের পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইল। মহাজ্ঞান বলে ময়নামতী সমস্তই নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলেন। সাত মণ ফুটন্ত তৈলের মধ্যে সাত দিন ডুবিয়া থাকিয়াও তাঁহার দেহ অবিকৃত রহিল। তুষের নৌকায় চড়িয়া তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিলেন। তৌল যন্ত্রে ওজন করিয়া দেখা গেল—তাঁহার দেহ পোস্তদানার অপেক্ষাও লঘু। এইরূপে সাত পরীক্ষা শেষ হইলে গোবিন্দচন্দ্রের সন্দেহ দূর হইল। ময়নামতীর জ্ঞান যে মিথ্যা নয় তাহা তিনি এতদিনে বিশ্বাস করিলেন। সন্তান হইয়া তিনি মাতার সম্বন্ধে যে জঘন্য ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন সেজন্য গভীর অনুতাপ জন্মিল। স্বীয় নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। গোপীচাঁদ স্থির করিলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—এখন

"আর আমি পরীক্ষা না নিব মায়ের বার বার।
শির মুড়িয়া ধর্মরাজ মুঞি ছাড়িমু বাড়ী ঘর॥"

পুত্রের মতি পরিবর্তিত হইল দেখিয়া ময়নামতী আশ্বস্ত হইলেন।

সংবাদ শুনিয়া চারি নারীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহারা পুনরায় সাজসজ্জা করিয়া রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সকল লীলা কৌশল, অনুনয় বিনয় এবার নিষ্ফল হইল। অবশেষে অদুনা কাঁদিয়া বলিলেন;—

"তোমা না দেখিয়া আমরা প্রাণ দিমু চারি রমা
মরিমু যে গরল ভক্ষিয়া।"

কিন্তু তথাপি গোবিন্দচন্দ্র অচল, তিনি শুধু একটি কথা বলিয়া পত্নীগণকে বিদায় দিলেন। বলিলেন—

"ঘরে যাও অদুনা মাগো ঘরে যাও তুমি।
এ বার বছর রাজ্য ভ্রমি আসি আমি।"

স্কন্ধে ঝুলি এবং হস্তে 'দোয়াদুশ' লইয়া গোপীচাঁদ সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিলেন। রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল; বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাজা সর্বপ্রথমে হাড়িকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোপীচাঁদকে দেখিয়া

যোগীবর আদর আপ্যায়ন করিয়া আসনে বসাইলেন। অনন্তর গোবিন্দ হাড়িফার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—

"তোহ্মার চরণে গুরু সেবা দিলুঁ আহ্মি।
এ ভব তরিতে জ্ঞান মোরে দেহ তুহ্মি॥"

রাজার বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া হাড়িফা তাঁহাকে শিষ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সংশয়ীর মনে যখন বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তখন তাহা স্বভাবতই দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। নাস্তিকতাবাদীরা বিচার-বুদ্ধি এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিলে তাঁহারাই চূড়ান্ত আস্তিক হইয়া উঠেন। তখন কাজেকর্মে, আচারে অনুষ্ঠানে তাঁহাদের নূতন বিশ্বাস অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দেয়। গোবিন্দচন্দ্রেরও তাহাই হইল। যে হাড়িফা সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার নিন্দাবাদ এবং কটূক্তি করিয়াছিলেন আজ তাঁহারই চরণধূলি তাঁহার শিরোভূষণ হইল। গোপীচাঁদ গুরুর সেবকরূপে তাঁহার সহিত দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ছিন্ন কন্থাধারী ভিক্ষুকবেশী এই সন্ন্যাসীকে দেখিলে আজ কে বলিবে যে ইনিই সেই বাইশ দণ্ডের অধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র?

পথে চলিতে চলিতে একদিন মহারাজ গোপীচাঁদ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। হাড়িফা শিষ্যের সেবায় সন্তুষ্ট হইলেও তাহার ভক্তির পরীক্ষা ভাল করিয়া গ্রহণ করেন নাই। আজ সেই পরীক্ষা লইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। গোপীচাঁদকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সেই সুযোগে হাড়িফা তাঁহার থলির মধ্য হইতে রাজার শেষ সম্বল একুশ কড়া কড়ি হরণ করিলেন। গোপীচাঁদ তাহার কিছুই বুঝিলেন না। যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা পুনরায় গুরুদেবের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পথপার্শ্বে এক পানশালা দেখিয়া হাড়িফার সুরা পান করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাঁহার নিজের কাছে কপর্দক মাত্র ছিল না বলিয়া তিনি শিষ্যের নিকটে কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। বলা বাহুল্য রাজার ভক্তির পরীক্ষার জন্যই হাড়িফার এই সমস্ত ছলনা। যাহাই হউক হাড়িফা মদ্যপানের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেই শিষ্য তাঁহার শেষ সম্বল একুশ কড়া কড়ি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঝুলির মধ্যে ত একটি কড়িও অবশিষ্ট নাই।

কয়েক দণ্ড পূর্বেও তিনি একুশ কড়া কড়ি ছিল দেখিয়াছেন, ইহাতে ভুল হইবার ত কোন কারণ নাই। হায় হায়, গুরুর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কেমন করিয়া? অঙ্গীকার ভঙ্গের ন্যায় মহাপাপ যে আর কিছুই নাই। পূর্ব জন্মের কোন্ দুষ্কৃতির ফলে আজ এই মহাপাপের ভাজন হইতে হইল? এইরূপে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে গোবিন্দচন্দ্র কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া মনে মনে করুণা জন্মিলেও হাড়িফা বিচলিত হইলেন না। তিনি শিষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহাকে অধিকতর কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন এ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ইহলোকের যাহা কিছু সকলই তাহার বশীভূত হইবে। রোগ শোক জরা মৃত্যু সমস্তই তাহার করায়ত্ত হইবে। পৃথিবীকে সে মৃত্তিকা নির্মিত ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিতে পারিবে। মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এখন যদি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি করুণা করেন তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যতের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া হাড়িফা হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া কঠোর কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। শোক-বিহ্বল শিষ্যকে ডাকিয়া হাড়িফা বলিলেন—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানব মাত্রেরই কর্তব্য, অঙ্গীকার করিয়া যে তাহা পালন করিতে না পারে সে পশু অপেক্ষাও হীন। তুমি একবার যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তখন যে-কোন উপায়েই হউক তোমার তাহা রক্ষা করা উচিত। তাহা না হইলে পরলোকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। তোমার অন্য কিছু না থাকিলেও দেহটা ত আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও তোমার প্রতিশ্রুত অর্থ এখনই দান করিতে পার। গুরুবাক্যে গোবিন্দচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আত্মবিক্রয়ে সম্মত হইলেন। তখন হাড়িফা একুশ কড়া মূল্যে গোপীচাঁদকে হীরা নটী নাম্নী এক বারবনিতার নিকটে বন্ধক রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয়দর্শন রাজপুত্রকে দেখিয়া হীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার

নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র দৃঢ়চেতা গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় শক্তিবলে সর্বপ্রকার প্রলোভন অবলীলাক্রমে জয় করিলেন। অবশ্য এ নারীর বাক্য অবহেলা করার জন্য রাজপুত্রকে বড় কম দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই।

দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাঁহাকে বহু হীন কর্ম করিতে হইয়াছে। হীরার আদেশে দূরবর্তী নদী হইতে তাঁহাকে স্নানের জল বহন করিয়া আনিতে হইত। নরপাল গোবিন্দচন্দ্রকে ছাগপাল লইয়া বনে বনে চরাইতে হইত। এত সব দুঃখ তিনি অবনতমস্তকে সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি শুচিতা হারান নাই।

ধ্যানে বসিয়া হাড়িফা সকলই জানিতে পারিতেন। শিষ্যের শক্তি দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত, কিন্তু তবুও তাঁহার উদ্ধারের জন্য কোন ত্বরা করিতেন না। হীরার আবাসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে হাড়িফা শিষ্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া একদিন সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা গুরুকে দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর হীরার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া যোগীবর গোবিন্দচন্দ্রকে পুনরায় স্বগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে গোপীচাঁদ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, দীর্ঘকাল পর পুত্রকে দেখিয়া ময়নামতীর চক্ষে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আকাশ-প্রদীপ

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

আকাশের আলো পথ নাহি পায়
ধূলার অন্তরালে,
ম্লান হ'য়ে এলো শান্তির টিকা
ধরার ধূসর ভালে।
সবিতার আলো, চাঁদিমার হাসি
মেঘের কারায় বাধা পায় আসি'
হারাইয়া যায় পথের নিশানা
কালো কুয়াশার জালে,
আকাশের আলো আনে না আশীষ
ধরার ধূসর ভালে।

গগনে গানের কত সমারোহ
গ্রহ-তারকার মেল',
কান্নায় ভরা করুণ ধরণী
চেয়ে রয় দুই বেলা!
মুগ্ধ সে মেয়ে কত আশা ক'রে
বালির বসতি ভাঙে আর গড়ে
মরুভূমি 'পরে তরুর স্বপ্নে
রচে আনন্দ-মেলা,
অন্ধ নিয়তি আনে দুর্গতি
ভাঙে ভুল, ভাঙে খেলা।

তবু নাহি ভোলে আকাশের কোলে
আছে তার আত্মীয়,
চিরবিরহের যবনিকা হানি'
আলোরে সে জানে প্রিয়।
তাহারি স্মরণে প্রতি সন্ধ্যায়
ভীরু দীপখানি জ্বেলে রেখে যায়,
আকাশ-প্রদীপে বলে: 'প্রিয় মোর
দুখের দেয়ালি নিও,
তোমার অমৃত-পরশে এ ধূলি
ফুল হ'য়ে ফোটে, প্রিয়!

* * * *

মোরা মরতের মাটির মানুষ,
ধরণীর ধূলাবালি
আত্মা মোদের করিছে মলিন,
চিত্তে জমিছে কালি।
সীমা-ঘেরা এই দীন খেলাঘরে
আসে না আকৃতি অসীমের তরে,
তবু কোন খনে মলিন এ মনে
সে-চরণে দিলে ডালি,
মোরা মরতের মাটির মানুষ
আকাশে প্রদীপ জ্বালি॥

ভারতে প্রত্নতত্ত্বানুশীলন

শ্রীজহরলাল বসু

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্রের অনুসন্ধান করিতে গেলে ইতিহাস পাঠ করার প্রয়োজন। কিন্তু সেই যোগসূত্রের সঠিক বিবরণ সব সময়ে ভাল রকম পাওয়া যায় না। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের দেশের কথাই বলি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানের তো প্রত্যক্ষদর্শী আমরা স্বয়ং; কাজেই তার আর অন্য প্রমাণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগরে কোন দিন সঙ্গোপনে 'এম্‌ডেন' উঁকি মারিয়াছিল বা সেখানা কতদূর ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল—সেটা অন্তত আমাদের বয়সী কাহারও অবিদিত নাই। তারপর অদূর অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধেও জানিতে হইলে যদিও আমদের নিজেদের প্রত্যক্ষদৃষ্টি ও জ্ঞানের সীমার মধ্যে পাই না, তথাপি তাহার জন্য বেশীদূর ছুটাছুটি করিতে হয় না। আমাদের বাপ-পিতামহদের নিকট হইতে অদূর অতীতের সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই বা পাইতে পারি যাহা হইতে মনে করিতে পারি যেন সেগুলোর সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান বা ধারণা বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মতই স্পষ্ট, প্রমাদবর্জ্জিত এবং নিখুঁত। সিপাহী বিদ্রোহের কথা বা মণিপুরের লড়াইয়ের কথা বা ব্রহ্ম-বিজয়ের কথা সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি বা যতদূর শুনিতে পাইয়াছি সে সমুদয় বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আমাদের কিছুই নাই।

কিন্তু সুদূর অতীতের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতটুকু? দূরস্থিত চক্রবালের বহির্ভূত জিনিষ যেমন আমরা শুধু চোখে দেখিতে পাই না তেমনি সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর নিকটে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন মতে পঁহুছিতে পারে না। সুদূর অতীত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে একটা ভাল রকম ধারণা ক'রে নিতে হ'লে যে সমুদয় উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় সেগুলি কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা আগেই বিবেচনা করা উচিত। গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বের যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের যাহা ছিল তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অনির্ভরযোগ্য। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষকগণ ভারতের প্রাচীন যুগের রীতিমত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নোপযোগী মালমসলা এত আহরণ করিয়াছেন যে এক্ষণে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচয়িতাকে কল্পনার পক্ষপুট বিস্তার করিয়া আর মাঝে মাঝে অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইতে হইবে না।

এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতত্ত্বানুশীলনের দ্বারা আমরা অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব জিনিষের বা তথ্যের সন্ধান পাই এবং পাইতেছি। সুপ্রাচীন যুগের লোকদের জীবনধারা, তৎকালীন ঘটনাবলী ইত্যাদি অনেক তথ্য সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে—পুরাতত্ত্বানুশীলন সাহায্যে। আদিম যুগের অসভ্য বর্ব্বর মানব কিরূপে ক্রমোন্নতিসূত্রে বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য মহামানবে পরিণত হইয়াছে তাহার রোমাঞ্চকর অথচ যুক্তিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাইতে হইলে এই পুরাতত্ত্বের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক Robert Bruce Foote তাঁহার "Collection of Prehistoric or Protohistoric Antiquities" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "On 30th May 1863, I came across a genuine chipped implement among the material turned out of a small ballast pit dug in the lateritic gravel on the parade ground at Pallavaram, south of Madras. In January, 1864 I revisited the place and found two further palaeolithes of typical shapes in the material exposed by enlargement of the pit; then found polished neolithic implements."

নানাস্থানের ভূগর্ভ হইতে প্রচুর ভগ্ন পাত্রের ও প্রচুর প্রস্তরাদি নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। সেই সমুদয় একত্র করিয়া অভিনিবেশ সহকারে বিচারপূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের (যাহাকে ঐতিহাসিকেরা এখন বলেন palaeolithic age এবং neolithic age) সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। সেই সুদূর অতীতের দিনে কুম্ভকারগণ কত যে যত্নসহকারে নানা কারুকার্য্যখচিত রঙবেরঙের নয়নাভিরাম পাত্র নির্ম্মাণ করিতেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কে বলে—তাহারা বর্ব্বর ছিল? কে বলে—তাহারা সভ্যতার আলোক তখনও পায় নাই? কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা পাত্র গাত্রে কি সুন্দর সুন্দর রঙ ফলাইয়া গিয়াছেন; আর এই সুদীর্ঘকাল পরেও সেই ভাঙা পাত্রগুলির গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলির রঙ এখনও যেন নূতন রহিয়াছে!

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত Foote সাহেব লিখিয়াছেন—

"The beauty of the pottery even when broken speaks to the skill of potters. Earthenware vessels found in old graves—perfectly preserved—show variety in shape, texture and ornamentation. The greatest value of the collection is the great light it throws upon geographical distribution of the people of several ages. Of the pottery in my collection the most interesting one is a lotah with a short side spout found in the Riverdale state. The shape of the spout is decidedly archaic and the earthenware is exceptionally coarse for so small a vessel."

প্রথমে এই পুরাতত্ত্বানুশীলনের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারা ছিল না; কিন্তু বহু সুনিপুণ গবেষকের অপরিসীম উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অধুনা পুরাতত্ত্বানুশীলন ধারা খুব সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইঁহারা অসাধ্য সাধনের কাজ করিয়াছেন। সুযোগ্য এবং সুদক্ষ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে অভিনিবেশসহকারে কাজ করিয়া ভূগর্ভ খননকারীরা এক্ষণে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার অতীত যুগের

ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি আমাদের চক্ষের সামনে একে একে উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। এইরূপে প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের ফলে গত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে ভারতের সুপ্রাচীন যুগের ইতিহাসে অনেক নূতন পৃষ্ঠা সংযোজিত হইয়াছে এবং অনেক পৃষ্ঠা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের যে যে অংশ পূর্ব্বে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এখন এই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাহার অনেকাংশের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন ও করিতেছেন। মৃত ব্যক্তি Rip Van Winkle-এর মত শত শত বর্ষের বিস্মৃতির গুহা হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন। যুগমানব যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের শত শত বর্ষ পূর্ব্বেকার অধিবাসিগণের দৈনিক জীবনধারা বা চিন্তনধারার সঙ্গে আমাদের নিজেদের জীবনধারার বা চিন্তনধারার কত ঐক্য বা অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাও বিচার করিবার সুযোগ সুবিধা এখন আমাদের ভাগ্যে ঘটিতেছে। প্রস্তরোপরি খোদিত বা ধাতুপটোপরি উৎকীর্ণ লিপিমালার পাঠোদ্ধার এখন সম্ভবপর হইয়াছে। সেই সুদূর অতীতের সুন্দরীগণ কোন্ কোন্ অলঙ্কার ধারণ করিতেন বা তখনকার বিলাসিনীগণের চারু অঙ্গ প্রসাধনের কি কি উপাদান ছিল তাহারও সন্ধান পাওয়া এখন সম্ভব হইয়াছে।

একথা নিতান্ত সত্য যে প্রাচ্যের সুদূর অতীত এখন প্রত্নতাত্ত্বিকের কৃপায় আমাদের নাগালের মধ্যে আসিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখন সেই সুদূর অতীত যুগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের নয়নপথে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

Sir Leonard Woolley যথার্থই বলিয়াছেন—"আজ আমরা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বের যুগের মীশরের সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি জানিতে সমর্থ হইয়াছি যাহা আমরা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের যুগের ইংলণ্ডের সম্বন্ধেও জানিতে পারি নাই। দীর্ঘকাল বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্ন প্রাচীন সুমেরিয়ান এবং হিটাইটদের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের সম্বন্ধে বা আসীরীয়া এবং ব্যাবিলনবাসিগণের হাজার হাজার বৎসরের ভূগর্ভস্থ নরকঙ্কাল সম্বন্ধে আজ যে এত বিস্তৃত বিবরণ জানিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহার জন্য আমরা ঐ কোদাল এবং খনিত্রের নিকটেই ঋণী।"

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। যে সময়ে আফগানিস্থান দেশসম্ভূত অশান্তির প্রচণ্ড বহ্নি উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে সন্ত্রস্ত করিয়া চলিয়াছিল প্রায় সেই সময়ে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) ভারতে এই প্রত্নতত্ত্বানুশীলন বিস্তার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। যে ব্রাহ্মীলিপি শত শত বর্ষ ধরিয়া অপঠিত ও অনুদ্‌ঘাটিত ছিল, ঐ বৎসরে সেই ব্রাহ্মীলিপির প্রথম পাঠোদ্ধার সাধন করেন জেম্‌স্ প্রিন্সেপ। এই সুপ্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার হইতে ভারতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হয়। অনন্তর হাজার হাজার প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত ও পঠিত হওয়ার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে কত নূতন পৃষ্ঠা সংযোজিত করিতে হইয়াছে!

কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন ধরিয়া শুধু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই এই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলন ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। Sir Alexander Cunningham প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উদ্বোধন হয়, আর ঐ বৎসরেই Cunningham সাহেব স্বয়ং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হন।

সারা দেশটা মাঝে মাঝে পর্য্যবেক্ষণ করা ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ বিবরণীসমূহের ধারাবাহিক সঙ্কলন করা—এই সব ছিল কানিংহামের প্রধান কাজ। এ কাজের প্রথম কর্ম্মী কানিংহাম, কাজেই তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এই বিষয়ে প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন বলিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বহুদিন ধরিয়া এই কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে যে সকল বিবরণ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন সেগুলির মূল্য আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় তথ্যলাভোপযোগী স্থানসমূহের অবধারণ ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের সঠিক সময় নির্দ্ধারণে কানিংহাম ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচয়িতা সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত Vincent Smith বলিয়াছেন, "ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস গ্রন্থনোপযোগী উপাদান সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় চীনদেশীয় সুবিখ্যাত পর্য্যটক হিউ-এন্-স্তাঙের বিবরণী হইতে। হিউ-এন্-স্তাঙ ভারতে আসিয়াছিলেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে মহারাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে। হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বিচক্ষণ রাজা; তিনি এই চীনদেশীয় পর্য্যটককে বহু বৎসর নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। হিউ-এন্-স্তাঙ ছাড়া আরও অনেক বিদেশী পর্য্যটক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু উপাদান-সম্ভারে এই হিউ-এন্-স্তাঙের বিবরণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। ইঁহার ভ্রমণকাহিনী Records of the Western World নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ কাহিনী সাধারণ্যে প্রথম প্রচার করেন শ্রীযুক্ত কানিংহাম এবং অচিরে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য ভাষায় তাহা অনূদিত হয়। ইউ-এন্-স্তাঙ উত্তরভারতের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে তাঁহার ভ্রমণের প্রতিটি বিবরণ আজ আমরা অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি।

সরকারের এই প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এখন হইতে অনেক কাজ করিতে লাগিল বটে কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিমন্দির বা দেউলসমূহের সংস্কারকার্য্যের দিকে এখনও কাহারও লক্ষ্য পড়িল না। সংস্কার তো দূরের কথা, বরং অনভিজ্ঞ লোকেরা তক্ষশিলা, সারনাথ, সাঁচি প্রভৃতি স্থানে খননকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন্ প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"জাতীয় প্রাচীন কীর্ত্তিকলার নিদর্শনগুলির সংরক্ষণ করা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিলে চলিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি উক্ত বিভাগকে খাস ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনয়ন করেন। কিন্তু তখনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ কিছু হইতেছিল না; বরং অনেক

মূল্যবান সুদুর্লভ পুরাতন জিনিষ ভারত হইতে ইউরোপ বা মার্কিনের চিত্রশালায় স্থানান্তরিত হইয়া তখন ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিত। সেগুলি ভারতে থাকিলে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজ ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের আরও কত নব নব তথ্যের হয়তো সন্ধান দিতে পারিতেন। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের ক্ষতি শুধু যে এই প্রকারেই সাধিত হইয়াছে তাহা নহে; অর্থগৃধ্নু, ধর্মদ্বেষী বিজাতীয়দের অত্যাচারের ফলেও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ক্ষতি কম হয় নাই। মুসলমানদের হাতে কত শত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির এবং দেবদেবীর প্রতিকৃতি যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সোমনাথের মত কত দুষ্প্রাপ্য স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত মন্দির এইরূপে দুর্দ্ধর্ষ অর্থলোভী নির্ম্মম দস্যুদের হাতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আবার কখনও বা অপেক্ষাকৃত গুণজ্ঞ স্থানীয় ব্যক্তির কৃপায় এই সকল স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসকারীর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ এক পাঠানপল্লী হইতে C. G. H. Hastings সাহেব বৌদ্ধযুগের এক উৎকীর্ণ মৃৎপাত্রের আবিষ্কার করেন। সেই পাত্রটি জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী মুদ্রাধাররূপে ব্যবহার করিতেছিলেন। ঐ মৃৎপাত্রের গাত্রে খরোষ্ঠি অক্ষরে এবং প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ ছিল—"থিওডোরেণ মেরিডার্খেন প্রতিথবিদ ইমে শরীরঃ শাক্যমুনিস ভগবতো বহুজনস্থিতয়ে" (অর্থাৎ বহুলোকের শান্তির নিমিত্ত ভগবান শাক্যমুনির এই নিদর্শনগুলি থিওডোরস্ মেরিডার্থ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইল)। কি ইতিহাসের দিক হইতে, কি ধর্ম্মের দিক হইতে মৃৎপাত্রটির মূল্য যে কত বেশী তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই উৎকীর্ণ লিপি আমাদের সংবাদ দিতেছে যে, তখনকার দিনের জনৈক গ্রীক শাসনকর্ত্তা একজন দীনাতিদীন সেবকের মত ভগবান তথাগতের শারীর নিদর্শন সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, সাধারণের মঙ্গলের জন্য ঐ মৃৎপাত্র মধ্যে।

ভিলসা নগরের সমীপবর্ত্তী বেশনগরে একটি গরুড়স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, নরপতি Antalkidas-এর রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে সমাগত Dion-এর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ পুত্র Heliodoros শ্রীভগবান বাসুদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ঐ গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা Antalkidas-এর রাজত্বকালের সময় হিসাবে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কাল আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ১৭৫ হইতে ১৩৫ মধ্যে।

এইরূপে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভগবানলাল মথুরাতে জনৈক নিকৃষ্ট-জাতীয় হিন্দুর গৃহের নিকট শীতলা-মন্দিরের সোপানে প্রোথিত একটি লালবর্ণের বেলে পাথরের থাম ভাঙ্গা দেখিতে পান; সেটি ছিল কোন পরাক্রান্ত শক-ভূপালের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভের শীর্ষভাগ। মথুরায় লব্ধ উক্ত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির উদ্ধার সাধনের দ্বারা অনেক তৎকালীন ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে।

Dr. Bellow সাবাগ্‌গড়িতে যে পথ্‌তি-হি-বহি নামক উৎকীর্ণ লিপির আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মূল্যও বড় কম নয়। ইহার সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—"শিলাপটখানি শত শত বর্ষ ধরিয়া মসলা বাটা শিলরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহার মুখখানের লেখাগুলি ক্ষয় লাগিয়া উঠিয়া গিয়াছে।" Fergusson সাহেব বলিয়াছিলেন—Whenever anyone will seriously undertake to write the history of sculpture in India, he will find the materials abundant and the sequence by no means difficult to follow."

শুনিতে পাওয়া যায়, বারাণসীর নিকট গঙ্গাবক্ষে Duff-Bridge নির্ম্মাণকালে সারনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল! সারনাথের স্মৃতিস্তম্ভগুলি কি কলাবিদ্যার পরাকাষ্ঠা হিসাবে, কি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে অতীব মূল্যবান, সন্দেহ নাই। সারনাথে লব্ধ ভগবান বুদ্ধদেবের এক মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া সুপণ্ডিত Vincent Smith বলিয়াছিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে এই মূর্ত্তিটি একবার নির্ম্মম যবনগণের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে—আর একবার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের সুযোগ্য কণ্ট্রাক্টরদিগের করকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে!"

এই সারনাথের Deer Park-এতেই ভগবান তথাগত সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাণলাভের উপায় সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানেই তাঁহার প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত করা সুসঙ্গত হইয়াছে; তাঁহার প্রধান শিষ্যপঞ্চককে মঞ্চোপরি প্রদর্শিত করা হইয়াছে; বামে শিশুসহ স্ত্রীলোকটি—সম্ভবত এই মূর্ত্তিটি যিনি করাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহারই নির্দ্দেশক। এই প্রতিকৃতিতে সেই যুগের ভাস্কর্য্যকৌশলের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। উপরে পরিদৃশ্যমান পরীগণের প্রতিকৃতিগুলি দিওগড়-স্থিত অনুরূপ প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে উপমিত হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"ঝান্সীর অন্তর্গত দিওগড়ের এক প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণু মন্দিরে একটি প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাস্কর্য্য বিচার করিয়া Vincent Smith বলেন, এ মূর্ত্তি অন্তত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে নির্ম্মিত। পণ্ডিত গোপীনাথ রাওয়ের নিজের মতে ঐ প্রতিকৃতি খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতকের প্রথম ভাগের।"

General F. C. Maisey তাঁহার সুবৃহৎ Sanchi and its Remains নামক পুস্তকে সাঁচী হইতে লব্ধ অনেক পুরাতন জিনিষের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাঁচী মধ্যভারতের ভিলসা নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী। এখানে বহু স্তূপ ও প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সাঁচীর নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি হইতে লব্ধ এক গদাচক্রধারী চতুর্ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তির কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার A Fuhrer তাঁহার Monumental Antiquities and Inscriptions in N.-W. Province and Oudh নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে অনেক সুপ্রাচীন জিনিষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Fuhrer* লিখিয়াছেন—সাহারাণপুরের অন্তঃপাতী খিজরাবাদ নামক স্থানে এক উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে চৌহান রাজকুমার বিশালদেবের

* Fuhrer প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষ-প্রণেতা অমরসিংহকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন ("Amar Singha a renowned Buddhist lexicographer and author of the Amarkosha." p. 15)—কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১২২০ সম্বতের (অর্থাৎ ১১৬৩ খৃষ্টাব্দের) জয়গাথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে Fuhrer সাহেবের পুস্তক হইতে সুপ্রাচীন যুগের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। মাঠাকুয়ার নামক সুপ্রাচীন দুর্গে ভগবান বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মহানুভব কার্লাইল সাহেব নিজ ব্যয়ে এবং নিজ রুচি অনুযায়ী সংস্কারসাধন পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের এক নির্ব্বাণ মূর্ত্তি এক প্রকাণ্ড বিহারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম সাহেব তাঁহার "The Stupa of Bharhut" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে অনেক পুরাতন জিনিষের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারহুত বর্ত্তমান পাটনা ষ্টেশন হইতে আন্দাজ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কানিংহামের মতে এই ভারহুত স্তূপ খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতকের জিনিষ। এখানে বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। বৌদ্ধজাতকের উপাখ্যানসমূহের বহুপ্রতিকৃতি এখানে পাওয়া গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখিবার বাসনায় হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া রাজা অজাতশত্রু এবং রথারূঢ় হইয়া রাজা প্রসেনজিৎ যে শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতি এখানে দৃষ্ট হয়। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—সেটি শ্রাবস্তি নগরের প্রসিদ্ধ জেতবাহনমঠের প্রতিকৃতি ; সেই প্রসিদ্ধ আম্রবৃক্ষ, সেই মন্দিরসমূহ, সেই প্রসিদ্ধ ধনী বণিক অনাথপিণ্ডদ—সবই একত্র পরিদৃষ্ট হয়। তা ছাড়া বহু যক্ষ-যক্ষিণী, দেব-দেবী, নাগরাজ প্রভৃতির প্রতিকৃতি এখানে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তির অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারনাথের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে কানিংহাম বলিয়াছেন—'The close fitting smooth robe is one of the most distinctive marks of the style, which is singu'arly original and absolutely independent of the Gandhara School The composition is so highly pictorial that it may have been designed after the model of a painted fresco." সারনাথের এইরূপ সুন্দর সুন্দর কত যে প্রস্তরমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে এলোরা এবং অজন্তায় আবিষ্কৃত গুহামন্দিরগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে ; অত্রস্থ প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই সুদূর অতীত যুগের ভাস্করগণ কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে পারিতেন ; আবার অজন্তার প্রস্তর-গাত্রোপরি অঙ্কিত বর্ণাঢ্য চারুচিত্রাবলীও কম নয়নাভিরাম নহে ! কোন্ স্মরণাতীত যুগে অনুলেপিত বর্ণবিভা সেগুলির আজও বিমলিন হয় নাই !

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Sir Alexander Cunningham কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করিলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ঘোর দুর্দ্দিন সমুপস্থিত হয় ; ঐ বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ অপূর্ণই থাকিয়া যায়। পরে লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলে এই প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্য আবার নবীন উদ্যমে পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় Asiatic Society-র সদস্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতেই তাঁহার এই বিভাগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিভাগ উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন লর্ড কার্জ্জন উক্ত অভিভাষণে প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন—ভারতের পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলি যথাসম্ভব বজায় রাখা ও রক্ষা করা হইতেছে ভারত গবর্ণমেণ্টের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার রীতিমত ব্যাপকভাবে আলোচনা এদেশে সুরু হয় লর্ড কার্জ্জনের আমল হইতে। এ সম্বন্ধে বক্তৃতাদানকালে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—"There has been during the last forty years, some sort of sustained effort on the part of the Government to recognise its responsib'lities and to purge itself of a well-merited reproach. This attempt has been accompanied and sometimes delayed, by disputes as to the rival claims of research and conversation, and by discussion over legitimate spheres of action of the Central and Local Governments." ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিঙ এই প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে সরকার হইতে স্থায়ী সাহায্যদানের ব্যবস্থা বিধান করেন এবং ১৮৬২ সালে General Cunningham-কে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃত্বপদে নিয়োগ করেন। তদবধি ঐ বিভাগ বহুমূল্যবান তথ্যের উদ্ঘাটন দ্বারা ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করেন। পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Sir John Marshal ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হন। মার্শ্যাল সাহেব এই বিভাগের কার্য্যপরিচালন পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট সাহেবও তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রচুর উৎসাহ দিতে থাকেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণী আইন প্রবর্ত্তিত হয় ; এই আইনের দ্বারায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানদিগের প্রাচীন জীর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ ও সৌধমালা সরকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। বাহিরের লোকেরা যাহাতে আর ভবিষ্যতে ঐ সকল মূল্যবান কীর্ত্তিকলাপের কোনরূপ অপচয় বা ধ্বংস সাধন করিতে না পারে তজ্জন্য রক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং সরকার হইতে উহাদের সংরক্ষণার্থ ইংরেজী ও বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় ইস্তাহার জারি করা হয়। যাহাতে ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন কোনরূপে নষ্ট না হয় এবং যাহাতে প্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধারকার্য্য অব্যাহতভাবে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয় লর্ড কর্জ্জন তাহার জন্য যতদূর সম্ভব বিধিবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য ভারতবাসী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহের ফলেই প্রত্নতত্ত্ববিভাগ আজ ভারতে এত অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"It is in my judgment equally our duty to dig and discover, to classify, reproduce and describe, to copy and decipher and to, cherish and conserve." ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সৌভাগ্যক্রমে লর্ড কর্জ্জনের মত পরম বন্ধুকে সে সময়ে পাইয়াছিল বলিয়াই এত দ্রুত উন্নতির পথে

(২) সৌর-সংস্কৃতি, (৩) আগ্নেয়-সংস্কৃতি (৪) বৈষ্ণব-সংস্কৃতি, (৫) শৈব-সংস্কৃতি ও (৬) শাক্ত-সংস্কৃতি। ইহাদের সংক্ষেপত পরিচয় এইরূপ—

(১) "গাণপত্য-সংস্কৃতি"—শাস্ত্র বলিয়াছেন "জ্ঞানং গণেশং"। মানুষের যেদিন হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, মানুষ বুদ্ধির ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, মানুষের পঞ্চকৃষ্টি বা পঞ্চজন একত্রে "গণে" দলবদ্ধ হইয়াছে—সেইদিন হইতেই গাণপত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টি। হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের—তাহার মানস-সম্পদের মূলে আছে এই গাণপত্য-সংস্কৃতি। হিন্দুর বিদ্যা ও শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী ও লক্ষ্মী গণেশেরই ভগিনী সহোদরা। হিন্দুর ললিতকলা এই দেব-গোষ্ঠীরই অবদান; উপনিষদের "দেবজন-বিদ্যা" এই গাণপত্য-সংস্কৃতিরই পরিণতি। সঙ্গীত হইতে সাহিত্য, এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই—তথাপি একথা বলিতে পারা যায় যে, রাজনীতি, হিন্দুর পারিবারিক প্রথা ও সমাজের আদিমতম বিধি ব্যবস্থা এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। কালে গণপতি অপ্রধান হইলেও হিন্দু সমাজ হইতে তাঁহার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। ভারতের—তথা বাঙ্গালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) "সৌর-সংস্কৃতি"—এক হইতে দশম পর্য্যন্ত সংখ্যা-লিখনপদ্ধতি, যজ্ঞ-কার্য্যের ও মানবের শুভাশুভ গণনার জন্য দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর, গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির আলোচনামূলক গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। সমাজের সর্ব্বস্তরে ইহার প্রভাব। বেদে মিত্র দেবতা বহু সম্মানিত। ভারতীয় ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা সাবিত্রী-দীক্ষা বা গায়ত্রী-দীক্ষা। গায়ত্রী মন্ত্রে মিত্র দেবতারই স্বরূপ প্রকাশিত। অধুনা সমাজে গ্রহাচার্য্যগণ যতই অবজ্ঞাত হউন, এক সময় তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্যতম ছিলেন। বসন্তের মত ত্বক্‌চিকিৎস্য ব্যাধির চিকিৎসা ও সৌর-সংস্কৃতির সৃষ্টি। আয়ুর্বিজ্ঞানের কিয়দংশ এই সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উড়িষ্যার কোণার্কের মন্দির এবং মন্দির-পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি-নিচয়ে সৌর-সংস্কৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে পরিচয় প্রকাশিত, তাহা লইয়া যে-কোন দেশের যে-কোন জাতি গৌরব করিতে পারে। এই মন্দির ও মূর্ত্তি-গোষ্ঠী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সৌর-সংস্কৃতির প্রভাব বহু বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে বহু প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজগণের কেহ কেহ সৌর ছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের পল্লীর সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত "ইতু পূজা" বা "মিতু পূজা" মিত্র পূজারই নামান্তর। সূর্য্যদেব আজিও আরোগ্যের দেবতারূপে পূজাপ্রাপ্ত হন।

(৩) "আগ্নেয়-সংস্কৃতি"—মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে অগ্নিদেব যেদিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে অথবা অরণীকাষ্ঠের মন্থনে কিরূপে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যেরূপেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটুক, অগ্নিকে যাঁহারা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমুন্নত ছিল। যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণের জন্য ভূ-মিতি ও পরিমিতি শাস্ত্রের উদ্ভব এই সংস্কৃতি হইতেই হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদের অনেকাংশ এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতি হইতে রাষ্ট্রনীতিও অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং নক্ষত্র-বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণের অনেকেই সাগ্নিক ছিলেন, তাঁহাদের পৃথক অগ্নি-গৃহ ছিল। প্রতিদিন সেই গৃহরক্ষিত অগ্নিতে সমিধ দান করিতে হইত। আজিও কোন কোন ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত নিত্য-হোমে তাহারই শেষ স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবে অভিশপ্ত-অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াছেন, কবে আর্য্যগণের একশাখা অগ্নি-উপাসক পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন, নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই। মনে হয় ব্রহ্মার সঙ্গে অগ্নির কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজিও পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি হিন্দুপ্রধান পল্লীতে অগ্নি-ভয় নিবারণ জন্য চৈত্র-মাসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে অগ্নির আরাধনা হয়। ঐদিন ব্রহ্মা-পূজার দিন নামে পরিচিত। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে হোম করিতে হইলে মর্ত্ত্যে ব্রহ্মা আছেন কি-না দেখিয়া দিন স্থির করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন, "জয়া পূর্ণা মহীতলে"। জয়া ও পূর্ণা তিথিতে ব্রহ্মা মর্ত্ত্যে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাও আদিতে পঞ্চবদন ছিলেন। মহাদেবের সঙ্গে বিবাদে তাঁহার একটী মস্তক লুপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিতেছেন—

ভিক্ষু

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় • ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

"আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন" ॥"

এই বিবাদের পৌরাণিক রহস্য আছে এবং ব্রহ্মার এই মস্তকহীনতার সঙ্গে অগ্নিপূজা-লোপেরও সম্বন্ধ আছে।

(৪) "শৈব-সংস্কৃতি"—বৈষ্ণব-সংস্কৃতির কথা সর্ব্বশেষে বলিতেছি। অনেকে বলেন আর্য্যগণ অথবা আর্য্যেতর কোন কোন জাতি আদিতে পশুচারক ছিলেন। আমার মনে হয় শৈব ও বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে পশুচারক জাতির সম্বন্ধ আছে। শৈব-সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শৈব-সংস্কৃতি হইতে যে লোকগীতি এবং মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শিবের কৃষিকার্য্য একটী প্রধান উপাখ্যান। শৈব-সংস্কৃতি বহু প্রাচীন এবং অতীতে শিবোপাসক জাতিই কৃষির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই যোগমার্গের প্রবর্ত্তক। চিকিৎসকার্য্যে মুক্তা, প্রবাল, পারদ, স্বর্ণাদি ইহাঁরাই প্রথম ব্যবহার করেন। ঔষধার্থে হলাহলের প্রয়োগও এই সংস্কৃতির অন্যতম দান।

জাতিগঠনে এই সংস্কৃতির অবদান বড় অল্প নহে। সমাজের আপাদ-মস্তক—চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই শিবপূজায় অধিকারী। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সংস্কৃতির মধ্যে শুদ্ধি-আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অন্তর্প্রবিষ্ট রহিয়াছে। গত সন ১৩২৮ সালের তৃতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদের "মহাদেব" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় এই শুদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। সেকালে একদল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "যাযাবর"। তাঁহাদের গোত্রই ছিল "যাযাবর"। ঋষি জরৎকারু প্রভৃতি "যাযাবর" গোত্রের ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের দলকে "ব্রাত" বলিত, দলভুক্ত সকলেই "ব্রাত্য" ছিলেন। দুই-চারি দিনের জন্য ইহাঁরা যেখানে থাকিতেন সেই স্থানকে "ব্রাত্যা" বলিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলে ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মত দৈব প্রজা অর্থাৎ দেবতাদের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই গান করিলে তাহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম 'ব্রাত্যস্তোম'। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দুইজন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন। তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদিগকে ঋত্বিক দিতেন, মোটামুটি তাহাদিগকে আপনার সমান করিয়া লইতেন।" এই ব্রাত্যদের দেবতা ছিলেন শিব। পূর্ব্বে ব্রাত্যস্তোম অর্থাৎ শুদ্ধিযজ্ঞ যখন তখন হইত। পরে একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে শুদ্ধিযজ্ঞ সুরু হয়। আজিও বৎসরের শেষে চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শিবের গাজনের দিন। এই দিনের নাম "হোম-পর্ব্ব"। শিবের গাজনে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত ভক্ত হইতে পারে এবং উত্তরীয় সূত্র (উপবীত) গলায় দিয়া গাজনের কয়দিন সকলেই সমান হইয়া যায়। ইহাদের মূলমন্ত্র

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥"

সমগ্র ভারতে—এবং ভারতের বাহিরেও এই সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, তক্ষণ শিল্পে, সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, জীবিকার অবলম্বনে, সমাজ-ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রনীতিতে এই সমুন্নত সংস্কৃতির প্রভাব সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট।

(৫) "শাক্ত-সংস্কৃতি"—শৈব-সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিবাদ বা শক্তিবাদ এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। এই সংস্কৃতি সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সমাজে এখনও ইহার প্রভাব অপ্রতিহত। এই সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলিকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতব্যাপী নবরাত্র-উৎসব এবং বাঙ্গালার দুর্গোৎসব প্রকৃতই জাতীয় উৎসব। দুর্গোৎসবে সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যেরও সমবায় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কামার, কুমোর, ছুতার, মালাকর হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি হাড়ি ডোম চণ্ডাল পর্য্যন্ত এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিন্দু জাতির সর্ব্বসম্প্রদায়-

সম্মেলনের এমন উৎসব বাঙ্গালায় আর দুইটী নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাভাব হেতু এবং ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার পল্লী-অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই উৎসবের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে এই সমস্ত উৎসবে নূতন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শাক্ত-সংস্কৃতির ফলে বাঙ্গালার সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। শাক্তগণ চিন্ময়ী জননীকে মৃন্ময়ীর সঙ্গে মিলাইয়া এই নদী, পর্ব্বত, বনানী ব্যবধানবহুল ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড ঐক্যে আবদ্ধ করিয়াছিল।

(৬) "বৈষ্ণব-সংস্কৃতি"—এই সংস্কৃতিও বহু পুরাতন। বেদ এবং তন্ত্রের সমন্বয়ে এই সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্ম্ম নিবারণ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন এই সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। শৈব-সংস্কৃতির মূলমন্ত্র যেমন "যত্র জীব তত্র শিব" এই সংস্কৃতির মূলমন্ত্রও তেমনই মানব-প্রেম, সর্ব্বভূতে সমদর্শন। পরাধীনতার মধ্যে জাতি গঠিত হয় না। জাতিকে স্বারাজ্য-সংসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে পঞ্চবিধা মুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের বাণী। জাতি গঠনে এই পঞ্চবিধা মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জাতি গঠনে প্রথম প্রয়োজন "সার্ষ্টি"—সমান ঐশ্বর্য্য। অর্থনৈতিক ভিত্তিই ইহার মূল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সকলকে সমানভাগে সমাজের ঐশ্বর্য্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। বণ্টন করিয়া দিলেও সকলের রাখিবার সামর্থ্য সমান নয়, ব্যয়ের বুদ্ধিও সমান নয়, ন্যায়-সঙ্গত নয়। সুতরাং সমাজের মধ্যে অর্থপ্রবাহের নিয়মানুগত প্রণালী থাকা চাই, শ্রমের মর্য্যাদা চাই, বিনিময়ের বিধি-সঙ্গত ব্যবস্থা চাই, আদান-প্রদানের শুভবুদ্ধি চাই, সহ-যোগিতা চাই। সমাজের মধ্যে সকলেই যেন প্রতিভা-প্রকাশের, যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র পায়। সমাজে কেহ যেন উপেক্ষিত না হয়।

দ্বিতীয় মুক্তি "সালোক্য"—সমান দেশ। এক দেশের অধিবাসীকে লইয়া জাতি-গঠনে যেমন সুবিধা হয়, ভিন্ন দেশের অধিবাসীকে লইয়া তেমনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই দিক দিয়া ভৌগলিক-ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুগণ তীর্থের সৃষ্টি করিয়া যদিও খণ্ড ভারতকে অখণ্ড মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, তথাপি জাতিগঠনে সালোক্য-মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় মুক্তি "সামীপ্য"—একদেশে বাস চাই, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে বা অন্তবিষয়ের আদান-প্রদানে জাতির মধ্যে পরস্পরের নৈকট্য থাকা চাই। তীর্থযাত্রায়, পার্ব্বণে, উৎসবে, নানা উপলক্ষে নানারূপ সম্মেলনেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

চতুর্থ মুক্তি "সারূপ্য"—জাতিগঠনে সমান রূপ চাই। কিন্তু আকার সকলের সমান হয় না, সুতরাং সবর্ণের আবশ্যকতা আছে। সেক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটিলে পরিধের সমান হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই জাতীয়-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আজিকার দিনে এই কথাটী বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

পঞ্চম মুক্তি—"সাযুজ্য"—পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটীই উপেক্ষনীয় নয়। জাতিগঠনে ভাব-সাযুজ্যের প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একভাষা না হইলে ভাব-সাযুজ্য ঘটে না। দেশের ব্যবধান থাকিলেও যদি পরিচ্ছদ এবং ভাষার ঐক্য থাকে, তাহা হইলেও জাতিগঠনে ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এক ভাষার ঐক্যেই জাতীয়তা সংরক্ষিত হইতে পারে। সংস্কৃতি-রক্ষার মূলেও আছে ভাষা। ভাষাই সাহিত্য সৃষ্টি করে, সংহতি রক্ষা করে, জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। যে জাতি নিজস্ব ভাষা ভুলিয়াছে তাহার দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। বৈষ্ণব-সংস্কৃতি আমাদিগকে এই মহান্ শিক্ষা দান করিয়াছে। বৈষ্ণব-সংস্কৃতির মধ্যেও শুদ্ধির স্থান অপ্রধান নয়। শক, হূণ, এমন কি গ্রীক, যবনেরাও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

সৌন্দর্য্যবোধ এবং রুচির দিক্ দিয়া বৈষ্ণব-সংস্কৃতির অবদান সুপ্রচুর। রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ফলে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই সংস্কৃতিকে বাঙ্গালীর প্রেমের ঠাকুর, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন এক দিব্যমহিমায় মণ্ডিত করিয়া-ছিলেন, বাস্তবতার এমন এক অমৃতলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। মানুষের ইতিহাসে অভিনব।

হিমালয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে দেবাত্মা, নমামি নগাধিরাজ,
এ কি শৈলের সমারোহ দেখি আজ!
শিখরে শিখরে গলিছে নিবিড় স্নেহ,
আকার ধরিতে চাহিছে অপরিমেয়।
গহ্বরে সিংহ কোথাও করিছে বাস,
কোথা অজগর ফেলিতেছে নিঃশ্বাস।
নিঃশ্বাস রোধি' গুহাতে কোথাও ঋষি—
যোগনিমগ্ন রয়েছেন দিবানিশি।
কঠোর, কোমল, প্রশান্ত দুর্জ্জয়,
দুর্নিরীক্ষ্য নমোনমঃ হিমালয়।

২

ভূর্জ্জ ও চীর, উচ্চ সরল শাল,
রয়েছে প্রসারি ছায়াবাহু সুবিশাল।
চরিছে চমরী, মৃগ ময়ূরের শ্রেণী,
ছড়ায়ে পড়িছে ঝর ঝর জলবেণী।
মত্ত হস্তীযূথ ভ্রমে—লাগে ডর,
শ্যাম সুন্দর বিপুল ভয়ঙ্কর।
গঙ্গা যমুনা সর্ব্বতীর্থময়ী—
দোহালা দেখিছে উৎসঙ্গেতে রহি।
দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী ও রূপ
হেরি উল্লাসে বিস্ময়ে হই চুপ।

৩

শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষেতে মিলামিশা—
তুমি সাধনার প্রস্তরীভূত নিশা।
স্বর্গ মর্ত্তে পাষাণ যোজক তুমি,
নর-নারায়ণে মিলনের পটভূমি।
পাষাণ প্রতীক তুমিই অনন্তের,
মূর্ত্ত প্রথম সূত্র বেদান্তের।
আছ ভারতের রোধি উত্তর দ্বার—
সাকার প্রশ্ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার!
বক্ষে চলিছে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
অনতিক্রম্য নমোনমঃ হিমালয়।

৪

ভঙ্গিমাময় পাষাণ আঁখরে লেখা,
তুমি মহাকাল সঙ্গীত-স্বর রেখা।
ধ্রুব প্রার্থনা, তুমি মহিম্ন স্তব,
প্রলয় নৃত্য প্রস্তরীকৃত সব।
তুঙ্গশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা—
মহাভারতের জমাট আকাঙ্ক্ষা।
ঘনীভূত প্রেমানন্দ আত্মহারা—
স্বর্গের ডাকে তুমি ভারতের সাড়া।
যুগের যুগের দেখিতেছ অভিনয়—
অনধিগম্য নমোনমঃ হিমালয়।

৫

রূঢ় কর্কশ শিলা আবরণ মাঝে
জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্ত্তি তোমার রাজে।
হে মহাতাপস এসো তুমি বাহিরিয়া—
শান্তি সলিলে জুড়াও ধরার হিয়া।
তোমার আশায় জগৎ রয়েছে বসি
অমৃতের বাণী শুনাও হে রাজঋষি।
যুগের যুগের তব সাধনার ফল
দাও—অপসর—বিশ্বের অমঙ্গল।
শুনাও নবীন উপনিষদের বাণী
পতিত আমরা উর্দ্ধে উঠাও টানি।

৬

বাহির হইতে ভিতর যে মহীয়ান।
জগন্মাতার পিতা তুমি হিমবান।
তুমিই প্রবর—আমরাও নহি পর
যিনি ও ভবন গুপ্ত ও মনোহর।
ক্ষুদ্র মানব প্রেমের মন্ত্র জানি,
দুষ্প্রধর্ষে নমনীয় করে আনি।
গোত্রপ্রধান—তুমি পরমাত্মীয়
স্নেহের এ দাবী হ'কস্তব গ্রহণীয়।
ক্ষন্তব্য—এ অপরাধ যদি হয়
বিরাট পুরুষ নমোনমঃ হিমালয়।

অরসিকেষু

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

মহাদেবপুরে মহা হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়াছে অর্থাৎ নকুড় মোক্তারের নবাগত শ্যালক নন্দবাবুই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক নন্দলাল চৌধুরী—সে কথা তিনি গোপন করিলেও কেমন করিয়া যেন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য সমিতির ছেলেরা আসিয়া নন্দ চৌধুরী মহাশয়কে ধরিয়া পড়িল—তাঁহার মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক যখন অখ্যাতনামা ছোট্ট শহর মহাদেবপুরে অনুগ্রহপূর্ব্বক পদার্পণ করিয়াছেন তখন তাহাদের সাহিত্য সমিতির পক্ষ হইতে একটা বিনীত অভিনন্দন তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

খ্যাতি অর্জ্জন করিলে এই জাতীয় নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধের উপদ্রব সহিতেই হয়। নন্দবাবু অবশ্য অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাবে আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এবং তিনি যে এখানে সাহিত্যিক হিসাবে মোটেই আসেন নাই, আসিয়াছেন ভগ্নীপতির বাড়ী বেড়াইতে, শরীরটাও তাঁহার তেমন ভাল নাই, উপরন্তু অভিনন্দন প্রভৃতি ব্যাপারও যে তিনি আদপেই পছন্দ করেন না, ইত্যাদি বহু প্রকার ওজর আপত্তি করিয়াও তিনি মহাদেবপুরের অতি-উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। বিপন্ন ও অসহায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্মতি তাহারা আদায় করিয়া তবে ছাড়িল।

সত্যসত্যই নন্দবাবু বড়দিনের ছুটিতে ভগ্নীপতির বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন, সাহিত্য করিতে আসেন নাই; কলিকাতায় নানা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, মহাদেবপুরে আসা পূর্ব্বে তাঁহার আর ঘটিয়া ওঠে নাই; এইবার ভগ্নীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এখানে পদধূলি দিয়া ধন্য করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ভগ্নীপতির গৃহবাসীবৃন্দ পুলকিত এবং মহাদেবপুর শহরের অধিবাসীবৃন্দ বিগলিত। বাঙ্গালার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীনন্দলাল চৌধুরী মহাশয়কে চাক্ষুস দেখিতে পাওয়াই মহাদেবপুরের উদীয়মান সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা; ইহার উপর তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাওয়ায় তাহারা আকাশের চন্দ্রই যেন হাতে পাইয়াছে, পারতপক্ষে নকুড়বাবুর বাড়ীর ত্রিসীমা ছাড়িয়া যাইতেছে না।

নন্দবাবুর ভগ্নী বলিলেন, "সত্যি নন্দ, তুই এতবড় নাম করা লিখিয়ে হয়ে উঠলি কবে, আমাদের ত কিচ্ছু বলিসনি এ্যাদ্দিন।"

কন্যা মীরা মাতার অজ্ঞতায় হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া উত্তর দিল, "এ কথা আর বল না মা, লোকে শুনলে হাসবে। থাকবে দিনরাত ভাঁড়ার আর রান্নাঘর নিয়ে—তা মামার নাম শুনবে কোত্থেকে? 'বঙ্গবিভা'র মত কাগজের হেন সংখ্যা নেই যাতে মামার কোন লেখা বেরোয়নি। তোমাকেও ত দেখিয়েছি মা মামার নাম কদ্দিন।"

ভ্রাতার এ হেন খ্যাতির কথা শোনেন নাই বলিয়া ভগ্নী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "না না, তা নয়, শুনেছি সব। তবে ভাই, সংসারের ঝঞ্ঝাটে পড়তেও সময় পাইনে সব। বাবা দুঃখু করতেন, আমার সব ছেলের মধ্যে নন্দটাই অপদার্থ হ'ল। তিনি থাকলে আজ কত খুশীই হতেন।" বর্ষিয়সী মহিলা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষুকোণ মার্জ্জনা করিলেন। "তা নন্দ, আজকাল কাজকর্ম্ম কি কচ্ছিস তা ত বল্লিনে?"

নন্দবাবু উত্তর করিলেন, "কত রকম কাজকর্ম্ম কোলকাতায় দিদি, একটু কি বিশ্রাম করবার উপায় আছে? এলাম দু'দিন তোমাদের দেশে জুড়োতে, তা যেরকম ছেলে-পুলে লেগেছে পেছনে, সুস্থিরে দু'দিন দেখছি আর তিষ্টুতে দেবে না।"

"সত্যি বাপু, দেশের লোকের যদি একটু আক্কেল থাকে। এল বেচারা দু'দিন জিরুতে, তা দিন রাত হৈ হৈ ক'রে বেড়ালে কি আর শরীর থাকবে? যাসনে নন্দ তুই ওদের কথায় নাচতে—বলে দিলাম আমি!"

ভ্রাতৃগর্ব্বে গরবিণী নকুড়-গৃহিণী ভ্রাতার আহারাদির তদ্বিরে উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নকুড়-কন্যা তিলার্দ্ধও মামাকে ছাড়িয়া থাকিতেছে না, নন্দলাল চৌধুরীর লিখিত সমুদয় গল্প উপন্যাসই সে ইতিমধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছে ও বন্ধুমহলে পড়াইয়াছে। উপরন্তু

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পী নন্দলাল যে তাহার আপন মাতুল, সে কথা সে সগৌরবে প্রচার করিতে ক্লান্তিবোধ করে নাই।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কয়েকমাস হ'ল যে উপন্যাসখানা তুমি শুরু করেছ 'বঙ্গবিভা'য়, তার শেষটা কি রকম হবে মামা? অজয়ের সঙ্গে বুঝি প্রভার বিয়ে দেবে শেষ পর্য্যন্ত, না?"

"হ্যাঁ ঐ রকমই একটা কিছু হবে। এখনো ভেবে ঠিক করিনি কিছু—"

"আচ্ছা মামা, তোমরা আস্ত বইখানা লিখে নিয়ে তার পর একটু একটু করে ছাপাও, না মাসে মাসে লেখ আর ছাপাও, বল না—"

নন্দবাবু ভাগিনেয়ীকে সস্নেহে এই জাতীয় অদ্ভুত কৌতূহল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া জানাইলেন—সেটা লেখকের অবসর ও মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, এ সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। কিন্তু এত সহজেই কথাশিল্পী মাতুলের ভাগিনেয়ীর কথা বন্ধ হইবার কথা নহে। মীরা পুনরায় প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়া চলিল—তাঁহার গ্রন্থাবলী তিনি মীরাকে উপহার পাঠান নাই কেন, কোন্ বইখানা তাঁহার প্রথম লেখা, তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ রচনা কোন্‌খানা, একখানা বড় বই লিখিতে তাঁহার কতদিন সময় লাগে, বই লিখিয়া মাসে তিনি কতটাকা উপার্জ্জন করেন, ইত্যাদি—কিন্তু পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা ও অকালপক্ক বালিকার এই সব অবান্তর প্রশ্ন নন্দবাবুকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। তিনি অগত্যা ভর্ৎসনার সুরে ভাগিনেয়ীকে বলিলেন, "এই বয়সে এত নভেল পড়ার ঝোঁক কেন তোর বল ত? ঢের সময় পড়ে আছে, যখন বড় হবি তখন পড়বি, বুঝলি? যা, চট ক'রে এখন গোটাকতক পান সেজে নিয়ে আয় ত দেখি, তোর সঙ্গে আর বকতে পারিনে আমি। ঘরে বাইরে সাহিত্য—সাহিত্য জালিয়ে মারলে দেখছি—"

"বা রে, তোমার বই দেশশুদ্ধ লোক পড়বে, আর আমি বুঝি পড়তে পাব না? পনেরোয় ত পা দিয়েছি গত মাসে, এখনো বুঝি ছোট?" ক্ষুব্ধা মীরা অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ ও ছলছল চক্ষু লইয়া পান সাজিতে উঠিয়া গেল।

খানিক বাদেই প্রৌঢ় নকুড়বাবু একটি বৃহৎ মৎস্য হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন; সম্মানিত শ্যালক বাড়ীতে অতিথি, সুতরাং আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থাটা ভালই করিতে হয়। সারাজীবন মফঃস্বল কোর্টে মোক্তারী করিয়া গোঁফ পাকাইলেন, ফৌজদারী আইনের দু-দশটা ধারা মুখস্থ বলিতে পারেন, সাহিত্যের ধার ধারেন নাই কোন দিন।

কিন্তু শ্যালক যাহার এতবড় সাহিত্যিক তিনি সাহিত্যের কিছুই খোঁজ রাখেন না বলিলে লোকে শুনিবে কেন? মোক্তার-বারের সহকর্ম্মীরা—বিশেষত ছোকরা মোক্তারের দল—তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। নন্দবাবুর গ্রন্থাবলী নিশ্চয়ই তিনি উপহার পাইয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেগুলি তাহাদের দেখানো ত দূরের কথা নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই কি মনে করিয়া? মোক্তারী করেন বলিয়া সাহিত্যের কি তাঁহারা কিছুই বুঝেন না? এমনি ধরণের সব অনুযোগে নকুড়বাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন; বারের বৃদ্ধ উকিল রামতারণ-বাবু নিজেকে একজন বড়দরের সাহিত্য-সমালোচক বলিয়া মনে করেন, দাশুরায়ের পাঁচালি ও মেঘনাদবধের অনেক জায়গা তাঁহার মুখস্থ। তিনি পর্য্যন্ত আজ সকালে শ্লেষ দিয়া কহিয়াছেন —"কি হে ভায়া, তোমাদের ঐসব আধুনিক সাহিত্য না কি বলে, আমরা তার কিছুই বুঝিনে না—কি বলে কর? মহাদেবপুরে সত্যিকারের সাহিত্য কটা লোক বোঝে বল ত? আর বলি, প্রেমের সাহিত্য সেকালেই কিছু কম ছিল না কি, লাগুক ত দেখি বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে তোমার আজকালকার ফচকে ছোঁড়াদের সাহিত্য, দেখি কেমন পারে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ নকুড়, তুমিও ঐ সব অকালপক্ক ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশলে নাকি গিয়ে! কি বোঝে ওরা সাহিত্যের? নিয়ে এস ত তোমার শালাকে একদিন এখানে, দেখব একটু আলোচনা করে—"

কি বিপদেই পড়িয়াছেন নকুড়বাবু। খ্যাতনামা তরুণ সাহিত্যিকের আত্মীয় হইয়া অখ্যাতনামা বৃদ্ধ মোক্তার নকুড়বাবুর যেন হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে।

সামনেই শ্যালককে পাইয়া আনন্দমিশ্রিত অভিমান উথলিয়া উঠিল, "ভায়া ত শহরে আচ্ছা হৈ চৈ লাগিয়ে তুলেছ দেখছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের যে প্রাণ যায়। কি কি বই লিখেছ ভায়া, তা ত দেখালেও না, কিছুই না; নাম ক'টা অন্তত একবার আমাকে শুনিয়ে দাও তবু ত বাঁচি। দেশের লোক যে আমায় খেয়ে ফেল্লে। ওগো শুনছ, মাছটা নিয়ে যাও ত।" শেষাংশটুকু অবশ্য [illegible] বলা হইল।

নন্দবাবু রহস্য করিয়া কহিলেন, "তার জন্যে কি হয়েছে জামাইবাবু, বই না হয় আমি গিয়েই খানকয়েক পাঠিয়ে দেব'খন, কিন্তু আপনি সাহিত্য বোঝেন না এ কখন হয়? আপনার মত এ বয়সে এতখানি রসিক লোক ত আজ পর্য্যন্ত দেখিনি বল্লেই হয়।"

নকুড়বাবু আপ্যায়িত হইয়া টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সহাস্যে কহিলেন, "তা যা বলেছ ভায়া, ওইটুকুতেই বেঁচে আছি। এককালে বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে খুবই পড়া গিয়েছিল, বুঝলে কি-না; তা ইদানীং কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আর পড়াশুনোর সময় পাইনে তেমন। আঃ কি বই লিখে গিয়েছে 'প্রেমের তুফান,' বঙ্কিম চাটুজ্জ্যের লেখা, না হে?"

মীরা ইতিমধ্যেই আসিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়াছিল, বাবার শেষ কথায় অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "বাবা, জানো না কিছু, কেবল আবোল-তাবোল বকবে, যাও ভেতরে যাও, মা ডাকছে—"

"দেখলে ভায়া, একটু কি সাহিত্যচর্চ্চার অবসর আছে! আমরা সব এখন ওল্ডো ফুলের দলে কি-না, কথা বল্লেই আবোল-তাবোল বকা হয়।"

হাসিতে হাসিতে নকুড়বাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দুপুর বেলা। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই সাহিত্য সমিতির সভ্যবৃন্দ নকুড়বাবুর বৈঠকখানায় আড্ডা জমাইয়াছে। লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে আজ সমিতির বিরাট অধিবেশন হইবে এবং সেই সঙ্গে নন্দবাবুকে সমারোহে অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শরীর ভাল নাই, মাথা ধরিয়াছে, পেট খারাপ প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকারের শারীরিক অসাচ্ছন্দ্যের কথা উল্লেখ করিয়া নন্দবাবু অব্যাহতি পাইলেন না, আধ ঘণ্টার জন্যও অন্তত হাজির হইয়া অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

সমিতির কয়েকজন উৎসাহী উদ্যোক্তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা চলিতেছিল। নন্দবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা মশাই, আমি যে সাহিত্যিক তা আপনারা খোঁজ পেলেন কোত্থেকে বলুন ত?"

"বাঃ আমরা পড়িনি বুঝি আপনার বই। আমাদের লাইব্রেরীতে যে [illegible] আপনার সব ক'খানি বই-ই কবে কেনা হয়ে গিয়েছে। [illegible] পড়ে থাকি বটে, তবু আপনার নাম শুনবো না, [illegible] যে বলেন আপনি—"

"না না তা বলছিনে, তবে আমিই যে সেই নন্দলাল চৌধুরী তা আপনাদের বল্লে কে?"

ছেলেরা এইবার হাসিয়া অস্থির হইল। একজন রসিক গোছের ছোকরা মুখ টিপিয়া কহিল, "আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিন, নকুড়বাবুও আপনার নাম জানেন না নাকি?"

নন্দবাবু খানিকটা গম্ভীর হইয়া কি চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাদের বড্ড ভুল হচ্ছে মশাই। আমাকে রেহাই দিন, আমি আপনাদের লেখক নন্দ চৌধুরী নই। কস্মিনকালেও কিছু লিখিনি—আমি হলফ ক'রে বলছি। এতদূর আপনারা এগিয়ে পড়বেন জানলে—"

ছেলেরা দ্বিতীয়বার উচ্ছ্বসিত হাস্যে ফাটিয়া পড়িল, "বুঝেছি, মিটিং অ্যাভয়েড করবার মস্ত ফন্দী বার করেছেন স্যার, ওসব মোটেই চলবে না কিন্তু। বিদুরের খুদ গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করতেই হবে আপনাকে।" কেহ বলিল, "আপনি যে লেখক সে আমরা আপনাকে দেখেই বলে দিতে পারি—"। কেহ বা নিম্নস্বরে জনান্তিকে মন্তব্য করিল, "কি রকম রসিক দেখছিস্!"

কথাবার্ত্তায় দেখিতে দেখিতে মিটিং-এর সময় হইয়া আসিল। ছেলেদের হাত এড়াইতে না পারিয়া নন্দবাবু অগত্যা সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাদেবপুর শহরটি ছোট হইলেও হুজুগে কম নহে; সুতরাং দলাদলিও বিদ্যমান। নন্দবাবুকে অভিনন্দন প্রদান লইয়াও একদল গণ্ডগোল বাধাইবার উপক্রম প্রথমে করিয়াছিল বটে—তবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই।

সভা লোকে লোকারণ্য। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি—ফুলের তোড়া মালা—লাল নীল কাগজের নক্সা ইত্যাদিতে সভামণ্ডপ জমকাইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইল। শঙ্খধ্বনি, সভাপতি বরণ, প্রস্তাবনা সঙ্গীত, প্রবন্ধাদি পাঠ, অভিনন্দন প্রদান প্রভৃতি যথা নিয়মে চলিতেছে। দুই-চারিজন বক্তা ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যক্ত করিলেন—নন্দলাল চৌধুরীর মত বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিককে পাইয়া একান্ত [illegible] মহাদেবপুরের অধিবাসীবৃন্দ কি পরিমাণ কৃতার্থ হইয়াছেন। নকুড়বাবু

তাঁহার ছেঁড়া মোক্তারী চাপকানটা চড়াইয়া ব্যস্তবাগীশের মত সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাপান অভিনন্দন-পত্র বিলি করিতেছিলেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল রামতারণবাবু এখনও সভায় আসেন নাই। হয়ত অভিমান হইয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে ছুটিলেন। একগাদা গাঁদাফুলের মালায় সুশোভিতকণ্ঠ নন্দবাবু নীলসার্জের কোট গায়ে ভক্তজন-পরিবৃত হইয়া নীলবর্ণ শৃগালের মত গম্ভীরভাবে বসিয়াছেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় পেটে যেন অসম্ভব যন্ত্রণা হইতেছে। পরিশেষে তাঁহাকেও কিছু বলিতে হইবে। ছেলেরা ধরিয়াছে—বাণী দিতেই হইবে। অটোগ্রাফের খাতাও খানকয়েক জড়ো হইয়াছে টেবিলের উপর।

নন্দবাবু অসুস্থতার অজুহাতে তাড়াতাড়ি সভার কার্য্য সমাপ্ত করিতে অনুরোধ করিয়া বাণী দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন; এমনি সময়ে সভায় কি যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। সভামণ্ডপের উত্তর কোণ হইতে একটা উত্তেজনাপূর্ণ কোলাহল দ্রুতগতিতে সভার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। 'জোচ্চরি' 'কক্ষনো না', 'নিশ্চয়ই হ্যাঁ' 'বিমল নিজে শুনে এসেছে', ইত্যাদি অসংলগ্ন কোলাহলে সভায় কান পাতা দায়। বিরুদ্ধবাদীদলের রুদ্ধ ক্রোধ উথলিয়া উঠিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ভক্তগণ হাঁকিতে লাগিল—"চুপ, চুপ—অর্ডার, অর্ডার!

কে কাহার কথা শোনে। নন্দবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত বিমল নামে একটি ছোকরা নন্দবাবুর কাছে আগাইয়া আসিল, পিছনে বিস্ময়বিমূঢ় জনতা। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি স্যার, সত্যিকথা বলবেন—"

নন্দবাবু নির্লিপ্তের মত উত্তর করিলেন, "করুন।"

"আপনিই কি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক নন্দলাল চৌধুরী?"

বিক্ষুব্ধ জনতা রুদ্ধনিশ্বাসে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।

অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "না।"

দ্বিগুণিত কোলাহলের মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, "তবে আপনি আমাদের প্রতারণা করেছেন?"

"না, রসিকতা করেছি—"

"মানে—?"

"আপনারাই ভুল ক'রে আমাকে সাহিত্যিক ক'রে তুলেছেন। প্রথমটা আমি রসিকতা ক'রে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শেষটা ভ্রম-সংশোধন করতে চেয়েছিলাম, আপনারা শোনেননি। মিটিং-এ এই কথাই আমি খুলে বলতাম—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সভায় দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইল। কেহ বলিল—জুয়াচুরি, কেহ বলিল – ধাপ্পাবাজী. রসিকতা কেহই বুঝিল না। সভায় মার মার শব্দ—

হট্টগোলের ভিতর নন্দবাবু অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িলেন এবং সেই রাত্রেই জরুরী কাজে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য, রসিক নন্দলাল ইহার পরে অরসিক মহাদেবপুরে আর পদার্পণ করেন নাই।

তবে নকুড়-গৃহিণীর পাড়া বেড়ানো সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে ও নকুড়-কন্যার বন্ধু সমাগমে অরুচি ধরিয়াছে। নকুড়বাবু হুঁকা হাতে ভাবিতে বসিয়াছেন—কিছুদিন কোর্ট কামাই করিলে তাঁহার চলে কি না? অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে নন্দবাবুর সহিত তাঁহার সম্পর্কটা দীর্ঘায়িত হইয়া বাহির হইল—"শ্—শা—"
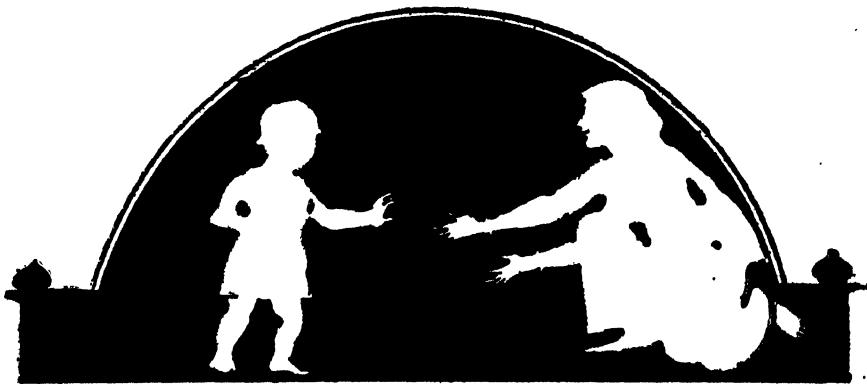
পাইকপাড়ার বাসুদেব মূর্ত্তিতে গোবিন্দচন্দ্রের লেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে ভূগর্ভ হইতে একটী বাসুদেব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। গ্রামখানি ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত টঙ্গীবাড়ী থানার অধীন। মূর্ত্তি আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া আউটসাহী পল্লী-কল্যাণ-আশ্রমের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেন মূর্ত্তিটী সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং আউটসাহীতে পল্লীকল্যাণাশ্রমে উহা রাখিবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি মূর্ত্তিটী ঐ স্থানেই রক্ষিত আছে। সম্প্রতি "বিক্রমপুরের ইতিহাস-এর" স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ মূর্ত্তির বিষয় অবগত হন। মূর্ত্তিটীর পাদপীঠে একটী ক্ষুদ্র লেখ উৎকীর্ণ আছে জানিয়া গুপ্ত মহাশয়ের কৌতূহল জাগ্রত হয়। তিনি শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সহায়তায় লেখটীর একটী প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত মহাশয় আমাকে প্রতিলিপিটী অর্পণ করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। আমি এই অবসরে গুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রতিলিপিটী যথোপযুক্তরূপে গৃহীত হয় নাই; সর্ব্বত্র সকলগুলি অক্ষরের উপর ঠিকমত কালি লাগে নাই। কিন্তু প্রতিলিপিটীর সহিত মণীন্দ্রবাবুর একটী অনুলিপি যুক্ত ছিল। যাহা হউক, লেখটী পড়িতে কোনই অসুবিধা হয় নাই।

বাসুদেব মূর্ত্তিটীর পাদপীঠের উভয়পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মামুলি উপাসক মূর্ত্তি আছে; উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাত্র চারি পঙ্‌ক্তির একটী ক্ষুদ্র লেখ। লেখটীর মধ্যে আবার একটী ক্ষুদ্র গরুড় মূর্ত্তি খানিকটা স্থান জুড়িয়াছে এবং অপর একটী রেখা উপর দিক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে উপরের তিনটী পঙ্‌ক্তি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই লেখটীতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত দ্রুত হস্তলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। যাঁহারা মধ্যযুগের প্রথমদিকের পূর্ব্ব-ভারতীয় লিপিমালা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লেখসমূহে ব্যবহার্য্য অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অক্ষর এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাধারণ অক্ষর, একই সময়ে এই দুই প্রকার লিপির ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন।(১) দেবপালের ঘোষরাবাঁ লিপির অক্ষর ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপির অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপির অক্ষর তাঁহারই বাদাল এবং বিষ্ণুপাদ মন্দিরের লেখদ্বয়ের অক্ষর অপেক্ষা আধুনিক। শত্রুভঞ্জের কেশরী লিপি, কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির বাণগড় লিপি এবং নয়পালের ইর্দ্দা লিপিকে পণ্ডিতগণ দশম শতাব্দীতে স্থান দিয়াছেন; কিন্তু এই সকল লিপিতে যে ত্রিভুজাকার "র" ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উহা কদাচিৎ দেখা যায়। উল্লিখিত বাণগড় লিপির "ভ"-ও অনেকটা আধুনিক। আবার শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দ কেশবদেবের ভাটেরা লিপির কাল আজকাল পণ্ডিতগণ ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন(২); কিন্তু এই লিপির অক্ষর ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায়। যাহা হউক, বর্ত্তমান পাইকপাড়া লিপির অক্ষর একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাল ও সেন বংশীয়দিগের লেখমালায় ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। নয়পালের কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের লিপি এবং প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির অক্ষরের সহিত পাইকপাড়া লিপির অধিকাংশ অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু "ত", "র" ও "ভ" অক্ষর তিনটীর রূপ অনেকটা আধুনিক। "ত" ও "ভ"-এর নিম্নাংশ বামদিকে আবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তীরফলকের অগ্রভাগের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত "র"-এর পরিবর্ত্তে ত্রিভুজাকারের "র" ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির লিপির "ত" ও "ভ" এবং ইর্দ্দা লিপির "র" কতকটা পাইকপাড়া লিপিতে ব্যবহৃত ঐ তিনটী অক্ষরের অনুরূপ। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন স্থলে এই আকারের "র" ও "ভ"-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।(৩) যাহা হউক লিপিতত্ত্ব অনুসারে পাইকপাড়া লেখটীকে একাদশ

(১) R. D. Banerji, *Origin of the Bengali Script*, pp. 60, 68-9.

(২) Bhandarkar, *List*, No. 1769. এই লিপি ১১শ শতাব্দীর পরের হইতে পারে।

(৩) Buehler's Palaeographic Charts, Tafel V.

শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিংবা তৎপরবর্ত্তীকালে স্থান দেওয়া যায়। লেখটীর ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। ইহা গদ্যে লিখিত।

এই লেখ হইতে জানা যায় যে পাইকপাড়ার বাসুদেব মূর্ত্তিটী শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রের ২৩শ সংবৎসরে অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্র নামক জনৈক রাজার ত্রয়োবিংশ রাজ্যাঙ্কে গঙ্গাদাস নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ করানো হইয়াছিল। গঙ্গাদাসের পিতা ছিলেন উপরত (অর্থাৎ মৃত) পারদাস। এই গঙ্গাদাসকে "রালজিক" বলা হইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহার অর্থ "রলজের (বা এতদনুরূপ কোন স্থানের) অধিবাসী।"

ইতিপূর্ব্বে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কোন লেখ আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা বাংলা দেশের একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই নরপতির নাম সুপরিচিত। বহুকাল পূর্ব্বে সুদূর-দক্ষিণ ভারতের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপি(৪) হইতে জানা গিয়াছিল যে, আনুমানিক ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে চোল সৈন্যগণ দিগ্বিজয় ব্যপদেশে পূর্ব্ব-ভারতে উপস্থিত হইলে বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন বঙ্গালদেশের অবস্থান, গোবিন্দচন্দ্রের বংশপরিচয় এবং তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে অধিক কিছুই জানা যায় নাই। পরে বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজগণের কয়েকটী লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। পাইকপাড়ায় আবিষ্কৃত বর্ত্তমান লেখ হইতে আরও দুইটী নূতন কথা জানা গেল। প্রথমতঃ, পূর্ব্বতন চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দচন্দ্রও সম্ভবতঃ বিক্রমপুর অঞ্চল শাসন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, গোবিন্দচন্দ্র দ্বাবিংশতি বর্ষেরও অধিককাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লিপিতত্ত্বের দিক হইতে পাইকপাড়া লিপিটীর কাল ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগের অধিককাল পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যায় না; আবার রাজেন্দ্র চোলের লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গালদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন্। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, রাজা গোবিন্দচন্দ্র আনুমানিক ১০২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আনুমানিক ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই দেশটীকে উত্তর-রাঢ় এবং দক্ষিণ-রাঢ় হইতে পৃথক করা হইয়াছে। চোল সৈন্য পালবংশীয় প্রথম মহীপালকে পরাজিত করিয়া উত্তর-রাঢ়ে এবং গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। এই উত্তর-রাঢ় এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অঞ্চল মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন বঙ্গের ন্যায় এই বঙ্গালদেশও বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুলফজল লিখিয়াছেন (জ্যারেটের অনুবাদ ২।১২০) যে বঙ্গাল প্রাচীন বঙ্গেরই নামান্তর। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের রাজগণ প্লাবন নিবারণের জন্য ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ আয়ত মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক একটী "আল" প্রস্তুত করাইতেন। এই প্রথার ফলে, বঙ্গ + আল এই দুই শব্দযোগে বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রাচীন বঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন(৫) যে, প্রাচীনকালে সঙ্কীর্ণ অর্থে বঙ্গ বলিতে বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বকূলস্থিত ভূখণ্ড বুঝাইত; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব হইতে মেদিনীপুরের কাঁসাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম ছিল বঙ্গ। আবুলফজলের নিরুক্তি পাঠে মনে হয় যে, এই ব্যাপক বঙ্গের সমুদ্রসন্নিহিত এবং নদীনালাবহুল দক্ষিণ ভাগেই জলপ্লাবন নিবারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত এবং উহাই কালক্রমে বঙ্গাল নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ লিপি হইতে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। এই লিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে (নদীনালাবহুল দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ "ভাটি" অঞ্চলে) অবস্থিত রামসিদ্ধি পাটক এবং বঙ্গালবড়াভূ নামক দুইটী স্থানের উল্লেখ আছে। বাখরগঞ্জ জিলার উত্তরদিকে গৌরনদী থানার অন্তর্গত রামসিদ্ধি এবং বজোড্ডা নামক স্থানদ্বয়ের সহিত ঐ দুইটী স্থান অভিন্ন

(৪) South Indian Inscriptions, (1890); I, pp. 97-99; Ep. Ind., IX, p. 229 ff. এই লিপি রাজেন্দ্র চোলের ১২শ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজেন্দ্র ১০১২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে সিংহাসন আরোহণ করেন। সুতরাং তিরুমলৈ লিপির তারিখ ১০২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ। রাজেন্দ্রের ৯ম রাজ্যবর্ষের পরে এই বিজয়াভিযান প্রেরিত হইয়াছিল।

(৫) *Studies in Indian Antiquities*, pp. 187-8.

বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।(৬) সুতরাং অধ্যাপক রায় চৌধুরী যে চন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সহিত বঙ্গালদেশের অভিন্নতার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গালদেশে যখন চন্দ্রবংশীয় রাজগণ স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন, তখন হইতেই বঙ্গাতিরিক্ত বঙ্গাল নামে একটী দেশ বা রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্ররাজ্য চন্দ্রদ্বীপ নামেও খ্যাত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে বঙ্গালের চন্দ্র-রাজগণ প্রাচীন বঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন; এই সময় হইতে বঙ্গ অর্থেও বঙ্গাল শব্দের ব্যবহার চলিতে থাকে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখাইতে চাহিয়াছেন (৭) যে, বঙ্গাল নামক একটী নগর বর্ত্তমান চট্টগ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল এবং চট্টগ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলই বঙ্গাল দেশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটীকে তিনি সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ তিনি যে সকল বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, উহাদের রচয়িতৃগণের অভ্রান্ত ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, সম্রাট্ আকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গালা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না; আসল বঙ্গালদেশটীও সুবা বাঙ্গালার অংশ ছিল, এইরূপ অনুমানই সঙ্গত এবং সহজ। তৃতীয়তঃ, বঙ্গালপতি গোবিন্দচন্দ্র বা তদ্বংশীয় অপর কেহ যে চট্টগ্রামের রাজা ছিলেন তাহার প্রমাণ নাই; বরং চট্টগ্রামাঞ্চল যে তাঁহাদের রাজ্যবহির্ভূত ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিতে হইলে বর্ত্তমান বাংলা দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দীর ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে খড়্গবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ব-বাংলা শাসন করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, খড়্গগণের লিপিতে হর্ষসংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু হর্ষের সহিত পূর্ব্ব-বাংলার কোনরূপ সম্পর্ক প্রমাণিত না হইলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কনোজরাজ যশোবর্ম্মার আক্রমণের ফলে খড়্গগণের পতন হয়। অতঃপর দেশে মাৎস্য ন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হইল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ খড়্গগণের পতনের কয়েকবৎর মাত্র পরে পালগণের অভ্যুদয়ের ফলে এই অরাজকতা বিদূরিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ, বাদাল-প্রশস্তির ২য় শ্লোক, দেবপালের মুঙ্গের লিপির ৩য় শ্লোক, ভোজের সাগরতাল লিপি, কর্করাজের বরোদা লিপি, বালাদিত্যের চাটসু লিপি প্রভৃতি হইতে আমি অন্যত্র (৮) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পালবংশের আদি রাজা গোপাল প্রথমে বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাংলায় রাজ্যলাভ বা রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের সময়ে পালগণ গৌড়-মগধাদি জয় করিয়া সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং ক্রমে তাঁহারা আপনাদিগকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহারা উত্তর-বাংলার কোনস্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই বহুকাল পরে সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর-বাংলাকে তাঁহার সম-সাময়িক পালরাজগণের জনকভূ বা পৈত্রিক ভূমি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যাহা হউক, দশম শতাব্দীতে পাল-বংশের ইতিহাসে এক দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। প্রথম মহীপালের নবম রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ বাণগড় লিপির (৯) দ্বাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি রণস্থলে বাহুবলে সকল বিপক্ষকে হত করিয়া অনধিকৃত বিলুপ্ত পৈত্র্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মহীপালের পৈত্রিক রাজ্য ইতিপূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক অনধিকৃত এবং তৎপক্ষে বিলুপ্ত ছিল; অথবা যাহারা প্রকৃত রাজ্যাধিকারী নহে, তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় ইতিপূর্ব্বে পালরাজের

(৬) *Indian Culture*, II. pp. 158-9.

(৭) *Ind. Hist. Quart., XVI*, pp. 229-38.

(৮) *Proceedings of the 2nd Ind. Hist. Cong.*, 1938, p. 194; *New Ind. Ant.*, II, p. 382 ff. সম্প্রতি ডক্টর মজুমদারও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (*Ind. Hist. Quart.* xvi, pp. 233ff.)। তবে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পালবংশীয়গণ চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করিতেন, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালরাজগণের কোন লেখ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কিংবা অপর কোন অবিসংবাদী প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(৯) *Ep. Ind., XIV*, p. 326.

রাজ্যলোপ পাইয়াছিল। এস্থলে পৈত্র্যরাজ্য বলিতে সমগ্র পালসাম্রাজ্য কিংবা পালগণের প্রথম অভ্যুদয় ক্ষেত্র বঙ্গ, কিংবা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের জনকভূ বরেন্দ্রী, কিংবা সাম্রাজ্যের বঙ্গ-বরেন্দ্রী অংশ বুঝাইতেছে, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। তবে প্রথম মহীপালের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে পূর্ব্ব-বাংলা পালগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল এবং তৎকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ আছে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালে ও ধুল্লাতে (অর্থাৎ বিক্রমপুর মধ্যে) এবং ফরিদপুরের মাদারিপুর মহকুমার অধীন কেদারপুর ও ইদিলপুরে (অর্থাৎ দক্ষিণ-বিক্রমপুর মধ্যে) শ্রীচন্দ্র নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির চারিটী শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধুল্লালিপি শ্রীচন্দ্রের পঞ্চত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং চারিটী শাসন বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে শ্রীচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এগুলির অক্ষর মহীপালের বাণগড় লিপির অক্ষর হইতে প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা ও রামপাল লিপি হইতে জানা যায় যে, রোহিতাগিরির অধীশ্বর চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রোহিতাগিরিকে কেহ শাহাবাদ জেলার রোহ্‌তাস্‌গড়, কেহ কেহ বা ত্রিপুরার অন্তর্গত লালমাই পাহাড় বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাংলার চন্দ্রবংশকে আজকাল অনেকেই আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সহিত সম্পর্কিত মনে করেন। সুতরাং রোহিতাগিরি ঐ অঞ্চলের কোনস্থান হওয়া অসম্ভব নহে। আবার এই রোহিতাগিরি চন্দ্রদ্বীপের অর্থাৎ বাখরগঞ্জ অঞ্চলের কোন স্থানও হইতে পারে। চন্দ্রদ্বীপ নামটী হইতে মনে হয় যে উহা প্রথমে একটী দ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, রোহিতাগিরির অবস্থান স্থিররূপে জানা না গেলেও পূর্ণচন্দ্র যে ঐ স্থানের ভূম্যধিকারীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুবর্ণচন্দ্র নামে পূর্ণচন্দ্রের এক পুত্র জন্মে; তিনিও রাজা ছিলেন না। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র এই বংশের প্রথম রাজা। (১০) তিনি হরিকেলের রাজ্যশ্রীর আধার বা আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন (অর্থাৎ হরিকেলপতির সামন্ত ছিলেন) এবং চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে "অভিধান-চিন্তামণি"কার হেমচন্দ্র বলিয়াছেন যে বঙ্গ এবং হরিকেল অভিন্ন। সুতরাং ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গেশ্বরের সামন্তরূপে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিলেন (১১) এবং চন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ বাখরগঞ্জ অঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের স্বামী (overlord) হরিকেলপতি যে পালবংশীয় ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি স্বয়ং পালরাজের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র পূর্ব্ববাংলায় বিস্তৃত অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার শাসনসমূহ। জনৈক সামন্তরাজের পুত্র হইয়াও শ্রীচন্দ্রের "সূচিতরাজচিহ্ন"রূপে জন্মগ্রহণ হইতেও মনে হয় যে, তিনিই চন্দ্রবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। তবে তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বের প্রথম হইতেই স্বাধীন ছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ত্রিপুরা জিলার বড়কাস্তা থানার অধীন ভারেল্লা গ্রামে লয়হচন্দ্র নামক অপর একজন চন্দ্র-নৃপতির রাজত্বকালে (সম্ভবতঃ তাঁহার ১৮শ রাজ্যাঙ্কে) নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রের সহিত লয়হচন্দ্রের কি সম্পর্ক ছিল অথবা আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল কি-না (১২), তাহা জানা যায় না। তবে এই দুইজন নরপতি এক বংশসম্ভূত হইলে লয়হচন্দ্রকে শ্রীচন্দ্রের সামান্য পরবর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে। যে অনধিকারী চন্দ্রগণ পাল-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ হইতে পালপ্রভুত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল তাঁহাদিগকে হতবল করিয়া ঐ রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা যে কেবল বাণগড় লিপির পূর্ব্বোল্লিখিত দাবী হইতে অনুমিত হয়, তাহা নহে; প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের বাঘাউরা লিপিও উহা সমর্থন করে। ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অধীন বাঘাউরা গ্রামে এই লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(১০) তাঁহাকে দিলীপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেও মনে হয় যে তিনি চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা ছিলেন। কালিদাস

(১১) "আধারো হরিকেলরাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াম্‌" কথাটিতে যে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেলের পালরাজগণের সামন্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা প্রথমে অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে বুঝাইয়াছিলেন।

(১২) সম্পর্ক থাকাই সম্ভব; কারণ একই যুগে একই অঞ্চলে

বাঘাউরা লিপির মহীপালকে কেহ কেহ প্রতিহারবংশীয় দ্বিতীয় মহীপাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু এই মতের সমর্থক কোনই যুক্তি নাই। প্রতিহারবংশের সহিত পূর্ব্ববাংলার কোনরূপ সম্পর্ক প্রমাণিত না হইলে এই অনুমানকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কেহ কেহ বাঘাউরা লিপির মহীপালকে পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপাল মনে করিতে পারেন। এই সিদ্ধান্তকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে লিপি-তত্ত্বানুসারে বাঘাউরা লেখটীকে দ্বিতীয় মহীপালের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। পালবংশীয় প্রথম মহীপাল শত্রু পরাভব করিয়া নষ্ট-রাজ্য উদ্ধারের দাবী করিয়াছেন ; সুতরাং বাঘাউরার মূর্ত্তি তাঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। যাহা হউক, প্রথম মহীপালের রাজত্বের প্রথম দিকে এই গৌরবলাভ ঘটিয়াছিল ; কারণ তাঁহারই রাজত্বের শেষার্দ্ধে গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের সাম্রাজ্য (অথবা উহার অধিকাংশ) পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ রাজেন্দ্র চোলের লিপি এবং বর্ত্তমান পাইকপাড়া লিপি। কিন্তু চন্দ্রগণ দীর্ঘকাল বঙ্গে প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই। "শব্দপ্রদীপ" নামক একখানি চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, গ্রন্থকারের পিতা বঙ্গেশ্বর রামপালের রাজবৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহ রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোবিন্দচন্দ্রের (আঃ ১০২০—৪৫ খ্রীঃ) সভায় ছিলেন, তাঁহার পৌত্র রামপালের (আঃ ১০৮৪—১১২৬ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। এস্থলে রামপালকে "বঙ্গেশ্বর" বলায় মনে হয় যে গোবিন্দ-চন্দ্রের পরে পূর্ব্ব-বাংলা পুনরায় পালগণের করতলগত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিতে হইবে যে "রামচরিত"-এ রামপালের যে সামন্তবৃন্দের বিবরণ আছে, তাঁহাদের কেহই পূর্ব্ব-বাংলার লোক নহেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে বঙ্গ পালরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। ১০-১৩ শতাব্দীর অনেক লিপিতে বঙ্গ এমন কি ২৪ পরগণা জেলা পর্য্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; মনে হয় যে ইতিপূর্ব্বে এই বিস্তৃত ভুক্তি পালরাজগণ তাঁহাদের উত্তরবাংলাস্থিত রাজধানী হইতে নিজেরা শাসন করিতেন এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য গণের কেহ কেহ কেবলমাত্র বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াও পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তর বাংলার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমগাছী লিপির ১৪শ শ্লোকে তৃতীয় বিগ্রহপালের দিগ্বিজয় বর্ণন-প্রসঙ্গে পূর্ব্ব দেশের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তিনিই দ্বিতীয়বার চন্দ্র-গণকে হতবল করিয়াছিলেন।(১৩)

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী গোবিন্দচন্দ্রকে কিংবদন্তীর গোপীচন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করেন। এই গোপীচন্দ তিলকচন্দের পুত্র এবং মৃকুলের অর্থাৎ ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুল পরগণার রাজা ছিলেন। গোপীচন্দ সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর মূল পূর্ব্ব-ভারতে এবং পাঞ্জাবে প্রচলিত কয়েকটী গাথা, একখানি নাটক এবং তারনাথের ইতিহাসে উল্লিখিত কাহিনী। অবশ্য কিংবদন্তীসমূহের কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু এগুলিতে তাম্রশাসন হইতে পরিজ্ঞাত চন্দ্রদিগের ইতিহাসের বিরোধী এবং অনেক পরস্পর-বিরোধী আজগুবি কাহিনীও আছে। ভট্টশালী মহাশয় শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ও গোপীচন্দের পিতা তিলকচন্দকে অভিন্ন মনে করেন। এ অনুমান সত্য হইলে, গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া দাঁড়ান। যাহা হউক, নূতন আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এই মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিয়া লাভ নাই। তবে অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে ইতিহাসের বাহিরে রাখাই ভাল।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে পূর্ব্ববাংলা বর্ম্মাবংশীয় রাজগণের করতলগত হইয়াছিল। বর্ম্মাগণ যাদববংশীয় ছিলেন এবং পূর্ব্বে সিংহপুরের অধিপতি ছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের দেরাদুন জেলার লকৃখামণ্ডলে আবিষ্কৃত ৭ম শতাব্দীর একখানি লিপিতে পাঞ্জাব-অঞ্চলে সিংহপুরপতি যাদববংশীয় বর্ম্মাদিগের অস্তিত্ব জানা যায়। ভারতের

(১৩) সুতরাং বাঘাউরার মহীপালকে পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপাল বলিয়া ধরিতে এদিক হইতে কোন বাধা নাই। তবে আমার মনে হয় লিপিটী একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের, দ্বিতীয়ার্দ্ধের নহে। অপর প্রমাণাভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাইবে না। বাঘাউরা লিপি দ্বিতীয় মহীপালের হইলে, শ্রীচন্দ্র হইতে গোবিন্দচন্দ্র পর্য্যন্ত চন্দ্রগণ অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ইহা যে অসম্ভব, তাহা নহে। বরং চন্দ্ররাজগণের দীর্ঘ দীর্ঘ রাজত্বকাল লক্ষ্য করিলে ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

অপর কোথাও সিংহপুরপতি যাদববংশীয় বর্ম্মা দেখা যায় নাই। সুতরাং বাংলার বর্ম্মাগণকে পাঞ্জাবের যাদব বর্ম্মাদিগের একটী শাখা মনে করা অসঙ্গত নহে। বাংলার বর্ম্মারাজগণের সময়ের কয়েকখানি লেখ পাওয়া গিয়াছে—হরিবর্ম্মার এবং শামলশর্ম্মার লিপি, হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি (১৪) এবং ভোজবর্ম্মার বেলাবো লিপি। হরিবর্ম্মার রাজত্বের ১৯শ এবং ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত দুইখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং তিনি প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সামন্তসার লিপি অস্পষ্ট; উহা হইতে তিনি জাতবর্ম্মার পুত্র ছিলেন এবং বিক্রমপুর হইতে শাসনখানি দান করিয়াছিলেন, ইহাই মাত্র জানা যায়। বর্ম্মাবংশের ইতিহাসের জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ ভোজবর্ম্মার বেলাবো লিপির উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই লিপির ৫ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সিংহপুরে যাদববংশীয় বর্ম্মাগণের আদিবাস ছিল। এই বংশে যাদব সৈন্যের সমরবিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ বজ্রবর্ম্মা নামক একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই বজ্রবর্ম্মা একজন সেনানীমাত্র ছিলেন। বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মা বেণপুত্র পৃথুর শ্রী ধারণ করিয়াছিলেন; চেদিরাজ কর্ণের (১০৪১-৭১ খ্রীঃ) কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; অঙ্গদেশে রাজশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন; কামরূপরাজ, কৈবর্ত্তরাজ দিব্য ও গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরাণের "আদ্য ক্ষিতীশ্বর" পৃথুর সহিত তুলনা হইতে সত্যই অনুমান করা হইয়াছে যে, জাতবর্ম্মাই এই বংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা ছিলেন। তিনি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না; কিন্তু তিনি অঙ্গদেশ, উত্তর-বাংলা ও কামরূপ প্রভৃতির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বেলাবো লিপিতে পূর্ব্ববাংলার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কের কথা নাই। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি (১৫) যে, জাতবর্ম্মা সম্ভবতঃ তাঁহার শ্বশুর কলচুরি কর্ণের সেনানী বা সামন্তরূপে অঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কর্ণ যে অঙ্গদেশ অধিকার করিয়া পূর্ব্বদিকে বীরভূম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, পাইকোড়ে আবিষ্কৃত তদীয় জয়স্তম্ভই তাহার প্রমাণ। সম্ভবতঃ জাতবর্ম্মা প্রথমে কর্ণের সামন্তরূপেই অঙ্গে রাজশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পৌরাণিক অঙ্গরাজের পৌত্র এবং বেণরাজের পুত্র পৃথুর সহিত জাতবর্ম্মার তুলনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। (১৬) যাহা হউক, মনে হয় যে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় বিগ্রহপালের ভায়রাভাই ছিলেন এবং ভায়রার পুত্রের বন্ধুরূপে তদীয় বিরুদ্ধাচারী দিব্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু বর্ম্মাগণ চিরকাল পালদিগের বন্ধু ছিলেন না; কারণ রাজ্যোদ্ধারকামী রামপালের বান্ধবগণের যে তালিকা রামচরিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বর্ম্মাবংশীয় কাহারও নাম নাই। আবার এই সময়ে পালদিগের বান্ধব রাষ্ট্রকূটগণ অঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বোঝা যায় যে, বর্ম্মাগণ শীঘ্রই অঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা উত্তর-বাংলায় কোন স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ উত্তর-বাংলা ও কামরূপের সহিত জাতবর্ম্মার কিছু সম্পর্ক দেখা গিয়াছে। বেলাবো শাসনে ভোজবর্ম্মা কর্ত্তৃক কৌশাম্বী অর্থাৎ রাজসাহীর অন্তর্গত কুশুম্বাতে ভূমিদানের উল্লেখ আছে; ইহা হইতে জানা যে উত্তর-বাংলার কিয়দংশ পরবর্ত্তী বর্ম্মারাজগণের অধিকার ছিল। আবার "রামচরিত" হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ব্ব-বাংলা পালরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল এবং উত্তর-বাংলার অধিকাংশ ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহার সামন্তগণ

(১৪) ভবদেবের লিপিখানি "ভুবনেশ্বর অনন্তবাসুদেব মন্দিরের লিপি" নামে বিখ্যাত। বর্ত্তমানে লিপিটী ঐ মন্দিরগাত্রে আছে বটে, কিন্তু মূলে অন্যত্র ছিল বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার এশিয়াটীক সোসাইটীর লোকেরা ঐ মন্দির হইতে কয়েকটী লেখ লইয়া আসিয়াছিল; পরে সেগুলি ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু ফেরত দিবার সময় ভ্রমক্রমে অন্যত্র হইতে সংগৃহীত ভবদেবের লিপিটী ভুবনেশ্বরে পাঠান হইয়াছিল। *Proceedings of the 3rd Ind. Hist. Cong.*, 1939, pp. 287 ff.

(১৫) *Proceedings of the 2nd Ind. Hist. Cong.*, 1938, p. 198.

(১৬) ভাগবত ৪।১৩।১৮। অধ্যাপক রায় চৌধুরী আমাকে প্রথমে পৃথুর সহিত অঙ্গদেশের কোন সম্পর্ক আছে কি-না তাহা খুঁজিয়া দেখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শাসনচালনা করিতেছিলেন। সুতরাং আমরা মনে করি যে কৈবর্ত্তরাজ ভীমের প্রধান সহায় এবং পরবর্ত্তীকালে রামপালের পক্ষাবলম্বনকারী হরি নামক যে প্রতিপত্তিশালী নায়কের কথা "রামচরিত"-এ পাওয়া যায়(১৭) তিনি জাতবর্ম্মার পুত্র হরিবর্ম্মা ব্যতীত অপর কেহ নহেন। "রামচরিত"-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, রামপাল বঙ্গরাজ্যের কিয়দংশের অথবা সর্ব্বাংশের শাসনাধিকার দান করিয়া হরিবর্ম্মাকে স্বপক্ষে আনিতে পারিয়াছিলেন। "রামচরিত"-এই পরে একজন পূর্ব্বাঞ্চলের বর্ম্মাবংশীয় নৃপতি দ্বারা রামপালের প্রসাদিত হইবার কথা আছে। এই বর্ম্মা রাজা হরিবর্ম্মা হইতে পারেন; কারণ রামচরিতের ৪র্থ পরিচ্ছেদ (৩৭ ও ৪০ শ্লোক) হইতে মনে হয় যে, হরিবর্ম্মা মদনপালের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ হরিবর্ম্মার পরে তাঁহার ভ্রাতা শামলবর্ম্মা রাজা হন; হরিবর্ম্মার দীর্ঘ রাজত্বের পরে শামলবর্ম্মা অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শামলবর্ম্মার পরে তৎপুত্র ভোজবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনবংশীয়েরা বিক্রমপুর অঞ্চল অধিকার করেন।

সেনবংশের আদিপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্যের জনৈক ক্ষৌণীন্দ্র বা ভূম্যধিকারী ছিলেন।(১৮) তাঁহার বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার যশোগাথা সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকটে (অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে) গীত হইত। তিনি জাতিতে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বংশ সম্ভূত পিতামাতা হইতে জাত) ছিলেন। মাধাইনগর লিপিতে তাঁহাকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। তিনি কর্ণাট রাজলক্ষ্মীর শত্রুগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। বোধ হয় কর্ণাটের কোন চালুক্যরাজের সেনানীরূপে তিনি পূর্ব্বভারতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।(১৯) দেওপাড়া লিপির ৯ম শ্লোক হইতে জানা যায়, সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গঙ্গাতীর সম্ভবতঃ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল; কারণ নৈহাটী লিপির তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সেনগণ প্রথমে রাঢ়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ব্যারাকপুর শাসনের ৫ম শ্লোকে সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনকে "রাজরক্ষাসুদক্ষ" বলা হইয়াছে; ইহা হইতে মনে হয়, তিনি তদানীন্তন পালরাজের সামন্ত ছিলেন। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনও প্রথম জীবনে পালগণের সামন্ত ছিলেন।(২০) কিন্তু বিজয়সেন শূররাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়া সেন-প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই সেনবংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। বিজয়সেন নান্য, বীর, বর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণকে এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত গৌড়েশ্বর অবশ্যই কোন পালসম্রাট; ইঁহার নিকট হইতেই উত্তর-বাংলা বিজিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিজয়সেনের রাজত্বের শেষ দিকে ভোজবর্ম্মা বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে পূর্ব্ব-বাংলা বিজিত হইয়াছিল। বীর প্রভৃতি পরাজিত নৃপবৃন্দের নামের তালিকামধ্যে কোন অজ্ঞাত বর্ম্মারাজার নাম রহিয়াছে কি-না, নূতন আবিষ্কার না হইলে তাহা জানা যাইবে না। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর শাসন তাঁহার রাজত্বের ৬২তম বর্ষে বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।(২১) এই লিপির ৮ম ও ৯ম শ্লোক পড়িলে মনে হয় যে, বিজয়সেন এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাসনকার্য্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্র বল্লাল সেনই নির্ব্বাহ করিতেন। "বল্লাল" এই কানাড়ী নামটী

(১৭) *Ramacharita*, V. R. Society, Introduction, pp. xxx-iii.

(১৮) দেওপাড়া লিপি, ৪র্থ শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ।

(১৯) পরমারগণের নাগপুর প্রশস্তিতে কর্ণের সহিত কর্ণাটগণের মিলনের বিষয় উক্ত হইয়াছে (*Ep. Ind.*, II, pp. 185, 192)। কিন্তু কর্ণের পূর্ব্বভারত আক্রমণ কর্ণাটগণের সহযোগে সম্পাদিত হইয়াছিল কি-না তাহা জানা যায় নাই। তাহা যদি হয়, তবে সেন ও বর্ম্মাগণ একই সময়ে (অর্থাৎ চেদি-কর্ণাট আক্রমণের সময়ে) বাংলায় আগমন করিয়াছিলেন।

(২০) শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী "রামচরিত"-এ উল্লিখিত রামপালের সামন্ত নিদ্রাবলপতি বিজয়রাজকে সেনবংশীয় বিজয়সেন মনে করেন (*Studies in Indian Antiquities*, p. 158)। সম্প্রতি এ সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে (*Ramacharita*, p. xxvii), তাহা একেবারে অলঙ্ঘ্য নহে।

(২১) ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, ইহা চালুক্যবিক্রমসংবতের তারিখ (*List*, No. 1682, note)। কিন্তু এ অনুমানের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

হইতেও সেনদিগের সহিত কর্ণাটের সম্পর্ক সূচিত হয়। যাহা হউক পূর্ব্ব-বাংলার ইতিহাসে চন্দ্রবংশের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই।

নিম্নে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত প্রতিলিপি (estampage) ও অনুলিপি (eye-copy) হইতে আমরা পাইকপাড়া লিপির পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

পাইকপাড়া লিপির পাঠ

(১ম পঙক্তি) [ক] শ্রীমদ্গো- [খ] বিন্দচ-[গ]ন্দ্রস্য সম্বৎ ২৩
(২য় পঙক্তি) [ক] রালজিক-উ- [খ] পরত-পা- [গ] রদাস-সুতঃ
(৩য় পঙক্তি) [ক] গঙ্গদা [খ] স-কারিত-বা-[গ] সুদেব-
(৪র্থ পঙক্তি) [ক] ভট্টারক

সংশোধিত পাঠ

শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রস্য সংবৎ ২৩.রালজিকোপরত-পারদাস-সুত-গঙ্গাদাস-কারিত-বাসুদেবভট্টারকঃ॥

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রের [রাজ্যের] ২৩শ সংবৎসরে রালজিক (অর্থাৎ রলজের বা তদনুরূপ কোন স্থানের অধিবাসী), মৃত পারদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের দ্বারা তৈরী করানো বাসুদেবভট্টারক (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তি)॥

তোমার কবিতা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

মনের আবেগ মিশায়ে সদাই
তোমার কবিতা লিখি—
ময়ূর মাতন জুড়ে সারাখন
নাচে যে ভবন-শিখি!
তোমার কবিতা নহে ত কেবল
ছন্দে সাজানো কথা—
চরণে চরণে তব শ্রীচরণে
নিবেদন ব্যাকুলতা!
দুরু দুরু আশা, হাসা, ভালবাসা
সকলি মিলায়ে দিয়া
তোমার পূজার পূত উপচার
পরিণত হয় প্রিয়া!
হৃদি-বল্লভ আঁখি-পল্লব
সারা রাতি রহে জাগি'—
হৃদয়-মাধব কাঁদে শতবার
'পদ-পল্লব' মাগি'!
রাগে, অনুরাগে, কোপনে, গোপনে
বিরহে, মিলনে গাঁথি'
তোমার কবিতা দুরূহ সবই তা
লিখিতে ফুরায় রাতি!
অথচ তাহার ছন্দে ছন্দে
অমৃত গন্ধ ভরা
মৃগনাভি সম লাগে অনুপম,
যদিও যায় না ধরা!
তোমার কবিতা লিখিয়া যখন
কষি টেনে করি শেষ—
বুঝিতে পারি যে রহিল তাহার
অনন্ত অবশেষ!
এক রাতি জেগে একটি কবিতা—
হায়, তাই দিয়ে যদি
সাগরে আনিয়া পারিতাম আমি
মিলাতে ঋণের নদী,
ভগীরথ হয়ে পূরব জনমে
ভাগীরথী ধারা তবে
আমিই আনিয়া দিতাম ঢালিয়া
সাগরে সগৌরবে!
এক রাতি কেন, যতগুলি রাতি
জীবনে এখনো বাকী
সব গুলি ভরি' যদি লিখে মরি,
কবিতা ফুরাবে না কি?
নহে, নহে, নহে—তোমার কবিতা
কভু ফুরাবার নহে
জনমে জনমে দেহ হ'তে দেহে
অদেহী এ ধারা বহে!
তব কবিতার সুধা-ঝঙ্কার
করেছে আমারে কবি
লভেছি কত না কবির জনম,
আবার যেন গো লভি!
মোক্ষ চাহি না, মুক্তি চাহি না
মাগি না কো নির্ব্বাণ—
কবি হয়ে যেন যুগে যুগে গেয়ে
যেতে পারি তব গান!

বাজিকর

একাঙ্কিকা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম্যপথ। যাযাবর জাতীয় একটী ক্ষুদ্র বাজিকরের দল চলিয়াছে। একটা জোয়ান পেশী-সবল দীর্ঘ দেহ; কঠোর মুখশ্রী, গালে একটী বড় আকারের আঁচিল। তাহার কাঁধে একটী ভার; ভারের বাঁকের দুইপ্রান্তে ঝুলানো দড়ির শিকায় পাঁচ-ছয়টী করিয়া সাপের ঝাঁপি। বাঁকের বাঁশটী বাঁ-হাতের কনুইয়ের ভাঁজে চাপিয়া ধরিয়াছে এবং দুই হাতে বাজাইতেছে তুমড়ি বাঁশী। একটী তরুণী, কালো নিকষের মত রঙ, তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, তাহার কাঁধে ঝুলি, হাতে দড়িতে আবদ্ধ দুইটী বাঁদর, একটী ছাগল। পিছনে একটী সবল দেহ প্রৌঢ়—একমুখ দাড়ি গোঁফ—মাথার চুলে জট বাঁধিয়াছে। তাহার কাঁধে গোটা কয়েক বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি। হাতে একটী ডুগডুগি। ডুগডুগি বাজিতেছে—একঘেয়ে ডুগ্-ডুগ্ ডুগ্‌ডুগ শব্দে। তাহাদের পিছনে একদল গ্রাম্যলোক

১ম ব্যক্তি। এই বড় বড় সাপ মাইরি। ইয়া গোদা একটা পাহাড়ে চিতি আছে! কাল সন্‌ধেতে ওই বুড়ো সেটাকে গলায় জড়িয়ে বসে ছিল। বেদেরা এসেছে শুনেই আমি দেখতে গিয়েছিলাম।

২য় ব্যক্তি। ওরা সব কামরূপের বিদ্যে জানে। বাঙালী বেদে কি না, ওদের হ'ল কাঁউরের বিদ্যে। কাঁউরের বিদ্যেই হল শ্রেষ্ঠ বিদ্যে, ডাকিনী মন্তর। মানুষ পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে। তোমাকে যদি ভেলকি লাগিয়ে দেয়—তবে সব ভুলে যাবে তুমি।

৩য় ব্যক্তি। এ্যাই—ছেলে—এ্যাই! বাড় দেখ ছেলের। যাস না—কাছে যাস না!

৪র্থ ব্যক্তি। মরবি। দেবে সাপ ছেড়ে!

উপরোক্ত কথাগুলি হইতেছিল প্রায় একসঙ্গেই—তাহাতে কথাবার্ত্তা প্রায় কোলাহলে পরিণত। এই সময়ে বেদে দুইজনের বাঁশী ও ডুগডুগি থামিল। লোকগুলিও স্তব্ধ হইয়া গেল

জোয়ান বাজিকরের নাম কিষ্টো। ভেলকি বাজী! ভেলকি বাজি! ভোজ বিদ্যার খেল বাবু! কামরূপের যাদু!

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া দিল—ডুগ্-ডুগ্—ডুডুগ্

বেদেনী-রাধিকা। কেলে সাঁপের নাচন বাবু! কেলে সাঁপের নাচন!

কথা শেষ করিয়াই বেদেনী গান ধরিল। কিষ্টো বাঁশীতে সুর তুলিল

হেল্যা দুল্যা নাচে গ,
কা-লো নাগিনী আমার হেল্যা দুল্যা নাচে গ
মাথায় নাচে কালো কানাই মোহন বংশী বাজে গ!
কালিদহের জল হৈল বিষে কাজল কালো গো—
ফুল্যে ফুল্যে নাচে জল বঁধুর পরশ যাচে গ—
বাঁকা বঁধু নীলকমল নাচে নাগের পারা গ—
কা-লো নাগিনী দিল কালি কুলে লাজে গ—

গ্রামবাসী বৃদ্ধ নবীন বাগদী। (সে অক্ষমতা হেতু পিছনে পড়িয়া আছে। চোখেও সে ভাল দেখিতে পায় না। সে কহিল।) যাস না রে, কাছে যাস না। ওরে ছেলেরা, কাছে যাস্ না। ভেলকি লাগিয়ে সব ভুলিয়ে দেবে। আমার ভাইপো চরণকে বেদেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। যাস না।

বৃদ্ধ বাজিকর। (হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল) হাঁ——হাঁরে বুঢ়া, ভেলকি লাগায়ে দিবে। পালারে বুঢ়া পালা। ভেলকি লাগায়ে দিবে।

আবার হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ডুগ-ডুগি বাজাইল, জোয়ান বেদে কিষ্টো বাঁশীতে সুর তুলিল। ধীরে ধীরে সে সুর এবং শব্দ পথের বাঁকের মাথায় দূরবর্ত্তী হইয়া ক্রমশ মিলাইয়া গেল।

দৃশ্যান্তর—পথের ধারেই থানা। থানার বারান্দায়—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বিমলবাবু ও দারোগা

বিমলবাবু। হা—হা—হা! ভেলকি লাগিয়ে দেবে! ভেলকি লাগিয়ে মানুষকে সব ভুলিয়ে দিতে পারে! কি বলছেন দারোগা বাবু? বিংশ শতাব্দীতে ভেলকি! হা—হা—হা!

দারোগা। আপনারা ইয়ংম্যান;—তাজা রক্ত! ভেলকি শুনে হাসাই আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমিও প্রথম জীবনে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু বিশবছর পুলিশ লাইনে চাকরি করে দেখলাম অনেক। এরা ক্রিমিনাল ট্রাইব। এদের তাঁবুতে পাহারা দিয়েছি—চোখে দেখেছি—

ক্রাইম করছে। কিন্তু কি যে হয়ে যেত—ব্যস্, সব গোলমাল হয়ে গেল! যখন আক্কেল ফিরত, তখন কাজ ওদের শেষ হয়ে গেছে। তন্ন তন্ন ক'রে তাঁবু সার্চ্চ করেছি, কিছু পাই নি। দশ-বারোটা ভেল্‌কির কেসই করেছি আমি। এরা ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করে। দশ-বারোটার ভেতর তিনটে ছেলে আমি বের করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য কি জানেন? সাত দিন আট দিন—এরই মধ্যে ছেলেরা বাপ-মাকে চিনতে পারে নি। বাড়ী চিনতে পারেনি!

বিমলবাবু। বলেন কি?

দারোগা। এক বর্ণও মিথ্যে বলি নি আমি। এখানকারই একটা খবর, বোধ হয় জানেন না। কাল বেদেরা তাঁবু ফেলেছে শুনেই পুরনো ডাইরী খুলে দেখলাম।

বিমলবাবু। হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমরা তখন খুব ছোট! বাগ্দীদের ছেলে চুরি করেছিল বেদেরা। আবছা মনে আছে; উঃ সে কি ভয় আমাদের! কাল সন্ধ্যেবেলায় সেই ছেলেটার বোন—পাঁচী বাগ্দিনী—এসেছিল আমার কাছে।

দারোগা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। পাঁচী বাগ্দিনীর নামও রয়েছে রিপোর্টে। ওই মেয়েটাও সঙ্গে ছিল ছেলেটার। ভাই-বোনে গিয়েছিল বেদেদের তাঁবু দেখতে। তারপর বোনটা ফিরে এল—ভাইটাকে আর পাওয়া গেল না। থানার রিপোর্টে দারোগা কি লিখেছেন দেখবেন? এই দেখুন। আঠারো বছর আগের ঘটনা—আপনার ১৯২২। দারোগা লিখেছেন যে, মেয়েটা যখন ফিরল—তখন তার বিহ্বলের মত অবস্থা। নাম ধরে ডাকলে পর্য্যন্ত সাড়া দেয় না। কাউকে চিনতে পারে না। তারপর দারোগা লিখেছেন—বেদেদের তাঁবু সার্চ্চ করা হ'ল। কিন্তু ছেলে পাওয়া গেল না। ক্রিমিন্যাল ট্রাইবের হিষ্ট্রিতে আছে যে, এরা না কি মানুষকে অজ্ঞান ক'রে অস্থাবরের মত লুকিয়ে রাখতে পারে।

দূরে বাঁশী ডুগ-ডুগির শব্দ বাজিয়া উঠিল

র'প্ ট্রিক্ সম্বন্ধে কত অনুসন্ধান চলছে। ইউরোপ এ্যামেরিকায় পর্য্যন্ত সাড়া পড়ে গেছে। কত টাকা রিওয়ার্ড দিতে চায়। র'প্ ট্রিক্ যদি থাকে, তবে এমনি কোন বেদেদের মধ্যেই আছে জানবেন। মুস্কিল কি জানেন?—আমাদের ভয়ে কিছুতেই স্বীকার করে না।

বাঁশী ডুগ-ডুগির শব্দ নিকটে আসিল

বাজি দেখবেন?

বিমল। মন্দ কি?

দারোগা। রামখেলান, বোলাও উলোক কো।

বাঁশী ও ডুগ-ডুগি বাজাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল বাজিকরের দল। পিছনে জনতা

কিষ্টো। ভেলকি বাজি! ভেলকি বাজি! ভোজ-বিদ্যার খেল্ বাবু। কামরূপের যাদু!

ডুগডুগি বাজাইয়া দিল

রাধিকা। বাজি দেখেন হুজুর! সাপের নাচন! হীরেমনের খেল্। শাউড়ী বউয়ের কোঁদল!

বৃদ্ধ বাজিকর। সেলাম হুজুর!

দারোগা। কি বাজি দেখাবি?

কিষ্টো। সাঁপের খেলা, বাঁদরের খেলা, ভোজবিদ্যার খেলা হুজুর! দড়ির ওপর বেদিনী নাচবে। আমি হাতের ওপর বাঁশ খাড়া রাখব, উপরে বেদিনী কসরৎ দেখাবে হুজুর!

দারোগা। ভাগ্ বেটা! এই বুড়োয়া!

বৃদ্ধ। হুজুর!

দারোগা। বাণের খেলা দেখাতে পারিস?

বৃদ্ধ। না হুজুর, আমরা জানি না; হুজুর—মা-বাপ!

দারোগা। তবে আর জানিস কি? ভেলকি লাগিয়ে মানুষ ভোলাতে পারিস? এই বাবুকে ভেল্কী লাগাতে পারিস?

বেদেনী রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

হাসছিস যে? পারিস?

রাধিকা। পারি বই কি হুজুর! কিন্তুক—বাবুকে যে তঃ হ'লে আমাদের সাথে যেতে হবে।

দারোগা। তাই যাবে বাবু।

রাধিকা। ওরে বাপ্‌রে! তাই হয়! আর বেদে আমরা, বাবুকে লিয়ে যে আমরা দায়ে পড়ব হুজুর! চা কোথাকে পাব—সাঁঝ-বিহানে।

রাধিকা আবার হাসিল

দারোগা। দূর! দূর! তোদের ও বাজে খেলা কে দেখবে? বাণ কাটাকাটি জানিসনে তোরা, ভেলকি জানিস নে—তবে আর তোরা কিসের বেদে?

কিষ্টো। (দম্ভভরে) হুজুর—হুকুম করেন, দেখাই।

বিমল। বাণ কাটাকাটি? সত্যিই জান তোমরা?

রাধিকা। বেদের জাত—বিছে জানি বই-কি বাবু। তবে হুজুরদের কাছে কিছু জানি না। দরোগাবাবু হাজতে পুরে দিবেন যে!

দারোগা। আচ্ছা—আচ্ছা! কোন ভয় নেই! দেখা তোদের খেলা!

বৃদ্ধ বেদে। সত্যি কথা—বলছেন হুজুর?

দারোগা। আরম্ভ কর তোদের খেলা। কোন ভয় নেই!

বৃদ্ধবেদে। (ডুগ-ডুগি বাজাইয়া হাঁক মারিয়া উঠিল। আ—কামরূপের কামাখ্যা মাঈ কি জয়!

কিষ্টো-রাধিকা। (একসঙ্গে) জয়!

কিষ্টো বাঁশী বাজাইল

বৃদ্ধবেদে। আ—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ, ভেলকি লাগ্। লাগ্ বুললে লাগবি, ভাগ বুললে ভাগবি। (ডুগ-ডুগি বাজাইল) কার দোহাই?

কিষ্টো-রাধিকা। (একসঙ্গে) ওস্তাদের দোহাই! (ডুগ-ডুগি)

বৃদ্ধ। আরে বেদে!

কিষ্টো। হাঁ ওস্তাদ!

বৃদ্ধ। আরে বেদেনী!

রাধিকা। হাঁ—হাঁ—ওস্তাদ!

বৃদ্ধ। বাজাও তো বাঁশী! লাগাও তো গান!

বাঁশী বাজিল—তরুণী গাহিল; বাঁশীর সহিত গানের কোন সম্বন্ধ নাই। তুমড়ি বাঁশী কেবল একই পর্দায় বাজিয়া চলিল; তরুণী গাহিল

মহামায়ার মায়া গ—!
নম নম মহাদেবী—মহাদেবের জায়া গ—!
কাঁউরের চণ্ডী আসে—আকাশে আকাশে গ—!
ডাকিনী হাঁকিনী আসে—খলখলিয়ে হাসে গ!
যেমন বাবুর চাঁদ মুখ—তেমনি ইলাম পাব গ!
বাণারসী সাড়ী পর্‌্যা—হেথা হতে যাব গ!

গানের মধ্যেই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে নবীন বাগ্দীর ভাইঝি পাঁচি চীৎকার করিয়া উঠিল

পাঁচি। হ্যাঁ—হ্যাঁ! ওই তো, গালে সেই আঁচিল! ওই তো, ওই আমাদের চরণ। ওই সেই বুড়ো বেদে! হ্যাঁ—ওই সেই বেদে!

সঙ্গে সঙ্গে সব স্তব্ধ হইয়া গেল

চরণ! চরণ!

মেয়েটা আসিয়া তরুণ বেদে কিষ্টোর হাত চাপিয়া ধরিল

রাধিকা। কে তু? কে তু? কেনে উয়ার হাত চেপে ধরেছিস?

পাঁচি। আমার ভাই! আমার ভাই! দারোগাবাবু, এই আমার হারানো ভাই! কাকা! দেখ তুমি দেখ। তোমরা সব দেখ! সেই গালে আঁচিল! ওগো—তোমরা—!

রাধিকা। (মাঝখানে পড়িয়া) ছাড়! ছাড়! হাত ছাড়! আমার সোয়ামী! ছাড় বুলছি!

পাঁচি। না। আমার ভাই—চরণ। একদৃষ্টে আমাকে দেখছিস চরণ, আমাকে চিনতে পারছিস? আমি তোর দিদি—পঞ্চু দাসী, পাঁচি দিদি! চিনতে পারছিস?

রাধিকা। তুকে আমি খুন করে ফেলাব।

বৃদ্ধ প্রথমটা যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তারপর সহসা সে অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল—চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল—সে সন্তর্পণে বাহির করিল—একটা ছোরা

দারোগা। রামখেলান, রামখেলান, পাকড়ো বুড়াকো! ছোরা নিকালতা বুড়া! হাঁ—জলদি, জলদি।

রামখেলান ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধকে ধরিল

আচ্ছা!

বৃদ্ধ বেদে। হুজুর! ও আমার ভাইয়ের বেটা, আমার জামাই। বেদের ছেলের গায়ে হাত দিলে তাকে আমরা খুন করি হুজুর।

দারোগা। এই মেয়ে—এই পাঁচি, ছাড়, তুই ওকে ছেড়ে দে! এই বেদেনী—সরে আয় তুই! এই ছোকরা! এই! দাঁড়িয়ে আছিস যে হতভম্বের মত! এই বেদিয়া ছোকরা!

কিষ্টো। (সুপ্তোত্থিতের মত) আঁ!

দারোগা। এ-ধারে আয়! শোন্। তুই পাঁচিকে—ওই মেয়েটাকে চিনতে পারছিস? বেদেনীর দিকে চাইছিস কি? বেদেনী নয়—ওই মেয়ে—ওই যে! হ্যাঁ!

কিষ্টো। (অত্যন্ত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল) না!

পাঁচি। না—না—ওই আমার চরণ! দারোগাবাবু, ওই আমার ভাই। ছেলেবেলায় এই বেদের তাঁবু দেখতে গিয়েছিলাম—আমরা ভাই-বোনে; ওই বেদে আমাদিগে ডাকলে—এখন ও বুড়ো হয়েছে! তারপর কি করে

দিলে—আর মনে নাই, আমি পথ হারিয়ে গেলাম! চরণকেও ভুলে গেলাম। ওরা চরণকে ভেলকি লাগিয়ে চুরি করেছে দারোগাবাবু!

রাধিকা। কিষ্টো! কিষ্টো!

কিষ্টো। অাঁ!

রাধিকা। তাড়ায়ে দে! তু উয়াকে তাড়ায়ে দে! দেখ্—তুর্ রাধি কাঁদছে, দেখ্!—

বিমল। বা, ওর নাম কিষ্টো—ওর নাম রাধি! দারোগাবাবু মিলটা তো আশ্চর্য্য! একটা যোগ-সাজশের গন্ধ পাচ্ছেন না?

দারোগা। হ্যাঁ। আরে বুড়োয়া, এর নাম কিষ্টো—ওর নাম রাধি! এমন মিল ক'রে নাম কি করে হ'ল রে? কি চুপ করে আছিস যে?

বৃদ্ধ বেদে। হাঁ! ভাইয়ের ছেলেটা আগে হ'ল বাবু, নাম হ'ল কিষ্টো। পরে হ'ল আমার বেটী। তখুন—সাদীর সম্বন্ধ ক'রে নাম রাখলাম—রাধি!

বিমল। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ!

পাঁচী। দারোগাবাবু! আমার ভাইকে ফিরে দেন হুজুর!

রাধিকা। আমার সোয়ামী, দারোগাবাবু—আমার সোয়ামী!

দারোগা। কি হে, তোমরা গাঁয়ের লোক কেউ চিনতে পার একে? আঠারো বছর আগে এই মেয়েটীর ভাই চুরি হয়ে গিয়েছিল। বেদেরা নাকি চুরি করেছিল। পাঁচি বলছে—এই তার ভাই। তোমরা চিনতে পার? কি, সব চুপ করে রইলে যে?

গ্রামের লোক—

—তা কি ক'রে বলব মাশায়?

—তা কে জানে স্যার! চরণ কেমন ছিল—কার মনে আছে স্যার!

—ওই যে পাঁচী বলছে—গালে আঁচিল রয়েছে!

পাঁচি। ঠিক, সেই আঁচিল দারোগাবাবু; ঠিক তেমনি! তেমনি মুখ, তেমনি নাক!

দারোগা। কিন্তু আর তো কেউ চিনতে পারছে না বাপু! তা ছাড়া—আঁচিল এক রকম অনেকের থাকে। বিমলবাবু, কি বলেন?

বিমল। কি বলব বলুন। জটিল রহস্য!

দারোগা। আর একটা কথা, এ মেয়েটীও তখন খুব ছোট ছিল, তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করা চলে না!

বিমল। তা বটে!

দারোগা। পাঁচি তুমি বাড়ী যাও, তোমার ভুল হয়েছে!

রাধিকা। তোমার রাঙা খোকা হ'ক দারোগাবাবু! রাজা হও তুমি!

নবীন। কাঁদিস নে পাঁচি; বাড়ী চল্। কাঁদিস নে।

পাঁচি। না—না, ওই আমার চরণ! কাকা, ওই আমার চরণ! ওই দেখ, এখনও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে!

দারোগা। যাও, যাও, তোমরা বাড়ী যাও! বাড়ী যাও!

বৃদ্ধ বেদে। হুজুর, আজ আমাদের ছুটি হোক হুজুর!

রাধিকা। না! না! খেলা কর বুড়া! আচ্ছা খেলা দেখা দারোগাবাবুকে! কিষ্টো—কিষ্টো! বাজা—বাঁশী বাজা।

দারোগা। না। আজ থাক। কাল বরং আসবি তোরা। সন্ধ্যে হ'য়ে এল! যাও—সব যাও। কাল—কাল বাজী হবে। যাও সব। এই বেদেরা—তোরা তাঁবুতে যা। এখুনি সিপাহী যাবে খোঁজে। যাও।

গ্রামের লোক—

—চলরে সব, চল।

—আরে আমাদের মণ্টে গেল কোথা? মণ্টে—। এই যে।

—গোবিন্দে! অ গোবিন্দে!

—লোকটার আঁচিলটা কিন্তু ঠিক চরণের মত।

ধীরে ধীরে সব মিলাইয়া গেল

বিমল। বিচারটা কিন্তু মোটেই সূক্ষ্ম হ'ল না দারোগা-বাবু। ওই লোকটাই চরণ হতে পারে।

দারোগা। অসম্ভব নয়। তবে কি জানেন; হারিয়ে গেছে—গেছে। মা-বাপ নেই যাদের অসীম দুঃখ। আর এখন সে ফ্যাসাদ করতে গেলে বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে। দেখেছেন তো—ছোরা বের করেছিল! খুন ক'রে দিত।

দৃশ্যান্তর—সন্ধ্যার ম্লান আলোক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। প্রান্তরে বেদিয়াদের আট-দশটা তাঁবু। একটী তাঁবুর সম্মুখে ঠিক সেই সময়ে রাধিকাও এই কথাই বলিতেছিল। সম্ভবিপদ্ মুক্তিতে সে উৎফুল্ল-উজ্জ্বল। কিন্তু কিষ্টো যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন-নির্ব্বাক; বৃদ্ধ বেদিয়াও স্তব্ধ

রাধিকা। উটাকে আমি খুন ক'রে দিতম কিন্তুক। বুঝলি কিষ্টো।

কিষ্টো। হুঁ।

রাধিকা। কাল কিন্তুক আচ্ছা খেল্ দেখাতে হ'বেক দারোগাবাবুকে! ও বাবা!

বৃদ্ধ। হুঁ।

রাধিকা। তুরা এমন চুপ ক'রে রইছিস কেনে? ও বাবা! ও কিষ্টো!

বৃদ্ধ। হুঁ-হুঁ। তু থাম রাধি!

কিষ্টো। (রূঢ়ভাবে) বুঢ়া!

বৃদ্ধ। আমি চল্লম রে রাধি—সাঙাতের তাঁবুতে।

কিষ্টো। (খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল) না!

বৃদ্ধ। আরে বাপ রে—বাপ রে। হাত ধরছিস কেনে রে? ছাড়—ছাড়।

কিষ্টো। না। সত্যি বুল আমাকে, উ মেয়েটী আমার বহিন কি-না!

বৃদ্ধ। (হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) আরে—আরে, বুলছিস্ কি তু? আ-গো রাধি, ওই মেয়েটা কিষ্টোকে ভেলকি লাগায়ে দিল রে।

হা হা করিয়া আবার হাসিল

রাধিকা। (কাতর ব্যগ্রতায় ডাকিয়া উঠিল) কিষ্টো! কিষ্টো!

কিষ্টো। না! না! আমি চরণ। মনে পড়েছে আমার;—ছোট মেয়ে আমার বহিন পাঁচি—আমার দিদি! এমনি সারি সারি তাঁবু! বল্—বুঢ়া—সত্যি বল্!

বৃদ্ধ। তু বেইমান রে, কিষ্টো—তু বেইমান।

কিষ্টো। তু চোর—চোট্টা। আমাকে চুরি করলি তু!

বৃদ্ধ। না।

কিষ্টো। হ্যাঁ!

রাধিকা। কিষ্টো! কিষ্টো! কি—ষ্টো!

কিষ্টো। চুপ্। বল, বুড়া বল্।

বৃদ্ধ। বেইমান হারামি! ছাড় হাত!

বলপ্রয়োগে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিষ্টো ধাক্কা দিয়া বৃদ্ধকে ফেলিয়া দিয়া—তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। তারপর গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল

বল্—বুঢ়া—চোট্টা—বল্!

রাধিকা। বাবাকে ফেলে দিয়ে তু বুকে চেপে বসলি? পাঁচি তুর আপন? বেইমান হারামি—

ছোরা বাহির করিল

বৃদ্ধ। (ব্যগ্র রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল) হাঁ—হাঁ—চণ্ডীমায়ের কসম রাধি! মারিস না—ছুরি মারিস না। বেটী—কিষ্টো তোর সোয়ামীরে!

বেদেনী। না। উ বলছে—চরণ!

বৃদ্ধ। ছাড়; কিষ্টো—ছাড়। বুলছি—আমি বুলছি!

কিষ্টো ছাড়িয়া দিল, বৃদ্ধ উঠিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তারপর বলিল

হাঁ কিষ্টো, তুই চরণ। ইথান থেকে তুকে চুরি করেছিলম। ছাওয়াল ছিল না আমার। তারপরে রাধি হ'ল, তখুন সাদী দিলম তুর সাথে।—হাঁ তু চরণ।

রাধিকা। না—না! কিষ্টো—কিষ্টো!

বৃদ্ধ। বহুৎ দিনের পর। গাঁওটা চিনলম না। লইলে তাঁবু ফেলতম না রে!

রাধিকা। কিষ্টো—কিষ্টো! কথা বল্। কিষ্টো!

কিষ্টো। আমি চললম!

রাধিকা। কিষ্টো!

কিষ্টো। আমার বাড়ী। আমার দিদির কাছকে।

দ্রুতপদে ছুটিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল

রাধিকা। (আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল) কিষ্টো—কিষ্টো!

বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। রাধিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তারপর আঁচলে চোখ মুছিয়া হইয়া উঠিল হিংস্র। সে উঠিয়া কিষ্টো যে পথে গিয়াছে সেই পথে চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল

বেইমানের জান লিব আমি! আকামা সাপাটা আর ছুরিটো—

সে আবার ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ এতক্ষণে বলিল—নিম্ন কঠিন স্বরে

বৃদ্ধ। সাথে যাব তুর?

রাধিকা। (দৃঢ়স্বরে) না!

দৃশ্যান্তর—রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইয়া গিয়াছে। বাগ্দীপাড়ায় সবই প্রায় নিষুতি। নবীন বাগ্দীর দাওয়ায় পাঁচি কেবল কাঁদিতেছিল। আর নবীন উপু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল

পাঁচি। চরণ—চরণ! কাকা, ঐ আমাদের চরণ!

কেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল দেখলে না? চরণ—চরণ!

পল্লীর অনতিদূরে কিষ্টো বেদে চকিতভাবে চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিয়া—যেন অন্ধকার পল্লীকেই উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল

কিষ্টো। আ-গো। পাঁচির বাড়ী কোথাকে গো? পাঁচি—আমার দিদি!—

পাঁচি। কে? কে? চরণ! চরণ! ভাই!

কিষ্টো। দিদি! মনে পড়ল! চিনলম তোকে। আমি এলম।

পাঁচি। আয়, আয় ভাই! আয়! দেখ কাকা, সেই মুখ—সেই আঁচিল। আলো ধরেছি আমি—দেখ তুমি।

নবীন। আরে, আরে, ছুঁয়ে দিসনে। করছিস কি?

পাঁচি। চরণ, কাকা, ও যে চরণ!

নবীন। হ'ল তো কি হ'ল? তা ব'লে জাতধরম ভাসিয়ে দিতে হ'বে না কি? বেদের ঘরে মানুষ—ঠাকুরদের বিধি নিয়ে পেরাচিতি করে ওসব করিস। তাছাড়া কে জানে চরণ কি না। হাজার চালাকি আছে বেদেদের।

পাঁচি। আয় চরণ, উঠে আয় ভাই। নিজেদের বাড়ী—মনে পড়ে তোর সেই কুলগাছ—পূব-দুয়ারী ঘর?

পাশের বাড়ীতেই উভয়ে আসিয়া উঠিল

দাঁড়া, আলো জ্বালি। আয় ভাই—ঘরে আয়। শীতের দিন। ওই দেখ সেই কুলুঙ্গী চরণ, আমরা বাতাসা চুরি করতাম! কুলের আচার—

কিষ্টো। (অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল) বাপরে! বাপরে! দুয়ার খুলে দে—দুয়ার খুলে দে রে দিদি। দম আমার বন্ধ হয়ে গেল রে!

পাঁচি। খোলা জায়গায় থেকেছিস ভাই এতদিন! এই নে দোর খুলে দিচ্ছি।

দুয়ার খুলিয়া দিল

কিষ্টো। আঃ! (পাঁচি হাসিল) দিদি! তোর বর কিছু বুলবে না তো, ওই বুড়ার মতন?

পাঁচি। সে নাই চরণ। সে নাই। থাকলেও কিছু বলত না রে। কত আদর করত তোকে। আমি বড় হতভাগী ভাই! পৃথিবীতে আমি একা!

কিষ্টো। কাঁদছিস রে দিদি?

পাঁচি। সে আমাকে বড় যত্ন করত ভাই। বড় ভালবাসত। আমার পোড়াকপালে—হঠাৎ মরে গেল। তা-ছাড়া—মেয়েদের স্বামীর বাড়া কি সম্পদ আছে বল্?

কথার মধ্যস্থলেই ফোঁস-ফোঁস শব্দ উঠিল

কিষ্টো। দিদি রাধি কাঁদছে! ফুলে ফুলে কাঁদছে!

পাঁচি। না! হ্যাঁ! তাই তো! ওকি ফোঁস ফোঁস করছে? সাপ না কি?

কিষ্টো। (সচকিত হইয়া উঠিল, যেন একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেছে) সাঁপ! হাঁ-হাঁ! রাধি লয় সাঁপ! ঠিক বুলেছিস দিদি! আলোটা ধরতো গো দিদি! বুড়া ছাড়লে সাঁপ। বুড়ার কাম বটে! হাঁ—হাঁ!

পাঁচি সভয়ে সন্তর্পণে আলোটা তুলিয়া ধরিল; কিষ্টো সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে পাঁচিও আলো লইয়া আসিল। কিন্তু কোথাও কিছু নাই; আলোকিত অঙ্গন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আর শব্দও শোনা যায় না

কইরে দিদি? কিছুই তো নাই রে!

পাঁচি। তবে ও কিছু নয় চরণ! শুনতেই ভুল হয়েছে আমাদের। বেদে বেদে ক'রে—সাপ-সাপ বাতিক হয়েছে।

কিষ্টো ও পাঁচি আবার আসিয়া ঘরে বসিল

কিষ্টো। রাধি কিন্তুক ঠিক কাঁদছে দিদি! ফুল্যা ফুল্যা কাঁদছে। তু যেমন কাঁদিস বরের লেগ্যা।

পাঁচি স্তব্ধ হইয়া কিষ্টোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার শব্দ হইল—ফোঁস্—ফোঁস্

কিষ্টো। (চকিত হইয়া) দিদি শুনছিস?

পাঁচি। সাপ! চরণ, নিশ্চয় সাপ!

কিষ্টো। ধর, ফেন্ন্ আলোটা ধর দিদি! দেখি তো কুথাকে গর্জ্জাইছে!—

পাঁচি আলো ধরিল—কিষ্টো বাহির হইয়া আসিল। অকস্মাৎ ঘরের আড়াল হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া কে কিষ্টোকে জড়াইয়া ধরিল। তাহারই অঞ্চল তাড়িত বাতাসে আলোটা দপ করিয়া নিভিয়া গেল। সে তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে

পাঁচি। (সভয়ে বলিয়া উঠিল) কে? কে? ও কে চরণ? আলো নিভে গেল যে! চরণ! চরণ!

রাধিকা। (যে আসিয়াছে-সে রাধিকা) না! না! চরণ লয়। আমার কিষ্টো! আমার কিষ্টো!

কিষ্টো। (অন্ধকারের মধ্যেই সস্নেহে রাধিকার রুক্ষ চুলে হাত বুলাইয়া দিল, বলিল) রাধি! রাধি!

রাধিকা। না। তুর সাথে কথা বুলব না আমি! তু বেইমান! তু আমাকে ফেল্যা চল্যে এলি। মাটিতে পড়ে কাঁদলে তুর রাধি, তু দেখলি না! এসেছিলম তুকে মারতে; সাপ আনলম-গামছাতে বেঁধে, ঘরে ছেড়ে দিব বল্যে; তা লারলম্। ঘরের পিছাড়ে ঠেসান দিয়ে ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদলম কেবল। তুকে ছেড়ে আমি থাকতে লারব, আমি লারব। তু আয়—ফিরে আয়! কিষ্টো! কিষ্টো!

কিষ্টো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছে; তাহার গললগ্ন হইয়া রাধিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছিল; পাঁচিও নিস্তব্ধ

কিষ্টো। (অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল প্রচণ্ড আবেগভরে) দিদি! লারব! আমি তুর কাছে থাকতে লারব রে দিদি! আমার রাধিকে ছেড়ে আমি থাকতে লারব!

রাধিকা কান্নার মধ্যেও আবেগে সোহাগে অধীর হইয়া কিষ্টোকে বারবার চুম্বন করিয়া হাসিয়া উঠিল বিচিত্র হাসি। অন্ধকারের মধ্যেও পাঁচি সমস্ত দেখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, সে অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ডাকিল

পাঁচি। চরণ!

রাধিকা। (কিষ্টোর বুকের মধ্যেই ঘাড় নাড়িয়া মুহূর্ত্তে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল) না—না! চরণ লয়—কিষ্টো, কিষ্টো, উ আমার কিষ্টো!

পাঁচি। হ্যাঁ—তোর কিষ্টো! আমার চরণ। তোর কিষ্টোর মধ্যেই আমার চরণ বেঁচে থাক। ও তোর। চরণ, যা তুই বউয়ের সঙ্গেই যা। নইলে ও বাঁচবে না। তুইও বাঁচবি না। (তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল) তোকে জাতেও নেবে না। দুঃখ কষ্টেরও তোর শেষ থাকবে না!

সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করিয়া কয় ফোঁটা জল চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল

কিষ্টো। কিন্তুক তুর যে কেউ নাই রে দিদি!

পাঁচী। তোরাই রইলি আমার। যেখানেই থাকিস জানব তোরা আছিস। একবার ক'রে বছর বছর আসবি, দেখা দিবি! কেমন?

রাধিকা। (আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, বলিল) শুনলি, কিষ্টো শুনলি? দিদি বুললে। বুললে, বউয়ের সাথে যা। তুর রাধির সাথে! শুনলি?

পাঁচি। (এবার সে সস্নেহে হাসিল) চল্ তোদের—এগিয়ে দি। ভোরও হয়ে এসেছে।

পাখী ডাকিয়া উঠিল। তাহারা দাওয়া হইতে নামিয়া পথ ধরিল। কিছুদূর আসিয়া প্রান্তর পাওয়া গেল। প্রান্তরের মধ্যে দূরে বেদেদের তাঁবু আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাইতেছে। সেখানে তখন বাঁশী ও ডুগডুগির শব্দ উঠিতেছে

রাধিকা। আজ সব রওনা হবে কিষ্টো! তাঁবু তুলবে। জলদি চল্ রে কিষ্টো!

বাঁশী ও ডুগডুগি বাজিয়াই চলিয়াছে

কিষ্টো। দিদি দাঁড়িয়ে কাঁদছে!

রাধিকা। (পিছন ফিরিয়া) হর বছর আমরা আসব দিদি! কেঁদ না। ফি বছর আমরা আসব—তুমার কাছে। হোক।

কিষ্টো। দিদির আমার কেউ নাই রে!

রাধিকা। (অকারণে হাসিয়া কিষ্টোর গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল) আরে—আরে! সাঁপটা গর্জ্জাইছে দেখ্—দেখ্! (তারপর সহসা শাসন করিয়া কহিল) চুপ, বলছি চুপ। দাঁড়া, তবে ভেলকির গান শুনায়ে দি তুকে।

সঙ্গে সঙ্গে সে গাহিয়া উঠিল

ও মায়ার ফাঁদ—
লাগ ভেলকি লাগ রে; আমার মায়ার ফাঁদ
কালো জলে ফাঁদ পেত্যা আনব ধর্যা চাঁদ।
সোনার হরিণ ধর্যা দিব চোখের দিকে চাও।
চোখে তুমার জল কেনে—কাজল পর্যা লাও।
সোনার হরিণ রূপার চাঁদে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধ।
হিজল কাঠের নাও রে আমার মন পবনের দাঁড়—
চল্ রে লয়্যা সোনার চাঁদে কামরূপের ধার—
পুড়্যা মরুক পিছ্যা ডেকে সাধবে যে গোর বাদ।

দুইজনে ভোরের আবছায়ার মধ্যে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইয়া স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর—বাঁশী ডুগডুগি থামিয়া আসিল। পাঁচি কেবল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল পাথরের মূর্ত্তির মত। যবনিকা তাহাকে ধীরে ধীরে আবৃত করিয়া দিল

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বিগত একমাসে ইয়োরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুর্য্যোদয়ের দেশ নিপ্পন হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর আমেরিকার পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ও বিশাল বারিধি রুদ্র রণদেবতার মলিন বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত। অতর্কিত আক্রমণ, অপ্রার্থিত পরাজয়, সুবিধান্বেষী চুক্তি প্রভৃতি গত একমাস আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতা আনয়ন করিয়া রণরঙ্গমঞ্চে এক নূতন অঙ্কের অভিনয়ারম্ভ সূচিত করিতেছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ

গত ৩রা এপ্রিল সহসা রয়টারের সংবাদে প্রকাশ পায় যে, পূর্ব্ব-লিবিয়ার শহর ও বন্দর বেন্‌ঘাজি বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। সিদিবারানি হইতে ইটালীয় সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া

ভূমধ্য-সাগরের প্রধান সেনাপতি সার এণ্ড্রু ব্রাউন কানিংহাম

খাল্লাম, বার্দিয়া, তব্রুক ও ডের্ণা অধিকারের পর বৃটিশবাহিনী গত ৬ই ফেব্রুয়ারি বেনঘাজি দখল করিয়াছিল। পূর্ব্ব লিবিয়ায় বেনঘাজি ছিল ইটালীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। কিন্তু বেনঘাজি অধিকারের পর পূর্ণ দুই মাস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই জার্মান ও ইটালীয় ট্যাঙ্ক-বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে বৃটিশ সৈন্যদের বেনঘাজি পরিত্যাগ করিতে হয়। জার্মানী যে সময় সিসিলিতে আস্তানা ঘাঁটি স্থাপন করে, সেই সময়েই আমরা তাহার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। আফ্রিকার যুদ্ধে সাফল্য লাভ ও ভূমধ্যসাগর-পথে আফ্রিকার সহিত ইটালীর সংযোগ রক্ষা এবং সিসিলি ও প্যাণ্টালেরিয়ার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গ্রীস অভিমুখে গমনোদ্যত বৃটিশ নৌবাহিনীকে বাধা প্রদানই যে ইহার উদ্দেশ্য সে কথা আমরা বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জার্মানীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ আমরা না পাইলেও সিসিলিস্থিত জার্মান সৈন্য যে নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করে নাই, আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত জার্মান-বাহিনীর বেন্‌ঘাজি দখলে তাহা সবিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বেন্‌ঘাজি অধিকারের পর জার্মান-বাহিনী ডের্ণা অধিকার করিয়া

বৃটীশ সাম্রাজ্যের সাধারণ সেনার কর্ত্তা—সার জন ডিল

বিদ্যুৎগতিতে বার্দিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ডের্ণা ও বার্দিয়ার মধ্যে তব্রুক ঘাঁটি অবস্থিত। তব্রুকের বৃটিশ সৈন্য পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই একদল জার্মান সৈন্য বার্দিয়ায় পৌঁছিয়াছে। তব্রুকে বৃটিশ সৈন্যগণকে বন্দী করিয়াছে বলিয়া জার্মানরা ঘোষণা করিলেও বৃটিশ সৈন্য এখনও তব্রুকে আত্মরক্ষা করিতেছে। অথচ বার্দিয়া জার্ম্মান-বাহিনীর হস্তগত। বর্ত্তমানে সাল্লামে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে। এদিকে এডোয়া

বৃটীশ বিমান বিভাগের নবনিযুক্ত চিফ্ মার্শাল সার চার্লস পোর্টাল

অধিকারের পর বৃটিশবাহিনী আদ্দিস্ আবাবায় প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধের জন্য বৃটেন

আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। সম্প্রতি কর্নেল পপফের কথায় প্রকাশ যে, তব্রুক, সিডিয়া মরূদ্যান অথবা আর্য্যামাদ্র হইতে বৃটিশ সৈন্যগণ সম্ভবত জার্মানবাহিনীকে প্রচণ্ড বাধাদানের চেষ্টা করিবে।
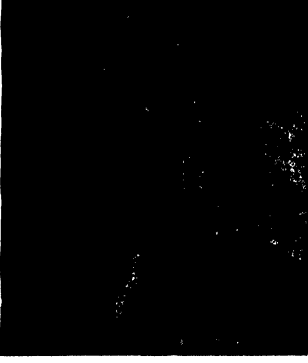
গ্রেট বৃটেনের সেনাবিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সার এলান ব্রুক

যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস

যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, অন্যান্য বহু সঠিক অনুমানের ন্যায় তাহাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। আমরা গত সংখ্যায়ই বলিয়াছিলাম যে, তুরস্ক সম্বন্ধে জার্মানী বিশেষ অবহিত হইলেও যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে হিটলার ততটা গ্রাহ্য করেন না। কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হইলে জার্মান আক্রমণ অসম্ভব নয়, এবং যুগোশ্লাভিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনমনীয় দৃঢ়তার মূল্যও গত এক বৎসরের ইতিহাসেই বহুবার পাওয়া গিয়াছে। বস্তুত, যুগোশ্লাভিয়ার মন্ত্রীরা ভিয়েনায় ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর দিন হঠাৎ যুগোশ্লাভিয়ায় এক রক্তপাতহীন বিপ্লব হয়। ১৮ বৎসর বয়স্ক তরুণ রাজা পিটার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। জেনারেল সিমোভিচ্‌ যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া ঘোষিত হন। রাজপ্রতিনিধি প্রিন্স পলকে সস্ত্রীক যুগোশ্লাভিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। আপোষ-তরণী এইভাবে তীরে আসিয়া নিমজ্জিত হওয়ায় হিটলারের ক্রোধবহ্নি প্রজ্জলিত হওয়া স্বাভাবিক। নিজ স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে বৃটেনও সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। ফলে বল্কানে এক নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে। বুলগেরিয়ায় ২২ ডিভিসন জার্মান বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। ৬ই এপ্রিল প্রভাতে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস একসঙ্গে আক্রান্ত হয়।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্লাভগণ সময়াভাবের জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার অবসর পায় নাই, বৃটিশ সমরনেতৃবর্গের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করাও সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলেও যুগোশ্লাভিয়া আশা করিয়াছিল যে, কয়েক দিন জার্মানবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলে মিত্রশক্তির সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবে এবং বৃটিশ ও গ্রীসের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালন সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু শ্লাভদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। জার্মানবাহিনী প্রথম হইতেই গ্রীক ও শ্লাভ সৈন্যদের পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রাখিতে সচেষ্ট ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্যালোনিকা অধিকার করে, এবং মনাষ্টির গিরিবর্ত্ম দখল করিয়া গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার শেষ সংযোগ-ব্যবস্থাও নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে, আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সংখ্যা-গরিষ্ঠ জার্মানবাহিনীর সম্মুখে বিচ্ছিন্ন শ্লাভগণ অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারে নাই। সম্মুখ প্রতিরোধ অসম্ভব বোধ হইলে বীর শ্লাভগণ গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই আপ্রাণ চেষ্টার মূল্য যতই হউক না কেন, আজ সমগ্র ইয়োরোপ যখন পশুশক্তির পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তখন এই পরাজয়ের জন্য দুঃখিত হওয়া ব্যতীত উপায় কি ?

গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও অগ্রগমনে অক্ষম হয় নাই। বৃটিশ সৈন্য গ্রীসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৃটিশ সমরনায়কগণ বৃটিশ সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করিলে গ্রীসে বৃটিশের সাফল্য লাভ করা সম্ভব। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা কতখানি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, তবে, করিৎসা, কালাবাকা, এবং অলিম্পস্‌ হইতে আলবানিয়ার চিমারা অঞ্চল পর্য্যন্ত দেড়শত মাইল রণক্ষেত্রে জার্মান-বাহিনী মিত্রশক্তির উপর ভীষণ চাপ দিতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার পতন অতি শীঘ্র সাধিত হইলেও গ্রীস আরও কিছুদিন শত্রুসৈন্যকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, গ্রীস পর্ব্বতসঙ্কুল হওয়ায় জার্মান-বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু নরওয়ের যুদ্ধ এখনও এত পুরাতন হয় নাই যে,

ভিচি মন্ত্রিসভায় মসিয়ে লাভালের স্থানে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব—মসিয়ে ফ্ল্যাঁদা

কষ্ট করিয়া আমাদিগকে তাহা স্মরণ করিতে হইবে। নরওয়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও সেখানে শত্রু সৈন্যের বিজয় লাভে অধিক বিলম্ব হয় নাই। যুগোশ্লাভিয়ার পরাজয় সম্বন্ধে যুগোশ্লাভ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সিমোভিচ্
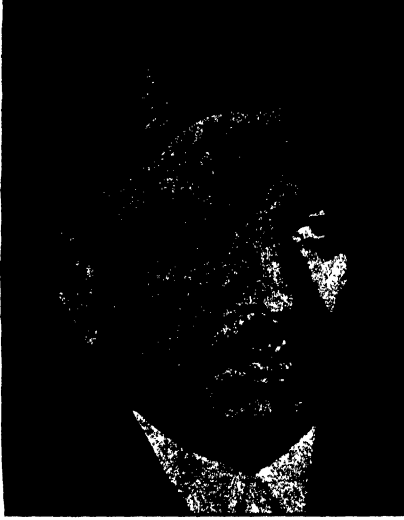
মসিয়ে লাভাল

বলেন যে, যুদ্ধ হইয়াছে দুই অসমান শক্তির মধ্যে। যুদ্ধের চরম পরিণতি সম্বন্ধে শ্লাভ জনসাধারণের মনে কোন প্রকার মোহ ছিল না। এইরূপ প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা যে অসম্ভব তাহা শ্লাভগণের অজ্ঞাত ছিল না। তবে যেখানে স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে, সেখানে সমরকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। গ্রীস সম্বন্ধে অবশ্য এতখানি নিরাশ হইয়া যুদ্ধ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আজ রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রীক ও সাম্রাজ্যবাহিনী পশ্চাদবর্ত্তী সৈন্যদের আড়াল করিয়া আসিতেছে। এদিকে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মিঃ করিৎজিস্ আত্মহত্যা করিয়াছেন। সংবাদ দুইটি নিতান্ত দুঃখের হইলেও একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, মিত্রবাহিনীর গ্রীস রণাঙ্গন পরিত্যাগ করার অর্থ জার্মানীর বিজয় লাভ। ভূমধ্য-সাগরে ও পশ্চিম-এশিয়ায় পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ তীরে বিজয় লাভের জন্য জার্মানী এত উদ্‌গ্রীব ও আগ্রহান্বিত কেন একথা বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। জার্মানীর বিজয় লাভের জন্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আক্রমণ যেরূপ অপরিহার্য্য, পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিজয় লাভও তাহার সেইরূপ একান্ত আবশ্যক। বৃটেনকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হইলে তাহার সামুদ্রিক বাণিজ্য ধ্বংস করা প্রয়োজন বলিয়াই জার্মানী আজ অর্থনৈতিক অবরোধে যেরূপ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই সুয়েজ অধিকার করিতে পারিলে সমস্ত প্রাচ্যের সহিত সে যে বৃটেনের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে একথাও সে জানে। তবে ইহা হিটলারের অজ্ঞাত নহে যে, ভূমধ্য সাগরে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে হইলে তাহাকে বৃটেনের দুর্জ্জয় নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ভারতবর্ষে পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছি যে, আফ্রিকার যুদ্ধে ইটালী-সাম্রাজ্যের সহিত আফ্রিকাস্থিত বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও মুসোলিনী তাঁহার নৌশক্তি ব্যবহার করেন নাই। এমন কি, ইটালীয় যুদ্ধজাহাজ আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইলে আমরা তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে না দেখিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিতেই দেখিয়াছি। কিন্তু ইটালীয় নৌশক্তিকে অক্ষত রাখিয়া কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হিটলার যে মুসোলিনীকে আগেই কিছু জানাইয়া রাখেন নাই, একথাও আমরা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত এই নৌযুদ্ধে হিটলার স্পেন ও ফ্রান্সের সাহায্য গ্রহণ করেন কি-না তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্পেন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে অভিমত প্রকাশ করিবার দিন এখনও আসে নাই। সম্প্রতি সামরিক বিদ্যালয়ের তরুণদিগকে উদ্দেশ করিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাঁহার বক্তৃতায় শান্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্পেনকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করা সম্বন্ধে তিনি যে আশা ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মিত্রশক্তির বিপক্ষে তাঁহার সহানুভূতির ক্ষীণ আভাষও কি অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ পায় নাই? হয়ত হিটলারের নির্দ্দেশেই স্পেন আজ নীরব। শেষ মুহূর্ত্তে যদি সে জিব্রাণ্টার প্রণালী অবরোধ করিয়া বসে তাহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ভিসি সরকার সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। মার্শাল পেতাঁ অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন মিত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্স অস্ত্র ধারণ করিবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কেমন করিয়া? এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ চার্চ্চিল ফরাসী নৌবহর হস্তান্তরিত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষ, ভিসি সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গত ১৮ই এপ্রিল এড্‌মিরাল দারলাঁ যে ঘোষণা করিয়াছেন, জার্মানীর প্রতি ভিসি সরকারের আনুগত্যের ইহা আর একটি প্রমাণ। কাজেই যথাসময়ে ফরাসী নৌবহরের সাহায্য লাভ করা জার্মানীর পক্ষে হয়ত অসম্ভব নহে।

এতদ্ব্যতীত জার্মানী যদি সুয়েজ দখলে সক্ষম হয় তাহা হইলে প শ্চি ম-এ শি য়া র তৈলভাণ্ডার হস্তগত করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কয়েক দিন পূর্ব্বে এইরূপ সংবাদ রটিয়াছিল যে, ইরাকের নূতন গবর্ণমেণ্ট জার্মানীর পক্ষপাতী। কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইরাকের মধ্য দিয়া যানবাহন চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য সাম্রাজ্যবাহিনী
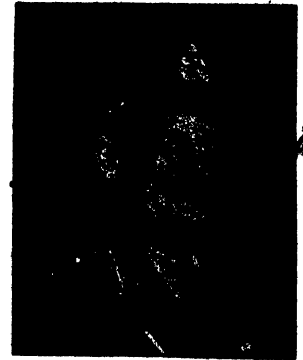
মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ সৈন্যের অধ্যক্ষ সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল

বসরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ইরাকের নূতন গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। ইহা বিশেষ আশার কথা সন্দেহ নাই। কারণ এই যুদ্ধ পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তৃত হইবার আশঙ্কা সমধিক। ইরাক ও ইরাণের তৈলখনি পৃথিবীর বিশেষ সম্পদ এবং হাইফা ও বাহেরিন দ্বীপে ইহা সঞ্চিত হয়। সুতরাং ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়া আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। সুয়েজ অধিকার করিতে পারিলে জার্মানী তুরস্কের সহিত চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পশ্চিম-এশিয়ায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হইবে। অনেকে করা অভ্যাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া জার্মানী সুয়েজ পর্য্যন্ত যদি দখল করিতে পারে তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া সে বৃটিশ নৌশক্তির প্রভাব যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াস পাইবে। এদিকে সুদূর-প্রাচীতে জার্মানীর মিত্র জাপান ঠিক সেই সময়ে নিজের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যে আঘাত হানিতে পারে অর্থাৎ পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের এই সংগ্রামের গুরুত্ব বর্ত্তমানে যথেষ্ট এবং বৃটেনের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব কোন অংশে কম নহে।

বল্‌কান রাজ্যে যুদ্ধের অবস্থা

বৃটেন ও জার্মানী

বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণের তীব্রতাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লণ্ডন হইতে স্কটল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নৈশ বিমান আক্রমণ চলিয়াছে। উত্তর-আয়র্লণ্ডও আক্রমণ হইতে বাদ যায় নাই। লণ্ডনের উপর দলে দলে জার্মান বিমান প্রদোষ হইতে প্রত্যুষ পর্য্যন্ত হাজার হাজার বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীও বার্লিন, কিয়েল, ব্রেমার, হাম্বের্গ, এম্‌ডেন্‌ প্রভৃতি স্থানে অগ্নিপ্রজ্জ্বালক বোমা নিক্ষেপ করিয়া পাল্টা জবাব দিতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজকীয় বিমানবাহিনী হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপে বোমা বর্ষণ করে। ব্রেষ্টের ডক, বার্কস্‌মায়ারের বিমান ঘাঁটি প্রভৃতি রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত।

এদিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশক্রমে মার্কিন বন্দরে আশ্রয় গ্রহণকারী ২৮টি ইটালিয়ান, ২টি জার্মান ও ৪০খানি ডেনিস্‌ জাহাজ মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ দখল করিয়াছেন। ইহাদের মোট ভার বহন ক্ষমতা ২৯৬,৭১৫ টন। জার্মানী ও ইটালী হইতে এই আটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে মার্কিন স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্‌ জানাইয়াছেন যে মার্কিন বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মনিমজ্জনে সচেষ্ট হওয়ায় তাহারা স্থানীয় আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে আটক করায় আন্তর্জ্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হয় নাই। উরুগুয়েতেও কয়েকখানি শত্রুজাহাজ আটক করা হইয়াছে এবং প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নাই।

সন্দেহ করেন যে, এই দারুণ গ্রীষ্মে আরবের রুক্ষ মরুভূমে জার্মান সৈন্য তাহাদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিবে না। কিন্তু যুদ্ধে যত কিছু বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হওয়া যায় জার্মান সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের তাহার উপযোগী করিয়া লইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হওয়ার জন্য তাহারা পূর্ব্ব হইতেই কৃত্রিম উপায়ে অত্যধিক তপ্ত কাচের ঘরে বাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীনল্যাণ্ডে নৌঘাঁটি নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু জার্ম্মান প্রভাবাধীন ডেনিস্ গবর্ণমেণ্টের অসম্মতিতে তাহা বিফল হইয়াছে। বস্তুত আমেরিকা স্পষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও সে বর্ত্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বলা চলে। কয়েকদিন আগে নিউইয়র্ক সান্ পত্রিকায় এক মার্কিন লেখক বলিয়াছেন যে, আমেরিকা এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে সে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। এখন শুধু যুদ্ধ ঘোষণার নিমিত্ত কোন ছল ছুতার অপেক্ষা এবং এরূপ ক্ষেত্রে ছলের অভাবও হয় না। কোন একটা মার্কিন জাহাজ আক্রান্ত হইলে বা অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটিলেই সে যুদ্ধে নামিয়া পড়িতে পারে।

রুশিয়া ও সুদূর-প্রাচী

জাপ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুকা যে রোম, বার্লিন ও মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন এ সংবাদ গত সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। রোম হইতে বার্লিন যাত্রার প্রাক্কালে মিঃ মাৎসুকা বলিয়াছেন যে, ত্রিশক্তি চুক্তি শতবর্ষ স্থায়ী হইবে। বিশ্বের নব বিধান প্রবর্ত্তনের আদর্শে এবং উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছে। তৎপরে বার্লিন হইয়া মস্কো পৌঁছিবার পর গত ১৩ই এপ্রিল সোভিয়েট ও জাপানের মধ্যে নিরপেক্ষতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে উভয় রাষ্ট্র পারস্পরিক শান্তি ও মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিবে এবং উভয়ে উভয়ের রাষ্ট্র সীমানা মানিয়া চলিবে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোন রাষ্ট্র যদি অপর এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্বাক্ষরকারী অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিবে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্মিলিত ঘোষণাবাণী দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জাপান মঙ্গোলিয়া রিপাব্লিকের সীমানা মানিয়া চলিবে এবং সোভিয়েটও মাঞ্চুকুও সাম্রাজ্যের সীমানা মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

জাপ-সোভিয়েটের এই চুক্তি অনাক্রমণাত্মক না হইয়া নিরপেক্ষতা চুক্তি হওয়ায় কেহ কেহ ইহার নূতন নামের জন্য ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। কিন্তু এই চুক্তির নামকরণ যাহাই হউক না কেন এবং ইহার ভাষাগত পার্থক্য লইয়া ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে যিনি যত সন্দিহানই হউক না কেন, এই চুক্তির গুরুত্ব যে যথেষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জাপানের সহিত নিরপেক্ষতা চুক্তি সংসাধিত হইলেও চীনের প্রতি সোভিয়েটের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। চীনকে সাহায্য প্রদানের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইবে না বলিয়া রুশিয়া মার্শাল চিয়াং-কাই-শেককে জানাইয়া দিয়াছে। চীনের যুদ্ধ হইতে জাপান একেবারে সরিয়া আসিতে না পারিলেও এই নিরপেক্ষতা চুক্তির ফলে জাপান দক্ষিণে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মনোনিবেশ করিতে পারে। জাপান এবং সোভিয়েট কাহারও ইহা অজ্ঞাত নহে যে, জাপান যদি আজ দক্ষিণে বৃটিশের সহিত শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হয়, তাহা হইলে চীন ব্রহ্মপথ দিয়া চীনে সাহায্য প্রেরণ একরূপ বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং তখন চীনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে একমাত্র সোভিয়েটের উপরই তাহার নির্ভর করা স্বাভাবিক। জাপান জানে, এরূপ অবস্থায় চীন স্বভাবতই পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং সোভিয়েট সরকারও ইহা ভুল করিয়াই বুঝেন যে ঘরের পাশে জাপানকে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে দিয়া তাহাকে প্রতিপত্তিশালী করা যেরূপ অযৌক্তিক, চীনের ঐ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজের প্রভাব ও মতবাদ চীনে প্রচার করার পক্ষেও সেইরূপ উহাই সুবর্ণসুযোগ। অথচ এদিকে জাপান সোভিয়েট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার মিত্রদের সাহায্যের জন্য প্রাচ্যে এক সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে সুতরাং এই চুক্তির ফল যে বহু সুদূর প্রসারী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। জাপান ইতিমধ্যেই তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সাংহাইয়ের উত্তরে সুংমিট দ্বীপে এবং একশত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে চুসান দ্বীপে জাপান ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। দক্ষিণ-চীনের সমগ্র উপকূল অবরোধের জন্য

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের রণক্ষেত্র

জাপ নৌবহরের আয়োজন চলিয়াছে। বিশটিরও অধিক জাপ সাবমেরিন দক্ষিণ-চীন সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছে। একদল জাপ বাহিনী নৌবিভাগের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ১৯এ এপ্রিল প্রাতে অতর্কিতে চেকিয়াং প্রদেশের উপকূলে নিংপো বন্দরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরেও প্রবল উদ্যমে সমরায়োজনের বিরাম নাই। সম্প্রতি আমেরিকান ফ্লাইং ফোর্ট্রেস মার্কা বহু বিমান সিঙ্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মালয় রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া একত্র কার্য্য চালাইতে ইহারা বদ্ধ-পরিকর। সংক্ষেপে, পূর্ব্ব-এশিয়ার রাজনৈতিক গগনে যে পুঞ্জীভূত কালো মেঘ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকে আসন্ন প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে।

২৩।৪।৪১

গল্পলেখার বিপদ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

"প্রচণ্ড নিদাঘ। নদ-নদী, হ্রদ-বিল-তড়াগ শুষ্কপ্রায়। খররৌদ্রে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তরুদল বিশীর্ণ। গ্রামপথে তপ্ত ধূলা উড়িতেছে। মধ্যাহ্নে বাহির হয় কাহার সাধ্য! মানুষ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ছটফট করিতেছে। হেমনলিনী নিদ্রার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইলেন। অবশেষে একরাশ তেঁতুল লইয়া বঁটি দিয়া বীচি ছাড়াইতে বসিলেন।"

এই পর্য্যন্ত লিখে উদীয়মান লেখক ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একটু দম নিলে।

হেমনলিনী এর পর কি করতে পারে? সে ধনীর গৃহিণী, সুন্দরী। নিঃসন্তান বলে যৌবন যাই-যাই ক'রেও এখনও যেতে পারেনি। পশ্চিম দিগ্বলয়ের প্রান্ত সীমায় এসেও হঠাৎ যেন থমকে রয়েছে। এই দুরন্ত গ্রীষ্মে ঘুম না এলে বঁটি দিয়ে তেঁতুল-বীচি ছাড়ানো মন্দ নয়। কিন্তু নায়িকা যেখানে ধনীর গৃহিণী সেখানে তেঁতুল-বীচিই বা সে কতক্ষণ ছাড়াতে পারে? তার স্বামী কৃষ্ণকিশোর অতি সচ্চরিত্র ও নিরীহ ব্যক্তি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্প্রীতি বর্ত্তমান। সুতরাং হেমনলিনী যে সেই বঁটি গলায় বসিয়ে একটা লোমহর্ষণ কাণ্ডের সৃষ্টি করবে সে সুযোগও নেই। এমন অবস্থায় হেমনলিনীকে নিয়ে ভবেন্দ্র সত্য সত্যই অত্যন্ত বিব্রত এবং বিচলিত হয়ে উঠল।

আমাদের চোখের সম্মুখে যে অসংখ্য নর-নারী—কেউ উদরান্নের চেষ্টায়, কেউবা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিচরণ ক'রে থাকে—কেউ মোটরে, কেউ ট্রামে, কেউ বা পদব্রজে—তাদের অতি অল্প ক'জনকেই আমরা চিনি। যাদের চিনি, তাদেরও অতি অল্পই চিনি। এমন অবস্থায় এই জনারণ্যের মধ্যে থেকে একটি হেমনলিনীকে কল্পনায় আবিষ্কার করে তাকে পাঁচজনের সামনে রংচং দিয়ে উপস্থিত করা চারিটিখানি কথা নয়।

কলিকাতা মহানগরীর একখানি সুসজ্জিত ঘরে দুপুর বেলায় বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে ভবেন্দ্র গ্রীষ্মের পল্লীর রূপ চিন্তা করতে লাগল। সেই সঙ্গে হেমনলিনীর কথাও। নীচের রাস্তা দিয়ে শ্রান্ত শীর্ণ কণ্ঠে কুলপি-বরফওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে। ধনী এবং সুন্দরী হলেও পল্লীগ্রামে ব'সে হেমনলিনীর উপায় নেই—একটু কুলপি-বরফ খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করে।

সে বঁটি দিয়ে তেঁতুলের বীচি ছাড়ায়।

তারপরে?

ভবেন্দ্র সেই কথাটাই একাগ্রচিত্তে ভাবতে লাগল। পল্লীবধূর পক্ষে উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা। তার পরিসর এত সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং হৃদয়ের তাপ এত অল্প যে, তাকে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই প্রথম পল্লীর গল্প লিখতে বসে এই প্রথম সেই কথাটা উপলব্ধি ক'রে সে পল্লীসাহিত্যের সম্বন্ধে একটা হতাশা বোধ করলে। এদের চরম পরিণতি সূর্য্যমুখী!

কিন্তু উদীয়মান লেখক ভবেন্দ্রনাথ সেই পুরাতন গতানুগতিক পথে যেতে পারে না। সে স্থির করেছে, পল্লীর কুসংস্কারের শৈবালাচ্ছন্ন বদ্ধ ডোবায় স্রোত না খেলিয়ে সে ছাড়বে না। কিন্তু হেমনলিনীর এমনই একটা মিষ্টি স্নিগ্ধ ছবি তার মনে এসেছে যে, তার থেকে কিছুতেই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। হেমনলিনীর ভদ্রঘরের গৃহিণী হওয়ার যোগ্যতা আছে, কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার একেবারেই সে অনুপযুক্ত।

এমন সময় ভবেন্দ্রের স্ত্রী সুলতা একহাতে একটি শ্বেতপাথরের গেলাসে তরমুজের সরবৎ নিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে এল।

বললে, বাবাঃ! এই গরমেও লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার? ধন্যি মানুষ তুমি!

ভবেন্দ্র সরবতে একটা চুমুক দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—তুমি কি মনে কর, লেখা আমাদের সখ?

—তবে?

—এ আমাদের জীবনধর্ম্ম। না লিখে আমরা পারি না। আমাদের লিখতেই হবে।

সুলতা একথার আর উত্তর না দিয়ে ভবেন্দ্রের লিখিত অংশটা পড়তে লাগল।

তারপর সকৌতুকে বললে, এবারে হিমুদি'কে নিয়ে পড়লে! বেশ হবে। লেখ, ছাপা হলে তাকে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দিতে হবে।

সুলতা হাতে তালি বাজিয়ে হেসে উঠল।

ভবেন্দ্র বললে, এ হেমনলিনী তোমার হিমুদি নয়, এ অন্য।

—আহা! আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি না! "ধনীর গৃহিণী, সুন্দরী। নিঃসন্তান বলে যৌবন যাই-যাই ক'রেও যেতে পারেনি। পশ্চিম দিগ্বলয়ের···" এ কে মশায়? হিমুদি নয়? স্বামীর নামটা অবশ্য মেলেনি। কিন্তু এই যে "সচ্চরিত্র ও নিরীহ ব্যক্তি! জামাইবাবু ছাড়া এটি কে হতে পারে? আমাকে বোকা পেয়েছ?"

ভবেন্দ্র হেসে বললে—না, তোমার বুদ্ধির শেষ নেই। কিন্তু সচ্চরিত্র এবং নিরীহ ব্যক্তি হলেই যে তোমার জামাইবাবু হতে হবে, তা আমার জানা ছিল না।

সুলতা এ পরিহাস গায়েই মাখলে না। সে ভবেন্দ্রের চেয়ারের হাতলে বসে বললে, হিমুদির সম্বন্ধেই যদি লিখতে হয়, তাহ'লে তার একটা গল্প তোমাকে বলি। তুমি ক'দিনই বা তাকে দেখেছ, কি-ই বা তার সম্বন্ধে জান! আমার কাছে শোন।

ভবেন্দ্র সরবৎটা শেষ ক'রে গেলাসটা রাখলে। রুমালে মুখ মুছে বললে—বল। দেখি তোমার হিমুদিকে নিয়েই একটা গল্প লেখা যায় কি না।

সুলতা বললে, তোমাদের সবারই ধারণা জামাইবাবুই এক দণ্ড দিদিকে না দেখে থাকতে পারে না। কিন্তু দিদির গুণ তো জান না?

ভবেন্দ্র নিরীহভাবে ঘাড় নাড়লে।

সুলতা হেসে বললে, একবার কি হয়েছিল শোনো। জামাইবাবু এমনি একটা গ্রীষ্মকালে জমিদারী দেখতে বেরিয়েছিলেন। পালকীতে ক'রে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর চোখ লাল। আর যায় কোথায়!

—তোমার দিদি ভাবলেন, মদ খেয়ে?

—তা কেন ভাববে? ভাবলে অসুখ। তখনি ডাক্তারের কাছে লোক ছুটল। হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করা দূরে থাক, জামাইবাবুকে তখনই বিছানা নিতে হ'ল। তাঁর গায়ে লেপ চাপিয়ে দেওয়া হল, সেই গরমে, বোঝ। বাড়ী তোলপাড়, রান্নাবাড়া বন্ধ! কেঁদে কেঁদে দিদিরও চোখ লাল!

—তারপরে? ডাক্তার কি বললে?

—বললে? তাকে কি দিদি বলতে দিলে? ডাক্তার যত বলে কিছুই হয়নি, দিদি তত বলে হয়নি তো চোখ লাল কেন? ডাক্তার বলে, দুপুরে এসেছেন, রোদের ঝাঁঝে ওরকম হতে পারে। দিদি বললে, হতে পারে তো এই যে দেশশুদ্ধ লোক সমস্ত দিন রোদে ঘুরছে ওদের চোখ লাল হয় না কেন? উনি তো পালকীতে এসেছেন। ডাক্তার বললে, তা হলেও ··। দিদি বললে, ও সব আমি বুঝি না। তোমার বিদ্যেয় যদি রোগ ধরতে না পার, আমি শহর থেকে বড় ডাক্তার আনাব।

—সর্ব্বনাশ! আর তোমার জামাইবাবু?

সুলতা হো হো ক'রে হেসে উঠল।

—জামাইবাবু? তিনি প্রতিবাদে একবার একটা কি কথা বলতে যেতেই দিদি একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে উঠল। বললে, ফের একটা কথা কয়েছ কি আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। জামাইবাবু ভয়ে আর কথাটি কইলেন না। সারারাত ধরে এই পর্ব্ব চলল। সারা রাত্রির ফি দিয়ে বেচারা ডাক্তারকে পর্য্যন্ত ঠায় বসিয়ে রাখা হল।

ভবেন্দ্র হাসতে লাগল।

—অথচ ব্যাপারটা কিছু নয়?

—না। অন্ততঃ বিশেষ কিছুই নয়। তারপরে এমন হয়েছে যে, জামাইবাবুর যদি শক্ত অসুখও হয়, বাইরে চুপ ক'রে পড়ে থাকেন, তবু বাড়ীর ভিতর জানাতে সাহস করেন না।

সুলতাও হাসতে লাগল।

বললে, এই নিয়ে একটা গল্প লেখ দেখি।

রোগশয্যায় অসুস্থ স্বামী। তার পাশে রাত্রির পর রাত্রি জেগে চলেছে দুটি নর-নারী। একজন ডাক্তার, সে সুপুরুষ, সুদর্শন এবং যুবক। অপর জনের যৌবন যাই-যাই ক'রেও যেতে পারছে না। তার যৌবনের প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে জলছে অপত্য কামনার বাড়বানল।

স্বামীর রুগ্ন দেহনদীর দুই তীরে দুটি চখাচখী এমনি ক'রে রাতের পর রাত জেগে চলেছে।

লেখাটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হওয়া মাত্র আদৃত হল। তার ভক্তের দলে এই নিয়ে রীতিমত একটা কলরব পড়ে গেল।

ভক্তশিরোমণি আলোক কাগজ বগলে ক'রে এসে কড়া নাড়লে।

বললে, অদ্ভুত! অনবদ্য!

ভবেন্দ্র খুশি হয়ে হাসলে। বললে, ভালো লেগেছে তোমাদের?

—ভালো?—আলোক চোখ কপালে তুলে বললে—শুধু ভালোলাগা? Wonderful! ও তো শুধু গল্প-নয়, জীবনের মহাকাব্য। বিশেষ ক'রে আমার কাছে।

—মানে?

আলোক সলজ্জভাবে হাসলে।

বললে, সে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আপনাকে বলতে দোষ নেই।

ব'লে সম্মতির অপেক্ষায় ভবেন্দ্রের দিকে সাগ্রহে চাইলে। অর্থাৎ শুধু যে তার বলবার ইচ্ছা আছে তাই নয়, এই কথাটা বলবার জন্যেই সে ট্রাম ভাড়া করে এতটা পথ এসেছে।

ভবেন্দ্র সোৎসুকে বললে, তাই নাকি?

আলোক মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ। আমার মেজদির নন্দাইএর যেবার খুব অসুখ হয়। বাইরে প্রচণ্ড দুর্য্যোগ, ঘরে মুমূর্ষু রোগী, আর তার দু'পাশে আমরা দুজন। সে যে কি মনের ভাব, আপনার গল্পটি পড়ার আগে পর্য্যন্ত আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না। আশ্চর্য্য আপনার দৃষ্টি, আশ্চর্য্য আপনার মনোবিশ্লেষণ, আর আশ্চর্য্য আপনার ভাষা!

রোমান্সের নীলাভ আলোয় যে ক'টি সঞ্চরমান বুভুক্ষু চিত্তের ছবি সে এঁকেছে, দিনের পরিপূর্ণ আলোয় তারই একজনের ছবি চোখের সামনে দেখে ভবেন্দ্র যেন হতাশ হয়ে গেল। আলোকের স্তুতিবাদের সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্ত্তে বিস্বাদ হয়ে গেল। এত কষ্টে, এত যত্নে এবং এত মমতায় সে কি এই ছবি আঁকল!

বললে, কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও?

—না। ওইটুকুই তফাৎ। নইলে···

ভবেন্দ্র আর শুনতে পারলে না।

এর সপ্তাহ কয়েক পরে একটি বুড়ো ভদ্রলোক একদিন তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। শীর্ণ দেহ, মাথার চুল ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা, চোখে অত্যন্ত পুরু কাচের নিকেলের চশমা। ভবেন্দ্রের অত্যন্ত সন্নিকটে চোখ নিয়ে এসে ভদ্রলোক কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি ভবেন্দ্রবাবু?

তার আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে এবং তার স্তিমিত চোখের অপার্থিব দৃষ্টিতে ভবেন্দ্র যেন শিউরে উঠল। তার মনে হ'ল, লোকটি যেন এ পৃথিবীর নয়—যেন একটি ভৌতিক গল্পের চরিত্র।

তার প্রশ্নের উত্তরে ভবেন্দ্র নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

ভদ্রভাবে বললে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

ভদ্রলোক বসলে না। তার মুখের উপর সেই অপার্থিব শীতল দৃষ্টি আর একবার বুলিয়ে পুনরায় কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি গল্প লেখেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বসলে।

ভবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোথেকে আসছেন?

—হুগলী থেকে।

—কি দরকার বলুন?

—দরকার? আপনি ভালো ক'রে খবর না নিয়ে কেন ওই সব বাজে কথা লেখেন?

—কি রকম বলুন তো?

রুক্ষভাবে ভদ্রলোক বললে, বলব বই কি! বলবার জন্যেই তো এতটা পথ এসেছি। আমি কৃষ্ণকিশোর।

—কৃষ্ণকিশোর!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যার কথা আপনি গল্পে লিখেছেন। যার স্ত্রী মুমূর্ষু স্বামীর বিছানায় বসে সারারাত ডাক্তারের সঙ্গে···

তাড়াতাড়ি ভবেন্দ্র বললে—সে আপনি কেন হবেন? আপনি তো ধনী বলে মনে হচ্ছে না! আপনাকে তো আমি চিনিই না। আপনার কথা লিখব কি করে? জানবই বা কি ক'রে?

—জানবার ভাবনা কি? পাড়াগাঁয়ে আর যতই অভাব থাক, দলাদলির অভাব নেই। সে খবরও নিয়েছি। মুখুয্যেদের ষষ্ঠী এসে আপনাকে খবরটা দিয়ে গেছে।

—মুখুয্যেদের ষষ্ঠীকে আমি চিনিই না।

—বেশ চেনেন। আমি কি খবর না নিয়েই আসছি? আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি শুনুন, আমি উকিল বাড়ী থেকে আসছি। আপনার নামে এক নম্বর মানহানির মামলা ঠুকচি।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু একবার জানতে এসেছি, ভদ্রলোকের মেয়ে-বৌএর নামে যা-তা লেখেন কেন?

ভবেন্দ্র সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু দম ধরে রইল। তারপর বললে, আপনিই যে আমার গল্পের কৃষ্ণকিশোর, সে কথা প্রমাণ করবেন কি ক'রে?

—খুব সহজে। আমার নামও কৃষ্ণকিশোর। আমি ধনী নই, জমিদারী দেখতে বেরুইনি, পালকী ক'রেও ফিরিনি। কিন্তু সত্যি সত্যি মাসখানেক আগে সদর থেকে ফেরবার সময় সর্দ্দি গর্ম্মি হয়েছিল! আমার স্ত্রীর রূপের প্রসঙ্গ আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু তিনিও নিঃসন্তান এবং আমার সেই অসুখের সময় সত্যি সত্যি ডাক্তারকে সারারাত্রি ডবল ফি দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে তাঁর গহনাগুলি সেই যে বাঁধা পড়েছে, আজও ছাড়াতে পারিনি। একেবারে নিরাভরণ হওয়ার চেয়ে শাঁখা দু'গাছি রাখার জন্যে তাঁর এই কাজ ভালো হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল, সে আপনার স্ত্রীকে জিগ্যেস করবেন।

ভবেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বললে, আপনি ভুল করছেন। আপনার স্ত্রী অথবা কারও স্ত্রীর কুৎসা রটনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি চিনি না, মুখুয্যেদের ষষ্ঠী সপ্তমী কেউ আমার কাছে কোনোদিন আসেনি। তাদের চিনিও না। হুগলী আমি জীবনে কখনও যাইনি। এ সমস্তই কল্পনা।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন।

বললেন, আশ্চর্য্য আপনাদের কল্পনা মশাই! রোগ হলে লোকে ডাক্তার ডাকে। স্বামী যখন রোগে ধুঁকছে, স্ত্রী কিছু আর তখন লজ্জা ক'রে তার বিছানা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। আমি মর-মর, আর আপনি কল্পনা করলেন, আমার স্ত্রী তখন ডাক্তারের সঙ্গে চখাচখী খেলা করছেন! বিলক্ষণ!

ভবেন্দ্র লজ্জিতভাবে বললে—দেখুন, রসের ক্ষেত্রে···

ভদ্রলোক যেন বারুদের মতো ফেটে পড়লেন।

—রসের ক্ষেত্র? রস আপনাদের মাথায় ঢালতে হয়। স্বামী মর-মর, স্ত্রী তার শেষ সম্বল চুড়ি ক'গাছি বন্ধক দিয়ে ডাক্তারের ফি জোগাচ্ছে, এর মধ্যে রসটা কোথায় শুনি?

ভবেন্দ্র হাত কচলে বললে, কি জানেন···

—জানি। সে আর মুখে বলবার নয়। আমি চললাম, আবার কোর্টে দেখা হবে।

রাগে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

কিন্তু বিপত্তির এইখানেই শেষ হ'ল না।

ক'টা দিন যেতে না যেতেই হেমনলিনী তাঁর স্বামীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সুলতা বহুকাল পরে দিদিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'ল। হেমনলিনী তার সহোদর দিদি নয়, পিসতুত দিদি। বলতে গেলে, সে সুলতাদের বাড়ীতেই মানুষ। কিন্তু বিবাহের পর দুই বোনে দেখা খুব কমই হয়।

বললে, হিমুদি যে! কি ভাগ্যি! তোমার বাহন কোথায়?

—গাড়ীভাড়া মেটাচ্ছে।

—কেমন আছ? জামাইবাবু কেমন আছেন?

—ভালো নয়। ক'দিন থেকে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হচ্ছে। সেইজন্যেই আসা। সেই সঙ্গে ভাবলাম, তোর ছাগলটাকেও দেখে আসি। কোথায় গেল সেটা?

—কে? ছাগল? ছাগল আবার কোথায় পাব?

নীচে থেকে জামাইবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল: কোথায় গো? কোন দিকে গেলে?

উপর থেকে সুলতা বললে—এই যে, এই দিকে, এই দিকে। আহা! জামাইবাবু আমার দিদিকে এক মুহূর্ত্ত না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখেন!

—তা বলতে পার, তা বলতে পার।

হেমনলিনী পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল

—ওকি কম্ফর্টারটা খুললে কেন ? কালকে সমস্ত রাত্রি ছটফট করেছ না ?

জামাইবাবু করুণকণ্ঠে বললেন, বড্ড গরম যে !

—হ'লই বা গরম ! দাঁতে যন্ত্রণা না ?

—এখন যন্ত্রণা অনেকটা কম মনে হচ্ছে।

—তোমার তো সব সময়েই কম মনে হয় ! যন্ত্রণার তুমি তো সবই বোঝ !

জামাইবাবু আর কথাটি কইতে সাহস করলেন না। এই দুর্দ্দান্ত গরমে হেমনলিনী তাঁর মুখ বেশ ক'রে কম্ফর্টার দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখনই পাশের ঘরে তাঁর বিছানা হ'ল। হেমনলিনী নিজের হাতে তাঁর পা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে সেই বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে এল। শান্ত ছেলের মতো জামাইবাবু চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লেন।

ভবেন্দ্র হেমনলিনীর আবির্ভাবে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার তার সাহস নেই। চুপি চুপি এক সময়ে তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

—কেমন আছেন ?

জামাইবাবু চোখ মেলে বললেন, ভালো নয়।

—দাঁতের যন্ত্রণা কি খুব বেশী ?

—কিছুমাত্র না। কেবল এই কম্ফর্টারটার জন্যে ·· তোমার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—না। তিনি বাথরুমে।

জামাইবাবু ঝেড়ে উঠলেন। বললেন, তাহ'লে দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, কম্ফর্টারটা খুলি। আর শোনো, তোমার দিদির সঙ্গে সহজে দেখা কোরো না। তোমার মাথায় ঘোল ঢালবে ব'লে এসেছে। জান তো ওকে ? কি যে গল্প লেখ তোমরা, আর আমাকে নিয়ে···। এই দেখ না, কিছুই নয়। দাঁতে অমন ব্যথা এ বয়সে হয়। তার জন্যে এই কলকাতা পর্য্যন্ত টানাটানি। শুনছি, ব্যারি সাহেবকে কল দেওয়া হবে।

ভবেন্দ্র বিরক্তভাবে বললে, গল্পের কথা যদি বললেন ··

—সে আমি জানি। গল্প গল্পই—কিন্তু স্ত্রীলোকে যদি তাই বুঝবে তবে আর···

—আজ্ঞে শুধু স্ত্রীলোকই নয়, প্রেতলোক থেকে একজন পুরুষ এসেও শাসিয়ে গেছে।

—প্রেতলোক থেকে ? কি রকম ?

—তা আমি কি ক'রে জানব ? শাসিয়ে গেছে, মান-হানির মামলা করবে। তার বিশ্বাস ও গল্পটা তার স্ত্রীকে নিয়ে লেখা। বুঝুন বিপদ !

—বল কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তার জন্যে ভয় পাচ্ছি না। সে যা হয় হবে। কিন্তু এখানে ফরিয়াদী নিজেই যে হাকিম ! রায়ও দেওয়া হয়ে গিয়েছে ! ভয় এইখানেই !

জামাইবাবু হাসলেন। বললেন, ভয়ের কথা বটে। তবে তোমার গল্পটা ঠিক হয়নি।

ভবেন্দ্র বিরক্তভাবে বললে, ঠিক হবে কি ক'রে ? ও তো আপনাদের নিয়ে লেখা নয়।

—তা বটে। কিন্তু এইবার একটা আমাদের নিয়ে সত্যিকার গল্প লেখ।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ভবেন্দ্র বললে, আবার ! এই ধাক্কাই সামলাই দাঁড়ান।

জামাইবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, ধাক্কা আমার ওপর দিয়ে কম যায় না। এক একটা অসুখ তো নয়, এক একটা ফাঁড়া। তবু প্রতিবাদ করি না। তাতে ফলও হবে না। হ'ত, যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাকত। হাসির কথা ! তোমাকে বলতে লজ্জাও করে। আসল কথা কি জান ? আমার উপর দিয়েই তোমার দিদি বাৎসল্য রসও মিটিয়ে নিতে চান। ফলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। তোমাকে সত্যি কথা বলছি, এক এক সময় স্ত্রীর উৎপাতে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। আবার স্ত্রীর মুখ চেয়েই সে ইচ্ছে সামলে নিই।

জামাইবাবুর চোখ ছল ছল করে উঠল। একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ তিনি দমন করলেন।

তারপর বললেন, লিখবে এই নিয়ে একটা ?

ভবেন্দ্র সটান বললে, আজ্ঞে না। মাপ করবেন।

—তাই তো হে। দেখছি, তোমার দিদিকে একা আমিই ভয় পাই না, সবাই পায়।

তারপরে কম্ফর্টারটা আবার জড়িয়ে জামাইবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যা গ্রহণ করলেন।

বাইরে তখন হেমনলিনী ঘন ঘন কড়া নাড়ছে !
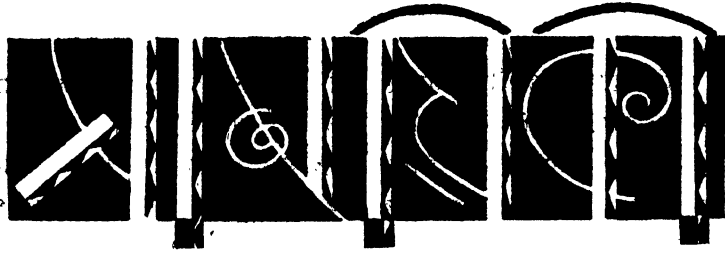
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

গত ২৫শে বৈশাখ তারিখে বাঙ্গালার তথা ভারতের গৌরব-রবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৮১ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমরা কবি-গুরুকে আমাদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করুন। এই পরিণত বয়সেও কবিগুরু নিত্য তাঁহার নূতন দানে বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতেছেন। বাঙ্গালী জাতি আজ তাই সর্ব্বত্র সমবেতভাবে তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

নববর্ষের বাণী—

নববর্ষের প্রথম দিনে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের একাধিক অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি যে ভাষণ দিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা অবশ্যপাঠ্য; প্রত্যেক ইংরেজ তাহা পাঠ করিলে এ দুর্দ্দিনেও তাঁহারা লাভবান হইবেন। যিনি আশীবৎসর ধরিয়া একটা আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জীবন
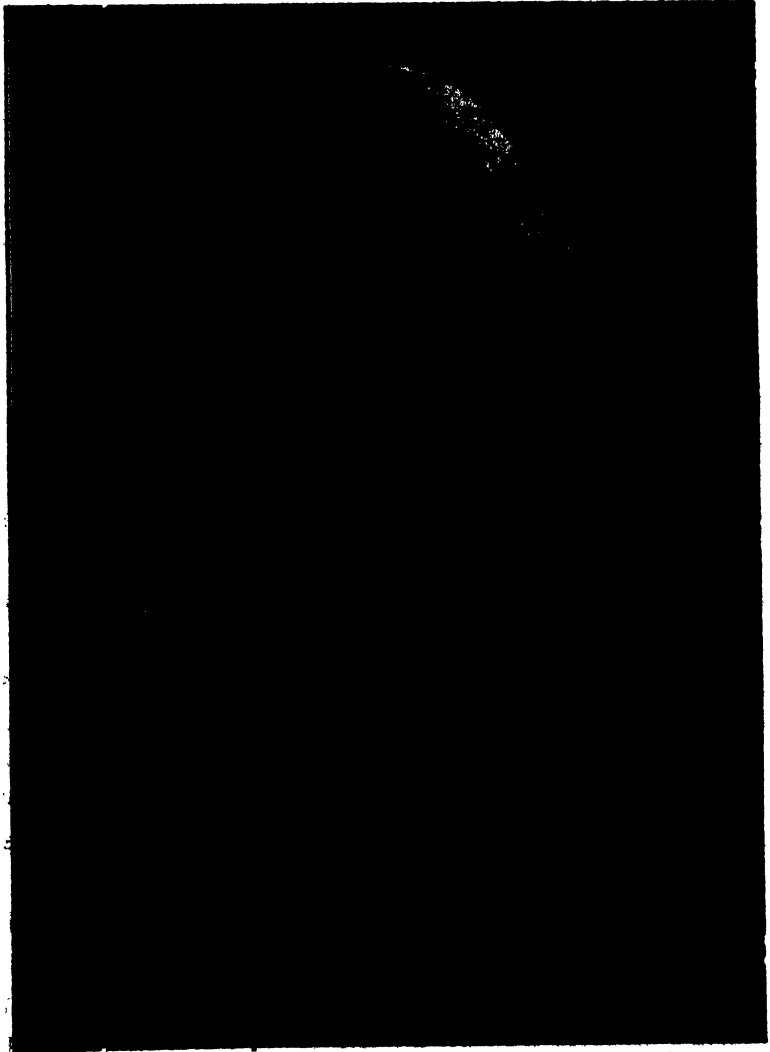
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন, আজ জীবন সায়াহ্নে তিনি যদি দেখেন যে তাঁহার সেই আদর্শ বহুধা বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে তখন তাঁহার চিত্তে যে বেদনা যে ক্ষোভ জন্মে, কবির এই ভাষণ তাহার জ্বালাময়ী বাণী। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতে বৃটিশ শাসনের নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ সমালোচনা হিসাবে এই ভাষণটি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একটা নির্ম্মম আঘাতে গভীর শ্রদ্ধা ভাঙ্গিয়া গেলে যে হতাশা ধ্বনিত হয়, কবির ভাষণে সেই হতাশার সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজী-সাহিত্য ও তাহার ভিতর দিয়া ইংরেজ চরিত্রের যে উদারতা, বলিষ্ঠতা ও সততার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সেই দিনের তরুণ চিত্তকে বিস্মিতই শুধু করে নাই, মুগ্ধও করিয়াছিল। সনাতন সমাজের অচলায়তনের মধ্যে সেদিনের তরুণদের প্রাণে ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের সার্ব্বজনীনতা একটা বিরাট বিপ্লবের জন্ম দিয়াছিল। ইংরেজ শুধু গায়ের জোরে দেশের মাটিই আয়ত্ত করে নাই, চরিত্রের দৃঢ়তায়, মনের উদারতায়, দাক্ষিণ্যে এবং প্রাণপ্রাচুর্য্যে দেশের মনকেও জয় করিতে পারিয়াছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় এবং আশৈশব ইংরেজের অন্তঃকরণের বিশালতা ও মানবমৈত্রীর পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া কবি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত ইংরেজ জাতিকে অন্তরের উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন।

আঘাত পাইয়া নিভৃত সাহিত্যচর্চ্চার আবেষ্টন হইতে বাহিরে আসিয়া 'ভারতের জনগণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য' তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা 'হৃদয়বিদারক'। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য, মানুষের শরীর ও মনের যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটে নি।

দেখিতে দেখিতে জাপান যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হইল। জাপানের ঐশ্বর্য্য এবং নিজের জাতির মধ্যে তাহার সত্য-শাসনের রূপ তিনি স্বয়ং চাক্ষুষ করিয়া আসিয়াছেন। আর প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন—অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে অতবড় বৃহৎ রুশ সাম্রাজ্য হইতে কত সহজে ও কত শীঘ্র মূর্খতা, দৈন্য ও আত্মাবমাননা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 'সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনও বিরোধ ঘটেনা, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ-সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসন-ব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।' পারস্য ও আফগানিস্থান অতি দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কেবল 'ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।'

এদেশের শিক্ষিত-মনে ইংরেজের জন্য যে শ্রদ্ধার আসন ছিল তাহা কেন আজ থাকিতে চাহিতেছে না, সে বিষয়ে ভারতবাসী ও ইংরেজ উভয়কেই ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। কবি বলেন, 'কেবল এই কথাই ভাবি, সাম্রাজ্যলোলুপতা এত বড়ো জাতির চরিত্রে কেমন করে ক্রমশ লজ্জাকর বিকারে কুৎসিত হয়ে উঠেছিল।' এই অভিযোগের মধ্যে কবির কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত, তাহাতে বেদনার সুরই বেশী। সব চাইতে তাঁহার বেশী দুঃখ এই যে, 'সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্নবস্ত্র শিক্ষা ও আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ।'

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জয়ন্তী—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অশীতি বর্ষে পদার্পণ করায় তাঁহার অজস্র ভক্তশিষ্য ও গুণমুগ্ধ দেশবাসী নানা স্থানে নানা ভাবে জয়ন্তী উৎসব পালন করিতেছেন। এই আনন্দোৎসব জাতির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন মাত্র। শিক্ষাদান, রসায়নের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান, জাতির নৈসর্গিক আপদে অকপট সেবা, অসাধারণ ত্যাগ, শিশুর মত সরল ব্যবহার ও আর্য্যঋষির জীবনযাপন প্রভৃতি গুণে তিনি দেশবাসীর প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। এসকল গুণের অনেকই তাঁহার তিরোধানের সহিত লোপ পাইবে। কিন্তু বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষকে তিনি মর্য্যাদাবোধ, শিল্পগঠন ও স্বাধীন জীবিকা-র্জ্জনের যে পথ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভবিষ্যতের দিক দিয়া চিন্তা করিলে মনে হয় তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চা পরীক্ষাগারের চতুঃসীমার মধ্যেই চিরকাল নিবদ্ধ ছিল। যে বিজ্ঞান শিল্পে নিয়োজিত না হয় বা ব্যবহারিক জীবনে কাজে না লাগে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ; এমন কি অসার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ইহার মর্ম্ম অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং

ইহার মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর রসায়ন চর্চ্চা যাহাতে শিল্পে রূপলাভ করিতে পারে আজীবন তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা তাঁহাতেই মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া জাতি আজ তাঁহার দান আনন্দ চিত্তে স্বীকার করিতে চায়। জয়ন্তী উপলক্ষে যে সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল মিউজিয়মের প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের সর্ব্বত্র রসায়নের মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের যে বিরাট প্রতিষ্ঠান চলিতেছে তাহাদেরই চেষ্টাপ্রসূত দ্রব্যাদি এই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুসন্ধান সমিতি (Board of Scientific & Industrial Researeh), বাঙ্গালোর বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, মাদ্রাজ বিজ্ঞান কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ায় বর্ত্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের ধারা সম্বন্ধে একটী সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছিল। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বহু শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুসন্ধান সমিতি তাহাদের আবিষ্কারগুলি যাহাতে সাধারণের কাজে লাগিতে পারে, তাহার পূর্ণ সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানানুসন্ধান সমিতি যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে পারেন। ইহা বিশেষ আশার কথা সন্দেহ নাই। সরকারী ভূতত্ত্বানুসন্ধান অফিস (Geological Survey of India) ও Indian Museumএর শিল্পশাখা হইতে ভারতে বাণিজ্যের উপযোগী এবং শিল্পের মূলবস্তুরূপে বহু প্রস্তর, লতা ও বীজ প্রদর্শনীতে আনিয়াছিলেন। প্রত্যেকটীর সহিত জন্ম বা প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহারের সঙ্কেত থাকায় তাহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহা সমস্ত প্রদর্শনীর সামান্য অংশের পরিচয়। একদিন আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত প্রদর্শনী বিশেষ করিয়া পরিদর্শন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহাই শেষ জীবনে তাঁহার নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সাধনার সামান্য পুরস্কার মাত্র।

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সাম্প্রদায়িকতা ও ছাত্রসমাজ—

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়েরই বহুলোক হতাহত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জের প্রায় পঞ্চাশ-

খানি গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে, অধিবাসীরা ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। এই অপ্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন দুঃসাধ্য হইলেও 'নিখিল-বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। ঐক্যসাবকমিটিতে কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান অধ্যাপক আছেন। তাঁহারা প্রতিদিন উভয় সম্প্রদায়ের বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন। কাজেই তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং শুভ প্রচেষ্টা যে ছাত্রদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ ফলপ্রসূ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, কাজটা খুব সহজসাধ্য হইবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ উভয় সম্প্রদায়ের মজ্জায় মজ্জায় আশ্রয় পাইয়াছে, সুতরাং ছাত্র সমাজও তাহার আওতার বাহিরে নাই। পৃথক পৃথক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই তাহা প্রমাণিত করিতেছে।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়—

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব সম্প্রতি ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দেশবাসীর নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদনে তিনি বলেন, অবস্থা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন এবং এখন জনগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি কলিকাতার নাগরিকদের নিকট বিশেষ করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন যে ঢাকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা যেন সকলে মনে রাখেন এবং শান্তিরক্ষার জন্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন। কলিকাতায় প্রায়ই সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে গুজব রটিতেছে, তিনি সেই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। হক সাহেবের এই আবেদনের সহিত আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা আছে। সুতরাং হক সাহেবের সহিত একমত হইয়া আমরা উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি ও দেশপ্রেমের নিকট আবেদন করিতেছি যে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও অকল্যাণকে আমরা যেন কোনমতেই প্রশ্রয় না দিই।

গান্ধীজী ও গণ-আন্দোলন—

গণ-আন্দোলনে দেশব্যাপী একটা অশান্তির সম্ভাবনা আছে, তাই মহাত্মাজী তাহাতে সম্মত হন নাই। অথচ একদল বিপ্লব-বিলাসী বলিয়া বেড়ান যে, গান্ধীজি অকারণ সময় নষ্ট করিতেছেন। মহাত্মাজীর গণ-আন্দোলনে রাজী না হওয়ার এই কারণ যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই—তবে ইহা সমগ্র সত্য নহে। কোন দেশে যুদ্ধের সময়ে জনগণের মধ্যে গণ-আন্দোলন ব্যাপকভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, ইতিহাস তাহা বলে না; অপরপক্ষে যুদ্ধ চলিতে চলিতে কোন সমর-নায়ক বা শাসকগণের অবিবে-চনার ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণ শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে এই প্রমাণ একাধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের শেষেও ইহাই ঘটিয়াছিল। আজিকার বলদৃপ্ত হিংস্র হানাহানির প্রচণ্ডতা যখন একদিন নিজের শ্মশান রচনা করিবে, সেইদিন মানুষের কল্যাণকামী শুভবুদ্ধি উদার শান্তির মধ্যে নবসৃষ্টির নির্ম্মাণ সুরু করিবে—এই বিশ্বাসই মহাত্মাজী করেন।

একক সত্যাগ্রহ ও মহাত্মাজী—

মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধবিরোধী একক সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিতেছেন। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু সমালোচক সমালোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মহাত্মাজীকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তিনি অবিলম্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করুন। বিশেষ করিয়া 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' এবং প্রসঙ্গত বিরোধী সমালোচক-দের গান্ধীজি এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে তিনি সম্মত নহেন। এই আন্দোলনের সকল দায়িত্ব স্বয়ং গান্ধীজী গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে কোন ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত করিবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে ইহা এক নৈতিক প্রতিবাদ মাত্র। অহিংস উপায়ে ভারতের

স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খার ইহা অভিব্যক্তি মাত্র—যুদ্ধের উদ্যোগে বাধা দিবার কোন পরিকল্পনাই ইহাতে নাই। মহাত্মাজীর বিবৃতি দুর্ব্বোধ্য নহে, অভিনবও নহে। তাঁহার মতবাদের দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা ইহার মধ্যে তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিতে পাইবেন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ—

বিহারে কংগ্রেসী সরকার স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে মিঃ এম্ ইউনাস কিছুদিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্ব

প্রফুল্ল জয়ন্তী প্রদর্শনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শেষ হইবার পর তিনি একবার মোসলেম লীগে যোগ দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু লীগের উদ্দেশ্যের সহিত একমত হইতে না পারিয়া দল ত্যাগ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ ইউনাস বিহার প্রাদেশিক ঐক্য সম্মিলনের সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহা কেবল এদেশের লোকদের নহে, বৃটিশ শাসকদেরও অবশ্যপাঠ্য বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে প্রধান কণ্টক—এরকম বলাই আজকাল রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট দেশের জনসাধারণের উপর বাহিরের-প্রাধান্য যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই কথাই কি সত্য নহে?

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতি—

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এক সময়ে বাঙ্গালার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেই কৃষ্ণনগরে এখনও যে সাহিত্য চর্চ্চার বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়, তাহাও বিচিত্র নহে। গত ৩০শে মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণনগর টাউন হলে রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় খ্যাতনামা কবি শ্রীযুত

নীহাররঞ্জন সিংহ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং সভায় বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অনিল ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিয়া বক্তৃতা বা কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি—

সম্প্রতি কলিকাতা মুসলিম হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অনেক দিন পরে তাঁহাকে মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কারণ বাঙ্গালা দেশ বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত এবং হিন্দু-সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য—এই দুইভাগে বাঙ্গালা সাহিত্য বিভক্ত হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে কাজী সাহেবের ন্যায় একজন শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক কবির সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমন সত্যই কল্যাণজনক। তাঁহার নিকট আমরা অনেক কিছুই প্রত্যাশা করি। তাই বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দুর্দ্দিনে তাঁহাকে ও তাঁহার মতাবলম্বীগণকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতে চাহি।

কলিকাতায় ভিক্ষুক সমস্যা—

কলিকাতা এক সময় বৃটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল। রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও তাহার নামডাক এক ফোঁটাও কমে নাই, তাই অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদের সহিত অবাঙ্গালী ভিখারী আসিয়াও এখানে ভিখারীর দল পুষ্ট করিতেছে। প্রকাশ, কলিকাতায় চারি হাজারেরও অধিকসংখ্যক ভিখারী আছে এবং ইহাদের এক অংশ কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী ও বিকলাঙ্গ। আর এক অংশ সুস্থ, সবল, কর্ম্মক্ষম, যদিচ তাহারাও অসুস্থতার ভাণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নানা মতলবে থাকে। কিছুদিন হইতে এইসব ভিখারীর জন্য শহরপ্রান্তে একটি আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করিয়া নগরের রাজপথগুলিকে রুগ্ন ভিখারীদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জল্পনা কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। আলোচনার ফলে এই সদিচ্ছাটাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, শিশু ভিখারীদের পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয় এবং সক্ষমদের জন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং রুগ্ন ও বিকলাঙ্গদের জন্য হাসপাতাল ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই কার্য্যের জন্য প্রাথমিকভাবে একলক্ষ এবং পরে বৎসর বৎসর একলক্ষ করিয়া টাকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার। কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে সম্মত আছেন, তাহা ছাড়া পাঁচ শত গৃহহীনকে আশ্রয় দেওয়ার মত একটি বাড়ী তৈয়ারি করিতেও তাঁহারা নাকি সম্মত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে কোন আন্দোলন দেখা যাইতেছে না। অথচ অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় নারীনিগ্রহ—

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের এক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে জানা যায় যে, বাঙ্গালাদেশে নারীনিগ্রহ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৮ সালে নারী ধর্ষণের সংখ্যা ছিল এক হাজার পঁচাত্তর। পর বৎসর (১৯৩৯) সেই সংখ্যা বারশত তেইশে দাঁড়াইয়াছে এবং ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত দেখা যায় এগার শত নিরানব্বই। এই সংখ্যার মধ্যে হিন্দু কত, মুসলমানই বা কত—আর অপরাধীদের মধ্যে হিন্দু বেশী কি মুসলমান বেশী তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা, নারীনিগ্রহের ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনেক উপরের। হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে কেমন করিয়া বাঙ্গালার এই কলঙ্কমোচন করা যায় সে সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদের সচেতন হওয়া দরকার।

সিন্ধুপ্রদেশেও ঐক্য প্রচেষ্টা—

পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলের অনুসরণে সিন্ধু প্রদেশের নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীও সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের কতকগুলি কার্য্যকরী উপায় অবলম্বনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। সিন্ধুর অবস্থা যে পাঞ্জাবের তুলায় ঢের বেশী উদ্বেগজনক, তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বাগ্রে এই অবস্থাটার

পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নূতন প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লা-বক্স ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা অটল থাকিলেই মঙ্গল।

জলধরের স্মৃতি তর্পণ—

গত ১৩ই এপ্রিল রবিবার কলিকাতা শ্যামবাজারে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের গৃহে রবিবাসরের অধিবেশনে ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় মৃত্যু সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্মৃতি পূজা করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সভায় জলধরবাবুর নানা গুণের বর্ণনা করা হইয়াছিল। রবিবাসরের সদস্যগণ ছাড়াও জলধরবাবুর বহু অনুরাগী বন্ধু সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটি—

সম্প্রতি বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালায় মোট ১১৮-টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির এলাকায় মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন। ইহা বাঙ্গালার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪.৭ ভাগ। উপরোক্ত ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ জন মিউনিসিপ্যালিটির করদাতা; গড়ে প্রতি অধিবাসীর হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় হয় ৪।০ টাকা (কলিকাতা শহরে তাহা ২০।৶০)। অপর দিকে গড়ে প্রতিজনের হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটি গুলির ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে ৩।৶১১ পাই। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তাহাদের আয়ের শতকরা ৫.৬ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রত্যেক বিদ্যালয়গামী (প্রাথমিক বিদ্যালয়) শিশুর জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির গড়ে ২৷১ পাই খরচ হইয়া থাকে।

প্রফুল্ল জয়ন্তী প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

ব্রহ্মের সহিত বাণিজ্য চুক্তি—

ব্রহ্ম হইতে ভারতবর্ষে বৎসরে আন্দাজ ২৮ কোটী টাকার মাল আসে। সে স্থলে বৎসরে ভারতবর্ষের ২২ কোটী টাকার মাল প্রতি বৎসর ব্রহ্ম ক্রয় করিয়া থাকে;

সুতরাং ভারত-বাণিজ্যে ব্রহ্মদেশ বিশেষ লাভবান। এরূপ ক্ষেত্রে যদি উভয় দেশের মধ্যে কোনও বাণিজ্য চুক্তি হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের সুবিধানুযায়ী চুক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সে দাবী করিতে পারে। বাঙ্গালা দেশের চাউল ব্যবসায়ীরা—কলমালিক ও বণিকসমিতির সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মারফত সরকারের নিকট একটী সুচিন্তিত মন্তব্য পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য-চুক্তি পাকা করিবার সময় যেন ভারতে আমদানী-করা চাউলের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হয়। ব্রহ্মের চাউল ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে আসার ফলে ধানের উপযুক্ত মূল্য পওয়া যায় না এবং চাষীরা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কথা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে খাটে। এখানকার চাউল নানা স্থানে রপ্তানী হয় এবং তাহাতে বৎসরের খরচে যে ঘাট্‌তি পড়ে, তাহা এবং প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আমদানী হইয়া যাওয়ায় ধান চাউলের মূল্য উপযুক্ত পাইতে অসুবিধা হয়। এইরূপ বাণিজ্য চুক্তি হওয়া একপ্রকার ভালই বলা চলে, কারণ দেশের লোকে যাহাতে কিছু পায় তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। এই অনুরোধ সুবিচার লাভ করে নাই। ব্রহ্মের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া বলবৎ হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে বিনা শুল্কে চাউল ভারতে প্রবেশলাভ করিবে! এ বৎসর ভারতবর্ষে চাউল খুব চড়া দরে বিক্রীত হইতেছে, তাহাতে এই চুক্তির কুফল বুঝিতে পারা যাইবে না; কিন্তু অন্যান্য বৎসরে চাষীর দুর্দশা উপলব্ধি করিয়া দেখিয়া কলমালিকগণের এই অনুরোধ উপেক্ষা করা কর্ত্তৃপক্ষের সমীচীন কার্য্য হয় নাই।

দাঙ্গা পীড়িতদের সাহায্য দান—

ঢাকার দাঙ্গাপীড়িতদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে এবং সহৃদয় দেশবাসীরা সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী হিন্দুদের সাহায্যের জন্য একশত টাকা স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের হস্তে দিয়াছেন। অপর পক্ষে স্যর নৃপেন্দ্রনাথও মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের হস্তে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য একশত টাকা দান করিয়াছেন। ইঁহাদের এই 'নিদর্শন দান' অর্থবানদের উৎসাহিত করিলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ত্রিপুরার মহারাজার রাজ্যে দাঙ্গাপীড়িত প্রায় আট হাজার নরনারী আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং মহারাজা তাহাদের সুখ সুবিধার সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহারাজার এই কার্য্য হিন্দুমুসলমান সকলে চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। মুসলমান নেতৃবৃন্দও দাঙ্গায় বিপন্ন লোকদিগকে নানাভাবে সাহায্য দান করিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্যই দেশের লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে।

স্বায়ত্ত শাসন আইন সংশোধন—

প্রবল প্রতিবাদ ও তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসন আইন সংশোধন বিল আলোচনার প্রস্তাব ভোটের জোরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। সৈয়দ জালাল-উদ্দীন হাসেমী প্রমুখ কেহ কেহ এই বিলটিকে ঢাকার সাহাবুদ্দীন আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিলটি আইনে পরিণত হইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা আইনে পরিণত হইলে জেলা বোর্ড প্রভৃতির কার্য্যকলাপের উপর দেওয়ানী আদালতের অধিকার থাকিবে না। আদালতকে এড়াইয়া চলিবার একটা মনোভাব বাঙ্গালায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া দেখা দিতেছে। ঋণসালিশী আইনেও আদালতের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আদালতের বিচার প্রার্থনা করিবার অধিকার খর্ব্ব করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীরা দেশকে যে দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা দেশের গভীর অমঙ্গলের কারণ হইবে।

আদিবাসী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা—

ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কোন না কোন শ্রেণীর আদিম অধিবাসী বাস করে। ইহারা তথাকথিত সভ্য-সমাজের আশে পাশে থাকে, তাহাদের আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে—অথচ বিধিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং সভ্যতা ও শিক্ষায় উন্নত হইবার সুবিধা পায় না। সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিয়া হিসাব করিলে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অথচ ভারতবাসী হইয়াও ইহারা ভারতের
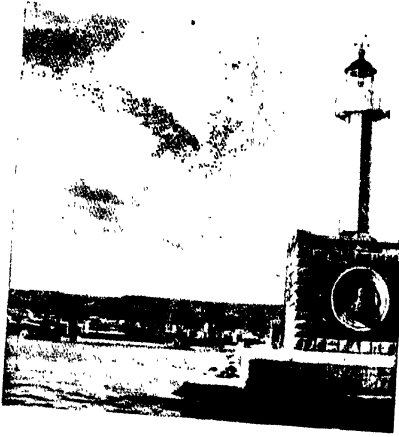
কৃষ্ণসাগরস্থ বুলগেরিয়ার প্রধান বন্দর—বাণা—সালোনিকার মধ্য দিয়া বুলগেরিয়ার সৈন্যদল ভূমধ্যসাগরে যাইবার পথ
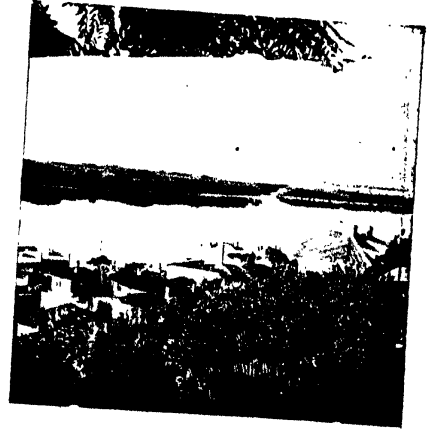
বলকানের প্রধান নদী—দানিউব—দক্ষিণ দোবরুজার দৃশ্য

বুলগেরিয়ার প্রধান ধর্মযাজক সেণ্ট জনের বাসস্থান—রিলাস্ক মঠ

বুলগেরিয়ার প্রধান সহর সোফিয়ার একটি রাজপথ—এইস্থানেও বোমা ফেলা হইয়াছে
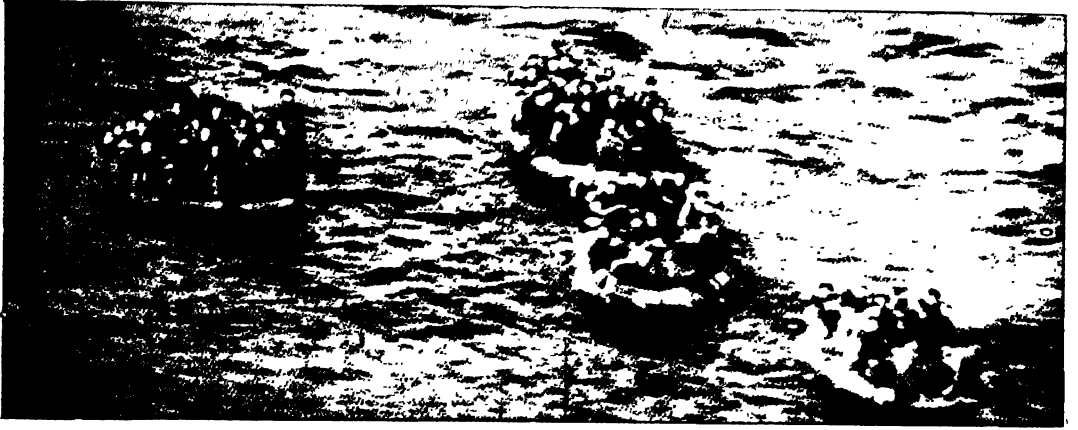
মাটাপান যুদ্ধের পর ইটালীয়গণকে উদ্ধার করা হইতেছে—৪খানি নৌকায় তাহাদিগকে তোলা হইয়াছে

যুদ্ধে এই সকল জার্মানকে বন্দী করিয়া লণ্ডনে আনা হইয়াছে

বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো দিল্লীতে শিক্ষানবীশ ভারতীয় সৈন্যদের পরিদর্শন করিতেছেন
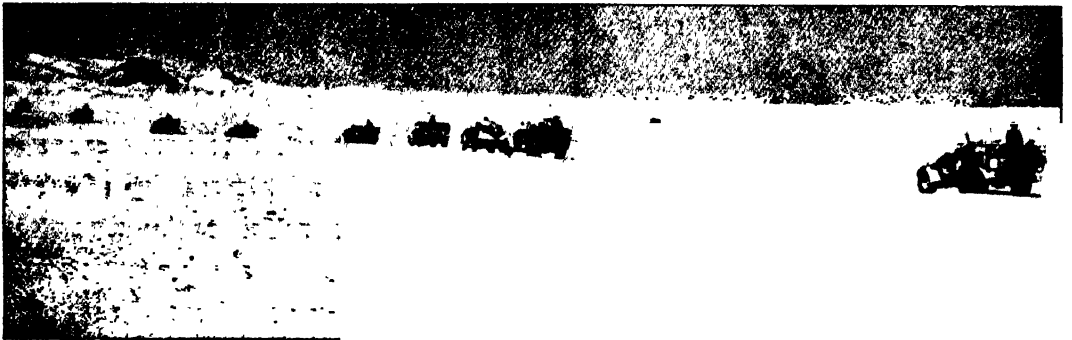
সাহারা ও লিবিয়ার মরুভূমিতে প্রহরী দল—ইহারাই শত্রুদিগকে বিপন্ন করিয়াছে

জীবন ও সংস্কৃতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং অনগ্রসর সম্প্রদায় বলিয়া চিরস্থায়ীভাবে একান্তে পরিত্যক্ত। এই বৃহৎ জনসংখ্যাকে যাহাতে তথাকথিত সভ্যসমাজের মধ্যে টানিয়া লওয়া যায় এবং ক্রমোন্নতির পথে চালিত করা সম্ভব হয় তজ্জন্য সম্প্রতি নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু বিদ্যালয়ে লেডী লিংলিথগো

কিরণশশী সেবায়তন—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্র-বান্ধবভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানটি গত প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নানাপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের হালসিবাগান ১০৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে সম্প্রতি দরিদ্র যক্ষ্মা-রোগীদিগের রঞ্জনরশ্মি দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা হইল, তাহা মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে বিশেষ উপকারে লাগিবে। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র নান তাঁহার পরলোকগতা পত্নী কিরণশশীর নামে এজন্য ২৫শত টাকা দান করিয়াছেন, আরও ৫ হাজার টাকা দিবেন এবং মাসিক আড়াই শত টাকা ব্যয়ভার বহন করিবেন। ভাণ্ডার এজন্য তিন হাজার টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও ৫ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়াছেন। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ৫ই এপ্রিল এই সেবায়তনের উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতায় এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের কর্ম্মীরা যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন, তাহা সর্ব্বত্র অনুকৃত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে লেডী রীড পাঠাগার উদ্বোধন

মুসলিম লীগের দাবী—

বিহার সরকারের পুলিশ বিভাগের রিপোর্টে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মুসলিম লীগ দল বিহারের মোমিন সম্প্রদায়কে লীগের দলে ভিড়াইতে পারেন নাই। লীগের বিশিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে মোমিন সম্প্রদায়ের মনের ভাব অত্যন্ত উগ্র। যুক্তপ্রদেশের সরকার যে ১৯৩৯ সালের শাসন-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিবরণীতে সিয়াসুন্নিদের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহাও বিশেষ করিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এইসব বিরোধ যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধেরই মত, তাহাও রিপোর্টে স্পষ্ট করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইসব রিপোর্ট যখন লিখিত হয়, তখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমল ছিল না—বরং খাস গভর্ণরের শাসন কালেই উহা হইয়াছে। ইহা হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লীগের দাবীর মধ্যে কোন যুক্তি নাই। ভারতের মুসলমানগণ সকলেই এক জাতি, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই—লীগ দলের এইসব প্রচার যে নিছক ভুয়া কথা, এই রিপোর্টগুলি কি তাহাই প্রমাণিত করে না ?

ভারতে চাউলের অভাব—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ আসিতেছে। ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানির জন্য উপযুক্তসংখ্যক জাহাজের অভাব হওয়াতেই এদেশে চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া অনেকে বলিতেছেন। উক্ত বিষয়ে কি প্রতিকার করা যায় ভারত-সরকার সম্প্রতি সেই সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

আসামের চা-শিল্প—

গত ১৯৩৯ সালের শেষে আসামে চা বাগিচার সংখ্যা ছিল ১১২৬টি। পূর্ব্ব বৎসর তাহা ছিল ১১২০টি। ১১২৬টি চা বাগানের মধ্যে ৩৯টি মাত্র দেশীয় মালিকের। গত ১৯৩৮ সালে আসামে মোট ৪,৩৯,১৩৪ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেই স্থলে ৪,৩৮,২৫১ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছে। ঐ বৎসর আসামের চা-বাগানগুলিতে কর্ম্মরত শ্রমিকের দৈনিক সংখ্যা ছিল ৫,৩৮,২৯৪। পূর্ব্ব বৎসর ৫,২০,৯৩২ ছিল। ১৯৩৯ সালে আসামের চা-বাগানগুলিতে মোট ২৫,২৩,৬৭,৩৫৮ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে বিমানপোত কারখানা—

ভারতে বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্য যে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট্ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, ভারত সরকার বর্ত্তমানে তাহার সহিত বিশেষভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। প্রথমে কোম্পানির মূলধন ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা পঁচাত্তর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথমে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও মহীশূর রাজসরকারই কোম্পানির অংশীদার ছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকারও কোম্পানীর অংশ কিনিয়া ইহার অংশীদার হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষে তিন জন শ্বেতাঙ্গ এই কোম্পানির পরিচালক সঙ্ঘে মনোনীত হইয়াছেন। কোম্পানির কারখানা নির্ম্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। যন্ত্রপাতিও শীঘ্র আসিয়া পৌছিবার কথা। বিলম্বে হইলেও শেষ পর্য্যন্ত যে কারখানা স্থাপিত হইল ইহাই সুখের কথা।

মিঃ জিন্নার নববিধান—

মহাকবি হোমারের মতে প্রত্যেক মিশরবাসীই চিকিৎসক এবং সকল ফীনিশীয়ই চোর। আমাদের মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নাও সেইরূপ মনে করেন যে—প্রত্যেক মুসলমানই অ-ভারতীয়, আর সকল হিন্দুই মুসলমানবিদ্বেষী। কোন রাজনীতিবিদের মত যে এরূপ হইতে আরে তাহা আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশের মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতেও জিন্না সাহেব তাঁহার সেই পাকিস্থান স্বপ্নই আওড়াইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য নাই এই কথা তিনি বলেন না বটে, কিন্তু তিনি যাহা বলিতে চাহেন তাহা আরও বিচিত্র। তিনি বলেন—হিন্দু-মুসলমানে মিল থাকাটা উচিত নহে। ভারতের ইতিহাস কি বলে সে কথা ভাবিবার ফুরসৎ তাঁহার নাই ; হয়ত বা সুবিধামত তিনি ভুলিয়াও বসিয়াছেন যে এই সেদিনও হিন্দু মুসলমানে মিলন ছিল এবং ভবিষ্যতেও মিলন থাকিবে।

রামপ্রসাদ স্মৃতি উৎসব—

গত ২০শে এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে ২৪পরগণা জেলার হালিসহর গ্রামে স্থানীয় সাহিত্যিকবৃন্দের উদ্যোগে

হালিসহরে রামপ্রসাদ সাহিত্যসম্মিলন ফটো—গোপাল রায়

ও চেষ্টায় ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের ভিটায় তাঁহার এক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। হালিসহরবাসী রায় সাহেব বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এক অভিভাষণে হালিসহরের অতীত ইতিহাস বিবৃত করেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুত অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অনিল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত মনুজ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে যে রামপ্রসাদের কাব্যের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করা হইবে।

বর্দ্ধমানে পল্লীসাহিত্য সম্মিলন—

প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মভূমি বর্দ্ধমান সহরের ৪ মাইল দূরবর্ত্তী রায়ান গ্রামে গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় শুক্রবার ও শনিবার পল্লী সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে (শুক্রবার) শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় উক্ত কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করা হয়। পরদিন সকালে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভার

বর্দ্ধমান রায়ানে পল্লীসাহিত্য সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ ফটো—অমরেন্দ্র তা

উদ্বোধন করেন। শনিবার অপরাহ্নে বর্দ্ধমানের চারণ-কবি শ্রীযুত কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পল্লী

সাহিত্য সম্মিলনের কাব্যশাখায় অধিবেশন হইয়াছিল। মফঃস্বলের গ্রামে এইরূপ বিরাটভাবে সাহিত্য সম্মিলন প্রায়ই দেখা যায় না।

'দৈনিক বসুমতী' ও বাঙ্গালা সরকার—

গত ৯ই চৈত্র তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদের জন্য বাঙ্গালা সরকার ভারত-রক্ষা আইনের বলে এক আদেশ জারি করিয়া তিন সপ্তাহ কাল 'দৈনিক বসুমতী'র প্রকাশ বন্ধ রাখেন এবং উক্ত তারিখের কাগজও বাজেয়াপ্ত হয়। বসুমতীর বিরুদ্ধে সরকারী শাস্তি সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের যত যুক্তিই থাকুক না কেন, আইন-সভায় অধিকাংশের ভোটের জোরে মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী সাময়িকপত্রগুলি একযোগে সরকারের কার্য্যের নিন্দা করেন। প্রবন্ধটির মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই ছিল না এবং সরকার পক্ষও তাহা বলিতে পারেন নাই। সরকার পক্ষের বক্তব্য এই যে, বসুমতীর প্রবন্ধটি বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সাহায্য করিবে। কিন্তু 'আজাদ' ও 'স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া'র বিরুদ্ধেও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না কেন? তাঁহারাও ত প্রায়ই ঐরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন। সে যাহাই হোক, দৈনিক বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয় এই সময় 'দৈনিক বসুমতী' বন্ধ থাকায় 'টেলীগ্রাফ বসুমতী' নামে আর একখানি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসুমতীর দেশপ্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক ইহাই কামনা করি।

শুল্ক বিভাগের আয়—

গত মার্চ মাসে ভারত সরকারের আমদানি ও রপ্তানি কর হইতে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ও উৎপাদন কর হইতে ৯৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে উভয় কর হইতে যথাক্রমে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় বৎসরে ৫৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকার স্থলে ৫০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তাহার মধ্যে আমদানি বাবদ ৩৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানি বাবদ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, অন্যান্য বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

আগের বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এই বৎসর চিনি, রৌপ্য, রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য, কাপড়, কেরোসিন, মোটর-গাড়ী, যন্ত্রপাতি, স্পিরিট, রবারনির্ম্মিত দ্রব্য, সুতা, খেলনা, কাগজ, রেশম, বেতারের সরঞ্জাম প্রভৃতির উপর আমদানি কর হইতে আয়ের পরিমাণ কমিয়াছে। অপর পক্ষে কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, কার্পাস, লৌহ, ইস্পাত ও ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি কর হইতে এবং দেশলাই, স্পিরিট, তামাক, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদির উৎপাদন কর হইতে আয় বাড়িয়াছে।

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতা বহুবাজার ৫২ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেননিবাসী ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৩১শে মার্চ্চ ৯৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া রেলওয়ে বোর্ডে চাকরী করিতেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পল্লীর একজন সর্ব্বজনসমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন এবং পল্লীর উন্নতি-বিধানে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার দুই পুত্র সলিসিটার শরৎচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ এবং ৫ কন্যা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং দুই কন্যা ও বহু পৌত্রদৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রদের মধ্যে শচীন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রকুমার সলিসিটার এবং ধীরেন্দ্রকুমার ব্যারিষ্টার।

বার্ণপুরে সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র শনি ও রবিবার আসানসোলের নিকটস্থ বার্ণপুরে স্থানীয় আগমনী সাহিত্য সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্যসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিনে শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উভয় দিনই সম্মিলনে বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প পঠিত হইয়াছিল এবং বার্ণপুরের মত কারখানাবহুল স্থানেও

বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। বর্দ্ধমান, রাজমহল, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকজন সাহিত্যিক এই সম্মিলনে

বার্ণপুরে আগমনী সাহিত্যসংঘের সাহিত্য সম্মিলন

যোগদান করিয়াছিলেন। আগমনী সাহিত্য সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টায় এই সম্মিলনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সাংবাদিকের পরলোকগমন—

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নৈশ সম্পাদক কালীরঞ্জন আচার্য্য মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষকরূপে তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং ১৯২৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত তিনি নৈশসম্পাদকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। পরে ১৯৩৯ সালে তিনি সংবাদপত্র ত্যাগ করিয়া ইস্টার্ণ স্টেট্‌স্ এজেন্সীর প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন এবং উক্ত এজেন্সীর দেশীয়রাজ্যসমূহের প্রচার বিভাগের সংগঠন করেন। প্রায় এক বৎসর আগে তিনি পুনরায় অমৃতবাজারে যোগদান করেন। আমরা এই

ভারত স্ত্রীশিক্ষা-সদনে ছাত্রীদিগকে প্রাথমিক সাহায্যের সার্টিফিকেট প্রদান—সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

কৃতী সাংবাদিকের অকালবিয়োগে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা ১৩৬ অখিল মিস্ত্রী লেন নিবাসী প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশত গত ২৯শে চৈত্র ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অর্থসাহায্যে তাঁহার স্বগ্রাম খড়দহে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি—

বাঙ্গালা দেশে কুইনাইনের মূল্য দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলে বেশী বলা হইবে না। বাঙ্গালা সরকারের অধীন সিঙ্কোনার বাগানে যে কুইনাইন উৎপাদন করিতে প্রতি পাউণ্ডে ছয় টাকা হইতে আট টাকার বেশী ব্যয় পড়ে না, সেই কুইনাইনের মূল্যই সরকার আঠার টাকা ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বাঙ্গালার নরনারীর প্রতি কর্ত্তব্যের এক চমৎকার নিদর্শন! কিন্তু এখন আঠার টাকায়ও এক পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই চৌত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য উঠিয়াছে। ইহার পর আরও দাম বাড়িবে কি না কে জানে? ম্যালেরিয়া দূর করিবার দায় সরকারের, সে দায় সরকার কতটা পালন করেন তাহা দেশবাসীর জানা আছে। কুইনাইনের মারফতেও যে রোগক্লিষ্ট দুস্থদের কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—সরকার সেই দিকেও নারাজ!

উদ্ভিজ্জ হইতে রং উৎপাদন—

বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগ নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জের ফল, মূল ও বল্কল হইতে বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী রং উৎপাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পলাশফুল ও বেলফুল লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পলাশ ফুল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা রং উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। খয়ের ও কমলালেবু লইয়াও অনুরূপ পরীক্ষা চলিতেছে। উক্ত শিল্পবিভাগ শ্বেতসার সম্পর্কেও গবেষণা করিতেছেন। ভারতের সর্ব্বত্র এমন অনেক উদ্ভিজ্জ আছে যাহা হইতে নানা প্রকার শিল্পবিষয়ক দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইয়া ভারতকে স্বাবলম্বী হইবার অধিকার দিতে পারে। এতদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকদের এদিকে নজর ছিল না; আজ যদি সত্য সত্যই দৃষ্টি ফিরিয়া থাকে, সুফল যে ফলিবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা সাগ্রহে সেদিনের প্রতীক্ষা করি।

ত্রিবাঙ্কুরে পেট্রলের ব্যবহার হ্রাস—

জগত-জোড়া অর্থসঙ্কটের ফলে চারিদিকেই ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা চলিয়াছে। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর সরকার পেট্রলের বদলে কয়লার গ্যাসের সাহায্যে মোটর পরিচালনায় বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শতকরা পঁচানব্বইটি সরকারী মোটর বাস কয়লার গ্যাস দ্বারা চালানোর পরিকল্পনা করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমুদয় মোটর-বাস-সমূহের জন্য পেট্রলের পরিবর্ত্তে কয়লার ব্যবহার হইলে ইন্ধন বাবদ ব্যয় শতকরা প্রায় পঁচিশ টাকা হ্রাস পাইবে বলিয়া প্রকাশ। ব্যাপকভাবে এই চেষ্টা হইলে কয়লা শিল্পেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

আমেরিকায় সমর সম্ভার

প্রস্তুতের কারখানা—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমর সম্ভার প্রস্তুতের জন্য বর্ত্তমানে ৭৮৪টি কারখানায় কাজ হইতেছে। ইহা ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী কর্ত্তৃত্বে আরও প্রায় আটশত কারখানা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—

খ্যাতনামা সাংবাদিক, "ভারতবর্ষে"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গত ২২শে বৈশাখ ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বীরেন্দ্রবাবু ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শেষ জীবনে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে শ্রবণশক্তি হারাইয়াছিলেন—তাহার উপর গত ৬ বৎসরকাল দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কাজ করিয়াছিলেন এবং বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয় বিদ্যাসাগর কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া চৌধুরী মহাশয় কয়েকমাস স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯১৪ সালে মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন ও তদবধি এখানে সুনামের সহিত অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। বহুকাল তিনি কলেজ্ হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী

কলেজের খেলা বিভাগের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। চৌধুরী মহাশয় শুধু অধ্যাপক নহেন—সাংবাদিক। তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স জার্নালের সম্পাদক। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার অধ্যক্ষতায় কলেজ আরও অধিক উন্নতি লাভ করিবে।

কলিকাতায় মেয়র নির্ব্বাচন—

এবারে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনে কোনরূপ প্রতিযোগিতা চলে নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মেয়র ও মিঃ ইস্পাহানি ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা উভয়কেই অভিনন্দন জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা·
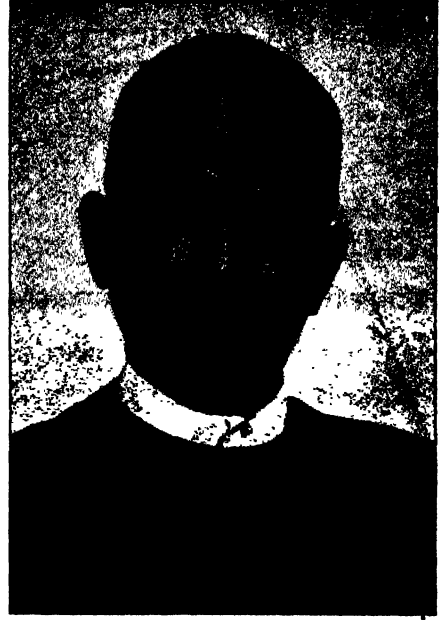
মেয়র—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

ডেপুটি মেয়র—এম, এ, এইচ, ইস্পাহানি

কর্পোরেশনের কাউন্সিলররূপে করদাতাদের সেবা করিয়া আসিতেছেন। নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। কংগ্রেসের আদর্শের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং গভীর নিষ্ঠা আছে। সুতরাং মেয়রের পদে নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শই যে তিনি অনুসরণ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্পোরেশনের সম্মুখে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে আমাদের বিশ্বাস তৎসম্পর্কে দেশবন্ধুর আদর্শ-অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম নগরীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহা-সম্মিলন—

গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র শনি ও রবিবার নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাপরিষদের উদ্যোগে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুত দ্বারকানাথ সেন তর্কতীর্থ সম্মিলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কবিরাজ শ্রীযুত অমিয়ানন্দ

কবিরাজ শ্রীদ্বারিকানাথ সেন তর্কতীর্থ

ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ শ্রীখণ্ডে গিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ও কবিরাজ শ্রীযুত প্রসূতিপ্রসন্ন সেন

কবিরাজ শ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর

প্রদর্শনী সভাপতিরূপে প্রদর্শনীটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কবিরাজ শ্রীসত্যব্রত সেন ধন্বন্তরি পতাকা উত্তোলন করেন ও নানা বিভাগের মধ্যে কবিরাজ শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ আয়ুর্ব্বেদ-দর্শন বিভাগে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এবারের সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, ৯টি বিভিন্ন বিভাগে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ বিকাশের জন্য সকল প্রকার চেষ্টাই হইয়াছিল। কলিকাতা ও বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু কবিরাজ এই সম্মিলনে যোগদান করায় সম্মিলন এবার সর্ব্ব-প্রকার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

জাপানের লোকসংখ্যা—

গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে যে লোক গণনার কার্য্য সম্পন্ন করা হয় তাহার ফলে জাপান সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ১০ কোটি ৫০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে! ইহার মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। গত ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে মোট লোকসংখ্যা ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার পরিমাণ বাড়িয়াছে।
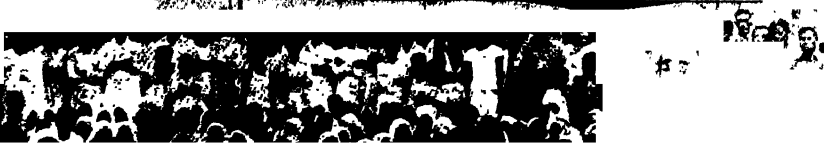
ঢাকা জেলা হইতে দাঙ্গার জন্য পলায়নকারী মহিলারা আগরতলার দুর্গাবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে

আগরতলায় বালিকা বিদ্যালয়ে আর এক দল মহিলা আশ্রয় লাভ করিয়াছে

ঢাকা দাঙ্গার ভয়ে গ্রামের লোকজন পলাইয়া আগরতলায় শাসন-বিভাগের প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছে

রামগড়ে ইটালীয় যুদ্ধবন্দীরা কাজ করিতেছে সাধারণ সৈনিকদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য এইরূপ কাজ করিতে হয়

রামগড়ে ইটালীয় যুদ্ধবন্দীদের ফুটবল খেলার দল—সময় কাটাইবার জন্য তাহাদের আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে

রামগড়ে বন্দীদের জন্য হাসপাতাল—একজন ইংরাজ ডাক্তার একজন ইটালীয় বন্দী-রোগীকে দেখিতেছেন

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হকি ঃ
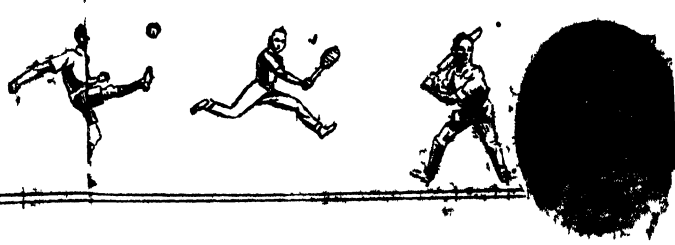
হকি খেলার ইতিহাস বহুদিনের পুরন। বর্ত্তমানে যেরূপ উচ্চ শ্রেণীব হকি খেলার সঙ্গে আদেব পবিচয বযেছে তা প্রাচীন যুগেব মধ্যে ছিল না। প্রাচীন যুগেব হকি খেলোযাডবা দৈহিক বলে অটুট স্বাস্থ্যে অধিকারী হযেও এবং অপূর্ব্ব ক্রীডাচাতুর্য্যে পাবদর্শীতা লাভ করলেও খেলার মধ্যে বোধহয এতখানি মার্জ্জিত পরিচয পাওয়া যেতনা এবং মাঠে এরূপ আইন কানুনের বাধ্য বাধ্যকর মধ্যে তাঁবা

ভূপাল ওযাণ্ডারাস ও রব বাইটন কাপ ফাইনাল ভাবত ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ব খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে

খেলতে জানতেন না। প্রাচীন পারস্যবাসীদেরই হকি খেলার প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যেতে পারে। প্রাচীন যুগে তারা যে, 'স্টিক-গেম' খেলত সেটা সঠিক হকি না হলেও হকি খেলার সঙ্গে তার যথেষ্ট সমসাদৃশ্য ছিল। গ্রীকরা তাদেব কাছ থেকেই হকি খেলায় পারদর্শীতা লাভ করে। আর রোমানদের হকি খেলায় যা কিছু সুনাম হয়েছিল তাতে গ্রীসেবও যথেষ্ট দান ছিল। এথেন্সে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের এক আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিকেরা নিঃসন্দেহে এই প্রমাণ স্বীকাব করেন যে, হকি খেলাব প্রবর্ত্তক প্রতীচ্যবাসী। এবং সেখান থেকেই ক্রমশঃ হকি খেলার প্রচলন পৃথিবীর অন্য অন্য সভ্য দেশের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ। আবিষ্কৃত প্রাচীর গাত্রে ছযজন বলিষ্ঠ যুবক যে খেলায় যোগদান করেছিল তাঁরা আজ ঐতিহাসিকদের মতে বর্ত্তমান হকি খেলার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। যুবকদেব চিত্র যেভাবে পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছিল তাতে মনে হয় অনেক বর্ত্তমান হকি খেলার নিয়ম অনুযায়ী 'বুলি'র জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ছবিতে হকি স্টিক উপরের দিকে না রেখে নীচের দিকে

খোদাই করা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ পরীক্ষা করে বলেছেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫১৬—৪৪৯ অব্দে কোন্ নিপুণ শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যে চি ত্র টি একদিন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। গ্রীসের আবিষ্কৃত প্রা চী ন ধাতু ও মৃত্তিকা পাত্রে হকি খেলার বহু বিভিন্ন চিত্র উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতার এ ত খা নি প্রসার সে সময় ছিল না, ক্রীড়ামোদিরা প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ চি ত্র গু লি র মধ্যে খেলোয়াড়দের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমা অ ব লো ক ন করে আনন্দ লাভ করত। সংবাদ-পত্রের কৃপায় আমাদের কষ্ট বর্ত্তমানে যথেষ্ট লাঘব হয়েছে। কেবল স্থানীয় নয় পৃথিবীর যে কোন দেশের বিভিন্ন খেলার ছবির আমরা পরিচয় পেতে পারি। হকি খেলাকে জীবন্ত রাখতে গিয়ে ভাস্কর্য্য শিল্পকে শিল্পীরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কেবল প্রাচীর গাত্রেই নয় সৌখিন আসবাব-পত্রে হকি খেলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। ১৩৩০ সা লে র আবিষ্কৃত গ্রীস থেকে কোপেন হেগেনে যে একটি ডিস আনা হয়েছিল তাতেও হকি খেলার একটি দৃশ্য অঙ্কিত ছিল! ছবিতে দুইজন হকি খেলো-য়াড় 'বুলি' করছে দে খা ন হয়েছে। প্রাচীন হকি খেলার সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পলো খেলার অনেক-খানি নিকট সম্পর্ক ছিল। পলো খেলার প্রবর্ত্তক ভারত-বর্ষ। সুতরাং হকি খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষের দানও ঐতিহাসিকগণ একেবারে অস্বীকার করেন না। অনেকের মতে প্রাচীনকালে পলো খেলার প্রচলন ছিল সম্ভ্রান্ত রাজন্য পরিবারের মধ্যে আর জনসাধারণ ঘোড়ার অভাবে হকির মতনই একটা 'স্টিক্ গেমে'র প্রচলন দেশের মধ্যে চালিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের যুক্তি একেবারে উপেক্ষার নয়।

পুলিস—এ বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী ফটো: জে, কে, সান্যাল

এলাহাবাদ এইচ এ—বাইটন কাপের তৃতীয় রাউণ্ডে ৩-২ গোলে দিল্লী ইয়ংস দলের নিকট পরাজিত হয়েছে ফটো: বি, বি, মৈত্র

আমেরিকাতেও 'স্টিক্ গেমে'র বেশ একটা চলন ছিল। এবং এই খেলাটা Aztec Indianরাই দেশের মধ্যে চালিয়েছিল। আমেরিকাতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে প্রাচীন অধিবাসীরা সকলে না হলেও বেশীর ভাগই যে 'ষ্টিক গেম'-এর চর্চ্চা করত তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বর্ত্তমানে আমরা যে হকি খেলার চর্চ্চা করছি সেটার জন্ম বলতে প্রায় ১৮৭৫ সালে। ঐসময় থেকেই প্রাচীন হকি খেলার মধ্যে যে সব দোষ ক্রটী ছিল তা সংশোধন করে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হকি খেলাকে উন্নত করতে দেশের উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রেরণা এসেছিল। খেলার ধরণের মধ্যে একটা নূতনত্ব প্রথম এনেছিল বিখ্যাত উইম্বলডন ক্লাব ১৮৮৩ সালে। ক্লাবের খেলোয়াড়রা প্রথম 'string' বল এবং ফিকে ছাই রংয়ের হকি স্টিক্ ব্যবহার আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে ইংলণ্ডের প্রায় চারি পাশেই অনেকগুলি হকি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হ'ল। তবে বর্ত্তমানের হকি খেলার প্রকৃত জন্মদিন হ'ল ১৮৮৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী। ঐ দিন 'হকি এসোসিয়েশনে'র প্রথম আন্তর্জ্জাতিক হকি খেলা হয় ইংলণ্ড বনাম আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে। লণ্ড সে খেলায় ৫-০ গোলে জয়লাভ করে। হকি খেলার নিয়মকানুন সংশোধন করা এবং নূতনভাবে গঠন করবার জন্য ১৯০০ সালে 'একটি 'ইণ্টার ন্যাসনাল কমিটির' প্রয়োজন অনুভব করা হয়। হকি এসোসিয়েশন থেকে আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের গভর্ণিং বডি তাদের প্রত্যেকের দুজন করে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। পরে ঐ প্রতিষ্ঠান 'ইণ্টার ন্যাশনাল হকি বোর্ড' নামে অভিহিত হয়।

দিল্লী ইয়ংস ফটো: জে, কে, সান্যাল

লক্ষ্ণৌ ওয়াই এ ফটো: বি, বি, মৈত্র

বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই হকি খেলার প্রচলন

হয়েছে। তবে ইউরোপের দেশগুলিতে ফুটবল যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে হকি ততখানি পারেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে হকি খেলাব আদর বেড়েছে। ভারতবর্ষে হকি খেলার জনপ্রিয়তা যতখানি ততখানি অন্য কোন দেশে নেই। হকি খেলা যেন ভারতবাসীর জাতীয় খেলা। আর হকিতে ভারতবর্ষ যতখানি পারদর্শীতা লাভ ক'রে পৃথিবীর অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছে তা বর্ত্তমানের হকি খেলার ইতিহাসকেই কেবল সমুজ্জল করে নি—বহু সহস্র বৎসর পরেও ঐতিহাসিকগণ যখন অতীত পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবময় কীর্ত্তির সন্ধান পেয়ে গবেষণা কার্য্যে মগ্ন থাকবেন সে সময় তাঁদের মধ্যে যদি কেহ ভারতবর্ষের সন্তান হ'ন তাহলে নিশ্চয় সেই জরাজীর্ণ প্রমাণ লিপির ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করে গৌরবান্বিত হয়ে উঠবেন। ভারতবর্ষে পাঞ্জাব, ভূপাল, মানাভাদার প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা হকি খেলার চর্চ্চা বিশেষ ভাবে করে থাকে। ঐ সব অঞ্চলের তুলনায় হকি খেলায় জনপ্রিয়তা এবং চর্চ্চা বাঙলা দেশে কম। তবে হকি খেলাকে বাঙলা দেশ সম্মান দিয়েছে। ভারতবর্ষের হকি খেলার প্রধান আকর্ষণ বাইটন কাপ। প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভারতবর্ষের বহু শক্তিশালী দল কলিকাতার হকি মরসুমের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। বাঙলার কয়েকজন হকি খেলোয়াড় 'অল্‌ইণ্ডিয়া হকি টীমে যোগদান করে ভারতবর্ষের সম্মানও একদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আজকারও প্রয়োজনে বাঙলা দেশের হকি খেলোয়াড় ভারতীয় হকির সম্মান রাখতে পারবে বলে বহুলোকের বিশ্বাস। আমাদের বাঙলা দেশের হকি খেলায় বর্ত্তমান ইতিহাস এতখানি গৌরবময় হলেও দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্খীর দল কিন্তু গৌরব বোধ করেন না। আজ হকি খেলায় বাঙলার যে স্থান সে স্থান বাঙ্গালী হকি খেলোয়াড় দিয়ে পুষ্ট হয়নি। অবাঙ্গালী হকি খেলোয়াড়রাই আজ বাঙলার হকি খেলার ইতিহাসকে গৌরবযুক্ত করেছে, সেখানে প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের স্থান নেই—তাদের অক্ষমতা আমাদের বার বার লজ্জার কারণ হয়েছে। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের অনুশীলনের আগ্রহ নেই, খেলার মাঠে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্য লক্ষ্য করে করতালি দিয়ে, লম্ফে ঝম্পে বর্ষাতি উড়িয়ে তাদের খেলায় উৎসাহ দেয়,—আর তর্কে, আস্ফালনে, গর্ব্বে ময়দান মাতিয়ে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব জিইয়ে রাখে। যে সময় অবাঙ্গালী হকি খেলোয়াড়রা ময়দান থেকে সকালের 'প্রাক্‌টিস ম্যাচ' খেলে মাথা ফাটিয়ে বাড়ী ফেরে আমাদের বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা সে সময় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হয়ত খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ধ্যানচাঁদের অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্যের কথা পড়ে বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠেন নতুবা অলস শয্যার উপর সাত সমুদ্রের পারে ব্রাডম্যানের বিভিন্ন বল মারার স্বপ্ন, লেরিটির মারাত্মক বোলিং, মোহনবাগানের গোল সম্মুখে পেনাল্টি মারের দৃশ্য দেখতে দেখতে কোন না কোন সময়ে স্বপ্নজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এর পর কাহারও স্কুল-কলেজ কাহারও বা অফিস। যাদের এসবের বালাই নেই তাদের সময় প্রচুর, সময় কাটাবার উপকরণও বহু।

২৯শে এপ্রিল ১৯৩৭ সালের কথা। হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বাঙ্গালী হকি খেলোয়াড়দের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে, অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের প্রভাবে হকি খেলায় প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের অবস্থা সম্বন্ধে যে মত দিয়েছিলেন তা খুব আশাপ্রদ নয়। তিনি একথাও বলেছিলেন, বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাঙলা দেশের খেলাধূলা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছে যাতে করে বাঙ্গালী ফুটবল খেলায় অত্যাবতের যে-গৌরব অর্জ্জন করেছিল তা অচিরেই হারাতে পারে। অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রভাব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের আর সুযোগ পরে মিলবে না। হকির মতনই তখন বাঙলা দেশের ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে বজায় রাখতে হবে।

ধ্যানচাঁদ পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়, তাঁর মতেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। আমরা এখন থেকে যদি নিজেদের কথা চিন্তা না করি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। তরুণ খেলোয়াড়দের আজ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে। আশা করি বাঙ্গালীর সুনাম তারাই একদিন অর্জ্জন করবে।

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

ফাইনাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভগবন্ত ক্লাব এবং ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স দুইটি দলই একটি ক'রে গোল করায় অতিরিক্ত সময় খেলান হয়। কিন্তু এই সময়ে কোন পক্ষই গোল দিতে সক্ষম না হওয়ায় বি এইচ এর নূতন আইন অনুযায়ী ফাইনালের উভয় দলকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। কাপটি দুই দলই ছ' মাস করে রেখে ফাইনাল বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। টসে ভগবন্ত ক্লাব দল জয়ী হওয়ায় প্রথম ছ' মাস তারাই কাপটি রাখবে। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম।

বাঙলা নববর্ষ উৎসবে ব্যাণ্ডবাদ্য দলের কুচকাওয়াজ

এ বৎসর বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার কোন কোন খেলায় খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। ফাইনাল খেলায় ভূপাল দলের জাহুরের আচরণ সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। বিপক্ষ দলের ভূতলশায়ী গোলরক্ষকের উপর নির্দ্দয় আক্রমণ সকলেরই বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি ও এরূপ ঘটনার সঙ্গে ক্রীড়ামোদিদের পরিচয় খুবই কম। আম্পায়ের নির্দ্দেশক্রমে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়েও পুনরায় তাঁর অনুমতিতে খেলায় যোগদান করে কিন্তু বাম্নি ও [illegible]গ্যাতাকে একরকম জোর করেই মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তার খেলার উগ্র প্রেরণাকে কেহ কোন রকমে বাধা দিতে পারেনি। সমস্ত মানসম্ভ্রম উপেক্ষা করে অতিরিক্ত সময়ের খেলাতে একরকম জোর করেই যোগদান করেছিল। খেলার মাঠে এ মজা উপভোগ্য হলেও উপেক্ষণীয় নয়—আশা করি এবৎসরের ঘটনা যেন পুনরায় আর না ঘটে
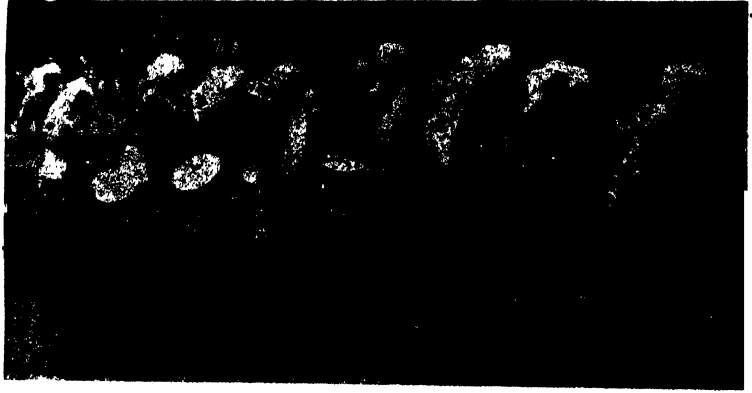
আগা খাঁ হকি ফাইনাল ঃ

টিকমগড়ের ভগবন্ত ক্লাব আগা খাঁ হকি খেলার ফাইনালে ২-১ গোলে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়বার কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে। ১৯৩৮ সালে ভগবন্ত ক্লাব প্রথমবার ফাইনালে বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের আগা খাঁ ফাইনালে এবং ১৯৪০ সালের বাইটন কাপ ফাইনালেও তারা একবার উঠেছিল। সম্প্রতি তারা দিল্লীর যাদবেন্দ্র হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে।

বাঙলা নববর্ষ উৎসবে বালক বালিকাদের ব্যায়াম চর্চ্চার একটি দৃশ্য

কলেজ দল পরাজিত হলেও বিপক্ষদলের সঙ্গে পুরাদমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল। সেমিফাইনাল খেলায় শক্তিশালী মানাভাদার দলকে ২-০ গোলে তারা পরাজিত করে। অনেকের মতে মানাভাদারের এ পরাজয় অনেকখানি ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলেই হয়েছিল। খেলার ফলাফলে ক্রীড়ামোদিরাও বিস্মিত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের কাছে শক্তিশালী দলও পরাজয় স্বীকার করে। এবং তা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হলেও খেলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ সম্ভাবনার কথা কেহ ভাবে নি। ফাইনালে কলেজদল দ্বিতীয়ার্দ্ধে অগ্রগামী থেকে এবং গোল করবার বহু সুযোগ নষ্ট ক'রে তারা সম্মানিত ভাবে বিপক্ষদলের নিকট পরাজিত হয়েছে। এ পরাজয়ে তাদের অসম্মানের কিছু নেই। ভগবন্ত ক্লাবের দলবদ্ধ ভাবে তীব্র আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার ক্ষিপ্রতা তাদের জয়লাভের সহায়তা করেছে। সর্ব্বোপরি খেলায় বহুদিনের অভিজ্ঞতা তাদিকে কোন সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি—ববং বিজয়ের পথে অনেকখানি শক্তিসঞ্চার করেছে। খেলা শেষ হবাব ছ' মিনিট পূর্ব্বে বিজয়ী দলের জুটসি বিজয়সূচক গোলটি করেন।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ঃ

কালীঘাট ক্লাব ২-১ গোলে মেসারার্স ক্লাবকে পরাজিত করে জুনিয়ার হকি টুর্ণামেন্টের বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। বিজয়ী দলের জ্যাকম ২টি গোলই দিয়েছিলেন।

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

পুলিস ১-০ গোলে ১৯৩৮ সালের চ্যাম্পিয়ান কলেজিয়ান্স দলকে হকি খেলায় পরাজিত ক'রে এবার সর্ব্বপ্রথম কাপ বিজয়ী হয়েছে। এল হে দলের বিজয়সূচক গোলটি দেন।

ডি এস এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

কলিকাতার মহামেডান স্পোর্টিং দল ৩-০ গোলে দিল্লীর চ্যাম্পিয়ান, ইউনিয়ান এফ সি'কে পরাজিত করে উক্ত শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। উভয় দলের খেলোয়াড়রা বল প্রয়োগে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে রেফারী কর্ত্তৃক সতর্কিত হয়। মহামেডান দলের আক্রমণ ভাগের খেলা ...... অপেক্ষা বহু অংশে উন্নত ছিল। বিপক্ষদলের গোলরক্ষক কয়েকটি অবধারিত গোল রক্ষা করে নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

হাই জাম্পে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ওরিগণ ইউনিভার্সিটির লা ট্রাটস্ আউট ... জাম্পে ৬ ফিট ১০১/৪ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ... রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ৬ ফিট ৯ ... ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক ট্রায়ালে সি জন ... ডি এলব্রিটন একত্রযোগে উক্ত উচ্চতা লঙ্ঘন করে রেকর্ড করেছিলেন।

ডোরথি রাউণ্ড ঃ

মিসেস লিট্‌ল (পূর্ব্বে মিস ডোরথি বাউণ্ড, উ... চ্যাম্পিয়ান) সম্প্রতি পেশাদার টেনিস খেলোয় যোগ দিয়েছেন। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি সিনিয়োরী ক্লাবে অনুশীলন আরম্ভ করবেন। যুদ্ধের দরুণ পুত্র বর্ত্তমানে কেনাডায় অবস্থান করছেন।

ভারতীয় বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়দের ক্ষমা প্রা...

বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন ... প্রতিযোগিতা থেকে হঠাৎ ভারতীয় বিশি... খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, যুধি... সোহনলাল আনওয়ার হোসেন প্রভৃতি অবসর ... দর্শক এবং এসোসিয়েশনের পরিচালকদের ম... অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। বিশিষ্ট খেলোয়াড়দে... আচরণের ফলে এসোসিয়েশন নিখিল ভারত সঙ্ঘের নিকট অভিযোগ জানান। অভিযোগ ঐ সকল খেলোয়াড় নিখিল ভারত টেনিস পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতায় ... যোগদা... পারবেন না তা সঙ্ঘ ...ক নির্দেশ ... আ... পেযে সুখী হলাম সঙ্ঘের নির্দেে ... সর্ত্ত গাউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ ...ওয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এক আবেদন ...ন। বর্ত্তিতার সম্মান রক্ষা করা খেলে... পরিচয়। যাঁরা সে সম্মান দিতে অ...

খেলোয়াড় হ'য়েও জনসাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন হ'ন। এই জন ছাড়া বাকি খেলোয়াড়গণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। র সিং আবার সঙ্ঘের এই নির্দ্দেশের প্রতিবাদ করে

মলা বিএস' কুস্তি প্রতিযোগিতায় —হেভীওয়েট বিজয়ী মাণিকগুহ (বামদিকে) ১০ ষ্টোন বিজয়ী সুশীল ঘোষ (দক্ষিণে)

ছন, সখের খেলোয়াড় হিসাবে তাঁরা ইচ্ছামত প্রতিযোগিতা থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। যদি পেশাদার খেলোয়াড় হ'তেন তাহলে তাদের উপর নাকি নিয়মানুবর্ত্তিতার থেকে শাস্তির বিধান দেওয়া চলত'। টেনিস মহলে যুধিষ্ঠির ক আমরা একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসাবেই এতদিন এসেছি। আজ আমরা তাঁর খেলোয়াড়োচিত ভাবের যথার্থ পরিচয় পেলাম। সে পরিচয় তাঁর মত শিষ্ট খেলোয়াড়ের সুনাম রক্ষা করেনি।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল টুর্ণামেণ্ট ঃ

মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ল টুর্ণামেণ্টের খেলা আরম্ভ হবে। নিম্নলিখিত দশটি শ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

জোন—'এ'—উত্তর-পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোঃ

জোন—'বি'—দিল্লী ফুটবল এসোঃ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজপুতানা ফুটবল এসোঃ।

জোন—'সি'—ভারতীয় ফুটবল এসোঃ, ঢাকা স্পোর্টিং এসোঃ, ও বিহার অলিম্পিক এসোঃ।

জোন—'ডি'—মাদ্রাজ ফুটবল এসোঃ, মহীশূর ফুটবল এসোঃ এবং পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোঃ।

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির দরুণ আর্ম্মি স্পোর্টিং কণ্ট্রোল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং সিন্ধু যোগদান করবে না বলেই স্থির করেছে।

ক্রিকেট ঃ

ভারতীয় অবশিষ্ট দল—৪৮৭ ও ১১৯ (১ উইকেট)
মহারাষ্ট্র দল—৩০৮ ও ২৯৫

ভারতীয় অবশিষ্ট দল 'ফেস্টিভ্যাল ম্যাচে' খেলায় ৯ উইকেটে মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করেছে।

ভারতীয় অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংসে কে এন বঙ্গনেকার ১৩৫, ভিনু মানকাদ ১০৫, মাস্তাক আলি ২০ এবং অমরনাথ ৫০ রান করেন। হাজারী ১১৯ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। পর পর দুবার বল দিয়ে উপর্য্যুপরি ২ উইকেট পেয়ে হাজারী মাঠের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বালী কুস্তি প্রতিযোগিতার ১০ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান

মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংসে এস এম সোহনী ১০১ রান

দিয়েছিলেন। নিম্বলকারের ৫২ রান ও হাজারীর ৪০ রানও উল্লেখযোগ্য। অমরনাথের পঞ্চম বল মেরে প্রফেসার দেওধর সর্ট রান নিতে গেলে মাস্তাক আলি কভার পয়েন্ট থেকে ষ্টাম্পে বল মেরে সোহনীকে রান আউট করেন। সোহনীর আউট হবার পর খেলার গতি একেবারে ঘুরে যায়। পনের মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে মহারাষ্ট্র দল ৮ রানে ৩টে ভাল ভাল উইকেট হারায়। এস ব্যানার্জির বোলিং এভারেজ ছিল—২২ ওভার, মেডেন ৬, রান ৭৩, উইকেট ৪। ফলোঅন্ করে মহারাষ্ট্র দলের দ্বিতীয় ইনিংসে রান নিম্বলকার এবং দেওধর যথাক্রমে ৭৮ করলেন। এই ইনিংসের খেলাতেও ব্যা মারাত্মক হয়েছিল। এভারেজ ছিল— মেডেন ৫, রান ৬১, উইকেট ৬। দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। ১ রান উঠল ১১৭। মাস্তাক আলী ৫৪ রান থাকেন। ৩০ মিনিটে তাঁর ৫০ রান উঠে। ৫৩ রান করে নট আউট রয়ে যান।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কৌতুক-নাটিকা "দৈবাৎ"—।০
বটকৃষ্ণ রায় প্রণীত একাঙ্ক নাটিকা 'পঞ্চমাঙ্ক'—॥০
শশধর দত্ত প্রণীত 'রমার বিয়ে"—২৲, "মোহন ও রমা"—২৲
পূর্ণশশী দেবী প্রণীত 'পথে বিপথে"—১৸০
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "চারিটি শো" ॥০
বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "১৯৫০"—২৲
অ...কুমার সেন প্রণীত "অভিনেতা"—২৲
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত "রাজযোটক"—২৲
অসীম দত্ত ও রমাপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত "হাল খাতা"—
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ছোট থেকে বড়"৷—৸০
অন্নদামোহন বাগচী প্রণীত "উন্মত্ত পৃথিবী"—২৲
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "না জানলে চলে না"
নিখিলেশ সেন প্রণীত "রোমাঞ্চকর কাহিনী"—॥০
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "লক্ষ্য-ভেদ"—১॥০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত "অদ্ভুত যত ভূতের গল্প"
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবন্ধুবেদবাণী"
অন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত "জীবন শিল্পী"—২৲